প্রফেসর'স

বিসিএস
সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত

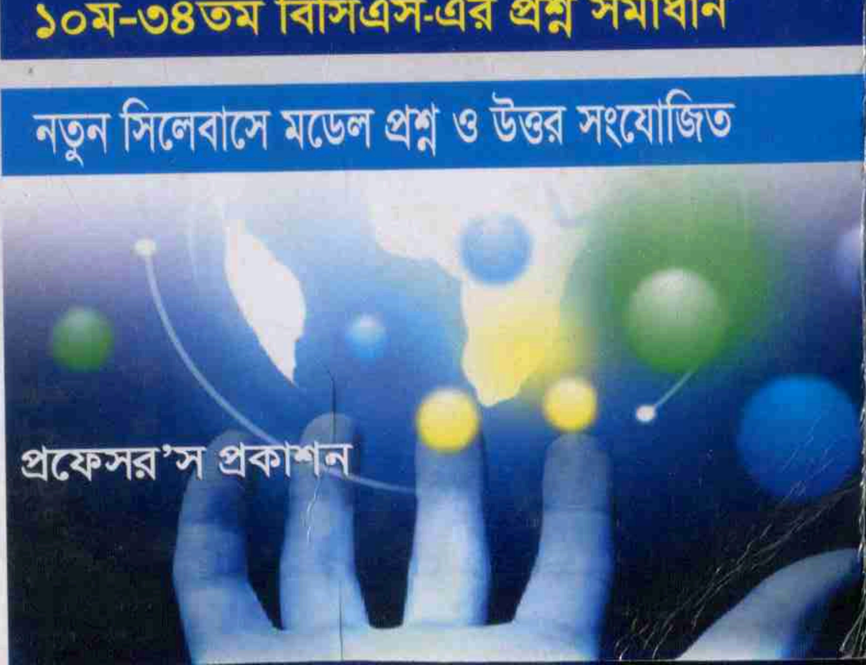

প্রফেসর'স প্রকাশন

PDF MADE BY

MAHBUB OR RASHID

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com

প্রফেসর'স

বিসিএস সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত

মোহাম্মদ আবু তাহের
সহকারী অধ্যাপক
চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ

গোলাম কিবরিয়া সরকার
বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, এমবিএ

প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৭/১ বাংলাবাজার, দোতলা, ঢাকা ১১০০
Email : pp@professorsbd.com
web : www.professorsbd.com
/professorsprokashonbd

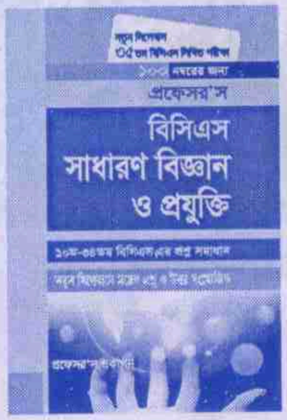

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
প্রফেসর'স প্রকাশন
৩৭/১ দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রক : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৭১২৪৬৫৩

প্রচ্ছদ : রফিক উল্যাহ, দি ডিজাইনার

পরিবেশক : বর্ণালী বইঘর, ৫৩ নীলক্ষেত, ঢাকা ১২০৫
ফোন : ০১৭১২ ২২৩৮৮৩

মূল্য : ৯০০ টাকা

Sadaron Biggaen O Projukti
Published by Jashim Uddin
Professor's Prokashon, 37/1 (1st Floor)
Banglabazar, Dhaka 1100
Phone : Office 9584436
Sales Center 7125054, 9533029
Email : pp@professorsbd.com
/professorsprokashonbd
Price : 900.00 Taka

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৭

পঞ্চদশ সংস্করণ
এপ্রিল ২০১৫

বইটি সম্পর্কে

পরিবর্তিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বব্যবস্থায় বিসিএস পরীক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক, মানসম্মত ও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ৩৫তম বিসিএস থেকে নতুন নিয়ম ও সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান সিলেবাস অনুযায়ী শুধু সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের ১০০ নম্বরের 'সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

আমাদের প্রকাশিত 'সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বইটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত নতুন সিলেবাসের আলোকে রচিত। বাজারে প্রচলিত অন্য বইগুলোর মতো পূর্বতন সিলেবাস অনুসরণে গৎবাঁধা কিছু বিষয় নিয়ে বা সঠিক মান বণ্টনকে উপেক্ষা করে শুধু প্রচ্ছদ ও সূচিপত্র পরিবর্তন করে এলোমেলোভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। নিচে উপস্থাপিত বইটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে লক্ষ্য করলেই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন :

- ১০ম থেকে ৩৪তম বিসিএসের প্রশ্ন সমাধান;
- নতুন সিলেবাসের আলোকে ১০ সেট মডেল প্রশ্ন ও উত্তর;
- PSC'র নন-ক্যাডার পরীক্ষার বিগত কয়েক বছরের প্রশ্ন সমাধান;
- সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে নতুন সিলেবাসের আলোকে রচিত;
- প্রতিটি অধ্যায় সিলেবাসে প্রদত্ত Topic অনুযায়ী আলাদাভাবে উপস্থাপন;
- সিলেবাসে প্রদত্ত প্রতিটি অধ্যায়ের সম্ভাব্য সব প্রশ্নের সন্নিবেশ;
- তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে কম্পিউটার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা/টীকা ও সাম্প্রতিক প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশ্ন সন্নিবেশ;

প্রফেসর'স প্রকাশন-এর বিসিএস সিরিজের বইগুলো বিগত প্রায় দুই দশক ধরে পরীক্ষার্থীদের কাছে সাফল্যের চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত। পূর্বের জনপ্রিয়তা ও আপনাদের সাফল্যে কার্যকর ভূমিকা রাখতে নতুন সিলেবাস অনুযায়ী প্রণীত আমাদের বিসিএস লিখিত সিরিজের বইগুলোতে সমাবেশ ঘটানো হয়েছে বহু মেধাবী, সফল ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিজ্ঞতার ছাপ। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইটিও আপনাদের সাফল্য অর্জনে যথেষ্ট সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। আপনাদের জন্য রইলো শুভ কামনা।

চাকরির বাজারে অনন্য সহায়িকা
প্রফেসর'স-এর গ্রন্থমালা

- BCS MCQ Review Series
  (বিসিএসসহ যে কোনো MCQ পরীক্ষার শ্রেষ্ঠ সহায়িকা)
- বিসিএস প্রিলিমিনারি ডাইজেস্ট
- বিসিএস লিখিত সিরিজ
- বিসিএস লিখিত ডাইজেস্ট
- বিসিএস ভাইভা সহায়িকা
- Job Solution
  (PSC সহ সব ধরনের নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও সমাধান)
- Bank Math Solution
- English for Competitive Exams.
  (চাকরি ও ভর্তি পরীক্ষার ইংরেজি সহায়িকা)
- 100 Articles on National & International Issues
- Selected Basic Essays
- Key to Govt. Bank Job
- Key to Private Bank Job
- Bankers Recruitment Text
  (সকল ব্যাংক নিয়োগের পরিপূর্ণ টেক্সট)
- Viva For Bank Job
- ইসলামী ব্যাংকে নিয়োগ সহায়িকা
- উচ্চতর রচনাসম্ভার
- গণিত স্পেশাল
- সিলেকটেড মডেল টেস্ট
  (যে কোনো MCQ পরীক্ষা-পূর্ব প্রস্তুতির বিশেষ সহায়িকা)
- পিএসসি নন-ক্যাডার জব
  (যে কোনো লিখিত নিয়োগ পরীক্ষার সংকলন)
- সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড আই কিউ টেস্ট
- মাধ্যমিক শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
- প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ সহায়িকা
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন
- বেসরকারি প্রভাষক নিবন্ধন
- উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ
- সহকারী জজ নিয়োগ সহায়িকা
- খাদ্য অধিদপ্তর নিয়োগ সহায়িকা
- স্বাস্থ্য সহকারী নিয়োগ সহায়িকা
- পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর নিয়োগ
- কমিউনিটি হেলথকেয়ার প্রোভাইডার নিয়োগ
- সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ সহায়িকা
- পুলিশ সার্জেন্ট ও সাব-ইন্সপেক্টর রিক্রুটমেন্ট টেস্ট
- সিনিয়র স্কেল সহায়িকা

সাধারণ জ্ঞানের সব বিষয়ের
আপডেট তথ্য জানতে সঙ্গে রাখুন
নির্ভুল এবং সর্বশেষ তথ্যপূর্ণ বই
নতুন বিশ্ব

বিসিএস। বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি। বিভিন্ন চাকরি
ও ভাইভাসহ সকল প্রতিযোগিতায়
শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের শ্রেষ্ঠ বই

প্রফেসর'স প্রকাশন

Phone : 7125054, 9533029
Web : www.professorsbd.com

Syllabus

GENERAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Total Marks-100

(For General Cadre only)

Introduction : This is intended to test candidates' basic knowledge and understanding about application of science and technology in our daily life.

Part – A : General Science

Marks-60

i. **Light :** Nature, Spectrum, Different colours and wavelengths, UV, IR and LASER, Reflection of Light, Refraction of Light, Total Internal Reflection of Light, Lenses, Thin converging lens, Dispersion of light, particle nature of light, Einstein's photoelectric equation, photocells.

ii. **Sound :** Hearing mechanism, Decibel, Frequency, Sound machines in home and around–, Microphone, Loud speaker, Public address system, Characteristics of a sound note, Formation of stationary waves in stretched string, Laws of vibrating strings, Beats, Doppler Effect, Applications and limitations of Doppler Effect, Echoes, Absorption of sound wave, Reverberations, Fundamentals of Building acoustics, Statement of Sabine's Formula.

iii. **Magnetism :** Polarity and relationship with current, Bar magnet, Magnetic lines of force, Torque on a bar magnet in a magnetic field, Earth's magnetic field as a bar magnet, Tangent galvanometer, Vibration magnetometer, Para, dia and Ferromagnetic substances with examples, Electromagnets and permanent magnets.

iv. **Acid, Base and Salt :** Acid-base concepts; characteristics of acids and bases; acid-base indicators; uses of acids and bases in daily life and caution in handling them; social effects of misuse of acids; reason for acidity in stomach and selection of the right food; pH; measurement and importance of pH of substances; salts; characteristics of salts; necessity of salt in daily life; uses of salts in agriculture and industries.

v. **Water :** Properties of water; melting and boiling points of water; electrical conductivity; structure of water; hydrogen bonding; sources of water; sources of fresh water in Bangladesh; water quality parameters (colour and taste; turbidity; presence of radioactive substances; presence of waste; dissolved oxygen; temperature; pH and salinity); recycling of water; role of water in conservation of nature; necessity of quality water; purification of water (filtration; chlorination; boiling and distillation); reasons for pollution of water sources in Bangladesh; effects of water pollution on plants, animals and human beings; effects of global warming on fresh water; strategy for preventing water pollution and responsibility of citizens or public awareness; prevention of water pollution by industries; prevention of water pollution due to soil erosion from agricultural land; conservation of water sources and development.

vi. **Our resources :** Soil; types of soil; soil pH; reasons and effects of soil pollution; natural gas and its main compositions; processing, uses and sources of natural gas, petroleum and coal; forestry; limitations and conservation of our resources.

vii. **Polymer :** Natural and synthetic polymer; polymerization process; sources, characteristics and usage of natural and synthetic polymers; manufacturing process, characteristics and uses of fibers, silk, wool, nylon and rayon; physical and chemical properties of rubber and plastic; role of rubber and plastic for environmental imbalance; aware of using rubber and plastic.

viii. **Atmosphere :** Biosphere and Hydrosphere, Ionosphere, role of oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Potable and polluted water, Pasteurization.

ix. **Food and Nutrition :** Elements of food; carbohydrates; protein; fats and lipid; vitamins; types and sources of carbohydrates, proteins; nutritional value; menu of balanced diet; the pyramid of balanced diet; body mass index (BMI); fast food or junk food; preservation of food; various processes of storing food; use of chemicals for preservation of foods and its physiological effects.

x. **Biotechnology :** Chromosome; shape, structure and chemical composition of chromosome; nucleic acid; deoxyribonucleic acid (DNA); ribonucleic acid (RNA); protein; gene; DNA test; forensic test; genetic disorder in human beings; Biotechnology and Genetic Engineering; cloning; social effects of cloning; transgenic plants and animals; Use of biotechnology in agricultural, milk products and pharmaceutics; Gene therapy; Genetically modified organism; Nanotechnology; Pharmacology; Pharmacokinetics.

xi. **Disease and Helthcare :** Dificiency, Infection, Antiseptic, Antibiotics, Stroke, Heart Attack, Blood Pressure, Hypertension and Diabetes, Dengue; Diarrhoea; Drug addiction, Vaccination, Cataract, food poisoning, X-ray; Ultrasonography; CT Scan; MRI; ECG; Endoscopy; Radiotherapy; Chemotherapy; Angiography; uses, risk and side-effects of above techniques; Basic concept of Cancer, AIDS and Hepatitis.

Part – B : Computer and Inromation Technolgy

Marks-25

i. **Computer Technology :** Organization of modern personal computer and its major functional units, computer generations, History of computers, Central processing unit and microprocessor, Computer memories and their classification and characteristics, Input and output devices with characteristics and uses. The role of BIOS. Bus architecture, Motherboard and its components, functions and organization of microprocessors, Arithmetic Logic Unit (ALU), Control unit, Language translator, Text editor, Compiler, Interpreter, Computer software, System software, Operating system, Application software with examples of applications, Computer virus, Office automation. Computational biology; Role of computer in Drug design; Programming languages, their type; and levels, Steps for software development. Impacts of computer on society.

ii. **Information Technology :** Data and information, information collection, processing and distribution, System analysis and information systems, expert systems. Basics of multimedia systems with examples hardware and software, concept of data compression, multimedia system development life cycle. Local area, metropolitan area and wide area computer networks. TCP/IP protocol suit, Internet, Internet services and protocols, Internet service providers and their responsibilities, intranet and extranet, World Wide Web and Web technology. Major components of telecommunication systems, mobile telephone systems, satellite communication systems and VSAT, importance of fibre optic communication system, Electronic commerce and technology for electronic commerce.

Part – C : Electical and Electronic Technolgy

Marks-15

iii. **Electrical Technology :** Electrical components, voltage, current, Ohm's Law, Electrical power and energy, Electromagnet and magnetic field, electromagnetic induction, Circuits Breakers, GFCI's and Fuses. Power Distribution in a series circuit, voltage sources in a series, Kirchoff's voltage law, voltage division in a series circuit, Interchanging series elements, voltage regulation and the internal resistance of voltage sources, parallel resistors, parallel circuits, power distribution in a parallel circuits, Kirchoff's current law, open and short circuits. Generation of AC and DC voltage, thermal, hydraulic and nuclear power generators, Electric motors and their applications. Transformers, AC transmission and distribution, Electrical instruments, voltage stabilizers, IPS and UPS.

iv. **Electronics Technology :** Electronic components, analog and digital signals, analog electronic device, amplifirs and oscillators, resistance, types of resistors, conductance, ohmmeters capacitance, capacitors, Inductors, Inductance, Sinusoidal Alternating waveforms, Frequency spectrum, The sinusoidal waveform, General format for the sinusoidal voltage of current, phase relations, The Basic Elements and Phasors, Respons of Basic R, L and C. Elements to a sinusoidal voltage of current. Frequency response of the Basic Elements, Average power and power factor, complex numbers, Rectangular Form, Polar form, conversion between forms, Impedance and the phasor Diagram, Introduction to 3 phase systems, Elementary concepts of generation, Transmission, and Distribution, Various Levels of power, Basic concepts of transformers, radio television and radar, digital devices and digital integrated circuits. impact of digital integrated circuits, counters and digital display devices, digital instruments.

সূচি

BCS প্রশ্ন ও সমাধান : ১০ম - ৩৪তম

- ৩৪তম বিসিএস ২০১৪ .... ০৩
- ৩৩তম বিসিএস ২০১২ .... ১৮
- ৩১তম বিসিএস ২০১১ .... ৩১
- ৩০তম বিসিএস ২০১১ .... ৫৬
- ২৯তম বিসিএস ২০১০ .... ৬৯
- ২৮তম বিসিএস ২০০৯ .... ৮৭
- ২৭তম বিসিএস ২০০৬ .... ৯৩
- ২৫তম বিসিএস ২০০৫ .... ১০৯
- ২৪তম বিসিএস ২০০৩ .... ১১৫
- ২৩তম বিসিএস ২০০১ (বিশেষ) ১১৯
- ২২তম বিসিএস ২০০১ .... ১২১
- ২১তম বিসিএস ১৯৯৯ .... ১২৪
- ২০তম বিসিএস ১৯৯৯ .... ১২৯
- ১৮তম বিসিএস ১৯৯৮ .... ১৩৪
- ১৭তম বিসিএস ১৯৯৬ .... ১৩৭
- ১৫তম বিসিএস ১৯৯৪ .... ১৪০
- ১৩তম বিসিএস ১৯৯২ .... ১৪৩
- ১১তম বিসিএস ১৯৯১ .... ১৪৫
- ১০ম বিসিএস ১৯৯০ .... ১৪৭

PSC গৃহীত নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান ২০১৩-২০১৪

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনস্ট্রাক্টর (টেকনিক্যাল) ২০১৪ .... ১৪৯
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৫০
- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সায়েন্টিফিক অফিসার ২০১৪ .... ১৫১

সূচি

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪ .... ১৫২
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০১৪ .... ১৫৩
- জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ক্যামেরাম্যান ২০১৪ .... ১৫৩
- তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৪ .... ১৫৫
- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মোটরযান পরিদর্শক ২০১৪ .... ১৫৬
- সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিসার ২০১৪ .... ১৫৭
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৪ .... ১৫৮
- কৃষি মন্ত্রণালয়ের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী বীজ-তুলা সংগ্রহ এবং জিনিং কর্মকর্তা ২০১৪ ... ১৫৯
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২০১৪ .... ১৬০
- শিল্প মন্ত্রণালয়ের বয়লার পরিদর্শক ২০১৪ .... ১৬২
- বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাব-অ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪ .... ১৬৩
- মেরিন একাডেমীর শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৬৩
- আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুবাদ কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০১৪ .... ১৬৪
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী ইলেকট্রনিক প্রকৌশলী ২০১৪ .... ১৬৫
- রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ২০১৪ .... ১৬৬
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মেডিকেল অফিসার ২০১৪ .... ১৬৭
- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ২০১৪ .... ১৬৭
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৪ .... ১৬৮
- স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস-এর কোল্ড চেইন ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪ .... ১৬৯
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী প্রধান পরিদর্শক ২০১৪ .... ১৭২
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কম্পিউটার প্রোগ্রামার ২০১৪ .... ১৭৩
- তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪ .... ১৭৪
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৪ .... ১৭৫
- স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর ২০১৪ .... ১৭৬
- আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১৪ .... ১৭৭
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিন একাডেমির প্রদর্শক ২০১৪ .... ১৭৮
- মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৭৯
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৮০
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০১৪ .... ১৮১
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৮১
- জাতীয় মুদ্রণ অধিদপ্তরের প্রেস ম্যানেজার ২০১৪ .... ১৮২
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ২০১৪ .... ১৮৩
- খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১২ .... ১৮৪
- জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪ .... ১৮৫

সূচি

- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৮৬
- রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশের রেলওয়ের উপ-সহকারী ২০১৪ .... ১৮৭
- তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রকৌশলী/তদন্ত কর্মকর্তা/আইন কর্মকর্তা ২০১৪ .... ১৮৭
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অফিসার ২০১৪ .... ১৮৯
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার অফিসার ২০১৪ .... ১৯০
- প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২০১৩ .... ১৯১
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৩ .... ১৯১
- শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ২০১৩ .... ১৯২

পার্ট A সাধারণ বিজ্ঞান General Science

অধ্যায়-০১ : আলোকবিজ্ঞান ০৩
Light

অধ্যায়-০২ : শব্দবিজ্ঞান ৩৭
Sound

অধ্যায়-০৩ : চৌম্বকবিদ্যা ৬১
Magnetism

অধ্যায়-০৪ : এসিড, ক্ষার ও লবণ ৭৮
Acid, Base and Salt

অধ্যায়-০৫ : পানি ৯৩
Water

অধ্যায়-০৬ : আমাদের সম্পদ ১৩৫
Our Resources

অধ্যায়-০৭ : পলিমার ১৬৭
Polymer

অধ্যায়-০৮ : বায়ুমণ্ডল ১৮১
Atmosphere

অধ্যায়-০৯ : খাদ্য ও পুষ্টি ২১৫
Food and Nutrition

সূচি

অধ্যায়-১০ : জৈব প্রযুক্তি ২৪১
Biotechnology

অধ্যায়-১১ : রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা ২৭১
Disease and Healthcare

পার্ট B কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি Computer & Inromation Technolgy

অধ্যায়-০১ : কম্পিউটার প্রযুক্তি ৩২১
Computer Technology

অধ্যায়-০২ : তথ্যপ্রযুক্তি ৩৯১
Imformation Technology

অধ্যায়-০৩ : কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পরিভাষা ৪৫৫
Computer & IT Related Terminology

পার্ট C ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি Electical & Electronic Technolgy

অধ্যায়-০১ : ইলেকট্রিক্যাল প্রযুক্তি ৪৮৭
Electrical Technology

অধ্যায়-০২ : ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি ৫৪১
Electronics Technology

মডেল প্রশ্ন ও উত্তর

- মডেল প্রশ্ন ০১ .... ৫৯৩
- মডেল প্রশ্ন ০২ .... ৬০৯
- মডেল প্রশ্ন ০৩ .... ৬২৫
- মডেল প্রশ্ন ০৪ .... ৬৪১
- মডেল প্রশ্ন ০৫ .... ৬৫৬
- মডেল প্রশ্ন ০৬ .... ৬৭১
- মডেল প্রশ্ন ০৭ .... ৬৮৫
- মডেল প্রশ্ন ০৮ .... ৬৯৯
- মডেল প্রশ্ন ০৯ .... ৭১৪
- মডেল প্রশ্ন ১০ .... ৭২৮

BCS প্রশ্ন ও উত্তর

৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

(প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের উত্তর এবং ২নং হতে ৫নং প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে) নম্বর

১. **ক. লাউড স্পিকার কি? এটা কিভাবে কাজ করে?** ৪

উত্তর : লাউড স্পিকার হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রো অ্যাকাউস্টিক ট্রান্সডিউসার যা বিদ্যুৎতরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। বর্তমানে প্রায় সবক্ষেত্রেই ডায়নামিক লাউড স্পিকার ব্যবহৃত হয়। ডায়নামিক লাউড স্পিকারে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক, পোলপিস, পেপার কোণ, ভয়েস কয়েল, স্পাইডার ও ধাতব ফ্রেম থাকে। ভয়েস কয়েলের মধ্যে চুম্বক অবস্থান করে, তাই কয়েলটা সবসময় চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করে।

যখন অ্যামপ্লিফায়ার থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (অডিও সিগন্যাল) এসে ভয়েস কয়েলে প্রবেশ করে, তখন ভয়েস কয়েল কাঁপতে থাকে। ভয়েস কয়েলের সাথে পেপার কোণ যুক্ত থাকায় পেপার কোণ কাঁপতে থাকে এবং এর সামনের বাতাসও কাঁপতে থাকে। বাতাসের এ কম্পন হচ্ছে মাইক্রোফোনের সামনে সৃষ্ট শব্দের কম্পনের একেবারে অবিকল প্রতিরূপ। অর্থাৎ মাইক্রোফোনের সামনে যে আওয়াজ করা হয়, লাউড স্পিকার থেকে সে একই আওয়াজ শোনা যায়।

খ. RUBY LASER-এর গঠন বর্ণনা করুন। ৪

উত্তর : রুবি লেজার (Ruby Laser) : এটি রুবি দণ্ড দ্বারা তৈরি একটি লেজার উৎপাদন যন্ত্র। এটি সিলিন্ডার আকৃতির রুবির দণ্ড। দণ্ডের একপ্রান্ত A সম্পূর্ণভাবে রৌপ্যায়িত (fully silvered) এবং অন্য প্রান্ত B অর্ধ রৌপ্যায়িত (half silvered)। দণ্ডটি কাচের নলের মধ্যে

থাকে। নলটি একটি প্যাঁচানো জেনন বাতি বা ঝলক বাতির (flash tube) মধ্যে রাখা হয়। বাতির আলো দ্বারা 'পাম্পিং' সম্পন্ন করা হয়।

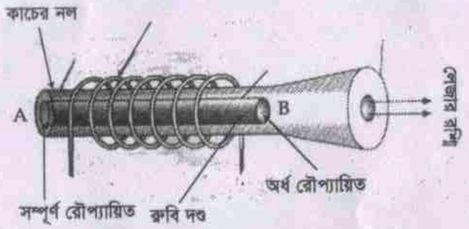

চিত্র : Ruby Laser এর গঠন

রুবি দণ্ডটি অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড নামক যৌগের কেলাস। এর মধ্যে ক্রোমিয়াম পরমাণুর অপদ্রব্য যোগ করা হয়। সাধারণত অধিক উত্তাপে বাষ্পীভূত অবস্থায় প্রতি 100 ভাগ Al_2O_3 এর সাথে 0.05 ভাগ CrO_2 গ্যাস মিশিয়ে, মিশ্রিত গ্যাসকে শীতল করে লেজার উৎপাদনের উপযোগী রুবি দণ্ড তৈরি করা হয়।

ঝলক বাতির আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করলে কেলাসস্থ অধিকাংশ পরমাণু উত্তেজিত হয় এবং পাম্পিং সম্পন্ন হয়। কিছু কিছু উত্তেজিত পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফোটন উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটায়। ফোটনসমূহ বা আলোক রশ্মি দণ্ডের দুই প্রান্তে বার বার প্রতিফলিত হয়। প্রতি যাত্রায় উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে এবং আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। অতি তীব্র লাল আলো বা লেজার রশ্মি রৌপ্যায়িত প্রান্ত ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

গ. চৌম্বক বলরেখা বলতে কি বুঝেন? এর ধর্মাবলি লিখুন। ৪

উত্তর : চৌম্বক বলরেখা : যে কাল্পনিক রেখা বরাবর চুম্বকের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে তাই চৌম্বক বলরেখা। অন্যভাবে, চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক বল যে সমস্ত নির্দিষ্ট রেখা বরাবর ক্রিয়া করে সেই সমস্ত রেখাকে বলা হয় চৌম্বক বলরেখা।

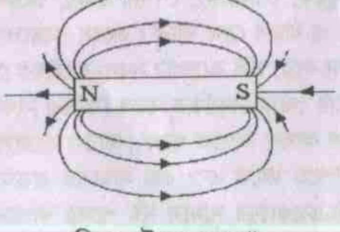

চিত্র : চৌম্বক বলরেখা

চৌম্বক বলরেখার ধর্মাবলি :

i. চৌম্বক বলরেখা বদ্ধ বক্ররেখা।
ii. বলরেখাগুলো উত্তর মেরু হতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ মেরুতে শেষ হয়।
iii. বলরেখাগুলো কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না।
iv. বলরেখাগুলো পরস্পরের উপর চাপ দেয় ফলে দুটি বলরেখার মধ্যে বিকর্ষণ কাজ করে।

ঘ. ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ কি কি? এর চিকিৎসা উল্লেখ করুন। ৪

উত্তর : ডেঙ্গু হিমোরেজিক ফিভার এর লক্ষণসমূহ :

১. রোগীর তাপমাত্রা হঠাৎ বৃদ্ধি পায়।
২. ৩-৭ দিনের মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্রে জটিলতা দেখা যায় অথবা বিকল হয়ে পড়ে।
৩. রক্তনালীতে চামড়ার নিচে রক্ত জমাট বাঁধে।
৪. দাঁতের গোড়া দিয়ে অথবা দেহের যে কোনো স্থান দিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়।
৫. রক্তবমি হয় ও মলদ্বার দিয়ে রক্ত যায়।
৬. মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিকের মত রক্তক্ষরণ হয়।
৭ লিভার বড় হয়, পেট বা ফুসফুসে পানি জমতে পারে।
৮. এছাড়াও সাধারণ ডেঙ্গুজ্বরের উপসর্গগুলো দেখা যায়।

চিকিৎসা : রক্তক্ষরণ , রক্তজমাট বাঁধা, রক্ত সংবহনতন্ত্রের পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এক জটিল অবস্থার জন্য রোগীকে হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য ভর্তি করতে হয়।

ঙ. একটি সাধারণ বিদ্যুৎ কোষের গঠন প্রণালী বর্ণনা করুন। ৪

উত্তর : একটি সাধারণ বা সরলতম বিদ্যুৎ কোষের উদাহরণ হলো- ভোল্টার কোষ। নিচে এ কোষের গঠন প্রণালী বর্ণনা করা হলো :

একটি কাচের পাত্রে খানিকটা পাতলা H_2SO_4 নিয়ে তার মধ্যে একটি দস্তা ও একটি তামার পাত পরস্পরকে স্পর্শ না করিয়ে ডুবালে একটি সরল ভোল্টার বিদ্যুৎ কোষ তৈরি হয়।

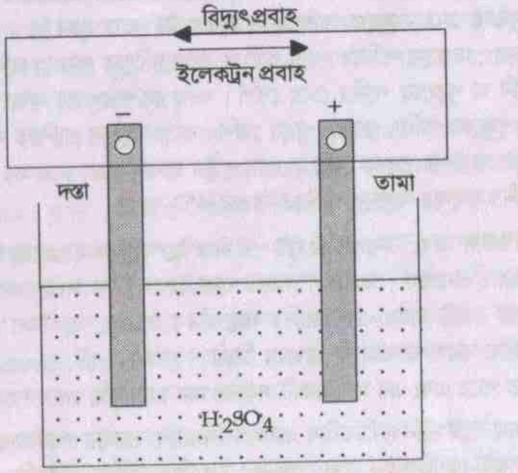

চিত্র : সরল ভোল্টার কোষ

পাত দুটির সাথে দুটি সংযোজক স্ক্রু লাগানো থাকে। একটি তামার তার দিয়ে সংযোজক স্ক্রু দুটিকে সংযুক্ত করলে তারের মধ্য দিয়ে তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয় এবং তামার পাত বেয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ উঠতে থাকে।

দস্তা ও এসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তামা ও দস্তার পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। তামার পাতের বিভব দস্তার পাতের চেয়ে উচ্চতর হওয়ায় তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়।

২. ক. বৈদ্যুতিক কোষ এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন। ২½

উত্তর : নিচে বৈদ্যুতিক কোষ এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈদ্যুতিক কোষ	ব্যাটারি
১. যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাকে বৈদ্যুতিক কোষ বলে। এটি একটি সরলতম একক কোষ। যেমন– ভোল্টার কোষ।	১. প্রকৃত পক্ষে ব্যাটারি বলতে একাধিক কোষের সমবায়কে বোঝায়। যেমন– লেড এসিড কোষ
২. 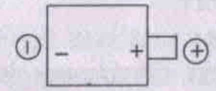 চিত্র : বৈদ্যুতিক কোষ	২. 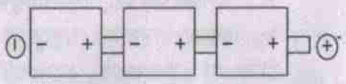 চিত্র : ব্যাটারি
৩. প্রতীক : 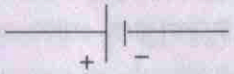	৩. প্রতীক :
৪. আকারে ছোট ও হালকা।	৪. আকারে বড় ও ভারী।
৫. প্রাপ্ত ভোল্টেজ কম।	৫. প্রাপ্ত ভোল্টেজ বেশি।

খ. পুকুরের চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ কেন? ২½

উত্তর : সমুদ্রের পানিতে নানা ধরনের লবণ দ্রবীভূত থাকে। তাই সমুদ্রের পানির ঘনত্ব নদীর পানি বা পুকুরের পানির চেয়ে বেশি। ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানির প্লবতা নদী বা পুকুরের পানির প্লবতার চেয়ে বেশি। ফলে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটার সময় সাতারুর শরীরের উপর প্লবতা বেশি হওয়ায় শরীর হালকা বলে মনে হয়। এ কারণে নদী বা পুকুরের পানির তুলনায় সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ।

গ. 'ডিজিটাল' এবং 'এনালগ' এ দুটি শব্দ দিয়ে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়? ২½

উত্তর : এনালগ : 'এনালগ' শব্দটি দ্বারা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এনালগ সিগনালকে বুঝায়। এটি এমন এক ধরনের সাংকেতিক প্রক্রিয়া, একটানা চলমান পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যা কোনো মাধ্যমে বিচরণে সক্ষম। এটি sinusoidal বা nonsinusoidal হতে পারে এবং এর মান একটি সর্বনিম্ন মান হতে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চমান পর্যন্ত হতে পারে।

যেসব ইলেকট্রনিক ডিভাইস এনালগ সিগনাল ব্যবহার করে কাজ করে সেগুলোকে এনালগ ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলে। যেমন : TV, স্পিডোমিটার ইত্যাদি।

ডিজিটাল : 'ডিজিটাল' শব্দটি দ্বারা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগনালকে বুঝায়। এটি এমন এক ধরনের থেমে থেমে যাওয়া সংকেত যা বৈদ্যুতিক সংকেত 'ON' এবং 'OFF'-এর মতো কাজ করে। ডিজিটাল সিগনাল কেবল 0 এবং 1 নিয়ে কাজ করে। '0' দ্বারা OFF state এবং 1 দ্বারা ON state কে বুঝায়।

যেসব ইলেকট্রনিক ডিভাইস ডিজিটাল সিগনাল ব্যবহার করে কাজ করে সেগুলোকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলে। যেমন : ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ইত্যাদি।

ঘ. নাইট্রোজেন চক্র কি? সংক্ষেপে লিখুন। ২½

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বিদ্যমান। বজ্রবৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড, পরবর্তীতে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং শেষে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড গঠিত হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পড়ে এবং মাটির ক্ষারকীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে মাটিতে মিশে যায়। উদ্ভিদ মূল দ্বারা মাটি থেকে নাইট্রেট লবণ ও নাইট্রোজেন সার শোষণ করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে পরিণত করে। প্রাণিকুল উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করে। এরূপে উদ্ভিদ থেকে প্রাণিদেহে প্রোটিনরূপে নাইট্রোজেন স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ ডিনাইট্রিফাইং জীবাণুর প্রভাবে বিয়োজিত হয়ে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এবং অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেন চক্র না থাকলে মাটিতে নাইট্রেট লবণের অভাব হতো। নাইট্রেট লবণের অভাব হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে কৃষির উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন হতো। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্রের উপকারিতা অনস্বীকার্য।

৩ ক. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ২½

উত্তর : চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী চলে আসে। অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। চন্দ্রগ্রহণ হয় শুধুমাত্র পূর্ণিমার সময়। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ চলে আসে। অর্থাৎ চাঁদের ছায়া সূর্যের উপর পড়ে। সূর্যগ্রহণ অমাবস্যার সময় হয়।

খ. শব্দ দূষণ কি? এর ফলে কি ক্ষতি হয়? ২½

উত্তর : শব্দ দূষণ : শব্দ এক প্রকার শক্তি। শব্দের সাহায্যেই আমরা পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করি। পাখির কলতান বা পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা সঙ্গীতের মধুর আওয়াজ যেমন আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করে তেমনি গোলমাল বা হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ মনকে শ্রান্ত করে এবং অনেক সময় আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই পরিবেশের শব্দ দূষণ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ধারণ ক্ষমতা ৪৫-৫৫ ডেসিবেল। কিন্তু আমরা আমাদের কানের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার চেয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ থেকে ৫০ গুণ বেশি শব্দ শুনি।

শব্দ দূষণের ফলে ক্ষতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যদি টানা ৮ ঘণ্টা আমরা ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন শুনি, তাহলে ২৫ বছরের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের বধির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কম আসে, মেজাজ খিটখিটে হয়, পরিপাকতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসারসহ অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া ক্রমাগত শব্দ দূষণের ফলে মানুষ হৃদরোগ, ডায়বেটিস, গ্যাস্ট্রিক এমনকি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

গ. একটি বাতির গায়ে 220V–25W লেখা আছে- কথাটির অর্থ কি? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাল্ব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V ও W লেখা থাকে। V দ্বারা ভোল্ট এবং W দ্বারা ওয়াট বোঝানো হয়। এখানে ভোল্ট হলো বৈদ্যুতিক চাপের একক এবং ওয়াট হলো তড়িৎ ক্ষমতার একক। কাজেই বাতির গায়ে 220V-25W লেখা থাকার অর্থ হচ্ছে 220 ভোল্ট বিভব পার্থক্যে সংযুক্ত করলে বাতিটি সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে এবং বাতিটি প্রতি সেকেন্ডে 25 ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করবে। অর্থাৎ 25 ওয়াট করে বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এছাড়া বাতিটিকে 220 ভোল্টের উপরের কোনো বিভব চাপে জ্বালানো যাবে না। কারণ এতে করে বাতিটির ভেতরের ফিলামেন্ট ফেটে যাবে অর্থাৎ বাতিটি ফিউজ হয়ে যাবে।

ঘ. মোটরগাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহৃত কোষে বিশুদ্ধ পানি দিতে হয় কেন? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : সাধারণত মোটরগাড়ির ইঞ্জিনে লেড স্টোরেজ কোষ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি কোষ 2Volt করে। ফলে গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারীতে ৬টি কোষ সংযোজন করে 12 ভোল্টেজের ব্যাটারি তৈরি করা হয়।

যখন গাড়ি চলতে থাকে তখন জেনারেটরের সাহায্যে কোষ চার্জিত হয়। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সময় কোষের বিদ্যুৎক্ষরণ বা ডিসচার্জ হয়। গাড়ি না চালিয়ে ঘন ঘন ইঞ্জিন বন্ধ এবং স্টার্ট করা হলে ব্যাটারীর ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়। তখন পুনরায় বাহির থেকে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করে ব্যাটারীকে চার্জ করতে হয়। বার বার চার্জ করা হলে H_2SO_4 মিশ্রিত পানি বিশ্লেষিত হয়।

$$H_2O\,(l) \longrightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g)$$

এতে $H_2(g)$ এবং $O_2(g)$ নির্গমনের ফলে ব্যাটারির পানি কমতে থাকে। তাই মাঝে মধ্যেই ব্যাটারিতে পাতিত বা বিশুদ্ধ পানি যোগ করে H_2SO_4 দ্রবণের ঘনত্ব 1.2-এ ঠিক রাখতে হয়।

৪. ক. হীরকের সংকট কোণ ২৪° বলতে কি বোঝায়? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : হীরকের সংকট বা ক্রান্তি কোণ ২৪° বলতে বোঝায় শূন্য মাধ্যমে (বা বায়ু) ও হীরকের বিভেদ তলে হীরক থেকে ২৪° কোণে আপতিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেষে প্রতিসরিত হয়। আপতন কোণের মান ২৪°-এর চেয়ে বেশি হলে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

খ. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কি এবং কেন ঘটে? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস : ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের পানি স্ফীত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে উপকূলের কাছাকাছি যে উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তাকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বলে। সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।

সাগরে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির কারণ : ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সাগরের পানি যেসব কারণে স্ফীত হয়ে জলোচ্ছ্বাস ঘটায় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. তীব্র বায়ুতাড়িত অভিসারি সমুদ্রস্রোত।
খ. ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের চাপের অস্বাভাবিক হ্রাস।
গ. ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার সম্ভাব্য উপকূলের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের কৌণিক অবস্থান।
ঘ. সাগরের অগভীর অংশে বা মহীসোপানে ঘূর্ণিঝড়ের আগমন।

ঙ. উপকূলের আকৃতি।
চ. ভরা জোয়ার (ভরা কটাল)।

গ. গামা রশ্মি কি? এর প্রভাবে মানুষের কি কি ক্ষতি হতে পারে? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : গামা রশ্মি (γ): তাড়িত চৌম্বক বর্ণালীর 10^{-11} মিটারের চেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সকল বিকিরণই গামা রশ্মি। অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হওয়ায় এ রশ্মির শক্তি অত্যন্ত বেশি যা দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ৫০,০০০ গুণ বেশি।

এ রশ্মির কয়েকটি ধর্ম :

i. ভর ও চার্জ নেই।
ii. আলোর বেগে ($3\times10^8 ms^{-1}$) চলে।
iii. বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
iv. ভেদন ক্ষমতা সর্বাধিক কিন্তু আয়নায়ন ক্ষমতা কম।

ক্ষতিকর দিক :

i. এ রশ্মির প্রভাবে মানুষের দেহ পুড়ে যেতে পারে।
ii. অকালে চুল পড়ে যেতে পারে।
iii. ক্যানসার, টিউমার হতে পারে।
iv. এমন কি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ঘ. পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিন গঠনের মূল পার্থক্য কি? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের পার্থক্য :

পেট্রোল ইঞ্জিন	ডিজেল ইঞ্জিন
১. জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।	১. জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহৃত হয়।
২. এতে বিদ্যুৎ স্পার্ক প্লাগ থাকে।	২. এতে কোনো স্পার্ক প্লাগ থাকে না।
৩. এতে বায়ু ও পেট্রোলের মিশ্রণ সিলিন্ডারে শোষিত হয়।	৩. এতে কেবল বায়ু সিলিন্ডারে শোষিত হয়।
৪. এতে উচ্চচাপে সংনমিত বায়ু ও জ্বালানির মিশ্রণে স্পার্কিং প্রক্রিয়ায় আগুন ধরানো হয়।	৪. এতে উচ্চচাপে সংনমিত বায়ুর ওপর জ্বালানি ইনজেক্ট করে আগুন ধরানো হয়।
৫. এ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা প্রায় ৩০%।	৫. এ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা প্রায় ৭০%।

৫. ক. এল.ডি.এল. ও এইচ.ডি.এল কি? মানব দেহে এদের কাজ কি? ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : এল.ডি.এল (LDL) : এল.ডি.এল (LDL)-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Low-Density Lipoprotein, যা প্রাণিজ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। মানবদেহের রক্তনালীর ভেতরের প্রাচীর গাত্রে এটি জমে রক্তনালী সংকুচিত করে এবং রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এটিকে খারাপ কোলেস্টেরলও বলা হয়।

এইচ.ডি.এল (HDL) : এইচ.ডি.এল (HDL)-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি High-Density Lipoprotein, যা উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। উদ্ভিজ্জ চর্বি মানব শরীরের জন্য গ্রহণযোগ্য। প্রায় ৩০% কোলেস্টেরল এতে সঞ্চিত থাকে। একে মানব দেহের ভাল কোলেস্টেরলও বলা হয়।

খ. রক্তের R_h ফ্যাক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? $2\frac{1}{2}$

উত্তর : রেসাস বানরের রক্তে একটি এন্টিজেন থাকে। এটাকে রেসাস এন্টিজেন বা R_h ফ্যাক্টর বলে। কোনো কোনো মানুষের রক্তের কণিকায় 'R_h এগ্লুটিনোজেন' নামক বিশেষ উপাদান থাকে। এ এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করেই মানুষের রক্তের গ্রুপ R_h পজেটিভ ও R_h নেগেটিভ এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত।

গুরুত্ব :

১. মানুষের রক্তকে R_h পজেটিভ ও R_h নেগেটিভ– এ দু ভাগে ভাগ করা যায়।

২. রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন– Hydrops foetalis, Erythroblastosis foetalis ইত্যাদি রক্তের R_h ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

গ. IC কি? এর সুবিধাগুলো লিখুন। $2\frac{1}{2}$

উত্তর : IC বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট/ সমন্বিত বর্তনী : ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা IC হলো এক প্রকার ইলেকট্রনিক সার্কিট যাতে সার্কিটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা যন্ত্রাংশগুলো একটি ক্ষুদ্র অর্ধ-পরিবাহক চিপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গঠন করা হয়, যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ চিপের অংশ। একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ যেমন রোধক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি এবং এদের অন্তসংযোগ একটি ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসেবে থাকে, যাতে এরা একটি পূর্ণ ইলেকট্রনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারে। একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহক পদার্থের মধ্যে এসব যন্ত্রাংশ গঠন ও সংযুক্ত করা হয়।

IC-এর সুবিধা :

১. স্বল্পসংখ্যক সংযোগ থাকায় এর বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability) অনেক বেশি হয়।

২. একটি ক্ষুদ্র আইসির মধ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস বা পার্টস খুবই অল্প জায়গার মধ্যে তৈরি করা হয় বলে এর আকার অত্যন্ত ছোট হয়।

৩. ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য ওজনও খুব সামান্য হয়।

৪. তাপমাত্রার কম-বেশি হলেও এর কার্যকারিতা সহজে নষ্ট হয় না।

৫. আইসি চালনার জন্য খুব সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়।

৬. বিভিন্ন পার্টস ক্রয় করে ডিভাইস বা বর্তনী তৈরি করলে যে খরচ পড়বে তার চেয়ে কম খরচে আইসি পাওয়া যায়।

৭. বহু সংখ্যক আইসি একসাথে তৈরি করা হয় বলে এদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্য থাকে না বললেই চলে।

৮. মেরামতের ঝামেলামুক্ত এবং কম খরচে পরিবর্তন করা যায়।

ঘ. স্বরকম্পের প্রয়োগ (Application of Beats) লিখুন। $2\frac{1}{2}$

উত্তর : স্বরকম্প বা বীটের প্রয়োগ :

ক. অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয়।

খ. খনিতে দূষিত গ্যাসের অস্তিত্ব নির্ণয়।

গ. বাদ্যযন্ত্রাদির সুর নির্ণয়।

৩৪তম বিসিএস : ২০১৪

প্রযুক্তি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

(প্রার্থীদিগকে ৬নং প্রশ্নের উত্তর এবং ৭নং হতে ১০নং প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে)

নম্বর

৬. ক. সিপিইউ (CPU) এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪

উত্তর : কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সিপিইউ বলে। কম্পিউটারের কাজ করার গতি সিপিইউ-এর উপর নির্ভরশীল।

মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI-Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ (Chip)। মাইক্রো কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়।

মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন ও কাজ এবং সিপিইউ-এর সংগঠন ও কাজ একই রকম। মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য (কাজ) চিপের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিট থাকে। মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে প্রোগ্রামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের মেমরি অংশে সংরক্ষণ করা হয়।

খ. টেলিকমিউনিকেশন কি? স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪

উত্তর : টেলিকমিউনিকেশন : টেলিকমিউনিকেশন বলতে সাধারণত ইলেকট্রনিক্যালী ইনফরমেশন-এর আদান প্রদানকে বুঝায়। অর্থাৎ এটি টেলিফোন তার ব্যবহার করে কমিউনিকেশন ব্যবস্থা। এর সাথে Data, Voice Transmission যুক্ত থাকে। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো—

i. কম্পিউটার
ii. টার্মিনালস
iii. কমিউনিকেশন সফটওয়্যার
iv. কমিউনিকেশন প্রসেসর
v. কমিউনিকেশন মিডিয়াম।

আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত কয়েকটি টেলিকমিউনিকেশন হলো— রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন, টেলেক্স, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম : স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মহাশূন্যে অবস্থিত রেডিও মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা করাকে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। স্যাটেলাইট পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২২০০০ মাইল উঁচুতে স্থাপন করে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সুবিধা :

১. মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও দ্রুত সময়ে টেলিযোগাযোগ করা যায়।

২. যুদ্ধ পর্যবেক্ষণসহ বিশ্বের যে কোনো স্থানের সরাসরি সঠিক সংবাদ ও তথ্য যে কোনো স্থানে প্রেরণ করা যায়।

অসুবিধা :

১. ব্যয়বহুল উৎক্ষেপণ যানের প্রয়োজন।

২. আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

৩. সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে সময় নষ্ট হয়।

অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম : অপটিক্যাল ফাইবারকে ব্যবহার করে গঠিত কমিউনিকেশন সিস্টেমকে অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে।

ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দ্বারা তৈরি অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোক রশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রাহকযন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

সুবিধা : এ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় সুবিধা অতি অল্প সময়ে অবিকৃত ডেটা প্রেরণ।

অসুবিধা : এখন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

গ. ই-কমার্স (E-commerce) কি? আধুনিক বিশ্বে এর ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করুন। ৪

উত্তর : ই-কমার্স (E-Commerce) : ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)-এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স (E-commerce)। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মধ্যে বিস্তৃত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনকে ই-কমার্স বলে।

E-Commerce-এর প্রয়োগ : ই-কমার্স দ্রুতগতিতে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি এ ধরনের লেনদেনের জন্য বহুল পরিচিত। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো স্থানের একটি ব্যাংক দূরবর্তী যে কোনো ব্যাংকের সাথে লেনদেনে সক্ষম। ফলে অবস্থানগত দূরত্ব বেশি বা কম হলেও আর্থিক লেনদেন একই সময়ে এবং দ্রুতগতিতে করা সম্ভব হচ্ছে।

ই-কমার্স ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়িক সমঝোতা ও বন্ধন তৈরির জন্য ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরের মধ্যে লেনদেন, চুক্তি এবং পরস্পরের ব্যবসা সম্বন্ধে জানার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সশরীরে যেতে হচ্ছে না। ই-কমার্স সুবিধা ব্যবসায়ীকে দূরবর্তী আরেকজন ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়িক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ই-কমার্স আজকের দিনে একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল হাতিয়ার। বিশেষত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অফিস এবং শাখা অফিসের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ই-কমার্স কাস্টমারকে উন্নত সার্ভিস প্রদানের সুবিধা দেয়। কম সময়ে কাস্টমার সার্ভিস প্রদান এবং সঠিক তথ্য প্রদান ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্য।

ই-কমার্স ব্যবসা বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। যে কোনো পণ্য বা সেবা বিশ্বব্যাপী বিপণন করার জন্য কোম্পানিগুলো নিজস্ব ওয়েবসাইট অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

ঘ. LED কি? এটি কিভাবে কাজ করে? ৪

উত্তর : LED : লাইট এমিটিং ডায়োড (Light Emitting Diode) সাধারণত এলইডি নামেই অধিক পরিচিত। আভিধানিক অর্থের সঙ্গে এর কার্যকারিতারও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটি এমন একটি ডায়োড যা থেকে আলো নির্গত হয়। এ ডায়োডের ভেতর দিয়ে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন এটা আলোকিত হয়ে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

LED-এর কাজ : LED অন্যান্য ডায়োডের মতো একটা সরল p-n জাংশন ডায়োড। এটিও সম্মুখ ঝোঁকে কাজ করে। সম্মুখ ঝোঁক যুক্ত ডায়োডে ইলেকট্রন ও হোল জাংশন স্থলে একসঙ্গে মিলিত হয়। কনভেনশনাল বা সাধারণ প্রচলিত ডায়োড সিলিকন বা জার্মেনিয়াম দিয়ে তৈরি। এসব ডায়োডে জাংশনে ইলেকট্রন ও হোলের মিলনের ফলে যে শক্তি মুক্ত হয় তা তাপ হিসেবে প্রকাশ পায়। তাই এ সব ডায়োড উত্তপ্ত হয়ে যায়। LED তৈরি হয় গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফসফাইড, গ্যালিয়াম ফসফাইড বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড থেকে। LED-এ সম্মুখ ঝোঁকে ইলেকট্রন হোলের মিলনে মুক্ত শক্তি তাপ হিসেবে নির্গত না হয়ে আলো হিসেবে বেরিয়ে আসে।

ঙ. নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটর কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তা বিস্তারিত আলোচনা করুন। ৪

উত্তর : নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতিতে দুই ধরনের ইউরেনিয়াম পরমাণু রয়েছে। একটি হলো ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235) অন্যটি ইউরেনিয়াম-২৩৮ (U-238)। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে পরমাণুটি প্রায় সমান দুই টুকরোয় বিভক্ত হয়, নির্গত হয় তিনটি নিউট্রন ও কিছু পরিমাণ শক্তি। নির্গত এই তিনটি নিউট্রন অন্য তিনটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলে, তারা ভেঙে দু টুকরো হয় এবং নিউট্রন নির্গত হয় এবং তিনগুণ শক্তি নির্গত হয়। এভাবে পরমাণুর ভাঙন চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে চেইন বিক্রিয়া (Chain reaction) বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলা হয়। এ বিক্রিয়া একবার শুরু হলে আপনা আপনি চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিউক্লিয়াসের এই বিভাজনকে বলা হয় ফিশন (Fission)। ফিশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি দিয়ে জেনারেটরের টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং তা সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে দূরদূরান্তে প্রেরণ করা হয়।

নিউক্লীয় চেইন বিক্রিয়াকে যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার নাম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর (Nuclear Reactor) বা নিউক্লীয় বিক্রিয়ক। একে পারমাণবিক চুল্লি নামেও অভিহিত করা হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক চুল্লি। এই চুল্লিতে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই তাপ বাষ্পীয় টার্বাইন ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি সরল চিত্র নিচে দেয়া হলো :

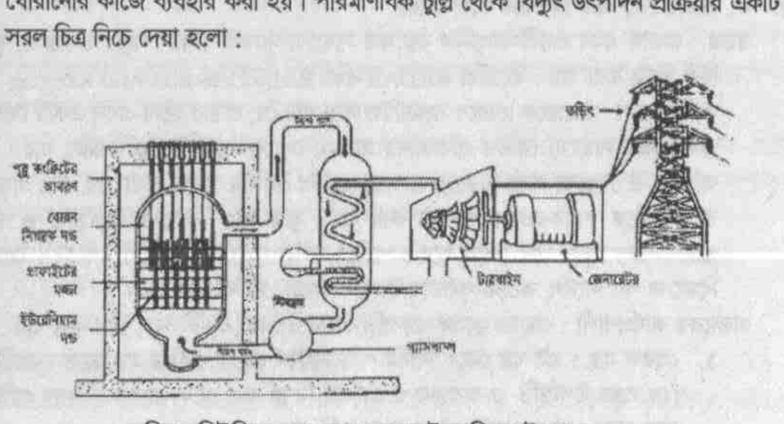

চিত্র : নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র। যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এ পাত্রের ভিতর থাকে গ্রাফাইটের ইট দিয়ে তৈরি মূল বস্তু বা মজ্জা (Core)। এই গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর খাড়াভাবে কতগুলো চ্যানেল বা খালি জায়গা থাকে। এ জায়গাগুলোতে ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। খালি জায়গা ও ইউরেনিয়াম দণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে বোরন বা ক্যাডমিয়াম দণ্ড। ক্যাডমিয়াম বা বোরন দণ্ডকে চ্যানেলের বা খালি জায়গার মধ্যে ওঠানামা করানো যায়। এসব দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে নিউক্লীয় বিক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে দেয়।

৭. ক. ট্রানজিস্টার কিভাবে অ্যামপ্লিফায়ার হিসাবে কাজ করে আলোচনা করুন। ৫

উত্তর : যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (Input) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে বিবর্ধিত (amplify) করে তাকে বলা হয় অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সংকেতকে বৃহৎ বহির্গামী সংকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি করতে বা বিবর্ধিত করতে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। অন্তর্গামী হতে পারে তড়িৎপ্রবাহ বা ভোল্টেজ। ট্রানজিস্টরের পীঠ প্রবাহের (base current) সামান্য পরিবর্তন সংগ্রাহক প্রবাহের (collector current) বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। ট্রানজিস্টর পীঠ-প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

খ. কম্পাইলার কি? এর কাজগুলো কি? ৫

উত্তর : কম্পাইলারের কাজ হাই লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। এটি গৌণ মেমরিতে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট কম্পাইলার একটি মাত্র হাই লেভেল ভাষাকে মেশিন ভাষায় পরিণত করতে পারে। তাই ভিন্ন ভিন্ন হাই লেভেল ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার প্রয়োজন। কম্পাইলারের প্রধান কাজ হলো :

১. উৎস প্রোগ্রামের উপাত্ত বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
২. প্রোগ্রামের সাথে প্রয়োজনীয় রুটিন যোগ করা।
৩. প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রধান মেমরিতে প্রয়োজনীয় স্মৃতি অবস্থানের ব্যবস্থা করা।

৮. ক. রাডার কি? এটি কিভাবে কাজ করে? ৫

উত্তর : রাডার এমন একটি আধুনিক যন্ত্র যার সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইংরেজি RADAR শব্দটি Radio Detection And Ranging শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। রাডারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, রাডার হলো এমন একটি কৌশল বা ব্যবস্থা যার সাহায্যে রেডিও প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কোনো বস্তুর উপস্থিতি জানা যায়। বস্তুটির অভিমুখ ও রেঞ্জ বা পাল্লা নির্ণয় করা যায়, বস্তুটির বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা যায় এবং এসব তথ্য বা উপাত্তকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। যুদ্ধে শত্রু বিমানের উপস্থিতি ও গতিবিধি জানার জন্য মূলত এর উদ্ভব হলেও শান্তির সময় সমুদ্র ও আকাশে যথাক্রমে জাহাজ ও বিমানের পথ নির্দেশ, ঝড়ের পূর্বাভাস ইত্যাদি কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

রাডারের কার্যপ্রণালী : রাডারে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. **প্রেরক যন্ত্র :** এই যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট শক্তি বিকীর্ণ হয় বা প্রেরিত হয় যাতে দূরবর্তী বস্তুটি (যে বস্তুর উপস্থিতি ও অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হবে) থেকে বিকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। রাডারে মাইক্রোওয়েভ বা অতিহ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবহার হয়।

২. **গ্রাহক যন্ত্র :** এর প্রেরকযন্ত্র যে অবস্থানে থাকে সেখানেই অবস্থান করে। এর সাহায্যে লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়।

৩. **নির্দেশক যন্ত্র :** প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্থাপনের জন্য থাকে একটি নির্দেশক (Indicator)। এটি আসলে একটি ক্যাথোড রে টিউব বা টেলিভিশন পর্দার মতোই কাজ করে।

নিচের ব্লক চিত্রে রাডারের কার্যপ্রণালী উপস্থাপন করা হলো :

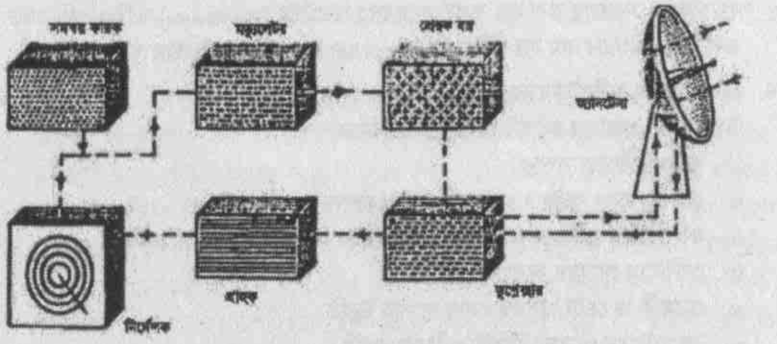

চিত্র : রাডারের কার্যপ্রণালী

বিভিন্ন কাজকে সমন্বয় করার জন্য এদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সময় বা কাল নির্ণায়ক সার্কিট থাকে। প্রেরক যন্ত্রে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষমতাসম্পন্ন পালস্ বা শব্দ উৎপাদন করে। উচ্চ দিকবিমুখী অ্যানটেনা ব্যবস্থা এই পালস বিকরিত বা বিকীর্ণ করে বা ছড়িয়ে দেয়। গ্রাহকযন্ত্রটি কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত বিকিরণ বা প্রতিধ্বনি উদঘাটন বা গ্রহণ করে। নির্দেশক যন্ত্র একে সংকেতে প্রকাশ করে। নির্দেশক যন্ত্র বস্তুটির দূরত্ব, উন্নতি সংক্রান্ত তথ্য ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দায় উপস্থাপন করে।

খ. ডেটা প্রসেসিং কি? এর ধাপগুলো লিখুন। ৫

উত্তর : ডেটা প্রসেসিং : ডেটাকে প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই ব্যবহারযোগ্য ইনফরমেশন বা তথ্যে পরিণত করা হয়। প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, বিন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটাকে অর্থপূর্ণ তথ্যে বা ইনফরমেশনে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডেটা প্রসেসিং। ডেটা প্রসেসিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য ডেটাকে প্রসেস করার প্রয়োজন হয়।

ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতির ধাপ : ডেটা প্রসেসিং সিস্টেমে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ডেটা সংগ্রহ, ডেটা সংরক্ষণ ও ডেটার বিন্যাস চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয়। ডেটা প্রসেসিংয়ের প্রধান তিনটি ধাপ হচ্ছে–

১. **ইনপুট :** ইনপুট হিসেবে ব্যবহারের জন্য ডেটা সংগ্রহ ও কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রি;
২. **প্রসেসিং :** সংগৃহীত ডেটার প্রসেসিং এবং
৩. **আউটপুট :** প্রসেসিং পরবর্তী ইনফরমেশন বা তথ্য ব্যবহার।

৯. ক. জেনারেটর ও মটরের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। $2\frac{1}{2}$

উত্তর : জেনারেটর : Generator একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, যা যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এর ভিতরে থাকে কয়েল জড়ানো আর্মেচার (Armature) ও বাইরের ফ্রেমে থাকে

বৈদ্যুতিক চুম্বক। যখন যন্ত্রের সাহায্যে আর্মেচারের সঙ্গে সংযুক্ত Shaft-কে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচারের কয়েলগুলো চুম্বকের ফ্লাক্স (Flux)-কে Cut করে। ফলে Faraday-এর Electromagnetic Induction সূত্র অনুসারে আর্মেচারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা Brush-এর সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়।

ইলেকট্রিক মটর : ইলেকট্রিক মটর হচ্ছে এমন এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে তা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। মোটরের গঠন জেনারেটরের মতোই; তবে এতে যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তখন কয়েলসহ আর্মেচার (Armature) যান্ত্রিক শক্তি লাভ করে এবং তা ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত রীতি (Fleming's left hand rule) অনুসারে ঘুরতে থাকে।

খ. ৬ষ্ঠ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২½

উত্তর : ৬ষ্ঠ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন।
ii. মৌখিক ভাষা ব্যবহার করে কম্পিউটার চালনা।
iii. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহারের ফলে গতিবৃদ্ধি।
iv. পেন্টিয়াম প্রসেসর ব্যবহার।
v. মেমোরী ও ডেটা ধারণক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
vi. বহু মাইক্রো প্রসেসর বিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।

গ. ই-মেইল কি? ইহা কিভাবে কাজ করে? ২½

উত্তর : ইলেকট্রনিক মেইল বা সংক্ষেপে ই-মেইল (E-mail) হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা। এ যন্ত্রটি নীতিগতভাবে ফ্যাক্স যন্ত্রের মতো কাজ করে। এটি কম্পিউটার, মডেম, মডুলেটর এবং স্যাটেলাইটের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। ই-মেইল দ্বারা স্বল্প খরচে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করা যায় এবং দীর্ঘ বার্তা প্রেরণে ই-মেইল খুবই সুবিধাজনক।

ঘ. টেলিভিশনের পিকচার টিউবের কাজ কি? ২½

উত্তর : টেলিভিশনের পিকচার টিউব হলো একটি মোচাকৃতি ক্যাথোডের টিউব। এর সামনের প্রান্তটি টিভির পর্দা এবং পেছনের প্রান্তে ইলেকট্রনগান সংযুক্ত থাকে।

পিকচার টিউবের সম্মুখের অংশের ভিতরের পিঠে 'ফসফর' নামক প্রতিপ্রভ রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দেয়া থাকে। ভিডিও সংকেত গ্রহণের পর ইলেকট্রনগান হতে নিঃসৃত ইলেকট্রন বীম ফসফর দানার ওপর পড়লে সেখান থেকে আলো নিঃসৃত হয়। পতিত ইলেকট্রনের সংখ্যা অনুসারে টিভির পর্দায় উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দু বা ঝলকের সৃষ্টি হয়। এই উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুর সমন্বয়েই টিভির পর্দায় ফুটে ওঠে ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি। উল্লেখ্য, রঙিন টিভিতে তিনটি ইলেকট্রনগান থাকে।

১০. ক. ডাটা ও ইনফরমেশনের সংজ্ঞা লিখুন। ২½

উত্তর : সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটো বা উপাত্ত বলে। ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা।

গ্রাফিক (Graphic) ডেটা : ছবি বা রেখা সংক্রান্ত ডেটা, যেমন— ফটোগ্রাফ, চার্ট, ড্রইং ইত্যাদি।

অডিও (Audio) ডেটা : শব্দ সম্বন্ধীয় ডেটা, যেমন— গান, কথা ইত্যাদি।

ভিডিও (Video) ডেটা : চলমান ছবি সম্বন্ধীয় ডেটা, যেমন— সিনেমা, অ্যানিমেশন, কোনো অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং ইত্যাদি।

ইনফরমেশন (Information) : ডেটা হলো সাজানো নয় এমন কিছু বিশৃঙ্খল ফ্যাক্ট (Raw Fact)। আর ইনফরমেশন বা তথ্য মানে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ডেটা যা সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য (Useful)। যেমন— কোনো ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ডেটা কিন্তু তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট হচ্ছে ইনফরমেশন। ইনফরমেশন নির্ভুল, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় হওয়া দরকার।

সব ইনফরমেশনই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন অবশ্যই সহজ, সঠিক, সম্পূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, বিষয়-সংশ্লিষ্ট, নিরাপদ, সময়োপযোগী হওয়া উচিত। মানুষ বিভিন্ন কাজে ইনফরমেশন ব্যবহার করে।

খ. অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fibre) কি? এই ফাইবার এর প্রয়োগ উল্লেখ করুন। ২½

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের স্বচ্ছ কাচ নির্মিত তার বিশেষ। বেশ কয়েকটি স্তরে সজ্জিত কাচের ঘনত্ব বাইরের দিক থেকে ভেতরে ক্রমশ ঘন হয়ে থাকে। ফলে প্রতিসরাঙ্ক ভিতর দিকে বাড়তে থাকে। এই অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে যখন কোনো শব্দ পাঠানো হয়, তখন সেই শব্দ প্রথমে বিদ্যুৎ শক্তি এবং পরে আলোক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয় এবং দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এই আলোক সিগন্যাল প্রথমে বিদ্যুৎ এবং পরে শব্দে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু বর্তমানে টেলিফোন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি মাত্র অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে অসংখ্য পৃথক সিগন্যাল অবিকৃত অবস্থায় প্রেরণ করা যায়। ডিজিটাল টেলিফোনে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হচ্ছে।

গ. হাই-লেভেল ও লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এর মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন। ২½

উত্তর : হাই-লেভেল ও লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এর মধ্যে দুটি পার্থক্য নিচে দেয়া হলো—

লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ	হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ
১. নিচুস্তরের ভাষা একটি মেশিনের জন্য রচিত প্রোগ্রাম, যা অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। নিচু স্তরের ভাষা বলতে মেশিনের ভাষা ও এসেম্বলি ভাষাকেই বোঝায়।	১. উঁচু স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। এটি মেশিন নির্ভর নয়। যেমন– বেসিক, প্যাস্কেল, মডুলা, ফরট্রান ইত্যাদি।
২. নিচু স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।	২. উঁচু স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ ও তাড়াতাড়ি করা যায়।

ঘ. Laser printing প্রযুক্তি বলতে কি বুঝেন? ২½

উত্তর : Laser Printing (লেজার প্রিন্টিং) প্রযুক্তি : লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তি বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের প্রিন্টিং প্রযুক্তি যেখানে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয়। লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে ছাপানোর কাজে লেজার প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। লেজার প্রিন্টারে একটি লেজার বীম (beam) ব্যবহৃত হয় যা একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর CRT-এর মতো রাস্টার স্ক্যান ইমেজ উৎপন্ন করে। ড্রামটি একটি আলোক সংবেদী প্লাস্টিক (Photosensitive plastic) দ্বারা প্রলেপযুক্ত থাকে যার পৃষ্ঠদেশে (surface) ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ প্রদান করা হয়। লেজার বীমটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর স্পট তৈরি করে। লেজার দ্বারা লিখিত স্পটসমূহ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে। উক্ত ধনাত্মক চার্জসমূহ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত টোনার ম্যাটেরিয়ালকে আকর্ষণ করে। ঘূর্ণায়মান ড্রামে কাগজ দেয়া হয়। টোনারটি কাগজে স্থানান্তরিত হয়। এভাবেই লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়।

৩৩তম বিসিএস : ২০১২

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

দ্রষ্টব্য : বাংলা অথবা ইংরেজি যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

(প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের উত্তর এবং ২নং হতে ৫নং প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে) নম্বর

১. ক. লেজার (LASER) কি? এর প্রয়োগ আলোচনা করুন। ৪

উত্তর : লেজার (LASER) : লেজার (LASER) হচ্ছে 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation' অর্থাৎ 'বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণের দ্বারা আলোকের বিবর্ধন'। কোনো বিশেষ পরমাণুকে ফোটন কণিকা দ্বারা উত্তেজিত করে লেজার রশ্মি তৈরি করা হয়। লেজার এমন এক যন্ত্র যার সাহায্যে অতি তীব্র, একবর্ণী, সুসংগত ও সমান্তরাল আলোকরশ্মি উৎপন্ন করা যায়। এই সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে লেজার রশ্মিগুচ্ছ বলা হয়।

লেজার রশ্মির প্রয়োগ : নিচে লেজার রশ্মির প্রয়োগ আলোচনা করা হলো :

১. লেজার রশ্মি অনেক দূর পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এজন্য দূর যোগাযোগে বা টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থায় এটি ব্যবহৃত হয়।
২. পরীক্ষাগারে লেজার রশ্মির সাহায্যে আলোর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণ করা যায়।
৩. খুব কঠিন বস্তুতে গর্ত করা, জোড়া লাগানো বা ঝালাই করার কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
৪. টেলিভিশনে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
৫. ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ছবি তৈরির প্রক্রিয়াকে হলোগ্রাফি (Holography) বলে।
৬. চিকিৎসাক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার এবং চর্মরোগের চিকিৎসায় লেজার ব্যবহার করা হয়।
৭. লেজার রশ্মির সাহায্যে সঠিকভাবে দূরত্ব মাপা যায়।

খ. সাধারণ পানি ও কঠিন পানির মধ্যে পার্থক্য কি? পানি খরতার কারণ কি? এবং কিভাবে তা দূর করা যায়? ৪

উত্তর : সাধারণ পানি ও কঠিন পানির মধ্যে পার্থক্য : সাধারণ পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ। দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানির অণু গঠিত হয়। অন্যদিকে ভারী পানি হলো অধিক ঘনত্বের পানি। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম (D) বা ভারী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কঠিন পানি উৎপন্ন হয়। দুই পরমাণু ডিউটেরিয়াম ও এক পরমাণু অক্সিজেন সংযোগে সৃষ্ট যৌগ হলো ডিউটেরিয়াম অক্সাইড (D_2O) বা কঠিন পানি।

পানি খরতার কারণ : যে পানিতে অনেক সাবান দেয়ার পরও সাবানের ফেনা হয় না তাকে খর পানি বলে। পানিতে ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও আয়রনের (Fe) দ্রবণীয় ক্লোরাইড, সালফেট ও হাইড্রোজেন কার্বনেট উপস্থিতি থাকলে পানি খর হয়।

পানির খরতা দূরীকরণের উপায় :

১. পানিতে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের লবণকে রাসায়নিকভাবে অদ্রবীভূত লবণে পরিণত করে পানি থেকে পৃথক করলে পানির খরতা দূর হয়।
২. পানি ফুটিয়ে পানির অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।
৩. পানিতে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে খরতা দূর করা যায়।

গ. মানবদেহে রক্তের গ্রুপগুলো কি কি? মানবদেহে কিডনির কাজ কি? ৪

উত্তর : মানবদেহে রক্তের গ্রুপ : লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে অবস্থিত বিভিন্ন অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণীবিভাগকে ব্লাড গ্রুপ (blood group) বা রক্ত গ্রুপ বলে। অস্ট্রিয়ায় জন্মগ্রহণকারী আমেরিকান জীববিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মনুষ্য রক্তের শ্রেণীবিন্যাস করেন। রক্তকণিকায় কতকগুলো অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী ল্যান্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের যে শ্রেণীবিন্যাস করেন, তা ABO ব্লাড গ্রুপ বা সংক্ষেপে ব্লাড গ্রুপ নামে পরিচিত।

রক্তের গ্রুপের শ্রেণীবিভাগ : রক্তের চারটি গ্রুপ রয়েছে। এগুলো হলো :

১. গ্রুপ-এ (A); ২. গ্রুপ-বি (B); ৩. গ্রুপ-এবি (AB) এবং ৪. গ্রুপ-ও (O)।

মানবদেহে কিডনি (kidney) বা বৃক্কের কাজ :

১. রক্ত থেকে নাইট্রোজেন জাতীয় বর্জ্য অপসারণ করা।
২. রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।
৩. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা।
৪. মানবদেহে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা।
৫. ভিটামিন ডি ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়া।
৬. দেহে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্লোরাইড ইত্যাদির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা।

ঘ. CFC কি? এটা কি ক্ষতি করে? ৪

উত্তর : সিএফসি (CFC) : সিএফসি হচ্ছে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (Chloro Floro Carbon)। এটি রেফ্রিজারেটর বা এয়ারকন্ডিশনার থেকেও নির্গত হয়। এছাড়া এরোসল ও কীটনাশকেও সিএফসি থাকে।

সিএফসি যে ক্ষতি করে : সিএফসি গ্যাস ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ফুটো করে দেয়। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। এর ফলে মানুষের চর্ম রোগ, ক্যান্সার ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ দেখা দেয়।

ঙ. 'পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক'— ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তর : ভারকেন্দ্র থেকে মুক্তভাবে ঝুলন্ত একটি চুম্বকদণ্ড পৃথিবীতে সর্বদা উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর অবস্থান করে। চুম্বকটিকে এ অবস্থা থেকে সরিয়ে নিলেও তা কয়েকবার দোল খেয়ে পুনরায় উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির হয়। যেহেতু ঝুলন্ত চুম্বকের কাছে অন্য কোনো চুম্বক নেই সুতরাং পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক।

২. ক. Systolic ও Diastolic Pressure বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যা করুন। ২.৫

উত্তর : সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক প্রেসার : হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতরে গতিশীল থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বিশ্রামরত অবস্থায় প্রতি মিনিটে ৭০-৮০ বার হৃৎস্পন্দন ঘটে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের ফলে হৃদস্পন্দন হয়ে থাকে। হৃৎপিণ্ডের এ সংকোচন ও প্রসারণকে যথাক্রমে সিস্টোল (Systole) ও ডায়াস্টোল (Diastole) বলে। মানবদেহ অসংখ্য শিরা ও ধমনী নিয়ে গঠিত। এই শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে ধমনীতে যখন রক্ত প্রবেশ করে তখন ধমনীর গায়ে রক্ত যে চাপ দেয় তাকে বলা হয় ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ। হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়টি সংকুচিত হবার ফলেই অধিকতর রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার (Systolic pressure)। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন শুরু হওয়ার ঠিক আগের চাপকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার (Diastolic pressure) বলে। একজন সুস্থ মানুষের এ রক্তচাপের ঊর্ধ্ব ও নিম্নসীমা ১২০/৮০।

খ. ডায়াবেটিক ও ইনসুলিন-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন। ২.৫

উত্তর : ডায়াবেটিক ও ইনসুলিন-এর মধ্যে সম্পর্ক : অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে, যে গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নামক হরমোন তৈরি হয়। এ হরমোন শরীরের শর্করা পরিপাক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি না হয় তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত শর্করা বা গ্লুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হওয়ার দরুন যে রোগ হয় তাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহার করা হয়।

খালি পেটে থাকা অবস্থায় একজন লোকের রক্তরসে যদি ৭.৮ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ এবং খাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে রক্তরসে যদি ১১.১ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ থাকে তবে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়। ডায়াবেটিস সাধারণত বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়।

গ. হিমোগ্লোবিন কি? এর কাজ কি? ২.৫

উত্তর : হিমোগ্লোবিন : সরল প্রোটিন গ্লোবিন (৯৬%) এবং লৌহঘটিত পদার্থ হিম (৪%)-এর সমন্বয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন লাল বর্ণের একটি শ্বাসরঞ্জক (respiratory pigment)। মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা ক্ষুদ্রাকার, দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো লাল রঙের কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। দেহে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ কণিকা তৈরি হয়। একটি লোহিত কণিকার গড় আয়ু ৪ মাস। সুস্থ মানুষের দেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৫ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে।

কাজ :

১. লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 এবং সামান্য পরিমাণ CO_2 পরিবহন করে।
২. রক্তের সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে।
৩. রক্তের অম্ল-ক্ষারের সাম্য রক্ষা করে।
৪. রক্তে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদনে সাহায্য করে।

ঘ. অতি পরিচিত পাঁচটি পানিবাহী রোগের নাম লিখুন। ২.৫

উত্তর : অতি পরিচিত পাঁচটি পানিবাহিত রোগ হলো : ডায়রিয়া, আমাশয়, কলেরা, জন্ডিস ও টাইফয়েড।

৩. ক. 'VIBGYOR' কি? আকাশ নীল দেখায় কেন? ২.৫

উত্তর : সাদা আলোকে বিশ্লিষ্ট করলে যে সাতটি রঙ পাওয়া যায় তাকে সংক্ষেপে 'VIBGYOR' বা 'বেনীআসহকলা' বলা হয়। যেখানে–

V = Violet বা বেগুনি
I = Indigo বা আসমানি
B = Blue বা নীল
G = Green বা সবুজ
Y = Yellow বা হলুদ
O = Orange বা কমলা
R = Red বা লাল।

আমরা জানি, সূর্যের আলো সাতটি রঙের সমষ্টি। এই সাত রঙের আলোর প্রতিটির তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা। এই পৃথক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কারণেই তাদের রঙও ভিন্ন। সূর্যের আলো যখন বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং গ্যাস অণুতে আপতিত হয় তখন সূর্যরশ্মির বিক্ষেপণ ঘটে।

যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম তা বিক্ষিপ্ত হয় বেশি। নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম হওয়ায় নীল আলো বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। তাই নীল আলো বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আমাদের চোখে এসে পৌঁছায়। সুতরাং আকাশের দিকে তাকালে আমরা নীল রং দেখি।

খ. প্রতিধ্বনি কি? প্রতিধ্বনির কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করুন। ২.৫

উত্তর : প্রতিধ্বনি : প্রতিফলনের দরুন ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে। সুতরাং শব্দ করার পর দূরবর্তী কোনো প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা অনুরূপ যে ধ্বনি শোনা যায় তাকে ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি বলে।

প্রতিধ্বনির ব্যবহার :

১. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়।
২. হিমশৈল, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়।
৩. পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজকে পথ দেখানো।
৪. বাদুড় অন্ধকারে পথ চলে প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে।
৫. প্রতিধ্বনির সাহায্যে কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়।

গ. বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ফিউজ ও আর্থ তার কি? বৈদ্যুতিক সার্কিটে এদের ব্যবহারের সুবিধা লিখুন। ২.৫

উত্তর : বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ফিউজ ও এর ব্যবহার : বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ফিউজ হলো টিন ও সিসার মিশ্রণে তৈরি সঙ্কর ধাতুর একটি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর ওপর দিয়ে আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং এর গলনাঙ্ক খুবই কম (৩০০°)। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যায়। ফলে বিদ্যুৎ বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা থেকে বাড়িঘর ও আমাদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষার জন্য বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ফিউজ ব্যবহার করা হয়।

আর্থ তার ও এর ব্যবহার : যে কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামই সাধারণত ধাতুর নির্মিত হয়। ধাতু অর্থাৎ ধাতব যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধাতব খুঁটির সাথে বৈদ্যুতিক তার সরাসরি যুক্ত থাকলে খুঁটিটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে কেউ এ খুঁটি স্পর্শ করলে তড়িতাহত হয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হবে। এই দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যই ধাতব খুঁটির সাথে বিদ্যুৎ লাইনের একটি তার সংযুক্ত করা হয়, যার নাম আর্থ তার। মূলত আর্থ তারের সংযোগের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি থেকে অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক চার্জ ভূপৃষ্ঠে প্রেরণ করে নিরাপদ রাখা হয়।

ঘ. X-ray কি? চিকিৎসাবিজ্ঞানে X-ray-এর গুরুত্ব কি? ২.৫

উত্তর : এক্স-রে (X-ray) : দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতব পদার্থের উপর পতিত হলে ধাতব পদার্থ হতে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন যে বিকিরণ নির্গত হয় তাই এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি। ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী উইলিয়াম রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে X-ray-এর গুরুত্ব : আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রের ব্যবহার রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. দাঁতের গোড়ায় ঘা, হাড় ভাঙার সমস্যা নির্ণয়ে ও অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও পরে এক্স-রের ব্যবহার অপরিহার্য।
২. শরীরের কোনো অংশের হাড় স্থানচ্যুত হলে, হাড় ভেঙে গেলে বা শরীরের কোনো অংশে অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু প্রবেশ করলে এক্স-রের দ্বারা তা নির্ণয় করা যায়।
৩. আলসার, ক্যান্সার, টিউমার, যক্ষ্মা, কিডনির পাথর প্রভৃতি রোগ নির্ণয় এবং রোগের সঠিক চিকিৎসায় এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

৪. ক. রঙিন টিভিতে কোন কোন আলোকরশ্মি ব্যবহার করা হয়? এসব রশ্মি কিভাবে সৃষ্টি করা যায়? ২.৫

উত্তর : রঙিন টিভিতে লাল (Red), সবুজ (Green), নীল (Blue) এই তিনটি আলোকরশ্মি ব্যবহার করা হয়। এজন্য রঙিন টিভির পিকচার টিউবকে RGB পিকচার টিউবও বলা হয়। আলোকের যৌগিক প্রকৃতি অনুযায়ী লাল, সবুজ ও নীল বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করে সাদা বর্ণসহ সব ধরনের বর্ণ তৈরি করা সম্ভব। তিন ধরনের রঙিন সংকেত রঙিন টিভির পিকচার টিউবের তিনটি ইলেকট্রন গান-এ আলাদাভাবে সরবরাহ করা হয়। রঙিন টিভির পিকচার টিউবের পর্দায় লাল, সবুজ ও নীল ফসফরাসের বিন্দু পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে। অতঃপর ইলেকট্রন গান থেকে তিন রঙের ইলেকট্রন প্রবাহ যখন ফসফরাস সমৃদ্ধ পর্দায় আঘাত করে তখন সেই বর্ণের আলো পর্দায় ফুটে ওঠে।

খ. 'রকেট' কি? এটা কি কৌশলে কাজ করে? ২.৫

উত্তর : রকেট হলো মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পেস শিপ প্রেরণ করার জন্য দ্রুতগতি সম্পন্ন নভোযান বিশেষ। এছাড়া দূরপাল্লার যুদ্ধে ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্যও রকেট ব্যবহার করা হয়।

আধুনিক জেট বিমান, রকেট ইত্যাদি নিউটনের তৃতীয় সূত্র তথা ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র ব্যবহার করে চালানো হয়। রকেটে জ্বালানি পুড়িয়ে প্রচুর গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। সেই গ্যাস প্রচণ্ড বেগে রকেটের পেছন দিয়ে নির্গত হয়। জ্বালানি নির্গত হওয়ার পূর্বে জ্বালানি ও রকেট উভয়েরই বেগ শূন্য থাকে। কাজেই তখন তাদের ভরবেগের সমষ্টি শূন্য। জ্বালানি নির্গত হওয়ার কালে নির্গমনের দিকে জ্বালানির কিছু ভরবেগ থাকে। ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রানুযায়ী জ্বালানি নির্গত হওয়ার আগে তাদের ভরবেগের সমষ্টি, জ্বালানি নির্গত হওয়াকালীন তাদের ভরবেগের সমষ্টির সমান হতে হবে।

সুতরাং জ্বালানি নির্গত হওয়ার সময় উভয়ের ভরবেগের সমষ্টি সমান হতে হলে অর্থাৎ শূন্য হতে হলে রকেটেরও জ্বালানির সমান ও বিপরীতমুখী একটি ভরবেগের সৃষ্টি হতে হবে। ফলে রকেটটি জ্বালানির বিপরীত দিকে এগিয়ে যাবে।

গ. 'বজ্রপাত' কি? এটা কিভাবে রোধ করা যায়? ২.৫

উত্তর : আকাশে জলীয়বাষ্প কণা জমে একত্রে মেঘমালা সৃষ্টি হয়, তখন মেঘের অসংখ্য জলকণার মধ্যে চার্জের সৃষ্টি হয়। মেঘমালা যখন একত্রিত হয় তখন এসব জলকণার মধ্যে ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট চার্জ থেকে বিপুল পরিমাণ আলোকশক্তি ও শব্দশক্তি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, একে বজ্রপাত বলে। বজ্রপাতের সময় বিপুল পরিমাণ শক্তি একত্রে বৈদ্যুতিক চার্জ আকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।

বজ্রপাত থেকে রক্ষার জন্য গৃহ বা অট্টালিকায় যে তীক্ষ্ণ পরিবাহী দণ্ড ব্যবহার করা হয় তাই বজ্রনিবারক। বজ্রনিবারকের এক প্রান্তে একটি ধাতব পাত, মাঝে ধাতব দণ্ড এবং অগ্রভাগে সূচিমুখবিশিষ্ট পরিবাহী থাকে। সাধারণত বাড়ির ছাদে বা উচ্চতম স্থানে সূচিমুখটি রেখে ধাতব পাতটি মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। বজ্রপাতের কারণে চার্জগ্রস্ত মেঘ সূচিমুখের সংস্পর্শে এসে দণ্ড বেয়ে মাটিতে চলে যায়। এতে ঘর-বাড়ি বা অট্টালিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

ঘ. 'নিয়ন' গ্যাস কোথায় পাওয়া যায়? এ গ্যাস কিভাবে কাজে লাগে? ২.৫

উত্তর : নিয়ন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস যা বায়ুমণ্ডলের ৬৫ হাজার অংশের ১ অংশ হিসেবে উপস্থিত। এটিকে বায়ু থেকে তরলীকরণ এবং পৃথকীকরণ পদ্ধতিতে পাওয়া যায়।

নিয়ন বৈদ্যুতিক সাজসজ্জা ও ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপন বোর্ডে আকর্ষণীয় উপস্থাপনার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া রাস্তায় নিয়ন বাতি জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করার কাজে ব্যবহৃত হয়। নিয়নের ত্রৈধ বিন্দু আন্তর্জাতিক তাপমাত্রা স্কেলের একটি নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভ্যাকুয়াম টিউবে নিয়ন ব্যবহৃত হয়।

৫. ক. Vaccine কি? ভ্যাক্সিন (Vaccine)-এর প্রয়োগ লিখুন। ২.৫

উত্তর : Vaccine (ভ্যাক্সিন) : আমাদের দেহের জীবাণুঘটিত প্রত্যেকটি রোগ এককেটি নির্দিষ্ট জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। কোনো একটি রোগের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট জীবাণুগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন মাত্রায় দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয় যেন উক্ত জীবাণুগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে না পারে। এ দুর্বল ও প্রক্রিয়াজাত জীবাণুগুলোকে যখন আমাদের রক্তে তথা শরীরে প্রবেশ করানো হয় তখন এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগ্রত করে তোলে কিন্তু কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগ্রত হওয়ার কারণে উক্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরনের শক্তিশালী এন্টিবডি তৈরি হয় যা উক্ত জীবাণু ধ্বংসে করতে সক্ষম। পরবর্তীতে উক্ত রোগের কোনো সক্রিয় জীবাণু যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন পূর্বে সৃষ্ট ঐ এন্টিবডিগুলো রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে। ফলে কোনো রোগ সৃষ্টি হয় না। এভাবে কোনো রোগের জন্য দায়ী জীবাণুগুলোকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে উক্ত রোগের বিরুদ্ধে আমাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাকেই ভ্যাক্সিন বলা হয়।

খ. ইনসুলিন কি? এর কাজ কি? ২.৫

উত্তর : ইনসুলিন : ইনসুলিন এক ধরনের হরমোন, যা অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত হয় এবং চিনির বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন হচ্ছে একটি পলিপেপটাইড। এর আণবিক ওজন প্রায় ৬০০০ গ্রাম। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ইনসুলিন সাধারণত গরুর অগ্ন্যাশয় থেকে প্রস্তুত করা হয়। ইনসুলিন অণুতে ৪৮টি অ্যামাইনো এসিড থাকে। রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়লে অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নির্গমন বৃদ্ধি করে দেয়। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স টিস্যু চিনির বিপাক করার মতো ইনসুলিন উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

ইনসুলিনের কাজ : ইনসুলিন শ্বেতসার, আমিষ ও চর্বির বিপাকপ্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিনের প্রধান কাজ রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখা। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয়। ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়। পাকস্থলীর জারক-রসের কার্যকারিতা নষ্ট হবার কারণে ইনসুলিন মুখে খাবার পরিবর্তে ইনজেকশন মাধ্যমে নেয়া হয়। কার্যকাল হিসেবে একাধিক প্রকার ইনসুলিন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

গ. প্রোটিন কি? এর তিনটি গুরুত্ব লিখুন। ২.৫

উত্তর : প্রোটিন : প্রোটিন হলো কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত জটিল জৈব পদার্থ, যার প্রতিটি অণু বহুসংখ্যক অ্যামাইনো এসিড অণু দিয়ে গঠিত এবং অ্যামাইনো এসিডগুলো পেপটাইড বন্ধ দ্বারা পরস্পরযুক্ত।

প্রোটিনের গুরুত্ব : প্রোটিনের তিনটি গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. প্রোটিন দেহের কোষ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ একক।
২. দেহের বাফার পদ্ধতি (Buffer System) গঠন করে।
৩. প্লাজমা প্রোটিনের লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে দেহরস ও রক্তের কলয়ডাল ওসমেটিক চাপ রক্ষা করে।

ঘ. কেমোথেরাপি কি? এটা কেন ব্যবহার করা হয়? ২.৫

উত্তর : কেমোথেরাপি : রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চিকিৎসা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো কেমোথেরাপি। এর জনক হলেন জার্মান চিকিৎসক পল এহর্লিক।

ব্যবহার : সাধারণত জীবাণুর সংক্রমণ এবং ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। অ্যান্টিক্যান্সার ড্রাগ প্রয়োগে ক্যান্সারের চিকিৎসাকে কেমোথেরাপি বলে। ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ যখন দেহের ব্যাপক অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব হয় না। এজন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। মূলত শরীরের ব্যাপক ও স্পর্শকাতর অংশে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়লে কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়।

৩৩তম বিসিএস : ২০১২

প্রযুক্তি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

(প্রার্থীদিগকে ৬নং প্রশ্নের উত্তর এবং ৭নং হতে ১০নং প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে)

৬. ক. পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার বলতে কি বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। ৪

উত্তর : পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার (Fifth Generation Computer) : Super VLSI (Very Large Scale Integration) চিপ ও অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার তৈরি হবে। এটি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রচুর ডেটা ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার। এ কম্পিউটারের বিশেষত্ব হলো প্রতি সেকেন্ডে ১০০ থেকে ১৫০ কোটি লজিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের কণ্ঠস্বর শনাক্ত করার ক্ষমতা ও কণ্ঠে দেয়া নির্দেশ বুঝতে পেরে কাজ করতে পারবে এ কম্পিউটার। আমেরিকা ও জাপান পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার চালুর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে আমরা যেসব কম্পিউটার ব্যবহার করি সেগুলো চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার।

বৈশিষ্ট্য : নিচে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো :

১. বহু মাইক্রোপ্রসেসর বিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।
২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার।
৩. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার।
৪. প্রোগ্রাম সামগ্রীর উন্নতি।
৫. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ।
৬. চৌম্বক বাবল মেমরি।
৭. ডেটা ধারণক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
৮. অধিক সমৃদ্ধশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার।
৯. বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার কম্পিউটারের উন্নয়ন।

খ. ট্রান্সফর্মার কি? ট্রান্সফর্মারের প্রধান উপাদানগুলো কি কি? ৪

উত্তর : ট্রান্সফর্মার : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পরিবর্তী প্রবাহের বিভবকে উচ্চ থেকে নিম্নমানে বা নিম্ন থেকে উচ্চমানে পরিবর্তন করা যায় তাকে ট্রান্সফর্মার বলে। তাড়িত চৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়।

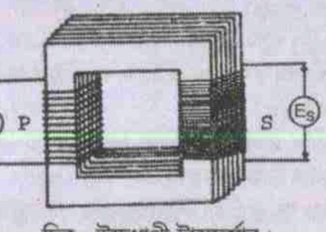

চিত্র : উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মার।

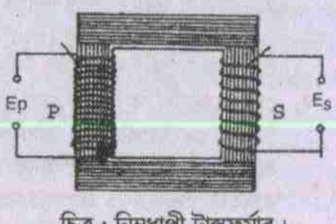

চিত্র : নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মার।

ট্রান্সফর্মারের গঠন : একটি ট্রান্সফর্মারের নিম্নলিখিত অংশ থাকে :

ক. কোর বা মজ্জা : কাঁচা লোহার কতগুলো আয়তাকার পাতকে একত্রিত করে কোর তৈরি করা হয়। কোরের বিপরীত বাহুতে অন্তরীত তারের পেঁচানোর ফলে দু'টি কুণ্ডলী তৈরি হয়।

খ. মুখ্য কুণ্ডলী : কোরের যে বাহুর কুণ্ডলীটিকে পরবর্তী প্রবাহ বা বিভব প্রয়োগ করা হয় তাকে মুখ্য কুণ্ডলী বা মুখ্য কয়েল বলে।

গ. গৌণ কুণ্ডলী : মুখ্য কুণ্ডলীর বিপরীত গৌণ কুণ্ডলী। এখানে পরিবর্তী বিভব আবিষ্ট হয়। উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীতে পাকসংখ্যা বেশি থাকে। আর নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারে মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা কম থাকে।

গ. মনিটর, প্রিন্টার ও কীবোর্ডের কার্যপদ্ধতি লিখুন। ৪

উত্তর : মনিটরের কার্যপদ্ধতি : মনিটরের প্রধান অংশ ক্যাথোড রশ্মির (Cathode Ray Tube-CRT) টিউবের পেছন দিকে অবস্থিত ইলেকট্রন গান থেকে ইলেকট্রন রশ্মি বা বিম বিচ্ছুরিত হয় এবং পর্দার দিকে ধাবিত হয়। পর্দার ভিতরের পৃষ্ঠে ফসফরাসের প্রলেপ থাকে। ইলেকট্রন বিম ফসফরাসের উপর পতিত হলে ফসফরাস থেকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হয়। ফসফরাসের ধরনের ভিত্তিতে মনিটরে পর্দায় প্রদর্শিত বিষয় এক রঙের বা বহু রঙের হতে পারে। মনিটরের পর্দায় প্রত্যেক বর্ণের সঠিক আকারকে, যাকে বলে ডট ম্যাট্রিক্স প্যাটার্ন (Dot Matrix Pattern) ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ মেমরি ভাণ্ডারে সব বর্ণের প্যাটার্ন সঞ্চিত রাখা হয়। এই মেমরি ভাণ্ডারকে বলে বর্ণ উৎপাদক (Character Generator)।

প্রিন্টারের কার্যপদ্ধতি : প্রিন্টার কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। প্রিন্টার বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং এর কার্যপ্রণালীও বিভিন্ন। বর্তমানে ব্যবহৃত লেজার প্রিন্টারে মুদ্রণের জন্য লেজার রশ্মির একটি আলোক সংবেদনশীল ড্রামের উপর মুদ্রণযোগ্য বিষয়ের ছাপ তৈরি করে। তখন লেজার রশ্মি প্রক্ষেপিত অংশ টোনার আকর্ষণ করে। এরপর ড্রাম সেই টোনারকে কাগজে স্থানান্তরিত করে। কাগজের উপর পতিত টোনার উচ্চ তাপে গলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসে যায়। এভাবেই লেজার প্রিন্টারে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়।

কীবোর্ডের কার্যপদ্ধতি : কীবোর্ড কম্পিউটারের একটি ইনপুট ডিভাইস। কীবোর্ডের প্রতিটি Key আসলে একটি বৈদ্যুতিক সুইচ, এর সাথে এনকোডার (Encoder) যুক্ত থাকে। কীবোর্ডের কোনো Key চাপলে এনকোডার সেই বর্ণের ASCII ইত্যাদি কোনো কোডের ডিজিটাল বৈদ্যুতিক সংকেত (O বা 1) উৎপন্ন করে। ফলে একটি ইনপুট রেজিস্টারে বর্ণের কোড লেখা হয়ে যায়। তারপর প্রসেসর রেজিস্টারে চলে যায় এবং ইনপুট রেজিস্টারে লেখা মুছে যায়। সুতরাং আবার কোনো কী চাপলে সেই বর্ণের কোড ইনপুট রেজিস্টারে উঠে যায়।

ঘ. স্যাটেলাইট কি? এটা কত প্রকার ও কি কি? ৪

উত্তর : স্যাটেলাইট : উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট বলতে বুঝানো হয় কোনো গ্রহের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে। তবে বর্তমান যুগে স্যাটেলাইট হলো মনুষ্য নির্মিত নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী এক প্রকার যন্ত্র যা রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করে পৃথিবীর অর্বিটালে বা কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। তিন স্তরের রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে পরে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে নির্দিষ্ট বেগ দেয়া হয়। এতে উপগ্রহটি পৃথিবীর চার পাশে কৃত্রিম চাঁদের মতো ঘুরতে থাকে। এসব স্যাটেলাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশ গ্রহণ করে সে অনুপাতে কাজ করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তথ্য প্রেরণ করে।

স্যাটেলাইটের প্রকারভেদ : কাজের উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটকে নয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. নভোপর্যবেক্ষণ বা এস্ট্রোনমি স্যাটেলাইট; ২. এটমসফিয়ারিক স্যাটেলাইট; ৩. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট; ৪. নেভিগেশন স্যাটেলাইট; ৫. রিকনাইসেন্স স্যাটেলাইট; ৬. রিমোট সেনসিং স্যাটেলাইট; ৭. সার্চ ও রেসকিউ স্যাটেলাইট; ৮. স্পেস এক্সপ্লোরেশন স্যাটেলাইট; ৯. ওয়েদার স্যাটেলাইট।

ঙ. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কি? বিভিন্ন প্রকার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন। ৪

উত্তর : ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার : ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হচ্ছে এমন এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের পরিবর্তনকে বাধা প্রদান করে। যেমন– শর্ট সার্কিটের ফলে অত্যধিক প্রবাহ, লোড শেডিংয়ের সময় এর প্রবাহের পরিবর্তন ইত্যাদি। স্ট্যাবিলাইজার বিদ্যুৎ প্রবাহকে গ্রহণযোগ্য করে গ্রাহককে নিরাপত্তার সাথে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিশ্চয়তা দেয়।

Stabilizer-কে অন্য কথায় Protection Deviceও বলা যায়। এতে এক প্রকার রিলে কাজ করে, যা একটি নির্দিষ্ট Voltage-এ নির্দিষ্ট থাকে। ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ঐ নির্দিষ্ট Voltage-এর অতিরিক্ত প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্ধারিত মানের Voltage Supply দেয়। যদি Stabilizer-এর ক্ষমতার অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় যা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিপজ্জনক, এ অবস্থায় Stabilizer-এর অভ্যন্তরীণ ফিউজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে।

প্রকারভেদ : ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার সাধারণত দু রকমের হয়। যথা : ১. লিনিয়ার রেগুলেটর ও ২. সুইসিং রেগুলেটর।

১. লিনিয়ার রেগুলেটরের সুবিধাসমূহ :

ক. সরল; খ. আউটপুটে ভোল্টেজ প্রবাহ কম হয়; গ. লোড রেগুলেশন ও লাইন খুবই ভালো; ঘ. লোড ও লাইন চেঞ্জ দ্রুত রেসপন্স করে; ঙ. কম নয়েস (noise) তৈরি করে।

লিনিয়ার রেগুলেটরের অসুবিধাসমূহ :

ক. ইফিসিয়েন্সি কম; খ. হিট সিঙ্ক (Heat Sink) প্রয়োজন হলে বেশি জায়গার দরকার; গ. ইনপুটের চেয়ে ভোল্টেজ বাড়াতে পারে না।

২. সুইসিং রেগুলেটরের সুবিধাসমূহ :

ক. ইফিসিয়েন্সি বেশি; খ. হাই পাওয়ার ডেনসিটিজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে; গ. ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে ভোল্টেজ চাহিদা অনুযায়ী কমাতে বা বাড়াতে পারে।

সুইসিং রেগুলেটরের অসুবিধাসমূহ :

ক. আউটপুটে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহ; খ. Transien Recovery সময় খুব কম; গ. বেশি Noise তৈরি করে; ঘ. বেশি দামি।

৭. ক. ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন। ৫

উত্তর : ইনপুট ডিভাইস : ইনপুট হলো বাইরে থেকে কোনো ডেটা বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো। কম্পিউটারের যেসব যন্ত্রাংশের মাধ্যমে এতে বিভিন্ন ধরনের ডেটা এন্ট্রি করা হয় সেসব যন্ত্রাংশকে ইনপুট ডিভাইস বা গ্রহণমুখ যন্ত্রাংশ বলে। কীবোর্ড ও মাউস হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইস।

উদাহরণ : কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ওসিআর (OCR), ওএমআর (OMR), ডিজিটাইজার, ডিজিটাল ক্যামেরা, বারকোড রিডার ইত্যাদি।

আউটপুট ডিভাইস : ইনপুট প্রদানের পর CPU প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে ও প্রয়োজনীয় ফলাফল প্রদান করে। ফলাফল পাওয়ার জন্য যেসব যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় আউটপুট ডিভাইস বা আউটপুট যন্ত্রাংশ। ইনপুটকৃত ডেটা কম্পিউটার মেমরি সংরক্ষণ করে ও প্রসেসরের সাহায্যে প্রক্রিয়াকরণ করে আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রদর্শন করে।

উদাহরণ : মনিটর, প্রিন্টার, হার্ডডিস্ক, স্পিকার, প্লটার ইত্যাদি।

খ. একটি ডিসি মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন। ৫

উত্তর : তড়িৎ মোটর : যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে।

প্রকারভেদ : তড়িৎ মোটর দুই প্রকার। যথা : ১. ডিসি মোটর ও ২. এসি মোটর। নিচে ডিসি মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করা হলো :

গঠন : এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে–

১. **ক্ষেত্র চুম্বক :** U-আকৃতির একটি স্থায়ী বা তড়িৎ চুম্বক এই যন্ত্রের ক্ষেত্র চুম্বকের কাজ করে।

২. **আর্মেচার :** কাঁচা লোহার মজ্জার উপর অন্তরীত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়।

৩. **কমুটেটর :** শক্ত তামার কতগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরীত করে কমুটেটর তৈরি করা হয়।

৪. **ব্রাশ :** কার্বন অথবা তামা দ্বারা ব্রাশ তৈরি করা হয়।

কার্যপ্রণালী : বহিঃবর্তনী থেকে আর্মেচার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত অভিমুখে তড়িৎ প্রবাহিত হয়। ফলে কুণ্ডলী ঘুরতে থাকে। দুটো চৌম্বক বলের ক্রিয়ার ফলে বিপরীতমুখী কুণ্ডলীতে ঘূর্ণন উৎপন্ন হয়। কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ বাড়ালে ঘূর্ণনের বেগও বৃদ্ধি পায়। যখন কুণ্ডলীটি ঘুরে তখন এতে অল্প পরিমাণে তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয়। এ সময় কুণ্ডলীটি ঐ চৌম্বকক্ষেত্রে ঘুরে চৌম্বক বলরেখার সাথে নিজেকে স্থাপিত করতে চায়। কুণ্ডলীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে কমুটেটরও ঘুরে। কুণ্ডলীর তল যখন উলম্ব অবস্থায় আসে তখন গতি জড়তার জন্য কুণ্ডলীটি একই দিকে আরো একটু এগিয়ে যায়। কুণ্ডলীর এই অবস্থায় ব্রাশ ও কমুটেটর অংশের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয়। ফলে কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে যায় এবং কুণ্ডলীকে একই দিকে আরো ঘুরিয়ে দেয়।

৮. ক. TCP/IP কি? UPS কি? এটি কেন ব্যবহার করা হয়? ৫

উত্তর : TCP/IP : ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত একগুচ্ছ নিয়মকানুনকে TCP/IP বলা হয়। TCP/IP-এর অর্থ হলো Transmission Control Protocol/Internet Protocol বা সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ বিধান/ইন্টারনেট বিধান। এ প্রটোকল হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের এক সেট Rules (বিধান), যা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্ভুলভাবে ডেটা কমিউনিকেশনে সহায়তা করে। অর্থাৎ নেটওয়ার্কে যুক্ত কম্পিউটারগুলোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত রীতিনীতিই হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রটোকল। TCP/IP প্রটোকল পাঁচটি লেয়ার (Layer) বা পর্যায়ে কাজ করে।

UPS : UPS-এর পূর্ণ অর্থ হলো Uninterruptable Power Supply। এটি এক প্রকার বিশেষ পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট, যা ব্যাটারির মধ্যে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখতে সক্ষম এবং লোডশেডিং বা অন্য কোনো কারণে বিদ্যুৎ চলে গেলে স্বল্প সময়ের (২০-৩০ মিনিট) জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সচল রাখে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান : ইউপিএস-এর ব্যাটারি বিদ্যুৎ শক্তি তথা চার্জ সঞ্চয় করে রাখে। ফলে হঠাৎ

UPS-এর ব্যবহার : ইউপিএস-এর ব্যাটারি বিদ্যুৎ শক্তি তথা চার্জ সঞ্চয় করে রাখে। ফলে হঠাৎ করে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন ইউপিএস সাধারণত এক থেকে দুই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ব্যাটারিতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ থেকে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। প্রকারভেদে ইউপিএস দশ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। ইউপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে কম্পিউটারের RAM এ রক্ষিত ডেটা মুছে যাওয়ার ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

খ. ইন্টারনেট কি? ইন্টারনেট ব্যবহারে সুবিধা ও অসুবিধাগুলো বর্ণনা করুন। ৫

উত্তর : ইন্টারনেট : ইন্টারনেট হচ্ছে পৃথিবী বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এটি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি নেটওয়ার্ক। ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত নেটওয়ার্কের সংখ্যা বর্তমানে

কয়েক হাজার এবং সংযুক্ত কম্পিউটারের সংখ্যা প্রায় দশ কোটি আর এই সংখ্যা দ্রুত বেড়েই চলেছে। অরপানেট (ARPANET) দিয়ে ইন্টারনেটের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। তবে ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/আইপি (TCP/IP) প্রটোকল উদ্ভাবনের পর ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত জিনিসগুলো প্রয়োজন : ১. কম্পিউটার বা সংশ্লিষ্ট ডিভাইস, ২. মডেম, ৩. ইন্টারনেট সংযোগ, ৪. সফটওয়্যার।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা : ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **বিরাট তথ্যসম্ভার :** ইন্টারনেট তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। ইন্টারনেট দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো ছিটানো অসংখ্য অনলাইন ডেটাবেজ হতে বহুবিধ তথ্য আহরণ করা সম্ভব।

২. **ইলেকট্রনিক মেইল (E-mail) :** ইন্টারনেট ব্যবহারকারী দ্রুতগতিতে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে তার যে কোনো তথ্য অন্য কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে পাঠাতে পারে এবং তথ্যগ্রহীতা সে তথ্য গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বব্যাপী ডাক ব্যবস্থায় ই-মেইল এখন সময়কে জয় করে বহুদূর এগিয়ে গেছে।

৩. **ই-কমার্স (E-commerce) :** ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নানা ধরনের পণ্য বা দ্রব্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে কেনা-কাটা করতে পারেন। অনলাইনের এই বাণিজ্যকে বলা হয় E-commerce।

৪. **গবেষণা (Research) :** গবেষকের প্রয়োজনীয় তথ্য (যা সংগ্রহ জটিল, সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর) ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে সংগ্রহ করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে গবেষণা এখন অনেক সহজসাধ্য হয়েছে।

৫. **যোগাযোগ :** ইন্টারনেটের মাধ্যমে লোকাল কলের সাহায্যে ISP-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে খুব কম খরচে বিশ্বের যে কোনো স্থানে কথা বলা সম্ভব।

৬. **সফটওয়্যার :** ইন্টারনেট থেকে বিনা খরচে অনেক প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও টুলস ডাউনলোড করা যায়।

এছাড়াও বর্তমানে ইন্টারনেটে অনেক ধরনের সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। সেগুলো হলো Telnet, FTP, IRC, www, Video conferencing, Iphone, facebook, twiter ইত্যাদি।

অসুবিধা :

১. ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে অনেক সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

২. ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে ঘরে বসে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনগণের মধ্যে অলসতা ও পরিশ্রমবিমুখতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. অনলাইন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় অনেক সময় হ্যাকারদের সৃষ্ট সমস্যা ও অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল, প্রয়োজনীয় উপাত্ত বিনষ্ট হয়ে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৪. ব্যবহারকারীর নানা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ডেটা অবাঞ্ছিত ভাইরাস প্রোগ্রামে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

৫. উন্মুক্ত যোগাযোগের কারণে কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে।

৯. ক. **কম্পিউটার (সফটওয়্যার)-এর সোর্স কোড কি? সোর্স কোড উন্নয়নে ব্যবহার হয় এমন দুটি সফটওয়্যার-এর নাম লিখুন।** ২.৫

উত্তর : সোর্স কোড : কোনো সফটওয়্যার তৈরির জন্য প্রোগ্রামারগণ যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং টুলস ব্যবহার করে যে প্রোগ্রাম রচনা করে তাকে সোর্স কোড বলে। অর্থাৎ যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখা কোডই হলো সোর্স কোড।

কম্পিউটার সোর্স কোড উন্নয়নে ব্যবহার করা হয় এমন দু'টি সফটওয়্যার হলো : (১) মাইক্রোসফট ভিজুয়াল স্টুডিও ডট নেট; (২) জাভা এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট টুলস।

খ. **কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং বলতে কি বুঝায়? হ্যাকিং-এর একটি উদাহরণ লিখুন।** ২.৫

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং : যে কোনো কম্পিউটার সিস্টেম যেমন– ই-মেইল একাউন্ট, স্কাইপ একাউন্ট বা অনলাইন ক্রেডিট একাউন্টে কোনো অনাদিষ্ট (unauthorized) ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতির উদ্দেশ্যে পাসওয়ার্ড ভেঙ্গে প্রবেশ করে তথ্য চুরি বা তথ্যের অপব্যবহার করাকে কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং বলে।

উদাহরণ : সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক বিচারপতি নিজামুল হকের স্কাইপ একাউন্ট হ্যাক করে তার কথপোকথন রেকর্ড করা হয় ও তা ফাঁস করা হয়। ফলে তিনি পদত্যাগ করেন।

গ. **কম্পিউটার ভাইরাস কিভাবে কাজ করে? ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবহার হয় এমন দুটি সফটওয়্যারের নাম লিখুন।** ২.৫

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস হলো এক ধরনের ক্ষতিকর প্রোগ্রাম (Malware) যা কম্পিউটারে রক্ষিত ডেটা ও অন্যান্য সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া কম্পিউটার ভাইরাস ইন্টারনেটের গতিকে মন্তর করে দেয় ও নেটওয়ার্কে জ্যাম সৃষ্টি করে। কম্পিউটার ভাইরাস সাধারণত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে পরে।

কম্পিউটার ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় এমন দুটি সফটওয়্যার হলো (১) Kasperskey ও (২) Norton Antivirus।

ঘ. **ডিজিটাল স্বাক্ষর কি এবং তা কেন গুরুত্বপূর্ণ?** ২.৫

উত্তর : ডিজিটাল স্বাক্ষর বা ইলেকট্রনিক ডিজিটাল সিগনেচার হলো কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত একপ্রকার গাণিতিক পদ্ধতি যা কম্পিউটারে রক্ষিত ও আদান-প্রদানকৃত কোনো ডকুমেন্টের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ডিজিটাল স্বাক্ষর কম্পিউটার ক্রিপ্টোগ্রাফিতে ব্যবহৃত এক প্রকার প্রযুক্তি যেখানে ডিজিটাল ডকুমেন্ট আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

গুরুত্ব :

১. ডিজিটাল ফাইলের নিরাপত্তা প্রদান করে।

২. নেটওয়ার্ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে।

৩. সফটওয়্যার সিস্টেমে প্রতারণা ও অনাদিষ্ট (unauthorized) ব্যবহার থেকে রক্ষা করে।

১০. ক. **Machine Language কি? Compiler কিভাবে কাজ করে?** ২.৫

উত্তর : Machine Language : কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র হওয়ায় শুধু বাইনারি সংকেত যা 0 ও 1 দ্বারা গঠিত ভাষা বুঝতে পারে। কম্পিউটার যে ভাষায় কোনো নির্দেশ বুঝতে সক্ষম সেই ভাষাকেই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ (Machine Language) বা যান্ত্রিক ভাষা বলে। যে ভাষাতেই প্রোগ্রাম লেখা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম মূলত বাইনারি গাণিতিক রাশি দ্বারা তৈরি।

কম্পাইলারের কার্যপ্রণালী : কম্পাইলারের কাজ হাই লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রাম তথা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করা। কম্পাইলার এক প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রাম বা Translator Program।

নিচে ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কম্পাইলারের কার্যপ্রণালী দেখানো হলো :

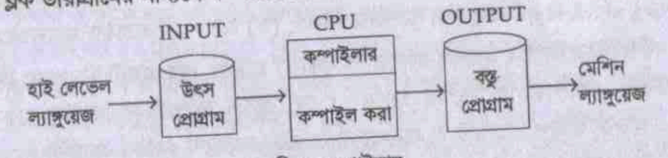

চিত্র : কম্পাইলার

খ. কম্পিউটারে সাধারণত কি কি পোর্ট থাকে? কোন পোর্ট-এ প্রিন্টার সংযোগ দেয়া হয়? ২.৫

উত্তর : পোর্ট : কম্পিউটারের সিপিইউ তথা মাদারবোর্ডের সাথে মনিটর, প্রিন্টার, মাউস, কীবোর্ডসহ যে কোনো পেরিফেরালস ডিভাইস সংযোগ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পোর্ট বা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

পোর্ট মূলত দুই প্রকার : (১) সিরিয়াল পোর্ট ও (২) প্যারালাল পোর্ট।

পূর্বে কম্পিউটারের প্রিন্টার প্যারালাল পোর্টের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করা হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রিন্টারসহ প্রায় সকল পেরিফেরালস ডিভাইসই ইউএসবি (USB–Universal Serial Bus) নামক সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করা হয়।

গ. HTML-এর পূর্ণরূপ লিখুন। HTML কিভাবে কাজ করে? ২.৫

উত্তর : HTML-এর পূর্ণরূপ হলো Hyper Text Markup Language। ওয়েব পেজ তৈরি করতে ব্যবহৃত সাধারণ প্রোগ্রামিং ভাষা হলো HTML।

HTML এর কার্যাবলী : ইন্টারনেট হলো পৃথিবীর সকল কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেটে তথ্য প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ওয়েব পেজ রয়েছে। ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রক্ষিত বিভিন্ন ফাইলই হলো ওয়েব পেজ, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ ব্রাউজ করে দেখেন। এসব ওয়েব পেজ মূলত HTML ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে (WWW) রাখা হয়। HTML প্লাটফর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে World Wide Web ডকুমেন্টের বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও উপকরণ তৈরি করে ও web page-এ প্রদর্শন করে।

ঘ. LAN কি? কম্পিটউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত তারবিহীন প্রযুক্তির নাম কি? এ প্রযুক্তির মূল অসুবিধা কি? ২.৫

উত্তর : LAN হলো Local Area Network। সাধারণত ১০ কি.মি. বা তার কম এলাকার মধ্যে বিস্তৃত কয়েকটি কম্পিউটার টার্মিনাল বা পেরিফেরালস ডিভাইস (যেমন– প্রিন্টার, স্ক্যানার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। একটি LAN সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটারের তারবিহীন প্রযুক্তি : কম্পিউটারের তারবিহীন প্রযুক্তিকে বলা হয় Wireless communication technology। এই প্রযুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে :

১. মাইক্রোওয়েভ; ২. রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি; ৩. ওয়াইফাই (Wifi); ৪. ব্লুটুথ; ৫. ওয়াইম্যাক্স ইত্যাদি।

অসুবিধা :

১. তারবিহীন প্রযুক্তি দূরবর্তী স্থানে ডেটা আদান-প্রদানে ধীর গতিসম্পন্ন।
২. আবহাওয়ার উপাদান যেমন– কুয়াশা, ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদির কারণে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।
৩. একাধিক সিগন্যালের মধ্যে ওভারল্যাপিং (overlaping) হয়ে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

৩২তম বিসিএস : ২০১২

৩২তম বিসিএস পরীক্ষা মুক্তিযোদ্ধা, মহিলা ও উপজাতীয় (শুধু কারিগরি ও পেশাগত ক্যাডার) প্রার্থীদের জন্য স্পেশাল হওয়ায় 'সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি।

৩১তম বিসিএস : ২০১১

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

[**দ্রষ্টব্য :** *প্রার্থীদিগকে ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এবং ২ – ৫ নং প্রশ্নের যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. ক. শব্দ শ্রবণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে ভূ-অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়? ৪

উত্তর : শব্দ শ্রবণ প্রক্রিয়া : শব্দ এক প্রকার তরঙ্গ যা বাতাসে ভেসে আমাদের কানের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছায় এবং তখন আমরা শুনতে পাই। মানবদেহের মাথার দুপাশে দুটি কান আছে এবং এই কান দুটিই আমাদের প্রধান শ্রবণ যন্ত্র।

মানুষের প্রতিটি কান তিনটি অংশে বিভক্ত–

ক. বহিঃকর্ণ (Outer Ear), খ. মধ্যকর্ণ (Middle Ear) এবং গ. অন্তঃকর্ণ (Inner Ear)।

প্রতিটি অংশই শব্দ শ্রবণে সমান কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

বহিঃকর্ণ : শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে ➤ বহিঃকর্ণের বাইরের দিকটি দৃশ্যমান গোলাকার ও ছিদ্রযুক্ত। মাথার দুপাশে অবস্থিত ও তরুনাস্থি নির্মিত কানের বাইরে প্রসারিত ও নরম অংশের নাম পিনা (Pinna) বা কর্ণছত্র। এটি বাইরে উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গ গ্রহণ করে কানের সরু নালীপথে প্রেরণ করে। নালীপথের ভেতরে টিমপেনিক পর্দাতে এ তরঙ্গ আঘাত করে। তখন টিমপেনিক পর্দা আন্দোলিত হয় ও ভেতরে পরপর সংযুক্ত তিনটি ছোট অস্থিকে আঘাত করে।

মধ্য কর্ণ : কম্পন তৈরি করে ➤ মধ্য কর্ণে ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নামের তিনটি ছোট অস্থি পর পর সংযুক্ত। অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিমপেনিক পর্দার আঘাতে এক প্রকার সহনীয় কম্পন তৈরি করে ও এ কম্পনকে সামনের দিকে প্রেরণ করে।

অন্তঃকর্ণ : মস্তিষ্কে শব্দ প্রেরণ করে ➤ অন্তঃকর্ণ পেরিলিম্ফ নামক তরল পদার্থে পূর্ণ। কর্ণ অস্থি থেকে আগত কম্পন পেরিলিম্ফের মাধ্যমে অডিটরি স্নায়ুতে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। অডিটরি স্নায়ু এ উদ্দীপনা মস্তিষ্কে নিয়ে যায় ও শব্দ তরঙ্গ আমরা শ্রবণ করতে সক্ষম হই।

প্রতিধ্বনির সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় : প্রতিধ্বনির সাহায্যে ভূ-অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করতে ভূ-পৃষ্ঠ ভেদকারী রাডার নামে শব্দ কম্পন সৃষ্টিকারী একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। একে সংক্ষেপে GPR (Ground Penetrating Radar) বলা হয়। এই রাডারটি একটি অথবা একাধিক বেতার তরঙ্গ ভূ-অভ্যন্তরে প্রেরণ করে। প্রতিধ্বনিত তরঙ্গগুলো ভূ-অভ্যন্তরের প্রকৃত অবস্থা ও দূরত্ব ডিজিটাল রূপে প্রকাশ

করতে পারে। এই ডিজিটাল রূপে প্রতিধ্বনি গ্রহণ করার জন্য একটি কম্পিউটার থাকে যা ত্রিমাসিক মানচিত্র আকারে ভূ-অভ্যন্তরের সকল পরিবর্তনসহ ভূ-কাঠামোর একটি ইমেজ প্রকাশ করে। অতঃপর পূর্ব থেকে সংগৃহীত বিভিন্ন প্রকার খনিজ পদার্থের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র ইমেজের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। বিশেষজ্ঞগণ এই ত্রিমাত্রিক ছবির কাঠামোর মিল থেকে ধারণা করতে সক্ষম হন ভূ-পৃষ্ঠের কত নিচে কি ধরনের খনিজ পদার্থ রয়েছে।

খ. বহুরূপতা বলতে কি বুঝায়? কার্বনের বহুরূপতা বর্ণনা করুন। ৪

উত্তর : বহুরূপতা (Allotropy) : যদি কোনো মৌল বা মৌলিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক কাঠামোতে ও বাহ্যিক রূপে প্রকৃতিতে থাকতে পারে তখন তার এ ধর্মকে বহুরূপতা (Allotorpy) বলা হয়।

যেসব মৌল বহুরূপতা বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে সেসব মৌলকে বহুরূপী মৌল বলা হয়। এ ধরনের বহুরূপী মৌল হলো টিন (Sn), কার্বন (C), সালফার (S), ফসফরাস (P), অক্সিজেন (O_2) ইত্যাদি। এসব মৌল প্রকৃতিতে সুস্থিত অণু অবস্থায় থাকে না, এবং বিভিন্ন কাঠামো গঠন করে রাসায়নিক স্থিতি অর্জন করে।

কার্বনের বহুরূপতা : কার্বন একটি মৌলিক পদার্থ। এর ইলেকট্রন বিন্যাস ২, ৪। কার্বন একটি অধাতু এবং এর যোজনী হলো 4। এটি প্রধানত সমযোজী বন্ধন গঠন করে। কার্বন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক পদার্থ, কারণ জীবজগৎ প্রধানত কার্বন এর যৌগসমূহ দ্বারা গঠিত। এছাড়া কার্বন যৌগের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বেশি। অন্য সকল মৌল দ্বারা গঠিত যৌগসমূহের চেয়ে কার্বন যৌগের সংখ্যা বহুগুণ বেশি।

প্রকৃতিতে কার্বন পরমাণু মুক্ত ও যৌগ উভয় অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকে। মুক্ত অবস্থায় কার্বন পরমাণু বিভিন্ন রকম রাসায়নিক কাঠামো ও ভৌত রূপে থাকতে পারে এবং এর ফলে কার্বনের বিভিন্ন প্রকার রূপভেদ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এই বিভিন্ন রূপভেদে কার্বনের অস্তিত্বকেই কার্বনের বহুরূপতা বলা হয়। কার্বনের রূপভেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হীরা বা ডায়মণ্ড এবং গ্রাফাইট। এছাড়া আকারহীন কার্বনও প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। কার্বনের অন্যান্য উৎস হচ্ছে কয়লা, কাঠ কয়লা, প্রাণিজ কয়লা, ভুসা কয়লা ও গ্যাস কার্বন। এরা অতি ক্ষুদ্র গ্রাফাইট কণা দ্বারা গঠিত। কার্বনের বহুরূপতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো হীরক ও গ্রাফাইটের গঠন।

ডায়মন্ড বা হীরার গঠন : হীরার গঠনে কার্বনের চারটি যোজ্যতাই ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি কার্বন পরমাণু একটি সুষম চতুস্তলকের কেন্দ্রে অবস্থিত থেকে এর চারদিকে চতুস্তলকের চারটি কোণে অবস্থিত অপর চারটি কার্বন পরমাণুর সাথে তাদের যোজ্যতা ইলেকট্রনের মাধ্যমে শক্তিশালী সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করে। এভাবে অসংখ্য কার্বন পরমাণু পরস্পরের সাথে বন্ধনযুক্ত হয়ে অতি বৃহৎ একটি অণু গঠন করে। প্রকৃতপক্ষে এক একটি হীরক খণ্ড এক একটি অতি বৃহৎ অণু। হীরক অত্যন্ত শক্ত, প্রকৃতপক্ষে সকল বস্তুর মধ্যে কঠিনতম। গলনে সমযোজী বন্ধন ছিন্ন করতে হয় বলে হীরকের গলনাঙ্ক খুবই বেশি। হীরক বিদ্যুৎ পরিবহন করে না।

যেমন– একে বায়ুতে অন্তত 900°C উত্তপ্ত করলে তবেই জারিত হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$C(s) + O_2(g) = CO_2(g)$$

নিচে হীরকের গঠন চিত্র দেয়া হলো :

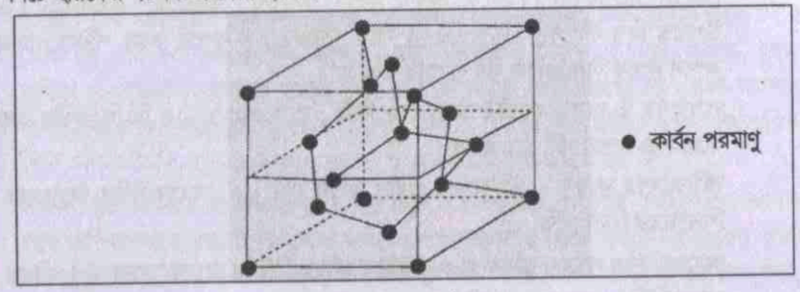

চিত্র : ডায়মন্ডের গঠন

গ্রাফাইটের গঠন : গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুসমূহ সমতলীয় স্তরাকারে অবস্থিত। প্রতিটি কার্বন পরমাণু অপর তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে। আবার ছয়টি কার্বন পরমাণু একটি সুষম ষড়ভুজের সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রতিটি স্তরে একটি ষড়ভুজী জালের সৃষ্টি করে। স্তরসমূহের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন না থাকায় এরা একে অন্যের উপর দিয়ে চলাচল করতে পারে। এ কারণে গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি পরমাণুর চারটি যোজ্যতা ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। অপর ইলেকট্রনগুলো মোটামুটি মুক্ত থাকে। এ মুক্ত ইলেকট্রনগুলো গ্রাফাইটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে। ফলে গ্রাফাইটই একমাত্র অধাতু যা বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। নিচে গ্রাফাইটের গঠন চিত্র দেয়া হলো :

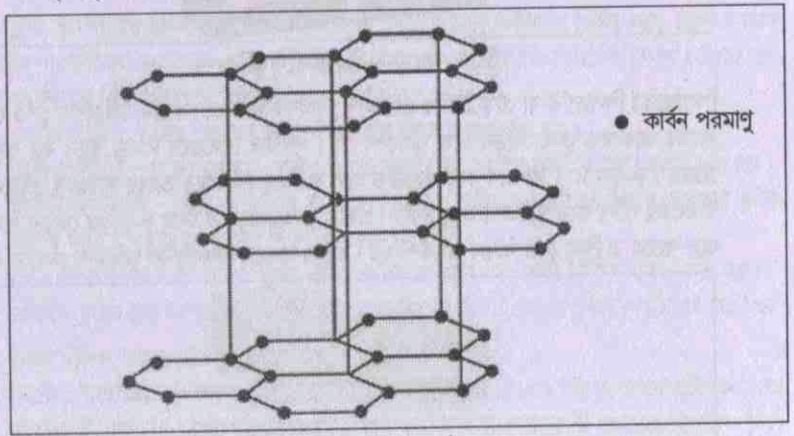

চিত্র : গ্রাফাইটের গঠন

গ. ভূমিকম্পের কারণগুলো কি কি? ৪

উত্তর : ভূমিকম্প (Earthquake) : ভূ-অভ্যন্তরে দ্রুত বিপুল শক্তি বিমুক্ত হওয়ায় পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। একটি শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটি পানিতে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তা পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও ভূ-অভ্যন্তরে যেখানে শক্তি বিমুক্ত হয় সেখান থেকে পানির ঢেউয়ের

মতো শিলায় ঢেউ বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-অভ্যন্তরে যেখানে শক্তি বিমুক্ত হয় তাকে কেন্দ্র (Centre) বলা হয়। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থ বিন্দু উপকেন্দ্র (Epicentre) নামে পরিচিত। ভূ-কম্পন তরঙ্গ পরিমাপের জন্য ভূ-কম্পন লিখন সিসমোগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

সাধারণত ভূ-পৃষ্ঠের অগভীর তলদেশ ৫ কিমি. থেকে প্রায় ১,১২৬ কি.মি. গভীর অভ্যন্তরের মধ্যেই ভূ-কম্পন সৃষ্টি হয়ে থাকে।

ভূমিকম্পের কারণ : ভূমিকম্পের প্রধান কারণ দুটি : ১. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও ২. শিলাস্তরের শিলা চ্যুতি

আগ্নেয়গিরির কারণে ভূমিকম্প : পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক সুপ্ত, জীবন্ত ও মৃত আগ্নেয়গিরি। এসব আগ্নেয়গিরির লাভা প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ভূ-অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি করে। এ চাপ থেকে হঠাৎ যে কোনো সময় অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ ছাড়া আগ্নেয়গিরির লাভা প্রচণ্ড শক্তিতে ভূ-অভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসার সময়েও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। চিত্রের মাধ্যমে আগ্নেয়গিরির কারণে ভূমিকম্প দেখানো হলো :

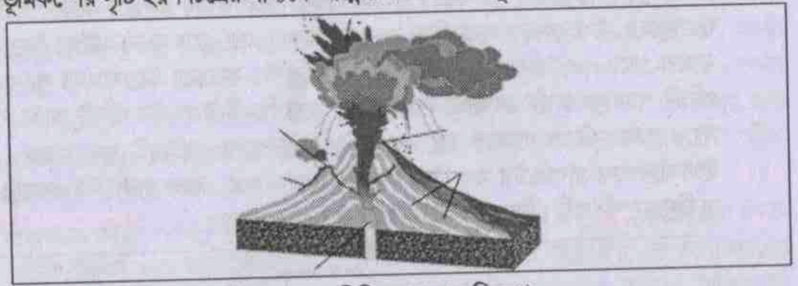

চিত্র : আগ্নেয়গিরির কারণে ভূমিকম্প

শিলাস্তরের শিলাচ্যুতি বা টেকটোনিক ভূমিকম্প : ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ভিত্তিশিলা চ্যুতি বা ফাটল বরাবর আকস্মিক ভূ-আলোড়ন হলে ভূমিকম্প হয়। পৃথিবীর শিলাস্তরে বিভিন্ন স্থানে বড় বড় ফাটল রয়েছে। ভূ-ত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ভূ-নিম্নস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টির ফলে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এছাড়া ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-ত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলা চ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়। চিত্রের মাধ্যমে টেকটোনিক ভূমিকম্প দেখানো হলো :

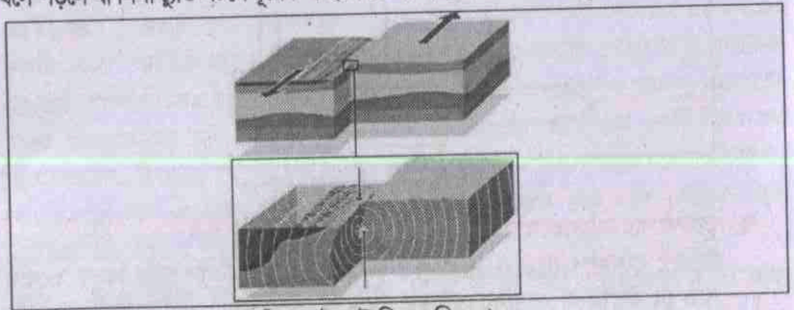

চিত্র : টেকটোনিক ভূমিকম্প

এছাড়াও সুনামি, জলোচ্ছ্বাস ও হ্যারিকেনের ফলে কিংবা হঠাৎ পাহাড় ধ্বসের কারণে ভূমিকম্প হতে পারে।

ঘ. ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন। ৪

উত্তর : ব্লাড ক্যান্সার : ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া (Leukemia) রক্ত যে সব কোষ দিয়ে তৈরি হয় সেই কোষকলার নাম ক্যান্সার। রক্ত কোষগুলো যেমন– লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা প্রধানত হাড়ের মজ্জা বা বোন ম্যারো থেকে উৎপন্ন হয়। ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়ার ক্ষেত্রে রক্তের শ্বেত কণিকা তৈরিতে সমস্যা দেখা দেয়। রক্তে অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকা তৈরি হতে থাকে ফলে রক্তের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়।

লক্ষণ : ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া লক্ষণ প্রধানত নির্ভর করে রক্তে কি পরিমাণ অস্বাভাবিক শ্বেত কণিকা আছে তার উপর। তবে সাধারণ লক্ষণের মধ্যে আছে শরীরের গ্রন্থিগুলো ফুলে যাওয়া, দীর্ঘমেয়াদি রাত্রিকালীন জ্বর, শারীরিক দুর্বলতা, মাড়ি, নাক বা ত্বক দিয়ে রক্ত পড়া, হাড়ের গিরাগুলোতে ব্যথা এবং ফুলে যাওয়া।

কারণ : ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়ার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিয়েশন, অতিরিক্ত এক্সরে গ্রহণ, বেনজিন, ধূমপান, ভাইরাস (HLV1) এবং বংশগত কারণে এটি হয় বলে ধারণা করা হয়।

প্রকারভেদ : ব্লাড ক্যান্সারের মাত্রা ও রোগের অবস্থার উপর ভিত্তি করে একে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. একিউট লিম্ফোসাইটিক লিউকিমিয়া (Acute Lymphocytic Leukemia — ALL)
২. ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকিমিয়া (Chronic Lymphocytic Leukemia— CLL)
৩. একিউট মেলোজেনাস লিউকিমিয়া (Acute Myelogenous Leukemia— AML)
৪. ক্রনিক মেলোজেনাস লিউকিমিয়া (Chronic Myelogenous Leukemia— CML)

ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা : ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়ার চিকিৎসা নির্ভর করে রোগীর বয়স, কোন ধরনের ক্যান্সার, ক্যান্সার ছড়িয়ে গেছে কিনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর। নিম্নে ব্লাড ক্যান্সারের কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো :

কেমোথেরাপি – কিছু ওষুধের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

রেডিওথেরাপি – যন্ত্রের মাধ্যমে রেডিও ওয়েভ ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়।

ইমিউনোথেরাপি – এটি সর্বাধুনিক ও নতুন পদ্ধতি। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার কৃত্রিম উন্নতি ঘটিয়ে ক্যান্সার কোষের বিরুদ্ধে লড়াই করা হয়।

বোন ম্যারো ট্রান্সফার – হাড়ের মজ্জা প্রতিস্থাপন করে নতুন রক্ত কোষ তৈরির ব্যবস্থা করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকিমিয়া সনাক্ত করা সম্ভব হলে এ রোগ সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

ঙ. ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক পদার্থ বলতে কি বুঝায়? ৪

উত্তর : ডায়াচৌম্বক পদার্থ (Diamagnetic Substance) : যে সব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে ঐ পদার্থের মধ্যে দুর্বল চুম্বকত্বের সৃষ্টি হয় এবং চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের বিপরীত দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে তাদেরকে ডায়াচৌম্বক পদার্থ বলে।

যখন কোনো ডায়াচৌম্বক পদার্থকে বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করা হয়, তখন দেখা যায় ডায়াচৌম্বক পদার্থটির অভ্যন্তরে চৌম্বকক্ষেত্র বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে সামান্য কম হয়। কোনো ডায়াচৌম্বক পদার্থকে কোনো অসম চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে, এটি চৌম্বকক্ষেত্রের সবলতার অঞ্চল থেকে দুর্বলতর অঞ্চলের দিকে গতিশীল হতে চায়। প্রযুক্ত চৌম্বকক্ষেত্র খুবই শক্তিশালী না হলে ডায়াচৌম্বক প্রভাব এত অল্প হয় যে তা ধরাই যায় না।

ডায়াচৌম্বক পদার্থের আচরণ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে না। তামা, দস্তা, বিসমাথ, রূপা, সোনা, সীসা, কাচ, মার্বেল, পানি, এলকোহল, হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি ডায়াচৌম্বক পদার্থের উদাহরণ।

প্যারাচৌম্বক পদার্থ (Paramagnetic Substance) : যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করা হলে চুম্বকায়নকারী ক্ষেত্রের দিকে সামান্য চুম্বকত্ব লাভ করে তাদেরকে প্যারাচৌম্বক পদার্থ বলে। যখন কোনো প্যারাচৌম্বক পদার্থকে বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করা হয়, তখন দেখা যায়, প্যারাচৌম্বক পদার্থটির অভ্যন্তরে চৌম্বকক্ষেত্র বাহ্যিক চৌম্বকক্ষেত্রের চেয়ে সামান্য বড় হয়। কোনো প্যারাচৌম্বক পদার্থকে অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে সেটি চৌম্বক ক্ষেত্রের দুর্বলতর অঞ্চল থেকে সবলতর অঞ্চলের দিকে গতিশীল হতে চায়– যা ডায়াচৌম্বক পদার্থের উল্টো। প্যারাচৌম্বক পদার্থের আচরণ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। এক্ষেত্রেও কেবল শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র প্রযুক্ত হলেই প্যারাচৌম্বক প্রভাব দৃশ্যমান হয়। কয়েকটি প্যারাচৌম্বক পদার্থ হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম, এন্টিমনি, প্লাটিনাম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, তরল অক্সিজেন প্রভৃতি।

২ ক. **নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির উৎস কোনগুলো? এদের ব্যবহার উল্লেখ করুন।** $2\frac{1}{2}$

উত্তর : নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির উৎস : শক্তি বা জ্বালানির যে উৎস প্রকৃতিতে অফুরান ও পরিবেশের সাথেই মিশে আছে এবং যা শক্তিরূপে প্রকৃতিতে অনুভব করা যায় সেসব শক্তিকে জ্বালানি রূপে ব্যবহার ও এ সংক্রান্ত প্রযুক্তিই হলো নবায়নযোগ্য জ্বালানি। বর্তমানে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পোন্নয়নের ফলে এই জ্বালানির চাহিদা দেশে দেশে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন নতুন বিকল্প জ্বালানির উৎসের সন্ধান চলছে। এরই প্রেক্ষিতে বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও এর উৎস বিশেষ করে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হলো : সূর্য হতে সৌরশক্তি, পানি থেকে সমুদ্রের স্রোতশক্তি, সৌরতাপ থেকে তাপশক্তি, বায়োমাস বা মৃত জীবজন্তু থেকে প্রাপ্ত গ্যাসীয় জ্বালানি এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রাপ্ত ভূ-তাপশক্তিও জৈব জ্বালানি।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির ব্যবহার :

১. সৌরশক্তি নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রধান উৎস। সৌরশক্তি ও সৌরতাপ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ব্যবহার করা হচ্ছে।
২. সমুদ্রের বাতাসকে কাজে লাগিয়ে বায়ুকল বা Wind Mill-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে।
৩. বায়ো ফুয়েল বা জৈব জ্বালানি এবং তরল হাইড্রোজেন মোটরগাড়ি ও ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাচ্ছে।
৪. সমুদ্রের ঢেউ ও জোয়ার ভাটাকে কাজে লাগিয়েও জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।
৫. মৃত জীবজন্তু ও বায়োমাস থেকে যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তা জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

খ. **আর্সেনিক কি? পানিতে কিভাবে আর্সেনিক দূষণ ঘটে?** $2\frac{1}{2}$

উত্তর : আর্সেনিক : আর্সেনিক একটি মৌলিক পদার্থ। এর রাসায়নিক সংকেত As এবং পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩। আর্সেনিকের কিছু ধর্ম ধাতুর মতো আবার কিছু বৈশিষ্ট্য অধাতুর মতো। এজন্য আর্সেনিককে অপধাতু বলা হয়। আর্সেনিক পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আর্সেনিক একটি স্ফটিক আকারের ধাতব মৌল, যা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে বহুবিস্তৃত। এটি নানাবিধ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য মৌলের সঙ্গে যৌগ উৎপন্ন করতে সক্ষম। সে কারণে আর্সেনিক ২০০টিরও অধিক খনিজ পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান, যাদের মধ্যে আর্সেনোপাইরাইট অন্যতম।

পানিতে আর্সেনিক দূষণ : অতি উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক রয়েছে এমন ভূ-গর্ভ স্তরের কূপ খননের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ আর্সেনিক যৌগ ভূ-পৃষ্ঠে উত্তোলন করা হচ্ছে, এবং এটি মূলত পানি পান করাসহ নানা কাজে ব্যবহারের সাথে সাথে পানিতে মিশে প্রকৃতিতে পরিবাহিত হচ্ছে। এছাড়া ধাতব আকরিক গলানো বা কয়লা দহনের মাধ্যমে আর্সেনিক বাতাসে মিশে যাচ্ছে। পরবর্তীতে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তা ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-মধ্যস্থ জলাশয়ে চলে যাচ্ছে। প্রধানত খাবার পানির মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর্সেনিকের সংস্পর্শে আসছে। ভূ-গর্ভস্থ পানিতে অজৈব আর্সেনিক সচরাচর আর্সেনেট (যোজনী ৫) ও আর্সেনাইট (যোজনী ৩) হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এদের মধ্যে শেষোক্তটি অধিক বিষাক্ত। অধিক পরিমাণে ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন, বৈশ্বিক জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কম বৃষ্টিপাতের ফলে পানির স্তর উঠানামা করা এবং নলকূপ বসানোর জন্য শত-সহস্রবার ভূ-পৃষ্ঠে গর্ত করায় ভূ-অভ্যন্তরে বায়ু প্রবেশ করে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ বায়ুবিহীন পরিবেশ বায়ুবাহিত অক্সিজেনের সংস্পর্শে এসে আর্সেনোপাইরাইটকে জারিত করে এবং পানির স্তরে আর্সেনিক বিমুক্ত করে। এই আর্সেনিকযুক্ত পানির স্তর অপর পানির স্তরের সাথে মিশে সেটিও দূষণ করে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭০ লাখ মানুষ অধিক মাত্রায় আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর গ্রহণযোগ্য আর্সেনিক মাত্রা প্রতি মিলিমিটার পানিতে ০.০১ mg আর বাংলাদেশ সরকারের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০৫ mg।

গ. **শব্দ দূষণ কি? এর ফলে কি কি ক্ষতি সাধিত হয়?** $2\frac{1}{2}$

উত্তর : শব্দ দূষণ : শব্দ এক প্রকার শক্তি। শব্দের সাহায্যেই আমরা পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করি। পাখির কলতান বা পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা সঙ্গীতের মধুর আওয়াজ যেমন আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করে তেমনি গোলমাল বা হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ মনকে শ্রান্ত করে এবং অনেক সময় আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই পরিবেশের শব্দ দূষণ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ধারণ ক্ষমতা ৪৫-৫৫ ডেসিবেল। কিন্তু আমরা আমাদের কানের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার চেয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ থেকে ৫০ গুণ বেশি শব্দ শুনি।

শব্দ দূষণের ফলে ক্ষতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যদি টানা ৮ ঘণ্টা আমরা ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন শুনি, তাহলে ২৫ বছরের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের বধির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কম আসে, মেজাজ খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া ক্রমাগত শব্দ দূষণের ফলে মানুষ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক এমনকি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

ঘ. **এলপিজি (LPG)-এর পূর্ণরূপ কি? এর মধ্যে প্রধান গ্যাসগুলো কি কি?** $2\frac{1}{2}$

উত্তর : এলপিজি (LPG) : এলপিজি (LPG)-এর পূর্ণ অর্থ হলো Liquified Petroleum Gas বা তরলীকৃত পেট্রোল গ্যাস। এটি গ্যাস জার কিংবা সিলিন্ডারের মাধ্যমে যে কোনো স্থানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব এবং ব্যবহারের দিক দিয়েও অন্যান্য জ্বালানি অপেক্ষা নিরাপদ ও সাশ্রয়ী। এটি রান্নার কাজে, উত্তাপ, রেফ্রিজারেশন ও বিদ্যুতায়নের কাজেও ব্যবহার করা হয়।

এলপিজি-এর প্রধান গ্যাস : এলপিজি-এর প্রধান গ্যাস প্রোপেন (C_3H_8), বিউটেন (C_4H_{10}) এবং প্রোপেন-বিউটেন মিশ্রণ। প্রোপেন ও বিউটেনের উপাদান হলো কার্বন ও হাইড্রোজেন। এগুলো জৈব যৌগের অধিভুক্ত।

৩. ক. অ্যানজিন্‌স (Angins) বলতে কি বুঝায়? পেসমেকার (Pacemaker) কি? ২½

উত্তর : অ্যানজিন্‌স (Angins) : করোনারি ধমনীতে প্ল্যাক (Plaque) বা চর্বির আস্তরণ জমে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে বা হৃদপেশিতে সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হলে মানবদেহে, বুকে এক ধরনের অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভূত হয়, একেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যানজিন্‌স (Angins) বলা হয়। অ্যানজিন্‌স অবস্থায় বুকে চাপ অনুভূত হয় এবং হৃৎপেশি সংকুচিত হয়ে আসছে বলে মনে হয়। এর কারণে কাধ, গলা, ঘাড়, চোয়াল, হাতের বাহু এমনকি পিঠেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। অ্যানজিনস কোনো রোগ নয় বরং রোগের উপসর্গ মাত্র। হৃদরোগের উপসর্গ হিসেবে অ্যানজিন্‌স আবির্ভূত হয় এবং পরবর্তীতে হার্ট অ্যাটাক এর সম্ভবনা সৃষ্টি হয়। অ্যানজিনস্ সাধারণত তিন প্রকার– ১. স্থায়ী (stable), ২. অস্থায়ী (unstable) ও ৩. পরিবর্তনশীল (variant)।

পেসমেকার (Pacemaker) : হৃদরোগের কারণে যখন মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ স্বাভাবিক গতিতে (প্রতি মিনিটে ৭০-৭২ বার) আর হয় না, তখন অস্ত্রপচার বা অপারেশনের মাধ্যমে ছোট একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র বুকের চামড়ার নিচে স্থাপন করা হয় যা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণ গতিকে কৃত্রিমভাবে বজায় রাখে, এই যন্ত্রটিকে পেসমেকার (Pacemaker) বলা হয়।

কৃত্রিমভাবে বৈদ্যুতিক স্পন্দন পেসমেকার সৃষ্টি করতে সক্ষম যা হৃৎযন্ত্রের স্বাভাবিক সংকোচন-প্রসারণ গতিকে বাইরে থেকে শক্তি প্রদান করে গতিশীল রাখে। অ্যারিদমেইস (Arrhythmais) বা অস্বাভাবিক হৃৎসঞ্চালন এর চিকিৎসায় পেসমেকার এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। অ্যারিদমেইস হলো এমন এক রোগ যা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সংকোচন প্রসারণ গতিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। হৃৎপিণ্ডের অতিদ্রুত সংকোচন-প্রসারণ গতিকে বলা হয় টেকিকার্ডিয়া (Techycardia) আর অতিধীর গতির সংকোচন-প্রসারণকে বলা হয় ব্রেডিকার্ডিয়া (Bradycardia)। ওপেনহার্ট সার্জারী বা হার্ট অ্যাটাকের পর এ ধরনের সমস্যা হতে পারে এবং তখন পেসমেকার স্থাপন করে সমস্যা সমাধান করা হয়। ১৯৩২ সালে আমেরিকান শরীরবিদ্যা বিশারদ অ্যালবার্ট হাইম্যান নিজের হাতে স্প্রিং ও বৈদ্যুতিক মোটর ব্যবহার করে এক ধরনের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্র তৈরি করেন যা কৃত্রিমভাবে মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন প্রসারণে সাহায্য করতে সক্ষম। অ্যালবার্ট হাইম্যানের যন্ত্রটিই আধুনিক পেসমেকারের সূত্রপাত ঘটায়।

খ. ফরমালিন বলতে কি বুঝায়? এটি কি কাজে ব্যবহার করা হয়? ২½

উত্তর : ফরমালিন : ফরমালিন হলো মিথান্যাল তথা ফরমালডিহাইড (H-CHO)-এর একটি জৈব যৌগ যা পচন নিবারক দ্রবণ হিসেবে কাজ করে। সাধারণ অবস্থায় মিথান্যাল গ্যাসীয় তবে পানিতে অত্যন্ত দ্রবনীয়। মিথান্যাল থেকে উৎপন্ন মিথান্যাল গ্যাসকে পানির মধ্যে দ্রবীভূত করে 30-40% জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হয়। মিথান্যালের এ 30-40% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলা হয়।

ফরমালিনের ব্যবহার :

১. ফরমালিন একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক।
২. পরীক্ষাগারে জীববিজ্ঞানের নমুনা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
৩. মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যও ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।
৪. চামড়া সংরক্ষণেও ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

গ. হরমোন কি? মানবদেহে হরমোনের কাজ উল্লেখ করুন। ২½

উত্তর : হরমোন (Hormone) : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে দেহের দূরবর্তীস্থানে পৌছে নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে এবং ক্রিয়া শেষে নিজে নিঃশেষ হয়ে যায় তাকে হরমোন বলে। হরমোন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কম বা বেশি পরিমাণে নিঃসৃত হলে স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত ঘটে এবং নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়।

মানবদেহে হরমোনের কাজ : মানুষের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য দুটি হরমোন প্রধান ভূমিকা পালন করে। এগুলো হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত গ্রোথ হরমোন (Growth Hormone—GH) এবং থাইরয়েড গ্রন্থি ক্ষরিত থাইরক্সিন হরমোন (Thyroxine Hormone—TH)। মানুষের দৈহিক বৃদ্ধিতে এ দুটি হরমোন নিম্নলিখিত কাজগুলো করে :

১. কঙ্কালতন্ত্রের বৃদ্ধি, তরুণাস্থির বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তিতে এ হরমোন ভূমিকা রাখে।
২. এটি কোষের অ্যামিনো অ্যাসিড গ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণের হার বৃদ্ধি করে।
৩. গ্রোথ হরমোন দেহে বিভিন্ন আয়নের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
৪. গ্রোথ হরমোন মস্তিষ্ক ব্যতীত দেহের সকল নরম অঙ্গাদির আকার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
৫. এটি অধিক দুগ্ধ উৎপাদনে স্তনগ্রন্থিকে প্রভাবিত করে।
৬. লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

ঘ. ভিটামিন 'এ' ও 'কে'-এর কাজ কি? ২½

উত্তর : ভিটামিন 'এ' এর কাজ :

১. দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক রাখে।
২. ত্বক বা শ্লেষ্মা ঝিল্লিকে সুস্থ রেখে দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে রক্ষা করে।
৩. খাদ্যবস্তু পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্রেক করতে সাহায্য করে।
৪. রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।
৫. দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ভিটামিন 'কে'-এর কাজ :

১. রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। কেটে গেলে ভিটামিন 'কে' এর জন্যই রক্ত পড়া বন্ধ হয়।
২. অস্থিতে ক্যালসিয়াম জমা করে হাড়কে মজবুত করে।
৩. শিশুদের নতুন হাড় বিকাশে সহায়তা করে।
৪. ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করতে সহায়তা করে।

৪. ক. সাবমেরিন ক্যাবল কি? এর কাজ কি? ২½

উত্তর : সাবমেরিন ক্যাবল : সাবমেরিন ক্যাবল হলো সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে একদেশ থেকে অন্য দেশে টেলিযোগাযোগের জন্য স্থাপিত ক্যাবল বা তার। মূলত সাবমেরিন ক্যাবলে অনেকগুলো যোগাযোগ ক্যাবল এক সাথে বান্ডেল আকারে এক দেশের ল্যান্ডিং স্টেশনের সাথে অন্য দেশের ল্যান্ডিং স্টেশনকে যুক্ত করে।

সর্বপ্রথম যে সাবমেরিন ক্যাবল ইংলিশ চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছিল তা ছিল মূলত টেলিগ্রাফিক ক্যাবল। পরবর্তীতে সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে টেলিযোগাযোগ সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং বর্তমানে ডেটা কমিউনিকেশন তথা ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থায় সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে সকল সাবমেরিন ক্যাবলে অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আলোর গতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়। এসব ক্যাবল সাধারণত ৬৯ মিলিমিটার ব্যাস এবং প্রতি মিটারে ১০ কেজি ভর বিশিষ্ট।

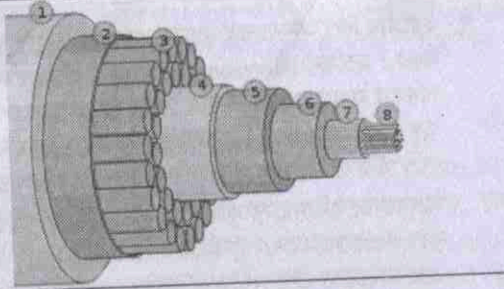

চিত্র : সাবমেরিন ক্যাবল

সাবমেরিন ক্যাবলের কাজ :

১. দুটি দেশের বা স্থানের ল্যান্ডিং স্টেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।
২. আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় মেরুদণ্ড (Backbone) হিসেবে কাজ করে।
৩. ডেটা কমিউনিকেশন তথা ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে।
৪. আলোর গতিতে অতি সহজে তথ্য আদান-প্রদান করে।
৫. পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি তাই অন্যান্য প্রযুক্তির চেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধবভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে।

খ. শুষ্ককোষ কি? দুটি শুষ্ক কোষের নাম লিখুন।

উত্তর : শুষ্ককোষ (Drycell) : টর্চ লাইট ও ট্রানজিস্টার রেডিওতে আজকাল প্রচুর ড্রাইসেল ব্যবহৃত হয়। এতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থসমূহ তরল অবস্থায় থাকে না। তাই একে 'ড্রাই সেল' বা 'শুষ্ক বিদ্যুৎকোষ' বলা হয়।

একটি দস্তার চোঙে নিশাদল, কয়লার গুঁড়া এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণের সাথে সামান্য পানি মিশিয়ে 'লেই' তৈরি করে দস্তার চোঙের মধ্যে ভর্তি করা হয়। চোঙের মধ্যে একটি কার্বন দণ্ড এমনভাবে বসানো হয় যাতে তা চোঙটি স্পর্শ করতে পারে। কার্বন দণ্ডের মাথায় টুপি বসানো থাকে। বিদ্যুৎ কোষটির উপরিভাগে কার্বন দণ্ডের চারপাশে গালা বা পীচের স্তর থাকে। দস্তার চোঙটির বাইরে একটি শক্ত কাগজের চোঙ থাকে। এ বিদ্যুৎ কোষে দস্তার চোঙটি ঋণ-মেরু এবং কার্বন দণ্ডের উপরিভাগ ধন-মেরু হিসেবে কাজ করে।

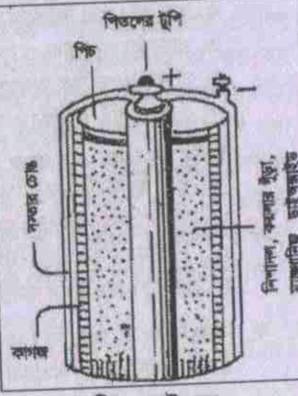

চিত্র : ড্রাইসেল

দুটি শুষ্ককোষ : দুটি শুষ্ককোষ হলো : ১. ড্যানিয়েল সেল, ২. ল্যাকলেন্স সেল।

গ. চুম্বক তৈরি করা যায় এমন ধাতুগুলো কি কি? চুম্বকের দুটি প্রয়োগের নাম লিখুন। ২$\frac{১}{২}$

উত্তর : চৌম্বক পদার্থ : যেসব পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে এবং যাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায় তাদেরকে চৌম্বক পদার্থ বলে। সাধারণত বিভিন্ন ধাতু চৌম্বক পদার্থের গুণসম্পন্ন। তবে চুম্বক তৈরি করা যায় এমন ধাতু হলো : লোহা (Fe), নিকেল (Ni), কোবাল্ট (Co) এবং লোহার সংকর ধাতু পারমালয় (Permalloy)।

চুম্বকের দুটি প্রয়োগ :

১. বিদ্যুৎ চুম্বক তৈরি করতে, মোটর, জেনারেটর, ট্রান্সফরমার ইত্যাদি তৈরিতে চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
২. চৌম্বকের দিক নির্দেশক ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রে বা মরুভূমিতে দিক নির্ণয় করা হয়।

ঘ. কি কি কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হয়? ২$\frac{১}{২}$

উত্তর : বিদ্যুতের সিস্টেম লসের কারণ : বাসগৃহে আমাদের আরামের জন্য অনেক মূল্যবান বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রপাতি বসানো থাকে যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি এনে দেয়। বিদ্যুৎ আমাদের অতি প্রয়োজনীয় সম্পদ। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ও কলকারখানায় বিদ্যুতের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ এর উৎপাদন সীমিত ও ব্যয়বহুল। বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারে অমিতব্যয়ী হলে, বিদ্যুৎ অবৈধভাবে ব্যবহার করলে ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সময় ত্রুটির কারণে বিদ্যুৎ শক্তি অপচয় হলে তাকে বিদ্যুতের সিস্টেম লস (System Loss) বলা হয়।

নিচে বিদ্যুতের সিস্টেম লসের কারণগুলো উল্লেখ করা হলো :

১. প্রতিদিন গৃহে অপ্রয়োজনে লাইট, ফ্যান চালিয়ে রাখলে।
২. হিটার, কুকার, মাইক্রোওয়েভ ওভেনের বহুল ব্যবহার।
৩. বিদ্যুৎ সংযোগের কোথাও কোনো লিকেজ সৃষ্টি হলে।
৪. ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুতের খরচ বেশি হয় ও সিস্টেম লস হয়।
৫. বেআইনিভাবে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যবহার করলে।
৬. যথোপযুক্ত পরিবাহী তার ব্যবহার না করা হলে।
৭. শর্ট সার্কিট সৃষ্টি হলে।

৫. ক. আলোর বিচ্ছুরণ ও বর্ণালী বর্ণনা করুন। সৌর বর্ণালী কি? ৫

উত্তর : আলোর বিচ্ছুরণ : কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলো থেকে মূল বর্ণের আলো পাওয়ার পদ্ধতিকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

১৬৬৬ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন একটি সহজ পরীক্ষার সাহায্যে সর্বপ্রথম আলোর বিচ্ছুরণ আবিষ্কার করেন। তিনি তার ঘরের জানালায় একটি ছিদ্র করে এই পরীক্ষা করেন। অন্ধকার ঘরে জানালার এই ছোট ছিদ্র দিয়ে সূর্যালোক বিপরীত দিকে দেওয়ালের উপর পড়ে। এখন আলোর গতিপথে একটি প্রিজম স্থাপন করে তিনি দেওয়ালে সাদা আলোর পরিবর্তে সাতটি রঙ দেখতে পান। সাতটি রঙের এই পট্টিকে নিউটন বর্ণালী আখ্যা দেন। বর্ণালীতে তিনি বেগুনী (Violet), নীল (Blue), আসমানী (Indiga), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red) এ সাতটি রঙ পর পর দেখতে পান। বর্ণালী থেকে দেখা যায়, লাল রঙের আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে কম এবং বেগুনী আলোর বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশি।

বর্ণালী : যৌগিক আলোর বিচ্ছুরণের ফলে মূল বর্ণগুলোর যে সজ্জা বা পট্টি পাওয়া যায়, তাকে বর্ণালী বা Spectrum বলে।

শূন্য মাধ্যমে সবকটি বর্ণের আলোক রশ্মি একই বেগে চলে। কিন্তু অন্য যে কোনো মাধ্যমে এক এক বর্ণের আলোর বেগ এক এক রকমের হয়। যেমন কাচের মধ্যে লাল রঙের আলোর বেগ, বেগুনী রঙের আলোর বেগের প্রায় ১.৮ গুণ বেশি। তাই বেগুনী আলো সবচেয়ে বেশি এবং লাল আলো সবচেয়ে কম বাঁকে। ফলে বর্ণালী উৎপন্ন হয়। এ কারণে একই মাধ্যমের প্রতিসারণাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন রঙের জন্য বিভিন্ন হয়। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন বর্ণের আলোর জন্য মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের বিভিন্নতার জন্য বর্ণালী উৎপন্ন হয়।

সৌর বর্ণালী : সূর্যের আলো থেকে আমরা যে বর্ণালী পাই তাকে সৌর বর্ণালী বলে। সৌর বর্ণালী সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করলে একে সাতটি বর্ণের অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী মনে হয়। কিন্তু বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা সৌর বর্ণালীকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ঐ বর্ণালীতে অসংখ্য কালো রেখা রয়েছে। এই কালো রেখাগুলোর অবস্থান সুনির্দিষ্ট। এ থেকে বলা যায়, সৌর বর্ণালী প্রকৃতপক্ষে কালো রেখা শোষণ বর্ণালী। ১৮০২ সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ওল্যাস্টন সর্বপ্রথম এই রেখাগুলো লক্ষ্য করেন। পরে ১৮০৪ সালে জার্মান বিজ্ঞানী যোসেফ ভন ফ্রনহফার এ রেখাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন। সে জন্য এই রেখাগুলোকে ফ্রনহফার রেখা (Fraunhoffer Line) বলে। সৌর বর্ণালীতে প্রায় সাতশত কালো রেখা পাওয়া গেছে।

খ. মাল্টিমিটার কি? এর গঠন বর্ণনা করুন (চিত্রসহ)। ৫

উত্তর : মাল্টিমিটার (Multimeter) : মাল্টিমিটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যার সাহায্যে রোধ, কারেন্ট এবং ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায়। এটি অতি প্রয়োজনীয় একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে এসি এবং ডিসি উভয় ধরনের কারেন্ট এবং ভোল্টেজ মাপা যায়। একে AVO মিটারও বলা হয়। AVO তিনটি শব্দের [A = Ampere, V = Volt, O = Ohm] সংক্ষিপ্ত নাম।

মাল্টিমিটার সাধারণত দুই প্রকার : ১. এনালগ মাল্টিমিটার (Analog Multimeter), ২. ডিজিটাল মাল্টিমিটার (Digital Multimeter)

এনালগ মাল্টিমিটারের গঠন : এনালগ মাল্টিমিটারের একটি শলাকা টাইপের চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার থাকে। কুণ্ডলীটি একটি স্থায়ী চুম্বকের দুই মেরুর মাঝখানে থাকে। মিটারের নির্দেশক কাঁটা কুণ্ডলীর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্র স্থায়ী চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের সঙ্গে ক্রিয়া করে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এর ফলে কুণ্ডলী ঘুরে যায়; সেই সঙ্গে নির্দেশক কাঁটাটিও স্কেলের উপর বিক্ষেপ দেখায়। স্কেলের উপর এই বিক্ষেপের পরিমাণ থেকে I, V , এবং R-এর মান নির্ণয় করা হয়। মাল্টিমিটারে ব্যবহৃত গ্যালভানোমিটারটি বামে শূন্য ধরনের (Left zero type)। অর্থাৎ এটি যখন বর্তনীতে ব্যবহৃত না হয় তখন এর কাঁটা বামপ্রান্তে স্থির থাকে।

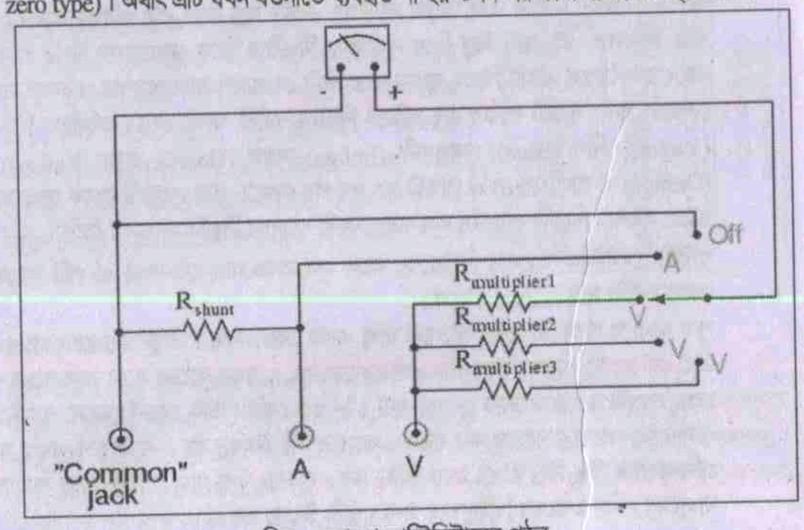

চিত্র : এনালগ মাল্টিমিটারের গঠন

ডিজিটাল মাল্টিমিটারের গঠন : ডিজিটাল মাল্টিমিটার মূলত প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ডের উপর বিভিন্ন ধরনের IC (Integrated Circuit) এবং LSIC (Large Scale Integration Circuit) ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক পার্টস বা কম্পোনেন্টস সমন্বয়ে গঠিত। মাল্টিমিটারের পর্দায় দেখার জন্য লাইট এমিটিং ডায়োড (LED) ব্যবহার করা হয়।

এনালগ মাল্টিমিটারের মতো এই মিটারেও সিলেকটর (Selector) সুইচ রয়েছে। সুইচ নব ঘুরিয়ে প্রয়োজনমতো কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স বা রোধ অংশে স্থাপন করা যায়।

প্রত্যেক অংশে আবার বিভিন্ন রেঞ্জ নির্দেশ দাগ কাটা রয়েছে। নির্দিষ্ট দাগে সুইচ নব স্থাপন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মিটার ঐ রেঞ্জের কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স (Resistance) পরিমাপ করতে পারে।

সাধারণত বহনযোগ্য বা পকেট ডিজিটাল মাল্টিমিটার কয়েকশো মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার থেকে কয়েক অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্ট, মিলিভোল্ট এবং কয়েক ওহম থেকে মেগাওহম (106Ω পর্যন্ত রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে পারে।

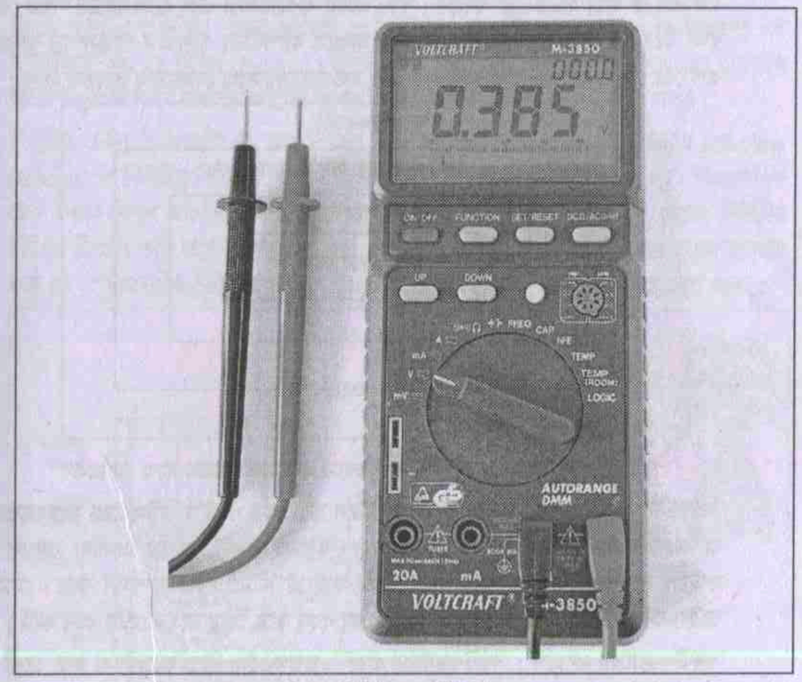

চিত্র : ডিজিটাল মাল্টিমিটার

৩১তম বিসিএস : ২০১১

প্রযুক্তি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : *প্রার্থীদিগকে ৬ নং প্রশ্নের উত্তর এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

৬. ক. কম্পিউটার সফটওয়্যার কি? সফটওয়্যারের প্রয়োগগুলো লিখুন। ৪

উত্তর : কম্পিউটার সফটওয়্যার : সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফটওয়্যার বলে।

হার্ডওয়্যার সত্যিকার অর্থে কম্পিউটিং-এর কাজ করে এবং সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারকে চালায়। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে কম্পিউটার গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান যন্ত্রে রূপ নেয়। চিত্রে কম্পিউটার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ দেখানো হলো :

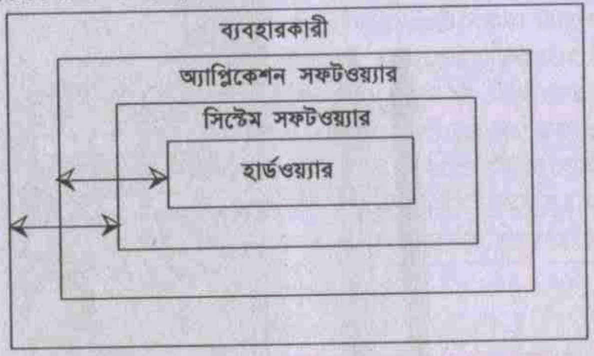

চিত্র : কম্পিউটার ব্যবহারকারী, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ

কম্পিউটার সফটওয়্যার মডিউল বা সাবমডিউলে রচিত হয়। এই মডিউলগুলো সংঘবদ্ধভাবে এক বা একাধিক ফাইল আকারে সংরক্ষিত থাকে। কাজেই একটি প্রোগ্রাম আলাদা আলাদা অনেক ফাইলে সংরক্ষিত থাকতে পারে। প্রত্যেকটি ফাইলই নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। যেমন কিছু ফাইল কম্পিউটারের জন্য নির্দেশ বা ইন্সট্রাকশন বহন করে, কিছু ফাইল ডেটা বহন করে।

সফটওয়্যারের প্রয়োগ : সফটওয়্যারের প্রধান প্রয়োগগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

অপারেটিং সিস্টেম : কম্পিউটারের সকল হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে। অপারেটিং সিস্টেমের অপর নাম সিস্টেম সফটওয়্যার।

অফিস প্রোগ্রাম : অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে অফিস প্রোগ্রাম সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। অফিস প্রোগ্রাম সফটওয়্যারে এক সাথে টাইপ করা, ডেস্কটপ পাবলিশিং, স্প্রেডশীট ও প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা থাকে।

রিজার্ভেশন সিস্টেম : আন্তর্জাতিক বিমান ব্যবস্থায় টিকেট কাটা ও আসন সংরক্ষণ এবং ফ্লাইটের শিডিউল ঠিক রাখতে রিজার্ভেশন সিস্টেম সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

কাস্টম সফটওয়্যার : বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের প্রয়োজনে অফিস ব্যবস্থাপনা ও পণ্য বিপণনের জন্য নিজেদের মতো কাস্টম সফটওয়্যার তৈরি করে।

খ. নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটর কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে? ৪

উত্তর : নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইউরেনিয়াম পরমাণু ব্যবহার করা হয়। প্রকৃতিতে দুই ধরনের ইউরেনিয়াম পরমাণু রয়েছে। একটি হলো ইউরেনিয়াম-২৩৫ (U-235) অন্যটি ইউরেনিয়াম-২৩৮ (U-238)। এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো একে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে পরমাণুটি প্রায় সমান দুই টুকরোয় বিভক্ত হয়, নির্গত হয় তিনটি নিউট্রন ও কিছু পরিমাণ শক্তি। নির্গত এই তিনটি নিউট্রন অন্য তিনটি ইউরেনিয়াম পরমাণুকে আঘাত করলে, তারা ভেঙে দু টুকরো হয় এবং নিউট্রন নির্গত হয় এবং তিনগুণ শক্তি নির্গত হয়। এভাবে পরমাণুর ভাঙন চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। একে চেইন বিক্রিয়া (Chain reaction) বা শৃঙ্খল বিক্রিয়া বলা হয়। এ বিক্রিয়া একবার শুরু হলে আপনা আপনি চলতে থাকে এবং নির্গত শক্তির পরিমাণ ও নিউট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিউক্লিয়াসের এই বিভাজনকে বলা হয় ফিশন (Fission)। ফিশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তি দিয়ে জেনারেটরের টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় এবং তা সরবরাহ লাইনের মাধ্যমে দূরদূরান্তে প্রেরণ করা হয়।

নিউক্লীয় চেইন বিক্রিয়াকে যে যন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তার নাম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর (Nuclear Reactor) বা নিউক্লীয় বিক্রিয়ক। একে পারমাণবিক চুল্লি নামেও অভিহিত করা হয়। পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক চুল্লি। এই চুল্লিতে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয়। এই তাপ বাষ্পীয় টার্বাইন ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। পারমাণবিক চুল্লি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি সরল চিত্র নিচে দেয়া হলো :

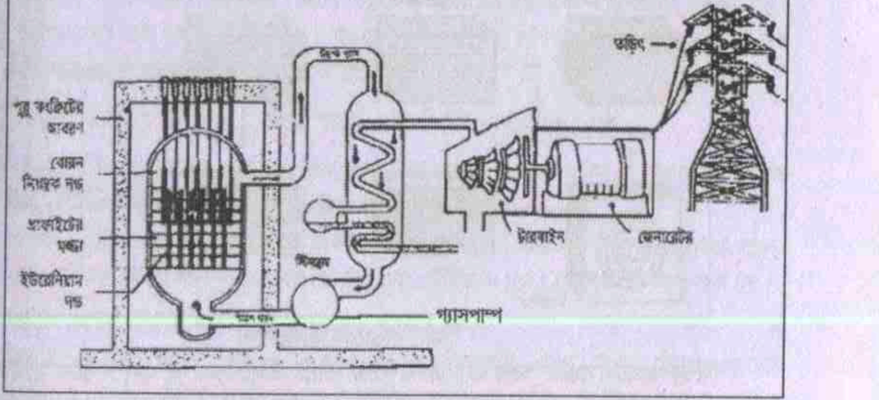

চিত্র : নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র। যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এই পাত্রের ভিতর থাকে গ্রাফাইটের ইট দিয়ে তৈরি মূল বস্তু বা মজ্জা (Core)। এই গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর খাড়াভাবে কতগুলো চ্যানেল বা খালি জায়গা থাকে। এই জায়গাগুলোতে

ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। খালি জায়গা ও ইউরেনিয়াম দণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে থাকে বোরন বা ক্যাডমিয়াম দণ্ড। ক্যাডমিয়াম বা বোরন দণ্ডকে চ্যানেলের বা খালি জায়গার মধ্যে ওঠানামা করানো যায়। এসব দণ্ড নিউট্রন শোষণ করে নিউক্লীয় বিক্রিয়ার গতিকে মন্থর করে দেয়।

গ. RADAR কি? এটি কিভাবে কাজ করে? বর্ণনা করুন। ৪

উত্তর : রাডার এমন একটি আধুনিক যন্ত্র যার সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইংরেজি RADAR শব্দটি Radio Detection And Ranging শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। রাডারকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায় যে, রাডার হলো এমন একটি কৌশল বা ব্যবস্থা যার সাহায্যে রেডিও প্রতিধ্বনির মাধ্যমে কোনো বস্তুর উপস্থিতি জানা যায়। বস্তুটির অভিমুখ ও রেঞ্জ বা পাল্লা নির্ণয় করা যায়, বস্তুটির বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করা যায় এবং এসব তথ্য বা উপাত্তকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। যুদ্ধে শত্রু বিমানের উপস্থিতি ও গতিবিধি জানার জন্য মূলত এর উদ্ভব হলেও শান্তির সময় সমুদ্র ও আকাশে যথাক্রমে জাহাজ ও বিমানের পথ নির্দেশ, ঝড়ের পূর্বাভাস ইত্যাদি কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

রাডারের কার্যপ্রণালী : রাডারে যেসব যন্ত্রপাতি থাকে তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় :

১. **প্রেরক যন্ত্র :** এই যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট শক্তি বিকীর্ণ হয় বা প্রেরিত হয় যাতে দূরবর্তী বস্তুটি (যে বস্তুর উপস্থিতি ও অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হবে) থেকে বিকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে। রাডারে মাইক্রোওয়েভ বা অতি হ্রস্ব তরঙ্গ ব্যবহার হয়।

২. **গ্রাহক যন্ত্র :** এটি প্রেরকযন্ত্র যে অবস্থানে থাকে সেখানেই অবস্থান করে। এর সাহায্যে লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়।

৩. **নির্দেশক যন্ত্র :** প্রাপ্ত তথ্যকে উপস্থাপনের জন্য থাকে একটি নির্দেশক (Indicator)। এটি আসলে একটি ক্যাথড রে টিউব বা টেলিভিশন পর্দার মতোই কাজ করে।

নিচের ব্লক চিত্রে রাডারের কার্যপ্রণালী উপস্থাপন করা হলো :

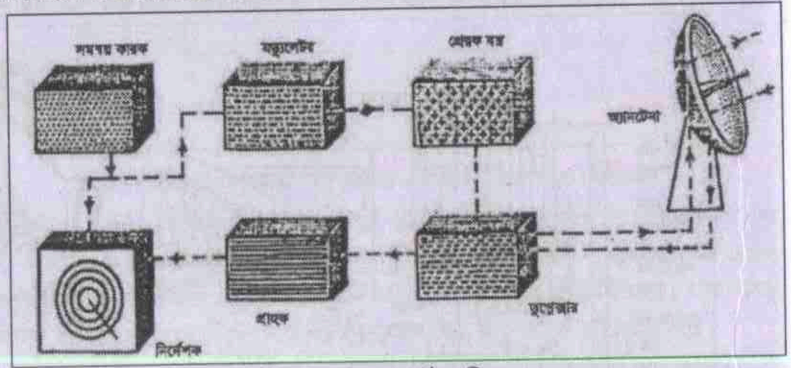

চিত্র : রাডারের কার্যপ্রণালী

বিভিন্ন কাজকে সমন্বয় করার জন্য এদের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সময় বা কাল নির্ণায়ক সার্কিট থাকে। প্রেরক যন্ত্রে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি শক্তির ক্ষুদ্র ক্ষমতাসম্পন্ন পালস বা শব্দ উৎপাদন করে। উচ্চ দিকবিমুখী অ্যানটেনা ব্যবস্থা এই পালস বিকরিত বা বিকীর্ণ করে বা ছড়িয়ে দেয়। গ্রাহকযন্ত্রটি কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত বিকিরণ বা প্রতিধ্বনি উদঘাটন বা গ্রহণ করে। নির্দেশক যন্ত্র একে সংকেতে প্রকাশ করে। নির্দেশক যন্ত্র বস্তুটির দূরত্ব, উন্নতি সংক্রান্ত তথ্য ক্যাথড-রে টিউবের পর্দায় উপস্থাপন করে।

ঘ. একটি বৈদ্যুতিক প্লাগ-এ ৩য় পিন-এর কাজ কি? রোধ কি? ৪

উত্তর : বৈদ্যুতিক প্লাগ-এ ৩য় পিন-এর কাজ : দুই পিন বিশিষ্ট বৈদ্যুতিক প্লাগের সাথে তৃতীয় পিন যুক্ত করে বৈদ্যুতিক প্লাগকে নিরাপদ করা হয়। একটি চ্যানেলের মাধ্যমে তৃতীয় পিনটি অন্য দুটি পিনের সাথে সংযুক্ত থাকে। তৃতীয় পিনের অন্য নাম হলো আর্থ পিন (Earth Pin)। আর্থিং বা ভূ-পৃষ্ঠ সংযোগের মাধ্যমে এই তৃতীয় পিন অন্য দুই পিনকে বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ অবস্থায় নিয়ে যেতে সহায়তা করে।

অন্যদিকে বাহ্যিকভাবেও তৃতীয় পিন-যুক্ত প্লাগ দুই পিন যুক্ত প্লাগ অপেক্ষা অনেক বেশি নিরাপদ ভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এছাড়া বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট হওয়ার সম্ভাবনা থেকেও ৩য় পিন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। নিচে ৩ পিন যুক্ত বৈদ্যুতিক প্লাগের সরল চিত্র প্রদান করা হলো :

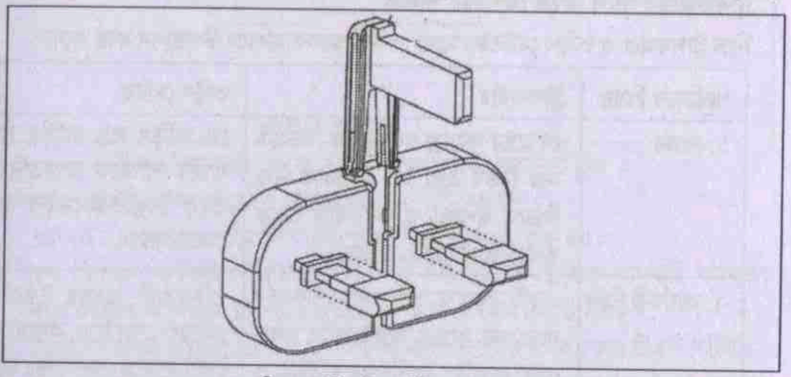

চিত্র : ৩-পিন ইলেকট্রিক প্লাগ

রোধ (Resistance) : তড়িৎ প্রবাহ মানে ইলেকট্রনের প্রবাহ। কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে চলার সময় পরিবাহকের অভ্যন্তরে অণু-পরমাণুর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তড়িৎপ্রবাহ বিঘ্নিত হয়। পরিবাহকের এই ধর্মকে রোধ বলে। সুতরাং বলা যায় যে, পরিবাহকের যে ধর্মের জন্য এর মধ্যদিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বিঘ্নিত হয় তাকে রোধ বলে।

ব্যাখ্যা : ওহমের সূত্র $I = \frac{V}{R}$ থেকে পাওয়া যায়, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় $R = \frac{V}{I}$

অর্থাৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও প্রবাহের অনুপাত দ্বারা ঐ তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহকের রোধ পরিমাপ করা হয়।

একক : রোধের একক ওহম। একে গ্রিক অক্ষর ওমেগা (Ω) দ্বারা সূচিত করা হয়। বড় মানের রোধ পরিমাপ করার জন্য কিলোওহম (K Ω) এবং মেগাওহম (M Ω) একক ব্যবহার করা হয়।

ঙ. তড়িৎ মোটর কি? ট্রান্সফর্মারের সাথে এর পার্থক্য কি? ৪

উত্তর : তড়িৎ মোটর (Electric Motor) : তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর। একে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে; যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শাক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে। তড়িৎ মোটর দুই প্রকারের; যথা– (ক) ডিসি মোটর, (খ) এসি মোটর।

একটি তড়িৎ মোটর নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

১. **ক্ষেত্র চৌম্বক :** U আকৃতির একটি স্থায়ী বা তাড়িত চুম্বক এই যন্ত্রের ক্ষেত্রে চুম্বকের কাজ করে।

২. **আর্মেচার :** কাঁচা লোহার মজ্জার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। আর্মেচার মূলত একটি আয়তকার কুণ্ডলী বা কয়েল।

৩. **কমুটেটর :** শক্ত তামার কতগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরিত করে কমুটেটর তৈরি করা হয়।

৪. **ব্রাস :** কার্বন অথবা তামা দ্বারা ব্রাস তৈরি করা হয়।

ট্রান্সফর্মারের সাথে তড়িৎ মোটরের পার্থক্য :

নিচে ট্রান্সফর্মার ও তড়িৎ মোটরের মধ্যে পার্থক্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সফর্মার	তড়িৎ মোটর
১. সংজ্ঞা	যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভব এবং নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তাকে রূপান্তরক বা ট্রান্সফর্মার বলে।	যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে।
২. কার্যকরী নীতি	একটি কয়েলে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কয়েলে আবিষ্ট তড়িৎ চালক শক্তি বা তড়িৎ উৎপাদনের পরিচিতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস রয়েছে ট্রান্সফর্মারে।	তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর।
৩. প্রকারভেদ	ট্রান্সফর্মার সাধারণত দুই প্রকার– ১. উচ্চধাপী বা আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার ২. নিম্নধাপী বা অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।	তড়িৎ মোটর দুই প্রকার– ১. ডিসি মোটর খ. এসি মোটর
৪. মূল কাজ	দূরদূরান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।	ছোট ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।
৫. ব্যবহার	বাসা-বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।	বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিল ইত্যাদিতে তড়িৎ মোটর ব্যবহৃত হয়।

৭. ক. **সংক্ষেপে অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।** ৫

উত্তর : অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তন প্রক্রিয়া : অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তন করার জন্য একটি অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্টার যন্ত্রের প্রয়োজন। একে সংক্ষেপে এডিসি (ADC) বলা হয়। একটি অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্টার যন্ত্র ভোল্টেজ বা অন্যান্য অ্যানালগ ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করে এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর ডিজিটাল আউটপুট কোড প্রদান করে, যা কিনা ইনপুটকৃত অ্যানালগ সংকেতেরই ডিজিটাল প্রকাশ।

ব্লক ডায়াগ্রাম চিত্রের মাধ্যমে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্টারের কার্যক্রম দেখানো হলো :

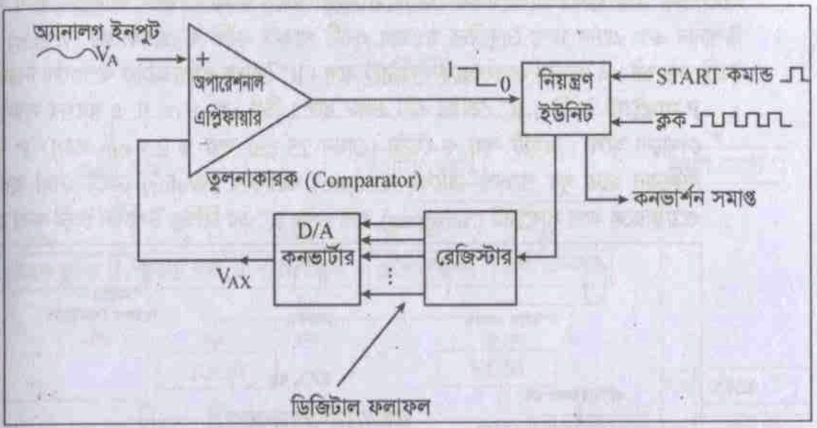

চিত্র : অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরক এর সরল চিত্র

অ্যানালগ হতে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

১. START কমান্ডের মাধ্যমে সিগন্যাল পালস্ দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়।

২. ক্লক সিগন্যাল অনুযায়ী রেজিস্টারে রক্ষিত বাইনারী ডেটাকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করে কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রণ ইউনিট। এ প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

৩. রেজিস্টারে রক্ষিত বাইনারি নাম্বার V_{AX} নামক অ্যানালগ সংকেতে রূপান্তর করে ডিএসি সার্কিট।

৪. অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার তুলনাকারক (Comparator) সার্কিট হিসেবে অ্যানালগ ইনপুট সিগন্যাল V_A এর সাথে V_{AX} কে তুলনা করে। যতক্ষণ পর্যন্ত $A_{AX} < V_A$ হয় ততক্ষণ তুলনাকারক আউটপুট দেয় HIGH। আর উল্টোটা হলে ফলাফল দেয় LOW। এমন একটা পর্যায়ে এ তুলনা আসে যখন V_{AX} ও V_A প্রায় সমান সমান হয় এবং সে সময় তুলনা বন্ধ করে দিয়ে অপারেশনাল অ্যাম্প্লিফায়ার ফলাফল দেয় যে V_A এর মান V_{AX} এর ডিজিটাল মানের সমতুল্য। সে সময় V_{AX} এর ডিজিটাল সংকেত অর্থাৎ বাইনারী সংখ্যাই V_A এর মান হিসেবে ফলাফল প্রদান করা হয়।

৫. এভাবে একটি অ্যানালগ সংকেত ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরের সাথে সাথে কনভার্সন সমাপ্ত সিগন্যাল প্রদান করে।

খ. **একটি IC-এর গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন।** ৫

উত্তর : ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা IC : ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা IC হলো এক প্রকার ইলেকট্রনিক সার্কিট যাতে সার্কিটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা যন্ত্রাংশগুলো একটি ক্ষুদ্র অর্ধ-পরিবাহক চিপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গঠন করা হয়, যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ চিপের অংশ। একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ যেমন রোধক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি এবং এদের অন্তসংযোগ একটি ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসেবে থাকে, যাতে এরা একটি পূর্ণ ইলেকট্রনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারে। একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহক পদার্থের মধ্যে এসব যন্ত্রাংশ গঠন ও সংযুক্ত করা হয়।

IC-এর গঠন প্রণালী : IC গঠন করার জন্য চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

ক. মনোলিথিক (Monolithic) পদ্ধতি; খ. পাতলা ফিল্ম (Thin Film) পদ্ধতি;

গ. স্থূল ফিল্ম (Thick Film) পদ্ধতি; এবং ঘ. হাইব্রিড (Hybrid) বা সংকর পদ্ধতি।

এদের মধ্যে মনোলিথিক পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত। সুতরাং নিচে এ পদ্ধতিতে IC গঠন প্রণালী আলোচনা করা হবে। মনোলিথিক (Monolithic) পদ্ধতি হলো যেখানে সার্কিটের প্রায় সকল উপাদান এবং এদের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ একটি পাতলা ফালি বা ওয়েফারের (Wafer) মধ্যে তৈরি করা হয়। এ পাতলা ওয়েফারকে সাবস্ট্রাট বলে। IC তৈরির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিম্নরূপ :

i. **P-সাবস্ট্রাট তৈরি :** IC তৈরির এটি প্রথম ধাপ। চিত্র- ক, খ ও গ এ ধাপের সরল চিত্র দেখানো হলো। একটি লম্বা ও মোটা (যেমন 25 cm লম্বা ও 2.5 cm ব্যাস) P টাইপ সিলিকন হতে খুব পাতলা রোধের (200μm) ওয়েফার (Wafer) কেটে নেয়া হয়। এ ওয়েফারকে বলে সাবস্ট্রাট (Substrate), যার ওপর IC এর বিভিন্ন উপাদান তৈরি করা হয়।

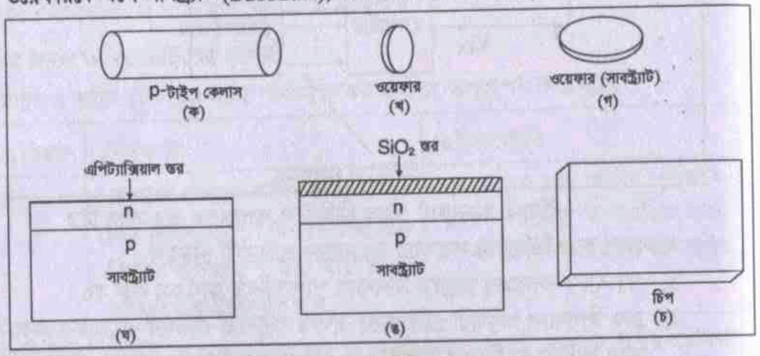

চিত্র : IC তৈরির বিভিন্ন ধাপ

ii. **এপিট্যাক্সিয়াল (Epitaxial) স্তর তৈরি :** দ্বিতীয় ধাপে সিলিকন পরমাণু ও পঞ্চ যোজনী বিশিষ্ট পরমাণু গ্যাসের মিশ্রণ উত্তপ্ত ওয়েফারের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি পাতলা স্তর ওয়েফারের উপর জমা হয়। এ পাতলা (10μm) আবরণকে এপিট্যাক্সিয়াল (Epitaxial) স্তর বলে। চিত্র (ঘ) এ প্রদত্ত স্তর।

iii. **অন্তরিত (Insulated) স্তর তৈরি :** এপিট্যাক্সিয়াল স্তরকে বাইরের দূষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সিলিকন ডাই-অক্সাইডের (SiO_2) একটি পাতলা স্তর (1μm) এপিট্যাক্সিয়াল স্তরের উপরে জমা করা হয়।

iv. **খাঁজ কাটা (Etching) :** সাবস্ট্রেট উপাদান তৈরির জন্য কোনো খাঁদ মেশানোর পূর্বে রাসায়নিক পদ্ধতিতে অন্তরিত স্তরে খাঁজ কাটা হয়। একে etching করা বলে। এচিং এর স্থলে এপিট্যাক্সিয়াল স্তর উন্মুক্ত হয়। ঐ সমস্ত স্থানে বর্তনীর বিভিন্ন উপাদান তৈরি করা হয়।

v. **চিপ তৈরি :** এরপর ওয়েফারকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশকে চিলতে বা চিপ (Chip) বলে। প্রতিটি চিপে IC থাকে। একই ধরনের বহু সংখ্যক চিপ ওয়েফারে এক সাথে তৈরি করা হয়। গ্লাস কাটার মত করে চিপগুলোকে কেটে আলাদা করা হয়।

৮. ক. কম্পিউটার মেমরি কয়ভাগে ভাগ করা যায়? এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। ৫

উত্তর : কম্পিউটার মেমরির শ্রেণীবিভাগ : কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমরিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. প্রধান মেমরি বা প্রাথমিক মেমরি (Main or Primary Memory)
২. সহায়ক বা গৌণ মেমরি (Auxiliary or Secondary Memory)
৩. ক্যাশ মেমরি (Cache Memory)

নিচে একটি ছকের মাধ্যমে কম্পিউটারের মেমরির শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলো :

মেমরির বৈশিষ্ট্য : তিন প্রকার মেমরির বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

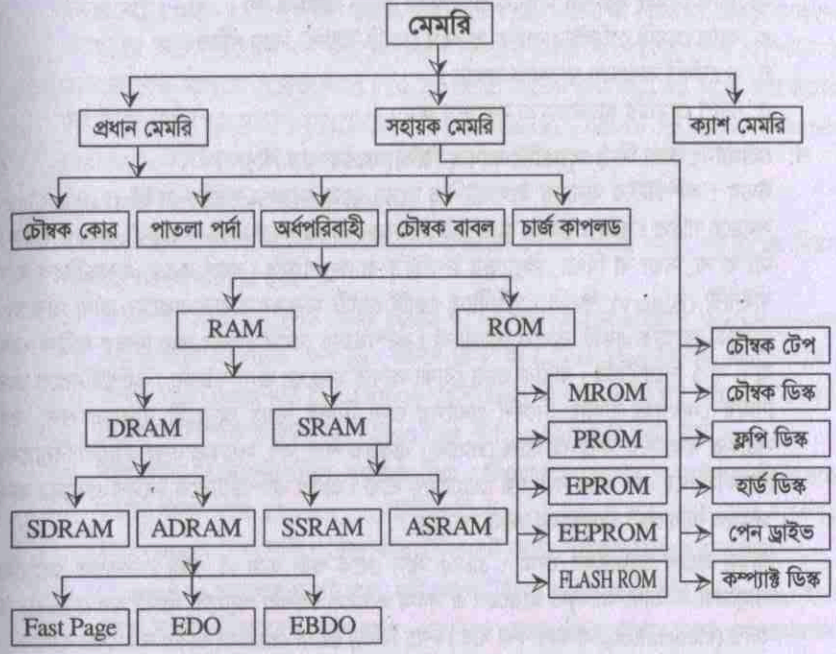

প্রধান বা মুখ্য মেমরি : প্রধান মেমরির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

১. কম্পিউটার চালু করার পর অপারেটিং সিস্টেমের একটি অংশ সহায়ক মেমরি হতে প্রধান মেমরিতে চলে এসে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে।
২. কম্পিউটার বন্ধ করে দিলে প্রধান মেমরিতে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায়।
৩. প্রসেসরের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকায় প্রধান মেমরিতে তথ্য সংরক্ষণ ও তা পঠনের গতি দ্রুত হয়।
৪. প্রধান মেমরি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি কোষ নিয়ে গঠিত।
৫. কম্পিউটার মাধ্যমে যে কোনো সফটওয়্যারে কাজ করতে হলে প্রথমে ঐ সফটওয়্যারটি সহায়ক মেমরি হতে প্রধান মেমরিতে নিয়ে আসতে হয়।

সহায়ক বা গৌণ মেমরি : সহায়ক মেমরির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

১. কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সহায়ক মেমরিগুলো ব্যবস্থা করা হয়।
২. যেহেতু প্রধান মেমরির RAM/ROM-এ কিছু লেখা যায় না তাই সকল তথ্য লেখার জন্য সহায়ক মেমরি প্রয়োজন হয়।
৩. বিদ্যুৎ চলে গেলে বা কম্পিউটার বন্ধ করলেও সহায়ক মেমরির তথ্যে কোনো সমস্যা হয় না বা মুছে যায় না।
৪. সহায়ক মেমরির ধারণ ক্ষমতা প্রধান মেমরির তুলনায় অনেক বেশি।
৫. সহায়ক মেমরির প্রকারভেদ অনেক বেশি এবং নিত্য নতুন সহায়ক মেমরির উদ্ভব হচ্ছে।

ক্যাশ মেমরি : ক্যাশ মেমরির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. ক্যাশ মেমরি সিপিইউ এর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে।
২. ক্যাশ মেমরি সরাসরি মাইক্রোপ্রসেসরের কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩. ক্যাশ মেমরি রেজিস্টার নামক ক্ষুদ্রতম মেমরি ইউনিট নিয়ে গঠিত।
৪. এ মেমরি সবচেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন।
৫. ক্যাশ মেমরির ধারণক্ষমতা সবচেয়ে কম।

খ. প্রোগ্রামিং ভাষা কি? প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন স্তরের নাম লিখুন। ৫

উত্তর : কম্পিউটার অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রের মতো অসংখ্য লজিক গেইট (Logic Gate) সমন্বয়ে গঠিত। এটাও কেবল মাত্র দুটি লজিকের উপর কাজ করে ০ (শূন্য) এবং ১ (এক), হ্যাঁ বা না, সত্য বা মিথ্যা, বিদ্যুতের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি। কাজ করার এ পদ্ধতিকে বলে বাইনারী (Binary) পদ্ধতি। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের হাজার রকমের ভাষা থাকলেও কম্পিউটার তার একটি ভাষাও বোঝে না। কম্পিউটার বোঝে কেবল তার নিজস্ব যান্ত্রিক ভাষা যা ০ বা ১ দিয়ে তৈরি। যান্ত্রিক ভাষা বোঝা আবার মানুষের জন্য কষ্টকর। কম্পিউটারকে তার নিজস্ব বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, সংকেত ইত্যাদির বিন্যাসই হচ্ছে প্রোগ্রাম। ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, সংকেত এবং এগুলো বিন্যাসের নিয়ম মিলিয়ে এক সঙ্গে বলা হয় প্রোগ্রামের ভাষা। অর্থাৎ কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত ভাষাকেই প্রোগ্রামের ভাষা বলা হয়।

বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা : ১৯৪৫ সাল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত কয়েকশত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা ভাষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ সকল ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তর (Level) বা প্রজন্ম (Generation) এ ভাগ করা যায়। নিচে বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামিং ভাষার নাম দেয়া হলো :

১. প্রথম প্রজন্ম বা ফার্স্ট জেনারেশন ভাষা (১৯৪৫) : মেশিন ভাষা (Machine Language)
২. দ্বিতীয় প্রজন্ম বা সেকেন্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৫০) : অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language)
৩. তৃতীয় প্রজন্ম বা থার্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৬০) : উচ্চতর বা হাইলেভেল (High Level) ভাষা।
৪. চতুর্থ প্রজন্ম বা ফোর্থ জেনারেশন ভাষা (১৯৭০) : অতি উচ্চতর বা ভেরি হাই লেভেল (Very High Level) ভাষা।
৫. পঞ্চম প্রজন্ম বা ফিফথ্ জেনারেশন ভাষা (১৯৮০) : স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল (Natural) ভাষা।

উল্লেখ্য, মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষাকে লো লেভেল বা নিম্নস্তরের ভাষা বলে। এ দুটি ভাষাকে লো লেভেল ভাষা বলার কারণ এগুলো হলো কম্পিউটারের ভাষা (০ ও ১ ভিত্তিক বাইনারি ভাষা) কিংবা এর কাছাকাছি। অন্যদিকে উচ্চতর বা হাই লেভেল ভাষা আমাদের পরিচিত ইংরেজি ভাষার কাছাকাছি।

৯. ক. ইন্টারনেট কি? কিভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করা যায়? ৫

উত্তর : ইন্টারনেট শব্দটির পূর্ণ অর্থ হলো International Network বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। পৃথিবীর সব দেশের যোগাযোগের নেটওয়ার্ক মিলে গড়ে উঠেছে ইন্টারনেট। কাজের পরিধি বিবেচনা করে ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক (Network of Networks)। অসংখ্য LAN, MAN, WAN, ISDN সংযোগ মিলে এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব।

আরপানেট (ARPANET) নামের একটি মার্কিন সামরিক গবেষণা প্রজেক্ট থেকে ইন্টারনেটের শুরু। স্নায়ুযুদ্ধকালীন ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি গবেষণা প্রজেক্টের অংশ হিসেবে সে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/ আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) প্রোটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়।

ইন্টারনেট সংযোগ কিভাবে বন্ধ করা যায় :

ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করার জন্য যে কোনো ওয়েব পেইজ ব্রাউজ করার পর নিচের নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. প্রথমে যে Web Page টি খোলা রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। এজন্য Web page-এর সর্ব উপরের ডানদিকে ক্রস (×) বাটনে ক্লিক করে Web Pageটি বন্ধ করতে হবে। অথবা Web page-এর File Option থেকে Exit বা Close সিলেক্ট করতে হবে। E-mail ওপেন করা থাকলে আগে Sign Out বা Log Out করে নিতে হবে।
২. কম্পিউটার স্ক্রিনের ডানদিকে সবচেয়ে নিচে নেটওয়ার্ক সংযোগের যে আইনকনটি রয়েছে তাতে ক্লিক করে Connect to উইন্ডোটি Maximize করতে হবে এবং তারপর Disconnect লেখা বাটনে ক্লিক করে ইন্টারনেট থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে হবে।
৩. Connect to ডায়ালগ বক্সটি যখন দুটি কম্পিউটারের ছবির মতো হয়ে Minimize হয়ে থাকে তখন ডিসকানেক্ট হতে হলে ঐ ছবিতে ডাবল ক্লিক করতে হবে এবং তারপর Disconnect বাটনে ক্লিক করতে হবে।

খ. কিভাবে ই-মেইল চেক করা হয়? কিভাবে ই-মেইল পড়া যাবে এবং কিভাবে ই-মেইল মোছা যাবে? ৫

উত্তর : ই-মেইল চেক করার নিয়ম : ই-মেইল এসেছে কিনা তা চেক করার নিয়মগুলো নিচে ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হলো :

১. ই-মেইল চেক করার জন্য প্রথমেই ইন্টারনেট সংযোগ চালু করতে হবে।
২. Internet Explorer অথবা Mozilla Firefox কিংবা অন্য কোনো Web Browser ব্যবহার করে ইন্টারনেট এড্রেসে E-mail সার্ভারের ঠিকানা লিখে সেই E-mail সার্ভারের Login page এ যেতে হবে।
৩. Login page এ ই-মেইল ব্যবহারকারী নিজের Email Account ID এবং Passward টাইপ করে Login বাটনে ক্লিক করলে Mail Server এ প্রবেশ করতে পারবেন।
৪. Mail Server এ নিজের E-mail Page এ যেসব Mail এসেছে সেগুলো তালিকা আকারে সাজানো থাকে। এই Mail তালিকা থেকে যে কোনো ই-মেইলের উপর ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট মেইলটি চেক করা যাবে।

ই-মেইল পড়ার নিয়ম : ই-মেইল পড়ার জন্য Mail Server এ Login করে Inbox এ ক্লিক করলে আগত E-mail গুলোর একটি তালিকা প্রদর্শিত হয়। এখন এসব Mail-এর তালিকা থেকে যে কোনো একটি মেইলের উপর ক্লিক করলে অন্য একটি Page এ সংশ্লিষ্ট মেইলটি ওপেন হয়। এবার প্রদর্শিত Mail টি পড়া যায় ও ইচ্ছেমতো Reply করা যায়।

ই-মেইল মোছার নিয়ম : ই-মেইল চেক করার জন্য Mail Server এ Login করার পর Inbox এ ক্লিক করলে যে ই-মেইলগুলোর তালিকা প্রদর্শিত হয় সেগুলোর বামপাশে ছোট একটি Check Box থাকে। এই চেক বক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন দিলে সংশ্লিষ্ট ই-মেইলটি Select হয়ে যায়। এখন এই সিলেক্ট করা ই-মেইলটি মুছতে হলে মেইল তালিকার উপরে Delete বাটনে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট Mail টি তালিকা থেকে তথা Inbox থেকে মুছে যায়।

১০.ক. **Wimax প্রযুক্তি কি? Facebook account খোলার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।** ৫

উত্তর : Wimax শব্দটির পুরো অর্থ হলো Worldwide Interoperability for Microwave Access অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহারের সাধারণ বিনিময়যোগ্য পদ্ধতি। Wimax হলো এক প্রকার টেলিযোগাযোগ প্রটোকল যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়মে সম্পূর্ণ মোবাইল ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়।

বর্তমানে Wimax-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ 40 Mbit/s রেটে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা সম্ভব এবং যা IEEE 802.16m প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত। এর ইন্টারনেট অ্যাকসেস স্পিড খুব শীঘ্রই 1 Gbit/s এ উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এজন্য Wimax প্রযুক্তিকে বলা হয় 4G বা Fourth Generation ওয়ারলেস টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি। 30 metre (বা 100-foot) এলাকায় Wi-Fi Local Area Network ব্যবহার করে Wimax সুবিধা প্রদান করা হয়। Wimax Forum নামে প্রযুক্তিবিদদের একটি সংগঠন Wimax প্রযুক্তির বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে থাকে।

Facebook Account খোলার পদ্ধতি :

Facebook এ Account খুলতে হলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় :

১. প্রথমে ইন্টারনেট ব্রাউজারের Address bar-এ www.facebook.com লিখে Enter দিতে হবে।
২. ফেসবুকের Home Page ওপেন হলে ডান পাশে Sign Up অপশন পাওয়া যায়। Sign Up বাটনে ক্লিক করলে একটি অনলাইন ফর্ম আসবে। এ Online Form-এ নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে Formটি পূরণ করতে হবে।
৩. পরবর্তীতে Security Check Box এ ভেসে ওঠা লেখাগুলো সঠিকভাবে লিখে Sign Up এ ক্লিক করতে হবে।
৪. পরবর্তী Page এ নিজের মেইল একাউন্ট প্রবেশ করে Friend খুঁজে নেয়া যেতে পারে অথবা Skip This Step ক্লিক করতে হবে।
৫. Profile Info Page টিকে High School, College, University এবং Employer এর নাম লিখে Save বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৬. পরের Page এ Profile Picture Upload বাটনে ক্লিক করে নিজের ছবি আপলোড করতে হবে।
৭. সবশেষে যে ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে Sign Up করা হয়েছিল সেটির Inbox এ গিয়ে Facebook থেকে পাঠানো Mail এর Confirmation Link এ ক্লিক করলেই Account খোলা সম্পন্ন হবে।

১০.খ. **Information Technology বলতে কি বুঝায়? TCP/IP Protocol Suit বর্ণনা করুন।** ৫

উত্তর : Information Technology বা তথ্যপ্রযুক্তি : Information Technology, or IT, is the study, design, creation, utilization, support and management of computer-based information system, especially software applications and computer hardware. আবার তথ্যপ্রযুক্তির অন্য সজ্ঞায় রয়েছে : Information Technology is the development, installation and implementation of computer system and application. ইন্টারনেটভিত্তিক বিশ্বকোষ Wikipedia'র সংজ্ঞা অনুযায়ী : Information Technology (IT) is the acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, pictorial, textual and numberical information by a microelectronics based combination of computing and telecommunication. মূলত তথ্যপ্রযুক্তি একটি সামগ্রিক বিষয়। কম্পিউটার প্রযুক্তি, ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রক্রিয়াই বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

TCP/IP Protocal Suite : The TCP/IP protocol architecture is a result of protocol research and development conducted on the experimental packet-switched network, ARPANET, funded by the Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) of USA, and is generally referred to as the TCP/IP protocol suite. This protocol suite consists of a large collection of protocols that have been issued as internet standards by the Internet Architecture Board (IBA).

The TCP/IP Layers : The TCP/IP model organizes the communication task into five relatively independent layers :

1. Physical layer, 2. Physical access layer, 3. Internet layer, 4. Host-to-host, or transport layer, 5. Application layer

The Physical Layer : The physical layer covers the physical interface between a data transmission device (e.g, workstation, computer) and a transmission medium or network.

The Network Access Layer : The network access layer is concerned with the exchange of data between end system (server, workstation etc) and the network to which it is attached. The specific software used at this layer depends on the type of netwerk to be used; different standards have been developed for circuit switching, packet switching (e.g., frame relay), LANs (e.g. Ethernet) and others.

The Internet Layer : The internet protocol (IP) is used at this layer to provide the routing function accross multiple networks.

Host-to-host or Transport Layer : The mechanisms for providing relibility are essentially independent of the nature of the applications. Thus, it makes sense to collect those mechanisms in a common to as the host-to -host layer, or transport layer.

The Application Layer : The application layer contains the logic needed to support the various user applications. For each different type of application, such as file transfer, a separate module is needed that is peculiar to that application.

৩০তম বিসিএস : ২০১১

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : *প্রার্থীদিগকে ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর এবং ২ – ৫ নং প্রশ্নের যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. ক. জারণ-বিজারণের আধুনিক সংজ্ঞা দিন। প্রমাণ করুন যে, জারণ-বিজারণ যুগপৎ সংগঠিত হয়। ৪

উত্তর : জারণ-বিজারণের আধুনিক সংজ্ঞা : যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা (অণু, পরমাণু, মূলক বা আয়ন) ইলেক্ট্রন প্রদান করে তাকে জারণ এবং যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা (অণু, পরমাণু, মূলক বা আয়ন) ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে তাকে বিজারণ বলে। যেমন– কপার সালফেটের সাথে জিংক বিক্রিয়া করে জিংক সালফেট ও কপার উৎপন্ন করে।

$CuSO_4 + Zn \rightarrow Cu + ZnSO_4$

এখানে Zn পরমাণু দুটি ইলেক্ট্রন প্রদান করে Zn^{2+} আয়নে পরিণত হয়েছে।

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ অর্থাৎ জিংক এর জারণ ঘটেছে।

আবার, Cu^{2+} আয়ন দুটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে Cu এ পরিণত হয়েছে।

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ অর্থাৎ কপার এর বিজারণ ঘটেছে।

সুতরাং জারণ-বিজারণ যুগপৎ সংগঠিত হয়।

খ. প্রতিধ্বনি কিভাবে সৃষ্টি হয়? প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়? ৪

উত্তর : কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ যদি দূরবর্তী কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূল ধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি হয় তাকে ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি বলে। কোনো শব্দ শোনার প্রায় ০.১ সেকেন্ড সময় পর্যন্ত শ্রোতার মস্তিষ্কে তার অনুভূতি থেকে যায়। তাই সৃষ্ট প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিফলকের দূরত্ব এমন হতে হয় যেন ঐ শব্দের অনুভূতি কানে শেষ হওয়ার পরপরই প্রতিফলিত শব্দ কানে পৌঁছায়।

প্রতিধ্বনির সাহায্যে খুব সহজেই কূপের পানি পৃষ্ঠের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। কূপের উপরে কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ পানি পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তখন শব্দ উৎপন্ন করা ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় থামা ঘড়ির (Stop watch) সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

মনে করি, কূপের গভীরতা $= h$

শব্দ উৎপন্ন করা ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় $= t$

শব্দের দ্রুতি $= v$

এখন, শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর পানি পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার কাছে ফিরে আসতে যেহেতু 2h দূরত্ব অতিক্রম করে।

আমরা জানি, দূরত্ব = বেগ × সময়

$\therefore 2h = v \times t \Rightarrow h = \frac{v \times t}{2}$

অতএব, v ও t-এর মান নির্ণয় করে ওপরের সমীকরণে বসালে কূপের গভীরতা পাওয়া যাবে। কূপের গভীরতা 16.6 মিটারের কম হলে প্রতিধ্বনিভিত্তিক এ পরীক্ষাটি করা সম্ভব হবে না।

গ. উচ্চ রক্তচাপ কি? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ ও কারণগুলো বর্ণনা করুন। ৪

উত্তর : প্রবাহমান রক্ত নালীগাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে বলা হয় ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ। হৃদযন্ত্রের বাম নিলয়টি সংকুচিত হওয়ার ফলেই অধিকতর রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন শুরু হওয়ার ঠিক আগের চাপকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলে। একজন সুস্থ যুবকের রক্তের চাপ স্বাভাবিকভাবে ১২০/৮০।

রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ ১২০/৮০-এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে তখন ঐ ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আছে বলে ধরা হয়।

হাইপারটেনশনের লক্ষণ

ক. সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথার পেছন দিকে ও ঘাড়ে ব্যথা হওয়া।
খ. মাথা ঘোরা, কানে ভো ভো করা, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা, অল্পতেই বিরক্ত হওয়া।
গ. বুকে ব্যথা, অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, রাতে হাপানি।
ঘ. পক্ষাঘাত।
ঙ. ঘনঘন প্রস্রাব, কখনও প্রস্রাবের সময় রক্ত যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ

ক. বাবা মা'র উচ্চ রক্তচাপ থাকলে।
খ. শরীরের ওজন বেড়ে গেলে।
গ. গতি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়ে গেলে।
ঘ. অ্যালকোহল জাতীয় খাবার খেলে।
ঙ. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে।
চ. অধিক সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে।

ঘ. Anthrax কি? এ রোগের উৎস, বিস্তার ও প্রতিরোধ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। ৪

উত্তর : অ্যানথ্রাক্স : অ্যানথ্রাক্স একটি গ্রিক শব্দ, যার অর্থ Coal বা কয়লা। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্তের শরীরে কালো রঙের ক্ষত সৃষ্টি হওয়া থেকেই সম্ভবত এ ধরনের নামকরণ হয়েছে। অ্যানথ্রাক্সকে বাংলায় তড়কা রোগ বলা হয়। অ্যানথ্রাক্স মূলত *Bacillus anthracis* নামক রড আকৃতির Gram(+) এবং বায়বীয় স্থানে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গবাদিপশুর (গরু, ছাগল এবং ভেড়া) একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা অসাবধানতা ও অসচেতনতার কারণে মানুষের মধ্যে সহজেই ছড়িয়ে পড়ে।

উৎস : *Bacillus anthracis*-এর স্পোর বা জীবাণুগুলোর মূল উৎস মাটি। মাটিতে এই ব্যাকটেরিয়ার স্পোরগুলো দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারে এবং তা কয়েক দশক পর্যন্তও হতে পারে। ফলে কোনো গবাদিপশু যেমন— গরু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি তৃণভোজী প্রাণী ঘাস খাওয়ার সময় সহজেই এ স্পোর দ্বারা আক্রান্ত হয়।

বিস্তার : আক্রান্ত গবাদিপশু জবাই, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাংস কাটার সঙ্গে যারা জড়িত থাকে তারা খুব সহজেই এ রোগে আক্রান্ত হয়। শরীরে কোনো কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে, এমনকি খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমেও মানুষের শরীরে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। উল্লেখ্য, আক্রান্ত গবাদিপশুর সরাসরি সংস্পর্শে না থেকেও বিভিন্ন ধরনের মাংসাশী, বর্জ্যভুক প্রাণীর দ্বারাও এ রোগ সহজে মানুষের মধ্যে ছড়াতে পারে।

প্রতিরোধে করণীয় : আক্রান্ত মৃত গবাদিপশুকে যত দ্রুত সম্ভব মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে এবং মলমূত্র ও রক্ত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে □ যারা গবাদিপশুর রক্ষণাবেক্ষণ, জবাই এবং মাংস কাটার সঙ্গে জড়িত, তাদের মুখে মাস্ক ও হাতে গ্লাভস ব্যবহার করতে হবে □ গবাদিপশু আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ পশু হাসপাতালে নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে □ অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধের জন্য পশু ও মানুষের জন্য কার্যকর ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভ্যাকসিন দিলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। তাই ভ্যাকসিন নিতে হবে।

ঙ. লোডশেডিং (Load Shedding) কি? বাংলাদেশে কি কি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়? ৪

উত্তর : লোডশেডিং (Load Shedding) : কোনো কারণে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে লোডশেডিং (Load Shedding) বলে। সাধারণত চাহিদার তুলনায় পাওয়ার স্টেশনগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে লোডশেডিং (Load Shedding) হয়।

বাংলাদেশে গ্যাস, কয়লা, পানির বিভবশক্তি, বায়ুশক্তি, তেল ও সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এছাড়াও পাবনার রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২. ক. বায়ুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কি? বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণগুলো কি কি? ২.৫

উত্তর : বায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো :

i. নাইট্রোজেন : ৭৮.০২ শতাংশ;
ii. অক্সিজেন : ২০.৭১ শতাংশ এবং
iii. কার্বন ডাই-অক্সাইড : ০.০৩ শতাংশ।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপ—

১. বনাঞ্চল ধ্বংস; ২. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; ৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি;
৪. দৈনন্দিন গৃহস্থালির রান্না-বান্না; ৫. শিল্পকারখানা ও পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি।

খ. Pasteurization কি এবং কিভাবে করা হয়? ২.৫

উত্তর : Pasteurization (পাস্তুরায়ন) : পাস্তুরায়ন অর্থ আংশিক নির্জীব। কোনো তরল খাদ্য বা পানীয় বিশেষত দুধকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে হঠাৎ তাপমাত্রা নামিয়ে জীবাণু ধ্বংস করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে Pasteurization বা পাস্তুরায়ন বলে। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

পাস্তুরায়ন প্রক্রিয়া : দুধকে পাস্তুরিত করার জন্য ৬২.৮° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট যাবৎ উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়, এরপর দ্রুত ঠাণ্ডা করে ১০° সে. তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুধকে কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা জীবাণুমুক্ত রাখা যায়।

গ. প্রাকৃতিক গ্যাস কি? বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো কি কি এবং এদের উপস্থিতির শতকরা হার কি? ২.৫

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) : ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মিথেন থেকে বিউটেন পর্যন্ত অ্যালকেনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে প্রাকৃতিক গ্যাস বলা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইথিলিন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৮৫%, ইথেন ১০%, প্রোপেন ৩% এবং এ গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে সালফার প্রায় অনুপস্থিত।

ঘ. Bio-gas কি এবং এর মধ্যে কি কি গ্যাস বিদ্যমান থাকে এবং প্রয়োগ লিখুন। ২.৫

উত্তর : Biogas (বায়োগ্যাস) : গোবর, মলমূত্র, পাতা, খড়কুটা প্রভৃতি পদার্থ পানির সাথে মিশিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতিতে রাখলে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় এসব পদার্থ থেকে যে বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাই বায়োগ্যাস নামে পরিচিত।

Biogas-এর উপাদান : বায়োগ্যাস-এর প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস। এছাড়াও ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে নাইট্রোজেন (N_2), অ্যামোনিয়া (NH_3), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), হাইড্রোজেন (H_2) প্রভৃতি গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকতে পারে।

Biogas-এর প্রয়োগ : বর্তমানকালে নানাবিধ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাসের প্রয়োগ বা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বায়োগ্যাসের প্রধান কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

i. এ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ii. ম্যান্টেল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মতো ঘর আলোকিত করা যায়।
iii. বায়োগ্যাসের সাহায্যে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিডি ইত্যাদি চালানো যায়।
iv. পাম্প চালিয়ে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা যায়।
v. এ গ্যাসের সাহায্যে গাড়ি চালানো যায়।

৩. ক. হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের মধ্যে পার্থক্য কি? বুঝিয়ে লিখুন। ২.৫

উত্তর : Heart attack (হার্ট অ্যাটাক) ও Stroke (স্ট্রোক)-এর মধ্যে পার্থক্য : কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (Coronary artery)। এ করোনারী ধমনী রক্তের জমাট বাঁধা পিণ্ড দ্বারা বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড অক্সিজেন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং দেখা দেয় হার্ট অ্যাটাক। অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে একটি হৃদরোগ। অপরদিকে স্ট্রোক হচ্ছে একটি মস্তিষ্কের রোগ। কোনো কারণে মস্তিষ্কের কোথাও রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালী ফেটে রক্তক্ষরণ হলে সেই অবস্থাকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোকের ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ দ্রুত সংঘটিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে রোগী জ্ঞান হারায়।

খ. হেপাটাইটিস কি? কি কি কারণে হতে পারে? ২.৫

উত্তর : হেপাটাইটিস : যকৃতের আরেক নাম হেপাটিকা। যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস অথবা অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণে যকৃতের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে হেপাটাইটিস বলে। হেপাটাইটিস-বি অত্যন্ত মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হেপাটাইটিসের কারণ : হেপাটাইটিস প্রধানত কয়েকটি প্রজাতির হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট যকৃতে (Liver) ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। আবার কোনো কারণে যকৃতের কোষগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙতে থাকলে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। যেমন– অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন ও ম্যালেরিয়া জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে যকৃতের কোষগুলোর অতিমাত্রায় ভাঙনের ফলে হেপাটাইটিস সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কোনো কারণে পিত্তনালী অবরুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে গেলেও অবস্ট্রাক্টিক (Obstructive) হেপাটাইটিস দেখা দেয়।

গ. **Antibiotic ও Antiseptic-এর সংজ্ঞা ও পার্থক্য লিখুন।** ২.৫

উত্তর : Antibiotic (অ্যান্টিবায়োটিক) : অণুজীব কর্তৃক উৎপাদিত এবং অন্যান্য অণুজীবের জন্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থকে Antibiotic (অ্যান্টিবায়োটিক) বলা হয়।

পেনিসিলিন, নিওমাইসিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, টেরামাইসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক-এর উদাহরণ।

Antiseptic (অ্যান্টিসেপ্টিক) : মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীর শরীরে সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস ও জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য যে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা অ্যান্টিসেপ্টিক নামে পরিচিত। অ্যান্টিসেপটিক দেহকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে পারে না কিন্তু দেহে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। ক্লোরোহেক্সিডিন, ৬২.৫-৭০% ইথানল (ইথাইল অ্যালকোহল) দ্রবণ, ৩% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ ইত্যাদি হলো অ্যান্টিসেপটিকের উদাহরণ।

ঘ. **Vaccination বলিতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে মানবদেহের জন্য প্রচলিত Vaccineগুলো কি কি?** ২.৫

উত্তর : সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সুনির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে অনুরূপ জীবাণু সম্ভাব্য সংক্রমণ রোধের প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে Vaccination বা টিকাদান বলে।

বাংলাদেশে যে সকল টিকা দেয়া হয় তা হলো বিসিজি (যক্ষা), ডিপিটি (ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার), মিজেলস (হাম), পোলিও। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি ও হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেরও টিকা প্রদান করা হয়। কলেরা রোগের টিকা পূর্বে প্রদান করা হলেও বর্তমানে এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো টিকা নেই।

৪. ক. **মৌলিক রংগুলো কি কি? কোনো বস্তুর রং কালো দেখায় কেন?** ২.৫

উত্তর : কোনো একটি পদার্থ থেকে প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা শোষণের পরে যে বর্ণের আলোক চোখে পতিত হয় তাই পদার্থের রঙ বা বর্ণ। মৌলিক বর্ণ– লাল, সবুজ ও নীল (আসমানী)। এ তিন রঙের সংমিশ্রণে অন্য সব রঙ তৈরি করা যায়।

কোনো বস্তু বর্ণালীর সাতটি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণ প্রতিফলিত করে তাকে ঐ বর্ণের দেখায়। যেমন– নীল বর্ণের বস্তু সাতটি বর্ণের মধ্যে নীল বর্ণকে প্রতিফলিত করে বাকি ছয়টি বর্ণ শোষণ করে। আবার সাদা বস্তু সাতটি বর্ণের সবগুলোকে প্রতিফলিত করে তাই একে সাদা দেখায়। কিন্তু কালো বস্তু সাতটি বর্ণের সবগুলোকেই শোষণ করে; কোনো বর্ণকেই প্রতিফলিত করে না। এজন্য ঐ বস্তুকে কালো দেখায়।

খ. **সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ও গামা রশ্মির প্রভাবে কি কি ক্ষতি হতে পারে?** ২.৫

উত্তর : গামা রশ্মির প্রভাবে মানুষের নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে :

১. এ রশ্মি দেহের কোষ নষ্ট করতে পারে। ২. এ রশ্মির প্রভাবে মাথার চুল পড়ে যায়।
৩. এ রশ্মিতে আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার ও টিউমার হতে পারে।
৪. অতিমাত্রায় এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে মানুষের নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে :

১. চর্ম ক্যান্সার হতে পারে।
২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
৩. চোখে ছানি পড়ে এবং অন্ধত্ব বেড়ে যায়।
৪. খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।
৫. প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে।

গ. **নিউক্লীয় চুল্লী কি? নিউক্লীয় চুল্লীর কাজ কি?** ২.৫

উত্তর : যে যান্ত্রিক ব্যবস্থার সাহায্যে নিউক্লিয়াসের নিয়ন্ত্রিত ক্রমিক বিভাজন দ্বারা বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক শক্তি অর্জন করা যায় তাকে নিউক্লীয় বা পারমাণবিক চুল্লী বলে।

নিউক্লীয় চুল্লী তিন প্রকার এবং এদের কাজ নিম্নরূপ :

১. গবেষণা চুল্লী (Research reactor) : এ চুল্লী বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে ব্যবহৃত হয়।
২. ব্রিডার চুল্লী (Breeder reactor) : এই চুল্লী প্লুটোনিয়াম তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।
৩. শক্তি চুল্লী (Energy reactor) : উচ্চ শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ চুল্লী ব্যবহৃত হয়।

ঘ. **রোধ ও আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা ও পার্থক্য লিখুন।** ২.৫

উত্তর : পরিবাহীর যে ধর্মের ফলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে কম-বেশি বাধার সৃষ্টি করে তাকে এর রোধ বলে। একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহী তার প্রস্থচ্ছেদের অভিলম্ব বরাবর বিদ্যুৎ প্রবাহে যে পরিমাণ বাধা প্রদান করে, তাকে তার আপেক্ষিক রোধ বলে।

রোধ ও আপেক্ষিক রোধের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

রোধ	আপেক্ষিক রোধ
১. পরিবাহীর যে ধর্মের ফলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে কম-বেশি বাধার সৃষ্টি করে তাকে এর রোধ বলে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক মাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য কোনো পরিবাহীর দু প্রান্তে যে বিভব পার্থক্যের প্রয়োজন হয় সেটাই উক্ত তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধের পরিমাণ নির্দেশ করে।	১. কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক আয়তনের কোনো একটি ঘনক আকৃতির বা একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি পরিবাহীর দু বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রোধকে ঐ তাপমাত্রায় উক্ত পরিবাহীর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে।
২. রোধের একক ওহম Ω।	২. আপেক্ষিক রোধের একক ওহম মিটার (Ωm)।
৩. কোনো পরিবাহীর রোধের মান নির্ভর করে তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, পরিবাহীর উপাদান ইত্যাদির ওপর।	৩. কোনো পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে এর তাপমাত্রা ও উপাদানের ওপর।
৪. রোধ হয় কোনো পরিবাহীর।	৪. আপেক্ষিক রোধ হয় পরিবাহীর উপাদানের।

৫. ক. **মাইক্রোফোন কি? মাইক্রোফোন কত প্রকার ও কি কি? মাইক্রোফোন কিভাবে কাজ করে?** ২.৫

উত্তর : মাইক্রোফোন হচ্ছে একটি ইলেকট্রো-অ্যাকাউস্টিক ট্রান্সডিউসার, যা শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে, তরঙ্গকে বিবর্ধিত করে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করে। সহজ কথায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রিক্যাল তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয় তাকে মাইক্রোফোন বলে।

প্রকারভেদ : যার ওপর নির্ভর করে মাইক্রোফোন অপারেট করে সে অনুযায়ী মাইক্রোফোন দু প্রকার। যথা :

১. প্রেসার অপারেটেড মাইক্রোফোন : কোনো কথা বা বাদ্যযন্ত্রের শব্দতরঙ্গ এ ধরনের মাইক্রোফোনের সামনের বায়ুতে চাপের তারতম্য ঘটালে শব্দতরঙ্গ মাইক্রোফোন কর্তৃক ইলেকট্রিক্যাল তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের মাইক্রোফোনের অপর নাম সাউন্ড ওয়েভ মাইক্রোফোন। এটি কয়েক ধরনের হয়ে থাকে : কার্বন মাইক্রোফোন, ডায়নামিক মাইক্রোফোন, ক্রিস্টাল মাইক্রোফোন, কনডেনসার মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

২. ভেলোসিটি মাইক্রোফোন : এ ধরনের মাইক্রোফোন তার কাজের জন্য বাতাসের চাপের পরিবর্তে বাতাসের ভেলোসিটির ওপর নির্ভরশীল।

যেভাবে কাজ করে : মাইক্রোফোনের সামনে যখন কোনো শব্দ করা হয় তখন ঐ শব্দের ফলে সৃষ্ট কম্পিত বায়ু মাইক্রোফোনের মধ্যস্থিত ডায়াফ্রামের পাতলা ধাতব পাতকে আঘাত করে। ফলে ডায়াফ্রাম কাঁপতে থাকে। ডায়াফ্রামের কম্পন হচ্ছে তরঙ্গের অবিকল প্রতিরূপ এবং শব্দতরঙ্গ তখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত সঙ্গীত, কথা ইত্যাদিকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়।

খ. Generator ও Electric motor বলিতে কি বুঝায়? এদের পার্থক্য কি কি? ২.৫

উত্তর : জেনারেটর : Generator একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, যা যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এর ভিতরে থাকে কয়েল জড়ানো আর্মেচার (Armature) ও বাইরের ফ্রেমে থাকে বৈদ্যুতিক চুম্বক। যখন যন্ত্রের সাহায্যে আর্মেচারের সঙ্গে সংযুক্ত Shaft-কে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচারের কয়েলগুলো চুম্বকের ফ্লাক্স (Flux)-কে Cut করে। ফলে Faraday-এর Electromagnetic Induction সূত্র অনুসারে আর্মেচারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা Brush-এর সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়।

ইলেকট্রিক মটর : ইলেকট্রিক মটর হচ্ছে এমন এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে তা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। মোটরের গঠন জেনারেটরের মতোই; তবে এতে যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তখন কয়েলসহ আর্মেচার (Armature) যান্ত্রিক শক্তি লাভ করে এবং তা ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত রীতি (Fleming's left hand rule) অনুসারে ঘুরতে থাকে।

গ. বৈদ্যুতিক মিটার কি? এখানে বিদ্যুৎ কিভাবে কাজ করে? ২.৫

উত্তর : বৈদ্যুতিক মিটার হলো এক ধরনের যন্ত্র যার মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তির পরিমাপ প্রধানত কিলোওয়াট-ঘণ্টায় হিসাব করা হয়।

বৈদ্যুতিক মিটারের মাধ্যমে ঘন ঘন উত্থান পতন ঘটে না এমন কোনো ডিসি বর্তনীতে সাধারণ ধরনের ডিসি ভোল্টমিটার এবং অ্যামিটার ব্যবহার করে একই সঙ্গে ভোল্টের এবং বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রকৃত মান লক্ষ্য করে সহজেই বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাপ করা যায়। ঘন ঘন পরিবর্তনশীল ডিসি প্রবাহ বা এসি বর্তনীতে বৈদ্যুতিক মিটারের সাহায্যে অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ প্রবাহ ও ভোল্টেজ মান এর গুণফল এবং সেগুলোর গড় নিয়ে বিদ্যুৎ শক্তির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

ঘ. চুম্বক ও চৌম্বক পদার্থ বলিতে কি বুঝায়? এদের পার্থক্য কি কি? ২.৫

উত্তর : যেসব পদার্থের আকর্ষণী ও দিকদর্শী ধর্ম আছে ও যাদের সাহায্যে পদার্থে চুম্বক ধর্ম প্রদান করা যায় তাকে চুম্বক বলে। যেসব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয় এবং যাদেরকে চুম্বকে পরিণত করা যায় তাদেরকে চৌম্বক পদার্থ বলে। চুম্বক দিকনির্দেশ করে কিন্তু চৌম্বক পদার্থ দিকনির্দেশ করে না। দুটি চুম্বকের সমধর্মী দু'প্রান্ত কাছে আনলে তারা পরস্পর বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত দুটি প্রান্ত কাছে আনলে পরস্পর আকর্ষণ করে। চৌম্বক পদার্থের ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে এ রকম আকর্ষণ বা বিকর্ষণ নেই।

৩০তম বিসিএস : ২০১১

প্রযুক্তি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ৬ নং প্রশ্নের উত্তর এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

৬. ক. পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার বলিতে কি বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি হবে? ৪

উত্তর : পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার (Fifth Generation Computer) : Super VLSI (Very Large Scale Integration) চিপ ও অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার তৈরি হবে। এটি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রচুর ডেটা ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার। এ কম্পিউটারের বিশেষত্ব হলো প্রতি সেকেন্ডে ১০০ থেকে ১৫০ কোটি লজিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের কণ্ঠস্বর সনাক্ত করার ক্ষমতা ও কণ্ঠে দেয়া নির্দেশ বুঝতে পেরে কাজ করতে পারবে এ কম্পিউটার। আমেরিকা ও জাপান পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার চালুর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য :

১. বহু মাইক্রোপ্রসেসরবিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।
২. কৃত্রিম বুদ্ধির ব্যবহার।
৩. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবারের (Optical Fiber) ব্যবহার।
৪. প্রোগ্রাম সামগ্রীর উন্নতি।
৫. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ।
৬. চৌম্বক বাবল মেমরি।
৭. ডেটা ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
৮. অধিক সমৃদ্ধশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার।
৯. বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার-কম্পিউটারের উন্নয়ন ইত্যাদি।

খ. Power point কি? কার্যক্ষেত্রে Power point-এর ব্যবহারগুলো কি কি? ৪

উত্তর : Power point হচ্ছে মাইক্রোসফট কর্তৃক বাজারজাতকৃত প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম। এটি মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ ও অ্যাপলের ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমে চালনা করা যায়।

Power point এর ব্যবহার :

১. Slide প্রস্তুত করা ও প্রদর্শন করা;
২. বিজ্ঞাপন তৈরি করা;
৩. বোর্ড রুম প্রেজেন্টেশন;
৪. সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শব্দ ও লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

গ. ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কি এবং কিভাবে কাজ করে? ৪

উত্তর : ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো টেলিফোন ও ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তর। এ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার হিসাবের মধ্যে প্রকৃত অর্থের আদান-প্রদান না ঘটিয়ে শুধু হিসাবের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণের সমন্বয় সাধন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। লেনদেন কার্যে সুবিধা ও নিরাপত্তার নিমিত্তে ব্যাংকে অটোমেটেড টেলার টার্মিনাল ব্যবহার করা

হয়। ডেটা দিয়ে ব্যাংকের লেনদেন কার্য সম্পাদনের জন্য চৌম্বক কালির রেখা বিশিষ্ট ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করা হয়। সংক্ষিপ্ত কী প্যাডের মাধ্যমে ডেটা দেয়া হয় এবং ব্যাংক কার্ড টার্মিনালে প্রবেশ করানো হয়। ফেরৎ সংকেতের জন্য ক্ষুদ্রাকার ভিডিও ডিসপ্লে ও প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড ব্যাংকের কম্পিউটারে ইনপুট করে দিনে রাতে যে কোনো সময় টাকা তোলা যায়। কম্পিউটারই গ্রাহকের স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখে, এর জন্য কোনো কর্মীর প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অটোমেটেড টেলার মেশিনগুলোকে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হয়। ফলে ব্যাংকের ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। অটোমেটেড টেলার মেশিনের সাহায্যে ব্যাংকে সার্বক্ষণিক গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

ঘ. Band width কি? Amplifier এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন। ৪

উত্তর : Band width : Band width হচ্ছে ডেটা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চ্যানেল। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন মাত্রায় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সময় উক্ত চ্যানেলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির ব্যবধান।

Amplifier কে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যুগল বর্তনীর উপর ভিত্তি করে দুইভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যথা- (১) রোধ-ধারক যুগল বিবর্ধক (R-C Coupled Amplifier) ও (২) ট্রান্সফর্মার যুগল বিবর্ধক (Transformer Coupled Amplifier)। আবার কাজের ধরন অনুসারে Amplifier কে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- (১) Class A (২) Class B (৩) Class C ও (৪) Class D।

ঙ. Direct current ও Alternating current বলিতে কি বুঝায়? এদের পার্থক্যগুলো কি কি? ৪

উত্তর : Direct current (সম প্রবাহ) : যখন কোনো বর্তনীর মধ্য দিয়ে একদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাকে সম প্রবাহ বা একমুখী (DC) প্রবাহ বলে।

Alternating current (পরিবর্তী প্রবাহ) : যে তড়িৎ প্রবাহের মান সবসময়ে পরিবর্তনশীল এবং তড়িৎ প্রবাহের দিকও কিছুক্ষণ পর পর বদলায় তাকে পরিবর্তী প্রবাহ (AC) বলে।

DC ও AC-এর মধ্যে পার্থক্য : সম-প্রবাহ (DC) এবং পরিবর্তী প্রবাহের (AC) মধ্যে মূলগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

সম প্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ	পরিবর্তী প্রবাহ
১. সম প্রবাহের অভিমুখ সর্বদা স্থির থাকে।	১. পরিবর্তী প্রবাহের মুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিবর্তিত হয়।
২. সম প্রবাহের মান স্থির থাকে, আবার নাও থাকতে পারে।	২. পরিবর্তী প্রবাহের মান একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন হয়।
৩. সম প্রবাহ ওহমের সূত্র ও কারসফের সূত্র মেনে চলে।	৩. পরিবর্তী প্রবাহ ও পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তির সম্পর্ক বর্তনীর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। এটি ওহম এবং কারসফের সূত্র মেনে চলে না।

৭. ক. মাউস কি? মাউসের কাজ কি কি? কী বোর্ড ও মাউসের পার্থক্য উল্লেখ করুন। ৬

উত্তর : মাউস হলো তারের সাহায্যে সংযুক্ত ছোট একটি যন্ত্র। এটি দেখতে অনেকটা ইঁদুর সদৃশ যা দিয়ে কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া হয়। এটি একটি জনপ্রিয় বহুল ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইস।

মাউসের কাজ :

- মাউস এর সাহায্যে কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করা যায়।

- মাউসকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের পর্দার কার্সর ওঠা-নামা করানো যায়।
- মাউসের সাহায্যে মনিটরের পর্দায় বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে লেখা, ছবি আঁকা, গ্রাফ তৈরি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণসহ আরো বহু প্রকারের কাজ করা যায়।

মাউস ও কী বোর্ড এর মধ্যে পার্থক্য :

- মাউস হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত একটি পয়েন্টিং ডিভাইস। এটি কী বোর্ডের নির্দেশ প্রদান ছাড়াই একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে কী বোর্ড দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটারের মতো। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। কী বোর্ডকে কনসোলও (Console) বলে।
- মাউস হচ্ছে একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন ইনপুট সিস্টেম। পক্ষান্তরে, কী বোর্ড হচ্ছে একটি ধীরগতি সম্পন্ন ইনপুট সিস্টেম।
- মাউস এর সাহায্য ছাড়া কম্পিউটার পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু কী বোর্ড ছাড়া কম্পিউটার এর অনেক কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
- মাউস-এ সাধারণত দুটি বা তিনটি বাটন থাকে। যেমন রাইট বাটন ও লেফট বাটন। কিন্তু কী বোর্ডে বর্ণ কী ছাড়াও অনেকগুলো মডিফায়ার কী (Modifier key) থাকে।
- কী বোর্ড দ্বারা কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য বাংলা বা ইংরেজি টাইপসহ অনেক নিয়মকানুন জানতে হয়। পক্ষান্তরে, মাউস এর সাহায্যে কম্পিউটারে নির্দেশনা প্রদান করতে তেমন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।
- কী বোর্ডের সাহায্যে অনেক জটিল কাজ সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু মাউসের সাহায্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায় না।
- কী বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করা যায়। কিন্তু মাউস এর সাহায্যে টাইপ করা সম্ভব নয়।

খ. Optical Mark Reader (OMR) কি? এর ব্যবহার লিখুন। OMR এর সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।

উত্তর : OMR (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) : এটি এমন একটি যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ বুঝতে পারে। পেন্সিলের দাগ বুঝা যায় পেন্সিলের সীসের উপাদান গ্রাফাইটের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বিচার করে। কালির দাগ বুঝা যায় কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করে। বিশেষ ব্যবস্থায় এ দাগগুলো তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন ঘটায়, ফলে কম্পিউটার দাগের অস্তিত্ব বুঝতে পারে।

OMR-এর ব্যবহার :

সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, জনমত জরিপ, আদমশুমারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। OMR ব্যবহারের জন্য প্রথমে কাগজের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি ছকের বিভিন্ন ঘর কালি অথবা নরম পেন্সিল দিয়ে পূরণ করতে হয়। OMR পূরণ করা চিহ্নের সংকেত কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রেরণ করে। যে ঘরের চিহ্ন পূরণ করা হয় সেই ঘরে আলোর প্রতিফলন ঘটে এবং যে ঘরের চিহ্ন পূরণ করা হয় না সে ঘরে আলো প্রতিফলিত হয় না। পূরণ করা ঘরগুলোর ভিত্তিতে তৈরি সংকেত কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে প্রেরিত হয়। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা প্রসেসর সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে ঐসব সংকেত থেকে প্রকৃত তথ্য গঠনপূর্বক ফলাফল বা আউটপুট প্রদান করে থাকে।

সুবিধা :

১. কোনো উত্তরপত্র বা ডকুমেন্ট পরীক্ষা করলে ভুল বা পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না।
২. দ্রুতগতিতে পরীক্ষা করা যায়।

অসুবিধা :

১. পেন্সিলের গ্রাফাইটের উপাদানগত সমস্যা থাকলে পড়তে পারে না।
২. কালির উপাদানগত সমস্যা থাকলে পড়তে পারে না।
৩. দামি কাগজের প্রয়োজন হয়।

৮. ক. **Power point কি? Power point-এর ব্যবহারগুলো কি কি?** ৫

উত্তর : Power point হচ্ছে মাইক্রোসফট কর্তৃক বাজারজাতকৃত প্রেজেন্টেশন প্রোগ্রাম। এটি মাইক্রোসফট এর উইন্ডোজ ও অ্যাপলের ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমে চালনা করা যায়।

Power point এর ব্যবহার :

১. Slide প্রস্তুত করা ও প্রদর্শন করা।
২. বিজ্ঞাপন তৈরি করা।
৩. বোর্ড রুম প্রেজেন্টেশন।
৪. সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শব্দ ও লেখার মাধ্যমে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

খ. **লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN কি? কয়েকটি LAN এর উদাহরণ দিন। LAN এর উপকারিতা ও প্রয়োগগুলো লিখুন।** ৫

উত্তর : সাধারণত ১০ কিমি বা তার কম এরিয়ার মধ্যে বেশ কিছু কম্পিউটার টার্মিনাল বা অন্য কোনো পেরিফেরাল ডিভাইস সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছে—Local Area Network.

Ethernet Co-axial 10base2 Cable নামে যে কো-অক্সিয়াল ক্যাবলটি বাজারে প্রচলিত আছে তার দ্বারা LAN তৈরি করলে LAN-এর সর্বোচ্চ 185 Meter এবং একটি LAN-এ সর্বোচ্চ চারটি রিপিটার স্টেশন ব্যবহার করা যাবে।

কয়েকটি LAN হলো : পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN), হোম এরিয়া নেটওয়ার্ক (HAN), ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক (Campus Network) প্রভৃতি।

উপকারিতা :

১. প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম ইত্যাদি ডিভাইসগুলোর মধ্যে শেয়ারিং দেয়ার মাধ্যমে যে কোনো ইউজার (User) তার নিজস্ব ওয়ার্কস্টেশন থেকে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে পারে।
২. ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং সুবিধা পাওয়া যায়।
৩. ইলেকট্রনিক মেইলিং সিস্টেমে সুবিধা হয়।

প্রয়োগ : সাধারণত বাড়ি, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, কম্পিউটার ল্যাবরেটরী, কোনো বড় অফিস বিল্ডিং এবং পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি বিল্ডিং-এ LAN ব্যবহার করা হয়।

৯. ক. **Fiber optic কত প্রকার ও কি কি? Optical fiber-এর মাধ্যমে কিভাবে ডাটা আদান প্রদান করা যায়?** ৫

উত্তর : ফাইবার অপটিকের প্রকারভেদ : ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ফাইবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index fiber)
২. গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index fiber) ও
৩. মনোমোড ফাইবার (Monomode fiber)

স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং এর ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে। কোরের প্রতিসরাঙ্কের ভিন্নতার জন্য এ দু ধরনের ফাইবারের আলোক রশ্মির গতিপথও ভিন্ন হয়। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের ব্যাসার্ধ বেশি।

প্রেরক যন্ত্র, প্রেরণ মাধ্যম এবং গ্রাহক যন্ত্র—এ তিনটি মূল অংশ নিয়ে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সংগঠিত। প্রেরক যন্ত্র উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ফাইবারের মাধ্যমে তা গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়।

অপটিক্যাল ফাইবার সরাসরি অ্যানালগ বা ডিজিটাল ডেটা পরিবহনে সক্ষম নয়। একে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মডুলেটর ও লাইট ইমিটিং ডায়োডের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গে পরিণত করে ফাইবারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোক রশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্রে মূলত দুটি অংশ থাকে— ফটো ডিটেকটর এবং প্রসেসিং ইউনিট। ফটো ডিটেকটরের কাজ হলো ফাইবার থেকে ডেটা উদ্ধার করা (Detection)। প্রসেসিং ইউনিটে থাকে অ্যামপ্লিফায়ার, ফিল্টার, ডিমডুলেটর ইত্যাদি। এরা ডেটাকে যথার্থভাবে ডিমডুলেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন এবং ফিল্টারেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়।

খ. **ই-মেইল কি? ই-মেইল অ্যাড্রেসের মূল গঠন কি রকম? E-mail এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো লিখুন।** ৫

উত্তর : ই-মেইল হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর কাজ হচ্ছে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা ফ্যাক্স মেশিনে তথ্য পাঠানো। এটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। পোস্টাল ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা যেমন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারি তেমনি কম্পিউটারের সাহায্যেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা যায়। অতএব, কম্পিউটারের সাহায্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের এ ব্যবস্থাকে বলে ই-মেইল।

ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে চাইলে প্রত্যেকের একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস (E-mail Address) থাকা জরুরি। এ ঠিকানা Username @ Domain নিয়ে গঠিত হয়। যেমন ananda@bdlink.com.bd একটি ই-মেইল ঠিকানা। এখানে Username হলো ananda এবং @ চিহ্নের পরের অংশকে বলে Domain name; Domain name (.) চিহ্ন দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়। এটিই হচ্ছে ই-মেইল অ্যাড্রেসের মূল গঠন।

ব্যবহারের সুবিধা : বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিফোন বা ফ্যাক্সে মিনিটে যেখানে ৩০ টাকার উপর খরচ হয় সেখানে E-mail-এ খরচ হয় ১ টাকারও কম।

যদি কোনো ঠিকানায় বারবার ই-মেইল পাঠাতে হয় তবে সে ঠিকানাসমূহ Address book-এ সংরক্ষিত করে রাখা যায়। এ ক্ষেত্রে সুবিধা হলো ই-মেইল করার সময় সে ঠিকানা পুনরায় টাইপ করতে হয় না।

- এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন দ্রুততর তেমনি বিশ্বস্ত ও সাশ্রয়ী।
- Autoresponders প্রোগ্রাম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় ই-মেইল পাঠানো সম্ভব।
- পোস্টাল মেইলে যেখানে প্রচুর কাগজ ব্যবহৃত হয় এবং সে কাগজ উৎপাদন করতে গিয়ে আবার অনেক ব্যয় করতে হয়। ই-মেইলের ক্ষেত্রে তা হয় না। ফলে অনেক সাশ্রয় হয়।
- অনেক সময় ই-মেইলের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ব্যবহার করে শুভেচ্ছা কার্ড এবং ছবি পাঠানো হয়ে থাকে।
- অনেক কোম্পানি ই-মেইলের মাধ্যমে নিজ পণ্যের ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে।

অসুবিধাসমূহ :

- ই-মেইলের মাধ্যমে অনেক সময় কম্পিউটারে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়ে থাকে, যা কম্পিউটারের অনেক ক্ষতি করতে পারে।
- অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত মেসেজগুলো স্পাম (Spam) হিসেবে মেইলে এসে জমা হয়, যেগুলো চেক করা এবং বাতিল করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়।
- ই-মেইল খুলতে গিয়ে হ্যাকিং (Hacking)-এর মাধ্যমে অনেক সময় কম্পিউটারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
- ই-মেইল পাঠাতে গিয়ে অনেক সময় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- কোনো মেইল যদি খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয় তবে প্রাপক অনেক সময় পড়তে গিয়ে বিরক্তি বোধ করতে পারে।
- ব্যবসায়িক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন জরুরি লেনদেন এবং বিশেষ করে অনেক সময় প্রযোজ্য স্বাক্ষর গ্রহণ এগুলো ই-মেইলের মাধ্যমে করা যায় না।
- এক্ষেত্রে অনেক সময় কম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজের মাধ্যমে ইনবক্স লোড হয়ে যেতে পারে।
- মেইল আপডেট করতে হলে নিয়মিত চেক আপ করতে হয় যা অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১০. ক. **Uninterrupted Power Supply (UPS) কি? এটি কেন ব্যবহার করা হয়? ব্যবহারগুলো লিখুন।** ৫

উত্তর : ইউপিএস হলো এক বিশেষ ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই, যা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এর পূর্ণ নাম Uninterrupted Power Supply. আমাদের দেশে বিদ্যুৎ কখন যায়, কখন আসে এর কোনো নিয়মনীতি নেই। হয়তো দিনভর অনেক কাজ কম্পিউটারে জমা হয়েছে। ভুলবশত সেগুলো সেভ করা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে তখন সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে বা মুছে যাবে। এতে করে সারা দিনের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এ কাজগুলো পুনরায় করতে হবে। এ অসুবিধা দূর করা এবং আকস্মিক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য ইউপিএস বা আনইন্টারাপটেড পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ইউপিএস-এর ব্যাটারি বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। ফলে হঠাৎ করে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন ইউপিএস সাধারণত এক থেকে দুই মিলি সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাটারিতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ থেকে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। প্রকারভেদে ইউপিএস দশ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। ইউপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে র‍্যামের ডাটার ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

খ. **Facebook কি? Facebook-এর ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন।** ৫

উত্তর : ফেসবুক হলো সামাজিক যোগাযোগের (সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং) একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। এটি ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা। এই জনপ্রিয় ওয়েবসাইটটি ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

সুবিধা :

১. ফেসবুক বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোকজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
২. বিদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ফেসবুক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৩. ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ফেসবুক একটি ভালো মাধ্যম।
৪. ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত প্রদান, কিংবা ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা আদান-প্রদান করা যায়।
৫. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা খবর ফেসবুকের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সবার সাথে শেয়ার করা যায়।

অসুবিধা :

১. ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।
২. অফিস চলাকালীন সময়ে ফেসবুকের ব্যবহার কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
৩. ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।
৪. ফেসবুকে অনেকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করে।
৫. ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক সময় ব্যবহারকারীর ছবি বিকৃত করে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়।

২৯তম বিসিএস : ২০১০

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১ নম্বর প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. ক. **গ্রিন হাউস কাকে বলে? গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? এই ইফেক্ট বা প্রক্রিয়ার নাম এরূপ হলো কেন?** ৪

উত্তর : গ্রিন হাউস : শীতপ্রধান দেশে যে কাচের ঘরের মধ্যে গাছপালা লাগানো হয়, তাকে গ্রিন হাউস বলে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট : বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট নামকরণের কারণ : শীতপ্রধান দেশগুলোতে গাছপালাকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাচ দিয়ে ঘেরা জায়গা বা ঘরের মধ্যে লাগানো হয়। দিনের বেলায় সূর্য হতে বিকীর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তাপ কাচের দেওয়াল ভেদ করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে। এর ফলে গাছপালা ও মাটি গরম হয়। গরম মাটি ও গাছপালা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপ বিকিরণ করে। এই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ কাচ ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। ফলে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণ পরিবেশে গাছপালা ভালোভাবে জন্মাতে পারে।

গ্রিন হাউসের ক্ষেত্রে কাচ যেমন সূর্য হতে আগত তাপকে আটকে রাখে, তদ্রূপ বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে পৃথিবীর বাইরে যেতে দেয় না। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গ্রিন হাউস ইফেক্ট নামে পরিচিত। গ্রিন হাউসের সাথে প্রক্রিয়াটির সাদৃশ্যের কারণেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

ঘ. কৃষি ও স্বাস্থ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বর্ণনা করুন। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সাফল্য কতটুকু? ৪

উত্তর : কৃষিক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার :

(i) বিভিন্ন শস্যের নতুন প্রজাতি উদ্ভাবনে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করা হয়।

(ii) পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

(iii) পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের মধ্যে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান যেমন : প্রোটিন, ভিটামিন, কার্বোহাইড্রেট ইত্যাদির পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বাংলাদেশে বিনা (BINA) নামক প্রতিষ্ঠান পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ফসলের নতুন নতুন প্রজাতি উদ্ভাবন করে চলেছে।

স্বাস্থ্যে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার :

(i) ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়।

(ii) মানবদেহের রক্তনালীর ক্ষতিগ্রস্ত অংশ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়।

(iii) নিউক্লিয়ার ইমেজিং-এর মাধ্যমে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা পরিমাপ করা যায়।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে।

৩. ক. কোলেস্টেরল কি এবং মানবদেহে এটি কি ক্ষতি করে? ৩

উত্তর : কোলেস্টেরল হচ্ছে এক ধরনের স্টেরয়েড এলকোহল, যা সকল প্রাণিদেহের কোষ ঝিল্লিতে পাওয়া যায় এবং রক্তরসের মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয়।

মানবদেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্তনালী সংকীর্ণ হয়ে যায়। রক্তনালী সংকীর্ণ হওয়ার কারণে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে স্ট্রোক ও হৃদরোগ দেখা দেয়।

খ. "সুস্থ পৃথিবীর জন্য চাই সুস্থ সমুদ্র"– এই স্লোগানের ওপর মন্তব্য করুন। ২

উত্তর : যেহেতু ভূ-পৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থানই দখল করে আছে সমুদ্র, কাজেই সুস্থ সমুদ্র ব্যতীত সুস্থ পৃথিবী কল্পনাতীত। সমুদ্রের পরিবেশ দূষিত হলে এর প্রভাব স্থলভাগের ওপরও পরিলক্ষিত হয়। সমুদ্রদূষণ পৃথিবীর সমস্ত জীবকুল ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব সৃষ্টি করে। কাজেই সুস্থ পৃথিবীর জন্য সুস্থ সমুদ্রের কোনো বিকল্প নেই।

গ. বন উজাড়ের ফলে পরিবেশের কি ক্ষতি হয়? ২

উত্তর : গাছপালা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বন উজাড়ের ফলে গাছপালার পরিমাণ কমে যাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভাবে বন উজাড়ের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ঘ. নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা করুন এবং কৃষিতে এর উপকার ব্যাখ্যা করুন। ৩

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বিদ্যমান। বজ্রবৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড, পরবর্তীতে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং শেষে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড গঠিত হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক

এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পড়ে এবং মাটির ক্ষারকীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে মাটিতে মিশে যায়। উদ্ভিদ মূল দ্বারা মাটি থেকে নাইট্রেট লবণ ও নাইট্রোজেন সার শোষণ করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে পরিণত করে। প্রাণিকুল উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করে। এরূপে উদ্ভিদ থেকে প্রাণিদেহে প্রোটিনরূপে নাইট্রোজেন স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ ডিনাইট্রিফাইং জীবাণুর প্রভাবে বিয়োজিত হয়ে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এবং অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেন চক্র না থাকলে মাটিতে নাইট্রেট লবণের অভাব হতো। নাইট্রেট লবণের অভাব হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে কৃষির উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন হতো। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্রের উপকারিতা অনস্বীকার্য।

৪. ক. প্যারাসাইট ও ভাইরাস বলতে কি বোঝায়? এরা কিভাবে দেহকে রুগ্ন করে? ৩

উত্তর : প্যারাসাইট : যেসব জীব সারাজীবন বা জীবনের কোনো এক বা একাধিক পর্যায়ে জীবনধারণের জন্য ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীবদেহে বসবাস করে, তাদের প্যারাসাইট বা পরজীবী বলে। পোষকদেহ সব সময় পরজীবী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্যারাসাইট বা পরজীবীরা অনেক সময় পোষকদেহের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতি সাধন করে এবং বিষাক্ত দ্রব্য নিঃসৃত করে পোষকের মৃত্যু ঘটায়।

ভাইরাস : ভাইরাস হলো নিউক্লিক এসিড ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত এক প্রকার অতিআণুবীক্ষণিক অকোষীয় রোগ জীবাণু বা রাসায়নিক বস্তু, যা জীবকোষের ভেতরে সক্রিয় হয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবকোষের বাইরে জড় পদার্থের ন্যায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

কোনো জীব বা প্রাণিদেহের কোষে ভাইরাস সংক্রমণের পর এর নিউক্লিক এসিড কোষের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কোষের মধ্যে নিউক্লিক এসিড প্রবেশ করার পর এটি কোষের জেনেটিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং নিজের জন্য প্রয়োজনীয় নিউক্লিক এসিড তৈরি করতে থাকে। এভাবে পরবর্তীকালে ভাইরাসের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তৈরি হয় এবং তা একসঙ্গে সংশ্লেষিত হয়ে পোষক কোষকে বিনষ্ট করে নতুন নতুন ভাইরাস বিমুক্ত হয়। ফলশ্রুতিতে পোষকদেহ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

খ. আর্সেনিক কি? পানিতে কিভাবে আর্সেনিক দূষণ ঘটে? ৩

উত্তর : আর্সেনিক একটি ধাতব মৌল, যার পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩। ভূত্বকীয় শিলাখণ্ডে সালফার বা অন্যান্য ধাতু, যেমন– আয়রন, কোবাল্ট, নিকেল, সিলভার, টিন প্রভৃতির সাথে মিশ্রিত অবস্থায় আর্সেনিক পাওয়া যায়।

মাটিতে যৌগ হিসেবে আর্সেনিক থাকে। নলকূপের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর পানিশূন্য হয়। নলকূপের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন এ পানিশূন্য স্তরে পৌঁছে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক মুক্ত করে। এ মুক্ত আর্সেনিক নলকূপের পানির সাথে মিশে পানিতে আর্সেনিক দূষণ ঘটায়।

গ. রোগ নিরূপণে EEG, ECG এবং CT Scan-এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন। ৪

উত্তর : EEG (ইইজি) : EEG-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electroencephalography। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রম পরীক্ষার একটি পদ্ধতি হচ্ছে EEG। এ পদ্ধতিতে ঘাড় ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় তড়িৎদ্বার স্থাপনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রমকে গ্রাফ আকারে রেকর্ড করা হয়। মৃগী, স্ট্রোক প্রভৃতি রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসায় EEG ব্যবহৃত হয়।

ECG (ইসিজি) : ECG-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electrocardiography। হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যক্রম পরীক্ষার এ পদ্ধতি হলো ECG। এ পদ্ধতিতে দেহের বিভিন্ন জায়গায় বারটি তড়িৎদ্বার স্থাপনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক কার্যক্রমকে গ্রাফ আকারে রেকর্ড করা হয়। বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ সনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় ECG ব্যবহৃত হয়।

CT Scan (সিটি স্ক্যান) : এক্স-রে ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গের ত্রিমাত্রিক ইমেজ বা ছবি তৈরি করার পদ্ধতিকে সিটি স্ক্যান বলা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রথমে এক্স-রে ব্যবহার করে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গের অনেকগুলো দ্বিমাত্রিক ছবি তোলা হয়। পরবর্তীতে এ দ্বিমাত্রিক ছবিগুলোকে একত্রিত করে কম্পিউটারের সাহায্যে অঙ্গটির ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করা হয়। মস্তিষ্ক, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, প্লীহা এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত অস্বাভাবিকতা ও রোগ নির্ণয়ে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

৫. ক. স্থিরবিদ্যুৎ ও চলবিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩

উত্তর : স্থিরবিদ্যুৎ ও চলবিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য :

স্থির ও চলবিদ্যুতের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হলো স্থির চার্জ দ্বারা স্থিরবিদ্যুতের সৃষ্টি হয় কিন্তু গতিশীল চার্জ দ্বারা চলবিদ্যুতের সৃষ্টি হয়।

আবার, স্থির বিদ্যুতের সাথে শুধু বিদ্যুৎক্ষেত্র জড়িত থাকে। অপরদিকে চলবিদ্যুতের সাথে বিদ্যুৎক্ষেত্র ছাড়াও চৌম্বকক্ষেত্র জড়িত থাকে।

খ. ইলেকট্রিক কলিংবেল কিভাবে কাজ করে? ২

উত্তর : ইলেকট্রিক কলিংবেলের বোতাম চাপলে একটি বৈদ্যুতিক সংকেত উৎপন্ন হয়। এ বৈদ্যুতিক সংকেত তারের মধ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা অথবা স্পিকারে গিয়ে পৌঁছায়। স্পিকার অথবা ঘণ্টার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এটিই হচ্ছে সাধারণ ইলেকট্রিক কলিংবেলের মূল কার্যনীতি।

গ. চুম্বক এবং চুম্বকত্ব কাকে বলে? ২

উত্তর : চুম্বকত্ব এক প্রকার শক্তি এবং যে বস্তুর মধ্যে এ শক্তি আছে তাকে চুম্বক বলে।

ঘ. এক্স-রে কি? চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর গুরুত্ব কি? ৩

উত্তর : 10^{-11} মিটার থেকে 10^{-8} মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গকে এক্স-রে বলে। এক্স-রে এক প্রকার আড় তরঙ্গ যার গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শরীরের কোনো অংশের হাড় স্থানচ্যুত হলে, হাড় ভেঙে গেলে বা শরীরের কোনো অংশে অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু প্রবেশ করলে এক্স-রে দ্বারা তা ধরা যায়। এছাড়াও আলসার, ক্যান্সার, টিউমার, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ নির্ণয় এবং রোগের সঠিক চিকিৎসায় এক্স-রে ব্যবহৃত হয়।

২৯তম বিসিএস : ২০১০

প্রযুক্তি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

১. ক. মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন কি? এ প্রক্রিয়া কোথায় ব্যবহৃত হয় এবং কেন? ৪

উত্তর : ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে মডুলেশন বলে। আবার এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলে।

ডেটা যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেসব মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে টেলিফোন লাইন অন্যতম। টেলিফোন লাইনের মধ্য দিয়ে এনালগ সংকেত আদান-প্রদান হয়। কিন্তু কম্পিউটারে প্রদত্ত ডেটা ও তথ্য প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল সংকেত। কাজেই ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেত এবং এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করা প্রয়োজন। এজন্য ডেটা যোগাযোগ ব্যবস্থায় মডুলেশন ও ডিমডুলেশন ব্যবহৃত হয়।

খ. ট্রান্সফর্মার কি? ট্রান্সফর্মারের প্রধান উপাদান কি কি? ৬

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পরিবর্তী প্রবাহের বিভবকে উচ্চ থেকে নিম্নমান বা নিম্ন থেকে উচ্চমানে পরিবর্তন করা যায়, তাকে বিভব পরিবর্তক বা ট্রান্সফর্মার বলে। ট্রান্সফর্মার দুই প্রকার। যথা : আরোহী ট্রান্সফর্মার ও অবরোহী ট্রান্সফর্মার। ট্রান্সফর্মারের প্রধান উপাদানগুলো হলো কাঁচা লোহার কোর বা মজ্জা, মুখ্য তার কুণ্ডলী, গৌণ তার কুণ্ডলী ইত্যাদি।

গ. সিপিইউ (CPU) এবং সফটওয়্যার (Software) বলতে কি বোঝায়? ৬

উত্তর : সিপিইউ (CPU) : কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ বলে। সিপিইউ কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বা ব্রেইনস্বরূপ।

সফ্টওয়্যার : সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকে সফ্টওয়্যার বলে।

ঘ. ডেটা এবং ইনফরমেশনের পার্থক্য কি? ৪

উত্তর :

ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য

ডেটা বা উপাত্ত	ইনফরমেশন বা তথ্য
সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে।	ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ডেটা যা সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য (Useful)।
ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা।	ডেটাকে প্রসেস করে ইনফরমেশন পাওয়া যায়।
ডেটা পুরোপুরি কোনো ভাবার্থ প্রকাশ করে না।	ইনফরমেশন কোনো বিষয়ের ভাবার্থ প্রকাশ করে যা ব্যবহারকারী বুঝতে পারে।

ডেটা বা উপাত্ত	ইনফরমেশন বা তথ্য
ডেটা ইনফরমেশনের ওপর নির্ভর করে না।	ইনফরমেশন ডেটার ওপর নির্ভর করে।
উদাহরণ : ফলাফল, দ্বিতীয়, ০০১, মিরাজ, ০০২, প্রথম, সুমাইয়া, পরীক্ষা, বার্ষিক ইত্যাদি ডেটা।	উদাহরণ : বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল রোল নাম মেধাস্থান ০০১ মিরাজ প্রথম ০০২ সুমাইয়া দ্বিতীয়

২. **ইন্টারনেট কি? ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করুন।**

উত্তর : ইন্টারনেট : INTERNET-এর পূর্ণরূপ International Network বা Interconnected Networks। ইন্টারনেট পৃথিবী বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এটি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি নেটওয়ার্ক।

আরপানেট (ARPANET) দিয়ে ইন্টারনেটের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। এ নেটওয়ার্কের নাম আরপানেট।

১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol) প্রোটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ১৯৮৩ সালের আরপানেটে টিসিপি/আইপি প্রোটোকল ব্যবহার শুরু হয়। এরপর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়।

১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক (NSFNET) প্রতিষ্ঠার ফলে আরপানেটের প্রভাব কমে যায় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক উন্নয়নে শরীক হয়। অবশেষে ১৯৯০ সালে আরপানেটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি ইন্টারনেট নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৯ সালে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (বা সার্ভিস প্রোভাইডার) চালুর ফলে সকলের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইন্টারনেটের সুবিধাবলী নিচে আলোচনা করা হলো :

- □ **বিশাল তথ্যসম্ভার :** ইন্টারনেট তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। ইন্টারনেট দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য অনলাইন ডেটাবেস থেকে নানা রকম তথ্য আহরণ সম্ভব। সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য এসব ডেটাবেসে সংরক্ষিত আছে জার্নাল, ম্যাগাজিন, পুস্তক, খবরের কাগজ, নানা রকম পণ্যের বিজ্ঞাপন, বিমান, রেল ইত্যাদির সময়সূচি, আবহাওয়ার খবর, খেলার খবর, স্টক রিপোর্ট এবং আরও অনেক কিছু, যা সংক্ষেপে বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। অবস্থা এমন যে, যে কোনো প্রকার তথ্যের জন্য ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর দিন দিন এ তথ্যের সমারোহ বেড়েই চলেছে।
- □ **ইলেক্ট্রনিক মেইল (e-mail) :** যে কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তার যে কোনো তথ্য অন্য কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে পাঠাতে পারে। ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য পাঠানোর কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত এর দ্রুতগতি, এটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে তথ্য পৌঁছে দিতে পারে এবং তথ্য গ্রহীতা সে তথ্য গ্রহণ করতে পারে।

- □ **গবেষণা (Research) :** অনেক সময় একজন গবেষকের এমন কোনো তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে যা খুঁজে পাওয়া তার জন্য হতে পারে অত্যন্ত জটিল, সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ ব্যাপারটি অতি সহজে মাউস ক্লিক করে উদ্ধার করা যায়।
- □ **সফটওয়্যার :** ইন্টারনেট থেকে অজস্র সফটওয়্যার ডাউন-লোড করা যায় বিনা খরচে।
- □ **অনলাইন কেনাকাটা :** ইন্টারনেট এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিশাল বিপণি। একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে কেনা-কাটা করতে পারেন। অনলাইনের এ বাণিজ্যকে E-commerce বলে।

  এছাড়া ইন্টারনেটে অনেক ধরনের সেবা পাওয়া যায়। সেগুলো হলো Telnet, FTP, IRC, Video Conferencing, Iphone, Usenet, Archie, Gofer, Veronica & WAIS-সহ আরো অনেক কিছু। তাছাড়াও নিত্যনতুন উদ্ভাবনের ফলে ইন্টারনেটের সুযোগ সুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধা : ইন্টারনেট ব্যবহারের বহুবিধ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। বর্তমানে গোপন ও মূল্যবান তথ্য চুরি অথবা পরিবর্তন একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত হ্যাকাররা নেটওয়ার্কে আড়ি পাতে এবং নেটওয়ার্কে গমনরত ইনফরমেশনের পরিবর্তন ঘটায়। এছাড়া প্রায়ই ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভাইরাস ঢুকে পিসির ক্ষতি সাধিত হয়।

৩. **E-commerce কি? আধুনিক বিশ্বে এর ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করুন। Cyber-Criminal গণ কিভাবে এর অসাধু সুবিধা নিচ্ছে?**

উত্তর : ই-কমার্স (E-Commerce) : ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)-এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স (E-commerce)। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মধ্যে বিস্তৃত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনকে ই-কমার্স বলে।

E-Commerce-এর প্রয়োগ : ই-কমার্স দ্রুতগতিতে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি এ ধরনের লেনদেনের জন্য বহুল পরিচিত। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো স্থানের একটি ব্যাংক দূরবর্তী যে কোনো ব্যাংকের সাথে লেনদেনে সক্ষম। ফলে অবস্থানগত দূরত্ব বেশি বা কম হলেও আর্থিক লেনদেন একই সময়ে এবং দ্রুতগতিতে করা সম্ভব হচ্ছে।

ই-কমার্স ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়িক সমঝোতা ও বন্ধন তৈরির জন্য ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরের মধ্যে লেনদেন, চুক্তি এবং পরস্পরের ব্যবসা সম্বন্ধে জানার জন্য এক দেশ থেকে অন্য দেশে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সশরীরে যেতে হচ্ছে না। ই-কমার্স সুবিধা ব্যবসায়ীকে দূরবর্তী আরেকজন ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়িক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ই-কমার্স আজকের দিনে একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল হাতিয়ার। বিশেষত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অফিস এবং শাখা অফিসের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ই-কমার্স কাস্টমারকে উন্নত সার্ভিস প্রদানের সুবিধা দেয়। কম সময়ে কাস্টমার সার্ভিস প্রদান এবং সঠিক তথ্য প্রদান ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্য।

ই-কমার্স ব্যবসা-বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। যে কোনো পণ্য বা সেবা বিশ্বব্যাপী বিপণন করার জন্য কোম্পানিগুলো নিজস্ব ওয়েবসাইট অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

Cyber Criminal-গণ নানাভাবে E-Commerce-এর অসাধু সুবিধা নিচ্ছে। বর্তমানে পাসওয়ার্ড চুরি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাঙা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত Cyber-Criminal-গণ নেটওয়ার্কে আড়ি পাতে এবং গোপন তথ্য জেনে নেয়। এর ফলে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

৪. ক. ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট কি? বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। ৫

উত্তর : ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট : বৈদ্যুতিক বর্তনীতে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বলে। যেমন– পরিবাহী তার, রোধক, বৈদ্যুতিক বাল্ব, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি : বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কয়েকটি পদ্ধতি সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো :

তাপবিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে কয়লা, জ্বালানি তেল ইত্যাদি পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। তাপের সাহায্যে পানি বাষ্পীভূত হয় এবং পানির বাষ্পের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

জলবিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে পানির বিভব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টার্বাইন ঘোরানো হয়। টার্বাইনটি একটি তড়িৎ জেনারেটরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। ফলে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

সৌরবিদ্যুৎ : সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আলোক-তড়িৎ কোষ ব্যবহৃত হয়। আলোক-তড়িৎ কোষের ওপর ন্যূনতম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট সূর্যের আলো পতিত হলে আলোকশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বায়ুবিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে বায়ুশক্তি ব্যবহার করে পাখা ঘুরানো হয়। পাখাটি জেনারেটরের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে সাধারণত নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার সাহায্যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন তাপ ব্যবহার করে পানি বাষ্প তৈরি করা হয়। পানির বাষ্পের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

খ. RAM এবং ROM বলতে কি বোঝেন? ৫

উত্তর : র‍্যাম (RAM) : র‍্যাম (RAM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Random Access Memory। এটি কম্পিউটারের অস্থায়ী তথ্য রাখার ভাণ্ডার, যেখানে কম্পিউটারের প্রতি মুহূর্তে চলমান সব ডেটা এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। র‍্যামে সব তথ্য জমা থাকে অস্থায়ী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে। যার ফলে কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে এর সব তথ্য মুছে যায়, যা আর পুনরুদ্ধার করা কখনোই সম্ভব হয় না।

রম (ROM) : রম (ROM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Read Only Memory। এটি কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি। কম্পিউটার বন্ধ করলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে রমের স্মৃতিতে রক্ষিত সব তথ্যাবলী অক্ষত বা অপরিবর্তিত থাকে। রমের রক্ষিত তথ্যের কোনো সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় না।

৫. ক. Nuclear Power Generator কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে? ৫

উত্তর : নিউক্লিয় শক্তি (Nuclear Energy) উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় Nuclear power generator বা পারমাণবিক চুল্লি। এ চুল্লিতে নিউক্লিয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয় এবং উৎপন্ন তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

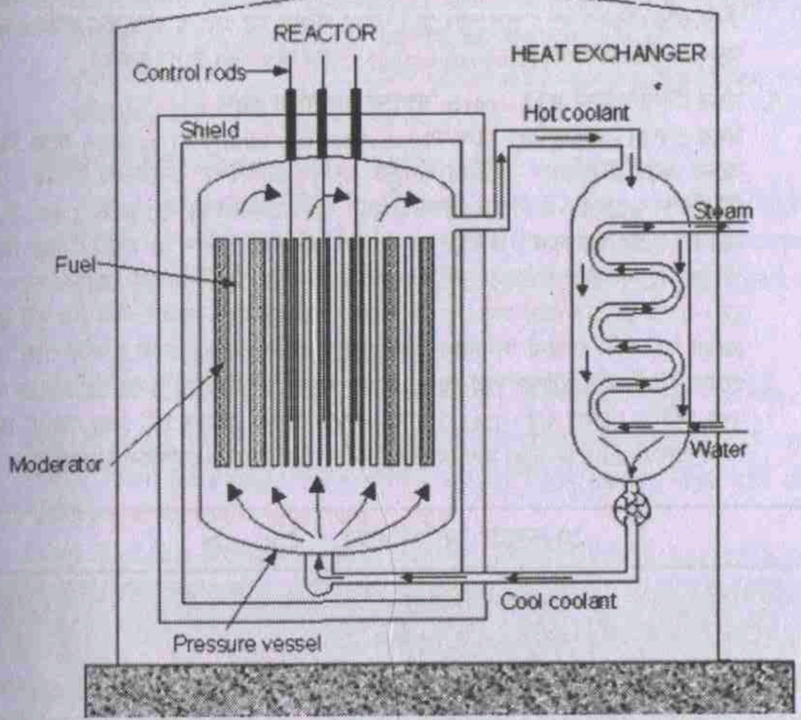

চিত্র : Nuclear power generator

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র, যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এ পাত্রের ভিতরে থাকে গ্রাফাইটের তৈরি চতুষ্কোণাকৃতি কতকগুলো ব্লক। এদেরকে মজ্জা (Core) বলা হয়। গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর কতকগুলো উলম্ব সরু নালীপথ থাকে। এসব নালীপথ ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। বোরন বা ক্যাডমিয়ামের কিছু দণ্ডকে ইউরেনিয়ামের পাশাপাশি রাখা হয়। এ দণ্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রক দণ্ড বলা হয়।

পারমাণবিক চুল্লিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়, তা দু'ধরনের পরমাণুর মিশ্রণ। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনোভাবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু বিভাজিত হলে এটি অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রতি ফিসন বা বিভাজনে ৩টি করে নিউট্রন সৃষ্টি হয় ও প্রতি বিভাজনে প্রায় 200 MeV শক্তি নির্গত হয়। এ নবজাত নিউট্রনগুলো পুনরায় আশপাশের অন্যান্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু তথা নিউক্লিয়াসের

বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয় এবং অতি অল্প সময়ে বহুসংখ্যক বিভাজনের ফলে অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদিত পারমাণবিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ক্যাডমিয়াম দণ্ডগুলোকে ওঠা-নামা করিয়ে শৃঙ্খল বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

পারমাণবিক চুল্লির কার্যকালীন সময়ে যে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তা সাধারণত উচ্চ চাপের কার্বন ডাই-অক্সাইড বা হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা বের করে আনা হয় এবং একটি বয়লারে রাখা পানির চারদিকে বেষ্টন করে ঘোরানো হয়। ফলে পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয় এবং এ বাষ্প দ্বারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে টার্বো জেনারেটর (Turbo-generator) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

খ. রঙিন টেলিভিশনের PAL system সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫

উত্তর : PAL-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Phase Alternate Line. PAL system হচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশে টেলিভিশন সম্প্রচারে ব্যবহৃত এনালগ টেলিভিশন এনকোডিং সিস্টেম। রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচারে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক রঙের প্রয়োজন। এ মৌলিক রংগুলো হলো লাল, নীল ও সবুজ। কিন্তু তিনটি মৌলিক রং একসাথে পাঠানো সম্ভব হয় না। এ জন্য রং তিনটিকে দুটি জোড়ায় ভাগ করা হয়। একটি জোড়ায় থাকে সবুজ ও নীল। অপর জোড়ায় থাকে লাল ও নীল। এ দুটি রঙের জোড়া বহনকারী কোনো সিগন্যাল যখন কোনো টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে তখন প্রয়োজনীয় তিনটি মৌলিক রংই পাওয়া যায়। ফলে টেলিভিশনের পর্দায় যে কোনো রঙিন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়। PAL সিস্টেম বলতে মূলত এভাবে দুটি ভিন্ন জোড়া রঙের সংমিশ্রণের (multiplexing) মাধ্যমে রঙিন ছবি সম্প্রচার করাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

২৮তম বিসিএস : ২০০৯

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : *ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে*]

১. ক. শব্দ দূষণ কি? এর ফলে কি ক্ষতি সাধিত হয়? Ultra-violet'র প্রভাবে মানবদেহের কি উপকার ও কি অপকার সাধিত হয়? ৪

উত্তর : শব্দ দূষণ : শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই শব্দ দূষণ বলা হয়।

শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিক : তীব্র শব্দযুক্ত পরিবেশের মধ্যে থাকলে শ্রবণ শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উচ্চ শব্দযুক্ত শিল্প কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদের শ্রবণ শক্তি দশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু-সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কমে আসে. মেজাজ খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার ও অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

মানবদেহের জন্য Ultra-violet ray'র উপকারি দিক :

i. Ultra-violet ray বা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানবদেহের ত্বকের নিচে ভিটামিন ডি তৈরি হওয়ার প্রাথমিক বিক্রিয়া সূচিত হয়।

ii. অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে আগে রিকেট, যক্ষ্মা (বিশেষত ত্বকের যক্ষ্মা) এবং আরো অনেক রোগের চিকিৎসা করা হতো। বর্তমানকালেও যে সকল রিকেটের রোগী ওষুধ হিসেবে ভিটামিন ডি সহ্য করতে পারে না, তাদের চিকিৎসার জন্য অতিবেগুনি রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

iii. এছাড়াও সোরিয়াসিস, ব্রন, পিটরিয়াসিস রেজিয়া প্রভৃতি ত্বকের ব্যাধির চিকিৎসাতেও অতিবেগুনি রশ্মির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানবদেহের উপর Ultra-violet ray'র ক্ষতিকর প্রভাব :

i. Ultra-violet ray বা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানবদেহের ত্বক লাল হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ যাবত অতিমাত্রায় অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের উপর পতিত হলে ত্বকে সৌর ক্ষত (sun burn) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে উপত্বকের কিছু কোষ মরে যায় এবং সেখানে রক্তরস ও শ্বেতকণিকা জমা হওয়ার ফলে ফোস্কা সৃষ্টি হয়।

ii. অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বকে ক্যান্সার হতে পারে।

iii. অতিবেগুনি রশ্মি চোখে প্রবেশ করলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এবং এর প্রভাবে চোখে ছানিও পড়তে পারে।

খ. Load Shedding কি? এবং কেন হয়? বাংলাদেশে কি কি উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়? ৪

উত্তর : Load Shedding : কোনো কারণে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে Load Shedding বলে।

Load Shedding-এর কারণ : সাধারণত চাহিদার তুলনায় পাওয়ার স্টেশনগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে Load Shedding হয়।

বাংলাদেশে গ্যাস, কয়লা, পানির বিভবশক্তি, বায়ুশক্তি, তেল ও সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এছাড়াও পাবনার রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গ. Petrol, Diesel এবং Kerosene-এর মধ্যে পার্থক্য কি? Antifreeze দ্রব্য কি? কি কাজে ব্যবহৃত হয়? ৪

উত্তর : Petrol, Diesel এবং Kerosene-এর মধ্যে পার্থক্য : Petrol, Diesel এবং Kerosene এদের প্রত্যেকেই সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ অ্যালকেন। তবে এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো এদের অণুতে বিদ্যমান কার্বন পরমাণু সংখ্যায়। Petrol-এর প্রতিটি অণুতে কার্বন পরমাণু সংখ্যা 5 থেকে 12 কিন্তু Diesel-এর প্রতিটি অণুতে কার্বন পরমাণু সংখ্যা 13 থেকে 18 এবং Kerosene-এর ক্ষেত্রে 12 থেকে 15।

Antifreeze দ্রব্য : কোনো তরল পদার্থের হিমাঙ্ক কমানোর জন্য তাতে যে দ্রব্য মেশানো হয় তাকে Antifreeze বা হিমায়ন-নিরোধক দ্রব্য বলে।

Antifreeze দ্রব্যের ব্যবহার : Antifreeze বা হিমায়ন-নিরোধক দ্রব্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পানির সঙ্গে অন্তর্দহ ইঞ্জিনে। এছাড়াও বিভিন্ন তাপ সঞ্চালক যন্ত্র যেমন সৌরপানি উত্তাপক যন্ত্রে (Solarwater heater) হিমায়ন-নিরোধক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

ঘ. রোগ প্রতিরোধের জন্য সাধারণত কি কি Vaccine ব্যবহার হয়? Heart attack ও Stroke এর মধ্যে পার্থক্য কি? ৪

উত্তর : রোগ প্রতিরোধে Vaccine : রোগ প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন ধরনের Vaccine ব্যবহার করা হয়। যেমন– যক্ষ্মা প্রতিরোধের জন্য BCG ভ্যাকসিন, ডিপথেরিয়া ও ধনুষ্টংকার প্রতিরোধের জন্য DPT ও DT ভ্যাকসিন, পোলিও প্রতিরোধের জন্য IPV ও OPV, জন্ডিস প্রতিরোধের জন্য হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি ভ্যাকসিন, হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি প্রতিরোধের জন্য দ্য হিব ভ্যাকসিন (The Hib Vaccine), হামের ভ্যাকসিন ইত্যাদি।

Heart attack (হার্ট অ্যাটাক) ও Stroke (স্ট্রোক)-এর মধ্যে পার্থক্য : কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (Coronary artery)। এ করোনারী ধমনী রক্তের জমাট বাধা পিণ্ড দ্বারা বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড অক্সিজেন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং দেখা দেয় হার্ট অ্যাটাক। অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে একটি হৃদরোগ। অপরদিকে স্ট্রোক হচ্ছে একটি মস্তিষ্কের রোগ। কোনো কারণে মস্তিষ্কের কোথাও রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালী ফেটে রক্তক্ষরণ হলে সেই অবস্থাকে স্ট্রোক বলে।

ঙ. Cyclone কি? Tornado'র সাথে এর পার্থক্য কি? Sidr কি? ৪

উত্তর : Cyclone (সাইক্লোন) : বায়ুমণ্ডলে বাতাসের ঘূর্ণনের দিক যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকের সদৃশ হয় তবে তাকে সাইক্লোন বলে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় শুধু তখনই বলা হয় যখন ভূ-পৃষ্ঠে বাতাসের বেগ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। সাইক্লোন দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে।

Tornado-র সাথে Cyclone-এর পার্থক্য : Tornado'র সাথে Cyclone-এর মূল পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

i. Cyclone অপেক্ষাকৃত বিস্তর বা ব্যাপক এলাকা জুড়ে সংঘটিত হয় কিন্তু Tornado তুলনামূলক ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। Tornado ঘূর্ণির ব্যাস সাধারণত ১০ মিটার থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।
ii. Tornado-এর তীব্রতা Cyclone-এর তীব্রতা অপেক্ষা সাধারণত বেশি হয়।
iii. Cyclone সাধারণত Tornado'র তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়। অর্থাৎ Tornado-এর স্থায়িত্বকাল Cyclone-এর তুলনায় অনেক কম।
iv. Tornado সাধারণত স্থলভাগেই উৎপত্তি লাভ করে থাকে, তবে স্থল ও সমুদ্র যে কোনো স্থানেই Tornado'র উৎপত্তি হতে পারে। অপরদিকে Cyclone সব সময়ই সাগর ও মহাসাগরে উৎপত্তি লাভ করে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

Sidr : Sidr একটি সিংহলি ভাষার শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'চোখ'। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় তার নামই হচ্ছে Sidr।

২. ক. Global warming বলতে কি বুঝেন? ২

উত্তর : Global warming : গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন অতিমাত্রায় বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী যে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাই Global warming নামে পরিচিত। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত তিনটি গ্যাসকে দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়। এই গ্যাস তিনটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ও নাইট্রাস অক্সাইড।

খ. পানি দূষণ বলতে কি বুঝেন? ইহার উৎস কি কি? ২

উত্তর : পানি দূষণ : যে প্রক্রিয়ায় পানির সাথে বিভিন্ন রোগজীবাণু, ময়লা-আবর্জনা বা বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত হয়ে পানি নিরাপদভাবে ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে তাকে পানি দূষণ বলে।

পানি দূষণের উৎস : বহুবিধ কারণে পানি দূষিত হয়। পানি দূষণের প্রধান কয়েকটি উৎস নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. কলকারখানা থেকে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত বর্জ্য ও ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ।
২. কৃষিকাজে ব্যবহৃত কীটনাশক ও রাসায়নিক সার।
৩. বিভিন্ন জলযান থেকে নিক্ষিপ্ত তেল, ময়লা-আবর্জনা ও মানুষের মলমূত্র।
৪. নদী বা খালের পাড়ে অবস্থিত শৌচাগার থেকে পতিত মানুষের মলমূত্র।
৫. মরা জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর মৃতদেহ।

এছাড়াও আরো নানাবিধ কারণে পানি দূষিত হয়।

গ. বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাপ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বাড়ে কেন? ২

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাপ বা পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর দুই মেরুতে যে বিশাল পরিমাণ বরফের স্তূপ সঞ্চিত রয়েছে তা গলতে শুরু করে। বরফ গলে পানিতে পরিণত হওয়ার ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায়।

ঘ. Pasteurization কি এবং কিভাবে করা হয়? ৪

উত্তর : Pasteurization (পাস্তুরায়ন) : কোনো তরল খাদ্য বা পানীয় বিশেষত দুধকে নির্দিষ্ট সময় যাবৎ নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে জীবাণু ধ্বংস করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে Pasteurization বা পাস্তুরায়ন বলে। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

পাস্তুরায়ন প্রক্রিয়া : দুধকে পাস্তুরিত করার জন্য ৬২.৮° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট যাবৎ উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়, এরপর দ্রুত ঠাণ্ডা করে ১০° সে. তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

৩. ক. CNG কি? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়? ২½

উত্তর : CNG (সিএনজি) : CNG-এর পূর্ণরূপ হলো 'Compressed Natural Gas'। যখন প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষত মিথেনকে (CH_4) উচ্চ চাপে সংকুচিত করে শক্ত সিলিন্ডার বা কনটেইনারে ভরে বাজারজাত করা হয় তখন তাকে CNG বলে।

CNG-এর ব্যবহার : পেট্রোল, ডিজেল ও প্রোপেন জ্বালানির বিকল্প হিসেবে CNG ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন যানবাহন যেমন– বাস, ট্রাক, ট্যাক্সিক্যাব, ট্রেন, অটোরিক্সা, এয়ারপোর্ট লিমুজিন ইত্যাদিতে জ্বালানি হিসেবে CNG ব্যবহৃত হয়।

খ. প্রাকৃতিক Gas কি? বাংলাদেশে এই Gas এ CH_4 এবং S এর শতকরা হার কি? ২½

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) : ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মিথেন থেকে বিউটেন পর্যন্ত অ্যালকেনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে প্রাকৃতিক গ্যাস বলা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইথিলিন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৯৫% থেকে ৯৯% এবং এ গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে সালফার প্রায় অনুপস্থিত।

গ. বায়ুমণ্ডলে Oxygen এর বিক্রিয়া আলোচনা করুন। ২½

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের দুটি প্রধান বিক্রিয়া সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো :

(i) বজ্র বৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে সৃষ্ট 3000°C তাপমাত্রায় বায়ুস্থ নাইট্রোজেন (N_2) ও অক্সিজেন (O_2) যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) গঠিত হয় এবং পরে 50°C তাপমাত্রায় অধিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাস এবং শেষে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড (HNO_3) গঠন করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :

$$N_2 (g) + O_2 (g) \xrightarrow[\text{3000°C তাপমাত্রা}]{\text{বিদ্যুৎ ক্ষরণ}} 2NO (g)$$

$$2NO (g) + O_2 (g) \xrightarrow{\text{50°C তাপমাত্রা}} 2NO_2 (g)$$

$$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3 (aq)$$

(ii) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি থেকে বায়ুতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হলে বায়ুস্থ অক্সিজেন থেকে ওজোন (O_3) গ্যাস উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$O_2 (g) + O (g) \rightarrow O_3 (g)$$

ঘ. Bio-gas কি? এর মধ্যে প্রধানত কি কি gas থাকে? এর প্রয়োগ কোথায়? ২½

উত্তর : Biogas (বায়োগ্যাস) : গোবর, মলমূত্র, পাতা, খড়কুটা প্রভৃতি পদার্থ পানির সাথে মিশিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতিতে রাখলে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ফারমেনটেশন প্রক্রিয়ায় এসব পদার্থ থেকে যে বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাই বায়োগ্যাস নামে পরিচিত।

Biogas-এর উপাদান : বায়োগ্যাস-এর প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস। এছাড়াও ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে নাইট্রোজেন (N_2), অ্যামোনিয়া (NH_3), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), হাইড্রোজেন (H_2) প্রভৃতি গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকতে পারে।

Biogas-এর প্রয়োগ : বর্তমানকালে নানাবিধ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাসের প্রয়োগ বা ব্যবহার লক্ষ করা যায়। বায়োগ্যাসের প্রধান কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

i. এ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ii. ম্যান্টেল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মতো ঘর আলোকিত করা যায়।

iii. বায়োগ্যাসের সাহায্যে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিডি ইত্যাদি চালানো যায়।
iv. পাম্প চালিয়ে কৃষিজমিতে সেচ প্রদান করা যায়।
v. এ গ্যাসের সাহায্যে গাড়ি চালানো যায়।

৪. ক. Antigen, Antibody ও Immunity কি? ৩

উত্তর : অ্যান্টিবডি রক্তে উৎপন্ন প্রতিরোধক পদার্থবিশেষ। দেহে যখন কোনো রোগজীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি প্রবেশ করে, তখন তাদের প্রতিহত করার জন্য লিম্ফোসাইট শ্বেত কণিকা থেকে এক প্রকার প্রোটিনজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। একে অ্যান্টিবডি বলে। অ্যান্টিবডি যেসব প্রোটিন কণাকে ধ্বংস করে বা যে প্রোটিনের প্রবেশের ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে। অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে প্রতিহত করার ক্ষমতাকে ইমিউনিটি বা অনাক্রমতা বলে।

খ. Antibiotic ও Antiseptic কি? উদাহরণ দিন। ৩

উত্তর : Antibiotic (অ্যান্টিবায়োটিক) : অণুজীব কর্তৃক উৎপাদিত এবং অন্যান্য অণুজীবের জন্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থকে Antibiotic (অ্যান্টিবায়োটিক) বলা হয়। পেনিসিলিন, নিওমাইসিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, ক্লোরামফেনিকল, টেরামাইসিন, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ইত্যাদি হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক-এর উদাহরণ।

Antiseptic (অ্যান্টিসেপটিক) : মানুষ কিংবা অন্য প্রাণীর শরীরে সংক্রামক জীবাণু ধ্বংস ও জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করার জন্য যে সকল ওষুধ ব্যবহার করা হয় তা অ্যান্টিসেপটিক নামে পরিচিত। অ্যান্টিসেপটিক দেহকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে পারে না কিন্তু দেহে জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। ক্লোরোহেক্সিডিন, ৬২.৫-৭০% ইথানল (ইথাইল অ্যালকোহল) দ্রবণ, ৩% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ ইত্যাদি হলো অ্যান্টিসেপটিকের উদাহরণ।

গ. Angins বলতে কি বুঝায়? Pacemaker কি? ৪

উত্তর : Angins (অ্যানজিন্স) : হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে প্রয়োজনের তুলনায় রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ কমে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয় তাকে Angina Pectoris (অ্যানজিনা পেকটোরিস) বলে। এই Angina Pectoris রোগটিই সংক্ষেপে Angina (অ্যানজিনা) বা Angins (অ্যানজিন্স) নামে পরিচিত। এ রোগে আক্রান্ত রোগীর করোনারী ধমনীগুলো (Coronary arteries) ৫০ থেকে ৭০ শতাংশেরও বেশি পরিমাণে সংকীর্ণ হয়ে যায়। ফলে ব্যায়াম ও অন্যান্য শারীরিক পরিশ্রমের সময় যখন হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে অতিরিক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তখন করোনারী ধমনী প্রয়োজনমতো অক্সিজেন সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে বুকে ভারী ও চাপবোধ অথবা ব্যথা অনুভূত হয়।

Pacemaker (পেসমেকার) : পেসমেকার একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ও দেড় ইঞ্চি চওড়া। আর মাত্র এক থেকে দুই মিলিমিটার পুরু। এতে একটা সূক্ষ্ম তার আছে, সেটা একটা ছোট রক্তনালীর মধ্য দিয়ে হার্টে চালিয়ে দেয়া হয়। একটা ছোট অপারেশন করে যন্ত্রটা বুকের চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই অপারেশনের মাত্র ৪/৫ দিন পর রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

পেসমেকারের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স মস্তিষ্ক আছে যা ওই সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে খবর পায় হার্ট চলছে না থেমে গেছে। হার্ট স্পন্দন থামলেই পেসমেকার বুঝতে পারে হার্টে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটেছে। তখনই পেসমেকারের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক ঐ তারের মধ্য দিয়েই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে পাঠিয়ে দেয়। হার্ট আবার পাম্প করতে আরম্ভ করে। এ ঘটনাগুলো এতো নিমিষে ঘটে যায় যে, হার্ট বন্ধ হয়ে ব্লাক আউট ইত্যাদি সমস্যার সূত্রপাতের কোনো অবকাশ থাকে না।

৫. ক. **একটি বৈদ্যুতিক plug এ ৩য় pin-এর কাজ কি?** ২

উত্তর : বৈদ্যুতিক plug-এ ৩য় pinটি আর্থ পিন (earth pin) বা গ্রাউন্ড পিন (ground pin) নামেও পরিচিত। এ পিনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ হলো বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহারকারীকে বৈদ্যুতিক শক (shock) থেকে রক্ষা করা। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বাইরের আবরণে বিদ্যুৎ চলে আসতে পারে। এ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি যদি যন্ত্রটি স্পর্শ করে তাহলে সে মারাত্মক রকম বৈদ্যুতিক শক পেতে পারে। কিন্তু ৩য় Pinটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রের বাইরের আবরণের সাথে যুক্ত থাকায় এর মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের ফিউজ পুড়ে যায়। ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ব্যবহারকারী বৈদ্যুতিক শক থেকে রক্ষা পায়। ৩য় পিন-এর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো অভ্যন্তরীণ শর্ট সার্কিটের কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা।

খ. **Optical glass কি?** ২

উত্তর : Optical glass (অপটিক্যাল গ্লাস) : Optical glass হচ্ছে স্বচ্ছ, সমসত্ত্ব ও উচ্চ প্রতিসরাঙ্কবিশিষ্ট বিশেষ এক ধরনের কাচ (glass)। বিভিন্ন ধরনের আলোকীয় যন্ত্রপাতি যেমন টেলিস্কোপ, বাইনোকুলার ইত্যাদির জন্য লেন্স তৈরির কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। Optical glass তৈরি করার সময় এর প্রতিসরাঙ্ক বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে টেমপারিং (Tempering) করা হয়ে থাকে।

গ. **Dry cell কি? দুটি Dry cell এর নাম লিখুন।** ২

উত্তর : Dry cell (শুষ্ক কোষ) : যে বিদ্যুৎ কোষে বিদ্যুৎ উত্তেজক হিসেবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের (NH_4Cl) পেস্ট এবং পোলারণ নিবারক হিসেবে কঠিন ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড (MnO_2) ব্যবহৃত হয় তাকে Dry cell বা শুষ্ক কোষ বলা হয়। **উদাহরণ :** কার্বন-জিঙ্ক কোষ ও লিথিয়াম আয়ন কোষ।

ঘ. **সাধারণ বৈদ্যুতিক bulb ও tube light এর মধ্যে পার্থক্য কি?** ৪

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক bulb(বাল্ব) ও tube light (টিউব লাইট)-এর মধ্যে পার্থক্য : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বে উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট টাংস্টেন ধাতুর তৈরি ফিলামেন্ট ব্যবহৃত হয় এবং বাল্বটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা পূর্ণ থাকে। ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন ফিলামেন্টটি খুব উত্তপ্ত হয় এবং আলো বিকিরণ করে। অপরদিকে টিউব লাইট হচ্ছে কাচের তৈরি বিদ্যুৎ ক্ষরণ নল যা নিম্নচাপে আর্গন ও পারদ বাষ্পের মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ থাকে। কাচ নলের ভিতরের দিকের দেয়ালে ফসফর নামক এক ধরনের প্রতিপ্রভ পদার্থের আবরণ থাকে এবং নলের দুপাশে দুটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার থাকে। ইলেকট্রোড দুটির মাধ্যমে নলের মধ্য দিয়ে উচ্চ বিভব পার্থক্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে বাষ্পীয় মিশ্রণ থেকে অতিবেগুনি রশ্মি নির্গত হয়। এই অতিবেগুনী রশ্মি ফসফর নামক প্রতিপ্রভ পদার্থের ওপর আপতিত হলে সেখান থেকে সাদা রঙের আলোক রশ্মি নির্গত হয়।

২৮তম বিসিএস : ২০০৯

প্রযুক্তি

সময় : ৩ ঘন্টা; পূর্ণমান : ১০০

[দ্রষ্টব্য : ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. ক. **Ohm's Law কি? এক Ohm বলতে কি বুঝেন?** ৪

উত্তর : Ohm's Law (ও'মের সূত্র) এর বিবৃতি : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ চলে তা পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক।

কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য V এবং স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহকের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহমাত্রা I হলে ও'মের সূত্রানুসারে,

$I \propto V$

বা, $I = GV$ .... (1)

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, একে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা বলে। G-এর বিপরীত রাশি $R = \frac{1}{G}$ সমীকরণ (1)-এ বসালে আমরা পাই,

$I = \frac{V}{R}$ .... (2)

এখানে R একটি ধ্রুব সংখ্যা, R-কে পরিবাহকের রোধ বলে এবং রোধ পরিমাপের একক হচ্ছে Ohm (ও'ম)। সমীকরণ (2) থেকে দেখা যায় যে, I = 1 Ampire (অ্যাম্পিয়ার) এবং V = 1 Volt (ভোল্ট) হলে R = 1 Ohm হয়। অর্থাৎ

যে পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে তার মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহ চলে সেই পরিবাহকের রোধকে এক Ohm (ও'ম) বলে।

খ. **Direct Current এবং Alternating Current বলতে কি বুঝেন?** ৬

উত্তর : Direct Current (সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ) : তড়িৎ প্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় বা সময়ের সাথে যদি তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে সে প্রবাহকে Direct Current (D. C) বা সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ বলে। তড়িৎ কোষ থেকে আমরা একমুখী প্রবাহ পাই।

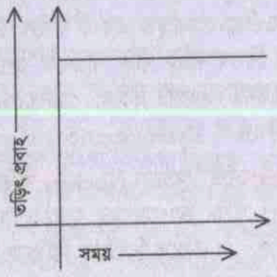

চিত্র : Direct Current

Alternating Current (পর্যাবৃত্ত বা পরিবর্তী প্রবাহ) : যে তড়িৎ প্রবাহ নির্দিষ্ট সময় পর পর দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহের দিক পর্যাবৃত্তভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে Alternating Current (A.C) বা পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা পরিবর্তী প্রবাহ বলে। আমাদের দেশে যে Alternating Current ব্যবহৃত হয় তা প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার দিক পরিবর্তন করে।

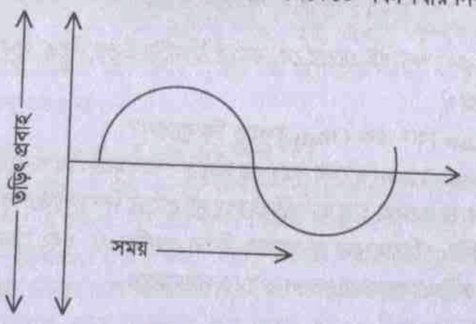

চিত্র : Alternating Current

গ. Dynamo ও Motor এর পার্থক্য কি? ৬

উত্তর : Dynamo (ডায়নামো) ও Motor (মোটর)-এর মধ্যে পার্থক্য :
যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তাকে Dynamo (ডায়নামো) বলে। তাড়িত চৌম্বক আবেশ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে Dynamo। অপরদিকে যে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা হয় তাকে বৈদ্যুতিক Motor (মোটর) বলে। বিদ্যুৎবাহী তারের ওপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক Motor। বস্তুতপক্ষে Dynamo ও বৈদ্যুতিক Motor একে অপরের সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য সম্পাদন করে থাকে।

ঘ. Hydroelectric power বলতে কি বোঝায়? ৪

উত্তর : Hydroelectric power : পানির বিভব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় তাকে Hydroelectric power বলে। পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকালে এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। পানির তলের উচ্চতা বা গভীরতা বৃদ্ধির ফলে এর মধ্যে অধিক বিভব শক্তি জমা হয়। কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় নিচের প্রান্তে বাঁধ দিয়ে এ কাজটি সাধারণত করা হয়ে থাকে। নদী থেকে আসা পানির প্রবাহ বাঁধে বাধা পেয়ে জমা হতে থাকে। ফলে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। হ্রদ পানিতে পূর্ণ হয়ে গেলে হ্রদ থেকে পানি একটি মোটা নলের ভিতর দিয়ে নিচে অবস্থিত একটি তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রবাহিত করা হয়। পানি পতনের সময় এর বিভব শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ গতি শক্তি একটি টার্বাইনকে ঘোরায়। টার্বাইনটি একটি তড়িৎ জেনারেটরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। এ জেনারেটরে তড়িৎ উৎপন্ন হয় যা Hydroelectric power নামে পরিচিত।

২. Nuclear power generator হতে কিভাবে Nuclear শক্তি উৎপন্ন করা হয়? ১০

উত্তর : নিউক্লিয় (Nuclear) শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় Nuclear power generator বা পারমাণবিক চুল্লি। এ চুল্লিতে নিউক্লিয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয় এবং উৎপন্ন তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

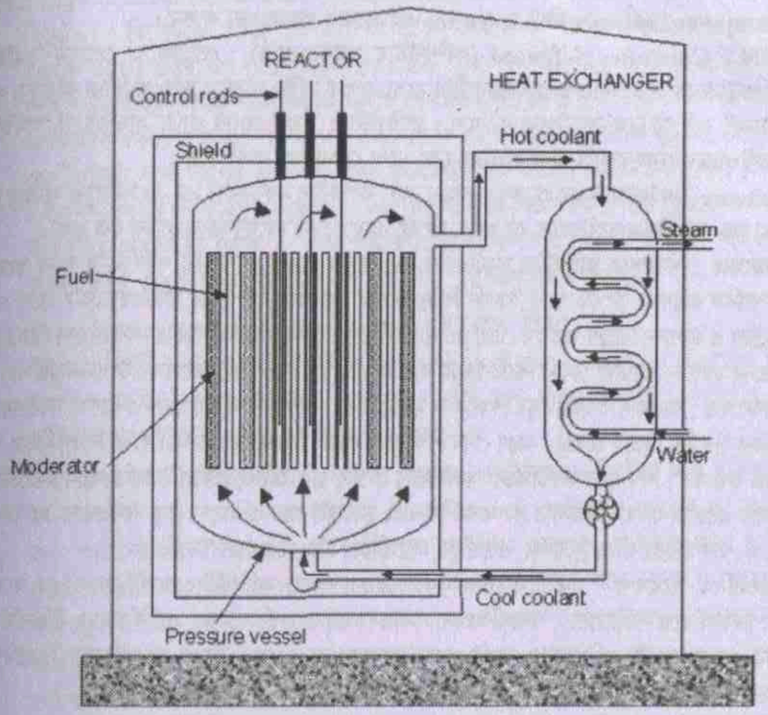

চিত্র : Nuclear power generator

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এ পাত্রের ভিতরে থাকে গ্রাফাইটের তৈরি চতুষ্কোণাকৃতি কতকগুলো ব্লক। এদেরকে মজ্জা (Core) বলা হয়। গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর কতকগুলো উলম্ব সরু নালীপথ থাকে। এসব নালীপথ ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। বোরন বা ক্যাডমিয়ামের কিছু দণ্ডকে ইউরেনিয়ামের পাশাপাশি রাখা হয়। এ দণ্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রক দণ্ড বলা হয়।

পারমাণবিক চুল্লিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়, তা দু'ধরনের পরমাণুর মিশ্রণ। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনোভাবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু বিভাজিত হলে এটি অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রতি ফিসন বা বিভাজনে ৩টি করে নিউট্রন সৃষ্টি হয় ও প্রতি বিভাজনে প্রায় ২০০ MeV শক্তি নির্গত হয়। এ নবজাত নিউট্রনগুলো পুনরায় আশেপাশের অন্যান্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু তথা নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয় এবং অতি অল্প সময়ে বহুসংখ্যক বিভাজনের ফলে অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদিত পারমাণবিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ক্যাডমিয়াম দণ্ডগুলোকে উঠা-নামা করিয়ে শৃঙ্খল বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

পারমাণবিক চুল্লির কার্যকালীন সময়ে যে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তা সাধারণত উচ্চ চাপের কার্বন ডাই-অক্সাইড বা হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা বের করে আনা হয় এবং একটি বয়লারে রাখা পানির চারদিকে বেষ্টন করে ঘোরানো হয়। ফলে পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয় এবং এ বাষ্প দ্বারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে টার্বো জেনারেটর (Turbo-generator) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

৩. **Computer Software কি? Software এর প্রয়োগ আলোচনা করুন।** ১০

উত্তর : Computer Software (কম্পিউটার সফটওয়্যার) : প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই কম্পিউটার সফটওয়্যার বলে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

Software (সফটওয়্যার)-এর প্রয়োগ : বর্তমান কালে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর বহু বিচিত্রমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর প্রধান কয়েকটি প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

শিল্পক্ষেত্র : শিল্পক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যাপক প্রয়োগ যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। রাসায়নিক কারখানা, ইস্পাত প্ল্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিল্পক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস কন্ট্রোল ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়াও রোবট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় কম্পিউটার সফটওয়্যার। রোবট বা এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো কোনো বিরতি ছাড়াই কাজ করতে পারে। ফলে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষাক্ষেত্র : আজকাল বাজারে প্রচুর শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এ ধরনের সফটওয়্যারের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ এসব শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের সাহায্যে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি হয় বিধায় এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষালাভ খুব আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। এ ধরনের কিছু সফটওয়্যার-এর উদাহরণ হলো : এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ওয়ার্ল্ড বুক, আমেরিকান টকিং ডিকশনারি ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা : বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান সব গবেষণাতেই কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার ব্যবহার করা হয়। কারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশ কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর সাহায্যে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা যায়।

প্রকাশনা শিল্প : পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রকাশনার জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কাঙ্ক্ষিত অবয়বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠা সাজানো, ভুল সংশোধন, সংরক্ষণ, প্যারা স্থানান্তর ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিং ও ডিটিপি প্যাকেজ সফ্‌ট্‌ওয়্যার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর ব্যবহার প্রকাশনা শিল্পে উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যতার এক অনন্য আবহ সৃষ্টি করেছে।

ডিজাইন তৈরি : শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে ইমারত, সেতু, পাতাল সড়ক, ফ্লাইওভার, রাস্তা, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদির ডিজাইন তৈরিতে কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার ব্যবহার করা হয় যা কম্পিউটার গ্রাফিক্স নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে একই জিনিসের অনেকগুলো ডিজাইন তৈরি করে তাদের সুবিধা, অসুবিধা ও উপযোগিতা তুলনা করে দেখা যায়। প্রয়োজনবোধে ডিজাইন সংশোধনও করা যায়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা : কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর বদৌলতে এখন ব্যাংকগুলোতে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় টাকা তোলার বিশেষ যন্ত্রে (ATM–Automated Teller Machine) ক্রেডিট কার্ড ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ যন্ত্রের সংখ্যা গণনার বোতামগুলোতে চাপ দিয়ে টাকার পরিমাণ জানিয়ে দিলে সাথে সাথে যন্ত্রের ভিতর থেকে টাকা বেরিয়ে আসে। এভাবে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার যে কোনো সময়েই ব্যাংক থেকে টাকা তোলা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র : ইতোমধ্যে বাজারে বেরিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সফ্‌ট্‌ওয়্যার যা সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের সফ্‌ট্‌ওয়্যারকে মিডি (MIDI—Musical Instruments Digital Interface) সফ্‌ট্‌ওয়্যার বলে। বর্তমানে এমন সুর সৃষ্টির সফ্‌ট্‌ওয়্যার তৈরি হয়েছে যা বিশ্বের বড় বড় নামীদামী সুর স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত বেটোভেন, বাখ, মোজার্ট প্রমুখ খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞের নতুন নতুন সুর সৃষ্টিতে সক্ষম। এ ধরনের একটি সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর নাম হচ্ছে Mozart 42nd।

বিনোদন : বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ প্রবেশ করেছে কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার। অবাস্তব সব দৃশ্যকে আশ্চর্য বাস্তব রূপ দেয় সফ্‌ট্‌ওয়্যার। ইটি, জুরাসিক পার্ক, টারমিনেটর, ম্যাট্রিক্স, সিন্দাবাদ, স্পাইডারম্যান ইত্যাদিসহ আরো অনেক ছবিতে যে আশ্চর্য দৃশ্য দেখানো হয়েছে তার সবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর বদৌলতে। সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর কারসাজিতে দর্শক মুহূর্তেই চলে যান সেই কোটি কোটি বছর আগের জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের কাছে। আবার খেলাধুলার জন্য রয়েছে সর্বাধুনিক সব ভিডিও গেম্‌স্ সফ্‌ট্‌ওয়্যার। এর পাশাপাশি প্রচলিত তাস বা দাবা খেলাও বাদ পড়েনি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কম্পিউটার সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর ব্যাপক হারে প্রয়োগ মানব সভ্যতার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছে।

৪. **Fiber Optic Communication System এর গুরুত্ব লিখুন।** ১০

উত্তর : আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় Fiber Optic Communication System (ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম) এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম-এর গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো :

উচ্চ ব্যান্ডউইড্‌থ (Bandwidth) : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য পরিবহনের জন্য ফাইবার অপটিক (বা অপটিক্যাল ফাইবার) ব্যবহৃত হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার-এর মধ্য দিয়ে যে তথ্য পাঠানো হয় তা আলোক তরঙ্গ হিসেবে সঞ্চালিত হয়। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ব্যান্ডউইড্‌থ (Bandwidth) তথ্য পরিবহনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে একই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তথ্য প্রেরণ করা যায় যা ডেটা বা তথ্য সঞ্চালনের অন্যান্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

উচ্চ গতিসম্পন্ন : আমরা জানি আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ কিলোমিটার। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলোর মাধ্যমে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে অতি উচ্চ গতিতে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

শক্তিক্ষয় তুলনামূলক কম : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয় তা এক ধরনের কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি। এই অপটিক্যাল ফাইবার-এর শোষণ ক্ষমতা খুবই কম কিন্তু প্রতিসরাঙ্ক তুলনামূলক বেশি। অপটিক্যাল ফাইবার-এর মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা বা তথ্য সঞ্চালিত হয়। আবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির সম্পূর্ণ অংশই প্রতিফলিত হয়, কোনো অংশই শোষিত বা প্রতিসরিত হয় না। ফলে এ পদ্ধতিতে শক্তির অপচয় কম হয়।

বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব মুক্ত : আলোক রশ্মি বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যেহেতু ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলোক তরঙ্গ হিসেবে তথ্য বা ডেটা আদান-প্রদান করা হয় কাজেই এই পদ্ধতিতে প্রেরিত তথ্য বা ডেটা কোনো বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত বা বিকৃত হয় না। ফলে প্রেরণ পথে কোনো বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র থাকলেও সম্পূর্ণ অবিকৃত তথ্য পাওয়া যায়।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় থাকে : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পথে ডেটা বা তথ্য পাঠানো হয়। ফলে এ পদ্ধতিতে তথ্য চুরি বা পাচার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এ ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই পদ্ধতির সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

৫. ক. **Multi-media কি? কত প্রকার ও কি কি? Multi-media'র সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো কি কি?** ৪

উত্তর : Multi-media (মাল্টিমিডিয়া) : মাল্টিমিডিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বহুমাধ্যম। মাল্টিমিডিয়া বলতে বোঝায় এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যেখানে একাধিক মিডিয়া (যেমন– লেখা বা টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ইমেজ ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে সচল, সজীব ও আকর্ষণীয় ভুবন তৈরি করা যায়। লিপি, দৃশ্য ও ধ্বনির সমন্বয়ে সৃষ্ট বহুমাত্রিক উপস্থাপনাই হলো মাল্টিমিডিয়া।

মাল্টিমিডিয়ার প্রকারভেদ : মাল্টিমিডিয়া প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১. লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া (Linear Multi-media)
২. হাইপারমিডিয়া (Hypermedia)
৩. ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া (Interactive Multi-media)

Multi-media'র সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তি : মাল্টিমিডিয়ার সাথে পার্সোনাল কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো হলো :

ক. সাউন্ড কার্ড; খ. সিডিরম ড্রাইভ বা ডিভিডি ড্রাইভ; গ. স্পিকার; ঘ. মাইক্রোফোন ও ঙ. ডিজিটাল ক্যামেরা

মাল্টিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু নতুন প্রযুক্তি হলো : মডেম, স্ক্যানার, টিভি কার্ড, টেলিফোন কার্ড ও রেডিও কার্ড।

খ. **Video Conferencing কি?** ৩

উত্তর : Video Conferencing (ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং) :
ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং বলতে বোঝায় কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা যেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের কথা শোনার পাশাপাশি একে অপরের ছবিও কম্পিউটার মনিটরে দেখতে পারেন। দুইজন ব্যক্তি আলোচনা সভায় মিলিত হলে তাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং (Point-to-point video conferencing) বলে। অপরদিকে দুই-এর অধিক ব্যক্তি আলোচনা সভায় মিলিত হলে তাকে মাল্টিপয়েন্ট ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং (Multipoint video conferencing) বলে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো :

ক. পার্সোনাল কম্পিউটার (P. C); খ. ভিডিও ক্যামেরা; গ. মাইক্রোফোন; ঘ. লাউড স্পীকার এবং ঙ. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) অথবা ইন্টারনেট সংযোগ।

গ. **Laser Printing প্রযুক্তি বলতে কি বুঝেন?** ৩

উত্তর : Laser Printing (লেজার প্রিন্টিং) প্রযুক্তি : লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তি বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের প্রিন্টিং প্রযুক্তি যেখানে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয়। লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে ছাপানোর কাজে লেজার প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। লেজার প্রিন্টারে একটি লেজার বীম (beam) ব্যবহৃত হয় যা একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর CRT-এর মতো রাস্টার স্ক্যান ইমেজ উৎপন্ন করে। ড্রামটি একটি আলোক সংবেদী প্লাস্টিক (Photosensitive plastic) দ্বারা প্রলেপযুক্ত থাকে যার পৃষ্ঠদেশে (surface) ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ প্রদান করা হয়। লেজার বীমটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর স্পট তৈরি করে। লেজার দ্বারা লিখিত স্পটসমূহ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে। উক্ত ধনাত্মক চার্জসমূহ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত টোনার ম্যাটেরিয়ালকে আকর্ষণ করে। ঘূর্ণায়মান ড্রামে কাগজ দেয়া হয়। টোনারটি কাগজে স্থানান্তরিত হয়। এভাবেই লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়।

২৭তম বিসিএস : ২০০৬

সাধারণ বিজ্ঞান

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. **UV ও IR কি আলো? এদের ব্যবহার কি? এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত এবং এদের মধ্যে কার শক্তি বেশি?** ৪

উত্তর : UV ও IR আলো নয়, উভয়ই রশ্মি। UV-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Ultra Violet। এক্স রশ্মির চেয়ে বড় ও বেগুনি রশ্মির চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মিকে বলা হয় Ultra Violet Ray বা অতিবেগুনি রশ্মি। সাধারণ আলোর সমধর্মী হলেও এই আলো চোখে সাড়া জাগায় না। তবে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অতি পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

IR-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Infrared Ray। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি এবং রেডিও বিকিরণের মাঝামাঝি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মিকে বলা হয় Infrared Ray বা অবলোহিত রশ্মি। কাঠের আগুন বা বৈদ্যুতিক চুলা থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তা অবলোহিত রশ্মি। সূর্য থেকে যে তাপ আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাও অবলোহিত বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে।

UV ও IR এর ব্যবহার

অতিবেগুনি রশ্মি চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া নিরাপত্তা ও গবেষণায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

অবলোহিত রশ্মি চিকিৎসাবিদ্যা বিশেষত স্তন ক্যান্সারসহ নানা রোগের চিকিৎসা, শিল্প ও কৃষি গবেষণা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য

অতিবেগুনি রশ্মি (UV) 10^{-9} মিটার থেকে 3.5×10^{-7} মিটারের কিছু বেশি।

অবলোহিত রশ্মি (IR) 10^{-6} মিটার থেকে 5×10^{-3} মিটার।

শক্তি

অবলোহিত রশ্মি অপেক্ষা অতিবেগুনি রশ্মির শক্তি বেশি।

খ. **কোলেস্টেরল, এলডিএল ও এইচডিএল কি? দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায় এবং দুটি কোলেস্টেরল প্রধান খাদ্যের নাম লিখুন।** ৪

উত্তর : কোলেস্টেরল এক জাতীয় স্টেরয়েড এলকোহল। এটি পানিতে অদ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় বলে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দলভুক্ত। আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যে খাবার খাই, তা আমাদের শরীরের ভেতর বিপাকের পর নানা বিক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন উপাদানে পরিণত হয়। এমনি একটি উপাদান হচ্ছে এসিটিক এসিড বা এসিটেট। কোলেস্টেরলের উৎপত্তি এই এসিটেট থেকে। কোলেস্টেরল আমাদের রক্তনালী ও কোষে অবস্থান করে, বিশেষ করে নার্ভাস টিস্যুতে এর পরিমাণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এ কোলেস্টেরল যখন আমাদের রক্তনালীতে জমাট বাঁধতে শুরু করে তখনই দেখা দেয় হাইপারটেনশন ও হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ তথা হৃদরোগ।

এলডিএল (LDL)

এলডিএল-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Low-density Lipoprotein, যা প্রাণিজ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। এটি রক্তনালীর প্রাচীরগাত্রে জমে রক্তনালী সংকুচিত করে এবং রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এটিকে খারাপ কোলেস্টেরলও বলা হয়।

এইচডিএল (HDL)

এইচডিএল-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি High-density Lipoprotein, যা উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। রক্তের প্রায় ৩০% কোলেস্টেরল এতে সঞ্চিত থাকে। একে মানবদেহের ভালো কোলেস্টেরলও বলা হয়।

দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায়

i. চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা,

ii. নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করা।

কোলেস্টেরল প্রধান দুটি খাবার

i. খাসির কলিজা,

ii. ডিমের কুসুম।

গ. ডেসিবেল (dB) কি? ৯০ dB শব্দ বলতে কি বোঝায়? টেপ রেকর্ডারের টেপে শব্দ রেকর্ডের জন্য কী থাকে আর তা কিভাবে পূর্বে রেকর্ডকৃত শব্দ তৈরি করে? ৪

উত্তর : ডেসিবেল

শব্দের আপেক্ষিক তীব্রতার একক হচ্ছে বেল (bel) এবং এই বেল এককের এক-দশমাংশ $\left(\frac{1}{10}\right)$ কে ডেসিবেল (dB) বলা হয়।

৯০ dB শব্দ বলতে যা বোঝায়

কোনো শব্দের তীব্রতা ৯০ dB বলতে বোঝায়, উক্ত শব্দটির তীব্রতা ও প্রমাণ তীব্রতার অনুপাত হবে ৯০×১০^{-১}।

টেপ রেকর্ডারের টেপে শব্দ রেকর্ডের জন্য ব্যবহৃত উপাদান

টেপ সাধারণত সেলুলোজ অ্যাসিটেট বা পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি এক ধরনের পাতলা পর্দা। দুই পার্শ্ববিশিষ্ট একটি চুম্বকীয় টেপ-এর একপার্শ্বে আয়রন অক্সাইডের ক্রিস্টাল দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। একে অনুজ্জ্বল পার্শ্ব বলে। অন্য পার্শ্বটি উজ্জ্বল। রেকর্ডিংয়ের সময় টেপের অনুজ্জ্বল পার্শ্বটি হেডের ছিদ্রের খুব নিকট দিয়ে যায়। এ সময় পরিবর্তনশীল (AC) ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ছিদ্রপথে চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, যা টেপের আয়রন অক্সাইডের সাথে ক্রিয়া করে সিগন্যাল রেকর্ড করে।

পূর্বে রেকর্ডকৃত শব্দ তৈরির প্রক্রিয়া

শব্দ রেকর্ডকৃত একটি টেপ যখন একটি ক্যাসেট প্লেয়ারে চালানো হয় তখন টেপে রেকর্ডকৃত সিগন্যাল একটি ইলেকট্রিক সিগন্যাল উৎপন্ন করে। এ ইলেকট্রিক সিগন্যাল খুবই দুর্বল হওয়ায় একে অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। এ বিবর্ধিত ইলেকট্রিক সিগন্যালকে স্পিকারে পাঠানো হয়। স্পিকার ইলেকট্রিক সিগন্যালকে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করে। এভাবে আমরা পূর্বে রেকর্ডকৃত শব্দ শুনতে পাই।

ঘ. দীর্ঘপথের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে উচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ কেন প্রবাহ করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন। বিদ্যুতের সিস্টেম লস কি? বিদ্যুৎ লাইনে ব্যবহৃত ফিউজ কি? ৪

উত্তর : বিদ্যুৎ পরিবহনে যে তার ব্যবহৃত হয় তার রোধ অল্প হলেও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী তারের উক্ত রোধের

কারণে বিদ্যুৎশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার কারণে বিদ্যুতের অপচয় হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা যত বেশি হয়, উৎপন্ন তাপের পরিমাণও তত বেশি হয় অর্থাৎ বিদ্যুৎশক্তির অপচয় তত বেশি হয়। প্রবাহমাত্রা কমালে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ তথা বিদ্যুতের অপচয় কম হয়। কিন্তু প্রবাহমাত্রা কমালে ভোল্টেজ (বিভব পার্থক্য) বৃদ্ধি পায়। এজন্য দীর্ঘপথের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, যেন বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা কমে যায়। এর ফলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ তথা বিদ্যুতের অপচয় কম হয়।

বিদ্যুতের সিস্টেম লস : বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রথমে উচ্চধাপ ট্রান্সফর্মার ও সুদীর্ঘ পরিবাহী তারের সাহায্যে বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোতে পাঠানো হয়। পরবর্তীতে এসব উপকেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মার ও পরিবাহী তারের মাধ্যমে গ্রাহক সংযোগ দেয়া হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ কাজে ব্যবহৃত এসব ট্রান্সফর্মার, পরিবাহী তার ও অন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় সৃষ্ট তাপের কারণে বিদ্যুতের কিছু অংশের অপচয় হয়। একে বিদ্যুতের সিস্টেম লস বলা হয়।

ফিউজ (Fuse) : 'ফিউজ' টিন ও সিসার একটি সঙ্কর ধাতুর তৈরি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর ওপর দিয়ে আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং এর গলনাঙ্ক কম (৩০০° সে)। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যায়। ফলে বিদ্যুৎবর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে।

ঙ. হেপাটাইটিস কি? এটি কি কারণে হয়? দায়ী জীবাণু কত রকমের হয়? কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে এবং কোনগুলো খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়? ৪

উত্তর : হেপাটাইটিস : যকৃতের আরেক নাম হেপাটিকা; যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ভাইরাস অথবা অ্যান্টিবায়োটিকের আক্রমণে যকৃতের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে হেপাটাইটিস বলে। হেপাটাইটিস-বি অত্যন্ত মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

হেপাটাইটিসের কারণ : হেপাটাইটিস প্রধানত কয়েকটি প্রজাতির হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট যকৃতে (Liver) ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। আবার কোনো কারণে যকৃতের কোষগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙতে থাকলে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। যেমন– অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন ও ম্যালেরিয়া জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে যকৃতের কোষগুলোর অতিমাত্রায় ভাঙনের ফলে হেপাটাইটিস সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কোনো কারণে পিত্তনালী অবরুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে গেলেও অবস্ট্রাক্টিক (Obstructive) হেপাটাইটিস দেখা দেয়।

হেপাটাইটিসের জন্য দায়ী জীবাণু : হেপাটাইটিস প্রধানত পাঁচ প্রকারের হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা : হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, হেপাটাইটিস-ডি ও হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস। এছাড়াও সাইটোমোলা ভাইরাস ও হার্পিস ভাইরাসের কারণেও হেপাটাইটিস হয়ে থাকে।

রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস : হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস

হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস খাবার ও পানির মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

২. ক. এলপিজি-এর সম্পূর্ণ নাম কি? এর মধ্যে প্রধান গ্যাসগুলো কি? ২

উত্তর : এলপিজি (LPG)-এর পূর্ণরূপ হলো 'Liquified Petrolium Gas', যার বাংলা অর্থ হচ্ছে 'রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস'। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদানগুলো হলো মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, পেন্টেন ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রোপেন ও বিউটেন হচ্ছে এলপিজি-এর প্রধান উপাদান।

খ. বাংলাদেশে বাসাবাড়িতে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ লাইনে স্থাপিত তিনবিন্দু সকেটের উপরে অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্রের এবং অপর দুই ছোট ছিদ্রের সাথে কোন কোন সরবরাহ লাইনের সংযোগ থাকে, তা চিত্র এঁকে দেখান। ২

উত্তর : বাংলাদেশের বাসাবাড়িতে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ লাইনে স্থাপিত তিনবিন্দু সকেটের উপরে অপেক্ষাকৃত বড় ছিদ্রের সাথে আর্থ (earth) লাইনের সংযোগ থাকে, যাকে আর্থিং সংযোগ (Earthing connecting) বলা হয়ে থাকে। নিচের দুটি ছোট ছিদ্রের একটির সাথে পজিটিভ বা ফেজ এবং অপরটির সাথে নেগেটিভ সংযোগ দেয়া থাকে। নিচের চিত্রে এটি প্রদর্শিত হলো :

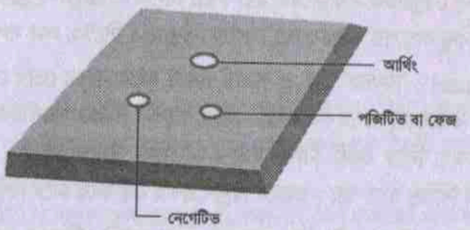

গ. গাছের পাতা সবুজ দেখা যায় কেন? ২

উত্তর : সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীতে যে সাদা আলো এসে পৌঁছায় তা মূলত সাতটি দৃশ্যমান আলোকের সমষ্টি। কোন বস্তুর উপর যখন সাদা আলো এসে পতিত হয় তখন বস্তুটি তার নিজস্ব রঙের আলোক রশ্মি ব্যতীত অন্য ছয়টি রঙের আলোক রশ্মি শোষণ করে নেয়; শুধু নিজস্ব রংবিশিষ্ট আলোক রশ্মিই প্রতিফলিত করে থাকে। এই প্রতিফলিত আলোক রশ্মি যখন আমাদের চোখে এসে পৌঁছায় তখন আমরা বস্তুটিকে উক্ত রঙের বস্তু হিসেবে দেখতে পাই। গাছের পাতায় ক্লোরোপ্লাস্ট নামক সবুজ রঞ্জক পদার্থ থাকে। ক্লোরোপ্লাস্ট নামক রঞ্জক পদার্থটি সাদা আলোক রশ্মির মধ্যস্থিত সবুজ রঙের আলোক রশ্মি ব্যতীত বাকি ছয়টি রঙের আলোক রশ্মিই শোষণ করে নেয়। শুধুমাত্র সবুজ রঙের আলোক রশ্মি প্রতিফলিত করে থাকে। এ কারণেই গাছের পাতা সবুজ দেখা যায়।

ঘ. একটা জেট বিমান সম্মুখ গতি পায় কিভাবে? ২

উত্তর : জেট বিমান সম্মুখ গতিপ্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া : জেট বিমানের সামনে দিয়ে বায়ু ঢোকার এবং পিছনের দিক দিয়ে গ্যাসীয় পদার্থ বের হওয়ার ব্যবস্থা থাকে। এর ইঞ্জিনের ভিতর বিভিন্ন রকমের দাহ্য পদার্থ, যেমন— তরল হাইড্রোজেন, অকটেন, অ্যালকোহল, তরল অক্সিজেন ইত্যাদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে। ইঞ্জিনের মধ্যস্থিত জ্বালানি প্রকোষ্ঠের ভেতরে যখন এসব দাহ্য পদার্থকে মিশ্রিত করে অগ্নি সংযোগ করা হয় তখন প্রবল তাপ ও চাপ এবং এক ধরনের ধূম্রজালিকা সৃষ্টি হয়। এই ধূম্রজালিকাই মূলত জেট (Jet) নামে পরিচিত। এ প্রবল তাপ ও চাপবিশিষ্ট ধূম্রজালিকা প্রচণ্ড বেগে জেট বিমানের পেছন দিয়ে বের হয়ে যায়। নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী, পশ্চাৎদিকে প্রচণ্ড বেগে গতিশীল এ গ্যাসীয় ধূম্রজালিকা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তার ফলেই জেট বিমান সম্মুখদিকে গতিপ্রাপ্ত হয়।

ঙ. ভ্যাক্সিন কি? গুটি বসন্তের টিকা কিভাবে তৈরি হয়? ২

উত্তর : ভ্যাক্সিন : আমাদের দেহের জীবাণুঘটিত প্রত্যেকটি রোগ একেকটি নির্দিষ্ট জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। কোনো একটি রোগের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট জীবাণুগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন মাত্রায় দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয় যেন উক্ত জীবাণুগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে না পারে। এ দুর্বল ও প্রক্রিয়াজাত জীবাণুগুলোকে যখন আমাদের রক্তে তথা শরীরে প্রবেশ করানো হয় তখন এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগ্রত করে তোলে কিন্তু কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগ্রত হওয়ার কারণে উক্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরনের শক্তিশালী এন্টিবডি তৈরি হয় যা উক্ত জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। পরবর্তীতে উক্ত রোগের কোনো সক্রিয় জীবাণু যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন পূর্বে সৃষ্ট ঐ এন্টিবডিগুলো রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে। ফলে কোনো রোগ সৃষ্টি হয় না। এভাবে কোনো রোগের জন্য দায়ী জীবাণুগুলোকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে উক্ত রোগের বিরুদ্ধে আমাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাকেই ভ্যাক্সিন বলা হয়।

গুটি বসন্তের টিকা তৈরির প্রক্রিয়া : গুটি বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত কোনো প্রাণীর দেহ থেকে প্রথমে গুটি বসন্তের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট প্রজাতির ভাইরাস সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে সংগৃহীত এই নির্দিষ্ট প্রজাতির ভাইরাসকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গুটি বসন্তের টিকা তৈরি করা হয়।

৩. ক. বিদ্যুৎ লাইনের ভোল্টেজ বেড়ে গেলে বাল্ব নষ্ট হয়ে যায় কেন? ২

উত্তর : বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্ট হিসেবে যে তার ব্যবহৃত হয় তা অতি উচ্চ রোধ সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ লাইনে ভোল্টেজ বেড়ে গেলে ওহমের সূত্রানুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রাও বেড়ে যায়। ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহমাত্রা বাড়লে রোধের কারণে সৃষ্ট তাপের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ভোল্টেজ তথা প্রবাহমাত্রা অতি উচ্চ পরিমাণে বেড়ে গেলে উৎপন্ন তাপের পরিমাণ এতই বেশি হয় যে, এটা ফিলামেন্টকে গলিয়ে দেয়। ফলে বাল্ব নষ্ট হয়ে যায়।

খ. ডিজইনফেক্ট্যান্ট এবং এ্যান্টিসেপটিক-এর মধ্যে প্রভেদ কি এবং এদের প্রয়োগস্থান কোথায়? ২

উত্তর : ডিজইনফেক্ট্যান্ট (Disinfectant) ও অ্যান্টিসেপটিকের (Antiseptic) মধ্যকার পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো :

i. ডিজইনফেক্ট্যান্ট দ্বারা কোনো বস্তুকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এর দ্বারা জীবাণু ধ্বংসের হার শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ।
অপরদিকে, অ্যান্টিসেপটিক দেহে জীবাণু সংক্রমণের (Infection) সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে দেয় কিন্তু দেহকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে পারে না।

ii. ডিজইনফেক্ট্যান্ট শরীরের জীবন্ত কোষ ও টিস্যুতে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ এটি জীবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কিন্তু অ্যান্টিসেপটিক তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর হওয়ায় এটি শরীরের যে কোনো অংশে প্রয়োগ করা যায়।

iii. আয়োডিন দ্রবণ, তুঁতে, ওজোন ও ক্লোরিন গ্যাস ইত্যাদি হলো ডিজইনফেক্ট্যান্ট-এর উদাহরণ। অপরদিকে, ৭০% ইথানল দ্রবণ, ৩% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ ইত্যাদি হলো অ্যান্টিসেপটিকের উদাহরণ।

প্রয়োগস্থান

ডিজইনফেক্ট্যান্ট : যে কোনো প্রাণহীন বস্তুতে প্রয়োগ করা হয়।

অ্যান্টিসেপটিক : মানবদেহের ত্বকে অথবা যে কোনো প্রাণিদেহের ত্বকে প্রয়োগ করা যায়।

গ. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশান কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন। ২

উত্তর : মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial infarction) : কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে, যা হার্ট অ্যাটাক (Heart attack) নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (Coronary artery)। অনেক সময় এই করোনারী ধমনীর ভিতরের দিকের দেয়ালে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথে সরু হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সৃষ্টি হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগ হলো :

i. উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)

ii. বহুমূত্র রোগ (Diabetes)

ঘ. খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/গুড় ও লবণের প্রয়োজন কি? ২

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও বিভিন্ন ধরনের লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে লবণ ও পানির অভাব দেখা দেয় এবং শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। লবণের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য খাবার স্যালাইনে কয়েকটি ধাতুর লবণ ব্যবহৃত হয়। আবার চিনি ও গুড় হচ্ছে কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যা দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। যেহেতু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেজন্য তার শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিনি বা গুড় খাবার স্যালাইনের সাথে ব্যবহৃত হয়।

৪. ক. বর্ষাকালীন শ্রাবণ মাসের গরমে অল্পতেই গা ঘামে কিন্তু খরাকালীন বৈশাখ মাসের গরমে অল্পতেই গা ঘামে না কেন? ২

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে উভয় ঋতুতেই সমান পরিমাণে ঘাম হয়। প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে খরাকালীন বৈশাখ মাসে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা শ্রাবণ মাসের তুলনায় কম থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হওয়ার কারণে আমাদের শরীরের ঘাম তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। ফলে আমাদের কাছে মনে হয় যেন আমাদের শরীরে বৈশাখ মাসে ঘাম কম হয়। অপরদিকে, বর্ষাকালীন শ্রাবণ মাসে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হওয়ার কারণে ঘামের বাষ্পীভবন তুলনামূলকভাবে কম হয়। ফলে শ্রাবণ মাসে শরীর সহজে শুকাতে চায় না। এজন্য আমাদের কাছে মনে হয় যেন বর্ষাকালীন শ্রাবণ মাসে আমাদের শরীরে ঘাম বেশি হয়।

খ. বৈদ্যুতিক হিটারের কয়েলে এবং বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টে কি একই ধরনের তার ব্যবহার করা হয়? ২

উত্তর : না, বৈদ্যুতিক হিটারের কয়েলে ও বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টে ভিন্ন ধরনের তার ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক হিটারের কয়েলে নাইক্রোম তার এবং বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেন্টে টাংস্টেন ধাতুর তৈরি তার ব্যবহৃত হয়। নাইক্রোম তারের তাপ সহ্যক্ষমতা টাংস্টেন তারের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে।

গ. লেজার কি? এটির চারটি প্রয়োগ লিখুন। ২

উত্তর : লেজার : লেজার (LASER) হচ্ছে 'Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation' কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ, যার অর্থ দাঁড়ায় 'বিকিরণের উদ্দীপিত নিঃসরণের দ্বারা আলোকের বিবর্ধন'। লেজার এমন এক যন্ত্র যার সাহায্যে অতি তীব্র, একবর্ণী, সুসংগত ও সমান্তরাল আলোক রশ্মি উৎপন্ন করা যায়। এই সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে লেজার রশ্মিগুচ্ছ বলে।

লেজার রশ্মির প্রয়োগ

i. লেজার রশ্মি অনেক দূর পর্যন্ত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এজন্য দূর যোগাযোগ ব্যবস্থায় এটি ব্যবহৃত হয়।

ii. টেলিভিশনে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

iii. ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরির কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ছবি তৈরির প্রক্রিয়াকে হলোগ্রাফি (Holography) বলে।

iv. চিকিৎসাক্ষেত্রে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারের কাজে এবং চর্মরোগের চিকিৎসায় লেজার ব্যবহৃত হয়।

ঘ. মাইক্রোফোন কিভাবে কাজ করে? ২

উত্তর : মাইক্রোফোনের সামনে যখন কোনো শব্দ করা হয় তখন ঐ শব্দের ফলে সৃষ্ট কম্পিত বায়ু মাইক্রোফোনের মধ্যস্থিত ডায়াফ্রামের পাতলা ধাতব পাতকে আঘাত করে। ফলে ডায়াফ্রাম কাঁপতে থাকে। ডায়াফ্রামের কম্পন হচ্ছে তরঙ্গের অবিকল প্রতিরূপ এবং শব্দ তরঙ্গ তখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। সাধারণত সঙ্গীত, কথা ইত্যাদিকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়।

ঙ. এইচআইভি কাকে বলে? এটি দেহের কি ক্ষতি করে এবং শেষ পর্যন্ত কি রোগ হয়? ২

উত্তর : এইচআইভি (HIV) : 'Human Immune Deficiency Virus' নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে HIV (এইচআইভি)। এটি এমন এক বিশেষ প্রজাতির ভাইরাস যা শরীরে প্রবেশ করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এর ফলে শরীরে তৈরি হয় এইডস (AIDS) নামক এক ভয়ংকর রোগ যার শেষ পরিণতি মৃত্যু।

৫. ক. সাধারণ বাতাসে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের শতকরা পরিমাণ কত? কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে কি ক্ষতি হবে? ২

উত্তর : বাতাসে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো :

i. নাইট্রোজেন : ৭৮.০২ শতাংশ

ii. অক্সিজেন : ২০.৭১ শতাংশ এবং

iii. কার্বন ডাই-অক্সাইড : ০.০৩ শতাংশ

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও বাড়তে থাকে যার ফলে সৃষ্টি হয় 'গ্রীন হাউস ইফেক্ট'। মানবজাতি ও অন্যান্য জীব প্রজাতির জন্য এই গ্রীন হাউস ইফেক্টের প্রভাব খুবই বিপজ্জনক। কারণ তাপমাত্রা বাড়লে পৃথিবীর দুই মেরুতে সঞ্চিত বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের মতো এলাকাগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আবার ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাটিতে পানির পরিমাণ কমে গিয়ে কোনো কোনো অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হবে। কাজেই বলা যায় যে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়লে মানব জাতিসহ পৃথিবীর সমগ্র জীবকুলের অস্তিত্ব হুমকির মুখোমুখি হবে।

খ. চুম্বক তৈরি করা যায় এমন ধাতুগুলো কি কি? চুম্বকের চারটি প্রয়োগের নাম লিখুন। ২

উত্তর : লোহা (Fe), নিকেল (Ni), কোবাল্ট (Co) ও লোহার তৈরি বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত দিয়ে চুম্বক তৈরি করা যায়।

চুম্বকের চারটি প্রয়োগ

i. সমুদ্রে জাহাজ চালাতে যে দিক নির্ণায়ক কম্পাস ব্যবহার করা হয়, তা স্থায়ী চুম্বক দ্বারা তৈরি।
ii. কম্পিউটারের প্রধান বা মুখ্য মেমোরিতে স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য স্থায়ী চুম্বক ব্যবহৃত হয়, যা সিরামিক চুম্বক নামে পরিচিত।
iii. মাইক্রোফোন ও লাউড স্পীকারে স্থায়ী চুম্বক ব্যবহৃত হয়।
iv. বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ও বৈদ্যুতিক পাখায় ইস্পাতের তৈরি অস্থায়ী চুম্বক ব্যবহৃত হয়।

গ. দুধ পাস্তুরিত করতে সাধারণভাবে কত সময়ের জন্য কত তাপ প্রয়োগ করা হয়? ২

উত্তর : দুধ পাস্তুরিত করার জন্য তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি দুই রকমের। যথা :

i. **বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দুধকে ৩০ মিনিট সময় যাবত ৬২.৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়। ফলে দুধ জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।
ii. **শর্ট টাইম মেথড :** এই পদ্ধতিতে দুধকে জীবাণু মুক্ত করার জন্য ১৫ সেকেন্ড সময় যাবত ৭১.৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়।

ঘ. কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য কাকে বলে? এরা কিভাবে রোগ তৈরি করে? ২

উত্তর : কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য (Carcinogenic Chemical Substance) : যেসব রাসায়নিক দ্রব্য শরীরে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং ক্যান্সার সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে তাদেরকে কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য বলে। অ্যাসবেস্টস (Asbestos), বেনজিন, তামাক ইত্যাদি হলো কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্যের উদাহরণ।

কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা শরীরে রোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়া : কারসিনোজেনিক রাসায়নিক দ্রব্যগুলো শরীরে প্রবেশ করে কোষীয় মেটাবলিজম (Metabolism) প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটায় অথবা কোষের DNA-কে সরাসরি ধ্বংস করে ফেলে। এর ফলে কোষের জৈব প্রক্রিয়া (Biological process) প্রভাবিত হয় এবং শুরু হয় অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজন। এই অনিয়ন্ত্রিত কোষ বিভাজনের ফলেই সৃষ্টি হয় ক্যান্সার।

২৭তম বিসিএস : ২০০৬

প্রযুক্তি

সময় : ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট; পূর্ণমান : ৫০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে। Marks

1. a. What is the CPU of a computer? 2

উত্তর : সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ : কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ, যা কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। সিপিইউ যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, হিসাব-নিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। সিপিইউ'র মধ্যে তিনটি প্রধান ইউনিট থাকে। যেমন–

ক. অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট (ALU) বা গাণিতিক যুক্তি অংশ
খ. কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ ও
গ. মেমোরি বা স্মৃতিভাণ্ডার

b. What do you understand by software? 2

উত্তর : সফটওয়্যার (Software) : সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষায় লিখিত কতকগুলো নির্দেশনার সমষ্টি যার সাহায্যে কম্পিউটার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। হার্ডওয়্যার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তোলাই সফটওয়্যারের কাজ। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন।

c. Give the difference between data and information. 2

উত্তর :

ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য

ডেটা বা উপাত্ত	ইনফরমেশন বা তথ্য
সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে।	ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ডেটা যা সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য (Useful)।
ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা।	ডেটাকে প্রসেস করে ইনফরমেশন পাওয়া যায়।
ডেটা পুরোপুরি কোনো ভাবার্থ প্রকাশ করে না।	ইনফরমেশন কোনো বিষয়ের ভাবার্থ প্রকাশ করে যা ব্যবহারকারী বুঝতে পারে।
ডেটা ইনফরমেশনের ওপর নির্ভর করে না।	ইনফরমেশন ডেটার ওপর নির্ভর করে।
উদাহরণ : ফলাফল, দ্বিতীয়, ০০১, মিরাজ, ০০২, প্রথম, সুমাইয়া, পরীক্ষা, বার্ষিক ইত্যাদি ডেটা।	উদাহরণ : বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল রোল নাম মেধাস্থান ০০১ মিরাজ প্রথম ০০২ সুমাইয়া দ্বিতীয়

d. What do you understand by VSAT? 2

উত্তর : V-SAT হচ্ছে Very Small Aperture Terminal-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন (ডিস)। এটিতে একটি ছোট এন্টেনা থাকে যা ০.৮ থেকে ২.৪ মিটার ডায়ামিটারের। যেখানে তার যোগাযোগ নেই বা যেসব এলাকায় লোকবসতি/জনসংখ্যার ঘনত্ব কম সেসব জায়গায় ব্যান্ড প্রস্থ (band width) ডিস্ট্রিবিউট করার সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে ভিস্যাট। ভিস্যাটের মাধ্যমে সাধারণত ২৫৬ কিলোবাইট/সেকেন্ডে থেকে ৫১২ কিলোবাইট/সেকেন্ড ব্যান্ড প্রস্থ (band width) বিতরণ করা সম্ভব। তবে সরবরাহকারীর (Provider) উপর নির্ভর করে এটি সর্বোচ্চ ২০ মেগাবাইট/সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে। VSAT-এ Uplink-এর চেয়ে Downlink কিছুটা মন্থর গতির।

e. What is a transformer? 2

উত্তর : ট্রান্সফর্মার (Transformer) : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোন পরিবর্তী প্রবাহের বিভবকে উচ্চ হতে নিম্নমান বা নিম্ন হতে উচ্চমানে রূপান্তরিত করা যায়, তাকে বিভব রূপান্তরক বা ট্রান্সফর্মার বলে। তাড়িৎ চুম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত দুই প্রকারের হয়। যথা :

(i) উচ্চধাপী (Step up) ট্রান্সফর্মার

(ii) নিম্নধাপী (Step down) ট্রান্সফর্মার

f. Give the differences between IPS and UPS. 2

উত্তর : IPS-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো Instant Power Supply। যা মূলত Power Storage হিসেবে কাজ করে থাকে। IPS এমন একটি Device যা বৈদ্যুতিক Power রিজার্ভ করে এবং পরবর্তীতে Main লাইন বা বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্ধে Back-up দেয়। UPS -এর মতো IPS বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধের সাথে সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে পারে না। 1/10 Sec পরে সরবরাহ automatically প্রদান করে থাকে। UPS অল্প সময়ের জন্য Back up দিয়ে থাকে কিন্তু UPS এর তুলনায় IPS বহুগুণ Backup দিয়ে থাকে। তাই IPS বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালনায় বেশি জনপ্রিয়।

অপরদিকে, ইউপিএস হলো এক বিশেষ ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই, যা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এর পূর্ণ নাম Uninterrupted Power Supply.

g. Distinguish between asynchronous and synchronous counters. 2

উত্তর : অ্যাসিনক্রোনাস (Asynchronous) ও সিনক্রোনাস (Synchronous) কাউন্টারের মধ্যবর্তী পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

i. অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের ক্ষেত্রে লেস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট (LSB) ফ্লিপ ফ্লপ (FF)-এ প্রথমে ক্লক পাল্‌স দেয়া হয়ে থাকে এবং অন্যান্য ফ্লিপ ফ্লপ (FF)-গুলো তাদের পূর্ববর্তী ফ্লিপ ফ্লপ (FF) থেকে ক্লক পালস পেয়ে থাকে।

অপরদিকে সিনক্রোনাস কাউন্টারের ক্ষেত্রে সকল ফ্লিপ ফ্লপ (FF)-এ একই সঙ্গে ক্লক পাল্‌স দেওয়া হয়।

ii. অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারে বিট (bit) সংখ্যা বাড়লে সর্বোচ্চ ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি (f_{max}) কমে যায়। অর্থাৎ বিট সংখ্যার পরিবর্তনে সর্বোচ্চ ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি (f_{max})-এর পরিবর্তন হয়।

কিন্তু সিনক্রোনাস কাউন্টারে বিট সংখ্যার পরিবর্তনের জন্য সর্বোচ্চ ক্লক ফ্রিকুয়েন্সির (f_{max})-এর কোনো পরিবর্তন হয় না।

iii. অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের তুলনায় সিনক্রোনাস কাউন্টারে অধিক বৈদ্যুতিক সংযোগ (Circuitry)-এর প্রয়োজন হয়। তবুও অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টারের তুলনায় সিনক্রোনাস কাউন্টার ব্যবহার করা অধিকতর সুবিধাজনক।

2. a. Classify computer memories and give their characteristics. 4

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমোরিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. প্রধান বা মুখ্য (Main বা Primary) মেমোরি

২. সহায়ক বা গৌণ (Auxiliary বা Secondary) মেমোরি

৩. ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) বা প্রসেসর মেমোরি

নিচে ছকের সাহায্যে মেমোরির প্রকারভেদ দেখানো হলো :

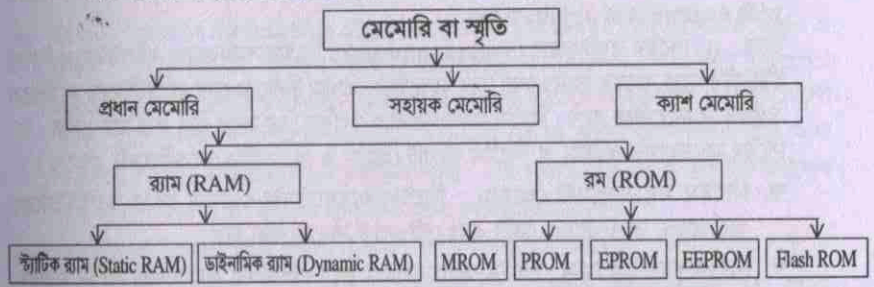

১. **প্রধান বা মুখ্য মেমোরি (Main memory, Main storage বা Primary storage) :** যে মেমোরির সঙ্গে অ্যারেথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট (ALU) প্রত্যক্ষ অ্যাকসেস থাকে তাকে প্রধান মেমোরি বলে। অত্যন্ত দ্রুত গণনা করতে সক্ষম ALU-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ অ্যাকসেস থাকায় প্রধান মেমোরিকেও অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে হয়।

প্রধান মেমোরির প্রকারভেদ : নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রধান মেমোরির নাম দেয়া হলো :

ক. চৌম্বক কোর (Magnetic Core) মেমোরি

খ. পাতলা পর্দা (Thin Film) মেমোরি

গ. অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) মেমোরি

ঘ. চৌম্বক বাবল (Magnetic Bubble) মেমোরি ও

ঙ. চার্জ কাপলড (Charge Coupled) মেমোরি

২. **সহায়ক বা গৌণ মেমোরি (Secondary, Auxiliary বা Back-up) :** সহায়ক মেমোরিতে সেসব ডেটা ও নির্দেশই থাকে যা মুহূর্তে গণনার জন্য প্রয়োজন না হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি সহায়ক মেমোরির নাম দেয়া হলো :

ক. ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk)

খ. হার্ড ডিস্ক (Hard Disk)

গ. সিডি (CD– Compact Disk)

ঘ. সিডি-আর (CD-R– Copact Disk Readable)
ঙ. সিডি-আরডব্লিউ (CD-RW– Compact Disk Rewritable)
চ. ডিভিডি-রম (Digital Video Disk-Random Access Memory)
ছ. ম্যাগনেটো অপটিক্যাল ডিস্ক (Magneto Optical Disk)
জ. জিপ ডিস্ক (ZIP Disk)
ঝ. ডিজিটাল টেপ (Digital Tape)
ঞ. চৌম্বক টেপ (Magnetic Tape)
ট. চৌম্বক ড্রাম (Magnetic Drum)

৩. **ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) :** যেসব নির্দেশ ও ডেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কোনো উচ্চ গতিসম্পন্ন মেমোরিতে রাখলে গড় অ্যাকসেস সময় কম হওয়ায় কম্পিউটার অতি দ্রুত কাজ করে। এজন্য এসব নির্দেশ ও ডেটা রাখা হয় ক্যাশ মেমোরিতে।

b. Give a brief description of system software and application software with examples of applications. 4

উত্তর : (i) সিস্টেম সফ্টওয়্যার (System software) : সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে নিয়োজিত রাখে। সিস্টেম সফটওয়্যারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, খ. সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ও গ. সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

ক. সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম : সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম : সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহারকারী সার্ভিস প্রোগ্রাম, নিরাপত্তা প্রদানের প্রোগ্রাম এবং কাজের হিসাব নিকাশসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারে।

গ. সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম : ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(ii) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application software) : ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার বা ব্যবহারিক সফট্ওয়্যার বলা হয়। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য নানা রকম তৈরি প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলা হয়। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ও খ. অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক বা ব্যবহার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম।

ক. সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম : সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যবহারকারী প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ কাজগুলো যেমন– ওয়েব ব্রাউজ, ই-মেইল, ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম, ডেটাবেজ ম্যানেজম্যান্ট, গ্রাফিক্স এবং ডেস্কটপ পাবলিশিং ইত্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন।

খ. অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক বা ব্যবহার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম : কোনো বিশেষ সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক প্রোগ্রাম ব্যবহৃত হয়। যেমন– সেলস ম্যানেজমেন্ট, ইলেকট্রনিক কমার্স, পে-রোল সিস্টেম, টিকেট রিজারভেশন, ট্রানজেকশন প্রসেসিং ইত্যাদি।

c. Briefly describe the impacts of computer on society. 4

উত্তর : আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য-প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। কম্পিউটারে নির্ভুল কর্ম সম্পাদন, দ্রুতগতি, স্মৃতি, স্বয়ংক্রিয় কর্ম সম্পাদন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য এর প্রয়োগক্ষেত্র আজ সুবিস্তৃত। তথ্য-প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো–

i. এতে ব্যয় সংকোচন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি হয়।
ii. সময় ও শক্তির অপচয় কম হয়।
iii. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি মানুষকে সঠিক পণ্য বা সেবা গ্রহণে সহায়তা করে। প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় তথ্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয় তথ্য-প্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ডেটাবেস উন্নয়ন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক, মুদ্রণ ও রিপ্রোগ্রাফিক প্রযুক্তি, তথ্যভাণ্ডার প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি ইত্যাদি সবই কম্পিউটার প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

3. a. Briefly describe the functions of any three layers of the TCP/IP protocol suite. 3

উত্তর : TCP/IP-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Transmission Control Protocol/ Internet Protocol অর্থাৎ ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ আইন/বিধি এবং ইন্টারনেট আইন বিধি। এ প্রোটোকল হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের এক Set rules যা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্ভুলভাবে ডেটা কমিউনিকেশনে সহায়তা করে। এক কথায়, নেটওয়ার্ক কম্পিউটারগুলোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত রীতিনীতি হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রটোকল।

TCP/IP প্রোটোকলকে পাঁচটি লেয়ারে (Layer) ভাগ করা যায়। এর উল্লেখযোগ্য তিনটি লেয়ার হলো :

Application Layer : এই লেয়ারে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ট্রান্সফার, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সুবিধা পায় এবং ডেটা গ্রহণ করার পর ডেটা ম্যানেজমেন্ট করা ফাইল সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

Transport Layer : এই লেয়ারে ডেটার উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ডেটা আদান-প্রদানের কাজ করে। এক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে ছোট ছোট ম্যাসেজ আকারে নির্ধারিত প্রান্তে ট্রান্সমিশন মিডিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রেরণ করা হয়।

Internet Layer : বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সিস্টেম থেকে আগত ডেটাকে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়াই এ লেয়ারের কাজ। এই লেয়ার ইন্টারনেট প্রোটোকল মেনে চলে।

b. What is the Internet? Discuss the responsibilities of Internet Service Providers. 2 + 3 = 5

উত্তর : ইন্টারনেট পৃথিবীর বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এটি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি নেটওয়ার্ক। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) প্রোটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রয়োজন :

i. কম্পিউটার, ii. মডেম, iii. ইন্টারনেট সংযোগ এবং iv. সফটওয়্যার।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের দায়িত্ব : ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের যেসব দায়িত্ব রয়েছে তা হলো :

i. কাস্টমারের সম্পূর্ণ প্রাইভেসি নিশ্চিত করা। কাস্টমারের PIN (Personal Indentification Number)-এর সাহায্যে এটা করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ঐ PIN ছাড়া তার Account Enable হবে না।

ii. ইনফরমেশন প্রসেসিং স্পিড ভালো রাখা, এটি করা যায় নয়েজ কমিয়ে।

iii. কোনো প্রকার বিঘ্ন ছাড়া সার্ভিস চালু রাখা, এর জন্য IPS-এর ব্যাক সার্ভিস ভালো থাকা খুব প্রয়োজনীয়।

iv. যে কোনো প্রকার ডিজাস্টারের রিপেয়ার করার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা রাখা। দক্ষ টেকনিশিয়ান নিয়োগের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

c. Give a brief description on pros and cons of satellite networks. 4

উত্তর : (i) স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সুবিধা (pros) : আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর একপ্রান্তের সংঘটিত কোনো ঘটনাকে অন্য প্রান্তে ন্যূনতম সময় ব্যবধানে সরাসরি দেখানো যাচ্ছে। বড় বড় টেলিমিডিয়াগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখছে তাদের টেলিকাস্টের মাধ্যমে। বিশ্ব পরিস্থিতি সাধারণ জনগণের কাছে অতি দ্রুত উপস্থাপিত হচ্ছে।

(ii) স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের অসুবিধা (cons) : স্যাটেলাইটকে তার কক্ষপথে স্থাপনের জন্য যে উৎক্ষেপণ মান ব্যবহৃত হয় তা খুবই ব্যয়বহুল যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পক্ষেই মেটানো সম্ভব নয়। অপরদিকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়ে। তদুপরি, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

4. a. Briefly describe the principle of AC power transmission and distribution. 5

উত্তর : উৎপাদিত তড়িৎ দূর-দূরান্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাই তড়িৎকে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে একটি প্রেরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সারা দেশে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থায় পাওয়ার স্টেশনগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থার নাম জাতীয় গ্রিড। তড়িৎ প্রেরণ করা হয় তারের মাধ্যমে। এ তার উঁচু টাওয়ারের মাধ্যমে টানানো থাকে। এসব তারে অনেক উচ্চ ভোল্টেজের তড়িৎ থাকে। কিন্তু তড়িৎ প্রবাহের মান থাকে কম। পাওয়ার স্টেশন থেকে তড়িৎকে ২৫,০০০ V-এ পাঠানো হয় এবং তড়িৎ প্রবাহের মান থাকে ২০০০০ অ্যাম্পিয়ার। এই ভোল্টেজকে একটি বিরাট আরোহী (স্টেপ আপ) ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। তখন ভোল্টেজের মান হতে পারে ২,৭৫,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ V। এজন্য তড়িৎ প্রবাহ (তড়িৎ কারেন্ট)-কে অনেক কমিয়ে ফেলতে হয়। প্রেরক তারে যে রোধ থাকে তা খুবই সামান্য কিন্তু এই রোধ তাৎপর্যপূর্ণ। তারের ভেতর দিয়ে যত বেশি তড়িৎপ্রবাহ চলে, ততই এটি উত্তপ্ত হতে থাকে। এই তাপশক্তি পারিপার্শ্বিক বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। তাপশক্তির উৎপাদনে তড়িৎ ব্যয় হয় এবং অপচয় ঘটে। এছাড়া তার যত বেশি উত্তপ্ত হয় এর রোধও বাড়তে থাকে। সুতরাং V বাড়ালে এবং তড়িৎ প্রবাহের মান কমালে শক্তি বা ক্ষমতার অপচয় কম হয়।

উচ্চ ভোল্টেজের এবং কম মানের তড়িৎ প্রবাহ গ্রাহকের ব্যবহারের উপযোগী নয়, তাই এই ভোল্টেজ আবার অনেকগুলো অবরোহী বা নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এতে ভোল্টেজ কমে যায় এবং তড়িৎ প্রবাহের মান বৃদ্ধি পায়। ফলে এই তড়িৎ গ্রাহকের ব্যবহারের উপযোগী হয়। বাংলাদেশে এই উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে ২২০V-এ নিয়ে আসা হয়।

b. Describe the working principle of induction motor. 4

উত্তর : যে তড়িৎযন্ত্র তড়িৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে তড়িৎ ইন্ডাকশন মোটর বলে। এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে : i. ক্ষেত্র চুম্বক, ii. আর্মেচার, iii. কম্যুটেটর ও iv. ব্রাস।

কার্যপ্রণালী : বহির্বর্তনী থেকে আর্মেচার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে কুণ্ডলীটি ঘুরতে শুরু করে। দুটি চৌম্বক বলের ক্রিয়ায় উদ্ভূত দ্বন্দ্বের জন্য কুণ্ডলীতে ঘূর্ণন উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণনের অভিমুখ ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত সূত্র থেকে পাওয়া যায়। কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ বাড়ালে ঘূর্ণনের বেগও বৃদ্ধি পায়। যখন কুণ্ডলীটি ঘোরে তখন এতে অল্প পরিমাণ তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়। এ সময় কুণ্ডলীটি ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরে চৌম্বক বলরেখার সাথে নিজেকে স্থাপিত করতে চায়। কুণ্ডলীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে কম্যুটেটরও ঘোরে। কুণ্ডলীর তল যখন উলম্ব অবস্থায় আসে তখন কুণ্ডলীর ওপর কোনো দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করে না। কিন্তু গতি জড়তার জন্য কুণ্ডলীটি একই দিকে আরো একটু এগিয়ে যায়।

কুণ্ডলীর এ অবস্থায় ব্রাস ও কম্যুটেটর অংশের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয় এবং কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ নির্দিষ্ট অভিমুখে যায়। ফলে দ্বন্দ্বের ভ্রামক কুণ্ডলীর ওপর একই দিকে ক্রিয়া করে এবং কুণ্ডলীকে একই দিকে আরো ঘুরিয়ে দেয়।

বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিলে তড়িৎ মোটরের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়।

c. Describe series voltage stabilizer with a suitable circuit diagram. 3

5. a. Describe the operation of a monochrome TV receiver with a suitable block diagram. 5

উত্তর : একটি একবর্ণী বা সাদাকালো (monochromatic) টেলিভিশনের (TV) ব্লক ডায়াগ্রাম নিচে দেয়া হলো :

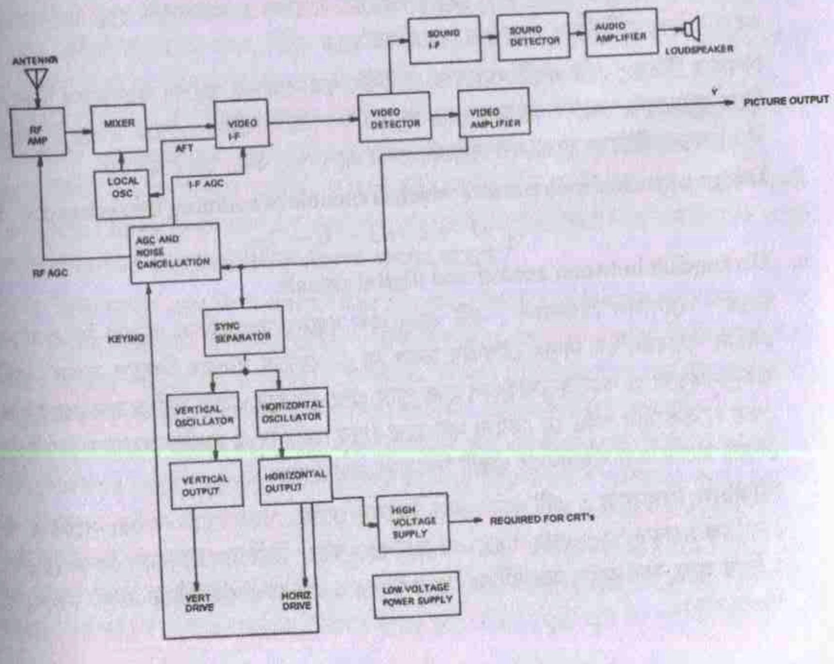

কার্যপ্রণালী : একটি একবর্ণী বা সাদাকালো (monochromatic) টেলিভিশনের (TV) বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রণালী নিচে বর্ণনা করা হলো :

অ্যান্টেনা : এ যন্ত্রের সাহায্যে TV প্রেরণ (Transmission) স্টেশন থেকে বিকিরিত RF তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়। এ কাজের জন্য সাধারণ ডাইপোল অ্যান্টেনা ব্যবহার করা হয়।

RF সেকশন : একটি RF বিবর্ধক, মিক্সার, লোকাল স্পন্দক এবং VHF ও UHF টিউনার একত্রে এই সেকশন গঠন করে। অ্যান্টেনা থেকে প্রাপ্ত RF কম্পাঙ্কের তরঙ্গ এবং লোকাল স্পন্দক থেকে সৃষ্ট তরঙ্গ একত্রে মিশিয়ে ইন্টারমিডিয়েট কম্পাঙ্কের (IF) তরঙ্গ উৎপন্ন করা এই অংশের মূল কাজ।

IF বিবর্ধক সেকশন : মিক্সার থেকে উৎপন্ন ইন্টারমিডিয়েট কম্পাঙ্কের সিগন্যালকে বিবর্ধিত করা এই অংশের প্রধান কাজ।

ভিডিও ডিটেক্টর : IF সিগন্যালকে বিবর্ধনের পর ভিডিও ডিটেক্টরে পাঠানো হয়। ভিডিও ডিটেক্টর হতে ভিডিও সিগন্যাল, অডিও IF সিগন্যাল ও সিনক্রোনাইজড সিগন্যাল আলাদা হয়ে যায়।

ভিডিও বিবর্ধক : ভিডিও ডিটেক্টর হতে প্রাপ্ত ছবির সিগন্যালকে বিবর্ধিত করাই এই ধাপের মূল কাজ।

শব্দ ধাপ : এই ধাপে FM তরঙ্গ হতে অডিও সিগন্যালকে পৃথক করা হয় এবং বিবর্ধনের পর লাউড স্পিকারের সাহায্যে শব্দ তরঙ্গে পরিবর্তন করা হয়।

সিগন্যাল পৃথকীকারক : এই অংশে ভিডিও সিগন্যালকে সিনক্রোনাইজড সিগন্যাল থেকে আলাদা করা হয়। এরপর পৃথকীকৃত সিগন্যালকে ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে উচ্চ বিভবে উন্নীত করা হয়। এই উচ্চ বিভব HT রেকটিফায়ারের সাহায্যে রেকটিফাইড হয়ে এর ধনাত্মক অংশটি পিকচার টিউবের অ্যানোডে আরোপিত হয়।

পিকচার টিউব : এটি একটি ক্যাথোড-রে টিউব যার সামনের অংশের কাচপাতের ভিতরের দিকে ফ্লুরোসেন্ট পদার্থের আবরণ দেয়া থাকে। যখন ইলেকট্রোগান থেকে উৎপন্ন ইলেকট্রন বীম পিকচার টিউবের ফ্লুরোসেন্ট পদার্থের ওপর এসে পড়ে তখন ছবি তৈরি হয়।

b. Design a synchronous counter which is capable of counting the sequences 5

$$\rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow$$

c. Distinguish between analog and digital signals. 2

উত্তর : অ্যানালগ সিগন্যাল : এটি এমন এক ধরনের সাংকেতিক প্রক্রিয়া বা একটানা চলমান পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ যা যে কোনো মাধ্যমে বিচরণে সক্ষম। এটি সাইনুসোইডাল বা ননসাইনুসোইডাল হতে পারে এবং এর মান একটি সর্বনিম্ন মান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত যে কোনো মান হতে পারে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী যে কোনো মানের জন্য বহির্গামীতে একটি সিগন্যাল পাওয়া যাবে।

ডিজিটাল সিগন্যাল : এটি এমন এক ধরনের থেকে থেকে থেমে যাওয়া সংকেত যা বৈদ্যুতিক সংকেত 'On' এবং 'Off'-এর মত কাজ করে। ডিজিটাল সিগন্যাল কেবল 0 এবং ১ নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ অন্তর্গামীতে শুধু 0 কিংবা ১-এর জন্য বহির্গামীতে একটি সিগন্যাল পাওয়া যাবে।

২৫তম বিসিএস

[প্রার্থীগণকে ১ নম্বর এবং বাকি যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে]

১ ○ প্রশ্ন-ক. হরমোন কি? মানবদেহে হরমোনের কাজ উল্লেখ করুন। ৪

উত্তর : হরমোন হলো অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নির্গত এক বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা সরাসরি রক্তে মিশে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় জৈব কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। নিচে বিভিন্ন প্রকার হরমোনের কাজ বর্ণনা করা হলো :

১. **গ্রোথ হরমোন :** দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর অভাবে মানুষ বেটে হয়।
২. **থাইরক্সিন হরমোন :** দেহের বিপাকে সহায়তা করে।
৩. **ইনসুলিন :** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়।
৪. **গ্লুকাগন :** রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
৫. **প্রোল্যাকটিন হরমোন :** স্তন বর্ধনে এবং দুগ্ধ নিঃসরণে সহায়তা করে।
৬. **অ্যাড্রেনালিন হরমোন :** জরুরি বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বিপদ মোকাবিলায় সহায়তা করে।
৭. **টেস্টোস্টেরন :** পুরুষের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং শুক্রাণু উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।
৮. **ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন :** স্ত্রীলোকের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সাহায্যতা করে এবং অমরা গঠনে সহায়তা করে।
৯. **রিলাক্সিন :** স্ত্রীলোকের গর্ভবস্থায় শ্রোণীবন্ধনী শিথিল করে।

○ প্রশ্ন-খ. ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা কি? এ মৃত্তিকা কিভাবে গঠিত হয়? এর ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন। ৪

উত্তর : Chrysophyta বিভাগের অন্তর্গত Bacillariophyceae শ্রেণীর শৈবালের সাধারণ নাম ডায়াটোম। এ শ্রেণীর সব শৈবালই আণুবীক্ষণিক এককোষী, তবে বিভিন্ন প্রজাতির কোষ একসাথে যুক্ত থেকে শৃঙ্খলের মতো, তারার মতো, কলাগাছের ভেলার মতো, সিঁড়ির মতো ইত্যাদি নানা ধরনের কলোনি তৈরি করে। এসব শিলা বা কলোনি বিশ্লেষণ ও দেহের ধ্বংসাবশেষ জমে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা বলে।

গঠন : ডায়াটোম শৈবালের কলোনিগুলো যুগ যুগ ধরে বিশ্লেষিত হয়ে জমা হয় এবং মৃত উদ্ভিদ-প্রাণিজ দেহাবশেষ মিশে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা গঠিত হয়। মূলত অতীতের ফসিল ডায়াটোমগুলোকে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা বলে।

ব্যবহার : বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে এ মাটি ব্যবহৃত হয়। যেমন– ডিনামাইট তৈরিতে এ মাটি একটি উপকরণ। Blast furnace-এর ভেতরের দেয়ালে প্রলেপ দেয়ার জন্য, টুথপেস্ট বা শব্দ নিয়ন্ত্রক ঘরের দেয়ালে প্রলেপ দেয়ার জন্য ডায়াটোমীয় মৃত্তিকার ব্যবহার রয়েছে।

○ প্রশ্ন-গ. পলিথিন কি এবং কি উপাদানে গঠিত? পলিথিন কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে? ৪

উত্তর : পলিথিন সাদা অস্বচ্ছ কঠিন প্লাস্টিক। অতি উচ্চচাপে এবং ১০০-২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তরলীকৃত ইথিলিন যৌগের অসংখ্য অণু পরস্পর মিলিত হয়ে পলিথিন উৎপন্ন করে। পলিথিনের মূল উপাদান ইথিলিন। এটি এক প্রকার জৈব যৌগ।

পরিবেশের ওপর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব : নিচে পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করা হলো :

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব : পলিথিন মাটির উর্বরতা নষ্ট করে উদ্ভিদজগতের ক্ষতিসাধন করে। ফসলের জমিতে পলিথিন সামগ্রী একবার পতিত হলে তা জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয় বলে অপরিবর্তিত থাকে এবং এতে মাটির রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না; মাটিতে উদ্ভিদের উপকারী ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। মাটির স্তরে পলিথিন থাকলে উদ্ভিদের শেকড় পলিথিন ভেদ করে গভীরে যেতে পারে না এবং উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। ফলে উদ্ভিদ অনুকূল পরিবেশ হারায় বলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে না; ফসলও হয় না।

মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব : প্লাস্টিকসামগ্রী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। প্লাস্টিক দহনে নির্গত হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের সৃষ্টি করে। প্লাস্টিকসামগ্রী থেকে নির্গত বিষাক্ত উপাদানগুলো মানুষের ক্যান্সার, ফুসফুসে সমস্যা, স্নায়ুতন্ত্রে বৈকল্য এমনকি জন্মত্রুটিও ঘটায়। প্লাস্টিকজাত সামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পেট্রোক্যামিকেলজাত উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকে বলে এ শিল্পসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকরা নানা জটিল রোগে ভোগে এবং তাদের জীবনীশক্তি কমে আসে।

○ প্রশ্ন-ঘ. গ্রিন হাউজ ইফেক্ট কি? পরিবেশের ওপর এর ভূমিকা সম্পর্কে লিখুন। ৪

উত্তর : গ্রিন হাউস ইফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন সুইডিস রসায়নবিদ সোভনটে আরহেনিয়াস ১৮৯৬ সালে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়াকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলে। বায়ুমণ্ডলে CFC, CO_2, CH_4 ও N_2O প্রভৃতি গ্যাস দ্বারা স্তর সৃষ্টি হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে তাপ আটকে পড়ে এবং সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে প্রভাব পড়ে তাই গ্রিন হাউস ইফেক্ট।

পরিবেশের ওপর এর প্রভাব : নিচে পরিবেশের ওপর এর প্রভাব উল্লেখ করা হলো :

১. **ভূপৃষ্ঠের নিচু এলাকায় প্লাবন :** পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এতে সমুদ্রের অনেক দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল, সমুদ্র উপকূলের দেশ ও শহর পানিতে ডুবে যাবে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাবে। এর ফলে অনেক জীবন এবং জীববসতি বিপন্ন হবে।

২. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধি পেলে মাটিতে পানির পরিমাণ কমে যাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতিমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে।

৪. **বনাঞ্চল ধ্বংস :** পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের জীবনধারণের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হবে। এর ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. **এসিড বৃষ্টি :** গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়ামণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে এসিড বৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পড়বে এবং ভূপৃষ্ঠের উর্বরতা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে এবং বনাঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

এছাড়া গ্রিন হাউজ ইফেক্টের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ পৃথিবীতে প্রবেশ করছে, যা মানবজীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ১৯৮৫ সালে জেনাহান শাকলিন সর্বপ্রথম এন্টার্কটিকার ওপরে ওজোনস্তরে ফাটল আবিষ্কার করেন।

○ প্রশ্ন-ঙ. বায়োগ্যাস বলতে কি বোঝায়? বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কি? এর প্রস্তুতপ্রণালী সংক্ষেপে লিখুন। ৪

উত্তর : প্রাণীর মলমূত্র, উদ্ভিদের আবর্জনা ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ পানির উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ার ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় যে বর্ণহীন, দুর্গন্ধহীন দাহ্য গ্যাস তৈরি করে তাকে বায়োগ্যাস বলে। বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন; ৬০-৭০ ভাগ মিথেন ও বাকিটা কার্বন ডাই-অক্সাইড।

প্রস্তুতপ্রণালী : বায়োগ্যাস তৈরির জন্য গ্যাসপ্লান্ট তৈরি করা হয়। এ প্লান্ট প্রধানত দু প্রকার। একটি 'স্থিরডোম', অন্যটি 'ভাসমান ডোম' মডেল। একটি স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্টের সমগ্র অংশ ইট, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়। এ প্লান্টের বিভিন্ন অংশ হচ্ছে–

১. **প্রবেশ কুয়া :** প্রবেশ নলের মুখে থাকে ইট নির্মিত চৌবাচ্চা।

২. **ডাইজেস্টার :** ৭-৮ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের রান্নাবান্না ও বাতি জ্বালানোর চাহিদা মেটানোর জন্য ২.৫ মিটার ব্যাস ও ২.২ মিটার গভীর গোলাকার কুয়া খনন করে এর তলার মধ্যবিন্দু আর্চের মতো করে নির্মাণ করা হয়।

৩. **হাইড্রোলিক চেম্বার :** হাইড্রোলিক চেম্বারটি একটি আয়তাকার চৌবাচ্চা। এর ওপরের অংশ স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

৪. **গ্যাস নির্গমন পাইপ :** ডোমের ওপরের অংশে গ্যাস ভালবযুক্ত নির্গমন পাইপ সংযুক্ত করতে হয়। ডাইজেস্টার, হাইড্রোলিক চেম্বার ও প্রবেশ নলের মুখের চৌবাচ্চা তৈরির পর প্লান্টটির চারপাশে মাটি দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে।

এরপর হাঁস-মুরগির মল, মানুষের মল, গোবর প্রভৃতি পচনশীল পদার্থের সাথে প্রয়োজনীয় অনুপাতে পানি মিশিয়ে প্রবেশ নল দিয়ে আস্তে আস্তে কুয়ায় ঢালতে হবে। কুয়া থেকে এসব পদার্থ ডাইজেস্টারে যায় এবং বায়ুর অনুপস্থিতিতে পচে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে ও গ্যাস নির্গমন পাইপ দিয়ে বের হয়ে আসে।

২ **○ প্রশ্ন-ক. কি প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আসে?** ২

উত্তর : আর্সেনিক একটি স্ফটিকাকার ধাতব মৌল। এটি পানিতে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার। মানুষের আর্সেনিক সহনীয় মাত্রা পানিতে ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য ঘটে এবং পানিতে আর্সেনিক দূষণ ঘটে। মাটিতে যৌগ হিসেবে আর্সেনিক থাকে। নলকূপের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর পানিশূন্য হয়। নলকূপের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন এ পানিশূন্য স্তরে পৌঁছে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক মুক্ত করে। এ মুক্ত আর্সেনিক নলকূপের পানির সাথে মিশে ওপরে উঠে আসে।

○ প্রশ্ন-খ. সাবমেরিন ক্যাবল কি? ২

উত্তর : সাবমেরিন ক্যাবল মূলত সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবারের বিশেষ ধরনের ক্যাবল ব্যবস্থাপনা। সমুদ্রের তলে স্থাপিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে সাবমেরিন ক্যাবল। এর মাধ্যমে আন্তঃমহাদেশীয় টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও অবিকৃতভাবে তথ্য সম্প্রচার করা সম্ভব। আমাদের দেশও ২১ মে ২০০৬ সালে সাবমেরিন ক্যাবল লাইনে যুক্ত হয়েছে।

○ প্রশ্ন-গ. সুনামি কি? ২

উত্তর : 'সুনামি' জাপানি শব্দ, যার অর্থ সামুদ্রিক ঢেউ। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প বা শিলাস্তরের চ্যুতি ঘটলে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং এ ঢেউ প্রবল প্রতাপে সমুদ্র উপকূলে আছড়ে পড়ে উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে। এ ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা এতটাই বেশি যে নিমিষেই ব্যাপক প্রাণহানী ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সংঘটিত সুনামিতে উপকূলীয় দেশগুলোতে অসংখ্য প্রাণহানী ঘটে।

○ প্রশ্ন-ঘ. বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরগুলোর নাম লিখুন। ২

উত্তর : পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ঊর্ধ্বদিকে যে গ্যাসীয় আবরণ সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডল ততই হালকা হতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের ৯৭% ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২৯ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করলেও বিজ্ঞানীদের মতে, বায়ুমণ্ডলের ঊর্ধ্বসীমা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

বায়ুমণ্ডলের স্তর : বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলো একের পর এক সজ্জিত। পৃথিবীর এ বায়বীয় আবরণে চারটি স্তর আছে। যথা : ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল।

১. **ট্রপোমণ্ডল :** ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডল স্তরকে বলা হয় ট্রপোমণ্ডল। বায়ুর এ স্তর ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে গড়ে প্রায় ১২.৮৭ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত। বায়ুর এ স্তর মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় স্তর। এ স্তরে প্রতি কিলোমিটারে ৬.৪° সেলসিয়াস তাপের হ্রাস হয়।

২. **স্ট্রাটোমণ্ডল :** বায়ুর এ স্তর ট্রপোমণ্ডলের ওপরের দিকে প্রায় ৫০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এ মণ্ডলের বায়ু অত্যন্ত লঘু, এর প্রবাহ খুবই ক্ষীণ।

৩. **মেসোমণ্ডল :** স্ট্রাটোমণ্ডলের ওপরের স্তর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উষ্ণতা দ্রুত হ্রাস পায়। এ স্তরকে মেসোমণ্ডল বলে। ৮০ কিলোমিটারের পরে পুনরায় উষ্ণতা বাড়তে থাকে। এর নাম মেসোবিরতি।

৪. **তাপমণ্ডল :** মেসোবিরতির ওপরের অংশ থেকে তাপমণ্ডল শুরু হয়। এ স্তরেই বিদ্যুৎ চমকাতে দেখা যায়। এর বহিঃসীমাকে এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) বলে।

○ প্রশ্ন-ঙ. আর্সেনিকোসিস রোগ কি এবং এর লক্ষণগুলো কি কি? ২

উত্তর : আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে বা শরীরে আর্সেনিকের দূষণ ঘটলে তাৎক্ষণিক ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা যায়। একে আর্সেনিকোসিস বলে। এর ফলে মানুষের–

১. গায়ের চামড়ায় বাদামি বা কালো রংয়ের দাগ দেখা দেয়।
২. হাত ও পায়ের তালু খসখসে হয় এবং ফুসকুড়ির মতো ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়।
৩. হাতে পায়ে লাল ছোপ এবং কুষ্ঠের মতো ঘা হয়।
৪. জন্ডিস দেখা দেয় এবং কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
৫. পেটে যন্ত্রণা হয় এবং বমি বা রক্তবমি হয়।

○ ৩. প্রশ্ন-ক. ডেঙ্গু রোগে রক্তের কোন কণিকা ভেঙে যায়? এ রোগ কিভাবে বাহিত হয়?

উত্তর : ডেঙ্গু রোগে রক্তের অণুচক্রিকা (Platelets) ভেঙে যায়।

যেভাবে বাহিত হয় : ডেঙ্গু ফিভার বা জ্বর এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা, ফুসকুড়ি ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। এডিস ইজিপটি নামক মশা এ ভাইরাসের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা সাধারণত দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়, গরম কালে শহর এলাকায় জলাবদ্ধ স্থানে এরা বংশবিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে গরমকালেই এদের বংশবিস্তার বেশি হয়ে থাকে। এ ভাইরাসকে ডেঙ্গু ভাইরাসও বলা হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা যাদেরকে কামড়ায় তারাই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। এছাড়াও এ মশা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পরে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তিও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। তাই বলা যায়, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিও এ রোগ ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

○ প্রশ্ন-খ. হাইড্রোমিটার ও ল্যাকটোমিটারের মধ্যে পার্থক্য করুন। ২

উত্তর : হাইড্রোমিটার দ্বারা তরলের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা হয়। পক্ষান্তরে, দুধের ঘনত্ব ও বিশুদ্ধতা নিরূপণের সরঞ্জাম হচ্ছে ল্যাকটোমিটার।

○ প্রশ্ন-গ. শীতকালে পুরাতন লেপের চেয়ে নতুন লেপ বেশি আরামদায়ক লাগে কেন?

উত্তর : লেপ ব্যবহার করে আমরা অভ্যন্তরীণ তাপকে বাইরে বা বাইরের তাপকে অভ্যন্তরে প্রবেশ রোধ করি। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। নতুন লেপের কাপড় ও তুলাতন্তু আলগাভাবে থাকে বিধায় এতে প্রচুর ফাঁক থাকে যেগুলোতে বায়ু আটকে থাকে। অন্যদিকে পুরাতন লেপ ব্যবহারের ফলে কাপড়ের ফাঁক ও তুলাতন্তুর ফাঁক কমে যায় ফলে এতে স্বল্প পরিমাণে বায়ুকণা আটকে থাকে। এজন্য নতুন লেপ পুরনো লেপের চেয়ে বেশি আরামদায়ক।

○ প্রশ্ন-ঘ. রক্তচাপ কি? রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম লিখুন? ২

উত্তর : হৃদযন্ত্র থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনীতে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ দু ধরনের; যথা :

১. **সিস্টোলিক চাপ :** হৃদযন্ত্রের সংকোচনকে সিস্টোল বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় সিস্টোলিক চাপ পারদস্তম্ভের ১০০-১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।
২. **ডায়াস্টোলিক চাপ :** হৃদযন্ত্রের প্রসারণকে ডায়াস্টোল বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় ডায়াস্টোলিক চাপ পারদস্তম্ভের ৬৫-৯০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphigmomenometer)।

○ প্রশ্ন-ঙ. রক্তের R_h বা রেসাস ফ্যাক্টর কি? এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

উত্তর : রেসাস বানরের রক্তে একটি এন্টিজেন থাকে। এটাকে রেসাস এন্টিজেন বা R_h ফ্যাক্টর বলে। কোনো কোনো মানুষের রক্তের কণিকায় 'R_h এগ্লুটিনোজেন' নামক বিশেষ উপাদান থাকে। এ এন্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করেই মানুষের রক্তের গ্রুপ R_h পজেটিভ ও R_h নেগেটিভ এ দু শ্রেণীতে বিভক্ত।

গুরুত্ব :

১. মানুষের রক্তকে R_h পজেটিভ ও R_h নেগেটিভ– এ দু ভাগে ভাগ করা যায়।
২. রক্তের বিভিন্ন রোগ যেমন– Hydrops foetalis, Erythroblastosis foetalis ইত্যাদি রক্তের R_h ফ্যাক্টরের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৪ ○ প্রশ্ন-ক. ভূমিকম্প কেন হয়? ২

উত্তর : সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। ক. ভূপৃষ্ঠজনিত, খ. আগ্নেয়গিরিজনিত ও গ. শিলাচ্যুতিজনিত কারণ।

১. **ভূপৃষ্ঠজনিত কারণ :** বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো সময় পাহাড়ি এলাকায় ধস নামে। ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।
২. **আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ :** আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসার চেষ্টায় প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের (Crater) ভেতরের ভূস্তরে আঘাত করতে থাকে। এ প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।
৩. **শিলাচ্যুতিজনিত কারণ :** ভূগর্ভের ভেতরে শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।
এছাড়াও ভূত্বকের পরিবর্তন, তাপ বিকিরণ, ভূগর্ভের চাপের হ্রাস, পানি বাষ্পীভবন, ভূত্বকের শীতলতাপ্রাপ্তি, হিমবাহ (Glacier), ভূ-আন্দোলন, খনির ভাঙন, বিস্ফোরণের প্রভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

○ প্রশ্ন-খ. সিপিইউ কি? ২

উত্তর : কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit)। সিপিইউ হচ্ছে কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে, সিপিইউ তেমনি কম্পিউটারের যাবতীয় কার্যক্রমসহ স্মৃতিভাণ্ডার, ইনপুট ডিভাইস, আউপুট ডিভাইসসহ যাবতীয় সরঞ্জামকে নিয়ন্ত্রণ করে। সিপিইউকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. গাণিতিক যুক্তি ইউনিট, ২. নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ও ৩. মেমরি।

○ প্রশ্ন-গ. বিগ ব্যাঙ তত্ত্ব কি? ২

উত্তর : বিগ ব্যাঙ বা প্রচণ্ড নিনাদ বা মহাবিস্ফোরণ নকশা হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের মহাবিস্ফোরণ বা আর্তনাদ, যা থেকে সময়, স্থান ও পদার্থের সৃষ্টি। প্রথমে এ মহাবিশ্ব ছিল অবিশ্বাস্যভাবে ঘন ও উত্তপ্ত। পরে এটি যখন বাইরের দিক থেকে প্রসারিত হতে থাকে তখন ছায়াপথ ও নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব প্রসারমান। মহাবিস্ফোরণের সময়কাল আমাদের পার্থিব সময় হিসেবে ১৫০০ কোটি বছর থেকে ২০০০ কোটি বছর অতীত হিসেবে ধরা হয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী অবশ্য এটাকে আজ থেকে ১৭.৭ শত কোটি বছর আগের বলে হিসাব করেছেন। বেলজিয়ামীয় নভোবিজ্ঞানী জর্জ লেমিট্রি ১৯২৭ সালে জানান মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে বিগ ব্যাঙের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এ রহস্য জানতে ২০০৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (CERN)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বিগ ব্যাঙ পরীক্ষা। কিন্তু প্রথম দু'দিনের পরীক্ষার পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরীক্ষাটি বাধাগ্রস্ত হয়।

○ প্রশ্ন-ঘ. এসি ও ডিসি বিদ্যুতের মধ্যে পার্থক্য কি? ২

উত্তর : যে বিদ্যুৎ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রবাহের দিক পরিবর্তন করে তাকে বলা হয় এসি (Alternating Current) বা পরিবর্তী প্রবাহ। যেমন– বাংলাদেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার দিক বদলায়। পক্ষান্তরে, যে বিদ্যুৎ প্রবাহ সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় তাকে ডিসি (Direct Current) বা একমুখী প্রবাহ বলে। যেমন– ব্যাটারি থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ।

○ প্রশ্ন-ঙ. সিএনজি কি? সিএনজির ব্যবহার লিখুন। ২

উত্তর : উচ্চচাপে প্রাকৃতিক গ্যাসকে ঘনীভূত করে যানবাহনের জ্বালানি বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহারকে সংক্ষেপে CNG (Compressed Natural Gas) বলে।

ব্যবহার :

১. এটি জ্বালানি তেলের বিকল্প হিসেবে যানবাহনে ব্যবহার করা হয়।

২. সহজে স্থানান্তরযোগ্য বলে যেখানে পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ করা যায় না সেখানে সিলিন্ডারে ভরে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার করা হয়।

৫ ○ প্রশ্ন-ক. ড্রাই আইস কাকে বলে? ২

উত্তর : কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড হলো শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইস। কার্বন ডাই-অক্সাইডের সংকট তাপমাত্রা 31.1° সে। এ তাপমাত্রার নিচে CO_2-কে চাপ প্রয়োগে তরল করা হয়। তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে উচ্চচাপে 0°C তাপমাত্রায় অতি দ্রুত শীতল করলে এটি জমে কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এটি দেখতে সাদা বরফের মতো বলে একে শুষ্ক বরফ বলা হয়। এটি বায়ুরোধক হিসেবে আইসক্রিম ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-খ. প্লাস্টার অব প্যারিস বলতে কি বোঝায়? ২

উত্তর : প্লাস্টার অব প্যারিস এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ, যা জলসংযোগে শক্ত হয়ে যায়। জিপসামকে ১২০-১৩০° C উষ্ণতায় নিয়ে গেলে জলীয় অংশ কমে গিয়ে চূর্ণ অবস্থায় আসে, যা অনার্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট মেশালে তা জমাট বাধে। এর সাধারণ নাম প্লাস্টার অব প্যারিস।

ব্যবহার : ১. শল্য চিকিৎসায় ব্যান্ডেজ; ২. ঢালাইয়ের কাজে; ৩. ভাস্কর্যে।

○ প্রশ্ন-গ. সেরিকালচার বলতে কি বোঝায়? ২

উত্তর : আমরা যে সিল্ক বা রেশমি কাপড় ব্যবহার করি তা রেশম মথ নামে এক ধরনের মথের লার্ভার লালাগ্রন্থি বা রেশম সুতা থেকে তৈরি হয়। রেশমি সুতা উৎপাদন এবং রেশমি বস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রেশম মথ পালন করার এবং তার গুটি বা কোকুন থেকে রেশমি সুতা সংগ্রহ করার সার্বিক প্রক্রিয়াকে সেরিকালচার বলা হয়। বাণিজ্যিকভাবে রেশম চাষ অত্যন্ত লাভজনক। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় উন্নতমানের রেশম চাষ করা হয়।

○ প্রশ্ন-ঘ. ভিটামিন 'কে' ও ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে কি ঘটে? ২

উত্তর : চর্বিদ্রাব্য ভিটামিন কে-এর অভাবে রক্ত জমাট বাধায় বাধাগ্রস্ত হয়। যার ফলে রক্তপাত প্রবণতা দেখা দেয়। চর্বিদ্রাব্য ভিটামিন 'এ' বা রেটিনল-এর অভাবে সংঘটিত রোগ হচ্ছে :

১. রাতকানা রোগ হয় এবং অধিক অভাবজনিত কারণে অন্ধত্ব দেখা দিতে পারে;

২. দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়;

৩. স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ল্যাথারিজমে নিম্নাঙ্গ ব্যাহত হয় ও ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে।

○ প্রশ্ন-ঙ. ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তম কেন? ২

উত্তর : ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ঘনঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি ও অত্যাবশ্যকীয় খনিজ লবণের অভাব দেখা দেয়। ডাবের পানিতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং কিছুটা গ্লুকোজও থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থের সাথে কিছুটা সোডিয়ামও বিদ্যমান। অন্য কোনো পানীয়তে এত সব নেই। এজন্য ডায়রিয়া হলে ডাবের পানি অত্যন্ত উপকারী।

২৪তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই (৬ × ৪ = ২৪) এবং অবশিষ্ট ১৩টি (১৩ × ২ = ২৬)

○ প্রশ্ন-১. কোলেস্টেরল কি? অধিক কোলেস্টেরলযুক্ত চারটি খাবারের নাম লিখুন।

উত্তর : কোলেস্টেরল এক জাতীয় স্টেরয়েড এলকোহল। এটি পানিতে অদ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় বলে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দলভুক্ত। আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যে খাবার খাই, তা আমাদের শরীরের ভেতর বিপাকের পর নানা বিক্রিয়ায় ভেঙ্গে গিয়ে নতুন নতুন উপাদানে পরিণত হয়। এমনি একটি উপাদান হচ্ছে এসিটিক এসিড বা এসিটেট। কোলেস্টেরলের উৎপত্তি এই এসিটেট থেকে। কোলেস্টেরল আমাদের রক্তনালী ও কোষে অবস্থান করে, বিশেষ করে নার্ভাস টিস্যুতে এর পরিমাণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এই কোলেস্টেরল যখন আমাদের রক্তনালীতে জমাট বাধতে শুরু করে তখনই দেখা দেয় হাইপারটেনশন ও হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ তথা হৃদরোগ।

অধিক কোলেস্টেরলযুক্ত চারটি খাবার হলো– ডিমের কুসুম, মাখন, গরুর মগজ, খাসীর কলিজা।

○ প্রশ্ন-২. সিস্টেম সফটওয়্যার ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : সফটওয়্যার দুই প্রকার। ১. সিস্টেম সফটওয়্যার ২. এপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের কার্যক্ষমতা ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ সম্বলিত প্রোগ্রামসমূহকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। অপারেটিং সিস্টেমসমূহ সিস্টেম সফটওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে, কম্পিউটার দ্বারা বিভিন্ন কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহৃত প্রোগামসমূহ এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত। তবে সফটওয়্যার বলতে মূলত এপ্লিকেশন সফটওয়্যারকেই বুঝানো হয়।

○ প্রশ্ন-৩. AIDS কি? এর প্রতিকারসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর : AIDS ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। AIDS-এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome. এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। ১৯৮১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম AIDS ধরা পড়ে।

এ রোগের কোনো প্রতিকার না থাকলেও এটা প্রতিরোধ করা সম্ভব। যেমন–

ক. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।

খ. বহুগামিতা ও পতিতালয়ে যাতায়াত পরিহার করা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা।

গ. রক্ত, রক্তজাত দ্রব্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের পূর্বে HIV/AIDS পরীক্ষা করে নেয়া।

ঘ. একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ (ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ), নতুন ব্লেড ব্যবহার করা অথবা ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, রেজার, ক্ষুর জীবাণুমুক্ত করে নেয়া।

ঙ. এইডস আক্রান্ত মায়ের দ্বারা তার শিশুর সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আক্রান্ত হলে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা।

○ প্রশ্ন-৪. জীব জগতের ওপর ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব বর্ণনা করুন।

উত্তর : জীব জগতের ওপর ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানা তথ্য দিয়েছেন। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন ওজোন স্তর ক্ষয়ের কারণে অতিবেগুনী রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে চলে এলে নিম্নলিখিত ক্ষতিগুলো হতে পারে :

ক. প্রাণিদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে।

খ. চোখে ছানি পড়বে।

গ. ত্বকের ক্যান্সার এবং অন্যান্য রোগব্যাধির সূচনা হবে। ধারণা করা হচ্ছে যে, ৫% ওজোন স্তরের ক্ষয়ের জন্য সারা বিশ্বে ৫ লাখ লোক স্কীন ক্যান্সারে ভুগবে। একটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে, ১% অতিবেগুনী রশ্মি বৃদ্ধির ফলে সাদা চামড়ার লোকদের মধ্যে নন মেলোনোমা ত্বকের ক্যান্সার বৃদ্ধি পাবে ৪ গুণ।

ঘ. অতিবেগুনী রশ্মি খাদ্যশস্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।
ঙ. প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে।
চ. বৃক্ষাদি এবং অরণ্যসমূহ নির্মূল হয়ে যাবে।
ছ. উদ্ভিদের পাতাগুলো আকারে ছোট হয়ে যাবে।
জ. বীজের উৎকর্ষতা নষ্ট হবে।
ঝ. ফসলের আগাছা, রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যাবে।
ঞ. অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব জীবকোষের উপর খুবই ক্ষতিকারক। এটা জীব কোষের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধিকে ব্যাহত করতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে কোষগুলোকে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।
ট. ক্ষুদ্র মাইক্রোঅর্গানিজম, সমুদ্র শৈবাল এবং প্লাংকটন অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। ফলে প্রাকৃতিক খাদ্যচক্রকে প্রভাবিত করে ক্ষতি সাধন করবে।

○ প্রশ্ন-৫. পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের ভূমিকা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সুষম জলবায়ুর প্রয়োজনে একটি দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। যেসব এলাকা জুড়ে পত্রবহুল গাছ জন্মানো হয় সেসব এলাকায় উদ্ভিদ থেকে বেরিয়ে আসা জলীয় বাষ্প স্থানীয়ভাবে আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেখানে বনাঞ্চল বেশি থাকে সেখানকার বাতাস আর্দ্র থাকে। এই আর্দ্র বাতাস একসাথে জমা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং সেখানকার বাতাসকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। আবার যদি কোনো এলাকায় ব্যাপকভাবে গাছপালা কাটা হয় এবং পূরণ করা না হয় তাহলে সেখানে বৃষ্টিপাত কমে যায়, ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ব্যাপক এলাকা অনুর্বর হয়ে কালক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হয়। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে গাছ বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যথায় প্রাণীকুল বায়ুমণ্ডল থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে তার ফলে বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হয়ে যেত এবং প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যেত।

○ প্রশ্ন-৬. খর পানি ও মৃদু পানি কি? পানির খরতার কারণ কি এবং কিভাবে তা দূর করা যায়?

উত্তর : খর পানি : যে পানি সাবানের সংমিশ্রণে সহজে ফেনা দেয় না এবং যে পানিতে Ca, Mg ও Fe-এর দ্রবণীয় Cl, PO_4 ও H_2CO_3-এর উপস্থিতি বিদ্যমান তাকে খর পানি বলে।

মৃদু পানি : যে পানি অতি সহজেই সাবানের ফেনা তৈরি করে তাকে মৃদু পানি বলে। এ পানিতে কোনো অপদ্রব থাকে না।

পানির খরতার কারণ : খর পানিতে এমন কিছু অপদ্রব আছে যার ফলে পানি সাবানের সঙ্গে সহজে ফেনা দেয় না। খর পানির এই অপদ্রবগুলো হলো ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ধাতুদ্বয়ের দ্রবণীয় হাইড্রোজেন কার্বনেট, সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ। এই অপদ্রবগুলো পানিতে দ্রবীভূত থাকলে পানি খর হয়।

পানির খরতা দূর করার উপায় : পানির দ্রবণীয় লবণকে রাসায়নিকভাবে অদ্রবীভূত লবণে পরিণত করে পানি থেকে পৃথক করলে পানির খরতা দূর হয়। দুটি পদ্ধতিতে পানির খরতা দূর করা যায়। ১. অস্থায়ী খরতা দূরীকরণ। যেমন– পানি ফুটিয়ে। ২. স্থায়ী খরতা দূরীকরণ। যেমন– সোডা প্রণালী। এ পদ্ধতিতে পানির সাথে সোডিয়াম কার্বনেট মিশ্রিত করে পানির খরতা দূর করা হয়। তাছাড়া পারমুটিট পদ্ধতিতে স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় খরতা দূর করা যায়।

○ প্রশ্ন-৭. ক্রোমোজোম ও জিনের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে লম্বা সুতার মতো কতগুলো বস্তু দেখা যায়, এগুলোই হলো ক্রোমোজোম। অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম জিন বা বংশানু নিয়ে ক্রোমোজোম তৈরি। জিনের রাসায়নিক গঠন উপাদান হচ্ছে ডিএনএ (DNA)। জিনের মাধ্যমে বাবা-মা থেকে জীবের বৈশিষ্ট্য, যেমন– দেহের আকার, আয়তন, রঙ, লিঙ্গ ইত্যাদি সন্তান-সন্ততিতে পরিবাহিত হয়। তাই ক্রোমোজোমকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলে।

অন্যদিকে জিন হলো ক্রোমোজোমে অবস্থিত বংশগতির বৈশেষ্ট্যের একক, যা জীবের বংশানুক্রমে মূলাধার হিসেবে কাজ করে। এর কাজ হলো পিতামাতার বৈশিষ্ট্যাবলী সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তর করা।

○ প্রশ্ন-৮. ইলেকট্রপ্লেটিং কি? ইহা কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : লোহা বা ইস্পাতের তৈরি অনেক সামগ্রীর ওপর তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের প্রলেপ দেয়া হয়। একে বলা হয় ইলেকট্রোপ্লেটিং। এ পদ্ধতিতে লোহার ওপর নিকেল, ক্রোমিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম এমনকি সোনা, প্লাটিনাম ইত্যাদি ধাতুর প্রলেপও দেয়া হয়। কোনো ধাতব পদার্থে মরিচারোধের উপায় হিসেবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৯. পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইমগুলো কি কি?

উত্তর : পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত এনজাইমগুলো হলো পেপসিন, রেনিন, অ্যামাইলেজ, ট্রিপসিন ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-১০. মাল্টিমিডিয়া কি?

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া শব্দের অর্থ বহুমাধ্যম। সাধারণ কম্পিউটারের সাথে অতিরিক্ত কিছু হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার যুক্ত করে কম্পিউটারে কাজ করার পাশাপাশি ছবি দেখা, গানশোনা ও অন্যান্য কাজ করা যায়। এ যন্ত্র দিয়ে এরূপ বহুবিধ কাজ করা যায় বলে একে মাল্টিমিডিয়া বা বহুমাধ্যম বলে।

○ প্রশ্ন-১১. কোথায় এবং কেন সারা বছরই দিন-রাত সমান?

উত্তর : বিষুব রেখা বরাবর অর্থাৎ বিষুবীয় অঞ্চলে সারা বছর দিন-রাত সমান থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে যখন দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে তখনও বিষুবীয় অঞ্চল সূর্য থেকে সমান দূরে অবস্থান করে। তাই সারা বছরই ঐ অঞ্চলে দিন-রাত সমান থাকে।

○ প্রশ্ন-১২. মরিচা কি? মরিচা কিভাবে রোধ করা যায়?

উত্তর : সাধারণত আর্দ্র বাতাসে লোহার জিনিস বাইরে পড়ে থাকলে, জলীয় বাষ্পের সাথে লোহার বিক্রিয়ায় এর ওপর বাদামী বর্ণের এক প্রকার প্রলেপ পড়ে। এ প্রলেপই মরিচা নামে খ্যাত।

সাধারণত ধাতুর উপরিতলে রঙ বা গ্রিজ দিয়ে, মেশিনের ঘূর্ণনশীল অংশে তেল বা গ্রিজ দিয়ে মরিচা রোধ করা যায়। লোহাকে গলিত দস্তায় ডুবিয়ে লোহার ওপর দস্তার পাতলা প্রলেপ দেয়া হয়। এতে লোহার ওপর মরিচা পড়তে পারে না। এভাবে কোনো ধাতুর ওপর দস্তার প্রলেপ দেয়াকে গ্যালভানাইজিং বলে। এছাড়া ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতেও মরিচা প্রতিরোধ করা যায়।

○ প্রশ্ন-১৩. উঁচু পর্বতের চূড়ায় রান্না করা কঠিন হয় কেন?

উত্তর : পাহাড় বা পর্বতের উপর বায়ুর চাপ কম থাকায় পানির স্ফুটনাংক কমে যায় অর্থাৎ কম তাপমাত্রায় পানি ফুটতে পারে। কিন্তু মাংস, মাছ, ডিম প্রভৃতি দ্রুত সিদ্ধ হয় না। এগুলো সুসিদ্ধ হওয়ার জন্য যে তাপের প্রয়োজন হয় পানি তার চেয়ে কম তাপমাত্রায় ফুটে বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য মাছ, মাংস সেই পর্যাপ্ত তাপ পায় না। ফলে সুউচ্চ পাহাড় বা পর্বতের চূড়ায় রান্না করা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

○ প্রশ্ন-১৪. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব ও টিউব লাইটের আলোর উৎপত্তিগত পার্থক্য কি?

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বে টাংস্টেনের সরু তার ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ প্রবাহ টাংস্টেন তারের মধ্য দিয়ে উচ্চ রোধের মুখে চলার সময় টাংস্টেন তার থাকে বলে ফিলামেন্ট খুব উত্তপ্ত হয় এবং আলো বিকিরণ করে। টিউব লাইটে কাচের নলের মধ্য দিয়ে নিম্নচাপে বায়ু চালনা (Discharge) করা হয়। নিম্নচাপে গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে এ বাতিতে আলো পাওয়া যায়। নলের একপ্রান্তে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড এবং অপরপ্রান্তে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড থাকে। ভিতরের বায়ুচাপ কমিয়ে ৫ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভের সমান করে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করা হয়। এতে তড়িৎদ্বারের মধ্যকার জায়গা, যা তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. লোহার টুকরা পানিতে ডুবে কিন্তু লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে। ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ভাসমান বস্তুর শর্ত হলো কোনো বস্তু কর্তৃক অপসারিত পানি বা তরলের ওজন ঐ বস্তুর ওজনের সমান হলে বস্তুটি ভাসবে। লোহার ঘনত্ব পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি। এজন্য একখণ্ড লোহাকে পানিতে ছেড়ে দিলে এর ওজনের চেয়ে কম ওজনের পানি অপসারিত হয়। ফলে লোহা পানিতে ডুবে যায়। কিন্তু লোহার পাত দিয়ে জাহাজ তৈরি করার সময় এর আয়তন বৃদ্ধি করা হয়, যা বেশি পানি অপসারণ করতে পারে। ফলে জাহাজের ওজন অপেক্ষা অপসারিত পানির ওজন বেশি হয়। এজন্য লোহার তৈরি জাহাজ পানিতে ভাসে।

○ প্রশ্ন-১৬. ইন্টারনেট কি?

উত্তর : বিশ্বব্যাপী জুড়ে থাকা অসংখ্য কম্পিউটারের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বলা হয় ইন্টারনেট। কম্পিউটারসমূহকে টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে পরস্পর সংযুক্ত করে তৈরি করা হয় এই নেটওয়ার্ক। স্কুল, কলেজ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে রাখা কম্পিউটারগুলো এভাবে সংযুক্ত হয়ে তৈরি করে লোকাল নেটওয়ার্ক। এই লোকাল নেটওয়ার্কগুলো আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়ে আরও বড় নেটওয়ার্কের সৃষ্টি করে। এ সমন্বিত কম্পিউটার নেটওয়ার্ককেই বলা হয় ইন্টারনেট।

○ প্রশ্ন-১৭. রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত তরলের নাম লিখুন।

উত্তর : রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত তরলের নাম ফ্রেয়ন। এর রাসায়নিক নাম ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন (Cl_2CF_2)।

○ প্রশ্ন-১৮. সুপারসনিক বিমান কি?

উত্তর : সুপারসনিক বিমান হলো শব্দের চেয়ে দ্রুতগামী বিমান। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের যৌথ উদ্যোগে ১৯৬২ সালে এটি তৈরি শুরু হয় ও ১৯৬৭ সালে শেষ হয়।

○ প্রশ্ন-১৯. মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো কি কি?

উত্তর : মানুষের রক্তের গ্রুপ চারটি। এগুলো হলো : A(এ), AB (এবি), B(বি) এবং O (ও)।

○ প্রশ্ন-২০. সাবান ও ডিটারজেন্ট-এর মধ্যে পার্থক্য করুন।

ক. সাবানের মৌলিক উপাদান হিসেবে চর্বি ও ক্ষার ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, ডিটারজেন্টে মৌলিক উপাদান হিসেবে চর্বি ও ক্ষারের সাথে বিভিন্ন সিনথেটিক পরিষ্কারক উপাদান ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয়।

খ. সাবানে মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) ব্যবহার করা হয় না। ডিটারজেন্টে মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) ও সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ব্যবহার করা হয়। ফলে ডিটারজেন্ট অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়।

গ. সাবান হলো ফ্যাটি এসিড মিশ্রিত গ্লিসারাইড। অন্যদিকে, ডিটারজেন্ট হলো সিনথেটিক পরিষ্কারক।

ঘ. সাবান ঠাণ্ডা পানিতে কম দ্রবণীয়। ডিটারজেন্ট ঠাণ্ডা পানিতে বেশি দ্রবণীয়।

ঙ. সাবান খর পানিতে কম ফেনা দেয় ও কম কার্যকর কিন্তু ডিটারজেন্ট খর পানিতে বেশি ফেনা দেয় ও অধিক কার্যকর।

চ. সাবানের কঠিন তলের ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা কম কিন্তু ডিটারজেন্টের তা বেশি।

○ প্রশ্ন-২১. সূর্যের তাপে গাছের পাতা গরম হয়ে শুকিয়ে যায় না কেন?

উত্তর : সূর্যের তাপে গাছের পাতা গরম হয় বটে; তবে প্রস্বেদনের প্রভাবে মূলরোম দ্বারা শোষিত প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি সূর্যালোকের সাহায্যে ও প্রোটোপ্লাজমের নিয়ন্ত্রণাধীনে পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট শর্তসমূহের উপস্থিতিতে বাষ্পাকারে নিষ্কাশিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। ফলে পাতা শুকিয়ে যায় না।

○ প্রশ্ন-২২. ই-মেইল (E-mail) কি?

উত্তর : ইলেকট্রনিক মেইল বা সংক্ষেপে ই-মেইল (E-mail) হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা। এ যন্ত্রটি নীতিগতভাবে ফ্যাক্স যন্ত্রের মতো কাজ করে। এটি কম্পিউটার, মডেম, মডুলেটর এবং স্যাটেলাইটের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। ই-মেইল দ্বারা স্বল্প খরচে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করা যায় এবং দীর্ঘ বার্তা প্রেরণে ই-মেইল খুবই সুবিধাজনক।

২৩তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই ($৬ \times ৪ = ২৪$) এবং অবশিষ্ট ১৩টি ($১৩ \times ২ = ২৬$)

○ প্রশ্ন-১. প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়?

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন গ্যাস। এই গ্যাসকে প্রজ্জ্বলন করে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপাদন করা হয়। উৎপন্ন তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

○ প্রশ্ন-২. ট্রপোস্ফিয়ারে ওজোন ক্ষতিকর, কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ারে এটি প্রয়োজনীয় কেন?

উত্তর : ট্রপোস্ফিয়ার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর। আমরা এই স্তরের মধ্যে বসবাস করি। এই স্তরে ওজোনের অবস্থানের ফলে গ্রীন হাউস ইফেক্টের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা আমাদের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু স্ট্রাটোস্ফিয়ার বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তর। এ স্তরের তাপমাত্রা সব সময়ই খুব কম থাকে। ফলে এখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলেও জনজীবনের কোনো ক্ষতি করে না। সেজন্য এ স্তরে ওজোন প্রয়োজনীয়।

○ প্রশ্ন-৩. গ্রীন হাউজ প্রভাব কি? পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে জলীয় বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা কি?

উত্তর : ওজোন স্তরে ক্ষত সৃষ্টি হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি ও পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব ফেলে, একেই গ্রীন হাউস প্রভাব বলে।

বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কম হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যায়। পক্ষান্তরে পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে তাপমাত্রা বেড়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-৪. SMOG কি? এর উৎপত্তির কারণ ও ক্ষতিকর প্রভাব বর্ণনা করুন।

উত্তর : SMOG শব্দটি SMOKE ও FOG-এর মিলিত রূপ। অর্থাৎ ধোঁয়া ও কুয়াশা মিলে ধোঁয়াশা (SMOG) সৃষ্টি করে। সাধারণত শিল্পবহুল এলাকায় SMOG সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত SMOG সৃষ্টি হলে পরিবেশ দূষণ ঘটে এবং মানুষের শ্বাসকষ্ট, ব্রংকাইটিস প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৫. Test-tube শিশু কি?

উত্তর : যদি নারী-পুরুষের স্বাভাবিক মিলনে সন্তান জন্ম না নেয় সেক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু নিয়ে নারী দেহের বাইরে মিলন ঘটিয়ে জাইগোট সৃষ্টি করা হয়। উৎপন্ন জাইগোট বা ভ্রূণ এরপর নারী দেহের জরায়ুতে স্থাপন করলে নির্দিষ্ট সময়ের পর শিশুর জন্ম হয়। এই শিশুকে টেস্ট টিউব শিশু বলে। এই পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে অনেক নিঃসন্তান দম্পতি সন্তানের মুখ দেখতে পারছেন।

○ প্রশ্ন-৬. Coronary angiography কি?

উত্তর : Coronary অর্থ ধমনী এবং angiography অর্থ প্রদর্শনবিদ্যা। অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে ধমনীতন্ত্রের প্রদর্শনকে Coronary angiography বলা হয়। সাধারণত হার্টএটাক বা স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অংশের ধমনীর অবস্থা জানতে চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

○ প্রশ্ন-৭. Heart attack ও Stroke-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে দেহের ধমনী বা শিরায় চর্বি জমতে থাকে এবং দেহের স্বাভাবিক রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় হৃৎপিণ্ড দেহের সর্বত্র প্রয়োজনীয় রক্ত সরবরাহ করতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের এই অবস্থাকে হার্ট অ্যাটাক বলে। এবং কোনো কারণে মস্তিষ্কের কোথাও রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে বা মস্তিষ্কের কোনো শিরা বা ধমনী ছিঁড়ে গেলে সেই অবস্থাকে স্ট্রোক বলে। সাধারণত উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগীদের হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রশ্ন-৮. Fluorescent tube light কি?

উত্তর : কোনো টিউব লাইটের দুই প্রান্তে দুটি ইলেকট্রোড থাকে এবং কাঁচদণ্ডের ভেতরে ফসফরাসের প্রলেপ দেয়া থাকে। তাছাড়া সমস্ত কাঁচদণ্ডটি আর্গন বা অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাসে ভর্তি করা হয়। দণ্ডের দুই প্রান্তে বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হলে উচ্চ কম্পাংকে বাতিটি প্রজ্বলিত হতে থাকে। এই ধরনের Tube lightকে Fluorescent tube light বলে।

প্রশ্ন-৯. লেজার (LASER) রশ্মির বৈশিষ্ট্য কি কি?

উত্তর : LASER রশ্মির বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. এটি আলোক বা বৈদ্যুতিক শক্তিকে তড়িৎ-চুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করে।
২. এটি অত্যধিক সুনির্দিষ্ট অর্থাৎ অনেক দূর পর্যন্ত দিক পরিবর্তন করে না।
৩. এর ঘনত্ব প্রায় স্থির।
৪. এটি অতিমাত্রায় সুসংগত ও এক বর্ণযুক্ত।

প্রশ্ন-১০. Computer-এর RAM কি?

উত্তর : RAM এর অভিব্যক্তি হলো Random Access Memory. এটি কম্পিউটারের ক্ষণস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডার। কম্পিউটারে কাজ করার সময় কাজগুলো কম্পিউটারে জমা থাকে। এটাই RAM। তবে তথ্যগুলো Save করে নিলে আর নষ্ট হয় না।

প্রশ্ন-১১. বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কোনো স্থানের বায়ুকে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয় এবং ঐ নির্দিষ্ট বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প আছে তাদের অনুপাতের শতকরা হারকে ঐ বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা বলে।

প্রশ্ন-১২. শিশির কেন উৎপন্ন হয়?

উত্তর : কোনো সম্পৃক্ত বায়ুর তাপমাত্রা কমে গেলে এবং ঐ বায়ুতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা থাকলে অতিরিক্ত আর্দ্রতা ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। এই জলকণাকে শিশির বলে। সাধারণত শীতকালে শিশির উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন-১৩. পানিতে লবণ যোগ করে তাড়াতাড়ি আলু সিদ্ধ করা যায় কেন?

উত্তর : লবণ পানিতে আলু সিদ্ধ করলে লবণ ব্যাপনের মাধ্যমে আলুর কোষে প্রবেশ করে এবং আলুর কোষপ্রাচীর ও খোসাকে নরম করে তোলে। ফলে তাপের প্রভাবে আলু অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন-১৪. 'প্রেসার কুকারে' তাড়াতাড়ি রান্না হয় কেন?

উত্তর : প্রেসার কুকার মোটা পাত্রের একটি আবদ্ধ পাত্র। রান্নার সময় প্রেসার কুকার উত্তপ্ত করলে ভেতরের জলীয় বাষ্প বের হতে পারে না বলে চাপ বাড়তে থাকে। চাপ বাড়ার ফলে পানির স্ফুটনাংক বেড়ে যায়। এতে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি রান্না সম্পন্ন হয়।

প্রশ্ন-১৫. সবসময় পানীয় হিসেবে পাতিত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত নয় কেন?

উত্তর : সাধারণ পানিতে অনেক খনিজ লবণ থাকে, যা আমাদের দেহের জন্য উপকারী। কিন্তু পাতিত পানিতে খনিজ লবণ থাকে না এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সিলিকা থাকে, যা আমাদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত নয়।

প্রশ্ন-১৬. একটি ধাতব পাত্রে তরল পদার্থ রেখে পাত্রটি উত্তপ্ত করা হলে প্রথমে তরলের উচ্চতা কমে যায় কেন?

উত্তর : ধাতব পাত্রে তরল পদার্থ রেখে তাপ প্রয়োগ করলে প্রথমে ধাতব পাত্রের প্রসারণ ঘটে বলে তরলের উচ্চতা কমে যায় এবং তরলের স্ফুটনাংক কম হওয়ায় কিছু তরল বাষ্পীভূত হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৭. মানবদেহে শিরার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো বিপজ্জনক কেন?

উত্তর : মানবদেহের শিরার মধ্যে থাকে রক্ত, যার ঘনত্ব বিশুদ্ধ পানির ঘনত্বের চেয়ে বেশি। শিরার মধ্যে বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করালে রক্তের ঘনত্ব কমে যায়। ফলে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ ব্যাহত হয় এবং পানি প্রবেশের ফলে কোষ নষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য মানবদেহের শিরায় বিশুদ্ধ পানি প্রবেশ করানো উচিত নয়।

প্রশ্ন-১৮. AIDS কি ধরনের রোগ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : AIDS-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome। এই রোগ হলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগী মারা যায়। তবে যেসব কারণে AIDS হয় সেগুলো থেকে বিরত থাকাই AIDS থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন-১৯. যানবাহন থেকে বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড কেন নির্গত হয়?

উত্তর : যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে সাধারণত ডিজেল, পেট্রোল ও অকটেন ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো এক ধরনের জৈব যৌগ। যানবাহনের ইঞ্জিনের মধ্যে জ্বালানি ও বাতাসকে প্রজ্বলন করে তাপ ও চাপের সৃষ্টি করা হয় কিন্তু কিছু জ্বালানি প্রজ্বলিত হয় না। এগুলো বায়ুর অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কালো ধোঁয়ার আকারে কার্বন মনোক্সাইড ও নাইট্রোজেন অক্সাইড হিসেবে বের হয়।

প্রশ্ন-২০. পেটে গ্যাস হলে কার্বন ট্যাবলেট সেবন করতে বলা হয় কেন?

উত্তর : পেটে গ্যাস হলে যদি কার্বন ট্যাবলেট সেবন করা হয় তাহলে ট্যাবলেট গ্যাসকে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত করে। নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে যায় বলে রোগী আরাম বোধ করে।

প্রশ্ন-২১. কম্পিউটার ভাইরাস কি?

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের প্রোগ্রাম। সাধারণত ইন্টারনেট বা ডিস্কের মাধ্যমে এগুলো কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত সমস্ত প্রোগ্রাম নিজের আয়ত্তে এনে ধ্বংস করে দেয়। কিছু দুষ্ট লোক এ ধরনের প্রোগ্রাম সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে থাকে।

প্রশ্ন-২২. আকাশ নীল দেখায় কেন?

উত্তর : সূর্যের আলো পৃথিবীতে প্রবেশের পথে মহাকাশের ধূলিকণা, জলকণা ও অন্যান্য উপাদানের সংস্পর্শে এসে বিচ্ছুরণ ঘটায়। সূর্যের আলোর ছয়টি রঙের মধ্যে নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এর বিচ্ছুরণ সবচেয়ে বেশি হয়। সেজন্যই আকাশের রঙ নীল দেখায়।

প্রশ্ন-২৩. Cathod Ray Tube (CRT) কি?

উত্তর : Cathod Ray Tube (CRT) এক ধরনের যন্ত্র যার দ্বারা বিদ্যুতের পরিমাণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা হয়। সাধারণত বৈদ্যুতিক বাতি বা প্রবাহের পরিমাণ বা হ্রাস-বৃদ্ধি জানতে CRT ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২৪. মানবদেহে কিডনির কাজ কি?

উত্তর : কিডনি মানবদেহে রক্তের ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে থাকে। কিডনি রক্ত থেকে দেহের প্রয়োজনীয় উপাদান রেখে দূষিত ও অপ্রয়োজনীয় অংশ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয়। সাধারণ প্রস্রাবে দেহের ক্ষতিকর পদার্থ ইউরিন হিসেবে বের করে।

২২তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই ($৬ \times ৪ = ২৪$) এবং অবশিষ্ট ১৩টি ($১৩ \times ২ = ২৬$)

প্রশ্ন-১. কম্পোস্ট কি? এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট, গৃহস্থালীর আবর্জনা, আগাছা, খড়কুটো প্রভৃতির এক বা একাধিক উপাদান পচানোর পর যে জৈব সার তৈরি হয় তাকে কম্পোস্ট বলে। এটি জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-২. 'উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করে।'—ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। উৎপন্ন খাদ্যের কিছু অংশ উদ্ভিদ নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অধিকাংশ দেহে জমা করে রাখে।

○ প্রশ্ন-৩. LASER কি? এর ব্যবহার আলোচনা করুন।

উত্তর : LASER-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
ব্যবহার : জীবদেহে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার, টেলিভিশন প্রোগ্রাম এবং পারমাণবিক ক্ষেত্রে এই রশ্মি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৪. বায়ুদূষণের কারণ কি কি? বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় আলোচনা করুন।

উত্তর : মোটরগাড়ি, কলকারখানার ধোঁয়া, কীটনাশক, আগাছানাশক, কলকারখানার বর্জ্য, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসে মিশে বায়ুদূষণ ঘটায়। এগুলো থেকে বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সিসা, হাইড্রোকার্বন মিশে দূষণ ঘটিয়ে থাকে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোটর গাড়ির কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কলকারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে আইন করে বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া কীটনাশক ও আগাছানাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার না করে সেক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে বায়ুদূষণ অনেকাংশে কমে যাবে।

○ প্রশ্ন-৫. বেকার্স ইস্ট কি ও এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : বেকার্স ইস্ট এক প্রকার ছত্রাকের গুঁড়া। এটি একটি জৈবপদার্থ। এটি প্রধানত পাউরুটি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ময়দার সাথে বেকার্স ইস্ট মেশানোর ফলে ময়দা ফুলে পাউরুটি তৈরি হয় এবং এক প্রকার গ্যাস বের হয়। সেজন্য পাউরুটি গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র তৈরি হয়।

○ প্রশ্ন-৬. জলাতঙ্ক কি? এর কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করুন।

উত্তর : জলাতঙ্ক এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণত র‍্যাবিস ভাইরাস আক্রান্ত শিয়াল বা কুকুর অন্য প্রাণীকে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। জলাতঙ্ক হলে এন্টি-র‍্যাবিস ইনজেকশন দিয়ে প্রতিকার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৭. সৌরশক্তির বর্তমান ব্যবহার ও এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : সৌরশক্তি দিয়ে বাতি জ্বালানো, রান্না করা, রেডিও, টিভি, ক্যালকুলেটর প্রভৃতি চালানো হয়। বর্তমানে মোটরগাড়ি চালানো ও কৃত্রিম উপগ্রহে সৌরশক্তি ব্যবহার শুরু হয়েছে।

উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে সৌরশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারলে প্রাত্যহিক জীবনে তেল-গ্যাস বা জ্বালানি কাঠের ওপর নির্ভরশীলতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। ফলে বৃক্ষ নিধন রোধ হবে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ সম্পদ অনেক বেড়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-৮. নিউক্লিয়ার রিএক্টর কি?

উত্তর : নিউক্লিয়ার রিএক্টর এক ধরনের চেইন বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়া পারমাণবিক পরীক্ষাগারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পদার্থের পরমাণুর নিউট্রনগুলো এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে পর্যায়ক্রমে শক্তি উৎপন্ন করতে করতে পরিশেষে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন করে। এই প্রক্রিয়াকে ফিশন বলে।

○ প্রশ্ন-৯. ক্রোমোজম কি? ক্রোমোজম কোষের কোথায় অবস্থান করে?

উত্তর : ক্রোমোজম জীবনের বংশগতির বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। এটি নিউক্লিক এসিড দিয়ে তৈরি (DNA; RNA)। এর মাধ্যমে জীবের বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তরিত হয়।

ক্রোমোজম জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকে।

○ প্রশ্ন-১০. পানি ফুটলে উথলে উঠে না, কিন্তু ফুটন্ত দুধ উথলে উঠে কেন?

উত্তর : দুধের মধ্যে বাতাসের পরিমাণ কম থাকে এবং ফ্যাটমিশ্রিত থাকে বলে ফোটানোর সময় ধীরে ধীরে বুদবুদ তৈরি হয়ে উথলে ওঠে কিন্তু পানিতে প্রচুর বাতাস মিশ্রিত থাকায় ফোটানোর সময় সহজেই বাষ্পায়িত হয় এবং কোনো বুদবুদ তৈরি না হওয়ায় উথলে ওঠে না।

○ প্রশ্ন-১১. বজ্রপাতের কারণ কি?

উত্তর : মেঘ তৈরি হওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের মেঘ ভিন্ন ভিন্ন চার্জে চার্জকৃত হয়ে থাকে। ঝড়-বৃষ্টির সময় ভিন্নধর্মী দুটি মেঘ পরস্পরের সংস্পর্শে এলে চার্জের বিনিময় ঘটে। ফলে প্রচণ্ড শব্দসহ বজ্রপাত ঘটে থাকে।

○ প্রশ্ন-১২. 'ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তম পানীয়'—কেন?

উত্তর : ডায়রিয়া হলে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় লবণ ও পানি বের হয়ে যায়। ডাবের পানিতে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম লবণ এবং প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ থাকে, যা রোগীর দেহের চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু অন্য কোনো পানীয়তে ঐ সব উপাদান নেই। সেজন্য বলা হয় ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তম পানীয়।

○ প্রশ্ন-১৩. ট্রেসার গবেষণা কাকে বলে?

উত্তর : কোনো রাসায়নিক বা ভৌত পরিবর্তনের সময় যেসব অণু বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাদের কার্যকারিতা বা তাদের অবস্থা ঐ পরমাণুর একটি নির্দিষ্ট আইসোটোপের সাহায্যে শনাক্ত করার পদ্ধতিকে ট্রেসার গবেষণা বলে।

○ প্রশ্ন-১৪. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি? এর বর্তমান ব্যবহার আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হাইড্রোকার্বন। তবে এর মধ্যে ৯৫-৯৮% মিথেন গ্যাস থাকে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাস গৃহস্থালীর জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, শিল্পের জ্বালানি ছাড়াও মোটর গাড়ির জ্বালানি ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-১৫. 'অংকুরিত ছোলা, ছোলা থেকে অধিক পুষ্টিকর।' কেন?

উত্তর : ছোলাতে শ্বেতসার, প্রোটিন, ফ্যাট ও খনিজ লবণ থাকে কিন্তু এগুলো সাধারণ অবস্থায় সবটুকু জীবনের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু অংকুরিত ছোলায় উক্ত উপাদানগুলো বিজারিত হয়ে জীবদেহের গ্রহণ উপযোগী হয়ে ওঠে। সেজন্য অংকুরিত ছোলা, ছোলা থেকে অধিক পুষ্টিকর।

○ প্রশ্ন-১৬. ইস্পাতের উপাদান কি কি?

উত্তর : ইস্পাতে প্রধানত ০.১৫-১.৫ ভাগ কার্বন ও বাকি অংশ লোহা থাকে। তবে লোহা ও কার্বনের সাথে অনেক ক্ষেত্রে ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, মলিবডেনাম, টাংস্টেন, নিকেল, সিলিকন প্রভৃতি ধাতু যোগ করে বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত তৈরি করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৭. এক্স-রে ও গামা-রে'র মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : এক্স-রে ও গামা-রে-এর মধ্যে তফাৎ নিম্নরূপ :

এক্স-রে	গামা-রে
১. এটি সক্রিয় কণা দ্বারা গঠিত।	১. এটি নিষ্ক্রিয় কণা দ্বারা গঠিত।
২. এর ভেদক ক্ষমতা কম।	২. এর ভেদক ক্ষমতা বেশি।
৩. এটি চুম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।	৩. এটি চুম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

○ প্রশ্ন-১৮. কি কি কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হয়?

উত্তর : বিদ্যুৎ উৎপন্ন করার সময় কিছু লস হয়। উৎপন্ন বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে ফেজ মারফত ট্রান্সফর্মারে আসার সময়ও সিস্টেম লস হয়। তাছাড়া বৈদ্যুতিক লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহের সময়ও লস হয়। সর্বোপরি অবৈধ ব্যবহারের ফলে বড় আকারের সিস্টেম লস দেখা যায়।

০ প্রশ্ন-১৯. মহাজাগতিক রশ্মি কি?

উত্তর : কার্বন, লোহা, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মৌলের ভারী কণার স্রোতকে মহাজাগতিক রশ্মি বলে। এগুলোর অবস্থান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে। এরা আলোর গতিতে চলতে থাকে এবং সামনের অন্যান্য মৌলের সাথে সংঘর্ষে নতুন কণার সৃষ্টি করে এবং আলোক বিচ্ছুরিত করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের মহাজাগতিক রশ্মি মিলে মিল্কিওয়ে বা ছায়াপথের সৃষ্টি করে।

০ প্রশ্ন-২০. এফএম রেডিও কি?

উত্তর : এফএম রেডিও বলতে বোঝায় Frequency Mode Radio. সাধারণ রেডিও অপেক্ষা এফএম রেডিওর শর্টওয়েভ রেঞ্জ অনেক বেশি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান পরিষ্কারভাবে শোনা যায়। তাছাড়া এফএম রেডিও শুনতে হলে রেডিও এন্টেনা ব্যবহার করতে হয়।

০ প্রশ্ন-২১. 'টিস্যু কালচার' বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : বিভিন্ন জীবের দেহ থেকে এক বা একাধিক টিস্যু সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে বৃদ্ধি ঘটিয়ে নতুন জীবের বা জীবের অংশের জন্ম দেয়াকে টিস্যু কালচার বলে। এই পদ্ধতিতে বর্তমানে রোগমুক্ত চারা, বীজহীন তরমুজ প্রভৃতি উন্নত জাতের উদ্ভিদ উৎপন্ন করা হচ্ছে।

০ প্রশ্ন-২২. কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে বৃষ্টি ঘটানো হয়?

উত্তর : বিমানে উড়ে জলভরা মেঘের ওপরে চলে যেতে হয়। ঐ মেঘের উপরে ড্রাই আইসের গুঁড়া ছড়িয়ে দিলে পানির কণাগুলো আস্তে আস্তে বড় আকার ধারণ করে এবং বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। এটাই কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি ঘটানোর পদ্ধতি।

২১তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই (৬ × ৪ = ২৪) এবং অবশিষ্ট ১৩টি (১৩ × ২ = ২৬)

০ প্রশ্ন-১. CFC কি এবং এটা কি কাজে ব্যবহৃত হয়? CFC ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : মিথেন (CH_4) ও ইথেন (C_2H_6)-এর ক্লোরোফ্লোরো উদ্ভূত যৌগসমূহকে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন সংক্ষেপে CFC বলে। CFC-এর বাণিজ্যিক নাম হলো 'ফ্রিয়নস'। CFC-এর মধ্যে ফ্রিয়ন -11, ফ্রিয়ন-12 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্যবহার : CFC কে সামান্য চাপে তরলে পরিণত করা যায় বিধায় এদেরকে হিমায়করূপে হিমায়নযন্ত্র তথা রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার শীতল রাখার জন্য সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এটি এরোসল ও প্লাস্টিক ফোম তৈরি করতে এবং দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা : CFC ব্যবহারের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এটি ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে। ফলে জীবজগতের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বা অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌছে। এতে মানুষের চর্ম ক্যান্সারসহ বহুবিধ মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া CO_2-এর মতো CFCও অধিক তাপ ধরে রাখার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এতে পৃথিবীর জীবজগতের ভারসাম্যপূর্ণ শৃঙ্খল নষ্ট হবে। এসব অসুবিধা দূর করে সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্যই CFC-এর বহুল ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন।

০ প্রশ্ন-২. ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারা বছরকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় তার প্রত্যেকটিকে এক একটি ঋতু বলে। যেমন– বাংলাদেশে তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে বছরকে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশর ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশে তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে বছরকে ৪ টি ঋতুতে ভাগ করা হয়।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ : ঋতু পরিবর্তন ঘটে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে। নিচে তাপমাত্রার পরিবর্তন ও ঋতু পরিবর্তনের কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

ক. **পৃথিবীর গঠন :** পৃথিবী গোল, তাই পৃথিবীর কোথাও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় ও ঋতু পরিবর্তিত হয়।

খ. **আবর্তন পথ :** পৃথিবীর আর্বতন পথ উপবৃত্তাকার। তাই বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কম বেশি হয়। এতে একই স্থানে বিভিন্ন সময় তাপের তারতম্য ঘটে, ফলে ঋতু পরিবর্তিত হয়।

গ. **কক্ষতলের সাথে মেরুরেখার অবস্থান :** পৃথিবীর মেরুরেখা নিজ কক্ষতলের সাথে ৬৬.৫ ডিগ্রি কোণে একই দিকে অবস্থান করে। এতে বছরে একবার পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্যের নিকটবর্তী হয়। যে গোলার্ধ যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে তার তাপমাত্রা তখন বেশি হয় এবং দূরে গেলে তাপমাত্রা কম হয়, ফলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

০ প্রশ্ন-৩. সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) কি? এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোকের উপস্থিতিতে ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানির সমন্বয়ে শর্করা উৎপন্ন করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বলে।

এই প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণটি হলো–

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব :

ক. **প্রাথমিক খাদ্য :** সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে যে শর্করা উৎপন্ন হয় তা সমগ্র জীবজগতের প্রাথমিক খাদ্য।

খ. **শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য :** শ্বসন প্রক্রিয়া জটিল খাদ্যকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র অংশে পরিণত করার মাধ্যমে ব্যাপক শক্তি সৃষ্টি করে। সুতরাং শ্বসন প্রক্রিয়াটি খাদ্যের ওপর নির্ভরশীল আর খাদ্য সরবরাহে সালোক সংশ্লেষণ অপরিহার্য।

গ. **অক্সিজেন উৎপাদন :** প্রায় প্রতিটি জীবের শ্বসনের সময় অক্সিজেন জরুরি। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন নিঃসরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের সরবরাহ নিশ্চিত হয়।

ঘ. **অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য :** আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে O_2 গ্রহণ ও CO_2 বর্জন করি। ফলে বাতাসে CO_2 বেড়ে যেত ও O_2 কমে যেত কিন্তু উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় CO_2 গ্রহণ ও O_2 ত্যাগের মাধ্যমে উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করে।

০ প্রশ্ন-৪. হার্ট অ্যাটাক (Heart attack) কি? হৃদরোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত 'Coronary by pass' ও 'angioplastic'-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : হার্ট অ্যাটাক : মানবদেহের রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে হৃৎপিণ্ড। রক্তকে রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানবদেহে পাম্প যন্ত্র হিসেবে কাজ করে। এই জীবন্ত পাম্প যন্ত্রটি বিরামহীনভাবে ছন্দময়গতিতে সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনীর সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশে পৌছে দেয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। যদি কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডের এ ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণ থেমে যায় অথবা বড় কোনো ধরনের অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় তবে এর প্রভাবে শরীরে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে।

Coronary by pass ও angioplastic উভয়ই হৃদরোগের চিকিৎসা পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও এ পদ্ধতিদ্বয়ের প্রয়োগ ক্ষেত্র, প্রয়োগ পদ্ধতিসহ কিছু বিষয়ে একে অপরের চেয়ে কিছুটা পৃথক।

Coronary by pass : মানবদেহে তিনটি বড় ধমনীসহ আরো কয়েকটি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ধমনী দ্বারা হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। যদি কোনো কারণে দুটি বা তিনটি বৃহৎ ধমনী দ্বারাই রক্ত প্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায় তবে সাধারণত যে পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয় তাকে Coronary by pass বলা হয়। সাধারণত ধমনীতে চর্বি জমে, রক্ত জমাট বেঁধে বা ধমনী গাত্র সংকুচিত হয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় বা বাধাগ্রস্ত হয়। Coronary by pass পদ্ধতিতে শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে শিরা কেটে এনে ধমনীর রক্ত চলাচলের বাধাপ্রাপ্ত স্থানের ওপর থেকে নিচে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এটি একটি স্থায়ী পদ্ধতি তবে এ পদ্ধতিটি বেশ জটিল।

Angioplastic : তিনটি বড় ধমনীর মধ্যে যে কোনো একটি ধমনী দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে এর চিকিৎসায় Coronary by pass-এর পরিবর্তে অপর একটি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, যার নাম Angioplastic। এ পদ্ধতিতে এক বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সমস্যাযুক্ত ধমনীর সংকুচিত স্থান বিশেষ ধরনের বেলুন দ্বারা প্রসারিত করা হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়। এ পদ্ধতিটি Coronary by pass অপেক্ষা সহজতর। তবে এক্ষেত্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তির রক্ত চলাচল পুনরায় বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

০ প্রশ্ন-৫. পারমাণবিক বোমা ও হাইড্রোজেন বোমার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : পারমাণবিক বোমায় যে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় তার নাম fission। কোনো ভারী পরমাণু যেমন ইউরেনিয়ামকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে ভেঙ্গে যায় এবং প্রচুর শক্তি উৎপাদন করে। এই অনিয়ন্ত্রিত fission বিক্রিয়া কাজে লাগিয়ে যে বোমা তৈরি করা হয় তার নাম পারমাণবিক বোমা।

হাইড্রোজেন বোমা তৈরির প্রযুক্তি পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রযুক্তির ঠিক উল্টো। এই প্রযুক্তিকে বলা হয় fusion। দুটি ক্ষুদ্র হাইড্রোজেন পরমাণুকে উচ্চ তাপ বা চাপে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ পরমাণু যেমন হিলিয়ামে পরিণত করাকে fusion বলে। fusion প্রক্রিয়ায় fission-এর চেয়েও বেশি শক্তি উৎপন্ন হয়। তাই পারমাণবিক বোমার চেয়ে হাইড্রোজেন বোমা বেশি শক্তিশালী।

০ প্রশ্ন-৬. ব্রিজের ওপর দিয়ে সৈন্য পার হবার সময় প্যারেড করে চলতে মানা করা হয় কেন?

উত্তর : প্রতিটি জিনিসই একটি নির্দিষ্ট কম্পাংকে ভেঙ্গে যায়। কাজেই প্রতিটি ব্রিজেরও একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে, যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ওটা ভেঙ্গে যাবে। ব্রিজের ওপর সৈন্যদের প্যারেড করা কালীন অনুনাদের (resonance) কারণে যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ব্রিজটি ভেঙ্গে যাবে সেই ফ্রিকোয়েন্সি তৈরি হতে পারে। কাজেই দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য ব্রিজের ওপর দিয়ে সৈন্য পার হবার সময় প্যারেড করে চলতে মানা করা হয়।

০ প্রশ্ন-৭. এক্স-রে আসলে কি?

উত্তর : এক্স-রে আলোকের মতোই তড়িৎ চুম্বকীয় অদৃশ্যমান বিকিরণ। দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন অজানা প্রকৃতির এক প্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয়। এ বিকিরণকেই এক্স-রে বলে। ১৮৯৫ সালে উইলহেলম রন্টজেন প্রথম এ ধরনের বিকিরণ পর্যবেক্ষণ করেন। এক্স-রের একক হলো রন্টজেন। এক্স-রে তৈরির জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকে 'এক্স-রে টিউব' বলে।

প্রশ্ন-৮. চোখে ধোঁয়া লাগলে চোখ জ্বলে কেন?

উত্তর : চোখে অবস্থিত অ্যাকুয়াস হিউমার এবং ভিট্রিয়াস হিউমার এবং অন্যান্য তরল খুব অ্যান্টিব্যাক্টেরিয়াল অর্থাৎ জীবাণুনাশক। সুতরাং কোনো ধুলাবালু চোখে প্রবেশ করলে জীবাণুনাশক তরলগুলো তখনই তাদের সাথে যুদ্ধ করে চোখকে রক্ষায় সচেষ্ট হয়। তাই চোখে ধোঁয়া লাগলে চোখ জ্বলে।

০ প্রশ্ন-৯. পাকস্থলীতে যে এসিড হয় এটি কি?

উত্তর : পাকস্থলীতে যে এসিড হয় তা হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)। হাইড্রোক্লোরিক এসিড পাকস্থলীতে উপস্থিত থেকে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড শর্করা পরিপাকে সাহায্য করে।

০ প্রশ্ন-১০. চাঁদের হলদে আলোতে লাল গোলাপ কেমন দেখাবে?

উত্তর : চাঁদের হলদে আলোতে লাল গোলাপ কালো দেখাবে। কারণ লাল জিনিস লাল রং ছাড়া যে কোনো রং শোষণ করে নেয়। লাল গোলাপ হলুদ আলো শোষণ করবে ফলে ফুলটি কোনো রঙই প্রতিফলিত করতে পারবে না এবং কালো দেখাবে।

০ প্রশ্ন-১১. ইনসুলিন কি করে?

উত্তর : অগ্ন্যাশয়ের 'আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স' নামক গ্রন্থির বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত এক প্রকার হরমোন হচ্ছে ইনসুলিন। ইনসুলিনের প্রধান কাজ হচ্ছে রক্তে গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা। কোনো কারণে প্রয়োজনানুপাতে ইনসুলিন নিঃসৃত না হলে গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়া ব্যাহত হয় ও রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় মূত্রের সাথে গ্লুকোজ দেহ থেকে বের হয়ে যায়। ফলে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ সৃষ্টি হয়। ইনসুলিন উপরোক্ত কাজ ছাড়াও শ্বেতসার, আমিষ ও চর্বির বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

০ প্রশ্ন-১২. বৃষ্টির ফোটা গোল কেন?

উত্তর : মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে পড়ন্ত বৃষ্টির ফোটা লম্বা দেখানোর কথা। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ফোঁটাগুলো গোল। এর কারণ পানির পৃষ্ঠটান। পৃষ্ঠটান নামক ভৌত ধর্মের কারণে বৃষ্টির ফোঁটা গোল হয়ে মাটিতে পড়ে।

০ প্রশ্ন-১৩. নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলতে কি বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রকৃতি জগতে বিদ্যমান বিভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন উৎস রয়েছে। যথা- তাপশক্তির প্রধান উৎস তেল, গ্যাস ইত্যাদি। আবার তাপশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি পেতে পারি। কিন্তু শক্তির উৎস হিসেবে এর একটিও অফুরন্ত নয় বরং ক্রম ব্যবহারের ফলে এগুলো একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন কতিপয় অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডার রয়েছে, যা বহুবিধ ব্যবহারেও নিঃশেষ হবে না ঐসব উৎসকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলে। সৌরশক্তি, বিশাল জলরাশির প্রবাহ, বাতাস ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘক্ষণ সূর্যালোক পড়ে এমন জায়গায় বিরাট দর্পণ বসিয়ে সূর্যরশ্মিকে বিশেষভাবে নির্মিত বয়লারে কেন্দ্রীভূত করে প্রচুর তাপ সৃষ্টি করা যায়। এ তাপ দ্বারা বাষ্প উৎপন্ন করে জেনারেটরের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

আবার বহমান স্রোতকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প এরকম একটি প্রকল্প। সূর্যতাপ বা স্রোতের এ ধরনের ব্যবহারের ফলে এগুলো নিঃশেষ হবে না। এ কারণে এদেরকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলা যায়।

০ প্রশ্ন-১৪. মোটরযান কিভাবে বায়ু দূষিত করে?

উত্তর : মোটরযানের ইঞ্জিন পেট্রোল, ডিজেল বা অকটেন ও বায়ুর মিশ্রণকে প্রজ্বলিত করে বিপুল পরিমাণ তাপ শক্তি ও চাপের সৃষ্টি করে যা ব্যবহার করে মোটরযান চালিত হয়। কিন্তু এই প্রজ্জ্বলন কার্য চলার সময় যে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে তা মূলত বায়ুমণ্ডলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড ও লেড অক্সাইড প্রভৃতি যৌগের মিশ্রণ। ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। আর আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বেশিরভাগ মোটরযানই ত্রুটিযুক্ত। ফলে এদের থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ুমণ্ডল তথা সামগ্রিক পরিবেশের জন্য এক মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এছাড়া মোটরযানের উচ্চ শব্দও পরিবেশকে দূষিত করে।

○ প্রশ্ন-১৫. কংক্রিট কি? কি উপায়ে কংক্রিটকে অধিকতর মজবুত করা হয়?

উত্তর : আধুনিক নির্মাণজগতের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ নির্মাণ উপাদান হচ্ছে কংক্রিট। সিমেন্ট ও পানির সমন্বয়ে প্রস্তুত লেই বা পেস্টের সাথে কতিপয় নিষ্ক্রিয় পদার্থের কণা যথা– বালি, খোয়া (ইঁটের টুকরা), পাথরের টুকরা সঠিক অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকৃতির যে কৃত্রিম পাথর তৈরি করা হয় তাকে কংক্রিট বলে। এটি নির্মাণ কাজের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পাকা বাড়ি, দালানকোঠা, পুল, কালভার্ট নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা ছাড়াও সম্প্রতি বিভিন্ন ধরনের ম্যুরাল ও ভাস্কর্য নির্মাণেও এটি ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ কংক্রিটের আঘাত ও চাপ সহ্য ক্ষমতা কম। তাই এদেরকে অধিকতর শক্ত করার জন্য নির্মাণের সময় কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। যথা— মধ্যখানে লোহার রড রেখে চারপাশে কংক্রিট জমানো হয় এতে কংক্রিট বেশ শক্ত হয় অর্থাৎ অধিক চাপ ও ঘাতসহ হয়। এছাড়া কংক্রিটের মধ্যে বাতাসের পরিমাণ যতো কম এবং পানি ও সিমেন্টের পরিমাণ যতো বেশি হবে কংক্রিট ততো বেশি শক্ত হবে।

○ প্রশ্ন-১৬. কৃত্রিম উপগ্রহ কি? বর্তমান সভ্যতায় কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা কি?

উত্তর : উপগ্রহ বলতে সাধারণত কোনো গ্রহের চারদিকের ঘূর্ণায়মান কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে বোঝায়। যেমন পৃথিবীর (গ্রহ) চারদিকে ঘূর্ণায়মান চাঁদ একটি উপগ্রহ। সুতরাং কৃত্রিম উপগ্রহ বলতে মানুষ নির্মিত উপগ্রহকে বোঝায়। মূলত কৃত্রিম উপগ্রহ এমন এক যন্ত্র যা মানুষ কর্তৃক নির্মিত হয়ে শক্তিশালী রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষিপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপিত হয় ও পৃথিবীকে অনবরত প্রদক্ষিণ করার সাথে সাথে বিচিত্র তথ্য প্রদানের কাজে নিয়োজিত থাকে। সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়।

বর্তমান সভ্যতায় কৃত্রিম উপগ্রহের ভূমিকা অপরিসীম। তাই আধুনিক যুগে কাজের ভিত্তিতে উপগ্রহগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিচে বিভিন্ন প্রকার কৃত্রিম উপগ্রহের কাজ উল্লেখ করা হলো যার দ্বারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। যোগাযোগ উপগ্রহগুলো পৃথিবীর এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় টেলিফোন আলাপ, টেলিসংকেত ও টেলিভিশন প্রোগ্রাম পৌছে দিতে সাহায্য করে। আবহাওয়া উপগ্রহগুলো বায়ুমণ্ডলে মেঘ, ঘূর্ণি ইত্যাদির ছবি প্রেরণসহ আবহাওয়া সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্য দেয়। দূর অনুধাবন উপগ্রহগুলো ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবর্তন কৃষি, বন, মৎস্য ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সচিত্র তথ্য প্রেরণ করে। এছাড়া আরো কতিপয় কৃত্রিম উপগ্রহ আছে, যা বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজেও এটি ব্যবহৃত হয়। কতিপয় উপগ্রহ যথেষ্ট গোপনে সামরিক বিষয়ে কাজ করে। এক কথায় বলা যায়, বর্তমান সভ্যতাকে সবদিক দিয়ে আরো উৎকর্ষ করার ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

○ প্রশ্ন-১৭. ইন্টারনেট কি?

উত্তর : বিশ্বব্যাপী তথ্য যোগাযোগের অতি আধুনিক নেটওয়ার্ক হলো ইন্টারনেট। টেলিফোন সিস্টেমকে ব্যবহার করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য কম্পিউটারকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে তাদের মধ্যে যে আন্তঃসম্পর্ক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় তাকে বলে ইন্টারনেট। টেলিফোনে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে টেলিফোন এক্সচেঞ্জগুলো যেমন আমাদের যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়, ইন্টারনেটের ক্ষেত্রেও তেমনি টেলিফোন যোগাযোগ সিস্টেমকে ব্যবহার করে প্রতিটি টার্মিনালে কম্পিউটারের সংযোগ দিয়ে কম্পিউটার থেকে কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিই হলো ইন্টারনেট পদ্ধতি। কম্পিউটার সিগন্যালকে টেলিফোন লাইনের উপযোগী করতে কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের সংযোগস্থলে একটি মডেম সংযুক্ত করতে হয়। অর্থাৎ ইন্টারনেট ব্যবস্থার আওতায় আসার জন্য প্রয়োজন একটি 386 কম্পিউটার, একটি মডেম ও টেলিফোন সংযোগ।

○ প্রশ্ন-১৮. গ্যালভানাইজিং কি?

উত্তর : গ্যালভানাইজিং হলো কোন ধাতুর ওপর বিদ্যুৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অন্য একটি ধাতু বিশেষত দস্তার প্রলেপ লাগানো। এভাবে একটি ধাতব জিনিস যেমন, ঘরের ঢেউটিন, পানির বালতি, হারিকেন ইত্যাদির ওপর দস্তার প্রলেপ লাগিয়ে জিনিসটিকে চকচকে, টেকসই এবং মরিচারোধী করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৯. পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কেন?

উত্তর : পলিথিন ব্যাগ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কারণ এটা সহজে ধ্বংস হয় না। অনেক জিনিস মাটিতে ফেলে রাখলে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ধীরে ধীরে মাটিতে পরিণত হয় কিন্তু পলিথিন অবিকৃত থাকে। ফলে পলিথিন মাটির উর্বরতা হ্রাস, গুণ পরিবর্তন করা সহ নানা সমস্যা তৈরি করে। শহরাঞ্চলে এটা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে।

○ প্রশ্ন-২১. হিমোগ্লোবিন মানবদেহে কোন ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : লোহিত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমস্থ এক ধরনের লৌহঘটিত প্রোটিন জাতীয় রঞ্জক পদার্থ হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। লোহিত রক্ত কণিকার কঠিন পদার্থের প্রায় ৯৫ ভাগই হচ্ছে হিমোগ্লোবিন।

মানবদেহে হিমোগ্লোবিনের ভূমিকা : মানবদেহে হিমোগ্লোবিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর প্রধান কাজ হচ্ছে ফুসফুস হতে কলায় অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যাওয়া ও রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন। হিমোগ্লোবিনের সাথে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে যথাক্রমে অক্সি-হিমোগ্লোবিন ও কার্বামাইনো হিমোগ্লোবিন নামে দু'ধরনের অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ দুটো রক্তের সাহায্যে দেহের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হয়। অক্সি-হিমোগ্লোবিনসমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুস থেকে হৃৎপিণ্ড হয়ে সারা দেহে বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে আর কার্বামাইনো হিমোগ্লোবিনসমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে যায়।

উপরোক্ত কাজ ছাড়াও হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে কাজ করে রক্তের PH নিয়ন্ত্রণ করে। এটি ভেঙ্গে পিত্তের প্রধান রঞ্জক সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-২২. বায়োটেকনোলজি কি?

উত্তর : বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করাকে বায়োটেকনোলজি বলে। যেমন– গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন হচ্ছে বায়োটেকনোলজি।

২০তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই (৬ × ৪ = ২৪) এবং অবশিষ্ট ১৩টি (১৩ × ২ = ২৬)

○ প্রশ্ন-১. ভোরের সূর্য লাল দেখা যায় কেন?

উত্তর : সূর্যের আলো পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সে অংশকে আমরা বলি দিন। সূর্যের সাদা আলো আসলে সাতটি রঙের মিশ্রণ। এগুলো হলো বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এদের মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি এবং বেগুনী আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। উঠার সময় অর্থাৎ ভোরে সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। দুপুরে সূর্য যখন আমাদের মাথার ওপরে থাকে তখন সূর্যালোককে ধূলিকণা, পানিকণাপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় দিগন্ত রেখা থেকে এই সূর্যরশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের পুরুস্তর ভেদ করতে হয় তার অনেক গুণ বেশি। তাই বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা পানিকণায় ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নীল এবং এর কাছাকাছি বর্ণগুলোর বিক্ষেপণ বেশি হয় এবং এরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লাল বর্ণের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় হওয়ায় তা সোজাসুজি পৃথিবীতে চলে আসে। তাই সূর্যোদয়ের সময় অর্থাৎ ভোরের সূর্যকে লাল দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-২. ভূমিকম্পের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। এগুলো হলো :

ক. **ভূ-পৃষ্ঠজনিত কারণ :** বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো সময় পাহাড়ি এলাকায় ধস নামার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

খ. **আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ :** আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূ-গর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসার চেষ্টায় প্রচণ্ড শক্তিতে আগেয়গিরির জ্বালামুখের (Crater) ভেতরের ভূ-স্তরে আঘাত করতে থাকে। সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

গ. **শিলাচ্যুতিজনিত কারণ :** ভূ-গর্ভের ভেতরে শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

এছাড়াও ভূ-ত্বকের পরিবর্তন, তাপ-বিকিরণ, ভূগর্ভের চাপের হ্রাস, পানি বাষ্পীভবন, ভূ-ত্বকের শীতলতাপ্রাপ্তি, হিমবাহ ভূ-আন্দোলন, খনির ভাঙ্গন ও বিস্ফোরণের প্রভাব ইত্যাদির কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

○ প্রশ্ন-৩. গরম চায়ের পেয়ালার উপরের দিকে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যায় তা কি?

উত্তর : গরম চায়ের পেয়ালার উপরের দিকে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যায় তা আসলে জলীয় বাষ্প। গরম চায়ের পেয়ালার পানি বাষ্পীভূত হবার সময় পেয়ালা থেকে প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করে বাষ্পীভূত হয়। এতে পেয়ালার চা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পানি বাষ্পীভূত হবার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ পেয়ালা থেকে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত পেয়ালার উপরে ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৪. পারমাণবিক বোমার পরীক্ষা প্রাণিজগতের দীর্ঘস্থায়ী কি ক্ষতিসাধন করে?

উত্তর : পারমাণবিক বোমার পরীক্ষায় পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান তেজস্ক্রিয়তার ফলে দূষিত হয়ে পড়ে। তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্রিয়ার ফলে মানবদেহের ক্রোমোজোমের ডিএনএ গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এর প্রভাব বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। বংশগতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রথমত বমি বমি ভাব, বমি, অজীর্ণ, ক্ষুধাহীনতা, শরীর খারাপ বোধ, ঠোঁট ফেটে যাওয়া, চামড়ার নিচে বা মুখ থেকে আপনা আপনি রক্তক্ষরণ, চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে। প্রাণিদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এমনকি কিছু প্রজাতির বিলুপ্তির সম্ভাবনাও থাকে। বৃক্ষাদি এবং অরণ্যসমূহ নির্মূল, বীজের উৎকর্ষতা নষ্ট, ফসলের আগাছা, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যাবে। ফলে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল প্রাণিজগতের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়বে।

○ প্রশ্ন-৫. সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management) বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : শস্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হচ্ছে সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management, IPM)। সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে আপদ দমনের বিভিন্ন কৌশল বা পদ্ধতিকে একটি একক প্রকল্পে একীভূত করে ক্ষতিকর আপদের সমগোষ্ঠীকে এমন একটি স্তরে রাখা হয় যেন এরা ফসলের অর্থনৈতিক ক্ষতি করতে না পারে এবং পরিবেশের উপর দমন পদ্ধতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া ন্যূনতম তথা সবচেয়ে কম হয়। সমন্বিত আপদ দমন পদ্ধতির মূলকথা হলো আপদ দমনের একক কৌশলের উপর নির্ভরশীল না হয়ে বিভিন্ন কৌশল, যেমন- যান্ত্রিক ও ভৌত, জৈবিক, রাসায়নিক এবং চাষাবাদ দমন পদ্ধতিকে একটি একক প্রকল্পের অধীনে এনে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দমনের জন্য সুদূরপ্রসারী ব্যবস্থা গ্রহণ। এর বিবেচ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে—

ক. ক্ষতিকারক আপদের প্রাকৃতিক মৃত্যুর কারণসমূকে উৎসাহিত ও ব্যবহার করা।

খ. পোকার সমগোষ্ঠীকে ক্ষতিকারক স্তরে রাখার জন্য কখন এবং কোথায় কৃত্রিম দমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করে যে ব্যবস্থা পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকারক হবে তা গ্রহণ করা।

○ প্রশ্ন-৬. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া (Photosynthesis) কি? এটা কিভাবে সংঘটিত হয়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ প্রয়োজনীয় আলো থেকে (সূর্যালোক) প্রাপ্ত শক্তি দ্বারা পানি ও CO_2-এর রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে শর্করা জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করে তাকে সালোকসংশ্লেষণ বলে। এই প্রক্রিয়ায় আলোকশক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন উপজাত হিসেবে বের হয়ে আসে।

$$6CO_2 + 12\,H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{আলো}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$$

সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রধান উপকরণগুলো হচ্ছে আলো, ক্লোরোফিল, পানি (H_2O) এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)। এদের মধ্যে উদ্ভিদের মূলাঞ্চল দ্বারা মাটি থেকে শোষিত হয়ে সালোকসংশ্লেষণের স্থান পাতায় পৌঁছায় এবং সেখান থেকে মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছায়। CO_2 বায়ুমণ্ডল থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় পত্ররন্ধ্রের মধ্য দিয়ে পাতার মেসোফিল কলার ক্লোরোপ্লাস্টে পৌঁছে। সালোকসংশ্লেষণ আলোক ও অন্ধকার দুই প্রক্রিয়ায় সংঘটিত হয়। আলোক পর্যায়ে ক্লোরোফিল অণু আলোক রশ্মির ফোটন (Photon) শোষণ করে এবং শোষণকৃত ফোটন থেকে শক্তি সঞ্চয় করে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ATP তৈরি করে। অন্ধকার পর্যায়ে CO_2 বিজারিত হয়ে কার্বহাইড্রেট উৎপন্ন করে।

○ প্রশ্ন-৭. তড়িৎ বর্তনী নিয়ে কাজ করার সময় হাত শুকনো রাখতে বলা হয় কেন?

উত্তর : শুষ্ক অবস্থায় মানুষের দেহের বিদ্যুৎ রোধের পরিমাণ প্রায় ৫০,০০০ ওহম। আর ভিজা অবস্থায় এর পরিমাণ প্রায় ১০,০০০ ওহম। কাজেই ভিজা অবস্থায় রোধের ক্ষমতা কম বলে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে। তাই তড়িৎ বর্তনী নিয়ে কাজ করার সময় হাত শুকনো রাখতে বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৮. গরম পানিতে পাতলা কাচের গ্লাসের চেয়ে মোটা কাচের গ্লাস সহজে ফেটে যায় কেন?

উত্তর : পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে ঐ গ্লাসের ভেতরের অংশ গরম পানির সংস্পর্শে প্রসারিত হয় কিন্তু কাচ তাপের কুপরিবাহী বলে ঐ তাপ বাইরের অংশে সঞ্চালিত হতে পারে না। তাই ভেতরের অংশ প্রসারিত হলেও বাইরের অংশ প্রসারিত হতে পারে না। ফলে প্রসারণ বলের জন্য গ্লাস ফেটে যায়। কিন্তু কাচ পাতলা হলে ভেতরের তাপ দ্রুত বাইরে যেতে পারে এবং কাচের প্রসারণ সব জায়গায় সমান হয়। ফলে গ্লাস ফাটে না।

○ প্রশ্ন-৯. সমুদ্রের পানি পান করা যায় না কেন?

উত্তর : সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় লবণ থাকে বলে এই পানি পান করা যায় না। এক গ্যালন (প্রায় সাড়ে চার লিটার) সমুদ্রের পানিতে লবণ থাকে প্রায় ১০০ গ্রাম। আবার যে সমুদ্র একটু ঘেরা জায়গায় অর্থাৎ মহাসাগর নয় তাতে লবণের পরিমাণ আরও বেশি। নদীর পানি সাগরে মিশবার আগে বয়ে নিয়ে আসে বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থ ও লবণ। সারাদিন সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে যায় কিন্তু লবণ থেকে যায়, আবার নদী লবণ নিয়ে আসে। এভবেই দিন দিন সমুদ্রের পানিতে লবণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সমুদ্রের পানিতে এত লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে তা পানের অযোগ্য।

○ প্রশ্ন-১০. পাতলা পায়খানা হলে স্যালাইন খাওয়ানো হয় কেন?

উত্তর : ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে ডিহাইড্রেশন হয় ও শরীরে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ কমে যায়। তাই শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের অভাব পূরণ করার জন্য স্যালাইন খাওয়ানো হয়। এতে দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা পায় এবং কোষের ভিতর ও বাইরের তরল পদার্থের চাপ ঠিক থাকে। স্যালাইন হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, গ্লুকোজ ও পানি দিয়ে তৈরি। কলেরা বা ডায়রিয়ায় মারা যাওয়ার মূল কারণই হলো এ অবস্থায় রোগী পায়খানা ও বমির ফলে দ্রুত ইলেকট্রোলাইট হারাতে থাকে, যা খাবার স্যালাইন পূরণে সক্ষম।

○ প্রশ্ন-১১. জেনারেটর ও মটরের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : জেনারেটর : Generator একটি বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র, যা যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এর ভিতরে থাকে কয়েল জড়ানো আর্মেচার (Armature) ও বাইরের ফ্রেমে থাকে বৈদ্যুতিক চুম্বক। যখন যন্ত্রের সাহায্যে আর্মেচারের সঙ্গে সংযুক্ত Shaft-কে ঘুরানো হয় তখন আর্মেচারের কয়েলগুলো চুম্বকের ফ্লাক্স (Flux)-কে Cut করে। ফলে Faraday-এর Electromagnetic Induction সূত্র অনুসারে আর্মেচারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় যা Brush-এর সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়।

মটর : মটর হচ্ছে এমন এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করলে একে তা যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং এর মধ্যে স্থাপিত Shaft ঘুরতে থাকে। মোটরের গঠন জেনারেটরের মতোই তবে এতে যখন বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তখন কয়েলসহ আর্মেচার (Armature) যান্ত্রিক শক্তি লাভ করে এবং তা ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত রীতি (Fleming's left hand rule) অনুসারে ঘুরতে থাকে।

○ প্রশ্ন-১২. ECG বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ECG হলো Electrocardiography । হৃদযন্ত্রের স্পন্দনের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎ কম্পনের রেখাচিত্র অংকনের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা। হৃদযন্ত্রের চিকিৎসায় অপরিহার্য যন্ত্ররূপে ECG ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে হৃদযন্ত্রের অবস্থা এবং কাজ-কর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-১৩. পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণ কিভাবে সাহায্য করে?

উত্তর : পরিবেশ সংরক্ষণে বৃক্ষরোপণের ভূমিকা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বৃক্ষরোপণের ফলে পরিবেশ নিম্নলিখিত সাহায্য পায় :

ক. ভূমির ক্ষয় রোধ হয়।

খ. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের সমতা ঠিক থাকে এবং উষ্ণতা বৃদ্ধি রোধ হয়।

গ. বৃক্ষরোপণে প্রস্বেদন বৃদ্ধি পায় ফলে বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে যায় ফলশ্রুতিতে বৃষ্টিপাত বাড়ে।

ঘ. গ্রীন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পায়।

○ প্রশ্ন-১৪. প্রস্বেদন কি? কিভাবে এটা আবহাওয়াকে প্রভাবিত করে?

উত্তর : যে শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বায়বীয় অঙ্গের (প্রধানত পাতার সজীব কলা) মাধ্যমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি বাষ্পাকারে বের হয়ে যায় তাকে প্রস্বেদন বলে। যেসব এলাকায় ব্যাপকহারে এবং বৃহৎ এলাকাজুড়ে পত্রবহুল গাছ জন্মানো হয় সেসব এলাকায় উদ্ভিদের প্রস্বেদনের ফলে উদ্ভিদ থেকে বেরিয়ে আসা জলীয় বাষ্প স্থানীয়ভাবে আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। অনেক সময় বৃষ্টিপাত ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। যেখানে বনাঞ্চল বেশি থাকে প্রস্বেদনের ফলে সেখানকার বাতাস আর্দ্র থাকে। এই আর্দ্র বাতাস একসাথে জমা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে। আবার কোনো এলাকায় যদি গাছপালা না থাকে তাহলে প্রস্বেদনের অভাবে বৃষ্টিপাত কম হয় এবং ব্যাপক এলাকা অনুর্বর হয়ে কালক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা কি?

উত্তর : পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ২৪ ঘণ্টায় একবার (অর্থাৎ ৩৬০ ডিগ্রি) ঘুরে আসে। এক ডিগ্রি দ্রাঘিমার পার্থক্য ৪ মিনিট। শূন্য ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশের পূর্বে সময় এগিয়ে এবং পশ্চিমে সময় পিছিয়ে আছে অর্থাৎ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত আগে পরে হয়। এ হিসাবে ১৮০° পূর্ব এবং পশ্চিম দ্রাঘিমা, যা আসলে একটিই রেখা, তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ২৪ ঘণ্টা। প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায় ১৮০° দ্রাঘিমা বরাবর উত্তর দক্ষিণে একটি তারিখ রেখা কল্পনা করা হয়েছে, যার পূর্বে অবস্থিত স্থানের তারিখ পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের তারিখ থেকে একদিন পিছিয়ে। এই রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে। কোনো স্থলভাগে একই সাথে দুটো তারিখের অসুবিধা যাতে না হয়, তাই এই তারিখ রেখাকে স্থানে স্থানে বাকিয়ে কেবল মাত্র সমুদ্রের (আটলান্টিক মহাসাগর) উপর দিয়ে নেয়া হয়েছে।

○ প্রশ্ন-১৬. গর্জনশীল চল্লিশা কি?

উত্তর : প্রায় ৪০ ডিগ্রি দক্ষিণ থেকে ৬০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি। এই অঞ্চলকেই গর্জনশীল চল্লিশা বলে।

○ প্রশ্ন-১৭. LASER কি?

উত্তর : LASER শব্দটির পূর্ণরূপ হলো Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation। লেসার এক ধরনের সংসক্ত ও সুসঙ্গত অতি উজ্জ্বল ও তীব্র এক বর্ণের আলোকরশ্মি। লেসার হলো আলোর বিবর্ধন। এ বিবর্ধন হবে উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা। আলোকতরঙ্গকে কোনো স্ফটিকের মধ্যে পাঠালে উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে। এই উদ্দীপিত নিঃসরণ অতি শক্তিশালী ও সুসঙ্গত আলোকরশ্মি। এই রশ্মির নাম লেসার রশ্মি। এর উত্তাপ প্রচণ্ড। লেসার রশ্মির সাহায্যে ধাতুকে গলানো যায়, হীরকখণ্ডে ছিদ্র করা যায়। এ রশ্মির সাহায্যে অস্ত্রোপচারও করা যায়।

○ প্রশ্ন-১৮. Computer Virus কি?

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারী কর্তৃক তৈরি এক প্রকার প্রোগ্রাম যেগুলো কম্পিউটার সিস্টেমে জমা করে রাখা সফটওয়্যার এবং উপাত্তকে ধ্বংস করে দেয়। ইন্টারনেটে ডাউনলোডিং ই-মেইল-এর এটাচমেন্ট, পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার, ভাইরাস আক্রান্ত নেটওয়ার্ক সার্ভার ইত্যাদি উৎস থেকে পিসিতে ভাইরাস আসতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৯. 'অপটিক্যাল ফাইবার' (optical fibre) কি? এই ফাইবারের প্রয়োগ উল্লেখ করুন।

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের স্বচ্ছ কাচ নির্মিত তার বিশেষ। বেশ কয়েকটি স্তরে সজ্জিত কাচের ঘনত্ব বাইরের দিক থেকে ভেতরে ক্রমশ ঘন হয়ে থাকে। ফলে প্রতিসরাঙ্ক ভিতর দিকে বাড়তে থাকে। এই অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে যখন কোনো শব্দ পাঠানো হয়, তখন সেই শব্দ প্রথমে বিদ্যুৎ শক্তি এবং পরে আলোক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয় এবং দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এই আলোক সিগন্যাল প্রথমে বিদ্যুৎ এবং পরে শব্দে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু বর্তমানে টেলিফোন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি মাত্র অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে অসংখ্য পৃথক সিগন্যাল অবিকৃত অবস্থায় প্রেরণ করা যায়। ডিজিটাল টেলিফোনে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-২০. 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর একটি প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

উত্তর : 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'-এর প্রয়োগ হচ্ছে ক্লোনিং। ক্লোনিং পদ্ধতিতে হুবহু একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাণীর জন্মদান করা যায়। ১৯৯৭ সালে ফিন ডারসেট ভেড়ির ওলান থেকে সংগৃহীত কোষের নিউক্লিয়াস অন্য জাতের একটি ভেড়ির ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপিত করে হুবহু একই রকম একটি ফিনডারসেট ভেড়ির বাচ্চা জন্মাতে সক্ষম হন। এর নাম রাখা হয় ডলি। এর আগে ভ্রূণ কোষ থেকে প্রাণী জন্ম দেয়া হলেও এই প্রথম একটি পরিণত দেহকোষ থেকে নকল প্রাণী জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

○ প্রশ্ন-২১. ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) এবং ভাইরাস (Virus)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

ব্যাকটেরিয়া	ভাইরাস
ক. কোষীয়।	ক. অকোষীয়।
খ. আদি প্রকৃতির নিউক্লিয়াস আছে।	খ. নিউক্লিয়াস নেই।
গ. ব্যাকটেরিয়ায় DNA ও RNA উভয়ই পাওয়া যায়।	গ. ভাইরাসে কখনও DNA এবং RNA একত্রে থাকে না।
ঘ. সাইটোপ্লাজম আছে।	ঘ. সাইটোপ্লাজম নেই।

১৮তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই (৬ × ৪ = ২৪) এবং অবশিষ্ট ১৩টি (১৩ × ২ = ২৬)

প্রশ্ন-১. সাধারণত বৈদ্যুতিক বাল্ব ও টিউব লাইটের আলোর মধ্যে উৎপত্তিগত পার্থক্য কি?

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বে টাংস্টেনের সরু তার ব্যবহৃত হয়। তড়িৎপ্রবাহ টাংস্টেন তারের মধ্য দিয়ে উচ্চ রোধের মুখে চলার সময় টাংস্টেন তার, যাকে বলে ফিলামেন্ট, তা খুব উত্তপ্ত হয় এবং আলো বিকিরণ করে। টিউব লাইটে কাচের নলের মধ্য দিয়ে নিম্নচাপে বিদ্যুৎ চালনা (discharge) করা হয়। নিম্নচাপে গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে এ বাতিতে আলো পাওয়া যায়। নলের এক প্রান্ত ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড এবং অপর প্রান্ত ধনাত্মক বা অ্যানোড থাকে। ভিতরের বায়ুচাপ কমিয়ে 5 mm পারদ স্তম্ভের সমান করে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। এতে তড়িৎদ্বারের মধ্যকার জায়গা, যা তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত।

প্রশ্ন-২. কোনো বস্তু কিভাবে দেখা যায়? বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন কেন?

উত্তর : আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় চোখ দ্বারা আমরা দেখার কাজ করি। চোখ একটি জটিল প্রক্রিয়া মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করে আমাদের বিভিন্ন বস্তু দেখার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। কোনো বস্তুকে আমরা তখনই দেখতে পাই, যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখের কর্নিয়ার উপর পড়ে তা লেন্সের মধ্য দিয়ে চোখের সবচেয়ে পেছনের অংশ রেটিনাতে পড়ে বস্তুর উল্টে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং সাথে সাথেই বিদ্যুৎ সংকেতের মতো এই প্রতিবিম্ব অপটিক নার্ভের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌছে। মস্তিষ্ক আবার এই প্রতিবিম্ব উলটে দিয়ে বস্তুর সোজা প্রতিবিম্ব তৈরি করে এবং তখনই বস্তুটিকে দেখতে পাই। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে মুহূর্তের মধ্যে। কোনো বস্তুকে আমরা তখনই দেখি যখন ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এসে আমাদের চোখে পড়ে। আবার প্রতিফলিত আলোকরশ্মির বর্ণের উপর বস্তুর বর্ণ নির্ভরশীল। কোনো একটি বস্তু যে বর্ণের রশ্মি প্রতিফলন করে আমরা সেই বস্তুকে সেই প্রতিফলিত বর্ণেই দেখব। সূর্যের আলোকে সাদা দেখালেও তা সাতটি বর্ণেরই মিশ্রণ। এই আলো থেকে কোনো বস্তু যে বর্ণ প্রতিফলন করে থাকে আমরা ঐ বস্তুকে সেই রংয়ে দেখি অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-৩. আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় এটা কি? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : মহাশূন্যে কোটি কোটি নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং বিশাল বাষ্পকুণ্ড নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে দল সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ। গ্যালাক্সি পরস্পর বিরাট দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত। এরূপ একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশের নামই ছায়াপথ। অন্ধকার আকাশে দীপ্তমান পথের মতো দেখা যায় বলে আদিকালের আকাশগঙ্গা, সুরগঙ্গা ইত্যাদিরই আধুনিক নাম 'ছায়াপথ'।

প্রশ্ন-৪. গাছের বয়স কিভাবে বোঝা যায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : উদ্ভিদের দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সেকেন্ডারি বা গৌণ কোষকলার বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ পরিধিতে বা প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি স্পষ্ট বোঝা যায়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই বৃদ্ধির হার বেশি থাকে এবং শীতকালে থাকে কম। ফলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কাষ্ঠিক উপাদান বেশি পরিমাণে তৈরি হয় এবং শীতকালে কম তৈরি হয়। এতে পাশাপাশি দুটি পুরু ও পাতলা বলয় সৃষ্টি হয় প্রতি এক বছর সময়ে। বিভিন্ন বছরে সৃষ্ট এসব বলয় এককেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে পরস্পর সজ্জিত হয়, যা বার্ষিক বলয় নামে পরিচিত। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের প্রস্থচ্ছেদে এসব বর্ষবলয় গণনা করে সাধারণত উদ্ভিদের বয়স বের করা হয়।

প্রশ্ন-৫. পৃথিবীর উপরের Ozone স্তর কিভাবে তৈরি হয়? এই স্তর মানুষের কি উপকারে আসে? ইদানিং Ozone স্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে কেন?

উত্তর : পৃথিবী নামক গ্রহটিকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর। এরই এক ধাপ ওজোনস্তর (Ozone sphere) নামে পরিচিত। ওজোন (O_3) অক্সিজেন (O_2) নামক মৌলিক পদার্থের ভৌতিক ও জৈবিক পরিবর্তনেরই ফল। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোনের এই আবরণই ওজোনস্তর সৃষ্টি করে রেখেছে। সূর্যের আলোতে মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর একটি উপাদান রয়েছে, যা অতিবেগুনী রশ্মি নামে পরিচিত। এই রশ্মিকে শোষণ করে সূর্যের আলোকে মানুষের জন্য নিরাপদ রাখে এই ওজোনস্তর। বায়ুমণ্ডলে ক্রমে অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদির আধিক্যের ফলে ওজোনস্তর ক্ষয়ীভূত এমনকি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন-৬. স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসা একটি ট্রেনের হুইসলের আওয়াজ এবং স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজে পার্থক্য কি এবং কেন?

উত্তর : স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসা ট্রেনের হুইসলের আওয়াজ স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ অপেক্ষা বেশি জোরে শোনা যায়। শব্দের Doppler effect-এর জন্য এ ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। বিজ্ঞানী জোহন ডপলার শব্দের এ বিশেষ ব্যতিক্রমী ধর্ম আবিষ্কার করেন। স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসা ট্রেন ও শ্রোতার মধ্যেকার আপেক্ষিক বেগ কমে এতে শব্দের কম্পাংক বৃদ্ধি পায়, আর স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময় শ্রোতার সাথের শব্দের উৎসের আপেক্ষিক বেগ বৃদ্ধি পায়, ফলে শব্দ কম্পাংক হ্রাস পেতে থাকে অর্থাৎ আওয়াজ কমে যেতে থাকে।

প্রশ্ন-৭. পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে হজমে সাহায্যকারী উপাদান কি কি?

উত্তর : মুখবিবর থেকে পায়ুপথ পর্যন্ত বিস্তৃত অনিয়মিত যে নালি বিদ্যমান তা-ই পরিপাকযন্ত্র। পরিপাকযন্ত্রে বিভিন্ন অংশ/ধাপ থেকে বিভিন্ন খাদ্যোপাদান হজমের জন্য বিভিন্ন হজমকারক এনজাইম বা উপাদান নিঃসরিত হয়ে থাকে। যেমন- মুখবিবরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয় টায়ালিন, পাকস্থলী থেকে নিঃসৃত হয় পেপসিন, রেনিন ও লাইপেজ এবং অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হয় ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ।

প্রশ্ন-৮. কোনো তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে কি কি কণা এবং রশ্মি নির্গত হয়?

উত্তর : সকল তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে তিন ধরনের বিশেষ কণা বা রশ্মি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত হয়ে থাকে। এগুলো হলো α (আলফা) β (বিটা) γ (গামা)।

প্রশ্ন-৯. আলু শিকড় না কাণ্ড?

উত্তর : আলু এক ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড (কাণ্ডের মতো এতে পর্ব ও পর্বমধ্য রয়েছে, যা থেকে অনুকূল পরিবেশে মুকুল বের হয়)।

প্রশ্ন-১০. ঢাকা শহরের বাতাস শহরবাসীর জন্য ক্ষতিকর কেন?

উত্তর : মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার পয়ঃপ্রণালীর নির্গত গ্যাস, অসংখ্য গাড়ির কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানার নির্গত ধোঁয়া, গৃহস্থালীর উপকরণ, ফ্রিজ নির্গত গ্যাস প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনঘটিত বিভিন্ন দূষিত গ্যাস, মাত্রাতিরিক্ত সিসা প্রভৃতি ঢাকার বায়ুতে প্রতিদিনই মিশে যাচ্ছে। তাই ঢাকা শহরের বাতাস শহরবাসীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

প্রশ্ন-১১. একজন নভোচারীর চন্দ্রপৃষ্ঠে ওজন ও পৃথিবী পৃষ্ঠে ওজনের মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : চন্দ্রে মধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের মান পৃথিবীর $^1/_6$ অংশের সমান। ফলে কোনো নভোচারীর চন্দ্রপৃষ্ঠে ওজন হবে পৃথিবী পৃষ্ঠে তার ওজনের চেয়ে কম এবং তা হবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে তার ওজনের $^1/_6$ অংশ।

○ প্রশ্ন-১২. পানিতে চিনি মেশালে তাপমাত্রা কমে যায় কেন?

উত্তর : চিনি কেলাসিত কঠিন কণা। পানিতে চিনি মেশালে তা পানি থেকে প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করে দ্রবীভূত হয়ে যায়। ফলে পানির তাপমাত্রা কমে যায়।

○ প্রশ্ন-১৩. টিস্যু কালচার বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : টিস্যু কালচার (Tissue Culture) জীববিজ্ঞানে একটি আধুনিক এবং অতি পরিচিত শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ কলা আবাদ। অর্থাৎ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর দেহ থেকে কিছু কলা (কোষের সমষ্টি) বিচ্ছিন্ন করে এমন কোনো উপযুক্ত পুষ্টিসমৃদ্ধ পরিবেশে রাখা হয়, যেখানে এই কলাগুলো পূর্ণ জীবিত থাকে এবং প্রয়োজনে এগুলোকে আবাদ করে কোষ বিভাজন ঘটিয়ে বৃদ্ধি করানো যায়।

○ প্রশ্ন-১৪. বাইনারি ও দশমিক গণনা পদ্ধতির মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : বাইনারি ও দশমিক গণনা পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক বা ভিত্তিগত পার্থক্য রয়েছে। বাইনারি পদ্ধতিতে গণনার ক্ষেত্রে Base হিসাবে 2-কে গণ্য করা হয় এবং দশমিক গণনার ক্ষেত্রে এই Base হলো 10।

○ প্রশ্ন-১৫. RADAR কি?

উত্তর : RADAR-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হলো Radio Detection And Ranging। এটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেতারযন্ত্র বিশেষ, যা শব্দ ও প্রতিধ্বনি এবং এর উৎস নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বেতার তরঙ্গের ব্যবহারে কাজ করে বলে অনেক দূরে কোনো বিমান, জাহাজ ও শত্রুর অবস্থান ইত্যাদি শনাক্তকরণে এবং বিশেষ করে জাতীয় প্রতিরক্ষা, যুদ্ধ ইত্যাদিতে ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-১৬. একটি সাইক্লোনের কেন্দ্রের চাপ বাইরের চাপের তুলনায় কম না বেশি?

উত্তর : সাইক্লোনের সৃষ্টি হলে এর কেন্দ্রের উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে উপরের দিকে উঠতে থাকে। কারণ উত্তপ্ত বায়ু পার্শ্ববর্তী বায়ু অপেক্ষা যথেষ্ট হালকা আর ঐ শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রচণ্ড বেগে আশপাশ থেকে বায়ু বইতে থাকে। ফলে বাইরের চাপের চেয়ে সাইক্লোনের কেন্দ্রের চাপ কম থাকে।

○ প্রশ্ন-১৭. ক্রিস্টালাইন ও অ্যামরফস বস্তুর মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : যেসব ক্ষুদ্রাকার সমসত্ত্ব কঠিন পদার্থের সমতল পিঠ সমন্বয়ে সুনির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকার থাকে এবং ঐ জ্যামিতিক আকার এর প্রস্তুতির সময়ে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে তাকে ক্রিস্টালাইন বা স্ফটিক বলে। যেমন- তুঁত ($CuSO_4 . 5H_2O$)।

যেসব কঠিন পদার্থ তাপের প্রভাবে তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় এবং ঐ বাষ্পকে শীতল করলে সরাসরি পুনরায় কঠিন পদার্থ পাওয়া যায়, তাদেরকে অ্যামরফস বলে। যেমন- আয়োডিন গুঁড়া।

○ প্রশ্ন-১৮. পিপীলিকাভূক একটি বস্তুর উদাহরণ দিন এবং কোন দেশে পাওয়া যায়?

উত্তর : পিপিলিকাভুকের উদাহরণ হলো Anteater, যা অস্ট্রেলিয়ায় দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-১৯. শব্দতরঙ্গ ও বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : বস্তুর কম্পনে বাতাসে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা-ই শব্দতরঙ্গ আর বৈদ্যুতিক আবেশে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তাই বিদ্যুৎ চৌম্বক তরঙ্গ। অপেক্ষাকৃত বড় লম্বিক তরঙ্গ যা জড় মাধ্যম ছাড়া প্রবাহিত হতে পারে না তাই শব্দতরঙ্গ। কিন্তু বিদ্যুৎ চৌম্বক আবেশ ক্ষুদ্রতর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট এবং জড় মাধ্যম ছাড়াই চলতে পারে।

○ প্রশ্ন-২০. Optical fibre বলতে কি বুঝেন? এর ব্যবহার কোথায় হয়?

উত্তর : Optical fibre বা আলোকতন্তু হচ্ছে এক ধরনের সরু কাচের তার। এর ভিতর দিয়ে আলোকরূপে তথ্য পাঠানো যায়। টেলিফোন কেবল, টেলিভিশন, ভিডিও ফোন প্রভৃতি যোগাযোগের ক্ষেত্রে আজকাল তামার তারের বদলে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হচ্ছে। অপটিক্যাল ফাইবারকে ইচ্ছেমত বাঁকানো বা মোড়ানো যায়। এটি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং কাচের মতো পরিষ্কার দেখায়।

○ প্রশ্ন-২১. সাধারণ পানি (Soft water) ও কঠিন পানি (Hard water)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো সাধারণ পানি। এতে সহজেই সাবানের ফেনা হয়। আর দুই পরমাণু ডিউটেরিয়াম ও এক পরমাণু অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো কঠিন পানি (D_2O)। সাধারণ পানির ঘনত্বের (১.০০৮) চেয়ে কঠিন পানির ঘনত্ব (১.১০৬) বেশি।

১৭তম বিসিএস

১ থেকে ৬ অবশ্যই (৬ × ৪ = ২৪) এবং অবশিষ্ট ১৩টি (১৩ × ২ = ২৬)

○ প্রশ্ন-১. পাইয়োরিয়া ও ফাইলেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : পাইয়োরিয়া হচ্ছে দন্তরোগ। এ রোগের ফলে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় এবং পুঁজ পড়ে। মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। দাঁত ব্রাস করলে রক্ত ঝরে এবং পরিণামে দাঁত আলগা হয়ে যায়।

অপরপক্ষে নেমাটোড নামীয় সুতার মতো কীটের এক বা একাধিক প্রজাতির আক্রমণে ফাইলেরিয়া রোগ হয়। অনেকে মনে করেন এটা এক বিশেষ ধরনের মশা বা মাছি দ্বারা আক্রান্ত সংক্রমিত রোগ। এই রোগ হলে প্রচণ্ড জ্বর ও শরীরের গিট ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়।

○ প্রশ্ন-২. প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন?

উত্তর : প্রেসার কুকারে তাপের ফলে উৎপন্ন জলীয় বাষ্পের চাপকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখা এবং এর ভিতরের জলীয় বাষ্পের চাপ বাড়তে থাকে। চাপ যত বাড়ে পানির স্ফুটনাংক তত বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাপমাত্রা ১০০°C-এর পরিবর্তে ১৩০°C-এ পৌছায়। তাই প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয়।

○ প্রশ্ন-৩. অধিবর্ষ কেন প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগে। প্রতি ৪ বছর পর ২৪ ঘণ্টা বা একদিন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে গণনা করা হয়। একেই অধিবর্ষ বলা হয়। সঠিক সময় গণনার জন্য অধিবর্ষ প্রয়োজন হয়।

○ প্রশ্ন-৪. প্লেট টেকটোনিক বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিজ্ঞানীদের মতে এ পৃথিবীর সব কয়টি মহাদেশ পূর্বে এক সাথে অবস্থান করত এবং এগুলো একটি প্লেটের উপর অবস্থান করে। পরবর্তীতে মহাবিশ্বের প্রসারণ ও অন্যান্য কারণে এ প্লেট ভেঙ্গে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয় এবং মহাদেশগুলো আলাদা হয়ে যায়। এ দূরত্ব খুব সামান্য হারে বাড়ছে। তবে অনুমান করা হয় আবার এ মহাদেশগুলো ভবিষ্যতে একত্রিত হবে। বিজ্ঞানীদের এ ধারণাই হচ্ছে 'প্লেট টেকটোনিক'।

○ প্রশ্ন-৫. মরিচা কি? মরিচার প্রক্রিয়া কিভাবে রোধ করা যায়?

উত্তর : মরিচা আয়রন ও অক্সিজেনের মিশ্রণ অর্থাৎ আয়রন অক্সাইড। লোহাকে বাতাসে রেখে দিলে এর উপর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সংমিশ্রণে যে আস্তরণ পড়ে তাকে মরিচা বলে।

কিভাবে মরিচা রোধ করা যায় : ক. রং দিয়ে; খ. দস্তার প্রলেপ বা গ্যালভানাইজিং করে; গ. আর্দ্রতার উপস্থিতিতে না আসার ব্যবস্থা করে ইত্যাদি।

০ প্রশ্ন-৬. ভাইরাস কি? ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্বসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : ভাইরাস হচ্ছে সূক্ষ্মদেহী অতি আণুবীক্ষণিক জীব। ভাইরাস এককোষী বা কোষহীন জীব কিনা তা এখনো প্রমাণিত হয়নি। ভাইরাস জীবিত অথবা মৃত উভয় দেহেই বাস করতে পারে। ভাইরাস গাছপালা, জীবজন্তু সবার মধ্যেই রোগ ছড়ায়। বসন্ত, পোলিও, হাম, ট্রাকোমা ইত্যাদি অনেক রোগ ভাইরাস ছড়ায়।

বৈশিষ্ট্য

ক. ভাইরাস জীবিত ও মৃত উভয় দেহেই বাস করতে পারে।

খ. ভাইরাস কেবলমাত্র (উপযুক্ত) পোষক কোষে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

গ. ভাইরাস প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড সমন্বয়ে গঠিত।

ভাইরাসের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

ক. ভাইরাস থেকে হাম, পোলিও, জন্ডিস এবং জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয়।

খ. ভাইরাস জেনেটিক কৌশলের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বাহক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ. ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করার কাজে যেসব ভাইরাস কাজ করে তাদের ব্যাকটেরিও ফায বলে।

০ প্রশ্ন-৭. বস্তুর আপেক্ষিক ভর কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস।

০ প্রশ্ন-৮. সাগরের পানি মিঠা পানি থেকে ভারী কেন?

উত্তর : সমুদ্রের পানির ঘনত্ব মিঠা পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি। কারণ সমুদ্রের পানিতে Ca, Mg সহ বিভিন্ন রকমের লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। তাই সাগরের পানি মিঠা পানি থেকে ভারী।

০ প্রশ্ন-৯. সবচেয়ে হালকা মৌল কি?

উত্তর : হিলিয়াম।

০ প্রশ্ন-১০. পুরু কাচের গ্লাসে গরম চা ঢাললে গ্লাসটি ফেটে যায় কেন?

উত্তর : তাপের প্রভাবে গ্লাসের ভেতরের অংশ প্রসারিত হয় কিন্তু কাচ তাপ কুপরিবাহী বলে গ্লাসের বাইরের অংশ সাথে সাথেই প্রসারিত হতে পারে না। এই কারণেই গ্লাসটি ফেটে যায়।

০ প্রশ্ন-১১. খাবার লবণের রাসায়নিক উপাদানগুলো কি?

উত্তর : খাবার লবণের রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে Na (সোডিয়াম) এবং ক্লোরিন। রাসায়নিক নাম হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড।

০ প্রশ্ন-১২. রক্তের হিমোগ্লোবিনে লৌহ থাকে, উদ্ভিদের ক্লোরোফিলে কোন ধাতুর অণু থাকে?

উত্তর : ক্লোরোপ্লাস্ট ধাতুর অণু থাকে।

০ প্রশ্ন-১৩. মহাবিস্ফোরণ নক্সা কি?

উত্তর : বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জেস লেমিটেয়ার মহাবিস্ফোরণ নক্সার প্রবক্তা। অধিকাংশ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে, এ মহাবিশ্ব হাজার হাজার মিলিয়ন বছর পূর্বে মহাবিস্ফোরণ বা প্রচণ্ড নিনাদের মধ্যে উৎপত্তি হয়েছে। প্রথমে এ মহাবিশ্ব ছিল অত্যধিক ঘন ও উত্তপ্ত। পরে এ মহাবিশ্ব যখন বাইরের দিকে প্রসারিত হয়ে থাকে তখনই ছায়াপথ ও নক্ষত্র সৃষ্টি হয়। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে সমগ্র বিশ্ব প্রসারমান। তবে তা অতি নগণ্য।

০ প্রশ্ন-১৪. সুপার নোভা কি?

উত্তর : বিজ্ঞানীদের মতে, বৃহৎ তারকাগুলো নিজেদের বৃহত্তর মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ভারসাম্য রক্ষার জন্য উত্তপ্ত হয়। ফলে কেন্দ্রের সংযোজন প্রক্রিয়া এত দ্রুত হতে থাকে যে, মাত্র দশ কোটি বছরেই তাদের হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যায়। তখন তাদের বাড়ার সাথে সাথে হিলিয়াম, অক্সিজেন ও কার্বনের মতো আরো ভারী মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটাতে থাকে। এর ফলে তারকার বাইরের অঞ্চল অনেক সময় বিরাট এক বিস্ফোরণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে যায়। এর নাম সুপার নোভা।

০ প্রশ্ন-১৫. সর্বশেষ হিমযুগ কত বছর আগে ঘটেছিল?

উত্তর : ১০,০০০ বছর আগে।

০ প্রশ্ন-১৬. বাংলাদেশের উষ্ণতম এবং শীতলতম স্থানগুলো কি কি?

উত্তর : উষ্ণতম স্থান নাটোরের লালপুর এবং শীতলতম স্থান সিলেটের মৌলভীবাজারের লালখান।

০ প্রশ্ন-১৭. রক্তিম দানব কি? উদাহরণ দিন।

উত্তর : তারকা কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বালানি ফুরিয়ে গেলে কেন্দ্রস্থল মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সংকুচিত হয় এবং এই সংকোচনের ফলে তার উত্তাপ অনেকগুণ বেড়ে যায়। উত্তাপের ফলে বহির্দেশ হয়ে পড়ে অনেক প্রশস্ত। তারকাটি তখন বিশাল লাল আকৃতির দেখায়। তারকার এই অবস্থাকে বলা হয় রেড জায়ান্ট বা রক্তিম দানব। এটি মধ্যমাকৃতির তারার জীবনাবসানের প্রথম ধাপ। আমাদের সূর্যের এ অবস্থা হতে আরও ৫ শত কোটি বছর লাগবে। সুপার নোভা বিস্ফোরণের পর কোনো বড় তারকা আরও সংকুচিত হয়ে রেড জায়েন্টে পরিণত হয়।

০ প্রশ্ন-১৮. শ্বেত বামন কি? উদাহরণ দিন।

উত্তর : শ্বেত বামন বা white dwarf হচ্ছে একটি সুস্থিত শ্বেত তারকা। বিজ্ঞানীদের ধারণা নক্ষত্রগুলো আস্তে আস্তে প্রসারিত এবং তাপ বিকিরণ করে। যখন নক্ষত্র দ্বিগুণ প্রসারিত হয় তখন এর তাপমাত্রা হয় অর্ধেক। তাপ বিকিরণ করতে করতে এক সময় নক্ষত্রের ইলেক্ট্রনগুলো অন্তর্বর্তী অপবর্জন তত্ত্বের বিকর্ষণের দ্বারা শোষিত হয় এবং সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে নক্ষত্রের তাপমাত্রা কমে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এরূপ নক্ষত্রকেই শ্বেত বামন বলে।

০ প্রশ্ন-১৯. কংক্রিট কি? উঁচু দালান নির্মাণে কংক্রিট ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : সিমেন্ট, বালি, পাথরের টুকরা, পানি প্রভৃতির সংমিশ্রণে তৈরি হয় কংক্রিট।
উঁচু দালান নির্মাণে কংক্রিট ব্যবহার করা হয় শক্ত ও মজবুত ভিত তৈরি করার জন্য। কারণ কংক্রিট নির্মিত দালানের স্থায়িত্ব ইট নির্মিত দালানের চেয়ে অনেক বেশি।

০ প্রশ্ন-২০. প্রাণপংক (ক্রোমোজোম) কি? কোষের কোথায় ক্রোমোজোম থাকে?

উত্তর : ক্রোমোজোম হচ্ছে জীবকোষের বংশবৃদ্ধির একক যা জীব বহন করে। ক্রোমোজোমের দ্বারা ছেলে বা মেয়ে হওয়া নির্ধারিত হয়। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে DNA. কোষের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম থাকে।

০ প্রশ্ন-২২. মাইক্রো কম্পিউটারের নিচুস্তর এবং উঁচুস্তরের ভাষাগুলো কি কি?

উত্তর : মাইক্রো কম্পিউটারের নিচুস্তরের ভাষায় একটি মেশিনের জন্য রচিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। উঁচুস্তরের ভাষা লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব। উঁচুস্তরের ভাষাগুলো হচ্ছে বেসিক, প্যাস্কেল, মডুলা, করট্রান, অ্যালগল, কোবল, পিতল/ওয়্যান প্রভৃতি।

○ প্রশ্ন-২৩. বায়োগ্যাস কি? এর প্রস্তুত প্রণালী ও ব্যবহার সম্বন্ধে লিখুন।

উত্তর : গাছপালা, লতাপাতা, গোবর, আবর্জনা ইত্যাদি পদার্থ পচিয়ে ফারমেন্টেশন পদ্ধতিতে যে গ্যাসের সৃষ্টি করে, তাই হলো বায়োগ্যাস। সাধারণত একটি বিশেষ ধরনের গর্তে গরু বা ঘোড়ার গোবর, গাছপালা, আবর্জনা ইত্যাদি পচিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা হয়।

ব্যবহার : ১. রান্নার কাজে বায়োগ্যাস ব্যবহৃত হয়; ২. বাড়িঘর গরম রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়; ৩. বাতি জ্বালাতে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২৪. LASER কি?

উত্তর : LASER হচ্ছে Light Amplification by Stimulated Emission Radiation-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কোনো বিশেষ পরমাণুকে ফ্লাশ লাইটের দ্বারা উত্তেজিত কোয়ান্টাম অবস্থায় আনতে পারলে তা থেকে যে শক্তিশালী আলোকরশ্মি নির্গত হয় তার নাম হচ্ছে লেসার রশ্মি।

○ প্রশ্ন-২৫. ক্যামেলিওয়ন কি এবং তার বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর : ক্যামেলিওয়ন হচ্ছে বহুরূপী সরীসৃপ।

বৈশিষ্ট্য : ১ এদের দেহ শুষ্ক ও বহিঃত্বক আঁইশযুক্ত; ২. প্রতিটি পায়ে পাঁচটি করে নখযুক্ত আঙ্গুল থাকে; ৩. এরা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়; ৪. এদের হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণ চারপ্রকোষ্ঠে বিভক্ত; ৫. এরা বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য এদের আঁইশ ব্যবহার করে।

○ প্রশ্ন-২৬. এরমিন কি এবং কেমন করে তা পাওয়া যায়?

উত্তর : এরমিন এক প্রকার প্রাণী যাদের লোম গ্রীষ্মে বাদামী এবং শীতে সাদা হয়। এ লোম থেকে পোশাক তৈরি করা হয়।

১৫তম বিসিএস

○ প্রশ্ন-১. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী চলে আসে। অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। চন্দ্রগ্রহণ হয় শুধুমাত্র পূর্ণিমার সময়। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ চলে আসে। অর্থাৎ চাঁদের ছায়া সূর্যের উপর পড়ে। সূর্যগ্রহণ অমাবস্যার সময় হয়।

○ প্রশ্ন-২. শর্টওয়েভ (Short wave) ও লংওয়েভ (Long wave) রেডিয়েশন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : যেসব রেডিয়েশনে তরঙ্গের এক চূড়া থেকে অপর চূড়ার দূরত্ব কম, তাদেরকে শর্টওয়েভ রেডিয়েশন বলা হয়। যেমন– সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি, এক্স-রে প্রভৃতি শর্টওয়েভ রেডিয়েশন। শর্টওয়েভ রেডিয়েশনের কম্পাঙ্ক বেশি হয়। যেসব রেডিয়েশনের তরঙ্গের এক চূড়া থেকে পরের চূড়ার দূরত্ব বেশি হয়; তাদেরকে লংওয়েভ রেডিয়েশন বলে। যেমন– সূর্যালোকের অতি লাল রশ্মি এবং কাঠের আগুন বা বৈদ্যুতিক চুল্লি থেকে বিকীর্ণ তাপের অতি লাল রশ্মির রেডিয়েশন। লংওয়েভ রেডিয়েশনের কম্পাঙ্ক কম থাকে।

○ প্রশ্ন-৩. ক্রোমোজোম (Chromosime) ও জিন (Gene)-এর পার্থক্য কি?

উত্তর : ক্রোমোজোম হচ্ছে নিউক্লিক এসিড (DNA, RNA) ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত কোষের একটি জটিল ক্ষুদ্রাঙ্গ, যার মধ্যে জীবের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ক্রোমোজোমকে বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বলা হয়। জিন হচ্ছে DNA অণুর একটি নির্দিষ্ট অংশ, যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী একক। জিন সাধারণত ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে।

○ প্রশ্ন-৪. আলেয়া কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বস্তরে সূর্য থেকে আগত বিদ্যুতায়িত কণার প্রভাবে সৃষ্ট আলোকচ্ছটাকেই বলা হয় আলেয়া।

○ প্রশ্ন-৫. এইচআইভি (HIV) কি? এটি কি রোগ সৃষ্টি করে এবং কিভাবে ছড়ায়?

উত্তর : এইচআইভি (Human Immunodeficiency Virus) হচ্ছে একটি ভাইরাস, যা এইডস রোগ সৃষ্টি করে। সাধারণত এইডস ভাইরাসবাহী ব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে, লালারসের মাধ্যমে, চুম্বন এবং যৌন মিলনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

○ প্রশ্ন-৬. জলবিদ্যুৎ কিভাবে সৃষ্টি করে?

উত্তর : পানি দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলে।

○ প্রশ্ন-৭. হিমশৈল পানিতে ভাসে কেন?

উত্তর : পানি একটি তরল পদার্থ, যা জমে গিয়ে বরফে পরিণত হলে আয়তন বা আকারে বেড়ে যায় কিন্তু এর ওজন বা ঘনত্ব পানির ঘনত্বের নয়-দশমাংশ হয়। হিমশৈল বিশাল আয়তনের বরফ। তাই হিমশৈল পানির চেয়ে হালকা হয়। এ কারণেই হিমশৈলের নয়-দশমাংশ পানিতে ডুবে থাকলেও এর এক-দশমাংশ পানিতে ভেসে থাকে।

○ প্রশ্ন-৮. শীতকালে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন?

উত্তর : শীতকালে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে। এ কারণে ভেজা কাপড়ের পানি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

○ প্রশ্ন-৯. খাবার লবণের সাথে বর্তমানে কি মেশানো হয় এবং কেন?

উত্তর : খাবার লবণের সাথে বর্তমানে আয়োডিন মেশানো হয়। গলগণ্ডসহ আয়োডিনের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগের প্রতিকারের জন্য এটি লবণের সাথে মেশানো হয়।

○ প্রশ্ন-১০. ইলেক্ট্রনিক চক্ষু ও ইলেক্ট্রনিক মস্তিষ্ক বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : ইলেক্ট্রনিক চক্ষু বলতে রাডারকে বুঝায়। জাহাজ, বোমারু বিমান, মিসাইল ইত্যাদির চিত্র রাডারের সাহায্যে দেখা যায়। তাই একে ইলেকট্রনিক চক্ষু বলে।

আর ইলেক্ট্রনিক মস্তিষ্ক বলতে কম্পিউটারকে বুঝায়। এটি মানুষের মস্তিষ্কের মতো চিন্তাভাবনা করে যাবতীয় সমস্যার সমাধান করতে পারে বলে একে ইলেক্ট্রনিক মস্তিষ্ক বলে।

○ প্রশ্ন-১১. পেনিসিলিন কি এবং কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : পেনিসিলিন একটি এন্টিবায়োটিক ঔষধ। এটি সাধারণত Penicillium notatum এবং Penicillium chrygamum নামক ছত্রাক থেকে উৎপাদন করা হয়। স্কটিশ জীবাণুবিদ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৯ সালে এটা আবিষ্কার করেন।

○ প্রশ্ন-১২. ইনসুলিন (Insulin) কি এবং এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : ইনসুলিন হচ্ছে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস্ অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক গ্রন্থির বিটাকোষ থেকে নিঃসৃত হরমোন।

কাজ : ১. ইনসুলিন দেহের বিভিন্ন কোষে গ্লুকোজের অনুপ্রবেশ ঘটায়; ২. গ্লুকোজের জারণ বৃদ্ধি করে; ৩. গ্লাইকোজেনকে সংশ্লেষিত করে।

○ প্রশ্ন-১৩. নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলো কি কি? কিছু ব্যবহার উল্লেখ করুন?
উত্তর : হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন। বৈদ্যুতিক বাতিতে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-১৪. বায়োটেকনোলজী বা জৈব প্রকৌশল কি?
উত্তর : কোনো জীবের কোষে বা কোষ সমষ্টির প্রয়োগগত দিক থেকে ব্যবহার উপযোগী কার্যকারিতা সম্পন্ন সকল জীবশক্তির সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগের দ্বারা জীবের সার্বিক উন্নয়নকে জীব প্রকৌশল বলা হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. অগ্নিনির্বাপক সিলিন্ডারে কি থাকে?
উত্তর : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)।

○ প্রশ্ন-১৬. সিএফসি (CFC) কি এবং কি ক্ষতি করে?
উত্তর : সিএফসি বা ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন হচ্ছে একটি গ্রীন হাউজ গ্যাস। এটা ওজোনস্তরকে ধ্বংস করে এবং গ্রীন হাউজ প্রভাব সৃষ্টিতে সহায়ক।

○ প্রশ্ন-১৭. মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো কি কি?
উত্তর : মানুষের রক্তের গ্রুপগুলো হলো : A, B, AB এবং O.

○ প্রশ্ন-১৮. সাধারণ লোহার সাথে ইস্পাতের পার্থক্য কি?
উত্তর : সাধারণ লোহা হচ্ছে এক প্রকার কাস্ট আয়রন, যাতে কার্বন বা অন্য কোনো ধাতব মৌল থাকে না। আর ইস্পাত হচ্ছে এমন কাস্ট আয়রন যাতে সামান্য ০.৫%-১.৫% কার্বন এবং সামান্য পরিমাণ ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ধাতু থাকে।

○ প্রশ্ন-১৯. চিমনী হতে নির্গত ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকায় কেন?
উত্তর : নির্গত গ্যাস বায়ু থেকে হালকা। তাই নির্গত গ্যাস উপরে উঠার চেষ্টা করে। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের বাধার জন্য এ গ্যাস কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘূর্ণিস্রোতের মতো উপরে উঠে।

○ প্রশ্ন-২০. আবহাওয়া ও জলবায়ু বলতে কি বোঝেন?
উত্তর : আবহাওয়া হচ্ছে কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের দৈনন্দিন অবস্থা। আর জলবায়ু হচ্ছে আবহাওয়ার কয়েক বছরের গড় ফল।

○ প্রশ্ন-২১. বিদ্যুতের চমকানি কতক্ষণ স্থায়ী হয়?
উত্তর : ৬ সেকেন্ড।

○ প্রশ্ন-২২. বেকিং পাউডার কি?
উত্তর : $NaHCO_3$-এর সঙ্গে K.H ট্রারট্রেট-এর মিশ্রণ।

○ প্রশ্ন-২৩. সেসিমোলজি (Sesimology) ও পেডোলজি (Pedology) বলতে কি বোঝেন?
উত্তর : সেসিমোলজি হচ্ছে ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল বিষয়ক গবেষণাবিদ্যা। পেডোলজি হচ্ছে মৃত্তিকা বিজ্ঞান, যা মাটির গঠন, ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে।

○ প্রশ্ন-২৪. ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা বেশি ঘটে কেন?
উত্তর : ভেজা হাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশি হয় বলে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা বেশি ঘটে।

○ প্রশ্ন-২৫. রঙিন টেলিভিশনে মৌলিক কি কি রং ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : লাল, সবুজ এবং নীল।

১৩তম বিসিএস

○ প্রশ্ন-১. বাংলাদেশের উপর দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে। এটি কি? এর ভৌগোলিক গুরুত্ব কি?
উত্তর : বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে সেটি কর্কটক্রান্তি রেখা। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই কাল্পনিক রেখার জন্যই বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।

○ প্রশ্ন-২. প্লাইউড কি? এটি কিভাবে তৈরি হয়?
উত্তর : প্লাইউড আধুনিক কৌশলনির্ভর এক ধরনের কাঠবিশেষ। নিম্নমানের তিন বা তার চেয়ে বেশিসংখ্যক পাতলা কাঠের টুকরা গ্লু (Glue) বা আঠা দ্বারা পরস্পর জোড়া লাগিয়ে প্লাইউড তৈরি করা হয়ে থাকে। এই প্লাইউড স্বাভাবিক কাঠ অপেক্ষা অধিক টেকসই।

○ প্রশ্ন-৩. জীব বিবর্তনে মানুষ যে প্রজাতি তার নাম কি? এ নামের অর্থ কি?
উত্তর : মানুষ প্রজাতির বৈজ্ঞানিক নাম হোমোসেপিয়েন্স। এ নামের মাধ্যমে মানুষকে একটি বিশেষ এবং সবপ্রজাতি থেকে আলাদা প্রজাতি হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

○ প্রশ্ন-৪. 'ডিজিটাল' এবং 'এনালগ' এ দুটি শব্দ দিয়ে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়?
উত্তর : 'ডিজিটাল' এবং 'এনালগ' শব্দ দুটি দ্বারা কম্পিউটারের দুধরনের কাজের ধারা বুঝিয়ে থাকে। এনালগ কম্পিউটারের ডাটাগুলোকে বৈদ্যুতিক ভোল্টে পরিণত করে এবং ডিজিটাল কম্পিউটার সংখ্যাকে বৈদ্যুতিক রিদম বা ছন্দে পরিবর্তিত করে থাকে।

○ প্রশ্ন-৫. মাছ যে অক্সিজেন নেয় সেটি কোথায়, কি করে থাকে? মাছ কোন অঙ্গের সাহায্যে এটি শরীরে গ্রহণ করে থাকে?
উত্তর : মাছ পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। এরা ফুলকার (Gill) সাহায্যে এই অক্সিজেন গ্রহণ করে।

○ প্রশ্ন-৬. ডায়রিয়া হলে যে লবণ গুড়ের শরবত খাওয়ানো হয়, তাতে লবণ ও গুড়ের (অথবা চিনির) ভূমিকা কি?
উত্তর : লবণ গুড়ের শরবতে বিদ্যমান লবণ রক্তে প্রয়োজনীয় পানির পরিমাণ ধরে রাখে। অপরদিকে গুড় বা চিনি রক্তে শর্করার সরবরাহ নিশ্চিত করে, যা পরবর্তীতে দহনের ফলে শক্তিতে পরিণত হয়ে মানবদেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।

○ প্রশ্ন-৭. মাইক্রোওয়েভ কি? আমাদের দেশে এর কি ব্যবহার আছে?
উত্তর : ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ওয়েভেরই অংশবিশেষ হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ। আমাদের দেশে রেডিও, টেলিভিশন ও টেলিফোনের সংবাদ দূরে পাঠানোর জন্য মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৮. মাটির রং লালচে হলে তাতে অপেক্ষাকৃত কি বেশি আছে বলে মনে করতে হবে? কেন?
উত্তর : মাটির রং লালচে হলে তাতে লৌহের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক বলে ধরে নিতে হবে। কারণ মাটিতে বিদ্যমান লৌহ আয়রন অক্সাইড হিসেবে অবস্থান করে এবং এর রং লাল হয়।

○ প্রশ্ন-৯. কম্পিউটারের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার বলতে কি বুঝায়?
উত্তর : কম্পিউটারের সফটওয়্যার বলতে এর দ্বারা কৃত বা অনুসৃত বিভিন্ন টেকনিক বা কর্মপদ্ধতি বুঝায়। অন্যদিকে হার্ডওয়্যার বলতে কম্পিউটারের যন্ত্রপাতিকে বুঝিয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১০. উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক ব্যবহৃত হলে এ পানি লোনা হবার প্রবণতা বাড়ে কেন?

উত্তর : উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক হারে ব্যবহৃত হলে সেখানকার পানির লেবেল (Water level) নিচে নেমে যায়। ফলে পার্শ্ববর্তী বিশাল জলাধার তথা সমুদ্র থেকে লোনা পানি এসে পানির লেবেল বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। তাই গভীর নলকূপে ভূগর্ভস্থ পানি অধিক উত্তোলন করলে তা স্বাভাবিক কারণেই লোনা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১১. খাদ্যে অতিরিক্তি কোলেস্টরেল থাকলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে। এটি কিভাবে হয়?

উত্তর : খাদ্যের অতিরিক্ত কোলেস্টরেল (যা এক ধরনের চর্বিবিশেষ) মানবদেহে বিশেষত রক্তবাহী নালীতে জমা হয়ে এর (রক্তবাহী নালীর) ব্যাস কমিয়ে দেয় বলে ঐ নালীর মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য হৃৎপিণ্ডের অধিক কাজ বা পরিশ্রম করতে হয়। এ কারণে হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

প্রশ্ন-১২. ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত রোগ নিবারণে সবুজ শাকসবজি কিছু তেল দিয়ে রান্না করে খাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়। এখানে তেলের ভূমিকাটা কি?

উত্তর : সবুজ শাকসবজিতে বিদ্যমান ভিটামিন 'এ' তেলে দ্রবীভূত। কাজেই সবুজ শাকসবজিকে তেল সহযোগে রান্না করলে তা সহজেই মানুষের শরীরে গ্রহণ উপযোগী হয়। এজন্যই তেল সহযোগে সবুজ শাকসবজি রান্না করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে।

প্রশ্ন-১৩. সাবান ও ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ক. উচ্চতর জৈব এসিডের সোডিয়াম/পটাশিয়াম লবণই সাবান। আর ডিটারজেন্ট হলো হাইড্রোকার্বনের সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।

খ. খর পানিতে সাবান কাজ করতে পারে না। কিন্তু ডিটারজেন্ট খর পানিতে সহজেই কাজ করতে পারে।

গ. সাবান দিয়ে কাপড় কাঁচতে গেলে সময় বেশি লাগে এবং এটা শ্রমসাধ্য। অথচ ডিটারজেন্ট দিয়ে স্বল্প সময়ে এবং অনায়াসে কাপড় কাঁচা যায়।

প্রশ্ন-১৪. বায়োগ্যাস বলতে কি বোঝায়? এর মধ্যে প্রধান গ্যাস কি থাকে?

উত্তর : গবাদি পশুর মলমূত্র, গাছপালার পাতা ও পানি কিছুদিন ধরে কোনো আবদ্ধ স্থানে রেখে ব্যাকটেরিয়া নামক অণুজীবের গাজনের ফলে যে গ্যাসের সৃষ্টি হয় তাকেই বায়োগ্যাস বলে। বায়োগ্যাসের প্রধান গ্যাস মিথেন (রাসায়নিক সংকেত CH_4)।

প্রশ্ন-১৫. পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিনের গঠনের পার্থক্য কি?

উত্তর : পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বুরেটর আছে, যার সাহায্যে বায়ু ও জ্বালানি (পেট্রোল) মিশ্রিত করে পরে স্পার্ক প্লাগের সাহায্যে ইগনিশনের (প্রজ্বলনের) মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করা হয়। পক্ষান্তরে ডিজেল ইঞ্জিনের কার্বুরেটর অনুপস্থিত। এখানে উচ্চচাপে ডিজেলকে কমবাশন (Combustion) চেম্বারে প্রেরণ করা হয় এবং বায়ুর সাথে না মিশিয়ে প্রজ্বলন করা হয়।

প্রশ্ন-১৬. টেলিফোন তারের বদলে অপটিক্যাল ফাইবারের প্রচলন আজকাল বাড়ছে। অপটিক্যাল ফাইবার জিনিসটি কি?

উত্তর : খুবই স্বচ্ছ কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি তারকে অন্য একটি স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা ঢেকে রেখে অপটিক্যাল ফাইবার নির্মাণ করা হয়। বাইরের স্বচ্ছ পদার্থ যা তারের কভার হিসেবে কাজ করে। এর Refractive Index ভিতরের কাচ বা প্লাস্টিক অপেক্ষা কম।

প্রশ্ন-১৭. পিতল একটি সংকর ধাতু। কি কি ধাতুর সমন্বয়ে এটি তৈরি করতে হয়?

উত্তর : তামা এবং দস্তার মিশ্রণে পিতল ধাতু হয়। পিতলে তামা ও দস্তার অনুপাত হচ্ছে ৩ : ২। অর্থাৎ ৬০% তামা এবং ৪০% দস্তার সংমিশ্রণে পিতল তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন-১৮. 'জিন ব্যাংক' বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : জিন ব্যাংক এক ধরনের ব্যাংক বিশেষ। এতে বংশগতির ধারা বহনকারী জিন (gene) পরিবেশে সংরক্ষণ করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রজনন কাজে ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১৯. ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য মূলত কি?

উত্তর : ক্যান্সার কোষের সঙ্গে সাধারণ সুস্থ কোষের পার্থক্য হচ্ছে ক্যান্সার কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক এবং অনিয়ন্ত্রিত। পক্ষান্তরে স্বাভাবিক কোষের বিভাজন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক এবং নিয়ন্ত্রিত।

প্রশ্ন-২০. পোনা উৎপাদন কেন্দ্রে ইনজেকশন দিয়ে রুই-কাতলা মাছকে বদ্ধ পানিতে প্রজননে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই ইনজেকশনের মধ্যে কি থাকে এবং তা কোথা থেকে আসে?

উত্তর : পোনা উৎপাদন কেন্দ্রে রুই-কাতলা মাছকে প্রজননে উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে ইনজেকশন দেয়া হয় সেই ইনজেকশনে হরমোন থাকে। এই হরমোন পুরুষ মাছের মাথার আইপিজি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

প্রশ্ন-২১. ইউরিয়া, টিএসপি এবং পটাশ সার এদের কোনটি থেকে উদ্ভিদ কি জরুরি জিনিস পায়?

উত্তর : উদ্ভিদ ইউরিয়া, টিএসপি এবং পটাশ সার থেকে যথাক্রমে নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাসিয়াম পেয়ে থাকে।

প্রশ্ন-২২. 'ম্যানগ্রোভ বন' বলতে কি ধরনের গাছের বনকে বোঝানো হয়ে থাকে?

উত্তর : লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে তাকে ম্যানগ্রোভ বন বলে। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন।

প্রশ্ন-২৩. আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে যে আধা পরিবাহী (সেমিকন্ডাক্টর) বস্তুটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় তা কি? এর প্রধান উৎস কি?

উত্তর : আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে যে আধা পরিবাহী বস্তু ব্যবহৃত হয় তা হচ্ছে সিলিকন। এর প্রধান উৎস বালু।

প্রশ্ন-২৪. লেবুর রস ও সিরকা দুটি মৃদু এসিড, যেগুলো আমরা বাড়িতে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করি। এই দুয়ের কোনটি কোন এসিড?

উত্তর : লেবুর রসে সাইট্রিক এসিড এবং সিরকায় এসিটিক এসিড বিদ্যমান।

১১তম বিসিএস

প্রশ্ন-১. ভূ-স্থির উপগ্রহ কি এবং কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : ভূ-স্থির উপগ্রহ মনুষ্য নির্মিত কৃত্রিম উপগ্রহ। এটি ভূ-অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়। অন্যান্য উপগ্রহের মতো এটি সচল নয়। তাই একে ভূ-স্থির উপগ্রহ বলে।

কাজ : ভূ-স্থির উপগ্রহ পৃথিবীর কম্পন, চাপ ও তাপ সম্পর্কীয় তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়ে থাকে এবং এ সমস্ত তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভূ-স্থির উপগ্রহ ভূমিকম্পন ও আগ্নেগিরির অগ্নুৎপাতের পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে। এছাড়াও এ উপগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরস্পরের খুব কাছাকাছি এসেছে।

প্রশ্ন-২. কংক্রিটের ভিতরে কেন লোহার রড দেওয়া হয়?

উত্তর : কংক্রিটের মধ্যস্থিত লোহা গাঁথুনির দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে। তাই দালানকোঠা নির্মাণের সময় স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য কংক্রিটে লোহার রড দেয়া হয়।

প্রশ্ন-৩. ঘূর্ণিঝড় কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : ঘূর্ণিঝড়ের প্রধান ফ্যাক্টর বা নিয়ামক হলো তাপমাত্রার ভিন্নতা। ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্বল্প পরিসর স্থানে বায়ুচাপ হঠাৎ করে এমন হয় যে, মধ্যস্থলে নিম্নচাপ এবং তার চারদিকে পরিধির দিকে চাপ ক্রমশ বেশি থাকে। চাপের স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী এই দুই চাপের সমতা আনার জন্য চারদিকের শীতল উচ্চচাপবিশিষ্ট অঞ্চল থেকে শীতল ও ভারী বায়ু প্রবল বেগে পাক খেতে খেতে নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে। অতঃপর এই বায়ু উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠতে বা যে কোনো দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এভাবেই ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-৪. রক্তচাপের পরিমাপ দুটির তাৎপর্য কি? উচ্চ রক্তচাপ কি ক্ষতি করে?

উত্তর : মানবদেহের হৃৎপিণ্ড একটি পাম্প মেশিন বিশেষ। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত শরীরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে বলে সিস্টোলিক প্রেসার এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী প্রসারিত হলে হৃৎপিণ্ড রক্তপূর্ণ হয় এবং ধমনী গাত্রে কোনো চাপ থাকে না। এ ঘটনাকে বলে ডায়াস্টোলিক প্রেসার।

প্রশ্ন-৫. বন উজারের ফলে কি কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : বন উজারের ফলে নিম্নোক্ত ক্ষতিসমূহ হয়ে থাকে :

(ক) পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। (খ) অকাল বৃষ্টিপাত বা অধিক বৃষ্টিপাত তথা অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। (গ) মৃত্তিকাক্ষয় বৃদ্ধি পায়। (ঘ) ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। (ঙ) বন্য জীবজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পায়।

প্রশ্ন-৬. লেসার (LASER) কি?

উত্তর : Light Amplification by Stimulated Emission Radiation-কে সংক্ষেপে LASER বলে। পদার্থের পরমাণু উত্তেজিত করে কোয়ান্টাম অবস্থায় আনতে পারলেই LASER রশ্মির উদ্ভব ঘটে। লেসার রশ্মি ডাক্তারের সিজারের মতো কাজ করে থাকে। ফলে এর সাহায্যে মানুষের চোখ, দাঁত ইত্যাদি অঙ্গে সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এছাড়া পারমাণবিক বিকিরণেও এ রশ্মি সহায়তা করে থাকে।

প্রশ্ন-৭. একটি কার্বুরেটরের কাজ কি?

উত্তর : কার্বুরেটরের কাজ হচ্ছে জ্বালানি প্রজ্জ্বলিত হবার পূর্বে জ্বালানিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করে বায়ুর সাথে মিশ্রিত করা, যাতে তা সহজেই কমবাশন (Combustion) চেম্বারে পুড়ে শক্তি প্রদান করতে পারে।

প্রশ্ন-৮. রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত গ্যাস পরিবেশের কি ক্ষতি করে?

উত্তর : রেফ্রিজারেটরে ব্যবহৃত গ্যাস গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে থাকে। ফলে বায়ুমণ্ডল খুব অল্প সময়েই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। এছাড়াও এই গ্যাস বায়ুমণ্ডলে অবস্থিত ওজোনস্তরের ক্ষয় সাধন করে বলে ultra violet ray বা অতিবেগুনী রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে। ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হওয়াসহ ত্বকের ক্যান্সারের মতো মারাত্মক ব্যাধি দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৯. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধা কি কি?

উত্তর : জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা :

ক. পরিবেশ দূষণের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

খ. গ্যাসে জ্বালানি খরচ কম হয়।

গ. গৃহিণীর কাছে অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার অপেক্ষা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

প্রশ্ন-১০. কি ত্রুটির জন্য বহুমূত্র রোগ হয়?

উত্তর : অগ্ন্যাশয়ে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স থেকে নিঃসৃত ইনসুলিন নামক হরমোন গ্লুকোজের পরিমাণ কাম্য মাত্রায় ধরে রাখে। কোনো কারণে এই অতীব প্রয়োজনীয় ইনসুলিন পরিমিত মাত্রায় নিঃসৃত না হলে বা একেবারেই নিঃসৃত না হলে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ক্রমাগত হারে বাড়তে থাকে। ফলে ঘন ঘন প্রস্রাব, সীমাহীন দুর্বলতা, অধিক এবং ঘন ঘন খাবার ইচ্ছা নিয়ে যে রোগটির জন্ম হয় সেটিই বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস।

প্রশ্ন-১১. শিশুদের কখন কোন টিকা দেয়া দরকার?

উত্তর : ক. বি. সি. জি. (যক্ষ্মারোগ) : জন্মের পর থেকে পনের বছরের মধ্যে সুবিধাজনক সময়ে।

খ. হাম : শিশুর বয়স ৯ মাস পূর্ণ হলে।

গ. পোলিও : শিশুর বয়স ৬, ১০, ১৪ সপ্তাহ এই তিন সময় তিনটি ডোজ।

প্রশ্ন-১২. বাতজ্বরের লক্ষণ কি?

উত্তর : ক. ঘন ঘন জ্বর হওয়া।

খ. পায়ের হাঁটু সংলগ্ন জয়েন্ট ফুলে যাওয়া এবং প্রদাহের সৃষ্টি হওয়া।

গ. হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ ইত্যাদি।

১০ম বিসিএস

প্রশ্ন-১. কেমোথেরাপি (Chemotherapy) কি এবং কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : ক্যান্সারবিনাশী ওষুধ দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাকে কেমোথেরাপি বলে। ক্যান্সার যখন শরীরের অনেকটা অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং সফল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয় না তখন এ ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

প্রশ্ন-২. নবায়নযোগ্য শক্তি বলতে কি বুঝায় এবং এর কয়েকটি উদাহরণ দিন।

উত্তর : যে শক্তি শেষ হয়ে গেলেও আবার তাকে নবশক্তিতে পরিণত করা যায়, তাকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলে। যেমন : ব্যাটারি, পারমুটিট।

প্রশ্ন-৩. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কি এবং কেন ঘটে?

উত্তর : সমুদ্রবক্ষে ভীষণ নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্রের পানির উত্থান পতন ঘটে, একেই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বলে। সূর্যের প্রবল তাপে সমুদ্রবক্ষের কোথাও কোথাও বায়ুশূন্যতার সৃষ্টি হলে নিম্নচাপজনিত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৪. AIDS কি এবং এতে কি ঘটে?

উত্তর : AIDS ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Acquired Immune Deficiency Syndrome. এইডস আক্রান্ত রোগীর দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় এবং রোগী আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়।

প্রশ্ন-৫. চাঁদে বস্তুর ওজন পৃথিবী থেকে বেশি না কম এবং কেন?

উত্তর : চাঁদে বস্তুর ওজন পৃথিবী অপেক্ষা কম। কারণ চাঁদের মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবী অপেক্ষা কম।

প্রশ্ন-৬. ক্লোরোফিল কি? এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : ক্লোরোফিল হচ্ছে এক প্রকার সবুজ রঞ্জক পদার্থ, যা গাছের সবুজ রঙের জন্য দায়ী। এরা সূর্যের আলোর সাহায্যে গাছের জন্য খাদ্য তৈরি করে।

○ প্রশ্ন-৭. ওজোন স্তর কি এবং এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মাইল ওপরে বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তরকে ওজোন স্তর বলে। এই স্তর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে নেয় এবং পৃথিবীর শব্দকে প্রতিফলিত করে।

○ প্রশ্ন-৮. আয়নস্তর কি এবং এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : বায়ুস্তরের ওজোন স্তরের ওপরে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে আয়নস্তর বলে। এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের চার্জযুক্ত কণা থাকে। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। ফলে সংবাদ আদান-প্রদান এই স্তরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৯. সৌরশক্তি কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উত্তর : শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। সূর্য ফিউশন প্রক্রিয়ায় সব সময় সৌরশক্তি উৎপন্ন করছে।

○ প্রশ্ন-১০. এসিড বৃষ্টি কি এবং কেন ঘটে?

উত্তর : পৃথিবীর শিল্পকারখানা থেকে প্রতিনিয়ত দূষিত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এই দূষিত গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন পার অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এসিডে পরিণত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে। এই এসিড মিশ্রিত বৃষ্টিপাতকে এসিড বৃষ্টি বলে।

○ প্রশ্ন-১১. অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারে পুকুরের পানির কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারের ফলে পুকুরের পানির সাথে সাবানের স্টীয়ারেট মিশে পানি দূষিত করে। এই পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

○ প্রশ্ন-১২. সুষম খাদ্য বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : যে খাদ্যে মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের ৬টি উপাদানই বর্তমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে।

○ প্রশ্ন-১৩. কোলেস্টেরোল কি? রক্তে এর মাত্রা বেশি হলে কি হয়?

উত্তর : রক্তের মধ্যে চর্বি জাতীয় উপাদানকে কোলেস্টেরোল বলে। রক্তে এর মাত্রা বেশি হলে রক্ত চলাচল বিঘ্ন হয় এবং দেহে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-১৪. কৃত্রিম বস্তু দ্বারা তৈরি ব্যাগ পরিবেশে কি দূষণ ঘটায়?

উত্তর : কৃত্রিম বস্তু দ্বারা তৈরি ব্যাগ মাটিতে পচে না এবং পানিতে গলে না। ফলে ব্যবহারের পর ফেলে দিলে চাষাবাদ ও পানি নিষ্কাশনে বিঘ্ন ঘটায়। তাছাড়া এই জাতীয় ব্যাগের বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরও বটে।

○ প্রশ্ন-১৫. আকাশের রং নীল কেন?

উত্তর : আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট হলে তার বিক্ষেপণ বেশি হয়ে থাকে। সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন গ্যাস অণু এবং সূক্ষ্ম ধূলিকণাতে আপতিত হলে নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ার কারণে এর বিক্ষেপণ বেশি হয়। ফলে আকাশে নীল আলোর প্রাচুর্য ঘটে এবং আকাশ নীল দেখায়।

○ প্রশ্ন-১৬. ফ্যাক্স (Fax) কি?

উত্তর : ফ্যাক্স হচ্ছে এক প্রকার যন্ত্র যার দ্বারা টেলিফোন লাইনের সাহায্যে দূরে সংবাদ, ছবি বা যে কোনো লিখিত তথ্য প্রেরণ করা যায়।

○ প্রশ্ন-১৭. সিসমোস্কোপ (Scismoscope) কি?

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের মাত্রা, অবস্থান এবং ফলাফল বিষয়ে গবেষণা করা হয় তাকে সিসমোস্কোপ বলে।

○ প্রশ্ন-১৮. গ্রহ জ্বল জ্বল করে ও নক্ষত্র মিট মিট করে জ্বলে কেন?

উত্তর : গ্রহের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো এর ওপর প্রতিফলিত হয় বলে এটি জ্বল জ্বল করে। আর নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে এবং অনেক দূর থেকে দেখা যায় বলে মিট মিট করে।

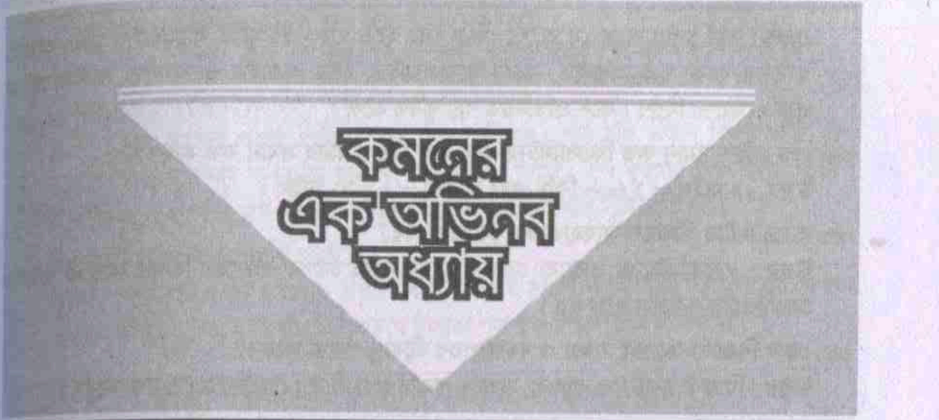

PSC গৃহীত নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্ন ও সমাধান ২০১৩-২০১৪

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনস্ট্রাক্টর (টেকনিক্যাল) ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান $২ \times ৫ = ১০$)

০১. মাইক্রোপ্রসেসর কী?

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI– Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ। কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউকে VLSI প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়।

০২. গ্রিনহাউস ইফেক্ট কী? প্রাকৃতিক কী উপায়ে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস যেমন– কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলে।

গাছপালা লাগিয়ে প্রাকৃতিকভাবে গ্রিনহাউস ইফেক্টকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

০৩. ভিটামিন-সি এর অপর নাম কী? কিসের অভাবে গাছের পাতা হলদে বর্ণ ধারণ করে?

উত্তর : ভিটামিন 'সি'-এর অপর নাম অ্যাসকরবিক এসিড। নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের পাতা হলদে বর্ণ ধারণ করে।

০৪. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে কী ক্ষতি হয়?

উত্তর : রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে হাইপোগ্লাইসোমিয়া রোগ হয়। এ রোগের লক্ষণগুলো হলো– বমিবমিভাব, ক্ষুধা অনুভব করা, অতিরিক্ত ঘামানো, হৃদকম্পন বেড়ে বা কমে যাওয়া।

০৫. মোটরযান কীভাবে বায়ু দূষিত করে?

উত্তর : মোটরযানের ইঞ্জিন পেট্রোল, ডিজেল বা অকটেন ও বায়ুর মিশ্রণকে প্রজ্বলিত করে বিপুল পরিমাণ তাপশক্তি এবং চাপের সৃষ্টি করে, যা ব্যবহার করে মোটরযান চালিত হয়। কিন্তু এই

প্রজ্বলন কার্য চলার সময় যে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে তা মূলত বায়ুমণ্ডলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, লেড অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি যৌগের মিশ্রণ। ফলে প্রতিনিয়ত বায়ু দূষিত হচ্ছে।

০৬. এক মাইল সমান কত কিলোমিটার এবং এক কিলোমিটার সমান কত মাইল?

উত্তর : ১ মাইল = ১.৬০৯ কিমি এবং ১ কিমি = ০.৬২১ মাইল।

০৭. ব্যারোমিটার কীভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়?

উত্তর : ব্যারোমিটারের সাহায্যে কোনো স্থানের বায়ুর চাপের পরিবর্তন হিসাব করে ঐ স্থানের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়।

০৮. কোন বিজ্ঞানী কলেরা, যক্ষ্মা ও গবাদিপশুর জীবাণু শনাক্ত করেন?

উত্তর : বিজ্ঞানী রবার্ট কচ কলেরা, যক্ষ্মা ও গবাদিপশুর জীবাণু (অ্যানথ্রাক্স) শনাক্ত করেন।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. আবিষ্কারকের নাম লিখুন :

ক. বসন্ত টিকা; খ. পেনিসিলিন।

উত্তর : ক. বসন্ত টিকা : আবিষ্কারক হলেন এডওয়ার্ড জেনার (যুক্তরাজ্য)।

খ. পেনিসিলিন : আবিষ্কারক হলেন আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (যুক্তরাজ্য)।

০২. গতি সম্পর্কিত নিউটনের সূত্র কয়টি? তৃতীয় গতি সূত্রটি কি?

উত্তর : ১৬৮৭ সালে স্যার আইজ্যাক নিউটন তার অমর গ্রন্থ 'ফিলোসোফিয়া ন্যাচারালিস প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা'-তে বস্তুর ভর, গতি ও বলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এ তিনটি সূত্র নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র নামে পরিচিত।

নিউটনের গতিবিষয়ক তৃতীয় সূত্রটি হলো– 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে'।

০৩. বরফের কত অংশ পানিতে ডুবে? পচা ডিম পানিতে ভাসে কেন?

উত্তর : পানি বরফে পরিণত হলে এর আয়তন বেড়ে যায়। বরফের $\frac{১১}{১২}$ অংশ পানিতে ডুবে যায়। পচা ডিমে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাসের দরুন এর গড় ঘনত্ব সাধারণ পানির ঘনত্ব অপেক্ষা কম হয় আর এ কারণেই পচা ডিম পানিতে ভাসে।

০৪. রঙিন টেলিভিশন হতে ক্ষতিকর কোন রশ্মি বের হয়? কোন বিজ্ঞানী এক্স-রে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : রঙিন টেলিভিশন হতে ক্ষতিকর গামা রশ্মি বের হয়। এক্সরে হলো ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তাড়িত চৌম্বক বিকিরণ। বিজ্ঞানী উলহ্হেলম রন্টজেন ১৮৯৫ সালে এক্সরে আবিষ্কার করেন।

০৫. ক্লোরোফিল ফলের রং-কে কীরূপ পরিবর্তন করে? আম গাছের মুকুল ঝরে যায় কেন?

উত্তর : ক্লোরোফিল পিগমেন্ট সবুজ প্লাস্টিড তথা ক্লোরোপ্লাস্টে থাকে। সাধারণত ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল 'a', ক্লোরোফিল 'b', জ্যান্থোফিল ও ক্যারোটিন পিগমেন্টসমূহ থাকে। Ch 'a' হলদে-সবুজ, Ch 'b' নীলাভ-সবুজ, জ্যান্থোফিল হলুদ এবং ক্যারোটিন কমলা রং সম্পন্ন। এ কারণে ফলের বিভিন্ন রং পরিলক্ষিত হয়।

আমের মুকুল ঝরে পড়ার কারণ : ফুল ফোটার সময় মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকলে পুষ্পমঞ্জরিতে পাউডারি মিলডিউ ও আনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এতে আমের মুকুল ঝরে পড়ে।

০৬. কফিতে কোন উপাদান থাকায় পান করলে ঘুম কম হয়?

উত্তর : কফিতে ক্যাফেইন নামক এক প্রকার উপাদান থাকে। তাই অতিরিক্ত কফি পান করলে ঘুম কম হয়।

০৭. পরিবেশের কোন দূষণের ফলে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে?

উত্তর : শব্দ দূষণের প্রভাব প্রাণীর উপর বেশ ক্ষতিকর। শব্দ যদি একটা নির্দিষ্ট মাত্রা (৮০ ডেসিবল) ছাড়িয়ে যায় তখন তা দূষণের পর্যায়ে চলে আসে। শব্দ দূষণের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, নিদ্রাহীনতা, শ্রবণশক্তি হ্রাস এবং চরম অবস্থায় মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি হতে পারে।

০৮. সিগারেটে কি বিষাক্ত পদার্থ থাকে?

উত্তর : সিগারেটে ৫৭টি মারাত্মক রাসায়নিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়, যা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। তবে সিগারেটে সবচেয়ে বিষাক্ত পদার্থ হিসেবে থাকে নিকোটিন।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সায়েন্টিফিক অফিসার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. রাতকানা ও গলগণ্ড রোগের কারণ কি?

উত্তর : রাতকানা : ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। রাতকানা রোগের লক্ষণগুলো হলো– স্বল্প আলোতে ভালো দেখা যায় না, চোখে সবকিছু ঝাপসা দেখা যায়, রোগটা বেড়ে গেলে কর্ণিয়া ঘোলাটে হয়ে যায়।

গলগণ্ড : গলগণ্ড হলো আয়োডিনের অভাবজনিত থাইরয়েড গ্রন্থির একটি রোগ। গলগণ্ড দুই ধরনের হতে পারে। যথা : সরল গলগণ্ড ও টক্সিক গলগণ্ড।

০২. ফেসবুক কি? এর আবিষ্কারক কে?

উত্তর : ইন্টারনেটে সামাজিক সম্পর্কের শক্তিশালী এক নেটওয়ার্ক হচ্ছে ফেসবুক। এর মাধ্যমে দূরে থাকা বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজনদের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়। তাছাড়া পুরনো বন্ধুদের সাথে নতুন করে পরিচয় ও বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখতে, নতুন বন্ধু খুঁজে পেতে, বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ইত্যাদি কাজে ফেসবুকের জুড়ি নেই।

ফেসবুকের আবিষ্কারক হলেন মার্ক জুকারবার্গ। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডরমিটরিতে ফেসবুকের যাত্রা শুরু করেন।

০৩. বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক?

উত্তর : বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী হলেন ইউরি গ্যাগারিন। তিনি রাশিয়ার নাগরিক।

০৪. বর্ষাকালে ভিজা কাপড় শুকাতে দেরি হয় কেন?

উত্তর : বর্ষাকালে বাতাসে জলীয়বাষ্প বেশি থাকে। তাই আর্দ্র বায়ু অধিক জলীয় বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না। ফলে ভিজা কাপড় শুকাতে দেরি হয়।

০৫. IPS ও UPS কি?

উত্তর : IPS : IPS-এর পূর্ণরূপ হলো– Instant Power Supply। এটি এক ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই মেশিন। IPS-এর ভিতরে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি থাকে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে IPS কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে তার ব্যাটারি হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

UPS : UPS-এর পূর্ণরূপ হলো– Uninterrupted Power Supply। এটি এক ধরনের বিশেষ ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাকালীন ভোল্টেজ সঞ্চিত করে রাখে এবং কোনো কারণে প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটলে কিছু সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ সরবরাহ করে।

০৬. একটি বাতির গায়ে 220V-30W লেখা আছে। এর অর্থ কি?
উত্তর : বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাল্ব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V এবং W লেখা থাকে। কোনো বাল্বের গায়ে 220V-30W লেখা থাকলে বোঝা যায় যে, 220V বিভব পার্থক্যে বাতিটি সংযুক্ত করলে বাতিটি সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে এবং প্রতি সেকেন্ডে 30 Joule হারে বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. কোন গ্রহকে সবুজ গ্রহ বলা হয়? কোন নক্ষত্রপুঞ্জকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায়?
উত্তর : সবুজ গ্রহ বলা হয় ইউরেনাসকে। সপ্তর্ষিমণ্ডলকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায়।

০২. WWW কি? Computer virus বলতে কি বুঝায়?
উত্তর : WWW : World Wide Web সংক্ষেপে www নামে পরিচিত। www হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পরের সংযোগযোগ্য Web page। এই Web page পরিদর্শন করাকে Web Browsing বলে।
কম্পিউটার ভাইরাস (Computer Virus) : কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের প্রোগ্রাম যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাহ (Self Executed), সংক্রমণ (Self Extracted) ও নিজস্ব সংখ্যাবৃদ্ধি (Self Replicated) করে। এই প্রোগ্রাম কিছু নির্দেশ বহন করে যা কম্পিউটারের CPU কর্তৃক গ্রহণ করে কম্পিউটারকে অস্বাভাবিক, অগ্রহণযোগ্য এবং অস্বস্তিদায়ক কাজ করতে বাধ্য করে।

০৩. সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দুটি মাধ্যম কি কি?
উত্তর : সাশ্রয়ী মূল্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দুটি মাধ্যম হলো :
১. বায়ুগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করে।
২. সৌরকোষের সাহায্যে সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে অর্থাৎ সোলার প্যানেল স্থাপন করে।

০৪. রাতকানা রোগ হয় কোন ভিটামিনের অভাবে? প্রয়োজনীয় Insulin-এর অভাবে কোন রোগ হয়?
উত্তর : ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। প্রয়োজনীয় Insulin-এর অভাবে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ হয়।

০৫. কত তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি? Lactometer কি?
উত্তর : 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। Lactometer হলো- দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণায়ক যন্ত্র।

০৬. WHO-এর মতে শব্দ দূষণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা কত? মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নির্গমন ধরিত্রীতে কি ধরনের কুফল বয়ে আনছে?
উত্তর : WHO-এর তথ্য মতে, শব্দ দূষণের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৬০ ডেসিবল। সূর্যালোকের তাপ ও ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবী থেকে বিকিরিত হওয়ার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড তা শোষণ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, অব্যাহত তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে মেরু প্রদেশের জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়লে আগামী ৪০০ বছরে এন্টার্কটিকা মহাদেশের সব বরফ গলে পৃথিবীর বিরাট অংশ পানিতে ডুবে যাবে।

০৭. রেডিয়াম আবিষ্কার করেন কে? কত তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়?
উত্তর : ১৮৯৮ সালে পোল্যান্ডের বিজ্ঞানী মাদামকুরি রেডিয়াম আবিষ্কার করেন। প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আবহাওয়া অধিদপ্তরের সহকারী আবহাওয়াবিদ ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম কি? এটি কবে উৎক্ষিপ্ত হয়?
উত্তর : মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম স্পুটনিক-১। ৪ অক্টোবর ১৯৫৭ রাশিয়া এটি উৎক্ষেপণ করে।

০২. কোন আলোকরশ্মি ত্বকে 'ভিটামিন ডি' তৈরিতে সাহায্য করে?
উত্তর : অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকে 'ভিটামিন ডি' তৈরিতে সাহায্য করে।

০৩. ইবোলা ভাইরাস কি? এটি কিভাবে সংক্রমিত হয়?
উত্তর : ইবোলা হলো একটি আরএনএ ভাইরাস। ১৯৭৬ সালে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (তৎকালীন জায়ারে) ও সুদানে প্রথম ইবোলা শনাক্ত করা হয়। ধারণা করা হয় বাদুরের দেহ অভ্যন্তরে এ রোগের ভাইরাস বংশবিস্তার করে। পরবর্তীতে মানুষ বা অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন- গরিলা, আফ্রিকান শিম্পাঞ্জি, সজারু ও মৃগ-এর মাধ্যমে তা ছড়িয়ে পড়ে।

০৪. WWW এবং RAM এর পূর্ণরূপ লিখুন।
উত্তর : WWW— World Wide Web.
RAM— Random Access Memory.

০৫. তাপীয় ক্ষমতা কাকে বলে? শিলা (Rock) কি?
উত্তর : তাপ ধারণ ক্ষমতা : কোনো বস্তুর তাপমাত্রা 1k বাড়াতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, তাকে ঐ বস্তুর তাপধারণ ক্ষমতা বা তাপধারকত্ব বলা হয়। এর একক হলো J/K
শিলা : শিলা (Rock) হলো এক বা একাধিক খনিজ পদার্থের মিশ্রণ।

০৬. লেবু ও তেঁতুলে কোন এসিড পাওয়া যায়?
উত্তর : লেবুতে সাইট্রিক এসিড পাওয়া যায় এবং তেঁতুলে টারটারিক এসিড পাওয়া যায়।

০৭. ন্যানো (NANO) টেকনোলজি বলতে কি বুঝায়?
উত্তর : ন্যানো প্রযুক্তি (ন্যানো টেকনোলজি বা সংক্ষেপে ন্যানোটেক) পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা। সাধারণত ন্যানো প্রযুক্তি এমন সব কাঠামো নিয়ে কাজ করে যা অন্তত একটি মাত্রায় ১০০ ন্যানোমিটার থেকে ছোট।
ন্যানো প্রযুক্তি বহুমাত্রিক, এর সীমানা প্রচলিত সেমিকন্ডাক্টর পদার্থবিদ্যা থেকে অত্যাধুনিক আণবিক স্বয়ং সংশ্লেষণ প্রযুক্তি পর্যন্ত। ন্যানো প্রযুক্তির জনক হলেন- রিচার্ড ফাইনম্যান। ন্যানো প্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, শক্তি উৎপাদনসহ বহুক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে।

জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ক্যামেরাম্যান ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. OMR কি? কম্পিউটারের কোন মেমোরি কখনও স্মৃতিভ্রংশ হয় না? ২
উত্তর : OMR-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Optical Mark Reader. OMR আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে কোনো বিষয়কে মার্ক করে শুধু তার চিহ্নগুলো পাঠ করে কম্পিউটারকে জানায়।
কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতিকে বলা হয় Read Only Memory বা ROM। এ মেমোরি কখনো স্মৃতিভ্রংশ হয় না। এতে সংরক্ষিত তথ্যের কোনো সংশোধন, পরিবর্ধন বা পরিবর্তন করা যায় না।

০২. E-commerce বলতে কি বুঝায়? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : ই-কর্মাস-এর পূর্ণরূপ Electronic Commerce। এটা হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক অন লাইনের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন ও পণ্যের আদান-প্রদান করা হয়। E-commerce সাধারণত ৩ প্রকার। যথা– ১. বিজনেস টু কনজিউমার (B2C) ই-কমার্স; ২. বিজনেস টু বিজনেস (B2B) ই-কমার্স; ৩. কনজিউমার টু কনজিউমার (C2C) ই-কমার্স।

০৩. 'ফেসবুক' কি? তিনটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিনের নাম লিখুন।

উত্তর : ফেসবুক হলো সামাজিক যোগাযোগের একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। এটি ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মার্ক জুকারবার্গ।

তিনটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন হলো– Google, Yahoo, Bing।

০৪. 'ব্লগিং' বলতে কি বুঝায়? 'ব্লগার' কাকে বলা হয়?

উত্তর : ব্লগ হচ্ছে এক ধরনের অনলাইন জার্নাল বা ওয়েবসাইট। অনলাইন দিনপত্রী 'ওয়েবলগ' শব্দটি জোম বার্গার ১৭ ডিসেম্বর ১৯৯৭ প্রথম ব্যবহার করেন। শব্দটির ছোট সংস্করণ 'ব্লগ' চালু করেন পিটার মেরহোলজ। এরপর ইভাস উইলিয়ামস 'ব্লগ' শব্দটা বিশেষ্য এবং ক্রিয়া দুটো হিসেবেই ব্যবহার করা শুরু করেন এবং ব্লগার শব্দটি জনপ্রিয় করে তোলেন। এ কারণে তাকে ব্লগিং-এর জনক বলা হয়।

যিনি ব্লগে পোস্ট করেন তাকে ব্লগার বলা হয়। ব্লগাররা প্রতিনিয়ত তাদের ওয়েবসাইটে কনটেন্ট যুক্ত করেন আর ব্যবহারকারীরা সেখানে তাদের মন্তব্য করতে পারেন।

০৫. 'ভিওআইপি' (VoIP)-এর পূর্ণরূপ কি? সংক্ষেপে এর ব্যবহার পদ্ধতি লিখুন।

উত্তর : VoIP : VoIP-এর পূর্ণরূপ হলো : Voice over Internet Protocol। VoIP হচ্ছে ডেটা নেটওয়ার্ক, যেমন— ইন্টারনেটের মাধ্যমে টেলিফোন কল আদান-প্রদান করার বিশেষ পদ্ধতি।

ব্যবহার পদ্ধতি : প্রচলিত টেলিফোনের মাধ্যমে আমরা যেমন কথা বলতে পারি তেমনি এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে কম্পিউটার দিয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে কথা বলা যায়। এতে খরচ অনেক কম পড়ে। এছাড়া ফ্যাক্স, পিএবিএক্স সিস্টেম ও ডোর ইন্টারকমে VoIP প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

০৬. 'ক্যালসিয়াম কার্বনেট' কেন পানিতে দ্রবীভূত হয় না? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ক্ষার ধাতু ব্যতীত অন্যান্য ধাতুসমূহের কার্বনেট লবণ পানিতে অদ্রবণীয়। ক্যালসিয়াম ক্ষার ধাতু নয়, এটি একটি মৃৎক্ষার ধাতু। সুতরাং ক্যালসিয়ামের কার্বনেট লবণ বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট পানিতে অদ্রবণীয় অর্থাৎ পানিতে দ্রবীভূত হয় না।

০৭. সমুদ্রের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম কি? 'ট্রান্সফর্মার' কি? এর কাজ লিখুন।

উত্তর : সমুদ্রের দ্রাঘিমাংশ নির্ণয়ের যন্ত্রের নাম ক্রোনোমিটার।

ট্রান্সফর্মার : যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে অথবা উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে রূপান্তর করা যায়, তাকে ট্রান্সফর্মার বলা হয়।

ট্রান্সফর্মার-এর কাজ : ক. অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে। খ. অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে।

০৮. কোলেস্টেরল কি? সংক্ষেপে এর বর্ণনা দিন।

উত্তর : কোলেস্টেরল এক ধরনের চর্বিজাতীয় পদার্থ। যা কোষের ঝিল্লি বা সেল মেমব্রেনে পাওয়া যায় এবং সব প্রাণীর রক্তে পরিবাহিত হয়।

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের সেল মেমব্রেনের এটি একটি অত্যাবশ্যক উপাদান। এ উপাদান মেমব্রেনের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থের ভেদ্যতা সচল রাখে এবং তার তারল্য বজায় রাখে। এছাড়াও কোলেস্টেরল একটি জরুরি প্রিকার্সার মলিকিউল, স্টেরয়েড হরমোন এবং স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রব্যে ভিটামিনের জৈব সংশ্লেষণ ঘটায়।

যেসব খাদ্যে কোলেস্টেরল রয়েছে তা হলো ডিমের কুসুম, কলিজা, মগজ, গরুর মাংস, খাসির মাংস, মুরগির মাংস এবং চিংড়ি মাছ। শরীরে অতিরিক্ত কোলেস্টেরলের জন্য করোনারি হার্ট ডিজিজ হতে পারে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী তথ্য অফিসার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১. গুগল কী? এটি কোন কাজে লাগে?

উত্তর : গুগল হলো একটি জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে Web Page-এর বিশাল ভান্ডার সংরক্ষিত আছে। এ Web Page-সমূহে রয়েছে বিভিন্ন তথ্য এবং ডেটা। কোনো ব্যবহারকারীর পক্ষেই জানা সম্ভব নয় যে, কোন বিষয়ের তথ্য পৃথিবীর কোথায় কোথায় জমা আছে। Google হলো এমন একটি সার্চ ইঞ্জিন যা ব্যবহারকারীর পক্ষ থেকে তার প্রয়োজনীয় বিষয়টি খুঁজে বের করে দেয়।

০২. আই প্যাড-এর উদ্ভাবক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি?

উত্তর : আই প্যাড হচ্ছে একটি ট্যাবলেট কম্পিউটার। এর উদ্ভাবক ও বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান হলো অ্যাপল। অ্যাপল এই আইপ্যাড বাজারে ছাড়ে ২০১০ সালের এপ্রিলে।

০৩. ওয়াই ফাই কী?

উত্তর : এটি একটি জনপ্রিয় ওয়্যারলেস প্রযুক্তি। যার সাহায্যে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে উচ্চ গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবহারসহ কম্পিউটারের লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে সংযুক্ত হয়ে ডেটা আদান প্রদান করা যায়।

০৪. অর্গানিক ফুড বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : অর্গানিক ফুড বলতে বোঝায় অর্গানিক বা জৈব উপায়ে উৎপাদিত খাদ্য। অর্গানিক চাষাবাদ পদ্ধতিতেই কেবল বীজ বপন থেকে ফসল উৎপাদন ও ঘরে তোলা পর্যন্ত সব ধরনের ডেটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অর্গানিক খাদ্য চাষাবাদের প্রথম এবং প্রধান শর্তই হচ্ছে সব ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

০৫. স্কেলার রাশি কী?

উত্তর : যে সকল ভৌত রাশিকে শুধু মান দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায়, দিক নির্দেশের প্রয়োজন হয় না তাদেরকে স্কেলার রাশি বলে।

দৈর্ঘ্য, ভর, দ্রুতি, কাজ, শক্তি, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি স্কেলার রাশির উদাহরণ।

০৬. তেজস্ক্রিয়তা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কোনো মৌল থেকে তেজস্ক্রিয় কণা বা রশ্মি নির্গমণের ঘটনাকে তেজস্ক্রিয়তা বলে। তেজস্ক্রিয় মৌল আলফা, বিটা ও গামা নামে তিন ধরনের শক্তিশালী রশ্মি নির্গমন করে। ফলে এরা ভেঙে অন্যান্য লঘুতর মৌলে রূপান্তরিত হয়। যেমন— রেডিয়াম ধাতু তেজস্ক্রিয় ভাঙনের ফলে ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে সীসায় পরিণত হয়।

তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপের জন্য যে একক ব্যবহার করা হয় তার নাম বেকরেল।

০৭. এইডস এবং এইচআইভি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : এইডস : এইডস হলো মারাত্মক ঘাতকব্যাধি। মানুষের মরণব্যাধি AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)-এর কারণ হলো HIV। ১৯৮১ সালে সর্বপ্রথম AIDS রোগী শনাক্ত করা হয়। মানবদেহে এইচআইভি সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। AIDS কোনো জন্মগত রোগ নয়। AIDS আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যান্য রোগে (যেমন– নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ডায়রিয়া ইত্যাদি) আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসাতেই এ রোগ ভালো হয় না, ফলে রোগীর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

এইচআইভি : HIV (Human Immunodeficiency Virus) হচ্ছে এক ধরনের রেট্রো ভাইরাস, যা নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। সাধারণ এইডস ভাইরাসবাহী ব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে, লালারসের মাধ্যমে, চুম্বন এবং যৌন মিলনের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়।

০৮. বায়ুমণ্ডলে কি কি গ্রিন হাউজ গ্যাস বিদ্যমান থাকে?

উত্তর : যেসব গ্যাস ভূপৃষ্ঠের তাপের একটি বড় অংশ আটকিয়ে রাখে এবং বায়ুমণ্ডলের তাপ বৃদ্ধি করে সেসব গ্যাসকে গ্রিন হাউস গ্যাস বলে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও আরো কিছু গ্যাস গ্রিন হাউস প্রভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ৪৯%, মিথেন (CH_4) ১৮%, নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ৬%, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC) ১৪% ও অন্যান্য গ্যাস ১৩% ক্ষতি করে।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মোটরযান পরিদর্শক ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন)

০১. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি এবং এর শরীরে কয়টি হাড় আছে?

উত্তর : মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম *Homo Sapiens* এবং মানুষের শরীরে মোট ২০৬টি হাড় আছে।

০২. উড়োজাহাজ, ডিনামাইট এবং বেতার যন্ত্র আবিষ্কারকদের নাম লিখুন।

উত্তর : নিচে আবিষ্কার ও আবিষ্কারকদের নাম দেয়া হলো :

আবিষ্কার	আবিষ্কারক
উড়োজাহাজ	অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট (১৯০৩, যুক্তরাষ্ট্র)
ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল (১৮৬২, সুইডেন)
বেতার যন্ত্র	জি. মার্কনি (১৮৬১, যুক্তরাষ্ট্র)

০৩. জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে কোনটি?

উত্তর : জীবের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বহন করে ক্রোমোসোম। আর ক্রোমোসোম গঠিত হয় অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম জিন বা বংশানু নিয়ে (জিনের রাসায়নিক উপাদান হলো DNA)। জিনের মাধ্যমে বাবা-মা থেকে জীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন– দেহের আকার, আয়তন, রং, লিঙ্গ ইত্যাদি সন্তান-সন্ততিতে পরিবাহিত হয়।

০৪. রাশিয়া কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বোমার নাম কি?

উত্তর : রাশিয়া কর্তৃক উদ্ভাবিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী বোমার নাম FOAB (Father of All Bombs) যা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উদ্ভাবিত MOAB (Mother of All Bombs) বোমাটির চেয়ে চারগুণ বেশি শক্তিশালী।

০৫. পানি বরফে পরিণত হলে এর আয়তন কি হবে?

উত্তর : পানি যখন বরফে পরিণত হয় তখন এর আয়তন বেড়ে যায়। দেখা গেছে, ১১ একক আয়তনের পানি ০° সে. তাপমাত্রায় ১২ একক আয়তনের বরফে পরিণত হয়। কিন্তু ভর একই থাকে।

০৬. কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়ে কোন সূত্রটির সাহায্য নিতে হয়?

উত্তর : কোনো বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে সমআয়তনের কোনো প্রমাণ বস্তুর তুলনায় সেটি কত ভারী তা বুঝানো হয়। 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি বলে পানিকে প্রমাণ বস্তু হিসেবে ধরা হয়।

$$S = \frac{\text{বস্তুর ওজন}}{4^\circ C \text{ তাপমাত্রার সমআয়তন পানির ওজন}}$$

০৭. ডায়াবেটিক রোগ সম্পর্কে যে তথ্যটি সত্য নয় সেটি কি?

উত্তর : ডায়াবেটিক রোগ সম্পর্কে যে তথ্যটি সত্য নয় তা হলো– চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার বেশি খেলে ডায়াবেটিক রোগ হয়।

সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিসার ২০১৪

০১. ক. কোন গ্যাস নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্যে করে?

উত্তর : অক্সিজেন গ্যাস নিজে জ্বলে না কিন্তু অন্যকে জ্বলতে সাহায্য করে।

খ. ফেসবুক বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ফেসবুক হলো ইন্টারনেটে সামাজিক সম্পর্কের শক্তিশালী এক নেটওয়ার্ক। এর মাধ্যমে দূরে থাকা বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন কিংবা আপনজনদের সাথে সহজে যোগাযোগ করা যায়। তাছাড়া পুরনো বন্ধুদের সাথে নতুন করে পরিচয় ও বন্ধুত্বের বন্ধন অটুট রাখা, নতুন বন্ধু খুঁজে পাওয়া, বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকা, সামাজিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার এক জনপ্রিয় মাধ্যম।

গ. কোন ধরনের মশা ডেঙ্গু রোগের বাহক?

উত্তর : এডিস ইজিপটাই (Aedes aegypti) মশা ডেঙ্গু রোগের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এরা সাধারণত দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়।

ঘ. কোন কোন তারিখে পৃথিবীতে দিন-রাত্রি সমান হয়?

উত্তর : ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর পৃথিবীতে দিন-রাত্রি সমান হয়।

ঙ. রঙ্গিন টেলিভিশন থেকে যে ক্ষতিকর রশ্মি বের হয় তার নাম কি?

উত্তর : রঙিন টেলিভিশন থেকে ক্ষতিকর গামা রশ্মি বের হয়।

চ. কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের কোন অংশ দিয়ে অতিক্রম করেছে?

উত্তর : কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

ছ. কোন আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?

উত্তর : লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি।

জ. বায়ুর প্রধান উপাদান কি?

উত্তর : বায়ুর প্রধান উপাদান হলো নাইট্রোজেন। বায়ুতে ৭৮.০২% নাইট্রোজেন থাকে।

ঝ. যে বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল তার নাম কি?

উত্তর : বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

ঞ. নিপাহ্ (NIPAH) কোন ধরনের রোগ?

উত্তর : নিপাহ্ ভাইরাসজনিত রোগ। এ রোগের বাহক হলো বাদুর।

ট. গ্রিন হাউস ইফেক্টে বাংলাদেশের সবচেয়ে গুরুতর ক্ষতি কি হবে?

উত্তর : গ্রিন হাউস ইফেক্টের ফলে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যাবে।

ঠ. বিশ্বের কোন দেশে সর্বাধিক নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাক্টর রয়েছে?

উত্তর : যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক নিউক্লিয়ার পাওয়ার রিঅ্যাকটর রয়েছে।

ড. কোনো ই-মেইল 'CC'-এর অর্থ কি?

উত্তর : কোনো ই মেইলে 'CC'-এর অর্থ হলো Carbon Copy.

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী প্রোগ্রামার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. কিডনির অবস্থা বোঝার জন্য রক্তের কি পরীক্ষা করা হয়?

উত্তর : কিডনির অবস্থা বোঝার জন্য অর্থাৎ কিডনি ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা বোঝার জন্য রক্তের ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও রক্তে ইউরিয়ার উপস্থিতির হার থেকেও কিডনির অবস্থা বোঝা যায়। কারণ কিডনির কার্যকারিতা যত কমবে রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ তত বাড়বে।

০২. সিস্টোলিক চাপ বলতে হৃৎপিণ্ডের কোন চাপকে বুঝায়?

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠের সংকোচন অবস্থায় চাপকে বলা হয় সিস্টোলিক চাপ। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে সিস্টোলিক চাপ (100 – 150) mm পারদ চাপ বা 120 mm পারদ চাপ।

০৩. গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : গ্রিন হাউস হলো কাচের তৈরি একটি ঘর, যার ভেতর গাছপালা লাগানো হয়। গ্রিন হাউসের ভেতরে প্রবিষ্ট তাপ কাচ ভেদ করে বাইরে বের হতে পারে না। একইভাবে CO_2 বায়ুমণ্ডলের একটি স্তরে গিয়ে আটকে থেকে প্রয়োজনীয় তাপ আটকিয়ে রেখে পৃথিবীকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে রাখে। কিন্তু CO_2 এর পরিমাণ ০.০৩% এর চেয়ে বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত তাপ আটকিয়ে রাখার ফলে পৃথিবীতে অতিরিক্ত তাপের কারণে যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে তাই গ্রিন হাউস ইফেক্ট। গ্রিন হাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হলো— CO, CO_2, CFC, CH_4, SO_2, N_2O প্রভৃতি।

০৪. রাউটার কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : রাউটার একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং ডিভাইস, যা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ডেটা প্যাকেট তার গন্তব্যে কোন পথে যাবে, তা নির্ধারণ করে। এই প্রক্রিয়াকে রাউটিং বলে।

এক নেটওয়ার্ককে অন্য নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করা এবং ডেটা প্যাকেট নেটওয়ার্ক থেকে অন্য নেটওয়ার্কে রাউট করার কাজে ব্যবহৃত ডিভাইসকে বলা হয় রাউটার। রাউটার সম্প্রচার অঞ্চল (broadcast domain) কে এমনভাবে ভেঙ্গে ফেলে যাতে একটি নেটওয়ার্ক অংশের অধীনে থাকা সকল ডিভাইস ঐ নেটওয়ার্ক অংশের জন্য প্রেরিত সম্প্রচার পড়তে এবং প্রক্রিয়াজাত করতে পারে।

০৫. শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ কত?

উত্তর : শব্দ এক প্রকার শক্তি। বস্তুর কম্পনের ফলে সৃষ্ট এই শক্তি অবিচ্ছিন্ন ও স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের ভেতর দিয়ে তরঙ্গাকারে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের কানে পৌঁছে এবং শ্রবণের অনুভূতি সৃষ্টি করে। মাধ্যম ছাড়া শব্দ চলাচল করতে পারে না তাই শূন্য মাধ্যমে শব্দের বেগ শূন্য।

০৬. কাচ তৈরির প্রধান কাঁচামাল কি?

উত্তর : কাচ হলো বিভিন্ন ধরনের ধাতব সিলিকেটের সংমিশ্রণ। এর প্রধান কাঁচামাল হলো SiO_2 বা বালু। কাচে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য যেমন— রঙ, তাপধারণ ক্ষমতা, কাঠিন্য ইত্যাদি প্রদানের লক্ষ্যে এতে বিভিন্ন ধাতব পদার্থ (Ni, Co, Cr) যোগ করা হয়। তবে কাচ প্রধানত Na ও Ca-এর সিলিকেট।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহকারী বীজ-তুলা সংগ্রহ এবং জিনিং কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. CNG ও LPG এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : CNG : Compressed Natural Gas.

LPG : Liquefied Petroleum Gas or, Liquid Pretroleum Gas.

০২. কোন গ্যাস মানবদেহের জন্য একইসাথে উপকারী এবং অপকারী? জোয়ারের কত সময় পর ভাটার সৃষ্টি হয়?

উত্তর : অক্সিজেনের একটি রূপভেদ হলো ওজোন (O_3) যা মানবদেহের জন্য একইসাথে উপকারী ও অপকারী। বায়ুমণ্ডলের স্ট্রাটোমণ্ডলে অবস্থিত ওজোনস্তরের অক্সিজেন আমাদের জন্য ক্ষতিকর সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি (Uv) রশ্মি প্রতিনিয়ত শোষণ করে ওজোন (O_3) গঠন করে।

প্রত্যেক স্থানে জোয়ারের ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পর ভাটার সৃষ্টি হয়।

০৩. ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্য কি লিখুন।

উত্তর : নিচে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

ভাইরাস	ব্যাকটেরিয়া
১. ভাইরাস অকোষীয়। এতে সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ও আদি নিউক্লিয়াস নেই।	১. ব্যাকটেরিয়া আদিকোষীয়। এতে সাইটোপ্লাজম, বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ও নিউক্লিয়াস থাকে।
২. কেবল সজীব কোষের ভেতর বংশবৃদ্ধি করতে পারে।	২. সজীব কোষের বাইরে বংশবৃদ্ধি করতে পারে।
৩. এদের দেহে কোনো এনজাইম থাকে না তাই এতে কোনো বিপাক ক্রিয়া দেখা যায় না।	৩. এদের দেহে এনজাইম থাকে তাই এতে বিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয়।

০৪. এপিকালচার ও পিসিকালচার বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : এপিকালচার (Apiculture) : বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন এবং মৌমাছির মধু সংগ্রহ করার বিদ্যাকে বলা হয় এপিকালচার বা মৌমাছি পালন বিদ্যা।

পিসিকালচার (Pisiculture) : বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্য চাষ তথা মৎস্য পালন, আহরণ ও সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে বলা হয় পিসিকালচার বা মৎস্য চাষ বিদ্যা।

০৫. বাইনারি নাম্বার কি?

উত্তর : বাইনারি নাম্বার হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত এক ধরনের সংখ্যাপদ্ধতি। এই সংখ্যা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অঙ্ক দুটি হলো ০ ও ১ যাদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় বিট (Bit)। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতির ভিত্তি হলো ২।

০৬. ICT ও IT বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : ICT-এর পূর্ণরূপ Information and Communication Technology। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) হলো এক ধরনের একীভূত যোগাযোগ ব্যবস্থা। এটি টেলিযোগাযোগ, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, সফটওয়্যার, তথ্য সংরক্ষণ, অডিও-ভিডিও সিস্টেম ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত এমন এক ধরনের ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে একজন ব্যবহারকারী খুব সহজে তথ্য গ্রহণ, সংরক্ষণ, সঞ্চালন ও বিশ্লেষণ করতে পারে।

অন্যদিকে IT-এর পূর্ণরূপ Information Technology। কম্পিউটার কিংবা টেলিযোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে তথ্য সংরক্ষণ, গ্রহণ-প্রেরণ, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিকে তথ্যপ্রযুক্তি (IT) বলে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ২০১৪

০১. গ্রিন হাউজ ইফেক্টের জন্য কোন গ্যাস দায়ী?

উত্তর : গ্রিন হাউস ইফেক্টের জন্য দায়ী গ্যাসগুলো হলো—CO, CO_2, CFC, CH_4, SO_2, N_2O প্রভৃতি।

০২. হীরক কোন মৌলের একটি বিশেষ রূপ?

উত্তর : হীরক হলো কার্বনের একটি বিশেষরূপ। পৃথিবীতে প্রাপ্ত সবচেয়ে কঠিন পদার্থ হলো হীরক।

০৩. কোন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি?

উত্তর : শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি কঠিন মাধ্যমে।

০৪. VOIP এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : VOIP-এর পূর্ণরূপ Voice Over Internet Protocol। ইন্টারনেট টেকনোলজি এবং মাল্টিমিডিয়া অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে ভয়েস, ডেটা এবং ভিডিও আদান-প্রদান করার পদ্ধতিকে VOIP টেকনোলজি বলে।

০৫. SMS ও MMS বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : SMS এর পূর্ণরূপ— Short Message Service. এর মাধ্যমে শুধু টেক্সট পাঠানো যায়। MMS এর পূর্ণরূপ— Multimedia Messaging Service. এর মাধ্যমে ছবি, শব্দ, ভিডিও, টেক্সট ইত্যাদি পাঠানো যায়। অর্থাৎ মোবাইল থেকে মাল্টিমিডিয়া কন্টেন্ট অন্তর্ভুক্ত যে কোনো বার্তা পাঠানোর জন্য একটি আদর্শ উপায়।

০৬. প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারী মৌল কি?

উত্তর : প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভারী মৌল হলো ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়ামের বহুল ব্যবহৃত আইসোটোপ দুটি $^{235}_{92}U$ এবং $^{238}_{92}U$।

০৭. স্কাইপ কি?

উত্তর : স্কাইপ একটি ভিওআইপি সেবা এবং সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন। এই সেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা ইন্টারনেটে যুক্ত হয়ে পরস্পরের সাথে ভয়েস, ভিডিও এবং তাৎক্ষণিক বার্তার মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারে। ২০০৩ সালে ডেনমার্কের ধমিজা, জানজু ফ্রিজ এবং সুইডেনের নিকলাস জেনস্ট্রম স্কাইপ প্রতিষ্ঠা করেন।

০৮. 'শুকতারা' নক্ষত্র না গ্রহ?

উত্তর : 'শুকতারা' আসলে কোনো নক্ষত্র বা তারা নয়। এটি একটি গ্রহ। এর নাম শুক্র। শুক্র গ্রহই ভোররাতে পূর্বাকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যায় পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারা নামে পরিচিত। নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে বলেই আমরা একে ভুল করে তারা বা নক্ষত্র বলি।

০৯. বিশ্বব্যাংকের মূল নাম কি?

উত্তর : বর্তমানে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের অঙ্গ সংস্থা ৫টি। যথা : IBRD, IDA, IFC, ICSID, MIGA। তন্মধ্যে IBRD প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ সালে। যেটা শুরুতে বিশ্বব্যাংক নামে পরিচিত ছিল। উপরের সবগুলোর সমন্বয়ে বর্তমান বিশ্বব্যাংক গ্রুপ গঠিত হলেও IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)-ই হলো বিশ্বব্যাংকের মূল নাম।

১০. আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ কোনটি?

উত্তর : আয়তনে বিশ্বের বৃহত্তম দেশ রাশিয়া। এর আয়তন ১,৭০,৭৫,২০০ বর্গ কিলোমিটার।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বয়লার পরিদর্শক ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. টুথপেস্টের সাধারণ উপাদান কি কি?

উত্তর : টুথপেস্টের সাধারণ উপাদানগুলো হলো– ডাই ও ট্রাই ক্যালসিয়াম ফসফেট, চক পাউডার, গ্লিসারিন, সোডিয়াম স্যাকারিন, গাম ট্রাগাকান্থ মিউসিলেজ, মেনথল, পিপারমেন্ট অয়েল, তরল প্যারাফিন, পাতিত পানি ইত্যাদি।

০২. ভূ-কম্পন শক্তি পরিমাপের গাণিতিক স্কেলের নাম কি?

উত্তর : ভূ-কম্পন শক্তি পরিমাপের গাণিতিক স্কেলের নাম রিক্টার স্কেল। ১৯৩৫ সালে আমেরিকার ভূ-কম্পনবিশারদ সি. এফ. রিক্টার এ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন। এ স্কেলে ১ থেকে ১০ পর্যন্ত ভূমিকম্পের তীব্রতা ধরা যায়।

০৩. পিডিপি কি?

উত্তর : পিডিপি (PDP)-এর পূর্ণরূপ হলো—Packet Data Protocol, যা তারবিহীন GPRS/HSDPA নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত হয়।

০৪. বাংলাদেশের প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশুর নাম কি?

উত্তর : অধ্যাপিকা ডা. রাশিদা বেগমের তত্ত্বাবধানে ১৯ সেপ্টেম্বর ২০০৮ বাংলাদেশে জন্ম নেয়া প্রথম হিমায়িত ভ্রূণ শিশুর নাম হলো অন্সরা (কন্যা শিশু)।

০৫. কোন গ্রহকে লাল নক্ষত্র বলা হয় ও কেন?

উত্তর : মঙ্গল গ্রহকে লাল গ্রহ (নক্ষত্র নয়) বলা হয়। কারণ অক্সিজেনের সংস্পর্শে এ গ্রহের পাথরগুলো মরচে পড়ে গেছে।

০৬. মহাকাশে কতগুলো গ্যালাক্সি আছে?

উত্তর : মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং বিশাল বাষ্পকুণ্ড নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীয় যে দল সৃষ্টি হয়েছে তাকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ বলে। মহাকাশে অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে।

০৭. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কোন দুটি গ্যাস সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে?

উত্তর : ভূপৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে যে বায়ুর আবরণ আছে তাকে বলে বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার। বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণে গঠিত। বিশুদ্ধ, শুষ্ক বায়ুতে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে রয়েছে নাইট্রোজেন (৭৮.০২%) ও অক্সিজেন (২০.৭১%)। আয়তনের দিক থেকে এ দুটি গ্যাস একত্রে ৯৮.৭৩ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে।

০৮. মডেম (Modem) শব্দের পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : মডেম (Modem) শব্দের পূর্ণরূপ হলো Modulator and Demodulator. যে যন্ত্র কম্পিউটারের ভাষাকে (ডিজিটাল) টেলিফোনের ভাষায় (এনালগ) এবং টেলিফোনের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে বলে মডেম।

বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাব-অ্যাসিস্টেন্ট মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কি?

উত্তর : ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে সিসমোমিটারও বলা হয়।

০২. একজন সাধারণ মানুষের দেহে মোট কয় টুকরা হাড় থাকে?

উত্তর : একজন সাধারণ মানুষের দেহে মোট ২০৬ টুকরা হাড় থাকে। এদের মধ্যে বৃহত্তম হাড়টি ফিমার ও ক্ষুদ্রতমটি স্টেপিস।

০৩. কোন গাছের পাতা থেকে গাছ জন্মায়?

উত্তর : পাথরকুচি গাছের পাতা থেকে গাছ জন্মায়।

০৪. সুনামি কি কারণে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : সমুদ্রগর্ভে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন কম্পন বা আলোড়ন সৃষ্টি হলে, সে শক্তির তরঙ্গ বিশাল সামুদ্রিক ঢেউ হয়ে সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল বা উপকূলে আছড়ে পড়ে। একে সুনামি বলে। অর্থাৎ সুনামি সৃষ্টির কারণ হলো সমুদ্র গর্ভের আন্দোলন বা কম্পন। সমুদ্র গর্ভস্থ আগ্নেয়গিরীর অগ্নুৎপাতের ফলেও এমনটি হতে পারে।

০৫. সূর্যের আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত মাইল?

উত্তর : সূর্যের আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,২৮২ মাইল (প্রায়)। [মিটার এককে এ গতিবেগ সেকেন্ডে ২,৯৯,৭৯২,৪৫৮ মিটার এবং কিলোমিটার এককে এ গতিবেগ প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার।]

০৬. স্টিফেন হকিং কে?

উত্তর : বর্তমান সময়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী হলেন স্টিফেন হকিংস। তিনি কৃষ্ণবিবর (Black Hole) সংক্রান্ত বিষয় ও মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ নিয়ে গবেষণা করছেন। ১৯৮৫ সাল থেকে তিনি দূরারোগ্য মোটর নিউরন রোগে আক্রান্ত হন। বিশেষ পদ্ধতিতে তিনি কম্পিউটারে তার গবেষণাকর্ম লিপিবদ্ধ করেন। তার বই কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (A Brief History of Time) পৃথিবী বিখ্যাত।

০৭. কম্পিউটারের কোনটি নেই?

উত্তর : কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। এটি বিভিন্ন প্রোগ্রামের সাহায্যে প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত বিচার-বিশ্লেষণ করে। তবে এটির নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা নেই। অর্থাৎ এটি শুধুমাত্র প্রদত্ত নির্দেশনার বাহক ও বাস্তবায়ক।

মেরিন একাডেমীর শিক্ষা কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় কোন যন্ত্র দিয়ে?

উত্তর : সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের জন্য ফ্যাদোমিটার নামক যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

০২. স্ট্রোক শরীরের কোন অংশের রোগ?

উত্তর : স্ট্রোক শরীরের মস্তিষ্কের একটি রোগ। মস্তিষ্কের কোনো ধমনীতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হলে স্ট্রোক হয়। স্ট্রোকের ফলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

০৩. সুনামি সৃষ্টির কারণ কি?

উত্তর : Tsunami জাপানি শব্দ। 'সু' অর্থ বন্দর এবং 'নামি' অর্থ ঢেউ। সুতরাং সুনামি অর্থ হলো বন্দরের ঢেউ। ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় সাগরে যে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়ে জলোচ্ছ্বাস হয় তাকে বলে সুনামি। সুনামি সৃষ্টির কারণগুলো হলো– সাগরের তলদেশে প্লেট দুমড়ে যাওয়ায় সৃষ্ট ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস ও নভোজাগতিক ঘটনা ইত্যাদি।

০৪. এক মিটার সমান কত ইঞ্চি?

উত্তর : এক মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি।

০৫. পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ও চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার বিয়োগফল কত?

উত্তর : পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০০

চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯

বিয়োগফল = ১

০৬. কম্পিউটারে কোনটি নেই?

উত্তর : Computer হলো একটি গণনাকারী বা হিসাবকারী যন্ত্র। এটি দ্রুতগতিতে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে পারলেও তার নিজস্ব কোনো বুদ্ধি বিবেচনা নেই।

০৭. www এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : WWW-এর পূর্ণরূপ World Wide Web। সুতরাং WWW হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা পরস্পরকে সংযোগযোগ্য Web page। পৃথিবীতে WWW এর সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে CERN-এ।

আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুবাদ কর্মকর্তা ও সহকারী সচিব (ড্রাফটিং) ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. বাতাসের নাইট্রোজেন কিভাবে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে?

উত্তর : বায়ুস্থ N_2 বজ্রপাত ও বৃষ্টির সময় বায়ুস্থ O_2 এর সাথে মিশে (প্রায় ৩০০০°C তাপমাত্রায়) নাইট্রোজেনের অক্সাইডে পরিণত হয়। পরে তা বৃষ্টির পানির সাথে মিশে HNO_3 তে পরিণত হয়। এই HNO_3 (নাইট্রিক এসিড) মাটির ক্ষারকীয় পদার্থ যেমন চুন (CaO) ও $CaCO_3$ এর সাথে মিশে দ্রবণীয় কার্বনেট লবণে $(NO3)_2$ পরিণত হয়। এ লবণ মাটির সাথে মিশে যায় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। এছাড়াও লিগুমিনাস জাতীয় উদ্ভিদের (মটর, শিম, ছোলা ইত্যাদি) শিকড়ে অবস্থিত সিমবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া বায়ু থেকে সরাসরি N_2 গ্রহণ করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।

০২. ডুবোজাহাজ কোন যন্ত্রের সাহায্যে পানির নিচ থেকে উপরের দৃশ্য দেখে?

উত্তর : ডুবোজাহাজে অবস্থিত ক্রু বা সৈন্যরা সরল পেরিস্কোপ ব্যবহার করে উপরের দৃশ্য দেখে থাকেন। আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ধর্ম ব্যবহার করে এ যন্ত্রটি তৈরি করা হয়।

০৩. কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়? ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি রোগের নাম লিখুন।

উত্তর : ভিটামিন A-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। টাইফয়েড একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ যা *Salmonella Typhy* নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে হয়।

০৪. প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : প্রেসার কুকারে স্থির আয়তনে চাপ বাড়িয়ে পানির স্ফুটনাংক বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় পানির স্বাভাবিকের থেকে (১০০°C) অধিক তাপমাত্রায় স্ফুটন ঘটে। দেখা গেছে প্রেসার কুকারে পানিকে ১২০°C তাপমাত্রার উপড়েও ফুটানো যায়। এ অধিক তাপমাত্রার কারণে প্রেসার কুকারে তাড়াতাড়ি রান্না হয়।

০৫. ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কি? পেনিসিলিন কে আবিষ্কার করেছেন?

উত্তর : ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম হলো– সিসমোগ্রাফ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একে সিসমোমিটারও বলা হয়। বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৯ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। তিনি *Penicillim notatum* নামক ছত্রাক থেকে এটি আবিষ্কার করেন।

০৬. কোন নভোচারী সর্বপ্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন?

উত্তর : ইউরি গ্যাগারিন হলেন প্রথম নভোচারী যিনি সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ভস্টক-১ এ করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহকারী ইলেকট্রনিক প্রকৌশলী ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে; মান ২ × ৫ = ১০)

০৩. ক. Internet-এ ব্যবহৃত www-এর পূর্ণরূপ কি? উইকিলিক্স-এর প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?

উত্তর : Internet-এ ব্যবহৃত www-এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Web। উইকিলিক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ।

খ. ঠাণ্ডা ও গরম পানির মধ্যে কোনটি তাড়াতাড়ি আগুন নেভাতে সাহায্য করে?

উত্তর : ঠাণ্ডা ও গরম পানির মধ্যে গরম পানি অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি আগুন নেভাতে সাহায্য করে। গরম পানি যখন প্রজ্জ্বলিত বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন সহজেই অধিক পরিমাণ জলীয়বাষ্প সৃষ্টি করে তা বস্তুটির জন্য O_2 সরবরাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

গ. প্রাকৃতিক কোন উৎস হতে সর্বাধিক মৃদু পানি পাওয়া যায়? কত ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় পানি ফুটে?

উত্তর : সর্বাধিক মৃদু পানি প্রাপ্তির প্রাকৃতিক উৎস হলো বৃষ্টি। সাধারণভাবে ১০০°C বা ২১২°F তাপমাত্রায় পানি ফুটে। তবে পরিবেশের চাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস করে এ তাপমাত্রা পরিবর্তন করা যায়।

ঘ. ইনকিউবেটর কি? কোন যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়?

উত্তর : ইনকিউবেটর হলো বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা, যেখানে কৃত্রিম জৈব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে মাইক্রো-অরগানিজমের কালচার করা বা ডিমে তা দেয়া হয়। তবে সাধারণভাবে আমরা ইনকিউবেটর বলতে ডিমে তা দেয়া ইনকিউবেটরকে বুঝি। ইনফ্যান্ট বেবিদের কেয়ারেও ইনকিউবেটর ব্যবহৃত হয়।

আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা যায়।

ঙ. ই-মেইল কি? মোবাইলে প্রেরিত SMS-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : ই-মেইল হলো ইলেক্ট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ। মোবাইলে প্রেরিত SMS-এর পূর্ণরূপ হলো Short Message Service।

চ. গলগণ্ড রোগ কেন হয়? Oncology বিভাগে কোন ধরনের রোগীর চিকিৎসা হয়?

উত্তর : গলগণ্ড রোগ হয় আয়োডিনের অভাবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় টিউমার ও ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা করা হয় তাকে Oncology বলে। অর্থাৎ এ বিভাগে ক্যান্সার ও টিউমার আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করা হয়।

ছ. পদার্থের তিন অবস্থা কি কি?

উত্তর : পদার্থের তিনটি অবস্থা হলো- ১. কঠিন, ২. তরল ও ৩. বায়বীয়।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. কোন পদার্থ তাপে সংকুচিত হয়? ভূমিকম্পের কম্পন মাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম কি?

উত্তর : যে সকল কঠিন পদার্থ এর তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় আয়তনে তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় সে সকল কঠিন পদার্থ তাপে সংকুচিত হয়। যেমন- বরফ। ভূমিকম্পের কম্পন মাত্রা মাপার যন্ত্রের নাম রিখটার স্কেল।

০২. ইন্টারনেট সর্বপ্রথম কত সালে ব্যবহৃত হয়? www-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : ইন্টারনেট সর্বপ্রথম ১৯৬৯ সালে ব্যবহৃত হয়, তবে ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯০ সাল থেকে। www -এর পূর্ণরূপ হলো- World Wide Web.

০৩. পরিবেশ দূষণ প্রধানত কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : পরিবেশ দূষণ প্রধানত চার প্রকার। যথা- ১. বায়ু দূষণ; ২. পানি দূষণ; ৩. মাটি দূষণ ও ৪. শব্দ দূষণ।

০৪. ভিটামিন A-এর অভাবজনিত দুটি উপসর্গের নাম লিখুন।

উত্তর : ভিটামিন A-এর অভাবজনিত দুটি উপসর্গের নাম হলো- ১. রাতকানা রোগ এবং ২. ল্যাথারিজম।

০৫. তাপমাত্রার চারটি স্কেল ও সংকেত উল্লেখ করুন।

উত্তর : মৌলিক ব্যবধানকে নানাভাবে ভাগ করে তাপমাত্রার বিভিন্ন স্কেল তৈরি করা হয়েছে। এদের মধ্যে চারটি স্কেল ও সংকেত নিচে দেয়া হলো :

তাপমাত্রার স্কেল	সংকেত
সেলসিয়াস	C
ফারেনহাইট	F
কেলভিন	K
রেনকাইন	Ra

০৬. ইলেকট্রোপ্লেটিং কি?

উত্তর : ইলেকট্রোপ্লেটিং হচ্ছে গ্যালভানাইজিংয়ের মতোই একটি প্রক্রিয়া, যাতে তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি ধাতুর তৈরি জিনিসপত্রের উপর অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ দেয়া হয়। লোহা বা ইস্পাতের তৈরি অনেক সামগ্রীর উপর এ প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এক ধরনের প্রলেপ দেয়া হয়, একে বলে ইলেকট্রোপ্লেটিং।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মেডিকেল অফিসার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ২ × ৫ = ১০)

০১. পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন?

উত্তর : মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলেও আমরা ছিটকে পড়ি না।

০২. স্টিফেন হকিন্স ও আলেকজান্ডার ফ্লেমিং কি জন্য বিখ্যাত?

উত্তর : স্টিফেন হকিন্স বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্য এবং পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য আলেকজান্ডার ফ্লেমিং বিখ্যাত।

০৩. প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন?

উত্তর : প্রেসার কুকারে পানির উপরস্থ চাপ বাড়িয়ে এর স্ফুটনাংক বৃদ্ধির মাধ্যমে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়।

০৪. ভূমিকম্প মাপক যন্ত্র ও বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্রের নাম লিখুন।

উত্তর : ভূমিকম্প মাপক যন্ত্রের নাম রিখটার স্কেল এবং বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্রের নাম রেইনগেজ।

০৫. ফুলকার সাহায্যে ও ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় কোন কোন প্রাণী?

উত্তর : ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় মাছ এবং ত্বকের সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায় কেঁচো, জোঁক।

০৬. মানবদেহে ভিটামিন সি-এর কাজ কি কি?

উত্তর : মানবদেহে ভিটামিন সি-এর কাজ নিচে আলোচনা করা হলো—

i. ক্ষত সারাতে বা ভাঙা হাড় জোড়া লাগাতে ভিটামিন সি সাহায্য করে।

ii. পাঁজরের হাড়ে ব্যথা, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

iii. স্কার্ভি রোগ হওয়া, শিশুদের মাড়ি ফুলে যাওয়া, গোড়ালি বা কব্জি ফুলে ওঠা থেকে রক্ষা করে।

০৭. আমাদের দেশে বনায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কি?

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বনায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। বৃক্ষ সমগ্র প্রাণীকুলের খাদ্যের যোগান দেয় এবং সুবিশাল শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে ছায়াদান করে উত্তপ্ত ধরণীকে সুশীতল রাখে। প্রাণিজগতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বৃক্ষ অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বাতাস থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী যেমন— আসবাবপত্র, জ্বালানি কাঠ, গৃহনির্মাণ, রেল লাইনের স্লিপার, নৌকা, লঞ্চ, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করতে যে বিপুল পরিমাণ কাঠের প্রয়োজন হয় তা বনায়ন থেকে আসে।

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক) ২০১৪

(যে কোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান ১ × ১০ = ১০)

০১. তড়িৎ প্রবাহের একক কি?

উত্তর : তড়িৎ প্রবাহের একক হলো অ্যাম্পিয়ার।

০২. আলোকবর্ষ কি পরিমাপের একক?

উত্তর : পৃথিবী থেকে অপরাপর নক্ষত্রের দূরত্ব পরিমাপের একক হলো আলোকবর্ষ।

০৩. বাংলা ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের নাম কি?

উত্তর : বাংলা ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের নাম পিপীলিকা।

০৪. আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রবক্তা কে?
উত্তর : আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন আলবার্ট আইনস্টাইন।

০৫. দুধ খাঁটি কিনা তা যাচাইয়ের জন্য কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?
উত্তর : ল্যাকটোমিটার ব্যবহার করে দুধের বিশুদ্ধতা নির্ণয় করা হয়।

০৬. CNG-এর পূর্ণরূপ কি?
উত্তর : CNG-এর পূর্ণরূপ হলো Compressed Natural Gas.

০৭. ইনসুলিনের কাজ কি?
উত্তর : ইনসুলিনের কাজ হলো চিনির বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা।

০৮. লিউকোপ্লাস্ট কি?
উত্তর : লিউকোপ্লাস্ট হচ্ছে এক ধরনের প্লাস্টিড। এর আকৃতি অর্ধবৃত্তাকৃতি, মূলাকৃতি, নলাকৃতির হতে পারে।

০৯. হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলগুলি কি কি?
উত্তর : হ্যালোজেন গ্রুপের মৌলসমূহ হলো— ফ্লোরিন (F), ক্লোরিন (Cl), ব্রোমিন (Br) এবং আয়োডিন (I)।

১০. ডিনামাইট কে আবিষ্কার করেন?
উত্তর : আলফ্রেড বার্নাড নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

১১. মার্ক জুকারবার্গ কে?
উত্তর : মার্ক জুকারবার্গ হলেন ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা।

১২. বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বোসের জন্ম কোথায় হয়েছিল?
উত্তর : বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু ৩০ নভেম্বর ১৮৫৮ মুন্সিগঞ্জের রাঢ়িখালে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সহকারী প্রকৌশলী ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১. ডিজিটাল কম্পিউটার কী?
উত্তর : যে কম্পিউটার সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে তাই ডিজিটাল কম্পিউটার। এটি যে কোনো গণিতের যোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে এবং বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মতো অন্যান্য অপারেশন যোগের সাহায্যে সম্পাদন করে।

০২. MICR চেক কী? এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : MICR চেক হলো ব্যাংক চেক বা ডকুমেন্টে মেশিন পাঠযোগ্য বিশেষ কিছু লেখার প্রযুক্তি, যা বিশেষ চুম্বকীয় কালিতে লেখা হয়। MICR-এর পূর্ণররূপ : Magnetic Ink Character Recognition বা Magnetic Ink Character Reader.

০৩. ফরমালিন কী?
উত্তর : ফরমালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে। ফরমালিনে ৪০% ফরমালডিহাইড, ১২%-১৮% মিথাইল অ্যালকোহল এবং অবশিষ্ট অংশ পানি থাকে।

০৪. সুষম খাদ্যের উপাদান কতটি? গ্রিন হাউজ তৈরি করা হয় কেন?
উত্তর : যে খাদ্যে ছয়টি খাদ্য উপাদানের সবগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক অনুপাতে উপস্থিত রয়েছে এবং যে খাদ্য ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটায়, তাকেই সুষম খাদ্য বলে। সুষম খাদ্যের উপাদান ছয়টি। যথা : (i) প্রোটিন, (ii) শর্করা, (iii) স্নেহ পদার্থ, (iv) ভিটামিন, (v) খনিজ লবণ ও (vi) পানি।
গ্রিন হাউস হলো কাচের ঘর, যার ভেতর গাছপালা লাগানো হয়। শীত প্রধান দেশে তীব্র ঠাণ্ডার হাত থেকে গাছপালাকে রক্ষার জন্য গ্রিন হাউস তৈরি করা হয়। গ্রিন হাউসের অভ্যন্তর ভাগের তাপ বাইরের চেয়ে অধিক থাকে।

০৫. ডেঙ্গু জ্বরের বাহক কোন প্রাণী? পিত্তপাথর গলাতে কি ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : ডেঙ্গু ভাইরাস ফ্লেভিভাইরাস গ্রুপের সদস্য। এটি এক ধরনের আরএনএ ভাইরাস। এ ভাইরাস সাধারণত ট্রপিক্যাল ও সাব ট্রপিক্যাল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলকেই এর এন্ডেমিক বা অধিক মাত্রায় সংক্রমণ অঞ্চল হিসেবে ধরা হয়।
ডেঙ্গু মশা দেখতে নীলাভ কালো, দেহে সাদা ডোরাকাটা পাঁচটি দাগ রয়েছে। এডিস ইজিপটাই ও এলবোপিকটাস-এই দুই প্রজাতির স্ত্রী মশা আমাদের দেশে ডেঙ্গু জ্বর ছড়ায়।
পিত্তথলির পাথর গলাতে বিশেষ এক ধরনের ওষুধ ক্যাথেটারের মাধ্যমে ইনজেকশন হিসেবে পিত্তথলিতে সরাসরি পুশ করা হয়। এছাড়া এ পাথর ভাঙতে উচ্চ কম্পনাংকের শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। যাকে শক ওয়েভ থেরাপি বলে।

০৬. Twitter কী?
উত্তর : টুইটার এক প্রকার সামাজিক নেটওয়ার্কিং। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে। ১৫ জুলাই ২০০৬ এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বের অধিকাংশ সেলিব্রেটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে টুইটার ব্যবহার করেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ইপিআই অ্যান্ড সার্ভিসেস-এর কোল্ড চেইন ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪

০১. ক. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির উৎস কোনগুলো? এদের ব্যবহার উল্লেখ করুন।
উত্তর : যেসব জ্বালানি নানা প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায়, যেগুলোর মজুদ ভবিষ্যতে কখনও শেষ হবে না অর্থাৎ বারবার ব্যবহার করা যায় তাদেরকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা Renewable Energy বলে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎসগুলো হলো– সৌরশক্তি, পরমাণু শক্তি, বায়ু, বৃষ্টি, জৈবিক পদার্থ ইত্যাদি।
নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার : নবায়নযোগ্য শক্তি বায়ু, সৌর, জলবিদ্যুৎ ইত্যাদি আমাদের জলবায়ু, স্বাস্থ্য এবং অর্থনীতির জন্য অনেক সুবিধা প্রদান করে। যেমন—
১. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশগত মান উন্নত।
২. একটি সুবিশাল এবং অফুরন্ত শক্তি সরবরাহ।
৩. যে কোনো গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর অনুঘটকগুলোর নির্গমন সামান্য।
৪. আরো একটি নির্ভরযোগ্য এবং প্রাণবন্ত শক্তি সিস্টেম।

খ. ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ এদের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ার ভাটাপূর্ণ এলাকায় যেসব উদ্ভিদ জন্মে সেগুলোই হলো ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। যেমন : গেওয়া, গরান, সুন্দরী ইত্যাদি। এদের বৈশিষ্ট্য হলো :

১. এদের মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করে না।
২. এরা শ্বাসমূলের সাহায্যে শ্বসন চালায়।
৩. এরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহকোষে পানি জমিয়ে রাখে এবং
৪. এদের অনেকেই জরায়ুজ পদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে।

০২.ক. বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিভিন্ন রকম থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : যে পাওয়ার প্লান্টে থার্মো কেমিক্যাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট বলে। থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন :

স্টিম পাওয়ার প্লান্ট : যে পাওয়ার প্লান্টে পানি থেকে বাষ্প তৈরি করে উক্ত বাষ্প দ্বারা প্রথমে টারবাইন ও পরে টারবাইন দ্বারা জেনারেটরের শ্যাফট ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়, তাকে স্টিম পাওয়ার প্লান্ট বলে। এর বয়লার প্লান্টে প্রথমে গ্যাসের সাহায্যে পানি থেকে বাষ্প উৎপন্ন করে টারবাইনে পাঠানো হয়, তারপর টারবাইন ঘুরিয়ে উক্ত স্টিম একটি কনডেনসারে প্রবেশ করে, কনডেনস্‌ড হয়ে পুনরায় ফিড ওয়াটার হিসেবে বয়লারে ফিরে আসে।

গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট : যে পাওয়ার প্লান্টে উচ্চতাপ ও চাপে বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসের (atmospheric air) সাথে গ্যাস মিশ্রিত করে ঐ মিশ্রিত গ্যাসকে পুড়িয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করে টারবাইনের সাথে সংযুক্ত অল্টারনেটারকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হয়, তাকে গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট বলে।

ডিজেল পাওয়ার প্লান্ট : যে পাওয়ার প্লান্টে জেনারেটরের প্রাইমমোভারকে ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাকে ডিজেল পাওয়ার প্লান্ট বলে।

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট : নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন চালানো হয়। প্রথমে রিয়্যাক্টরের মধ্যে ইউরেনিয়াম (U^{235}) নিউক্লিয়াসে এর বিভাজন ক্রিয়া ঘটানো হয়। এই বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড তাপশক্তির উদ্ভব ঘটে। এই তাপশক্তিকে এক্সচেঞ্জারে আগত পানি উক্ত তাপের মাধ্যমে স্টিমে পরিণত করে স্টিমের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

সোলার পাওয়ার প্লান্ট : যেসব দেশে সূর্য লম্বালম্বিভাবে কিরণ দেয়, যেমন— কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত দেশসমূহে সূর্যকিরণ থেকে দিনের বেলায় হিট অ্যাকুমুলেটর (Heat accumulator) এর সাহায্যে তাপ সংগ্রহ করে রাতেও সেই তাপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। আমাদের দেশে এই পদ্ধতি সম্ভব। কারণ আমাদের দেশে দিনের দৈর্ঘ্য প্রায় বারো ঘণ্টা এবং এই সময়ে পর্যাপ্ত সূর্যকিরণ পাওয়া যায়।

খ. কি কি কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হয়?

উত্তর : বিদ্যুৎ ইলেকট্রন চার্যযুক্ত এক প্রকার পরিবাহী কণা। তাই এটি কোনো পরিবাহী ধাতব, মৃত্তিকা, পানির সংস্পর্শে এলে মুক্ত হয় অর্থাৎ লস হয়। যে কারণে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হয় সেগুলো হলো—

১. উৎপাদন কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে দীর্ঘপথ আসার সময় কিছু সিস্টেম লস হয়।
২. নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে ফিডার ফেজে বিদ্যুৎ দেয়ার সময়ও কিছু সিস্টেম লস হয়।

৩. ফিডার লাইন থেকে যখন ট্রান্সফর্মারে বিদ্যুৎ আসে তখনও সিস্টেম লস হয়।
৪. বিদ্যুৎ লাইনে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ প্রবাহের কারণেও সিস্টেম লস হয়।
৫. বিদ্যুতের অবৈধ ব্যবহারেও সিস্টেম লস হয়।

০৩.ক. বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কি? উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর : বায়োটেকনোলজি : বিভিন্ন ধরনের জৈব যৌগ থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করাকে বায়োটেকনোলজি বলে। যেমন– গোবর থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন হচ্ছে বায়োটেকনোলজি।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং : বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজোমকে প্রজননের মাধ্যমে নতুন প্রজাতি উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। বিভিন্ন ধরনের ধান যেমন— বি আর-৮, বি আর-২২ ইত্যাদি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

খ. করোনারি বাইপাস ও এনজিওপ্লাস্ট কি?

উত্তর : যে রক্তবাহিকাগুলো হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে তাদের করোনারি আর্টারি বলে। করোনারি আর্টারিগুলোর গাত্রে অতিরিক্ত চর্বি জমে এবং অভ্যন্তর ভাগ উঁচু নিচু-অমসৃণ ও সরু হলে রক্তপ্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রক্ত চলাচল বাধা দূর করার জন্য সাধারণত যে চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাই করোনারি বাইপাস।

হৃৎপিণ্ড হতে পাম্পকৃত রক্ত তিনটি বৃহৎ ধমনীর মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। ধমনী দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে এর চিকিৎসায় এনজিওপ্লাস্টি চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সমস্যাযুক্ত ধমনীর সংকুচিত স্থান বিশেষ ধরনের বেলুন দ্বারা প্রসারিত হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

০৪.ক. ফরমালিন কি? এটি কোন কাজে ব্যবহার করা হয়? ৩

উত্তর : ফরমালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলে। ফরমালিনে ৪০% ফরমালডিহাইড, ১২%-১৮% মিথাইল অ্যালকোহল এবং অবশিষ্ট অংশ পানি থাকে।

ব্যবহার :

১. ফরমালিন শক্তিশালী জীবাণুনাশক হওয়ায় পরীক্ষাগারে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
২. ফরমালিন চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

খ. হরমোন কি? মানবদেহে হরমোনের কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : যে জৈব রাসায়নিক পদার্থ অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হতে নিঃসৃত হয়ে বার্তাবহ রূপে রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের নানাবিধ বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে দেহের রাসায়নিক সংযোজন রক্ষা করে তাকে হরমোন বলে।

নিচে মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার হরমোনের কাজ বর্ণিত হলো :

১. **টেস্টোস্টেরন :** এ হরমোন পুরুষের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এবং শুক্রাণু উৎপাদনে ভূমিকা পালন করে।
২. **ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন :** এ হরমোন স্ত্রীলোকের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে এবং প্লাসেন্টা গঠনে ভূমিকা পালন করে। ডিম্বাশয়, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি এবং গর্ভাবস্থায় গর্ভফুল থেকে এ সকল হরমোন তৈরি হয়।
৩. **ইনসুলিন :** এ হরমোন রক্তে গ্লুকোজের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাসে ভূমিকা রাখে।

৪. **গ্রোথ হরমোন :** মস্তিষ্কের পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত এ হরমোন দেহের বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। এর প্রভাবে মানুষের উচ্চতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।

৫. **রিলাক্সিন :** এ হরমোন গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের শ্রোণিবন্ধনী শিথিল করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।

গ. চিনি কোন জাতীয় খাদ্য?

উত্তর : চিনি কার্বহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। চিনি সুক্রোজ হিসেবে পরিচিত। চিনি কার্বন 12 পরমাণু, হাইড্রোজেন 22 পরমাণু এবং অক্সিজেন 11 পরমাণু দ্বারা গঠিত একটি অণু। চিনির সংকেত হলো $C_{12}H_{22}O_{11}$।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরের সহকারী প্রধান পরিদর্শক ২০১৪

০১. উত্তর লিখুন :

ক. বাতাসে বিদ্যমান কোন আকৃতির কণা বেশি ক্ষতিকর?

উত্তর : কার্বন ডাই-অক্সাইড।

খ. DNA-এবং RNA-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : DNA — De-oxyribo Nucleic Acid.

RNA — Ribo Nucleic Acid.

গ. পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি?

উত্তর : শুক্র।

ঘ. প্যারিস প্লাস্টার কি?

উত্তর : প্লাস্টার অব প্যারিস এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ, যা পানি সংযোগে শক্ত হয়ে যায়। জিপসামকে ১২০°-১৩০°c উষ্ণতায় নিয়ে গেলে জলীয় অংশ কমে গিয়ে চূর্ণ অবস্থায় আসে, যা অনার্দ্র ক্যালসিয়াম সালফেট মেশালে জমাট বাঁধে।

ঙ. কম্পিউটারের মেমোরি কত প্রকার ও কী কী?

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমোরিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. প্রধান বা মুখ্য (Main/Primary) মেমোরি।

২. সহায়ক বা গৌণ (Auxiliary/Secondary) মেমোরি।

৩. ক্যাশ বা প্রসেসর (Cache/Processor) মেমোরি।

প্রধান মেমোরির দুটি অংশ। যথা : ক. RAM এবং খ. ROM

চ. 'এসবেস্টস' কী ধরনের পদার্থ?

উত্তর : এসবেস্টস হচ্ছে এক ধরনের নিরোধক পদার্থ।

ছ. রক্তের কোন উপাদান অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন করে?

উত্তর : লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট।

জ. কোন ধাতুর উপর আঘাত করলে শব্দ হয় না?

উত্তর : পারদ।

ঝ. আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারক কে?

উত্তর : আপেক্ষিক তত্ত্বের আবিষ্কারক হলেন— বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন।

ঞ. রেডিও আইসোটোপ কী?

উত্তর : যেসব আইসোটোপ অল্প সময়ের জন্য কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়তা দেখায় তাদেরকে রেডিও আইসোটোপ বলে। যেমন– রেডিয়াম, ইউরেনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কম্পিউটার প্রোগ্রামার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. 'ফাইবার অপটিক্স' বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : ফাইবার অপটিক্স এক ধরনের পাতলা, স্বচ্ছ তন্তুবিশেষ, সাধারণত কাচ অথবা প্লাস্টিক দিয়ে বানানো হয়, যা আলো পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। যখন আলোক রশ্মি কাচতন্তু বা ফাইবার অপটিক্সের একপ্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে, তখন তন্তুর দেয়ালে বার বার এর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে, যতক্ষণ না অপর প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়।

ফাইবার অপটিক্স সাধারণত টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে মানবদেহের ভেতরের কোনো অংশ দেখার জন্য বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া আলোকসজ্জা, সেন্সর ও ছবি সম্পাদনার কাজেও বর্তমানে ফাইবার অপটিক্স ব্যবহৃত হচ্ছে।

০২. 'পরজীবী' কি? এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর : যা অন্য জীব দেহের উপর বাস করে তাকে পরজীবী বলে।

নিচে পরজীবীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ দেয়া হলো :

ক. এরা অসবুজ তাই খাদ্য তৈরি করতে পারে না।

খ. এরা জীবিত উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের উপরে বা ভেতরে বাস করে।

গ. এরা আশ্রয় প্রদানকারী জীবদেহ থেকে নানা প্রক্রিয়ায় খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সাধন করে থাকে।

ঘ. এদের দেহে খাদ্য দ্রব্য শোষণের জন্য কোনো কোনো সময় চোষকমূল থাকে।

ঙ. কখনও বা এরা আশ্রয় প্রদানকারী জীবের দেহে রোগ সৃষ্টি করে থাকে। যেমন— স্বর্ণলতা, ফিতাকৃমি প্রভৃতি।

০৩. যন্ত্রের নাম লিখুন :

ক. বায়ুর চাপ পরিমাপক; খ. দুধ-এর ঘনত্ব পরিমাপক; গ. শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপক।

উত্তর :

ক. বায়ুর চাপ পরিমাপক : ব্যারোমিটার

খ. দুধ-এর ঘনত্ব পরিমাপক : ল্যাক্টোমিটার

গ. শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপক : থার্মোমিটার।

০৪. পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন? সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট হয় কেন?

উত্তর : পৃথিবী সবকিছুকেই তার কেন্দ্রের দিকে টানে, একে মাধ্যাকর্ষণ বলে। এ মাধ্যাকর্ষণের জন্যে সবকিছু পৃথিবীর সঙ্গে লেগে থাকে এবং ছিটকে মহাশূন্যে যায় না।

অভিকর্ষ বলের বিপরীতে কাজ করতে হয় বলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে কষ্ট হয়।

০৫. পূর্ণরূপ লিখুন :

ক. MODEM, খ. WWW, গ. ROM.

উত্তর :

ক. MODEM —Modulator-Demodulator

খ. WWW — World Wide Web

গ. ROM — Read Only Memory

০৬. সিনেমার পর্দা-সাদা হয় কেন? সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?

উত্তর : সাদা পর্দা অন্য কোনো আলোকরশ্মি শোষণ না করে প্রতিফলিত করে। যার ফলে সিনেমার ঔজ্জ্বল্য কমে না এবং যে রঙের আলোকরশ্মি আপতিত হয় তার কোনো পরিবর্তন হয় না। পাশাপাশি দর্শক স্পষ্ট ছবি দেখতে পায়। এ কারণেই সিনেমা হলে সাদা পর্দা ব্যবহার করা হয়।

সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে ৮.৩২ মিনিট সময় লাগে।

০৭. গ্রিন হাউজ গ্যাস কি?

উত্তর : পৃথিবী কর্তৃক নিঃসৃত দীর্ঘ তরঙ্গের তাপশক্তি যেসব গ্যাস গ্রহণ করে বা ধরে রাখে সেসব গ্যাসকে গ্রিন হাউজ গ্যাস বলে। কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন, ওজোন ইত্যাদি গ্যাসই গ্রিন হাউজ গ্যাস।

তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি বিভাগের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার ২০১৪

০১. সংক্ষেপে উত্তর দিন (যে কোনো পাঁচটি) : ২ × ৫ = ১০

ক. DNA পরীক্ষার মাধ্যমে মানবদেহের প্রধানত কী পাওয়া যায়?

উত্তর : DNA পরীক্ষার মাধ্যমে প্রধানত বংশ-পরিচয় নির্ণয় করা হয়। কোনো ব্যক্তির ডিএনএর (জিন) পরিমাণ তার পূর্বপুরুষদের মাত্র কয়েক ধাপ ওপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যাদের বংশধর হওয়া প্রমাণ করতে এ পরীক্ষা করা হয়।

খ. ভিটামিন ই কোন খাদ্যে পাওয়া যায়? ভিটামিন ই মানুষের দেহে কেন প্রয়োজন?

উত্তর : যকৃত, ডিমের কুসুম, বিভিন্ন টাটকা শাক, বিভিন্ন বীজ শস্যের তেল, অংকুরিত ছোলা, গম ও সয়াবিন ইত্যাদিতে ভিটামিন ই পাওয়া যায়।

পেশির বিকৃতি রোধ এবং প্রজনন শক্তির জন্য ভিটামিন ই প্রয়োজন।

গ. Chemical Ecology বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : জীব ও তাদের পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রাকৃতিকভাবে রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা মধ্যস্থতা করাকেই রাসায়নিক বাস্তববিদ্যা বলে। Chemical ecology জীবন্ত প্রাণিসত্তার মিথস্ক্রিয়ার রাসায়নিক সংশ্লিষ্ট বিষয়।

ঘ. ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ কীভাবে জন্মায়?

উত্তর : সমুদ্র উপকূলবর্তী জোয়ার-ভাটাপূর্ণ এলাকায় যেসব উদ্ভিদ জন্মে সেগুলোই হলো ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ।

যেভাবে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ জন্মায় :

১. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চলে জোয়ার ভাটার টানে বীজ ভেসে যায় বলে কিছু কিছু গাছে জরায়ুজ অঙ্কুরোদগম হয়। ফলে গাছে থাকা অবস্থাতেই বীজের অঙ্কুরোদগম হয় এবং মূল বড় ও ভারী হলে ফলটি মাটিতে পড়ে।

২. লবণাক্ত মাটির জন্য গাছের শিকড় মাটির খুব গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। তাই ঝড় ঝাপটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক গাছের মূল ডানাবৎ ছড়ানো হয়।

৩. মাটিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব থাকায় অনেক গাছের মাটির নিচে সমান্তরালভাবে বিস্তৃত মূল থেকে খাড়াভাবে নিউমেটাফোর (শ্বাসমূল) ওপরে উঠে আসে।

ঙ কুইনাইনের গাঠনিক সংকেত লিখুন।

উত্তর :

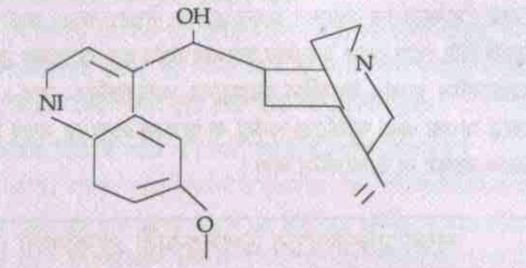

fig : Quinine

চ. কিডনির কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্য রক্তের যে পরীক্ষা করা হয় তার নাম কী?

উত্তর : কিডনির কার্যকারিতা নির্ণয়ের জন্য রক্তের ২টি পরীক্ষা করা হয়। যথা : ১. S – ইউরিয়া এবং ২. S - ক্রিটিনিন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহকারী প্রকৌশলী ২০১৪

০১. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : হার্ডওয়্যার : কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো তৈরির জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র সামগ্রীকে হার্ডওয়্যার বলে। সোজা কথায় কম্পিউটারের যে সকল অংশ হাত দিয়ে ধরা বা ছোঁয়া যায় সেসব যন্ত্রকে হার্ডওয়্যার বলে। কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের মধ্যে Input Device, Output Device, বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ অংশ, স্মৃতি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সফটওয়্যার : প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকে সফটওয়্যার বলে। সফটওয়্যার প্রধানত দু প্রকার (i) সিস্টেম সফটওয়্যার ও (ii) এপ্লিকেশন সফটওয়্যার।

০২. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে Sea level rise হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় কারণ বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি। যার ফলে আবহাওয়া পরিবর্তিত হয়েছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে (Sea level rise) এবং বিশ্ব প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো– বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার প্রধান কারণ গ্রিন হাউস ইফেক্ট। কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও অন্যান্য কিছু গ্যাস গ্রিন হাউস সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ৪৯%, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ১৪%, মিথেন ১৮%, নাইট্রাস অক্সাইড ৬% ও অন্যান্য গ্যাস ১৩% ক্ষতি করে।

০৩. যে যন্ত্র দুর্বল সংকেতকে সবল সংকেতে পরিণত করে, তার নাম কি?

উত্তর : যে যন্ত্র দুর্বল সংকেতকে সবল সংকেতে পরিণত করে, তার নাম হলো– অ্যামপ্লিফায়ার। অ্যামপ্লিফায়ার অর্থ বিবর্ধক। এটি ইনপুটে প্রদত্ত সিগন্যালকে বিবর্ধিত করে। সুতরাং অ্যামপ্লিফায়ার হলো– এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যা তার ইনপুটে প্রদত্ত সিগন্যালকে বিবর্ধিত করে। এসময় সিগন্যালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। অ্যামপ্লিফায়ারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনটি- গেইন, ব্যান্ড উইথ ও ডিস্টরশন।

০৪. শরীরের কোন অংশে ইনসুলিন প্রস্তুত হয় এবং কিসের অভাবে ডায়াবেটিস হয়?

উত্তর : মানবদেহের অগ্ন্যাশয় রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহানস নামক বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন হরমোন প্রস্তুত হয়, যা রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। ডায়াবেটিস হলো– ইনসুলিন হরমোনের অভাবজনিত রোগ। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত শর্করা বা গ্লুকোজ প্রস্রাবের সাথে নির্গত হওয়ার দরুন যে রোগ হয় তাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস বলে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) ২০১৪

০১. যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন :

ক. 3G-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Third Generation.

খ. মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত?

উত্তর : ৯৮.৪°F বা ৩৬.৯°C.

গ. পেন্সিলের সীসে প্রধানত কি থাকে?

উত্তর : গ্রাফাইট।

ঘ. সহজে সর্দিকাশি হয় কোন ভিটামিনের অভাবে?

উত্তর : ভিটামিন সি-এর অভাবে।

ঙ. মানুষের হৃৎপিণ্ডে কতটি প্রকোষ্ঠ থাকে?

উত্তর : মানুষের হৃৎপিণ্ড চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট।

চ. ইন্টারনেট ব্রাউজার কি?

উত্তর : এক প্রকার অ্যাপলিকেশন সফটওয়্যার।

ছ. ভিটামিন 'এ'-এর অপর নাম কি?

উত্তর : রেটিনল।

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. ক. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর সাধারণত কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতর নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। তবে নাইট্রোজেন অপেক্ষা আর্গন অনেক বেশি নিষ্ক্রিয় এবং এর বিদ্যুৎ পরিবহন ক্ষমতাও কম। এ কারণে বৈদ্যুতিক বাল্বে নাইট্রোজেনের পরিবর্তে বর্তমানে আর্গন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

খ. রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে শরীরে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় যা কিটোসিস রোগের সৃষ্টি করে। এর ফলে দেহের ওজন কমতে থাকে, ক্ষুধা বেড়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়।

গ. রঙিন টেলিভিশনে কোন কোন মৌলিক রং ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : রঙিন টেলিভিশনে তিনটি মৌলিক রং ব্যবহৃত হয়। রংগুলো হলো– লাল, নীল এবং সবুজ। রঙিন টেলিভিশনের পর্দা তৈরি হয় তিন রকম ফসফর দানা দিয়ে। ফলে এসব মৌলিক রঙের মিশ্রণে টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে ওঠে রঙিন ছবির বিভিন্ন রং।

ঘ. পৃথিবী ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কেন? সূত্রটির আবিষ্কারক কে?

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে অভিকর্ষ বা মাধ্যাকর্ষণ বলে। এই মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্যই পৃথিবীর ঘূর্ণন সত্ত্বেও আমরা পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ছিটকে পড়ি না বরং প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সাথে আবর্তিত হচ্ছি। অভিকর্ষও এক ধরনের মহাকর্ষ। আকর্ষণ বল সম্পর্কিত সূত্রটির আবিষ্কারক বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন। যা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র নামে পরিচিত।

ঙ. ইউরিয়া সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কত? আমাদের দেশে ইউরিয়া সারের কাঁচামাল কি?

উত্তর : ইউরিয়া সারে নাইট্রোজেনের পরিমাণ শতকরা ৪৬ ভাগ। আমাদের দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় মিথেন গ্যাস। এছাড়া অন্যান্য প্রাকৃতিক গ্যাসও ব্যবহৃত হয়।

চ. ভিটামিন কে আবিষ্কার করেন? পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কোনগুলো?

উত্তর : ভিটামিন আবিষ্কার করেন যুক্তরাজ্যের নাগরিক স্যার ফ্রেডরিক গোল্যান্ড হপকিনস। পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো- ভিটামিন বি এবং ভিটামিন সি। এরা তেলে অদ্রবণীয়।

ছ. হ্যালির ধূমকেতু কত বছর পর পর দেখা যায়? সর্বশেষ এ ধূমকেতু কবে দেখা গিয়েছিল?

উত্তর : হ্যালির ধূমকেতু সাধারণত ৭৬ বছর পর পর দেখা যায়। হ্যালির ধূমকেতু সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৮৬ সালে। এটিকে নির্দিষ্ট সময় পরপর আবর্তনশীল ধূমকেতু হিসেবে সর্বপ্রথম সনাক্ত করেন এডমন্ড হ্যালি। তার নাম অনুসারে এর নামকরণ করা হয় হ্যালির ধূমকেতু। এটি ২০৬১ সালে আবার দেখা যাবে।

জ. উচ্চ পর্বতের চূড়ায় উঠলে নাক দিয়ে রক্তপাতের সম্ভাবনা থাকে কেন?

উত্তর : পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে যত উপরে উঠা যায় তত বায়ুর চাপ কমতে থাকে। কাজেই উপরে উঠলে দেহের ভেতরের চাপ বাইরের চাপ অপেক্ষা অধিক হলে দেহের রক্তনালীতে প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এ চাপে নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসে। এজন্য পর্বত আরোহীকে আঁট-সাট পোশাক পরিধান করতে হয়।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাব-রেজিস্ট্রার ২০১৪

০১. যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখুন :

ক. ই-গভর্নেন্স বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ইলেকট্রনিক গভর্নেন্স-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ই-গভর্নেন্স। ইলেকট্রনিক পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার কর্তৃক জনগণকে দ্রুততম সময়ে সঠিক সেবা ও তথ্য সরবরাহকে ই-গভর্নেন্স বলে। ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এবং মোবাইলের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিককে উত্তম সেবা, ব্যবসা ও শিল্প কারখানার উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ এবং সরকারি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স গড়ে ওঠে। এর প্রধান সুবিধা হলো দুর্নীতিমুক্ত, অধিক স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং অপব্যয়রোধী সরকারি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

খ. বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-এর শতকরা হার কত?

উত্তর : বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন-এর শতকরা হার যথাক্রমে ২০.৭১% এবং ৭৮.০২%।

গ. CFC বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : CFC হলো Chloro Floro Corbon-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি এক প্রকার গ্রিন হাউস গ্যাস। এটি বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরে পৌঁছে ওজোনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওজোনকে ভেঙ্গে অক্সিজেনে পরিণত করে ($CFC + O_3 \rightarrow O_2$ + মুক্ত ক্লোরিন পরমাণু (Cl))। এর ফলে ওজোন স্তরে ফাটল দেখা দেয়। এ ফাটল দিয়ে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি, মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীতে সরাসরি চলে এসে জীবজগতের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

ঘ. কোন কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ ও স্কার্ভি রোগ হয়?

উত্তর : ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা রোগ হয় এবং ভিটামিন 'সি' এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়।

ঙ. 'Theory of Relativity' এর প্রবক্তা কে? তিনি কোন দেশের নাগরিক ছিলেন?

উত্তর : Theory of Relativity-এর প্রবক্তা আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি জন্মসূত্রে জার্মানির নাগরিক ছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিন একাডেমির প্রদর্শক ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. জোয়ারের কত সময় পর ভাটার সৃষ্টি হয়?

উত্তর : কোনো স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার হওয়ার পর প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট সময় অতিক্রম করলে পুনরায় সেখানে মুখ্য জোয়ার সৃষ্টি হয়। আবার কোনো স্থানে একবার মুখ্য জোয়ারের প্রায় ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পরে একবার গৌণ জোয়ার সংঘটিত হয়। জোয়ারের প্রায় ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাঁটা সংঘটিত হয়।

০২. মেঘলা আবহাওয়ায় প্রায়শ গরম বেশি অনুভূত হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : আকাশ পরিষ্কার থাকলে ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ আকাশে উঠে যায়। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ শীতল হয়ে পড়ে। কিন্তু মেঘ তাপ অপরিবাহী এবং তা বিকিরণে বাধা দেয়। তাই আকাশ মেঘলা থাকলে ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপ এর আশে পাশেই থেকে যায়। ফলে ভ্যাপসা গরম লাগে।

০৩. কিসের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়?

উত্তর : প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। সমুদ্রের গভীরতা মাপার জন্য ফ্যাদোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করা হয় এবং এই শব্দ সমুদ্রের গভীরে গিয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে সমুদ্র পৃষ্ঠে ফিরে আসে। আর এ সময়ের পার্থক্য থেকে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়।

০৪. সাধারণ Electric Bulb এর ভিতরে সাধারণত কি গ্যাস ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভেতরে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বাল্বের ভেতরে নাইট্রোজেন গ্যাস থাকার কারণে ফিলামেন্টের তাপমাত্রা ২৭০০°c এর বেশি উঠতে পারে না। ফলে ফিলামেন্ট গলে যায় না। তবে বর্তমানে নাইট্রোজেনের পরিবর্তে আর্গন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। কারণ এর নিষ্ক্রিয়তা বেশি।

০৫. রঙিন টেলিভিশন থেকে ক্ষতিকর কোন রশ্মি বের হয়?

উত্তর : রঙিন টেলিভিশন থেকে এক ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়, যা গামা রশ্মি নামে পরিচিত। তেজস্ক্রিয় আধান নিরপেক্ষ এ রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র, যার ফলে এর ভেদন ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এ রশ্মি মানবদেহে ক্যান্সারসহ বিভিন্ন জটিল রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

০৬. বাকইনুর কসমোড্রম কি? এটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : বিশ্বের প্রথম ও বৃহত্তম মহাকাশ উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের নাম বাইকনুর কসমোড্রম। ১৯৫০ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এটি নির্মাণ করে। বাইকনুর কসমোড্রম রাশিয়ার মস্কো শহর থেকে প্রায় ২১০০ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে কাজাখস্তানের উষ্ণ ধূলিপূর্ণ স্তেপভূমিতে স্থাপিত। কাজাখস্তানে অবস্থিত হলেও এটি নিয়ন্ত্রণ করে রাশিয়া।

০৭. Software বলতে কি বুঝায়? Computer এর আবিষ্কারক কে?

উত্তর : সফটওয়্যার বলতে বুঝায় কোনো নির্দিষ্ট কম্পিউটারের সকল ধরনের প্রোগ্রাম। এটি কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে। কম্পিউটারের আবিষ্কারক হাওয়ার্ড এইকিন। তবে কম্পিউটারের জনক বলা হয় চার্লস ব্যাবেজকে।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি কোন মাধ্যমে?

উত্তর : কঠিন মাধ্যমে শব্দের গতি সবচেয়ে বেশি, তরল মাধ্যমে তার চেয়ে ধীর। বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের দ্রুতি (গতি) সবচেয়ে কম আর ভ্যাকিউয়ামে বা শূন্যে শব্দের দ্রুতি (গতি) শূন্য।

০২. বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারীর নাম কি?

উত্তর : বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারীর নাম ইউরি গ্যাগারিন। তিনি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিক ছিলেন। তিনি ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল নভোযান ভস্টক-১-এ করে মহাশূন্যে যান। তিনি মহাকাশে ১০৯ মিনিট ছিলেন।

০৩. মাটির পাত্রে পানি ঠাণ্ডা থাকে কেন?

উত্তর : মাটির পাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। এসব ছিদ্র দিয়ে পানি কলসির উপরিতলে এসে পৌঁছে এবং বাষ্পীভূত হয়। বাষ্পায়নের সময়ে প্রয়োজনীয় সুপ্ততাপ কলসির পানি থেকে গ্রহণ করে। ফলে পানি ঠাণ্ডা থাকে।

০৪. LCD-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : LCD এর পূর্ণরূপ হলো Liquid Crystal Display. উন্নতমানের কম্পিউটারের ডিসপ্লেতে LCD ব্যবহৃত হয়।

০৫. ব্লাড ব্যাংক কাকে বলে?

উত্তর : যে স্থানে ৪° সে.-৬° সে. তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণ করা হয় তাকে ব্লাড ব্যাংক বলে। সংরক্ষিত রক্ত রোগীর প্রয়োজনে শরীরে প্রয়োগ করা হয়।

০৬. মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষ কাকে বলে?

উত্তর : মাধ্যাকর্ষণ : কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে মাধ্যাকর্ষণ বলে।

যেমন— পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল হলো মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ।

মহাকর্ষ : এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুকণার মধ্যকার এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বলে। যেমন— সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে আকর্ষণ বল হলো মহাকর্ষ।

০৭. ভিটামিন 'সি' এর অভাবে কোন রোগ হয়?

উত্তর : ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে মূলত স্কার্ভি রোগ হয়। এছাড়া শিশুদের মাড়ি ফুলে যায়, দেহের ওজন হ্রাস পায়, রক্ত শূন্যতা হয়, দুর্বল লাগে এবং ক্ষত সারতে বা ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে দেরি হয়।

০৮. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য দায়ী কি?

উত্তর : পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মূলত দায়ী কার্বন ডাই-অক্সাইড। এছাড়া অন্যান্য গ্রিন হাউস গ্যাসগুলোও দায়ী। যেমন– মিথেন (CH_4), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC), কার্বন মনোঅক্সাইড (CO) ইত্যাদি।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১. একটি পরমাণু কোন মৌলিক কণাসমূহ দ্বারা গঠিত?

উত্তর : একটি পরমাণু তিনটি মৌলিক কণা দ্বারা গঠিত। যথা– ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন।

০২. HIV-এর পূর্ণরূপ কি? HIV কোন রোগের সৃষ্টি করে?

উত্তর : HIV-এর পূর্ণরূপ হলো– Human Immunodeficiency Virus। HIV এইডস (AIDS) রোগ সৃষ্টি করে।

০৩. মোবাইল টেলিফোনে ব্যবহৃত SIM Card এর SIM এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : মোবাইল টেলিফানে ব্যবহৃত SIM Card এর SIM-এর পূর্ণরূপ হলো– Subscriber Identity Module.

০৪. 'রান্না করার হাড়িপাতিল সাধারণত এলুমিনিয়ামের তৈরি হয়।'- এর প্রধান কারণ কি?

উত্তর : এলুমিনিয়াম একটি তাপ সুপরিবাহী পদার্থ। এলুমিনিয়ামের পাত্রে তাপ প্রয়োগ করলে তা সহজেই সমগ্র পাত্রে ছড়িয়ে যায় এবং দ্রুত খাদ্যবস্তু সিদ্ধ হতে সাহায্য করে। এ কারণে রান্না করার হাড়ি পাতিল সাধারণত এলুমিনিয়ামের তৈরি হয়।

০৫. অগ্ন্যাশয় হতে নির্গত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন কোনটি? এর অভাবে কোন রোগ হয়?

উত্তর : অগ্ন্যাশয় হতে নির্গত চিনির বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন হলো– ইনসুলিন। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়।

০৬. ভূ-গর্ভস্থ কয়লা আহরণে সাধারণত কি কি খনি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে বর্ণনা করুন।

উত্তর : ভূ-গর্ভস্থ কয়লা আহরণে সাধারণত দুটি খনি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যথা–

i. উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা আহরণ

ii. আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিং পদ্ধতিতে আহরণ।

০৭. কচুশাক বিশেষভাবে মূল্যবান যে উপাদানের জন্য তা কোনটি?

উত্তর : কচুশাক বিশেষভাবে মূল্যবান লৌহ উপাদানের জন্য। এছাড়া কচুশাকে ভিটামিন-এ, ক্যালসিয়াম অক্সালেট এবং অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ আছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের সমাজসেবা অফিসার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১. বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে তার আর্দ্রতা বাড়ে না কমে?

উত্তর : বাতাসের তাপমাত্রা হ্রাস পেলে তার আর্দ্রতাও হ্রাস পায়। বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস পেলে বা কম হলে বায়ু শুষ্ক অনুভূত হয়। আপেক্ষিত আর্দ্রতা কম হলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয় এবং বেশি হলে বাষ্পীভবন ধীরে হয়। এজন্য আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়।

০২. মানুষের রক্তের গ্রুপ কয়টি? সর্বজনীন গ্রহীতা ও সর্বজনীন দাতার রক্তের গ্রুপ কি কি?

উত্তর : মানুষের রক্তের গ্রুপ চারটি। যথা : A, B, AB এবং O। সর্বজনীন গ্রহীতা রক্তের গ্রুপ হলো 'AB' এবং সর্বজনীন দাতার রক্তের গ্রুপ হলো 'O'।

০৩. কোন ধরনের প্রাণিগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলা হয়?

উত্তর : সর্বাধিক মিলসম্পন্ন একদল প্রাণী যারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর মিলনের মাধ্যমে উর্বর সন্তান ধারণে সক্ষম কিন্তু অন্য প্রাণির সাথে মিলে সন্তান উৎপাদনে অক্ষম তাদেরকে প্রজাতি (species) বলে। যেমন– মানুষ, গরু, ছাগল, সিংহ, কুমির প্রভৃতি প্রাণিগোষ্ঠী স্বতন্ত্র প্রজাতি হিসেবে নিজেদের মধ্যে বংশবিস্তার করতে সক্ষম।

০৪. মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে কি কি ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর : রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমে গেলে স্নায়ুর কার্যকলাপে বিঘ্নঘটাসহ অজ্ঞান হওয়া, কখনো কখনো মস্তিষ্কের ক্ষতিসাধনের সাথে সাথে মৃত্যু ঘটতে পারে।

০৫. পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ কোনটি?

উত্তর : পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম গ্রহ শুক্র। পৃথিবী থেকে শুক্রের দূরত্ব ৪.৩ কোটি কিমি। শুক্র গ্রহ ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা নামে পরিচিত।

০৬. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরে কোন গ্যাস সাধারণত ব্যবহার করা হয় এবং কেন?

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বের ভিতরে সাধারণত নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহৃত হয়। কারণ নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহারের ফলে ফিলামেন্টের তাপমাত্রা ২৭০০°c এর বেশি উঠতে পারে না। ফলে ফিলামেন্ট গলে যায় না। বাল্বে বিভিন্ন গ্যাস যেমন– নাইট্রোজেন, আর্গন ভরা থাকলে ফিলামেন্টের বাষ্পীভবন কম হয়। এতে বাল্বের স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পায়।

০৭. স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে রক্তের P^H মান কত থাকে?

উত্তর : রক্ত এক ধরনের অস্বচ্ছ, সামান্য ক্ষারীয় আন্তঃকোষীয় তরল যোজক কলা। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহে রক্তের P^H এর মান ৭.২-৭.৪। রক্তের উপাদান দুটি। যথা– রক্তরস (৫৫%) এবং রক্তকণিকা (৪৫%)।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. LASER-এর পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : LASER-এর পূর্ণরূপ = Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.

০২. কোষের 'পাওয়ার হাউজ' কাকে বলা হয়?

উত্তর : মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের 'পাওয়ার হাউজ' বলা হয়।

০৩. উইকিপিডিয়া কি?

উত্তর : উইকিপিডিয়া একটি ওয়েব-ভিত্তিক, বহু-ভাষিক, মুক্ত বিশ্বকোষ। এখন পর্যন্ত ২৫০ টিরও বেশি ভাষায় উইকিপিডিয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

০৪. ক্যান্সার রোগের কারণ কি?

উত্তর : ক্যান্সার রোগের কারণ কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

০৫. কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রোগ্রামসমূহকে কি বলে?

উত্তর : কম্পিউটারে ব্যবহৃত প্রোগ্রামসমূহকে সফটওয়্যার বলে।

জাতীয় মুদ্রণ অধিদপ্তরের প্রেস ম্যানেজার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. WWW এর পূর্ণরূপ কি? Modem কি?

উত্তর : WWW এর পূর্ণরূপ– World Wide Web.

মডেম (Modem) : মডেম হচ্ছে একটি বৈদ্যুতিক ডিভাইস (Device)। নেটওয়ার্কিংয়ে (Networking) তথ্যাবলী আদান-প্রদানের জন্য (Modem) ব্যবহৃত হয়। Modem শব্দটি Modulation শব্দের 'Mo' এবং Demodulation শব্দের 'Dem' নিয়ে গঠিত। সুতরাং যে যন্ত্র কম্পিউটারের ভাষাকে টেলিফোনের ভাষায় এবং টেলিফোনের ভাষাকে কম্পিউটারের ভাষায় রূপান্তরিত করে তাকে Modem বলে।

০২. Internet এর পূর্ণরূপ কি? VIRUS শব্দের পূর্ণরূপ কি?

উত্তর : Internet এর পূর্ণরূপ হলো– Interconnected Network.

এবং VIRUS শব্দের পূর্ণরূপ হলো– Vital Information Resources Under Seize.

০৩. NASA কোথায় অবস্থিত? প্রথম মহিলা নভোচারীর নাম কি?

উত্তর : NASA যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত। NASA-এর পূর্ণরূপ National Aeronautics and Space Administration.

প্রথম মহিলা নভোচারী রাশিয়ার ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা।

০৪. পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র কোনটি? আমাদের সৌরমণ্ডল যে ছায়াপথে অবস্থিত তার নাম কি?

উত্তর : পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রের নাম সূর্য।

আমাদের সৌরমণ্ডল যে ছায়াপথে অবস্থিত তার নাম মিল্কিওয়ে (Milkway)।

০৫. মাদাম কুরি কি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন? ঈশ্বর কণা (God Particle) কি?

উত্তর : মাদাম কুরি পদার্থ (১৯০৩) এবং রসায়ন (১৯১১) বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন।

ঈশ্বর কণা (God Particle) : ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী পিটার হিগস ১৯৬৪ সালে শক্তি হিসেবে এমন একটি কণার ধারণা দেন, যা বস্তুর ভর সৃষ্টি করে। এর ফলে এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। পরবর্তীতে অধরা বিবেচিত হবার কারণে ধীরে ধীরে তা God Particle বা 'ঈশ্বর কণা' হিসেবে পরিচিতি পেতে থাকে।

০৬. চাঁদে এ পর্যন্ত কতজন মানুষ পদার্পণ করেছেন? সূর্যের আলোতে কয়টি রং?

উত্তর : চন্দ্রপৃষ্ঠে এ পর্যন্ত ১২ জন নভোচারী অবতরণ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম অবতরণকারী নীল আর্মস্ট্রং (২০ জুলাই ১৯৬৯, অ্যাপোলো-১১) এবং এখনও পর্যন্ত সর্বশেষ অবতরণকারী ইউজিন কারনান (১১ ডিসেম্বর ১৯৭২, অ্যাপোলো-১৭)। সূর্যের আলোতে ৭টি রং বিদ্যমান। যথা– বেগুনি, নীল, আসমানী, হলুদ, কমলা, সবুজ ও লাল।

০৭. কোন যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ এবং ভূমিকম্প মাপা হয়?

উত্তর : বায়ুর চাপ নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম–ব্যারোমিটার। এবং ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের নাম– সিসমোমিটার।

০৮. খাদ্য লবণের রাসায়নিক নাম কি? শরীরের কোন অঙ্গ ইনসুলিন হরমোন নির্গত করে?

উত্তর : খাদ্য লবণের রাসায়নিক নাম সোডিয়াম ক্লোরাইড (Nacl)। শরীরের অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন হরমোন নির্গত করে।

জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. ইলেকট্রোপ্লেটিং বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কোনো অধিক সক্রিয় ধাতুর উপর কম সক্রিয় উজ্জ্বল ধাতুর প্রলেপ দেয়াকে ইলেকট্রোপ্লেটিং বলা হয়। এ ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ধাতু হিসেবে সাধারণত নিকেল বা ক্রোমিয়াম ধাতু ব্যবহার করা হয়। ইলেকট্রোপ্লেটিং এর ফলে সংশ্লিষ্ট বস্তুটির ঔজ্জ্বল্য, স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। সাধারণত লৌহ নির্মিত বস্তুকে এ প্রক্রিয়ায় মরিচারোধী করে প্রস্তুত করা হয়।

০২. ২০১৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে কে কে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন?

[Note : জ্বালানি সাশ্রয়ী উজ্জ্বল আলো তৈরি করতে পারে এমন নীল LED উদ্ভাবনের জন্য ২০১৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন তিন বিজ্ঞানী। তারা হলেন– ইসামু আকাসাকি (জাপান), হিরোশি আমানো (জাপান), সুজি নাকামুরা (জাপানি বংশোদ্ভূত মার্কিনী)।

০৩. অপটিক্যাল ফাইবার কি?

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার হলো এক ধরনের সূক্ষ্ম কাচতন্তু। এর ভিতরে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। এর এক প্রান্ত দিয়ে আলো প্রবেশ করে বারবার পর্যায়ক্রমে আপতিত ও প্রতিফলিত হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারকে আলোক নল বলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর ব্যবহার রয়েছে।

০৪. পানিকে বিশ্লেষণ করলে কি কি মৌলিক পদার্থ, কি পরিমাণে পাওয়া যায়?

উত্তর : পানিকে বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ করলে তা থেকে দুটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়। যথা– ১. অক্সিজেন ও ২. হাইড্রোজেন। বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী প্রতি ১৮ গ্রাম পানি বিশ্লেষণ করে ১৬ গ্রাম অক্সিজেন ও ২ গ্রাম হাইড্রোজেন পাওয়া যায়। অর্থাৎ পানিতে O_2 ও H_2-এর ভর অনুপাত হলো ৮ : ১।

০৫. হাইপোগ্লাইসেমিয়া কিসের অভাবে হয়? চোখের পানি কোথায় উৎপন্ন হয়?

উত্তর : যখন মানবদেহের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা সাধারণ অবস্থার তুলনায় অনেক কমে যায় তখন চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ঐ অবস্থাকে হাইপোগ্লাইসেমিয়া বলে। দীর্ঘক্ষণ না খেয়ে থাকা ব্যক্তি কিংবা দেহে ইনসুলিনের আধিক্যসহ বহু কারণে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়। চক্ষুলেন্স ও কর্ণিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অ্যাকুয়াস হিউমার বা চোখের পানি উৎপন্ন হয়।

০৬. কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন? বিশ্বের প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রাম রচয়িতা কে?

উত্তর : কম্পিউটার আবিষ্কার করেন– হাওয়ার্ড এইকেন। বিশ্বের প্রথম Computer Programme রচয়িতা হলেন– লেডি অ্যাডা অগাস্টা।

০৭. কম্পিউটার বিষয়ক শব্দ সংক্ষেপ BIOS এবং HTML-এর পূর্ণরূপ লিখুন।

উত্তর : BIOS-এর পূর্ণরূপ হলো–Basic Input Output System ও HTML এর পূর্ণরূপ হলো– Hyper Text Markup Language.

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ইনস্ট্রাক্টর (ননটেক) ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১. Windows NT কী? ইনপুটের কাজ কী?

উত্তর : মাইক্রোসফট কর্পোরেশন Windows Programme-এর Windows 95-তে উত্তরণের আগে ৩২ বিটের একটি operating system বাজারে ছাড়ে। এটি Windows NT নামে পরিচিত। এটি পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য শক্তিশালী অপারেটিং সিস্টেম।

ইনপুট দিয়ে কম্পিউটার সমস্যা সমাধানের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা দেয়া হয়। অর্থাৎ ইনপুট হলো ডেটা বা প্রোগ্রাম গ্রহণকারী অংশ। কী-বোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, OMR, পাঞ্চ কার্ড রিডার ইত্যাদি ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ।

০২. সার্চ ইঞ্জিনের জনক কে? বর্তমানে জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন কী কী?

উত্তর : সার্চ ইঞ্জিনের জনক ল্যারি পেজ ও ব্রিন। বর্তমানে জনপ্রিয় কয়েকটি সার্চ ইঞ্জিন হলো— Google, Yahoo, Altavista, MSN Bing ইত্যাদি।

০৩. কোলেস্টেরল বলতে কী বোঝায়? রক্তে এর মাত্রা বেশি হলে কী হয়?

উত্তর : কোলেস্টেরল এক জাতীয় স্টেরয়েড অ্যালকোহল। এটি পানিতে অদ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় বলে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দলভুক্ত।

রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে তা রক্তনালীর প্রাচীরগাত্রে জমে রক্তনালী সংকুচিত করে এবং রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

০৪. বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দামী বিজ্ঞান পুরস্কারের নাম কী? এই পুরস্কারের প্রবর্তক কারা?

উত্তর : বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে দামী বিজ্ঞান পুরস্কারের নাম 'ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স প্রাইজ'। রাশিয়ার মিলনার ফাউন্ডেশন এ পুরস্কার ঘোষণা করে। ২০১২ সালে এটি প্রথম চালু হয় এবং এ পুরস্কারের অর্থমূল্য ৩০ লাখ ডলার।

০৫. কম্পিউটারের ক্লোন ও কম্পিউটার ভিশন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কম্পিউটারের ক্লোন হলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত কম্পিউটার যার বৈশিষ্ট্য মূল কম্পিউটারের মতো। কম্পিউটার ভিশন হলো কম্পিউটারের কাজের ক্ষেত্র যেখানে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংরক্ষণ, সরবরাহ ইত্যাদির মাধ্যমে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখে।

০৬. ক্লোরেলা কী?

উত্তর : ক্লোরেলা এক প্রকার সবুজ এককোষী শৈবাল। অর্থাৎ ক্লোরেলা ক্লোরোফিলযুক্ত স্বভোজী উদ্ভিদ। ১৭ প্রকার এমাইনো এসিড বিদ্যমান থাকায় ক্লোরেলাকে প্রোটিন খাদ্যের আদর্শ উৎস বলা হয়।

০৭. ভিডিও কনফারেন্সিং কী?

উত্তর : ভিডিও কনফারেন্সিং বলতে বোঝায় কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা, যেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের কথা শোনার পাশাপাশি একে অপরের ছবিও কম্পিউটার মনিটরে দেখতে পারেন। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো– পার্সোনাল কম্পিউটার; ভিডিও ক্যামেরা; মাইক্রোফোন; লাউড স্পীকার এবং লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) অথবা ইন্টারনেট সংযোগ।

জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. ঠাণ্ডা ও গরম পানির মধ্যে কোনটি তাড়াতাড়ি আগুন নেভাতে সাহায্য করবে?

উত্তর : ঠাণ্ডা ও গরম পানির মধ্যে তাড়াতাড়ি আগুন নেভাতে সাহায্য করবে গরম পানি। সাধারণত কোনো কিছুতে আগুন জ্বালানো নির্ভর করে ঐ স্থানের অক্সিজেনের আধিক্যের উপর। ঠাণ্ডা পানিতে প্রকৃতপক্ষে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন দ্রবীভূত থাকে। পক্ষান্তরে গরম পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে এবং তা অল্প তাপে বাষ্পে রূপান্তরিত হতে পারে। এভাবে প্রাপ্ত পর্যাপ্ত জলীয় বাষ্প আগুনে অক্সিজেন সরবরাহে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে আগুন তাড়াতাড়ি নেভানো সহজ হয়।

০২. WWW এবং RAM-এর পূর্ণরূপ লিখুন।

উত্তর : WWW-এর পূর্ণরূপ— World Wide Web এবং RAM এর পূর্ণরূপ— Random Access Memory.

০৩. গ্রিনহাউজ এফেক্ট-এর জন্য মূলত কোন কোন গ্যাস দায়ী?

উত্তর : গ্রিনহাউজ এফেক্ট-এর জন্য মূলত দায়ী কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস। গ্রিনহাউজ এফেক্ট বলতে পৃথিবীতে সূর্যরশ্মি থেকে আগত তাপ আটকে পড়ে সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে বোঝায়। যেসব গ্যাস গ্রিনহাউজ এফেক্ট-এর জন্য দায়ী তাদেরকে গ্রিনহাউজ গ্যাস বলে। যেমন— কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), কার্বন মনো-অক্সাইড (CO), সিএফসি (CFC) ইত্যাদি।

০৪. একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির স্বাভাবিক রক্তচাপ কত?

উত্তর : মানবদেহ অসংখ্য শিরা ও ধমনী নিয়ে গঠিত। এই শিরা ও ধমনীর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড সারা শরীরে রক্ত সরবরাহ করে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে ধমনীতে যখন রক্ত প্রবেশ করে তখন ধমনীর গায়ে রক্ত যে চা দেয় তাকে বলা হয় ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ। একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক রক্তের চাপ ১২০/৮০ mm Hg.

০৫. বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি এবং হিটারে কি তার ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি এবং হিটারে সাধারণত উচ্চ রোধক বিশিষ্ট নাইক্রোম তার ব্যবহৃত হয়। উচ্চ রোধকের কারণে তাপমাত্রা প্রচুর বৃদ্ধি পায়, যা বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও হিটারের কর্মক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

০৬. কোন ভিটামিনের অভাবে রাতকানা রোগ হয়?

উত্তর : ভিটামিন 'এ' এর অভাবে রাতকানা বা জেরোপথালমিয়া রোগ হয়। ভিটামিন 'এ' এর বেশি অভাব হলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। রাতকানা রোগ বুঝানোর প্রতীক হলো Xn।

০৭. কোন যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী কোনো বস্তুর উপস্থিতি, দূরত্ব ও দিক নির্ণয় করা হয়। যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাশূন্যের গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি দেখা যায় তাকে নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্র বলে। ১৬১১ সালে ডেনমার্কের বিখ্যাত বিজ্ঞানী কেপলার সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন, যা নভোদূরবীক্ষণ যন্ত্র নামে পরিচিত।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

০১. টেলি মেডিসিন বলতে কি বোঝানো হয়?

উত্তর : টেলিমেডিসিন (Telemedicine) হলো টেলিফোন, ইন্টারনেট বা অন্যান্য নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য বা সেবা প্রদানের আধুনিক পদ্ধতি। জরুরি পরিস্থিতিতে বা দুর্গম এলাকায় টেলিফোন বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সিং (Video conferencing)-এর সাহায্যে সেবা প্রদান করা হয়। দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের টেলিফোন বা ইন্টারনেটে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে আলোচনা করাকেও টেলিমেডিসিন বলা হয়।

০২. 'গতি শক্তি' কি? উদাহরণসহ লিখুন।

উত্তর : কোনো গতিশীল বস্তু তার গতির জন্য কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে গতিশক্তি বলে। কোনো স্থির বস্তুতে বেগের সঞ্চার করা বা গতিশীল বস্তুর বেগ বৃদ্ধি করার অর্থ হচ্ছে বস্তুটিতে ত্বরণ সৃষ্টি করা। আর এর জন্য বল প্রয়োগ করতে হবে। ফলে বস্তুর উপর কাজ করা হবে। এতে বস্তুটি কাজ করার সামর্থ্য লাভ করবে এবং এই কাজ বস্তুতে গতিশক্তি হিসেবে জমা থাকবে। সে কারণে সকল সচল বস্তুই গতিশক্তির অধিকারী। বস্তু স্থিতিতে আসার পূর্বে এই পরিমাণ কাজ সম্পন্ন করতে পারে। ঢিল ছুড়ে আম বা বরই পাড়ার সময় ঢিলের গতিসম্পন্ন আম বা বরইকে বৃন্তচ্যুত করে দূরে ফেলে দেয়।

০৩. ভিনেগার কি?

উত্তর : এসিটিক এসিডের ৪%-৮% জলীয় দ্রবণই ভিনেগার নামে পরিচিত। পুরনো মদে এবং কতগুলো ফলের মধ্যকার উদ্ভিজ্জ তেলে এসিটিক এসিড পাওয়া যায়। এছাড়া 'ব্যাকটেরিয়াম এসেটি' নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা ইথাইল অ্যালকোহল জারিত হয়ে ভিনেগার উৎপন্ন হয়।

০৪. রাতকানা রোগ কি কারণে হয়?

উত্তর : ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। ভিটামিন 'এ' জাতীয় খাদ্য কম গ্রহণ করলে শরীরে সুষম পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। ভিটামিন 'এ'-এর অধিক অভাবজনিত কারণে অন্ধত্বও হতে পারে।

০৫. কোল্ড চেইন কি সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : কোল্ড চেইন একটি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত সাপ্লাই চেইন। এটি প্রদত্ত তাপমাত্রার পরীক্ষা বজায় রাখে যা স্টোরেজ ও বিতরণের কার্যক্রমের নিরবচ্ছিন্ন সিরিজ হিসেবে কাজ করে। এটি তাজা কৃষিপণ্য উৎপাদন, সীফুড, হিমায়িত খাদ্য, ফটোগ্রাফিক ফিল্ম, কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল দ্রব্যসমূহ পরিবহনের সময় শীতলীকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

০৬. ইনকিউবেটর কি?

উত্তর : ইনকিউবেটর হচ্ছে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত ব্যবস্থা। বড় বড় মুরগির খামারে ইনকিউবেটরের সাহায্যে ডিম ফুটানো হয়।

০৭. কম্পিউটারের ভাষা কি?

উত্তর : কম্পিউটারের ভাষা বাইনারি। বাইনারি পদ্ধতির মৌলিক অংশ দুটি। যথা– শূন্য (০) এবং এক (১)।

রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বাংলাদেশের রেলওয়ের উপ-সহকারী ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. বায়ুমণ্ডলের দুটি স্তর-এর নাম লিখুন।

উত্তর : বায়ু মণ্ডলের দুটি স্তরের নাম– ট্রপোমণ্ডল ও স্ট্রাটোমণ্ডল।

০২. Renewable energy বা নবায়নযোগ্য জ্বালানি কী?

উত্তর : যেসব জ্বালানি নানা প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায়, যেগুলোর মজুদ ভবিষ্যতে কখনো শেষ হবে না অর্থাৎ বারবার ব্যবহার করা যায় তাদেরকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা Renewable Energy বলে। যেমন— সৌরশক্তি, পরমাণুশক্তি ইত্যাদি।

০৩. 1 Kwatt/hour বিদ্যুৎ বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : বিদ্যুৎ শক্তির বাণিজ্যিক বা ব্যবহারিক একক হলো কিলোওয়াট/ঘণ্টা। এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্রে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় বা ব্যয় হয় তাকে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা বলে।

০৪. কোষ বা cell-এর পাওয়ার হাউজ কাকে বলে?

উত্তর : মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষ বা Cell-এর পাওয়ার হাউজ বলা হয়।

০৫. RAM ও ROM-এর পূর্ণরূপ লিখুন।

উত্তর : RAM-এর পূর্ণরূপ— Random Access Memory.
ROM- এর পূর্ণরূপ— Read Only Memory.

০৬. মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থির নাম কি? মানুষের খাটো বা লম্বা হওয়া কোন গ্রন্থির উপর নির্ভর করে?

উত্তর : মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থির নাম হলো যকৃত (Liver), মানুষের খাটো বা লম্বা হওয়া নির্ভর করে পিটুইটারি গ্রন্থির উপর।

তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সহ. প্রকৌশলী/তদন্ত কর্মকর্তা/আইন কর্মকর্তা ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. AIDS-এর পূর্ণরূপ কি? এ রোগের উপসর্গ ও প্রতিকার সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : AIDS এর পূর্ণরূপ হলো– Acquired Immune Deficiency Syndrome.

এ রোগের উপসর্গ নিম্নরূপ :

১. শরীরের ওজন দ্রুত কমে যাওয়া।

২. অজানা কারণে দুই মাসেরও অধিক সময় ধরে জ্বর থাকা।

৩. দীর্ঘদিন ধরে শুকনা কাশি থাকা।
৪. শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দেয়া।
৫. লসিকা গ্রন্থি (lymph Gland) ফুলে যাওয়া।

AIDS এর প্রতিকার : এইডস-এর এখনও পর্যন্ত কোনো চিকিৎসা নেই। তাই এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় দৈনন্দিন জীবনে সতর্কতা অবলম্বন করা। যেমন–

১. আমাদের সকল আচরণে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
২. রক্ত গ্রহণের পূর্বে রক্তদাতার রক্তে HIV আছে কিনা তা পরীক্ষা করে নেওয়া।
৩. রক্তদানের সময় নতুন সুচ ও সিরিঞ্জ ব্যবহার করা।
৪. নারী ও পুরুষের মধ্যে দৈহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বৈধতা, বিশ্বস্ততা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

০২. সিএনজি'র পূর্ণরূপ কি? এটি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : সিএনজি'র পূর্ণরূপ হলো— কমপ্রেসড ন্যাচারাল গ্যাস। উচ্চ চাপে প্রাকৃতিক গ্যাসকে তরলে রূপান্তরিত করে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের জ্বালানি থেকে অব্যবহৃত কার্বন কম নির্গত হয় বলে এটি পরিবেশ বান্ধব।

০৩. এক্স-রে বলতে কি বুঝেন? এক্স-রে ও গামা রে কোনটির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি?

উত্তর : দ্রুতগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতুকে আঘাত করলে তা থেকে যে অতিক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের (10^{-8}m থেকে 10^{-11}m) এবং উচ্চ ভেদন ক্ষমতা সম্পন্ন একপ্রকার বিকিরণ উৎপন্ন হয় তাকে এক্স-রে (X-ray) বলে।

এক্স-রে ও গামা রে-এর মধ্যে এক্স-রে-এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি। গামা রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র, তাই শক্তি অনেক বেশি।

০৪. পৃথিবী ও চাঁদে একটি বস্তুর ওজনে পার্থক্য হবে কিনা কারণসহ সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ওজন হলো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল। স্থানভেদে বস্তুর ওজন পরিবর্তিত হয়। সুতরাং পৃথিবী ও চাঁদে অবস্থানরত একটি বস্তুর ওজনে অবশ্যই পার্থক্য হবে। কারণ বস্তুর ওজন হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করে অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর। আমরা জানি, ওজন (W) = ভর (m) × অভিকর্ষজ ত্বরণ (g)। আবার ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে যাওয়া যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ততই কমতে থাকে। চাঁদে কোনো বস্তুর ওজন পৃথিবীতে ঐ বস্তুর ওজনের ৬ ভাগের ১ ভাগ মাত্র।

০৫. ডায়াবেটিস কি? মানবদেহের কোন অঙ্গ রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর : ডায়াবেটিস হলো ইনসুলিন হরমোনের অভাবজনিত রোগ। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা স্থায়ীভাবে বেড়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত শর্করা বা গ্লুকোজ প্রস্রাবের সাথে নির্গত হওয়ার দরুণ যে রোগ হয় তাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস বলে।

মানবদেহের অগ্ন্যাশয় রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে। অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহানস নামক বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন হরমোন নির্গত হয় যা রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

০৬. মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা কত? এটি পরিমাপের কি কি স্কেল রয়েছে?

উত্তর : মানবদেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বা উষ্ণতা হলো– 98.4°F বা 36.9°C।

মানবদেহের তাপমাত্রা পরিমাপে দুই ধরনের স্কেল ব্যবহৃত হয়। যথা– সেন্টিগ্রেড স্কেল এবং ফারেনহাইট স্কেল। ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটারে দাগ কাটা থাকে 95°F – 110°F পর্যন্ত।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের রিসার্চ অফিসার ২০১৪

(যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন)

০১. ক. থ্রিজি প্রযুক্তি কি? প্রযুক্তিতে তথ্য আদান-প্রদানের হার কত? বাংলাদেশে প্রথম থ্রিজি সুবিধা চালু করে কোন মোবাইল সংস্থা?

উত্তর : থ্রিজি হলো Third Generation বা তৃতীয় প্রজন্মের মোবাইল ফোন প্রযুক্তি। এ প্রযুক্তির সাহায্যে মোবাইল হ্যান্ডসেটের (থ্রিজি সাপোর্টেড) মাধ্যমে ভয়েস সুবিধার পাশাপাশি টেলিভিশন দেখা, ভিডিও কনফারেন্সে দ্রুত গতির ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়। থ্রিজি প্রযুক্তিতে তথ্য আদান-প্রদানের গতি সেকেন্ডে ৪০ মেগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশে প্রথম থ্রিজি সুবিধা চালু করে রাষ্ট্রীয় টেলিযোগাযোগ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান টেলিটক।

খ. সর্বজনীন দাতার রক্ত গ্রুপ কোনটি? এবং কেন?

উত্তর : সর্বজনীন দাতার রক্তের গ্রুপ হলো 'O'। 'O' গ্রুপধারী ব্যক্তি অন্যসব গ্রুপকে রক্ত দান করতে পারে বলে একে সর্বজনীন দাতা গ্রুপ বলা হয়।

গ. বায়োগ্যাসের প্রধান কাঁচামাল কি কি? এবং তাদের অনুপাত কত?

উত্তর : বায়োগ্যাসের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে গরু, মহিষ, হাঁস-মুরগি, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির মলমূত্র, আবর্জনা, কচুরিপানা বা জলজ উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
কাঁচামাল হিসেবে পরিষ্কার পানি ও গোবর ১ ঃ ১ অনুপাতে মেশাতে হয়।

ঘ. সুপার কম্পিউটার কি? এবং এর উদ্ভাবক কে?

উত্তর : অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতিতে কাজ করতে সক্ষম কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জঙ্গী বিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, মহাকাশ গবেষণা ইত্যাদি কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। কয়েকটি সুপার কম্পিউটারের উদাহরণ হলো– CRAY-1, CRAY X–MP, CYBER–205. সুপার কম্পিউটারের উদ্ভাবক সাইমুর ক্রে (Seymour Cray)।

ঙ. আকাশে বিজলী চমকায় কেন?

উত্তর : মেঘ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণার সমষ্টি। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (ধনাত্মক ও ঋণাত্মক) থাকে। এসব আয়নের উপর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানিকণার সৃষ্টি করলে মেঘ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান লাভ করে। এরূপ বিপরীতধর্মী দুটি মেঘ কাছাকাছি আসলে আকর্ষণের ফলে চার্জ এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে দ্রুত ছুটে যায়। ফলে ইলেক্ট্রনের (চার্জ) গতিপথে যে তীব্র আলোক উৎপন্ন হয় তাকে বিজলী চমকানো বলে।

চ. বাতাসের প্রধান উপাদানগুলো কি?

উত্তর : বাতাসের প্রধান উপাদানগুলো হলো– নাইট্রোজেন (৭৮.০২%), অক্সিজেন (২০.৭১%), আর্গন (০.৮০%), জলীয় বাষ্প (০.৪১%), কার্বন ডাই অক্সাইড (০.০৩%), ওজোন গ্যাস (০.০০১%), মিথেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি।

ছ. আলোর গতি কত? সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌছাতে কত সময় লাগে?

উত্তর : আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

জ. ফেসবুক এবং উইন্ডোজ প্রোগ্রামের জনক কে কে?

উত্তর : ফেসবুকের জনক মার্ক জুকারবার্গ। উইন্ডোজ প্রোগ্রামের জনক বিল রোল্যান্ড হ্যানসন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সাইফার অফিসার ২০১৪

০১. যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে : ২ × ৫=১০

ক. বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ল্যাপটপের নাম কি? এর প্রস্তুতকারক কে?

উত্তর : বাংলাদেশের তৈরি প্রথম ল্যাপটপের নাম দোয়েল। দোয়েলের প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান টেশিস (TSS)।

খ. নিপাহ কি এবং এর প্রধান বাহক কে?

উত্তর : নিপাহ এক ধরনের RNA ভাইরাস যা প্রাণীর মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। নিপাহ ভাইরাসের প্রধান বাহক বাদুড়।

গ. বিলিরুবিন বেশি হওয়া কোন রোগের লক্ষণ?

উত্তর : বিলিরুবিনের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হওয়া জন্ডিস বা পাণ্ডু রোগের লক্ষণ। মানুষের রক্তে বিলিরুবিনের স্বাভাবিক মাত্রা ০.২-০.৮ মি.গ্রাম/ডেসিলিটার।

ঘ. দুটি বারমাসী সবজির নাম লিখুন।

উত্তর : দুটি বারমাসী সবজি– পেঁপে, কলা।

ঙ. সবচেয়ে হালকা গ্যাস কি? বায়োগ্যাসে শতকরা কত ভাগ মিথেন আছে?

উত্তর : সবচেয়ে হালকা গ্যাস হাইড্রোজেন। বায়োগ্যাসে শতকরা ৬০-৭০ ভাগ মিথেন (CH_4) থাকে।

চ. CPU এবং RAM কি?

উত্তর : CPU– কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট (Central Processing Unit)। সিপিইউ হচ্ছে কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। মানুষের মস্তিষ্ক যেমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করে, সিপিইউ তেমনি কম্পিউটারের যাবতীয় কার্যক্রমসহ স্মৃতিভাণ্ডার, ইনপুট ডিভাইস, আউটপুট ডিভাইসসহ যাবতীয় সরঞ্জামকে নিয়ন্ত্রণ করে।

RAM– কম্পিউটারের অস্থায়ী স্মৃতিকে Random Access Memory বা RAM বলে। কম্পিউটারে কাজ করার সময় কাজগুলো কম্পিউটারে জমা থাকে। তবে তথ্যগুলো Save করে নিলে আর নষ্ট হয় না।

ছ. লেবু এবং তেঁতুলে কি এসিড পাওয়া যায়?

উত্তর : লেবুতে পাওয়া যায়– সাইট্রিক এসিড এবং তেঁতুলে পাওয়া যায়– টারটারিক এসিড।

জ. ভাইরাস এবং এন্টিভাইরাস কি?

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস : একধরনের ক্ষতিকর প্রোগ্রাম যা কম্পিউটারে গোপনে প্রবেশ করে ব্যবহারকারীর প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম, ফাইল বা উপাত্ত নষ্ট করে তাকে ভাইরাস বলে। যেমন— Win Worm 32, Trozan horse ইত্যাদি।

এন্টি ভাইরাস : এটি একটি প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার ভাইরাসকে চিহ্নিত করে, দূরীভূত করে এবং কম্পিউটার সিস্টেমকে ভাইরাস প্রতিরোধী করে তোলে। যেমন— Norton এন্টি ভাইরাস।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী থানা/উপজেলা শিক্ষা অফিসার ২০১৩

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান : ২ × ৫ = ১০

০১. আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে প্রথমে আলো দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর : মেঘে মেঘে সংঘর্ষের ফলে আকাশে বিদ্যুতের ঝলক এবং শব্দ একই সাথে উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ ঝলকের গতিবেগ আলোর গতির সমান এবং সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার। অপরদিকে, শব্দের বেগ অনেক কম এবং 0°C তাপমাত্রায় প্রতি সেকেন্ডে 332 মিটার। উভয় গতিবেগের ও বিশাল ব্যবধানের কারণে বিদ্যুতের ঝলকের (চমকানোর) তুলনায় শব্দ আমাদের নিকট পৌঁছাতে বেশি সময় লাগে। এজন্য আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে প্রথমে আলো দেখা যায় এবং পরে শব্দ শোনা যায়।

০২. সূর্য থেকে পৃথিবীতে কোন প্রক্রিয়ায় তাপ আসে?

উত্তর : সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ আকারে তাপ আসে। এ প্রক্রিয়ার জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না।

০৩. শীতকালে ভিজা কাপড় দ্রুত শুকায় কেন?

উত্তর : শীতকালে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। তাছাড়া শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে। এ কারণে ভিজা কাপড়ের পানি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয়। আর তাই শীতকালে ভিজা কাপড় দ্রুত শুকায়।

০৪. পদার্থ কয় অবস্থায় থাকতে পারে এবং কি কি?

উত্তর : পদার্থ তিন অবস্থায় থাকতে পারে। এগুলো হলো কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থা।

০৫. ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কি?

উত্তর : ভূমিকম্প নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ (Seismograph)।

০৬. কম্পিউটার ভাইরাস কি?

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস এক ধরনের প্রোগ্রাম। সাধারণত ইন্টারনেট বা ডিস্কের মাধ্যমে এগুলো কম্পিউটারে প্রবেশ করে এবং কম্পিউটারে সংরক্ষিত সমস্ত প্রোগ্রাম নিজের আয়ত্তে এনে ধ্বংস করে দেয়। কিছু দুষ্ট লোক এ ধরনের প্রোগ্রাম সৃষ্টি করে ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের ক্ষতি করে।

০৭. মৃদু পানি ও খর পানি কাকে বলে?

উত্তর : মৃদু পানি : যে পানি সাবানের সাথে সহজেই ফেনা উৎপন্ন করে তাকে মৃদু পানি বলে। যেমন– বৃষ্টির পানি, পাতিত পানি ইত্যাদি।

খর পানি : যে পানি সাবানের সাথে সহজেই ফেনা উৎপন্ন করে না কিন্তু যথেষ্ট সাবান খরচ করার পর ফেনা উৎপন্ন করা হয় তাকে খর পানি বলে। যেমন– সমুদ্রের পানি, নদীর পানি, ঝরনার পানি, গভীর নলকূপের পানি ইত্যাদি।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা ২০১৩

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান : ২ × ৫ = ১০

০১. সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?

উত্তর : সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

০২. কোন প্রাণী চোখ খুলে ঘুমায়?
উত্তর : মাছ চোখ খুলে ঘুমায়।

০৩. মানবদেহে রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে কে?
উত্তর : হিমোগ্লোবিন মানবদেহে রক্তের গ্লুকোজ নিয়ন্ত্রণ করে।

০৪. CNG-এর পূর্ণ ইংরেজি রূপ কি?
উত্তর : CNG-এর পূর্ণ রূপ হলো– Compressed Natural Gas.

০৫. নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে কোন সার প্রস্তুত হয়?
উত্তর : নাইট্রোজেন গ্যাস থেকে ইউরিয়া সার প্রস্তুত হয়।

০৬. কোন তরল পদার্থ সবচেয়ে বেশি ভারী?
উত্তর : তরল পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে ভারী হলো পারদ।

শ্রম পরিদপ্তরের সহকারী শ্রম পরিচালক ২০১৩

যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিন; মান : ১ × ৫ = ৫

০১. ইনকিউবেটর কী?
উত্তর : ইনকিউবেটর হচ্ছে ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদনের সবচেয়ে আধুনিক ও উন্নত ব্যবস্থা। বড় বড় মুরগির খামারে ইনকিউবেটরের সাহায্যে ডিম ফুটানো হয়।

০২. ইন্টারনেট (অন্তর্জাল) এর জনক কে?
উত্তর : ইন্টারনেটের জনক হিসেবে পরিচিত ভিনটন জি কার্ফ।

০৩. আলোর গতিবেগ কত?
উত্তর : আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল।

০৪. 'রোবট' বলতে কী বোঝায়?
উত্তর : 'রোবট' (Robot) একটি যান্ত্রিক কিংবা কাল্পনিক, কৃত্রিম কার্যসম্পাদক। রোবট সাধারণত একটি ইলেক্ট্রো যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার কাজকর্ম, অবয়ব ও চলাফেরা দেখে মনে হয় এটি স্বেচ্ছায় কাজ করছে।

০৫. www-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : WWW-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে World Wide Web.

০৬. হ্যালির ধূমকেতু কত সালে দৃশ্যমান হবে?
উত্তর : হ্যালির ধূমকেতু ৭৫-৭৬ বছর পর পর দেখা যায়। সর্বশেষ দেখা গেছে ৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। তাই আবার দেখা যাবে ২০৬১ সালে।

০৭. AIDS-এর পূর্ণরূপ কী?
উত্তর : AIDS-এর পূর্ণরূপ হলো : Acquired Immune Deficiency Syndrome.

৩৫ তম বিসিএস

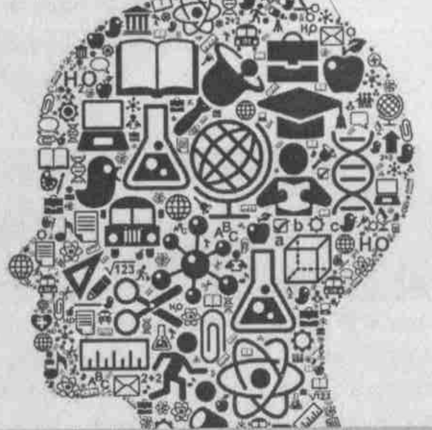

পার্ট A

সাধারণ বিজ্ঞান

মান-৬০

অধ্যায় ০১ ‖ আলোকবিজ্ঞান (Light)
অধ্যায় ০২ ‖ শব্দবিজ্ঞান (Sound)
অধ্যায় ০৩ ‖ চৌম্বক বিদ্যা (Magnetism)
অধ্যায় ০৪ ‖ এসিড, ক্ষার ও লবণ (Acid, Base and Salt)
অধ্যায় ০৫ ‖ পানি (Water)
অধ্যায় ০৬ ‖ আমাদের সম্পদ (Our resources)
অধ্যায় ০৭ ‖ পলিমার (Polymer)
অধ্যায় ০৮ ‖ বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)
অধ্যায় ০৯ ‖ খাদ্য ও পুষ্টি (Food and Nutrition)
অধ্যায় ১০ ‖ জৈব প্রযুক্তি (Biotechnology)
অধ্যায় ১১ ‖ রোগ-ব্যাধি ও স্বাস্থ্য (Disease and Healthcare)

অধ্যায়
০১

আলোকবিজ্ঞান
Light

*Syllabus— **Light** : Nature, Spectrum, Different colours and wavelengths, UV, IR and LASER, Reflection of Light, Refraction of Light, Total Internal Reflection of Light, Lenses, Thin converging lens, Dispersion of light, particle nature of light, Einstein's photoelectric equation, photocells.*

ক প্রকৃতি, বর্ণালী, বিভিন্ন রং ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অতিবেগুনী রশ্মি, অবলোহিত রশ্মি এবং লেজার
Nature, Spectrum, Different Colours and Wavelengths, UV, IR & LASER

প্রশ্ন-১. আলো কি? আলো কিভাবে উৎপন্ন হয়?

উত্তর : আলো : আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।
আলোর উৎপত্তি : যে কোনো পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের বিভিন্ন শক্তিস্তরে অবস্থান করে। এ পরমাণুতে যখন তাপশক্তি বা অন্য কোনো শক্তি সরবরাহ করা হয়, তখন ইলেকট্রনগুলো এক শক্তিস্তরে থেকে অন্য শক্তিস্তরে লাফিয়ে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে ইলেকট্রনগুলো আবার নিজ নিজ শক্তিস্তরে ফিরে আসে, তখন ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আলোকশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। এভাবেই সকল প্রকার আলোকের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-২. আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত মাইল?

উত্তর : শূন্য মাধ্যমে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার।

প্রশ্ন-৩. আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব কি?

উত্তর : ১৬৭৮ সালে হাইগেন সর্বপ্রথম আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্বমতে, আলো ইথার নামে এক কাল্পনিক মাধ্যমের ভিতর দিয়ে তরঙ্গ আকারে $3 \times 10^8 ms^{-1}$ বেগে সঞ্চালিত হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব কম এবং নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ নির্দিষ্ট বর্ণের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-৪. কোয়ান্টাম তত্ত্ব কি?

উত্তর : সর্বপ্রথম ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রদান করেন। এ তত্ত্বানুসারে আলোকরশ্মি কোনো উৎস থেকে অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের আকারে না বেরিয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির গুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এ সর্বনিম্ন মানের শক্তিসম্পন্ন কণিকাকে কোয়ান্টাম বা ফোটন বলে।

প্রশ্ন-৫. আলোর তড়িৎ চৌম্বক তত্ত্ব কি?

উত্তর : আলোর তড়িৎ চৌম্বক : ১৮৬৪ সালে ম্যাক্সওয়েল আলোর তাড়িত চৌম্বক তত্ত্বের অবতারণা করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে যখন গতিশীল চৌম্বক ও তড়িৎ ক্ষেত্রের দ্রুত পর্যাবৃত্ত পরিবর্তন ঘটে তখন দৃশ্য ও অদৃশ্য বিকিরণের উদ্ভব হয় যা তরঙ্গ আকারে $3 \times 108\ ms^{-1}$ বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এটি অনুপ্রস্থ তরঙ্গ এবং সঞ্চালনের জন্য ইথারের কল্পনা প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন-৬. আলোকরশ্মি ও আলোক রশ্মিগুচ্ছ কি? আলোক রশ্মিগুচ্ছ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : আলোকরশ্মি : কোনো দীপ্তিমান বস্তুর কোনো বিন্দু থেকে আলো যে কোনো দিকে যে ঋজু পথ ধরে চলে, সে পথকেই আলোকরশ্মি বলে।

আলোক রশ্মিগুচ্ছ : পাশাপাশি কতগুলো আলোকরশ্মির সমষ্টিকে রশ্মিগুচ্ছ বলে। আলোক রশ্মিগুচ্ছ তিন প্রকার। যথা : ক. সমান্তরাল; খ. অভিসারী ও গ. অপসারী।

সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ : কতগুলো সমান্তরাল আলোকরশ্মি নিয়ে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ তৈরি হয়।

অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ : আলোক রশ্মিগুলো যদি কোনো এক বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে সে রশ্মিগুচ্ছকে অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে।

অপসারী রশ্মিগুচ্ছ : কোনো বিন্দু থেকে উৎপন্ন আলোক রশ্মিগুলো যদি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তাকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে।

প্রশ্ন-৭. ফোটন কি?

উত্তর : কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে আলোকরশ্মি কোনো উৎস থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয়। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এ সর্বনিম্ন মানের শক্তিসম্পন্ন কণিকাকে ফোটন বলে।

প্রশ্ন-৮. আলবার্ট আইনস্টাইনকে কোন সালে কিসের জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়?

উত্তর : আলবার্ট আইনস্টাইনকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়। কোনো কোনো ধাতুর উপর আলো পড়লে তাৎক্ষণিকভাবে ইলেকট্রন নির্গত হয়। একে আলোক তড়িৎ ক্রিয়া বলে। আলোর তরঙ্গ ধর্মের সাহায্যে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায় না। ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইন আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দেন, সেজন্য তাকে ১৯২১ সালে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রশ্ন-৯. ঘনকোণ কাকে বলে? এর একক কি?

উত্তর : কোনো তলের সীমারেখার বিভিন্ন বিন্দু থেকে যদি অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু পর্যন্ত সরলরেখা আঁকা যায় তাহলে একটি শঙ্কু উৎপন্ন হয়, যার শীর্ষ ঐ বিন্দুতে থাকে। এ শঙ্কুর শীর্ষ বিন্দুতে যে ত্রিমাত্রিক কোণ উৎপন্ন হয় তাকে ঐ তল কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ বলে। সাধারণভাবে সমতলের পরিবর্তে ত্রিমাত্রিক স্থানে যে কোণ হয়, তাকে ঘনকোণ বলে। একে $\Delta\omega$ (ডেল ওমেগা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ব্যাখ্যা : r ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠের ΔA ক্ষেত্রফল কর্তৃক আবদ্ধ ঘনকোণ,

$$\Delta\omega = \frac{\Delta A}{r^2}$$

একক : ঘনকোণের একক হলো স্টেরেডিয়ান (Sr).

প্রশ্ন-১০. 'লুমেন' কি?

উত্তর : এক ক্যান্ডেলা দীপন ক্ষমতার কোনো বিন্দু উৎস থেকে যে পরিমাণ আলোক ফ্লাক্স এক স্টেরেডিয়ান ঘনকোণে নির্গত হয় তাকে এক লুমেন বলে। লুমেন হচ্ছে আলোক ফ্লাক্সের একক।

আমরা জানি, আলোক ফ্লাক্স = দীপন ক্ষমতা × ঘনকোণ

অতএব, আলোক ফ্লাক্সের একক হবে দীপন ক্ষমতা ও ঘনকোণের এককের গুণফল অর্থাৎ

$1\ \ell m = 1\ cd \times 1\ sr = 1\ cd.sr$

প্রশ্ন-১১. আলোক ফ্লাক্স কি? আলোক ফ্লাক্সের একক কি?

উত্তর : আলোক ফ্লাক্স : কোনো দীপ্তিমান বস্তু বা আলোক উৎস থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোকশক্তি নির্গত হয় বা বিকীর্ণ হয় তাকে দীপ্তি বা আলোক প্রবাহ বা আলোক ফ্লাক্স বলে। আলোর ফ্লাক্সকে ϕ (ফাই) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ব্যাখ্যা : কোনো গোলকের কেন্দ্রে স্থাপিত I দীপন ক্ষমতার কোনো বিন্দু উৎস S থেকে গোলকের পৃষ্ঠে ΔA ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত আলোক ফ্লাক্সের পরিমাণ হবে, $\phi = I.\ \frac{\Delta A}{r^2} = I\Delta\omega$,

এখানে, $\Delta\omega$ = ঘনকোণ।

আলোক ফ্লাক্সের একক : আলোক ফ্লাক্সের একক লুমেন বা ℓm.

প্রশ্ন-১২. ক্যান্ডেলা কাকে বলে?

উত্তর : ক্যান্ডেলা : এসআই এককের সাতটি মৌলিক এককের মধ্যে একটি হচ্ছে ক্যান্ডেলা। এটি দীপন ক্ষমতার একক।

101325 প্যাসকেল চাপে প্লাটিনামের হিমাঙ্কে (2042K) কোনো কৃষ্ণবস্তুর পৃষ্ঠের $\frac{1}{600000}$ বর্গমিটার পরিমিত ক্ষেত্রফলের পৃষ্ঠের অভিলম্ব বরাবর দীপন ক্ষমতাকে 1 ক্যান্ডেলা (1cd) বলে।

অথবা, প্লাটিনামের গলনাঙ্কে রক্ষিত একটি আদর্শ কৃষ্ণবস্তুর প্রতি একবর্গ সেন্টিমিটার ক্ষেত্রফল হতে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলো নির্গত হয় তার ৬০ ভাগের ১ ভাগকে ক্যান্ডেলা বলে।

প্রশ্ন-১৩. দীপ্তিমিতি কাকে বলে?

উত্তর : একটি বাতি কি পরিমাণ আলো দেয় বা কোনো পৃষ্ঠে কিভাবে আলো পড়লে সেটি কেমন উজ্জ্বল দেখায় এসব নিয়ে যে আলোচনা হয় তাকে দীপ্তিমিতি (Photometry) বলে।

অথবা, আলোক বিজ্ঞানের যে শাখায় বিভিন্ন আলোক উৎস বা বিভিন্ন আলোকিত তলের ঔজ্জ্বল্যের তুলনা ও আলোকের পরিমাণ সংক্রান্ত বিষয়াদি আলোচনা করা হয় তাকে দীপ্তিমিতি বলে।

প্রশ্ন-১৪. ইথার কি?

উত্তর : ইথার হচ্ছে এক কাল্পনিক মাধ্যম বা একটি অবিচ্ছিন্ন মাধ্যম, যার স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি, কিন্তু ঘনত্ব খুবই কম। এর ভেতর দিয়ে আলো তরঙ্গ আকারে $3 \times 10^8 ms^{-1}$ বেগে সঞ্চালিত হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায় এবং আমাদের চোখে পৌঁছে দর্শনের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-১৫. বর্ণালী কাকে বলে? বর্ণালী উৎপত্তির কারণ কি?

উত্তর : কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলোর বিচ্ছুরণের জন্য মূল রঙগুলোর যে রঙিন পট্টি পাওয়া যায় তাকে বর্ণালী (Spectrum) বলে।

বর্ণালীর উৎপত্তি : আলোকরশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন আলোকরশ্মি বিভেদ তলে বেঁকে যায়। এ বাঁকার পরিমাণ মাধ্যমদ্বয়ের প্রকৃতি ও আলোর রঙের ওপর নির্ভর করে।

একেক বর্ণের আলোর বাঁকার পরিমাণ একেক রকম হওয়ার জন্য প্রিজমের মধ্যে সাদা আলো সাতটি বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয় এবং এ বিশ্লিষ্ট অবস্থায়ই প্রায় প্রিজম থেকে নির্গত হয়। ফলে পর্দার উপর আমরা বর্ণালী দেখতে পাই। ভ্যাকুয়াম বা শূন্য মাধ্যম ব্যতীত অন্য যে কোনো মাধ্যমে একেক বর্ণের আলোর বেগ একেক রকমের হয়। যে কারণে একই মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক ভিন্ন ভিন্ন রঙের জন্য বিভিন্ন হয়। সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন বর্ণের আলোর জন্য মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্কের বিভিন্নতার জন্য বর্ণালী উৎপন্ন হয়।

○ প্রশ্ন-১৬. 'শুদ্ধ বর্ণালী' ও 'অশুদ্ধ বর্ণালী' কাকে বলে? এদের মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : বর্ণালীতে রঙের অবস্থান অনুসারে একে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : শুদ্ধ বর্ণালী (Pure Spectrum) এবং অশুদ্ধ বর্ণালী (Impure Spectrum)।

শুদ্ধ বর্ণালী : যে বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণগুলো প্রত্যেকে নিজ নিজ স্থান অধিকার করে থাকে এবং এক বর্ণের সাথে অপর বর্ণের মিশ্রণ হয় না তাকে শুদ্ধ বর্ণালী বলে।

অশুদ্ধ বর্ণালী : যে বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণগুলো নিজ নিজ স্থান অধিকার করে থাকে না বরং এক বর্ণের সাথে অপর বর্ণ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে তাকে অশুদ্ধ বর্ণালী বলে।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্ণালীর পার্থক্য

শুদ্ধ বর্ণালী	অশুদ্ধ বর্ণালী
১. শুদ্ধ বর্ণালীতে বর্ণগুলো নিজ নিজ স্থান অধিকার করে থাকে।	১. অশুদ্ধ বর্ণালীতে বর্ণগুলো নিজ নিজ স্থান অধিকার করে থাকে না।
২. এক বর্ণের সাথে অপর বর্ণের মিশ্রণ হয় না।	২. এক বর্ণের সাথে অপর বর্ণ মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।
৩. প্রিজমকে মধ্যরশ্মির সাপেক্ষে ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে রাখতে হয়।	৩. প্রিজমটিকে ন্যূনতম বিচ্যুতি অবস্থানে রাখার প্রয়োজন নেই।
৪. প্রিজমের উপর আপতিত রশ্মিগুলোকে সমান্তরাল করতে হয়।	৪. প্রিজমের উপর আপতিত রশ্মিগুলোর সমান্তরাল হওয়ার প্রয়োজন নেই।

○ প্রশ্ন-১৭. উৎস অনুসারে বর্ণালীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি?

উত্তর : বিভিন্ন আলোক উৎস যে বর্ণালী উৎপন্ন করে সেগুলোকে সাধারণভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ক. নিঃসরণ বর্ণালী (Emission Spectra) ও খ. শোষণ বর্ণালী (Absorption Spectra)।

ক. **নিঃসরণ বর্ণালী :** অতি উত্তপ্ত কোনো বস্তু থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মি বিশ্লেষণ করে যে বর্ণালী পাওয়া যায় তাকে নিঃসরণ বর্ণালী বলে। যেমন– বৈদ্যুতিক বাতির ফিলামেন্ট থেকে যে আলো নিঃসৃত হয় তার বর্ণালীকে নিঃসরণ বর্ণালী বলা হয়। নিঃসরণ বর্ণালীকে আবার তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

i. অবিচ্ছিন্ন বর্ণালী (Continuous Spectra)
ii. রেখা বর্ণালী (Line Spectra) ও
iii. পট্টি বা পাড় বর্ণালী (Band Spectra)

খ. **শোষণ বর্ণালী :** কোনো স্বচ্ছ রঙিন বস্তুকে সাদা আলোর গতিপথে রাখলে ঐ বস্তুটি নিজের রঙ ব্যতীত কতগুলো রশ্মি শোষণ করে। এরপর যে বর্ণালী পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, বস্তুটি দ্বারা শোষিত রঙগুলো ঐ বর্ণালীতে অনুপস্থিত। এ ধরনের বর্ণালীকে শোষণ বর্ণালী বলা হয়। এ বর্ণালীকে আবার দু ভাগ ভাগ করা যায়। যথা :

i. কালো রেখা বর্ণালী (Dark Line Spectra) ও
ii. কালো পট্টি বর্ণালী (Dark Band Spectra)

○ প্রশ্ন-১৮. প্রভা (Luminance) কাকে বলে? প্রভা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : এমন কতগুলো বস্তু আছে যেগুলো এক ধরনের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে কিন্তু ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে। এ ঘটনাকে প্রভা বলে। প্রভা সাধারণত তিন প্রকারের। যথা :

১. প্রতিপ্রভা (Flourescence);
২. অনুপ্রভা (Phosphorescence) এবং
৩. তাপাপন (Calorescence)।

○ প্রশ্ন-১৯. 'প্রতিপ্রভা', 'অনুপ্রভা' ও 'তাপাপন' কাকে বলে?

উত্তর : প্রতিপ্রভা : এমন কতগুলো বস্তু আছে যেগুলোর উপর এক বর্ণের আলো পড়লে বস্তুটি ভাস্বর হয় এবং অন্য বর্ণের আলো বিকিরণ করে। একে প্রতিপ্রভা বলে এবং বস্তুগুলোকে প্রতিপ্রভ বস্তু বলে। কুইনাইন, সালফেট, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি প্রতিপ্রভ বস্তুর উদাহরণ। কোনো প্রতিপ্রভ বস্তুর উপর যতক্ষণ আলো ফেলা হয় প্রতিপ্রভাও ততক্ষণ দেখা যায়।

অনুপ্রভা : এমন কতগুলো বস্তু আছে যাদের সাদা আলোয় কিছুক্ষণ উন্মুক্ত রেখে আলো সরিয়ে নিলেও অন্ধকারে কিছুক্ষণ আলো দেয়। একে অনুপ্রভা বলে এবং বস্তুগুলোকে অনুপ্রভ বস্তু বলে। ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড প্রভৃতি অনুপ্রভ বস্তু।

তাপাপন : এটি প্রতিপ্রভার ঠিক বিপরীত ঘটনা। কোনো বস্তু দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করলে তাকে তাপাপন বা ক্যালোরেসেন্স বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অবলোহিত আলো শোষিত হয় এবং দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। কার্বন ডাই-সালফাইডে আয়োডিন দ্রবণ তাপাপন প্রদর্শন করে।

○ প্রশ্ন-২০. বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র কি? এর প্রধান অংশ কয়টি ও কি কি?

উত্তর : বিভিন্ন উৎস হতে নিঃসৃত বর্ণালী পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র (Spectrometer) বলে। একে বর্ণালীমাপক যন্ত্রও বলা হয়।

এ যন্ত্রের প্রধান তিনটি অংশ আছে। যথা :

ক. কলিমেটর (Collimator),
খ. দূরবীক্ষণ (Telescope) এবং
গ. প্রিজম টেবিল (Prism table)।

○ প্রশ্ন-২১. তরঙ্গদৈর্ঘ্য কাকে বলে? সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য কি?

উত্তর : তরঙ্গদৈর্ঘ্য : তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো স্পন্দনশীল বস্তুর একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে, সে সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। একে λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তরঙ্গাস্থিত মাধ্যমের কোনো কণা N সংখ্যক স্পন্দনের সময় S দূরত্ব অতিক্রম করলে $\lambda = \frac{S}{N}$.

সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ হলো গামা রশ্মি এবং সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ হলো বেতার তরঙ্গ।

প্রশ্ন-২২. তাড়িতচৌম্বক বর্ণালী কাকে বলে? এর বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : শক্তির বিকিরণ তরঙ্গ আকারে ঘটে। বিভিন্ন শক্তির বেলায় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং সে সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য হয়। বিভিন্ন রশ্মি ও দৃশ্যমান আলোক বা বিদীর্ণ তাপের ভেতর প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে সব তরঙ্গকে সাধারণভাবে তাড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে। তাড়িত চৌম্বক বিকিরণ বা তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের সমগ্র পরিসরকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; একে বলা হয় তাড়িত চৌম্বক বর্ণালী।

তাড়িত চৌম্বক বর্ণালীর বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্য :

i. গামা রশ্মি
- ক. বর্ণালীতে 10^{-11} মিটারের চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সব বিকিরণই গামা রশ্মি।
- খ. এটি তেজস্ক্রিয় রশ্মি।
- গ. প্রাণিদেহে এ রশ্মি ক্ষতিকারক।
- ঘ. এ রশ্মির শক্তি দৃশ্যমান আলোর চেয়ে পঞ্চাশ হাজার গুণ বেশি।

ii. এক্স-রে
- ক. বর্ণালীতে 10^{-11} মিটার থেকে 10^{-8} মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে এক্স-রে।
- খ. এ রশ্মি মানুষের দেহের নরম অংশের মধ্য দিয়ে ভেদ করে যেতে পারে কিন্তু হাড় বা টিউমারের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না।

iii. অতিবেগুনি রশ্মি
- ক. বর্ণালীতে 10^{-9} মিটার থেকে 3.5×10^{-7} মিটারের চেয়ে কিছু বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ পর্যন্ত অতিবেগুনি রশ্মির এলাকা।
- খ. এ রশ্মি শরীরের ত্বকে ভিটামিন তৈরি করতে সাহায্য করে। তবে বেশিক্ষণ এ রশ্মিতে থাকলে ক্ষতি হতে পারে; বিশেষ করে চোখের।

iv. দৃশ্যমান আলো
- ক. তাড়িত চৌম্বক বর্ণালীর 4×10^{-7} মিটার থেকে 7×10^{-7} মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে দৃশ্যমান আলো।
- খ. তবে দৃশ্যমান আলোর সব তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম।

v. অবলোহিত রশ্মি
- ক. সূর্য থেকে যে বিকীর্ণ তাপ আসে তাকে বলা হয় অবলোহিত রশ্মি।
- খ. বর্ণালীর মোটামুটি 10^{-6} মিটার থেকে 10^{-3} মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত এলাকা অবলোহিত বিকিরণের।

vi. বেতার তরঙ্গ
- ক. অবলোহিত বিকিরণের চেয়ে অর্থাৎ 10^{-3} মিটারের চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে বেতার তরঙ্গ।
- খ. বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 10^4 মিটার পর্যন্ত হতে পারে।
- গ. 10^{12} হার্জের চেয়ে কম কম্পাঙ্কের, সব তরঙ্গকে বেতার তরঙ্গ হিসেবে ধরা হয়।
- ঘ. বেতার তরঙ্গের মধ্যেও আবার নানা ভাগ আছে। মিডিয়াম ওয়েভ বা মাঝারি তরঙ্গে ব্যবহার করা হয় মোটামুটি 200 থেকে 500 মিটার দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ। শর্ট ওয়েভ বা হ্রস্ব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 10 মিটার থেকে 100 মিটার। আবার টেলিভিশনের জন্য অতি হ্রস্ব তরঙ্গ বা মাইক্রো ওয়েভ ব্যবহার করা হয়, যার দৈর্ঘ্য মাত্র তিন সেন্টিমিটারের মতো।

প্রশ্ন-২৩. বর্ণালীতে দৃশ্যমান আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : বর্ণালীতে লাল থেকে বেগুনি পর্যন্ত প্রত্যেকটি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা। আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুবই ক্ষুদ্র। আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে সাধারণত অ্যাংস্ট্রম (Angstrom) এককে (A.U বা Å) প্রকাশ করা হয়। $1 Å = 10^{-8}$ cm। বর্ণালীতে বিভিন্ন বর্ণের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিচে দেয়া হলো :

বর্ণ	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
লাল	6400 Å – 7800 Å
কমলা	5900 Å – 6400 Å
হলুদ	5500 Å – 5900 Å
সবুজ	5000 Å – 5500 Å
আসমানী	4800 Å – 5000 Å
নীল	4500 Å – 4800 Å
বেগুনি	3800 Å – 4500 Å

আমাদের দর্শন অনুভূতি হলুদ-সবুজ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। লাল ও বেগুনি আলোতে দর্শন ক্ষমতা প্রায় শূন্য। সেজন্য হলুদ আলোতে বস্তু সবচেয়ে পরিষ্কার দেখা যায় কিন্তু লাল ও বেগুনি আলোতে ভালো দেখা যায় না।

প্রশ্ন-২৪. তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর বিভিন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : বিভিন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য :

তরঙ্গের প্রচলিত নাম	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ	~ 10^5 m
মধ্যম বেতার তরঙ্গ	~ 10^3 m
ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ	~ 10^2 m
মাইক্রোওয়েভ	~ 1 m
অবলোহিত আলোক	~ 10^{-6} m থেকে 10^{-3} m
দৃশ্যমান আলোক	~ 7×10^{-7} m থেকে 4×10^{-7} m
অতিবেগুনি আলোক	~ 4×10^{-7} m থেকে 1×10^{-9} m
রঞ্জন রশ্মি (বা এক্সরে)	~ 1×10^{-8} m থেকে 1×10^{-11} m
গামা রশ্মি (γ-রশ্মি)	~ 1×10^{-11} m থেকে 10^{-15} m

প্রশ্ন-২৫. অতিবেগুনি রশ্মি কি?

উত্তর : বর্ণালীতে অবস্থিত 10^{-9}m থেকে 3.5×10^{-7}m এর চেয়ে কিছু বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকে বলা হয় অতিবেগুনি রশ্মি। বিকিরণ পর্যায়ে অতিবেগুনি রশ্মির স্থান দৃশ্যমান আলো ও এক্স-রের মাঝামাঝি জায়গায়। সাধারণ আলোর সমধর্মী হলেও এ আলো চোখে সাড়া জাগায় না। তবে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অতিরিক্ত পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিন্তু পরিমিত পরিমাণে হলে এ রশ্মি মানবদেহে ভিটামিন 'ডি' উৎপন্ন করে। সূর্যের আলোতে প্রচুর পরিমাণে এই বিকিরণ থাকে। কিন্তু উর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর এর অনেকটাই শোষণ করে নেয়। তাই পৃথিবীর জীবকুল এর অনিষ্টকারী প্রভাব থেকে রেহাই পায়।

প্রশ্ন-২৬. ক্যাথোড রশ্মি কি? এর ধর্ম কি কি?

উত্তর : তড়িৎক্ষরণ নলের বায়ুর চাপ কমে 10^{-3} mm থেকে 10^{-5} mm হলে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায় এবং নলে কোনো আলো থাকে না; তখন অদৃশ্য রশ্মির একটি বিম ক্যাথোড থেকে অভিলম্বভাবে নির্গত হয়ে কাচের নলের দেয়ালে সবুজ প্রতিপ্রভার (Fluorescence) সৃষ্টি করে। এ রশ্মিকে ক্যাথোড রশ্মি বলে।

ক্যাথোড রশ্মির ধর্ম

ক. সরল পথে গমন করে।
খ. ঋণাত্মক চার্জবিশিষ্ট।
গ. রশ্মিকণার নির্দিষ্ট ভর আছে।
ঘ. ক্যাথোড থেকে অভিলম্বভাবে নির্গত হয়।
ঙ. ভরবেগ ও জড়তা আছে।
চ. আয়নিত করার ক্ষমতা আছে।
ছ. স্থির তড়িৎক্ষেত্র দিয়ে গেলে এর পথের বিসরণ ঘটে।
জ. চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবে এ রশ্মির পথ বেঁকে যায়।
ঝ. কোনো বস্তুকে আঘাত করলে প্রতিপ্রভা সৃষ্টি করে।
ঞ. অনুপ্রভা রশ্মির সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-২৭. আলট্রাসোনোগ্রাফি কি?

উত্তর : অতিশাব্দিক তরঙ্গের সাহায্যে কোনো বস্তুকে স্ক্যান করে যে সংকেত পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে ফটো তোলার প্রক্রিয়ার সাধারণ নাম আলট্রাসোনোগ্রাফি। রোগ নির্ণয়, ধাতব বস্তুর ভিতরে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ধরা ইত্যাদি নানান কাজে আজকাল আলট্রাসোনোগ্রাফি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রশ্ন-২৮. অবলোহিত রশ্মি কি?

উত্তর : লাল আলোর চেয়ে খানিকটা বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের কোনো আলোকে বলে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি। অর্থাৎ সূর্য থেকে যে বিকীর্ণ তাপ আসে তাকে বলা হয় অবলোহিত রশ্মি (infrared ray)। বর্ণালীর 10^{-6}m থেকে 10^{-3}m তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যন্ত অবলোহিত বিকিরণের এলাকা।

প্রশ্ন-২৯. ইনফ্রারেড সেন্সর কি?

উত্তর : ইনফ্রারেড সেন্সর এক ধরনের যন্ত্র যার সাহায্যে আলো উৎপাদন ছাড়াও রাতের অন্ধকারে দেখা যায়। কোনো বস্তু থেকে সার্বক্ষণিক যে অবলোহিত রশ্মি নিক্ষিপ্ত হয় এ সেন্সর সেটিকে গ্রহণ করে বস্তুটিকে দৃশ্যমান করে তোলে।

প্রশ্ন-৩০. বেতার তরঙ্গ, মিডিয়াম ওয়েভ, শর্টওয়েভ ও মাইক্রোওয়েভ কি?

উত্তর : বেতার তরঙ্গ : 10^{-3} m এর চেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ হচ্ছে বেতার তরঙ্গ। তবে বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 10^{4}m পর্যন্তও হতে পারে।

মিডিয়াম ওয়েভ : 200 হতে 500 m পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে মিডিয়াম ওয়েভ বলে।

শর্ট ওয়েভ : 10 হতে 100 m পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে শর্ট ওয়েভ বলে।

মাইক্রোওয়েভ : 3 cm দৈর্ঘ্যের তরঙ্গকে মাইক্রোওয়েভ বলে।

প্রশ্ন-৩১. দৃশ্যমান আলো কাকে বলে?

উত্তর : 4×10^{-7} থেকে 7×10^{-7} মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ হচ্ছে দৃশ্যমান আলো। আমরা যে আলোতে দেখি সেটি দৃশ্যমান আলো। তবে দৃশ্যমান আলোর সকল তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসেবে ছোট থেকে বড় আকারে সাজালে পাওয়া যায়— বেগুনি < নীল < আসমানী < সবুজ < হলুদ < কমলা < লাল।

প্রশ্ন-৩২. গামা রশ্মির প্রভাবে মানুষের কি কি ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর : গামা রশ্মির প্রভাবে মানুষের নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে :

১. এ রশ্মি দেহের কোষ নষ্ট করতে পারে।
২. এ রশ্মির প্রভাবে মাথার চুল পড়ে যায়।
৩. এ রশ্মিতে আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার ও টিউমার হতে পারে।
৪. অতিমাত্রায় এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

প্রশ্ন-৩৩. সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের কি কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের জন্য সৃষ্ট ক্ষতি :

১. চর্ম ক্যান্সার হতে পারে।
২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
৩. চোখে ছানি পড়ে এবং অন্ধত্ব বেড়ে যায়।
৪. খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।
৫. প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন-৩৪. লেজার রশ্মি (LASER) কি?

LASER-এর পূর্ণরূপ হলো Light Amplification by Stimulation Emission of Radiation. এর অর্থ হলো 'উদ্দীপিত নিঃসরণ দ্বারা আলোর বিবর্ধন'।

কোনো বিশেষ পরমাণুকে ফোটন কণিকা দ্বারা উত্তেজিত করে লেজার রশ্মি তৈরি করা হয়। এ রশ্মি অত্যধিক লক্ষ্যভেদী, সুসঙ্গত, একক রঙের এবং তীব্র শক্তিসম্পন্ন একগুচ্ছ আলো। লেজার যন্ত্রের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গকে কোনো স্ফটিকের মধ্য দিয়ে চালনা করা হলে উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে এবং অতি শক্তিশালী সুসংগত আলোক রশ্মি নিঃসরিত হয়। এ রশ্মির নাম লেজার রশ্মি।

লেজার রশ্মির বৈশিষ্ট্য :

১. এ রশ্মির তীব্রতা খুব বেশি এবং দিকাভিমুখী।
২. এ রশ্মি প্রায় নিখুঁতভাবে সমান্তরাল।
৩. এ রশ্মি এক বর্ণী বা এক রঙের।
৪. এ রশ্মি পানি দ্বারা শোষিত হয় না।

○ প্রশ্ন-৩৫. লেজার রশ্মি ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : লেজার রশ্মির ব্যবহার (Uses of Laser beams) : লেজার রশ্মির নিম্নলিখিত ব্যবহার রয়েছে :

১. দূরত্বের সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
২. নিখুঁত জরিপ কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। লেজার রশ্মির সাহায্যে পৃথিবী এবং চাঁদের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় সম্ভব হয়েছে।
৩. অতি সূক্ষ্ম তার ঝালাইয়ের কাজে এবং কঠিন বস্তুতে সূক্ষ্ম ছিদ্র করার কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
৪. টেলিভিশনে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
৫. বর্ণালী মাপন যন্ত্রে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
৬. শল্য চিকিৎসকরা চক্ষু ও চিকিৎসার কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহার করেন।
৭. জীবকোষ ও ক্রোমোজমের ওপর কোনো সূক্ষ্ম গবেষণামূলক কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
৮. রকেট এবং কৃত্রিম উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
৯. লাইব্রেরিতে বই-এর বার কোড (bar code) পাঠ এবং দোকানে জিনিসপত্রের মূল্যের বার কোড পাঠের কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
১০. লেজার রশ্মি পানি কর্তৃক শোষিত হয় না। সেহেতু পানির নিচে যোগাযোগ রক্ষার কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহৃত হয়।
১১. ভিডিও ডিস্কসহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের নিবিড় (compact) ডিস্ক তৈরি ও পাঠের কাজে লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়।
১২. একটি সুবিধানজক দূরবীক্ষণ যন্ত্রে লেজার যন্ত্র ব্যবহারে চাঁদে আলোক রশ্মি প্রেরণ করা যেতে পারে। ঐতিহাসিক এ্যাপেলো-11, চাঁদে অবতরণের Kape Kennedy space স্টেশন থেকে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়েছিল।

○ প্রশ্ন-৩৬. X-Ray কে আবিষ্কার করেন? এটির কাজ কি?

উত্তর : ১৮৯৫ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ডব্লিউকে রন্টজেন X-Ray আবিষ্কার করেন।

কাজ : এক্স-রের সাহায্যে আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে হাড়ের যে চিত্র পাওয়া যায়, তাকে রেডিওগ্রাফ বলা হয়। দেহের কোনো হাড় ভেঙে গেলে, অথবা স্থানচ্যুত হলে, কিংবা কোনো বস্তু প্রবেশ করলে রঞ্জন রশ্মির সাহায্যে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়। টিউমার, ক্যান্সার, চর্মরোগ, আলসার ইত্যাদি রোগের চিকিৎসায় এ রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৩৭. X-ray কি? চিকিৎসাবিজ্ঞানে X-ray-এর গুরুত্ব কি?

উত্তর : এক্স-রে (X-ray) : দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতব পদার্থের উপর পতিত হলে ধাতব পদার্থ হতে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন যে বিকিরণ নির্গত হয় তাই এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি। ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী উইলিয়াম রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে X-ray-এর গুরুত্ব : আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রের ব্যবহার রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. দাঁতের গোড়ায় ঘা, হাড় ভাঙার সমস্যা নির্ণয়ে ও অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও পরে এক্স-রের ব্যবহার অপরিহার্য।
২. শরীরের কোনো অংশের হাড় স্থানচ্যুত হলে, হাড় ভেঙে গেলে বা শরীরের কোনো অংশে অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু প্রবেশ করলে এক্স-রের দ্বারা তা নির্ণয় করা যায়।
৩. আলসার, ক্যান্সার, টিউমার, যক্ষা, কিডনির পাথর প্রভৃতি রোগ নির্ণয় এবং রোগের সঠিক চিকিৎসায় এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৩৮. এক্স-রে ও গামা-রে'র মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : এক্স-রে ও গামা-রে-এর মধ্যে তফাৎ নিম্নরূপ :

এক্স-রে	গামা-রে
১. এটি সক্রিয় কণা দ্বারা গঠিত।	১. এটি নিষ্ক্রিয় কণা দ্বারা গঠিত।
২. এর ভেদন ক্ষমতা কম।	২. এর ভেদন ক্ষমতা বেশি।
৩. এটি চুম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়।	৩. এটি চুম্বক বা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।

○ প্রশ্ন-৩৯. অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) কি? এটা কি কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) : 10^{-6} মিটার থেকে 10^{-3} মিটার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গকে অবলোহিত রশ্মি বলে।

অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার :

i. চিকিৎসকরা চর্মরোগের চিকিৎসায় এবং দেহের বিভিন্ন অংশের ব্যথা উপশমে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করে থাকেন।
ii. চুরি প্রতিরোধক এলার্ম তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।
iii. ভগ্নাবশেষ থেকে মৃত ও আহত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।
iv. চামড়া, ধাতব দ্রব্যাদি, কাগজ ইত্যাদি শুকানোর কাজে অনেক ক্ষেত্রে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৪০. UV ও IR কি আলো? এদের ব্যবহার কি? এদের তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত এবং এদের মধ্যে কার শক্তি বেশি?

উত্তর : UV ও IR আলো নয়, উভয়ই রশ্মি। UV-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Ultra Violet। এক্স রশ্মির চেয়ে বড় ও বেগুনি রশ্মির চেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মিকে বলা হয় Ultra Violet Ray বা অতিবেগুনি রশ্মি। সাধারণ আলোর সমধর্মী হলেও এই আলো চোখে সাড়া জাগায় না। তবে ফটোগ্রাফিক ফিল্মে এর অস্তিত্ব ধরা পড়ে। অতি পরিমাণে অতিবেগুনি রশ্মি মানুষের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।

IR-এর পূর্ণ অতিব্যক্তি Infrared Ray। দৃশ্যমান আলোক রশ্মি এবং রেডিও বিকিরণের মাঝামাঝি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মিকে বলা হয় Infrared Ray বা অবলোহিত রশ্মি। কাঠের আগুন বা বৈদ্যুতিক চুলা থেকে যে তাপ বিকীর্ণ হয় তা অবলোহিত রশ্মি। সূর্য থেকে যে তাপ আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছায় তাও অবলোহিত বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আসে।

UV ও IR এর ব্যবহার : অতিবেগুনি রশ্মি চিকিৎসাক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া নিরাপত্তা ও গবেষণায়ও এটি ব্যবহৃত হয়।

অবলোহিত রশ্মি চিকিৎসাবিদ্যা বিশেষত স্তন ক্যান্সারসহ নানা রোগের চিকিৎসা, শিল্প ও কৃষি গবেষণা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।

তরঙ্গদৈর্ঘ্য : অতিবেগুনি রশ্মি (UV) 10^{-9} মিটার থেকে 3.5×10^{-7} মিটারের কিছু বেশি।

অবলোহিত রশ্মি (IR) 10^{-6} মিটার থেকে 5×10^{-3} মিটার।

শক্তি : অবলোহিত রশ্মি অপেক্ষা অতিবেগুনি রশ্মির শক্তি বেশি।

খ

আলোর প্রতিফলন
Reflection of Light

○ প্রশ্ন-৪১. আলোর প্রতিফলন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : আলো যখন বায়ু বা অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পায় তখন দুই মাধ্যমের বিভেদতল থেকে কিছু পরিমাণ আলো প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে। একে আলোর প্রতিফলন বলে। আলোর প্রতিফলন দুটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে :

i. আপতিত আলো প্রতিফলকের উপর কত কোণে আপতিত হচ্ছে; এবং

ii. প্রথম ও দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রকৃতি।

○ প্রশ্ন-৪২. প্রতিফলন কত প্রকার ও কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রতিফলক পৃষ্ঠের প্রকৃতি অনুসারে প্রতিফলন দুই প্রকারের। যথা–

i. নিয়মিত প্রতিফলন (Regular Reflection)

ii. ব্যাপ্ত প্রতিফলন (Diffused Reflection)

i. **নিয়মিত প্রতিফলন (Regular Reflection) :** যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল থাকে বা অভিসারী বা অপসারী গুচ্ছে পরিণত হয় তবে আলোর সেই প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে।

প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ হলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে সমতল দর্পণে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে।

ii. **ব্যাপ্ত প্রতিফলন (Diffused Reflection) :** যদি একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মি কোনো পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর আর সমান্তরাল থাকে না বা অভিসারী বা অপসারী গুচ্ছে পরিণত হয় না তখন আলোর সেই প্রতিফলনকে ব্যাপ্ত প্রতিফলন বলে।

প্রতিফলক পৃষ্ঠ মসৃণ না হলে ব্যাপ্ত প্রতিফলন ঘটে। এ ক্ষেত্রে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলক পৃষ্ঠের বিভিন্ন বিন্দুতে বিভিন্ন কোণে আপতিত হয় ফলে তাদের প্রতিফলন কোনোও বিভিন্ন হয় এবং বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা আমাদের চারপাশের বস্তুগুলোকে দেখতে পাই ব্যাপ্ত প্রতিফলনের মাধ্যমে।

○ প্রশ্ন-৪৩. প্রতিফলন সম্পর্কিত নিচের বিষয়গুলোর সংজ্ঞা লিখুন।

আপতিত রশ্মি (Incident ray), আপতন বিন্দু (Point of incedent), অভিলম্ব (Normal), প্রতিফলিত রশ্মি (Reflected ray), আপতন কোণ (Angle of incident), প্রতিফলন কোণ (Angle of reflection)

উত্তর : আপতিত রশ্মি (Incident ray) : যে রশ্মি প্রতিফলনের উপর এসে পড়ে তাকে আপতিত রশ্মি বলে। চিত্র AO আপতিত রশ্মি।

আপতন বিন্দু (Point of incedent) : আপতিত রশ্মি প্রতিফলকের উপর যে বিন্দুতে এসে পড়ে তাকে আপতন বিন্দু বলে। চিত্রে 0 আপতন বিন্দু।

অভিলম্ব (Normal) : আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অংকিত লম্বকে অভিলম্ব বলে। চিত্রে ON অভিলম্ব।

প্রতিফলিত রশ্মি (Reflected ray) : প্রতিফলকে বাধা পেয়ে যে রশ্মি আগের মাধ্যমে ফিরে আসে তাকে প্রতিফলিত রশ্মি বলে। চিত্রে OB প্রতিফলিত রশ্মি।

আপতন কোণ (Angle of incident) : আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণকে আপতন কোণ বলে। আপতন কোণকে i দিয়ে প্রকাশ করা হয়। চিত্রে $\angle AON = i$

প্রতিফলন কোণ (Angle of reflection) : প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্বের সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে তাকে প্রতিফলন কোণ বলে। প্রতিফলন কোণকে r দিয়ে প্রকাশ করা হয়। চিত্রে $\angle NOB = r$

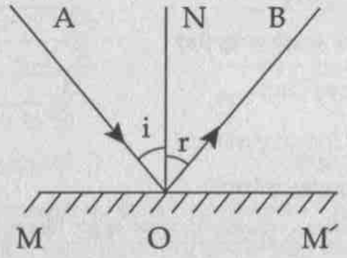

MM´ একটি মসৃণ প্রতিফলক পৃষ্ঠ। AO আলোক রশ্মি প্রতিফলকের O বিন্দুতে পড়ে OB পথে প্রতিফলিত হয়।

তাহলে $\angle AON = i$ = আপতন কোণ

$\angle NOB = r$ = প্রতিফলন কোণ

○ প্রশ্ন-৪৪. প্রতিফলনের সূত্রগুলো লিখুন।

উত্তর : আলোর প্রতিফলন দুটি সূত্র মেনে চলে। যথা :

i. আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অংকিত অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

ii. আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়। অর্থাৎ $\angle i = \angle r$

○ প্রশ্ন-৪৫. দর্পণ কাকে বলে? দর্পণ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : দর্পণ (Mirror) : যে মসৃণ তলে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাকে দর্পণ বলে। সাধারণত কাচের একদিকে ধাতুর (সাধারণত রূপার) প্রলেপ লাগিয়ে দর্পণ তৈরি করা হয়। কাচের উপর ধাতুর প্রলেপ দেয়াকে পারা লাগান বা 'সিলভারিং' করা বলে। শুধুমাত্র সিলভারিং করা কাচই যে দর্পণ তা নয় যে কোনো মসৃণ তল যেমন পালিশ করা টেবিল, চকচকে ধাতব পাত, স্থির পানির পৃষ্ঠ, পরিষ্কার পারদ পৃষ্ঠ ইত্যাদি সবই দর্পণ হিসেবে কাজ করে।

দর্পণের প্রকারভেদ : দর্পণ প্রধানত দুই প্রকার। যথা : i. সমতল দর্পণ (Plane mirror) ও ii. গোলীয় দর্পণ (Spherical mirror)

i. **সমতল দর্পণ :** কোনো সমতল পৃষ্ঠ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে সমতল দর্পণ বলে। আমরা প্রত্যহ চেহারা দেখার জন্য যে আয়না ব্যবহার করি সেটি সমতল দর্পণ।

ii. **গোলীয় দর্পণ :** কোনো ফাঁপা গোলকের অংশবিশেষ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে যদি আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে গোলীয় দর্পণ বলে।

প্রশ্ন-৪৬.ভালো সমতল দর্পণের বৈশিষ্ট্য কি?

উত্তর : একটি ভালো সমতল দর্পণের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন :

i. দর্পণের পৃষ্ঠ সমতল হতে হবে।

ii. দর্পণের পুরুত্ব কম এবং সুষম হতে হবে।

iii. দর্পণের পিছনে ধাতব প্রলেপ ভালো হতে হবে। প্রলেপ যত ভালো হবে বিম্ব তত উজ্জ্বল হবে।

iv. দর্পণের কাচ বায়ু বুদবুদ শূন্য হবে।

প্রশ্ন-৪৭. গোলীয় দর্পণ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : গোলীয় দর্পণ দুই প্রকারের। যথা :

ক. অবতল দর্পণ (Concave mirror)

খ. উত্তল দর্পণ (Convex mirror)

ক. অবতল দর্পণ : কোনো ফাঁপা গোলকের ভিতরের পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে অবতল দর্পণ বলে।

কোনো স্বচ্ছ ফাঁপা গোলকের কিছু অংশ কেটে নিয়ে এর উত্তল পৃষ্ঠে সিলভারিং করে অবতল দর্পণ তৈরি করা হয়।

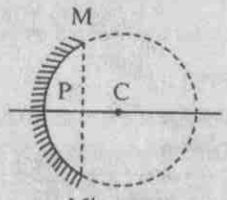

চিত্র : MPM' একটি অবতল দর্পণ

খ. উত্তল দর্পণ : কোনো স্বচ্ছ ফাঁপা গোলকের বাইরের পৃষ্ঠের কিছু অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে আলোর নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তবে তাকে উত্তল দর্পণ বলে।

কোনো স্বচ্ছ ফাঁপা গোলকের কিছু অংশ কেটে নিয়ে এর অবতল পৃষ্ঠে সিলভারিং করে উত্তল দর্পণ তৈরি করা হয়।

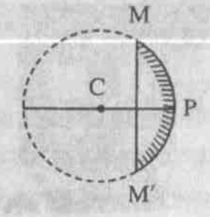

চিত্র : MPM' একটি উত্তল দর্পণ

প্রশ্ন-৪৮. প্রধান ফোকাস কি?

উত্তর : প্রধান ফোকাস : (Principal Focus) : কোনো গোলীয় দর্পণে আপতিত প্রধান অক্ষের নিকটবর্তী সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দুতে মিলিত হয় (অবতল দর্পণে) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হয় বলে মনে হয় (উত্তল দর্পণে) তাকে ঐ দর্পণের প্রধান ফোকাস বলে। চিত্রে F প্রধান ফোকাস।

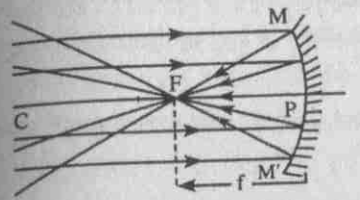

চিত্র : অবতল দর্পণ

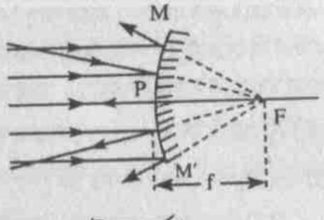

উত্তল দর্পণ

প্রশ্ন-৪৯. বিম্ব কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? এদের পার্থক্য নিরূপণ করুন।

উত্তর : বিম্ব (Image) : কোনো বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হয় বা দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়, তাহলে ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর বিম্ব বলে। বিম্ব দুই প্রকারের হয়। যথা–

i. বাস্তব বিম্ব বা সদ বিম্ব (Real image)

ii. অবাস্তব বিম্ব বা অসদ বিম্ব (Virtual image)

বাস্তব ও অবাস্তব বিম্বের পার্থক্য :

বাস্তব বিম্ব	অবাস্তব বিম্ব
১. কোনো বিন্দু থেকে নি:সৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।	১. কোনো বিন্দু থেকে নি:সৃত আলোক রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হলে দ্বিতীয় বিন্দুতে অবাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।
২. প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত আলোক রশ্মির প্রকৃত মিলনের ফলে বাস্তব বিম্ব গঠিত হয়।	২. অবাস্তব বিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না।
৩. চোখে দেখা যায় এবং পর্দায়ও ফেলা যায়।	৩. চোখে দেখা যায় কিন্তু পর্দায় ফেলা যায় না।
৪. অবতল দর্পণ ও উত্তল লেন্সে উৎপন্ন হয়।	৪. সব রকম দর্পণ ও লেন্সে উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন-৫০. একটি বিম্বের পূর্ণ বিবরণের জন্য কি কি উল্লেখ করতে হয়?

উত্তর : একটি বিম্বের পূর্ণ বিবরণের জন্য নিচের বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হয়। যথা :

১. অবস্থান : দর্পণ থেকে এর দূরত্ব।

২. প্রকৃতি : ক. সদ বা অসদ

খ. সোজা না উল্টো

৩. আকৃতি : বিবর্ধিত না খর্বিত না লক্ষ্যবস্তুর সমান।

প্রশ্ন-৫১. চিহ্নের প্রচলিত প্রথা কি?

উত্তর : গোলীয় দর্পণের সামনের লক্ষ্যবস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের জন্য বিম্বও বিভিন্ন অবস্থানে গঠিত হয়। তাই লক্ষ্যবস্তুর দূরত্ব, বিম্বের দূরত্ব ও ফোকাস দূরত্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য এদের চিহ্ন (ধনাত্মক না ঋণাত্মক) ঠিক করে নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একেই চিহ্নের প্রচলিত প্রথা বলে। এ প্রথা অনুসারে–

ক. সকল দূরত্ব দর্পণের মেরু থেকে পরিমাপ করতে হবে।

খ. সকল বাস্তব দূরত্ব ধনাত্মক। বাস্তব দূরত্ব বলতে আলোকরশ্মি প্রকৃতপক্ষে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বুঝায়।

গ. সকল অবাস্তব দূরত্ব ঋণাত্মক। আলোকরশ্মি প্রকৃতপক্ষে যে দূরত্ব অতিক্রম করে না, করছে বলে মনে হয় সেই দূরত্বকে অবাস্তব দূরত্ব বলে।

এ প্রথা অনুসারে অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ধনাত্মক ও উত্তল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব ঋণাত্মক।

প্রশ্ন-৫২. দর্পণ চেনার উপায় কি?

উত্তর : কোনো দর্পণের একেবারে নিকটে একটি আঙুল খাড়াভাবে স্থাপন করলে যদি সোজা বিম্ব লক্ষ্যবস্তুর চেয়ে বড় হয় তাহলে দর্পণটি অবতল, আর যদি সোজা বিম্ব ছোট হয় তাহলে দর্পণটি উত্তল ও সোজা বিম্ব লক্ষ্যবস্তুর সমান হলে দর্পণটি সমতল হবে।

প্রশ্ন-৫৩. রৈখিক বিবর্ধন কি? এটি কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : বিম্বের দৈর্ঘ্য ও লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্যের অনুপাতকে রৈখিক বিবর্ধন বলে। কোনো লক্ষ্যবস্তুর দৈর্ঘ্য Lo এবং বিম্বের Li হলে রৈখিক বিবর্ধন

$$m = \frac{\text{বিম্বের দৈর্ঘ্য}}{\text{লক্ষ্য বস্তুর দৈর্ঘ্য}} = \frac{Li}{Lo}$$

বিবর্ধনের মান 1 এর চেয়ে বড় হলে বিম্বটি লক্ষ্যবস্তুর তুলনায় বড়, বিবর্ধনের মান 1 এর চেয়ে ছোট হলে বিম্বটি লক্ষ্যবস্তুর তুলনায় ছোট এবং বিবর্ধনের মান 1 এর সমান হলে বিম্বটি লক্ষ্যবস্তুর সমান।

প্রশ্ন-৫৪. দর্পণের বিভিন্ন ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : তিন প্রকারের দর্পণ আছে; যথা : ১. সমতল দর্পণ, ২. অবতল দর্পণ এবং ৩. উত্তল দর্পণ। দর্পণগুলোকে আমরা বিভিন্ন কার্যে ব্যবহার করে থাকি। দর্পণের বিভিন্ন ব্যবহার নিচে আলোচিত হলো :

সমতল দর্পণ : এটি মুখ দেখার জন্য এবং দাড়ি-গোঁফ কামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সরল পেরিস্কোপ তৈরি করতে এটি ব্যবহৃত হয়।

অবতল দর্পণ : অবতল দর্পণের বহুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নির্দিষ্ট আকারের অবতল দর্পণকে দাড়ি-গোঁফ কামানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। চিকিৎসকগণ গলা, নাক এবং কানের ভেতর প্রতিফলন দ্বারা আলো ঢুকিয়ে পরীক্ষা করার জন্য এ দর্পণ প্রতিফলক হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। সাইকেল, মোটর সাইকেল, মোটরগাড়ির বাতিতে প্রতিফলক হিসেবে এটা ব্যবহৃত হয়। বহুদূর পর্যন্ত আলোকিত করার জন্য এটা সার্চলাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটা উত্তাপক এবং বিবর্ধক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

উত্তল দর্পণ : এ দর্পণ চারদিকে আলোক ছড়িয়ে দিতে পারে বলে এটিকে রাস্তার বাতিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া পিছনদিক থেকে আগত গাড়ি-ঘোড়া ও অন্যান্য জিনিস দেখার জন্য মোটরগাড়িতে, মোটর চালকের সামনে এটি ব্যবহার করা হয়। জনাকীর্ণ শহরে লোকের ভিড় এড়িয়ে নিরাপদে চলার জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে উত্তল দর্পণ ব্যবহৃত হয়।

গ

আলোর প্রতিসরণ ও পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
Refraction of Light & Total Internal Reflection of Light

প্রশ্ন-৫৫. আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?

উত্তর : আলোকরশ্মি কোনো এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য এক স্বচ্ছ মাধ্যমে তির্যকভাবে যাওয়ার ক্ষেত্রে মাধ্যম দুটির বিভেদ তল থেকে এটি দিক পরিবর্তন করে। তবে অভিলম্ব আপতনের ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি দিক পরিবর্তন না করে এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অপর স্বচ্ছ মাধ্যমে প্রবেশ করে। আলোকরশ্মির এক স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে সঞ্চালিত হওয়াকেই আলোর প্রতিসরণ বলে।

প্রশ্ন-৫৬. আলোর প্রতিসরণের নিয়ম কয়টি ও কি কি?

উত্তর : আলোর প্রতিসরণের নিয়ম তিনটি। যথা :

ক. আলোকরশ্মি তির্যকভাবে হালকা মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে বিভেদতলের ওপর অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে বেঁকে যায়। আর ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে বেঁকে যায়।

খ. আলোকরশ্মি মাধ্যম দুটির বিভেদ তলে লম্বভাবে পতিত হলে প্রতিসরিত রশ্মির কোনো দিক পরিবর্তন হয় না।

গ. আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ তলে অঙ্কিত অভিলম্ব একই সমতলে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৫৭. প্রতিসরণাঙ্ক বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন এক স্বচ্ছ মাধ্যম হতে অন্য কোনো স্বচ্ছ মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন একজোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম ও নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এ ধ্রুবককে প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

অর্থাৎ 'a' মাধ্যম সাপেক্ষে 'b' মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক, $^{a}\eta_{b} = \frac{\sin i}{\sin r}$.

প্রশ্ন-৫৮. পরম প্রতিসরণাঙ্ক কাকে বলে?

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন শূন্য মাধ্যম থেকে অন্য কোনো মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তখন নির্দিষ্ট বর্ণের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের অনুপাতকে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাঙ্ক বলে।

ব্যাখ্যা : আলোকরশ্মি শূন্য মাধ্যম a হতে অন্য কোনো মাধ্যম b-তে প্রতিসৃত হওয়ার পর যদি আপতন কোণ = i এবং প্রতিসরণ কোণ = r হয়, তবে শূন্য মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্ক অর্থাৎ পরম প্রতিসরণাঙ্ক $n = \frac{\sin i}{\sin r}$

প্রশ্ন-৫৯. আলোর বেগের সাথে প্রতিসরণাংকের সম্পর্ক লিখুন।

উত্তর : আলোকরশ্মি যখন এক স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যম থেকে অন্য এক স্বচ্ছ সমসত্ত্ব মাধ্যমে তীর্যকভাবে প্রবেশ করে তথা প্রতিসরণের জন্য বিভেদ তলে এর দিক পরিবর্তন করে। বিভিন্ন মাধ্যমে আলোর বেগের বিভিন্নতার জন্যই আলোক রশ্মির এই দিক পরিবর্তন হয় বা প্রতিসরণ হয়। আলোর তরঙ্গ তত্ত্ব থেকে এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে এবং এ তত্ত্ব থেকে আমরা পাই, কোনো মাধ্যমের পরম প্রতিসরণাংক η হলে,

$$\eta = \frac{\text{শূন্য মাধ্যমের আলোর বেগ (Co)}}{\text{ঐ মাধ্যমের আলোর বেগ (Cm)}}$$

বা, $\eta = \frac{Co}{Cm}$

এখন আলোক রশ্মি যদি 'a' মাধ্যম থেকে 'b' মাধ্যমে প্রবেশ করে তাহলে 'a' মাধ্যমের সাপেক্ষে 'b' মাধ্যমের প্রতিসরণাংক

$$^{a}\eta_{b} = \frac{\text{'a' মাধ্যমের আলোর বেগ}}{\text{'b' মাধ্যমের আলোর বেগ}} \; \frac{C_a}{C_b}$$

বা, $^{a}\eta_{b} = \frac{C_a}{C_b}$

এখন 'b' মাধ্যম যদি 'a' মাধ্যমের চেয়ে আলোর সাপেক্ষে ঘন হয় তাহলে $^{a}n_{b} >$। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে 'b' মাধ্যমের আলোর বেগ 'a' মাধ্যমের চেয়ে কম। সুতরাং ঘনতর মাধ্যমে আলোর বেগ হালকা মাধ্যমের চেয়ে কম হয়।

প্রশ্ন-৬০. ক্রান্তি কোণ কি?

উত্তর : যখন কোনো আলোকরশ্মি ঘন স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে প্রতিসৃত হয়ে হালকা স্বচ্ছ মাধ্যমে এমনভাবে যায় যে প্রতিসরণ কোণ ৯০° হয়, তখন আপতিত রশ্মি ঘন মাধ্যমে যে আপতন কোণ সৃষ্টি করে তাকে ঐ মাধ্যম দুটির মধ্যকার ক্রান্তি কোণ বলে। একে θc দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

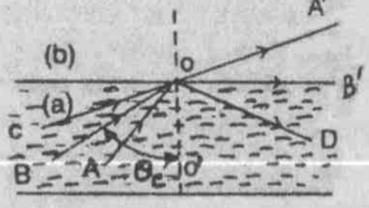

প্রশ্ন-৬১. পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন কি?

উত্তর : আলোক রশ্মি যখন ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় মানের কোণে আপতিত হয় তখন প্রতিসরণের পরিবর্তে আলোক রশ্মি সম্পূর্ণরূপে ঘন মাধ্যমের অভ্যন্তরে প্রতিফলনের সূত্রানুযায়ী প্রতিফলিত হয়। এই ঘটনাকে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন বলে।

পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সংগঠিত হওয়ার শর্ত—

১. আলোক রশ্মি ঘন মাধ্যম থেকে ঘন ও হালকা মাধ্যমের বিভেদতলে আপতিত হবে।

২. আপতন কোণ ক্রান্তি কোণের চেয়ে বড় হবে।

প্রশ্ন-৬২. পানিপূর্ণ বীকারে ডুবলে অর্ধপূর্ণ টেস্টবিউবের উপরের অংশ চকচকে দেখায় কেন?

উত্তর : একটি পানিপূর্ণ বীকারে আংশিক পানিপূর্ণ একটি টেস্টটিউব কাত করে বসিয়ে উপর থেকে দেখলে টেস্ট টিউবের ফাঁকা-অংশ চক্চকে দেখা যায় কিন্তু পানিপূর্ণ অংশ কালো দেখায়। আলোর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য এরকম হয়। বাইরে থেকে আলোক রশ্মিগুলো কাচের পাত্রের পানির মধ্যে এসে টেস্ট টিউবের গায়ে পড়ে। কিন্তু আলোক রশ্মি সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে আপতিত হয় বলে সেগুলো পূর্ণ প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে প্রবেশ করে। ফলে টেস্ট টিউবের কিছু অংশ চকচকে দেখায়।

প্রশ্ন-৬৩. পানিপূর্ণ গ্লাসের নিচ থেকে উপরের পৃষ্ঠের দিকে তাকালে দর্পণের মতো দেখায় কেন?

উত্তর : একটি পানিপূর্ণ গ্লাসকে ধীরে ধীরে চোখের উপরের দিকে তুললে পানির উপর পৃষ্ঠ দর্পণের মতো উজ্জ্বল দেখায়। গ্লাসকে উঁচু করতে করতে এমন একটা অবস্থানে আসে যখন বায়ু থেকে পানির মধ্য দিয়ে আগত আলোক রশ্মি গ্লাসের পানি ও উপরের বাতাসের ভেদতলে সংকট কোণের চেখে বড় কোণে আপতিত হয়। তাই আলোক রশ্মির পূর্ণ প্রতিফলন হয় এবং পানির উপরের তল দর্পণের মতো দেখায়।

প্রশ্ন-৬৪. হীরক এত উজ্জ্বল কেন?

উত্তর : হীরকের বিভিন্ন ধারগুলো এমনভাবে কাটা থাকে যে, তার কোনো এক পৃষ্ঠ দিয়ে আলোকরশ্মি ভেতরে প্রবেশ করলে প্রতিসরাঙ্ক (২.৪২) বেশি হওয়ার কারণে বেশ কয়েকটি পৃষ্ঠে তার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে এবং দু একটি পৃষ্ঠ দিয়ে আলোকরশ্মি ভেতর থেকে বের হয়ে যায়। হীরকে প্রবিষ্ট আলোকরশ্মির এই বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্যই তা এত উজ্জ্বল দেখায়।

প্রশ্ন-৬৫. গরমের দিনে পিচঢালা মসৃণ রাজপথে মরীচিকা দেখা যায় কেন?

উত্তর : গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত পিচঢালা মসৃণ রাজপথে মরীচিকা দেখা যায়। গরমের দিনে পথচারীর সামনে রাজপথকে বৃষ্টির অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের মতো ভেজা ও চকচকে মনে হয়। যেহেতু আমরা নিথর পানিতে আকাশের বিম্ব দেখে অভ্যস্ত, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের জন্য তাই রাজপথে আকাশের বিম্ব দেখে আমরা স্বভাবতই ভাবি যে রাজপথ ভেজা এবং সেখানে আলোর প্রতিফলন ঘটছে।

প্রশ্ন-৬৬. মরুভূমিতে মরীচিকা সৃষ্টির কারণ ও ফলাফল কি?

মরুভূমিতে সূর্যের প্রচণ্ড তাপে বালি খুব তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। ফলে বালি সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রা অনেক বেশি হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাওয়া যায় বায়ুর তাপমাত্রা ততই কমতে থাকে। এখন মরুভূমিতে অবস্থিত কোনো বস্তু থেকে আলোক রশ্মি পথিকের চোখে আসার সময় ঘনতর মাধ্যম থেকে লঘুতর মাধ্যমে প্রবেশ করতে থাকে। এক সময় আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে এবং আলোক রশ্মি বাঁকা পথে পথিকের চোখে পৌছাবে। যেহেতু পথিকের চোখ সোজা পথের বস্তুকেই শুধুমাত্র দেখতে পায়। তাই পথিক ঐ স্থানে বস্তুর একটি প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব অনুভব করবে এবং ঐ স্থানে পানির অস্তিত্ব আছে বলে ভুল করবে।

○ প্রশ্ন-৬৭. মেরু অঞ্চলে কিভাবে মরীচিকা সৃষ্টি হয়?

উত্তর : মেরু অঞ্চল খুব ঠাণ্ডা বলে ঐ অঞ্চলের ভূসংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা সবচেয়ে কম হয়। ফলে ভূসংলগ্ন বায়ুস্তর উপরের বায়ুস্তর অপেক্ষা অধিক ঘন। এখন দূরবর্তী কোনো জাহাজ বা নৌকা থেকে আলোকে রশ্মি উপরের দিকে যেতে থাকলে তা ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে প্রবেশ করে। ফলে প্রতিসরিত রশ্মি অভিলম্ব থেকে দূরে সরতে থাকে। এক সময় আপাতন কোণ সংকট কোণের চেয়ে বড় হয় এবং পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন সংঘটিত হয়। তখন আলোক রশ্মি নিচের দিকে বেঁকে যায় এবং এক সময় দর্শকের চোখে পড়ে। এতে দর্শকের কাছে মনে হয় যে, রশ্মিটি উপর থেকে আসছে এবং দর্শক নৌকা বা জাহাজের উল্টো বিম্ব দেখতে পায়।

○ প্রশ্ন-৬৮. অপটিক্যাল ফাইবার কি?

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার একধরনের পাতলা, স্বচ্ছ তন্তুবিশেষ, সাধারণত কাঁচ অথবা প্লাস্টিক দিয়ে বানানো; যা আলো পরিবহণে ব্যবহৃত হয়। যখন আলোকরশ্মি কাচ তন্তুর বা অপটিক্যাল ফাইবারের এক প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করে, তখন তন্তুর দেয়ালে বার বার এর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে, যতক্ষণ না অপর প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। একগুচ্ছ অপটিক্যাল ফাইবারকে আলোক নল বলে।

অপটিক্যাল ফাইবার সাধারণত টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানবদেহের ভিতরের কোনো অংশ দেখার জন্য বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া আলোকসজ্জা, সেন্সর ও ছবি সম্পাদনার কাজেও বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৬৯. 'হীরকের প্রতিসরাঙ্ক কাচের চেয়ে বেশি'—এর অর্থ কি?

উত্তর : হীরক ঘনতর মাধ্যম ও কাচ লঘুতর মাধ্যম। আলোকরশ্মি যখন কাচ থেকে হীরকে প্রতিসৃত হয় তখন আপতন কোণ প্রতিসরণ কোণ অপেক্ষা বড় হয়। আবার আলোর বেগ হীরকের চেয়ে কাচে বেশি। হীরক ও কাচের মধ্যকার সংকট কোণ অপেক্ষা বায়ু ও হীরকের মধ্যকার সংকট কোণ কম হবে।

○ প্রশ্ন-৭০. গ্লিসারিনপূর্ণ পাত্রে কাচদণ্ড রাখলে তা দেখা যায় না কেন?

উত্তর : বায়ুর সাপেক্ষে কাচের প্রতিসরাঙ্ক ১.৫২ এবং বায়ুর সাপেক্ষে গ্লিসারিনের প্রতিসরাঙ্ক ১.৪৭। অর্থাৎ গ্লিসারিন ও কাচের প্রতিসরাঙ্ক প্রায় সমান। তাই গ্লিসারিনপূর্ণ পাত্রে কাচদণ্ড ডুবালে তা একই প্রতিসরাঙ্কের কারণে দেখা যায় না।

○ প্রশ্ন-৭১. খাড়াভাবে তাকালে একটি পুকুরের গভীরতা প্রকৃত গভীরতা হতে কম মনে হয় কেন?

উত্তর : বাহির থেকে খাড়াভাবে তাকালে একটি পানিপূর্ণ পুকুরের তলদেশ প্রকৃত গভীরতা হতে কম গভীর বলে মনে হয়। আলোকের প্রতিসরণের দরুন এমনটি ঘটে। আলোকের প্রতিসরণের দরুন পুকুরের তলদেশের প্রতিটি বিন্দুর প্রতিবিম্ব তার গভীরতার কোনো নির্দিষ্ট অনুপাতে উপরে উৎপন্ন হয়। চোখে ঐ প্রতিবিম্বগুলো দেখা যায়। ফলে উপর থেকে দেখলে পুকুরকে কম গভীর বলে মনে হয়।

এ কারণেই কোনো শিকারী বায়ু হতে তির্যকভাবে তাকিয়ে পানির মধ্যে মাছ দেখে গুলি ছুঁড়লে মাছকে আঘাত না করে তার অবাস্তব প্রতিবিম্বকে আঘাত করে। ফলে মাছ গুলিবিদ্ধ হয় না।

ঘ লেন্স ও অভিসারী লেন্স
Lenses & Thin Converging Lens

○ প্রশ্ন-৭২. লেন্স বলতে কি বোঝায়? লেন্স কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : দুটি গোলীয় বা একটি গোলীয় ও অপরটি সমতল পৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ সমসত্ত্ব প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে।

লেন্সের প্রকারভেদ : লেন্স প্রধানত দু'রকমের হতে পারে; যথা—

ক. স্থূলমধ্য বা উত্তল বা অভিসারী লেন্স (Convex lens)

খ. ক্ষীণমধ্য বা অবতল বা অপসারী লেন্স (Concave lens)

○ প্রশ্ন-৭৩. উত্তল ও অবতল লেন্সের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

উত্তর : উত্তল ও অবতল লেন্সের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ :

উত্তল লেন্স	অবতল লেন্স
১. যে লেন্সের মধ্যভাগ মোটা ও প্রান্ত সরু তাকে উত্তল লেন্স বলে।	১. যে লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও প্রান্তভাগ মোটা তাকে অবতল লেন্স বলে।
২. আলোক রশ্মি উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয়।	২. আলোক রশ্মি অবতল পৃষ্ঠে আপতিত হয়।
৩. একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে অভিসারী করে থাকে।	৩. একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোক রশ্মিকে অপসারী করে থাকে।
৪. অভিসারী লেন্স।	৪. অপসারী লেন্স।
৫. বাস্তব ও অবাস্তব বিম্ব তৈরি হয়।	৫. সর্বদাই অবাস্তব বিম্ব তৈরি হয়।

○ প্রশ্ন-৭৪. উত্তল ও অবতল লেন্সের প্রকারভেদগুলো লিখুন।

উত্তর : তলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে প্রত্যেক প্রকার লেন্স আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথা—

উত্তল লেন্স :

i. উভোত্তল বা দ্বি-উত্তল লেন্স (Double convex lens or bi-convexlens) : এ লেন্সের দুটি তলই উত্তল।

ii. সমতলোত্তল লেন্স (Plano convex lens) : এ লেন্সের একটি তল সমতল ও অপরটি উত্তল।

iii. অবতলোত্তল লেন্স (Concavo-convex lens) : এ লেন্সের একটি তল উত্তল ও অপরটি অবতল।

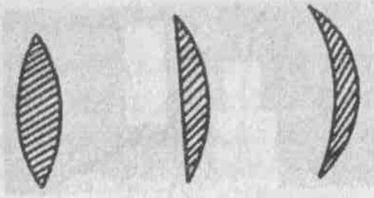

(i) (ii) (iii)

অবতল লেন্স :

i. উভোবতল বা দ্বি-অবতল লেন্স (Double concave or biconcave lens) : এ লেন্সের দুই তলই অবতল।
ii. সমতলাবতল লেন্স (Plano concave lens) : এ লেন্সের একটি তল সমতল ও অপরটি অবতল।
iii. উত্তলাবতল লেন্স (Convexo-concave) : এ লেন্সের একটি তল অবতল ও অপরটি উত্তল।

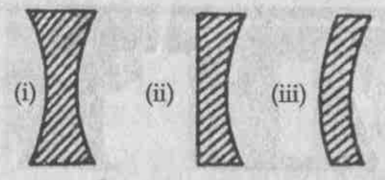

০ প্রশ্ন-৭৫. লেন্সের প্রধান ফোকাস কি?

উত্তর : লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এবং নিকটবর্তী রশ্মিগুচ্ছ প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্সে) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্সে) সেই বিন্দুকে লেন্সের প্রধান ফোকাস বলে।

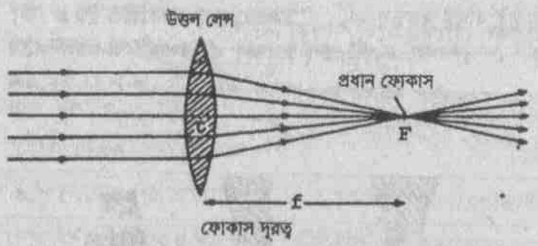

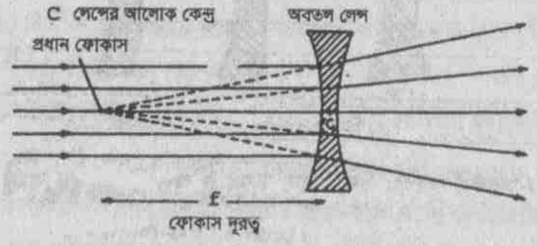

০ প্রশ্ন-৭৬. লেন্সের আলোক কেন্দ্র কি?

উত্তর : কোনো আলোক রশ্মি যদি কোনো লেন্সের এক পৃষ্ঠে আপতিত হয়ে নির্গত হওয়ার সময় আপতিত রশ্মির সমান্তরালভাবে নির্গত হয় তাহলে সেই রশ্মি প্রধান অক্ষের উপর যে বিন্দু দিয়ে যায় সেই বিন্দুকে আলোক কেন্দ্র বলে।

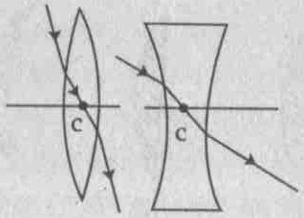

০ প্রশ্ন-৭৭. লেন্সের ক্ষমতা কি?

উত্তর : একগুচ্ছ সমান্তরাল আলোকরশ্মিকে কোনো লেন্সের অভিসারী (উত্তল লেন্স) গুচ্ছে বা অপসারী (অবতল লেন্স) গুচ্ছে পরিণত করার প্রবণতা বা সামর্থ্যকে লেন্সের ক্ষমতা বলে।

০ প্রশ্ন-৭৮. লেন্স কিভাবে সনাক্ত করা যায়?

উত্তর : উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্বের মধ্যে কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকলে সেই বস্তুর অসদ, সোজা ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয়। আবার অবতল লেন্সের সামনে বস্তু রাখলে তার অসদ, সোজা ও খর্বিত বিম্ব গঠিত হয়। সুতরাং লেন্স সনাক্ত করার জন্য লেন্সের সামনে খুব কাছাকাছি একটি আঙুল রেখে অপর দিক থেকে দেখলে যদি আঙুলের সোজা ও বিবর্ধিত বিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্স উত্তল আর যদি সোজা কিন্তু খর্বিত প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তাহলে সেই লেন্স অবতল।

০ প্রশ্ন-৭৯. লেন্সের ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : অবতল ও উত্তল উভয় প্রকার লেন্সই আমাদের অনেক জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।

উত্তল লেন্সের ব্যবহার : উত্তল লেন্সকে আতশী কাঁচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। উত্তল লেন্সের সাহায্যে আলোকরশ্মিকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রিভূত করে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

চশমা, ক্যামেরা, বিবর্ধক কাচ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি আলোক যন্ত্রে উত্তল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

অবতল লেন্সের ব্যবহার : প্রধানত চশমায় ব্যবহার করা হয়। এছাড়া গ্যালিলিওর দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও অবতল লেন্স ব্যবহার করা হয়।

ঙ আলোর বিচ্ছুরণ
Dispersion of Light

০ প্রশ্ন-৮০. প্রিজম কি?

উত্তর : দুটি হেলানো সমতলপৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে। প্রিজমে ছয়টি আয়তক্ষেত্রিক তল অথবা তিনটি আয়তক্ষেত্রিক ও দুটি ত্রিভুজাকৃতি তল থাকে।

০ প্রশ্ন-৮১. প্রিজমের মধ্য দিয়ে গমনের ফলে সাদা আলো কোন কোন রঙে বিশ্লিষ্ট হয়?

উত্তর : প্রিজমের ভিতর দিয়ে গমনের ফলে সাদা আলো ৭টি রঙে বিশ্লিষ্ট হয়। রঙগুলো হলো : বেগুনি (Violet), নীল (Indigo), আসমানী (Blue), সবুজ (Green), হলুদ (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল (Red)। সংক্ষেপে এদেরকে VIBGYOR ও বাংলায় বেনীআসহকলা বলে।

০ প্রশ্ন-৮২. সাদা আলোর গঠন প্রকৃতি লিখুন।

উত্তর : সাদা আলোর গতিপথে একটি প্রিজম রাখা হলে সাদা আলোর প্রতিসৃত রশ্মিতে সাতটি রঙ-এর একটি বর্ণালী পাওয়া যায়। এ বর্ণগুলো হলো বেগুনি, নীল, আসমানী, হলুদ, সবুজ, কমলা ও লাল। এ সাতটি বর্ণের যে কোনো একটির গতিপথে প্রিজম রাখলে এটি আর বিশ্লিষ্ট হয় না। কাজেই এ সাতটি বর্ণ দ্বারা গঠিত সাদা আলো একটি যৌগিক রং। ১৬৬৬ সালে বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন সাদা আলোকের প্রকৃতি যে যৌগিক তা প্রমাণ করেন।

○ প্রশ্ন-৮৩. আলোক বিচ্ছুরণ কি?

উত্তর : প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোর প্রতিসরণের ফলে সাদা রঙের আলো সাতটি মূল রঙের আলোকে বিশ্লিষ্ট হওয়ার প্রণালীকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো মাধ্যমে প্রতিসরণের ফলে যৌগিক আলো থেকে মূল বর্ণের আলো পাওয়ার পদ্ধতিকে আলোর বিচ্ছুরণ বলে।

○ প্রশ্ন-৮৪. রংধনু কাকে বলে?

উত্তর : বৃষ্টির সময় বা বৃষ্টি পরবর্তী সময়ে বর্তুলাকার বৃষ্টির ফোঁটার ওপর সূর্যের আলোকরশ্মি পতিত হলে তা বিচ্ছুরিত হয়ে সূর্যের বিপরীত দিকের আকাশে ধনুকের আকারে যে সাতরঙের বর্ণালীর সৃষ্টি করে তাকে রংধনু বলে।

○ প্রশ্ন-৮৫. আলোর বিক্ষেপণ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : বিভিন্ন বর্ণের আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন। আলোক তরঙ্গ যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার ওপর আপতিত হয় তখন কণাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে আলোক বিক্ষেপণ বলে।

○ প্রশ্ন-৮৬. পরিপূরক রং কি?

উত্তর : আমরা জানি, সাদা আলো সাতটি বর্ণের সমষ্টি। এখন সাতটি বর্ণ থেকে যদি কোনো একটি বর্ণ বাদ দেয়া যায় তাহলে, তা আর সাদা থাকে না, রঙিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে বর্ণটি বাদ দেয়া হয়েছে এবং ঐ বর্ণ বাদ দেয়ার ফলে যে বর্ণের সৃষ্টি হয় তাদেরকে একে অপরের পরিপূরক বলা হয়। যেমন– বর্ণালীর নীল আলো সরিয়ে নিলে সামগ্রিক বর্ণটি হলুদ হয়। এক্ষেত্রে হলুদ ও নীল পরিপূরক বর্ণ।

○ প্রশ্ন-৮৭. মৌলিক রং কি কি? মানুষ কিভাবে রঙিন বস্তু দেখে?

উত্তর : যে সকল বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় না তাদেরকে মৌলিক বর্ণ বলে।

মৌলিক বর্ণ তিনটি। যথা– আসমানী বা নীল, সবুজ ও লাল। এদেরকে সংক্ষেপে 'আসল' বলা হয়।

সাদা রং মূলত সাতটি মৌলিক বর্ণের সমষ্টি। কোনো একটি বস্তু যে বর্ণ প্রতিফলিত করে বস্তুটিকে আমরা সে রঙেই দেখি। আর মৌলিক রঙগুলোর সমন্বয়েই অন্য সব রং তৈরি হয়। যেমন–

সবুজ + লাল = হলুদ　　　লাল + নীল + সবুজ = সাদা

লাল + নীল = ম্যাজেন্টা　　　নীল + হলুদ = সাদা ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৮৮. মনোক্রোমেটিক আলোক উৎস বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সাদা আলো আসলে অনেকগুলো আলোর সংমিশ্রণ। কিন্তু যেসব আলোক উৎস থেকে শুধুমাত্র এক বর্ণের আলোক উৎপন্ন হয়, তাদেরকে বলে মনোক্রোমেটিক উৎস। যেমন– সোডিয়াম বাতি। সোডিয়াম বাতিতে সোডিয়াম ছাড়াও থাকে নিষ্ক্রিয় গ্যাস। বাতির ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে যখন বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়, তখন সোডিয়াম চার্জপ্রাপ্ত হয়ে এক বর্ণের আলোক বিকিরণ করে।

○ প্রশ্ন-৮৯. মৌলিক রংগুলো কি কি? কোনো বস্তুর রং কালো দেখায় কেন?

উত্তর : কোনো একটি পদার্থ থেকে প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা শোষণের পরে যে বর্ণের আলোক চোখে পতিত হয় তাই পদার্থের রঙ বা বর্ণ। মৌলিক বর্ণ– লাল, সবুজ ও নীল (আসমানী)। এ তিন রঙের সংমিশ্রণে অন্য সব রঙ তৈরি করা যায়।

কোনো বস্তু বর্ণালীর সাতটি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণ প্রতিফলিত করে তাকে ঐ বর্ণের দেখায়। যেমন– নীল বর্ণের বস্তু সাতটি বর্ণের মধ্যে নীল বর্ণকে প্রতিফলিত করে বাকি ছয়টি বর্ণ শোষণ করে। আবার সাদা বস্তু সাতটি বর্ণের সবগুলোকে প্রতিফলিত করে তাই একে সাদা দেখায়। কিন্তু কালো বস্তু সাতটি বর্ণের সবগুলোকেই শোষণ করে; কোনো বর্ণকেই প্রতিফলিত করে না। এজন্য ঐ বস্তুকে কালো দেখায়।

চ আলোর কণা ধর্ম, আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ও আলোক কোষ

Particle Nature of Light, Einstein's Photoelectric Eqution & Photocells

○ প্রশ্ন-৯০. ফটো তড়িৎ ক্রিয়া বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে ধাতব পদার্থের উপর দৃশ্যমান আলোক কিংবা অন্য কোনো বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ আপতিত হলে ঐ পদার্থ হতে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আলোক রশ্মি যতক্ষণ পর্যন্ত ধাতব পদার্থে আপতিত হয়, ততক্ষণই ইলেকট্রন নির্গত হয়। ধাতব পদার্থ হতে নির্গত ইলেকট্রনকে বলা হয় ফটো ইলেকট্রন (Photo electron) বা আলোক ইলেকট্রন। আলোকের প্রভাবে ধাতব পদার্থ হতে ইলেকট্রনের নির্গমনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় আলোক তড়িৎ নির্গমন (Photo-electric effect) এবং এই ক্রিয়াকে বলা হয় ফটো-ইলেকট্রিক ক্রিয়া বা আলোক তড়িৎ ক্রিয়া (Photo-electric effect)।

○ প্রশ্ন-৯১. আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য লিখুন?

উত্তর : আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য রয়েছে :

১. আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আলোক তড়িৎ ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং আলোক রশ্মির আপতন বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ ক্রিয়া বন্ধ হয় অর্থাৎ এটি একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা।
২. প্রত্যেক ধাতু হতে আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের জন্য আপতিত রশ্মির একটি ন্যূনতম কম্পাঙ্ক থাকে যার নাম প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক।
৩. বিভিন্ন ধাতুর ক্ষেত্রে প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক বিভিন্ন।
৪. আলোক ইলেকট্রনের বেগ কোনো নির্দিষ্ট শীর্ষ মানের মধ্যে হতে পারে।
৫. আলোক ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ গতিবেগ আপতিত রশ্মির কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক।
৬. আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের হার আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-৯২. আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যায় চিরায়ত আলোকের তরঙ্গ তত্ত্বের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা লিখুন।

উত্তর : আলোক তড়িৎ নির্গমনের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। আলোকের তরঙ্গ তত্ত্ব বা আলোকের বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার কারণসমূহ নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. এ তত্ত্ব অনুসারে নির্গত ইলেকট্রনের বেগ আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভর করে। কিন্তু ফলাফল তা নয়। সুতরাং পরীক্ষালব্ধ ফলটিকে তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

খ. এ তত্ত্ব অনুসারে নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার পরীক্ষালব্ধ ফলাফল হতে আমরা পাই যে, নির্গত ইলেকট্রনের প্রাথমিক গতি শক্তি আপতিত আলোকের তীব্রতার উপর নির্ভরশীল নয়, তা আপতিত আলোকের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পরীক্ষালব্ধ ফলটিকে তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

গ. এ তত্ত্ব অনুসারে আলোকের শক্তি সমগ্র তরঙ্গ মুখের উপর সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং ঐ তরঙ্গ মুখ হতে পরমাণু প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে ইলেকট্রন নির্গত করতে অনেক সময় নিবে অর্থাৎ ঘটনাটি তাৎক্ষণিক হবে না। কিন্তু আলোক ইলেকট্রন নির্গমন একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা। অতএব পরীক্ষালব্ধ ফলটিকে তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ঘ. যে কোনো ধাতব পদার্থের ক্ষেত্রে এর প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক অধিক হতে হবে। তা না হলে ইলেকট্রন নির্গত হবে না। এই প্রারম্ভ কম্পাঙ্কের অস্তিত্ব তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না।

ঙ. অধিক প্রাবল্যের আলোক, নির্গত ইলেকট্রনকে অধিক পরিমাণে গতিশক্তি প্রদান করবে। কিন্তু এখানে তা ঘটে না।

চ. নির্গত ইলেকট্রনের বেগ আপতিত আলোকের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে না। কিন্তু এটি সত্য নয়। অতএব আলোকের তরঙ্গ তত্ত্বের সাহায্যে আলোক তড়িৎ নির্গমন ব্যাখ্যা করা যায় না।

○ প্রশ্ন-৯৩. আলোক তড়িৎ নির্গমনের সূত্রাবলি লিখুন।

উত্তর : ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লিনার্ড, থমসন, রিচার্ডসন এবং কম্পটন-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল হতে নির্ণীত হয়েছে যে আলোক তড়িৎ নির্গমন নিম্নলিখিত সূত্র মেনে চলে।

১ম সূত্র : আলোক তড়িৎ নির্গমন একটি তাৎক্ষণিক ঘটনা। অর্থাৎ আপতিত রশ্মি পতনকাল এবং আলোক ইলেকট্রন এর নির্গমনকালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যদি থাকেও তবে তা অবশ্যই 3×10^{-9} সেকেন্ডের কম।

২য় সূত্র : প্রতিটি আলোক ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে আপতিত আলোক রশ্মির একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম কম্পাঙ্ক রয়েছে, যার নাম প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক।

৩য় সূত্র : আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক প্রারম্ভ কম্পাঙ্ক অপেক্ষা অধিক হলে আলোক তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা আপতিত আলোকের প্রাবল্যের সমানুপাতিক অর্থাৎ $i \propto I$.

এখানে, i = তড়িৎ প্রবাহ মাত্রা এবং

I = আলোকের প্রাবল্য।

৪র্থ সূত্র : আলোক ইলেকট্রনের গতিবেগ তথা গতিশক্তি আপতিত আলোকের প্রাবল্যের ওপর নির্ভর করে না, বরং আপতিত আলোকের কম্পাঙ্ক এবং নিঃসারক বা নির্গমক (emitter)-এর প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

○ প্রশ্ন-৯৪. আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ লিখুন।

উত্তর : ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রয়োগ করেন। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে যে কোনো বিকিরণ অসংখ্য ফোটনের সমষ্টি অর্থাৎ বিকিরণ ফোটনের একটি ঝাঁক বা ঝরনা। একে ফোটন হাইপোথেসিস বলে। যদি υ ফোটনের কম্পাঙ্ক হয়, তবে প্রতিটি ফোটনের শক্তি হবে $= h\upsilon$, এখানে h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। মনে করি $h\upsilon$ শক্তিবিশিষ্ট একটি ফোটন কোনো একটি ধাতব পাতের পরমাণুর ওপর আপতিত হলো ফোটনের সাথে

পরমাণুর একটি সংঘাত হবে এবং এ সংঘাত একটি স্থিতিস্থাপক সংঘাত হবে। এ সংঘাতের ফলে পরমাণুস্থ একটি ইলেকট্রন ফোটনের সমুদয় শক্তি গ্রহণ করবে এবং কোনো শক্তি স্থানান্তরিত হবে না। এখন ইলেকট্রনটি নিউক্লিয়ারের সঙ্গে আবদ্ধ থাকায় এ শক্তির কিছু অংশ (W) ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ হতে মুক্ত করতে ব্যয় হবে। অবশিষ্ট শক্তি নিয়ে ইলেকট্রন v বেগে নির্গত হবে। যদি ইলেকট্রনের ভর m হয় তবে এর গতিশক্তি $= \frac{1}{2}mv^2$ ।

অতএব শক্তির নিত্যতা সূত্র হতে পাই,

$$h\upsilon = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

বা, $\frac{1}{2}mv^2 = h\upsilon - W$...........(1)

এখানে w = ইলেকট্রনকে নিউক্লিয়াসের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে ব্যয়িত শক্তি। যখন বন্ধনশক্তি ন্যূনতম হবে, তখন নির্গত ইলেকট্রনের গতিশক্তি বা বেগ সর্বোচ্চ মানের হবে। এ ন্যূনতম বন্ধনশক্তি, W_0 এবং নির্গত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ বেগ Vm হলে, সমীকরণ (1)-কে লেখা যায়।

$\frac{1}{2}mv_m{}^2 = h\upsilon - W_0$...........(2)

ন্যূনতম বন্ধনশক্তি W_0-কে বলা হয় কার্য অপেক্ষক (Work function)। W_0 বিভিন্ন পদার্থের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মানের হয়।

সমীকরণ (1) ও (2) হলো আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ। $h\upsilon = w_o$

○ প্রশ্ন-৯৫. আলোক তড়িৎ কোষ কি? এটি কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : সংজ্ঞা : যে যন্ত্রের সাহায্যে আলোক তড়িৎ ক্রিয়ার ভিত্তিতে আলোক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, তাকে আলোক তড়িৎ কোষ বলে।

আলোক তড়িৎ কোষ তিন প্রকার। যথা :

১. আলোক নিঃসরণ কোষ (Photo-emission cell)

২. আলোক বিভব কোষ (Photo-voltaic cell) এবং

৩. আলোক পরিবাহী কোষ (Photo-conductive cell)

আলোক নিঃসরণ কোষকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা :

ক. বায়ু শূন্য কোষ (Vacuum type cell) এবং

খ. গ্যাস ভর্তি কোষ (Gas-filled cell)

○ প্রশ্ন-৯৬. আলোক বিদ্যুৎ কোষের ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : আলোক বিদ্যুৎ কোষের ব্যবহার : আধুনিক বিজ্ঞান জগতে আলোক-বিদ্যুৎ কোষের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। এটি টেলিভিশন, সিনেমা, আলোক টেলিগ্রাম, আগুন লাগার সঙ্কেত, চোর-ডাকাত ধরা ইত্যাদি বহু ধরনের কার্যে ব্যবহৃত হয়।

ছ আলোর সাধারণ ব্যবহারিক ধর্ম
Practical Nature of Light

○ প্রশ্ন-৯৭. নীল কাচের মধ্য দিয়ে সাদা ফুল নীল ও হলুদ ফুল কালো দেখায় কেন?

উত্তর : কোনো বস্তুর উপর আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসলে সে বস্তুটি আমরা দেখতে পাই। প্রতিফলিত আলোর যে বর্ণ থাকে বস্তুটিকেও আমরা সেই বর্ণের দেখি। একটি সাদা ফুল সূর্যের সাতটি আলোই প্রতিফলিত করে বলে তা সাদা দেখায়। সাদা ফুল থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি যখন নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসে তখন ঐ কাচ নীল ব্যতীত অন্যসব বর্ণের আলো শোষণ করে নেয়, তাই আমাদের চোখে শুধু নীল আলো পৌঁছে। ফলে ফুলটি নীল দেখায়। পক্ষান্তরে, হলুদ ফুল শুধু হলুদ বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে বলে তা হলুদ দেখায়। কিন্তু হলুদ বর্ণের আলোক নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসার সময় শোষিত হয় তাই হলুদ ফুলকে নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে কালো দেখায়।

○ প্রশ্ন-৯৮. দুটি ভিন্ন রঙের স্বচ্ছ পদার্থ পরপর রেখে তার মধ্য দিয়ে সাদা আলো দেখলে কালো দেখায় কেন?

উত্তর : এর কারণ প্রথম স্বচ্ছ পদার্থটির যে রঙ সেটি ছাড়া অন্যসব রঙ শোষণ করে নেয় এবং প্রথম স্বচ্ছ পদার্থ থেকে বেরিয়ে আসা রঙটি দ্বিতীয় স্বচ্ছ পদার্থটি দ্বারা শোষিত হয় বলে আমাদের চোখে কোনো আলো আসে না তাই কালো দেখায়। উদাহরণস্বরূপ একখণ্ড লাল কাচ ও একখণ্ড সবুজ কাচ পর পর রেখে সূর্যালোকের দিকে ধরলে প্রথমে লাল কাচ লাল বর্ণের রশ্মিকে নিজের ভেতর দিয়ে যেতে দিবে কিন্তু তা যখন সবুজ কাচের উপর পড়বে তখন আর ঐ কাচের মধ্য দিয়ে যেতে পারবে না ফলে এদেরকে কালো দেখাবে।

○ প্রশ্ন-৯৯. আকাশ নীল দেখায় কেন?

উত্তর : সূর্যের আলোর মধ্যে বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাতটি বর্ণের আলোই বিদ্যমান। যখন কোনো একটি আলোক তরঙ্গ অত্যন্ত ক্ষুদ্র কোনো কণার উপর পড়ে, তখন এ কণাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে আলোক বিক্ষেপণ (ওডর্টশরধভথ) বলে। এ বিক্ষেপণ নির্ভর করে আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ওপর। আমরা জানি, কম দৈর্ঘ্যের আলোক তরঙ্গের বিক্ষেপ বেশি। বর্ণালী হতে দেখা যায় যে, নীল বর্ণের আলোক তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। সূর্যরশ্মি যখন বায়ুমণ্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণা ও অণুতে আপতিত হয়, তখন নীল বর্ণ ও এর কাছাকাছি বর্ণগুলোর বেশি বিক্ষেপণ ঘটে। ফলে বেগুনি, আসমানী ও নীল বর্ণের আলোক প্রাচুর্য ঘটায় আকাশ নীল দেখায়।

বায়ুমণ্ডল না থাকলে অবশ্য আমরা আকাশের এ নীলিমা থেকে বঞ্চিত হতাম। কারণ সেক্ষেত্রে আলোকরশ্মির বিক্ষেপণ হতো না। ফলে আকাশ অন্ধকার বা কালো দেখাত।

○ প্রশ্ন-১০০. দিনের বেলায় চাঁদকে পুরো সাদা দেখালেও সূর্যাস্তের পর হলদে দেখায় কেন?

উত্তর : চাঁদের প্রকৃত নিজস্ব রং হচ্ছে হলুদ। দিনের বেলায় আকাশ কর্তৃক বিক্ষিপ্ত হালকা নীল আলো চাঁদের নিজস্ব হলুদ রঙের সাথে মিশে যায়। এ দুটি বর্ণের মিশ্রণের (নীল + হলুদ = সাদা) ফলে চোখে চাঁদকে সাদা বলে মনে হয়। কিন্তু সূর্যাস্তের পর আকাশের হালকা নীল বর্ণ লোপ পায় বলে চাঁদকে হলদে মনে হয়।

○ প্রশ্ন-১০১. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য লাল দেখায় কেন?

উত্তর : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য ও আকাশের খানিকটা অংশ গাঢ় লাল দেখায়। আলোক বিক্ষেপণের জন্য এরকম দেখায়। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় সূর্য প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি থাকে এবং সূর্যালোক আমাদের চোখে পৌঁছতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের পুরু স্তর ভেদ করতে হয়। ফলে রশ্মিকে বায়ুমণ্ডলে ভাসমান ধূলিকণা, পানিকণা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নীল প্রান্তের কম তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বর্ণগুলো বিক্ষেপিত হয়, কিন্তু লাল প্রান্তের আলোকগুলো বিশেষ করে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় তা কম বিক্ষেপিত হয়, ফলে সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসে। তাই আমরা প্রভাতসূর্য ও অস্তরবিকে লাল দেখি।

○ প্রশ্ন-১০২. লাল আলোতে গাছের পাতা কালো দেখায় কেন?

উত্তর : দিনের বেলায় সূর্যালোকে গাছের পাতা সবুজ দেখায় অথচ লাল আলোতে গাছের পাতার রং কালো বলে মনে হয়। দিনে গাছের পাতার ক্লোরোফিল সূর্যালোকের সবুজ ব্যতীত অন্য সাতটি বর্ণের সবকটিকেই শোষণ করে বলে গাছের পাতা সবুজ দেখায়। কিন্তু যখন লাল আলোতে সবুজ পাতা দেখি তখন সবুজ বর্ণ লাল আলোতে শোষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, পাতার ক্ষেত্রে সূর্যের আলোতে সবুজ বাদে বাকীগুলো শোষিত হয় এবং লাল আলোতে সবুজ শোষিত হয়, অর্থাৎ সূর্যের সবগুলো বর্ণ শোষিত হয়। কোনো আলোই প্রতিফলিত হয় না। তাই লাল আলোতে গাছের সবুজ পাতা কালো দেখায়।

○ প্রশ্ন-১০৩. সিনেমা হলের পর্দা সাদা ও অমসৃণ রাখা হয় কেন?

উত্তর : সাদা পর্দা অন্য কোনো আলোকরশ্মি শোষণ না করে প্রতিফলিত করে। যার ফলে সিনেমার ঔজ্জ্বল্য কমে না এবং যে রঙের আলোকরশ্মি আপতিত হয় তার কোনো পরিবর্তন হয় না। পাশাপাশি দর্শক স্পষ্ট ছবি দেখতে পায়। এ কারণেই সিনেমা হলে সাদা পর্দা ব্যবহার করা হয়।

আর সিনেমা হলের পর্দা অমসৃণ হওয়ার কারণ হলো, এতে পর্দার ওপর আপতিত আলোকরশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়া এ আলোকরশ্মিগুলো সিনেমা হলের অভ্যন্তরে চতুর্দিকের সব দর্শকের চোখে পড়ে।

○ প্রশ্ন-১০৪. অন্ধকার ঘরে টিভি দেখা উচিত নয় কেন?

উত্তর : টেলিভিশনের তীব্র ঔজ্জ্বল্যের আলো চোখের ভেতর অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটায়। এতে চোখের অক্ষিপট বা রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া পর্দার আলোর কম্পন প্রকট হওয়ায় চোখ তাতে শ্রান্ত হতে পারে। তাই অন্ধকার ঘরে টেলিভিশন দেখা উচিত নয়।

○ প্রশ্ন-১০৫. আমরা কাছের জিনিস বড় এবং দূরের জিনিস ছোট দেখি কেন?

উত্তর : কোনো বস্তু হতে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পৌছলে আমরা সেই বস্তু দেখি। বস্তুর দুই প্রান্ত হতে প্রতিফলিত আলো আমাদের চোখে যে পরিমাণ কোণ উৎপন্ন করে বস্তুটিকে আমরা সে রকম দেখতে পাই। বস্তুর অবস্থান দূরে হলে বস্তুটি আমাদের চোখে ছোট কোণ উৎপন্ন করে এবং আমরা বস্তুটিকে ছোট দেখতে পাই। অন্যদিকে কাছের বস্তু আমাদের চোখে বড় কোণ উৎপন্ন করে বলে আমরা বড় দেখি।

○ প্রশ্ন-১০৬. পদ্ম পাতার ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়লে চকচকে দেখায় কেন?

উত্তর : পদ্ম পাতায় অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রোঁয়া থাকে। পাতার ওপর পানির ফোঁটা পড়লে ঐ রোঁয়াগুলোর ওপর আটকে থাকে। ফলে পাতা এবং পানির ফোঁটার মাঝের অংশে বাতাস থাকে। আলোর আপতিত রশ্মির যেগুলো সংকট কোণের চেয়ে বড় কোণে পানির ফোঁটার তলে আপতিত হয়, সেগুলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। এ প্রতিফলিত রশ্মি দর্শকের চোখে পড়ে বলে পানির ফোঁটাকে চকচকে দেখায়।

○ প্রশ্ন-১০৭. সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও সূর্যকে কিছুক্ষণ দেখা যাবে কেন?

উত্তর : সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড বা ৮.৩ মিনিট সময় লাগে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে শেষ যে আলোকরশ্মি সূর্য থেকে নির্গত হবে, সে রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে আরো ৮.৩ মিনিট সময় লাগবে। সূর্য আকাশে না থাকলেও এই ৮.৩ মিনিট সময় ধরে আলো পৃথিবীতে আসতে থাকবে। ফলে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরও ৮.৩ মিনিট সময় ধরে সূর্যকে আকাশে দেখা যাবে।

○ প্রশ্ন-১০৮. রাতে যেসব নক্ষত্র আমরা দেখি, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বহু বছর আগে লোপ পেয়েছে– বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : রাতের আকাশে এমন বহু নক্ষত্র আছে যাদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ। সুতরাং ঐ বিশাল দূরত্বে থাকা কোনো নক্ষত্র হতে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে বহু কোটি বছর সময় লাগবে। বিশাল দূরত্বের কোনো নক্ষত্র যদি কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দী আগে ধ্বংস হয়ে থাকে তবে ঐ নক্ষত্র হতে সর্বশেষ নির্গত আলোকরশ্মি বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে আসতে থাকবে। এজন্য আমরা ঐ নক্ষত্রকে আকাশে দেখতে পাব যদিও নক্ষত্রটি অনেক পূর্বেই ধ্বংস হয়েছে।

○ প্রশ্ন-১০৯. অনেক দূরের গাছপালা, লাইট পোস্ট ইত্যাদিকে ছোট দেখায় কেন?

উত্তর : একটি বস্তু বড় বা ছোট দেখাবে কিনা তা নির্ভর করে চোখে বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন বীক্ষণ কোণের ওপর। বীক্ষণ কোণ যদি বড় হয় তাহলে বস্তু বড় দেখায় এবং বীক্ষণ কোণ যদি ছোট হয় তবে বস্তু ছোট দেখায়। অনেক দূরের গাছপালা, লাইট পোস্ট ইত্যাদি ছোট দেখায় কারণ এসব ক্ষেত্রে বীক্ষণ কোণের মান ছোট থাকে।

○ প্রশ্ন-১১০. চাঁদের হলদে আলোতে লাল গোলাপ কেমন দেখায়?

উত্তর : চাঁদের হলদে আলোতে লাল গোলাপ কালো দেখাবে। কারণ লাল বর্ণের বস্তু লাল বর্ণ ব্যতীত অন্য সব বর্ণকে শোষণ করে এবং লাল বর্ণকে প্রতিফলিত করে। চাঁদের হলদে আলো লাল গোলাপের উপর পড়লে লাল গোলাপ হলুদ আলো শোষণ করে নেবে। ফলে কোনো আলোই প্রতিফলিত হবে না। কোনো আলো প্রতিফলিত না হওয়ায় ফুলটি কালো দেখাবে।

○ প্রশ্ন-১১১. কাচ স্বচ্ছ কিন্তু কাচের গুঁড়া অস্বচ্ছ কেন?

উত্তর : সাধারণত কাচ স্বচ্ছ কিন্তু একে গুঁড়া করলে অস্বচ্ছ হয়। এর কারণ কাচের গাত্র সব সময় মসৃণ, সমতল ও সমান হওয়ায় আলোকরশ্মির নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে কিন্তু কাচের ছোট ছোট অমসৃণ তল বিশিষ্ট কণা থেকে আলোকরশ্মি বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। তাই গুঁড়া কাচ অস্বচ্ছ সাদা বলে মনে হয়। আবার কাচের গুঁড়া পানি দিয়ে ভেজালে পানির ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিসরণের সুবিধা হয় বলে তা পুনরায় স্বচ্ছ দেখায়।

○ প্রশ্ন-১১২. সমুদ্রের ফেনা সাদা দেখায় কেন?

উত্তর : সমুদ্রের ঢেউয়ের ফেনা অসংখ্য জলকণার সমষ্টি। আলোকরশ্মি পানির কণাসমূহের ওপর পড়লে পানির কণা প্রিজমের কাজ করে। ফলে সূর্যরশ্মি পানিকণায় বিচ্ছুরিত হয়ে বিভিন্ন বর্ণে বিশ্লিষ্ট হয়। পানি কণাগুলো যেহেতু অত্যন্ত কাছাকাছি থাকে, তাই বিশ্লিষ্ট বর্ণগুলো একত্রে মিশে সাদা দেখায়।

○ প্রশ্ন-১১৩. হলোগ্রাফী ও হলোগ্রাম কি?

উত্তর : হলোগ্রাফী হলো লেন্সের ব্যবহার ব্যতিরেকে অদ্ভুত আলোকচিত্র তৈরির একটি পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে গৃহীত আলোক প্রতিবিম্বকে বলা হয় হলোগ্রাম। এক্ষেত্রে প্রাপ্ত ছবি ত্রিমাত্রিক। এটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। সাধারণত কম্পিউটারে তথ্য সঞ্চয় করে রাখা, বস্তুর গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণে হলোগ্রাফী ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-১১৪. সৌরশক্তি কি? সৌরশক্তির ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : সূর্যতাপ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে সৌরশক্তি বলে। সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপকে ধাতব চাকতির সাহায্যে প্রতিফলিত করে তা দিয়ে রান্নাবান্নার কাজ চালানো হয়। লেন্সের মাধ্যমে ফোকাস করে সূর্যালোক থেকে আগুন জ্বালানো যায়। সৌরতাপে শস্য, সবজি, মাছ ইত্যাদি শুকানোর কাজ করা যায়। সৌরশক্তির সাহায্যে বয়লারে বাষ্প তৈরি করে তার দ্বারা তড়িৎ উৎপাদনের জন্য টারবাইন ঘুরানো যায়।

○ প্রশ্ন-১১৫. সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্ব ও টিউব লাইটের আলোর মধ্যে উৎপত্তিগত পার্থক্য কি?

উত্তর : সাধারণ বৈদ্যুতিক বাল্বে টাংস্টেন-এর সরু তার ব্যবহৃত হয়। তড়িৎপ্রবাহ টাংস্টেন তারের মধ্য দিয়ে উচ্চ রোধের মুখে চলার সময় টাংস্টেন তার থাকে বলে ফিলামেন্ট খুব উত্তপ্ত হয় এবং আলো বিকিরণ করে। টিউব লাইটে কাচের নলের মধ্য দিয়ে নিম্নচাপে বায়ু চালনা (Discharge) করা হয়। নিম্নচাপে গ্যাসের মধ্যে বিদ্যুৎক্ষরণের ফলে এ বাতিতে আলো পাওয়া যায়। নলের একপ্রান্তে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথোড এবং অপরপ্রান্তে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানোড থাকে। ভেতরের বায়ুচাপ কমিয়ে 5mm পারদ স্তম্ভের সমান করে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয়। এতে তড়িৎদ্বারের মধ্যকার জায়গা, তরঙ্গায়িত উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হয়।

○ প্রশ্ন-১১৬. আলোকবর্ষ কি? সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে কত সময় লাগে?

উত্তর : কোনো মাধ্যমে আলো এক বৎসরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে এক আলোকবর্ষ বলে। এটি আলো পরিমাপের দৈর্ঘ্যের একটি একক। শূন্য মাধ্যমে এক আলোকবর্ষ = 9.461 × 1012 কিলোমিটার।

আমরা জানি, আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার এবং সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় 15 কোটি কিমি। সুতরাং সূর্য হতে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগবে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড (প্রায়)।

○ প্রশ্ন-১১৭. বস্তুর বর্ণ নির্ভর করে কিসের ওপর?

উত্তর : বর্ণ বস্তুর কোনো ধর্ম নয়। কোনো বস্তুর উপর আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসলে সে বস্তুটি আমরা দেখতে পাই। বস্তু সাধারণত দু রকমের হয়; যথা : ১. স্বপ্রভ (Self luminous) ও ২. নিষ্প্রভ (Non-luminous)। স্বপ্রভ বস্তুর বর্ণ নির্ভর করে তা থেকে নির্গত আলোক তরঙ্গের বর্ণের ওপর। অন্যদিকে নিষ্প্রভ বস্তুর নিজস্ব কোনো বর্ণ নেই। এর বর্ণ নির্ভর করে : ১. বস্তুর প্রকৃতি ও ২. আপতিত আলোর প্রকৃতির উপর।

○ প্রশ্ন-১১৮. কোনো বস্তু কিভাবে দেখা যায়? বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন কেন?

উত্তর : কোনো বস্তুকে আমরা তখনই দেখতে পাই, যখন সূর্য থেকে আপতিত আলোকরশ্মি ঐ বস্তুর উপর পড়ে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় আমাদের চোখে পড়ে। বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখের মধ্যখানের কালো অংশ কর্ণিয়ার ওপর পড়ে। তা এসে লেন্সের মধ্য দিয়ে চোখের সবচেয়ে পেছনের অংশ রেটিনাতে পড়ে বস্তুর উল্টো প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং সাথে সাথেই বিদ্যুৎ সংকেতের মতো এই প্রতিবিম্ব অপটিক নার্ভের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌছায়। মস্তিষ্ক আবার এই প্রতিবিম্ব উল্টে দিয়ে বস্তুর সোজা প্রতিবিম্ব তৈরি করে এবং তখনই বস্তুটিকে দেখতে পাই। পুরো ব্যাপারটি ঘটে মুহূর্তের মধ্যে।

কোনো বস্তুকে আমরা তখনই দেখি যখন ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এসে আমাদের চোখে পড়ে আবার প্রতিফলিত আলোকরশ্মির বর্ণের ওপর বস্তুর বর্ণ নির্ভরশীল। কোনো একটি বস্তু যে বর্ণের রশ্মি প্রতিফলিত করে আমরা সে বস্তুকে সে প্রতিফলিত বর্ণেই দেখব। সূর্যের আলোকে সাদা দেখালেও তা সাতটি বর্ণেরই মিশ্রণ। এই আলো থেকে কোনো বস্তু যে বর্ণ প্রতিফলন ঘটায় আমরা ঐ বস্তুকে সেই রঙেই দেখে থাকি। একেক বস্তু একেক রং প্রতিফলন করে। এর জন্য বিভিন্ন বস্তুকে আমরা বিভিন্ন রঙে দেখি অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-১১৯. বস্তুর রং বা বর্ণ কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : বস্তুর রং বা বর্ণ নির্ভর করে আপতিত আলোকের প্রকৃতি, বস্তুর ওপর আপতিত আলোক ও বস্তু কর্তৃক শোষিত আলোকের অনুপাত এবং বস্তু দ্বারা প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত আলোকরশ্মির প্রকৃতির ওপর।

○ প্রশ্ন-১২০. চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা আগুনের একটি বৃত্ত দেখি কেন?

উত্তর : চোখের দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল ০.১ সেকেন্ড। চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার বিম্ব গঠিত হয়। যদি বস্তুটিকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে ০.১ সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। কোনো বস্তুকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে যদি বস্তুকে আবার চোখের সম্মুখে আনা হয় তাহলে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বের জন্য বস্তুটির মাঝখানের অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। তাই চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা আগুনের একটি বৃত্ত দেখি।

○ প্রশ্ন-১২১. চোখের নিকট বিন্দু ও দূর বিন্দু বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : স্বাভাবিক চোখ যে নিকটতম বিন্দু পর্যন্ত বিনা শ্রান্তিতে স্পষ্ট দেখতে পায়, তাকে চোখের নিকট বিন্দু বলে। সাধারণত স্বাভাবিক চোখের নিকট বিন্দু চোখ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার বা ১০ ইঞ্চি দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ চোখ থেকে ২৫ সেমি দূরবর্তী বিন্দুকে চোখের নিকট বিন্দু বলে। কোনো বস্তু ২৫ সেমি'র কম দূরত্বে থাকলে সেটি দেখতে চোখের বেশ কষ্ট হয় এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে দেখলে চোখ ব্যথা হয়। অন্যদিকে, সবচেয়ে দূরে অবস্থিত যে বিন্দু পর্যন্ত স্বাভাবিক চোখ স্পষ্ট দেখতে পায়, তাকে চোখের দূর বিন্দু বলে। স্বাভাবিক চোখের জন্য দূর বিন্দু অসীম দূরত্বে অবস্থিত।

○ প্রশ্ন-১২২. দৃষ্টিসীমা কি? দৃষ্টির ত্রুটি বলতে কি বোঝায়? দৃষ্টির ত্রুটি কত ধরনের ও কি কি?

উত্তর : একটি চোখের স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু থেকে দূরবিন্দু পর্যন্ত দূরত্বকে উক্ত চোখের দৃষ্টিসীমা বলে। চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলে অর্থাৎ দূর ও নিকট বিন্দুর মধ্যবর্তী বস্তু দেখতে চোখের অসুবিধা হলে তাকে দৃষ্টির ত্রুটি বলে।

দৃষ্টির ত্রুটি চার ধরনের :

ক. মায়োপিয়া : যখন কোনো চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এ ত্রুটিকে মায়োপিয়া বা হ্রস্ব দৃষ্টি বলে।

খ. হাইপারমেট্রোপিয়া : যখন চোখ দূরের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এ ত্রুটিকে হাইপারমেট্রোপিয়া বা দীর্ঘ দৃষ্টি বলে।

গ. প্রেসবায়োপিয়া : বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের চোখের উপযোজন ক্ষমতা কমার ফলে মানুষ এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে কাছের ও দূরের উভয় বস্তুই দেখতে পায় না। এ ত্রুটিকে প্রেসবায়োপিয়া বা চালশে বলে।

ঘ. এস্টিগমেটিজম : যখন কোনো চোখ একই সময়ে একই দূরত্বে অবস্থিত বিভিন্ন তলের বস্তুকে সমানভাবে স্পষ্ট দেখতে পায় না তখন চোখের এ ত্রুটিকে এস্টিগমেটিজম বা বিষম দৃষ্টি বলে।

○ প্রশ্ন-১২৩. ক্ষীণ দৃষ্টিযুক্ত চোখে অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় কেন?

উত্তর : ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখের দূরবিন্দু অসীম দূরত্ব থেকে কমে চোখের কাছে চলে আসে। তাই এর প্রতিকারের জন্য এমন লেন্স প্রয়োজন যা অসীম দূরে অবস্থিত লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব ক্ষীণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখের দূর বিন্দুতে গঠন করতে পারবে। যেহেতু অসীম দূরত্ব থেকে আগত আলোকরশ্মিসমূহ অবতল লেন্সে প্রতিসরণের পর লেন্সের ফোকাস তলে বস্তুর অবাস্তব প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে, তাই ক্ষীণ দৃষ্টি চোখে অবতল লেন্সের (যার ফোকাস দূরত্ব সমান) চশমা ব্যবহার প্রয়োজন।

○ প্রশ্ন-১২৪. হ্রস্ব দৃষ্টি ও দীর্ঘ দৃষ্টি কাকে বলে? এগুলো কিভাবে প্রতিকার করা যায়?

উত্তর : হ্রস্ব দৃষ্টি : যখন চোখ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু ভালোভাবে দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্ব দৃষ্টি বলে। এক্ষেত্রে চোখের নিকট বিন্দু ২৫ সেমি'রও কম হতে পারে। অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে চোখের এ ত্রুটি দূর করা যায়।

দীর্ঘ দৃষ্টি : যখন চোখ দূরের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না, তখন চোখের এ ত্রুটিকে দীর্ঘ দৃষ্টি বলে। উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করে চোখের এ ত্রুটি দূর করা যায়।

○ প্রশ্ন-১২৫. দর্শানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার বিম্ব গঠিত হয় এবং বস্তুটি দেখা যায়। যদি বস্তুটিকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে ০.১ সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। এ সময়কালকে দর্শানুভূতির স্থায়িত্বকাল বলে।

○ প্রশ্ন-১২৬. দুটি চোখ থাকার সুবিধা কি?

উত্তর : দুটি চোখ থাকার সুবিধা হলো অক্ষিপটে লক্ষবস্তুর দু'দিক হতে একই সময়ে দু'টি প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এবং তারা একসাথে মিলে মস্তিষ্কে বস্তুর একটি একক অনুভূতির সৃষ্টি করে। এতে বস্তুর দূরত্ব, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ, রং প্রভৃতি এবং দুটি বস্তুর প্রকৃত অবস্থান, দুটি বস্তুর পারস্পরিক দূরত্ব নির্ণয় এবং বস্তু সম্পর্কে ত্রিমাত্রিক ধারণা স্পষ্ট হয়।

○ প্রশ্ন-১২৭. কনট্যাক্ট লেন্স কাকে বলে?

উত্তর : চোখের দৃষ্টিশক্তিজনিত ত্রুটি রোধ করার জন্য চক্ষুগোলকে এক ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয়। এ লেন্সকেই কনট্যাক্ট লেন্স বলা হয়। এ লেন্স ব্যবহার করার পূর্বে ক্যারাটোমিটারের সাহায্যে চোখের ব্যাসার্ধ ও শক্তি নির্ধারণ করা হয়।

○ প্রশ্ন-১২৮. বর্ণান্ধতা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : মানুষের তিনটি স্নায়ু তিন ধরনের (লাল, নীল, সবুজ) আলোর ঢেউ এর আঘাতে সাড়া দেয় এবং এতে বস্তুর সঠিক বর্ণ আলোয় দৃষ্ট হয়। যদি কোনো লোকের এ তিনটি স্নায়ুর যে কোনো একটি অকেজো হয়ে পড়ে তবে সে লোক সে স্নায়ুর সাথে জড়িত রং দেখতে পায় না। এর ফলে সে লোক এক রংকে অন্য রং বলে ভুল করে। একে বর্ণান্ধতা বলে।

○ প্রশ্ন-১২৯. মানুষের চোখ ও ক্যামেরার তুলনা করুন।

উত্তর : নিচে মানুষের চোখ ও ক্যামেরার তুলনা করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মানুষের চোখ	ক্যামেরা
১. আলোক নিরুদ্ধ বাক্স	চোখের অক্ষিগোলক আলোক নিরুদ্ধ বাক্সের কাজ করে।	ক্যামেরায় আলোক নিরুদ্ধ বাক্স আছে।
২. বিম্বের ধরন	চোখের লেন্স চোখের সামনের বস্তুর সদ, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠন করে।	ক্যামেরায় এক বা একাধিক উত্তল লেন্স আছে, যা সদ, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠন করে।
৩. ডায়াফ্রাম	চোখের আইরিশ ডায়াফ্রামের কাজ করে।	ক্যামেরার ডায়াফ্রাম লেন্সের উন্মেষ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. সময় নিয়ন্ত্রণ	চোখের পাতা এই কাজ করে।	ক্যামেরার সাটার আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ করে।
৫. বিম্ব গঠন	চোখের রেটিনায় বিম্ব গঠিত হয়।	ক্যামেরার আলোক-সংবেদী ফিল্মে বিম্ব পড়ে।
৬. বস্তু দেখা	চোখের উপযোজন ক্ষমতার জন্য যে কোনো অবস্থানের বস্তু দেখা যায়।	ক্যামেরার লেন্স ও ফিল্মের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো দূরত্বের বস্তুর ছবি তোলা যায়।
৭. প্রতিফলন রোধ	অক্ষিপটের কৃষ্ণমণ্ডল চোখের ভেতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করে।	অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করার জন্য ক্যামেরার ভেতরে কালো রং করা থাকে।

অধ্যায় ০২

শব্দবিজ্ঞান
Sound

*Syllabus— **Sound** : Hearing mechanism, Decibel, Frequency, Sound machines in home and around– Microphone, Loud speaker, Public address system, Characteristics of a sound note, Formation of stationary waves in stretched string, Laws of vibrating strings, Beats, Doppler Effect, Applications and limitations of Doppler Effect, Echoes Absorption of sound wave, Reverberations, Fundamentals of Building acoustics, Statement of Sabine's Formula.*

ক শ্রবণ কৌশল, ডেসিবেল, কম্পাংক, ঘরে ও বাইরের বিভিন্ন ব্যবহারিক যন্ত্র, মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার, পাবলিক এড্রেস সিস্টেম

Hearing mechanism, Decibel, Frequency, Sound machines in home and around– Microphone, Loud speaker, public address system

○ প্রশ্ন-১. শব্দ কি? শব্দ কিভাবে উৎপত্তি হয়?

উত্তর : শব্দ শক্তির একটি বিশেষ তরঙ্গরূপ, যা কোনো কম্পনশীল বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়ে জড় মাধ্যমের সাহায্যে আমাদের কানে পৌঁছে শ্রুতির অনুভূতি জন্মায় বা জন্মাতে চেষ্টা করে।

উৎপত্তি : কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। বস্তুর কম্পন থামার সাথে সাথে শব্দ নিঃসরণও থেমে যায়।

○ প্রশ্ন-২ বাতাসে শব্দতরঙ্গ কিভাবে সঞ্চারিত হয়?

উত্তর : শব্দতরঙ্গ এক প্রকার অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ। বায়ুস্তরের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে বাতাসে শব্দতরঙ্গ একস্থান হতে অন্যস্থানে সঞ্চারিত হয়।

উৎস থেকে শব্দ সৃষ্টি হলে তা অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ শব্দ বায়ুর মধ্য দিয়ে তরঙ্গাকারে সঞ্চারিত হয়ে আমাদের কানে প্রবেশ করলেই আমরা সে শব্দ শুনতে পাই।

○ প্রশ্ন-৩. মানুষের শ্রবণ যন্ত্রের (কান) বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিন।

উত্তর : মানুষের কানকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা– ক. বহিঃকর্ণ বা পিন্না (Pinna), খ. মধ্যকর্ণ বা টিম্পেন্নাম (Tympannum), গ. অন্তঃকর্ণ বা ল্যাবিরিন্থ (Labyrinth)।

ক. বহিঃকর্ণ : একে দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ কানের পাতা, যার কাজ শব্দশক্তিকে কেন্দ্রীভূত কানের ভিতরে পাঠানো। দ্বিতীয় অংশ কানের ছিদ্র বা নালী। এ পথে শব্দতরঙ্গ কানের মধ্যে প্রবেশ করে।

খ. মধ্যকর্ণ : এ অংশের কাজ বাতাসের শব্দতরঙ্গ কানের ভেতরের অনুভূতিশীল অংশে পৌঁছে দেয়া।

গ. অন্তঃকর্ণ : অন্তঃকর্ণের গঠন বেশ জটিল। এতে প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা একটি অস্থিনল শামুকের মতো পাকানো থাকে। একে ককলি (cochlea) বলে। অন্তঃকর্ণ ব্যাসিলার মেমব্রেন (basilar membranes) নামক একটি পর্দা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। ব্যাসিলার মেমব্রেনের সাথে বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের এবং বিভিন্ন টানের কয়েক সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তু থাকে। এ তন্তুগুলো স্নায়ুতন্তুর সাহায্যে মস্তিষ্কের সাথে সংযুক্ত থাকে। ককলি এক প্রকার তরলে পূর্ণ থাকে এবং তন্তুগুলো এ তরলে নিমজ্জিত থাকে।

প্রশ্ন-৪. শব্দ শ্রবণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

উত্তর : কানের পাতা শব্দতরঙ্গকে সংগ্রহ করে কানের নালীর মধ্য দিয়ে কর্ণপটহে পাঠায়। ফলে কর্ণপটহ আন্দোলিত হয়। কর্ণপটহের এ আন্দোলন হাতুড়ি, নেহাই এবং রেকাবি দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে ককলির তরল পদার্থকে আন্দোলিত করে। এখন যে তন্তুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক তরলের কম্পাঙ্কের সমান সে তন্তু অনুযায়ী কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হতে থাকে। ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া (electrical response) উৎপন্ন হয়ে স্নায়ুতন্তুর দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং আমরা শব্দ শুনতে পাই। কি প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক সাড়া উৎপন্ন হয় তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানী হেলমহোৎজ শ্রবণ প্রক্রিয়ার এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

প্রশ্ন-৫. শব্দের বেগ কাকে বলে? এর উপর চাপ, তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার প্রভাব কি?

উত্তর : এক সেকেন্ডে একটি নির্দিষ্ট দিকে শব্দ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলে।

চাপের প্রভাব : স্থির তাপমাত্রায় শব্দের বেগ চাপের উপর নির্ভর করে না।

তাপমাত্রার প্রভাব : তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়। হিসাব করে দেখা গেছে 1°C বা 1K তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের দ্রুতি $0.6ms^{-1}$ বৃদ্ধি পায়।

আর্দ্রতার প্রভাব : বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে বায়ুর ঘনত্ব কমে যায়, ফলে শব্দের বেগ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলেও শব্দের বেগ বেড়ে যায়।

প্রশ্ন-৬. শব্দের বেগ সম্পর্কে লিখুন। শব্দের বেগ কিসের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : কোনো মাধ্যমে শব্দ প্রতি সেকেন্ডে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলে। 0°C তাপমাত্রায় এবং স্বাভাবিক চাপে শব্দের বেগ ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড। প্রতি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বাড়লে শব্দের গতি ০.৬ মিটার/সেকেন্ড বৃদ্ধি পায়। বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে গেলেও শব্দের গতি বাড়ে। শব্দের বেগ মাধ্যমের ঘনত্ব, প্রকৃতি ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৭. কঠিন, তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগের তুলনা করুন।

উত্তর : শব্দ কেবল বায়বীয় মাধ্যমে সঞ্চালিত হয় না। এটি কঠিন ও তরল মাধ্যমেও সঞ্চালিত হতে পারে। কঠিন মাধ্যমে শব্দ সবচেয়ে দ্রুত চলে, তরল মাধ্যমে তার চেয়ে ধীরে চলে। বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ সবচেয়ে কম এবং শূন্যস্থানে শব্দের বেগ শূন্য। লোহার মধ্যদিয়ে শব্দ বাতাসের চেয়ে ১৫ গুণ দ্রুত চলে। স্বাভাবিক অবস্থায় লোহাতে শব্দের বেগ ৫২২১ মিটার/সেকেন্ড।

প্রশ্ন-৮. 'বেল' (bel), 'ডেসিবেল' (decibel), 'ফন' ও 'সোন' (sone) কি?

উত্তর : 'বেল' (bel) হলো আপেক্ষিক তীব্রতার একক। এ একক বড় হওয়ায় এর এক দশমাংশকে $\left(\frac{1}{10}\right)$ আপেক্ষিক তীব্রতার একক হিসেবে নেয়া হয়। এর নাম ডেসিবল (decibel) অথবা সংক্ষেপে (db)। এটিই আপেক্ষিক তীব্রতার ব্যবহারিক একক।

1000 Hz কম্পাঙ্কবিশিষ্ট প্রমাণ তীব্রতার এক ডেসিবেল-এর একটি বিশুদ্ধ সুর যে প্রাবল্য সৃষ্টি করে তাকে ফন বলে। শব্দ প্রাবল্যের আরও একটি একক আছে। এর নাম সোন (sone)। শ্রোতার শ্রাব্যতার সীমার 40 ডেসিবেল উর্ধ্বে 1000 Hz কম্পাঙ্কের একটি বিশুদ্ধ সুর যে প্রাবল্য সৃষ্টি করে তাকে 'সোন' বলে।

প্রশ্ন-৯. কয়েকটি শব্দের তীব্রতার লেভেল বা 'ডেসিবেল' উল্লেখ করুন?

উত্তর :

শব্দ	তীব্রতা লেভেল (db)
সর্বনিম্ন শ্রাব্য শব্দ	0
পাতার মর্মর শব্দ	10
ফিসফিসানি	30
শ্রেণীকক্ষের শব্দ	50
স্বাভাবিক কথাবার্তা	60
ব্যস্ততম রাস্তার শব্দ	70
কারখানার কোলাহল	90
মাথার উপরের জেট প্লেনের শব্দ	100
তীব্র বজ্রনির্ঘোষের শব্দ	110
কানে বেদনা দানকারী সূচন শব্দ	120

প্রশ্ন-১০. ডেসিবেল কি?

উত্তর : শব্দ জোরে বা আস্তে হওয়ার একক ডেসিবেল। একে db দ্বারা বোঝানো হয়। বিভিন্ন স্থানে স্বীকৃত ডেসিবেল হচ্ছে :

আবাসিক এলাকা	২৫ db - ৪০ db
বাণিজ্যিক এলাকা	৩৫-৪৫ db - ৪০ - ৬০db
শিল্প কারখানা	৪০-৬০ db
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০-৪০ db
হাসপাতাল	২০-৩৫ db

প্রশ্ন-১১. ফ্রিকোয়েন্সি কি?

উত্তর : শব্দের কারণ হচ্ছে কম্পন। তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণা প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাংক বা ফ্রিকোয়েন্সি বলে। একে হার্জ (Hz) দ্বারা বোঝানো হয়।

প্রশ্ন-১২. শ্রাব্যতার সীমা বলতে কি বোঝায়? ইনফ্রাসনিক ও সুপারসনিক শব্দ কাকে বলে?

উত্তর : প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা ২০ থেকে ২০,০০০-এর মধ্যে থাকলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা আমরা শুনতে পাই। কম্পনের এ সীমাকে শ্রাব্যতার সীমা বলা হয় এবং উক্ত শব্দকে শ্রুত শব্দ বলে।

প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা ২০-এর কম হলে আমরা শব্দ শুনতে পাই না। এ শব্দকে ইনফ্রাসনিক বা অবশ্রুতি শব্দ বলে। আর প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা ২০,০০০-এর বেশি হলে উৎপন্ন শব্দও আমরা শুনতে পাই না একে শ্রবণোত্তর বা সুপারসনিক শব্দ বলে।

○ প্রশ্ন-১৩. অবশ্রুতি তরঙ্গ ও শ্রবণোত্তর তরঙ্গ বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : যে শব্দ তরঙ্গের কম্পন সংখ্যা প্রতি সেকেন্ডে ২০ বার-এর কম, তাই হলো অবশ্রুতি তরঙ্গ। আর যে শব্দ তরঙ্গের কম্পন প্রতি সেকেন্ডে ২০,০০০-এর বেশি, তা হলো শ্রবণোত্তর তরঙ্গ।

○ প্রশ্ন-১৪. আলট্রাসনিক তরঙ্গ কি?

উত্তর : কোনো মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে শব্দের কম্পন সংখ্যা ২০,০০০-এর অধিক হলে আমরা এ শব্দ শুনতে পাই না। ২০,০০০-এর অধিক কম্পনযুক্ত শব্দকে আলট্রাসনিক তরঙ্গ বা শব্দ বলে। আলট্রাসনিক শব্দের ব্যবহার হিসেবে ক. জীবাণু ধ্বংস করে, খ. পানিতে অদ্রাব্য ঔষধকে দ্রাব্য করে, গ. রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা, ঘ. ডুবো জাহাজের অবস্থান, সমুদ্রতলে পাহাড়ের অবস্থান, সমুদ্রের গভীরতা এবং সমুদ্রে মাছের ঝাঁকের অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. শব্দোত্তর তরঙ্গের কয়েকটি ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : শব্দোত্তর তরঙ্গ আমাদের অনেক প্রয়োজনে লাগে। নিচে কয়েকটি ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা হলো :

ক. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়, হিমশৈল, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়ে।
খ. পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজকে পথ প্রদর্শনে।
গ. ধাতবপিণ্ড বা পাতে সূক্ষ্মতম ফাটল অনুসন্ধানে।
ঘ. সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করা।
ঙ. ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা।
চ. রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা।
ছ. সাধারণভাবে মিশ্রিত হয় না এমন তরলসমূহের (যেমন– পানি ও পারদ) মিশ্রণ তৈরিতে।
জ. চোর ধরার যন্ত্র নির্মাণে।

○ প্রশ্ন-১৬. বাদুর কিভাবে পথ চলে?

উত্তর : শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে বাদুর পথ চলে থাকে। বাদুর চলার সময় ক্রমাগত বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে। সামনে কোনো প্রতিবন্ধক থাকলে তাতে বাধা পেয়ে এ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে বাদুরের কানে ফিরে আসে। সৃষ্ট এ শব্দোত্তর তরঙ্গ ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান এবং প্রতিফলিত শব্দের প্রকৃতি থেকে বাদুর সহজেই প্রতিবন্ধকের অবস্থান ও আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। ফলে পথ চলার সময় বাদুর সেই প্রতিবন্ধক পরিহার করে।

○ প্রশ্ন-১৭. বর্ষাকালে সাধারণত জোরে শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর : অন্যান্য সময়ের তুলনায় বর্ষাকালে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। বায়ুতে জলীয়বাষ্প বেশি থাকলে বায়ুর ঘনত্ব কমে, ফলে শব্দের বেগ বেড়ে যায়। তাই বর্ষাকালে জোরে শব্দ শোনা যায়। এ কারণে এক পশলা বৃষ্টির পর বায়ুতে শব্দের বেগ বেড়ে যায়।

○ প্রশ্ন-১৮. চন্দ্র অভিযানকারীরা চন্দ্রপৃষ্ঠে পাশাপাশি হাঁটলেও কেউ কারও কথা শুনতে পাননি। এজন্য যান্ত্রিক সাহায্য নিতে হয়েছিল কেন?

উত্তর : শব্দ সঞ্চালনে জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কোনো জায়গায় শব্দ সৃষ্টি হলে সেখানে একটা দীঘল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গ মাধ্যমের পদার্থকে অবলম্বন করে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠে কোনো বায়ুমণ্ডল বা জড় বস্তুর মাধ্যম নেই। তাই শব্দ উচ্চারণ করলেও তা স্থানান্তরিত হয়নি। অতএব পরস্পর কথা বলার জন্য যান্ত্রিক উদ্ভাবনীর সাহায্য নিতে হয়েছিল।

○ প্রশ্ন-১৯. দালানকোঠা বা দরবার হলের শব্দ নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করা হয়? শব্দের অনুরণনের কি প্রয়োজন আছে? কোন কনসার্ট হলকে Acoustically Dead বলা হয়?

উত্তর : বড় বড় দরবার হলে বা দালানের দেয়াল, ছাদ বা মেঝে থেকে বহু প্রতিফলনের দরুন শব্দের অনুরণন (Reverberation) লক্ষ করা যায়। নরওয়ের সেন্টস পলক্যাথেড্রালের মধ্যে কোনো শব্দ করলে তা নিঃশেষ হতে প্রায় ৬ সে. সময় লাগে। কোনো হলে শব্দের অতিরিক্ত অনুরণন হলে সঙ্গীত বা বক্তৃতা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। আবার কোনো হলে একেবারে শব্দের অনুরণন থাকবেনা এমনটিও কাম্য নয়। শ্রোতাদের নরম কাপড় চোপড় শব্দ শোষক হিসেবে কাজ করে। ফলে সঙ্গীত বা বক্তৃতার স্বর দুর্বল হয়ে পড়ে। অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, কিছু মাত্রার অনুরণন থাকা খুবই দরকার। নতুবা হলটা Acoustically Dead হয়ে পড়ে। তবে অনুরণন কাল কত হলে সর্বোত্তম শব্দ শোনা যায় এটা অবশ্যই পরীক্ষার বিষয়। সিটে কুশন ও বিভিন্ন দেয়াল ঢেকে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ১ থেকে ২ সে. অনুরণন সময় উত্তম।

○ প্রশ্ন-২০. মশা উড়ার শব্দ আমরা শুনতে পাই, কিন্তু পাখি উড়ার শব্দ বা পেন্ডুলাম দোলার শব্দ আমরা শুনতে পাই না কেন?

উত্তর : যদি কোনো শব্দ উৎসের কম্পন সেকেন্ডে 20 থেকে 20,000 বারের মধ্যে হয়, তবে সে শব্দ উৎসের কম্পন আমরা শুনতে পাই। কিন্তু শব্দ উৎসের কম্পন সেকেন্ডে 20 বারের কম বা 20,000 বারের অধিক হলে আমরা সেই শব্দ শুনতে পাই না।

মশা যখন উড়ে, তখন মশার পাখার কম্পন সেকেন্ডে 20 থেকে 20,000 বারের মধ্যে হয়, তাই মশার উড়ার শব্দ আমরা শুনতে পাই। অপরদিকে, পাখি যখন আকাশে উড়ে, তখন পাখির পাখার কম্পন কিংবা পেন্ডুলাম দোলার কম্পন সেকেন্ডে 20 বারের কম হয়। তাই পাখির উড়ার শব্দ বা পেন্ডুলাম দোলার শব্দ আমরা শুনতে পাই না।

○ প্রশ্ন-২১. মশার গুঞ্জনের তীক্ষ্ণতা বাঘের গর্জনের চেয়ে বেশি কেন?

উত্তর : মশার ডানার কম্পনে উৎপন্ন শব্দের কম্পাঙ্ক বাঘের গর্জনের কম্পাঙ্কের চেয়ে অনেক বেশি। যেহেতু তীক্ষ্ণতা কম্পাঙ্কের সমানুপাতিক, তাই মশার ডানার কম্পাঙ্ক বাঘের গর্জনের কম্পাঙ্কের চেয়ে বেশি। এজন্য মশার গুঞ্জনের তীক্ষ্ণতা বেশি হয়।

○ প্রশ্ন-২২. আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় এবং বিদ্যুৎ ঝলক দেখার কিছু পরে মেঘের গর্জনের শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর : মেঘে মেঘে সংঘর্ষের ফলে আকাশে বিদ্যুতের ঝলক এবং শব্দ একই সাথে উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ ঝলকের গতিবেগ আলোর গতির সমান এবং সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার। অপরদিকে, শব্দের বেগ অনেক কম এবং 0°C তাপমাত্রায় প্রতি সেকেন্ডে 332 মিটার। উভয়ের গতিবেগের এ বিশাল ব্যবধানের কারণে বিদ্যুৎ ঝলকের তুলনায় শব্দ আমাদের নিকট পৌছাতে বেশি সময় লাগে। এজন্য বিদ্যুৎ ঝলক দেখার কিছু পরে আমরা মেঘের গর্জনের শব্দ শুনতে পাই।

○ প্রশ্ন-২৩. টেপ রেকর্ডার কি? কিভাবে টেপ তৈরি হয়?

উত্তর : টেপ রেকর্ডার তড়িৎ প্রবাহকে চুম্বকক্ষেত্রে রূপান্তর করে এবং রেকর্ডিং মাধ্যমে বিভিন্ন সংকেত বা তথ্য রেকর্ড করে। রেকর্ডিং এর জন্য টেপ রেকর্ডারে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তুতপ্রণালী : টেপ সাধারণত সেলুলোজ অ্যাসিটেট বা পলিভিনাইল ক্লোরাইড দিয়ে তৈরি এক ধরনের পাতলা পদার্থ। দু পার্শ্ব বিশিষ্ট একটি চুম্বকীয় টেপ এর এক পার্শ্বে আয়রন অক্সাইড ক্রিস্টাল সংযুক্ত ফেরিক অক্সাইড দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। একে অনুজ্জ্বল পার্শ্ব বলে। ক্রিস্টাল দেখতে দণ্ড চুম্বকের মতো, যার উত্তর ও দক্ষিণ মেরু আছে। অন্য পার্শ্বটি উজ্জ্বল। টেপ পদার্থ যাতে সহজে বেড়ে না যায় এবং যাতে সহজে বাঁকানো না যায় সে ধরনের গুণাবলী টেপ পদার্থের থাকতে হবে। সিগন্যাল ধারণ করার জন্য টেপটি ট্রান্সডিউসারের সাথে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৪. কিভাবে রেকর্ডিং করা হয়?

উত্তর : যখন কেউ মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলে, তখন শব্দের কম্পন পরিবর্তনশীল ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস তৈরি করে। এ ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালসকে একটি বিবর্ধকের ভেতর দিয়ে পাঠানোর পর বিবর্ধিত সংকেতকে একটি ইলেকট্রোম্যাগনেট হেডের নিকট পাঠানো হয়। হেড হচ্ছে একটি লৌহ রিং, যাতে ছোট ছোট বায়ুছিদ্র থাকে যেগুলো খালি চোখে দেখা যায় না। রেকর্ডিংয়ের সময় টেপের অনুজ্জ্বল পার্শ্বটি হেডের ছিদ্রের খুব নিকট দিয়ে চলে। এসময় পরিবর্তনশীল ইলেকট্রিক্যাল ইম্পালস ছিদ্রপথে চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, যা টেপের আয়রন অক্সাইডের সাথে ক্রিয়া করে সিগন্যাল ধারণ করে। চুম্বকদণ্ডটি এ সময় বিভিন্ন দিক মুখ করে থাকে এবং এর দিক পরিবর্তন চুম্বকক্ষেত্রের ওপর নির্ভরশীল।

○ প্রশ্ন-২৫. মাইক্রোফোন কি? এটি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : মাইক্রোফোন হচ্ছে একটি ইলেকট্রো-অ্যাকাউস্টিক ট্রান্সডিউসার, যা শব্দ তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে, তরঙ্গকে বিবর্ধিত করে টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে প্রেরণ করে। সহজ কথায়, যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দতরঙ্গকে ইলেকট্রিক্যাল তরঙ্গে রূপান্তরিত করা হয় তাকে মাইক্রোফোন বলে।

মাইক্রোফোনের সামনে যখন কোনো শব্দ করা হয় তখন ঐ শব্দের ফলে সৃষ্ট কম্পিত বায়ু মাইক্রোফোনের মধ্যস্থিত ডায়াফ্রামের পাতলা ধাতব পাতকে আঘাত করে। ফলে ডায়াফ্রাম কাঁপতে থাকে। ডায়াফ্রামের কম্পন হচ্ছে তরঙ্গের অবিকল প্রতিরূপ এবং শব্দতরঙ্গ তখন বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়।

সাধারণত সঙ্গীত, কথা ইত্যাদিকে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে মাইক্রোফোন ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২৬. মাইক্রোফোন কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : যার ওপর নির্ভর করে মাইক্রোফোন অপারেট করে সে অনুযায়ী মাইক্রোফোন দু প্রকার। যথা :

১. প্রেসার অপারেটেড মাইক্রোফোন ও ২. ভেলোসিটি অপারেটেড মাইক্রোফোন।

১. **প্রেসার অপারেটেড মাইক্রোফোন :** কোনো কথা বা বাদ্যযন্ত্রের শব্দতরঙ্গ এ ধরনের মাইক্রোফোনের সামনের বায়ুতে চাপের তারতম্য ঘটালে শব্দতরঙ্গ মাইক্রোফোন কর্তৃক ইলেকট্রিক্যাল তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের মাইক্রোফোনের অপর নাম সাউন্ড ওয়েভ মাইক্রোফোন। এটি কয়েক ধরনের হয়ে থাকে : কার্বন মাইক্রোফোন, ডায়নামিক মাইক্রোফোন, ক্রিস্টাল মাইক্রোফোন, কনডেনসার মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

২. **ভেলোসিটি মাইক্রোফোন :** এ ধরনের মাইক্রোফোন তার কাজের জন্য বাতাসের চাপের পরিবর্তে বাতাসের ভেলোসিটির ওপর নির্ভরশীল।

○ প্রশ্ন-২৭. ডায়নামিক মাইক্রোফোন কিভাবে তৈরি করা হয়?

উত্তর : ডায়নামিক মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামে সরু এনামেল তারের কয়েল জড়ানো থাকে। ডায়াফ্রাম একটি শক্তিশালী চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন সেটি অতি সহজে চুম্বককে বেষ্টন করে কাঁপতে পারে। এ চুম্বক একটি বিশেষ ধরনের চুম্বক। এর মাঝখানে থাকে একটি উত্তর মেরু এবং দুই পাশে থাকে দুটি দক্ষিণ মেরু। মাইক্রোফোনের সামনে যখন কোনো শব্দ সৃষ্টি করা হয়, তখন শব্দের জন্য কম্পিত বাতাস ডায়াফ্রামকে আঘাত করে। ফলে ডায়াফ্রামও কাঁপতে থাকে এবং এর এনামেল কয়েলও কাঁপতে থাকে। কয়েলের ভেতরে চুম্বক থাকায় চুম্বক দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বক প্রবাহ শব্দের অনুরূপ চৌম্বক প্রবাহে পরিবর্তিত হয়। ফলে শব্দের অনুরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের মাইক্রোফোনের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স ও সেনসিটিভিটি খুব বেশি হওয়ায় বর্তমানে এ ধরনের মাইক্রোফোন খুবই জনপ্রিয়।

○ প্রশ্ন-২৮. কনডেনসার মাইক্রোফোন কিভাবে তৈরি করা হয়?

উত্তর : কনডেনসার মাইক্রোফোন তৈরির জন্য দুটো ধাতব প্লেট ব্যবহার করা হয়। প্লেট দুটো সামনে-পিছনে অবস্থান করে এবং দুটো প্লেটের মাঝখানে সামান্য ফাঁকা থাকে। এ ফাঁকা জায়গায় বাতাস ডাই-ইলেকট্রিকের কাজ করে। সুতরাং এটা তখন একটা কনডেনসারে পরিণত হয়। পেছনের প্লেটটি খাঁজ কাটা এবং সামনের প্লেটটি নমনীয় যা ডায়াফ্রামের কাজ করে। এ মাইক্রোফোন তখনই সক্রিয় হয়ে উঠে যখন প্লেট দুটো মাঝখানের ক্যাপাসিটির পরিবর্তন ঘটে। এ ক্যাপাসিটির পরিবর্তন প্লেট দুটোর মধ্যকার দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। যখন কোনো শব্দতরঙ্গ ডায়াফ্রামে আঘাত করে তখন ডায়াফ্রাম কাঁপতে থাকে এবং শব্দের জোর অর্থাৎ চাপ অনুসারে প্লেট দুটোর মধ্যকার দূরত্ব কমে-বাড়ে। এতে ক্যাপাসিটির পরিবর্তন হয় এবং চার্জেরও তারতম্য ঘটে। চার্জের এ পরিবর্তন বিদ্যুৎ তরঙ্গরূপে পাওয়া যায়। বর্তমানে প্রায় সমস্ত ক্যাসেট টেপ রেকর্ডারেই এ মাইক্রোফোন ব্যবহার করা হয়। কারণ এটি আকারে খুবই ছোট এবং এর সংবেদনশীলতা অধিক।

○ প্রশ্ন-২৯. লাউড স্পিকার কি? এটি কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : লাউড স্পিকার হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রো অ্যাকাউস্টিক ট্রান্সডিউসার যা বিদ্যুৎতরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। বর্তমানে প্রায় সবক্ষেত্রেই ডায়নামিক লাউড স্পিকার ব্যবহৃত হয়। ডায়নামিক লাউড স্পিকারে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক, পোলপিস, পেপার কোণ, ভয়েস কয়েল, স্পাইডার ও ধাতব ফ্রেম থাকে। ভয়েস কয়েলের মধ্যে চুম্বক অবস্থান করে, তাই কয়েলটা সবসময় চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করে।

যখন অ্যামপ্লিফায়ার থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (অডিও সিগন্যাল) এসে ভয়েস কয়েলে প্রবেশ করে, তখন ভয়েস কয়েল কাঁপতে থাকে। ভয়েস কয়েলের সাথে পেপার কোণ যুক্ত থাকায় পেপার কোণ কাঁপতে থাকে এবং এর সামনের বাতাসও কাঁপতে থাকে। বাতাসের এ কম্পন হচ্ছে মাইক্রোফোনের সামনে সৃষ্ট শব্দের কম্পনের একেবারে অবিকল প্রতিরূপ। অর্থাৎ মাইক্রোফোনের সামনে যে আওয়াজ করা হয়, লাউড স্পিকার থেকে সে একই আওয়াজ শোনা যায়।

○ প্রশ্ন-৩০. শব্দ দূষণ কি? এর ফলে কি কি ক্ষতি সাধিত হয়?

উত্তর : শব্দ দূষণ : শব্দ এক প্রকার শক্তি। শব্দের সাহায্যেই আমরা পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করি। পাখির কলতান বা পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা সঙ্গীতের মধুর আওয়াজ যেমন আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করে তেমনি গোলমাল বা হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ মনকে শ্রান্ত করে এবং অনেক সময় আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শব্দের আধিক্য আমাদের

দেহ ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই পরিবেশের শব্দ দূষণ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ধারণ ক্ষমতা ৪৫-৫৫ ডেসিবেল। কিন্তু আমরা আমাদের কানের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার চেয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ থেকে ৫০ গুণ বেশি শব্দ শুনি।

শব্দ দূষণের ফলে ক্ষতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যদি টানা ৮ ঘণ্টা আমরা ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন শুনি, তাহলে ২৫ বছরের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের বধির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কম আসে, মেজাজ খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া ক্রমাগত শব্দ দূষণের ফলে মানুষ হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক এমনকি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

○ প্রশ্ন-৩১. ফনোগ্রাফ ও গ্রামোফোন কি?

উত্তর : শব্দকে যান্ত্রিকভাবে ধারণ করে পুনরুৎপাদন করার যন্ত্রকে ফনোগ্রাফ বলে। বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন ১৮৭৮ সালে প্রথম ফনোগ্রাফ নির্মাণ করেন।

গ্রামোফোন : ফনোগ্রাফের উন্নত ও নির্ভরযোগ্য সংস্করণের নাম গ্রামোফোন।

○ প্রশ্ন-৩২. সুনামি কি?

উত্তর : 'সুনামি' জাপানি শব্দ, যার অর্থ সামুদ্রিক ঢেউ। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প বা শিলাস্তরের চ্যুতি ঘটলে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং এ ঢেউ প্রবল প্রতাপে সমুদ্র উপকূলে আচড়ে পড়ে উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে। এ ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা এতটাই বেশি যে নিমিষেই ব্যাপক প্রাণহানী ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সংঘটিত সুনামিতে উপকূলীয় দেশগুলোতে অসংখ্য প্রাণহানী ঘটে।

○ প্রশ্ন-৩৩. প্রমাণ তীব্রতা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : 1000 Hz কম্পাংকবিশিষ্ট শব্দের শ্রাব্যতার সীমা $10^{-12}Wm^{-2}$ তীব্রতার সমান ধরা হয় এবং একেই প্রমাণ বা আদর্শ তীব্রতা বলে। অর্থাৎ 1000 Hz কম্পাংকবিশিষ্ট $10^{-12}Wm^{-2}$ তীব্রতাকে প্রমাণ তীব্রতা বলে। একে I_0 দ্বারা সূচিত করা হয়। I_0 এর সাপেক্ষে সকল তীব্রতা পরিমাপ করা হয়।

○ প্রশ্ন-৩৪. তীব্রতা লেভেলের সমীকরণটি প্রতিপাদন করুন।

উত্তর : যদি I তীব্রতার জন্যে শব্দোচ্চতা L এবং I_0 তীব্রতার জন্যে শব্দোচ্চতা L_0 হয় তবে–

আমরা পাই, $L = a \log_{10} I$ .... (1)

এবং $L_0 = a \log_{10} I_0$ ....(2)

∴ তীব্রতা লেভেল, $\beta = L - L_0 = a(\log_{10} I - \log_{10} I_0)$

$$= a \log_{10} \frac{I}{I_0}$$

যখন a = 1 হয় তখন

$$\beta = \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) \text{bel}$$

decibel এককে তীব্রতা লেভেল,

$$\beta = 10 \log_{10}\left(\frac{I}{I_0}\right) \text{db}$$

খ

স্বর-এর বৈশিষ্ট্য
Characteristics of a Sound Note

○ প্রশ্ন-৩৫. সংজ্ঞাগুলো লিখুন : i. সুর ও ii. স্বর

উত্তর : i. সুর : কোনো উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দে যদি একটি মাত্র কম্পাঙ্ক থাকে তাহলে সেই শব্দকে সুর বলে।

উদাহরণ : সুর শলাকা থেকে নিঃসৃত শব্দ।

ii. স্বর : কোনো উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দে যদি একাধিক কম্পাঙ্ক থাকে তাহলে সে শব্দকে স্বর বলে।

উদাহরণ : আমরা যে কথা বলি তা স্বর।

○ প্রশ্ন-৩৬. সুর ও স্বরের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : সুর ও স্বরের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	সুর	স্বর
১. কম্পাঙ্ক	কোনো উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দে যদি একটি মাত্র কম্পাঙ্কের শব্দ থাকে তাহলে ঐ শব্দকে সুর বলে।	কোনো উৎস থেকে উৎপন্ন শব্দে যদি একাধিক কম্পাঙ্কের শব্দ থাকে তাহলে ঐ শব্দকে স্বর বলে।
২. উদাহরণ	সুর শলাকার শব্দ।	কথা বলার যে শব্দ সৃষ্টি হয়।

○ প্রশ্ন-৩৭. সকল হারমোনিকই উপসুর কিন্তু সকল উপসুর হারমোনিক নয়— ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : স্বর হচ্ছে দুই বা ততোধিক সুরের সমষ্টি। স্বরে অবস্থিত সুরগুলোর মধ্যে যার কম্পাঙ্ক সবচেয়ে কম তাকে মূলসুর বা মৌলিক সুর বলে। আর যাদের কম্পাঙ্ক মূলসুরের চেয়ে বেশি তাদের উপসুর বলে। আবার যে উপসুরগুলোর কম্পাঙ্ক মূলসুরের কম্পাঙ্কের সরল গুণিতক তাদের বলে হারমোনিক। অতএব সংজ্ঞানুসারে বলা যায়, সকল হারমোনিকই উপসুর কিন্তু সকল উপসুর হারমোনিক নয়।

○ প্রশ্ন-৩৮. স্বর-গ্রাম কাকে বলে?

উত্তর : একটি নির্দিষ্ট নোট ও তার অষ্টকের মাঝখানের ছয়টি নোট মিলে একটি সুন্দর সুর উৎপন্ন হয়। এই ক্রমবর্ধমান আটটি কম্পন পর পর সাজানো থাকলে তাকে স্বরগ্রাম বলে।

হারমোনিয়াম ও পিয়ানোতে কতকগুলো চাবি ও বাঁশিতে কতকগুলো ছিদ্র থাকে। যারা একটি নির্দিষ্ট স্বরগ্রামে সাজানো থাকে। স্বর গ্রামের নোটগুলোকে সাধারণত C, D, E, F, G, A, B, C এই অক্ষরগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

○ প্রশ্ন-৩৯. সুর বিরাম বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : দুটি সুরের কম্পাঙ্কের অনুপাতকে সুর বিরাম বা সুর অবকাশ বলে। দুটি সুরের কম্পাঙ্কের পার্থক্য বেশি বা কম হলে তাদের তীক্ষ্ণতার পার্থক্য ভালোভাবে বোঝা যায়।

মনে করি, A, B, C, D ইত্যাদি কয়েকটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক যথাক্রমে n_1, n_2, n_3, n_4 ইত্যাদি।

B ও A এর মধ্যে বিরাম $= \frac{n_2}{n_1}$

B ও C এর মধ্যে বিরাম $= \frac{n_2}{n_3}$

D ও C এর মধ্যে বিরাম $= \frac{n_4}{n_3}$ ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৪০. ডায়াটোনিক স্বরগ্রাম কাকে বলে?

উত্তর : একটি বিশেষ সুর ও এর এক অষ্টক উপর সুরের মধ্যে সমসংগতিপূর্ণ বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আরও ছয়টি সুর সন্নিবেশ করে যে স্বরগ্রাম প্রস্তুত করা হয় তাকে ডায়াটোনিক স্বরগ্রাম বলে।

○ প্রশ্ন-৪১. শব্দ কখন নয়েজ এবং কখন সংগীত গুণ সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক রকম শব্দ শুনতে পাই। এদের মধ্যে কতকগুলো শ্রুতিমধুর অর্থাৎ, সংগীত গুণ সম্পন্ন, আবার কতকগুলো শ্রুতিকটু বা নয়েজ। কিন্তু এভাবে শব্দের পার্থক্য বিচার করা সর্বদা সহজ নয়। কারণ অনুভূতির বিচারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ সম্পূর্ণ ব্যক্তি নির্ভর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে উৎসের কম্পন যখন অনিয়মিত, অপর্যাপ্ত এবং ক্ষণস্থায়ী হয়, তখন ঐ শব্দকে সুরবর্জিত বা নয়েজ শব্দ বলা হয়। আবার উৎসের কম্পন যখন নিয়মিত, পর্যাবৃত্ত এবং নিরবিচ্ছিন্ন হয়, তখন ঐ শব্দ সংগীত গুণ সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-৪২. সংজ্ঞা লিখুন : i. অষ্টক ও ii. মেলডি

উত্তর : i. অষ্টক : কোনো সুরের কম্পাঙ্ক যদি অন্য একটি সুরের কম্পাঙ্কের দ্বিগুণ হয় তাহলে দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির অষ্টক বলে।

ii. মেলডি : কতকগুলো শব্দ একটির পর একটি ধ্বনিত হলে তাদের সমন্বয়ে যদি সুশ্রাব্য অনুভূতির সৃষ্টি করে তবে তাকে মেলডি বলে।

○ প্রশ্ন-৪৩. এক মুখ খোলা বাঁশির চেয়ে দুই মুখ খোলা বাঁশির সুর বেশি শ্রুতিমধুর কেন?

উত্তর : এক মুখ খোলা বাঁশিতে কেবল মাত্র অযুগ্ম সংখ্যক হারমোনিকগুলো উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি হারমোনিকগুলো অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু দুই মুখ খোলা বাঁশিতে সকল হারমোনিক উপস্থিত থাকে। ফলে এক মুখ বন্ধ নল অপেক্ষা দুই মুখ খোলা নল হতে উৎপন্ন সুর অনেক বেশি শ্রুতিমধুর হয়।

○ প্রশ্ন-৪৪. সঙ্গীত স্কেল বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : একই সময় দুটো সঙ্গীতময় শব্দ উচ্চারিত হলে তাদের লব্ধি হয় শ্রুতিমধুর হবে, নতুবা শ্রুতিকটু হবে। যদি শ্রুতিমধুর হয় তবে তাকে সঙ্গতিপূর্ণ (Consonance) বলে। আর যদি শ্রুতিকটু হয় তবে তাকে অসঙ্গতিপূর্ণ (Desonance) বলে। বাস্তবে দেখা যায় যে, শব্দ দুটোর কাঁপুনির হারের অনুপাত যদি একটা ছোট সরল সংখ্যা হয় (যেমন— ১, ২, ইত্যাদি) তবে তাদের লব্ধি শ্রুতিমধুর হয়। এ নীতির উপর ভিত্তি করে একটা স্কেল তৈরি করা হয় তাকেই মিউজিক স্কেল বা সঙ্গীত স্কেল বলে।

○ প্রশ্ন-৪৫. সনিক বোমা (Sonic Bomb) কাকে বলে? মিগ যুদ্ধজাহাজ উড়তে গেলে অনেক সময় বোমার শব্দ শোনা যায় কেন?

উত্তর : শব্দশক্তি জড় মাধ্যমের ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১১৫৬ ফুট হিসেবে সঞ্চালিত হয়। জাহাজ উড়ার সময় ভয়ানক শব্দ হয় এবং এ শব্দতরঙ্গও সেকেন্ডে ১১৫৬ ফুট হিসেবে জাহাজের চারদিকে

সঞ্চালিত হতে থাকে। জাহাজটি শব্দ উৎপাদন করে এক জায়গায় স্থির না থেকে তার সামনের দিকের ধাবমান শব্দতরঙ্গের পিছু পিছু ছুটতে থাকে। জাহাজের গতিবেগ যত বাড়তে থাকে শব্দ তরঙ্গও জাহাজের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতার মতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। জাহাজের গতি এক সময় শব্দের বেগকে ছাড়িয়ে যায়। তখনই জাহাজ শব্দতরঙ্গ কর্তৃক সৃষ্ট তরঙ্গ দেয়াল ভাঙ্গে এবং ভীষণ শব্দ হয়। আজকাল শব্দের দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি দ্রুতগতিসম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ বানানো হয়েছে। শব্দের দ্বিগুণ বেগে কোনো জাহাজ চলতে গেলে শব্দের সর্বোচ্চ বেগকে অতিক্রম করাকালীন পর পর দুইবার এবং তিনগুণ বিশিষ্ট জাহাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতি অর্জনের সময় পর পর তিনবার শব্দ শোনা যাবে। এ শব্দ ঠিক যেন বোমা পড়ার শব্দ। আসলে এটি সনিক বোমা।

○ প্রশ্ন-৪৬. সনিক বুম কি? এটি কিরূপে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : সুপারসনিক (শব্দের চেয়ে দ্রুত) বেগে গতিশীল কোনো বিমান বা মিসাইলের 'শকওয়েভ' দ্বারা তৈরি অত্যন্ত জোরালো শব্দকে সনিক বুম বলে। শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ভ্রমণে (সুপারসনিক ফ্লাইটে) বিমানটি চাপ তরঙ্গকে ওভারটেক করে, ফলে বিমানের নাককে শীর্ষবিন্দু করে শকওয়েভ কোণের সৃষ্টি হয়। এই শকওয়েভই সুপারসনিক বুম সৃষ্টি করে।

গ

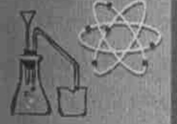

টানা তারে স্থির তরঙ্গের উৎপত্তি, টানা তারের সূত্রাবলী, বিট

Formation of stationary waves in streched string, Laws of vibrating strings, Beats

○ প্রশ্ন-৪৭. নিম্নলিখিত রাশিগুলোর সংজ্ঞা লিখুন।

উত্তর : i. তরঙ্গ, ii. পর্যায়কাল, iii. কম্পাঙ্ক, iv. বিস্তার, v. দশা, vi. তরঙ্গমুখ, vii. তরঙ্গ বেগ, viii. তরঙ্গের তীব্রতা, ix. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য।

i. **তরঙ্গ :** যে পর্যাবৃত্ত আন্দোলন কোনো জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে একস্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি সঞ্চারিত করে কিন্তু মাধ্যমের কণাগুলোকে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত করে না তাকে তরঙ্গ বলে।

ii. **পর্যায়কাল :** কম্পমান কণার কোনো মাধ্যমে একটি পূর্ণ কম্পন দিতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তাকে উক্ত মাধ্যমে ঐ কম্পনের দোলনকাল বা পর্যায়কাল বলা হয়। একে সাধারণত 'T' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

iii. **কম্পাঙ্ক :** কম্পমান কণা এক সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ কম্পন বা দোলন সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। কম্পাঙ্ককে 'n' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।
যদি t সেকেন্ডে N সংখ্যক কম্পনের সৃষ্টি হয়, তবে, $n = \frac{N}{t}$ হবে।

iv. **বিস্তার :** কম্পমান কণার সাম্যাবস্থান হতে যে কোনো একদিকে কণার সর্বাধিক সরণকে ঐ কণার বিস্তার বলা হয়। একে 'a' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

v. **দশা :** তরঙ্গস্থিত কোনো একটি কণার দশা বলতে মূলত ঐ কণার গতির অবস্থা বোঝায়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট মুহূর্তে কণাটির অবস্থান, গতির দিক, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি বোঝায়। সময়ের সাথে তরঙ্গস্থিত কোনো কণার দশা পরিবর্তিত হয়।

vi. **তরঙ্গমুখ :** কোনো তরঙ্গের ওপরিস্থিত সমদশা সম্পন্ন সব বিন্দুর মধ্য দিয়ে অঙ্কিত তলকে তরঙ্গ মুখ বলে।

vii. **তরঙ্গ বেগ :** তরঙ্গ কোনো মাধ্যমের ভিতর এক সেকেন্ডে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ বেগ বলা হয়। যদি তরঙ্গ মাধ্যমের ভিতর t সেকেন্ডে S দূরত্ব অতিক্রম করে তবে তরঙ্গ বেগ, $v = \frac{S}{t}$ হবে। তরঙ্গের বেগ একটি দিক রাশি এবং তরঙ্গের বেগ ও বস্তুর বেগের একক অভিন্ন।

viii. **তরঙ্গের তীব্রতা :** তরঙ্গের অভিমুখের লম্বভাবে রক্ষিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্যে দিয়ে এক সেকেন্ডে যে পরিমাণ শক্তি অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গের তীব্রতা বলে।

ix. **তরঙ্গ দৈর্ঘ্য :** তরঙ্গস্থিত মাধ্যমের কোনো কণা বা উৎস একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় নেয় সে সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলা হয়। একে λ (লেমডা) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

N সংখ্যক কম্পনের ফলে তরঙ্গ S দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে, $\lambda = \frac{S}{N}$ হবে।
তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে দূরত্বের এককে প্রকাশ করা হয়।

প্রশ্ন-৪৮. তরঙ্গবেগ, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করুন।

উত্তর : শব্দের বেগ, কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক :

ধরি, শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক $= f$

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য $= \lambda$

এবং শব্দের বেগ $= v$

কম্পাঙ্কের সংজ্ঞানুযায়ী, শব্দ তরঙ্গটি এক সেকেন্ডে f সংখ্যক পূর্ণ কম্পাঙ্ক সৃষ্টি করবে এবং পূর্ণ কম্পন শব্দ λ দূরত্ব অতিক্রম করবে।

∴ একটি পূর্ণ কম্পনের জন্যে অতিক্রান্ত দূরত্ব λ

∴ f টি পূর্ণ কম্পনের জন্যে অতিক্রান্ত দূরত্ব $= f\lambda$

কিন্তু শব্দ এক সেকেন্ডে মোট যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে শব্দের বেগ বলা হয়।

∴ বেগ, $v = f\lambda$

∴ বেগ = কম্পাঙ্ক × তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

প্রশ্ন-৪৯. অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গ কাকে বলে?

***অথবা,* আড় তরঙ্গ ও লম্বিক তরঙ্গ কাকে বলে?**

উত্তর : আড় তরঙ্গ : মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের অভিমুখ যদি তরঙ্গ গতি বা প্রবাহের অভিমুখের সাথে লম্ব হয়, তাহলে ঐ শ্রেণির তরঙ্গসমূহকে আড় তরঙ্গ বলা হয়।

উদাহরণ : এক গাছা দড়ি ঘরের ছাদ হতে ঝুলিয়ে একে দৈর্ঘ্যের আড়াআড়িভাবে ঝাঁকুনি দিতে থাকলে, এর ওপর আড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

লম্বিক তরঙ্গ : মাধ্যমের কণাগুলোর কম্পনের অভিমুখ যদি তরঙ্গ গতি বা তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখের সমান্তরাল হয় তাহলে ঐ শ্রেণির তরঙ্গসমূহকে লম্বিক তরঙ্গ বলা হয়।

উদাহরণ : ঝুলন্ত একটি স্প্রিং এর এক প্রান্ত উলম্বভাবে ওপরে নিচে টানলে এর মধ্যে লম্বিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। গ্যাস মাধ্যমে সৃষ্ট তরঙ্গ লম্বিক তরঙ্গের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন-৫০. অনুপ্রস্থ ও অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : অনুপ্রস্থ ও অণুদৈর্ঘ্য তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য :

পার্থক্যের বিষয়	আড় তরঙ্গ	লম্বিক তরঙ্গ
১. কণার স্পন্দন ও তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখ	মাধ্যমের কণাগুলি তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখের লম্বভাবে স্পন্দিত হতে থাকে।	মাধ্যমের কণাগুলি তরঙ্গ প্রবাহের অভিমুখের সমান্তরালে অগ্রপশ্চাৎ এ স্পন্দিত হতে থাকে।
২. যে মাধ্যমে উৎপন্ন হয়	কঠিন ও তরল মাধ্যমে যান্ত্রিক আড় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।	কঠিন, তরল ও বায়বীয় মাধ্যমে লম্বিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।
৩. তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য	আড় তরঙ্গ যান্ত্রিক তরঙ্গ ছাড়াও আলোর চুম্বকীয় তরঙ্গ এবং বিভিন্ন তরঙ্গেরও হতে পারে।	লম্বিক তরঙ্গ যান্ত্রিক তরঙ্গ।
৪. গঠন	পরপর দুইটি তরঙ্গ শীর্ষ বা পরপর দুইটি তরঙ্গপাদ-এর মধ্যবর্তী দূরত্ব এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সূচিত করে।	পরপর দুটি ঘনীভবন বা সন্নিহিত পরপর দুটি লঘুভবন এর মধ্যবর্তী দূরত্ব এর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে।

প্রশ্ন-৫১. অগ্রগামী তরঙ্গ কাকে বলে?

উত্তর : অগ্রগামী তরঙ্গ : স্পন্দন (আড় ও লম্বিক তরঙ্গের ক্ষেত্রে) স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের এক কণা হতে পরবর্তী অপর কণাতে স্থানান্তরিত হলে এবং তরঙ্গের কণাগুলো একযোগে সামনের দিকে অগ্রসর হলে তাকে অগ্রগামী তরঙ্গ বলা হয়।

প্রশ্ন-৫২. স্থির তরঙ্গ কাকে বলে?

উত্তর : স্থির তরঙ্গ : একই বিস্তার এবং পর্যায়কাল বিশিষ্ট দুটি অগ্রগামী তরঙ্গ যখন কোনো মাধ্যমে পরস্পর বিপরীত দিক থেকে সমবেগে একে অপরের ওপর আপতিত হয় তখন একটি লব্ধি তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ তরঙ্গ শুধুমাত্র স্পন্দিত হতে থাকে কিন্তু কোনোদিকে অগ্রসর হয় না। এ তরঙ্গকে স্থির তরঙ্গ বলা হয়। এ ধরনের তরঙ্গের ক্ষেত্রে গতিশক্তি স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন-৫৩. স্থির তরঙ্গের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর : স্থির তরঙ্গের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

i. মাধ্যমের সীমিত অংশে এ তরঙ্গের উদ্ভব এবং পরিশেষে বিলুপ্ত হয়।

ii. তরঙ্গের বিভিন্ন বিন্দুতে কম্পনের বিস্তার বিভিন্ন হয়। যে বিন্দুতে বিস্তার সর্বাধিক তাকে সুস্পন্দ বিন্দু বলে আর তরঙ্গের যে বিন্দুতে বিস্তার শূন্য তাকে নিস্পন্দ বিন্দু বলে।

iii. পরপর দুটি নিস্পন্দ বিন্দুর মধ্যবর্তী কণার সরণ একই দিকে হয় এবং তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব $\frac{\lambda}{2}$। দুটি পর পর নিস্পন্দ বিন্দুদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বকে লুপ বলা হয়।

iv. পর পর দুটি লুপের কণাগুলোর সরণ পরস্পর বিপরীত দিকে হয়।

v. নিস্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন সর্বাধিক কিন্তু সুস্পন্দ বিন্দুতে চাপ ও ঘনত্বের পরিবর্তন শূন্য।

vi. নিস্পন্দ বিন্দুতে অবস্থিত কণাগুলো ছাড়া সকল কণার গতি সরল ছন্দিত গতি।

প্রশ্ন-৫৪. স্থির তরঙ্গ ও অগ্রগামী তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : স্থির তরঙ্গ ও অগ্রগামী তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অগ্রগামী তরঙ্গ	স্থির তরঙ্গ
১. মাধ্যমের সকল কণাই পর্যাবৃত্ত গতি লাভ করে।	১. নিস্পন্দ বিন্দুর কণাগুলো ছাড়া অন্যান্য সকল কণাই পর্যাবৃত্ত গতি লাভ করবে।
২. মাধ্যমের কণাগুলো কখনও স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয় না।	২. প্রতিটি পূর্ণ কম্পনে কণাগুলো দুবার স্থির অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
৩. মাধ্যমের প্রতিটি কণার বিস্তার সমান।	৩. মাধ্যমের প্রতিটি কণার দশা সমান; কিন্তু বিস্তার বিভিন্ন।
৪. মাধ্যমের ভেতর দিয়ে নির্দিষ্ট বেগে অগ্রসর হয়।	৪. মাধ্যমের মধ্যে স্থিরভাবে অবস্থান করে।

প্রশ্ন-৫৫. নিস্পন্দ ও সুস্পন্দ বিন্দু কি?

উত্তর : **নিস্পন্দ বিন্দু :** যে সকল বিন্দুতে তরঙ্গস্থিত কণার সরণ সর্বাপেক্ষা কম হয়, সে সকল বিন্দুকে নিস্পন্দ বিন্দু বলা হয়।

সুস্পন্দ বিন্দু : যে সকল বিন্দুতে তরঙ্গস্থিত কণার সরণ সর্বাপেক্ষা বেশি হয়, সে সকল বিন্দুকে সুস্পন্দ বিন্দু বলে।

প্রশ্ন-৫৬. টানা তারে কিভাবে স্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হয় ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : সুষম, নমনীয় এবং দৈর্ঘ্যের তুলনায় ক্ষুদ্র ব্যাসযুক্ত একটি তারের দুই প্রান্ত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে টান টান করে এর দৈর্ঘ্যের অভিলম্বভাবে টেনে ছেড়ে দিলে অথবা তারটিকে মৃদু আঘাত করলে, তারের বিভিন্ন কণা দৈর্ঘ্যের অভিলম্বভাবে কম্পিত হতে থাকবে। এ কম্পন কণা হতে কণাতে স্থানান্তরিত হবে অর্থাৎ অনুপ্রস্থ তরঙ্গের সৃষ্টি হবে। অতঃপর এ তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট বেগ নিয়ে দুই বদ্ধ প্রান্তের দিকে অগ্রসর হবে এবং বদ্ধ প্রান্ত কর্তৃক প্রতিফলিত হবে। প্রতিফলিত এ তরঙ্গদ্বয় তারের মাঝ বরাবর পরস্পরকে অতিক্রম করে পুনরায় বদ্ধ প্রান্তদ্বয় কর্তৃক প্রতিফলিত হবে। এরূপে তারের উপর দুটি একই ধরনের তরঙ্গের বিপরীত দিক হতে এসে মিলিত হওয়ার ফলে স্থির তরঙ্গের উৎপত্তি হবে। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে এ ধরনের কম্পনকে কাজে লাগানো হয়।

তারের টান বলকে 'T', তারের মধ্যে উৎপন্ন তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 'λ' এবং তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর 'm' হলে তারের মধ্য দিয়ে চলমান তরঙ্গের বেগ 'v' কে নিম্নোক্ত সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

$$v = \sqrt{\frac{T}{m}}$$

আবার, $v = n\lambda$

তাহলে, $n\lambda = \sqrt{\frac{T}{m}}$

$$\therefore n = \frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{T}{m}}$$

আবার, $\lambda = 2l$

$$\therefore n = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}}$$

এটিই টানা তারে আড় কম্পনের রাশিমালা।

প্রশ্ন-৫৭. একটি টান দেওয়া তারের আড় কম্পনের সূত্রগুলো লিখুন।

উত্তর : টানা তারের আড় কম্পনের সূত্র : দুই প্রান্তে আবদ্ধ তারে অনুপ্রস্থ কম্পন সৃষ্টি করলে যে মূলসুর উৎপন্ন হয় তার কম্পাঙ্ক কতকগুলো সূত্র মেনে চলে। ফরাসি গণিতজ্ঞ মার্সেন 1636 সালে এ সূত্রগুলো আবিষ্কার করেন।

১. **দৈর্ঘ্যের সূত্র :** কোনো কম্পমান তারের টান (T) ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর (m) স্থির থাকলে, তারের কম্পাঙ্ক (n) তারের দৈর্ঘ্যের (ℓ) ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ, $n \propto \frac{1}{\ell}$; যখন T এবং m স্থির থাকে।

২. **টানের সূত্র :** কোনো কম্পমান তারের দৈর্ঘ্য (ℓ) ও প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভর (m) স্থির থাকলে তারের কম্পনাঙ্ক (n) টানের (T) বর্গমূলের সমানুপাতিক হয়।

অর্থাৎ, $n \propto \sqrt{T}$; যখন ℓ এবং m স্থির থাকে।

৩. **ভরের সূত্র :** কোনো কম্পমান তারের টান (T) ও দৈর্ঘ্য (ℓ) স্থির থাকলে তারের কম্পাঙ্ক (n) প্রতি একক দৈর্ঘ্যের ভরের (m) বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক।

অর্থাৎ, $n \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$; যখন ℓ ও T স্থির থাকে।

প্রশ্ন-৫৮. সনোমিটার কাকে বলে?

উত্তর : **সনোমিটার :** সনোমিটারের সাহায্যে টানা তারের সূত্রগুলো ব্যাখ্যা করা যায়। একটি আয়াতকার ফাঁপা কাঠের বাক্সের উপর প্রায় এক মিটার লম্বা একটি তার আটকিয়ে সনোমিটার তৈরি করা যায়। চিত্রে একটি সনোমিটার দেখানো হলো। তারের একপ্রান্ত একটি খুঁটির সাথে আটকানো এবং তারটি A এবং B দুটি কাঠের স্থির সেতুর উপর দিয়ে মসৃণ কপিকল P-এর গা বেয়ে একটি হুকের সাথে সংযুক্ত। হুকে ভার চাপালে তার টান টান হয়। A এবং B স্থির সেতু দুটির মাঝে M একটি সঞ্চরণশীল সেতু। M সেতুকে সরিয়ে A এবং M-এর মধ্যে কম্পমান তারের যেকোনো দৈর্ঘ্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যায়। A এবং B এর মধ্যবর্তী তারের অংশকে টেনে ছেড়ে দিলে তির্যক কম্পন সৃষ্টি হবে এবং তারের দৈর্ঘ্য, টান এবং ভার অনুযায়ী নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক যুক্ত সুর উৎপন্ন হবে।

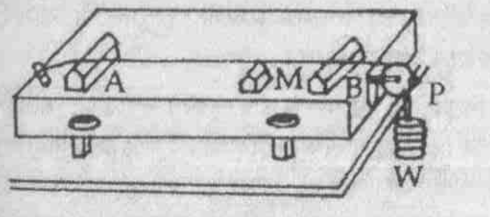

চিত্র : সনোমিটার

প্রশ্ন-৫৯. সনোমিটারের সাহায্যে একটি সুর শলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর : **তত্ত্ব :** সনোমিটারের সাহায্যে কোনো একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের জন্যে আমরা যে সমীকরণ ব্যবহার করি তা হলো–

$$n = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{m}}$$

এখানে, n = কম্পাঙ্ক,

ℓ = তারের কম্পমান দৈর্ঘ্য

T = Mg = তারে প্রযুক্ত টান

এবং m = তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর।

পরীক্ষা পদ্ধতি : একটি সুরশলাকা নিই যার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে। প্রথমে পরীক্ষাধীন তারের মোট দৈর্ঘ্য ও ভর জেনে একক দৈর্ঘ্যের ভর বের করি। এখন, সুরশলাকাকে একটি রাবার প্যাডে আঘাত করি এবং সনোমিটারের বাক্সের উপর স্থাপন করি। সেতুকে এদিক-সেদিক সরিয়ে তারের দৈর্ঘ্যকে এমনভাবে সংযোজিত করি যাতে তারের উপরে স্থাপিত কাগজের টুকরা ছিটকে পড়ে। অর্থাৎ, তার ও সুরশলাকা অনুনাদ সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় দুই সেতুর মধ্যবর্তী তারের দৈর্ঘ্য বের করি। এরপর টান বের করি।

হিসাব : ধরি, তারের টান T = Mg ডাইন, তারের কম্পমান দৈর্ঘ্য = ℓ, তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর = m গ্রাম।

$$\therefore \text{ কম্পাঙ্ক, } n = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$= \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{Mg}{m}}$$

এখন, M, g, ℓ, এবং m এর মান জেনে n নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৬০. একটি টানা তারের আড় কম্পনের কম্পাঙ্ক কোনো বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : টানা তারের আড় কম্পনের কম্পাঙ্কের নির্ভরশীলতা :

আমরা জানি, একটি টানা তারের আড় কম্পনের কম্পাঙ্ক,

$$n = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{m}}$$

$$= \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T\times 4}{\pi d^2\rho}} \quad \left[\because m = \frac{\pi d^2}{4}\times\rho\right]$$

$$= \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{\pi\rho}}$$

সুতরাং, টানা দেওয়া তারের আড় কম্পনের সূত্রগুলো : i. দৈর্ঘ্য; ii. ব্যাসার্ধ; iii. তারের টান; iv. তারের উপাদানের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে।

○ প্রশ্ন-৬১. সংজ্ঞা লিখুন : ক. মুক্ত কম্পন ও খ. পরবশ কম্পন বা, আরোপিত কম্পন

উত্তর : ক. মুক্ত কম্পন : কোনো স্পন্দনক্ষম বস্তুকে আঘাত করে ছেড়ে দিলে বস্তুটি নিজস্ব নির্দিষ্ট কম্পাঙ্ক ও নির্দিষ্ট পর্যায়কালে স্পন্দিত হয়। বস্তুর এই ধরনের কম্পনকে মুক্ত কম্পন বা স্বাভাবিক কম্পন বলে।

খ. পরবশ কম্পন বা, আরোপিত কম্পন : নির্দিষ্ট সময় অন্তর যদি কোনো পরিবর্তনশীল বলের মান এবং দিক একই থাকে তাহলে এ বলকে পর্যাবৃত্ত বল বলে। এ পর্যাবৃত্ত বল কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত হলে বস্তুটি প্রথমে তার নিজস্ব স্বাভাবিক কম্পাঙ্কে কম্পিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণ অনিয়মিতভাবে কম্পিত হবার পর বস্তুটি প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত বলের কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হতে থাকে। পর্যাবৃত্ত বল যতক্ষণ বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল থাকে বস্তুটি ততক্ষণ প্রযুক্ত বলের কম্পাঙ্কে স্পন্দিত হতে থাকে। এ ধরনের কম্পনকে পরবশ কম্পন বা আরোপিত কম্পন বলে।

○ প্রশ্ন-৬২. অনুনাদ কাকে বলে?

উত্তর : যখন পর্যাবৃত্ত বল প্রয়োগে কোনো বস্তুকে আন্দোলিত করা হয়, তখন যদি পরবশ কম্পনশীল বস্তুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক প্রযুক্ত পর্যাবৃত্ত বলের কম্পাঙ্কের সমান হয়, তাহলে বস্তু অধিক বিস্তারে কম্পিত হয় ও কম্পন বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়। এ ধরনের কম্পনকে অনুনাদ বলে।

○ প্রশ্ন-৬৩. সব অনুনাদই আরোপিত কম্পন কিন্তু সব আরোপিত কম্পন অনুনাদ নয়–ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : একটি কম্পনরত বস্তুকে অন্য একটি বস্তুর নিকট আনলে দ্বিতীয় বস্তুটিতে কম্পন শুরু হয়। একে পরবশ বা আরোপিত কম্পন বলে। প্রযুক্ত কম্পাংক দ্বিতীয় বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পাংকের সমান হলে অনুনাদ সৃষ্টি হয়। সমান না হলে সাধারণ আরোপিত কম্পন হয়। অনুনাদ হচ্ছে বিশেষ ধরনের আরোপিত কম্পন।

কাজেই, সব অনুনাদই আরোপিত কম্পন কিন্তু সব আরোপিত কম্পন অনুনাদ নয়।

○ প্রশ্ন-৬৪. তরঙ্গের উপরিপাতন নীতি কী?

উত্তর : যখন কোনো মাধ্যমের কোনো বিন্দুতে একই সঙ্গে দুটি তরঙ্গ আপতিত হয় তখন প্রত্যেক তরঙ্গের প্রভাবে সাম্যাবস্থা থেকে মাধ্যমের কণার সরণ হয়। এ কণার লব্ধি সরণ প্রত্যেক তরঙ্গের জন্যে কণার সরণের ভেক্টর সমষ্টির সমান।

মনে করি, একটি তরঙ্গের দরুন মাধ্যমের কোনো বিন্দুর কোনো সময়ে সরণ হলো y_1, দ্বিতীয় একটি তরঙ্গের জন্যে ঐ বিন্দুতে ঐ সময়ে সরণ হলো y_2, তাহলে ঐ দুটি তরঙ্গ যুগপৎ অতিক্রম করলে ঐ বিন্দুর লব্ধি সরণ হবে,

$$\vec{y} = \vec{y_1} + \vec{y_2}$$

$$y = y_1 - y_2$$

যদি দুটি সরণ একই দিকে হয় তবে ধনাত্মক চিহ্ন নিতে হবে। সরণ দুটি বিপরীতমুখী হলে ঋণাত্মক চিহ্ন নিতে হবে। উপরিপাতন নীতির সাহায্যে স্থির তরঙ্গ সৃষ্টি, ব্যতিচার, স্বরকম্প ইত্যাদি ঘটনা ব্যাখ্যা করা যায়।

○ প্রশ্ন-৬৫. বীট বা স্বরকম্প কাকে বলে?

উত্তর : প্রায় সমান তীব্রতা ও কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট দুটি উৎস হতে একই সময়ে শব্দ উৎপন্ন করলে এরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে একটি লব্ধি শব্দ সৃষ্টি করে। এ লব্ধি শব্দের তীব্রতা পর্যায়ক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পায়। শব্দের প্রাবল্যের এরূপ পর্যায়ক্রমিক হ্রাস বৃদ্ধিকে স্বরকম্প বা বীট বলে।

○ প্রশ্ন-৬৬. স্বরকম্প বা বীট উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : **স্বরকম্প বা বীট উৎপত্তি কৌশল :** সাধারণত সামান্য পার্থক্যের কম্পাঙ্ক সম্পন্ন দুটি তরঙ্গমালা যখন একই সরলরেখা বরাবর পরস্পর বিপরীত দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন ব্যতিচারের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফাঁপা কাঠের বাক্সের উপর বসানো দুটি একই কম্পাঙ্কের সুরশলাকা নিয়ে একটির পর একটি আঘাত করলে একটানা একই রকম শব্দ শোনা যায়। সুরশলাকা দুটিকে একসঙ্গে আঘাত করলেও একটানা শব্দ উৎপন্ন হয়, তবে শব্দ এক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা জোরালো হয়। এখন, একটি

সুরশলাকার বাহুতে কিছুটা মোম আটকিয়ে সামান্য ভারী করলে এর কম্পাঙ্ক কিছুটা কমে যাবে। এবার উভয়কে একসঙ্গে আঘাত করলে দেখা যাবে যে, শব্দ একটানা হচ্ছে না; শব্দের প্রাবল্য একবার বাড়ছে ও একবার কমছে। শব্দের প্রাবল্যের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই স্বর কম্পের সৃষ্টি হয়। এর উৎপত্তি নিম্নের ব্যাখ্যা হতে বুঝা যায়–

প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটি সুরশলাকা এদের নিজ নিজ কম্পাঙ্কের সমান সংখ্যক শব্দ তরঙ্গ বায়ুর মধ্যে সৃষ্টি করে।

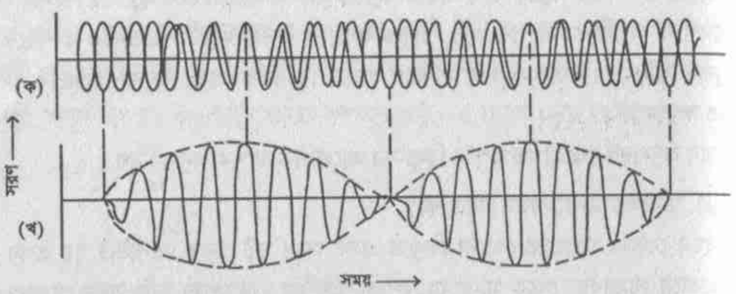

(ক) নং চিত্রে ঐ দুটি তরঙ্গ গুচ্ছের প্রতিকৃতি অর্থাৎ, বিভিন্ন বিন্দুতে সৃষ্ট সরণগুলো কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তা দেখানো হয়েছে। এ তরঙ্গ গুচ্ছ দুটি পরস্পরের উপর আপতিত হয়ে যে লব্ধি তরঙ্গের সৃষ্টি করবে তা (খ) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এ চিত্র হতে দেখা যায় যে বিবেচনাধীন বিন্দুতে লব্ধি তরঙ্গ গুচ্ছের বিস্তার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার সময়ের সাথে এরূপ হ্রাস বৃদ্ধির ফলে তরঙ্গের প্রাবল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বা বীট সৃষ্টি হয়।

বীট প্রকাশের রাশিমালা

যদি দুটি উৎসের কম্পাঙ্ক n_1 এবং n_2 হয় এবং প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট বীটের সংখ্যা N হয়–

তাহলে, $N = n_1 \sim n_2$

যদি $n_1 > n_2$ হয়, $N = n_1 - n_2$

যদি $n_1 > n_2$ হয়, $N = n_2 - n_1$

○ প্রশ্ন-৬৭. বীটের সাহায্যে একটি সুরেলী কাঁটার অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয় প্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিটের সাহায্যে সুরেলী কাঁটার কম্পাঙ্ক নির্ণয় : বীটের সাহায্যে আমরা কোনো টিউনিং ফর্কের বা সুরশলাকার অজানা কম্পাঙ্ক বের করতে পারি। যখন একটি জানা কম্পাঙ্ক ও অজানা কম্পাঙ্কের সুরশলাকার মধ্যে কম্পাঙ্কের পার্থক্য বেশি না হয় তখনই কেবল ঐ পদ্ধতিতে অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয় করা যায়।

এখন, n_1 অজানা কম্পাঙ্কের সুরশলাকাকে n_2 জানা কম্পাঙ্কের সুরশলাকার সাথে একসাথে কাঁপিয়ে বীট সৃষ্টি করা হলো। ধরা যাক, প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট বীট সংখ্যা = N

$\therefore N = n_1 \sim n_2$

এখন, অজানা কম্পাঙ্ক n_1, জানা কম্পাঙ্ক n_2 এর চেয়ে ছোট বা বড় হতে পারে। সুতরাং অজানা কম্পাঙ্ক, $n_1 = n_2 \pm N$

এখন, n_1 এর কম্পাঙ্ক $n_2 + N$ বা $n_2 - N$ কোনটি হবে তা নির্ণয়ের জন্যে আমরা অজানা কম্পাঙ্কের সুরশলাকার বাহুতে কিছু মোম লাগিয়ে দিই ফলে এটি ভারী হয় এবং কম্পাঙ্ক কমে যায়। এখন বীট সৃষ্টি বীট সংখ্যা N-এর চেয়ে বাড়তেও পারে বা কমতেও পারে। যদি বীট সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে n_1, n_2 এর চেয়ে ছোট হবে অর্থাৎ $n_1 = n_2 - N$ হবে। আর যদি বীট সংখ্যা কমে যায় তাহলে n_1, n_2 এর চেয়ে বড় হবে অর্থাৎ, $n_1 = n_2 + N$।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, অজানা কম্পাঙ্কের সুরশলাকায় মোম লাগালে যদি বীট সংখ্যা বাড়ে তাহলে অজানা কম্পাঙ্ক জানা কম্পাঙ্কের চেয়ে ছোট হবে আর যদি বীট সংখ্যা কমে তাহলে অজানা কম্পাঙ্ক জানা কম্পাঙ্কের চেয়ে বড় হবে।

○ প্রশ্ন-৬৮. শব্দের ব্যতিচার কি?

উত্তর : একই কম্পাঙ্ক ও বিস্তারবিশিষ্ট দুটি শব্দ তরঙ্গ একই দিকে চলতে থাকলে এদের উপরিপাতনের ফলে কখনো শব্দের প্রাবল্য খুব বেড়ে যায় আবার কখনো প্রাবল্য শূন্য হয়। একে শব্দের ব্যতিচার বলে।

○ প্রশ্ন-৬৯. বিট (Beat) কি? কিভাবে বিটের মাধ্যমে খনিতে দূষিত গ্যাসের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়?

উত্তর : একই ধরনের এবং প্রায় সমান কম্পাঙ্কের দুটি শব্দ তরঙ্গের উপরিপাতনের ফলে শব্দের প্রাবল্যের যে পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি হয় তাকে বীট বলে।

খনিতে দূষিত গ্যাসের অস্তিত্ব নির্ণয় : বিটের সাহায্যে খনিতে দূষিত বায়ু আছে কিনা তা নির্ণয় করা যায়। যে খনির বায়ু দূষিত বলে সন্দেহ হয় তার খানিকটা বায়ু একটি অর্গান নলে নেয়া হয়। অপর একটি অর্গান নলে বিশুদ্ধ বায়ু নেয়া হয়। এখন নল দুটিকে একত্রে বাজালে যদি বিটের সৃষ্টি হয় তাহলে বুঝতে হবে বায়ু দূষিত। কারণ বায়ু দূষিত হলে তার ঘনত্ব বিশুদ্ধ বায়ুর ঘনত্বের চেয়ে আলাদা হবে ফলে নলদ্বয় থেকে সৃষ্ট শব্দের কম্পাঙ্কের পার্থক্য থাকবে। ফলে বিট সৃষ্টি হবে। আর যদি খনির বায়ু বিশুদ্ধ হয় তাহলে কম্পাঙ্কের কোনো প্রভেদ থাকবে না। ফলে বিটও শোনা যাবে না। এভাবে বিটের সাহায্যে খনিতে দূষিত গ্যাসের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৭০. শব্দতরঙ্গ ও আলোক তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

উত্তর :

শব্দতরঙ্গ	আলোকতরঙ্গ
১. শব্দ একটি যান্ত্রিক বা স্থিতিস্থাপক তরঙ্গ।	১. আলো একটি তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ।
২. শব্দ একটি অগ্রগামী দীঘল তরঙ্গ।	২. আলো একটি অগ্রগামী আড় তরঙ্গ।
৩. শব্দতরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয়।	৩. আলোক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না।
৪. শব্দের বেগ তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে।	৪. আলোর বেগ তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না।
৫. স্বাভাবিক তাপমাত্রা ও চাপে বায়ু মাধ্যমে শব্দের বেগ 332 m/sec.	৫. শূন্যস্থানে আলোর বেগ 3×10^8 m/sec.

ঘ ডপলার ক্রিয়া, ডপলার ক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ এবং এর সীমাবদ্ধতা
Doppler Effect, Applications and limitations of Doppler Effect

○ প্রশ্ন-৭১. ডপলারের ক্রিয়া কি?

উত্তর : ডপলারের ক্রিয়া : শব্দের উৎস ও শ্রোতার মধ্যে আপেক্ষিক গতির জন্যে শ্রোতার নিকট উৎস হতে নিঃসৃত শব্দের তীক্ষ্মতার যে আপাত পরিবর্তন ঘটে তাকে ডপলারের ক্রিয়া বলে।

○ প্রশ্ন-৭২. শব্দের ক্ষেত্রে ডপলারের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ডপলার ক্রিয়ার ব্যাখ্যা : বিভিন্ন অবস্থার জন্যে কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্মতার যে আপাত পরিবর্তন ঘটে তা নিম্নে চিত্রের সাহায্যে বুঝানো হলো–

মনে করি, কোনো এক মুহূর্তে চলমান শব্দের উৎসটির অবস্থান ৪নং বিন্দুতে ছিলো। এর আগে চার অনুক্রমিক সেকেন্ডে উৎসটির অবস্থান ছিলো যথাক্রমে ৩, ২, ১, ০ বিন্দুতে। শব্দের বেগ যদি v হয় তবে উৎস যখন ৪নং বিন্দুতে পৌঁছায় তখন ৩ নং বিন্দু হতে নিঃসৃত তরঙ্গের তরঙ্গ মুখ v ব্যাসার্ধের একটি গোলকের পৃষ্ঠদেশ A তে পৌঁছায়।

অনুরূপভাবে, শব্দের উৎস যখন 8 নং অবস্থানে পৌঁছায় তখন ২নং অবস্থান হতে নিঃসৃত শব্দ তরঙ্গের তরঙ্গ মুখ 2v ব্যাসার্ধের গোলকের পৃষ্ঠদেশ B তে পৌঁছায়। এভাবে গোলক C এবং D শব্দ উৎস ১ এবং 0 নং অবস্থানের অনুরূপ।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, শ্রোতা যদি উৎসের ডান দিকে থাকে তবে তরঙ্গ উৎস স্থির থাকলে তরঙ্গ মুখগুলো যে অবস্থায় থাকতো তরঙ্গ উৎসের গতির ফলে এগুলো অনেক ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, অর্থাৎ শ্রোতা বেশি সংখ্যক শব্দ শুনতে পাবে।

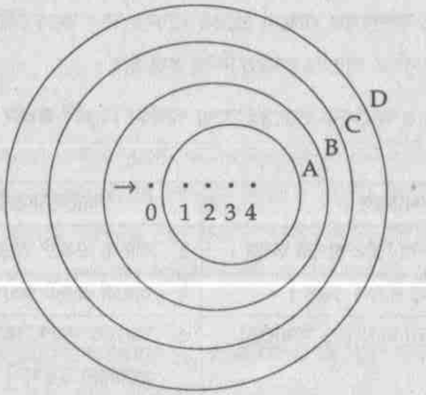

তাই উৎসের কম্পাঙ্ক বেড়ে গেছে বলে মনে হবে। শ্রোতা যদি ডানদিকে না থেকে বামদিকে থাকতো তবে তরঙ্গ মুখগুলোর মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে যেতো। ফলে শ্রোতা কম সংখ্যক শব্দ শুনতে পেতো এবং কম্পাঙ্ক বা তীক্ষ্মতা কমে গেছে বলে মনে হত।

○ প্রশ্ন-৭৩. ডপলার ক্রিয়ার প্রয়োগ উল্লেখ করুন।

উত্তর : ডপলার ক্রিয়ার প্রয়োগসমূহ আলোচনা করা হলো :

i. সমুদ্রের তলদেশে সাবমেরিনের বেগের মান ও দিক নির্ণয় করতে ডপলার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। সাবমেরিন হতে প্রেরিত শব্দ ও সাবমেরিনের গতির নিজস্ব শব্দের ফলেই প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়।

ii. বিমান, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয় করা যায়। এক্ষেত্রে রাডার হতে এক ধরনের তরঙ্গগুচ্ছ লক্ষ্যবস্তুর দিকে প্রেরণ করা হয় যা বিমান বা উপগ্রহের গতিবেগের ফলে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে শব্দের গতিবেগ পরিমাপ করা হয়।

iii. ডপলার ক্রিয়ার সাহায্যে যুগ্ম তারকার অস্তিত্ব, শনি গ্রহের বলয়, সূর্য, নীহারিকা ইত্যাদির আবর্তন সংক্রান্ত বহু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

iv. তারকা, নীহারিকা ইত্যাদি জ্যোতিষ্কের গতিবেগের পরিমাপে ডপলার ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৭৪. ডপলার প্রভাব বা ডপলার নীতি কি?

উত্তর : শ্রোতা ও উৎসের মধ্যে আপেক্ষিক গতির ফলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের আপাত পরিবর্তনকে ডপলার প্রভাব বা নীতি বলে।

যখন কোনো উৎস কোনো স্থির শ্রোতার দিকে গতিশীল থাকে তখন শ্রোতার কাছে শব্দ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু উৎস থেকে দূরে সরে গেলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের আপাত হ্রাস হয়।

যখন কোনো শ্রোতা স্থির উৎসের দিকে গতিশীল থাকে তখন শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের আপাত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রোতা স্থির উৎস থেকে দূরে সরে গেলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের আপাত হ্রাস হয়।

শ্রোতা ও উৎস একই দিকে গতিশীল হলে এবং উৎসের বেগ শ্রোতার চেয়ে বেশি হলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের কোনো পরিবর্তন হবে না।

শ্রোতা গতিশীল উৎসের দিকে অগ্রসর হলে শ্রুত শব্দের কম্পাঙ্কের আপাত বৃদ্ধি হবে।

○ প্রশ্ন-৭৫ আলোর ক্ষেত্রে ডপলার প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : যখন দূরবর্তী কোনো নক্ষত্র হতে নিঃসৃত আলো স্পেকট্রোস্কোপে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পাশাপাশি আর্ক বাতি (arc lamp) সৃষ্ট একই ধরনের বর্ণালী পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন দেখা যায় যে নক্ষত্র নিঃসৃত বর্ণালী রেখা ধীরে ধীরে হয় বেগুনি কিংবা লাল প্রান্তের দিকে সরে যাচ্ছে। বেগুনি প্রান্তের দিকে সরণ হলে বুঝতে হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য হ্রাস পাচ্ছে বা কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পর্যবেক্ষণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, নক্ষত্রটি পৃথিবীর দিকে আসছে। পক্ষান্তরে নক্ষত্র নিঃসৃত বর্ণালী রেখা ধীরে ধীরে লাল প্রান্তের দিকে সরে গেলে বুঝতে হবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বেড়ে যাচ্ছে বা কম্পাঙ্ক কমে যাচ্ছে অর্থাৎ নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৭৬. রেল স্টেশনের প্লাটফরমে দাঁড়ানো অবস্থায় আগত ট্রেনের বাঁশি বাজানো শুনলে শ্রুত শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয় কেন?

উত্তর : ট্রেনটি যখন বাঁশি বাজাতে বাজাতে প্লাটফরমের দিকে অগ্রসর হয় তখন শব্দের তীক্ষ্ণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলে মনে হয়। আবার প্লাটফরম অতিক্রম করে ট্রেনটি যখন চলে যায় তখন শব্দের তীক্ষ্ণতা কমে যায়। এর কারণ যখন শ্রোতা ও স্বনকের মধ্যে কোনো গতি থাকে না তখন স্বনক যতগুলো তরঙ্গ সৃষ্টি করে ততগুলো শব্দ তরঙ্গই শ্রোতার নিকট পৌছে। সুতরাং এক্ষেত্রে শ্রুতশব্দের কম্পাঙ্ক তথা তীক্ষ্ণতা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ট্রেনটি যখন প্লাটফরমের দিকে আসতে থাকে তখন শ্রুতশব্দের তীব্রতা প্রতি সেকেন্ডে শ্রোতা কর্তৃক প্রাপ্ত তরঙ্গ সংখ্যার সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। কাজেই এক্ষেত্রে শ্রুতশব্দের তীক্ষ্ণতার আপাত বৃদ্ধি ঘটবে। স্টেশন থেকে চলে যাওয়ার সময় শ্রোতার নিকট এর বিপরীত অনুভূতি জাগাবে অর্থাৎ শব্দের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকবে। এ ঘটনাকে ডপলার প্রভাব বলে।

ঙ

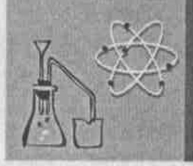

প্রতিধ্বনি, শব্দতরঙ্গের শোষণ, ধ্বনির অনুরণন, শব্দবিজ্ঞানের মৌলিক পর্যেষণা, সাবিনার সূত্রের বর্ণনা

Echoes, Absorption of sound wave, Reverberations, Fundamentals of Building acoustics, Statement of Sabine's Formula

○ প্রশ্ন-৭৭. শব্দের প্রতিফলন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : শব্দ তরঙ্গ একটি সুষম মাধ্যমের মধ্য দিয়ে চলার সময় যদি অন্য কোনো সুষম মাধ্যমে বাধা পায় তাহলে শব্দ তরঙ্গটি পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসে। একে শব্দের প্রতিফলন বলে।

○ প্রশ্ন-৭৮. শব্দের প্রতিফলকের ব্যবহারিক প্রয়োগ কি কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : শব্দের প্রতিফলকের ব্যবহারিক প্রয়োগ হতে পারে নিম্নরূপ :

ক. **কথন নল বা কথা বলার নল (Talking Tube) :** স্টীমার বা মোটর লঞ্চের সারেং ও ইঞ্জিন ঘরের কর্মীদের সাথে কথোপকথনের জন্য এক প্রকার লম্বা নল ব্যবহার করা হয়। এ নলকে কথন নল বলে। এ নলের এক প্রান্তে কথা বললে অপর প্রান্তে খুব স্পষ্ট শোনা যায়। এর কারণ, কথায় যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।
উৎপন্ন শব্দ নলের গায়ে বার বার প্রতিফলিত হয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে এবং তা স্পষ্ট শোনা যায়।

খ. **স্টেথোস্কোপ (Stethoscope) :** ডাক্তাররা বুক পরীক্ষা করার জন্য যে স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেন তার কার্যনীতিও কথন নলের অনুরূপ। এতে দুটি নল থাকে। নল দুটি এক জায়গায় মিলিত হয়ে একটি পাতলা পর্দাযুক্ত যন্ত্রের সাথে লাগানো থাকে। এ যন্ত্রটি বুকে রাখলে বুকের শব্দ প্রতিফলিত হয়ে কানে পৌঁছে।

গ. **ফিসফিসানী গ্যালারি (Whispering Gallery) :** কিছু কিছু হলঘর এমনভাবে তৈরি করা হয়, যাতে খুব আস্তে বা ফিসফিস করে কথা বললেও সব শ্রোতা শুনতে পায়। এখানে গ্যালারিগুলোকে মসৃণ বাঁকা দেয়ালের কাছে ঘেঁষে তৈরি করা হয়। ফলে ফিসফিস শব্দ সরাসরি শ্রোতার কানে পৌঁছতে না পারলেও তা বাঁকা দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে সব শ্রোতার কানে পৌঁছে যায়।

○ প্রশ্ন-৭৯. প্রতিধ্বনি কিভাবে সৃষ্টি হয়?

উত্তর : প্রতিফলনের দরুন ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে। সুতরাং কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ যদি দূরবর্তী কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে উৎসের কাছে ফিরে আসে তখন মূল ধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি হয় তাকে ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি বলে। কোনো শব্দ শোনার প্রায় ০.১ সেকেন্ড সময় পর্যন্ত শ্রোতার মস্তিষ্কে তার অনুভূতি থেকে যায়। তাই সৃষ্ট প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিফলকের দূরত্ব এমন হতে হয় যেন ঐ শব্দের অনুভূতি কানে শেষ হওয়ার পর প্রতিফলিত শব্দ কানে পৌছায়।

○ প্রশ্ন-৮০. প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়?

উত্তর : প্রতিধ্বনির সাহায্যে খুব সহজেই কূপের পানিপৃষ্ঠের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। কূপের উপরে কোনো শব্দ উৎপন্ন করলে সেই শব্দ পানিপৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলে প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তখন শব্দ উৎপন্ন করা ও সেই শব্দের প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় থামা ঘড়ির সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

মনে করি, কূপের গভীরতা $= h$

শব্দ উৎপন্ন করা ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময় $= t$

শব্দের দ্রুতি $= v$

এখন, শব্দ উৎপন্ন হওয়ার পর পানিপৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে শ্রোতার কাছে ফিরে আসতে যেহেতু $2h$ দূরত্ব অতিক্রম করে।

আমরা জানি, দূরত্ব $=$ বেগ $\times$ সময়

$\therefore 2h = v \times t$

$\Rightarrow h = \frac{v \times t}{2}$

অতএব, v ও t-এর মান নির্ণয় করে ওপরের সমীকরণে বসালে কূপের গভীরতা পাওয়া যাবে। কূপের গভীরতা 16.6 মিটারের কম হলে, প্রতিধ্বনিভিত্তিক এ পরীক্ষাটি করা সম্ভব হবে না।

○ প্রশ্ন-৮১. সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় কিভাবে?

উত্তর : ফ্যাদোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। এটি আলট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে, যা সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং জাহাজে রক্ষিত হাইড্রোফোন যন্ত্রে ধরা পড়ে। সমুদ্রের তলদেশে শব্দতরঙ্গের যেতে-আসতে গৃহীত সময় হতে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা হয়। আধুনিক ফ্যাদোমিটারে তরঙ্গ সৃষ্টি, প্রতিধ্বনি গ্রহণ, সময় গণনা প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসপ্লেতে দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৮২. প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে খনিজ পদার্থের সন্ধান করা হয়?

উত্তর : খনিজ পদার্থের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মাটির নিচে গর্ত করে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ বিস্ফোরণের শব্দ মাটির নিচের বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসা প্রতিধ্বনি হাইড্রোফোন নামক গ্রাহক যন্ত্রে ধারণ করা হয়। এ যন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় প্রতিধ্বনির লেখ অঙ্কিত হয়। এ লেখ পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন শিলার গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এভাবে শিলার গঠন প্রকৃতি থেকে ভূ-অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮৩. বহু প্রতিধ্বনি কি?

উত্তর : দুই বা ততোধিক প্রতিফলক থেকে প্রয়োজনীয় দূরত্ব থেকে একবার শব্দ করলে বার বার প্রতিফলনের জন্য অনেকগুলো প্রতিধ্বনি শোনা যায়। একে বহু প্রতিধ্বনি বলে। মেঘ ডাকলে এক অবিচ্ছিন্ন গুড় গুড় আওয়াজ শোনা যায়। এ অবিচ্ছিন্ন শব্দ মেঘ ডাকার প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়।

○ প্রশ্ন-৮৪. সাধারণ মাপের ঘরে কথা বললে আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না কেন?

উত্তর : সাধারণ মাপের ঘরের যে কোনো দুটি দেয়ালের মাঝের দূরত্ব 16.6 মিটারের কম থাকে। একমাত্রিক শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে হলে শব্দের প্রতিফলককে শব্দের উৎস হতে কমপক্ষে 16.6 মিটার দূরে থাকতে হবে। সাধারণ মাপের ঘরে কথা বললে ঐ শব্দের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে থেকে যায়। এ সময়ের মধ্যে প্রতিফলিত শব্দ কানে এসে পৌঁছে মূল শব্দের সাথে মিশে যায়। এর ফলে প্রতিধ্বনিকে পৃথকভাবে শোনা যায় না। তাই সাধারণ মাপের ঘরের মধ্যে কথা বললে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না।

○ প্রশ্ন-৮৫. প্রতিধ্বনি কি? প্রতিধ্বনির কয়েকটি ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : প্রতিধ্বনি : প্রতিফলনের দরুন ধ্বনির পুনরাবৃত্তিকে প্রতিধ্বনি বলে। সুতরাং শব্দ করার পর দূরবর্তী কোনো প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসা অনুরূপ যে ধ্বনি শোনা যায় তাকে ঐ শব্দের প্রতিধ্বনি বলে।

প্রতিধ্বনির ব্যবহার :
১. সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়।
২. হিমশৈল, ডুবোজাহাজ ইত্যাদির অবস্থান নির্ণয়।
৩. পোতাশ্রয়ের মুখ থেকে জাহাজকে পথ দেখানো।
৪. বাদুড় অন্ধকারে পথ চলে প্রতিধ্বনি ব্যবহার করে।
৫. প্রতিধ্বনির সাহায্যে কূপের গভীরতা নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮৬. শব্দবিজ্ঞানের সাথে শ্রুতিবিজ্ঞানের সম্পর্ক আলোচনা করুন। Sabine's সূত্রগুলো লিখুন।
১৯০০ সালের পূর্বে স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে বড় ধরনের ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছিল। তখনকার দিনে তৈরি যেকোনো থিয়েটার বা কনসার্ট হল ছিল দর্শকদের কাছে খুবই অসহনীয়। কেননা কথা ও সংগীত শোনার জন্য কোন সুষ্ঠ নকশাই তৈরি করতে পারছিলেন না তখনকার প্রকৌশলীরা। সবচেয়ে ভালো উদাহরণ ছিল 'The fogg Art Museum Hall of Harvard University." এই হলের সৃষ্ট শব্দসজ্জার ছিল খুবই ত্রুটিপূর্ণ যা দর্শকদের কাছে ছিল বিরক্তির বিষয়।
উক্ত বিষয়টির সুষ্ঠ সমাধানের জন্য ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর Wallance C Sabine কিছু বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপন করেন এগুলো হলো–
- যে কোনো শব্দ যখন কোনো উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে তরঙ্গ আকারে সামনের দিকে অগ্রসর হয় তখন এটি যে কোনো প্রতিবন্ধকে (দেয়াল, সিলিং, ফ্লোর) বাধা পেয়ে এর কিছু শক্তি হারিয়ে পুনরায় প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।
- যে কোনো শব্দই শ্রোতার কাছে আসার পূর্বে প্রায় ২০০-৩০০ বার কোন না কোনোভাবে প্রতিফলিত হয়।
- এর ফলে শ্রোতা একই সাথে দুই ধরনের শব্দ তরঙ্গ শুনতে পায়। এই দুই ধরনের শব্দতরঙ্গের আসার মাঝে অবশ্যই সময়ের ব্যবধান থেকে যায়। যার ফলে শ্রোতা একই শব্দ বারবার শুনতে পায় এবং বিরক্তি প্রকাশ করে।

প্রদত্ত তথ্যগুলোই সাবিনা'র সূত্র নামে পরিচিত।

○ প্রশ্ন-৮৭. সিনেমা, থিয়েটার বা কনসার্ট হলের দেয়াল নরম প্যাড দিয়ে আবৃত থাকে কেন?
উত্তর : কোন উৎস থেকে আগত শব্দতরঙ্গ অন্য কোন মাধ্যমে বাধা পেয়ে ফিরে আসলে তাকে শব্দের প্রতিফলন বলে। আমরা জানি যদি উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যকার দূরত্ব ১৬.৬৬ মিটারের বেশি হয় তবেই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সিনেমা থিয়েটার বা কনসার্ট হলের দেয়ালগুলো পরস্পর থেকে ১৬.৬৬ মিটারের অধিক দূরে অবস্থিত। ফলে ঐ সকল স্থানে উৎস থেকে আগত শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে দর্শকদের কানে শ্রবণের অনুভূতি জাগাবে। ফলে দর্শক একই শব্দ বারবার শুনবে এবং প্রকৃত শব্দ বুঝতে পারবে না, অর্থাৎ দর্শক বিরক্তি প্রকাশ করবে। সিনেমা, থিয়েটার বা কনসার্ট হলের দেয়াল নরম প্যাড দিয়ে আবৃত করে রাখলে ঐ সকল দেয়ালে কোন রকম প্রতিফলন হবে না, কেননা দেয়ালগুলো শব্দতরঙ্গ শোষণ করে নেবে। যার ফলে দর্শক শুধুমাত্র আগত শব্দতরঙ্গই শুনতে পারে। তাদের কাছে কোন রকমের প্রতিফলিত তরঙ্গ বিরক্তির কারণ হয়ে উঠবে না।

অধ্যায় ০৩

চৌম্বকবিদ্যা
Magnetism

***Syllabus— Magnetism :** Polarity and relationship with current, Bar magnet, Magnetic lines of force, Torque on a bar magnet in a magnetic field, Earth's magnetic field as a bar magnet, Tangent galvanometer, Vibration magnetometer, Para, dia and Ferromagnetic substances with examples, Electromagnets and permanent magnets.*

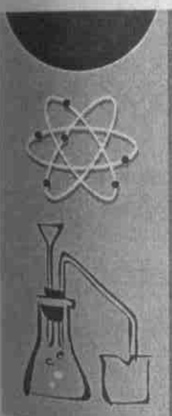

মেরু ধর্ম ও বিদ্যুতের সাথে সম্পর্ক, দণ্ড চুম্বক, চৌম্বক বলরেখা, দণ্ড চুম্বকের উপর ক্রিয়ারত টর্ক, দণ্ড চুম্বক হিসেবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, কম্পন ম্যাগনেটোমিটার, প্যারা, ডায়া ও ফেরোচুম্বক পদার্থসমূহ, তড়িৎ চুম্বক এবং স্থায়ী চুম্বক।

Polarity and relationship with current, Bar magnet, Magnetic lines of force, Torque on a bar magnet in a magnetic field, Earth's magnetic field as a bar magnet, Tangent galvanometer, Vibration magnetometer, Para, dia and Ferromagnetic substances with examples, Electromagnets and permanent magnets.

○ প্রশ্ন-১. চুম্বক এবং চুম্বকত্ব কাকে বলে?
উত্তর : চুম্বক হলো লোহার একটি যৌগিক পদার্থ যার রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে Fe_3O_4।
যেসব বস্তুর আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্ম আছে, তাদের চুম্বক বলে। চুম্বকের আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও দিক নির্দেশক ধর্মকে এর চুম্বকত্ব বলে। চুম্বকত্ব চুম্বকের একটি ভৌত ধর্ম।

○ প্রশ্ন-২. চৌম্বক এবং অচৌম্বক পদার্থ কাকে বলে?
উত্তর : যেসব পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় বা কৃত্রিম চুম্বকে পরিণত করা যায়, তাদের চৌম্বক পদার্থ বলে। অন্যদিকে যেসব পদার্থকে চুম্বক আকর্ষণ করে না, তাদের অচৌম্বক পদার্থ বলে। লোহা, ইস্পাত, কোবাল্ট, নিকেল প্রভৃতি ধাতু চৌম্বক পদার্থ। রবার, অ্যালুমিনিয়াম, কাঠ ইত্যাদি ধাতুকে চুম্বক আকর্ষণ করে না। তাই এরা অচৌম্বক পদার্থ। প্রায় সব অধাতুই অচৌম্বক পদার্থ।

○ প্রশ্ন-৩ : চৌম্বক দৈর্ঘ্য ও জ্যামিতিক দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

উত্তর : চৌম্বক অক্ষ বরাবর কোনো চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে এর চৌম্বক দৈর্ঘ্য বা কার্যকর দৈর্ঘ্য বলে। এখানে NS চৌম্বক দৈর্ঘ্য।

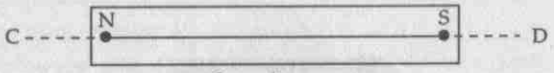

চিত্র : চৌম্বক অক্ষ

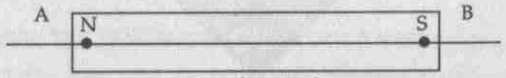

চিত্র : চৌম্বক দৈর্ঘ্য

উপরের চিত্রে AB যদি একটি দণ্ড চুম্বক, N ও S এর মধ্যবর্তী দূরত্ব NS হলো চৌম্বক দৈর্ঘ্য।

চৌম্বক দৈর্ঘ্য $= 0.85 \times$ জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য।

জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য : কোনো চুম্বকের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্বকে জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য বলে। পূর্বের চিত্রে ঐ একই দণ্ড চুম্বকের জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য হলো AB।

$$\text{জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য} = \frac{\text{চৌম্বক দৈর্ঘ্য}}{0.85}$$

○ প্রশ্ন-৪. চুম্বকের পোলারিটি কি?

উত্তর : একটি চুম্বক দণ্ডকে সুতা দিয়ে মুক্ত ও বাধাহীনভাবে শূন্যে ঝুলিয়ে দিলে দেখা যায়, এটি সব সময় উত্তর-দক্ষিণে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায় যদি চুম্বক দণ্ডটিকে একটুখানি ঘুরিয়ে দেয়া হয় তাহলে দেখা যাবে যে, কয়েকবার দোল খেয়ে চুম্বকটি আবার উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর এসে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ চুম্বকের স্থায়ী উত্তর-দক্ষিণ মেরু বিদ্যমান। এ ধরনের দ্বিপোল বিশিষ্ট চুম্বক দণ্ডকে পোলার দণ্ড বলা হয়। যখন কোনো চৌম্বক পদার্থকে অন্য কোনো স্থায়ী চুম্বক বা পোলার দণ্ডের নিকট আনা হয় তখন চৌম্বক পদার্থটি অস্থায়ী চুম্বকে পরিণত হয় এবং এর দু'পাশে চুম্বক দ্বিপোল সৃষ্টি হয়। চুম্বকের এ পোলারাইজেশন ধর্মকে পোলারিটি বলে।

○ প্রশ্ন-৫. চুম্বকের ধর্ম কি কি?

উত্তর : চুম্বকের চারটি মূল ধর্ম আছে; যথা : ক. আকর্ষণী ধর্ম, খ. দিকদর্শী ধর্ম, গ. বিপরীতধর্মী দুই প্রান্ত এবং ঘ. চুম্বকন ধর্ম।

○ প্রশ্ন-৬. চৌম্বকক্ষেত্র কি?

উত্তর : কোনো চুম্বকের আশেপাশে যে অঞ্চল জুড়ে এর প্রভাব বর্তমান থাকে অর্থাৎ অন্য কোনো চুম্বক বা চৌম্বক পদার্থ আনলে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল লাভ করে সে অঞ্চলকে চুম্বকের চৌম্বকক্ষেত্র বলে।

○ প্রশ্ন-৭. স্থায়ী ও অস্থায়ী চুম্বক বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : স্থায়ী চুম্বক : কোনো চৌম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করার পর চুম্বকত্ব প্রদানকারী শক্তিকে অপসারণ করলেও যদি চুম্বকত্ব সহজে বিলুপ্ত না হয়, তবে ঐ চুম্বককে স্থায়ী চুম্বক বলে। স্থায়ী চুম্বক দু'প্রকার। যথা– ১. সংকর চুম্বক ও ২. সিরামিক চুম্বক।

অস্থায়ী চুম্বক : কোনো চুম্বক পদার্থকে চুম্বকে পরিণত করার পর চুম্বকত্ব প্রদানকারী শক্তি অপসারণ করলে যদি চুম্বকের চুম্বকত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে ঐ চুম্বককে অস্থায়ী চুম্বক বলে। যেমন– কাঁচা লোহার চুম্বক।

○ প্রশ্ন-৮. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম চুম্বক বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : প্রাকৃতিক চুম্বক : খনিতে যেসব চুম্বক পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার থাকে না, এদের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু শক্তিশালী হয় না। প্রাকৃতিক চুম্বককে সন্ধানী পাথরও বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য : ১. প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার থাকে না, ২. প্রাকৃতিক চুম্বকের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু শক্তিশালী হয় না।

কৃত্রিম চুম্বক : লোহা, ইস্পাত, নিকেল ইত্যাদি চৌম্বক পদার্থকে পরীক্ষাগারে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বক নিয়মিত আকারের হয়ে থাকে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৯. একটি দণ্ড চুম্বককে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবালে এর সব জায়গায় সমপরিমাণ লোহার গুঁড়া লেগে থাকে কি?

উত্তর : একটি দণ্ড চুম্বককে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবালে এর সব জায়গায় সমপরিমাণ লোহার গুঁড়া লেগে থাকে না। চুম্বকের মধ্যভাগের দিকে আকৃষ্ট লোহার পরিমাণ কমতে থাকে এবং মধ্যস্থলে কোনো লোহার গুঁড়াই লেগে থাকে না।

○ প্রশ্ন-১০. চৌম্বক মেরু কাকে বলে?

উত্তর : চুম্বকের দুপ্রান্তের কাছাকাছি যে সংকীর্ণ অঞ্চলে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি তাদেরকে চৌম্বক মেরু বলে। এক্ষেত্রে উত্তর-সন্ধানী মেরুকে N-Pole আর দক্ষিণ-সন্ধানী মেরুকে S-Pole বলে।

○ প্রশ্ন-১১. চৌম্বক বলরেখা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে মুক্তাবস্থায় স্থাপিত বিচ্ছিন্ন উত্তর মেরু যে পথে পরিভ্রমণ করে তাকে চৌম্বক বলরেখা বলে। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো চুম্বককে ঘিরে যে অদৃশ্য বল চৌম্বকক্ষেত্রের কতগুলো নির্দিষ্ট রেখা বরাবর ক্রিয়া করে তাদেরকে চৌম্বক বলরেখা বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রে কোনো বিন্দুতে বলরেখার সাথে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে চৌম্বক তীব্রতার দিক এবং বলরেখার সাথে লম্বভাবে অবস্থিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত বলরেখার সংখ্যা তীব্রতার মান নির্দেশ করে।

○ প্রশ্ন-১২. চুম্বকের প্রান্তীয় অঞ্চলে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি কিভাবে বোঝা যায়?

উত্তর : একটি দণ্ডচুম্বককে লোহার গুঁড়ার মধ্যে ডুবালে দেখা যায় চুম্বকের গায়ে লোহার গুঁড়া লেগে গেছে। কিন্তু লোহার গুঁড়া চুম্বকের গায়ে সমানভাবে লাগেনি। কেবল চুম্বকের প্রান্তীয় অঞ্চলে লোহার গুঁড়া বেশি লেগে আছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চুম্বকের প্রান্তীয় অঞ্চলে আকর্ষণ ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি।

○ প্রশ্ন-১৩. বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বকীয় ক্রিয়া বর্ণনা করুন।

উত্তর : কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। একে বিদ্যুৎ প্রবাহের চৌম্বকীয় ক্রিয়া বলে। ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ওয়েরস্টেড এটি আবিষ্কার করেন।

○ প্রশ্ন-১৪. বিদ্যুৎ প্রবাহের ওপর চুম্বকের ক্রিয়া কিরূপ?

উত্তর : একটি স্থির চুম্বকের নিকট একটি বিদ্যুৎবাহী পরিবাহী আনলে পরিবাহীটি চুম্বকের চারদিকে ঘোরে। ফ্লেমিং-এর বাম হস্ত নিয়ম এরূপ বিদ্যুৎবাহী গতির দিক নির্দেশ করে। ফ্যারাডের পরীক্ষা, বার্লো-চক্র প্রভৃতি এর পরীক্ষাগত প্রমাণ।

○ প্রশ্ন-১৫. কুরি বিন্দু কি?

উত্তর : কোনো একটি চুম্বককে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অধিক উত্তপ্ত করলে এটির চুম্বকত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এ তাপমাত্রাকে কুরি বিন্দু বলে।

○ প্রশ্ন-১৬. চুম্বকের নিরপেক্ষ বিন্দু কি?

উত্তর : দণ্ড চুম্বককে চৌম্বক মধ্যতলে চুম্বকের উত্তর মেরু ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে স্থাপন করলে প্রান্তমুখী অবস্থানে নিরপেক্ষ বিন্দুর সৃষ্টি হয়, আর চুম্বকের উত্তর মেরু ভৌগোলিক উত্তর দিকে স্থাপন করলে প্রস্থমুখী অবস্থানে নিরপেক্ষ বিন্দু গঠিত হয়।

○ প্রশ্ন-১৭. ঘর্ষণ পদ্ধতিতে কোনো দণ্ডকে চুম্বকিত করলে তার কোন প্রান্তে কোন মেরুর উৎপত্তি হবে?

উত্তর : ঘর্ষণ পদ্ধতিতে কোনো দণ্ডকে চুম্বকিত করলে ঘর্ষণ যে প্রান্তে শেষ হয় সে প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর বিপরীত জাতীয় মেরুর উৎপত্তি হবে এবং যে প্রান্তে ঘর্ষণ শুরু হয় সে প্রান্তে ঘর্ষণকারী মেরুর সমজাতীয় মেরু সৃষ্টি হয়।

○ প্রশ্ন-১৮. বিকর্ষণই চুম্বকত্বের নিশ্চিততর পরীক্ষা-প্রমাণ করুন।

উত্তর : চুম্বকের এক মেরু অন্য চুম্বকের বিপরীত মেরুকে যেমন আকর্ষণ করে তেমনি চৌম্বক পদার্থকেও আকর্ষণ করে। কাজেই আকর্ষিত বস্তুটি চুম্বক না চৌম্বক পদার্থ তা বলা কঠিন, কিন্তু বিকর্ষণ সমজাতীয় মেরুদ্বয়ের মধ্যেই ঘটে। কাজেই বিকর্ষণ হতে নিশ্চিত বলা যায় যে অপরটিও একটি চুম্বক। তাই বিকর্ষণই চুম্বকত্বের নিশ্চিততর পরীক্ষা।

○ প্রশ্ন-১৯. পূর্বে আবেশ পরে আকর্ষণ– ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : কোনো চুম্বককে চৌম্বক পদার্থের নিকটে রাখার ফলে আবেশের দ্বারা পদার্থের নিকটতম প্রান্তে ঐ চুম্বক মেরুর বিপরীত মেরু এবং দূরবর্তী প্রান্তে সমজাতীয় মেরু উৎপন্ন হয়। চুম্বক মেরুর ক্রিয়ার নিয়মানুসারে আবেশী মেরু ও নিকটবর্তী আবিষ্ট বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ এবং আবেশী মেরু ও দূরবর্তী আবিষ্ট সমমেরুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অধিক হলে বিকর্ষণ বল কম হবে এবং চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হবে। অতএব প্রমাণিত হয় যে, পূর্বে আবেশ পরে আকর্ষণ সংঘটিত হবে।

○ প্রশ্ন-২০. কোনো চৌম্বক পদার্থের অণুগুলো এক একটি চুম্বক হওয়া সত্ত্বেও চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্ব থাকে না কেন?

উত্তর : চৌম্বক পদার্থের অণুগুলো এক একটি চুম্বক হওয়া সত্ত্বেও চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্ব থাকে না। তার কারণ হলো এ অণু চুম্বকগুলো চৌম্বক পদার্থের মধ্যে এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অণু চুম্বকগুলো একই দিকে মুখ করে থাকে না বলে পদার্থে চুম্বকত্ব থাকে না।

○ প্রশ্ন-২১. তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া এবং তড়িৎ চুম্বক কি?

উত্তর : কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এর চারপাশে যে অস্থায়ী চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, তা-ই তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া।

তড়িৎ চুম্বক : কাঁচা লৌহ বা ইস্পাতের দণ্ডের বাইরে অন্তরিত পরিবাহী তার স্প্রিং এর মত ঘন সন্নিবিষ্ট করে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে দণ্ডটি অস্থায়ী চুম্বকত্ব লাভ করে। এ অস্থায়ী চুম্বকই তড়িৎ চুম্বক।

○ প্রশ্ন-২২. তড়িৎবাহী তারের উপর চুম্বকের প্রভাব কি?

উত্তর : তড়িৎবাহী তার নিজস্ব একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। শক্তিশালী চুম্বকের বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র এবং তড়িৎবাহী তারের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ঘটে। ফলে তারটি লাফিয়ে উঠে।

○ প্রশ্ন-২৩. সলিনয়েড কি?

উত্তর : একটি অন্তরীত পরিবাহী তারকে স্প্রিং-এর মতো বহুপাকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে সাজিয়ে বা কয়েল তৈরি করে বিদ্যুৎ চালনা করলে তড়িৎ ক্ষেত্রের চৌম্বক ক্রিয়ার জন্য সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের অধিকাংশ বলরেখা কুণ্ডলী বা কয়েলের কেন্দ্রে ঘনীভূত হয় অর্থাৎ চুম্বকক্ষেত্রে একটি দণ্ড চুম্বকের ন্যায় কাজ করে। এ ব্যবস্থাকে সলিনয়েড বলে।

○ প্রশ্ন-২৪. বায়োট স্যাভার্ট সূত্র কি?

উত্তর : বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য নির্ণয়ের জন্য বায়োট স্যাভার্ট যে সূত্র প্রদান করেন তাকে বায়োট স্যাভার্ট-এর সূত্র বলে।

○ প্রশ্ন-২৫. চৌম্বক আবেশ, চুম্বকন মাত্রা, চৌম্বক ধারকত্ব কি?

উত্তর : চৌম্বক আবেশ : একটি শক্তিশালী চুম্বকের নিকট কোনো চৌম্বক পদার্থ রাখা হলে তা সাময়িকভাবে চুম্বকে পরিণত হয়। একেই চৌম্বক আবেশ বলে।

চুম্বকন মাত্রা : সুষমভাবে চুম্বকিত কোনো দণ্ড চুম্বকের একক আয়তনের চৌম্বক ভ্রামককে এর চুম্বকন মাত্রা বলে।

চৌম্বক ধারকত্ব : চৌম্বক পদার্থগুলোকে সমপরিমাণে চুম্বকিত করার পর চুম্বকনকারী বল সরিয়ে নিলে দেখা যায় সব পদার্থের সমপরিমাণ চুম্বকত্ব অবশিষ্ট নেই। একেক পদার্থে একেক পরিমাণ চুম্বকত্ব বজায় থাকে। কোনো পদার্থের চুম্বকত্ব ধরে রাখার প্রবণতাই চৌম্বক ধারকত্ব।

○ প্রশ্ন-২৬. পদার্থের চৌম্বক ভেদ্যতা ও পদার্থের চৌম্বক প্রবণতা কি?

উত্তর : পদার্থের চৌম্বক ভেদ্যতা : কোনো পদার্থের চুম্বক আবেশ (B) ও চৌম্বক প্রাবল্যের (H) অনুপাতকে ঐ পদার্থের চৌম্বক ভেদ্যতা বলে। চৌম্বক ভেদ্যতা, $\mu = \frac{B}{H}$

পদার্থের চৌম্বক প্রবণতা : যে ধর্মের দরুন একই চৌম্বকক্ষেত্রে স্থাপিত বিভিন্ন চৌম্বক পদার্থ বিভিন্ন পরিমাণের আবিষ্ট চুম্বকত্ব লাভ করে, তাকে চৌম্বক প্রবণতা বলে।

○ প্রশ্ন-২৭. উপমেরু কাকে বলে?

উপমেরু : ভুল পদ্ধতিতে চুম্বকনের সময় চৌম্বক পদার্থের দু প্রান্তে সমমেরু ও মাঝখানে বিপরীত মেরু কিংবা মাঝখানে অতিরিক্ত মেরুর সৃষ্টি হয়। চুম্বকের দুই প্রান্ত ব্যতীত অন্যত্র সৃষ্ট এ অনিয়মিত মেরুকে উপমেরু বা অনুবন্ধী মেরু বলা হয়।

○ প্রশ্ন-২৮. চৌম্বক বল সংক্রান্ত কুলম্বের সূত্র বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : কুলম্বের সূত্র : দুটি পৃথক মেরুর মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান মেরুশক্তিদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল মেরুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

ব্যাখ্যা : মনে করি, m_1, m_2 মেরুশক্তি বিশিষ্ট দুটি চুম্বক পরস্পর d দূরত্বে অবস্থিত। এদের ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান F হলে

$F \propto m_1 m_2$ [যখন d ধ্রুবক] .... (i)

এবং $F \alpha \frac{1}{d^2}$ [যখন m_1, m_2 ধ্রুবক] .... (ii)

সুতরাং গাণিতিকভাবে (i) ও (ii) নং হতে

$\therefore F \propto \frac{m_1 m_2}{d^2}$ [যখন উভয় পরিবর্তিত]

বা, $F = k \frac{m_1 m_2}{d^2}$ [k সমানুপাতিক ধ্রুবক]

গাণিতিক হিসাবে দেখা যায়, $k = \frac{1}{4\pi\mu}$

এখানে, μ অন্য একটি ধ্রুবক

$\therefore F = \frac{m_1 m_2}{4\pi\mu d^2}$

○ প্রশ্ন-২৯. চৌম্বক একক মেরুর সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : কুলম্বের সূত্র হতে একক মেরুর সংজ্ঞা : মেরুদ্বয় বায়ু বা শূন্য মাধ্যমে স্থাপিত হলে,

$F = \frac{m_1 m_2}{4\pi\mu_0 d^2}$

μ_o বায়ু বা শূন্য মাধ্যমের পরম প্রবেশ্যতা

যদি $m_1 = m_2 = 1$ এবং d = 1 metre হয়, তবে

$F = \frac{1}{4\pi\mu_o}$ নিউটন হয়।

অতএব, বলা যায়, শূন্যস্থানে সমমানের সমধর্মী দুটি মেরু পরস্পর হতে 1 metre দূরে স্থাপন করলে তারা যদি $\frac{1}{4\pi\mu_o}$ নিউটন বল দ্বারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে তবে প্রত্যেকটি মেরুকে একক মেরু বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৩০. লাল মেরু এবং নীল মেরু বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : ভূ-চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে যথাক্রমে নীল মেরু এবং লাল মেরু বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৩১. চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক কি ?

উত্তর : চৌম্বক দ্বিপোল ভ্রামক : একটি চুম্বক বা চৌম্বক দ্বিপোলের যেকোনো একটি মেরুর মেরুশক্তির মান ও চৌম্বক দৈর্ঘ্যের গুণফলকে ঐ চুম্বক বা চুম্বক দ্বিপোলের ভ্রামক বলে।

○ প্রশ্ন-৩২. ডায়াচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ফেরোচৌম্বক পদার্থ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : ডায়াচৌম্বক পদার্থ : যে সমস্ত পদার্থকে একটি শক্তিশালী চুম্বক মেরুর কাছে আনলে বিকর্ষিত হয় এবং যাদের চৌম্বক প্রবেশ্যতা (μ) 1-এর কম ও চৌম্বক গ্রহীতা (K) ঋণাত্মক তাদেরকে ডায়াচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন– এন্টিমনি, বিসমাথ, পানি, তামা, দস্তা, সোনা ইত্যাদি ডায়াচৌম্বক পদার্থ।

প্যারাচৌম্বক পদার্থ : যে সমস্ত পদার্থ চৌম্বক ক্ষেত্রের সবল অংশের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং যাদের চৌম্বক প্রবেশ্যতা (μ) 1-এর বেশি ও চৌম্বক গ্রহীতা আংশিক ধনাত্মক তাদেরকে প্যারাচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন– প্লাটিনাম, অক্সিজেন, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি প্যারাচৌম্বক পদার্থ।

ফেরোচৌম্বক পদার্থ : যে সমস্ত পদার্থ চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয় এবং যাদের চৌম্বক প্রবেশ্যতা μ-এর মান অনেক গুণ বেশি হয় ও চৌম্বক গ্রহীতা ধনাত্মক তাদেরকে ফেরোচৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন– লোহা, নিকেল, কোবাল্ট ইত্যাদি ফেরোচৌম্বক পদার্থ।

○ প্রশ্ন-৩৩. ফেরোচৌম্বকত্ব কি?

উত্তর : ফেরোচৌম্বকত্ব : যেসব পদার্থকে চৌম্বক ক্ষেত্রে রাখলে এদের মধ্যে শক্তিশালী চৌম্বকত্ব আবিষ্ট হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়, সে সব পদার্থকে ফেরোচৌম্বক পদার্থ বলে এবং চৌম্বকত্ব আবিষ্ট হওয়ার এই পদ্ধতিকে ফেরোচৌম্বকত্ব বলে। লৌহ, কোবাল্ট, নিকেল, ইস্পাত ইত্যাদি ও এদের সংকর ধাতু ফেরোচৌম্বকত্ব পদার্থের অন্তর্গত।

○ প্রশ্ন-৩৪. একটা ফেরোচৌম্বক পদার্থ কখন প্যারাচৌম্বক পদার্থে পরিণত হয়?

উত্তর : যখন কোনো ফেরোচৌম্বক পদার্থকে কুরী বিন্দু বা এর চেয়ে বেশি উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয় তখন ফেরোচৌম্বক পদার্থ প্যারাচৌম্বক পদার্থে পরিণত হয়।

○ প্রশ্ন-৩৫. ফেরোচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ডায়াচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরুপন করুন।

উত্তর : ফেরোচৌম্বক, প্যারাচৌম্বক ও ডায়াচৌম্বক পদার্থের মধ্যে পার্থক্য :

ফেরোচৌম্বক	প্যারাচৌম্বক	ডায়াচৌম্বক
১. চুম্বক দ্বারা প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়।	চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে আকর্ষিত হয়।	চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে বিকর্ষিত হয়।
২. অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে দুর্বলতর অঞ্চল হতে সবলতর অঞ্চলে গমন করে।	অসম চৌম্বক ক্ষেত্রে দুর্বলতর অঞ্চল হতে সবলতর অঞ্চলে গমন করে।	অসম চৌম্বকক্ষেত্রে সবলতর অঞ্চল হতে দুর্বলতর অঞ্চলে গমন করে।
৩. চুম্বক ক্ষেত্র অপেক্ষা চৌম্বক আবেশ অনেক বেশি।	চুম্বকন ক্ষেত্র অপেক্ষা চৌম্বক আবেশ সামান্য বেশি।	চুম্বকন ক্ষেত্র অপেক্ষা চৌম্বক আবেশ সামান্য কম।
৪. আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা (μ_r) 1 অপেক্ষা অনেক বেশি।	আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা (μ) 1 এর চেয়ে সামান্য বেশি।	আপেক্ষিক চৌম্বক প্রবেশ্যতা (μ) 1 এর চেয়ে সামান্য কম।
৫. চৌম্বক প্রবণতা ধনাত্মক ও উচ্চ মানের হয়।	চৌম্বক প্রবণতা ধনাত্মক এবং অল্প মানের হয়।	চৌম্বক প্রবণতা ঋণাত্মক এবং অল্পমানের হয়।
৬. একটি নির্দিষ্ট কুরী বিন্দু আছে।	কোনো কুরী বিন্দু নেই।	কোনো কুরী বিন্দু নেই।
৭. এরা কেবল কঠিন কেলাসিত পদার্থ হিসেবে থাকতে পারে।	এরা কঠিন, তরল, বায়বীয় যে কোনো অবস্থাতেই থাকতে পারে।	এরা কঠিন, তরল, বায়বীয় যে কোনো অবস্থাতেই থাকতে পারে।
৮. চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম আছে।	চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই।	চৌম্বক ধারকত্ব ধর্ম নেই।

○ প্রশ্ন-৩৬. কুরী বিন্দু অপেক্ষা অধিক উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে ফেরোচৌম্বক পদার্থের ধর্ম কিভাবে পরিবর্তিত হয়?

উত্তর : কুরী বিন্দু অপেক্ষা অধিক উষ্ণতায় ফেরোচুম্বক পদার্থের ধার্মের পরিবর্তন : একটি চুম্বক পদার্থকে তাপ দিতে থাকলে তাপশক্তি ফেরোচুম্বকের ডোমেইনসমূহের মধ্যে বিদ্যমান বিনিময় যুগল বিনষ্ট করতে সচেষ্ট হয় ও সম্পৃক্ত অবস্থা হতে বিভিন্ন ডোমেইনে পরিবর্তিত হতে থাকে। অতঃপর আরো তাপ বৃদ্ধির ফলে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যখন সব ডোমেইন ভেঙে যায় এবং চুম্বক দ্বিপোলগুলো প্রত্যেকটি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এক একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ চুম্বক পদার্থটি প্যারাচুম্বকে পরিণত হয়। যে ক্রান্তি তাপমাত্রায় ফেরো চুম্বক থেকে প্যারাচুম্বক অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, সেই তাপমাত্রাকে কুরী তাপমাত্রা বা কুরী বিন্দু বলে। অর্থাৎ কুরী বিন্দু অপেক্ষা উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থটি প্যারাচুম্বক এবং ঐ তাপমাত্রার নিচে ফেরোচুম্বক পদার্থ হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন-৩৭. চৌম্বক হিসটেরেসিস বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : চৌম্বক হিসটেরেসিস : চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য H-এর পরিবর্তনের সাথে সাথে চুম্বকন মাত্রা I-এর যে পরিবর্তন ঘটে তা প্রত্যাবর্তী নয়। অর্থাৎ I-H লেখচিত্রে যে পথ ধরে H-এর বৃদ্ধির সাথে I-এর বৃদ্ধি হয় সেই পথ ধরে H-এর হ্রাসের সাথে I-এর হ্রাস ঘটে না। I-H লেখচিত্রের একই পথে প্রত্যাবর্তনের এই অক্ষমতাকে হিসটেরেসিস বলে।

প্রশ্ন-৩৮. হিস্টেরেসিস লস কি?

উত্তর : হিস্টেরেসিস লস : যখন কোনো চৌম্বক পদার্থকে হিস্টেরেসিস চক্রের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তখন কিছু শক্তি ব্যয় হয়, বিচুম্বকন করার সময় সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে ফিরে পাওয়া যায় না। একে হিস্টেরেসিস লস বলা হয়।

ব্যাখ্যা : চুম্বকন ক্ষেত্রে H কে সম্পূর্ণ অপসারিত করার পরেও পদার্থের মধ্যে কিছু চুম্বকত্ব অবশিষ্ট থেকে যায় যাকে বিলুপ্ত করার জন্য বিপরীত দিকে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ চুম্বকন চক্র অনুসরণ করলে কিছু পরিমাণ শক্তির অপচয় হয়। এ অপচয়ের পরিমাণ I-H লুপ দ্বারা বেষ্টিত তলের ক্ষেত্রফলের সমান।

প্রশ্ন-৩৯ : তড়িৎ চুম্বক নির্মাণে ইস্পাত অপেক্ষা কাঁচা লোহা, অধিক কার্যকর কেন?

উত্তর : নরম লোহার ধারণ ক্ষমতা ইস্পাতের ধারণ ক্ষমতা অপেক্ষা বেশি। অর্থাৎ নাড়াচাড়া না করলে অথবা সতর্কভাবে ব্যবহার না করলে ইস্পাত অপেক্ষা নরম লোহা এর চৌম্বক ধর্ম বেশি পরিমাণে বজায় রাখতে সক্ষম। এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রের বেলায়, নরম লোহার চুম্বকনের পরিমাত্রা ইস্পাত অপেক্ষা বেশি। অতএব, নির্দিষ্ট H-এর বেলায় নরম লোহার চৌম্বক গ্রাহিত্য $\left(k = \frac{1}{H}\right)$ ইস্পাত অপেক্ষা অনেক বেশি। আবার B-H লুপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নির্দিষ্ট চুম্বক ক্ষেত্রের বেলায় নরম লোহার চৌম্বক আবেশ (B) ইস্পাত অপেক্ষা বেশি। অতএব, নরম লোহার ভেদ্যতা $\left(\mu = \frac{B}{H}\right)$ ইস্পাত অপেক্ষা বেশি।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যাবলির জন্যই তড়িৎ চুম্বক নির্মাণে ইস্পাত লোহা অপেক্ষা কাঁচা লোহা পছন্দ করা হয়।

প্রশ্ন-৪০. পৃথিবী নিজে একটা চুম্বক, এ সিদ্ধান্তের কারণ কি? আলোচনা করুন।

উত্তর : পৃথিবী নিজে একটা চুম্বক, এ সিদ্ধান্তের কারণ : চুম্বক এবং চুম্বক মেরুর ধর্ম হতে ১৬০০ সালে ড. গিলবার্ট প্রমাণ করেন, পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। তার মতে, মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বক সর্বদা মোটামুটি ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ দিকে মুখ করে স্থির অবস্থায় থাকে। যদি চুম্বকটিকে ঐ অবস্থা হতে খানিকটা ঘুরিয়ে দেয়া হয় তবে কিছুক্ষণ দোল খাবার পর পুনরায় চুম্বকটি মোটামুটি ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ দিক বরাবর এসে স্থির হয়ে অবস্থান করে। তিনি এ ঘটনা হতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, পৃথিবী যদি চুম্বক না হত তবে মুক্তভাবে ঝুলন্ত চুম্বক বা চুম্বক শলাকা যে কোনো দিকে অবস্থান করত, কিন্তু কখনই তা ঘটে না। যেহেতু ঝুলন্ত চুম্বক শলাকার চারদিকে অন্য কোনো চুম্বক নেই, অতএব পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক। যার দক্ষিণ মেরু মোটামুটি ভৌগোলিক উত্তর দিকে এবং উত্তর মেরু মোটামুটি ভৌগোলিক দক্ষিণ দিকে অবস্থান করে। বিপরীত মেরুতে আকর্ষণ হওয়ায় ঝুলন্ত চুম্বক বা চুম্বক শলাকার উত্তর ও দক্ষিণ মেরু যথাক্রমে ভূ-চুম্বকের দক্ষিণ ও উত্তর মেরুর দিকে অবস্থান করে ভৌগোলিক উত্তর ও দক্ষিণ দিক নির্দেশ করে। অতএব, "পৃথিবী নিজে একটা চুম্বক।"

প্রশ্ন-৪১. কোনো স্থানে ভূ-চুম্বকত্বের উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : ভূ-চুম্বকত্বের উপাদান : পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান এবং অভিমুখ ভিন্ন। এজন্য কোনো স্থানে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করার জন্য তিনটি রাশি জানা দরকার। এ তিনটি রাশিকে ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের চৌম্বক উপাদান বলে। যথা : (i) বিচ্যুতি, (ii) বিনতি ও (iii) ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্যের অনুভূমিক উপাংশ।

প্রশ্ন-৪২. কোনো স্থানের বিনতি 50°N বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কোনো স্থানে বিনতি 50°N বলতে বুঝায় ঐ স্থানে ভারকেন্দ্র হতে মুক্তভাবে ঝুলানো একটি চুম্বক শলাকার অক্ষ স্থির অবস্থায় অনুভূমিক তলের সাথে 50° কোণে আনত থাকবে এবং শলাকাটি উত্তর মেরুর নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে।

প্রশ্ন-৪৩. কোনো স্থানের বিচ্যুতি 10°W বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কোনো স্থানের বিচ্যুতি 10°W বলতে বুঝায় ঐ স্থানে অনুভূমিক তলে সাম্য অবস্থায় দণ্ডায়মান চুম্বক শলাকার অক্ষ, ভৌগোলিক উত্তর দক্ষিণ রেখার সাথে 10° কোণ উৎপন্ন করে এবং শলাকার উত্তর মেরুটি ভৌগোলিক অক্ষের পশ্চিম দিকে থাকবে।

প্রশ্ন-৪৪. কোনো স্থানে ভূ-চুম্বক ক্ষেত্রের আনুভূমিক প্রাবল্য $30 Nwb^{-1}s$ এ উক্তিটির অর্থ কি?

উত্তর : আনুভূমিক প্রাবল্য $30 Nwb^{-1}s$ এ উক্তির অর্থ : কোনো স্থানে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্য $30 Nwb^{-1}s$ উক্তির অর্থ পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের জন্য ঐ স্থানে একটি একক মেরুর উপর মোট যে বল ক্রিয়া করে, চৌম্বক মধ্যতলে তার অণুভূমিক উপাংশের মান 30 Newton.

প্রশ্ন-৪৫. একটি দোলন চুম্বকমান (Vibration magnetometre) যন্ত্রের বর্ণনা দিন।

উত্তর : দোলন চুম্বকমান যন্ত্র :

যন্ত্রের বর্ণনা :

i. যন্ত্রে একটি কাঠের বাক্স থাকে। এ বাক্সের দু'পাশের দেয়াল কাচ দিয়ে নির্মিত। বাক্সের উপরিতলের ঠিক মাঝখানে একটি লম্বা কাচের নল (N) লাগানো থাকে। নলের উপরিভাগে একটি ঘূর্ণনক্ষম স্ক্রু (S) লাগানো থাকে।
ii. পাকহীন একটি রেশমী সুতার একপ্রান্ত স্ক্রু (S') এবং অপর প্রান্তে অচৌম্বক পদার্থের দোলনা ঝুলানো থাকে। এ দোলনার (p) উপর দণ্ড চুম্বকটি (NS) বসানো থাকে।
iii. বাক্সের নিচতলে এবং দোলনার নিচ বরাবর একটি সরলরেখা আঁকা থাকে। রেখাটি যাতে সহজে দেখা যায় সেজন্য বাক্সের উপর তলে ঐ রেখা বরাবর দুটি আয়তাকার ছিদ্র (S_1, S_2) থাকে। এ রেখার সাপেক্ষে দোলনায় স্থাপিত চুম্বকের দোলনকাল নির্ণয় করা যায়।

কার্য প্রণালী :

i. বাক্সটিকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে চুম্বকটিকে এমনভাবে ঝুলানো হয় যাতে তা চৌম্বক মধ্যতলে সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে।
ii. এবার অন্য একটি দণ্ড চুম্বক ঝুলন্ত চুম্বকের নিকট ক্ষণিকের জন্য ধরলে ঝুলন্ত চুম্বকটি একটি ক্ষুদ্র কোণে বিক্ষিপ্ত হয়ে দুলতে থাকবে। থামা ঘড়ির সাহায্যে কয়েকটি দোলনের সময় গণনা করে, সেই সময়কে দোলন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে দোলনকাল T পাব। যদি দোলনকাল T হয় তবে আমরা পাই,

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{MH}} \text{ .... (i)}$$

এখানে, I = দণ্ড চুম্বকের জড়তার ভ্রামক

M = চৌম্বক ভ্রামক

H = ভূ-চৌম্বক ক্ষেত্রের অনুভূমিক প্রাবল্য

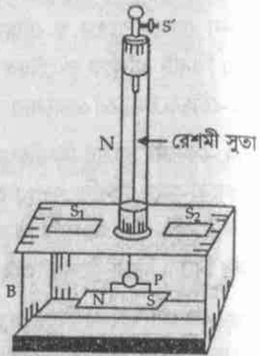

চিত্র : দোলন চুম্বক যন্ত্র

○ প্রশ্ন-৪৬. একটি দোলন ম্যাগনেটোমিটারের সাহায্যে কিভাবে MH নির্ণয় করা যায়? বর্ণনা করুন।

উত্তর : আমরা জানি, $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{MH}}$ .... (i)

এখানে, M = দণ্ড চুম্বকের চৌম্বক ভ্রামক

I = দণ্ড চুম্বকের জড়তার ভ্রামক

H = পরীক্ষাধীন স্থানে ভূ-চুম্বকের অনুভূমিক উপাংশ

(i) নং সমীকরণ হতে,

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I}{MH}$$

বা, $MH = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$

এখন দণ্ড চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য l, প্রস্থ, b এবং ভর m হলে এর জড়তার ভ্রামক,

$$I = \frac{m}{12}(l^2 + b^2)$$

$$\therefore MH = \frac{4\pi^2}{T^2} \times \frac{m}{12}(l^2 + b^2)$$

বা, $MH = \frac{m\pi^2}{3T^2}(l^2 + b^2)$

কার্যপ্রণালী : প্রথমে স্লাইডক্যালিপার্সের সাহায্যে চুম্বকটির দৈর্ঘ্য l এবং প্রস্থ b নির্ণয় করি। নিক্তির সাহায্যে এর ভর m নির্ণয় করি। এবার দণ্ড চুম্বকটিকে দোলন ম্যাগনেটোমিটারে রেখে অপর একটি চুম্বকের সাহায্যে সামান্য বিচ্যুত করে ছেড়ে দেই। এরপর একটি থামা ঘড়ির সাহায্যে চুম্বকটির ২০টি দোলনের সময় নির্ণয় করি এবং মোট সময়কে ২০ দ্বারা ভাগ করে দোলনকাল T' নির্ণয় করি। এভাবে কয়েকটি T নির্ণয় করে তার গড় হিসাব করি।

হিসাব : তত্ত্ব থেকে পাওয়া $MH = \frac{M\pi^2}{3T^2}(l^2 + b^2)$ এ সমীকরণে l, b ও T-এর মান বসিয়ে MH এর মান নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৪৭. দোলন বা কম্পন ম্যাগনেটোমিটার কাকে বলে? এর কয়েকটি ব্যবহার লিখুন। যে কোনো একটির বর্ণনা দিন।

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে দুটি চুম্বকের ভ্রামকের তুলনা করা যায়, ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের আনুভূমিক প্রাবল্যের অনুপাত ইত্যাদি নির্ণয় করা যায় তাকে দোলন ম্যাগনেটোমিটার বলে।

এর কয়েকটি ব্যবহার হলো :

ক. MH নির্ণয় করা যায়।

খ. দুটি চুম্বকের চৌম্বক ভ্রামকের তুলনা করা যায়।

গ. ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের আনুভূমিক প্রাবল্যের তুলনা করা যায়।

যে কোনো একটির বর্ণনা :

ক. MH নির্ণয় করার পদ্ধতি :

আমরা জানি, $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{MH}}$ .... (i)

এখানে, M = দণ্ড চুম্বকের চৌম্বক ভ্রামক

I = দণ্ড চুম্বকের জড়তার ভ্রামক

H = পরীক্ষাধীন স্থানে ভূ-চুম্বকের অনুভূমিক উপাংশ

(i) নং সমীকরণ হতে,

$$T^2 = 4\pi^2 \frac{I}{MH}$$

বা, $MH = \frac{4\pi^2 I}{T^2}$

এখন দণ্ড চুম্বকটির জ্যামিতিক দৈর্ঘ্য l, প্রস্থ, b এবং ভর m হলে এর জড়তার ভ্রামক,

$$I = \frac{m}{12}(l^2 + b^2)$$

$$\therefore MH = \frac{4\pi^2}{T^2} \times \frac{m}{12}(l^2 + b^2)$$

বা, $MH = \frac{m\pi^2}{3T^2}(l^2 + b^2)$

কার্যপ্রণালী : প্রথমে স্লাইডক্যালিপার্সের সাহায্যে চুম্বকটির দৈর্ঘ্য l এবং প্রস্থ b নির্ণয় করি। নিক্তির সাহায্যে এর ভর m নির্ণয় করি। এবার দণ্ড চুম্বকটিকে দোলন ম্যাগনেটোমিটারে রেখে অপর একটি চুম্বকের সাহায্যে সামান্য বিচ্যুত করে ছেড়ে দেই। এরপর একটি থামা ঘড়ির সাহায্যে চুম্বকটির ২০টি দোলনের সময় নির্ণয় করি এং মোট সময়কে ২০ দ্বারা ভাগ করে দোলনকাল T' নির্ণয় করি। এভাবে কয়েকটি T নির্ণয় করে তার গড় হিসাব করি।

হিসাব : তত্ত্ব থেকে পাওয়া $MH = \frac{M\pi^2}{3T^2}(l^2 + b^2)$ এ সমীকরণে l, b ও T-এর মান বসিয়ে MH এর মান নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৪৮. তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া কি?

উত্তর : তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া : কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে (চার্জের গতির ফলে) এর চারদিকে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়, এ ঘটনাকে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া বলে।

○ প্রশ্ন-৪৯. চৌম্বক ক্ষেত্র (আবেশ) $\vec{B}$ এর সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : চৌম্বক ক্ষেত্র $\vec{B}$: একটি গতিশীল চার্জ বা স্থায়ী চুম্বক তার আশেপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের দিকের সাথে সমকোণে একক বেগে চলমান একটি একক চার্জের উপর ক্রিয়াশীল বলকে ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রের মান বলে।

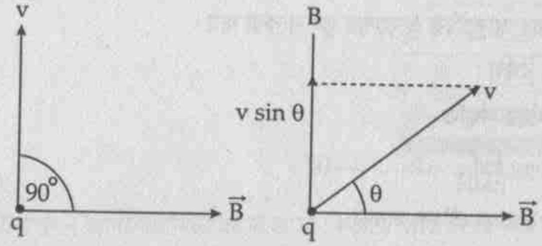

কোনো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকের সাথে q চার্জ v বেগে গতিশীল হলে ঐ চার্জটি যদি F বল লাভ করে তাহলে চৌম্বকক্ষেত্রের মান, $B = \frac{F}{qv}$ যদি গতিশীল চার্জ ও চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কোণ 90° না হয়ে θ কোণ হয়, তবে $B = \frac{F}{qv\sin\theta}$

বা, $F = qvB\sin\theta$

ভেক্টর রূপ : $\vec{F} = q\vec{v}\times\vec{B}, \vec{F}$ এর দিক হবে ডানহাতি স্ক্রু নিয়ম অনুযায়ী।

○ প্রশ্ন-৫০. একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 15T বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 15 T : একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মান 15 T বলতে বুঝায় যে, ঐ ক্ষেত্রে IC আধান $1\ ms^{-1}$ বেগে ক্ষেত্রের দিকের সাথে সমকোণে গতিশীল হলে ক্ষেত্রটি ঐ আধানের ওপর 15N বল প্রয়োগ করবে।

○ প্রশ্ন-৫১. বায়োট-স্যাভার্ট এর সূত্র বিবৃত করুন।

উত্তর : বায়োট-স্যাভার্টের সূত্র : নির্দিষ্ট মাধ্যমে কোনো পরিবাহীর ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এর আশপাশে কোনো বিন্দুতে সৃষ্ট চৌম্বক ক্ষেত্রের মান (i) পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক (ii) তড়িৎ প্রবাহের সমানুপাতিক (iii) পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের মধ্যবিন্দু হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং (iv) পরিবাহীর দৈর্ঘ্য ও এর মধ্যবিন্দু হতে ঐ বিন্দুর দূরত্বের মধ্যবর্তী কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-৫২. হল ভোল্টেজ (বিভব) ও হল ক্রিয়া কি?

উত্তর : হল ভোল্টেজ ও হল ক্রিয়া : চৌম্বক ক্ষেত্র ও তড়িৎ উভয়ের সাথে লম্ব বরাবর যে বিভব পার্থক্য সৃষ্টি হয় তাকে হল বিভব বলে। আর এ ক্রিয়াকে হল ক্রিয়া বলে।

○ প্রশ্ন-৫৩. তড়িৎবাহী ক্ষুদ্র কুণ্ডলীর উপর টর্কের রাশিমালা $\tau = \vec{m}\times\vec{B}$ প্রতিপাদন করুন।

উত্তর : তড়িৎবাহী ক্ষুদ্র কুণ্ডলীর ক্ষেত্রে টর্কের রাশিমালা : মনে করি, PQRS একটি ক্ষুদ্র আয়তাকার বর্তনী। এটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্র $\vec{B}$ এ স্থাপিত। বর্তনীর মধ্য দিয়ে I পরিমাণ তড়িৎ ঘড়ির কাঁটার ঘূর্ণনের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। বর্তনীর PQ ও RS বাহুর দৈর্ঘ্য = a, এরা $\vec{B}$ এর সমান্তরাল বরাবর। QR ও SP বাহুর দৈর্ঘ্য = b, এরা $\vec{B}$-এর সাথে লম্ব বরাবর অবস্থিত।

PQ বাহুর উপর প্রযুক্ত বল $= I\ \vec{a}\times\vec{B}$

$= I\,aB\sin\theta$

$= I\,aB\sin 0^\circ = 0$

RS বাহুর উপর প্রযুক্ত বল $= I\ \vec{a}\times\vec{B}$

$= I\,aB\sin\theta$

$= I\,aB\sin 180^\circ = 0$

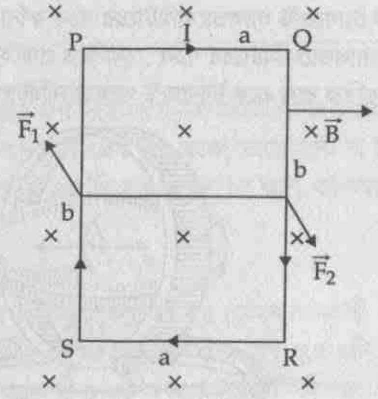

ধরি, SP বাহুর উপর প্রযুক্ত বল = $\vec{F}_1$

$\therefore \vec{F}_1 = I\vec{b}\times\vec{B} = IbB\sin\theta\hat{n}$

বা $\vec{F}_1 = IbB\sin 90^\circ = IbB$

আবার ধরি, QR বাহুর উপর প্রযুক্ত বল = $\vec{F}_2$

$\therefore \vec{F}_2 = I\vec{b}\times\vec{B} = IbB\sin\theta\hat{n}$

বা $\vec{F}_2 = IbB\sin 90^\circ = IbB$

$\vec{F}_1$ ও $\vec{F}_2$ এর মান সমান। কিন্তু দিক বিপরীত।

ফলে এরা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবে এবং বর্তনীকে ঘুরাতে চেষ্টা করবে।

অতএব, দ্বন্দ্বের ভ্রামক বা টর্ক, r = বলের মান × দ্বন্দ্বের বাহুর দৈর্ঘ্য

$= IbBa$

$= I(ab)\,B$

$= IAB;\quad A =$ বর্তনীর ক্ষেত্রফল $= ab$

○ প্রশ্ন-৫৪. গ্যালভানোমিটার কি? এটা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : গ্যালভানোমিটার : যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের উপস্থিতি ও পরিমাণ নির্ণয় করা হয় তাকে গ্যালভানোমিটার বলে।

প্রকারভেদ : গ্যালভানোমিটার মূলত দুই শ্রেণির হয়ে থাকে। যথা : ১. চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার ও ২. চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার।

১. **চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার :** যে গ্যালভানোমিটারে চুম্বক শলাকা মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং কুণ্ডলী স্থির থাকে তাকে চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার বলে। অ্যাস্ট্যাটিক গ্যালভানোমিটার, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার চলচুম্বক জাতীয় গ্যালভানোমিটার।

২. **চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার :** যে গ্যালভানোমিটারে কুণ্ডলী মুক্ত অবস্থায় থাকে এবং চুম্বক স্থির থাকে তাকে চল কুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার বলে। ডি আরসোনভ্যাল গ্যালভানোমিটার একটি চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার।

○ প্রশ্ন-৫৫. একটি ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের গঠন বর্ণনা করুন।

উত্তর : ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটারের গঠন : কুণ্ডলীতে প্রবাহের মান চুম্বক শলাকার বিক্ষেপ কোণের ট্যানজেন্টের সমানুপাতিক বলে একে ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার বলা হয়।

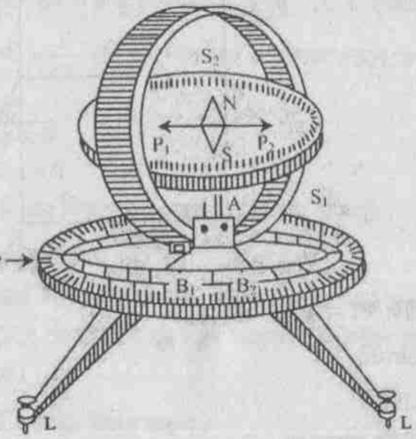

চিত্রের মত গ্যালভানোমিটার একটি বৃত্তাকার কাঠের ফ্রেম (F) এর খাঁজের মধ্যে অনেকগুলো পাকের অন্তরিত তামার তার জড়ানো থাকে। কুণ্ডলী তারের দু'প্রান্ত অনুভূমিক পাটাতন P এর উপর আটকানো দুটি বন্ধনী স্ক্রু B_1 ও B_2-এর সাথে যুক্ত থাকে। তার জড়ানো কাঠের ফ্রেমটিও অনুভূমিক বৃত্তাকার পাটাতন P এর উপর খাড়াভাবে বসানো থাকে এবং এটি একটি উলম্ব অক্ষের চারদিকে সহজে ঘুরতে পারে। পাটাতন P এর উপর একটি বৃত্তাকার স্কেল S_1থাকে যার সাহায্যে প্রয়োজনবোধে কুণ্ডলীর ঘূর্ণনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। পাটাতনটি অণুভূমিক করার জন্য এর নিচে তিনটি স্ক্রু (L) লাগান থাকে। তার কুণ্ডলীর কেন্দ্রস্থলে একটি কাচের ঢাকনা যুক্ত অনুভূমিক বৃত্তাকার বাক্স A বসানো আছে। বাক্সটির কেন্দ্রে তথা তার কুণ্ডলীর কেন্দ্রে একটি চুম্বক শলাকা (N–S) এমনভাবে আটকানো থাকে যে শলাকাটি অনুভূমিক তলে অবাধে ঘুরতে পারে। শলাকাটির মধ্য বিন্দুতে এর সাথে সমকোণে একটি লম্বা

অ্যালুমিনিয়ামের সূচক (P_1P_2) লাগানো থাকে। সূচকটি একটি অনুভূমিক স্কেলের (S_2) উপর ঘুরতে পারে। স্কেলটি 0°–90° ভাগে চারটি বৃত্তপাদে বিভক্ত থাকে। স্কেলটির 0°–0° রেখা এবং 90°–90° রেখা পরস্পরের সমকোণে থাকে। সূচকটি স্কেলের উপর যে কোণে আবর্তিত হবে চুম্বকের আবর্তন কোণও তত হবে। লম্বন ত্রুটি পরিহার করে বিক্ষেপের পাঠ নির্ভুলভাবে নেয়ার জন্য শলাকার নিচে একটি সমতল দর্পণ বসানো থাকে।

প্রশ্ন-৫৬. চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার ও চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার ও চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো :

চলচুম্বক গ্যালভানোমিটার	চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার
চলচুম্বক গ্যালভানোমিটারের কুণ্ডলী স্থির থাকে।	চলকুণ্ডলী চুম্বক গ্যালভানোমিটারে কুণ্ডলী মুক্ত অবস্থায় থাকে।
চলচুম্বক গ্যালভানোমিটারের চুম্বক শলাকা মুক্ত অবস্থায় থাকে।	চলকুণ্ডলী চুম্বক গ্যালভানো মিটারের চুম্বক স্থির থাকে।
অ্যাস্ট্যাটিক গ্যালভানোমিটার, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার ইত্যাদি চুম্বক গ্যালভানোমিটার।	ডি আরসোনভ্যাল চুলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার।

○ প্রশ্ন-৫৭. সান্ট কি?

উত্তর : সূক্ষ্ম ও সুবেদী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাতে উচ্চ মাত্রার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে না পারে তার জন্য যন্ত্রের সাথে সমান্তরালে নিম্নমানের যে রোধ যুক্ত থাকে; তাকে সান্ট বা বিকল্প পথ বলে। এর ফলে মূল প্রবাহের বৃহত্তর অংশ সান্টের মধ্য দিয়ে আর ক্ষুদ্রতম অংশ গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

○ প্রশ্ন-৫৮. সান্ট ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর: সান্ট ব্যবহার করার কারণ : সুবেদী বৈদ্যুতিক যন্ত্র (যেমন চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার) এর মধ্যে দিয়ে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হলে তাপ সৃষ্টি হয়ে এটি ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হতে পারে। এজন্য এরূপ যন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এর সাথে সমান্তরাল সমবায়ে একটি অল্পমানের রোধ যুক্ত করে একটি বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয়। এর ফলে মূল প্রবাহ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। মূল প্রবাহের এক অংশ গ্যালভানোমিটারের ভেতর দিয়ে ও অপর অংশ সান্টের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। সান্টের রোধ খুব কম হওয়ায় এর ভেতর দিয়ে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এবং অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ গ্যালভানোমিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ফলে গ্যালভানোমিটার নষ্টের হাত থেকে রক্ষা পায়।

○ প্রশ্ন-৫৯. মূলপ্রবাহের সাথে গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ ও সান্টের প্রবাহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করুন।

উত্তর : গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ ও সান্টের প্রবাহের সাথে মূল প্রবাহের সম্পর্ক :

ধরি, গ্যালভানোমিটারের রোধ G এর সাথে A ও B বিন্দুতে সমান্তরাল সমবায়ে s মানের রোধ সান্ট হিসেবে যোগ করা হয়েছে। বর্তনীর মূল প্রবাহ I এসে A বিন্দুতে I_g ও I_s শাখায় বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে গ্যালভানোমিটার ও সান্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

অতএব, $I = I_g + I_s$

A ও B বিন্দুর বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B হলে ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে আমরা পাই,

গ্যালভানোমিটারের ক্ষেত্রে, $V_A - V_B = I_gG$

এবং সান্টের ক্ষেত্রে, $V_A - V_B = I_SS$

এই দুই সমীকরণের তুলনা থেকে পাওয়া যায়

$I_s S = I_g G$

বা, $\frac{I_s}{I_g} = \frac{G}{S}$

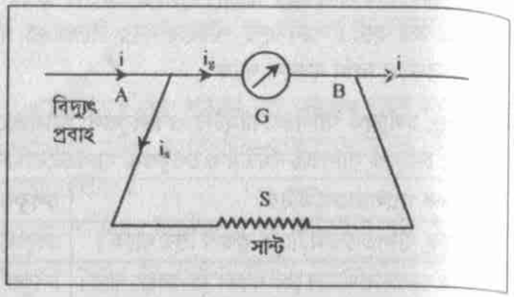

উভয় পক্ষে 1 যোগ করে,

$\frac{I_s + I_g}{I_g} = \frac{G+S}{S}$

বা, $\frac{I}{I_g} = \frac{G+S}{S}$ [$\because I_g + I_s = I$]

বা, $I_g = \frac{S}{G+S} I$ .... (i)

অনুরূপভাবে, $I_s = \frac{S}{G+S}$ .... (ii)

(i) সমীকরণ থেকে পাওয়া যায়

$I = \frac{G+S}{S} I_g$ .... (iii)

(iii) সমীকরণ থেকে বোঝা যায় যে, গ্যালভানোমিটারের প্রবাহ I_g কে $\frac{G+S}{S}$ দিয়ে গুণ করলে বর্তনীর মূল প্রবাহ I পাওয়া যায়। এজন্য $\frac{G+S}{S}$ কে সান্টের গুণন ক্ষমতা বা সান্টের গুণক বলে।

○ প্রশ্ন-৬০. অ্যামিটার কি?

উত্তর : অ্যামিটার : যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায় তাকে অ্যামিটার বলে। একে বর্তনীর সাথে শ্রেণি সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।

গঠন : এ যন্ত্রে একটি চলকুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলী তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের উপরে ঘুরতে পারে। কুণ্ডলীর সাথে সমান্তরাল সমবায়ে একটি অল্পমানের রোধ লাগানো থাকে।

○ প্রশ্ন-৬১. একটি অ্যামিটারের পাল্লা n গুণ বৃদ্ধি করতে যে মানের সান্ট ব্যবহার করতে হবে তার রাশিমালা নির্ণয় করুন।

উত্তর : একটি অ্যামিটার সর্বোচ্চ যে পরিমাণ প্রবাহ পরিমাপ করতে পারে তাকে উহার পাল্লা বলে। সান্টের পরিবর্তন করে এই পাল্লা বৃদ্ধি করা যায়। ধরা যাক, একটি অ্যামিটারের কার্যকর রোধ R এবং এটি সর্বোচ্চ I প্রবাহ মাপতে পারে। এ যন্ত্রের সাহায্যে I-এর n গুণ অর্থাৎ nI প্রবাহমাত্রা পরিমাপের জন্য এর সাথে সমান্তরালে s রোধ যুক্ত করতে হবে।

সান্টের নীতি অনুসারে,

আমরা জানি, $I_g = \frac{IS}{G+S}$

সুতরাং এক্ষেত্রে, $I = \frac{InS}{R+S}$

বা, $R + S = nS$

বা, $S(n-1) = R$

$\therefore s = \frac{R}{n-1}$

অর্থাৎ, অ্যামিটারের সমান্তরালে $\frac{R}{n-1}$ রোধ সংযোগ করলে n গুণ তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপ করা যাবে।

○ প্রশ্ন-৬২. ভোল্টমিটার কি?

উত্তর : ভোল্টামিটার যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে ভোল্টমিটার বলে।

গঠন : এ যন্ত্রে একটি চলকুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলী তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাগ কাটা একটি স্কেলের উপর ঘুরতে পারে। কুণ্ডলীর সাথে শ্রেণি সমবায়ে একটি উচ্চমানের রোধ লাগানো থাকে।

○ প্রশ্ন-৬৩. অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের পার্থক্য :

পার্থক্যের বিষয়	অ্যামিটার	ভোল্টমিটারের পার্থক্য
১. সংজ্ঞা	যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা হয় তাকে আমিটার বলে।	যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্যের পরিমাণ সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে ভোল্টামিটার বলে।
২. রোধের পরিমাণ	অ্যামিটার স্বল্পরোধ বিশিষ্ট একটি চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার।	ভোল্টমিার উচ্চরোধ বিশিষ্ট চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার।
৩. সংযোগের নিয়ম	যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ নির্ণয় করতে হয় অ্যামিটারকে সেই বর্তনীর সাথে শ্রেণির সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।	বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য নির্ণয় করতে হয় ভোল্টমিটারকে সেই বিন্দুর সাথে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।

প্রশ্ন-৬৪. ভোল্ট মিটার ও ভোল্টামিটারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ভোল্টমিটার ও ভোল্টামিটারের মধ্যে পার্থক্য : ভোল্টমিটারের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুবিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা হয়। আর ভোল্টামিটারের সাহায্যে কোনো একটি তড়িৎ বিশ্লেষ্যের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাংক নির্ণয় করা হয়।

○ প্রশ্ন-৬৫. মাল্টিমিটার কি?

উত্তর : মাল্টিমিটার : যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রোধ বিভব পার্থক্য ও তড়িৎ প্রবাহ মাপা যায় তাকে মাল্টিমিটার বলে। মাল্টিমিটারে রোধ, বিভব পার্থক্য ও তড়িৎ প্রবাহ মাপার জন্য পৃথক স্কেল আছে। এ যন্ত্র ও'মস মিটার (Ohms meter), ভোল্টমিটার (Volt meter) ও অ্যাম্পিয়ার মিটার (Ampere meter) এর সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য এটি Avometer নামেও পরিচিত।

অধ্যায়

০৪

এসিড, ক্ষারক ও লবণ
Acid, Base & Salt

***Syllabus— Acid, Base and Salt :** Acid-base concepts; characteristics of acids and bases; acid-base indicators; uses of acids and bases in daily life and caution in handling them; social effects of misuse of acids; reason for acidity in stomach and selection of the right food; pH; measurement and importance of pH of substances; salts; characteristics of salts; necessity of salt in daily life; uses of salts in agriculture and industries.*

ক

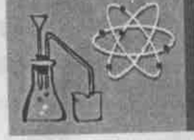

এসিড-ক্ষারকের ধারণা, এসিড ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য, এসিড-ক্ষারক নির্দেশক

Acid-base concepts, characteristics of acids and bases, acid-base indicators

○ প্রশ্ন-১. এসিড বা অম্ল কি?

উত্তর : কোন দ্রবণে (H^+) হাইড্রোজেন আয়নের ঋণাত্মক লগারিদমকে PH বলে। PH এর মান কম হলে দ্রবণটি এসিডিও হয়। অর্থাৎ যে সকল পদার্থ জলীয় দ্রবণে বা জলীয় দ্রবণ ছাড়া H^+ প্রদান করে তারা এসিড বা অম্ল। যেমন : সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4); হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl); নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২. ক্ষার ও ক্ষারক কি? সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক ক্ষার নয়।— ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ক্ষারক হলো মূলত ধাতব অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড। কিছু কিছু ক্ষারক আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয়, আর কিছু কিছু আছে যারা দ্রবীভূত হয় না। যে সমস্ত ক্ষারক পানিতে দ্রবীভূত হয় তাদেরকে বলে ক্ষার। তাহলে ক্ষার হলো বিশেষ ধরনের ক্ষারক। NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, NH_4OH এরা সবাই ক্ষার। এদেরকে কিন্তু ক্ষারকও বলা যায়। পক্ষান্তরে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড [$Al(OH)_3$] কিন্তু পানিতে দ্রবীভূত হয় না। তাই এটি একটি ক্ষারক হলেও ক্ষার নয়। অতএব একথা বলা যায় যে, সকল ক্ষার ক্ষারক হলেও সকল ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়। আবার CuO একটি ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়।

○ প্রশ্ন-৩. এসিডের এবং ক্ষারকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর : হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2 \uparrow$$

কখনও কখনও এসিডের এ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে উৎপন্ন CO_2 আগুন নেভানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।

খাবার সোডা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ, পানি ও CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়।

$$NaHCO_2 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2 \uparrow$$

এটি দস্তা ও হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ। এটি হাইড্রোজেন গ্যাস কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য, টেস্টটিউবের মুখে একটি জ্বলন্ত দিয়াশলাই ধরলে দেখা যায় পপ পপ শব্দ করে জ্বলছে। এটি হাইড্রোজেন ছাড়া অন্য গ্যাস হলে এমন শব্দ হতো না।

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 \uparrow$$

হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো প্রায় সকল এসিডই ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

$$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + \text{তাপ}$$

কেন লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন হচ্ছে না?

কারণ হলো চুনের পানিতে থাকা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগকৃত H_2SO_4 এর সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম সালফেট ও পানি উৎপন্ন করে। ফলে ধীরে ধীরে $Ca(OH)_2$ এর পরিমাণ কমতে থাকে এবং যখন সব $Ca(OH)_2$, H_2SO_4-এর সাথে বিক্রিয়া করে ফেলে তখন লিটমাস কাগজের রং আর পরিবর্তন হয় না।

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{Ca(OH)_2} + \underset{\text{এসিড}}{H_2SO_4} \rightarrow \underset{\text{লবণ}}{CaSO_4} + \underset{\text{পানি}}{2H_2O}$$

এখানে উৎপন্ন ক্যালসিয়াম সালফেট হলো একটি লবণ। তাহলে আমরা বলতে পারি ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন মূল পদার্থই (পানি ছাড়া) হলো লবণ।

আরও কিছু ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন লবণ দেখে নেওয়া যাক :

ক্ষারক		এসিড		লবণ		পানি
NaOH	+	HCl	→	NaCl	+	H_2O
KOH	+	HNO_3	→	KNO_3	+	H_2O
$2NH_4OH$	+	H_2SO_4	→	$(NH_4)2SO_4$	+	H_2O
$3Ca(OH)_2$	+	$2H_3PO_4$	→	$Ca_3(PO_4)_2$	+	$3H_2O$

তবে একমাত্র যে ক্ষারক ও এসিডের বিক্রিয়াতেই লবণ উৎপন্ন হয় তা নয়। অন্য বিক্রিয়ার মাধ্যমেও লবণ উৎপন্ন করা যায়। যেমন– ধাতু ও এসিডের মধ্যে বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন হয়।

$$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$$
$$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$$
$$Na + 2HCl \rightarrow NaCl + H_2$$

আবার কার্বোনেটের সাথে (যা একটি লবণ) এসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়েও লবণ উৎপন্ন করা যায়।

$$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$$

প্রশ্ন-৪. শক্তিশালী ও দুর্বল এসিড কি?

উত্তর : কিছু কিছু এসিড বিশেষ করে জৈব এসিডসমূহ পানিতে পুরোপুরিভাবে বিয়োজিত না হয়ে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয় অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে না। এই এসিডসমূহকে দুর্বল এসিড বলা হয়। পক্ষান্তরে, খনিজ এসিডসমূহ পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলোই বিয়োজিত হয়। এই এসিডসমূহকে শক্তিশালী এসিড বলা হয়।

উদাহরণ :

দুর্বল এসিড	শক্তিশালী এসিড
এসিটিক এসিড (CH_3COOH)	সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)
সাইট্রিক এসিড	নাইট্রিক এসিড (NHO_3)
অক্সালিক এসিড (HOOC–COOH)	হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)

তবে কিছু এসিড আছে যেমন– কার্বোনিক এসিড (H_2CO_3), যা জৈব এসিড না হলেও দুর্বল এসিড।

প্রশ্ন-৫. নির্দেশক কি? আলোচনা করুন।

উত্তর : অম্ল-ক্ষারক নির্দেশকসমূহ (Acid-Base Indicators) : অম্ল-ক্ষারক টাইট্রেশনের সময় তুল্যতা-বিন্দু নির্ধারণের জন্য কতিপয় যৌগ ব্যবহার করা হয়। এসব যৌগ অম্লীয় মাধ্যমে এক ধরনের বর্ণ দেখায় এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে অন্য ধরনের বর্ণ দেখায়। এ সকল যৌগকে প্রশমন বা অম্ল-ক্ষারক নির্দেশক বলা হয়। যেমন, মিথাইল অরেঞ্জ, লিটমাস, ফেনলফ্থ্যালিন (Phenolphthalein) ইত্যাদি হলো অম্ল ক্ষারক নির্দেশক।

প্রকৃতপক্ষে সকল নির্দেশক একই : pH এ বর্ণ পরিবর্তন করে না। প্রতিটি নির্দেশকের একটি তথাকথিত pH সীমানা আছে, যেখানে দু'প্রকার বর্ণের সংমিশ্রণ দেখা যায়। pH এর মান এ সীমানা থেকে কম হলে নির্দেশক শুধুমাত্র অম্লীয় বর্ণ এবং pH এর মান এ সীমানা থেকে বেশি হলে নির্দেশক শুধুমাত্র ক্ষারীয় বর্ণ দেখায়। নির্দেশক সামান্য pH বিস্তারে বর্ণ পরিবর্তন করে। তাই কোন নির্দিষ্ট অম্ল-ক্ষারক যুগলের টাইট্রেশনের জন্য এমন একটি নির্দিষ্ট নির্দেশক নির্বাচন করা প্রয়োজন, যার বর্ণ পরিবর্তনের pH পরিসরের মধ্যে ঐ টাইট্রেশনের তুল্যতা বিন্দুর pH অবস্থিত হয়। অন্য কথায় কোন টাইট্রেশনের তুল্যতা বিন্দুতে যে নির্দেশকের বর্ণ হঠাৎ পরিবর্তিত হয়, তা ঐ টাইট্রেশনের জন্য সঠিক নির্দেশক।

কোন পদার্থকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করার প্রধান শর্তসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ :

১. নির্দেশকের বর্ণ যথেষ্ট স্থায়ী ও উজ্জ্বল হতে হবে এবং অম্লীয় মাধ্যম ও ক্ষারীয় মাধ্যমের বর্ণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে হবে। এরা বিপরীত বর্ণের হলে সবচেয়ে ভাল হয়।

২. নির্দেশকের বর্ণ হঠাৎ পরিবর্তিত হতে হবে। অর্থাৎ H^+ আয়নের যে ঘনমাত্রার মধ্যে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হয় তার বিস্তার স্বল্প হতে হবে।

৩. যে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে নির্দেশক ব্যবহার করা হবে, তার টাইট্রেশনের সমাপনী বিন্দুতে নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হতে হবে।

প্রশ্ন-৬. ক্ষারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি? আলোচনা করুন।

উত্তর : নির্দেশকের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে রং পরিবর্তন : সকল ক্ষারক লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে নীল করে। এছাড়া আরো কিছু নির্দেশক আছে, যারা পরীক্ষাগারে বহুল ব্যবহৃত (যেমন— মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড, ফেনলফথেলিন), তাদেরও রং পরিবর্তন করে। টেবিল-১ এ ক্ষারক নির্দেশকের কী ধরনের রং পরিবর্তন করে তা দেখানো হলো।

টেবিল-১ : ক্ষারক ও নির্দেশকের বিক্রিয়ার ফলে রং পরিবর্তন

নির্দেশক	নির্দেশকের রং	ক্ষারকের ধারণকৃত রং
লাল লিটমাস কাগজ	লাল	নীল
মিথাইল অরেঞ্জ	কমলা	হলুদ
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
ফেনলফথ্যালিন	বর্ণহীন	গোলাপি

পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারক অর্থাৎ ক্ষারসমূহ পানিতে হাইড্রোঅক্সাইড আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করে।

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$
$$KOH \rightarrow K^+ + OH^-$$
$$NH_4OH \rightarrow NH_4 + OH^-$$

ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। ক্ষারক ও এসিড পরস্পর বিপরীতধর্মী পদার্থ এবং বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিক্রিয় করে নিরপেক্ষ পদার্থ লবণ ও পানি তৈরি করে।

প্রশ্ন-৭. এসিড, ক্ষারক ও ক্ষারের সংজ্ঞা লিখুন। রাজাম্ল কাকে বলে?

উত্তর : এসিড (Acid) : যদি কোনো যৌগের অণুতে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং ঐ প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ধাতু বা ধাতুর ন্যায় ক্রিয়াশীল কোনো যৌগমূলক দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত করা যায় এবং যা ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে, তাকে অম্ল বা এসিড বলে।

ক্ষারক (Base) : সাধারণত ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইডকে ক্ষারক (Base) বলে।

ক্ষার (Alkali) : পানিতে দ্রবীভূত হয় এমন সব ক্ষারককে ক্ষার বলে।

রাজাম্ল (Aquaregia) : এক মোল গাঢ় নাইট্রিক এসিড ও তিন মোল গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের আনুপাতিক মিশ্রণকে রাজাম্ল (Aquaregia) বলে। অর্থাৎ (গাঢ় HNO_3+ গাঢ় 3HCl)

প্রশ্ন-৮. পানি একটি উভধর্মী অক্সাইড ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রোটনীয় মতবাদ অনুসারে যে সব অণু বা আয়ন অবস্থাভেদে প্রোটন দাতা ও প্রোটন গ্রহীতা উভয় প্রকার আচরণ করে, তাদেরকে উভধর্মী যৌগ বা অ্যাম্পোটেরিক (amphoteric) বা অ্যাম্পিপ্রোটিক (amphiprotic) বলা হয়। এসব পদার্থের মধ্যে H_2O, HCO_3^-, HSO_4^- উল্লেখযোগ্য। যেমন পানি (H_2O) অ্যামোনিয়াকে প্রোটন দান করে অম্ল রূপে এবং HCl থেকে প্রোটন গ্রহণ করে ক্ষারক রূপে ক্রিয়া করে। তাই H_2O একটি উভধর্মী বা অ্যাম্পিপ্রোটিক পদার্থ।

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{NH_3} + \underset{\text{অম্ল}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{অ্যামোনিয়াম আয়ন}}{NH_4^+} + OH^-$$

$$\underset{\text{অম্ল}}{HCl} + \underset{\text{ক্ষারক}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{হাইড্রোনিয়াম আয়ন}}{H_3O^+} + Cl^-$$

○ প্রশ্ন-৯. অক্সিএসিডসমূহের তীব্রতা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : অক্সিএসিডসমূহের কেন্দ্রীয় পরমাণুর ধনাত্মক জারণসংখ্যা যত বেশি ঐ এসিডের তীব্রতা তত বেশি হয়। যেমন– $\overset{+7}{HClO_4} > \overset{+6}{H_2SO_4} > \overset{+5}{HNO_3} > \overset{+4}{H_2SO_3}$ তীব্রতা হ্রাস পাচ্ছে।

দুর্বল এসিডসমূহের মধ্যে HF এর $K_a = 3.5 \times 10^{-4}$; H_2S এর প্রথম $K_a = 9.1 \times 10^{-8}$; HIO_3 এর $Ka = 1.7 \times 10^{-1}$, CH_3COOH এর $Ka = 1.76 \times 10^{-5}$। এ সকল মান হতে এদের শক্তির ধারণা পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-১০. নিম্নলিখিত পদার্থের মধ্যে কোনটি এসিড এবং কোনটি ক্ষারক, ব্যাখ্যা করুন।

Hcl, H_2SO_4, NaOH, NHO_3 $Ca(OH)_2$ $Mg(OH)_2$, CaO, CH_3COOH, KOH ইত্যাদি।

উত্তর : প্রশমন বিক্রিয়া দ্বারা, জানা এসিডের সাথে কোন পদার্থের বিক্রিয়া করালে লবণ ও পানি উৎপন্ন হলে তাহলে সেই পদার্থ অবশ্যই ক্ষারক হবে। যেমন :

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$

এসিড লবণ পানি

এখানে, NaOH অবশ্যই ক্ষারক হবে।

আবার, জানা ক্ষারকের সাথে কোন পদার্থের বিক্রিয়া করালে লবণ ও পানি উৎপন্ন হলে, তাহলে সেই পদার্থটি অবশ্যই এসিড। যেমন :

$$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$$

ক্ষারক লবণ পানি

এখানে Hcl অবশ্যই এসিড। এভাবে এসিড ও ক্ষারকের সনাক্ত করা যায়।

উপরে উল্লেখ্য পদার্থ গুলোর মধ্যে কোনটি এসিড, কোনটি ক্ষারক তা আলাদা করে দেখানো হল।

এসিড	ক্ষারক
HCl	NaOH
H_2SO_4	$Mg(OH)_2$
HNO_3	$Ca(OH)_2$
CH_3COOH	CaO
H-COOH	KOH

○ প্রশ্ন-১১. অনুবন্ধী অম্ল ও অনুবন্ধী ক্ষারক কি?

উত্তর : অনুবন্ধী অম্ল ও অনুবন্ধী ক্ষারক : কোনো অম্ল থেকে একটি প্রোটন অপসারণের ফলে যে ক্ষারকের সৃষ্টি হয়, তাকে সে অম্লের অনুবন্ধী ক্ষারক বলা হয়। কোনো ক্ষারকের সাথে একটি প্রোটন সংযোগের ফলে যে অম্লের সৃষ্টি হয়, তাকে সে ক্ষারকের অনুবন্ধী অম্ল বলা হয়।

অর্থাৎ

অনুবন্ধী অম্ল-ক্ষারক যুগল

$$HCl_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightleftharpoons H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$$

অনুবন্ধী যুগল

এখানে হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)-এর অনুবন্ধী ক্ষারক হলো ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) এবং পানি (H_2O)-এর অনুবন্ধী এসিড হলো হাইড্রোজেনিয়াম আয়ন (H_3O^+)।

○ প্রশ্ন-১২. টাইট্রেশন বা অনুমাপন কি?

উত্তর : টাইট্রেশন বা অনুমাপন : একটি নির্দিষ্ট আয়তনের কোনো পরীক্ষাধীন দ্রবণের সাথে প্রমাণ দ্রবণের মাত্রিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রমাণ দ্রবণের তুল্য আয়তন নির্ণয়ের মাধ্যমে পরীক্ষাধীন দ্রবণে কোনো নির্দিষ্ট দ্রবের পরিমাণ নির্ণয়ের পদ্ধতিকে টাইট্রেশন বা অনুমাপন বলা হয়।

○ প্রশ্ন-১৩. অম্ল ও ক্ষারকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তর : অম্ল ও ক্ষারকের শ্রেণীবিভাগ : ব্রনস্টেট-লাউরী মতবাদে প্রোটন প্রদানের প্রবণতা অনুসারে অম্লসমূহ নিম্নোক্ত তিনশ্রেণীভুক্ত হতে পারে। যেমন–

১. **আণবিক শ্রেণীর অম্ল :** HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_3$, $HClO_4$, H_2SO_4, H_2S, H_2CO_3, H_2O, H_3PO_4, CH_3COOH ইত্যাদি।

২. **অ্যানায়নিক শ্রেণীর অম্ল :** HSO_4^-, HCO^-_3, HPO_4^{2-}, HS^- ইত্যাদি।

৩. **ক্যাটায়নিক শ্রেণীর অম্ল :** H_3O^+, NH_4^+ $CH_3COOH_2^+$

অপরদিকে প্রোটন গ্রহণের প্রবণতা অনুসারে ক্ষারক সমূহ নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীভুক্ত হতে পারে। যেমন–

১. **আণবিক শ্রেণীর ক্ষারক :** NH_3, H_2O, CH_3COOH

২. **অ্যানায়নিক শ্রেণীর ক্ষারক :** OH^-, S^{2-}, CO_3^{2-}, Cl^-, Br^-, NO_3^- ইত্যাদি।

মতবাদের বৈশিষ্ট্য : ব্রনস্টেডের সংজ্ঞা অনুযায়ী যে সব পদার্থকে অম্ল বলা হয়, অ্যারহেনিয়াস সূত্র অনুযায়ীও সেগুলো অম্ল (যেমন HCl) কিন্তু ব্রনস্টেডের সূত্রানুযায়ী অনেক পদার্থ ক্ষারক হিসেবে চিহ্নিত হলেও অ্যারহেনিয়াস সূত্রানুযায়ী সেগুলো ক্ষারক নয়; যেমন NH_3, H_2O প্রভৃতি। অ্যারহেনিয়াস মতবাদে দ্রাবক হিসেবে পানির ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু ব্রনস্টেড মতবাদে কোন নির্দিষ্ট দ্রাবকের উল্লেখ নেই।

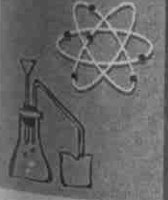

খ প্রাত্যহিক জীবনে এসিড ও ক্ষারকের ব্যবহার এবং এর সাবধানতা, এসিডের অপব্যবহারে সামাজিক প্রভাব, পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন

Uses of acids and bases in daily life and caution in handling them, social effects of misuse of acids, Reason for acidity in stomach and selection of the right food.

○ প্রশ্ন-১৪. নিম্নলিখিত ফলগুলোর বিভিন্ন ধরনের এসিডের উপস্থিতিগুলোর নাম লিখুন।

আঙ্গুর, কমলা, লেবু, তেঁতুল, টমেটো, চা, ভিনেগার, আমলকী, আপেল, আনারস।

উত্তর :

ফলের নাম	উপস্থিত এসিড
আঙ্গুর, কমলা, লেবু	সাইট্রিক এসিড
তেঁতুল	টারটারিক এসিড
টমেটো	অক্সালিক এসিড
চা	ট্যানিক এসিড
ভিনেগার	এসিটিক এসিড
আমলকী	এসকরবিক এসিড
আপেল, আনারস	ম্যালিক এসিড

● প্রশ্ন-১৫. প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের ব্যবহার ও এর সাবধানতাগুলো লিখুন।

উত্তর : বোলতা বা বিচ্ছু হুল ফুটালে প্রচণ্ড জ্বালা করে কেন? এর কারণ হলো বোলতা ও বিচ্ছুর হুলে থাকে হিস্টামিন (Histamine) নামক ক্ষারক পদার্থ। তাই এসব ক্ষেত্রে জ্বালা নিবারণের জন্য যে মলম ব্যবহার করা হয়, তাতে থাকে ভিনেগার বা বেকিং সোডা, যেগুলো এসিড। এরা ঐ ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে ক্ষারককে নিষ্ক্রিয় করে; ফলে জ্বালা আর থাকে না।

আবার আমরা প্রায় সবাই সাধারণত মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি ইত্যাদি খাবার খাওয়ার পর পেপসি, স্প্রাইট বা কোকাকোলা জাতীয় কোমল পানীয় পান করি। এটা কি আমাদের কোনো কাজে আসে?

আসলে খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট মাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। এই মাত্রার হেরফের হলে আমাদের বদহজম হয় বা খাবার হজমে অসুবিধা হয়। কোমল পানীয়সমূহে থাকে দ্রবীভূত বেকিং সোডা ($NaHCO_3$)। বেশি প্রোটিনযুক্ত খাবার খেলে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় কোমল পানীয় পান করলে এতে থাকা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট অতিরিক্ত এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে। ফলে পাকস্থলীতে এসিডের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে বদহজম হয় না। উল্লেখ্য, বেকিং সোডাও কিন্তু একটি এসিড। কিন্তু HCl অনেক শক্তিশালী এসিড বলে এদের মধ্যে বিক্রিয়া হয়।

$$NaHCO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$$

লেবু, কমলা, আপেল, পেয়ারা, আমলকী, কামরাঙ্গা ইত্যাদি নানা রকম ফলে আছে নানা রকমের জৈব এসিড, যেগুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আবার কিছু কিছু এসিড আছে, যারা রোগ প্রতিরোধও করে। যেমন– ভিটামিন সি বা এসকরবিক এসিড। ভিটামিন সি ক্ষত সারাতে খুবই সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের শরীরে এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়

আম, জলপাই ইত্যাদি নানা রকম আচার সংরক্ষণে যে এসিড ব্যবহার করা হয় তা হলো ভিনেগার বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH)।

বিয়ে বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর বোরহানি বা দই খেলে কোন লাভ হয় কি? হ্যাঁ, কোমল পানীয়ের মতো বোরহানি বা দই খেলে এতে বিদ্যমান ল্যাকটিক এসিড হজমে সহায়তা করে।

কেক, বিস্কুট বা পাউরুটি ফোলানো হয় বেকিং সোডা ব্যবহার করে। তাপ দিলে বেকিং সোডা ভেঙে কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়, যা কেক বা পাউরুটিকে ফুলিয়ে তোলে। আমরা টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য যেসব পরিষ্কারক ব্যবহার করি, এর মূল উপাদান হলো শক্তিশালী এসিড, যেমন– HCl, HNO_3, H_2SO_4। আবার সৌর বিদ্যুৎ তৈরির জন্য সৌর প্যানেলের জন্য বা বাসাবাড়িতে আইপিএস (IPS) চালানোর জন্য বা গাড়িতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, তাতে অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড।

ফসল উৎপাদনের জন্য সার হলো অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। সার হিসেবে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি তার অন্যতম হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3) অ্যামোনিয়াম সালফেট [$(NH_4)_2SO_4$] ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট [$(NH_4)_3PO_4$], আর সার কারখানায় এদেরকে তৈরি করা হয় যথাক্রমে নাইট্রিক এসিড (HNO_3), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ও ফসফরিক এসিড [$H_3(PO_4)$] থেকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নানা রকম এসিড। তাই আমাদের জীবনে এসিডের ভূমিকা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। তবে কিছু কিছু এসিড, বিশেষ করে শক্তিশালী এসিডসমূহ (যেমন– H_2SO_4, HNO_3, HCl) মানবদেহের জন্য যেমন মারাত্মক ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রেরও ক্ষয় সাধন করে। আমাদের শরীরে কোথাও লাগলে সেই স্থান পুড়ে যায় ও ক্ষত সৃষ্টি করে। এসিড ছুড়লে মানুষের শরীর ঝলসে যায়। অন্যদিকে কাপড়ে লাগলে কাপড়ও পুড়ে যায় ও ছিদ্র হয়ে যায়। একইভাবে ধাতব পদার্থসমূহ এসিডের সংস্পর্শে আসলে তাও ক্ষয় হয়ে যায়। অতএব এসিডের ব্যবহারে আমাদের খুবই সাবধান হতে হবে।

● প্রশ্ন-১৬. এসিডের অপব্যবহার, আইন কানুন ও সামাজিক প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : এসিডের অপব্যবহার, আইনকানুন ও সামাজিক প্রভাব : আমাদের সমাজের কিছু দুষ্ট চরিত্রের মানুষ এসিডকে মানুষের শরীরে ছুড়ে মেরে একদিকে যেমন মারাত্মক অপরাধ করছে, অন্যদিকে তেমনি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ– এসিডের অপব্যবহার করছে। এসিড ছুড়ে মারার ফলে মানুষের শরীর সম্পূর্ণ ঝলসে যায়। ফলে মুখমণ্ডলে এসিড ছুড়লে তা বিকৃত আকার ধারণ করে। এ কারণে এসিড-সন্ত্রাসের যারা শিকার হন (যারা সাধারণত নারী), তারা বিকৃত চেহারা নিয়ে জনসম্মুখে আসতে চায় না, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা এসিড সন্ত্রাসের শিকার হন, তাদের বেশির ভাগই স্কুল কলেজের ছাত্রী বা গৃহবধূ। ফলে দেখা যাচ্ছে, যে এসিড-সন্ত্রাসের কারণে অনেক সম্ভাবনাময় ও মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে গৃহবধূরা এর শিকার হলে একটি পরিবারে নেমে আসছে দুর্বিষহ জীবন। তাই এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে এবং মানুষকেও সচেতন করতে হবে।

এসিড ছুড়লে শাস্তি : এসিড ছোড়া একটি মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। এসিড যে ছোড়ে, সে একদিকে যেমন অন্যের ক্ষতিসাধন করছে, অন্যদিকে নিজেও শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। তাই আমাদের সব মানুষকে এসিড ছোড়ার ভয়াবহতার কথা বোঝাতে হবে। বাংলাদেশের অনেক এলাকা আছে, যেখানে কয়েকটি গ্রামজুড়ে হয়তো একজন ভালো ছাত্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে। ঐ ছাত্রীটি এসিড-সন্ত্রাসের শিকার হলে তা মূলত ঐ অঞ্চলের জন্য অর্থাৎ দেশের জন্যই এক অপূরণীয় ক্ষতি।

● প্রশ্ন-১৭. পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন : পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য আমাদের হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। আর কোনো কারণে যদি এই এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন ঐ অবস্থাকেই আমরা পাকস্থলীর এসিডিটি বলি। নানাবিধ কারণে পাকস্থলীতে এসিডিটির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে, যার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্যদ্রব্য। আমরা যেসব পানীয় ও ফলের রস পান করি, তার প্রায় সবই অম্লীয়। কাজেই এসব পানীয় বেশি মাত্রায় পান করলে বা খালি পেটে পান করলে তা এসিডিটি সৃষ্টি করে। অন্যান্য পানীয় বিশেষ করে চা, কফি বা মদজাতীয় পানীয়সমূহও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়ায়। ভাজা পোড়া, তেলযুক্ত ও চর্বি জাতীয় খাবারও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। আমেরিকার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী পেয়াজ, রসুন, মরিচ ও অন্যান্য অতিরিক্ত মসলাযুক্ত খাবার, চকলেট— এগুলোও এসিডিটি তৈরির কারণ।

খাদ্য ছাড়াও আরো কিছু কারণে এসিডিটি বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো দুশ্চিন্তা, নিয়মিত সময়মতো খাবার না খাওয়া, এমনকি প্রয়োজনমাফিক ঘুম না হলেও এসিডিটি হতে পারে। আবার কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণও এসিডিটির কারণ হতে পারে।

উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করে কীভাবে এসিডিটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় :

প্রথমত, যেসব খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়ের কারণে এসিডিটি হয়, সেগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ না করে পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সাময়িকভাবে ঐ সব খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত, বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে যেগুলো কিছুটা ক্ষার ধর্মী এবং ফলে এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করতে পারে। ঐসব খাদ্য গ্রহণ করে আমরা এসিডিটির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। এসব খাদ্যের মধ্যে রয়েছে বেশির ভাগ শাকসবজি। যেমন– পুঁইশাক, পালংশাক, গাজর, শিম, বীট, লেটুসপাতা, অ্যাসপারাগাস, মাশরুম, ভুট্টা, আলু, ফুলকপি ইত্যাদি। অন্যদিকে ক্ষার ধর্মী ফলমূল যেমন– কিশমিশ, খেজুর, পেঁপে, কিউরি, নাসপাতি, তরমুজ, পিচ, স্ট্রবেরি এগুলো এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে।

আবার কিছু কিছু খাদ্য খাদ্যশস্য আছে (যেমন– ডাল, দেয়া ধান, মিষ্টি ভুট্টা), যারা এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে। দুধ জাতীয় খাবারের মধ্যে মাখন, ছাগলের দুধ থেকে তৈরি করা মাখন, সয়া দুধ, বাদাম দুধ, এগুলোও ক্ষার ধর্মীয়, যা এসিডিটি নষ্ট করতে পারে। নানা রকমের বাদাম, হারবাল চা, সবুজ চা, আদা চা খেয়েও অতিরিক্ত এসিড কমানো যায়।

○ প্রশ্ন-১৮. প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারকের ব্যবহার ও সাবধানতা আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারকের ব্যবহার ও সাবধানতা : আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারকের ব্যবহার ব্যাপক। পিপড়ার কামড়ের মাধ্যমে মূলত ফরমিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা আমাদের শরীরে জ্বালা-পোড়া সৃষ্টি করে। আর মৌমাছি হুল ফুটালে ফরমিক এসিড, মেলিটিন (Melettin) ও অ্যাপামিন (Apamin) নামক এসিডিক পদার্থ নিঃসৃত হয়, যার কারণে জ্বালা-পোড়াও হয় আবার আক্রান্ত স্থান ফুলেও যায়।

পিপড়া কামড়ালে বা মৌমাছি হুল ফুটালে জ্বালা-পোড়ার কারণ হচ্ছে এসিড, তাই আমরা এসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে এরকম মলম বা লোশন ব্যবহার করতে পারি। এরকম একটি লোশন হলো ক্যালামিন (Calamine), যা মূলত জিংক কার্বোনেট ($ZnCO_3$)। বেকিং সোডা ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যায়। এই ক্যালামিন ও বেকিং সোডা হলো ক্ষারক। ক্ষারকের আরও কিছু ব্যবহার হলো :

মাটির এসিডিটি দূর করতে : মাটিতে এসিডিটি বাড়লে উর্বরতা নষ্ট হয়। তখন ক্ষারক ব্যবহার করে এসিডিটিকে প্রশমিত করা যায় ও উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ক্ষারক হলো চুন (CaO), স্ন্যাক লাইম [$Ca(OH)_2$]। অবশ্য এ কাজে চুনাপাথরও ($CaCO_3$) ব্যবহার করা হয়।

বাসাবাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে অ্যামেনিয়াম হাইড্রোক্সাইড বহুল ব্যবহৃত হয়। টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ক্ষারীয়। খাওয়ার পরে সাধারণত আমাদের মুখে এসিডীয় অবস্থা তৈরি হয়। আর টুথপেস্ট বা পাউডার দিয়ে ব্রাশ করলে একদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, অন্যদিকে তেমনি পেস্ট বা পাউডারের ক্ষারক সৃষ্ট এসিডকে নিষ্ক্রিয় করে। ফলে দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়।

আবার থালা-বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে শক্ত সাবান, তরল সাবান ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, সেগুলোতে ক্ষারক থাকে। এমনকি আমরা যে কাপড় কাচার সাবান ব্যবহার করি, তা তৈরি করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে। একইভাবে সেভিং ফোম বা নরম সাবান ব্যবহার করি, তা তৈরি করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে।

গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা এসিডিটির কারণে আমরা যে এন্টাসিড খাই তা হলো ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড নামের ক্ষারক।

ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা : নিজেদের জামাকাপড় পরিষ্কার করার সময় একটু বেশি কাপড় একসাথে পরিষ্কার করলে দেখা যায়, হাতের তালু থেকে ছোট ছোট চামড়া উঠে যায়। এর জন্য দায়ী হলো সাবানে থাকা ক্ষার। এসিড যেমন মানুষের শরীরে ছুড়লে ক্ষতি হয়, তেমনি ক্ষারক শরীরের ক্ষতি করে। তাই ক্ষারীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করার সময় হাতে মোজা ও গায়ে অ্যাপ্রোন পরে নেওয়া উত্তম।

○ প্রশ্ন-১৯. ফরমালিন বলতে কি বুঝায়? এটিকে কি কাজে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : ফরমালিন : ফরমালিন হলো মিথান্যাল তথা ফরমালডিহাড (H-CHO)-এর একটি জৈব যৌগ যা পচন নিবারক দ্রবণ হিসেবে কাজ করে। সাধারণ অবস্থায় মিথান্যাল গ্যাসীয় তবে পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়। মিথান্যাল থেকে উৎপন্ন মিথান্যাল গ্যাসকে পানির মধ্যে দ্রবীভূত করে ৩০-৪০% জলীয় দ্রবণ তৈরি করা হয়। মিথান্যালের এ ৩০-৪০% জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন বলা হয়।

ফরমালিনের ব্যবহার :

১. ফরমালিন একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক।
২. পরীক্ষাগারে জীববিজ্ঞানের নমুনা সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
৩. মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্যও ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।
৪. চামড়া সংরক্ষণেও ফরমালিন ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-২০. পেটে গ্যাস হলে কার্বন ট্যাবলেট সেবন করতে হয় কেন?

উত্তর : পেটে গ্যাস হলে যদি কার্বন ট্যাবলেট সেবন করা হয় তাহলে ট্যাবলেট গ্যাসকে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত করে। নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে যায় বলে রোগী আরাম বোধ করে।

○ প্রশ্ন-২১. পাকস্থলীতে যে এসিড হয় এটি কি?

উত্তর : পাকস্থলীতে যে এসিড হয় তা হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)। হাইড্রোক্লোরিক এসিড পাকস্থলীতে উপস্থিত থেকে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেনকে সক্রিয় পেপসিনে পরিণত করে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড শর্করা পরিপাকে সাহায্য করে।

○ প্রশ্ন-২২. সাবান ও ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ক. উচ্চতর জৈব এসিডের সোডিয়াম/পটাশিয়াম লবণই সাবান। আর ডিটারজেন্ট হলো হাইড্রোকার্বনের সালফোনিক এসিডের সোডিয়াম লবণ।

খ. খর পানিতে সাবান কাজ করতে পারে না। কিন্তু ডিটারজেন্ট খর পানিতে সহজেই কাজ করতে পারে।

গ. সাবান দিয়ে কাপড় কাঁচতে গেলে সময় বেশি লাগে এবং এটা শ্রমসাধ্য। অথচ ডিটারজেন্ট দিয়ে স্বল্প সময়ে এবং অনায়াসে কাপড় কাঁচা যায়।

○ প্রশ্ন-২৩. লেবুর রস ও সিরকা কি ধরনের এসিড?

উত্তর : লেবুর রসে সাইট্রিক এসিড এবং সিরকায় এসিটিক এসিড বিদ্যমান।

গ

পিএইচ, বস্তুর pH-এর পরিমাপ ও গুরুত্ব

pH, measurement and importance of pH of substances

প্রশ্ন-২৪. pH কি?

উত্তর : কোনো দ্রবণের হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) ঋণাত্মক লগারিদমকে pH বলে।

অর্থাৎ $pH = -\log [H^+]$

এখানে H^+ এর মাত্রা কমলে pH মান বাড়ে, তখন দ্রবণটি এসিডিও হয়। আবার H^+ এর মাত্রা বাড়লে pH মান কমে, তখন দ্রবণটি ক্ষারকীয় হয়।

প্রশ্ন-২৫. ধমনির রক্তের pH কত? বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : আমাদের ধমনির রক্তের pH হলো প্রায় ৭.৪। এর সামান্য হেরফের হলে (~ ০.৪) মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। আবার আমাদের জিহবার লালার pH ৬.৬-এর কাছাকাছি থাকলে তখন তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আবার আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য দরকারি pH হলো ২। এই মান ০.৫-এর মতো হেরফের হলেই তা বদহজম সৃষ্টি করে। আমাদের প্রস্রাবের pH ৭-এর কম থাকা স্বাভাবিক। মাটির pH সাধারণত ৪-৮ হয়ে থাকে। মাটির pH ৩-এর কম অর্থাৎ এসিডিক হলে মাটির অনেক দরকারি উপাদান যেমন– ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মাটি থেকে চলে যায়। ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এসিডিক মাটির জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যদিকে মাটি খুব ক্ষারীয় হলে অর্থাৎ pH-এর মান ৯.৫-এর বেশি হলেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে Al^{3+} (অ্যালুমিনিয়াম আয়ন) সহজে মাটি থেকে গাছের মূলে চলে যায় এবং এতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ক্ষারীয় মাটির জন্য নাইট্রেট ও ফসফেট জাতীয় সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষার অর্থাৎ pH খুব কমে গেলে বা বেড়ে গেলে মাটিতে থাকা উপকারী অনেক অণুজীব মারা যায়, ফলে গাছপালার জৈবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়।

বাজারে মুখ ধোয়ার জন্য যেসব প্রসাধন সামগ্রী পাওয়া যায় তাতে লেখা থাকে pH ৫.৫-এর কারণ আমাদের ত্বক সাধারণত এসিডিক হয় এবং এর pH ৪-৬ এর মধ্যে থাকে। তবে নবজন্ম নেয়া শিশুদের ত্বকের pH ৭-এর কাছাকাছি থাকে। তাই বড়দের জন্য যেসব প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়, তা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এতে শিশুদের ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে।

বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় pH নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানারকম ঔষধ, কলমের কালি, বেকারিতে লজেন্স জাতীয় মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য, চামড়া প্রস্তুতি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক। এছাড়া আলোকচিত্র-সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, রং তৈরি ও ব্যবহারে, ধাতব পদার্থের ইলেকট্রোপ্লেটিং ইত্যাদি হাজারো ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা হয়।

প্রশ্ন-২৬. pH এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : **pH এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা :** কোনো একটি পদার্থ এসিড, ক্ষার না নিরপেক্ষ তা নির্দেশক ব্যবহার করে জানা যায়। কিন্তু তাতে কি পরিমাণ এসিড বা ক্ষার আছে সেটি বুঝা যায় pH এর মান পরিমাপ করে। কোনো একটি জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার নেগেটিভ লগারিদমকে pH বলে।

নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি যেখানে কোনো এসিড বা ক্ষার থাকে না, তার pH হয় ৭। আর যদি এতে এসিড যোগ করা হয় তাহলে pH-এর মান কমে যায়। যত বেশি এসিড যোগ করা যায়, pH-এর মান ততই কমে যায়। পক্ষান্তরে যদি বিশুদ্ধ পানি বা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণে ক্ষার যোগ করা হয়, তাহলে এর pH বাড়তে থাকে। যত বেশি ক্ষার যোগ করা হয়, pH-এর মান ততই বাড়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়–

কোনো দ্রবণের $pH = 7$ হলে তা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি হবে।

কোনো দ্রবণের $pH < 7$ হলে তা অম্লীয় বা এসিডীয় দ্রবণ হবে।

কোনো দ্রবণের $pH > 7$ হলে তা ক্ষারীয় দ্রবণ হবে।

মানবদেহ থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এমনকি রাসায়নিক শিল্পে pH-এর মান জানা ও নিয়ন্ত্রণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-২৭. প্রশমন বিক্রিয়া কি? এর প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : **প্রশমন :** পাকস্থলীর এসিডিটির জন্য পেটের ব্যথা হলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড নাম এন্টাসিড খেলে ব্যথা সেরে যায়। কারণ হলো, এসিডিটির জন্য দায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রশমন বিক্রিয়া ঘটে যার ফলে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ব্যথা আর থাকে না। বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো :

$$2HCl + Mg(OH)_2 \rightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$

$$3HCl + Al(OH)_3 \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

আবার চুন (CaO) ও স্ল্যাক লাইম [$Ca(OH)_2$] দিয়ে মাটির যে এসিডিটি দূর করে উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়, সেটিও হয় প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যা নিচে দেখানো হলো :

$$CaO + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$$

$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2H_2O$$

প্রয়োজনীয়তা : খাওয়ার পরে আমাদের মুখে এসিড তৈরি হয় আর টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে এসিডজনিত কারণে দাঁতের ক্ষয়রোধ হয়। এখানেও কিন্তু একধরনের প্রশমন বিক্রিয়াই ঘটে। টুথপেস্টের pH সাধারণত ৯-১১ এর মধ্যে হয় অর্থাৎ এরা ক্ষারীয় এবং এতে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, বেকিং সোডা, টেট্রাসোডিয়াম পাইরোফসফেট জাতীয় পদার্থ থাকে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশমন বিক্রিয়া আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রশ্ন-২৮. পানির আয়োনিক গুণফল কি?

উত্তর : বিজ্ঞানী কোলরাস্ ও হেডউইলার (Kohlrausch ও Heydweiller 1894) বিশুদ্ধ পানির পরিবাহিতা নির্ণয় করে দেখান যে, অতি বিশুদ্ধ পানি অতি সামান্য মাত্রায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে। অতএব বিশুদ্ধ পানি অল্পমাত্রায় নিম্নরূপে বিয়োজিত হয় :

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ [সঠিকভাবে $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$]

ভরক্রিয়া সূত্র মতে, $K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$: এখানে H_2O = ঘনমাত্রা বোঝায়

প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিমাণে বিয়োজনের ফলে পানির ঘনমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। তাই $[H_2O]$ এর মান ধ্রুবক ধরা হয়।

সুতরাং $[H^+][OH^-] = K[H_2O] = K_w =$ ধ্রুবক

K_w কে পানির আয়নিক গুণফল বলা হয়। বিভিন্ন তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফল (K_w) এর মান সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন হয়। 25°C তাপমাত্রায় পানির গুণফল (K_w) এর মান 1×10^{-14} ধরা হয়। পানি বিয়োজিত হলে সমান সংখ্যক H^+ ও OH^- উৎপন্ন হয়। তাই বিশুদ্ধ পানিতে H^+ ও OH^- এর ঘনমাত্রা সমান থাকে। আবার $[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$

$\therefore [H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

যেহেতু বিশুদ্ধ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোক্সিল আয়ন সমান থাকে, তাই এ অবস্থায় পানিকে নিরপেক্ষ যৌগ বলা হয়। পানির আয়নিক গুণফলের সম্পর্ক থেকে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা প্রকাশের জন্য pH স্কেল নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২৯. pH স্কেল কি?

উত্তর : আমরা জানি 1M HCl দ্রবণে $[H^+] = 1 \text{mol ion } L^{-1}$। সুতরাং 1M HCl দ্রবণের pH $= -\log[H^+] = -\log 1 = -\log 10^0 = 0$। যেহেতু 1M HCl এর pH = 0, সুতরাং pOH = 14। আবার, 1M NaOH দ্রবণের pH = 14; pOH = 0। সাধারণভাবে গবেষণাগারে 1(M) দ্রবণের বেশি ঘনমাত্রার দ্রবণ ব্যবহার করা হয় না। সুতরাং যে কোনো জলীয় দ্রবণের pH(ও pOH) এর মান 0 থেকে 14 এর মধ্যে থাকবে। বিভিন্ন pH বা pOH এর মানের দ্রবণের অবস্থা নিম্নোক্ত চিত্র দ্বারা সহজে বোঝা যায়।

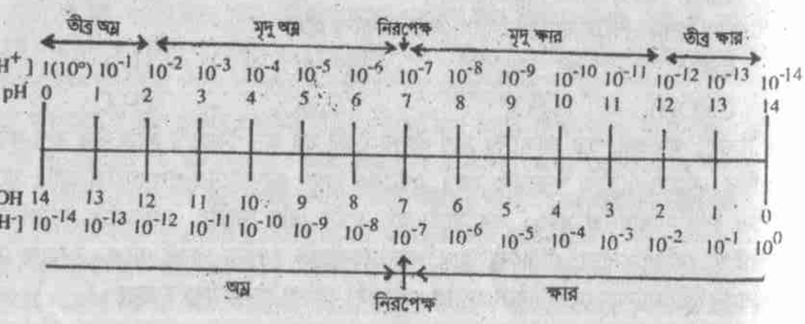

চিত্র : pH স্কেল

○ প্রশ্ন-৩০. বাফার দ্রবণ কি?

উত্তর : বাফার দ্রবণ : যে দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH এর মান অপরিবর্তিত থাকে অর্থাৎ যে দ্রবণের এর pH স্থির রাখার ক্ষমতা আছে তাকে বাফার দ্রবণ বলা হয়। সাধারণত একটি দুর্বল এসিডের সাথে সবল ক্ষারের তার লবণ যোগ করে বা একটি দুর্বল ক্ষারকের সাথে সবল অম্লের তার লবণ যোগ করে বাফার দ্রবণ তৈরি করা হয়।

ঘ লবণ, লবণের বৈশিষ্ট্য, প্রাত্যহিক জীবনে লবণের প্রয়োজনীয়তা, কৃষি ও শিল্প কারখানায় লবণের ব্যবহার

Salts, characteristics of salts, necessity of salt in daily life, uses of salts in agriculture and industries

○ প্রশ্ন-৩১. লবণ কি?

উত্তর : এসিড ও ক্ষার বা ক্ষারকের বিক্রিয়ার ফলে পানির সাথে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাই হলো লবণ। যেমন :

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{NaOH} + \underset{\text{এসিড}}{HCl} \rightarrow \underset{\text{লবণ}}{NaCl} + \underset{\text{পানি}}{H_2O}$$

○ প্রশ্ন-৩২. লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : লবণ হলো এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ।

$$NaHCO_3 \rightarrow Na^+ + H^+ + CO_3^{2-}$$

আবার সোডিয়াম কার্বোনেটের (Na_2CO_3) এ জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় এবং তা লাল লিটমাসকে লাল করে। এর কারণে হলো, পানিতে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও কার্বোনিক এসিড তৈরি করি। কিন্তু উৎপন্ন কার্বোনিক এসিড দুর্বল এসিড হওয়ায় তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয় না, আংশিকভাবে বিয়োজিত হয়। পক্ষান্তরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি শক্তিশালী ক্ষার বলে তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি করে। ফলে দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়নের আধিক্য থাকে আর সে কারণেই দ্রবণ ক্ষারীয় হয় এবং লাল লিটমাসকে নীল করে, কার্বোনেট লবণসমূহ এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অন্য একটি লবণ, কার্বন-ডাইঅক্সাইড গ্যাস ও পানি তৈরি করে।

$$Na_2CO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$$
$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

প্রায় সব লবণই কঠিন এবং উচ্চ গলনাংক ও স্ফুটনাংক বিশিষ্ট হয়। বেশির ভাগ লবণই পানিতে দ্রবণীয়,তবে কিছু কিছু লবণ আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যেমন— ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$), সিলভার সালফেট ($AgSO_4$), সিলভার ক্লোরাইড ($AgCl$)।

○ প্রশ্ন-৩৩. প্রাত্যহিক জীবনে লবণের ব্যবহারগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : লবণের ব্যবহার : লবণ ছাড়া তরি-তরকারি রান্না করলে খুবই বাজে স্বাদযুক্ত হবে এবং আমরা অনেকেই তা খেতে পারব না। যে লবণ আমাদের খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তোলে, তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl), যা সাধারণ লবণ বা টেবিল লবণ নামেও পরিচিত। তরি-তরকারি ছাড়াও আরো অনেক খাবার যেমন— পাউরুটি, আচার, চানাচুর ইত্যাদি খাবার লবণ ব্যবহার করা হয়। খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করার জন্য আরেকটি লবণ সোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহার করা হয়, যা 'টেস্টিং সল্ট' নামে পরিচিত।

আমরা কাপড় কাচার যে সাবান ব্যহার করি তা হলো মূলত সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) আর সেভিং ফোম বা জেলে থাকে পটাসিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COOK$)। কাপড় কাচার সোডা হিসেবে আমরা যে সোডিয়াম কার্বোনেট ($Na_2CO_3.10H_2O$) ব্যবহার করি তাও একটি লবণ। আবার আমরা জীবাণুনাশক যে তুঁতে বা ফিটকিরি ব্যবহার করি, সেগুলোও লবণ।

কৃষিতে লবণের ব্যবহার : মাটির এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমরা যে চুনাপাথর ব্যবহার করি, এই চুনাপাথর একটি লবণ। আবার আমরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যহার করে থাকি, তাদের বেশির ভাগই হলো লবণ। যেমন— অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম ফসফেট [$(NH_4)_3PO_4$], পটাসিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) ইত্যাদি।

তুঁতে বা কপার সালফেট ($CuSO_4.5H_2O$) কৃষিজমিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধে বহুল ব্যবহৃত একটি লবণ। এটি শৈবালের উৎপাদন বন্ধে খুব কার্যকরী।

শিল্প-কারখানায় লবণ : শিল্প-কারখানায় নানা কাজে খাবার লবণ অপরিহার্য। যেমন—চামড়াশিল্পে চামড়ার ট্যানিং করতে, মাখন ও পনিরের শিল্পোৎপাদন, কাপড় কাচার সোডা ও খাবার সোডা তৈরি করতে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজে খাবার লবণ ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু লবণ যেমন– তুঁতে, মারকিউরিক সালফেট ($HgSO_4$), সিলভার সালফেট ($AgSO_4$) শিল্প - কারখানায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টেক্সটাইল ও রং তৈরির কারখানায় রং ফিক্স করার কাজে লবণ প্রয়োজন হয়। ধাতুর বিশুদ্ধকরণে লবণ লাগে। রাবার প্রস্তুতিতে রাবারকে ল্যাটেক্স থেকে আলাদা করা হয় লবণ ব্যবহার করে। ঔষধ কারখানায় স্যালাইন ও অন্যান্য ঔষধেও লবণ ব্যবহৃত হয়। ডিটারজেন্ট তৈরিতেও ফিলার হিসেবে লবণ অত্যাবশক। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্প-কারখানায় লবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

○ প্রশ্ন-৩৪. খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/গুড় ও লবণের প্রয়োজন কি?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও বিভিন্ন ধরনের লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে লবণ ও পানির অভাব দেখা দেয় এবং শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। লবণের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য খাবার স্যালাইনে কয়েকটি ধাতুর লবণ ব্যবহৃত হয়। আবার চিনি ও গুড় হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যা দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। যেহেতু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেজন্য তার শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিনি বা গুড় খাবার স্যালাইনের সাথে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৩৫. পানিতে লবণ যোগ করে তাড়াতাড়ি আলু সিদ্ধ করা যায় কেন?

উত্তর : লবণ পানিতে আলু সিদ্ধ করলে লবণ ব্যাপনের মাধ্যমে আলুর কোষে প্রবেশ করে এবং আলুর কোষপ্রাচীর ও খোসাকে নরম করে তোলে। ফলে তাপের প্রভাবে আলু অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।

○ প্রশ্ন-৩৬. খাবার লবণের সাথে বর্তমানে কি মেশানো হয় এবং কেন?

উত্তর : খাবার লবণের সাথে বর্তমানে আয়োডিন মেশানো হয়। গলগণ্ডসহ আয়োডিনের অভাবজনিত বিভিন্ন রোগের প্রতিকারের জন্য এটি লবণের সাথে মেশানো হয়।

অধ্যায় ০৫

পানি
Water

***Syllabus— Water :** Properties of water; melting and boiling points of water; electrical conductivity; structure of water; hydrogen bonding; sources of water; sources of fresh water in Bangladesh; water quality parameters (colour and taste; turbidity; presence of radioactive substances; presence of waste; dissolved oxygen; temperature; pH and salinity); recycling of water; role of water in conservation of nature; necessity of quality water; purification of water (filtration; chlorination; boiling and distillation); reasons for pollution of water sources in Bangladesh; effects of water pollution on plants, animals and human beings; effects of global warming on fresh water; strategy for preventing water pollution and responsibility of citizens or public awareness; prevention of water pollution by industries; prevention of water pollution due to soil erosion from agricultural land; conservation of water sources and development.*

ক পানির বৈশিষ্ট্য, পানির গলনাংক ও স্ফুটনাংক, বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা, পানির গঠন, হাইড্রোজেন বন্ধন

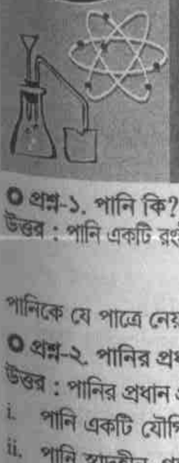

Properties of water, melting and boiling points of water, electrical conductivity, structure of water, Hydrogen bonding

○ প্রশ্ন-১. পানি কি?

উত্তর : পানি একটি রংহীন, গন্ধহীন যৌগিক পদার্থ। এটি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত। যেমন :

$$2H_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2(g)} \rightarrow H_2O_{(l)}$$

পানিকে যে পাত্রে নেয়া হয় তা সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

○ প্রশ্ন-২. পানির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

i. পানি একটি যৌগিক পদার্থ। এটা দুই অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত।
ii. পানি স্বাদহীন, গন্ধহীন পদার্থ।

iii. পানির নিজস্ব কোনো বর্ণ নেই। ইহাকে যে পাত্রে রাখা হয়, সে পাত্রের আকার ধারণ করে।
iv. পানির সান্দ্রতা ধর্ম বিদ্যমান।
v. পানির প্রধান ধর্ম হলো, সর্বদা নিচের দিকে প্রবাহিত হয়।
vi. পানি একটি উভধর্মী অক্সাইড।

প্রশ্ন-৩. পানি একটি উভধর্মী অক্সাইড ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রোটনীয় মতবাদ অনুসারে, যেসব অণু বা আয়ন অবস্থাভেদে প্রোটন দাতা ও প্রোটন গ্রহীতা উভয় প্রকার আচরণ করে, তাদেরকে উভধর্মী যৌগ বা অ্যাম্পোটেরিক (amphoteric) বা অ্যাম্পিপ্রোটিক (amphiprotic) পদার্থ বলা হয়। এসব পদার্থের মধ্যে H_2O, HCO_3^-. HSO_4^- উল্লেখযোগ্য। যেমন : পানি (H_2O) অ্যামোনিয়াকে প্রোটন দান করে অম্ল রূপে এবং HCl থেকে প্রোটন গ্রহণ করে ক্ষারক রূপে ক্রিয়া করে। তাই H_2O একটি উভধর্মী বা অ্যাম্পিপ্রোটিক পদার্থ।

$$\underset{\text{ক্ষারক}}{NH_3} + \underset{\text{অম্ল}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{অ্যামোনিয়াম আয়ন}}{NH_4^+} + OH^-$$

$$\underset{\text{অম্ল}}{HCl} + \underset{\text{ক্ষারক}}{H_2O} \rightleftharpoons \underset{\text{হাইড্রোনিয়াম আয়ন}}{H_2O^+} + Cl^-$$

প্রশ্ন-৪. সাধারণ পানি ও কঠিন পানির মধ্যে পার্থক্য কি? পানি খরতার কারণ কি? এবং কিভাবে তা দূর করা যায়?

উত্তর : সাধারণ পানি ও কঠিন পানির মধ্যে পার্থক্য : সাধারণ পানি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের যৌগ। দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে পানির অণু গঠিত হয়। অন্যদিকে ভারী পানি হলো অধিক ঘনত্বের পানি। হাইড্রোজেনের আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম (D) বা ভারী হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হয়ে কঠিন পানি উৎপন্ন হয়। দুই পরমাণু ডিউটেরিয়াম ও এক পরমাণু অক্সিজেন সংযোগে সৃষ্ট যৌগ হলো ডিউটেরিয়াম অক্সাইড (D_2O) বা কঠিন পানি।

পানি খরতার কারণ : যে পানিতে অনেক সাবান দেয়ার পরও সাবানের ফেনা হয় না তাকে খর পানি বলে। পানিতে ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও আয়রনের (Fe) দ্রবণীয় ক্লোরাইড, সালফেট ও হাইড্রোজেন কার্বনেটের উপস্থিতি থাকলে পানি খর হয়।

পানির খরতা দূরীকরণের উপায় :

১. পানিতে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের লবণকে রাসায়নিকভাবে অদ্রবীভূত লবণে পরিণত করে পানি থেকে পৃথক করলে পানির খরতা দূর হয়।
২. পানি ফুটিয়ে পানির অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।
৩. পানিতে সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করে খরতা দূর করা যায়।

প্রশ্ন-৫. গরম চায়ের পেয়ালার উপরের দিকে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যায় তা কি?

উত্তর : গরম চায়ের পেয়ালার উপরের দিকে ধোঁয়ার মতো যা দেখা যায় তা আসলে জলীয় বাষ্প। গরম চায়ের পেয়ালার পানি বাষ্পীভূত হবার সময় পেয়ালা থেকে প্রয়োজনীয় তাপ গ্রহণ করে বাষ্পীভূত হয়। এতে পেয়ালার চা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত পানি বাষ্পীভূত হবার জন্য প্রয়োজনীয় তাপ পেয়ালা থেকে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত পেয়ালার উপরে ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

প্রশ্ন-৬. গরম পানিতে পাতলা কাচের গ্লাসের চেয়ে মোটা কাচের গ্লাস সহজে ফেটে যায় কেন?

উত্তর : পুরু কাচের গ্লাসে গরম পানি ঢাললে ঐ গ্লাসের ভেতরের অংশ গরম পানির সংস্পর্শে প্রসারিত হয় কিন্তু কাচ তাপের কুপরিবাহী বলে ঐ তাপ বাইরের অংশে সঞ্চালিত হতে পারে না। তাই ভেতরের অংশ প্রসারিত হলেও বাইরের অংশ প্রসারিত হতে পারে না। ফলে প্রসারণ বলের জন্য গ্লাস ফেটে যায়। কিন্তু কাচ পাতলা হলে ভেতরের তাপ দ্রুত বাইরে যেতে পারে এবং কাচের প্রসারণ সব জায়গায় সমান হয়। ফলে গ্লাস ফাটে না।

প্রশ্ন-৭. হিমশৈল পানিতে ভাসে কেন?

উত্তর : পানি একটি তরল পদার্থ, যা জমে গিয়ে বরফে পরিণত হলে আয়তন বা আকারে বেড়ে যায় কিন্তু এর ওজন বা ঘনত্ব পানির ঘনত্বের নয়-দশমাংশ হয়। হিমশৈল বিশাল আয়তনের বরফ। তাই হিমশৈল পানির চেয়ে হালকা হয়। এ কারণেই হিমশৈলের নয়-দশমাংশ পানিতে ডুবে থাকলেও এর এক-দশমাংশ পানিতে ভেসে থাকে।

প্রশ্ন-৮. শীতকালে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন?

উত্তর : শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে। এ কারণে ভেজা কাপড়ের পানি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

প্রশ্ন-৯. H_2O_2 কিসের সংকেত?

উত্তর : হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড-এর রাসায়নিক সংকেত হলো H_2O_2। এটি এক ধরনের স্বচ্ছ তরল পদার্থ এবং পানি অপেক্ষা সামান্য আঠালো।

প্রশ্ন-১০. D_2O কি?

উত্তর : দুই পরমাণু ডিউটেরিয়াম ও এক পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো কঠিন পানি বা D_2O। সাধারণ পানির ঘনত্বের (১.০০৮) চেয়ে কঠিন পানির ঘনত্ব (১.১০৬) বেশি।

প্রশ্ন-১১. বরফ পানিতে ভাসে কেন?

উত্তর : বরফের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের তুলনায় কম এবং বরফের আয়তন পানির আয়তনের তুলনায় বেশি বলে বরফ পানিতে ভাসে। পানিতে বরফের $\frac{11}{12}$ অংশ পানির নিচে এবং $\frac{1}{12}$ অংশ পানির উপরে থাকে।

প্রশ্ন-১২. পানির গলনাংক ও স্ফুটনাংক আলোচনা করুন।

উত্তর : গলনাংক ও স্ফুটনাংক : পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে সেটিকে আমরা বরফ বলি। যে তাপমাত্রায় বরফ গলে যায়, সেটিই হলো গলনাংক। বরফের গলনাংক 0° সেলসিয়াস। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়, তাকে স্ফুটনাংক বলে। পানির স্ফুটনাংক ৯৯.৯৮° সেলসিয়াস যা ১০০° সেলসিয়াসের খুবই কাছাকাছি। তাই সাধারণভাবে আমরা পানির স্ফুটনাংক ১০০° সেলসিয়াস বলে থাকি।

বিশুদ্ধ পানি স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন হয়। পানির ঘনত্ব তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সর্বোচ্চ আর তা হলো ১ গ্রাম/সি.সি বা ১০০০ কেজি/মিটার৩ অর্থাৎ ১ সি.সি. পানির ভর হলো ১ গ্রাম বা ১ কিউবিক মিটার পানির ভর হলো ১০০০ কেজি।

○ প্রশ্ন-১৩. পানির পরিবাহিতা আলোচনা করুন।

উত্তর : বিশুদ্ধ পানি তড়িৎ পরিবহন করে না, তবে এতে তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ (যেমন– লবণ, এসিড) দ্রবীভূত থাকলে তড়িৎ পরিবহন করে। পানির একটি বিশেষ ধর্ম হলো এটি বেশিরভাগ অজৈব যৌগ ও অনেক জৈব যৌগকে দ্রবীভূত করতে পারে। এজন্য একে সর্বজনীন দ্রাবকও বলা হয়। পানি একটি উভধর্মী পদার্থ হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ কখনো এসিড, কখনো ক্ষার হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এসিডের উপস্থিতিতে পানি ক্ষার হিসেবে আর ক্ষারের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করে। তবে বিশুদ্ধ পানি পুরোপুরি নিরপেক্ষ অর্থাৎ এর pH হলো ৭।

○ প্রশ্ন-১৪. পানির গঠন আলোচনা করুন।

উত্তর : পানি দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু ও একটি অক্সিজেন পরমাণু দিয়ে গঠিত। পানির সংকেত হলো H_2O।

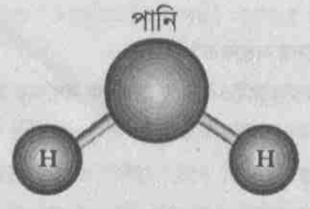

চিত্র : পানির গঠন

আমরা যে পানি দেখি, (আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে জানা গেছে, সেখানে অনেক পানির অণু ক্লাস্টার(Cluster) আকারে থাকে।

○ প্রশ্ন-১৫. হাইড্রোজেন (H) বন্ধন কি?

উত্তর : হাইড্রোজেন পরমাণু যখন উচ্চ ইলেকট্রোনিগেটিভ মৌল যেমন ফ্লুটিন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের সাথে মিলিত হয়ে সমযোজী যৌগ গঠন করে, তখন এদের বন্ধন ইলেকট্রনযুগল উচ্চ ইলেকট্রোনিগেটিভ মৌল কর্তৃক খুব বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে ঐ পরমাণুতে বেশি পরিমাণে আংশিক ঋণাত্মক চার্জ সৃষ্টি হয় এবং হাইড্রোজেন পরমাণুতে একই পরিমাণ ধনাত্মক চার্জের সৃষ্টি হয়। হাইড্রোজেন পরমাণুতে অন্য ইলেকট্রন না থাকায় এর নিউক্লিয়াসটি প্রকৃতপক্ষে ইলেকট্রনের আবরণ থেকে আংশিক মুক্ত হয়ে পড়ে। এ ধরনের পোলার অণুসমূহ যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন একটি অণুর হাইড্রোজেন প্রান্ত অন্য অণুর ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে একটি দুর্বল বন্ধন সৃষ্টি করে। এই দুর্বল আকর্ষণকে হাইড্রোজেন বন্ধন বলা হয়। হাইড্রোজেন বন্ধনকে ডট ডট "........" চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

উদাহরণ : $\overset{\delta+}{H}\overset{\delta-}{F}$, $\overset{\delta+}{H_2}\overset{\delta-}{O}$ ইত্যাদির মধ্যে H- বন্ধন ঘটে।

○ প্রশ্ন-১৬. পানিতে হাইড্রোজেনের বন্ধনের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : সমযোজী যৌগের ধর্মে হাইড্রোজেন বন্ধনের প্রভাব: হাইড্রোজেন বন্ধনের ফলে অণুসমূহের বিপরীত প্রান্তসমূহ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বিরাট অণু সৃষ্টি করে। তরল অবস্থায় অণুসমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে থাকলেও তারা মোটামুটি মুক্তভাবে চলাফেরা করে। তরল অবস্থায় হাইড্রোজেন বন্ধন থাকলেও কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় আনতে কিছু হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙা অপরিহার্য। এ কারণে সাধারণ সমযোজী যৌগ অপেক্ষা এসব যৌগের গলনের ক্ষেত্রে অধিকতর শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। ফলে এসব যৌগের গলনাংক একই ধরনের অন্যান্য যৌগ অপেক্ষা অনেক বেশি হয়।

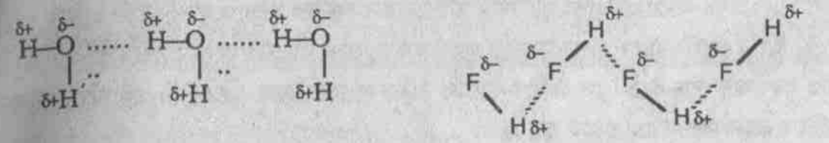

চিত্র : হাইড্রোজেনের বন্ধন

কিন্তু বাস্তবে H_2O-এর গলনাংক ও স্ফুটনাংক যথাক্রমে 0°C ও 100°C। এটা হয়েছে পানিতে হাইড্রোজেন বন্ধনের উপস্থিতির কারণে।

○ প্রশ্ন-১৭. প্রাণির জীবনে H-বন্ধনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রাণির জীবনে H-বন্ধনের গুরুত্ব :

১. আমাদের দেহের ভরের ৭০% হলো পানি। তরল পানি ছাড়া প্রাণির দেহ গঠন ও রক্ষা অসম্ভব। আর H-বন্ধনের কারণেই পানি তরল অবস্থা লাভ করেছে।

২. আমাদের দেহে শক্তিদায়ক প্রধান খাদ্য হলো কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন। প্রথম যৌগে O এবং ২য় যৌগে O.N.S ইত্যাদি তড়িৎ ঋণাত্মক পরমাণু রয়েছে। তাই এদের অণুতে H-বন্ধন বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৩. প্রাণীদেহের বিভিন্ন তন্ত্র যেমন চর্ম, অস্থি, টিস্যু, রক্ত, চুল ইত্যাদির প্রোটিন গঠনে H-বন্ধনের ভূমিকা বর্তমান। প্রতিটি কোষের DNA ও RNA তে রয়েছে H-বন্ধনের ভূমিকা।

৪. আমাদের পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান কার্পাস তুলো, সিল্ক, উল, সাংশ্লেষিক তন্তু প্রভৃতির প্রত্যেকটির আঁশের দৃঢ়তা লাভের মূলে রয়েছে H-বন্ধন।

৫. উদ্ভিদের দেহ কাঠামোতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট পলিমার সেলুলোজ। এ সেলুলোজের গঠনে তড়িৎ ঋণাত্মক অক্সিজেন পরমাণুর সাথে H-বন্ধন বর্তমান। এ H-বন্ধন সেলুলোজে দৃঢ়তা দিয়েছে। আর উদ্ভিদের দৃঢ় কাণ্ড থেকে প্রাপ্ত কাষ্ঠ দিয়ে আমাদের গৃহায়ন ও ব্যবহার্য আসবাবপত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

○ প্রশ্ন-১৮. বরফের গঠন আলোচনা করুন।

অথবা, বরফের আয়তন পানির আয়তনের তুলনায় বেশি কেন?

অথবা, বরফ পানিতে ভাসে কেন?

উত্তর : বরফের গঠন (Structure of Ice) : এক একটি বরফের কেলাস বা স্ফটিককে এক একটি অতি বৃহৎ অণু হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বরফে প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন

পরমাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তন্মধ্যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত, অপর দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। অক্সিজেন পরমাণুর চারদিকে এই চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু বিকৃত চতুস্তলকীয়ভাবে অবস্থান করে। সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয় অক্সিজেন পরমাণু থেকে 0.96Å দূরত্বে অবস্থিত। অপরদিকে হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয় অক্সিজেন পরমাণু থেকে 1.80A দূরত্বে অবস্থিত। হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য একটি পানির অণুর অংশ। অপরদিকে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য H_2O অণুর অক্সিজেন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। অর্থাৎ প্রতিটি H_2O অংশ অপর চারটি H_2O অণুর অংশের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। এভাবে একটি অতি বৃহৎ অণু গড়ে উঠে। সে কারণে বরফের সঠিক সংকেত হচ্ছে $(H_2O)n$। এই গঠনে বরফের স্ফটিকে বহু ফাঁকা জায়গা থেকে যায়।

সুতরাং বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির তুলনায় কম এবং বরফ পানিতে ভাসে। 0°C. তাপমাত্রায় বরফ যখন গলতে আরম্ভ করে তখন কিছু সংখ্যক হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে যায় এবং এই ফাঁকা জায়গায় কিছু পানির অণু অবস্থান নেয়। ফলে বরফ পানিতে রূপান্তরিত হলে তার আয়তন কমে অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের ভাঙার পরিমাণ বাড়ে। সুতরাং পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। 4°C তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বোচ্চ মানের হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির অণুসমূহের মধ্যে কম্পন ও গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে অণুসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে। বিপরীতমুখী দুটি প্রক্রিয়া সব সময় কার্যকর, তবে 4°C তাপমাত্রার উপরে কম্পনজনিত আয়তন বৃদ্ধি হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙার ফলে আয়তন হ্রাস অপেক্ষা বেশি হয়। ফলে 4°C তাপমাত্রার উপরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির আয়তন বাড়ে অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায়।

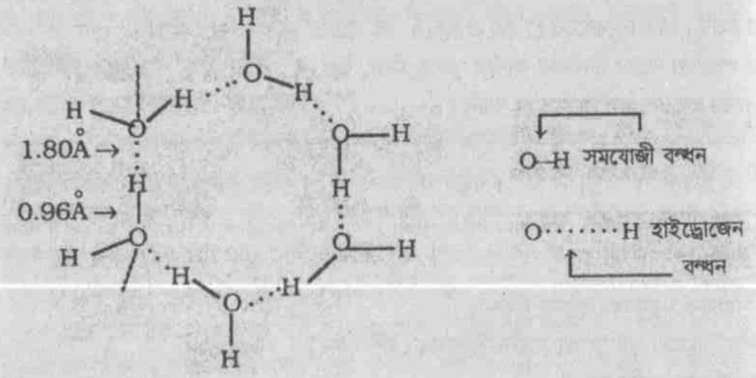

চিত্র : বরফের আণবিক গঠন। বৃত্ত দিয়ে অক্সিজেন পরমাণু নির্দেশ করা হয়েছে, সাধারণ সরলরেখা (—) দিয়ে সমযোজী বন্ধন এবং ডট লাইন (....) দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ধন বুঝানো হয়েছে।

খ

পানির উৎস, বাংলাদেশে বিশুদ্ধ পানির উৎস, পানির গুণগত পরিমিতি (রং ও স্বাদ, অস্বচ্ছতা, তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহের উপস্থিতি, বর্জ্যের উপস্থিতি, দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা, পি. এইচ. এবং লবণাক্ততা)

Sources of water, sources of fresh water in Bangladesh, water quality parameters (colour and taste, turbidity, presence of radioactive substances presence of waste, dissolved oxygen, temperature, pH and salinity)

○ প্রশ্ন-১৯. পানির আয়নিক গুণফল ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বিজ্ঞানী কোলরাস্ ও হেডউইলার (Kohlrausch ও Heydweiller 1894) বিশুদ্ধ পানির পরিবাহিতা নির্ণয় করে দেখান যে, অতি বিশুদ্ধ পানি অতি সামান্য মাত্রায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে। অতএব বিশুদ্ধ পানি অল্পমাত্রায় নিম্নরূপে বিয়োজিত হয় :

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ [সঠিকভাবে $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$]

ভরক্রিয়া সূত্র মতে, $K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$; এখানে [ ] = ঘনমাত্রা বোঝায়

প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিমাণে বিয়োজনের ফলে পানির ঘনমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। তাই $[H_2O]$ এর মান ধ্রুবক ধরা হয়।

সুতরাং $[H^+][OH^-] = K[H_2O] = K_w$ = ধ্রুবক

K_w কে পানির আয়নিক গুণফল বলা হয়। বিভিন্ন তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফল (K_w) এর মান সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন হয়। 25°C তাপমাত্রায় পানির গুণফল (K_w) এর মান 1×10^{-14} ধরা হয়। পানি বিয়োজিত হলে সমান সংখ্যক H^+ ও OH^- উৎপন্ন হয়। তাই বিশুদ্ধ পানিতে H^+ ও OH^- এর ঘনমাত্রা সমান থাকে।

আবার $[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$

$\therefore [H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

যেহেতু বিশুদ্ধ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রক্সিল আয়ন সমান থাকে; তাই এ অবস্থায় পানিকে নিরপেক্ষ যৌগ বলা হয়। পানির আয়নিক গুণফলের সম্পর্ক থেকে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা প্রকাশের জন্য pH স্কেল নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২০. পানির গুণগত মান বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পানির (H_2O) মতো এত বেশি আর কোনো রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয় না। পানির এমন কিছু বিশেষত্ব আছে বা এমন কিছু বৈচিত্র্যময় ধর্মাবলি আছে যার জন্য এর ব্যবহারিক ক্ষেত্রের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। বিশুদ্ধ অবস্থায় পানির কোনো রং স্বাদ এবং গন্ধ থাকে না। তবে পানিতে দ্রবীভূত গ্যাস ও লবণের কারণে পানি কিছুটা স্বাদযুক্ত। তাত্ত্বিকভাবে যদি পানির ভৌত ধর্মাবলি পরিবর্তিত হয় তবে তাকে দূষিত পানি বলে। এখানে বিশুদ্ধ পানির কিছু ভৌত ধর্মাবলি উল্লেখ করা হলো।

পানির কিছু ভৌত স্থির মান

ভৌত বৈশিষ্ট্য (Physical parameter)	মান (Value)
১. শোষণ গুণাংক	0°C তাপমাত্রায় O_2-এর জন্য 1.713 এবং N_2-এর জন্য 0.049 ও 0.024
২. স্ফুটনাংক	100°C
৩. হিমাংক	0°C
৪. ঘনত্ব	20°C তাপমাত্রায় 0.99823 g/cc
৫. বর্ণ	বর্ণহীন
৬. পেষণ গুণাংক	20°C তাপমাত্রায় ও 1 atm চাপে 1.0016
৭. ডাইপোল মোমেন্ট	1.86 D
৮. পরিবাহিতা	25°C তাপমাত্রায় 5.54×10^{-5} Ohm^{-1}
৯. ডাই-ইলেকট্রিক ধ্রুবক	25°C তাপমাত্রায় 78.54
১০. 2% N_2 ও 0.057% O_2 ধারণ করে	O°C তাপমাত্রায় ও 1 atm চাপে
১১. প্রতিসরাংক	1.33 (20°C তাপমাত্রায়)
১২. আপেক্ষিক তাপ	20°C তাপমাত্রায় 0.99859
১৩. পৃষ্ঠতল টান	20°C তাপমাত্রায় 72.75 ডাইন/সেমি
১৪. আপেক্ষিক গুরুত্ব	4°C তাপমাত্রায় 1.0000
১৫. আপেক্ষিক পরিবাহিতা	25°C তাপমাত্রায় 5.54×10^{-8} Ohm^{-1} cm^{-1}
১৬. তাপীয় পরিবাহিতা	40.8°C-এ 1.555
১৭. pH	7.0
১৮. বাষ্পচাপ	20°C তাপমাত্রায় 17.62
১৯. সান্দ্রতা	20°C তাপমাত্রায় ও 1 atm চাপে 1.0016

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহার যেমন- পান করা, গৃহস্থালি, সেচ, শিল্পক্ষেত্র, চিত্রবিনোদন, মৎস্য চাষের জন্য পানির আবশ্যক গুণাগুণ এক এক রকম। পানির গুণাগুণ নির্ণয় করতে বিভিন্ন রকম রাসায়নিক, প্রাণরাসায়নিক এবং অণুজীব সম্পর্কিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন এবং পরীক্ষিত মান প্রমাণ মানের (Standard value) সাথে তুলনা করে পানির গুণাগুণ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়।

○ প্রশ্ন-২১. পানীয় জলের গুণাগুণ (Drinking water quality) ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পানীয় জলের গুণাগুণ (Drinking water quality) : যে উপাদান সংযুক্তির পানি পান করলে শারীরিক কোনো সমস্যা দেখা দিবে না এবং সে সাথে দেহে খনিজের চাহিদা সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পূরণ করবে সে পানিকে পানীয় জল বলা হয়। প্রাকৃতিক পানিতে বিভিন্ন রকম খনিজ উপাদান থাকে এবং পানীয় জলে এসব উপাদান গ্রহণযোগ্য মানের নিচে অথবা সমান হতে হবে। তবে উপাদান ঘাটতি থাকলে সেটি উত্তম পানীয় জল বলে বিবেচিত হবে না। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে বিশুদ্ধকৃত পানি সম্পূর্ণরূপে সরবরাহ করা সম্ভব হয় না, সেখানে নলকূপের পানি পান করতে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু নলকূপের পানি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ নয় কারণ ভূ-গর্ভস্থ পানিতে মাটি হতে কিছু ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ (যেমন- আর্সেনিক) ফিল্টার ছাড়াই পানির সাথে উঠে আসতে পারে। অন্যদিকে, কিছু মানুষ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য লেক, জলাশয়, পুকুর, নদী প্রভৃতি উৎস হতে দূষিত পানি পান করে এবং এর ফলে প্রতি বছর তিন মিলিয়ন মানুষ প্রভাবিত অথবা মৃত্যুবরণ করে। এমনকি তথাকথিত পাইপবাহিত বিশুদ্ধ পানি ও বিভিন্ন রোগ; যেমন-জন্ডিস, কলেরা, টাইফয়েড, ডায়রিয়া, পেটের পীড়া প্রভৃতির

জীবাণু বহন করে। শহরের পানিতে জীবাণু মুক্তকরণের জন্য ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হয় কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহারে পানিতে ক্লোরিনের পরিমাণ বেড়ে গেলে তা ফুসফুস সংক্রমণ, আমাশয়, এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের সর্বোচ্চ মাত্রা (TLV) ছকে দেখানো হলো :

পানীয় জলের গুণাগুণ মান (ppm বা mg/lit)

উপাদান	বাংলাদেশ		WHO		ভারত	
	প্রত্যাশিত	বাতিলযোগ্য	প্রত্যাশিত	বাতিলযোগ্য	প্রত্যাশিত	বাতিলযোগ্য
আর্সেনিক	0.5	-	0.05	0.05	0.2	-
অ্যামোনিয়া	0.5	-	0.5	-	-	-
বেরিয়াম	0.5	-	-	1.0	-	-
বাইকার্বনেট	NYS	-	340	-	-	-
BOD	0.2	-	6.0	-	-	-
বোরন	1.0	-	1.0	-	-	-
ক্যাডমিয়াম	0.005	-	0.01	0.01	-	-
ক্লোরাইড	150	600	500	-	-	-
ক্যালসিয়াম	75	-	75	200	200	400
ক্লোরিন (অবশেষ)	0.2	-	1.0	-	-	
ক্রোমিয়াম	0.05	-	0.05	0.05	0.05	-
ক্রোমিয়াম (মোট)	0.05	-	0.05	0.05	0.5-	
COD	4.0	-	4.0	-	4.0	4.0
কলিফরমস্	Nill	-	2.0	-	-	-
কপার	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0
সায়ানাইড	0.1	-	0.05	-	-	0.01
কপার	1.0	-	1.0	1.0	1.0	1.0
সায়ানাইড	0.1	-	0.05	-	-	0.01
DO	6.0	-	4.6	-	6	6
ফ্লোরাইড	1.0	-	1.5	-	1.0	2.0
লৌহ (Fe)	0.321	-	0.3	1.0	0.3	1.0
লেড (Pb)	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.01
ম্যাগনেসিয়াম	30	50	30	150	50	100
ম্যাঙ্গানিজ	0.1	-	0.1	0.5	0.1	0.5
পারদ (Hg)	0.001	-	0.001	-	-	-
নিকেল	0.1	-	0.2	-	-	-
নাইট্রেট	10	-	13	-	1.0	1.5
নাইট্রাইট	0.1	-	-	-	-	-
ফসফেট	0.1	-	0.8	-	-	-
pH	6	7.5	6-8.5	6.5-9.2	7-8.5	6.5-9.2
সালফেট	100	300	200	400	20	-
জিংক	5	-	5	15	5	15

○ প্রশ্ন-২২. দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved oxygen) বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolved oxygen) : অ্যাকুয়াটিক সিস্টেমে জীবন ধারণের পরিমাণ ও ধারণ নির্ণীত হয় পানির বডিতে (Water bodies) দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা। দ্রবীভূত অবস্থায় ন্যূনতম পরিমাণ অক্সিজেন না থাকলে পানিতে কোনো রকম প্রাণী বা উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারে না। পানিতে অক্সিজেন যখন দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, তখন একে দ্রবীভূত অক্সিজেন বলে। পানির গুণগত মান নির্ণয়ের জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেন একটি উৎকৃষ্ট প্যারামিটার।

পানিতে জৈব দূষকের পরিমাণ অগণিত Micro organism-এর বৃদ্ধি ঘটায়। এসব অণুবীক্ষণিক জীবাণু জটিল জৈব যৌগকে বিয়োজিত করে সাধারণ অজৈব উপাদান যেমন– কার্বনেট, বাই-কার্বনেট, নাইট্রেট, সালফেট এবং ফসফেট যৌগে পরিণত করে। Hazardos জৈব যৌগ পানি থেকে অণুবীক্ষণিক জীবাণু দ্বারা অপসারণ প্রক্রিয়াকে Self-purification বলে। যেসব অণুবীক্ষণিক জীবাণু এরূপ Self-purification ঘটায়, এরা পানিতে দ্রবীভূত, অক্সিজেনকে খরচ করে বা কাজে লাগায় Respiration প্রক্রিয়া দ্বারা যদি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি হয়, তখন Self-purification-এর মাত্রাও বেশি হয়। যদি দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম হয়, তখন কতক দূষিত পদার্থ পানির Self-purification-দ্বারা দূর করা সম্ভব হয়। এভাবে দ্রবীভূত অক্সিজেনের লেভেল দূষিত পানির অবস্থা পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণীয় পরিমাপক বা প্যারামিটার।

○ প্রশ্ন-২৩. দ্রবীভূত অক্সিজেন এর প্রভাবিত হওয়ার কারণগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : যখন পানি এর ক্ষমতা অনুযায়ী অক্সিজেন ধারণ ও দ্রবীভূত করতে পারে, তখন একে বলা হয় অক্সিজেনের সাপেক্ষে সম্পৃক্ত (Saturation with respect to oxygen)। দ্রবীভূত অক্সিজেনের লেভেল কতক ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে। নিম্নের টেবিলে তা দেখানো হয়েছে যে, পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হ্রাস পায়।

Temperature, K

	273	278	283	288	293	298	303
Fresh water	14.6	12.8	11.3	10.2	9.2	8.4	7.6
Sea water	11.3	10.0	9.0	8.1	7.4	6.7	6.1

অধিকন্তু যে পানিতে দ্রবীভূত লবণ রয়েছে, উক্ত পানিতে অক্সিজেন কম দ্রবীভূত হয়। এর অর্থ যে কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় স্বাদু পানির চেয়ে সমুদ্রের পানির Saturation মান (Value) কম। পানিতে গ্যাসের দ্রাব্যতা বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সরাসরি সমানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-২৪. জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের প্রয়োজন। দ্রবীভূত এই অক্সিজেন জলজ প্রাণীর শ্বসনে ব্যবহৃত হয়। 25°C উষ্ণতায় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সর্বোচ্চ পরিমাণ 8ppm (8 mg/L)। তাপমাত্রার সাথে পানিতে অক্সিজেনের দ্রাব্যতার পরিবর্তন ঘটে। শূন্য ডিগ্রি (0°C) সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানিতে অক্সিজেনের দ্রাব্যতা 14 ppm। পানিকে জৈব বা অজৈব দূষক দ্রবীভূত থাকলে তা অক্সিজেনের দ্রাব্যতার উপর প্রভাব ফেলে এ ধরনের দূষিত পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা (dissolved) কমে যায়। এ ধারণা থেকেই দূষণের নির্দেশক হিসেবে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে (DO) ব্যবহার করা হয়। অধিকাংশ জলজ প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 5 ppm হওয়া বাঞ্ছনীয়।

○ প্রশ্ন-২৫. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয়ের নিয়ামকগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ সাধারণত তিনটি নিয়ামকের উপর নির্ভরশীল। যথা :

১. জলজ অর্গানিজমসমূহের সালোকসংশ্লেষণ এবং শ্বসনের প্রভাব;
২. বর্জ্য পদার্থের জারণ এবং
৩. পানির তাপমাত্রা।

ফটোসিন্থেটিক প্রক্রিয়ার সময় বিমুক্ত অক্সিজেন দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রাকে কমিয়ে ফেলে। এই প্রক্রিয়ায় পানিতে অক্সিজেন যুক্ত হয়। শ্বসনের প্রাক্কালে অক্সিজেন প্রত্যাহৃত হয়। সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন এবং পুনর্বায়বায়ন (Reaeration) প্রক্রিয়ার সাথে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিবর্তন নিম্নে দেখানো হলো :

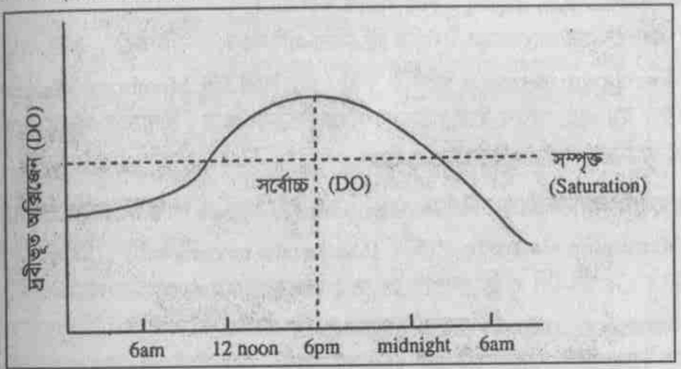

চিত্র : দ্রবীভূত অক্সিজেনের আহ্নিক পরিবর্তন।

পানির মধ্যে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা 5 ppm এর কম হলেই সেই পানিকে দূষণ কবলিত বলে আখ্যায়িত করা হয়। পানিতে জৈব পদার্থ উপস্থিত থাকলে ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীব দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবহার করে জৈব পদার্থসমূহকে ভেঙ্গে ফেলে। এর ফলে পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। দূষিত পানির দূষণ মাত্রা নির্ণয়ে (BOD = Biological oxygen demand) BOD পরীক্ষা দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীল।

জৈব পদার্থ + অণুজীব + DO + CO_2 + H_2O + নতুন ব্যাকটেরিয়া কোষ।

○ প্রশ্ন-২৬. দ্রবীভূত অক্সিজেন নির্ণয় পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : দ্রবীভূত অক্সিজেন নির্ণয় (Determination of dissolved oxygen) : দ্রবীভূত অক্সিজেন নির্ণয়ের মাধ্যমে পানির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বর্জ্য পানির দূষণ মাত্রা নির্ধারণে ব্যবহৃত জীব অক্সিজেন চাহিদা (Biological oxygen demand) পরিমাপের ভিত্তি হচ্ছে দ্রবীভূত অক্সিজেন। গ্রাহক পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন এবং শিল্পজাত বর্জ্য পানির বায়বীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দ্রবীভূত অক্সিজেন পরিমাপ করা যায়।

পদ্ধতি (Method) :

১. ক্ষারকীয় পটাসিয়াম আয়োডাইডযুক্ত পানির নমুনায় ম্যাঙ্গানিজ সালফেট যোগ করা হয়। ম্যাঙ্গানিজ হাইড্রোক্সাইড ও পটাসিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়।

$MnSO_4 + 2KOH \rightarrow Mn(OH)_2 + k_2SO_4$

২. পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা $Mn(OH)_2$ জারিত হয়ে ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

$2Mn(OH)_2 + O_2 \rightarrow 2MnO(OH)_2$ ক্ষারীয় ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড

৩. ক্ষারীয় ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডে H_2SO_4 যোগ করলে ম্যাঙ্গানিজ সালফেট উৎপন্ন হয়।

$$MnO(OH)_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow Mn(SO_4)_2 + 3H_2O$$

৪. উৎপন্ন $Mn(SO_4)_2$ পটাসিয়াম আয়োডাইড থেকে আয়োডিন বিমুক্ত করে।

$$Mn(SO_4)_2\ 2KI \rightarrow MnSO_4 + K_2SO_4 + I_2$$

৫. স্টার্চ নির্দেশক ব্যবহার করে মুক্ত আয়োডিনকে প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্বারা টাইট্রেশন করা হয়।

$$2Na_2 S_2 O_3 + I_2 \rightarrow Na_2 S_4 O_6 + 2NaI$$

$$5ml \text{ of } 0.025\ M\ Na_2S_2O_3 \equiv 1mg/L\ DO$$

দ্রবীভূত অক্সিজেন Mg/L (ppm) এককে প্রকাশ করা হয়।

নাইট্রাইট এবং ফেরাস আয়নসমূহ উপর্যুক্ত বিক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এসব আয়ন অপসারণ করা হয় Membrane electrode ব্যবহার করে। শুধু অক্সিজেন Membrane electrode-এর মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হয় এবং ধাতব ইলেকট্রোডের সাথে বিক্রিয়া করে। বিদ্যুতের পরিমাণ পরিমাপ করে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হিসেব করা যায়।

○ প্রশ্ন-২৭. দ্রবীভূত অক্সিজেন নির্ণয়ে Membrane Electrode পদ্ধতিতে আলোচনা করুন।

উত্তর : Membrane electrode পদ্ধতি (Mackereth oxygen cell) : গৃহস্থালির ও শিল্পজাত বর্জ্য পানির DO পরিমাপ ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পোলারোগ্রাফিক ও অন্যান্য পদ্ধতির বিভিন্ন অসুবিধা থাকায় Membrane electrode পদ্ধতি এক্ষেত্রে সুবিধাজনক।

দু'টি ধাতব ইলেকট্রোড যার একটি Ag ও অন্যটি লেড, এ দু'টি ইলেকট্রোডকে সম্পৃক্ত $KHCO_3$ দ্রবণে নিমজ্জিত করা হয় এবং পরীক্ষণীয় দ্রবণ থেকে পলিইথিলিন পর্দা (Polyethylene membrane) দ্বারা পৃথক রাখা হয়। এভাবে উৎপন্ন গ্যালভানিক কোষটিকে একটি ছিপির সাহায্যে PH মিটারের সাথে সংযুক্ত করা হয়। এখান থেকে DO-এর সরাসরি পাঠ (Reading) পাওয়া যায়, যা Mg/L অথবা (ppm) এককে প্রকাশ করা হয় The scale of 0 to 14 pH becomes 0 to 14 test (Sample after treatment) with a little Na_2SO_3, to expel O_2) বিদ্যুৎ পরিমাপ করা হয়।

$$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^- \text{ (Ag electrode)}$$

$$Pb + 4OH^- \rightarrow PbO_2 + 2H_2O + 4e^-$$

$$\text{Or, } 2Pb + 4OH^- \rightarrow 2pb(OH)_2 + 4e^- \text{ pb electrode)}$$

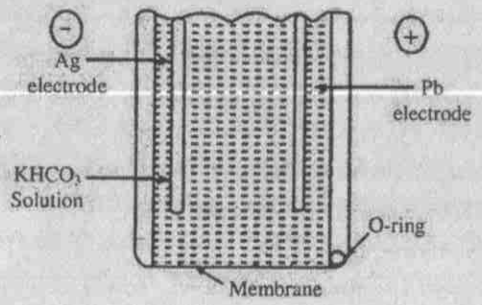

Fig : The Mackereth oxygen cell.

○ প্রশ্ন-২৮. জৈব পদার্থের অক্সিজেন ব্যয় করার সামর্থ্য আলোচনা করুন।

উত্তর : জৈব পদার্থের অক্সিজেন ব্যয় করার সামর্থ্য (Ability of oxygen consumption for organic substances জলে উপস্থিত বায়ুর অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়া জৈব দ্রাবক জারিত করে। এক্ষেত্রে অণুজীব বা ব্যাক্টেরিয়া জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনকে জৈব পদার্থের জারণে বা ডিগ্রেডেশনে কাজে লাগায়। ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন এর পরিমাণ ক্রমশ কমতে থাকে। জৈব পদার্থের পরিমাণ কম হলে দ্রবীভূত অক্সিজেন এর ব্যয় কম হবে এবং জৈব পদার্থের পরিমাণ অধিক হলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ব্যয় বাড়বে। এই ঘটনাকে জৈব পদার্থের অক্সিজেন ব্যয় করার সামর্থ্য বলে। উল্লেখ্য 25°C তাপমাত্রায় জলে অক্সিজেনের সর্বোচ্চ দ্রাব্যতা 8.7 mg/L।

○ প্রশ্ন-২৯. BOD নির্ণয়ের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : BOD নির্ণয়ের গুরুত্ব ((Importance of the determination of BOD) : জলের উৎকর্ষতা নির্ধারণের জন্য BOD নির্ণয় করা হয়। জলে জৈব দূষকের পরিমাণ বেশি হলে BOD-এর মান বেশি হবে এবং জৈব দূষকের পরিমাণ কম হলে BOD-এর মান কম হবে। সুতরাং BOD-এর মান পর্যবেক্ষণ করে জলের উৎকর্ষতা যাচাই করা সম্ভব হয়। উল্লেখ্য, দূষিত জলে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর উপস্থিতি দেখে জলের উৎকর্ষতা বা দূষণমাত্রা যাচাই করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণী জলের উৎকর্ষ নির্ধারণে সূচক হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-৩০. জীব রাসায়নিক চাহিদা নির্ণয় পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : জীব রাসায়নিক চাহিদা নির্ণয় (Determination of bio-chemical oxygen demand) :

মূলনীতি : জৈব পদার্থের ভাঙনের প্রাক্কালে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ব্যবহৃত মিলিগ্রাম/ লিটার (ppm) এককে প্রকাশিত পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণকে জীব রাসায়নিক চাহিদা, BOD বলা হয়। জৈব অক্সিজেনের চাহিদাকাঙ্ক্ষী বস্তুর পরিমাণ পরিমাপনে সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি হচ্ছে BOD পরীক্ষা।

এই পদ্ধতির মৌলিক নীতি অনুযায়ী আণবিক অক্সিজেন ব্যবহার করে অণুজীব দ্বারা পানির নমুনার সমস্ত জীব ভাঙনযোগ্য (biodegradable) জৈব বস্তু CO_2 এবং H_2O জারিত হয়।

উদাহরণস্বরূপ, গ্লুকোজ পরিপাকের সার্বিক সাধারণ বিক্রিয়া হচ্ছে,

$$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$$

$Imgc = 2.67mgO_2, BOD = mg - O_2$ যা প্রতি লিটার পানিতে বিদ্যমান জীবাণুর অনুঘটনে জারণীয় জৈব বস্তুর সমতুল্য।

প্রকৃত BOD মান অবশ্য তাত্ত্বিক পরিমাণের চেয়ে কম হয়ে থাকে। কেননা কিছু পরিমাণ কার্বন নতুন ব্যাকটেরিয়া কোষে অন্তর্ভুক্ত হয়। BOD পরীক্ষণটি একটি জীব নিরূপণ পদ্ধতি (Biossay)। এই পদ্ধতি যথেষ্ট নির্ভুল নয়। এ কারণে প্রাকৃতিক পানির BOD মান কিছুটা বেশি হতে পারে। তদুপরি অণুজীব সৃষ্ট জৈব জারণ ছাড়াও নাইট্রোজেনঘটিত বস্তুর জীব-জারণ (Bio-oxidation) দ্বারাও পানির অক্সিজেন ব্যবহৃত হতে পারে।

$$NH_4^+\ 2O_2 \rightarrow 2H^+ + NO_3^- + H_2O$$

অধিকন্তু পানিতে বিদ্যমান রাসায়নিক বিজারক পদার্থসমূহের রাসায়নিক বা প্রাণরাসায়নিক জারণ ঘটত পারে।

$$4Fe^{2+} + O_2 + 10H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3 + 8H^+$$

$$2SO_3^{2-} + O_2 \rightarrow 2SO_4^{2-}$$

পানির অক্সিজেন প্রত্যাহারে উপর্যুক্ত সব প্রক্রিয়ারই অবদান রয়েছে।

BOD প্যারামিটার উপযুক্ত অ্যাকুয়াটিক অণুজীব দ্বারা ব্যবহৃত অক্সিজেনের পরিমাণ, (পাঁচ দিন পর্যন্ত) জানা যায়। (পাঁচদিন কথাটা কোনো পবিত্র বিষয় নয়, এ পরীক্ষাটি ইংল্যান্ডে উদ্ভাবিত হয়েছে যেখানে Maximum stream flow পাঁচ দিন চলে এবং পরিপূর্ণ Seedling ঘটাতে পাঁচদিন সময় লাগে। Seedling এর উদ্দেশ্য হলো নমুনা পানিতে Biological population প্রবেশ করানো যাতে জৈব পদার্থকে (দূষিত পানির) জারণ করতে পারে। যখন এরূপ Micro-organism ইতোমধ্যে উপস্থিত থাকে যেমন— গার্হস্থ বর্জ্য পানি বা পৃষ্ঠতল পানি, এক্ষেত্রে Seedling প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যখন নমুনা পানিতে অণুবীক্ষণিক জীবের অভাব থাকে, তখন লঘুকরণ পানির Dilution water) seedling প্রয়োজন হয়। পানীয় পানির জন্য BOD-মপা সভন 6 ppm(WHO) বর্জ্যের উৎসভেদে পানির BOD-এর মান কম বেশি হয়। যেমন— গার্হস্থ্য পানির BOD=160 ppm, শিল্প কারখানার বর্জ্য মিশ্রিত পানির BOD হলো = 220 pmm, কাগজ শিল্পের বর্জ্য পানির BOD-এর মান 375 ppm, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণের বর্জ্য পানির BOD = 750 ppm এবং চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য পানির BOD-এর মান 1000–2000 ppm। পানির BOD যত উচ্চ হয়, জলজ বায়ুজীবী জীবের জীবনধারনের জন্য সে পানি তত বেশি অনুপযোগী হয়।

○ প্রশ্ন-৩১. পানিতে প্রাণ রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা আলোচনা করুন।

উত্তর : পানিতে প্রাণরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা BOD নির্ণয় (Procedure for the determination of BOD in water) :

১. **লঘু পানি তৈরিকরণ :** একটি নির্দিষ্ট আয়তনের পাতিত পানিতে নিম্নরূপ দ্রব্যাদি যোগ করা হয়।
   i. 1ml ফসফেট বাফার (pH = 7.2),
   ii. 1 ml $MgSO_4$ দ্রবণ (22.5 g/L),
   iii. 1 ml $CaCl_2$ দ্রবণ (27.5 g/L) এবং
   iv. 1 ml $Fecl_3$ দ্রবণ (0 – 25 g/L)।

২. **লঘুকরণ কৌশল :** লঘুকরণ বিষয়টি নমুনার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন— শিল্পের বর্জ্য পানির জন্য 0%-1%, নর্দমার স্থিত বর্জ্য পানির জন্য 1–5%, নদীর দূষিত পানির জন্য 25 – 100% এবং জারিত পানি প্রবাহের জন্য 5–25% পর্যন্ত লঘু করা হয়।

৩. উক্ত পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 7ppm না হওয়া পর্যন্ত পানির মধ্যে নল দ্বারা ৫ (পাঁচ) মিনিট পর্যন্ত বায়ুর বুদবুদ চালনা করা হয়। BOD-এর মান DO-এর মানের চেয়ে বেশি হলে লঘুকরণ পানি দিয়ে একে আরও লঘু করা হয়। এ দ্রবণের ৫০% নিয়ে DO পরিমাপ করা হয়। ধরা যাক, এক্ষেত্রে DO-এর পরিমাণ D_1-এরপর অবশিষ্ট নমুনা পানিকে একটি ছিপিযুক্ত বোতলে (250–300 ml) নিয়ে বোতলের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে 20°C তাপমাত্রায় বা 293 K পাঁচ দিন ধরে রেখে দেয়া হয়। এরপর এ নমুনার DO পরিমাপ করা হয়। ধরা যাক, এক্ষেত্রে DO-এর পরিমাণ D_2।

৪. নমুনা লঘু করার ফলে তাতে জীবাণু ও পুষ্টির মাত্রা হ্রাস পায় বলে লঘু নমুনায় জীবাণুর কিছু বীজ ও অতিরিক্ত কিছু পুষ্টি ও বাফার যোগ করা হয়। বীজ হিসেবে যে পানি ব্যবহৃত হয়, তারও একটা BOD থাকে। তাই একটি ফাঁকা (Blank) নমুনার সাহায্যে (পানির নমুনা ছাড়া কেবল বীজ হিসেবে ব্যবহৃত পানি, বাফার ও পুষ্টি দ্বারা গঠিত নমুনা) বীজের BOD নির্ণয় করে লঘু পানি

নমুনার BOD থেকে তাকে বাদ দিতে হয়। এজন্য লঘু পানিতে Seed যোগ করে (নমুনা ছাড়া) একে দুই অংশে ভাগ করা হয়। এক অংশের DO-এর পরিমাণ ধরা যাক B_1 ও অপর অংশের (Incubation এরপর) DO-এর পরিমাণ ধরা যাক B_2। এখন নিম্নের সমীকরণের সাহায্যে পানির BOD নির্ণীত হয়।

$$\text{mg/L BOD} = \frac{(D_1 - D_2) - (B_1 - B_2) \times f}{P}$$

এখানে,

D_1 = নমুনার DO (লঘুকৃত),
D_2 = নমুনার Incubation-এরপর DO,
B_1 = লঘু পানির DO,
B_2 = লঘু পানির Incubation-এরপর DO,
P = ব্যবহৃত পানির নমুনায় দশমিক ভগ্নাংশ
f = নমুনা পানির সাথে নিয়ন্ত্রিত পানির অনুপাত

f- কে কখনো নমুনা লঘুকরণ গুণীয়ক বলে। এই BOD মানকে mg/L বা (ppm) হিসেবে প্রকাশ করা হয়। BOD of 80 mgL-এর এক লিটার নমুনা পানিতে জৈব বিশ্লেষ্য জৈব পদার্থ 80mg O_2 খরচ করে।

○ প্রশ্ন-৩২. BOD এর মান নির্ণয়ে পরীক্ষার দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

উত্তর : BOD এর মান নির্ণয়ে পরীক্ষার দুর্বলতা বা সীমাবদ্ধতা (Limitation or weakness in BOD determining procedure) : BOD নির্ণয়করণের কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। যেমন—

১. বিশ্লেষণীয় পানিতে DO পর্যন্ত থাকা সত্ত্বেও জৈবিক বিভাজনীয় বস্তুর বিভাজন পাঁচদিনে সম্পূর্ণ হয় না। সম্পূর্ণ বিভাজন ঘটতে প্রায় ২০ দিন সময় লাগে। ফলে পানির প্রকৃত BOD-এ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায় না।

২. যে পরিবেশ থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়, গবেষণাগারে সে পরিবেশ কখনও সৃষ্টি করা যায় না। গবেষণাগারে পানির যে BOD পাওয়া যায় তা প্রাকৃতিক অবস্থায় বিদ্যমান পানির BOD থেকে ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৩. বর্জ্য পানিতে অনেক সময় বিষাক্ত উপাদান মিশ্রিত থাকে, যা জীবাণুকে ধ্বংস করে। এরূপ অবস্থায় BOD মানের কোনো তাৎপর্য থাকে না।

৪. পানিতে উপস্থিত নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার BOD পরীক্ষা বাধাগ্রস্ত করে। তাই পরীক্ষার পূর্বে এদেরকে অপসারণ করা দরকার।

৫. এ পরীক্ষা দ্বারা শুধু পানিতে জৈব পদার্থের ঘনমাত্রা জানা যায়।

○ প্রশ্ন-৩৩. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (COD) কাকে বলে? আলোচনা করুন।

উত্তর : রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (Chemical Oxygen Demand (COD) : BOD কোনো কোনো সময় সঠিকভাবে পানি দূষণ মাত্রাকে বিশ্লেষণ করতে পারে না। কতক যৌগ যেমন— ডিটারজেন্ট (Detergents) microbial degradation ঘটায় না, তাই BOD দ্বারা এক্ষেত্রে দূষণমাত্রা জানা যায় না। এভাবে BOD নির্ণয়ের ক্ষেত্রে পাঁচদিন সময়ের মধ্যে অনেক জৈব যৌগ আংশিক জারিত

হয়। আবার অনেক সময় নমুনা পানিতে Toxic পদার্থ থাকতে পারে, যেমন—Biocides যেগুলো জীবাণুর জন্য বিষাক্ত। এছাড়া পাঁচদিন সময় অনেক দীর্ঘ। এসব সমস্যা সমাধানকল্পে যা BOD-এর পরীক্ষার সাথে সহগামী অন্য একটি বিশ্লেষণীয় পদ্ধতি, COD (Chemical Oxygen Demand) প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোনো দূষিত পানিতে বা কোনো বর্জ্য পানিতে বিদ্যমান জারণযোগ্য জৈব ও অজৈব উভয় প্রকার পদার্থের রাসায়নিক জারণে mg/L এককে প্রকাশিত যে পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়, তাকে রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলে। COD সাধারণত BOD-এর তুলনায় উচ্চতর, কেননা জারণীয় জৈব ও অজৈব যে কোনো পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিভাজন ঘটে। অথচ জারণীয় কোনো কোনো পদার্থ থাকে প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ায় যেগুলো বিভাজিত হয় না।

রাসায়নিক বস্তু জৈব $(CH_2O] + O_2 \xrightarrow{\text{রাসায়নিক}} CO_2 + H_2O$

অজৈব বস্তু $4Fe^{+2} + O_2 + 4H^+ \xrightarrow{\text{রাসায়নিক}} 4Fe^{+3} + 2HO^-$

$$NH_4^+ + 2O_2 \xrightarrow{\text{রাসায়নিক}} NO_3^- + 2H^+ + H_2O$$

COD একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। জলস্রোত এবং শিল্পজাত বর্জ্য পানির নমুনায় COD পরিমাপ করে এদের দূষণ মাত্রা স্বল্প সময়ের মধ্যে নির্ণয় করা যায়।

$COD = mg - O_2$, যা প্রতি লিটার পানিতে বিদ্যমান, অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা জারণীয় বস্তুর সমতুল্য। জীবাণু সক্রিয় ও জীবাণু নিষ্ক্রিয় উভয় শ্রেণির বস্তু (জৈব ও অজৈব) অম্লীয় $K_2Cr_2O_7$-এর দ্বারা জারিত হতে পারে।

○ প্রশ্ন-৩৪. রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (COD) নিরূপণ করুন।

উত্তর : রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (COD) নিরূপণ (Determination of chemical oxygen demand) : কতিপয় শক্তিশালী জারক (যেমন– $K_2Cr_2O_7$) দ্বারা ভাঙনযোগ্য ও সহজে ভাঙনযোগ্য নয় এমন সকল জৈব পদার্থকে পরীক্ষাগারে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে জারিত করার জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন তাকেই রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা COD বলা হয়। এর একক হচ্ছে ppm বা mg/L।

পানি, পৌর বর্জ্য পানি এবং শিল্পজাত বর্জ্য পানির নমুনায় দূষণ মাত্রা নির্ধারণকল্পে COD গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এটি নির্ণয়ে অত্যন্ত কম সময়ের প্রয়োজন হয়।

মূলনীতি : অনুঘটক $AgSO_4$ এবং ক্লোরাইড প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের জন্য ব্যবহৃত $HgSO_4$-এর উপস্থিতি 50% H_2SO_4 যুক্ত অতিরিক্ত $K_2Cr_2O_7$ দ্রবণকে প্রমাণ ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্বারা প্রমিতকরণ (Titration) করা হয়।

$$3(CH_2O) + 16H^+ + 2Cr_2O_7^{-2} \rightarrow 4Cr^{3+} + 3CO_2 + 11H_2 - O$$

COD নির্ণয় : নমুনার COD মানকে নিম্নোক্তভাবে হিসাব করা হয়—

$$COD(mg/L) = \frac{(v_1 - v_2)N \times 8 \times 100}{x}$$

যেখানে,

$v_1 =$ ফাঁকা নমুনার জন্য ব্যবহৃত ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেটের আয়তন,

$v_2 =$ নমুনার প্রমিতকরণের জন্য ব্যবহৃত ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেটের আয়তন,

$N =$ ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেটের নরমালিটি,

$X =$ পরীক্ষণের জন্য নেয়া নমুনার আয়তন।

প্রাসঙ্গিকভাবে, উল্লেখ্য কোনো নতুনার COD মান BOD মান অপেক্ষা বেশি হয়। কেননা COD নির্ণয়ের ক্ষেত্রে জৈব ভাঙনযোগ্য এবং জৈবিক ভাঙনে নিষ্ক্রিয় এই উভয় প্রকার জৈব বস্তুই জারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো নমুনা পানির COD হচ্ছে 120mg/L এবং BOD মান হচ্ছে 100mg/L। এক্ষেত্রে বলা যায়, ঐ নমুনা পানিতে প্রতি লিটারে 26 mg অক্সিজেন চাহিদাসম্পন্ন এমন সব জৈব যৌগ আছে, যারা সহজেই জীব ভাঙন সম্পন্ন নয় (Nonbiodegradable)। এসব পদার্থের উদাহরণ হচ্ছে কার্বলিক এসিড, কতিপয় কীটনাশক ফেনল জাতীয় যৌগ, ডিটারজেন্ট।

BOD-এর তুলনায় COD নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মূলত অম্লীয় দ্রবণে নমুনাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অতিরিক্ত $Cr_2O_7^{-2}$-এর সাহায্যে জারিত করে COD নির্ণয় করা হয়। জারণীয় সমগ্র মিশাল জারিত হওয়ার পরও মিশ্রণে কিছু পরিমাণ $Cr_2O_7^{-2}$ তথা জারিত মিশালের পরিমাণ পাওয়া যায়।

$3[CH_2O]+16H^+ + Cr_2O_7^{-2} \rightarrow 3CO_2 + 4Cr^{+3} + 11H_2O + Cr_2O_7^{-2}$ অবশিষ্ট

$[Cr_2O_7^{-2} + 6Fe^{+2} + 14H^+ \rightarrow 2Cr^{3+} + 6Fe^{+3} + 7H_2O$

$$1m\,mol\ Cr_2O_7^{-2} \equiv \frac{3}{2} m\,mol\,[CH_2O] \equiv \left(\frac{3}{2}\right) m\,molO_2 = 48\,mgO_2$$

○ প্রশ্ন-৩৫. BOD ও COD এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : BOD এবং COD-এর মধ্যে পার্থক্য (Differences between the BOD and COD) :

১. নমুনা পানিকে ক্ষুদ্র অণুজীব দ্বারা সংঘটিত প্রাণরাসায়নিক জারণ প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণকে BOD বলে। এর একক হচ্ছে mg/L। নমুনায় বিদ্যমান জৈব যৌগ কর্তৃক গৃহীত দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যা শক্তিশালী অজৈব জারক দ্বারা জৈব যৌগের জারণের সময় ব্যবহৃত হয়, তাকে COD বলে। এর একক হলো mg/L। উভয় পরামিতি দ্বারাই পানির নমুনায় দূষণ মাত্রা নির্ণয় করা হয়।

২. কোনো নমুনায় COD-এর মান BOD থেকে বেশি হয়; কেননা BOD প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র জৈব ভাঙনযোগ্য পদার্থসমূহ জারিত হয়। অপরদিকে, COD প্রক্রিয়ায় জারণযোগ্য সকল প্রকার (Biodegradable এবং Nonbiodegradable) পদার্থ জারিত হয়। এর ফলে অক্সিজেনের ব্যবহার অধিক হয়।

৩. BOD নির্ণয় প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত মন্থর (৫ দিন)। অপরদিকে, COD নির্ণয় প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত। বিক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে ২ ঘণ্টা।

৪. BOD নির্ণয় প্রক্রিয়াটিতে অণুজীব দ্বারা জারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। অপরদিকে, COD প্রক্রিয়ায় জারণ ক্রিয়া শক্তিশালী রাসায়নিক জারক দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

৫. BOD প্রক্রিয়াটি কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ। অপরদিকে, COD প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত দ্রুত এবং সহজতর।

৬. BOD একটি প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়া। অপরদিকে, COD একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

৭. BOD যত জটিলই হোক, প্রাকৃতিক পানিতে কেবল জৈবিক বিভাজনীয় জৈব বস্তুর পরিমাণ যখন জানার প্রয়োজন হয় তখন BOD নির্ণয় করা অত্যাবশ্যক; COD নয়।

৮. BOD দ্বারা অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বা এর জাতকের জারণ সম্ভব, কিন্তু COD দ্বারা সহজে জারণ ঘটানো যায় না।

৯. BOD একটি ভৌত পরীক্ষা, অপরদিকে COD একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া।

১০. BOD পরীক্ষার সমীকরণ হলো $[CH_2O] + O_2 \xrightarrow{\text{micro-organism}} CO_2 + H_2O$ অপরদিকে COD পরীক্ষার সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$3[CH_2O]\ 16H^+ + 2\ Cr_2O_7^{-2} \rightarrow 4Cr^{+3} + 3CO_2 + 11H_2O$$ ।

○ প্রশ্ন-৩৬. মোট জৈব কার্বন (TOC) কি?

উত্তর : মোট জৈব কার্বন (Total Organic Carbon, TOC) : পানি দূষণের সূচকসমূহের মধ্যে মোট জৈব কার্বন নির্ণয় প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়। এ কারণে TOC নির্ণয় BOD কিংবা COD থেকে উৎকৃষ্টতর। এই পদ্ধতিতে জলীয় নমুনাকে (5–10mL) একটি দহন নলে অনুঘটকের উপস্থিতিতে 900°C তাপমাত্রায় দহন করা হয়। জৈব পদার্থসমূহ জারিত হয়ে CO_2-এ পরিণত হয়। উৎপন্ন CO_2-কে অবলোহিত রশ্মি বিশ্লেষক দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

বিকল্প পদ্ধতিতে জৈব কার্বনকে নিকেল অনুঘটকের উপস্থিতিতে 300–400°C তাপমাতায় বিজারণ করে CH_4 এ পরিণত করা হয়। উৎপন্ন মিথেনকে গ্যাস ক্রোম্যাটোগ্রাফীয় পদ্ধতিতে শিখা আয়নীকরণ শনাক্তকারক (Flame Inisation Detector, FID) ব্যবহার করে পরিমাপ করা হয়।

সুতরাং যান্ত্রিক পদ্ধতিতে CO_2 অথবা CH_4-এর পরিমাণ নির্ণয় করে কোনো নমুনায় মোট কার্বনের পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। জৈব নমুনা পানিতে কি পরিমাণ জৈব পদার্থ আছে তা TOC দ্বারা নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-২৭. মোট কার্বন বা TOC এর কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : মোট কার্বন বা TOC-এর কার্যপদ্ধতি : প্রথমে নমুনার সাথে $K_2S_2O_8$ এবং পরে H_2PO_4 যোগ করা হয়। দ্রবণে CO_3^{2-}-এবং HCO_3^- হতে উৎপন্ন CO_2 নির্গত করার জন্য $H_3PO_4^-$ কে বাতাস অথবা N_2-এর সাহায্যে sparging করা হয় এর পরে নমুনাকে UV রশ্মি বিচ্ছুরিত 184.9UV ল্যাম্পযুক্ত চেয়ারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। UV রশ্মি বিচ্ছুরণ দ্বারা উৎপন্ন OH^+ রেডিক্যাল, দ্রবীভূত জৈব যৌগকে দ্রুত জারণে সাহায্য করে। জারণ শেষে যে CO_2 গ্যাস সিস্টেম থেকে বের হয় তা গ্যাস ক্রোমোটোগ্রাফি দ্বারা মাপা হয়।

○ প্রশ্ন-২৮. Drinking water এর উৎস হিসাবে Desalting আলোচনা করুন।

উত্তর : সামুদ্রিক পানি Drinking water-এর উৎস হিসাবে Desalting (Sea water as a source of drinking water-Desalting) : পানির electrochemical desalting electrodialysis এবং Electriao-osmosis-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। Electrochemical desalting-এর কৌশল পানিতে উপস্থিত লবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ পরিচালনা করে তড়িৎ বিশ্লেষক সংঘটিত করা হয়। অ্যানায়নসমূহ অ্যানোডে জারিত করা হয় এবং ক্যাটায়নসমূহ ক্যাথোডে বিজারিত করা হয়। ক্যাথোড এবং অ্যানোড Spaces মূল তড়িৎ থেকে diaphragm দ্বারা পৃথক করা থাকে। অ্যানোড diaphragm হলো Ceramic বা micro-porous rubber, যখন ক্যাথোড diaphragm দ্বারা পৃথক করা থাকে। অ্যানোড diaphragm হলো Ceramic বা micro-porous rubber, যখন ক্যাথোড

diaphragm অ্যাসবেসটস কাপড় দ্বারা গঠিত। একটি ম্যাগনেটিক ইলেকট্রোড (Fe_3O_4) অ্যানোড চেম্বারে স্থাপন করা হয় এবং Fe, Zn বা Steel electrode ক্যাথোড চেম্বারে স্থাপন করা হয়। পানিকে Central চেম্বারে প্রবেশ করানো হয় এবং তড়িৎ প্রবাহ পরিচালনা করা হলে আয়নসমূহ diaphragm-এর মধ্যে ভেদ করে অ্যানোড ও ক্যাথোড চেম্বারে চলে যায়। আয়নসমূহের back diffusion diaphragm দ্বারা প্রতিহত করা হয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে Porons ion exchange diaphragm ব্যবহার করা হয়। যখন diaphram পানিতে নিমজ্জিত করা হয়, ion-exchangers বিয়োজিত হয় এবং বিনিময়কারী আয়নসমূহ দ্রবণে চলে আসে।

$$RNa \rightleftharpoons R^- + Na^+$$

$$ROH \rightleftharpoons R^+ + \overline{O}H$$

○ প্রশ্ন-৩৯. পানির উৎসসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির উৎস : পানির সবচেয়ে বড় উৎস হলো সাগর, মহাসাগর বা সমুদ্র। পৃথিবীতে যত পানি আছে তার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগেরই উৎস সমুদ্র। আর সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকায় তা কিন্তু পানযোগ্য নয়। এমনকি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য কাজেও ব্যবহারের উপযোগী নয়। সমুদ্রের পানিকে লোনা পানি (marine Water)ও বলে।

পানির আরেকটি অন্যতম উৎস হলো হিমবাহ ও তুষার স্রোত, যেখানে পানি মূলত বরফ আকারে থাকে। এই উৎসে প্রায় শতকরা ২ ভাগের মতো পানি আছে। উল্লেখ্য যে বরফ আকারে থাকায় এই পানিও কিন্তু অন্য কাজে ব্যবহার উপযোগী নয়। ব্যবহার উপযোগী পানির উৎস হলো নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ, পুকুর ও ভূগর্ভস্থ পানি। ভূর্গভস্থ পানি নলকূপের সাহায্যে পাই। অবশ্য পাহাড়ের উপর জমে থাকা বরফ বা তুষার গলেও ঝর্ণা সৃষ্টি করতে পারে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, ব্যবহারের উপযোগী পানি মাত্র শতকরা ১ ভাগ।

বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস

আমরা বাসা-বাড়িতে রান্না থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া ও খাওয়ার পানি মিঠা পানির থেকে পাই। মাঠে ফসল ফলাতে কখনো কখনো (যেমন– ইরি ধানের জন্য) প্রচুর পরিমাণে পানি লাগে। এ পানিও আমরা সেখান থেকে পাই। আমাদের দেশে ঝর্ণা তেমন একটা না থাকায় মিঠা পানির মূল উৎস নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ ও ভূগর্ভ। তবে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ থাকায় (বিশেষ করে আর্সেনিক) বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি পানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে এবং ঐ সকল এলাকায় বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে পরিশোধন করে তা পান করছে।

○ প্রশ্ন-৪০. ইলিশ মাছ ও পানির লবণাক্ততা বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : লবণাক্ততা : আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ ডিম ছাড়ার সময় মিঠা পানিতে আসে। ইলিশ সামুদ্রিক মাছ অর্থাৎ লবণাক্ত পানির মাছ হলেও ডিম ছাড়ার সময় অর্থাৎ প্রজননের সময় মিঠা পানিতে আসে। কারণ হলো, সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে, যা ডিম নষ্ট করে ফেলে। ফলে ঐ ডিম থেকে আর পোনা মাছ তৈরি হতে পারে না। তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার সময় হলে মিঠা পানিতে আসে। তবে সব মাছের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কিছু মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী লবণাক্ত পানিতেই প্রজনন করতে পারে।

গ

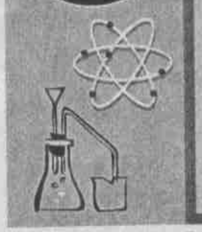

পানি চক্র, প্রকৃতি সংরক্ষণে পানির ভূমিকা, গুণগত পানির প্রয়োজনীয়তা, পানির বিশুদ্ধকরণ (ছাঁকন, ক্লোরিনেশন, ফুটানো এবং পাতন)

Recycling of water, role of water in conservation of nature, necessity of quality water, purification of water (filtration, chlorination, boiling and distillation)

০ প্রশ্ন-৪১. মানব জীবনে পানির গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : পানি প্রকৃতির আত্মা, ভবিষ্যতের আশা। পানিই জীবন, এটি ছাড়া জীবন ও জীবন সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুই সম্ভব নয়। প্রকৃতির অপার দান এই পানি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। পানিতে 'পানি' ছাড়া আরও অনেক খনিজ পুষ্টি থাকে, যা আমাদের শরীরের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য আবশ্যক। ফলে পানি আমরা শুধু খাওয়ার জন্যই খাই না, বরং সাথে সাথে আরও অনেক প্রয়োজনীয় জিনিস গ্রহণের জন্য পান করি। এছাড়া একটি অঞ্চলের অর্থনীতি অনেকটাই পানি ও তার সহজ প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে। ইতিহাস হতে দেখা যায় পৃথিবীতে অধিকাংশ জনবসতি গড়ে উঠেছে হয় কোনো নদীকে না হয় কোনো সাগরকে কেন্দ্র করে। বাতাসের নিশ্চয়তা সবখানে থাকে কিন্তু বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তা সবখানে থাকে না। ফলে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নীল অথবা ট্রাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর কূলেই।

পানি পান ছাড়া আমরা মাত্র কয়েকদিন বেঁচে থাকতে পারি। শরীরের 70 ভাগই পানি। এর মধ্যে রক্তে, কোষে এবং হাড়ে যথাক্রমে 18%, 75% এবং 22% পানি; এমনকি দাঁত ও চুলেও সামান্য পরিমাণ পানি থাকে। সমগ্র পৃথিবীতে 51 কোটি বর্গ কি.মি. পৃষ্ঠ পানি দ্বারা আবৃত যার মধ্যে 36.1 কোটি বর্গ কি.মি. সাগর বা মহাসাগর। পৃথিবীতে পানি মজুদ আছে মোট 26.6 ট্রিলিয়ন টন। এর মধ্যে 94.7% আছে লিথোস্ফেয়ারে এবং বাকি 5.3% বাস্তবে দেখা যায় হাইড্রোস্ফেয়ারে, যার মধ্যে 97% থাকে সাগরে। সমস্ত মজুদের মাত্র 3% মিষ্টি বা মৃদু পানি। শুধু এই 3% পানিই কেবল মানুষের পান বা অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে সেচ কাজে 30%, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে 50%, গৃহস্থালির কাজে 7% এবং শিল্প কারখানায় 12% ব্যবহৃত হয়।

০ প্রশ্ন-৪২. পানির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

উত্তর : পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জীবনকে আরও গতিশীল ও আরামদায়ক করার জন্য মিষ্টি পানির উপর ক্রমান্বয়ে চাপ বাড়ছে। ইতোমধ্যে অন্তত ২৫টি অঞ্চলে; যেমন- মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ভারত, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল প্রভৃতিতে পানি সম্পদের অপ্রতুলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবীতে এমন অনেক শহর আছে যেখানকার অধিবাসীদের পানি বাবদ মোট আয়ের ২০% খরচ করতে হয় এবং অনেক অঞ্চলে কয়েক মিলিয়ন শিশু ও নারীকে পানি সংগ্রহের জন্য প্রতিদিন অন্তত চার ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রতি তিনজনের মধ্যে একজন অর্থাৎ ২.৫ বিলিয়নেরও অধিক মানুষ বিশুদ্ধ পানি হতে বঞ্চিত। প্রায় ২৫,০০০ মানুষ প্রতিদিন পানি সম্বন্ধীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় এবং প্রতি বছর ৪০ লাখ শিশু পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব (যেমন- ডায়রিয়া) হতে মৃত্যুবরণ করে। যদি আমরা এবং আগামী প্রজন্ম পানিকে বিশুদ্ধ না রাখতে পারি বা পানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারি তবে আগামী ৫০ বছর পর বিশেষ করে পানীয় জলের অভাব এমন দাঁড়াবে যে, পানির মূল্য পেট্রোলের চেয়ে বেশি হবে। অনেকের ধারণা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হতে পারে বিশুদ্ধ পানির জন্যই।

বর্তমানে মনুষ্য সৃষ্ট উৎস হতে পানি দূষণ এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পানির অপর নাম 'জীবন' না হয়ে 'মরণ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশুদ্ধ পানি ছাড়া যেহেতু বেঁচে থাকাটাই দায় সেহেতু আমাদের সবার এখনই উচিত পানির যাচ্ছেতাই ব্যবহার রোধ করে এর বিশুদ্ধতা রক্ষায় সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

০ প্রশ্ন-৪৩. পানিতে দ্রবীভূত জৈব পদার্থের অপসারণ আলোচনা করুন।

উত্তর : দ্রবীভূত জৈব পদার্থের অপসারণ (Removal of dissolved organics) : পানীয় জলে বিদ্যমান কতিপয় বিচিত্র জৈব যৌগের স্বল্পমাত্রায় উপস্থিত ক্যান্সারসহ বিভিন্ন ধরনের রোগের উদ্ভব করে। পানির জীবাণুমুক্তকরণ প্রক্রিয়ায় পানিতে বিভিন্ন জৈব উপজাত সৃষ্টি করে বলে ধারণা করা হয়। পানিতে বিদ্যমান হিউমিক পদার্থ এবং জৈব যৌগের ক্লোরিনেশনে কতিপয় ক্লোরিনজাত যৌগ গঠিত হয়। তাই ক্লোরিনেশনের পূর্বে নিম্ন ঘনমাত্রাসম্পন্ন এসব জৈব যৌগের অপসারণ করে পানিতে ট্রাইহ্যালোমিথেন গঠনের কার্যকর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যায়। জীবাণুমুক্তকরণ উপজাত হিসেবে পানিতে অন্যান্য জৈব যৌগের মধ্যে অ্যালডিহাইড, কার্বক্সিলিক এসিড, অক্সোএসিড অন্যতম। জীবাণুমুক্তকরণ উপজাত ছাড়াও অনেক জৈব যৌগ সেকেণ্ডারি বর্জ্য পানি বিশোধন প্রক্রিয়াকাল উৎপন্ন হয়। এদের অধিকাংশ হিউমিক পদার্থ জাতীয় (আণবিক ভর; 1000-5000)। অন্যান্য যৌগের মধ্যে কার্বহাইড্রেট, প্রোটিন, ডিটারজেন্ট, লিগনিন, ট্যানিন উল্লেখযোগ্য। উচ্চ আণবিক ভর এবং অ্যানায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হিউমিক যৌগসমূহ বর্জ্য পানি বিশোধনের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে প্রভাবান্বিত করে। ইথার নিষ্কাশন দ্বারা এদের অধিকাংশই অপসারণ করা সম্ভব।

দ্রবীভূত জৈব পদার্থের অপসারণের সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে সক্রিয়কৃত কার্বনের (Activated carbon)-এর উপর পরিশোধন (adsorption)। সক্রিয়কৃত কার্বনকে যে কোনো কার্বনজনিত বস্তু কয়লা, কাঠ, লিগনাইট থেকে তৈরি করা যায়। কার্বনজনিত বস্তুকে বায়ুর অনুপস্থিতিতে 6000°C তাপমাত্রার নিচে আংশিক জারণ করে প্রস্তুত করা হয়।

600–700°C তাপমাত্রায় জারণ পদার্থ হিসেবে CO_2 ব্যবহার করা যায়—

$$CO_2 + C \rightarrow 2CO$$

অথবা কার্বনকে 800 - 900°C তাপমাত্রায় পানি দ্বারা জারণ করা হয়—

$$H_2O + C \rightarrow H_2 + CO$$

এসব প্রক্রিয়ায় সূক্ষ্ম ছিদ্রসহ বৃহৎ পৃষ্ঠতল ক্ষেত্রবিশিষ্ট কার্বন পরমাণুর বিশেষ বিন্যাসবিশিষ্ট কাঠামো অর্জিত হয়, যা জৈব যৌগের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করে (Surface area : 500–1500 m^2/g)।

সক্রিয়কৃত কার্বন সাধারণত দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা : দানাদার এবং পাউডারকৃত সক্রিয় কার্বন। দানাদার সক্রিয়কৃত কার্বনের কণার আকার 0.1–1 mm ব্যাসবিশিষ্ট এবং পাউডারকৃত সক্রিয় কার্বন কণার ব্যাস 50-100μm।

সক্রিয়কৃত কার্বন দ্বারা জৈব যৌগের পরিশোষণ প্রক্রিয়ায় প্রকৃত কৌশল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা হচ্ছে জৈব অণুসমূহ দুর্বল ভ্যান্ডার ওয়ালস বলের মাধ্যমে পৃষ্ঠদেশে পরিশোষিত হয়। সক্রিয়নকৃত কার্বনের বৃহৎ পৃষ্ঠতলীয় ক্ষেত্রফল পরিশোষক হিসেবে এর কার্যকারিতাকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছে। পাউডারকৃত সক্রিয় কার্বনের ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হলেও পানি বিশোধনে দানাদার সক্রিয়কৃত কার্বনের ব্যবহার এখনও ব্যাপক। সক্রিয়কৃত কার্বনকে সুনির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত করে উপর থেকে নিচের দিকে পানির প্রবাহ চালনা করা হয়। জৈব যৌগসমূহ স্থির দশা (activated carbon) কর্তৃক শোধিত হয়। স্টিম বায়ুতে 950°C উত্তপ্ত করে ব্যবহৃত কার্বনকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। এই প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত জৈব যৌগসমূহ জারিত হয় এবং কার্বন পৃষ্ঠদেশে পুনরুৎপাদিত হয়।

সম্প্রতি সাংশ্লেষিক পলিমার জাতীয় বিভিন্ন পরিশোধক উদ্ভাবিত হয়েছে। অ্যাম্বারলাইট XAD-4 (Amberlite XAD-4) এদের অন্যতম।

○ প্রশ্ন-৪৪. পানিতে দ্রবীভূত অজৈব যৌগের অপসারণ আলোচনা করুন।

উত্তর : দ্রবীভূত অজৈব যৌগের অপসারণ (Removal of dissolved inorganics) : পানির পূর্ণাঙ্গ বিশোধনে অজৈব দ্রবণসমূহকে অপসারণ অপরিহার্য। সেকেন্ডারি বর্জ্য বিশোধন থেকে প্রাপ্ত প্রবাহে সাধারণত 300–400 mg/L পর্যন্ত দ্রবীভূত অজৈব পদার্থ থাকে। সুতরাং পানির পুনর্ব্যবহার কিংবা ভূপৃষ্ঠীয় জলাধারে নিক্ষেপের পূর্বে সংক্রেমিত পানি থেকে অজৈব যৌগের অপসারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত।

বিশেষ করে পানি থেকে নাইট্রোজেন এবং ফসফরাস অপসারণ করা না হলে পরবর্তী পর্যায়ে জলাশয়ে ইউট্রোফিকেশন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটে। কতিপয় ক্ষেত্রে বিষাক্ত স্বল্প মাত্রার ধাতুর অপসারণও অপরিহার্য। অজৈব পদার্থের অপসারণে পাতন প্রণালী অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি হলেও এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অধিকন্তু পানিতে বিদ্যমান উদ্বায়ী পদার্থসমূহ (যেমন-NH_3) পাতন প্রণালীতে কার্যকরভাবে পৃথক হয় না, বরং পাতিতের সাথে বাহিত হয়।

মেমব্রেন প্রক্রিয়াসমূহ বর্তমানে অধিকতর ফলপ্রসূ হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে; ইলেকট্রোডায়ালাইসিস, আয়ন বিনিময়, বিপরীত অসমোসিস প্রক্রিয়াসমূহ উল্লেখযোগ্য। পানির বিশুদ্ধকরণে অন্যান্য মেমব্রেন প্রক্রিয়াসমূহের মধ্যে ন্যানোফিল্ট্রেশন, আল্ট্রাফিল্টেশন, মাইক্রোফিল্টেশন অন্যতম।

○ প্রশ্ন-৪৫. বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য পানির বিশোধন আলোচনা করুন।

উত্তর : বিশোধন প্রক্রিয়া : বর্জ্য পানিকে প্রথমে প্রাইমারি বিশোধন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়া চুল, মাংসের অংশ, অদ্রবীভূত কঠিন পদার্থ অপসারিত হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে সেকেন্ডারি বিশোধন প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক অধঃক্ষেপণ এবং জৈব বিশোধন সম্পন্ন করা হয়। লাইম দ্বারা অধঃক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় ক্রোমিয়াম অপসারণের পর সক্রিয়কৃত স্লাজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ক্ষুদ্র এবং বিচ্ছিন্ন ট্যানারি শিল্পের ক্ষেত্রে জারণ-পুকুর এবং অবায়বীয় লেগুন অধিকতর গ্রহণযোগ্য। দ্রবণে অত্যধিক NaCl-এর উপস্থিতির কারণে বিশোধিত বর্জ্য পানি তথাপি সমস্যার সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-৪৬. পানির খনিজমুক্ত বা আয়নমুক্তকরণ ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

উত্তর : পানিকে সম্পূর্ণভাবে আয়নমুক্ত করতে হলে এক স্তর বা মনোবেড (monobed) ইউনিটে অবশ্যই উচ্চ অ্যাসিটিক রেজিনের সাথে সম্মিলিতভাবে উচ্চ ক্ষারকীয় রেজিন থাকতে হবে। পানিকে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন বিনিময়কারীর ভেতর দিয়ে প্রেরণ করে একে খনিজমুক্ত করা হয়। পানির সব আয়ন দ্রবীভূত করার কেবলমাত্র অন্য পদ্ধতি হলো পাতন। এতে কলুষিতকরণ এড়ানোর জন্য ব্লক টিন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পাতিত পানি অথবা আয়নমুক্ত পানি সরবরাহ করার জন্য অ্যালুমিনিয়াম এবং ছাঁচে তৈরি পলিভিনাইলিডিন ক্লোরাইড পাইপ ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৪৭. গৃহকাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পানির উপযোগীকরণ আলোচনা করুন।

উত্তর : গৃহকাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পানির উপযোগীকরণ (Water conditioning for domestic use) : গৃহকাজে ব্যবহার উপযোগী পানি অবশ্যই ভেজাল মুক্ত হওয়া দরকার। এই পানি খাওয়া, ধোয়া, মাজা এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই পানিকে

১. স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিরাপদ,
২. ন্যায়সংগতভাবে মৃদু,
৩. কার্যত বর্ণহীন এবং
৪. দূষণীয় দুর্গন্ধ ও বিস্বাদহীন হতে হবে।

খাবার পানির উপযোগীকরণ : নিম্নলিখিত চারটি স্তরে এটি সম্পন্ন করা হয়–i. তলায়ন, ii. জমাটবন্ধন, iii. ছাঁকন ও (iv) জীবাণুমুক্তকরণ।

i. **তলায়ন (Sedimentation) :** তলায়ন এমন এক ধরনের প্রক্রিয়া যার ফলে পানি হতে প্রলম্বিত (suspended) বস্তুকে পৃথক করা হয়। এক্ষেত্রে প্রলম্বিত বস্তু সম্বলিত পানিকে একটি ট্যাংকে স্থির অবস্থায় রেখে দিলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ট্যাংকের তলদেশে জমা হয়। পরে পরিষ্কার পানি উপর হতে সংগ্রহ করা হয়। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়াটি একটি অবিরাম ফ্লো টাইপ ট্যাংকে ঘটানো হয়। এই ট্যাংকে পানি অনবরত অনুভূমিক/রেডিয়াল/উল্লম্ব দিকে সমগতিতে পানি চালনা হয়।

ii. **জমাটবন্ধন (Coagulation) :** তলায়ন ট্যাংক হতে পানি জমাটবন্ধন ট্যাংকে যায়। এখানে পানিতে উপস্থিত সূক্ষ্ম বালি, কাদা ও কলয়েড ভেজালগুলো প্রথমে জমাট বাঁধে। এই ভেজাল কণাগুলো যাতে দ্রুত জমাট বাঁধে তার জন্য ট্যাংকে আয়রন বা অ্যালুমিনিয়াম লবণকে জমাট বাঁধক হিসেবে যোগ করা হয়। এগুলো এদের আঠালো হাইড্রোক্সাইড অধঃক্ষেপ গঠন করে। এই হাইড্রক্সাইডগুলো প্রলম্বিত ভেজালগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে বড় আকারে পরিণত হয় ও সহজেই নিচে জমা হয়।

অর্থাৎ পানিতে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট যোগ করলে নিম্নরূপে আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে-

$$Al_2(SO_4)_3 + 6H_2O \rightleftharpoons 2Al(OH)_3 + 3H_2SO_4$$

পূর্ণ আর্দ্রবিশ্লেষণের জন্য H_2SO_4-কে প্রশমিত করা প্রয়োজন। যদি পানি প্রাথমিকভাবে ক্ষারীয় থাকে, তবে-

$$Al_2(SO_4)_3 + 3Mg(HCO_3)_2 \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3MgSO_4 + 6CO_2$$

যদি পানি যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষারীয় না থাকে, তবে Na_2CO_3 বা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যোগ করা হয়।

$$Al_2(SO_4)_3 + 3Na_2CO_3 + 3H_2O \rightarrow 2Al(OH)_3 + 3Na_2SO_4 + 3CO_2$$

অ্যাসিডিয় পানির ক্ষেত্রে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট যোগ করে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডে পরিণত করা হয়।

$$NaAlO_2 + 2H_2O \rightleftharpoons NaOH + Al(OH)_3$$

যথার্থ জমাট বাঁধার জন্য পানির pH-এর মান নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় ও জমাট বন্ধনকারী পদার্থকে ভালোভাবে মিশানো হয়।

iii. **ছাঁকন বা পরিস্রাবণ (Filtration) :** গৃহকাজে ব্যবহৃত পানির ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াটি হলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এ প্রক্রিয়াটি হলো ভাসমান বস্তু সম্বলিত তরল পানিকে সুবিধাজনক ছিদ্রবিশিষ্ট পদার্থের মধ্যে দিয়ে চালনা করে ভাসমান পদার্থ দূর করা। দেখা যায় যে, পুরু বালির স্তরের মধ্য দিয়ে পানিকে চালনা করা হলে ভাসমান পদার্থ, কলয়ডীয় পদার্থ এবং অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া, রং ও গন্ধ পানি হতে দূরীভূত হয়।

প্রশ্ন-৪৮. নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলতে কি বোঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রকৃতি জগতে বিদ্যমান বিভিন্ন শক্তির ভিন্ন ভিন্ন উৎস রয়েছে। যথা- তাপশক্তির প্রধান উৎস তেল, গ্যাস ইত্যাদি। আবার তাপশক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তি ও যান্ত্রিক শক্তি পেতে পারি। কিন্তু শক্তির উৎস হিসেবে এর একটিও অফুরন্ত নয় বরং ক্রম ব্যবহারের ফলে এগুলো একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রকৃতিতে এমন কতিপয় অফুরন্ত শক্তিভাণ্ডার রয়েছে, যা বহুবিধ ব্যবহারেও নিঃশেষ হবে না ঐসব উৎসকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলে। সৌরশক্তি, বিশাল জলরাশির প্রবাহ, বাতাস ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। উদাহরণস্বরূপ দীর্ঘক্ষণ সূর্যালোক পড়ে এমন জায়গায় বিরাট দর্পণ বসিয়ে সূর্যরশ্মিকে বিশেষভাবে নির্মিত বয়লারে কেন্দ্রীভূত করে প্রচুর তাপ সৃষ্টি করা যায়। এ তাপ দ্বারা বাষ্প উৎপন্ন করে জেনারেটারের সাহায্য বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। আবার বহমান স্রোতকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। চট্টগ্রামের কাপ্তাই বাঁধ প্রকল্প এরকম একটি প্রকল্প। সূর্যতাপ বা স্রোতের এ ধরনের ব্যবহারের ফলে এগুলো নিঃশেষ হবে না। এ কারণে এদেরকে নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলা যায়।

প্রশ্ন-৪৯. জলবিদ্যুৎ কিভাবে সৃষ্টি করে?

উত্তর : পানি দিয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে জলবিদ্যুৎ বলে।

প্রশ্ন-৫০. পানির পুনঃআবর্তন বিষয়টি বিস্তারিত লিখুন।

উত্তর : পানির পুনঃআবর্তন : ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগই পানি দ্বারা আবৃত, কিন্তু বেশির ভাগ পানিই (শতকরা ৯৭ ভাগ) লবণাক্ত হওয়ায় তা সরাসরি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় না। মিঠা পানির বড় একটি অংশ বিশেষ করে নদ-নদী, খাল-বিল ও হ্রদের পানি নানাভাবে প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে চলেছে এমনকি ভূগর্ভস্থ পানি যা আমরা কূপ বা নলকূপ থেকে পাই এবং খাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করি, সেটিও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ (যেমন– আর্সেনিক) দ্বারা দূষিত হয়ে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। তাহলে আমাদের ব্যবহারের উপযোগী পানির পরিমাণ কি খুবই সীমিত নয়? হ্যাঁ, যদিও আমাদের প্রচুর পানিসম্পদ রয়েছে, কিন্তু ব্যবহার উপযোগী পানির পরিমাণ খুবই অল্প ও সীমিত। তাই পানি ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সাশ্রয়ী হতে হবে এবং একই পানি কীভাবে বার বার ব্যবহার করা যায় সেটিও চিন্তা করতে হবে।

প্রকৃতিতে পানির পুনঃআবর্তন ঘটছে। দিনের বেলা সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের পানি (সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিলের পানি) বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ ও পরে তা বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে। এই বৃষ্টির পানির বড় একটি অংশ নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং আবার বাষ্পীভূত হয় ও বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে। পানির এই পুনঃআবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পুনঃআবর্তন না হলে বৃষ্টিই হতো না, ফলে মরুভূমিতে পরিণত হয়ে যেত পুরো পৃথিবী। প্রচণ্ড খরা হতো, ফসল উৎপাদন কমে যেত। বৃষ্টি হলো প্রাকৃতিকভাবে পানির পুনঃআবর্তন। আমরা যদি ব্যবহারের পর বর্জ্য পানি সংগ্রহ করে তা পরিশোধন করে আবার ব্যবহার করি তাহলে সেটিও কিন্তু এক ধরনের পুনঃআবর্তনই হবে।

প্রশ্ন-৫১. পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা : যেহেতু পরিবেশের প্রায় প্রতিটি উপাদান ও প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পানির উপর নির্ভরশীল, তাই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে পানি অপরিহার্য। পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাবে না, ফসল উৎপাদন হবে না এবং আমাদের অস্তিত্ব তথা পুরো পরিবেশই ধ্বংস হয়ে যাবে।

মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা : হাত-মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে গোসল, রান্না-বান্না, কাপড় পরিষ্কার করা এবং সর্বোপরি খাওয়ার জন্য পানি যদি গন্ধযুক্ত বা লবণাক্ত হয়, তবে তা খাওয়ার উপযোগী হবে না। এর বাস্তব প্রমাণ হলো আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় নদী ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হওয়ায় তারা ঐ পানি খেতে তো পারছেই না, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের বেশির ভাগ কাজেই ব্যবহার করতে পারছে না। তারা বৃষ্টির পানি সংগ্রহের পর পরিশোধন করে, তারপর পান করছে ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে। আবার খাওয়ার পানি যদি মানসম্মত না হয়, বিশেষ করে এতে যদি রোগজীবাণু থাকে, তাহলে তা মারাত্মক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটাতে পারে। সমুদ্রের পানি কৃষিকাজে বা শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা যায় না। কারণ সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে, যা শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (যেমন–বয়লার) ক্ষয়সাধন করে ও নষ্ট করে ফেলে। একইভাবে আমাদের বেশিরভাগ ফসলাদিই লবণ পানিতে জন্মাতে পারে না। অর্থাৎ লবণাক্ত পানি কৃষিকাজের জন্য উপযোগী নয়।

মোটকথা, শিল্পকারখানা থেকে শুরু করে কৃষিকাজ ও দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই মানসম্মত পানি অত্যাবশ্যক। তা না হলে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও মারাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে।

প্রশ্ন-৫২. পানির বিশুদ্ধকরণ এর ক্লোরিনেশন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ক্লোরিনেশন : যদি পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে, তবে তা অবশ্যই দূর করতে হবে এবং তা করা হয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে। নানারকম জীবাণুনাশক পানি বিশুদ্ধকরণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অন্যতম হলো ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2)। এছাড়া ব্লিচিং পাউডার [Ca(OCl)Cl] এবং আরও কিছু পদার্থ যার মধ্যে ক্লোরিন আছে এবং যা জীবাণু ধ্বংস করতে পারে তা ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য যে ট্যাবলেট বা কীট ব্যবহার করা হয় সেটি হলো মূলত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড (NaOCl)। এতে বিদ্যমান ক্লোরিন পানিতে থাকা রোগজীবাণু ধ্বংস করে। ক্লোরিন ছাড়াও ওজোন (O_3) গ্যাস দিয়ে অথবা অতিবেগুনি রশ্মি দিয়েও পানিতে থাকা রোগজীবাণু ধ্বংস করা যায়। বোতলজাত পানির কারখানায় এ পদ্ধতিতে পানিকে রোগজীবাণুমুক্ত করা হয়।

ঘ

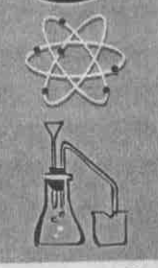

বাংলাদেশে পানির উৎসসমূহের দূষণের কারণ; উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানব জীবনে পানি দূষণের প্রভাব; বিশুদ্ধ পানির উপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

Reasons for pollution of water sources in Bangladesh, effects of water pollution on plants, animals and human beings, effects of global warming on fresh water

○ প্রশ্ন-৫৩. পানি দূষক (water pollutant) বলতে কি বুঝেন? বাখ্যা করুন।

উত্তর : পানির দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ/বস্তুকে বা শর্তকে পানির দূষক বলা হয়। পানি দূষকগুলোকে রাসায়নিক গঠন অনুসারে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। পানি দূষকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো।

i. জৈব দূষক,
ii. অজৈব দূষক,
iii. জীবন্ত দূষক,
iv. বিষক্রিয়া সম্পন্ন ধাতু,
v. ভাসমান কঠিন পদার্থ ও
iv. তলানি।

উপর্যুক্ত ক্ষতিকারক পদার্থগুলো নদ-নদী সিস্টেমে সংযুক্ত হলে পানি এমন পরিমাণে বিষাক্ত হয়, যার ফলে মাছ মরে পানিতে ভাসতে থাকে। অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রতিও এরূপ অবস্থা ঘটে ফলে তাঁদের জীবন হুমকির সম্মুখীন হয়।

অজৈব দূষক : অজৈব দূষকের মধ্যে অজৈব লবণ, ধাতব যৌগ, খনিজ এসিড, ধাতু জটিল যৌগ, ক্ষুদ্র কণা, জৈব ধাতব যৌগ, পলি ফসফেটিক, ডিটারজেন্ট উল্লেখযোগ্য। এ দূষকসমূহ রাসায়নিক কারখানা, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ কয়লার খনি, আকরিক থেকে ধাতু পৃথককরণসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানিতে মিশ্রিত হয়।

○ প্রশ্ন-৫৪. অজৈব পানি দূষকের শ্রেণিবিভাগ করে, বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : অজৈব পানি দূষকের শ্রেণিবিভাগ (Classification of inorganic water pollutant) :

১. **এসিড ও ক্ষার :** কারখানা হতে উৎপন্ন হাইড্রোক্লোরিক, নাইট্রিক, সালফিউরিক এবং ফসফরিক এসিড, সালফার ডাই-অক্সাইড, ক্লোরিন, নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, অ্যামোনিয়া এবং সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের হাইড্রোক্সাইডসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণে এসিড ও ক্ষার পানিতে মিশ্রিত হয় যা মানুষ, পশু-পাখি এবং এবং অন্যান্য জীবজন্তুর জন্য ক্ষতিকর।

২. **দ্রবীভূত লবণ :** কার্বনেট, বাইকার্বনেট, অ্যাসিটেট, নাইট্রেট, নাইট্রাইট, ক্লোরাইড, ফ্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইড, সালফেট ইত্যাদি আয়ন এবং কপার ক্যাপসিয়াম, মারকারি, জিংক, নিকেল ম্যাঙ্গানিজ কোবাল্ট, লেড, টিন, আর্সেনিক ইত্যাদির সালফাইডসমূহ দ্বারা দ্রবীভূত লবণ গঠিত। উপর্যুক্ত লবণসমূহ পানিতে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত হলে মারাত্মক পানি দূষণ ঘটে। পানিতে আয়রন, ক্যাডমিয়াম, সোডিয়াম, লিথিয়াম এবং সিলিকা মিশ্রিত কিছু ধাতব ও অধাতব পদার্থ জীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

৩. **অদ্রবণীয় লবণ :** ক্যালসিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ধূলিকণা এবং বস্তুকণা ইত্যাদি পানিতে অদ্রবণীয় কিন্তু এরা পানিকে দূষিত করে।

৪. **পলিফসফেট :** ডিটারজেন্টে যে পলি-ফসফেট থাকে সেটি পানিতে প্রচুর পরিমাণে ফসফেট নির্গত করে। এ ফসফেট পানিতে শৈবালের পুষ্টিসাধান করে। ফলে শৈবালের অধিক্য ঘটে এবং পানি দূষিত হয়।

৫. **Acid main drainage :** এটি পানি দূষকের প্রথম উৎস যা জলীয় পরিবেশকে এসিড বৃষ্টির ন্যায় মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এটি জলস্রোতের উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে এবং কয়লার খনি এলাকার পানি দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কয়লা উত্তোলনের সময় আয়রন পাইরাইটস বায়ু ও পানির উপস্থিতিতে জারিত হয়ে H_2SO_4, $Fe(OH)_3$, উৎপন্ন হয় যা চুয়ে স্থানীয় পানিতে মিশে যায়।

৬. **অজৈব কীটনাশক :** কপার, ক্যাডমিয়াম, আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, জিংক এবং কোবাল্ট ইত্যাদি অজৈব কীটনাশক ক্ষতিকর পানি দূষক। এগুলো মারাত্মক পরিণতি সৃষ্টি করে। অজৈব কীটনাশকের মধ্যে সালফার এবং আর্সেনিক পানিতে মিশ্রিত হয়ে জলীয় পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

৭. **অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি :** প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উৎস থেকে অজৈব ধাতব-পদার্থ এবং জৈব প্রজাতিই বিষাক্ত জবৈ ধাতব যৌগ গঠন করে। এ যৌগসমূহের মিথক্রিয়া জারণ-বিজারণের সাম্যাবস্থায়, প্রশমনে,কলয়েড প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সূক্ষাতিসূক্ষ্ম জীবাণু জলীয় ইকোসিস্টেমের বিক্রিয়ার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-৫৫. পানি দূষণ বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : পানি দূষণ (Water Pollution) : পানিতে অতিরিক্ত বাহ্যিক পদার্থ যুক্ত হলে বা কোনো তাপীয় প্রক্রিয়ার দ্বারা পানির ভৌত, রাসায়নিক এবং জীব বৈজ্ঞানিক ধর্মের এবং পানীয় গুণাগুণে পরিবর্তন ঘটে, তাকে পানি দূষণ বলে। আবার যে পানি উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের জন্য নিরাপদ নয়, এমন পানিকে দূষিত পানি বলে। মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের জন্য ক্রমবর্ধমান পানি দূষণের ফলে পানি সম্পদের ব্যাপকতা সংকুচিত হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৫৬. দূষিত পানি বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : পানির মধ্যে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকে যা মানব প্রাণিকূলের জন্য ক্ষতিকর এবং জলজ প্রাণীর জন্য হুমকিস্বরূপ তবে সেই পানিকে দূষিত পানি (Polluted water) বলে। জাতীয় পানি কমিশনের সংজ্ঞানুযায়ী অধিকাংশ মানুষ কর্তৃক ব্যবহার উপযোগী পানি যদি যথেষ্ট উচ্চ মানসম্পন্ন না হয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে ব্যবহারযোগ্য না হয় তবে তাকে দূষিত পানি (Polluted water) বলে। দূষিত পানি পান করার ফলে মানুষসহ অন্যান্য জীবজন্তুর প্রভূতি ক্ষতি সাধিত হয়। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

○ প্রশ্ন-৫৭. পানির ভৌত দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির ভৌত দূষণ (Physically polluted water or physical pollution of water) : ভৌতভাবে দূষিত পানির স্বাভাবিক অবস্থা হতে বর্ণ, গন্ধ, ঘনত্ব, স্বাদ ঘোলাত্ব ও তাপীয় ধর্ম প্রভৃতি পরিবর্তিত হয়।

১. বর্ণ : বিষাক্ত পদার্থ ছাড়া পানির বর্ণ পরিবর্তন তেমন ক্ষতিকর নয়, তবে পানির নির্দিষ্ট গভীরে গাছ ও প্রাণীর মেটাবলিজমের জন্য প্রবেশিত সূর্যালোকের মানকে প্রভাবিত করতে পারে। বিভিন্ন জৈব রঙ ও অজৈব জটিল বাণিজ্যিক বর্ণ হতে অধিকাংশ পানি বর্ণিল হয়। সামান্য ম্যাজেন্টা (0.0_2 ppm) হতেও পানি রঙিন হয়। এছাড়া পানিতে প্রাকৃতিকভাবে আসা উপাদানের সাথে বাণিজ্যিক প্রবাহীর মিথস্ক্রিয়ায়ও পানি বর্ণিল হতে পারে।

২. গন্ধ : রাসায়নিক মাধ্যমে যেমন– H_2S, Cl_2, NH_3, ফেনল, অ্যালকোহল, এস্টার হাইড্রোকার্বন ইত্যাদি) ও জীবাণুঘটিত মাধ্যম (যেমন– শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি)। উভয়ের জন্যই পানি গন্ধযুক্ত হতে পারে। পানির pH কম হলে H_2S (অ্যাসিডিয় পদার্থ) বেশি থাকে। ফলে পানির গন্ধও বেশি হয়। N_2, S, P ও পচনশীল জৈব বস্তুর কতিপয় জৈব ও অজৈব বস্তু কর্তৃক দূষিত পানি অসহ্য গন্ধ হয়।

৩. ঘোলাত্ব : ঘোলা পানিতে কোলয়ডাল দ্রব্য, সূক্ষ্ম ভাসমান কণা ও মাটির ক্ষয়িত অংশ থাকে Fe, Mn, Ni, Co, Pb, Sb, Bi প্রভৃতির কারণে পানি ঘোলা হয়। এরূপ ঘোলা পানি শিল্প কার্যে বা গৃহকার্যে ব্যবহার অনুপযোগী।

৪. স্বাদ : Fe, Mn ফেনল, যুক্ত ক্লোরিন ও জলীয় একটি নোমাইসিটিস যুক্ত শৈল্পিক প্রবাহী মাটির মতও ছাতা পড়া স্বাদযুক্ত হয়। Mn তেল হাইড্রোকার্বন ক্লোরোফেনল, বিয়োজিত জৈব শৈবাল, ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও প্যাথেজেন পানির অদ্ভুত স্বাদ তৈরি করে।

৫. ফেনা : সাবান, সাংশ্লেষিক ডিটারজেন্ট, সিনডেট এবং কাগজ ও মন্ড শিল্পের অশোধিত জৈব প্রবাহী ফেনা তৈরি করে।

৬. তাপীয় : বিভিন্ন তাপীয় শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের বর্জিত অংশের অব্যবহৃত তাপ হতে প্রধানত তাপীয় দূষণ হয়। তাপীয় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায় যার কারণে জৈব বস্তু দ্রুত ভেঙে যায়।

○ প্রশ্ন-৫৮. পানির রাসায়নিক দূষণ আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির রাসায়নিক দূষণ (Chemically polluted water or chemical pollution of water) : অ্যাসিডীয়, ক্ষারীয় বা pH পরিবর্তন, দ্রবীভূত অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাসের পরিবর্তনের জন্য পানি রাসায়নিকভাবে দূষিত হয়। এটি জৈব বা অজৈব দূষকসমূহ দ্বারা দূষিত হয়।

জৈব দূষণসমূহ : জৈব দূষকসমূহ দু'প্রকার হতে পারে। যথা :

বায়োগ্রেডেবল জৈব দূষকসমূহ : বায়োডিগ্রেডেবল জৈব দূষকসমূহ সাধারণত গৃহকার্যের বর্জিত প্রোটন, পানির কারখানা, ট্যানারি, কসাইখানা, নর্দমার ময়লার চর্বি, সাবান উৎপাদন, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, প্রশম প্রক্রিয়াকরণ কার্বোহাইড্রেট সুগন্ধ স্টার্চ টেক্সটাইল, কাগজ কল, পলিমার রেজিন কয়লা তেল প্রভৃতিসহ গৃহকার্যের বিভিন্ন ধরনের জৈব বস্তু ও শিল্প বর্জ্য এবং সূক্ষ্মাঙ্গীর জন্য অবিষাক্ত সাংশ্লেষিক যৌগে থাকে।

নন-বায়োডিগ্রেডেলে জৈব দূষকসমূহ : নন-বায়োডিগ্রেডেবল জৈব দূষকসমূহ হলো পানির ঐ সকল দূষক যারা জলীয় সিস্টেমে দীর্ঘদিন স্থায়ী থাকে। যেমন– কীটনাশক, ছত্রাকনাশক, জীবাণুনাশক, আগাছানাশক, পতঙ্গনাশক, নেমাটোসাইড মটিসাইড প্রভৃতি প্রধান। কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ও রক্ষার জন্য এ সকল জৈব দ্রব্য ব্যবহৃত হলেও এরা নিকটস্থ পানির উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-৫৯. পানির জীবাণুঘটিত দূষণ আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির জীবাণুঘটিত দূষণ (Biologically polluted water or biochemical pollution of water) : মানুষ, বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীসহ উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীর দৈহিক নিঃসারক উপাদানের কারণে পানি দূষিত হয়। বিভিন্ন প্রজাতির পাখির দ্বারাও পানি দূষিত হয়। এরূপ দূষিত পানি প্রধানত Coliform group ও নির্দিষ্ট subgroups, বিষ্ঠাত্যাগী স্ট্রেপটোকক্কাই ও বিবিধ প্রত্যঙ্গ ধারণ করে। জীবাণুঘটিত পানি ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, ক্যাস্টিয়ান ও গাছের টক্সিন ধারণ করে। এরূপ দূষিত পানি পানে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড তান্ত্রিক সংক্রমণ হয়।

○ প্রশ্ন-৬০. দূষিত পানির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : দূষিত পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of polluted water)

১. **ভৌত বৈশিষ্ট্য :**
ক. পানির স্বাভাবিক বর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়;
খ. পানি দুর্গন্ধ আসতে পারে;
গ. পানিতে সহজে ফেনা হয় না;
ঘ. পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে;
ঙ. পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় এবং
চ. পানির স্বচ্ছতা থাকে না।

২. **রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য :**
ক. পানির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব বেড়ে যায়;
খ. পানির খরতা বেড়ে যায়;
গ. পানিতে রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ে এবং
ঘ. পানিতে বিভিন্ন আয়নের পরিমাণ বেড়ে যায়।

৩. **প্রাণরাসায়নিক বৈশিষ্ট্য :**
ক. পানির প্রাণরাসায়নিক চাহিদা বেড়ে যায়;
খ. পানিতে বিভিন্ন আগাছা, শেওলা প্রভৃতি জন্মে;
গ. পানিতে জলজ জীবাণুর পরিমাণ বেড়ে যায় এবং
ঘ. পানি পানের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

○ প্রশ্ন-৬১. পানি দূষণের উৎপত্তি বা উৎসসমূহ কি কি?

উত্তর : পানি দূষণের উৎপত্তি বা উৎসসমূহ (Origin or sources of polluted water) : পানি দূষণের উৎসসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. প্রাকৃতিক উৎসসমূহ ও ২. মনুষ্য সৃষ্ট উৎসসমূহ।

○ প্রশ্ন-৬২. পানি দূষণের প্রাকৃতিক উৎসসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রাকৃতিক উৎসসমূহ : পানি দূষণের প্রাকৃতিক উৎসগুলোর মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গ্যাস ও পদার্থসমূহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের মৃত্যুজনিত বর্জ্য পদার্থসমূহ, পাহাড়ের

ক্ষয়জনিত পদার্থসমূহ, ভূমি ধস ও ভূমি ক্ষয়জনিত পদার্থসমূহ দ্বারা প্রাকৃতিক পানি যেমন— নদী, খাল-বিলের পানি দূষিত হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন— ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, হারিকেন, টাইফুন প্রভৃতির কারণে সমুদ্রের উপকূল এলাকাসমূহ পানিতে প্লাবিত হয় ও প্রাণিকুলের মৃত্যু, গাছপালা ও বিভিন্ন অপদ্রব্য পানিতে মিশে গিয়ে পানিকে দূষিত করে। বন্যায় ব্যাপক এলাকা যখন ভেসে যায় তখন প্রচুর জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, যাদের মৃত্যুর ও পচনের দ্বারা পানি দূষিত হয়।

○ প্রশ্ন-৬৩. পানি দূষণের মনুষ্য সৃষ্ট উৎসসমূহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : মনুষ্য সৃষ্ট উৎসসমূহ : পানি দূষণের উৎসের মধ্যে মনুষ্য সৃষ্ট উৎস হলো পানি দূষণের প্রধান কারণ। শিল্প কারখানার বর্জ্য, পানি ও মিউনিসিপালিটির বর্জ্য, গৃহস্থালির ব্যবহৃত বর্জ্য পানি, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মল-মূত্র, পশু-পাখির মৃতদেহ, হাট-বাজারের ব্যবহৃত ময়লা-আবর্জনা প্রভৃতি পানিতে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে প্রচুর দ্রবীভূত অক্সিজেন খরচ হয়ে পানি দূষিত হয়। বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য, ধাতব শিল্পের বর্জ্য, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট থেকে নির্গত দূষিত পানি, কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন কীটনাশক ঔষধ, পেস্টিসাইড প্রভৃতি পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। এসব আবর্জনা ও বর্জ্য পানিতে মিশ্রিত হওয়ার ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পানিকে দূষিত করে। মনুষ্য সৃষ্ট পানি দূষকের উৎসকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

শিল্প সংস্থা	নির্গত দূষক
অ্যাসিটেট রেওন	অ্যাসিটিক এসিড
ভিসকোজ রেওন	জিঙ্ক, সালফাইড
কিউপ্রামোনিয়াম রেওন	কপার
পারমাণবিক প্ল্যান্ট	ফ্লুরাইড
ব্যাটারি তৈরির কারখানা	সীসা, খনিজ এসিড
সিরামিক প্ল্যান্ট	ফ্লুরাইড
পেপার মিল	মুক্ত ক্লোরিন
তেল শোধনাগার	মারক্যাপট্যান
চামড়া কারখানা	টারটারিক এসিড
লন্ড্রি	ক্ষার, ক্লোরিন, তেল, ফ্যাট এবং গ্রিজ
খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ	শ্বেতসার
ফার্টিলাইজার প্ল্যান্ট	ফ্লুরাইড, ফসফেট
রঙ কারখানা	সীসা
ডেয়ারী	সুগার
ফটোগ্রাফি	সিলভার
ট্যানারি	সালাইড, ক্রোমিয়াম, ফেনল, ট্যানিক এসিড
বস্ত্র কারখানা	খনিজ এসিড, ফ্যাট, তেল, গ্রিজ, জিঙ্ক
হালকা পানীয় তৈরির কারখানা	সাইট্রিক এসিড,

○ প্রশ্ন-৬৪. পানির দূষণের বিন্দু ও অ-বিন্দু উৎস আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির দূষণের বিন্দু ও অ-বিন্দু উৎস (Point & non-point sources of water pollution) : পানি প্রাকৃতিক উপায়ে ও মনুষ্য সৃষ্ট উপায়ে দূষিত হয়। তবে মনুষ্য সৃষ্ট উৎসই পানি দূষণের প্রধান উৎস। আবার পানির কোনো বিভেদ প্রাচীর না থাকায় কোনো একটি দেশে উৎপন্ন পানি দূষক পৃথক একটি দেশের পানীয় বা গোসলের পানিকে সংক্রামিত করে তথা দূষিত করতে পারে। উল্লেখ্য যে, মনুষ্য সৃষ্ট পানি দূষকের উৎসকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

ক. বিন্দু উৎস (Point sources) ও

খ. অ-বিন্দু উৎস (Non-point sources)।

ক. **বিন্দু উৎস (Point sources) :** বিন্দু উৎসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো— কল-কারখানা, পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং নর্দমার নিষ্কাশিত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট। এসব উৎস থেকে বিপুল পরিমাণে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পয়ঃপ্রণালী ও নদনদীতে গিয়ে পড়ে।

খ. **অ-বিন্দু উৎস (Non-point sources) :** কৃষিকার্যে, অরণ্য, বাগান এবং শহরাঞ্চলের রাস্তা অ-বিন্দু উৎসের অন্তর্ভুক্ত। বৃষ্টির পানির মাধ্যমে তেল পরিবহনে ব্যবহৃত রাস্তা থেকে তেল, শহরাঞ্চলের বাগান বা লন থেকে পেস্টিসাইড ও রাসায়নিক সার প্রথমে ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালীর পানিতে মিশে এবং অবশেষে ড্রেনের পানির মাধ্যমে হ্রদ বা নদনদীকে বৃহৎ, পানির ভাণ্ডারে বাহিত হয়।

○ প্রশ্ন-৬৫. পানি দূষণের দূষকসমূহ কি কি?

উত্তর : পানি দূষণের দূষক (Sources of water pollution) : পানির দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ বস্তুকে শর্তকে পানির দূষক বলা হয়। পানি দূষকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- জৈব পরিপোষক, রোগজীবাণু, বিষাক্ত জৈব পদার্থ, বিষাক্ত অজৈব পদার্থ, তলানি বা গাঁদ এবং তাপ।

○ প্রশ্ন-৬৬. পানির জৈব দূষণ আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির জৈব দূষণ যেভাবে ঘটে (How organic water pollution is created) : পানিতে দ্রবীভূত O_2 ধ্বংসকারী বর্জ্য পদার্থ, রোগ-জীবাণুবাহী বর্জ্য, সংশ্লেষিত জৈব পদার্থ, নালা-নর্দমা ও কৃষিজ আবর্জনা, পেট্রোলিয়াম তেল প্রভৃতি পানির জৈব দূষণের মূল উৎস। এসব উৎস ও তার প্রভাব নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. **দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) ধ্বংসকারী বর্জ্য :** কিছু অক্সিজেন পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে, যা জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের শ্বাসক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয়। এরূপ দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) পানির গুণমান নির্ধারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার। পানিতে এর অত্যানুকূল মাত্রা হলো 4-6 ppm। এর কম হলে জলজীবের জন্য বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হয়। বিভিন্ন উৎস যেমন- গৃহস্থ ও প্রাণিজ জৈব আবর্জনাবাহিত নর্দমার তরল, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বর্জ্য, কাগজ ও চামড়া শিল্পের জৈব বর্জ্য, পশুপাখি জবেহ হতে নির্গত তরল প্রভৃতি হতে বিভিন্ন রকম জৈব আবর্জনা পানিতে মিশে পানির DO হ্রাস করে। ব্যাকটেরিয়াজনিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে জৈব বস্তু পানিতে দ্রবীভূত O_2 গ্রহণ করার ফলে $(C+O_2 \rightarrow CO_2)$DO হ্রাস পায়।

২. **রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিকারী বর্জ্য :** পানি রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীবের একটি গুরুত্বপূর্ণ আধার এবং এরূপ অণুজীববাহিত পানি জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। পানিবাহিত এরূপ রোগের মধ্যে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, পোলিও, ক্ষতজনিত হেপাটাইসিস অন্যতম। এ ধরনের রোগ জীবাণুবাহী কোনো মানুষের মলমূত্র পানিতে মিশলে উল্লিখিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। এছাড়া হাসপাতালের বর্জ্য ও কোনো নদী বা পুকুরের পানির সাথে মিশলেও এ ধরনের পানি দূষণ হতে পারে। পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হওয়া উচিত এরূপ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা।

৩. **নালা-নর্দমা ও কৃষিজবাহিত তরল :** নালা-নর্দমার মাধ্যমে গৃহস্থ ও শিল্প বর্জ্য এবং বিধৌত পানি নির্গত হয়ে কোনো না কোনো নদীতে গিয়ে মিশে। আবার কৃষিজ জমি বিধৌত হয়ে উদ্ভিদ-পুষ্টি নদীতে গিয়ে মিশলে পানির আগাছা ও শৈবালের বাড়-বাড়ন্ত বৃদ্ধি পায়; ফলে পানিতে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীর জন্য এটি বেশ সমস্যা সৃষ্টি করে। এ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াকে ইউট্রোফিকেশন (eutrophication) বলে। এর ফলে পানির DO হ্রাস পেতে পারে এবং পানি চিত্তবিনোদনের অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে।

৪. **সংশ্লেষিত জৈব যৌগ :** 1980 সালে 60 মিলিয়ন টন জৈব পদার্থ সংশ্লেষণ করা হয়েছিল, যা 1950 সালের চেয়ে দশগুণ। এসব জৈব পদার্থের মধ্যে সংশ্লেষিত কীটনাশক ও বালাইনাশক, ডিটারজেন্ট, প্লাস্টিক, প্লাস্টিসাইজার, তন্তু, ইলাস্টোমার, বিভিন্ন প্রকার জৈব দ্রাবক, সংশ্লেষিত রং, ঔষধপত্র ও অন্যান্য শিল্পজ রাসায়নিক পদার্থ অন্যতম। এসব জৈব পদার্থ পরিবহনের সময় বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে কিছু অংশ পানির সাথে মিশতে পারে। আবার উৎপাদন প্ল্যান্ট হতেও কিছু অংশ বর্জ্যের সাথে পানিতে গিয়ে মিশতে পারে। এ ধরনের পদার্থের বেশিরভাগই প্রাণী, উদ্ভিদ এবং মানুষের জন্য খুবই বিষাক্ত। কিছু জৈব পদার্থ পরিবেশে সহজে ধ্বংস হয় না বা বিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্য যৌগে রূপান্তরিত হয় না। অ্যারোমেটিক ক্লোরিন যুক্ত হাইড্রোকার্বন এক ধরনের জৈব পদার্থ যা পানির সাথে মিশে পানির রং, গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তিত করে। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট হতে নির্গত অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট পানিতে রং, গন্ধ এবং স্বাদ পরিবর্তিত করে। সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট হতে নির্গত অ্যালকাইল বেনজিন সালফোনেট পানিতে ফেনা সৃষ্টি করে এবং অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, ইথারের মত উদ্বায়ী পদার্থ ভূ-গর্ভস্থ নর্দমায় বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে।

৫. **পেট্রোলিয়াম তেল :** সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত জ্বালানি তেলের সমস্তই পানিবাহী জলযানের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়। দুর্ঘটনা বা অন্য কারণে প্রায়ই সাগরে তেল ছড়িয়ে পড়ে। এতে জলজ পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এর ফলে সূর্যরশ্মি পানিতে প্রবাহিত হতে পারে না এবং বায়ুস্থ অক্সিজেন পানির সাথে মিশতে পারে না। ফলে পানিতে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণে ব্যাঘাত ঘটে।

০ প্রশ্ন-৬৭. পানির অজৈব দূষণ আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির অজৈব দূষণ যেভাবে ঘটে (How inorganic water pollution is created) : অজৈব পদার্থের কারণে পানিতে অজৈব দূষণ ঘটে। এসব পদার্থের মধ্যে খনিজ এসিড, অজৈব লবণ, ধাতু বা ধাতুর যৌগের সূক্ষ্ম কণা, ট্রেস মৌল, সায়ানাইড, সালফেট, নাইট্রেট, জৈব ধাতব পদার্থ এবং

জটিল যৌগসমূহ অন্যতম। ধাতু জৈব যৌগ সংযোজনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জৈব প্রজাতি; যেমন— ফোলভিক এসিড এবং সংশ্লেষিত জৈব প্রজাতি; যেমন—EDTA উৎপন্ন হতে পারে। এ ধরনের আন্তঃক্রিয়া জারণ-বিজারণ সাম্য, এসিড-ক্ষার বিক্রিয়া, কোলয়েড গঠন এবং অণুজীবে সংঘটিত বিক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে বা প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া পানিতে অতি ক্ষুদ্র প্রজাতির উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং জলজ প্রাণীর জীবন প্রবাহে ধাতব বিষক্রিয়া এরূপ আন্তঃক্রিয়া দ্বারাও প্রভাবিত হয়।

ট্রেস মেটালগুলোর মধ্যে Hg, Pb, Cd, As, Sb এবং Se সবচেয়ে বেশি বিষক্রিয়া ঘটায়। এসব ধাতুর আয়ন এনজাইমের S—H বন্ধনের প্রতি আসক্তি অত্যন্ত বেশি হওয়ায় এনজাইম ভেঙে যেতে পারে এবং প্রোটিনের কার্বক্সিলিক গ্রুপ (–COOH) এবং অ্যামিনো গ্রুপও ($-NH_2$) এসব ধাতু দ্বারা আক্রান্ত হয়। ট্রেস মেটাল শিল্প বর্জ্য, ধাতু নিষ্কাশন, ব্যবহার্য দ্রব্য, গ্যাসোলিন, নর্দমার ময়লা, কীটনাশক প্রভৃতির মাধ্যমে পানিতে মিশতে পারে।

ডিটারজেন্টের মাধ্যমে নির্গত পলিফসফেটসমূহ পানিতে ফসফেটের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এতে জলজ আগাছা বৃদ্ধি পায় এবং জলজ প্রাণীর টিকে থাকা বাধাগ্রস্ত হয়।

বিভিন্ন ধাতব-অধাতব ও কয়লা খনি হতে নির্গত H_2SO_4 অজৈব পানি দূষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যেমন—কয়লা খনি হতে চুঁইয়ে পড়া H_2SO_4 ও $Fe(OH)_3$ স্থানীয় পানি প্রবাহের সাথে মিশে অজৈব দূষণ ঘটায়। কয়লাতে যুক্ত পাইরাইটস (FeS_2) বায়ুর অনুপস্থিতিতে স্থিতিশীল কিন্তু উত্তোলনের সময় তা বাতাস কর্তৃক জারিত হয়ে প্রচুর পরিমাণ এসিড উৎপন্ন করে। উত্তোলনের সমস্ত সময়ব্যাপী এ বিক্রিয়া চলতে থাকে, যা কিছু অণুজীব দ্বারা আরও বেশি দ্রুতগতি সম্পন্ন হয়।

$$2FeS_2 + 2H_2O + 7O_2 \rightarrow 2Fe^{2+} + 4HSO_4^-$$

$$4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \rightarrow 4Fe^{3+} + 2H_2O$$

এ ধরনের এসিড নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কার্বনেট পাথর ব্যবহার করা যেতে পারে।

০ প্রশ্ন-৬৮. সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পানি দূষকের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তর : সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পানি দূষকের শ্রেণিবিভাগ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পানি দূষণ বা পানি দূষকের শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যথা ঃ রাসায়নিক গঠন অনুসারে, প্রকৃতি অনুযায়ী।

তবে পানি দূষকসমূহকে নিম্নলিখিত প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা :

১. অক্সিজেন গ্রাসী দূষক (Oxygen demanding wastes);
২. রোগ সৃষ্টিকারী এজেন্ট (Disease causing agent);
৩. উদ্ভিদ পরিপোষক (Plant nutrients);
৪. সাংশ্লেষিক জৈব যৌগসমূহ (Syntheric organic compounds);
৫. তেল (Oil);
৬. অজৈব রাসায়নিক যৌগ এবং খনিজ পদার্থ (Inorganic chemicals and mineral substance);
৭. তেজস্ক্রিয় পদার্থ (Radioactive materials);
৮. তাপ (Heat) তাপীয় দূষণ (Thermal pollution;
৯. তলানি (Sediments)।

প্রশ্ন-৬৯. পানির শিল্প দূষণ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : শিল্প দূষণ (Industrial pollution) : বিশ্বব্যাপী পানি দূষণের প্রধান উৎস হলো শিল্পকারখানার তরল বর্জ্য। এক এক শিল্প কারখানা হতে এক এক রকম দূষক পদার্থ নির্গত হয়। আমাদের দেশের মত শিল্পে অনুন্নত দেশে শিল্প দূষণের মাত্রা কম হলেও সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো হাতেগোনা কয়েকটি শিল্পকারখানা ছাড়া বাকি সবগুলোর কোনোটিতেই নিজস্ব কোন বর্জ্য শোধন করার প্ল্যান্ট নেই। ফলে কারখানা হতে তরল বর্জ্য নালা-নর্দমার মাধ্যমে সরাসরি নদীতে বা সাগরে গিয়ে মিশে। তরল বর্জ্যের রাসায়নিক পদার্থ পানিতে রাসায়নিক দূষণ, কঠিন বর্জ্য জৈব দূষণ ও তলানি সৃষ্টি এবং বিষাক্ত ধাতু পানিতে ধাতু দূষণ ঘটায়। কাগজ ও মন্ড কারখানা হতে কাঠের টুকরা, সেলুলোজ তন্তু, দ্রবীভূত লিগনিন, মন্ড ও কাঠ সংরক্ষণকারী (Preservatives) রাসায়নিক পদার্থ, মিথাইল মারকেপট্যান, উচ্চ বিজারক পদার্থ সালফাইট প্রভৃতি নির্গত হয়ে পানিতে মিশতে পারে। এসব পদার্থ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন (DO) গ্রহণ করতে পারে এবং BOD বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়া ট্যানারি হতে নির্গত Cr(IV) মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ। সোডা-ক্লোরিন শিল্প হতে (Hg(II), সার শিল্প হতে NH_3, ইলেকট্রোপ্লেটিং শিল্প হতে বিষাক্ত ধাতব পদার্থ পানিতে মিশে পানিতে মারাত্মক দূষণ ঘটাতে পারে।

ছক : পানিতে শিল্প বর্জ্য হতে দূষণ।

শিল্প কারখানা	বর্জ্যের pH	বর্জ্যে দূষক পদার্থ
১. কস্টিক সোডা	-	মারকারি, ক্লোরিন প্রভৃতি।
২. সাইকেল	-	সায়ানাইড, ক্রোমেট প্রভৃতি।
৩. বস্ত্র শিল্প	7-10	সোডিয়াম, জৈব এসিড, রঞ্জক পদার্থ প্রভৃতি।
৪. ইলেকট্রোপ্লেটিং	-	সায়ানাইড, ভারী ধাতু, অ্যামোনিয়া, ক্লোরামিন প্রভৃতি।
৫. লৌহ ও ইস্পাত		অ্যামোনিয়া, ফেনল সায়ানাইড, সালফাইড আলকাতরা প্রভৃতি।
৬. কাগজ ও মন্ড	6.5-8.3	ট্যানিন, লিগনিন, ফেনলিক যৌগ, সালফাইড, সাবান, ফেনা প্রভৃতি।
৭. কীটনাশক	-	রঞ্জক পদার্থ, অক্সালিক এসিড, ভারী ধাতু। যেমন- Pb, Zn, Cd প্রভৃতি।
৮. চিনি শিল্প	-	কার্বোহাইড্রেট, চিনি, মোম প্রভৃতি।
৯. শোধনাগার	-	মুক্ত তেল, ইমালসিফাইড তেল, ফেনল, সাবান, মারকেপট্যান, ক্ষারীয় লবণ, রেজিনাস, আলকাতরা সদৃশ পদার্থ প্রভৃতি।
১০. চামড়া শিল্প		Cr(III), Cr(VI), Ca(II)-লবণ, এনজাইম জাতীয় পদার্থ, রং, তেল, অ্যামোনিয়াম লবণ, Na-সালফাইড, সালফোনিক এসিড প্রভৃতি।
১১. টিএসপি	-	ফ্লোরিন, ফসফোরিক এসিড প্রভৃতি।
১২. ইউরিয়া	-	অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, As, Cr প্রভৃতি।
১৩. ভিসমস রেয়ন	2.8-4.1	জিংক, পলিসালফাইড প্রভৃতি।

প্রশ্ন-৭০. বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য পানির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্পের বর্জ্য পানির প্রভাব (Effect of waste water of tannery industries in Bangladesh) : প্রতিটি দেশেরই তার নিজস্ব কাঁচামাল, জ্বালানি, কারিগর দক্ষতা, শিল্পজাত ও উৎপাদে চাহিদার শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তবে প্রায় প্রতিটি দেশেই কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠান জনগণের সার্বজনীন চাহিদা পূরণে প্রতিষ্ঠিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাল্প-পেপার, টেক্সটাইল, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সাবান ও ডিটারজেন্ট, ট্যানারি, সার, সিমেন্ট, কাচ, ঔষধ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানার মধ্যে সার, সিমেন্ট, চিনি, সাবান, পাট, কাগজ, কাচ, ট্যানারি, টেক্সাইল, গার্মেন্টিস এবং ঔষধ শিল্প গড়ে উঠেছে।

পরিবেশের উপর বিভিন্ন শিল্পের প্রভাব অনস্বীকার্য। তবে ঢাকার নিকটবর্তী বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষণের ক্ষেত্রে ট্যানারি শিল্পের অবদান সর্বাধিক বলে পরিগণিত। ট্যানারি শিল্পে মূলত চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয় যাতে এটি অপচনশীল শক্ত লেদারে।

i. গ্রিনহাউস প্রক্রিয়াকরণ এবং
ii. ট্যান-ইয়ার্ড প্রক্রিয়াকরণ।

উভয় প্রক্রিয়াতেই বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, যাতে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ট্যানারি শিল্প থেকে উৎসারিত তরল বর্জ্য পরিবেশের উপর অত্যধিক বিরূপ প্রভাব ফেলে।

প্রভাবসমূহকে নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা হলো :

১. ট্যানারি সৃষ্ট তরল প্রবাহে বিভিন্ন ক্ষতিকর উপাদান রয়েছে, যা খাল, নদী, জলাশয়, ভূমিতে দূষণের উদ্ভব করে।
২. ট্যানারি বর্জ্য গ্রহণকারী জলাধারে পানির বর্ণ বাদামি হয়ে যায়। যা দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকে।
৩. ট্যানারি বর্জ্যের উপাদানের মধ্যে পচনযোগ্য দ্রবীভূত পদার্থ প্রোটিন থাকে, যা দুর্গন্ধের সৃষ্টি করে।
৪. এসিডীয় এবং অম্লীয় প্রভাবসমূহ কনক্রীট এবং ধাতু পাইপকে ক্ষয় করে।
৫. বর্জ্য প্রবাহে NaCl-এর পরিমাণ এত বেশি থাকে, যা গ্রহণকারী জলাধারের পানিকে ব্যবহারের অনুপযোগী করে তোলে।
৬. ট্যানারি বর্জ্যের প্রবাহে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া থাকে, যা ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।
৭. বর্জ্য প্রবাহে দ্রবীভূত ক্রোমিয়াম জলজ প্রাণীর জন্য অত্যন্ত টক্সিক।
৮. ট্যানারি শিল্পের তরল বর্জ্যে বিদ্যমান কঠিন পদার্থে চুল, মাংসখণ্ড, $CaCO_3$ প্রভৃতি থাকে, যা জলজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।
৯. বর্জ্য পানিতে বিদ্যমান ক্রোমিয়াম এবং সালফাইড অণুজীবের জন্য টক্সিক; ফলে বর্জ্য পানির জীব বিশোধন প্রক্রিয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। ভাসমান লাইম ও পয়ঃবিশোধন প্রক্রিয়ায় জৈবিক কার্যক্রম বাধা সৃষ্টি করে।
১০. বর্জ্য পানিতে বিদ্যমান অত্যধিক লবণ এবং ক্রোমিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিতেও সংক্রমণ করতে পারে।

○ প্রশ্ন-৭১. পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব (Harmful effects of water pollution) : পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. নদী, পুকুর, হ্রদ, কুয়া ইত্যাদি স্থানের বদ্ধ দুর্গন্ধময় পচা পানিতে অসংখ্য রোগজীবাণু জন্মায়। এরা মানুষ ও গবাদি পশুর কলেরা, টাইফয়েড ও আমাশয় রোগ সৃষ্টি করে।

২. পানিতে যদি অতিরিক্ত পরিমাণ উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর পদার্থসমূহ উপস্থিত থাকে, তবে ক্ষতিকর উদ্ভিদসমূহ ব্যাপক বৃদ্ধি পেতে পারে। পরিশেষে সেগুলো পচনের ফলে পানি স্বাদহীন ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে ওঠে ও পানি শোষণ পদ্ধতির ব্যাঘাত ঘটে। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উদ্ভিদগুলো যখন মরে যায় ও পচন আরম্ভ হয় তখন পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণও হ্রাস পায়।

৩. শিল্প ও আণবিক চুল্লি হতে নির্গত গরম পানি পার্শ্ববর্তী এলাকার জলাশয়ের পানির দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে। এতে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

৪. মড়ক, আগাছা ও কীটনাশক মিশ্রিত পানি মাছ ও উদ্ভিদ ভক্ষণ করলে লিউকেমিয়া ও স্নায়বিক দুর্বলতা মস্তিষ্কের বিকৃতি ও ক্যান্সার রোগের উৎপত্তি হতে পারে।

৫. বিভিন্ন পদার্থ মিশ্রিত পানি মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। ধাতব পদার্থের মধ্যে পারদ ও সীসা মানুষের জন্য খুবই মারাত্মক ক্ষতি করে। এরা সামান্য মাত্রায় বিপজ্জনক ও অতিমাত্রায় মানুষের মৃত্যুও ঘটাতে সক্ষম।

৬. রাসায়নিক জটিল পদার্থ, তৈলাক্ত ও মার্বেল জাতীয় আবর্জনা পানির ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষুদ্র জীবাণুগুলো ধ্বংস করে। ফলে পানির জীবাণু বিশুদ্ধকরণ বিঘ্নিত হয়।

৭. নদী বা অন্যান্য জলাশয়ের ঘোলাটে পানি জলজ জীবের বিভিন্ন প্রকার ক্ষতি করতে পারে। যেমন—
   ক. পানিতে সাঁতার কাটে বা ভাসে এমন জীবের উপর সরাসরি বিষক্রিয়া হতে পারে।
   খ. জলজ প্রাণীর ডিম ও লার্ভার স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং বৃদ্ধি ক্ষমতা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গিয়ে মারা যেতে পারে।
   গ. জলজ জীবের স্থানান্তর ও চলাফেরার অসুবিধা হতে পারে।
   ঘ. জলজ জীবের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য কমে যেতে পারে।

৮. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম বর্জনীয় পদার্থের উদ্ভিদজাত পদার্থের পচন পানির ঠাণ্ডা স্তরে হয়ে থাকে। এতে দ্রবীভূত O_2-এর পরিমাণ এ স্তরে হ্রাস পায়। ফলে জলজ জীবের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

৯. প্রাকৃতিক পানিতে মিশ্রিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ, মানুষ, জলজ অন্যান্য প্রাণীসমূহের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-৭২. বন উজাড়ের ফলে পরিবেশের কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : গাছপালা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বন উজাড়ের ফলে গাছপালার পরিমাণ কমে যাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রিন হাউস প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভাবে বন উজাড়ের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

○ প্রশ্ন-৭৩. অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারে পুকুরের পানির কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারের ফলে পুকুরের পানির সাথে সাবানের স্টীয়ারেট মিশে পানি দূষিত করে। এই পানি খাবার পানি হিসেবে ব্যবহার করলে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

○ প্রশ্ন-৭৪. মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বিস্তারিত লিখুন।

উত্তর : মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব : বৈশ্বিক উষ্ণতা হলো বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানির তাপামাত্রাও বেড়ে যাবে। প্রায় ১০০ বছর আগে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ১° সেলসিয়াস কম ছিল। আমরা হয়ত ভাবতে পারি ১০০ বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা ১° সেলসিয়াস বেড়েছে, এটি আর এমনকি। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাপমাত্রার সামান্য বৃদ্ধিতেই মেরু অঞ্চলসহ অন্যান্য জায়গায় সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করে। এ বরফ গলা পানি মূলত সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর যে সকল দেশ নিচু,সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, ভূগর্ভস্থ পানি ও হ্রদের পানিতে মিশে যাবে। ফলে পানির সকল উৎসই লবণাক্ত হয়ে পড়বে।

পানির সকল উৎস লবণাক্ত হলে প্রথমত মিঠা পানিতে বসবাসকারী জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ, পানির তাপমাত্রা বাড়লে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে, আবার লবণাক্ততা বাড়লেও কিন্তু দ্রবীভূত অক্সিজেন অনেক কমে যাবে, যার ফলে জলজ প্রাণীসমূহ বাঁচতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদের বড় একটি অংশ লবণাক্ত পানিতে জন্মাতেও পারে না, বেড়ে উঠতেও পারে না, যে কারণে পানির জীব বৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

○ প্রশ্ন-৭৫. বাংলাদেশের উপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার একটি বড় প্রমাণ হলো, এখন গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ে, এমনকি মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ৪৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায়, যেটি আগে কখনো হয়নি। তাপমাত্রার উপাত্ত থেকে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল-দুই সময়েই তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেশি থাকে। অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বাংলাদেশে স্পষ্টতই পড়ছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে পৃথিবীতে সঞ্চিত বরফ গলে যাবে এবং সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর প্রভাব বাংলাদেশে আরো তীব্রতর হবে, কেননা বঙ্গোপসাগরে পানির উচ্চতা বেড়ে আমাদের দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ অংশ পানির নিচে চলে যাবে। সাগরের লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডে ঢুকে নদ-নদী, খাল-বিল ও ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে যাবে। যার ফলে মিঠা পানি বলতে কিছু থাকবে না। সাতক্ষীরাসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় চিংড়ি চাষের জন্য নালা কেটে লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডে আনা হয়। এ কারণে ঐ সকল এলাকার ভূগর্ভস্থ পানিসহ মিঠা পানির অন্যান্য উৎস লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে খাওয়ার পানি ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার উপযোগী পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। ঐ সকল এলাকার মিঠা পানির একমাত্র উৎস বলতে গেলে এখন বৃষ্টির পানি। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় ১০-১৫টি গ্রামের মানুষ সবাই মিলে একটি পুকুরে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি ব্যবহার করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পানি আনার জন্য গৃহবধূদের ৭-৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পুকুরে সংগৃহীত পানি আনতে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে সমগ্র বাংলাদেশেই এ অবস্থা হতে পারে।

ইতোমধ্যেই কয়েকটি দেশ (যেমন– মালদ্বীপ, ভারতের অংশ) বৈশ্বিক উষ্ণতাজনিত কারণে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে পানির নিচে ডুবে গেছে এবং ঐ সকল দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন পাল্টে যেতে পারে। যার কারণে নদ-নদীতে পানির প্রবাহ ও গতিপথ পাল্টে যাবে।

ঙ

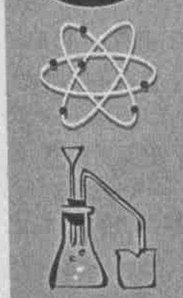

পানি দূষণ প্রতিরোধে কৌশলপত্র এবং নাগরিকদের দায়িত্ব-কর্তব্য অথবা গণসচেতনতা, শিল্পকারখানা দ্বারা পানি দূষণের প্রতিরোধ, কৃষি জমি থেকে মাটি দূষণের কারণে পানি দূষণের প্রতিরোধ, পানির উৎসসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

Strategy for preventing water pollution and responsibility of citizens or public awareness, prevention of water pollution by industries, prevention of water pollution due to soil erosion from agricultural land, conservation of water sources and development

○ প্রশ্ন-৭৬. পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পদ্ধতি (General methods to control water pollution): আমাদের দেশ পানি দূষণের প্রধান প্রধান উৎস হচ্ছে শিল্পজাত বর্জ্য নির্গমন, পয়ঃনিষ্কাশন জনিত বর্জ্য এবং কৃষি সম্পর্কিত বর্জ্য। এ তিনিটি উৎস যদি কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তবে অনেকাংশ ক্ষেত্রেই পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। এজন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করা যেতে পারে—

১. আমাদের দেশে শিল্পে উন্নত না হলেও পানি দূষণের ক্ষেত্রে শিল্পজাত বর্জ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উন্নত বিশ্বে প্রায় সকল শিল্প কারখানাতে নিজস্ব বর্জ্য সংশোধনাগার আছে। কিন্তু নিয়ম থাকলেও আমাদের দেশে খুব কম শিল্প কারখানা আছে যাদের নিজস্ব বর্জ্য সংশোধনের ব্যবস্থা রয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম-নীতি মেনে সকল শিল্প কারখানা অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে নদী বা অন্য কোনো জলাধারে তরল বা কঠিন বর্জ্য মেশার আগেই তা সংশোধনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

২. জমিতে অপরিকল্পিতভাবে এবং অতিরিক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার রোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে রাসায়নিক সারের বিকল্প হিসেবে জৈব সার ব্যবহার করা যেতে পারে। জমিতে প্রয়োগকৃত নাইট্রেট বা ফসফেট সার বৃষ্টির পানি দ্বারা ধুয়ে যাতে নদীতে পতিত না হতে পারে সেজন্য জমির চারপাশে উঁচু বাঁধ দিতে হবে।

৩. পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য নর্দমাবাহিত ময়লা পানি অবশ্যই রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পদ্ধতিতে জৈব পদার্থ ক্ষুদ্রাংশকরণ বা ধ্বংসকরণের (degradable) মাধ্যমে তা নদী বা জলাশয়ে নির্গত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বর্জ্য সংশ্লেষিত সকল ধাপ সুচারুভাবে মেনেই সম্পাদন করতে হবে।

৪. সংশ্লেষিত ডিটারজেন্ট ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বায়ো-ডেগ্রেডাবল ডিটারজেন্ট অথবা পরিষ্কারক হিসেবে সোডা বা সাবান ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫. রাসায়নিক কীটনাশক পানি দূষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। Cl-যুক্ত কীটনাশক উৎপাদন ও আমদানি নিষিদ্ধ করে তুলনামূলক পরিবেশের জন্য কম ক্ষতিকর কীটনাশক বা জৈব কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে পালন করা উচিত।

৬. জলাধারের পাশে মলমূত্র ত্যাগ না করা, রোগীর জামা-কাপড় না ধোয়া, নদী বা পুকুরে পশু গোসল না করানো, গৃহস্থালির ময়লা আবর্জনা না ফেলা-এসব সচেতনতামূলক বিষয়গুলো সকলকে মেনে চলা উচিত।

○ প্রশ্ন-৭৭. ভারী ধাতুসমূহের জৈব বিষাক্ততা আলোচনা করুন।

উত্তর : ভারী ধাতুসমূহের জৈব বিষাক্ততা (Biotaxicity of heavy metals) : প্রাকৃতিক বস্তুর মধ্যে যা মানুষের পরিবেশজনিত উদ্বিগ্নতার কারণ, তার মধ্যে ভারী ধাতু সর্বব্যাপী। ধাতুকে Degradation করা যায় না, বিপাক ক্রিয়ান্বিত করা যায় না, যেন এরা চূড়ান্ত নাছোড়বান্দা। ধাতব পদার্থসমূহ জীবন Organism-এর মধ্যে অজৈব লবণ বা জৈব ধাতব জাতক হিসেবে প্রবেশ করে। ভারী ধাতুসমূহের মধ্যে মার্কারি, লেড, আর্সেনিক এবং ক্যাডমিয়াম এগুলো মারাত্মকভাবে পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে। এসব ধাতব পদার্থ পরিবেশের প্রায় সব উপাদানে উপস্থিত রয়েছে-বায়ুমণ্ডল, ভূমি এবং অ্যাকুয়াটিক সিস্টেমে ভারী ধাতুর বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানসমূহের বেশিরভাগ অংশ বৃষ্টির দ্বারা প্রাকৃতিক পানিস্রোতের সাথে মিশে যায়। কিন্তু অ্যাকুয়াটিক সিস্টেমে মার্কারি Pysico-Chemical রূপে স্থানান্তরিত হয়, যা অতি মাত্রায় toxic এবং মানুষের জন্য বিপজ্জনক।

○ প্রশ্ন-৭৮. সমুদ্রের পানি পান করা যায় না কেন?

উত্তর : সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় লবণ থাকে বলে এই পানি পান করা যায় না। এক গ্যালন (প্রায় সাড়ে চার লিটার) সমুদ্রের পানিতে লবণ থাকে প্রায় ১০০ গ্রাম। আবার যে সমুদ্র একটু ঘেরা জায়গায় অর্থাৎ মহাসাগর নয় তাতে লবণের পরিমাণ আরও বেশি। নদীর পানি সাগরে মিশবার আগে বয়ে নিয়ে আসে বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থ ও লবণ। সারাদিন সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে যায় কিন্তু লবণ থেকে যায়, আবার নদী লবণ নিয়ে আসে। এভবেই দিন দিন সমুদ্রের পানিতে লবণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সমুদ্রের পানিতে এত লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে তা পানের অযোগ্য।

○ প্রশ্ন-৭৯. পাতলা পায়খানা হলে স্যালাইন খাওয়ানো হয় কেন?

উত্তর : ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে ডিহাইড্রেশন হয় ও শরীরে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ কমে যায়। তাই শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের অভাব পূরণ করার জন্য স্যালাইন খাওয়ানো হয়। এতে দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা পায় এবং কোষের ভিতর ও বাইরের তরল পদার্থের চাপ ঠিক থাকে। স্যালাইন হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, গ্লুকোজ ও পানি দিয়ে তৈরি। কলেরা বা ডায়রিয়ায় মারা যাওয়ার মূল কারণই হলো এ অবস্থায় রোগী পায়খানা ও বমির ফলে দ্রুত ইলেকট্রোলাইট হারাতে থাকে, যা খাবার স্যালাইন পূরণে সক্ষম।

○ প্রশ্ন-৮০. সাধারণ পানি (Soft water) ও কঠিন পানি (Hard water)-এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো সাধারণ পানি। এতে সহজেই সাবানের ফেনা হয়। আর দুই পরমাণু ডিউটেরিয়াম ও এক পরমাণু অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো কঠিন পানি (D_2O)। সাধারণ পানির ঘনত্বের (১.০০৮) চেয়ে কঠিন পানির ঘনত্ব (১.১০৬) বেশি।

○ প্রশ্ন-৮১. সাগরের পানি মিঠা পানি থেকে ভারী কেন?

উত্তর : সমুদ্রের পানির ঘনত্ব মিঠা পানির ঘনত্ব অপেক্ষা বেশি। কারণ সমুদ্রের পানিতে Ca, Mg সহ বিভিন্ন রকমের লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। তাই সাগরের পানি মিঠা পানি থেকে ভারী।

○ প্রশ্ন-৮২. উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপের ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক ব্যবহৃত হলে এ পানি লোনা হবার প্রবণতা বাড়ে কেন?

উত্তর : উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক হারে ব্যবহৃত হলে সেখানকার পানির লেবেল (Water level) নিচে নেমে যায়। ফলে পার্শ্ববর্তী বিশাল জলাধার তথা সমুদ্র থেকে লোনা পানি এসে পানির লেবেল বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়। তাই গভীর নলকূপে ভুগর্ভস্থ পানি অধিক উত্তোলন করলে তা স্বাভাবিক কারণেই লোনা হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৮৩. বৃষ্টিপাতের উপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ সংক্রান্ত কম্পিউটার মডেলিং থেকে ধারণা করা যায় যে, কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, আবার কোনো এলাকায়, বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাবে, যা খরা সৃষ্টি করতে, এমনকি মরুভূমিতেও পরিণত করতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরন পরিবর্তন হলে নদ-নদী, খাল-বিলে পানির পরিমাণ ও প্রবাহ পরিবর্তিত হবে যা অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কম্পিউটার মডেলিং থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে কোনো এলাকায় শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, যা থেকে অসময়ে বন্য হতে পারে।

○ প্রশ্ন-৮৪. কৃষি জমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত কারণে দূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : একটি জমিতে বছরের পর বছর ফসল চাষ করলে এর উর্বরতা নষ্ট হয়। আর উর্বরতা নষ্ট হলে মাটির ক্ষয় অনেক বেড়ে যায়। আমরা যদি জৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করি, তবে তা মাটির ক্ষয়রোধ করতে সাহায্যে করে।

মাটিতে জৈব সার থেকে আসা জৈব পদার্থ বেশি থাকে বলে তা বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে সহায়তা করে। ফলে, বৃষ্টি হলে খুব সহজেই তা প্রবাহিত হয় না বা মাটির কণা সহজে বাতাসে উড়ে গিয়ে নদীর পানি দূষিত করে না। এতে মাটির কণা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ যেমন—কীটনাশক, নাইট্রোজেন ও ফসফরাস ইত্যাদি দ্বারাও দূষণ কমে যায়। আবাদি জমির চারপাশে পুকুর খনন করেও পানির দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

আবার ক্ষেত থেকে ফসল কাটার পর যে অবশিষ্ট অংশ জমিতে থাকে, তা পানির দূষণ রোধ করে। এছাড়া ফসলের ধরন পরিবর্তন করে দূষণ রোধ করা যায়। যখন-তখন সার প্রয়োগ না করে ঠিক সময়ে বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের আগ মুহূর্তে সার প্রয়োগ না করে দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮৫. উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা লিখুন।

উত্তর : আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। আর সেই কৃষিকাজে সেচের জন্য দরকার পানি অর্থাৎ পানি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঘর-বাড়িও পানি ছাড়া তৈরি অসম্ভব। আবার উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত। সকল শিল্প কারখানায় কোনো না কোনো পর্যায়ে পানির ব্যবহার অপরিহার্য। তাহলে আমরা বলতে পারি, উন্নয়ন ও পানি একে অপরের পরিপূরক।

○ প্রশ্ন-৮৬. বাংলাদেশে পানির উৎসে হুমকি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে পানির উৎসে হুমকি : বাংলাদেশে যে সকল পানির উৎস রয়েছে (নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, হ্রদ), সেগুলো স্পষ্টতই বেশ কয়েকটি হুমকির মুখে রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই বলা যায়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে হুমকি। এ জাতীয় পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লবণাক্ত পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। যার ফলে আমাদের পানির উৎসসমূহ বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমুদ্রের উচ্চতা ২ মিটার বাড়লে বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ পানির নিচে চলে যাবে। জাপান ও ইন্দোনেশিয়ায় ঘটে যাওয়া সুনামির ভয়াবহতা ছিল পরিবেশের হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশও সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

○ প্রশ্ন-৮৭. বন্যা ও ক্ষয়জনিত কারণে পানির উৎসে হুমকি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে বন্যাপ্রবণ একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নদ-নদীই খরস্রোতা, যার ফল হলো নদী ভাঙ্গন। নদী ভাঙ্গনের ফলে সৃষ্ট মাটি পানির স্রোতে মিশে যায় এবং একপর্যায়ে নদীর তলায় জমা হয় ও নদী ভরাট হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়, অন্যদিকে তেমনি নদী শুকিয়ে যেতে পারে বা মরেও যেতে পারে।

আমাদের দেশের অনেক নদী ইতোমধ্যেই মরে গেছে। করতোয়া, বিবিয়ানা, শাখা বরাক-এসব নদীই এখন মরা নদী। এমনকি একসময়ের খরস্রোতা পদ্মা নদীর অবস্থাও সংকটাপন্ন। পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত পাকশী ব্রিজের নিচে গরুর গাড়ি চলার দৃশ্যও দেখা যায়। এর কারণ হলো, নদী ভরাট হয়ে যাওয়া। নদী শুকিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো পানিসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

○ প্রশ্ন-৮৮. পানি একটি মৌলিক অধিকার আলোচনা করুন।

উত্তর : পানি প্রকৃতির এমন একটি দান, যা প্রায় সব জীবের জন্য অপরিহার্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ খাওয়া, রান্নাসহ অন্যান্য কাজে পানি ব্যবহার করে আসছে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। এদের প্রতিটিই পানির ওপর নির্ভরশীল। তাই পানিও মানুষের মৌলিক অধিকার। আর যেহেতু এটি প্রাকৃতিক সম্পদ, কোনো দেশ বা জাতি এটি সৃষ্টি করেনি, সেহেতু প্রতিটি ফোঁটা পানির উপর পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। কাজেই আমরা যখন পানি ব্যবহার করি, তখন মনে রাখতে হবে যে আমরা অন্যের সম্পদ ভোগ করছি এবং এটি কোনোমতেই অপচয় করা উচিত নয়। অপচয় করার অর্থই হলো অন্যের অধিকার খর্ব করা, যা সমীচীন নয়।

○ প্রশ্ন-৮৯. পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন : আমরা সবাই জানি, আমাদের প্রচুর পানিসম্পদ আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যবহার যোগ্য পানিসম্পদের পরিমাণ খুবই সীমিত। এমতাবস্থায় আমরা যদি পানির উৎস সংরক্ষণে সজাগ না হই, তাহলে ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হতে পারে। যেকোনো ধরনের উন্নয়নকাজ তা শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, নগরায়ন যাই হোক না কেন– পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আবার এই সকল উন্নয়নের ফলে পানির উৎসসমূহ যদি হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই থমকে যাবে। কাজেই যেখানে– সেখানে শিল্প-কারখানা নগরায়ন না করে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে করতে হবে। যাতে করে পানির উৎসসমূহ কোনোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

○ প্রশ্ন-৯০. পানি প্রবাহের সর্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিক নীতি আলোচনা করুন।

উত্তর : পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি : সাগর মহাসাগর বা সমুদ্র একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত। আবার পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট নদী সাগরে গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটি নদী বা সাগর যেখানেই থাকুক না কেন, যে দেশেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বা যেখান দিয়েই এটি প্রবাহিত হোক না কেন, আসলে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। অর্থাৎ পানিসম্পদ অবশ্যই একটি সর্বজনীন বিষয়। এটি কোনো জাতি-গোষ্ঠী, দেশ বা মহাদেশের সম্পদ নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক বৈরিতা উন্নয়ন প্রতিযোগিতা বা যুদ্ধদেহী মনোভাবের কারণে পানিসম্পদের এই সর্বজনীনতা অনেক ক্ষেত্রেই মানা হচ্ছে না। তবে জাতিসংঘ ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীর ক্ষেত্রে পানির বন্টন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি তৈরি করে, যদিও এখন পর্যন্ত সেটি খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

○ প্রশ্ন-৯১. আন্তর্জাতিক নদী-কনভেনশন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন (Inernational Water Course Convention) : আন্তর্জাতিক আইন সমিতি (The International Law Association) ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত তাদের ৫২তম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির ব্যবহার সম্পর্কে একটি কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। এটি হেলসিংকি নিয়ম নামে অভিহিত। পরবর্তীতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন কমিশন আন্তর্জাতিক পানির ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি তৈরি করে, যা ১৯৯৭ সালের ২১ মে জাতিসংঘের সাধারণসভায় কনভেনশন হিসেবে গৃহীত হয়। এই কনভেশন অনুযায়ী, একের অধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর পানি কোনো দেশই অন্য দেশের অনুমতি ছাড়া একতরফাভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এই রীতি অনুযায়ী দেশসমূহ ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অংশের পানি ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য দেশের অংশে পানিপ্রবাহে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ০৬

আমাদের সম্পদ
Our resources

Syllabus— **Our resources :** *Soil; types of soil; soil pH; reasons and effects of soil pollution; natural gas and its main compositions; processing, uses and sources of natural gas, petroleum and coal; forestry; limitations and conservation of our resources.*

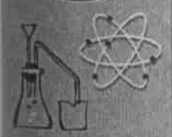

ক মাটি, মাটির প্রকারভেদ, মাটির p^H, মাটি দূষণের কারণ ও এর প্রভাব

Soil; types of soil; soil pH; reasons and effects of soil pollution

○ প্রশ্ন-১. মাটি কত প্রকার ও কি কি? এদের গঠন লিখুন।

উত্তর : মাটি প্রধানত তিন প্রকার। যথা : বেলে মাটি, দোআঁশ মাটি ও এঁটেল মাটি।

ক. **বেলে মাটি :** এ মাটিতে ৭০ ভাগ বা তারও বেশি বালু কণা থাকে। এর পানি ধারণ ক্ষমতা কম কিন্তু শোষণ ক্ষমতা বেশি।

খ. **দোআঁশ মাটি :** এ মাটিতে প্রায় সমান পরিমাণে বালি, পলি ও কাদা-কণা বিদ্যমান। এর পানি ধারণ ও শোষণ উভয় ক্ষমতাই বেশি।

গ. **এঁটেল মাটি :** এ মাটিতে ৪০% – ৫০% কর্দম কণা থাকে। এর পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি কিন্তু শোষণ ক্ষমতা কম।

○ প্রশ্ন-২. মৃত্তিকার বুনট কি? এর গুরুত্ব লিখুন।

উত্তর : মৃত্তিকার একক কণার পারস্পরিক আকার দ্বারা সৃষ্ট স্থুলতা বা সূক্ষ্নতাকে মৃত্তিকার বুনট বলে। মৃত্তিকার ভৌত ধর্মসমূহের মধ্যে বুনট অন্যতম। নিচে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. বুনট মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলি অবহিত করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে মৃত্তিকার পানি ধারণক্ষমতা জানা যায়।

২. মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসর ও পুষ্টি উপাদানের ধারণক্ষমতা বুনটের ওপর নির্ভরশীল। এর সাহায্যে স্থুলতা বা সূক্ষ্মতা নির্ণয় করা যায়।

○ প্রশ্ন-৯০. পানি প্রবাহের সর্বজনীনতা ও আন্তর্জাতিক নীতি আলোচনা করুন।

উত্তর : পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি : সাগর মহাসাগর বা সমুদ্র একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত। আবার পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট নদী সাগরে গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটি নদী বা সাগর যেখানেই থাকুক না কেন, যে দেশেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বা যেখান দিয়েই এটি প্রবাহিত হোক না কেন, আসলে সেগুলো সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ। অর্থাৎ পানিসম্পদ অবশ্যই একটি সর্বজনীন বিষয়। এটি কোনো জাতি-গোষ্ঠী, দেশ বা মহাদেশের সম্পদ নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক বৈরিতা উন্নয়ন প্রতিযোগিতা বা যুদ্ধদেহী মনোভাবের কারণে পানিসম্পদের এই সর্বজনীনতা অনেক ক্ষেত্রেই মানা হচ্ছে না। তবে জাতিসংঘ ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীর ক্ষেত্রে পানির বণ্টন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি তৈরি করে, যদিও এখন পর্যন্ত সেটি খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি।

○ প্রশ্ন-৯১. আন্তর্জাতিক নদী-কনভেনশন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন (Inernational Water Course Convention) : আন্তর্জাতিক আইন সমিতি (The International Law Association) ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত তাদের ৫২তম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির ব্যবহার সম্পর্কে একটি কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। এটি হেলসিংকি নিয়ম নামে অভিহিত। পরবর্তীতে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আইন কমিশন আন্তর্জাতিক পানির ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি তৈরি করে, যা ১৯৯৭ সালের ২১ মে জাতিসংঘের সাধারণসভায় কনভেনশন হিসেবে গৃহীত হয়। এই কনভেশন অনুযায়ী, একের অধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর পানি কোনো দেশই অন্য দেশের অনুমতি ছাড়া একতরফাভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। তবে এই রীতি অনুযায়ী দেশসমূহ ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অংশের পানি ব্যবহার করতে পারে। এক্ষেত্রে অন্য দেশের অংশে পানিপ্রবাহে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে তা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

অধ্যায় ০৬

আমাদের সম্পদ
Our resources

Syllabus— **Our resources :** *Soil; types of soil; soil pH; reasons and effects of soil pollution; natural gas and its main compositions; processing, uses and sources of natural gas, petroleum and coal; forestry; limitations and conservation of our resources.*

ক মাটি, মাটির প্রকারভেদ, মাটির pH, মাটি দূষণের কারণ ও এর প্রভাব

Soil; types of soil; soil pH; reasons and effects of soil pollution

○ প্রশ্ন-১. মাটি কত প্রকার ও কি কি? এদের গঠন লিখুন।

উত্তর : মাটি প্রধানত তিন প্রকার। যথা : বেলে মাটি, দোআঁশ মাটি ও এঁটেল মাটি।

ক. **বেলে মাটি :** এ মাটিতে ৭০ ভাগ বা তারও বেশি বালু কণা থাকে। এর পানি ধারণ ক্ষমতা কম কিন্তু শোষণ ক্ষমতা বেশি।

খ. **দোআঁশ মাটি :** এ মাটিতে প্রায় সমান পরিমাণে বালি, পলি ও কাদা-কণা বিদ্যমান। এর পানি ধারণ ও শোষণ উভয় ক্ষমতাই বেশি।

গ. **এঁটেল মাটি :** এ মাটিতে ৪০% – ৫০% কর্দম কণা থাকে। এর পানি ধারণ ক্ষমতা বেশি কিন্তু শোষণ ক্ষমতা কম।

○ প্রশ্ন-২. মৃত্তিকার বুনট কি? এর গুরুত্ব লিখুন।

উত্তর : মৃত্তিকার একক কণার পারস্পরিক আকার দ্বারা সৃষ্ট স্থূলতা বা সূক্ষ্মতাকে মৃত্তিকার বুনট বলে। মৃত্তিকার ভৌত ধর্মসমূহের মধ্যে বুনট অন্যতম। নিচে এর গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. বুনট মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলি অবহিত করতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে মৃত্তিকার পানি ধারণক্ষমতা জানা যায়।

২. মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসর ও পুষ্টি উপাদানের ধারণক্ষমতা বুনটের ওপর নির্ভরশীল। এর সাহায্যে স্থূলতা বা সূক্ষ্মতা নির্ণয় করা যায়।

৩. বুনট মৃত্তিকার বীজ বপনকাল পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। কোন মৃত্তিকায় কোন ফসল চাষ করা যাবে তা মৃত্তিকার বুনটভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস থেকে জানা যায়।

সর্বোপরি, মৃত্তিকাকে উর্বর ও উৎপাদনশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় কি না, তা বুনট সম্পর্কে ধারণা থাকলে বলা যায়। এজন্য কৃষিতে বুনটের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

○ প্রশ্ন-৩. মাটির রং লালচে হলে তাতে অপেক্ষাকৃত কি বেশি আছে বলে মনে করতে হবে?

উত্তর : মাটির রং লালচে হলে তাতে লৌহের ভাগ বেশি আছে বলে বুঝে নিতে হবে। কারণ, আয়রন অক্সাইডের রং লাল। মাটিতে আয়রন অক্সাইড বেশি পরিমাণে থাকলে সে মাটির রং লাল দেখায়।

○ প্রশ্ন-৪. মৃত্তিকার ক্ষারত্বের কারণ কি?

উত্তর : কোনো মৃত্তিকার দ্রবণে হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন অপেক্ষা হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নের ঘনমাত্রা অধিক হলে মৃত্তিকা ক্ষারীয়প্রধান হয়। মৃত্তিকায় প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতি ক্ষারত্বের কারণ। এছাড়া—

১. মৃত্তিকায় যথোপযুক্ত নিষ্কাশনের অভাব এবং অধিক তাপমাত্রা ও অল্প বৃষ্টিপাতের কারণে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হয়।
২. উৎস শিলা বা আদি শিলা ক্ষারজ হলে উৎপন্ন মৃত্তিকা ক্ষারপ্রধান হয়।
৩. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বা জোয়ারের পানি দ্বারা বার বার জমি প্লাবিত হলে জমি লবণসমৃদ্ধ হয় এবং মৃত্তিকা ক্ষারত্ব লাভ করে।
৪. দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রকার ক্ষারীয় সার প্রয়োগে মৃত্তিকা ক্ষারপ্রধান হয়।

○ প্রশ্ন-৫. মৃত্তিকার pH কি?

উত্তর : মৃত্তিকার অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্দেশ করার জন্য একটি স্কেলের সাহায্যে pH-এর মান 0 —14 পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ স্কেল অনুযায়ী প্রশমন বিন্দু বা নিরপেক্ষ বিন্দুর pH হলো 7.0। pH-এর মান 7.0-এর কম হলে অম্লত্ব এবং 7.0-এর অধিক হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। হাইড্রোজেন H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের কারণে অম্লীয় মৃত্তিকা এবং হাইড্রোক্সিল OH^- আয়নের গাঢ়ত্বের কারণে ক্ষারীয় মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। কোনো মৃত্তিকার দ্রবণের pH জানা থাকলে এর সঞ্চিত OH^- আয়নের পরিমাণ জানা যায়।

○ প্রশ্ন-৬. মৃত্তিকায় বাতান্বয়ন কাকে বলে? এর গুরুত্ব লিখুন।

উত্তর : মৃত্তিকা ও বাইরের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বাতাসের বিনিময়ই হচ্ছে মৃত্তিকায় বাতান্বয়ন। মৃত্তিকার অকৈশিক রন্ধ্র পরিসরে (Noncapillary Pore Space) সাধারণত বায়ু থাকে। একটি উৎপাদনশীল দোআঁশ মৃত্তিকার গোটা রন্ধ্র পরিসরের পঞ্চাশ শতাংশ বায়ু দ্বারা পূর্ণ থাকে। মৃত্তিকায় পানির পরিমাণ বেশি হলে মৃত্তিকা বাতান্বয়ন গাছের জন্য সংকটপূর্ণ হয়। কারণ পানি রন্ধ্র পরিসরের বায়ুকে অপসারিত করে। উত্তম বাতান্বিত (Well-aerated) মৃত্তিকায় বাতাসের উপাদান বায়ুমণ্ডলের বাতাসের উপাদানের প্রায় সদৃশ। অল্প বাতান্বিত (Poorly Aerated) মৃত্তিকার বাতাসে বায়ুমণ্ডলের বাতাসের তুলনায় অক্সিজেন কম এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বেশি থাকে।

বাতান্বয়ন মৃত্তিকার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যা অণুজীব ও উদ্ভিদের ওপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ফেলে। অণুজীবের কার্যকলাপ ও উদ্ভিদের শ্বসনের ফলে মৃত্তিকার বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায়। বাতান্বয়ন প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে অক্সিজেনের অভাব হয়। ফলে (ক) উদ্ভিদের শিকড় বৃদ্ধি বাধা প্রাপ্ত হয় এবং শিকড়গুলো মোটা, ছোট ও গাঢ় রঙের হয়, (খ) উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণ ক্ষমতা কমে যায়, (গ) মৃত্তিকা থেকে পানি শোষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, (ঘ) মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক কতকগুলো অজৈব-যৌগের সৃষ্টি হয়, (ঙ) অণুজীব কর্তৃক জৈবপদার্থের বিগলন, মিথোজীবী ও অমিথোজীবী জীবাণু দ্বারা নাইট্রোজেন সংবন্ধনকরণ, নাইট্রিফিকেশন, সালফার জারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াসমূহ হ্রাস পায়।

○ প্রশ্ন-৭. মৃত্তিকা গঠনকারী উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : মৃত্তিকা গঠনে প্রধানত পাঁচটি উপাদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। কোনো স্থানের মৃত্তিকা এ পাঁচটি উপাদানের যুগপৎ ক্রিয়ার ফলে গঠিত হয়। এগুলো হলো— জলবায়ু, জীবজগৎ, উৎসবস্তু, সময় এবং ভূসংস্থান। এসব উপাদানের দীর্ঘ সময় ধরে যৌথ ক্রিয়ার ফলে একটি সুগঠিত মৃত্তিকা প্রোফাইল বিকাশ লাভ করে। এ উপাদানসমূহের কোনো কোনোটির আধিক্য বা ঘাটতির কারণে মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ফলে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়।

○ প্রশ্ন-৮. লবণাক্ত মৃত্তিকাকে সাদা ক্ষার মাটি বলার কারণ কি?

উত্তর : পানির বাষ্পায়নের ফলে অন্তভূমি থেকে লবণ ওপরে ওঠে আসে এবং ভূত্বকে জমা হতে থাকে। এসব লবণের মধ্যে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, সালফেট ও বাইসালফেট লবণসমূহ প্রধান। ফলে মাটির ওপরের স্তরে বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে সাদা সাদা লবণ জাতীয় পদার্থ পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে লবণাক্ত মৃত্তিকাকে সাদা ক্ষার মাটি বা White alkali soil বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৯. মাটির বাফারিং ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : মাটির বাফারিং ক্ষমতা হলো মাটির এক বিশেষ গুণ। এটি মাটির এমন একটি গুণ যা মাটির অম্লমান (pH) পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে এবং pH মানকে স্থির রাখে। মৃত্তিকা দ্রবণে এমন কতগুলো রাসায়নিক দ্রব্য দ্রবীভূত থাকে যেগুলো সহজে দ্রবণের সক্রিয় H^+-এর পরিমাণের তারতম্য ঘটাতে দেয় না। মৃত্তিকা দ্রবণের এ গুণাগুণকেই বাফারিং (Buffering) বলা হয়। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, মৃত্তিকার যে গুণের জন্য একটি মাটির অম্লমান (pH) পরিবর্তনে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং pH মানকে স্থির রাখে তাই হলো বাফারিং। আর কোনো মৃত্তিকার অম্লমান পরিবর্তনে বাধা দেয়ার ক্ষমতা বা সামর্থ্যকেই বলা হয় বাফারিং ক্ষমতা। সাধারণত দুর্বল এসিড ও এর লবণের মিশ্রণ বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-১০. মৃত্তিকার বাফারিং এজেন্টসমূহ কি কি?

উত্তর : মৃত্তিকার বাফারিং এজেন্টগুলো হলো : মৃত্তিকা খনিজ, জৈব বিনিময় বা কার্বনেট, বাইকার্বনেট এবং ফসফেট, মৃদু জৈব এসিড; যথা— কার্বনিক এসিড, সাইট্রিক এসিড, অ্যাসিটিক এসিড, ম্যালিক এসিড ইত্যাদি। মৃত্তিকাস্থ অণুজীবের কার্যাবলির ফলে অনবরত এসব এসিড সৃষ্টি হচ্ছে। ক্যাটায়ন সমৃদ্ধ কলয়ডাল কমপ্লেক্স শক্তিশালী বাফারিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-১১. এসিড মৃত্তিকা বা অম্ল মৃত্তিকা কাকে বলে?

উত্তর : মৃত্তিকার পিএইচ মান ৭-এর কম থাকলে তাকে এসিড মৃত্তিকা বলা হয়। তবে পিএইচ মান ৬·৭-এর কম থাকলে তাকেই মৃত্তিকা বিজ্ঞানীরা এসিড মৃত্তিকা বলেন। সাধারণত ওপরের স্তরের যে এলাকায় শিকড় বিস্তার লাভ করে সে এলাকার মৃত্তিকার অম্লত্বকে বোঝায়। তবে মৃত্তিকার যে কোনো স্তরের অম্লীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

এসিড মৃত্তিকায় হাইড্রক্সিল (OH^-) আয়নের তুলনায় হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে। এ ধরনের মৃত্তিকায় অ্যালুমিনিয়াম আয়ন থেকে ধাপে ধাপে পানি বিয়োজন প্রক্রিয়ায় (Hydrolysis) হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন তৈরি হয়। এছাড়া আয়রনের আয়নও (Fe^{3+}) ধাপে ধাপে পানি বিয়োজন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে। অ্যালুমিনিয়াম এবং আয়রন আয়ন ব্যতীত অ্যালুমিনিয়াম ও আয়রন হাইড্রক্সিল আয়নও এসিড মৃত্তিকায় থাকে।

○ প্রশ্ন-১২. ক্ষারীয় মৃত্তিকা কাকে বলে?

উত্তর : মৃত্তিকার পিএইচ মান ৭-এর অধিক হলে তাকে ক্ষারীয় মৃত্তিকা বলা যায়। তবে মৃত্তিকা বিজ্ঞানীদের মতে, মৃত্তিকার পিএইচ ৭·৪-এর অধিক হলে সেসব মৃত্তিকাকে ক্ষারীয় মৃত্তিকা বলে।

সাধারণত মৃত্তিকার পৃষ্ঠের যে এলাকায় শিকড় বিস্তার লাভ করে সে মৃত্তিকার পিএইচ মেপে তা নির্দেশ করা হয়। তবে মৃত্তিকার যে কোনো ক্ষিতিজের (Horizon) পিএইচ -কেও নির্দেশ করা যেতে পারে। এ ধরনের মৃত্তিকায় হাইড্রোজেন আয়নের তুলনায় হাইড্রক্সিল আয়ন অধিক পরিমাণে থাকে। মৃত্তিকা দ্রবণে ক্ষার ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কলয়ডের বিনিময়যোগ্য অবস্থানেও ক্ষার ধাতু ও ক্ষার মৃত্তিকা (Alkaline earth) আয়নের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

○ প্রশ্ন-১৩. 'মৃত্তিকা একটি জীবন্ত প্রাকৃতিক সত্ত্বা' —আলোচনা করুন।

উত্তর : জীবন্ত হলো যার জীবন আছে এবং যাবতীয় জৈবনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। আর 'প্রাকৃতিক সত্ত্বা' হলো প্রাকৃতিক নিয়মে যার সৃষ্টি। অর্থাৎ জীবন্ত প্রাকৃতিক সত্ত্বা বলতে মূলত স্বতঃউৎপন্ন সজীব বস্তুকে বোঝায়।

মৃত্তিকা একটি জীবন্ত প্রাকৃতিক সত্ত্বা। এটি প্রাকৃতিক নিয়মে সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকাতে ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, যা মৃত্তিকার অঙ্গতুল্য। এটি শিলা থেকে ক্রমবিকশিত হয় এবং অণুজীবগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্যের স্থায়িত্বের জন্য তথা পরিপুষ্টির জন্য বিভিন্ন উপাদান সংযোজনের প্রয়োজন হয় এবং এর অভাবে একসময় মৃত্তিকা কঠিন শিলায় পরিণত হয় যা মৃত্তিকার মৃত্যুর শামিল। অর্থাৎ মৃত্তিকার জন্মমৃত্যু রয়েছে, অঙ্গপ্রতঙ্গ রয়েছে; তাই এটি একটি সজীব বস্তু। সেজন্য বলা হয় মৃত্তিকা একটি জীবন্ত প্রাকৃতিক সত্ত্বা।

○ প্রশ্ন-১৪. মৃত্তিকার পানির প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : মৃত্তিকার কণার রন্ধ্র পরিসরে বায়ু ব্যতীত যে তরল পদার্থ থাকে তাকে মৃত্তিকার পানি বলে। মৃত্তিকার পানি একটি আয়নিক উপাদান যা সাধারণ তাপমাত্রায় তরল অবস্থায় থাকে। মৃত্তিকার পানি বীজের অঙ্কুরোদগম, উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং অণুজীবের জৈবনিক কার্যকলাপে ভূমিকা রাখে। এটি মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলিকে প্রভাবিত করে এবং উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পুষ্টি উপাদান পরিবহনে সহায়তা করে। মৃত্তিকার পানি জৈব পদার্থ বৃদ্ধিকরণে সহায়তা করে এবং শিলা ও খনিজের অবক্ষয় ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে মৃত্তিকা গঠনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া এটি মৃত্তিকার উৎপাদন ও উর্বরতা বজায় রাখে এবং মৃত্তিকাকে নরম ও ঝুরঝুরে করে রাখে। ফলে শিকড়ের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. মৃত্তিকার কৈশিক পানি (Capillary Water) কি?

উত্তর : মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবমুক্ত থেকে মৃত্তিকা যে সর্বোচ্চ পরিমাণ পানি ধরে রাখতে পারে তাই মৃত্তিকার কৈশিক পানি। কৈশিক পানি দ্বারা মৃত্তিকার সকল সূক্ষ্ম রন্ধ্র পূর্ণ থাকে। এ পানি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবমুক্ত। এর টেনশন ১৫ বায়ুচাপ। মৃত্তিকার শস্য উৎপাদনের জন্য এ পানি সর্বাধিক উপকারে আসে। গাছ মৃত্তিকা থেকে সাধারণত যে পানি গ্রহণ করে তা মৃত্তিকার কৈশিক পানি। এ পানি অনায়াসে বিচরণ করতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৬. মৃত্তিকার সংযুতির সংজ্ঞা দিন। মৃত্তিকার সংযুতি গঠনে অণুজীবের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : মৃত্তিকার পৃথক পৃথক কণা (বালি, পলি, কর্দম) পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট আকৃতিতে সংস্থাপিত হওয়ার নামই মৃত্তিকার সংযুতি। মৃত্তিকার এ সংযুতি বালি, পলি ও কর্দম কণাগুলোর দৃঢ়ভাবে দলা পাকানো অবস্থা। সংযুতির ওপর মৃত্তিকার পানি পরিবাহিতা, তাপ পরিবহন ক্ষমতা, আয়তনী ঘনত্ব, সচ্ছিদ্রতা ইত্যাদি নির্ভরশীল।

যে কোনো স্থানের মৃত্তিকায় কেবল একপ্রকার কণিকা থাকে না, বরং কোনো কোনো আধানও থাকে। এ আধানযুক্ত (–ve) কণিকা অন্যের সহায়তা ছাড়া দলা বাঁধে না। এ দলা বাঁধানোর ক্ষেত্রে যা কাজ করে তা হলো মৃত্তিকার কলয়েড, জৈব পদার্থ, গাছের শিকড়, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পানি, মৃত্তিকাস্থ অণুজীব প্রভৃতি।

ভূপৃষ্ঠ থেকে উদ্ভিদ কেটে নিলে বা উদ্ভিদ কোনো কারণে মরে গেলে মৃত্তিকায় উক্ত উদ্ভিদের শিকড় ক্রমান্বয়ে পচতে থাকে। উক্ত পচন থেকে আঠালো পদার্থ নিঃসৃত হয় যা মৃত্তিকার সংযুতি গঠনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, উদ্ভিদের শিকড়ের পচন ক্রিয়া মৃত্তিকাস্থ বিভিন্ন অণুজীবের সহায়তায় হয়ে থাকে। অপরদিকে মৃত্তিকার বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, শৈবাল, ছত্রাক ইত্যাদি) মৃত্তিকার একক কণাসমূহকে প্রাকৃতিক পরিবেশে দলাবদ্ধ করতে সহায়তা করে, ফলে মৃত্তিকার সংযুতি গঠিত হয়।

○ প্রশ্ন-১৭. মৃত্তিকার সংযুতি উর্বরতার চাবিকাঠি? —আলোচনা করুন।

উত্তর : কৃষিক্ষেত্রে মৃত্তিকার গঠন ও উন্নয়নে সংযুতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মূলত জমির উর্বরতা নির্ভর করে মৃত্তিকা ও তার অনুকূল ভৌত ধর্মের ওপর। মাটিতে গাছের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু উত্তম সংযুতি না থাকলে গাছের পক্ষে সে খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব নয়। মৃত্তিকার ভৌত ধর্মাবলি উন্নয়ন এবং ফসল উৎপাদনে সংযুতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া—

ক. উত্তম দানাদার সংযুতি মৃত্তিকায় বায়ু চলাচল ও পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধি করে, ফলে জৈব পদার্থের বিয়োজন ও অণুজৈবিক কার্যাবলি বৃদ্ধি পায় এবং মৃত্তিকার উর্বরতা বাড়ে।

খ. সংযুতি মৃত্তিকার রন্ধ্রপরিসর, তাপ পরিচালন, আয়তনী ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তম সংযুতির ফলে কোনো জমিতে অতিরিক্ত পানি জমে না বা মৃত্তিকা শুকিয়ে পানির অভাব দেখা দেয় না। এটি জমির উর্বরতার জন্য অত্যন্ত উপযোগী মাত্রা।

গ. উত্তম সংযুতির কারণে ভূমিক্ষয় কম হয় এবং মৃত্তিকায় উদ্ভিদের শিকড় গভীরে প্রবেশ করতে পারে, ফলে উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সহজে পরিশোষণ করতে পারে।

সর্বোপরি, সংযুতি মৃত্তিকার সকল ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। জমি থেকে যথাযথ পরিমাণে ফসল পেতে হলে মৃত্তিকায় উত্তম সংযুতি থাকা বাঞ্ছনীয়। এজন্য বলা যায় 'মৃত্তিকার সংযুতি উর্বরতার চাবিকাঠি'।

○ প্রশ্ন-১৮. মৃত্তিকার অম্লত্বের কারণ কি?

উত্তর : মৃত্তিকার দ্রবণে H^+ আয়নের গাঢ়তার কারণে মৃত্তিকার অম্লত্ব সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকার ক্ষারীয় লবণের (যেমন— Ca) অভাবহেতু অথবা জৈব পদার্থের প্রাচুর্যের কারণে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়। এছাড়া—

ক. অম্লপ্রধান শিলা; যেমন—গ্রানাইট, রাওলাইট ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট মৃত্তিকা অম্লীয় হয়।

খ. উদ্ভিদ দেহে অনবরত জৈব রাসায়নিক কর্মকাণ্ডের কারণে দেহে H^+ আয়ন সৃষ্টি হয় এবং মূলের মাধ্যমে তা মৃত্তিকায় যুক্ত হয়ে মৃত্তিকার অম্লত্ব বৃদ্ধি করে।

গ. জমিতে প্রয়োজনীয় চুন ব্যবহার না করলে মৃত্তিকার ভৌত অবস্থার অবনতি ঘটে এবং মৃত্তিকা অম্লীয়প্রধান হয়ে পড়ে।

ঘ. শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত বর্জ্য ও গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড উৎপন্ন করে, যা মৃত্তিকার অম্লত্ব ঘটায়।

ঙ. ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত সার ব্যবহারে মৃত্তিকা অম্লপ্রধান হয়ে পড়ে।

○ প্রশ্ন-১৯. মৃত্তিকার বিক্রিয়া কি?

উত্তর : মৃত্তিকার দ্রবণে কিছু উপাদানের সক্রিয়তা এবং কোনো কোনো উপাদানের কারণে সৃষ্ট একটি রাসায়নিক অবস্থার নাম মৃত্তিকার বিক্রিয়া। মৃত্তিকার বিক্রিয়া মৃত্তিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য। এটি মৃত্তিকার রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। সক্রিয় উপাদানের গাঢ়তার কারণে মৃত্তিকা তিন ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে—

ক. **অম্লীয় বিক্রিয়া :** মৃত্তিকা দ্রবণে H^+ আয়নের গাঢ়তা বেশি হলে মৃত্তিকা এরূপ বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

খ. ক্ষারীয় বিক্রিয়া : OH^- আয়নের ঘনমাত্রা বেশি হলে মৃত্তিকা ক্ষারীয় বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

গ. প্রশমিত বিক্রিয়া : মৃত্তিকার দ্রবণে H^+ ও OH^- আয়ন সমপরিমাণে থাকলে মৃত্তিকা এরূপ বিক্রিয়া প্রদর্শন করে।

○ প্রশ্ন-২০. মৃত্তিকার অতিরিক্ত চুনাকরণের ফলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : চুনজাতীয় উপকরণ প্রয়োগের দ্বারা মৃত্তিকার অম্লত্বজনিত ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রশমন করার প্রক্রিয়াই হলো চুনাকরণ। এর ফলে মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। তবে দীর্ঘদিন মৃত্তিকায় একটানাভাবে চুন প্রয়োগ করলে কিংবা অতিরিক্তমাত্রায় প্রতিনিয়ত চুন প্রয়োগ করলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির পরিবর্তে উৎপাদনক্ষমতা ও উর্বরতা উভয়ই হ্রাস পায়। অতিরিক্ত চুনাকরণের ফলে—

১. মৃত্তিকায় ফেরাস, ম্যাঙ্গানিজ, কপার এবং জিঙ্ক এর অভাব দেখা দেয়।
২. ফসফেট এর সহজলভ্যতা কমতে থাকে এবং জটিল অদ্রবণীয় ফসফেট উৎপন্ন হয়।
৩. উদ্ভিদ কর্তৃক ফসফরাস পরিশোষণ বাধাগ্রস্ত হয়। বোরণ এবং গ্রহণক্ষমতা ও ব্যবহার অল্পমাত্রায় হয়।

○ প্রশ্ন-২১. সবুজ সার কি? মৃত্তিকায় এর প্রভাব উল্লেখ করুন।

উত্তর : কোনো জমিতে শস্য জন্মিয়ে তা সবুজ থাকতেই সে জমিতে চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিলে পচে যে সার তৈরি হয় তাই সবুজ সার।

মৃত্তিকায় জৈব পদার্থ যুক্ত করার লক্ষ্যে তথা জমির উর্বরতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সবুজ সার প্রয়োগ করা হয়। এ সার মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করে এবং মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন বন্ধন গঠনে সহায়তা করে। এটি মৃত্তিকার অণুজীবসমূহের কর্মতৎপরতা এবং অজৈব খনিজ উপাদানের দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি করে। সবুজ সার মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান চুয়ানো বন্ধ করে এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে।

○ প্রশ্ন-২২. হিউমাস (Humus) কি? এর প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : হিউমাস মৃত্তিকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। হিউমাস হলো জৈব পদার্থের বিয়োজনের পর প্রাপ্ত অবশিষ্ট দ্রব্য। অর্থাৎ জৈব পদার্থ উত্তমরূপে বিয়োজনের পর মৃত্তিকার যে গাঢ় কালো থেকে বাদামি বর্ণের কলয়েডাল বস্তু অবশিষ্ট থাকে তাই হলো হিউমাস। এটি তুলনামূলকভাবে স্থায়ী এবং বিয়োজন প্রতিরোধী। রাসায়নিকভাবে হিউমাস হিউমিক এসিড, ফালভিক এসিড, হিউমিনস ও হিমাটোলনিক এসিড দিয়ে গঠিত।

হিউমাসের বর্ণ গাঢ় বাদামি বা কালো। এটা পানিতে অদ্রবণীয় তবে ক্ষারে দ্রবণীয়। এর রাসায়নিক গঠন অত্যন্ত জটিল, স্থায়ী ও বিয়োজন প্রতিরোধী। এর বিনিময় ক্ষমতা বেশি এবং উদ্ভিদ খাদ্য উপাদানের আধার হিসেবে কাজ করে ও কলয়েড গুণাগুণ সম্পন্ন।

হিউমাস সরাসরি মৃত্তিকার ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক অবস্থাকে উন্নত করে, মাটির বর্ণ কালো করে এবং তাপ ধারণক্ষমতা বাড়ায়। মাটির সংযুতি উন্নয়নে সাহায্য করে। উদ্ভিদের খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে এবং পুষ্টি উপাদান বিশেষ করে ফসফরাসের সহজলভ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

○ প্রশ্ন-২৩. এক্টিভেটর কি?

উত্তর : এক্টিভেটর একপ্রকার পচনশীল দ্রব্য যা জৈব ও রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে তৈরি। এটি আবর্জনা স্তূপে ব্যবহার করলে আবর্জনা স্তূপের পচনক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

পচনকারী ছত্রাক, শুকনো গুড়াগোবর, ইউরিয়া, টিএসপিসহ অন্যান্য সার, পাতাপচা, মাটি ইত্যাদি মিশিয়ে এক্টিভেটর তৈরি করা যায়। এক্টিভেটর ব্যবহার করে কমপোস্ট তৈরি করলে তাকে এক্টিভেটর কমপোস্ট বলে।

○ প্রশ্ন-২৪. মৃত্তিকার আত্মভূত পানি (Imbibition Water) কি?

উত্তর : আসঞ্জন (Adherian) ও সংসঞ্জন (Cohension) বলের প্রভাবে মৃত্তিকার কণিকার চারপাশে খুব দৃঢ়ভাবে লেগে থাকা পানি আত্মভূত পানি। এ পানি সহজে পৃথক করা যায় না এবং উদ্ভিদ এ পানি খুব একটা ব্যবহার করতে পারে না। মৃত্তিকায় এ পানির পরিমাণ খুবই কম।

○ প্রশ্ন-২৫. মাটি থেকে কিভাবে খাদ্যরস উদ্ভিদের শিকড়ে প্রবেশ করে?

উত্তর : ব্যাপন প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে খাদ্যরস উদ্ভিদের শিকড়ে প্রবেশ করে। মাটির রসে প্রচুর পরিমাণে খনিজ লবণ থাকে। সে তুলনায় উদ্ভিদের মূলরোমের কোষে খনিজ লবণের পরিমাণ অনেক কম। এ কারণে মাটির রসের ঘনত্ব মূলরোমের কোষের ঘনত্বের চেয়ে বেশি হয়। ফলে মাটির রস থেকে খনিজ লবণ মূলরোমে প্রবেশ করে। ঠিক এভাবে দ্বিতীয় কোষের তুলনায় প্রথম কোষে খাদ্যরস বা খনিজ লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রথম কোষ থেকে খাদ্যরস দ্বিতীয় কোষে প্রবেশ করে। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে খনিজ লবণ জাইলেম বাহিকায় প্রবেশ না করা পর্যন্ত ব্যাপন কার্য চলতে থাকে। জাইলেম বাহিকায় খনিজ লবণ পৌছানোর পর কাণ্ডের দিকে চলে যায়। এভাবেই উদ্ভিদ মাটি থেকে খাদ্যরস সংগ্রহ করে।

○ প্রশ্ন-২৬. পানি কিভাবে উদ্ভিদের মূলরোমে প্রবেশ করে এবং পরিবহন টিস্যুতে গমন করে?

উত্তর : অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি উদ্ভিদের মূলরোমের ভেতরে প্রবেশ করে। কোনো একটি উদ্ভিদের কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, মূলরোম থেকে শুরু করে মজ্জা পর্যন্ত পরিবহন কোষগুলোর পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ আছে। প্রতিটি সজীব কোষে রসপূর্ণ গহ্বর আছে। কোষরস সাধারণত মাটির রসের চেয়ে বেশি ঘন। কোষরসের ঘনত্ব আবার মূলরোম থেকে মজ্জা পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বেশি। তাই অভিস্রবণের ফলে মাটির কম ঘনরস থেকে পানি প্রথমে মূলরোমের অধিক ঘনরসবিশিষ্ট গহ্বরে প্রবেশ করে। পরে একই প্রক্রিয়ায় ক্রমান্বয়ে পানি মূলরোম থেকে অন্তঃত্বকের কোষে পৌছায়। মূলজ চাপের ফলে অন্তঃত্বক থেকে পানি জাইলেমে প্রবেশ করে এবং মূলের বিভিন্ন অংশে চলে যায়।

○ প্রশ্ন-২৭. তাপমাত্রা কিভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর : উদ্ভিদের মৌসুমী বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য তাপ ও আলোর প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শীতপ্রধান দেশের উদ্ভিদ শীতকালে খুব কম তাপমাত্রায় জীবনধারণে সক্ষম। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে হলে সাধারণত এসব উদ্ভিদ বেঁচে থাকতে পারলেও এ সময় এদের বৃদ্ধি হয় না। আবহাওয়া উষ্ণ হতে শুরু করলে এক বিশেষ তাপমাত্রায় উদ্ভিদের বিপাক ক্রিয়া সক্রিয় হয়, সালোকসংশ্লেষণ আরম্ভ হয় এবং গাছের বৃদ্ধি শুরু হয়। আমাদের দেশে আউশ ও বোরো ধানের ফসল সংগ্রহের সময়কাল তাপমাত্রা বৃদ্ধি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে বোরো ধানে ফুল ও দানা তৈরি হতে থাকে।

○ প্রশ্ন-২৮. দস্তার অভাবে কৃষি ফসলের কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : দস্তার অভাবে ফসলের প্রধানত দু ধরনের ক্ষতি হয়। যেমন— ক. পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়; খ. ফল আকারে ছোট হয় এবং ফলন কমে যায়।

○ প্রশ্ন-২৯. পানি সেচ ও নিকাশ কি?

উত্তর : কোনো ফসলী জমির উৎপাদন বৃদ্ধি তথা ফসল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম উপায়ে জমিতে পানি প্রয়োগ পদ্ধতিকে পানি সেচ বলা হয়। পক্ষান্তরে জমিতে আবদ্ধ অতিরিক্ত পানি যা উদ্ভিদের তথা ফসলের অনাবশ্যক এবং মৃত্তিকার জন্য ক্ষতিকর, এরূপ পানি জমি থেকে বের করে দেয়াকে পানি নিকাশ বলে। গাছের গোড়ায় অতিরিক্ত জমে থাকা পানি ফসলের পুষ্টি ও বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে বলে ফসলের বৃদ্ধির জন্য এ পানি নিকাশ অত্যাবশ্যক।

○ প্রশ্ন-৩০. কৃষিক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : কৃষির অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গামা রশ্মি ব্যবহার করা হয়। গামা রশ্মির ভেদন ক্ষমতা আলফা ও বিটা রশ্মির চেয়ে বেশি।

কৃষিক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির ব্যবহার

ক. মৃত্তিকা সংক্রান্ত গবেষণায় মাটির গঠন, রাসায়নিক সংযুক্তি, বায়ুর চলন, ব্যাকটেরিয়ার নাইট্রোজেন সংযোজনের ক্ষমতা নির্ধারণ এবং উদ্ভিদ কর্তৃক পুষ্টি উপাদান গ্রহণ পরীক্ষায় রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

খ. গাছের ফিজিওলজির সালোকসংশ্লেষণ পরীক্ষায় রেডিও আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

গ. সার সংক্রান্ত গবেষণা— কোন সার কোন গাছের জন্য বেশি উপকারী, কোন সার মূলতন্ত্রের মাধ্যমে গাছের দেহে বেশি প্রবেশ করে এসব পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

ঘ. গাছের পুষ্টি; যেমন— ফসফরাস, সালফার, ক্যালসিয়াম, কপার, জিংক, লোহা, কার্বন ইত্যাদির বিপাক পরীক্ষার জন্য পরমাণু শক্তি ব্যবহৃত হয়।

ঙ. বীজ গুদামজাতের সময় অঙ্কুরোদগমে বাধা প্রদানে ব্যবহৃত হয়।

চ. পোকামাকড় ও রোগ দমনে ব্যবহৃত হয়।

ছ. খাদ্যশস্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৩১. সুষম সার (Balanced Fertilizer) কি?

উত্তর : উদ্ভিদের দেহ বিশ্লেষণ করলে প্রায় ৯০টির বেশি উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র ১৬টি উপাদান উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যক। এসব উপাদানের যে কোনো একটির অভাবে উদ্ভিদের বর্ধন ও পুষ্টিতে মারাত্মক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এ উপাদানগুলোর মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ তিনটি উপাদান উদ্ভিদ বায়ু ও পানি থেকে গ্রহণ করে। এ উপাদানগুলো ছাড়া উদ্ভিদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম, যাদের চাহিদা পূরণ করার জন্য বাহির হতে সার প্রয়োগ করতে হয়। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে N, P, K এ তিনটি উপাদান যখন সঠিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয় তখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি, শস্যের ফলন ও গুণগত মান উন্নত হয়। তাছাড়া এরা অন্যান্য উপাদানের পরিশোষণ ও আত্মীকরণে সাহায্য করে। এভাবে জমিতে N, P, K এর সামঞ্জস্য বজায় রেখে সঠিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হলে তাকে সুষম সার বা Balanced Fertilizer বলা হয়। উত্তম ফসল পেতে হলে জমিতে সুষম সার প্রয়োগ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। কারণ, সুষম সার ব্যবহারের ওপরই সারের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ নির্ভর করে।

○ প্রশ্ন-৩২. কম্পোস্ট (Compost) কি?

উত্তর : কম্পোস্ট হচ্ছে প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপাদের ধীরগতির পচন দ্বারা সৃষ্ট জৈব-সার। জৈব অবশিষ্টাংশ বা জৈব অবশিষ্টাংশ ও মৃত্তিকার মিশ্রণ স্তূপাকৃতিতে সাজিয়ে ভিজানো হয় এবং জৈব-পচনের জন্য কিছু সময় রেখে দেয়া হয়।

কম্পোস্ট প্রস্তুত করার জন্য সাধারণত উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশ ও গো-মহিষাদির মলমূত্র ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট আকারের গর্তে উদ্ভিদের অবশিষ্টাংশসমূহ, খামারজাত সার ও মৃত্তিকার স্তর পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হয়। স্তূপের আকারের ওপর কম্পোস্ট তৈরির সময় নির্ভর করে। আদর্শ স্তূপ সাধারণত চার মাস সময়ের মধ্যে কম্পোস্টে পরিণত হয়।

অণুজীব কম্পোস্ট তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অণুজীব দ্বারা বিয়োজনের ফলে জৈব-পদার্থের কার্বন ঃ নাইট্রোজেন অনুপাত হ্রাস পায় এবং জৈব-সার জমিতে প্রয়োগের উপযোগী হয়। এ কারণে

কম্পোস্ট প্রস্তুত করার স্তূপে সঠিক ধরনের অণুজীবের উপস্থিতি অতি প্রয়োজনীয়। অণুজীবের কার্যাবলি সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকর রাখার জন্য আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানসমূহ অনুকূল অবস্থায় থাকা প্রয়োজন। বর্ষাকালে কম্পোস্ট তৈরির সুবিধা হলো, এ সময় স্তূপে পানি দিতে হয় না।

জৈব পদার্থ না পচিয়ে জমিতে প্রয়োগ করা হলে উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এ কারণে জমির বাইরে জৈব-পদার্থ দিয়ে কম্পোস্ট তৈরি করে তা জমিতে প্রয়োগ করা হলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-৩৩. শস্য সংরক্ষণ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : পোকামাকড়, রোগবালাই, ইঁদুর ইত্যাদির আক্রমণ থেকে ক্ষেতের শস্য রক্ষার ব্যবস্থাপনাকে শস্য সংরক্ষণ বলে। পোকামাকড়, রোগবালাই ও ইঁদুর ফসলের প্রধান শত্রু। উৎপাদিত ফসলের উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতি বছরই এদের দ্বারা নষ্ট হয়। তবে ফসলের ক্ষেতে ক্ষতিকর পোকার সাথে নানা প্রকার উপকারী পোকাও থাকে। এরা ফুলের পরাগায়ণে সাহায্য করে এবং ক্ষতিকর পোকামাকড়ের ডিম ও কিড়া খেয়ে অনেক উপকার করে। অতএব, উপকারী পোকা রক্ষা করেই ক্ষতিকর পোকা দমন করা উচিত।

○ প্রশ্ন-৩৪. পেস্ট কি?

উত্তর : যেসব উদ্ভিদ বা প্রাণী মানুষের পালিত পশুপাখি, ফসল, ব্যবহার্য দ্রব্যাদি প্রভৃতির ক্ষতিসাধন বা বিরক্তির উদ্রেক করে তাদেরকে পেস্ট বা আপদ বলা হয়। পোকা-মাকড়, ইঁদুর এবং এ জাতীয় প্রাণী, পাখি, ছত্রাক, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, নেমাটোড, আগাছা ইত্যাদি পেস্টের উদাহরণ।

○ প্রশ্ন-৩৫. ভেষজ কীটনাশক কি? এটি ব্যবহারের সুবিধা কি?

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার ভেষজ উপাদান যেমন— পাটবীজ, নিম বীচির গুঁড়া ও পশুর মূত্র ইত্যাদি এক সাথে মিশিয়ে যে কীটনাশক তৈরি করা হয় তাকে বলে ভেষজ কীটনাশক।

বর্তমানে অধিক ফলনের আশায় পোকামাকড় দমনে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে ফসলের অনিষ্টকারী পোকার সাথে বিভিন্ন উপকারী পোকাও ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে মৎস্য সম্পদ এবং সর্বোপরি পরিবেশের ভারসাম্য হচ্ছে বিনষ্ট ও জনস্বাস্থ্য হচ্ছে হুমকির সম্মুখীন। ভেষজ কীটনাশক ব্যবহার করলে এসব ক্ষতি হবে না বরং বিপুল অর্থের সাশ্রয় হবে এবং মৃত্তিকার উর্বরতাও বাড়বে। কৃষিবিদদের মতে, ভেষজ কীটনাশক ব্যবহার করে ৮০ ভাগ রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার কমানো যায়।

○ প্রশ্ন-৩৬. বিভিন্ন প্রকার জৈব রাসায়নিক কীটনাশকগুলো কি কি?

উত্তর : বিভিন্ন প্রকার জৈব রাসায়নিক কীটনাশকগুলো হলো :

ক. জৈব ক্লোরিনেটেড কীটনাশক : হেপ্টাক্লোর, ডিডিটি, এলড্রিন, ডাই এলড্রিন, ক্লোরডেন, এনড্রিন ইত্যাদি।

খ. জৈব ফসফরাস কীটনাশক : ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন, সুমিথিয়ন, নগস, বাসুডিন, ডাইমেক্রন, লেবাসিড ইত্যাদি।

গ. জৈব কার্বামেট কীটনাশক : ফুরাডান, সেভিন, মেটাসিল, বাইগন ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৩৭. পুকুরে মাছ চাষের জন্য পানির PH কত থাকা উত্তম?

উত্তর : PH-এর ওপর পুকুরের পানির অম্লধর্মিতা বা ক্ষারধর্মিতা নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি মাছ চাষের জন্য অধিকতর উপযুক্ত। তাই পানির PH ৬.৫–৮.৫ হলে পানি প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হয়।

○ প্রশ্ন-৩৮. পুকুরে চুন প্রয়োগের তিনটি কারণ লিখুন।

উত্তর : পুকুরে চুন প্রয়োগের তিনটি কারণ হলো :

ক. চুন মাটি ও পানির অম্লত্ব কমায় এবং ক্ষারত্ব বাড়ায়।

খ. এটি ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ ও রোগ জীবাণু ধ্বংস করে এবং পানি পরিষ্কার করে।

গ. চুন মাছের জন্য প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে।

○ প্রশ্ন-৩৯. পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয় কেন?

উত্তর : পানিতে মাছের প্রধান খাদ্য হচ্ছে প্লাঙ্কটন নামক অতি ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী। মাছ এদেরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। প্লাঙ্কটনের আধিক্যের জন্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম প্রভৃতি প্রয়োজন। পানিতে এসব উপাদান অনেক সময় পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। তাই প্লাঙ্কটন উৎপাদনের জন্য পুকুরে সার প্রয়োগ করা হয়।

○ প্রশ্ন-৪০. আমাদের দেশে মাছের সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে কেন? এর প্রতিকার কি?

উত্তর : মাছকে বলা হয় রূপালি ফসল এবং জলজ প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাণিজ আমিষের শতকরা ৮০ ভাগ আমরা মাছ থেকে পেয়ে থাকি। কিছুদিন আগেও জলাশয়ে যে পরিমাণ মাছ পাওয়া যেত এখন আর সে পরিমাণ পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে এ মৎস্যসম্পদ কমে যাওয়ার জন্য দুটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। যথা : ক. প্রাকৃতিক কারণ ও খ. মানুষের সৃষ্ট কারণ।

ক. প্রাকৃতিক কারণ :

i. **নদীর গভীরতা হ্রাস :** অনেক নদীতে পলি জমে এর গভীরতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে ঐসব নদী মাছের বসবাস ও প্রজননের অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে।

ii. **নদীর গতিপথ পরিবর্তন :** অনেক নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে সেগুলো মৎস্য উৎপাদনের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

iii. **ঋতু পরিবর্তনে অনিয়ম :** অনিয়মিত ঋতু পরিবর্তনের ফলে মৎস্যসম্পদ দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যেমন— নির্দিষ্ট সময়ে বর্ষার আগমন না ঘটায় অনাবৃষ্টির কারণে খাল-বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে মাছের আবাসস্থল বিনষ্ট হচ্ছে এবং মাছের উৎপাদন দ্রুত কমে যাচ্ছে।

খ. মানুষের সৃষ্ট কারণ :

i. **জনসংখ্যা স্ফীতি :** দ্রুত জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণে অপরিকল্পিতভাবে মাছ ধরে চাহিদা মেটানোর জন্য মাছের উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

ii. **খাল-বিল ভরাট :** ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল উৎপাদনের জন্য এবং আবাসস্থল গড়ে তোলার জন্য মানুষ মৎস্য চাষ উপযোগী খাল-বিল ভরাট করছে। এর ফলে মাছের আবাসস্থল কমে যাচ্ছে।

iii. **কীটনাশকের বিষক্রিয়া :** ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কীটপতঙ্গ দমনের জন্য যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তা শেষপর্যন্ত সেচের পানি বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে পুকুর, নদী, খাল-বিলে গিয়ে পড়ে। এতে অনেক সময় মাছ মারা যায়।

iv. **কলকারখানার বিষাক্ত বর্জ্য :** কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নদী-নালা, খাল-বিলের পানির সাথে মিশে এবং মাছের মৃত্যু ঘটায়।

v. **আইন অবমাননা :** মাছ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যেসব আইন রয়েছে সেগুলো না মেনে ইচ্ছেমতো মাছ ধরা হয়। ফলে মাছের উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে।

মাছের সংখ্যা হ্রাসের প্রতিকার : মৎস্যসম্পদকে ক্রম বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে :

i. যেসব নদীর গভীরতা কমে গেছে সেগুলোকে খনন করে মাছের বসবাস ও প্রজননের উপযোগী করে তুলতে হবে।

ii. প্রচলিত আইনের যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে ডিমওয়ালা মাছ ও ছোট মাছ ধরা বন্ধ করতে হবে।

iii. কলকারখানার বিষাক্ত রাসায়নিক বর্জ্য ও কীটনাশক যেন মাছ উৎপাদনকারী জলাশয়ে না মিশতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

iv. জনসংখ্যা বৃদ্ধি মৎস্য সম্পদের হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে হবে।

v. আদর্শ পুকুর তৈরি করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে মাছ চাষ করতে হবে।

vi. পরিত্যক্ত পুকুর, ডোবা, খাল-বিল সংস্কার করে সেখানে মাছ চাষ করতে হবে।

vii. সহজ শর্তে দরিদ্র লোকদের মাঝে মাছ চাষের জন্য ঋণ দিতে হবে।

viii. মাছ চাষীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ix. মাছ চাষের জলাশয় থেকে রাক্ষুসে মাছ সরিয়ে ফেলতে হবে।

○ প্রশ্ন-৪১. ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা কি? এ মৃত্তিকা কিভাবে গঠিত হয়? এর ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : Chrysophyta বিভাগের অন্তর্গত Bacillariophyceae শ্রেণির শৈবালের সাধারণ নাম ডায়াটোম। এ শ্রেণির সব শৈবালই আণুবীক্ষণিক এককোষী, তবে বিভিন্ন প্রজাতির কোষ একসাথে যুক্ত থেকে শৃঙ্খলের মতো, তারার মতো, কলাগাছের ভেলার মতো, সিঁড়ির মতো ইত্যাদি নানা ধরনের কলোনি তৈরি করে। এসব শিলা বা কলোনি বিশ্লেষণ ও দেহের ধ্বংসাবশেষ জমে যে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয় তাকে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা বলে।

গঠন : ডায়াটোম শৈবালের কলোনিগুলো যুগ যুগ ধরে বিশ্লেষিত হয়ে জমা হয় এবং মৃত উদ্ভিদ-প্রাণিজ দেহাবশেষ মিশে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা গঠিত হয়। মূলত অতীতের ফসিল ডায়াটোমগুলোকে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা বলে।

ব্যবহার : বিভিন্ন জিনিস তৈরিতে এ মাটি ব্যবহৃত হয়। যেমন– ডিনামাইট তৈরিতে এ মাটি একটি উপকরণ। Blast furnace-এর ভেতরের দেয়ালে প্রলেপ দেয়ার জন্য, টুথপেস্ট বা শব্দ নিয়ন্ত্রক ঘরের দেয়ালে প্রলেপ দেয়ার জন্য ডায়াটোমীয় মৃত্তিকার ব্যবহার রয়েছে।

○ প্রশ্ন-৪২. কি প্রক্রিয়ায় মাটি থেকে ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক আসে?

উত্তর : আর্সেনিক একটি স্ফটিকাকার ধাতব মৌল। এটি পানিতে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার। মানুষের আর্সেনিক সহনীয় মাত্রা পানিতে ০.05 মিলিগ্রাম/লিটার। ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য ঘটে এবং পানিতে আর্সেনিক দূষণ ঘটে।

মাটিতে যৌগ হিসেবে আর্সেনিক থাকে। নলকূপের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর পানিশূন্য হয়। নলকূপের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন এ পানিশূন্য স্তরে পৌঁছে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক মুক্ত করে। এ মুক্ত আর্সেনিক নলকূপের পানির সাথে মিশে ওপরে উঠে আসে।

○ প্রশ্ন-৪৩. ভূমিকম্প কেন হয়?

উত্তর : সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হতে পারে। ক. ভূপৃষ্ঠজনিত, খ. আগ্নেয়গিরিজনিত ও গ. শিলাচ্যুতিজনিত কারণ।

১. **ভূপৃষ্ঠজনিত কারণ :** বিভিন্ন কারণে কোনো কোনো সময় পাহাড়ি এলাকায় ধস নামে। ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

২. **আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ :** আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা বেরিয়ে আসার চেষ্টায় প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের (Crater) ভেতরের ভূস্তরে আঘাত করতে থাকে। এ প্রচণ্ড সংঘর্ষে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

৩. শিলাচ্যুতিজনিত কারণ : ভূগর্ভের ভেতরে শিলাচ্যুতির ফলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।
এছাড়াও ভূত্বকের পরিবর্তন, তাপ বিকিরণ, ভূগর্ভের চাপের হ্রাস, পানি বাষ্পীভবন, ভূত্বকের শীতলতাপ্রাপ্তি, হিমবাহ (Glacier), ভূ-আন্দোলন, খনির ভাঙন, বিস্ফোরণের প্রভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির কারণেও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশ্ন-৪৪. কম্পোস্ট কি? এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : গবাদি পশুর উচ্ছিষ্ট, গৃহস্থালীর আবর্জনা, আগাছা, খড়কুটো প্রভৃতির এক বা একাধিক উপাদান পচানোর পর যে জৈব সার তৈরি হয় তাকে কম্পোস্ট বলে। এটি জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন-৪৫. 'উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজেই প্রস্তুত করে।'—ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : উদ্ভিদ মাটি থেকে পানি ও বায়ু থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পাতার ক্লোরোফিলের সাহায্যে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে। উৎপন্ন খাদ্যের কিছু অংশ উদ্ভিদ নিজস্ব প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং অধিকাংশ দেহে জমা করে রাখে।

প্রশ্ন-৪৬. বাংলাদেশের উপর দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে। এটি কি? এর ভৌগোলিক গুরুত্ব কি?

উত্তর : বাংলাদেশের উপর দিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক রেখা চলে গেছে সেটি কর্কটক্রান্তি রেখা। ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এই কাল্পনিক রেখার জন্যই বাংলাদেশ নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।

প্রশ্ন-৪৭. মাটির অম্লজান (Soil P^H) বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : মাটির বিক্রিয়া একটি রাসায়নিক ধর্ম। এই ধর্ম প্রকাশের একক হচ্ছে P^H বা অম্লমান। মাটিতে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রার ঋণাত্মক লগারিদমকে মাটির অম্লমান বলে (Soil P^H may be defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration)। P^H হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব বা গাঢ়তাকে নির্দেশ করে। সহজ কথায় মাটির অম্লমান বলতে মাটিতে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণকে বুঝায় যা সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। মাটির অম্লমান ১-১৪ সংখ্যা দ্বারা উল্লেখ করা হয়। P^H মিটার দ্বারা মাটির অম্লমান নির্ণয় করা যায়। কোনো মাটির অম্লমান ৭ এর নিচে গেলে উক্ত মাটির অম্লত্ব দেখা যায় এবং অম্লমান ৭.০ এর ওপরে উঠে গেলে মাটির ক্ষারত্ব দেখা যায়। যে মাটি যত বেশি অম্লীয় সে মাটির অম্লত্ব তত বেশি। $P^H = -\log[H^+] = \log\frac{1}{[H^+]}$

ধরা যাক, কোনো এক লিটার দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের পরিমাণ ১০^-৬ গ্রাম, তাহলে ঐ দ্রবণের পিএইচ ৬ হবে। অর্থাৎ $P^H = \log\frac{1}{[H^+]} = \log\frac{1}{10^{-6}} = \log 10^6 = 6\log 10 = 6$

[এখানে হাইড্রোজেন আয়নের গাঢ়ত্ব বা পরিমাণ $= ০.০০০০০১ = \frac{১}{১০০০০০০} = \frac{১}{১০^{৬}} = ১০^{-৬}$]

প্রশ্ন-৪৮. মাটির বিক্রিয়া ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস করুন।

উত্তর : মাটির বিক্রিয়াভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ :

মাটির অম্লমান অনুসারে মাটিকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. অম্লীয় মাটি : অম্ল মাটির অম্লমান ৭ এর নিচে।
২. প্রশম মাটি : প্রশম বা নিরপেক্ষ মাটির অম্লমান ৭.০।
৩. ক্ষারীয় মাটি : ক্ষারীয় মাটির অম্লমান ৭.০ এর বেশি।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক শ্রেণিবিভাগ :

মাটির অম্লত্ব অথবা ক্ষারত্বের আপেক্ষিক পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাটির প্রতিক্রিয়াকে (পিএইচ) সাত ভাগে ভাগ করা হয়েছে (এসআরডিআই, ২০০০)। যথা–

প্রতিক্রিয়া শ্রেণি	মাটির অম্লমান	প্রধান বিক্রিয়া
১. অত্যধিক অম্ল	৪.৫-এর নিচে	অম্ল মাটি
২. অধিক অম্ল	৪.৬-৫.৫	
৩. মৃদু অম্ল	৫.৬-৬.৫	প্রশম মাটি
৪. নিরপেক্ষ	৬.৬-৭.৩	
৫. মৃদু ক্ষার	৭.৪-৮.৪	ক্ষারীয় মাটি
৬. অধিক ক্ষার	৮.৫-৯.০	
৭. অত্যধিক ক্ষার	৯.০-এর অধিক	

প্রশ্ন-৪৯. মাটির অম্লত্ব বলতে কি বুঝেন? উদ্ভিদ, পানি ও অণুজীবসমূহের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন।

উত্তর : মৃত্তিকা দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব বেশি হলে মাটিতে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়। মাটির অম্লমানের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির অম্লতার তীব্রতাও পরিবর্তিত হয়। যে মাটির অম্লমান যত কম সে মাটির অম্লত্ব তত বেশি। মাটিতে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা মাটির অম্লতার তীব্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মাটির অম্লত্ব প্রধানত দু'প্রকার। যথা– সক্রিয় অম্লত্ব ও প্রচ্ছন্ন অম্লত্ব। মাটির দ্রবণে যে পরিমাণ H^+ মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে সক্রিয় অম্লত্ব বলে। পিএইচ মিটার দ্বারা সক্রিয় অম্লত্ব জানা যায়। অন্যদিকে কর্দম কণা বা কলোয়েড যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন শোষিত বা আবদ্ধ অবস্থায় রাখে তাকে প্রচ্ছন্ন অম্লত্ব বলে। মাটির প্রচ্ছন্ন অম্লত্ব সক্রিয় অম্লত্বের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি এবং এটেল মাটিতে এর পরিমাণ আরও অধিক। অম্লত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য মাটিতে অবস্থানরত উদ্ভিদ, পানি ও অণুজীবসমূহের মধ্যেও নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন–

১. মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সহজলভ্যতা হ্রাস পায়।
২. মাটিতে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের আধিক্যজনিত বিষাক্ততা সৃষ্টি হয়।
৩. মাটিস্থ অণুজীবসমূহ বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়ার সক্রিয়তা হ্রাস পায়।
৪. মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার প্রভৃতি মুখ্য পুষ্টি উপাদানের দ্রবণীয়তা কমে যায়।
৫. মাটিতে আয়রন, জিংক, বোরন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায়।
৬. অম্ল মাটিতে কিছু কিছু ফসল যেমন– চা, আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি ভালো জন্মে।

প্রশ্ন-৫০. অম্ল মাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : অম্ল মাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. অম্ল মাটির P^H ৭.০-এর কম হয়।
২. ব্যাকটেরিয়া ও এক্টিনোমাইটিসির কার্যাবলি কমে যায়। ছত্রাকের কার্যাবলি বেড়ে যায়।
৩. অম্ল মাটিতে চুন প্রয়োগ ব্যতীত অধিকাংশ মাঠে ফসল সফলভাবে উৎপাদন করা যায় না।
৪. অম্ল মাটিতে ফসফরাস, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের প্রাপ্যতা কমে যায়।
৫. মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধির সাথে নাইট্রোজেন, মলিবডেনাম, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও সালফারের দ্রবণীয়তা কমতে থাকে।

৬. অম্ল মাটিতে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়াম বিষাক্ততা দেখা দিতে পারে। মধ্যম অম্ল মাটিতে ম্যাংগানিজ, মলিবডেনাম ও বোরনের প্রাপ্যতা বাড়তে পারে। অম্লত্ব তীব্রতর হলে এদের দ্রবণীয়তা কমে যায়।

৭. তীব্র অম্লযুক্ত মাটিতে ফসফরাসের দ্রবণীয়তা ব্যাপক হ্রাস পায়।

○ প্রশ্ন-৫১. মাটির অম্লত্ব সৃষ্টির কারণসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : মাটিতে অম্লত্ব সৃষ্টির প্রধান কারণ অম্লীয় উৎস শিলা। অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে অম্লীয় সারের ব্যবহার এবং জমি নিবিড় চাষের মাধ্যমে ফসল কর্তৃক অধিক হারে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পরিশোষণ, অধিক বৃষ্টিপাতের দরুন ক্ষারক দ্রব্যের চুয়ানি এবং অণুজৈবিক কার্যাবলি।

১. **অম্লীয় উৎস শিলা :** মাটি উৎপাদনের উৎস শিলা অম্লীয় হলে উৎপন্ন মাটি অম্লীয় হয়। মাটি গঠনকারী অম্লীয় বিক্রিয়াসম্পন্ন শিলার মধ্যে রয়েছে গ্রানাইট, রায়োলাইট, বালি পাথর ও নীস। এসব শিলায় ক্ষারীয় উপাদানের চেয়ে সিলিকার পরিমাণ বেশি থাকে। প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে এসব শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মাটি দ্রবণে সিলিসিক এসিড উৎপন্ন হয়, যা মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশের পুরাতন তৃতীয় ক্রম পাহাড়ি এলাকায় কম-বেশি পরিমাণে এসব শিলা উপস্থিত থাকায় মাটি উৎসগতভাবে অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।

২. **অম্লীয় সার প্রয়োগ :** মাটিতে প্রধানত অ্যামোনিয়াম ও অন্যান্য সার বা অম্ল উৎপাদনকারী সার বহু দিন ব্যবহার করলে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায়। কোনো জমিতে ১০০ পাউন্ড অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে যে পরিমাণ অম্লত্ব উৎপাদিত হয় তা প্রশমনের জন্য ১০৯ পাউন্ড ক্যালসিয়াম কার্বনেট প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড সারের অম্লাঙ্ক যথাক্রমে ৭৪ ও ১২৮।

৩. **অণুজৈবিক কার্যাবলি :** জৈব পদার্থ বিয়োজন ও রাসায়নিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অণুজীব প্রভাবিত জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে নানা প্রকার জৈব এসিড ও নাইট্রোজেন আয়ন উৎপাদিত হয়। এই নাইট্রোজেন ও জৈব এসিড সাময়িকভাবে মাটির অম্লত্ব বাড়িয়ে দেয়। মাটির অম্লত্ব বাড়ানোর জন্য নাইট্রিকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব খুব বেশি। মাটিতে অণুজৈবিক শ্বসন থেকে উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি মিলিত হয়ে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে। এই কার্বনিক এসিড ক্ষারক উপাদানের অপচয় ঘটিয়ে মাটির অম্লত্ব বাড়াতে পারে। মাটিতে সালফারের অণুজৈবিক জারণ ও অম্লত্ব বাড়ায়।

৪. **বৃষ্টিপাত ও চুয়ানি :** অধিক বৃষ্টিপাত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের অপচয় ঘটায়। ফলে মাটির ওপর স্তরে অম্লত্ব সৃষ্টি হয়। বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০ সেমি-এর বেশি হলে এবং ওপর ভূমিতে ক্যালসিয়াম কার্বনেট কম থাকলে সেখানে অম্লত্ব দেখা দিতে পারে। যে পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে সেই পানি অধিক হারে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের চুয়ানি ঘটায় ও অম্লত্ব সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের উঁচু ও মাঝারি উঁচু মধ্যম নিষ্কাশিত পলি মাটির অধিকাংশই ক্ষারক দ্রব্যের চুয়ানির ফলে অম্লত্ব দেখা দিয়েছে। অবশ্য চুনযুক্ত মাটির উপরিভাগে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেট থাকায় সেখানে এখনও অম্লত্ব সৃষ্টি হয়নি। উঁচু, মাঝারি উঁচু ও নিম্ন সকল পাহাড়ি এলাকায়ই ক্ষারক দ্রব্যের চুয়ানির ফলে অম্লত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃষ্টিপাত ক্ষারক দ্রব্যের অপচয়ের অনুকূল।

৫. **জৈব পদার্থের বিয়োজন :** জৈব পদার্থের বিয়োজনের ফলে মাটিতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রচুর উৎপন্ন হয়, ফলে অম্লত্ব বাড়ে। $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$; $H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$

৬. **নিবিড় চাষ ও ফসল পরিশোষণ :** কোনো জমিতে ফসল উৎপাদনের তীব্রতা যত বাড়ে সেই মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধির আশঙ্কাও তত বৃদ্ধি পায়। প্রতি ফসল ঋতুতে কর্তিত ফসলের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অপসারিত হয়। এসব জমিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম সার ব্যবহার করা না হলে অম্লত্ব সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

৭. **বায়ুস্থ যৌগসমূহের পতন :** বায়ুতে CO_2, SO_2, NO প্রভৃতি যৌগ তাকে, যা বৃষ্টির পানিতে দ্রবীভূত হয়ে মাটিতে নেমে আসে এবং এসিড উৎপত্তির মাধ্যমে মাটি অম্লীয় করে।

৮. **খনিজ উপাদান :** মাটিতে আয়রন, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি খনিজ উপাদান যদি অতিরিক্ত পরিমাণে থাকে তবে পানির সাথে উক্ত উপাদানগুলোর বিক্রিয়ায় মাটি অম্লীয় হয়।

○ প্রশ্ন-৫২. মাটির ক্ষারত্ব বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : মৃত্তিকা দ্রবণে হাইড্রোক্সিল আয়নের $[OH^-]$ ঘনত্ব বেশি হলে মাটিতে ক্ষারত্বের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ কোনো মাটির অম্লমান ৭ এর বেশি হলে ঐ মাটিতে ক্ষারত্ব দেখা দেয়। ক্ষারত্ব সৃষ্টির জন্য হাইড্রোক্সিল আয়নের সাথে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ও পটাশিয়াম প্রভৃতি ক্ষারজ উপাদান সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। হাইড্রোক্সিল আয়নের সাথে ক্ষারজ এসব উপাদান মিশে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে। যে মাটির অম্লমান ৭ এর বেশি থাকে তাকে ক্ষারীয় মাটি বলে। ক্ষারী মাটিতে বিনিময়যোগ্য সোডিয়ামের পরিমাণ ১৫% এর বেশি থাকে।

○ প্রশ্ন-৫৩. ক্ষারকীয় মাটির বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : ক্ষারীয় মাটির বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. ক্ষারীয় মাটির অম্লমান ৭.০ এর বেশি থাকে।
২. ক্ষারীয় মাটিতে তামা, বোরন ও দস্তার অভাব দেখা দিতে পারে।
৩. সোডিয়ামের প্রাচুর্যে মাটিতে বিষাক্ততা দেখা যায়।
৪. ক্ষার মাটিতে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের দ্রবণীয়তা কম।
৫. অণুজীবের কার্যাবলি ব্যাহত হয় এবং জৈব পদার্থের বিগলন কমে যায়।
৬. কর্দম কণা ও জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকে।
৭. বিনিময়ক্ষম সোডিয়ামের পরিমাণ ১৫% এর বেশি থাকে।
৮. ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ বেশি থাকে।

○ প্রশ্ন-৫৪. মাটির ক্ষারত্বের কারণ কি কি?

উত্তর : বিভিন্ন কারণে মাটিতে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১. **শিলাগত কারণ :** ক্ষারীয় শিলা হতে সৃষ্ট মাটি ক্ষারীয় বিক্রিয়তা প্রদর্শন করে, যেমন– চুনাপাথর, ডলোমাইট হতে সৃষ্ট মাটিতে চুনের পরিমাণ বেশি থাকে। বাংলাদেশে গঙ্গা প্লাবনভূমিতে অধিক হারে শামুক-ঝিনুক থাকে বলে এ মাটিতে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হয়েছে।

২. **জলবায়ুগত কারণ :** জলবায়ুর কারণে শুষ্ক ও অবশুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় বলে সেখানে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের চুয়ানি কম হয়। ফলে মাটির ওপর স্তরে ক্ষারীয় দ্রব্য বেশি থাকে, যা মাটিতে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে।

৩. **লোনাজনিত কারণ :** সামুদ্রিক লোনা পানির প্লাবনে কোনো জমি নিয়মিত প্লাবিত হলে সে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যায়। লোনা পানিতে লবণ বেশি থাকে। অন্যদিকে সোডিয়াম আয়নের আধিক্য থাকে। ফলে মাটি ক্ষারীয় হয়ে থাকে।

৪. **খারাপ মানের সেচের পানি ব্যবহার :** জমিতে ক্রমাগত অধিক সোডিয়ামযুক্ত সেচের পানি ব্যবহার করলে ক্ষারতা দেখা দেয়। পানির সোডিয়াম জমির জৈব পদার্থসমূহকে দ্রবীভূত করে এবং এদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে মাটির ক্ষারতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটির সংযুতি নষ্ট হয়।

○ প্রশ্ন-৫৫. ক্ষার মাটির পরিশোধন আলোচনা করুন।

উত্তর : নিচের উপায়গুলো অবলম্বন করে মাটির ক্ষারত্ব দূর করা যেতে পারে :

১. **দূরীকরণ (Eradication) :** মাটি থেকে ক্ষারত্ব দূরীকরণের প্রথম উপায় হলো মাটিস্থ লবণ সরিয়ে দেয়া। আর এ কাজ করতে পর্যাপ্ত পরিমাণ লবণমুক্ত পানির দ্বারা সেচ দিতে হবে। তারপর এর নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। এ ব্যবস্থায় প্রচুর পরিমাণ পানি সেচ দিয়ে প্লাবিত করে দিতে হয়। এতে মাটির ক্ষারদ্রব্য ধুয়ে যায়। তবে মাটিতে সোডিয়ামের তুলনায় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বেশি থাকলে দূরীকরণ প্রক্রিয়া অধিক কার্যকর হয়।

২. **রূপান্তর (Conversion) :** মাটিতে সোডিয়ামের পরিমাণ বেশি হলে ক্যালসিয়াম ফসফেট বা জিপসাম ব্যবহার করে অতিরিক্ত সোডিয়াম দূর করা যায়। এক্ষেত্রে মাটির কণার গায়ে লেগে থাকা সোডিয়াম আয়ন জিপসাম বা ক্যালসিয়াম ফসফেটের ক্যালসিয়াম আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এরূপ অবস্থায় জমিতে সেচ দিলে দ্রবণীয় Na_2SO_4 নিষ্কাশিত পানির সাথে বেরিয়ে গিয়ে মাটি ক্ষারমুক্ত করে।

$$\boxed{\text{কর্দম কণা}}\ Na^{+} + CaSO_4 \longrightarrow Na_2SO_4 + \boxed{\text{কর্দম কণা}}\ Ca^{++}$$

৩. **নিয়ন্ত্রণ (Control) :** পানির বাষ্পায়ন কমিয়ে মাটির লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। লোনা মাটিতে পানি ও ক্যালসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে লবণাক্ততা কমে যায়। ফলে মাটির অম্লমান কমে কলোয়েড কণা পুঞ্জীভূত হয় এবং মাটিতে পানির প্রবেশ্যতা বাড়ে। মাটির অম্লমান যাতে কম থাকে সেজন্য সেচের পানিতে সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে দেয়া যায়। ক্ষার সহনশীল ফসলের চাষ করে ক্ষারত্ব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ ছাড়াও ক্ষার মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে চিনি কলের বর্জ্য দ্রব্য (চিটাগুড়) প্রয়োগ করে চাষাবাদ করলে মাটির ক্ষারত্ব কমে যায়।

○ প্রশ্ন-৫৬. মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব পরিমাপ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাটির অম্লমানের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব। তাই অম্লমান পরিমাপ করে মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব পরিমাপ করা যায়। মাটির অম্লমান পরিমাপের জন্য ২টি উপায় রয়েছে। যথা– P^H মিটার ও লিটমাস পেপার।

P^H মিটার : P^H মিটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এ যন্ত্রটির গ্লাস ইলেকট্রোড মৃত্তিকা দ্রবণে নিমজ্জিত করে প্রাপ্ত রিডিং দেখে মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্বের পরিমাণ করা যায়। প্রাপ্ত রিডিং মাটির অম্লমান ৬.৬-৭.৩ এর মধ্যে হলে নিরপেক্ষ মাটি, ৬.৫ বা তার নিচে হলে অম্লীয় মাটি এবং ৭.৪ বা তার বেশি হলে ক্ষারীয় মাটি হবে। এক্ষেত্রে ১ ভাগ মাটির সাথে ২ ভাগ পানি মিশিয়ে মিশ্রিত দ্রবণের অম্লমান পরীক্ষা করা হয়।

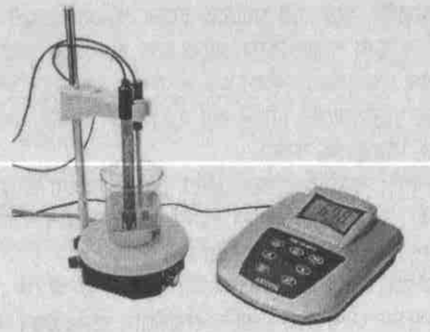

চিত্র : p^H মিটার

লিটমাস পেপার : উপরোক্ত মৃত্তিকা দ্রবণে লাল লিটমাস পেপার ডুবালে যদি লিটমাস পেপারটি নীল হয় তবে ক্ষারীয় মাটি হবে অথবা নীল লিটমাস পেপারটি লাল হলে অম্লীয় মাটি হবে। কিন্তু লিটমাস পেপারের রং পরিবর্তন না হলে মাটির প্রতিক্রিয়া নিরপেক্ষ হবে।

○ প্রশ্ন-৫৭. মাটির বিশোধনের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : মাটি ফসল উৎপাদনের অন্যতম প্রাকৃতিক মাধ্যম। কিন্তু মাটির অম্লমানের বিভিন্নতার কারণে ফসলের সহনশীলতাও বিভিন্ন হয়। ফলে কোনো মাটিতে কোনো নির্দিষ্ট ফসল উৎপাদন করতে হলে মাটির অম্লমান কমিয়ে বা বাড়িয়ে প্রথমে মাটি সংশোধন করা হয় এবং পরে ফসল উৎপাদন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মাটির অম্লমান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মাটি সংশোধন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, অম্লীয় মাটির অম্লমান ৭ এর নিচে হবে। ধরা যাক মাটির অম্লমান ৪.৫ অর্থাৎ মাটি অধিক অম্লীয়। এ অম্লমানে পাটের ফসল ভাল হবে না। তাই এ মাটি পাট চাষের জন্য উপযোগী করতে হলে সংশোধনপূর্বক পাট চাষ করা যেতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, পাট চাষের জন্য উপযোগী অম্লমান ৬.০-৭.৫। সুতরাং মাটির অম্লমান ৪.৫ থেকে ৬ বা তার উপরে বৃদ্ধি করে মাটি পাট চাষের উপযোগী করতে হবে। যে পদ্ধতিতে মাটির অম্লমান বৃদ্ধি করা হবে সেটাই হলো অম্লীয় মাটির সংশোধন পদ্ধতি।

মাটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য :

ক. মাটির অম্লমান ফসল উৎপাদনের উপযোগী রাখা।
খ. পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি করা।
গ. মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করা।
ঘ. ফসলের পুষ্টি গ্রহণ সহজসাধ্য করা।
ঙ. ফসল উপযোগিতা বৃদ্ধি করা।
চ. সর্বোপরি ফসলের ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করা।

○ প্রশ্ন-৫৮. অম্লীয় মাটির সংশোধন আলোচনা করুন।

উত্তর : অম্লীয় মাটির অম্লমান ৭ এর কম থাকে। এসআরডিআই-এর সুপারিশ অনুসারে অম্লীয় মাটির অম্লমান ৬.৫ বা তার নিচে হবে। অম্লীয় মাটিকে প্রধানত ৩ ভাগে ভাগ করা যায়; যথা–মৃদু অম্ল, অধিক অম্ল ও অত্যধিক অম্ল। অম্লীয় মাটি সংশোধনের কয়েকটি উপায় নিচে দেয়া হলো :

১. **চুন ব্যবহার :** মাটিতে অম্লত্ব কমানোর জন্য চুন ব্যবহার করতে হয়। চুন ব্যবহারে মাটির অম্লমান বৃদ্ধি পেয়ে মাটির অম্লত্ব কমিয়ে দেয়। যেমন– ডলোচুন ব্যবহারে মাটির অম্লত্ব কমে। অম্লীয় মাটি সংশোধনের জন্য নিম্নরূপ হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

মাটির অম্লমান	চুন প্রয়োগের পরিমাণ (টন/হেক্টর)
৩.৫-৪.৫	৩-৫
৪.৬-৫.৫	২-৩
৫.৬-৬.৫	১-২

২. **জৈব সার ব্যবহার :** মাটিতে জৈব সার (যেমন– কম্পোস্ট, বায়োফার্টিলাইজার, ট্রাইকোর্ডামা কম্পোস্ট, জৈববালাই নাশক, গোবর) প্রয়োগ করে অম্লত্ব কমানো যায়। জৈব সারে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম থাকে যা মৃত্তিকা দ্রবণের H^+ আয়নকে সরিয়ে মাটির অম্লত্ব হ্রাস করে।

৩. **সবুজ সার :** সবুজ সার প্রয়োগ করা হলে মাটিতে পচে জৈব সার উৎপন্ন হয়। যা মাটির অম্লত্ব হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

৪. **অণুজীব সার ব্যবহার :** রাইজোবিয়াম অণুজীব সার ব্যবহার করে অম্লমাটি সংশোধন করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, অণুজীব সার ব্যবহারে নাইট্রোজেন প্রধান রাসায়নিক সার যেমন ইউরিয়া বা

এমোনিয়াম সালফেট কম লাগে বা লাগে না। ফলে অম্ল সৃষ্টিকারী রাসায়নিক সারের সাশ্রয় হয় এবং অম্লীয় মাটি সংশোধন করা যায়। তাছাড়া রাইজোবিয়াম অণুজীব মাটিতে মৃত্যুর পর জৈব পদার্থ দান করে যা মাটির অম্ল মাটি সংশোধনে ভূমিকা রাখে। রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া চুনের দ্বারা প্রশমিত মাটিতে অধিক থাকে।

৫. **সেচের পানির মান উন্নয়ন :** আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামমুক্ত পানি দ্বারা সেচ প্রদান করে মাটির অম্লত্ব প্রতিরোধ করা যায়।

৬. **সুষম সারের ব্যবহার :** ফসলের জমিতে ইচ্ছামতো রাসায়নিক সার ব্যবহার না করে বিভিন্ন জৈব ও অজৈব সারের সমন্বয় ঘটিয়ে সুষম সার ব্যবহার করলে অম্লতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

৭. **অম্লীয় সার ব্যবহার কমিয়ে :** যেসব সার অম্লত্ব সৃষ্টি করে এরকম সারের ব্যবহার কমিয়ে ঐ সারের বিকল্প সার ব্যবহার করতে হবে। যেমন– এমোনিয়াম সালফেট সারের পরিবর্তে সোডিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা যেতে পারে।

৮. **কাঠের ছাই প্রয়োগ :** মাটিতে কাঠের ছাই প্রয়োগে অম্লত্ব কমে যায়।

○ প্রশ্ন-৫৯. ক্ষারীয় মাটির সংশোধন আলোচনা করুন।

উত্তর : ক্ষারীয় মাটির অম্লমান ৭ এর বেশি থাকে। এসআরডিআই এর সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষারীয় মাটি অম্লমান ৭.৪ বা তার বেশি। অম্লমান অনুসারে ক্ষারীয় মাটি তিন প্রকার; যথা– স্বল্প ক্ষার, অধিক ক্ষার ও অত্যধিক ক্ষার মাটি। ক্ষারীয় মাটি সংশোধনের জন্য কতিপয় উপায় নিচে আলোচনা করা হলো :

১. **জিপসাম ব্যবহার :** জিপসাম ব্যবহার করে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা যায়। ক্ষারীয় মাটিতে বিনিময়যোগ্য সোডিয়াম এর পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে সোডিয়াম আয়ন জিপসাম সারের Ca^{++} আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। প্রতিস্থাপিত সোডিয়াম, সালফেট আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফেট তৈরি করে এবং পানি নিকাশের সাথে বের হয়ে যায়। ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করতে কী পরিমাণ জিপসাম ব্যবহার করতে হবে তার পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হলো :

বিনিময়যোগ্য সোডিয়ামের পরিমাণ	জিপসামের প্রয়োজন (প্রতি একর ফুটে টন)	সালফারের প্রয়োজন (প্রতি একর ফুটে টন)
১	১.৭	০.৩২
২	৩.৪	০.৬৪
৩	৫.১	০.৯৬
৪	৬.৮	১.২৮
৫	৮.৫	১.৬০
৬	১০.২	১.৯২
৭	১১.৯	২.২৪
৮	১৩.৬	২.৫৬
৯	১৫.৩	২.৮৮
১০	১৭.০	৩.২০

২. **জৈব সার ব্যবহার :** জৈব সার বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা যায়। যখন ট্রাইকোর্ডামা নামক ছত্রাকের মাধ্যমে জৈব বস্তু পঁচিয়ে জৈব সার তৈরি করা হয় তখন তাকে ট্রাইকোর্ডামা জৈব সার বলে। ট্রাইকোর্ডামা জৈব সার মাটিতে ব্যবহার করলে ক্ষারীয় মাটির অম্লমান কমে যায়। মাটিতে বায়ো ফার্টিলাইজার বা জৈব বালাইনাশক ব্যবহার করেও ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা যায়। জৈব পদার্থ বিযোজন ও রাসায়নিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে অণুজীব (ট্রাইকোর্ডামা) প্রভাবিত জৈব

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মাটিতে নানা প্রকার জৈব এসিড ও নাইট্রোজেন আয়ন উৎপাদিত হয়। ফলে মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষারীয় মাটি সংশোধন হয়। তাছাড়া মৃত্তিকাতে অণুজৈবিক শ্বসন থেকে উৎপাদিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানি মিলিত হয়ে কার্বনিক এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিড ক্ষারক উপাদানের অপচয় ঘটিয়ে বা এসিড হিসেবে কার্যকর হয়ে মাটির অম্লমান বৃদ্ধি করে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করে।

৩. **সালফার প্রয়োগ :** জমিতে সালফার প্রয়োগ করে ক্ষারীয় মাটি সংশোধন করা হয়। সালফার জারিত হয়ে সালফিউরিক এসিডে পরিণত হয়। এই সালফিউরিক এসিড পুনরায় সোডিয়াম কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম সালফেটে রূপান্তরিত হয়। সোডিয়াম সালফেট জমি থেকে নিষ্কাশন করে দূর করা যায়।

$S + 4H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 6H$; $Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2CO_3 + Na_2SO_4$

৪. **ক্ষার সহনশীল ফসলের চাষ :** যে সকল জমিতে ক্ষারমুক্ত করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ক্ষার সহনশীল বা ক্ষার প্রতিরোধক ফসলের চাষ করে ক্ষারীয় মাটি উৎপাদনশীল রাখা যায়। ধান, গম, ভুট্টা, পেঁয়াজ, মটর, বাঁধাকপি প্রভৃতি ফসল মাঝারি ধরনের ক্ষার সহনশীল। সুতরাং এদের চাষ করার মাধ্যমে ক্ষারত্ব এড়ানো যায়।

৫. **সেচ ও নিকাশ :** যে সকল মাটিতে তুলনামূলকভাবে কম পরিমাণে সোডিয়াম থাকায় ক্ষারতা দেখা যায়, সেক্ষেত্রে পানি দ্বারা সেচ দিলে ক্ষারীয় লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং পরবর্তীকালে চুয়ানীর মাধ্যমে অথবা জমিতে নিষ্কাশন পদ্ধতিতে বের করে দিলে ক্ষারত্ব কমে যায়।

○ প্রশ্ন-৬০. মাটির উপাদান কত প্রকার কি কি? বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাটি প্রধানত ৪টি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা–

১. খনিজ পদার্থ (Mineral matter)
২. জৈব পদার্থ (Organic matter)
৩. বায়ু (Air) ও
৪. পানি (Water)।

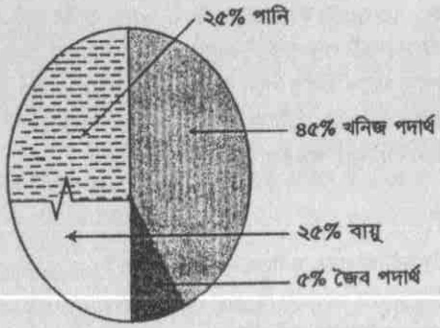

চিত্র : মাটির উপাদান (আয়তনভিত্তিক)

১. **খনিজ পদার্থ :** খনিজ পদার্থ মাটির অন্যতম প্রধান উপাদান। আয়তন অনুসারে মাটির অধিকাংশ স্থানই খনিজ পদার্থ দখল করে আছে। ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে আদি শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খনিজ পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। বালিকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা হচ্ছে মাটির খনিজ পদার্থ। মাটির এই খনিজ কণাসমূহ বিভিন্ন অনুপাতে মিশে মৃত্তিকা বুনট এবং

পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মৃত্তিকা সংযুতি গঠন করে। মৃত্তিকা সংযুতি গঠিত হওয়ার ফলে মাটি সচ্ছিদ্র হয় এবং তাতে সহজে বায়ু ও পানি স্থান করে নিতে পারে। মাটিতে আয়তন অনুসারে শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে।

খনিজ পদার্থ :

ক. বালিকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা দ্বারা গঠিত এবং আদি শিলা থেকে উৎপন্ন।

খ. পুষ্টি উপাদান (যেমন : লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি) সমৃদ্ধ।

২. জৈব পদার্থ : জৈব পদার্থ মাটির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ মাটিতে পচে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে জৈব পদার্থ বলে। জৈব পদার্থ মাটির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈব পদার্থ মাটির প্রাণ। আয়তন অনুসারে মাটিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিতে ১.৫% এর কম জৈব পদার্থ আছে। অথচ মাটিতে কমপক্ষে ২.৫% জৈব পদার্থ থাকা দরকার।

৩. বায়ু : বায়ু মাটির একটি অন্যতম উপাদান। আয়তন অনুসারে মাটিতে শতকরা ২৫ ভাগ বায়ু থাকে। তবে এই বায়ুর পরিমাণ মাটিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কমতে থাকে। শুকনো জমিতে পানির তুলনায় বায়ুর পরিমাণ বেশি থাকে। মাটিতে অবস্থিত বায়ু গাছপালার শিকড়, মৃত্তিকা অণুজীবের শ্বসনের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে। মাটিস্থ বায়ুতে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস থাকে। মাটিস্থ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড পানিতে মিশে কার্বনিক এসিড তৈরি করে, যা মাটিতে বিদ্যমান জটিল পুষ্টি উপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। মৃত্তিকাস্থ রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বায়বীয় নাইট্রোজেন শিমজাতীয় গাছের শিকড়ে জমা করে। ভৌত বিবেচনায় মাটির স্বাভাবিক আয়তনের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে বায়ু পরিসর থাকে। ভূমিকর্ষণ ও আলোড়নসহ নানা প্রক্রিয়ার প্রভাবে মৃত্তিকা বায়ু পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলের সাথে বায়ু বিনিময়ের মাধ্যমে মৃত্তিকা বায়ু পরিবর্তিত হয়। মাটির রন্ধ্র পরিসরের বায়ু ও বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু পারস্পরিক বিনিময়কে মৃত্তিকা বাতান্বয়ন (Soil aeration) বলে। মৃত্তিকা বায়ুতে প্রায় ৭৯.২০% নাইট্রোজেন, ২০.৬০% অক্সিজেন এবং ০.২৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে।

৪. পানি : পানি মাটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৃষ্টির পানি বা সেচের পানিই মৃত্তিকা পানির প্রধান উৎস। মাটি কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি জমা থাকে। মাটিতে বায়ু ও পানির পরিমাণ একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মাটিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুর পরিমাণ কমতে থাকে। মাটিতে আয়তন অনুসারে শতকরা ২৫ ভাগ পানি থাকে।

মৃত্তিকা পানি :

- মাটিকে রসালো রাখে।
- মাটিতে গাছের পুষ্টি উপাদানগুলোকে দ্রবীভূত করে।
- উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের দ্রাবক ও বাহক হিসেবে কাজ করে।
- বীজের অংকুরোদগমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।
- মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

○ প্রশ্ন-৬১. মাটির কণাসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : যেসব খনিজ কণার ব্যাস দুই মিলিমিটার বা তার কম তাকে মাটির কণা বলে। মাটির কণা প্রধানত ৩ প্রকার। যথা : বালিকণা, পলিকণা, কর্দমকণা।

বিভিন্ন প্রকার মাটিকণার বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলি :

মাটির গুণাগুণ/বৈশিষ্ট্য	বালিকণা	পলিকণা	কর্দমকণা
১. পানি ধারণ ক্ষমতা	কম	মধ্যম	বেশি
২. বায়ু চলাচল	উত্তম	মধ্যম	কম
৩. পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা	বেশি	ধীর থেকে মধ্যম	খুব ধীর
৪. মাটির জৈব পদার্থ	কম	মধ্যম থেকে বেশি	বেশি থেকে কম
৫. জৈব পদার্থের বিয়োজন	দ্রুত	মধ্যম	ধীর
৬. বায়ুজনিত ভূমিক্ষয়	মধ্যম	বেশি	কম
৭. ভূমিকর্ষণ (বৃষ্টির পর) উপযোগিতা	উত্তম	মধ্যম	কম
৮. পুষ্টি সংরক্ষণ ক্ষমতা	কম	মধ্যম	বেশি
৯. অম্লমান পরিবর্তনে প্রতিরোধী	কম	মধ্যম	বেশি
১০. তাপীয় গ্রহণ ক্ষমতা	দ্রুত	মধ্যম	কম

খ

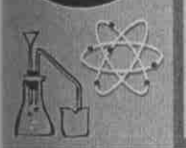

প্রাকৃতিক গ্যাস ও এর প্রধান উপাদান; প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার ও উৎস

Natural gas and its main compositions; processing, uses and sources of natural gas

○ প্রশ্ন-৬২. N_2-এর অভাবে ফসলের কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : N_2-এর অভাবে ফসলের প্রধানত যে ক্ষতি হয় তা হলো : ক. ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, খ. বীজ অপুষ্ট হয়ে ফলন কমে যায়, গ. গাছের পাতা ঝরে যায়, ঘ. দানা জাতীয় ফসলের কুশি কম হয়, ঙ. পার্শ্ব কুঁড়ি শুকিয়ে যায়। ফলে ফলনে ঘাটতি দেখা দেয়।

○ প্রশ্ন-৬৩. খনিজের উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : খনিজ হচ্ছে একটি যৌগিক পদার্থ, যার সৃষ্টি হয়েছে ভূত্বকে প্রাপ্ত প্রায় ৯০টি স্বাভাবিক মৌলিক উপাদানের দুই বা ততোধিকের রাসায়নিক সংযোগে। যেমন— হেমাটাইট পাথর খনিজটি একটি যৌগিক পদার্থ (Fe_2O_3 : ফেরিক অক্সাইড), যা লোহা (Fe) এবং অক্সিজেন (O_2) মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। তবে অনেক খনিজ আছে যা একটি মাত্র মৌলিক পদার্থ দ্বারা গঠিত। যেমন— সোনা, হীরা, গন্ধক। এ মৌলিক পদার্থ তিনটি ভূগর্ভেও মৌল (অশোধিত) হিসেবে পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-৬৪. বায়োমাস (Biomass) কি?

উত্তর : বায়োমাস হচ্ছে জীবদেহের জীবিত বস্তুর ভর। কিন্তু প্রাণহীন বস্তু; যেমন— মেরুদণ্ডী প্রাণীর পশম ও পালক বা গাছের অন্তরতম অঞ্চলের কাঠও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো জীবের একটি কার্যকর পরিমাণগত পরিমাপ প্রদান করা এবং এর দ্বারা জীব ও জড়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ না করা। এটা দ্বারা সাধারণত শুষ্ক ওজনকে বোঝানো হয় বা শুষ্ক ওজন দ্বারা এর মান নির্ণয় করা হয়। কোনো একটি মডেলে বায়োমাস একটি পরিবর্তনশীল অবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, যার ভেতরের এবং বাইরের দিকে অনেক ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, একটি

পরভোজী জীব (যেমন— ব্যাকটেরিয়া, পাখি, মহিষ ইত্যাদি) খাদ্য বা পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস সংক্রান্ত গ্যাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড) ও বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে এবং দেহের নতুন কোষকলা তৈরি করে। বৃদ্ধির ফলে বায়োমাস বাড়ে এবং উপবাসে বায়োমাস কমে যায়।

প্রাথমিক উৎপন্নকারী থেকে খাদ্য শিকলের অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে প্রচুর শক্তি হারানোর ফলে শিকলের প্রতিটি ধাপে নতুন বায়োমাসে যে শক্তি প্রবাহিত হয় তার পরিমাণে পরিবর্তন হয়। প্রতি ধাপে খাদ্যের পরিমাণে এ পরিবর্তন প্রায়ই অনুভূমিক স্তম্ভ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। খাদ্য শিকলের ওপরের দিকে স্তম্ভটি সাধারণত হ্রাস পায়, ফলে হিস্টোগ্রামের আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে পিরামিডের আকৃতি ধারণ করে। এজন্য এটাকে বায়োমাস পিরামিড বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৬৫. ডিনাইট্রিফিকেশন (Denitrification) কি?

উত্তর : ডিনাইট্রিফিকেশন মূলত একটি জৈব-প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অনুকূল অবস্থায় ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া দ্বারা নাইট্রেট (NO_3) মৃত্তিকা থেকে দ্রুত অপসারিত হয়। অল্পসংখ্যক ব্যাকটেরিয়া NO_3-কে N_2 ও N_2O-এ রূপান্তরিত করতে পারে। ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া বিজারিত ব্যাকটেরিয়াগুলো শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় O_2-এর প্রতিস্থাপক হিসেবে NO_3 এবং NO_2 ব্যবহারে সক্ষম। নাইট্রেট এখানে শ্বসনের প্রান্তীয় ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করে।

ডিনাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে—

১. এ প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বিপাকীয় ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি;
২. উপযুক্ত ইলেকট্রন দাতা, যেমন– জৈব-কার্বন যৌগ, বিজারিত সালফার যৌগ বা আণবিক হাইড্রোজেন;
৩. অবাত অবস্থা বা অক্সিজেনের সীমিত সহজলভ্যতা; এবং
৪. প্রান্তীয় ইলেকট্রন গ্রাহক হিসেবে কাজ করার জন্য NO_3-এর উপস্থিতি।

শস্য উৎপাদনের বিষয় বিবেচনা করা হলে ডিনাইট্রিফিকেশন একটি ক্ষতিকর প্রক্রিয়া। কারণ এ প্রক্রিয়ায় গাছের জন্য নাইট্রোজেনের সহজলভ্য আকার NO_3 নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু সমগ্র নাইট্রোজেন চক্রে ডিনাইট্রিফিকেশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

○ প্রশ্ন-৬৬. নাইট্রিফিকেশন কি?

উত্তর : নাইট্রিফিকেশন একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়া। এর মাধ্যমেই অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে উদ্ভিদের জন্য গ্রহণযোগ্য আকারে আসে। সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়, যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অণুজৈবিক এনজাইমের প্রভাবে অ্যামোনিয়া জারিত হয়ে নাইট্রেট (NO_3) উৎপাদন করে তাকে নাইট্রিফিকেশন বলা হয়। বিভিন্ন নাইট্রিফিকেশন প্রক্রিয়া দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

○ প্রশ্ন-৬৭. কোনো উদ্ভিদ কি বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে?

উত্তর : শিম্বী বা লেগুমিনাস গোত্রের কিছু উদ্ভিদ বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে। অন্যদিকে মটরশুটি, শিম, খেসারি, ছোলা, মসুর, বরবটি প্রভৃতি উদ্ভিদের শেকড়ে রাইজোবিয়াম নামে একপ্রকার সিমবায়োটিক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নুডুল তৈরি করে সেখানেই বসবাস করে এবং বায়ু থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এটি উদ্ভিদের প্রোটিন সংশ্লেষণে সাহায্য করে। অবশ্য এ লেগুমিনাস উদ্ভিদ ছাড়া অন্য উদ্ভিদ বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে না।

○ প্রশ্ন-৬৮. প্রাকৃতিক গ্যাস কি? প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান প্রধান উপাদানগুলো কি কি এবং এদের উপস্থিতির শতকরা হার কি?

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) : ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মিথেন থেকে বিউটেন পর্যন্ত অ্যালকেনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে প্রাকৃতিক গ্যাস বলা হয়।

প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইথিলিন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় থাকে।

প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৮৫%, ইথেন ১০%, প্রোপেন ৩% এবং এ গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে সালফার প্রায় অনুপস্থিত।

○ প্রশ্ন-৬৯. Bio-gas কি এবং এর মধ্যে কি কি গ্যাস বিদ্যমান থাকে এবং প্রয়োগ লিখুন।

উত্তর : Biogas (বায়োগ্যাস) : গোবর, মলমূত্র, পাতা, খড়কুটা প্রভৃতি পদার্থ পানির সাথে মিশিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতিতে রাখলে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় এসব পদার্থ থেকে যে বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাই বায়োগ্যাস নামে পরিচিত।

Biogas-এর উপাদান : বায়োগ্যাস-এর প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস। এছাড়াও ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে নাইট্রোজেন (N_2), অ্যামোনিয়া (NH_3), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), হাইড্রোজেন (H_2) প্রভৃতি গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকতে পারে।

Biogas-এর প্রয়োগ : বর্তমানকালে নানাবিধ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাসের প্রয়োগ বা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বায়োগ্যাসের প্রধান কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

i. এ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ii. ম্যান্টেল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মতো ঘর আলোকিত করা যায়।
iii. বায়োগ্যাসের সাহায্যে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিডি ইত্যাদি চালানো যায়।
iv. পাম্প চালিয়ে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা যায়।
v. এ গ্যাসের সাহায্যে গাড়ি চালানো যায়।

○ প্রশ্ন-৭০. CNG কি? এটি কোথায় ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : CNG (সিএনজি) : CNG-এর পূর্ণরূপ হলো 'Compressed Natural Gas'। যখন প্রাকৃতিক গ্যাস বিশেষত মিথেনকে (CH_4) উচ্চ চাপে সংকুচিত করে শক্ত সিলিন্ডার বা কনটেইনারে ভরে বাজারজাত করা হয় তখন তাকে CNG বলে।

CNG-এর ব্যবহার : পেট্রোল, ডিজেল ও প্রোপেন জ্বালানির বিকল্প হিসেবে CNG ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন যানবাহন যেমন– বাস, ট্রাক, ট্যাক্সিক্যাব, ট্রেন, অটোরিক্সা, এয়ারপোর্ট লিমুজিন ইত্যাদিতে জ্বালানি হিসেবে CNG ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৭১. প্রাকৃতিক Gas কি? বাংলাদেশে এই Gas এ CH_4 এবং S এর শতকরা হার কি?

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) : ভূ-পৃষ্ঠের নিচে মিথেন থেকে বিউটেন পর্যন্ত অ্যালকেনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায়, তাকে প্রাকৃতিক গ্যাস বলা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন, ইথেন, প্রোপেন, বিউটেন, ইথিলিন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ইত্যাদি গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেনের পরিমাণ প্রায় ৯৫% থেকে ৯৯% এবং এ গ্যাস অধিক বিশুদ্ধ হওয়ার কারণে সালফার প্রায় অনুপস্থিত।

○ প্রশ্ন-৭২. বায়োগ্যাস বলতে কি বোঝায়? বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কি? এর প্রস্তুতপ্রণালী সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : প্রাণীর মলমূত্র, উদ্ভিদের আবর্জনা ও অন্যান্য পচনশীল পদার্থ পানির উপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ার ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় যে বর্ণহীন, দুর্গন্ধহীন দাহ্য গ্যাস তৈরি করে তাকে বায়োগ্যাস বলে। বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন; ৬০-৭০ ভাগ মিথেন ও বাকিটা কার্বন ডাই-অক্সাইড।

প্রস্তুতপ্রণালী : বায়োগ্যাস তৈরির জন্য গ্যাসপ্লান্ট তৈরি করা হয়। এ প্লান্ট প্রধানত দুপ্রকার। একটি 'স্থিরডোম', অন্যটি 'ভাসমান ডোম' মডেল। একটি স্থিরডোম বায়োগ্যাস প্লান্টের সমগ্র অংশ ইট, বালি ও সিমেন্ট দিয়ে তৈরি হয়। এ প্লান্টের বিভিন্ন অংশ হচ্ছে–

১. **প্রবেশ কুয়া :** প্রবেশ নলের মুখে থাকে ইট নির্মিত চৌবাচ্চা।

২. **ডাইজেস্টার :** ৭-৮ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবারের রান্নাবান্না ও বাতি জ্বালানোর চাহিদা মেটানোর জন্য ২.৫ মিটার ব্যাস ও ২.২ মিটার গভীর গোলাকার কুয়া খনন করে এর তলার মধ্যবিন্দু আর্চের মতো করে নির্মাণ করা হয়।

৩. **হাইড্রোলিক চেম্বার :** হাইড্রোলিক চেম্বারটি একটি আয়তাকার চৌবাচ্চা। এর ওপরের অংশ স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে রাখা হয়।

৪. **গ্যাস নির্গমন পাইপ :** ডোমের ওপরের অংশে গ্যাস ভাল্বযুক্ত নির্গমন পাইপ সংযুক্ত করতে হয়। ডাইজেস্টার, হাইড্রোলিক চেম্বার ও প্রবেশ নলের মুখের চৌবাচ্চা তৈরির পর প্লান্টটির চারপাশে মাটি দিয়ে ভালোভাবে ঢেকে দিতে হবে।

এরপর হাস-মুরগির মল, মানুষের মল, গোবর প্রভৃতি পচনশীল পদার্থের সাথে প্রয়োজনীয় অনুপাতে পানি মিশিয়ে প্রবেশ নল দিয়ে আস্তে আস্তে কুয়ায় ঢালতে হবে। কুয়া থেকে এসব পদার্থ ডাইজেস্টারে যায় এবং বায়ুর অনুপস্থিতিতে পচে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে ও গ্যাস নির্গমন পাইপ দিয়ে বের হয়ে আসে।

○ প্রশ্ন-৭৩. প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়?

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন গ্যাস। এই গ্যাসকে প্রজ্বলন করে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপাদন করা হয়। উৎপন্ন তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে টারবাইন ঘোরানোর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

○ প্রশ্ন-৭৪. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধা কি কি?

উত্তর : জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা :

ক. পরিবেশ দূষণের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

খ. গ্যাসে জ্বালানি খরচ কম হয়।

গ. গৃহিণীর কাছে অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার অপেক্ষা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

○ প্রশ্ন-৭৫. বাংলাদেশে কয়টি গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে? সবচেয়ে বৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্রের নাম লিখুন।

উত্তর : প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলনের জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩টি ব্লকে ভাগ করা হয়েছে। আর দেশে গ্যাসক্ষেত্র রয়েছে মোট ২৬টি। তিতাস বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র এবং বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাসক্ষেত্র হচ্ছে সাঙ্গু।

গ পেট্রোলিয়াম ও কয়লা, বনবিদ্যা, আমাদের সম্পদসমূহের সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণের উপায়

Petroleum and coal; forestry; limitations and conservation of our resources

○ প্রশ্ন-৭৬. Growing Stock কি?

উত্তর : বাংলাদেশের বিভিন্ন বনভূমিতে মজুদ কাঠের পরিমাণ নির্ণয় করার জন্য জরিপ ও সমীক্ষা চালানো হয়েছে। বনের গাছে যে কাঠের পরিমাণ মজুদ থাকে তাকে গ্রোয়িং স্টক (Growing Stock) বলা হয়। বনে কি পরিমাণ গ্রোয়িং স্টক রয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

○ প্রশ্ন-৭৭. কৃষি বনবিদ্যা (Agroforestry) বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : কৃষি বনবিদ্যা বা অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি অর্থ একই জমিতে কৃষি শস্য ও বনবৃক্ষের চাষ। অর্থাৎ অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি হলো টেকসই (Sustainable) ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, যা ভূমি থেকে প্রাপ্ত মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং একই জমিতে একই সাথে বা পর্যায়ক্রমে শস্য ও বনবৃক্ষ এবং/বা প্রাণীর উৎপাদনকে যুক্ত করে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সুতরাং বলা যায় যে, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি ভূমি ব্যবহার পদ্ধতি এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের একটি সামষ্টিক নাম।

○ প্রশ্ন-৭৮. চাষাবাদের 'সল্ট পদ্ধতি' কি?

উত্তর : 'SALT' হচ্ছে Slopping Agricultural Lands Technology. এটি পার্বত্য অঞ্চলে চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ে সমোন্নতি রেখা বরাবর প্রত্যেক ৪-৬ মিটার স্থানে ২টি সারিতে নাইট্রোজেন ধারক গাছ-গাছড়ার বেড়া সৃষ্টি করা হয় এবং মধ্যবর্তী স্থানে খাদ্যশস্য ও বনজ বৃক্ষ লাগানো হয়। আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন সংস্থা (ICMI) বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে এ চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণে সহায়তা দিচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৭৯. আউশ, আমন ও বোরো ধানের তিনটি করে উচ্চফলনশীল জাতের নাম লিখুন।

উত্তর : আউশ : মালা, চান্দিনা, নিজামী।

আমন : মুক্তা, প্রগতি, ব্রিশাইল।

বোরো : গাজী, চান্দি, বিপ্লব।

○ প্রশ্ন-৮০. সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনা কাকে বলে?

উত্তর : উদ্ভিদ সংরক্ষণের এমন একটি পদ্ধতি যার মধ্যে সম্ভবপর সব রকম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি থাকবে তাকেই সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনা বা Integrated Pest Management বলে। এ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রাকৃতিক, জৈবিক, কৃষি পরিচর্যা, রাসায়নিক, যান্ত্রিক, আইনগত প্রভৃতির সমন্বয় সাধন ও প্রয়োগ করে এবং কৃষি পরিবেশের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াকে ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে আপদসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর ধাপের বা প্রান্তিক রেখার নিচে রাখা হয়। এ ব্যবস্থাকেই সমন্বিত আপদ ব্যবস্থাপনা বলে।

○ প্রশ্ন-৮১. Petrol, Diesel এবং Kerosene-এর মধ্যে পার্থক্য কি? Antifreeze দ্রব্য কি? কি কাজে ব্যবহৃত হয়?

উত্তর : Petrol, Diesel এবং Kerosene-এর মধ্যে পার্থক্য : Petrol, Diesel এবং Kerosene এদের প্রত্যেকেই সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন অর্থাৎ অ্যালকেন। তবে এদের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো এদের অণুতে বিদ্যমান কার্বন পরমাণু সংখ্যায়। Petrol-এর প্রতিটি অণুতে কার্বন পরমাণু সংখ্যা 5 থেকে 12 কিন্তু Diesel-এর প্রতিটি অণুতে কার্বন পরমাণু সংখ্যা 13 থেকে 18 এবং Kerosene-এর ক্ষেত্রে 12 থেকে 15।

Antifreeze দ্রব্য : কোনো তরল পদার্থের হিমাঙ্ক কমানোর জন্য তাতে যে দ্রব্য মেশানো হয় তাকে Antifreeze বা হিমায়ন-নিরোধক দ্রব্য বলে।

Antifreeze দ্রব্যের ব্যবহার : Antifreeze বা হিমায়ন-নিরোধক দ্রব্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় পানির সঙ্গে অন্তর্দহ ইঞ্জিনে। এছাড়াও বিভিন্ন তাপ সঞ্চালক যন্ত্র যেমন সৌরপানি উত্তাপক যন্ত্রে (Solarwater heater) হিমায়ন-নিরোধক দ্রব্য ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৮২. পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিনের গঠনের পার্থক্য কি?

উত্তর : পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বুরেটর আছে, যার সাহায্যে বায়ু ও জ্বালানি (পেট্রোল) মিশ্রিত করে পরে স্পার্ক প্লাগের সাহায্যে ইগনিশনের (প্রজ্বলনের) মাধ্যমে শক্তি উৎপাদন করা হয়। পক্ষান্তরে ডিজেল ইঞ্জিনের কার্বুরেটর অনুপস্থিত। এখানে উচ্চচাপে ডিজেলকে কমবাশন (Combustion) চেম্বারে প্রেরণ করা হয় এবং বায়ুর সাথে না মিশিয়ে প্রজ্বলন করা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৩. পেট্রোলিয়াম কি? আংশিক পাতনের সাহায্যে কিভাবে অশোধিত তেল থেকে হাইড্রোকার্বন সংগ্রহ করা হয়, তার বর্ণনা দিন।

উত্তর : পেট্রোলিয়াম তেল : বহু বছর ধরে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে উচ্চ তাপে ও চাপে সৃষ্ট যে অশোধিত তেল (crude oil) সমুদ্রের তলদেশে এবং শিলাস্তরের নিচে পাওয়া যায় তাকে পেট্রোলিয়াম তেল বলে। Petroleum শব্দের অর্থ শিলা তেল (rock oil)। এ পেট্রোলিয়াম তেল অসংখ্য যৌগের (প্রায় ১৫০টি) মিশ্রণ যার প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে হাইড্রোকার্বন : (১) অ্যালকেন, (২) চাক্রিক অ্যালকেন ও (৩) অ্যারোমেটিকস্। অশোধিত তেলকে তেল শোধনাগারে (oil refinery) আংশিক পাতনের মাধ্যমে বিভিন্ন অংশে পৃথক করা হয়।

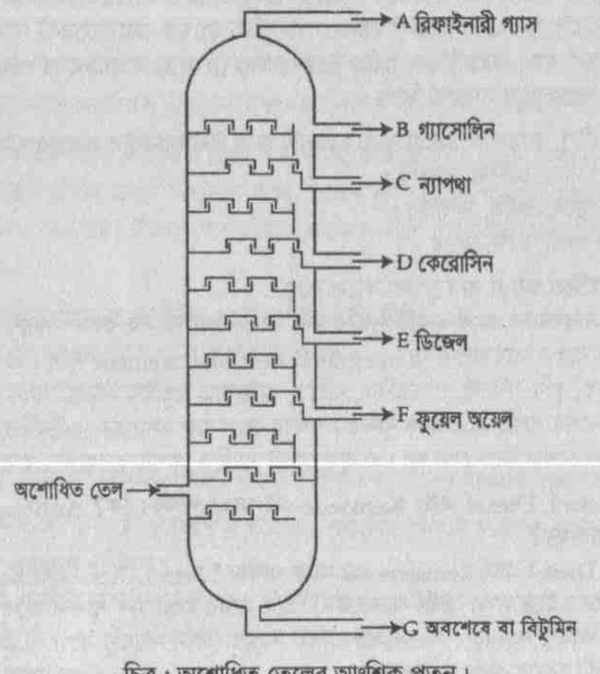

চিত্র : অশোধিত তেলের আংশিক পতন।

বর্ণনা : একটি অংশ-পাতন টাওয়ারে (fractionating tower) অশোধিত তেলের আংশিক পাতন করা হয়। এ টাওয়ার বেশ উঁচু এবং এর মধ্যে বিভিন্ন স্তরে অনেকগুলো পাত্র বা ট্রে একটির উপরে আর একটি করে সাজানো (ছবিতে দেখনো হয়নি) থাকে। ট্রেগুলোর ছিদ্র বাব্‌ল ক্যাপ (bubble cap) দ্বারা আবৃত এবং পাশে থাকে ওবারফ্লো পাইপ। টাওয়ারের বিভিন্ন অংশে তাপমাত্রা 40°C থেকে 400°C পর্যন্ত রাখা হয়। বিভিন্ন ট্রের তাপমাত্রা ভিন্ন ভিন্ন তাকে। টাওয়ারের নিচের অংশ দিয়ে অশোধিত তেলকে উত্তপ্ত অবস্থায় প্রবেশ করানো হয়। গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে তেলের মিশ্রণ উচ্চ তাপে তরল ও গ্যাসে বিভক্ত হয় এবং পাত্রের বাব্‌ল ক্যাপ থাকার কারণে তরল নিচে নেমে আসে এবং গ্যাস ছিদ্র দিয়ে উপরে ওঠে যায়।

○ প্রশ্ন-৮৪. অকটেন নাম্বার বলতে কি বুঝেন? গাড়ির জ্বালানি তেলের অকটেন নাম্বার কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর : গাড়ির ইঞ্জিনে যখন পেট্রোল বাষ্প দহ্মীভূত হয় তখন বিপুল পরিমাণ শক্তি ও উষ্ণ গ্যাসের উদ্ভব ঘটে যা সিলিন্ডারের পিস্টনকে চাপ দেয় এবং চাকা ঘুরায়। জ্বালানি থেকে সর্বোচ্চ শক্তি পেতে হলে এমন ইঞ্জিনের দরকার যার দ্বারা সমস্ত পেট্রোল বাষ্প দহ্মীভূত হয়। এ উদ্দেশ্যে পেট্রোল বাষ্প ও বায়ুর মিশ্রণকে চাপ দিয়ে সঙ্কুচিত (compressed) করা হয়। এ সঙ্কোচনের ফলে স্ব-দহন বা অটো-ইগনিশন (auto-ignition) ঘটে। এর ফলে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয় যা পিস্টনকে ধাক্কা দেয় এবং ইঞ্জিনে একটা খট খট ধাতব শব্দ হয়। একে নকিং (Knocking) বলা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনের দহনে গাড়ির নকিং বাড়ে এবং শব্দ বেড়ে যায়। এতে জ্বালানির অপচয় হয় এবং ইঞ্জিনের দক্ষতা ও আয়ু কমে যায়। গাড়ির নকিং কমাবার সবচেয়ে উপযোগী জ্বালানি হচ্ছে শাখায়িত হাইড্রোকার্বন, যেমন– ২, ২, ৪–ট্রাইমিথাইলপেন্টেন বা আইসো-অকটেন। এ যৌগের ব্যবহার করা হয় নকিং নিবারক (antiknock) হিসেবে।

একটি জ্বালানির উৎকৃষ্ঠতা পরিমাপ করা হয় তার নকিংরোধী প্রবণতা দ্বারা। সাধারণত হাইড্রোকার্বন জ্বালানিসমূহের মধ্যে আইসো অকটেনের নকিং প্রবণতা সবচেয়ে কম। তাই এটি সর্বোৎকৃষ্ট জ্বালানি। অপরপক্ষে n– হেপ্টেনের নকিং সৃষ্টির প্রবণতা সবচেয়ে বেশি বলে এটি নিকৃষ্টতম জ্বালানি। তাই আইসো অকটেনের জ্বালানি ক্ষমতা ধরা হয় '১০০ অকটেন' এবং n– হেপ্টেনের জ্বালানি ক্ষমতা ধরা হয় '০ (শূন্য) অকটেন'। সুতরাং কোনো জ্বালানি, আইসো অকটেন ও n– হেপ্টেনের যে মিশ্রনের সমান সম্পন্ন সেই মিশ্রণে উপস্থিত আইসো অকটেনের শতকরা আয়তনিক সংযুক্তি প্রকাশক সংখ্যাকে ঐ জ্বালানির অকটেন নাম্বার বা সংখ্যা বলে।

যেমন, কোনো জ্বালানির কার্য-ক্ষমতা যদি ২৫% n– হেপ্টেন ও ৭৫% আইসো অকটেনের মিশ্রণের মত হয় তাহলে ঐ জ্বালানির অকটেন সংখ্যা হবে ৭৫।

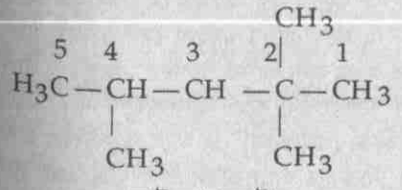

আইসো অকটেন

$H_3C(CH_2)_5CH_3$

n-হেপ্টেন

বিভিন্ন উপায়ে জ্বালানি তেলের নকিং হ্রাস করা যায়। যেমন–

১. **জ্বালানিতে টেট্রাইথাইল লেড (TEL) এর ব্যবহার :** অনেক গবেষণায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, অশাখায়িত বা মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনের নকিং দেয়ার ধর্মকে কমাতে টেট্রাইথাইললেড (tetraethyllead) $Pb(C_2H_5)_4$ সংক্ষেপে TEL, খুবই উপযোগী। তাই TEL কে বলা হয় অ্যান্টিনক (antiknock) বা নকিং রোধক। বর্তমানে ইঞ্জিনের নকিং কমাবার জন্য জ্বালানিতে যে ফ্লুইড ব্যবহার করা হয় তাতে থাকে 65% $Pb(C_2H_5)_4$ + 25% $Br-CH_2-CH_2-Br$ + 10% $Cl-CH_2-CH_2-Cl$। ডাইহ্যালাইড দুটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো, ব্যবহৃত লেডকে উদ্বায়ী যৌগ PbBrCl এ পরিণত করা যা নির্গত ধোঁয়ার সাথে সহজে বের হয়ে যেতে পারে। লেড বিষাক্ত পদার্থ বলে বাতাসে লেডের পরিমাণ বৃদ্ধি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং পরিবেশ দূষিত করে। গাড়ির ধোঁয়ার অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ হচ্ছে CO, NO_2। তাই ১৯৯০ সাল থেকে সারা বিশ্বে লেডমুক্ত জ্বালানির প্রচলন শুরু হয়েছে যা বিশেষভাবে তৈরি ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়।

২. **তাপীয় ভাঙন (Thermal cracking or pyrolysis) :** ($C_1 - C_{12}$) পেট্রোলিয়ামে উপস্থিত নিম্নতর হাইড্রোকার্বনসমূহের চাহিদা উচ্চতর হাইড্রোকার্বনসমূহের ($> C_{12}$) চেয়ে বেশি। এর কারণ হচ্ছে, ক্ষুদ্র অণু বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনসমূহ অতিসহজে বাষ্পীভূত হতে পারে। ফলে জ্বালানি দহনের সময় নকিং কম হয় এবং তাই এরা জ্বালানি হিসেবে অধিক উপযোগী। পেট্রোলিয়াম শিল্পে তাই তাপের সাহায্যে অনুঘটকের উপস্থিতিতে বড় অণুর হাইড্রোকার্বনকে ভেঙে ছোট অণুর অ্যালকেন ও অ্যালকিনে পরিণত করা হয়। যেমন–

$$C_8H_{18} \text{ (অকটেন)} \rightarrow C_6H_{14} \text{ (হেক্সেন)} + C_2H_4 \text{ (ইথিন)}$$

$$C_8H_{18} \text{ (অকটেন)} \rightarrow C_4H_{10} \text{ (বিউটেন)} + C_4H_8 \text{ (বিউটিন)}$$

$$2H_3C-CH_3(g) \rightarrow CH_4(g) \text{ (মিথেন)} + H_3C-CH=CH_2 \text{ (প্রপিন)} + CH_2=CH_2 \text{ (ইথিন)} + H_2(g) \text{ (হাইড্রোজেন)}$$

শিল্পে এ ধরনের বিক্রিয়াকে তাপীয় বিয়োজন বা ক্র্যাকিং বা পাইরোলাইসিস বলা হয়।

৩. **অ্যালকাইলেশন (Alkylation) :** আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, শাখাযুক্ত অ্যালকেনের অকটেন সংখ্যা বেশি হওয়ায় জ্বালানি হিসেবে এদের চাহিদা বেশি। তাই মুক্ত শিকল অ্যালকেনকে শাখাযুক্ত অ্যালকেনে পরিণত করার জন্য অনেক গবেষণা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে যে কটি পদ্ধতি সফল হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অ্যালকাইলেশন (alkylation) বিক্রিয়া। যে পদ্ধতিতে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকিন) এর সাথে অনুঘটকের উপস্থিতিতে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকেন) এর বিক্রিয়ায় অ্যালকাইল গ্রুপ বৃদ্ধি করা যায় তাকে অ্যালকাইলেশন বলে।

$$\text{যেমন– শাখাযুক্ত অ্যালকেন + অ্যালকিন} \xrightarrow[20°C]{\text{গাঢ় } H_2SO_4} \text{শাখায়িত শিকলযুক্ত অ্যালকেন}$$

উদাহরণ :

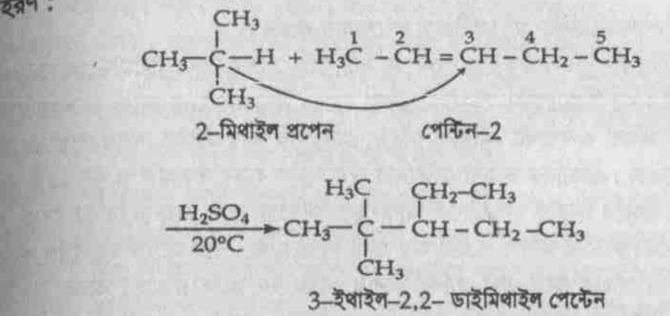

৪. **অ্যারোমেটিকরণ বা রিফরমিং (Reforming) :** পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত মুক্ত শিকল অ্যালকেনকে উচ্চ চাপ ও তাপে উপযুক্ত অনুঘটকের উপস্থিতিতে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনে রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে অ্যারোমেটিকরণ (aromatization) বা রিফরমিং বলা হয়। যেমন– 500°C উষ্ণতায় Al_2O_3 বা Cr_2O_3 প্রভাবকের উপস্থিতিতে 40 বায়ুচাপে অথবা Pt প্রভাবকের উপস্থিতিতে 10 বায়ুচাপে হেক্সেন থেকে বেনজিন উৎপন্ন হয়।

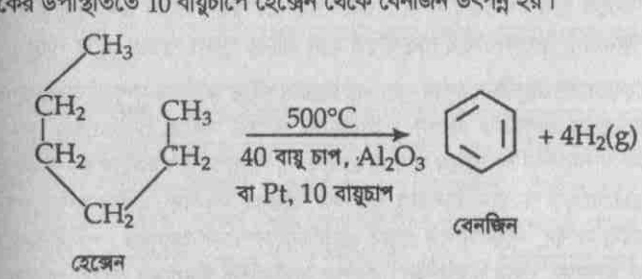

যে অ্যারোমেটিকরণ প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে প্লাটিনাম ব্যবহৃত হয় তাকে প্লাটফরমিং (Platforming) বলে। শাখাযুক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের মত অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের নকিং নিবারণ ক্ষমতা খুব উচ্চ। ফলে এর অকটেন নাম্বার বেশি।

○ প্রশ্ন-৮৫. কেরোসিন ও ডিজেল এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : কেরোসিন তেল (Kerosine oil) : অশোধিত তেলের আংশিক পাতন থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে কেরোসিন তেল। কেরোসিন ভগ্নাংশ 160 — 250°C তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয়। অশোধিত তেলের প্রায় শতকরা ১৩ ভাগ কেরোসিন। কেরোসিনের মূল উপাদান হচ্ছে $C_{13} - C_{16}$ কার্বন বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন। কেরোসিন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য। প্রদীপ বা কুপিতে আলো জ্বালাবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়। শীতপ্রধান দেশে হিটার দ্বারা ঘর গরম করার জন্যও কেরোসিন ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কেরোসিনের চাহিদা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে, কারণ এটি গ্যাস টারবাইনে ও জেট ইঞ্জিনেও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ডিজেল তেল (Diesel oil) : অশোধিত তেলের আংশিক পাতন থেকে প্রাপ্ত কেরোসিন তেলের চেয়ে অধিক স্ফুটনাঙ্ক (250 – 300°C) বিশিষ্ট হাইড্রোকার্বন মিশ্রণকে ($C_{13} - C_{17}$ কার্বনযুক্ত

হাইড্রোকার্বন) ডিজেল তেল বলে। ডিজেল তেল অন্তর্দহন ইঞ্জিন চালিত গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ডিজেল তেলকে তাপীয় ভাঙনের দ্বারাও অপর জ্বালানি গ্যাসোলিন বা পেট্রোলে (স্ফুটনাঙ্ক 40 – 100°C $C_5 — C_{17}$ কার্বনযুক্ত হাইড্রোকার্বন) রূপান্তরিত করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮৬. বন সংরক্ষণ বিধির প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তর : দেশের বিরাজমান বন সংরক্ষণ ও নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের বনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি। কারণ বন পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু আমাদের দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যন্ত বেশি। এ অধিক জনসংখ্যা মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য সীমিত বনজ সম্পদের উপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। প্রাত্যহিক চাহিদা মেটানোর জন্য মানুষ বনের বৃক্ষরাজি ও বন্য প্রাণী উজাড় করছে। বন ধ্বংস হওয়ার কারণে বন্য প্রাণীর আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, প্রজনন বিঘ্নিত হচ্ছে, খাদ্য সংকট হচ্ছে। অবৈধ শিকারীর কবলে পড়েও বন্য প্রাণী ধ্বংস হচ্ছে। বনে অবৈধ অনুপ্রবেশ বাড়ছে। বনজ সম্পদ চুরি ও পাচার করে এক শ্রেণির অসাধু লোক বন ধ্বংস করছে। বনের নিকটবর্তী এলাকাবাসী ধীরে ধীরে বন দখল করছে। বন এলাকায় অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করছে। অসাধু চক্র পার্বত্য এলাকার পাহাড় কেটে, কাঠ পাচার করে পাহাড়ি বন ধ্বংস করছে। এ ছাড়াও সৃজিত সামাজিক বনের বৃক্ষরাজি আত্মসাৎ করছে। এর ফলে ভূমিক্ষয়, ভূমি ধ্বংসসহ নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে। দেশ পরিবেশগত ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বনজসম্পদকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বনসংরক্ষণ বিধি প্রণীত হয়েছে। এ বিধির কার্যকরী প্রয়োগে সরকারিভাবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। বনবিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসংযোগ বাড়াতে হবে। বন সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিধি বাস্তবায়িত হলে অনেক সুফল পাওয়া যেতে পারে।

○ প্রশ্ন-৮৭. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ : 'প্রাকৃতিক সম্পদ' বলতে প্রকৃতিপ্রদত্ত সকল সম্পদকে বুঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির অবাধ দান যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, মৃত্তিকা, নদ-নদী, কৃষিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, শক্তি সম্পদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বুকে জীবনের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান কয়েকটি প্রাকৃতিক সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এ সকল সম্পদের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। প্রয়োজনের তুলনায় এ দেশে খনিজ সম্পদের পরিমাণ খুবই কম। ফলে প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ খনিজ সম্পদই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ রয়েছে তার বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

১. **প্রাকৃতিক গ্যাস :** প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ। ১৯১০ সাল থেকে এ দেশে অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে সর্বপ্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৭ সালে এই গ্যাসক্ষেত্র থেকে সর্বপ্রথম গ্যাস উত্তোলন করা হয়। গ্যাস দেশের মোট জ্বালানি চাহিদার শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। দেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৪-এর তথ্য মতে এই ২৫টি গ্যাস ক্ষেত্রে উত্তোলনযোগ্য ও সম্ভাব্য প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

বর্তমানে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৮৩টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক গ্যাস অফুরন্ত নয়। তাই নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে সুবিধাজনক শর্তে উৎপাদন বণ্টন চুক্তির আওতায় বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে।

২. **কয়লা :** বাংলাদেশ কয়লা সম্পদে তত উন্নত নয়। বাংলাদেশে যে কয়লা পাওয়া যায় তার অধিকাংশই নিকৃষ্টমানের। এ দেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। ১৯৮৫ সালে দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া এলাকায় বিরাট কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকার অসুবিধার কারণে সকল খনি থেকে কয়লা উত্তোলন সম্ভব হচ্ছে না। এ পর্যন্ত দেশে মোট আবিষ্কৃত ৬টি কয়লা ক্ষেত্রসমূহে কয়লার মজুদ প্রায় ৩৩০০ মিলিয়ন টন, যা প্রায় ৪৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমতুল্য। ২০১০-১১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত উত্তোলিত কয়লা মোট ৩.৯৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ কয়লা মজুদ আছে তা উত্তোলন করতে পারলে প্রায় ২ শত বছর পর্যন্ত ব্যবহার করা সম্ভব হবে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন।

৩. **খনিজ তেল :** বিশেষজ্ঞদের ধারণা বাংলাদেশে প্রচুর খনিজ তেল পাওয়া যাবে। এ লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে দেশি ও বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় দীর্ঘদিন ধরে অনুসন্ধান কার্য চালানো হচ্ছে। কিন্তু খনিজ তেল সম্পদের আবিষ্কার ও উত্তোলনে মোটেই অগ্রগতি হয়নি। তবে ১৯৮৬ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই খনিজ তেল পাওয়া যায়। কূপটিতে ২০২০ থেকে ২০৩০ মিটার গভীরতায় প্রায় ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল এখানে মজুদ আছে। তবে উত্তোলনযোগ্য মজুদের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় প্রায় ৬ মিলিয়ন ব্যারেল বা ৮.৯৪ লাখ মেট্রিক টন। সিলেটের হরিপুর ছাড়াও ফেঞ্চুগঞ্জ-৩ ও কৈলাসটিলা-২ কূপে খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু কারিগরি জটিলতার কারণে তেল আধারের ব্যাপ্তি ও তেলের পরিমাণ সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

৪. **চুনাপাথর :** বাংলাদেশ চুনাপাথর সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ; সুনামগঞ্জ জেলার ভাভারঘাট, বাগালিবাজার, লালঘাট ও টাকেরঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও কক্সবাজার জেলার সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। এছাড়া রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। জয়পুরহাট চুনাপাথর প্রকল্প থেকে বছরে প্রায় ১৬ লাখ টন চুনাপাথর উত্তোলন করা হয়।

৫. **চীনামাটি :** বাংলাদেশের নেত্রকোনার বিজয়পুর এবং রাজশাহী জেলার পত্নীতলায় চীনামাটি পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে নেত্রকোনা জেলার বিজয়পুর গ্রামে প্রায় ২৬ কিমি. দীর্ঘ এবং কয়েক মিটার প্রস্থ এলাকা জুড়ে প্রধান খনি অবস্থিত। এ খনিতে সঞ্চিত চীনামাটির পরিমাণ আনুমানিক ২৫ লক্ষ ৭ হাজার টন। বাংলাদেশের মোট চাহিদার প্রায় ৫০ ভাগ চীনামাটি এ খনি হতে উত্তোলন করা হয়। পত্নীতলার চীনামাটি খনিটি ৪১১ মিটার মাটির নিচে এবং স্তরটি প্রায় ৯ মিটার পুরু।

৬. **তামা :** বাংলাদেশের রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। এসব খনি হতে তামা উত্তোলনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বাসনপত্র, মুদ্রা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে তামার প্রয়োজন হয়।

৭. **সিলিকা বালু :** সিলেটের নয়াপাড়া, ছাতিয়ানি, শাহজীবাজার ও কুলাউড়া; চট্টগ্রামের দোহাজারী, জামালপুরের গারো পাহাড়ের বালিঝুরি এবং কুমিল্লা জেলার কালিকাপুর মৌজায় সিলিকা বালু পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট সিলিকা বালু উৎপাদিত হয়।

৮. **পারমাণবিক খনিজ পদার্থ :** পারমাণবিক খনিজ পদার্থ (Atomic minerals) সাধারণত ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর খনিজ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পারমাণবিক খনিজ পদার্থগুলো হলো জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, লিউকক্সেন প্রভৃতি।

৯. **গন্ধক :** বারুদ, কীটপতঙ্গ নাশক ওষুধ তৈরি, এসিড, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, দিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরিতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায়।

১০. **নুড়ি পাথর :** সিলেট জেলার লুবা, ভোলাগঞ্জ ও জিয়নগঞ্জ; দিনাজপুর জেলার পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রচুর নুড়ি পাথর পাওয়া যায়। প্রধানত রাস্তাঘাট, গৃহ, পুল, কালভার্ট, রেল লাইন প্রভৃতি নির্মাণে নুড়ি পাথর ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি নুড়ি পাথর পাওয়া যায় সিলেটে।

১১. **খনিজ বালি :** চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর Radio Active Sand পাওয়া গেছে। এর মোট পরিমাণ ৫ লক্ষ টন বলে অনুমান করা হয়। এতে প্রচুর ভারি খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকায় এটি ভারী ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১২. **লবণ :** খনিজ সম্পদ হিসেবে লবণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে কোনো লবণের খনি না থাকলেও সমুদ্রের লোনা পানি আটকিয়ে কুটির শিল্পের ভিত্তিতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে প্রচুর লবণ উৎপাদন করা হয়। সরকারের অর্থানুকূল্যে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বছরে প্রায় ২ কোটি মণ লবণ উৎপাদন করা হয়।

১৩. **কঠিন শিলা :** রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে বার্ষিক কঠিন শিলার চাহিদা প্রায় ৬০-৭০ লাখ মেট্রিক টন। এর বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হয় ২৫ মে, ২০০৭ সালে। জানুয়ারি ২০১২ পর্যন্ত মোট উৎপাদিত কঠিন শিলা ১৮.১১ লক্ষ মেট্রিক টন। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এখান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে। অন্যদিকে মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৬.৫ মিলিয়ন টন কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়।

অধ্যায়

০৭

পলিমার
Polymer

*Syllabus— **Polymer :** Natural and synthetic polymer; polymerization process; sources, characteristics and usage of natural and synthetic polymers; manufacturing process, characteristics and uses of fibers, silk, wool, nylon and rayon; physical and chemical properties of rubber and plastic; role of rubber and plastic for environmental imbalance; aware of using rubber and plastic.*

ক প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার, পলিমারকরণ প্রক্রিয়া, উৎস, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমারসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার

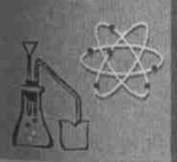

Natural and synthetic polymer, polymerization process, sources, characteristics and usage of natural and synthetic polymers

○ প্রশ্ন-১. পলিমার ও মনোমার কি?

উত্তর : পলিমার (Polymer) : মেলামাইনের থালা-বাসন, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, কার্পেট, পিভিসি পাইপ, পলিথিনের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, সিল্কের বা উলের কাপড়, সুতি কাপড়, নাইলনের সুতা, রাবার- এসব জিনিস আমাদের খুবই পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত। এরা সবাই পলিমার। পলিমার (Polymer) শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক পলি (Poly) ও মেরোস (Meros) থেকে, যার অর্থ হলো যথাক্রমে অনেক (Many) ও অংশ (Part)। অর্থাৎ অনেকগুলো একই রকম ছোট ছোট অংশ একের পর এক জোড়া লাগালে যে একটি বড় জিনিস পাওয়া যায়, তাই পলিমার। রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায় একই ধরনের অনেকগুলো ছোট অণু পরপর যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে। যে ছোট অণু থেকে পলিমার তৈরি হয়, তাদেরকে বলে মনোমার (Monomer)।

আমরা যে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করি, তা হলো ইথিলিন মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। একইভাবে আমরা যে পিভিসি পাইপ (PVC) ব্যবহার করি, তা হলো ভিনাইল ক্লোরাইড নামক মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। তবে সব সময় একটি মনোমার থেকেই পলিমার তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই, একের অধিক মনোমার থেকেও তৈরি হতে পারে। যেমন– বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড বা

বৈদ্যুতিক সুইচ হলো বাকেলাইট নামের একটি পলিমার, যা তৈরি হয় ফেনল ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। আবার মেলামাইনের থালা-বাসন হলো মেলামাইন রেজিন নামের পলিমার, যা তৈরি হয় মেলামাইন ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে।

○ প্রশ্ন-২. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : প্রাকৃতিক পলিমার : যে সকল পলিমার প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, সে সকল পলিমারকে প্রাকৃতিক পলিমার বলে। যেমন : রাবার।

কৃত্রিম পলিমার : যে সকল পলিমার প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, মানুষ শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি করে, সে সকল পদার্থকে কৃত্রিম পলিমার বলে। যেমন : পিভিসি।

কিছু প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার-এর উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো–

প্রাকৃতিক পলিমার	কৃত্রিম পলিমার
পাট	মেলামাইন
সিল্ক	রেজিন
সুতি কাপড়	বাকেলাইট
রাবার	পিভিসি
ফাইবার	পলিথিনের ব্যাগ
উল (Wool)	বৈদ্যুতিক সুইচ

○ প্রশ্ন-৩. পলিমারকরণ প্রক্রিয়া কি? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পলিমারকরণ প্রক্রিয়া : মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোমার সংযুক্ত করে পলিমার তৈরি হয়, তাকেই বলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া। সাধারণত পলিমারকরণে উচ্চচাপ ও তাপের প্রয়োজন হয়। যদি দুটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয় তাহলে উৎপন্ন পদার্থটিতে দুটির বেশি মনোমার থাকতে পারবে না। অর্থাৎ

১টি মনোমার + ১টি মনোমার ⟶ মনোমার-মনোমার বা $(\text{মনোমার})_2$

তিনটি মনোমার হলে উৎপন্ন পদার্থটিতে তিনটি মনোমার থাকবে অর্থাৎ

১টি মনোমার + ১টি মনোমার + ১টি মনোমার ⟶ মনোমার-মনোমার- মনোমার বা $(\text{মনোমার})_3$

যদি n সংখ্যক মনোমার নিয়ে একটি পলিমার বানানো হয়, তাহলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে দেখানো যায়।

n মনোমার ⟶ $(\text{মনোমার})_n$

○ প্রশ্ন-৪. পলিমারকরণ কি? তা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : ইথিন, প্রপিন ও অন্যান্য প্রতিস্থাপিত অ্যালকিনসমূহ উচ্চতাপে ও চাপে অনুঘটকের উপস্থিতিতে এক অণু অপর অণুর সাথে পর পর যুক্ত হয়ে উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি করে। এ উচ্চ আণবিক ভর বিশিষ্ট পদার্থকে পলিমার (polymer) বলে এবং যে প্রক্রিয়ায় পলিমার তৈরি হয় তাকে পলিমারকরণ (polymerization) বলে। গ্রীক শব্দ পলি (poly) অর্থ বহু এবং মেরোস (meros) অর্থ অংশ বা একক (unit)। সুতরাং ছোট একক অণু থেকে বৃহৎ অণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াই হচ্ছে পলিমারকরণ। অর্থাৎ যে বিক্রিয়ায় একই যৌগের (যেমন– অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন) বহুসংখ্যক অণু পরপর যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু বিশিষ্ট নতুন যৌগ উৎপন্ন করে, সে বিক্রিয়াকে পলিমারকরণ বলে এবং উৎপন্ন যৌগকে পলিমার ও মূল যৌগকে মনোমার (monomer) বলে। যেমন– উচ্চ চাপে (1000 – 1200 atm) ও 100 – 200°C তাপমাত্রায় সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 600 – 1000 ইথিন অণুর সংযোগে পলিথিন উৎপন্ন হয়।

যেমন–

$$\underset{\text{ইথিন (মনোমার)}}{nCH_2 = CH_2} \xrightarrow[100-200^\circ C]{O_2,\ 1000-1200 \text{ বায়ুমণ্ডল চাপ}} \underset{\text{পলিথিন (পলিমার)}}{\left[H_2C - CH_2 \right]_n} ;\ n = 600\text{–}1000$$

পলিমারকরণ বিক্রিয়া দুপ্রকার। যথা :

(ক) সংযোজন বা যুত বা চেইন পলিমারকরণ (addition or chain polymerizations)

(খ) ঘনীভবন বা ধাপভিত্তিক পলিমারকরণ (condensation or stepwise polymerizations)

○ প্রশ্ন-৫. যুত পলিমারকরণের কৌশল বর্ণনা করুন।

উত্তর : যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় কোনো ক্ষুদ্র পদার্থের অপসারণ ব্যতীত মনোমার অণুসমূহ পরপর যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকল পলিমার গঠন করে এবং গঠিত পলিমার এর আণবিক ভর মনোমারের আণবিক ভরের পূর্ণ গুণিতক হয় তাকে সংযোজন পলিমারকরণ বলে। সাধারণত, দ্বিবন্ধনযুক্ত যৌগসমূহ যেমন অ্যালকিন, প্রতিস্থাপিত অ্যালকিন ও ভিনাইল যৌগসমূহে সংযোজন পলিমারকরণ ঘটে।

সংযোজন পলিমারকরণে অসম্পৃক্ত যৌগের π-বন্ধন ভেঙ্গে π-বন্ধন যুক্ত দুটি কার্বন পরমাণুতে সক্রিয় কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। এ সক্রিয় কেন্দ্রের মাধ্যমে কার্বন শিকলের বিস্তারণ ঘটে এবং পলিমার গঠিত হয়। চেইনের সংশ্লিষ্ট স্থানে প্রতিস্থাপক শুধু যুক্ত থাকে।

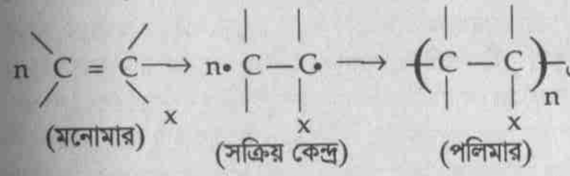

এখানে 'x' প্রতিস্থাপক।

○ প্রশ্ন-৬. পলিথিন এর সংশ্লেষণ লিখুন।

উত্তর : 1000 — 1200 বায়ুচাপে ইথিন গ্যাসকে তরলীভূত করে সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে 200°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে ইথিনের অসংখ্য অণু পরপর যুক্ত হয়ে যুত পলিমার পলিথিন গঠন করে। পলিথিন একটি সাদা, অস্বচ্ছ ও শক্ত প্লাস্টিক পদার্থ।

$$nH_2C = CH_2 \longrightarrow \left[H_2C - CH_2 \right]_n \quad \text{এখানে } n = 600 - 1000$$

○ প্রশ্ন-৭. পলিথিনের ব্যবহারগুলো লিখুন।

উত্তর : প্লাস্টিক ব্যাগ, খেলনা, রান্নাঘরের যাবতীয় সামগ্রী যেমন– ফুড বক্স, গামলা, গ্লাস, বদনা, মগ, বালতি ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৮. ঘনীভবন পলিমার কাকে বলে?

উত্তর : সংযোজন পলিমারকরণ ছাড়াও আর এক ধরনের পলিমারকরণ পদ্ধতি আছে। একে ঘনীভবন পলিমারকরণ (condensation polymerization) বলে। এ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনোমার অণুর সংযুক্তিতে বৃহৎ পলিমার গঠনের সময় ছোট ছোট অণু যেমন— H_2O, CH_3OH, CO_2 ইত্যাদি অপসারিত হয়ে নতুন বন্ধন তৈরি হয়। অর্থাৎ, যে পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় দুটি কার্যকরীমূলক বিশিষ্ট একই বা ভিন্ন মনোমারের অণুসমূহের মধ্যে বিক্রিয়ায় ক্ষুদ্র কোনো পদার্থের অণু অপসারিত হয়ে

ঘনীভবনের মাধ্যমে দীর্ঘ শিকল পলিমার গঠিত হয় তাকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বলে। এ প্রক্রিয়ায় পলিএস্টার, পলিঅ্যামাইড, পলিউরেথেন, পলিসিলোক্সেন প্রভৃতি পলিমার গঠিত হয়।

○ প্রশ্ন-৯. ঘনীভবন পলিমারের বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ আলোচনা করুন।

উত্তর : এটি তন্তুময় পলিমার। তাই এটি বস্ত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

নাইলন-66 হলো, তন্তুময় সংশ্লেষণিক পলিঅ্যামাইড। এর গলনাঙ্ক 263°C। নাইলন-66 বিভিন্ন সিনথেটিক বস্ত্র উৎপাদনের কাঁচামাল।

অনুরূপভাবে অ্যামাইনো এসিড থেকে প্রোটিন এবং গ্লুকোজ থেকে স্টার্চ ও সেলুলোজ নামক ঘনীভবন বায়োপলিমার গঠিত হয়।

খ উৎপাদন প্রক্রিয়া, ফাইবার, সিল্ক, উল, নাইলন ও রেয়ন-এর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

Manufacturing process, characteristics and uses of fibers, silk, wool, nylon and rayon

○ প্রশ্ন-১০. তন্তু ও সুতা কি? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আমাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র বা কাপড়। এই বস্ত্র আমাদের শীতের হাত থেকে রক্ষা করে, মানসম্ভ্রম রক্ষা করে। সৃষ্টির আদিকালে যখন বস্ত্র ছিল না, তখন লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা ছিল না, তাই ঐ যুগকে অসভ্যতার যুগ বলা হয়। তাই বস্ত্র বা কাপড়-চোপড় আধুনিক সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সব বস্ত্রই তৈরি হয় সুতা থেকে আবার সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে। তন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁশ দিয়ে তৈরি। তাই তন্তু বলতে আঁশজাতীয় পদার্থকেই বুঝায়। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে তন্তু বলতে বুনন ও বয়নের কাজে ব্যবহৃত আঁশসমূহকেই বুঝায়। তন্তু দিয়ে সুতা ও কাপড় ছাড়াও কার্পেট ফিল্টার, তড়িৎ নিরোধক ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পদার্থ তৈরি করা হয়।

আমাদের অতি প্রয়োজনীয় তন্তু উৎস অনুযায়ী দুই রকম হয়। সুতি কাপড় তৈরির জন্য তুলা (Cotton), পাট, লিনেন, রেশম, পশম, উল, সিল্ক, অ্যাসবেস্টস ও ধাতব তন্তু ইত্যাদি যেগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, তাদেরকে প্রাকৃতিক তন্তু বলে। অন্যদিকে পলিস্টার, রেয়ন, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি যেগুলো বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়, তারা হলো কৃত্রিম তন্তু।

প্রাকৃতিক তন্তুসমূহের মধ্যে আবার তুলা, পাট, লিনেন ইত্যাদি পাওয়া যায় উদ্ভিদ থেকে। তাই এদেরকে উদ্ভিদ তন্তু বলে। পক্ষান্তরে রেশম, পশম এগুলো পাওয়া যায় প্রাণী থেকে। তাই এদেরকে প্রাণিজ তন্তু বলে। আবার অ্যাসবেস্টস ও ধাতব তন্তু পাওয়া যায় প্রাকৃতিক খনিতে। তাই এদেরকে খনিজ তন্তু বলে।

অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তু আবার দুরকমের হয়। যেমন– সেলুলোজিক তন্তু ও নন সেলুলোজিক তন্তু। রেয়ন, এসিটেট রেয়ন, ভিসকোস রেসন, কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম রেয়ন– এগুলো সেলুলোজকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় বলে এদেরকে সেলুলোজিক তন্তু বলে।

সেলুলোজ হলো একধরনের সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ, যা দিয়ে উদ্ভিদ ও প্রাণী কোষ তৈরি হয়। যেসব কৃত্রিম তন্তু সেলুলোজ থেকে তৈরি না করে অন্য পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয়, তারাই হলো নন-সেলুলোজিক তন্তু। নাইলন, পলিস্টার, পলি প্রোপিলিন, ডেক্রন–এগুলো হলো নন-সেলুলোজিক কৃত্রিম তন্তু। একটি বস্ত্র আরামদায়ক কি না তা নির্ভর করে এটি কি ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি তার ওপর। আবার কাপড় তৈরি হয় সুতা থেকে, যা আসে তন্তু থেকে। কাজেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

○ প্রশ্ন-১১. তুলা কি? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : গরমের দিনে আমরা সুতির পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। কারণ, সুতির পোশাকে সুতার তাপ পরিবহন ও পরিচালন ক্ষমতা বেশি। তুলার আঁশ থেকে সুতির সুতা তৈরি হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে প্রধান হলো সুতি। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সুতির তন্তুকে অনেকটা নলের মতো দেখায়। নলের মধ্যে যে সরু পদার্থটি থাকে তা প্রথম অবস্থায় 'লুমেন' (Lumen) নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। পরে আঁশগুলো ছাড়িয়ে নেওয়ার পর রোদের প্রভাবে শুকিয়ে যায় এবং নলাকৃতি তন্তুটি ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা হয়ে ক্রমে একটি মোচড়ানো ফিতার মতো রূপ ধারণ করে। এই ফিতার মতো সুতির আঁশে ১০০ থেকে ২৫০টি পর্যন্ত পাক বা মোচড় থাকে। বস্ত্র তৈরির সময় এই মোচড়ানো অংশ একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে মিশে যায় বলে সুতি বস্ত্র টেকসই হয়। আপতদৃষ্টিতে সুতি পোশাক তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে ময়েশ্চারাইজেশনের (moisturization) মাধ্যমে একে উজ্জ্বল ও চকচকে করে তোলা হয়। সুতি তন্তুকে রং করা হলে তা পাকা হয় এবং তাপ ও ধোয়ার ফলে রংয়ের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। অজৈব এসিডের সংস্পর্শে সুতি তন্তু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু অন্যান্য এসিডের সংস্পর্শে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। সুতির বস্ত্র ব্যবহারে তেমন বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন নেই বিধায় এর বহুল ব্যবহার হয়েছে। সুতি বস্ত্রের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এর সংকোচনশীলতা।

চিত্র : অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সুতিতন্তু

○ প্রশ্ন-১২. রেশম কি? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : আগেকার দিনের রাজা-রানির পোশাক বলতে আমরা রেশমি পোশাকই বুঝি। অর্থাৎ বিলাসবহুল বস্ত্র তৈরিতে রেশম তন্তু ব্যবহৃত হয়। রেশমের প্রধান গুণ এর সৌন্দর্য। তিন শতাধিক রঙের রেশম পাওয়া যায়। রেশম বা পলু পোকা নামক এক প্রজাতির পোকার গুটি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় তন্তু আহরণ করা হয়। রেশম মূলত ফাইব্রেয়ন (Fibroin) নামক একপ্রকার প্রোটিন জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিক প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশম সবচেয়ে শক্ত ও দীর্ঘ। বিভিন্ন গুণাগুণের জন্য রেশমকে তন্তুর রানি বলা হয়। সূর্যালোকে রেশম দীর্ঘক্ষণ রাখলে এটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। রেশম হালকা কিন্তু অধিকতর উষ্ণ এবং খুবই কম পরিসরে রাখা যায়।

○ প্রশ্ন-১৩. পশম (Wool) কি? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : আমরা শীতের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে পোশাকের কথা সবচেয়ে আগে ভাবি তা হচ্ছে পশম বা উলের পোশাক। তাপ কুপরিবাহী বলে পশমি পোশাক শীতবস্ত্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কুঞ্চন প্রতিরোধের ক্ষমতা, রং ধারণক্ষমতা ইত্যাদি পশমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। পশম তাপ

কুপরিবাহী বিধায় শীতের দিনে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। তাই গায়ে দিলে গরম বোধ হয়। লঘু এসিড ও ক্ষারে পশমের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। মথ পোকা পশম তন্তু নষ্ট করে। তাছাড়া ছত্রাক পশম তন্তুকে সহজে আক্রান্ত করে নষ্ট করে দিতে পারে। পশম একটি অতি প্রাচীন তন্তু। বিভিন্ন জাতের ভেড়া বা মেষের লোম হতে পশম উৎপন্ন হয়। প্রায় ৪০ জাতের মেষ থেকে ২০০ প্রকার পশম তৈরি করা হয়। জীবন্ত মেষ থেকে লোম সরিয়ে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে 'ফ্লিস উল' (Fleece wool) এবং মৃত বা জবাই করা মেষ থেকে যে পশম তৈরি করা হয় তাকে 'পুল্ড উল' (Pulled wool) বলা হয়। মানুষের চুল ও নখে যে প্রোটিন থাকে অর্থাৎ কেরাটিন (Keratin), তা দিয়ে পশম তন্তু গঠিত। পশমের মধ্যে আলপাকা, মোহেরো, কাশ্মিও, ভিকুনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

○ প্রশ্ন-১৪. নাইলন (Nylon) কি? এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : কৃত্রিম নন-সেলুলোজিক তন্তুর মধ্যে নাইলন সর্বপ্রধান। সাধারণত এডিপিক এসিড ও হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইলন তৈরি হয়। নাইলনকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়–নাইলন –৬.৬ এবং নাইলন –৬।

নাইলন খুব হালকা ও শক্ত। এর স্থিতিস্থাপকতা ভিজলে দ্বিগুণ হয়। এটি আগুনে পোড়ে না, তবে গলে গিয়ে বোরাক্স বিডের (Borax Bead) মতো স্বচ্ছ বিড গঠন করে। কার্পেট, দড়ি, টায়ার, প্যারাসুটের কাপড় ইত্যাদি প্রস্তুতিতে নাইলন ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. রেয়ন কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে রেয়ন হলো প্রধান ও প্রথম তন্তু। উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ ও প্রাণিজ পদার্থ থেকে রেয়ন প্রস্তুত করা হয়। তিন প্রকারের প্রধান রেয়ন হলো (১) ভিসকোস, (২) কিউপ্রামোনিয়াম ও (৩) অ্যাসিটেট। এরা সুন্দর, উজ্জ্বল, মনোরম, অভিজাত এবং আকর্ষণীয় রূপ এবং মোটামুটি টেকসই। লঘু এসিডের সাথে তেমন কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু ধাতব লবণে সহজে রেয়ন বিক্রিয়া করে। অধিক উত্তাপে রেয়ন গলে যায়। তাই রেয়ন বস্ত্রে বেশি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায় না।

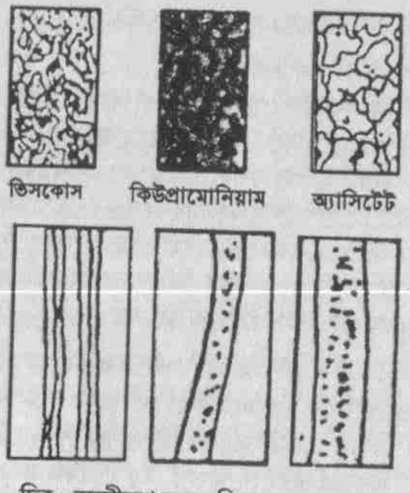

চিত্র : অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেয়ন তন্তুর রূপ

○ প্রশ্ন-১৬. তন্তু হতে সুতা তৈরির বিভিন্ন ধাপের বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : তন্তু দিয়ে সরাসরি কাপড় বানানো যায় না। এর জন্য তন্তু দিয়ে প্রথমে সুতা তৈরি করা হয়। তন্তু থেকে কোন প্রক্রিয়ায় সুতা তৈরি হবে তা নির্ভর করে তন্তুর বৈশিষ্ট্যের ওপর। একেক রকমের তন্তুর জন্য একেক রকম পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। নিম্নে সুতা তৈরির বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

তন্তু সংগ্রহ : যে কোনো ধরনের সুতা তৈরির প্রথম ধাপ হলো তন্তু সংগ্রহ, যা তন্তুর উৎস অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন– তুলার ক্ষেত্রে গাছ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা আলাদা করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হলো জিনিং। জিনিং প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত তন্তুকে বলে কটন লিন্ট। অনেকগুলো কটন লিন্ট একত্রে বেঁধে বেল বা গাঁইট তৈরি করা হয়। এই গাঁইট থেকেই স্পিনিং মিলে সুতা কাটা হয়।

তবে পাট বা পাট জাতীয় (যেমন– শণ, তিসি ইত্যাদি) গাছ থেকে একই পদ্ধতিতে তন্তু সংগ্রহ করা যাবে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে বীজ থেকে তন্তু সংগ্রহ করা হয় না। তন্তু সংগ্রহ করা হয় সরাসরি গাছ থেকে। এর জন্য গাছ কেটে প্রথমে কয়েক দিন মাঠেই একসাথে জড়ো করে রাখা হয় পাতা ঝরানোর জন্য। এতে সাধারণত ৫-৮ দিন সময় লাগে। এলাকা ভেদে জড়ো করে রাখা গাছকে চেল্লা বা পিল বলে। এভাবে জড়ো করে রাখার ফলে উদ্ভিদের পাতায় পচন ধরে, ফলে একটু ঝাঁকুনি দিলেই তা গাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। তবে খেয়াল রাখতে হয় গাছের পাতা যেন পুরোপুরি পচে না যায়। সেক্ষেত্রে পচা পাতা গাছের গায়ের সাথে লেগে যায়, যা সরানো কষ্টসাধ্য হয়। পাতা ঝরানোর পর প্রাপ্ত গাছ একসাথে আটি বেঁধে ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে পচানো হয়। কারণ পচালে খুব সহজেই গাছ থেকে আঁশ বা তন্তু আলাদা করা যায়। গাছ থেকে আঁশ আলাদা করে পানিতে ধুয়ে রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ একত্রিত করে গাঁইট বা বেল বাঁধা হয়। তুলার মতোই এই গাইট বা বেল সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে নেয়া হয়।

রেশমি সুতা তৈরি হয় রেশম তন্তু থেকে। এক্ষেত্রে সরাসরি সুতা উৎপাদিত হয়, অন্য কোনো প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রেও কিন্তু রেশম তন্তুর মতো সরাসরি সুতা তৈরি হয়। কিন্তু উল বা পশমি সুতার জন্য দরকারি প্রাণিজ তন্তু অর্থাৎ প্রাণিজ পশম, লোম বা চুল সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে কেটে নিয়ে। এভাবে প্রাণীর দেহ থেকে লোম পশম চুল কেটে নিলে ঐ সকল প্রাণীর তেমন কোনো ক্ষতি হয় না এবং কিছু দিনের মধ্যে আবার লোম গজায় যা বড় হলে আবার কেটে তন্তু সংগ্রহ করা হয়। তাহলে এটি পরিষ্কার যে, একই পশুর গা থেকে বার বার পশম সংগ্রহ করা যায়। এভাবে সংগৃহীত পশম, লোম বা চুলকে ফ্লিস উল বলা হয়। এই ফ্লিস উল বস্তায় করে সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে আনা হয়।

সুতা কাটা (Spinning) : সুতা কাটা হয় স্পিনিং মিলে। সাধারণত একটি মিল বা কারখানায় এক ধরনের তন্তু থেকে সুতা কাটা হয়। কারণ, সুতা কাটার যে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে তা একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক রকম। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্তু ও তা থেকে তৈরি সুতার কারখানাও আলাদা। তবে তন্তু ভেদে সুতা কাটার পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও কিছু সাদৃশ্য আছে। এখন আমরা তন্তু থেকে সুতা কাটার পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করছি।

ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং : কারখানায় আনা তন্তুর বেল বা গাঁইট ব্লেন্ডিং রুমে নিয়ে প্রথমে খুলে ফেলা হয়। এরপর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এক সাথে গুচ্ছাকারে থাকা তন্তুকে ভেঙে যথাসম্ভব ছোট ছোট গুচ্ছে পরিণত করা হয়। এ সময় তন্তুর সাথে থাকা ময়লার ছোট ছোট টুকরা, বীজ বা পাতার ভাঙা কোনো অংশ ইত্যাদিও দূর করা হয়। এরপর বিভিন্ন রকম তুলার মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণ তৈরি

করার কারণ হলো, গুণে ও মানে ঠিক একই রকম তুলা পাওয়া সব সময় সম্ভব নয়, মিশ্রণ না করলে একেক সময় একেক রকম সুতা তৈরি হবে, কখনো ভালো, কখনো মন্দ অর্থাৎ সুতার মান এক হবে না। এছাড়া বিভিন্ন রকম তুলা মিশিয়ে সুতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। আরেকটি ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ ছোট একটি দেশ এবং বাণিজ্যিকভাবে তুলার উৎপাদন হয় না বললেই চলে। বেশির ভাগ তুলাই আমদানিনির্ভর। আর তুলা আমদানি করা হয় বিভিন্ন দেশ থেকে। একেক দেশের তুলার মানও একেক রকম হয়। একই রকম তুলার যোগান পাওয়া বাস্তবে অসম্ভব। এজন্য বিভিন্ন রকম তুলা সংগ্রহ করেই মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বেল বা গাঁইট থেকে তুলার এই মিশ্রণ তৈরিই হলো ব্লেডিং এবং মিক্সিং। তবে পাট তন্তুর বেলায় এই প্রক্রিয়াকে ব্যাচিং (Batching) বলে।

কার্ডিং এবং কম্বিং (Carding & Combing) : সুতা কাটার দ্বিতীয় ধাপ হলো কার্ডিং এবং কম্বিং। তুলা, লিনেন, পশম এসব তন্তুর বেলায় এই ধাপটি প্রয়োগ করা হয়। তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কার্ডিং এবং কম্বিং-এর কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ঠিক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী অতি ছোট তন্তু বাদ দেয়া হয় এবং ধুলাবালি বা ময়লার কণা থাকলে তাও দূরীভূত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কার্ডিং করলেই চলে। তবে মিহি মসৃণ ও সরু সুতা তৈরি করতে কম্বিং দরকার হয়। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ ধরনের কম্বিং করা হয়, যা হেলকিং নামে পরিচিত। হেলকিং করলে সুতা অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও মিহি হয়।

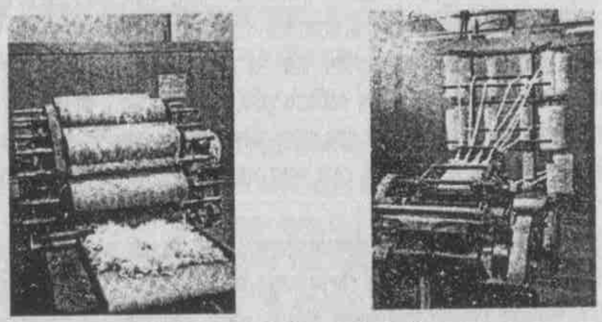

চিত্র : স্পিনিং মিলে সুতা তৈরি

স্পিনিং (Spinning) : কার্ডিং ও কম্বিং করে প্রাপ্ত তন্তু পাতলা আস্তরের মতো হয় এবং এটিকে স্লাইভার (Sliver) বলে। এ স্লাইভার পাকালেই সুতা তৈরি হয়। পাকানোই হলো মূলত স্পিনিং। এ পর্যায়ে স্লাইভারকে টেনে ক্রমশ অধিকতর সরু করা হয়। একসময় স্লাইভারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গোছা তন্তু বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরিবর্তিত স্লাইভারকে মোচড়ানো বা পাকানো হয়। স্লাইভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়া হলো রোভিং আর টুইস্টিং (Twisting)। স্লাইভারকে মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে যায় এবং সুতায় পরিণত হয়। মোচড় কম-বেশি করে সুতা শক্ত বা নরম করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোচড় বেশি দিলে সুতা বেশি শক্ত হয়, তবে মোচড় অতিরিক্ত হলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। মোচড়ের পরিমাণ নির্ভর করে মূল তন্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর। সাধারণত লম্বা তন্তুর বেলায় (যেমন– পাট বা লিনেন) তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় লাগে। টুইস্ট কাউন্টার (Twist counter) নামক একধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৭. রেশম তন্তু থেকে রেশম সুতা তৈরির পদ্ধতি বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় এক ধরনের গুটি। একে কোকুনও (cocoon) বলে। পরিণত কোকুন বা গুটি সাবান পানিতে লোহার কড়াইয়ে সেদ্ধ করা হয়। এতে কোকুন নরম হয়ে যায় এবং ওপর

থেকে খোসা খুব সহজেই আলাদা হয়ে যায়। খোসা উঠে গেলে তন্তুর প্রান্ত বা নাল পাওয়া যায়। এই নাল ধরে আস্তে আস্তে টানলে লম্বা সুতা বের হয়ে আসে। চিকন বা মিহি সুতার জন্য ৫-৭টি কোকুনের নাল আর মোটা সুতার জন্য ১৫-২০টি কোকুনের নাল একত্র করে টানা হয়। এ কাজে চরকা ব্যবহার করা হয়। নালগুলো একত্রিত করলে এদের গায়ে লেগে থাকা আঠার কারণে একটি আরেকটির সাথে লেগে যায় ও সুতার গোছা তৈরি হয়।

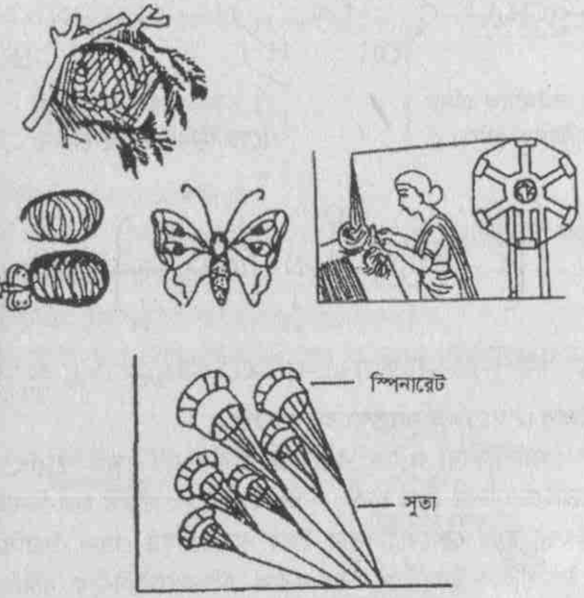

চিত্র : রেশম তন্তু থেকে সুতা তৈরি

○ প্রশ্ন-১৮. কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরির পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরির পদ্ধতি প্রায় সব তন্তুর ক্ষেত্রে একই রকম। একের অধিক ক্ষুদ্র আঁশ ও উপযুক্ত দ্রাবকের সাহায্যে ঘন ও আঠালো দ্রবণ তৈরি করা হয়। এই দ্রবণ হলো স্পিনিং দ্রবণ। এই স্পিনিং দ্রবণকে স্পিনারেট নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে উচ্চ চাপে প্রবাহিত করা হয়। দ্রবণকে জমাট বাধানোর জন্য এর সাথে প্রবাহপথে উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এতে স্পিনারেট থেকে সুতার দীর্ঘ নাল বের হয়ে আসে যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য। এই সুতা কাপড় তৈরি বা বয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৯. Nylon কি? এর সংশ্লেষণ বর্ণনা করুন।

উত্তর : ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ার বহুল পরিচিত উদাহরণ হচ্ছে ডাইঅয়িক এসিড ও ডাইঅ্যামিনের বিক্রিয়ায় নাইলন– 66 নামক পলিঅ্যামাইড গঠন।

হেক্সেন ডাইঅয়িক এসিড (অ্যাডিপিক এসিড) এবং 1, 6–ডাই অ্যামিনো হেক্সেন (হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন) এর সমমোলার মিশ্রণের বিক্রিয়ায় পানি অপসারিত হয়ে হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামোনিয়াম

অ্যাডিপেট বা নাইলন সল্ট উৎপন্ন হয়। একে TiO_2 প্রভাবকসহ একটি বাষ্পকারকে (evaporator) ডাউথার্ম স্টিম কয়েল দ্বারা উত্তপ্ত করলে পলিহেক্সামিথিলিন অ্যাডিপ্যামাইড গঠিত হয়। বাণিজ্যিকভাবে একে নাইলন–66 বলে। এখানে সংখ্যা 66 দ্বারা দুটি মনোমারের কার্বন সংখ্যা যথাক্রমে 6 এবং 6 বুঝানো হয়।

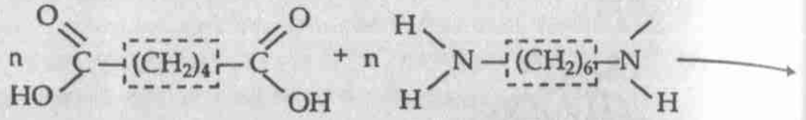

হেক্সান ডাইঅয়িক এসিড (অ্যাডিপিক এসিড) 1, 6-ডাইঅ্যামিনো হেক্সেন (হেক্সামিথিলিন ডাইঅ্যামিন)

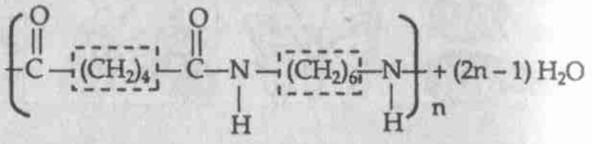

চিত্র : নাইলন– 66-$[-HN(CH_2)_6-NH-CO-(CH_2)_4-CO-]_n$ এর গঠন।

○ প্রশ্ন-২০. পিভিসি (PVC) এর সংশ্লেষণ বর্ণনা করুন।

উত্তর : ইথাইন (অ্যাসিটিলিন) ও শুষ্ক HCl গ্যাসের মিশ্রণকে 150 – 250°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত মারকিউরিক ক্লোরাইডের উপর দিয়ে চালনা করলে উভয়ই সংযোজিত হয়ে ভিনাইল ক্লোরাইড বা ক্লোরোইথিন উৎপন্ন হয়। ক্লোরোইথিনকে জৈব পারঅক্সাইড যেমন, টারসিয়ারী বিউটাইল পারঅক্সাইডের উপস্থিতিতে উচ্চ চাপে উত্তপ্ত করলে পলিক্লোরোইথিন বা পলিভিনাইল ক্লোরাইড (PVC) উৎপন্ন হয়।

$$HC \equiv CH + HCl \longrightarrow CH_2 = CHCl$$

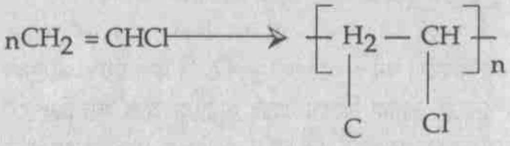

○ প্রশ্ন-২১. পিভিসি (PVC) এর ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : পিভিসি অত্যধিক শক্ত প্লাস্টিক। গৃহ নির্মাণের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বৈদ্যুতিক সামগ্রী, পানির পাইপ, কৃত্রিম চামড়া ও রেকর্ড তৈরিতে এটি ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২২. পলিস্টারিনের সংশ্লেষণ লিখুন।

উত্তর : ফিনাইল ইথিন বা স্টারিন একটি তরল পদার্থ। একে প্রায় 1000 বায়ুচাপে অথবা বিভিন্ন লুইস এসিডের (H_2SO_4, $AlCl_3$ ইত্যাদি) উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে পলিস্টারিন উৎপন্ন হয়। এদিকে বেনজিনের সঙ্গে ইথিলিনের সংযোগে ফ্রিডেলক্রাফট বিক্রিয়ায় স্টারিন পাওয়া যায়।

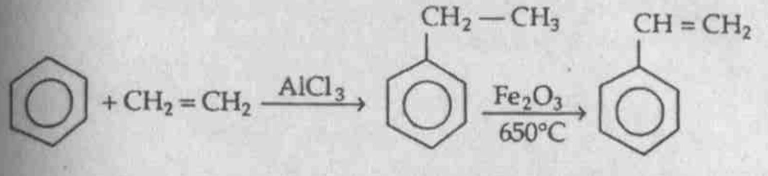

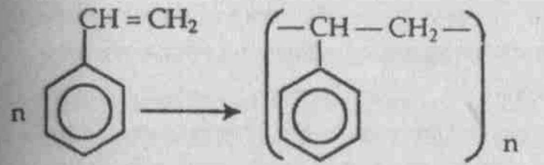

○ প্রশ্ন-২৩. পলিস্টারিন এর ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : প্যাকেজিং উপাদান, ফোমের সামগ্রী ও তাপ নিরোধকের (insulator) কাজে ব্যবহৃত হয়। কৃত্রিম রাবার উৎপাদনেও এটি ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২৪. পলিটেরেথেলেট থেকে পলিএস্টার উৎপন্ন করুন।

উত্তর : ইথিলিন গ্লাইকল ও টেরেথেলিক এসিডের বিক্রিয়ায় পলিটেরেথেলেট নামক ঘনীভবন পলিএস্টার গঠিত হয়।

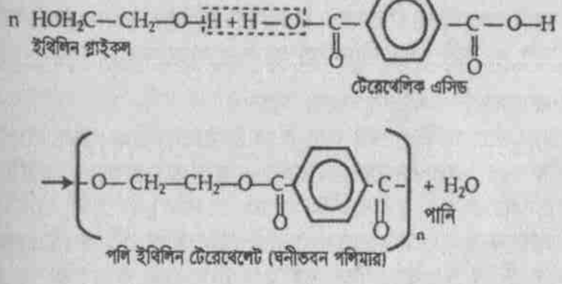

রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাবার ও প্লাস্টিকের ভূমিকা, রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সচেতনতা

Physical and chemical properties of rubber and plastic, role of rubber and plastic for environmental imbalance, aware of using rubber and plastic

○ প্রশ্ন-২৫. পলিথিন কিভাবে তৈরি হয়? ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০-১২০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিথিন পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পলিমারকরণ দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

$$n\,(\text{ইথিলিন}) \xrightarrow[O_2\ \text{প্রভাবক}]{\text{উচ্চতাপ ও চাপ}} \text{পলিথিন}$$

$$n\,(CH_2=CH_2) \xrightarrow[O_2\ \text{প্রভাবক}]{\text{উচ্চ তাপ ও চাপ}} (-CH_2-CH_2-)_n$$

তবে উচ্চ চাপ পদ্ধতি সহজসাধ্য না হওয়ায় ইদানীং এটি তেমন জনপ্রিয় নয়। এখন টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ($TiCl_3$) নামক প্রভাবক ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই পলিথিন তৈরি হয়।

○ প্রশ্ন-২৬. রাবার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : পেনসিলের লেখা মোছার জন্য যে ইরেজার ব্যবহার করা হয় তা হলো রাবার। সাইকেল, রিকশা বা অন্যান্য গাড়ির টায়ার, টিউব, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুন-এসবই রাবার। পানির পাইপ, সার্জিক্যাল মোজা, কনভেয়ার বেল্ট, রাবার ব্যান্ড, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর নিপল-এসবই রাবারের তৈরি সামগ্রী। রাবার ও রাবারজাত পণ্যসামগ্রী আমাদের জীবনের অনেক কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

○ প্রশ্ন-২৭. রাবারের ভৌত ধর্ম আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রাকৃতিক রাবার পানিতে অদ্রবণীয় একটি অদানাদার কঠিন পদার্থ। রাবার কিছু কিছু জৈব দ্রাবক যেমন– এসিটোন, মিথানল ইত্যাদিতে অদ্রবণীয় হলেও টারপেন্টাইন, পেট্রোল, ইথার, বেনজিন ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। রাবার একটি স্থিতিস্থাপক পদার্থ অর্থাৎ একে টানলে লম্বা হয় ও ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বেশিরভাগ রাবারই তাপ সংবেদনশীল অর্থাৎ তাপ দিলে গলে যায়। বিশুদ্ধ রাবার বিদ্যুৎ ও তাপ কুপরিবাহী। তবে ইদানীং বিশেষভাবে তৈরি বিদ্যুৎ পরিবাহী রাবার বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন।

○ প্রশ্ন-২৮. রাবারের রাসায়নিক ধর্ম আলোচনা করুন।

উত্তর : আমরা জানি, প্রায় প্রতিটি পদার্থ তাপ দিলে আয়তনে বাড়ে। কিন্তু রাবারের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটি ঘটে অর্থাৎ তাপ দিলে রাবারের আয়তন কমে যায়। রাবারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ধর্ম হলো, এটি বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন– দুর্বল ক্ষার, এসিড, পানি ইত্যাদির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে কারণে প্রলেপ দেওয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

রাবার দীর্ঘদিন রেখে দিলে তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ হলো, রাবার বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। অক্সিজেন ছাড়াও আরো কিছু রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে ওজোন (O_3) প্রাকৃতিক রাবারের সাথে বিক্রিয়া করে, ফলে রাবার ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

○ প্রশ্ন-২৯. প্লাস্টিক কী?

উত্তর : প্লাস্টিক শব্দের অর্থ হলো সহজে ছাঁচযোগ্য। নরম অবস্থায় প্লাস্টিক দিয়ে ইচ্ছামতো ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার-আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করা যায়। আমরা বাসাবাড়িতে নানা রকম প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি। মগ, বালতি, জগ, মেলামাইনের থালা-বাসন, পিভিসি পাইপ, বাচ্চাদের খেলনা, গাড়ির সিটবেল্ট, এমনকি আসবাবপত্র সবকিছুই কিন্তু প্লাস্টিক। এগুলো সবই পলিমার পদার্থ।

○ প্রশ্ন-৩০. প্লাস্টিকের ভৌত ধর্ম আলোচনা করুন।

উত্তর : প্লাস্টিক পানিতে দ্রবীভূত হয় না। বেশির ভাগ প্লাস্টিকই পানিতে অদ্রবণীয়। প্লাস্টিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম হলো, এরা বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবহন করে না। তাই বিদ্যুৎ ও তাপ নিরোধক হিসেবে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো গলিত অবস্থায় এদেরকে যে কোনো

আকার দেওয়া যায়। এই সুবিধার কারণেই এটি নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাপ দিলে প্লাস্টিকে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টার কাপড়, বাচ্চাদের খেলনা এসব প্লাস্টিক তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং গলিত প্লাস্টিক ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়ে যায়। এভাবে যতবারই এদেরকে তাপ দেওয়া যায়, এরা নরম হয় ও ঠাণ্ডা করলে শক্ত হয়। এদেরকে থার্মোপ্লাস্টিকস (Thermoplastics) বলে। পক্ষান্তরে মেলামাইন, বাকেলাইট (যা ফ্রাইং প্যানের হাতলে এবং বৈদ্যুতিক সকেটে ব্যবহার করা হয়) এগুলো তাপ দিলে নরম হয় না বরং পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এদেরকে একবারের বেশি ছাচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। এই সকল প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস (Thermosetting Plastics) বলে।

○ প্রশ্ন-৩১. প্লাস্টিকের রাসায়নিক ধর্ম আলোচনা করুন।

উত্তর : বেশিরভাগ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে অনেকটাই নিষ্ক্রিয়। তাই বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এমনকি পাতলা এসিড বা ক্ষারের সাথেও বিক্রিয়া করে না। তবে শক্তিশালী ও ঘনমাত্রার এসিডে কিছু কিছু প্লাস্টিক দ্রবীভূত হয়। প্লাস্টিক সাধারণত দাহ্য হয় অর্থাৎ এদেরকে আগুন ধরালে পুড়তে থাকে ও প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে।

প্লাস্টিক পচনশীল নয়। দীর্ঘদিন মাটি বা পানিতে পড়ে থাকলেও এরা পচে না। অবশ্য ইদানীং বিজ্ঞানীরা পচনশীল প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন, যা বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। হাত-পা কেটে গেলে বা মেডিক্যাল অপারেশনের পরে সেলাইয়ের কাজে যে সুতা ব্যবহৃত হয় তা এক ধরনের পচনশীল প্লাস্টিক।

প্লাস্টিক পোড়ালে অনেক ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি হয়। যেমন– পিভিসি পোড়ালে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) নিঃসৃত হয়। আবার পলিইউরেথেন (Polyurethane) প্লাস্টিক (যা আসবাবপত্র, যেমন– চেয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস ও হাইড্রোজেন সায়ানাইড তৈরি হয়।

○ প্রশ্ন-৩২. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিকের প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তর : বেশিরভাগ প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রাবার পচনশীল নয়। এর ফলে পুনঃব্যবহার না করে বর্জ্য হিসেবে অপসারণ করলে এগুলো পরিবেশে জমা হতে থাকে এবং নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আমরা একটু খেয়াল করলেই দেখবো যে, ঢাকা বা অন্যান্য শহরের বেশির ভাগ নর্দমার নালায় প্রচুর প্লাস্টিক বা রাবার জাতীয় জিনিস পড়ে আছে। এগুলো জমতে জমতে একপর্যায়ে নালা বন্ধ হয়ে যায় ও নর্দমার নালায় পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা নষ্ট করে। একইভাবে প্লাস্টিক ও বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা না করায় এর বড় একটি অংশ নদ-নদী, হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এভাবে জমতে থাকলে একসময় নদীর গভীরতা কমে যায়, যা নাব্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আবার ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা রাবারের বর্জ্য অনেক সময় মাটিতে থাকলে তা মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে পারে। ফেলে দেওয়া এসব বর্জ্য অনেক সময় গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর খাবারের সাথে মিশে পাকস্থলীতে যায় এবং এক পর্যায়ে তা মাংস ও চর্বিতে জমতে থাকে। এমনকি নদ-নদী, খাল-বিলে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক/রাবার বর্জ্য খাবার গ্রহণের সময় মাছের দেহেও প্রবেশ করতে পারে ও জমা হতে থাকে। আর আমরা মাছ, মাংস খেলে শেষ পর্যন্ত তা আমাদের দেহে প্রবেশ করে, যা ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাহলে এটি স্পষ্ট যে, প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী সঠিক ব্যবস্থাপনা না করলে তা মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী যতবার সম্ভব নিজেরা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে ও অন্যদের ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে যেখানে-সেখানে ফেলে না দিয়ে একসাথে জড়ো করে রাখতে হবে। এভাবে জড়ো করা সামগ্রী বিক্রিও করা যায়। এতে একদিকে

যেমন পরিবেশ সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। বিক্রি করার সুযোগ না থাকলে এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

○ প্রশ্ন-৩৩. টেফলন কী?

উত্তর : পলি টেট্রাফ্লোরো ইথিনকে টেফলন বলে। সংকেত

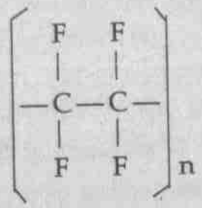

○ প্রশ্ন-৩৪. টেফলন এর সংশ্লেষণ বর্ণনা করুন।

উত্তর : টেট্রাফ্লোরোইথিনকে ফেনটন বিকারক অর্থাৎ $FeSO_4$ ও H_2O_2 এর উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে তা থেকে সংযোজন পলিমারকরণ প্রক্রিয়ায় পলিটেট্রাফ্লোরোইথিন গঠিত হয়। এটি বাণিজ্যিকভাবে টেফলন নামে পরিচিত। এটি একটি অদাহ্য, এসিড ও ক্ষারে নিষ্ক্রিয় এবং বিদ্যুৎ নিরোধী শক্ত ননস্টিকিং প্লাস্টিক।

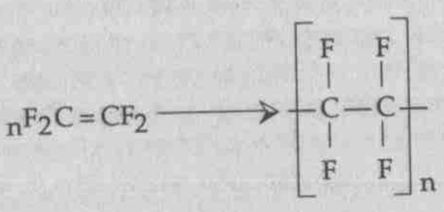

○ প্রশ্ন-৩৫. টেফলন এর ব্যবহারগুলো লিখুন।

উত্তর : এটি অত্যন্ত শক্ত প্লাস্টিক। টেফলন তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী, ননস্টিক রান্নার প্যান, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর প্রভৃতি তৈরিতে এ পলিমার ব্যবহার হয়।

○ প্রশ্ন-৩৬. পলি-স্টার কি? এর সংশ্লেষণ বর্ণনা করুন।

উত্তর : হেপ্টেনে দ্রবীভূত প্রপিনকে 140 বায়ুচাপে $TiCl_3$ এর উপস্থিতিতে 120°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত করলে প্রপিনের অসংখ্য অণু যুক্ত হয়ে পলিপ্রপিন গঠন করে। এটিও শক্ত প্লাস্টিক। একে পলি-স্টার বলে।

○ প্রশ্ন-৩৭. পলি-স্টার এর ব্যবহারগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : এটি পলিথিনের চেয়ে শক্ত প্লাস্টিক। এটি দড়ি, কার্পেট, বোতল, পাইপ ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যায় ০৮

বায়ুমণ্ডল
Atmosphere

Syllabus— Atmosphere : *Biosphere and Hydrosphere, Ionosphere, role of oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Potable and polluted water, Pasteurization.*

ক বায়ুমণ্ডল
Atmosphere

○ প্রশ্ন-১. বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? এর উপাদান উল্লেখ করুন।

উত্তর : পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্বদিকে যে গ্যাসীয় আবরণ সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করে রেখেছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যতই ওপরে ওঠা যায় বায়ুমণ্ডল ততই হালকা হতে থাকে। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের ৯৭% পদার্থ ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ২৯ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থান করলেও বিজ্ঞানীদের মতে, বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বসীমা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বায়ুর উপাদান হলো নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয়বাষ্প। এছাড়া বায়ুতে বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস; যেমন– হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন ইত্যাদি থাকে। স্থানবিশেষে হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, অ্যামোনিয়া, ওজোন প্রভৃতি উপাদান সামান্য পরিমাণে থাকে। সাধারণ বায়ুতে আয়তন হিসেবে নাইট্রোজেন ৭৮.০২%, অক্সিজেন ২০.৭১%, আরগন (Ar) ০.৯৩%, কার্বন ডাই-অক্সাইড .০৩% এবং বাকি অন্যান্য গ্যাস।

○ প্রশ্ন-২. বায়ুমণ্ডলের স্তর কয়টি ও কি কি?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলীয় স্তরকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়। যথা : ১. ট্রপোমণ্ডল, ২. স্ট্রাটোমণ্ডল, ৩. মেসোমণ্ডল ও ৪. তাপমণ্ডল।

Name of the region	Height above the earth's surface, km.	Temperature range °C	Major chemical species present
Troposphere	0 – 11	15 to 56	O_2, N_2, CO_2, H_2O
Stratosphere	11 – 50	56 to –2	O_3
Mesosphere	50 – 85	– 2 to –92	O_2^+, NO^+
Thermosphere	85 – 500	–92 to 1200	O_2^+, O^+, NO^+

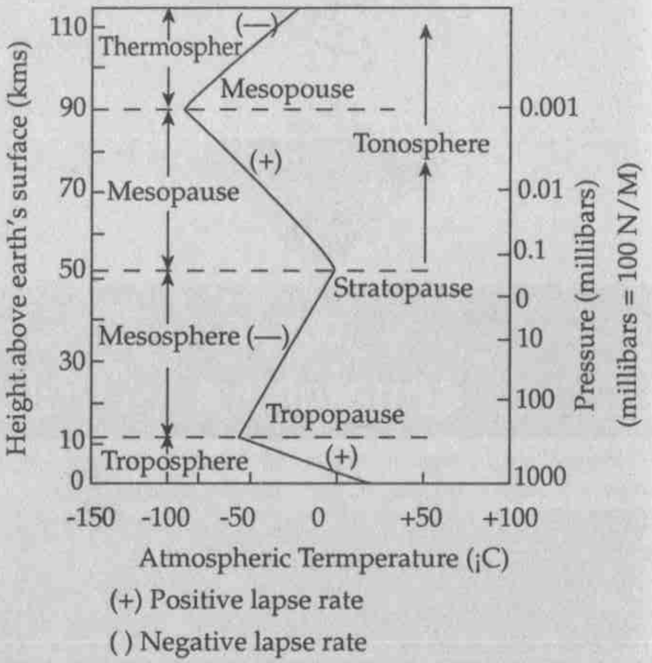

Fig. Major atmospheric regions with temperature and pressure profile.

○ প্রশ্ন-৩. ট্রপোমণ্ডল (Troposphere) কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : এটি বায়ুমণ্ডলের সর্ব নিম্নস্তর, যা ভূপৃষ্ঠের সাথে লেগে আছে। জীবজগতের জন্য বায়ুমণ্ডলের এ স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ট্রপোমণ্ডলের শেষপ্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি (Tropopause)। এ স্তরের গভীরতা মেরু এলাকায় ৮ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় এলাকায় ১৬ থেকে ১৯ কিলোমিটার।

ট্রপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য :

ক. উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর ঘনত্ব ও উষ্ণতা কমতে থাকে।
খ. উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়।
গ. নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকে।
ঘ. আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশিরভাগ এ স্তরে ঘটে থাকে।
ঙ. শীতকালে এ স্তরটি সংকুচিত হয় এবং গ্রীষ্মকালে সম্প্রসারিত হয়।
চ. মানুষসহ সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ এ স্তরের তলদেশে বাস করে।

○ প্রশ্ন-৪. 'স্ট্রাটোমণ্ডল' (Stratosphere) কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : ট্রপোবিরতির ওপর ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্রাটোমণ্ডল বিস্তৃত। বায়ুমণ্ডলীয় ওজোন (O_3) গ্যাসের বেশিরভাগ এ স্তরেই বিদ্যমান আছে। এ ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি শুষে নেয়। তাই পৃথিবী প্রাণিজগতের বাস উপযোগী হয়েছে। এ স্তরের ২০ কিলোমিটার থেকে ধীরে ধীরে উষ্ণতা বাড়তে থাকে এবং তা উচ্চ স্ট্রাটোমণ্ডলে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ স্তরের ওপরেই অবস্থান করে স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause)।

স্ট্রাটোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য :

ক. এখানে ওজোন (O_3) গ্যাসের পরিমাণ অধিক।
খ. এখানে বায়ুর তাপ ও চাপের পার্থক্য প্রায় নেই।
গ. এ স্তরে বায়ুর ঊর্ধ্ব ও নিম্নগতি নেই ও বায়ু জলীয়বাষ্পহীন।
ঘ. এখানে বায়ুর সমান্তরাল গতি লক্ষণীয়।
ঙ. এ স্তরটি না থাকলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণে প্রাণিকুল ধ্বংস হয়ে যেত।

○ প্রশ্ন-৫. মেসোমণ্ডল (Mesosphere) ও তাপমণ্ডল (Thermosphere)-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

উত্তর : মেসোমণ্ডল (Mesosphere) : স্ট্রাটোবিরতির ওপরের স্তর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উষ্ণতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এ বিস্তৃত অংশকে মেসোমণ্ডল বলে। তবে মেসোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমাকে মেসোপজ (Mesopause) বলে।

মেসোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ স্তরে বায়ুর চাপ খুবই কম।
খ. এখানে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পায়।
গ. এ স্তরে অধিকাংশ উল্কাপিণ্ড জ্বলে ওঠে।

তাপমণ্ডল (Thermosphere) : মেসোবিরতির ওপরের অংশ থেকে তাপমণ্ডল শুরু হয়। এখানে বায়ুর উষ্ণতা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায় বলে একে থার্মোমিটার বা তাপমণ্ডল বলে। তাপমণ্ডলের নিম্নাংশকে আয়নমণ্ডল বলে।

তাপমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ স্তর থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়।
খ. এখানে বায়ু খুব হালকা।
গ. আয়নমণ্ডলের ওপরের অংশে এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনিটোস্ফিয়ার নামক দুটি স্তর আছে যা মূলত অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু দ্বারা গঠিত।
ঘ. সৌরশক্তির অতি শক্তিশালী গামারশ্মি ও এক্স-রে এ স্তরে শোষিত হয়।

○ প্রশ্ন-৬. চাপ বলয় কাকে বলে? ভূপৃষ্ঠে সাধারণত কয় প্রকার চাপ বলয় দেখা যায়?

উত্তর : বায়ুর চাপ আবহাওয়া ও জলবায়ুর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। বায়ু ওপরে, নিচে এবং চারপাশে চাপ দেয়। বায়ুর এ চাপকে বায়ুচাপ বলে। নানা কারণে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র বায়ুর চাপ সমান থাকে না। বায়ুর চাপের তারতম্যের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র পৃথিবীতে কতগুলো চাপ বলয় সৃষ্টি হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠে সাধারণত চারটি চাপ বলয় রয়েছে। যথা :

১. নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় ২ ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়
৩. মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় ৪. মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়।

○ প্রশ্ন-৭. নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ৫° থেকে ১০° অক্ষাংশ পর্যন্ত এ বলয় অবস্থিত। এ অঞ্চলে সারাবছর সূর্য প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ অঞ্চলের বায়ু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু, তাই বায়ুর চাপ কম। এখানে জলভাগ বেশি। ফলে এ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। একে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলে।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ অঞ্চলের বায়ু অন্যান্য অঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু হয়।
খ. এ অঞ্চলের বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ হয় না। তাই এর অপর নাম নিরক্ষীয় শান্ত বলয়।
গ. এ অঞ্চলে প্রায়ই বজ্রপাতসহ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
ঘ. সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে প্রচুর জলীয়বাষ্পের উদ্ভব হয়।

○ প্রশ্ন-৮. ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি?

উত্তর : নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ, আর্দ্র ও লঘু বায়ু যতই ওপরে ওঠে ততই শীতল হতে থাকে। কিন্তু নিচ থেকে উষ্ণ বায়ু অনবরত ওপরে ওঠায় এ বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিচে নামতে পারে না। ফলে ওপরের বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে ২৫° থেকে ৩৫° ক্রান্তীয় অঞ্চলে শীতল ও ভারি বায়ু নিচে নামতে থাকে। ফলে উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের ২৫°– ৩৫° মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ চাপ বলয় দুটিকে যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় বলে।

ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ অঞ্চলের বায়ু শীতল ও ভারী হয়।
খ. এ অঞ্চলের বায়ু নিম্নগামী।
গ. বায়ুর আর্দ্রতা অত্যন্ত কম ও পার্শ্বপ্রবাহ নেই।
ঘ. জলীয়বাষ্পের অভাবে এ অঞ্চলে পৃথিবীর বৃহৎ মরুভূমিগুলো দেখা যায়।
ঙ. আটলান্টিক মহাসাগরের উপর কর্কটীয় শান্ত বলয়কে 'অশ্ব অক্ষাংশ' বলে।

○ প্রশ্ন-৯. মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় কাকে বলে? এ বলয়ের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

উত্তর : দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বেশি। ফলে এ অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে সরে যায়। তখন দু'মেরুবৃত্তে (৬০°–৭০° অক্ষাংশের মধ্যে) বায়ুর চাপ হ্রাস পেয়ে দুটি নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ দুটিকে মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয় বলে।

মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ অঞ্চলের বায়ু শীতল ও শুষ্ক।
খ. এ অঞ্চলের আয়তন মেরুদ্বয়ের আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশি।
গ. ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থান পরিবর্তিত হয়।

○ প্রশ্ন-১০. মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় কাকে বলে? এ বলয়ের বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

উত্তর : দু'মেরুর নিকটবর্তী স্থানে অত্যধিক শীতের জন্য বায়ু সর্বদা শীতল ও ভারী হয়। ফলে মেরু অঞ্চলে দুটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ দুটিকে মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় বলে। এ উচ্চচাপ বলয়দ্বয় হতে বায়ু মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।

মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ অঞ্চল আয়তনে ছোট বলে এখানে বায়ুর চাপ তুলনামূলক বেশি।
খ. সূর্যকিরণের প্রখরতা নেই বলে এখানকার বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকে না।
গ. অতিরিক্ত শৈত্যের জন্য এ অঞ্চলের বাতাস সর্বদাই ভারী।

○ প্রশ্ন-১১. নিয়ত বায়ুপ্রবাহ কাকে বলে? এর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

উত্তর : পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ প্রধানত চাপ বলয়ের ওপর নির্ভরশীল। যে বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বছরের সকল সময় নির্দিষ্ট দিকে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বলে। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ তিন প্রকার। যথা : ১. অয়ন বায়ু, ২. পশ্চিমা বায়ু বা প্রত্যয়ন বায়ু ও ৩. মেরু বায়ু।

○ প্রশ্ন-১২. সাময়িক বায়ু কাকে বলে? সাময়িক বায়ু কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : দিনের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অথবা বছরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে যে বায়ুপ্রবাহ জল ও স্থলভাগের তাপের তারতম্যের জন্য সৃষ্টি হয় তাকে সাময়িক বায়ু (Periodical wind) বলে। সাময়িক বায়ু তিন প্রকার। যথা : ১. মৌসুমী বায়ু, ২. স্থলবায়ু ও ৩. সমুদ্র বায়ু। এছাড়া পার্বত্য বায়ু ও উপত্যকা বায়ুও সাময়িক বায়ুর অন্তর্গত।

○ প্রশ্ন-১৩. বৃষ্টিপাত কাকে বলে? বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করুন।

উত্তর : জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উর্ধ্বাকাশে উত্থিত হলে এটা শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘের মধ্যে অসংখ্য পানিকণা ও বরফকণা থাকে। এসব পানি ও বরফকণা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে বড় পানির কণায় পরিণত হয়। এসব বড় কণা এক সময় পৃথিবীর আকর্ষণের টানে পানির ফোঁটা হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে। একে বৃষ্টিপাত বলে। বৃষ্টিপাত চার প্রকার। যথা : ১. পরিচলন বৃষ্টি, ২. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, ৩. ঘূর্ণি বৃষ্টি ও ৪. সংঘর্ষ বৃষ্টি।

○ প্রশ্ন-১৪. পরিচলন বৃষ্টিপাত কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : নিরক্ষীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত সূর্যকিরণের ফলে বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে এবং প্রসারিত হয়। ফলে সহজেই বায়ু শীতল হয়ে পড়ে। এভাবে বায়ুর তাপ হ্রাসের ফলে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে পরিচলন বৃষ্টি বলে।

বৈশিষ্ট্য :

ক. এক ধরনের বৃষ্টি স্বল্প সময় ধরে হয়।
খ. বজ্র ও বিদ্যুৎসহ বৃষ্টিপাত হয়।
গ. সারাবছর ধরে প্রায় একইভাবে এবং একই পরিমাণ বৃষ্টি হয়।
ঘ. মুষলধারে বৃষ্টি হয়।
ঙ. সাধারণত বিকালের দিকে বৃষ্টিপাত হয়।

○ প্রশ্ন-১৫. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি?

উত্তর : জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উঁচু পাহাড় বা পর্বতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে এবং শীতল হয়ে পর্বতের প্রতিবাদ ঢালে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে। পর্বতের অপর পাশের বায়ু শুষ্ক হওয়ায় বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। একে বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল বা অনুবাত ঢাল বলে।

বৈশিষ্ট্য :

ক. ভূমির বন্ধুরতার জন্য এ ধরনের বৃষ্টি হয়ে থাকে।
খ. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি সাধারণত ঋতুভিত্তিক হয়।
গ. ঝড় বা বজ্রপাত হয় না বললেই চলে।
ঘ. মুষলধারে হয়ে থাকে তবে মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়।
ঙ. পাহাড়ের বাধার কারণে উৎপন্ন হয় বলে পাহাড়িয়া বৃষ্টিও বলা হয়।

○ প্রশ্ন-১৬. সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত কি? এ ধরনের বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ মুখোমুখি হলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শিশিরাঙ্কে পৌছায়। এটি আরো ঘনীভূত হয়ে বায়ুপুঞ্জের সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এটি সংঘর্ষ বৃষ্টি নামে পরিচিত। এ প্রকার বৃষ্টিপাত সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় দেখা যায়।

বৈশিষ্ট্য :

ক. সাধারণত শীতকালে এ ধরনের বৃষ্টি হয়ে থাকে।
খ. একটানা কয়েকদিন ঝিরঝির বৃষ্টি হয়।
গ. বৃষ্টির ধারা খুব তীব্র নয়।
ঘ. বৃষ্টিপাত ৩৫°– ৬৫° উভয় অক্ষাংশের মধ্যে সংঘটিত হয়।

○ প্রশ্ন-১৭. বারিমণ্ডল কিভাবে বায়ুমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর : বিশাল জলরাশিতে পরিপূর্ণ ভূত্বকের অবনমিত অংশই বারিমণ্ডল। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশ এলাকা জুড়ে বারিমণ্ডল বিস্তৃত। আয়তনের বিশালতার কারণে এটি বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপ, আর্দ্রতা

ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। বারিমণ্ডলের নিকটবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন এবং বারিমণ্ডলের দূরবর্তী স্থানের বায়ু চরমভাবাপন্ন হয়। বারিমণ্ডলের শীতল ও উষ্ণ পানির স্রোত উপকূলবর্তী অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের তাপের সমতা বণ্টনে বারিমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

○ প্রশ্ন-১৮. কি কি কারণে বায়ুচাপের তারতম্য ঘটে?

উত্তর : বায়ুচাপের তারতম্যের কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো : ১. উচ্চতা, ২. উষ্ণতা, ৩. জলীয়বাষ্প, ৪. বায়ুর গভীরতা, ৫. পৃথিবীর গতিসমূহ।

উপরিউক্ত কারণগুলোর জন্যই সাধারণত বায়ুচাপের তারতম্য হয়ে থাকে।

সুতরাং বলা যায়, বারিমণ্ডল বায়ুমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করে।

○ প্রশ্ন-১৯. উপকূলে আঘাত হানার পর সাইক্লোন দুর্বল হয়ে পড়ে কেন?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলের নিম্নচাপজনিত সংকট থেকে উদ্ভূত গোলযোগই হলো সাইক্লোন। গভীর সমুদ্রে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়। যেহেতু সাইক্লোন উদ্ভবের জন্য উষ্ণ এবং আর্দ্র বায়ুর প্রয়োজন, সে কারণে উপকূলে আঘাত হানার পরে স্থলভাগের কিছুদূর গিয়ে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর অভাবে সাইক্লোন সাধারণত দুর্বল হয়ে পড়ে।

○ প্রশ্ন-২০. একটি সাইক্লোনের কেন্দ্রের চাপ বাইরের চাপের তুলনায় কম না বেশি?

উত্তর : সাইক্লোন কেন্দ্রের চাপ বাইরের তুলনায় কম। সাইক্লোন কেন্দ্রের বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে এবং আশপাশের বায়ু সে শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসলে সাইক্লোনের সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বায়ু ওপরে ওঠে যায় বলে সাইক্লোনের কেন্দ্রের চাপ বাইরের চাপের তুলনায় কম হয়।

○ প্রশ্ন-২১. মানবদেহের ওপর বায়ুচাপ কত? মানুষ তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে?

উত্তর : ১৬ বর্গফুট ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট স্বাভাবিক আকারের একজন মানুষের ওপর বায়ুর চাপ ১৫.১ টন বা ৪১৩ মণ (প্রায়)। এটি মানুষের জন্য সহনাতীত। মানবদেহের ওপর বায়ুমণ্ডলের চতুর্দিকের চাপ সমান। চতুর্দিকের বায়ুর চাপ সমান হওয়ায় একদিকের চাপ অপরদিকের চাপকে নিষ্ক্রিয় করে। মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে এবং শরীরের চামড়ার লোমকূপের মধ্য দিয়ে সর্বদা বায়ু দেহের ভিতর প্রবেশ করে। ফলে ভিতরের বায়ু ওপরের বায়ুর চাপকে নিষ্ক্রিয় করে। এভাবে বায়ুর প্রচণ্ড চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে মানুষের সহনীয় পর্যায়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-২২. বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের ভূমিকা কি?

উত্তর : অক্সিজেনের ভূমিকা :

১. জীবনধারণের জন্য অক্সিজেন প্রয়োজন। জীবের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং বিপাকে অক্সিজেন প্রয়োজন হয়।
২. কৃত্রিম O_2, মুমূর্ষু রোগীর জন্য এবং অক্সি-অ্যাসিটিলিন শিখা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
৩. জ্বালানি বা আগুন জ্বলতে O_2 লাগে।

কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভূমিকা :

১. সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য তৈরিতে উদ্ভিদের কার্বন ডাই-অক্সাইড অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান।
২. বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেড়ে যাওয়ায় মেরু প্রদেশের জমাট বরফ গলে গিয়ে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে, ফলে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে যাবে।

নাইট্রোজেনের ভূমিকা :

১. পরিবেশকে নিষ্ক্রিয় বা স্বাভাবিক রাখতে নাইট্রোজেন প্রয়োজন হয়।
২. উদ্ভিদের খাদ্যসার হিসেবে নাইট্রোজেন ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২৩. যতই ওপরে ওঠা যায় ততই বায়ুর তাপ হ্রাস পায় কেন?

উত্তর : বায়ুর তাপের মূল উৎস সূর্য হলেও বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে অধিকতর তাপ সংগ্রহ করে উত্তপ্ত হয়। পরে এ তাপ ধীরে ধীরে ঊর্ধ্ব স্তবের বায়ুকে উত্তপ্ত করে। এ কারণে নিচের বায়ুস্তরে তাপমাত্রা সর্বাধিক এবং ওপরের দিকে ক্রমশ তাপ কম। বায়ুর নিম্নস্তরে ধূলিকণা, জলীয়বাষ্প ও অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান অধিক থাকায় সেখানকার বায়ু ঘন কিন্তু ক্রমে ওপরের দিকে এসব উপাদান কম থাকায় সেখানকার বায়ু ক্রমেই পাতলা থাকে। বায়ু যত বেশি ঘন তার তাপধারণ ক্ষমতাও তত অধিক। এ কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় তাপ ততই হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ১০০০ মি. উচ্চতায় বায়ুর তাপ প্রায় ৬° সেলসিয়াস হ্রাস পায়।

○ প্রশ্ন-২৪. 'সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ সবচেয়ে বেশি'–কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বায়ু নিচ থেকে ওপরের দিকে স্তরে স্তরে সজ্জিত থাকে। সমুদ্র সমতল অর্থাৎ নিম্নস্তরে বায়ুর চাপ সবচেয়ে বেশি হয়। কারণ বায়ুর নিম্নস্তরে উপরিস্থিত সকল বায়ুস্তরের ওজন তার ওপর পড়ে। এ কারণে সমুদ্র সমতল থেকে যতই ওপরে ওঠা যায় ততই বায়ুস্তরের গভীরতা ও ওজন কমতে থাকে। ফলে সমুদ্র সমতলে বায়ুর চাপ বেশি থাকে এবং সেখান থেকে ওপরের দিকে চাপ ক্রমেই কমতে থাকে। অপরদিকে গ্রীষ্মকালে বাতাস দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের জলভাগ থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্পসহ প্রবাহিত হয় বলে এ বায়ুর দ্বারা প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বায়ুর চাপের মান মিলিবারে (mb) দেখানো হয়। সমুদ্র সমতলে ৬.৪৫ বর্গ সেমি পরিমিত স্থানে বায়ুর চাপ ৬.৭ কেজি প্রায়।

○ প্রশ্ন-২৫. ওপরের বায়ুস্তর অপেক্ষা নিচের বায়ুস্তর ঘন কেন?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে একটি স্তরের ওপর আর একটি বায়ুস্তর রয়েছে এবং ওপরের বায়ুস্তর নিচের বায়ুর স্তরের ওপর অবিরত চাপ দিচ্ছে। ফলে ওপরের বায়ুস্তর অপেক্ষা নিচের বায়ুস্তর খুবই ঘন। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। এছাড়া বায়ুর নিম্নস্তরে ধূলিকণা, জলীয়বাষ্প ও অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান অধিক থাকায় ওপরের বায়ু অপেক্ষা নিচের বায়ু বেশি ঘন।

○ প্রশ্ন-২৬. বনভূমি এলাকায় বেশি বৃষ্টিপাত হয় কেন?

উত্তর : বনভূমি অঞ্চলের মাটিতে সূর্যের তাপ খুব অল্প প্রবেশ করতে পারে। ফলে সেখানে ছায়া থাকে বলে সেখানকার মাটি সর্বদা আর্দ্র থাকে। এছাড়া বনভূমি অঞ্চলে গাছপালা প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি প্রস্বেদনের মাধ্যমে বায়ুতে ছেড়ে দেয়। বাষ্পীভবন বায়ুর আর্দ্রতা বাড়িয়ে দেয়। ফলে বনভূমি এলাকার বায়ু শীতল থাকে এবং সেখানে অধিক বৃষ্টিপাত হয়। আবার জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু আর্দ্র বনভূমি অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় আরো শীতল হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এসব কারণেই বনভূমি এলাকায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

○ প্রশ্ন-২৭. নিরক্ষীয় এলাকায় পরিচলন বৃষ্টিপাত হয় কেন?

উত্তর : নিরক্ষরেখার ৫°–১০° উত্তর-দক্ষিণে সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এ অঞ্চলে জলরাশির পরিমাণও বেশি। ফলে ভূপৃষ্ঠের বায়ু উষ্ণ হলে প্রচুর জলীয়বাষ্পসহ ওপরে ওঠে শীতল হয় এবং ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ অবস্থায় চারপাশের শীতল ও ভারী বায়ু উষ্ণ অঞ্চলে এসে বায়ু চাপের সমতা রক্ষা করে এবং পরবর্তীতে সে বায়ু আবার উষ্ণ হয়ে জলীয়বাষ্পসহ ওপরে ওঠে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ কারণে পরিচলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উষ্ণতার বিনিময় হয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারাবছর পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়। এ অঞ্চলে প্রতিদিন বিকালে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ গড়ে ২০০ সেন্টিমিটার।

○ প্রশ্ন-২৮. শীতকালীন মৌসুমী বায়ুর কারণে বৃষ্টিপাত হয় না, কিন্তু গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী বায়ুর কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় কেন?

উত্তর : শীতকালে মৌসুমী বায়ু অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থলভাগ থেকে জলভাগের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে জলভাগ থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। এ কারণে এ বায়ুর দ্বারা সাধারণত শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না, কিন্তু গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল তখন সূর্য মকরক্রান্তির ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ সময় এশিয়া অঞ্চল অত্যন্ত শীতল হয়ে পড়ে এবং বাতাস উত্তর-পূর্ব দিকের স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত হয় বলে এ বায়ু দ্বারা বৃষ্টিপাত হয় না। তবে এ ব্যাপারটি শুধু এশিয়া অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য।

○ প্রশ্ন-২৯. নিরক্ষীয় এলাকায় তাপমাত্রা বেশি –ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ভূপৃষ্ঠকে বেষ্টন করে যে রেখাটি পৃথিবীর দু'মেরুর ঠিক মধ্যস্থল দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে অতিক্রম করেছে তাকেই নিরক্ষরেখা বলা হয়। এ অঞ্চলে মধ্যাহ্নে সূর্যের কিরণ বছরের মধ্যে দু'দিন (২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টেম্বর) ঠিক লম্বভাবে এবং অন্যান্য সময়েও প্রায় লম্বভাবে পড়ে। এ কারণেই নিরক্ষীয় এলাকায় সারাবছর তাপমাত্রা বেশি থাকে।

○ প্রশ্ন-৩০. ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশকে গর্জনশীল চল্লিশা বলে–ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগ বেশি বলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর গতি ও বেগ পরিবর্তিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে স্থলভাগ কম থাকায় উত্তর-পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ু অবাধে জলভাগের ওপর দিয়ে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়। ইউরোপীয় নাবিকরা একে প্রবল পশ্চিমা বায়ু (Brave West Wind) বলে থাকেন। দক্ষিণ গোলার্ধের ৪০°-৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশে সমুদ্রের ওপর দিয়ে এ বায়ু বেশ জোরে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হয় বলে একে 'গর্জনশীল চল্লিশা' (Roaring Forties) বলে। কারণ দক্ষিণ গোলার্ধের বিশাল জলরাশি এ বায়ুর গতিপথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। গর্জনশীল চল্লিশা সারাবছর ঝটিকাশঙ্কুল থাকে বলে পারতপক্ষে বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজগুলো এর নিকটবর্তী হয় না।

○ প্রশ্ন-৩১. উপকূলীয় এলাকায় জলবায়ু সমভাবাপন্ন কেন?

উত্তর : সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চল সামুদ্রিক আবহাওয়া দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। ফলে সমুদ্রের নিকটবর্তী উপকূলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন থাকে। কারণ সমুদ্র থেকে প্রবাহিত আর্দ্র বায়ু শীতকালে বায়ুকে উষ্ণ ও গরমকালে বায়ুকে ঠাণ্ডা রাখে।

○ প্রশ্ন-৩২. অয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু কি?

উত্তর : নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় থেকে উষ্ণ ও হালকা বায়ু ওপরে উঠে গেলে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চ চাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারী বায়ু নিরক্ষীয় নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্রানুসারে, এ বায়ু উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে পাল চালিত বাণিজ্য জাহাজগুলো এ বায়ুপ্রবাহের দিক অনুসরণ করে যাতায়াত করতো বলে একে আয়ন বায়ু বা বাণিজ্য বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে এটি উত্তর-পূর্ব আয়ন বায়ু এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু নামে পরিচিত।

○ প্রশ্ন-৩৩. সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় কি?

উত্তর : অনিয়মিত বায়ুপ্রবাহের একটি ফল হচ্ছে ঘূর্ণিঝড়। বায়ুমণ্ডলে বাতাসের ঘূর্ণনের দিক যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকের সদৃশ হয় তবে তাকে সাইক্লোন (Cyclone) বলে। ভূপৃষ্ঠের কোনো অল্প

পরিসর স্থানে বায়ুচাপ থাকে। ফলে চাপের সমতা রক্ষার্থে চারদিকের শীতল উচ্চচাপ বিশিষ্ট অঞ্চল থেকে শীতল ও ভারী বায়ু প্রবলবেগে ঘুরতে ঘুরতে নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে। নিম্নচাপ কেন্দ্রে প্রবেশ করে এ বায়ু উত্তপ্ত বায়ুর সাথে মিশে উষ্ণ ও হালকা হয়ে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠতে থাকে বা যে কোনো দিকে প্রবাহিত হয়। এরূপ বায়ু প্রবাহই ঘূর্ণিঝড় নামে পরিচিত। উত্তর গোলার্ধে এটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার গতিতে ঘুরে থাকে।

○ প্রশ্ন-৩৪. সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণিবিভাগগুলো কি কি?

উত্তর : সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়কে বেশকিছু শ্রেণিতে বিভক্ত করে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়। তাদের শ্রেণিবিভাগ মূলত বাতাসের গতিবেগের উপর নির্ভর করে করা হয়। বাতাসের গতি বৃদ্ধির পরিমাপে ঘূর্ণিঝড়ের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

ক. লঘুচাপ	: বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৩১ কিলোমিটারের কম।
খ. সুস্পষ্ট লঘুচাপ	: বাতাসের গতি ৩১ কিলোমিটার থেকে ৪০ কিলোমিটার।
গ. নিম্নচাপ	: বাতাসের গতি ৪১ কিলোমিটার থেকে ৫০ কিলোমিটার।
ঘ. গভীর নিম্নচাপ	: বাতাসের গতি ৫১ কিলোমিটার থেকে ৬১ কিলোমিটার।
ঙ. ঘূর্ণিঝড়	: বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার থেকে ৮৮ কিলোমিটার।
চ. প্রবল ঘূর্ণিঝড়	: বাতাসের গতি ঘণ্টায় ৮৯ কিলোমিটার থেকে ১১৭ কিলোমিটার।
ছ. হারিকেন শক্তিসম্পন্ন প্রবল ঘূর্ণিঝড়	: বাতাসের গতি ঘণ্টায় ১১৭ কিলোমিটার বা তার উর্ধ্বে।

○ প্রশ্ন-৩৫. টর্নেডো কি?

উত্তর : স্থলভাগের সীমিত স্থানে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড়কে টর্নেডো (Tornedo) বলে। কাল-বৈশাখী ঝড়কে এ শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে। সাধারণত 'কিউমুলো-নিম্বাস' মেঘ থেকে টর্নেডো হয়ে থাকে। টর্নেডোর বাইরের ও ভিতরের বায়ুচাপের গড় পার্থক্য ২ ইঞ্চি। এ পার্থক্য ১ থেকে ৫ ইঞ্চি পর্যন্তও হতে পারে। টর্নেডোর পরিভ্রমণ পথের দৈর্ঘ্য কয়েকশ ফুট থেকে ১০-১৫ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। এদের স্থায়িত্ব কালও অতি অল্প; বড়জোর আধঘণ্টা। আকস্মিকভাবে বায়ুচাপের হ্রাস, দ্রুতবেগে বায়ুর আবর্তন এবং অত্যধিক উত্তোলন ক্ষমতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশে প্রায়শ চৈত্র-বৈশাখ মাসে টর্নেডো হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৩৬. বরিশাল কামান (Barisal Gun) কি?

উত্তর : সুন্দরবন অঞ্চলে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে মাঝে মাঝে দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পূর্ব থেকে কামানের গোলার আওয়াজের মতো এক প্রকার গুরুগম্ভীর শব্দ শোনা যেত। ইংরেজরা একে Barisal Gun বলে আখ্যায়িত করেছে। এ শব্দ এত দূর হতে আসে যে সাধারণের গোচরীভূত কোনো শব্দ ঐ ধরনের হতে পারে না। কোনো কোনো গবেষক বলেন, বঙ্গোপসাগরের অতল তল থেকে এ শব্দ উত্থিত হয়। বর্ষাকালে প্রবল বারিপাতের পর যেহেতু এ শব্দ শোনা যায়, সেহেতু জলপ্রবাহের সাথে এর কোনো সম্পর্ক আছে, এরূপ অনুমান করা যায়। Fergusson Beveride এবং Williams Adams প্রমুখ বিজ্ঞানীর মতে বর্ষাকালে জোয়ারের সময় সমুদ্রে প্রায় ৪০ হাত ঢেউ উঠতো এবং অনুরূপ দুটি ঢেউয়ের সংঘর্ষে ঐরূপ আওয়াজ শোনা যেত।

○ প্রশ্ন-৩৭. সমোষ্ণরেখা কি?

উত্তর : বায়ুর সমতাপ সম্পন্ন বিন্দুগুলোকে মানচিত্রের ওপর সংযুক্তকারী কাল্পনিক রেখাকে সমোষ্ণরেখা বলে। সমোষ্ণরেখা একটি সময়ের সব বিন্দুর তাপমাত্রা অথবা বহুদিন বা একবছরের মধ্যে কয়েক মাসের গড় তাপমাত্রা প্রকাশ করে। বায়ুর তাপমাত্রার বণ্টন দেখানোর জন্য সমোষ্ণরেখা ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৩৮. সমচাপ রেখা কি?

উত্তর : যেসব স্থানে বায়ুমণ্ডলীয় গড় চাপ সমান সেসব স্থান সংযোগকারী কাল্পনিক রেখাকে সমচাপ রেখা বলে।

অন্যভাবে বলা যায়, বছরের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বায়ুর চাপ নির্ণয় করে সমান চাপের স্থানগুলোকে এক একটি কল্পিত রেখা দ্বারা যোগ করা হয়। এ রেখাও লোকে সমপ্রেষ বা সমচাপ রেখা (Isobar) বলে।

○ প্রশ্ন-৩৯. নিম্নচাপ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : আমরা জানি কোনো স্থানের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেখানকার বায়ু প্রসারিত হয়ে হালকা হয়ে যায় এবং চাপ কমে যায়। বায়ুচাপের এই হ্রাস পাওয়াকেই নিম্নচাপ বলে। নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে চারিদিকের শীতল ভারী বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবল বেগে ছুটে আসে। এ বায়ু সমুদ্রের বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প বয়ে আনে এবং বৃষ্টিপাত, ঝড় ইত্যাদি ঘটায়। বিভিন্ন কারণে এ নিম্নচাপ অঞ্চলটি স্থান পরিবর্তন করলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতসহ ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-৪০. ব্যারোমিটারের সাহায্যে কিভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস পাওয়া যায়?

উত্তর : বায়ুর চাপ মাপার যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার। ব্যারোমিটারের সাহায্যে কোনো স্থানের বায়ুর চাপের পরিবর্তন হিসাব করে ঐ স্থানের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়। যথা :

ক. ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা বেশ খানিকটা নেমে গেলে ধরে নিতে হবে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা।

খ. পারদ স্তম্ভের উচ্চতা ক্রমশ কমতে থাকলে খারাপ আবহাওয়া বা বৃষ্টির পূর্বাভাস।

গ. পারদ স্তম্ভের উচ্চতা হঠাৎ নেমে গেলে ধরে নিতে হবে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। ঝড়ের পূর্বাভাস।

ঘ. ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে ধরতে হবে বায়ুতে জলীয়বাষ্প হ্রাস পাচ্ছে। ভালো আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

ঙ. ব্যারোমিটারের পারদ স্তম্ভের উচ্চতা দ্রুত হ্রাস পেলে ধরতে হবে ক্ষণস্থায়ী ভালো আবহাওয়ার পূর্বাভাস।

○ প্রশ্ন-৪১. মৌসুমী বায়ু বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : মৌসুমী আরবি শব্দ। এর অর্থ ঋতু। ঋতুভেদে যে বায়ু প্রবাহিত হয় বা ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে বায়ুর দিক পরিবর্তন হয়, তাকে মৌসুমী বায়ু বলে। মৌসুমী বায়ুর সৃষ্টি হয় শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে, বিশাল জলভাগ ও স্থলভাগের উপরকার বায়ুর তাপমাত্রা এবং চাপের পার্থক্যের কারণে। মৌসুমী বায়ু হলো সমুদ্রবায়ু ও জলবায়ুর ব্যাপক সংস্করণ যা আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশ, মিয়ানমার, দক্ষিণ চীন, ভারত, পাকিস্তান, তাইওয়ান, জাপান, ভিয়েতনাম, উত্তর অস্ট্রেলিয়া, কম্বোডিয়া, লাওস প্রভৃতি অঞ্চল মৌসুমী বায়ুর অন্তর্গত।

খ বারিমণ্ডল Hydrosphere

○ প্রশ্ন-১. বারিমণ্ডল কি?

উত্তর : যে বিশাল পানি রাশি দ্বারা ভূত্বকের নিচু অংশগুলো পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে বারিমণ্ডল বলে। বারিমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১ ভাগ স্থান দখল করে রয়েছে। এর আয়তন প্রায় ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

○ প্রশ্ন-২. মহাসাগর (Ocean) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ পানিরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে।

○ প্রশ্ন-৩. সাগর ((Sea), উপসাগর (Bay) এবং হ্রদ (Lake) কি?

উত্তর : মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট পানিরাশিকে সাগর (Sea) এবং তিনদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে উপসাগর (Bay) এবং চারদিকে সম্পূর্ণভাবে স্থল দ্বারা বেষ্টিত প্রাকৃতিক পানিরাশিকে হ্রদ (Lake) বলে।

○ প্রশ্ন-৪. আয়তন ও গভীরতা উল্লেখসহ পাঁচটি মহাসাগরের নাম লিখুন।

উত্তর : মহাসাগরের আয়তন ও গড় গভীরতা

মহাসাগর	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	গড় গভীরতা (মিটার)
প্রশান্ত	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪,২৭০
আটলান্টিক	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩,৯৩২
ভারত	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩,৯৬২
উত্তর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৮২৪
দক্ষিণ	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯

○ প্রশ্ন-৫. সমুদ্রস্রোতের কারণগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : মহাসাগরের ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে পানির প্রবাহকে মহাসাগরীয় স্রোত বা সমুদ্রস্রোত বলে। নিচে সমুদ্রস্রোতের কারণগুলো আলোচনা করা হলো :

i. **বায়ুপ্রবাহ :** প্রবল নিয়ত বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্রের ওপরের স্তরের পানিরাশিকে একই দিকে চালিত করে। অয়নবায়ু প্রবাহিত এলাকায় সমুদ্রস্রোত পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত এলাকায় সমুদ্রস্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

ii. **উষ্ণতার তারতম্য :** অধিক উত্তাপে নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের পানি বেশি উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বেড়ে যায়, হালকা হয় এবং এর ঘনত্ব কমে যায়। কিন্তু উচ্চ ও মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলো উত্তাপ কম পায় বলে সেখানে সমুদ্রের পানি ভারী হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও হালকা পানি শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এ শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী পানি অন্তঃপ্রবাহরূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।

iii. **লবণাক্ততার তারতম্য :** লবণাক্ততার ওপর পানির ঘনত্ব নির্ভর করে। লবণাক্ততা কম হলে পানি হালকা হয় এবং লবণাক্ততা বেশি হলে পানি ভারী হয়। হালকা পানি বহিঃস্রোত হিসেবে এবং ভারী পানি অন্তঃস্রোত হিসেবে প্রবাহিত হয়।

iv. **বাষ্পীভবনের তারতম্য :** সমুদ্রের অধিক উত্তাপবিশিষ্ট এলাকায় বাষ্পীভবন বেশি হয়, ফলে সেখানে পানির উচ্চতা কমে যায়। কাছাকাছি কম উত্তপ্ত এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা পানি অধিক উত্তাপবিশিষ্ট এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানির সমতা রক্ষা করে।

v. **গভীরতার তারতম্য :** অগভীর সমুদ্রের পানি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত ও হালকা হয় এবং ওপরে ওঠে আসে। তখন ওপরে ওঠে আসা পানির স্থান পূরণের জন্য শীতল নিম্নগামী একটি পানির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ফলে সমুদ্রে ঊর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্রোতের সৃষ্টি হয়।

vi. **পৃথিবীর আবর্তন :** পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এর ফলে সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

vii. **স্থলভাগের অবস্থান :** সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় সামনে কোনো স্থলভাগ থাকলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এর স্রোত দিক পরিবর্তন করে নতুন পথে প্রবাহিত হয়।

viii. **শৈলশিরার অবস্থান :** সমুদ্রের তলদেশে শৈলশিরার অবস্থানের ফলে অন্তঃস্রোতের গতিকে প্রতিহত করে। শীতল আন্তঃস্রোত শৈলশিরা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উষ্ণ অঞ্চলে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে শৈলশিরা উভয়পক্ষের তলদেশে পানির লবণাক্ততা, ঘনত্ব ইত্যাদির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ঘটে, যা পৃষ্ঠস্রোতের গতিপ্রকৃতির ওপর প্রভাব ফেলে।

উপরোক্ত বিভিন্নমুখী কারণে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

○ প্রশ্ন-৬. জোয়ার-ভাটা কাকে বলে এবং এর ফলাফল কি?

উত্তর : চন্দ্র ও সূর্য ভূপৃষ্ঠের পানি ও স্থলভাগকে অবিরাম আকর্ষণ করছে। এ আকর্ষণের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠের পানি প্রত্যহ নিয়মিত স্থানবিশেষে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। পানির এ ফুলে ওঠা বা স্ফীতিকে জোয়ার (High Tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাটা (Low Tide) বলে।

জোয়ার-ভাটার ফলাফল :

i. জোয়ার-ভাটা নদীর মোহনা হতে স্রোতের সাথে পরিবাহিত তলানি অপসারিত করে, নদীমুখ জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখে।
ii. জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর স্রোতের দিক পরিবর্তিত হয়।
iii. এর ফলে নৌ চলাচলের সুবিধা হয়।

○ প্রশ্ন-৭. তেজ কটাল ও মরা কটাল কাকে বলে?

উত্তর : তেজ কটাল : অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে একই সরলরেখায় থাকে বলে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই দিক থেকে একই সাথে কার্যকর হয়। উভয়ের মিলিত আকর্ষণ প্রবল বেগে কাজ করে। তাই ঐদিন চন্দ্র ও সূর্যের দিকে পূর্ণিমার দিন অপেক্ষাও পানি বেশি ফুলে ওঠে। অর্থাৎ প্রচণ্ড জোয়ার হয়। এ জোয়ারকেই তেজ কটাল বলে। আবার পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর একদিকে চন্দ্র এবং অপরদিকে সূর্য সরলরেখায় থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, সূর্যের আকর্ষণে সেখানে গৌণ জোয়ার হয়। আবার চন্দ্রের বিপরীত দিকে যেখানে গৌণ জোয়ার হয় সেখানেই সূর্যের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয়। সেজন্য পূর্ণিমায় উক্ত দু স্থানে প্রবল জোয়ার হয়। একেও তেজ কটাল বলে।

মরা কটাল : অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য একই সরলরেখায় না থেকে উভয়েই পৃথিবীর সাথে সমকোণে অবস্থান করে। ঐ দিন তারা পৃথিবীকে আড়াআড়িভাবে আকর্ষণ করে বলে জোয়ারের বেগ অনেক কম হয়। একে মরা কটাল বলে।

○ প্রশ্ন-৮. দিনে দু'বার জোয়ার-ভাটা হয় কেন?

উত্তর : জোয়ার-ভাটা হয় মূলত সমুদ্রের পানির ওপর চন্দ্রের আকর্ষণের কারণে। অবশ্য সূর্যের আকর্ষণও অল্প প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণভাবে যদিও বলা হয় যে, চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে, আসলে কিন্তু একটি ভরকেন্দ্রের চারিদিকে পৃথিবী ও চাঁদ দুটোই ঘুরছে। এ ঘূর্ণনজাত কেন্দ্রাতিক বলের ফলে পৃথিবী চাঁদ থেকে দূরে সরে যেতে চাচ্ছে আর তার বিপরীতে কাজ করছে চাঁদের আকর্ষণ। পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ চাঁদের দিকে থাকে সেদিকে চাঁদের আকর্ষণ কেন্দ্রাতিক বলের চেয়ে বেশি বলে সেখানকার পানি ফুলে উঠে জোয়ারের সৃষ্টি করে। একই সময় পৃথিবীর অপরদিকে চাঁদের আকর্ষণ কেন্দ্রাতিক বলের চেয়ে কম বলে সেখানকার পানিও ফুলে ওঠে। এ সময় দুটি পৃষ্ঠের লম্বভাবে অবস্থিত স্থানে চলে ভাটা। এই কারণেই কোনো স্থানে দিনে দু'বার জোয়ার-ভাটা হয়।

○ প্রশ্ন-৯. প্রবাল দ্বীপ কি?

উত্তর : অসংখ্য প্রবাল কীট দিয়ে তৈরি প্রবাল দ্বীপ এক ধরনের প্রবাল প্রাচীর। এটি সমুদ্রের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে গঠিত হয়। প্রবাল দ্বীপগুলো স্থলভাগ থেকে বহুদূরে অথচ সমুদ্রের অগভীর অংশে গঠিত হয়। এর উপরিভাগ সাধারণত সমতল হয় যার ওপর প্রচুর পরিমাণে বালু সঞ্চিত হয়ে অনেকটা মালভূমির মতো সৃষ্টি করে। শৈবাল প্রবাল কীটগুলোর সঞ্চয় কাজে বিশেষ সহায়তা করে। শৈবালও অনুরূপ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং সমুদ্রের পানি থেকে চুন জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ করে। আর এভাবেই শৈবাল ও প্রবালের মাধ্যমে গড়ে ওঠে প্রবাল দ্বীপ।

○ প্রশ্ন-১০. ডেল্টা (ব-দ্বীপ) কি?

উত্তর : ব-দ্বীপ নদীর মোহনায় অধঃক্ষেপণজনিত তলানির (Sediment) স্থিতি। নদীর বেগ ক্রমাগত কমতে কমতে মোহনায় এসে পরিণত রূপ লাভ করে। মোহনাতে নদীর উপত্যকা সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। স্রোতের বেগও একেবারে কমে যায়। ফলে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ, পলিমাটি, সূক্ষ্ম বালিকণা প্রভৃতি হালকা পদার্থ নদীর মোহনায় সঞ্চিত হতে থাকে। বছরের পর বছর এ সব পদার্থ স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে নদীর তলদেশ ক্রমাগত উঁচু হয়ে নদী উপত্যকায় নতুন ভূ-খণ্ড গঠিত হয়। এভাবে গঠিত ভূ-খণ্ড আরো উঁচু হলে নদীর মুখ বন্ধ হয়ে স্রোত ব্যাহত হয়। নিজ সৃষ্ট এ ভূ-খণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নদীর স্রোত দিক পরিবর্তন করে এবং শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। নতুন গঠিত ভূ-খণ্ডের দুপাশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হওয়ায় মোহনাস্থিত এ ভূ-খণ্ডের দু'পাশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে ভূ-খণ্ডটি ত্রিকোণাকৃতির মাত্রাহীন বাংলা 'ব' অক্ষরের মতো দেখায় বলে এগুলোকে ব-দ্বীপ বলা হয়। বাংলাদেশ গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় গড়ে ওঠা একটি বড় ব-দ্বীপ।

○ প্রশ্ন-১১. ব্যারিয়ার দ্বীপ কি?

উত্তর : ব্যারিয়ার দ্বীপ (Barrier Island) হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় দীর্ঘ কিন্তু সরু পলিস্তর যা মূল ভূ-খণ্ড থেকে জলাভূমি বা উপসাগর দ্বারা বিচ্ছিন্ন। এ ধরনের ব্যারিয়ার দ্বীপগুলো সাধারণত প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্যের কয়েক গুণ বেশি বড় হয়ে থাকে এবং সবসময় সামুদ্রিক ঢেউয়ের প্রভাবে প্রভাবিত।

ব্যারিয়ার দ্বীপ বালি, তেল ও গ্যাসের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের উপকূলের ব্যারিয়ার দ্বীপ তেল-গ্যাস ক্ষেত্র এর অন্যতম উদাহরণ।

যে কোনো ব্যারিয়ার দ্বীপের আলোচনায় পারিপার্শ্বিকতা গুরুত্বপূর্ণ। উপকূলীয় অঞ্চলে যেসব ঘটনা নিয়ত ঘটে থাকে ব্যারিয়ার দ্বীপসমূহ তাতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

○ প্রশ্ন-১২. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড কি?

উত্তর : সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের একটি অতলস্পর্শী মহীখাত। সুন্দরবনের অদূরে মহীসোপান এলাকাকে দ্বিখণ্ডিত করে সাগরতলায় সৃষ্টি হয়েছে এ গভীর মহীখাত। দুবলা দ্বীপ থেকে

পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং Bengal Deep Sea Fan-এর উত্তরে অবস্থিত এটি। সমুদ্রের গভীরের দিকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

○ প্রশ্ন-১৩. নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতের বিবরণ দিন।

উত্তর : পৃথিবীর আবর্তন ও আয়ন বায়ুর প্রভাবে নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে দুটি উষ্ণ স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়। এ স্রোত দুটির নাম যথাক্রমে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত। এ দু'নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যভাগ দিয়ে একটি ক্ষীণ স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় একে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত বলে।

প্রশ্ন-১৪. শৈবাল সাগরের বর্ণনা দিন।

উত্তর : উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত, ক্যানারি স্রোত এবং উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের বৃত্তাকার বা ঘূর্ণ প্রবাহের ফলে এর মধ্যভাগে পানির আবর্তনের মধ্যে কোনো স্রোত প্রবাহিত হয় না। স্রোতহীন এ পানিতে ভাসমান আগাছা ও শৈবাল সঞ্চিত হয় ও কিছু জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। একে শৈবাল সাগর বলে। এরূপ সাগর উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরেও রয়েছে।

○ প্রশ্ন-১৫. ল্যাব্রাডর স্রোতের বিবরণ দিন।

উত্তর : উত্তর মহাসাগর থেকে আগত দুটি শীতল স্রোত গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের কাছে মিলিত হয়ে ল্যাব্রাডর স্রোতের সৃষ্টি করে। এ স্রোতটি নিউফাউন্ডল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পর উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপসাগরীয় স্রোতের গাঢ় নীল পানি এবং ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ পানি পাশাপাশি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় এদের মধ্যবর্তী সীমারেখা সুস্পষ্ট দেখা যায়। এ সীমারেখাকে 'হিমপ্রাচীর' বলে।

○ প্রশ্ন-১৬. সমুদ্রের পানি লোনা কেন?

উত্তর : কোটি কোটি বছর ধরে পানিচক্রের মাধ্যমে একই পানি স্থলভাগ ও সমুদ্রের মধ্যে ঘুরে চলছে। নদী-নালা তথা ভূত্বকের মধ্য দিয়ে পানি ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় লবণ দ্রবীভূত করে সমুদ্রে নিয়ে আসে। সমুদ্রের লবণ যেহেতু বাষ্পীভূত পানির সাথে পুনরায় স্থলভাগে ফিরে আসে না, সে জন্যই ক্রমে সমুদ্রের পানিতে লবণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি হয়ে স্বাদ লবণাক্ত হয়েছে। গড়ে ১০০০ কেজি সামুদ্রিক পানিতে ৩৫ গ্রাম লবণ বর্তমান। এছাড়া লবণ উৎপাদনকারী বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী এবং সমুদ্রতলে বিভিন্ন বিস্ফোরণ তথা অগ্ন্যুৎপাতের ফলেও সমুদ্রের পানি লোনা হয়।

○ প্রশ্ন-১৭. আটলান্টিক মহাসাগরের পানির রং সবুজ কেন?

উত্তর : সমুদ্রের পানিতে সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হলে সাধারণত পানির রং নীল দেখায়। আটলান্টিক মহাসাগরে প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ জন্মায়। এগুলো পঁচে এর থেকে এক ধরনের হলুদ রং বের হয়। এ রং এবং সমুদ্রের স্বাভাবিক নীল– এ দুয়ে মিলে আটলান্টিকের পানি সবুজ দেখায়।

○ প্রশ্ন-১৮. সেতুবন্ধ কাকে বলে?

উত্তর : প্রণালীর মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত কল্পিত সেতু যা দুই অঞ্চলকে যুক্ত করেছে বলে মনে করা হয় তাকে সেতুবন্ধ বলে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝে পক প্রণালী অবস্থিত যা আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরকে যুক্ত করেছে। এ দু'দেশের মাঝে রামেশ্বর দ্বীপ, মান্নার দ্বীপ এবং আরো অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ রয়েছে যেগুলো সেতুর মতো অবস্থিত। এটি একটি সেতুবন্ধ। এ সেতুবন্ধের দৈর্ঘ্য ৩৪ কিলোমিটার।

○ প্রশ্ন-১৯. অশ্ব অক্ষাংশ কাকে বলে?

উত্তর : ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে দুটি ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় অবস্থিত। বায়ু নিম্নগামী বলে এ অঞ্চলে অনুভূমিক বায়ুপ্রবাহ অনুভব করা যায় না। প্রাচীনকালে যখন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে জাহাজযোগে ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করা হতো। তখন এ অঞ্চলে পৌছালে বায়ুপ্রবাহের অভাবে পাল চালিত জাহাজের গতি মন্থর বা পুরো নিশ্চল হয়ে পড়তো। এ অবস্থায় নাবিকরা খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে অনেক সময় ঘোড়াগুলো সমুদ্রে ফেলে দিত। এজন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত অঞ্চলকে অশ্ব অক্ষাংশ বলে।

○ প্রশ্ন-২০. বায়ুতে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কি? বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণগুলো কি কি?

উত্তর : বায়ুতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের স্বাভাবিক পরিমাণ হলো :

i. নাইট্রোজেন : ৭৮.০২ শতাংশ;
ii. অক্সিজেন : ২০.৭১ শতাংশ এবং
iii. কার্বন ডাই-অক্সাইড : ০.০৩ শতাংশ।

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণসমূহ নিম্নরূপ— ১. বনাঞ্চল ধ্বংস; ২. জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার; ৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধি; ৪. দৈনন্দিন গৃহস্থালির রান্না-বান্না; ৫. শিল্পকারখানা ও পরিবহনের সংখ্যা বৃদ্ধি।

○ প্রশ্ন-২১. Pasteurization কি এবং কিভাবে করা হয়?

উত্তর : Pasteurization (পাস্তুরায়ন) : পাস্তুরায়ন অর্থ আংশিক নির্জীব। কোনো তরল খাদ্য বা পানীয় বিশেষত দুধকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে হঠাৎ তাপমাত্রা নামিয়ে জীবাণু ধ্বংস করার মাধ্যমে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে Pasteurization বা পাস্তুরায়ন বলে। ফরাসি বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম এ পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন।

পাস্তুরায়ন প্রক্রিয়া : দুধকে পাস্তুরিত করার জন্য ৬২.৮° সে. তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট যাবৎ উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়, এরপর দ্রুত ঠাণ্ডা করে ১০° সে. তাপমাত্রার নিচের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দুধকে কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা জীবাণুমুক্ত রাখা যায়।

○ প্রশ্ন-২২. গ্রিনহাউস কাকে বলে? গ্রিনহাউস ইফেক্ট কি? এই ইফেক্ট বা প্রক্রিয়ার নাম এরূপ হলো কেন?

উত্তর : গ্রিনহাউস : শীতপ্রধান দেশে যে কাচের ঘরের মধ্যে গাছপালা লাগানো হয়, তাকে গ্রিনহাউস বলে।

গ্রিনহাউস ইফেক্ট : বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্রিনহাউস গ্যাস যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে।

গ্রিনহাউস ইফেক্ট নামকরণের কারণ : শীতপ্রধান দেশগুলোতে গাছপালাকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাচ দিয়ে ঘেরা জায়গা বা ঘরের মধ্যে লাগানো হয়। দিনের বেলায় সূর্য হতে বিকীর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তাপ কাচের দেওয়াল ভেদ করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে। এর ফলে গাছপালা ও মাটি গরম হয়। গরম মাটি ও গাছপালা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপ বিকিরণ করে। এই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ কাচ ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। ফলে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণ পরিবেশে গাছপালা ভালোভাবে জন্মাতে পারে।

গ্রিনহাউসের ক্ষেত্রে কাচ যেমন সূর্য হতে আগত তাপকে আটকে রাখে, তদ্রূপ বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে পৃথিবীর বাইরে যেতে দেয় না। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গ্রিনহাউস ইফেক্ট নামে পরিচিত। গ্রিনহাউসের সাথে প্রক্রিয়াটির সাদৃশ্যের কারণেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

প্রশ্ন-২৩. বন উজাড়ের ফলে পরিবেশের কি ক্ষতি হয়?

উত্তর : গাছপালা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। বন উজাড়ের ফলে গাছপালার পরিমাণ কমে যাওয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভাবে বন উজাড়ের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর এক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-২৪. Cyclone কি? Tornado'র সাথে এর পার্থক্য কি? Sidr কি?

উত্তর : Cyclone (সাইক্লোন) : বায়ুমণ্ডলে বাতাসের ঘূর্ণনের দিক যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকের সদৃশ হয় তবে তাকে সাইক্লোন বলে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় শুধু তখনই বলা হয় যখন ভূ-পৃষ্ঠে বাতাসের বেগ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। সাইক্লোন দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে এবং উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে।

Tornado-র সাথে Cyclone-এর পার্থক্য : Tornado'র সাথে Cyclone-এর মূল পার্থক্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

i. Cyclone অপেক্ষাকৃত বিস্তর বা ব্যাপক এলাকা জুড়ে সংঘটিত হয় কিন্তু Tornado তুলনামূলক ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যে সংঘটিত হয়ে থাকে। Tornado ঘূর্ণির ব্যাস সাধারণত ১০ মিটার থেকে ১০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

ii. Tornado-এর তীব্রতা Cyclone-এর তীব্রতা অপেক্ষা সাধারণত বেশি হয়।

iii. Cyclone সাধারণত Tornado'র তুলনায় দীর্ঘস্থায়ী হয়। অর্থাৎ Tornado-এর স্থায়িত্বকাল Cyclone-এর তুলনায় অনেক কম।

iv. Tornado সাধারণত স্থলভাগেই উৎপত্তি লাভ করে থাকে, তবে স্থল ও সমুদ্র যে কোনো স্থানেই Tornado'র উৎপত্তি হতে পারে। অপরদিকে Cyclone সব সময়ই সাগর ও মহাসাগরে উৎপত্তি লাভ করে স্থলভাগের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

Sidr : Sidr একটি সিংহলি ভাষার শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে 'চোখ'। ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বঙ্গোপসাগরের উপকূল সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে যে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় তার নামই হচ্ছে Sidr।

প্রশ্ন-২৫. Global warming বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : Global warming : গ্রিন হাউস গ্যাসের নির্গমন অতিমাত্রায় বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী যে উষ্ণায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাই Global warming নামে পরিচিত। বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রধানত তিনটি গ্যাসকে দায়ী বলে বিবেচনা করা হয়। এই গ্যাস তিনটি হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ও নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)।

প্রশ্ন-২৬. বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাপ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বাড়ে কেন?

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাপ বা পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর দুই মেরুতে যে বিশাল পরিমাণ বরফের স্তূপ সঞ্চিত রয়েছে তা গলতে শুরু করে। বরফ গলে পানিতে পরিণত হওয়ার ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায়।

প্রশ্ন-২৭. বায়ুমণ্ডলে Oxygen এর বিক্রিয়া আলোচনা করুন।

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের দুটি প্রধান বিক্রিয়া সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো :

(i) বজ্র বৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে সৃষ্ট 3000°C তাপমাত্রায় বায়ুস্থ নাইট্রোজেন (N_2) ও অক্সিজেন (O_2) যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) গঠিত হয় এবং পরে 50°C তাপমাত্রায় অধিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) গ্যাস এবং শেষে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড (HNO_3) গঠন করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় :

$$N_2(g) + O_2(g) \xrightarrow[\text{3000°C তাপমাত্রা}]{\text{বিদ্যুৎ ক্ষরণ}} 2NO(g)$$

$$2NO(g) + O_2(g) \xrightarrow{\text{50°C তাপমাত্রা}} 2NO_2(g)$$

$$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3(aq)$$

(ii) বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি থেকে বায়ুতে তড়িৎ-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হলে বায়ুস্থ অক্সিজেন থেকে ওজোন (O_3) গ্যাস উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :

$$O_2(g) + O(g) \rightarrow O_3(g)$$

প্রশ্ন-২৮. বর্ষাকালীন শ্রাবণ মাসের গরমে অল্পতেই গা ঘামে কিন্তু খরাকালীন বৈশাখ মাসের গরমে অল্পতেই গা ঘামে না কেন? ২

উত্তর : প্রকৃতপক্ষে উভয় ঋতুতেই সমান পরিমাণে ঘাম হয়। প্রকৃত ব্যাপারটি হচ্ছে খরাকালীন বৈশাখ মাসে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা শ্রাবণ মাসের তুলনায় কম থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা কম হওয়ার কারণে আমাদের শরীরের ঘাম তুলনামূলকভাবে তাড়াতাড়ি বাষ্পীভূত হয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। ফলে আমাদের কাছে মনে হয় যেন আমাদের শরীরে বৈশাখ মাসে ঘাম কম হয়। অপরদিকে, বর্ষাকালীন শ্রাবণ মাসে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা অনেক বেশি থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা বেশি হওয়ার কারণে ঘামের বাষ্পীভবন তুলনামূলকভাবে কম হয়। ফলে শ্রাবণ মাসে শরীর সহজে শুকাতে চায় না। এজন্য আমাদের কাছে মনে হয় যেন বর্ষাকালীন শ্রাবণ মাসে আমাদের শরীরে ঘাম বেশি হয়।

প্রশ্ন-২৯. দুধ পাস্তুরিত করতে সাধারণভাবে কত সময়ের জন্য কত তাপ প্রয়োগ করা হয়?

উত্তর : দুধ পাস্তুরিত করার জন্য তাপ প্রয়োগ পদ্ধতি দুই রকমের। যথা :

i. **বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের আবিষ্কৃত পদ্ধতি :** এই পদ্ধতিতে দুধকে ৩০ মিনিট সময় যাবত ৬২.৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়। ফলে দুধ জীবাণুমুক্ত হয়ে যায়।

ii. **শর্ট টাইম মেথড :** এই পদ্ধতিতে দুধকে জীবাণু মুক্ত করার জন্য ১৫ সেকেন্ড সময় যাবত ৭১.৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত অবস্থায় রাখা হয়।

প্রশ্ন-৩০. পলিথিন কি এবং কি উপাদানে গঠিত? পলিথিন কিভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে?

উত্তর : পলিথিন সাদা অস্বচ্ছ কঠিন প্লাস্টিক। অতি উচ্চচাপে এবং ১০০-২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তরলীকৃত ইথিলিন যৌগের অসংখ্য অণু পরস্পর মিলিত হয়ে পলিথিন উৎপন্ন করে। পলিথিনের মূল উপাদান ইথিলিন। এটি এক প্রকার জৈব যৌগ।

পরিবেশের ওপর পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব : নিচে পরিবেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর ক্ষতিকর প্রভাব আলোচনা করা হলো :

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব : পলিথিন মাটির উর্বরতা নষ্ট করে উদ্ভিদজগতের ক্ষতিসাধন করে। ফসলের জমিতে পলিথিন সামগ্রী একবার পতিত হলে তা জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয় বলে অপরিবর্তিত থাকে এবং এতে মাটির রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না; মাটিতে উদ্ভিদের উপকারী ব্যাকটেরিয়া মারা যায়। মাটির স্তরে পলিথিন থাকলে উদ্ভিদের শেকড় পলিথিন ভেদ করে গভীরে যেতে পারে না এবং উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। ফলে উদ্ভিদ অনুকূল পরিবেশ হারায় বলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে না; ফসলও হয় না।

মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব : প্লাস্টিকসামগ্রী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। প্লাস্টিক দহনে নির্গত হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের সৃষ্টি করে। প্লাস্টিকসামগ্রী থেকে নির্গত বিষাক্ত উপাদানগুলো মানুষের ক্যান্সার, ফুসফুসে সমস্যা, স্নায়ুতন্ত্রে বৈকল্য এমনকি জন্মত্রুটিও ঘটায়। প্লাস্টিকজাত সামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পেট্রোক্যামিকেলজাত উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকে বলে এ শিল্পসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকরা নানা জটিল রোগে ভোগে এবং তাদের জীবনীশক্তি কমে আসে।

○ প্রশ্ন-৩১. গ্রিনহাউজ ইফেক্ট কি? পরিবেশের ওপর এর ভূমিকা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : গ্রিনহাউস ইফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন সুইডিস রসায়নবিদ সোভনটে আরহেনিয়াস ১৮৯৬ সালে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়াকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলে। বায়ুমণ্ডলে CFC, CO_2, CH_4 ও N_2O প্রভৃতি গ্যাস দ্বারা স্তর সৃষ্টি হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে তাপ আটকে পড়ে এবং সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে পৃথিবীপৃষ্ঠে যে প্রভাব পড়ে তাই গ্রিনহাউস ইফেক্ট।

পরিবেশের ওপর এর প্রভাব : নিচে পরিবেশের ওপর এর প্রভাব উল্লেখ করা হলো :

১. **ভূপৃষ্ঠের নিচু এলাকায় প্লাবন :** পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এতে সমুদ্রের অনেক দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল, সমুদ্র উপকূলের দেশ ও শহর পানিতে ডুবে যাবে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাবে। এর ফলে অনেক জীবন এবং জীববসতি বিপন্ন হবে।

২. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধি পেলে মাটিতে পানির পরিমাণ কমে যাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতিমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে।

৪. **বনাঞ্চল ধ্বংস :** পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের জীবনধারণের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হবে। এর ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. **এসিড বৃষ্টি :** গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়ামণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে এসিড বৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পড়বে এবং ভূপৃষ্ঠের উর্বরতা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে এবং বনাঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

এছাড়া গ্রিনহাউজ ইফেক্টের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তরে ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ পৃথিবীতে প্রবেশ করছে, যা মানবজীবনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। ১৯৮৫ সালে জেনাহান শাকলিন সর্বপ্রথম এন্টার্কটিকার ওপরে ওজোনস্তরে ফাটল আবিষ্কার করেন।

○ প্রশ্ন-৩২. সুনামি কি?

উত্তর : 'সুনামি' জাপানি শব্দ, যার অর্থ সামুদ্রিক ঢেউ। সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্প বা শিলাস্তরের চ্যুতি ঘটলে সমুদ্রে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় এবং এ ঢেউ প্রবল প্রতাপে সমুদ্র উপকূলে আছড়ে পড়ে উপকূলীয় অঞ্চলে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি করে। এ ঢেউয়ের প্রচণ্ডতা এতটাই বেশি যে নিমিষেই ব্যাপক প্রাণহানী ও সম্পদের ক্ষতিসাধন করে। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সংঘটিত সুনামিতে উপকূলীয় দেশগুলোতে অসংখ্য প্রাণহানী ঘটে।

○ প্রশ্ন-৩৩. শীতকালে পুরাতন লেপের চেয়ে নতুন লেপ বেশি আরামদায়ক লাগে কেন?

উত্তর : লেপ ব্যবহার করে আমরা অভ্যন্তরীণ তাপকে বাইরে বা বাইরের তাপকে অভ্যন্তরে প্রবেশ রোধ করি। বায়ু তাপের কুপরিবাহী। নতুন লেপের কাপড় ও তুলাতন্তু আলগাভাবে থাকে বিধায় এতে প্রচুর ফাঁক থাকে যেগুলোতে বায়ু আটকে থাকে। অন্যদিকে পুরাতন লেপ ব্যবহারের ফলে কাপড়ের ফাঁক ও তুলাতন্তুর ফাঁক কমে যায় ফলে এতে স্বল্প পরিমাণে বায়ুকণা আটকে থাকে। এজন্য নতুন লেপ পুরোনো লেপের চেয়ে বেশি আরামদায়ক।

○ প্রশ্ন-৩৪. পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের ভূমিকা ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সুষম জলবায়ুর প্রয়োজনে একটি দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। যেসব এলাকা জুড়ে পত্রবহুল গাছ জন্মানো হয় সেসব এলাকায় উদ্ভিদ থেকে বেরিয়ে আসা জলীয় বাষ্প স্থানীয়ভাবে আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে। যেখানে বনাঞ্চল বেশি থাকে সেখানকার বাতাস আর্দ্র থাকে। এই আর্দ্র বাতাস একসাথে জমা হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং সেখানকার বাতাসকে শীতল রাখতে সাহায্য করে। আবার যদি কোনো এলাকায় ব্যাপকভাবে গাছপালা কাটা হয় এবং পূরণ করা না হয় তাহলে সেখানে বৃষ্টিপাত কমে যায়, ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ব্যাপক এলাকা অনুর্বর হয়ে কালক্রমে মরুভূমিতে পরিণত হয়। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে গাছ বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। অন্যথায় প্রাণীকুল বায়ুমণ্ডল থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে তার ফলে বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হয়ে যেত এবং প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যেত।

○ প্রশ্ন-৩৫. বায়ুদূষণের কারণ কি কি? বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় আলোচনা করুন।

উত্তর : মোটরগাড়ি, কলকারখানার ধোঁয়া, কীটনাশক, আগাছানাশক, কলকারখানার বর্জ্য, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসে মিশে বায়ুদূষণ ঘটায়। এগুলো থেকে বাতাসে সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সিসা, হাইড্রোকার্বন মিশে দূষণ ঘটিয়ে থাকে।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য মোটর গাড়ির কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কলকারখানার ধোঁয়া ও বর্জ্য নির্গত হওয়ার ক্ষেত্রে সরকারিভাবে আইন করে বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া কীটনাশক ও আগাছানাশকের যথেচ্ছা ব্যবহার না করে সেক্ষেত্রে জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এতে বায়ুদূষণ অনেকাংশে কমে যাবে।

○ প্রশ্ন-৩৬. বজ্রপাতের কারণ কি?

উত্তর : মেঘ তৈরি হওয়ার সময় বিভিন্ন ধরনের মেঘ ভিন্ন ভিন্ন চার্জে চার্জকৃত হয়ে থাকে। ঝড়-বৃষ্টির সময় ভিন্নধর্মী দুটি মেঘ পরস্পরের সংস্পর্শে এলে চার্জের বিনিময় ঘটে। ফলে প্রচণ্ড শব্দসহ বজ্রপাত ঘটে থাকে।

○ প্রশ্ন-৩৭. কৃত্রিম উপায়ে কিভাবে বৃষ্টি ঘটানো হয়?

উত্তর : বিমানে উড়ে জলভরা মেঘের ওপরে চলে যেতে হয়। ঐ মেঘের উপরে ড্রাই আইসের গুঁড়া ছড়িয়ে দিলে পানির কণাগুলো আস্তে আস্তে বড় আকার ধারণ করে এবং বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। এটাই কৃত্রিম উপায়ে বৃষ্টি ঘটানোর পদ্ধতি।

○ প্রশ্ন-৩৮. CFC কি এবং এটা কি কাজে ব্যবহৃত হয়? CFC ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : মিথেন (CH_4) ও ইথেন (C_2H_6)-এর ক্লোরোফ্লোরো উদ্ভূত যৌগসমূহকে ক্লোরোফ্লোরো কার্বন বা সংক্ষেপে CFC বলে। CFC-এর বাণিজ্যিক নাম হলো 'ফ্রিয়নস'। CFC-এর মধ্যে ফ্রিয়ন -11, ফ্রিয়ন-12 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্যবহার : CFC কে সামান্য চাপে তরলে পরিণত করা যায় বিধায় এদেরকে হিমায়করূপে হিমায়নযন্ত্র তথা রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার শীতল রাখার জন্য সর্বাধিক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও এটি এরোসল ও প্লাস্টিক ফোম তৈরি করতে এবং দ্রাবকরূপে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহার বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা : CFC ব্যবহারের সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এটি ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ধ্বংস করে। ফলে জীবজগতের জন্য অত্যধিক ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি বা অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। এতে মানুষের চর্ম ক্যান্সারসহ বহুবিধ মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া CO_2-এর মতো CFCও অধিক তাপ ধরে রাখার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এতে পৃথিবীর জীবজগতের ভারসাম্যপূর্ণ শৃঙ্খল নষ্ট হবে। এসব অসুবিধা দূর করে সুন্দর পৃথিবী গড়ার জন্যই CFC-এর বহুল ব্যবহার বন্ধ করা প্রয়োজন।

○ প্রশ্ন-৩৯. ঋতু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারা বছরকে যে কয়টি ভাগে ভাগ করা হয় তার প্রত্যেকটিকে এক একটি ঋতু বলে। যেমন– বাংলাদেশে তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে বছরকে ৬টি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশে তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে বছরকে ৪ টি ঋতুতে ভাগ করা হয়।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ : ঋতু পরিবর্তন ঘটে তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে। নিচে তাপমাত্রার পরিবর্তন ও ঋতু পরিবর্তনের কারণগুলো বর্ণনা করা হলো :

ক. **পৃথিবীর গঠন :** পৃথিবী গোল, তাই পৃথিবীর কোথাও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য হয় ও ঋতু পরিবর্তিত হয়।

খ. **আবর্তন পথ :** পৃথিবীর আর্বতন পথ উপবৃত্তাকার। তাই বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কম বেশি হয়। এতে একই স্থানে বিভিন্ন সময় তাপের তারতম্য ঘটে, ফলে ঋতু পরিবর্তিত হয়।

গ. **কক্ষতলের সাথে মেরুরেখার অবস্থান :** পৃথিবীর মেরুরেখা নিজ কক্ষতলের সাথে ৬৬.৫ ডিগ্রি কোণে একই দিকে অবস্থান করে। এতে বছরে একবার পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্যের নিকটবর্তী হয়। যে গোলার্ধ যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে তার তাপমাত্রা তখন বেশি হয় এবং দূরে গেলে তাপমাত্রা কম হয়, ফলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

○ প্রশ্ন-৪০. মোটরযান কিভাবে বায়ু দূষিত করে?

উত্তর : মোটরযানের ইঞ্জিন পেট্রোল, ডিজেল বা অকটেন ও বায়ুর মিশ্রণকে প্রজ্বলিত করে বিপুল পরিমাণ তাপ শক্তি ও চাপের সৃষ্টি করে যা ব্যবহার করে মোটরযান চালিত হয়। কিন্তু এই প্রজ্বলন কার্য চলার সময় যে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে তা মূলত বায়ুমণ্ডলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড ও লেড অক্সাইড প্রভৃতি যৌগের

মিশ্রণ। ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। আর আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বেশিরভাগ মোটরযানই ত্রুটিযুক্ত। ফলে এদের থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ুমণ্ডল তথা সামগ্রিক পরিবেশের জন্য এক মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এছাড়া মোটরযানের উচ্চ শব্দও পরিবেশকে দূষিত করে।

○ প্রশ্ন-৪১. আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় এটা কি? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : মহাশূন্যে কোটি কোটি নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং বিশাল বাষ্পকুণ্ড নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে দল সৃষ্টি হয়েছে তাকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ। গ্যালাক্সি পরস্পর বিরাট দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত। এরূপ একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশের নামই ছায়াপথ। অন্ধকার আকাশে দীপ্তমান পথের মতো দেখা যায় বলে আদিকালের আকাশগঙ্গা, সুরগঙ্গা ইত্যাদিরই আধুনিক নাম 'ছায়াপথ'।

○ প্রশ্ন-৪২. গাছের বয়স কিভাবে বোঝা যায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : উদ্ভিদের দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সেকেন্ডারি বা গৌণ কোষকলার বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ পরিধিতে বা প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি স্পষ্ট বোঝা যায়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই বৃদ্ধির হার বেশি থাকে এবং শীতকালে থাকে কম। ফলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কাষ্ঠিক উপাদান বেশি পরিমাণে তৈরি হয় এবং শীতকালে কম তৈরি হয়। এতে পাশাপাশি দুটি পুরু ও পাতলা বলয় সৃষ্টি হয় প্রতি এক বছর সময়ে। বিভিন্ন বছরে সৃষ্ট এসব বলয় এককেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে পরস্পর সজ্জিত হয়, যা বার্ষিক বলয় নামে পরিচিত। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের প্রস্থচ্ছেদে এসব বর্ষবলয় গণনা করে সাধারণত উদ্ভিদের বয়স বের করা হয়।

○ প্রশ্ন-৪৩. পৃথিবীর উপরের Ozone স্তর কিভাবে তৈরি হয়? এই স্তর মানুষের কি উপকারে আসে? ইদানিং Ozone স্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে কেন?

উত্তর : পৃথিবী নামক গ্রহটিকে ঘিরে আছে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর। এরই এক ধাপ ওজোনস্তর (Ozone sphere) নামে পরিচিত। ওজোন (O_3) অক্সিজেন (O_2) নামক মৌলিক পদার্থের ভৌতিক ও জৈবিক পরিবর্তনেরই ফল। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোনের এই আবরণই ওজোনস্তর সৃষ্টি করে রেখেছে।

সূর্যের আলোতে মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর একটি উপাদান রয়েছে, যা অতিবেগুনী রশ্মি নামে পরিচিত। এই রশ্মিকে শোষণ করে সূর্যের আলোকে মানুষের জন্য নিরাপদ রাখে এই ওজোনস্তর। বায়ুমণ্ডলে ক্রমে অতিরিক্ত পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC) ইত্যাদির আধিক্যের ফলে ওজোনস্তর ক্ষয়ীভূত এমনকি ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

○ প্রশ্ন-৪৪. স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসা একটি ট্রেনের হুইসলের আওয়াজ এবং স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজে পার্থক্য কি এবং কেন?

উত্তর : স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসা ট্রেনের হুইসলের আওয়াজ স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার আওয়াজ অপেক্ষা বেশি জোরে শোনা যায়। শব্দের Doppler effect-এর জন্য এ ব্যতিক্রম ঘটে থাকে। বিজ্ঞানী জোহন ডপলার শব্দের এ বিশেষ ব্যতিক্রমী ধর্ম আবিষ্কার করেন। স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসা ট্রেন ও শ্রোতার মধ্যেকার আপেক্ষিক বেগ কমে এতে শব্দের কম্পাংক বৃদ্ধি পায়, আর স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময় শ্রোতার সাথের শব্দের উৎসের আপেক্ষিক বেগ বৃদ্ধি পায়, ফলে শব্দ কম্পাংক হ্রাস পেতে থাকে অর্থাৎ আওয়াজ কমে যেতে থাকে।

○ প্রশ্ন-৪৫. ঢাকা শহরের বাতাস শহরবাসীর জন্য ক্ষতিকর কেন?

উত্তর : মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যার পয়ঃপ্রণালীর নির্গত গ্যাস, অসংখ্য গাড়ির কালো ধোঁয়া, শিল্পকারখানার নির্গত ধোঁয়া, গৃহস্থালীর উপকরণ, ফ্রিজ নির্গত গ্যাস প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনঘটিত বিভিন্ন দূষিত গ্যাস, মাত্রাতিরিক্ত সিসা প্রভৃতি ঢাকার বায়ুতে প্রতিদিনই মিশে যাচ্ছে। তাই ঢাকা শহরের বাতাস শহরবাসীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

○ প্রশ্ন-৪৬. একটি সাইক্লোনের কেন্দ্রের চাপ বাইরের চাপের তুলনায় কম না বেশি?

উত্তর : সাইক্লোনের সৃষ্টি হলে এর কেন্দ্রের উত্তপ্ত বায়ু প্রবল বেগে উপরের দিকে উঠতে থাকে। কারণ উত্তপ্ত বায়ু পার্শ্ববর্তী বায়ু অপেক্ষা যথেষ্ট হালকা আর ঐ শূন্যস্থান পূরণের জন্য প্রচণ্ড বেগে আশপাশ থেকে বায়ু বইতে থাকে। ফলে বাইরের চাপের চেয়ে সাইক্লোনের কেন্দ্রের চাপ কম থাকে।

○ প্রশ্ন-৪৭. ওজোন স্তর কি এবং এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মাইল ওপরে বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তরকে ওজোন স্তর বলে। এই স্তর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে নেয় এবং পৃথিবীর শব্দকে প্রতিফলিত করে।

○ প্রশ্ন-৪৮. আয়নস্তর কি এবং এটি কি কাজে লাগে?

উত্তর : বায়ুস্তরের ওজোন স্তরের ওপরে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে আয়নস্তর বলে। এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের চার্জযুক্ত কণা থাকে। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। ফলে সংবাদ আদান-প্রদান এই স্তরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৪৯. এসিড বৃষ্টি কি এবং কেন ঘটে?

উত্তর : পৃথিবীর শিল্পকারখানা থেকে প্রতিনিয়ত দূষিত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এই দূষিত গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন পার অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এসিডে পরিণত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে। এই এসিড মিশ্রিত বৃষ্টিপাতকে এসিড বৃষ্টি বলে।

○ প্রশ্ন-৫০. কৃত্রিম বস্তু দ্বারা তৈরি ব্যাগ পরিবেশে কি দূষণ ঘটায়?

উত্তর : কৃত্রিম বস্তু দ্বারা তৈরি ব্যাগ মাটিতে পচে না এবং পানিতে গলে না। ফলে ব্যবহারের পর ফেলে দিলে চাষাবাদ ও পানি নিষ্কাশনে বিঘ্ন ঘটায়। তাছাড়া এই জাতীয় ব্যাগের বর্জ্য পরিবেশ দূষণ ও মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরও বটে।

গ

পরিবেশ

Environment

○ প্রশ্ন-৫১. পরিবেশ কি?

উত্তর : আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। অন্যভাবে বলা যায়, সময় ও স্থানের পরিবর্তনের সাপেক্ষে কোনো একটি জীবন (Life) বা জীবের চারপাশে যে পরিবর্তনশীল অবস্থা বিরাজমান তাকে পরিবেশ বলে। পরিবেশকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– জড় পরিবেশ ও জীব পরিবেশ। জীব ও জড় পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। জীব ও জড় এর বাসস্থানকে ঘিরেই তার পরিবেশ গড়ে ওঠে। জড় উপাদানের মূল উপাদান হচ্ছে মাটি, পানি ও বায়ু। জীব উপাদানের মূল উপাদান হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণী।

○ প্রশ্ন-৫২. পরিবেশের ভারসাম্য বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : জড় ও জীব এ দু' জাতীয় উপাদানের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে পরিবেশ। পরিবেশের উপাদানসমূহের আনুপাতিক হার নির্দিষ্ট। এদের মধ্যে কোনো একটি উপাদান হ্রাস বা বৃদ্ধি পেলে পরিবেশের আমূল পরিবর্তন ঘটে। কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশে যে অনুপাতে বিভিন্ন উপাদান থাকা দরকার সে পরিমাণ উপাদানসমূহ বিদ্যমান থাকাই হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য।

○ প্রশ্ন-৫৩. পরিবেশ দূষণ বলতে কি বোঝায়? বায়ু, পানি ও মাটি দূষণের কারণসমূহ কি?

উত্তর : রাসায়নিক, ভৌতিক ও জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের যে কোনো পরিবর্তনকেই পরিবেশ দূষণ বলে। অর্থাৎ পরিবেশের স্বয়ংক্রিয় উপাদানসমূহের যে কোনো একটির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলে যদি তা জীবজগতের ক্ষতির কারণ হয়, তবে তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণ প্রধানত চার প্রকার। যথা :

১. বায়ু দূষণ ২. পানি দূষণ ৩. মাটি দূষণ এবং ৪. শব্দ দূষণ।

বায়ু দূষণ : মানুষের বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপের ফলে অথবা কোনো প্রাকৃতিক কারণে বাতাসে অবস্থিত এক বা একাধিক গ্যাসের বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়। গ্যাসের এ পরিবর্তনকেই বায়ু দূষণ বলা হয়।

বায়ু দূষণের কারণসমূহ :

১. ধোঁয়া, ২. দূষিত গ্যাস, ৩. কীটনাশক, আগাছানাশক ও ছত্রাকনাশক ওষুধ, ৪. ধূলিকণা, ৫. তেজস্ক্রিয় বস্তু ইত্যাদি।

পানি দূষণ : পানি দূষণ হলো প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে পানির গুণগতমানের এমন কোনো পরিবর্তন, যা মানুষ ও অন্যান্য জীবের জন্য ক্ষতিকর।

পানি দূষণের কারণসমূহ :

১. নর্দমার ময়লা, ২. শিল্পের আবর্জনা, ৩. রাসায়নিক সার, ৪. কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ও আগাছা দমনকারী ওষুধ, ৫. রেডিও অ্যাকটিভ ওয়াস্টেজ, ৬. তেল, ৭. কাপড় কাঁচা ও গোসল, ৮. এসিডসমূহ ইত্যাদি।

মাটি দূষণ : পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানসমূহ বা পরিবেশে অবস্থানকারী বিভিন্ন পদার্থসমূহ মাটির স্বাভাবিক গঠনে বাধা সৃষ্টি করলে মাটির যে ক্ষতি সাধিত হয়, তাকে মাটি দূষণ বলে। বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে মাটি দূষিত হয়। এছাড়া ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, পলিথিন, প্লাস্টিক ইত্যাদিও মাটিকে দূষিত করে।

শব্দ দূষণ : শব্দ দূষণ হলো শব্দের আধিক্য বা কোলাহল, যা পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিঘ্নিত করে এবং পরিবেশকে সুষ্ঠুভাবে বসবাসের অনুপযোগী করে তোলে। হাইড্রোলিক হর্ন, মাইকের আওয়াজ, কলকারখানার শব্দ ইত্যাদি শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে।

○ প্রশ্ন-৫৪. প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : আজকের বিশ্বে জনসংখ্যার বৃদ্ধি একটি বিরাট সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের তিনটি প্রধান নিয়ামক হলো– গাছপালা, বায়ু ও পানি। জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে এ তিনটির ওপরই প্রভাব পড়ছে ব্যাপকভাবে।

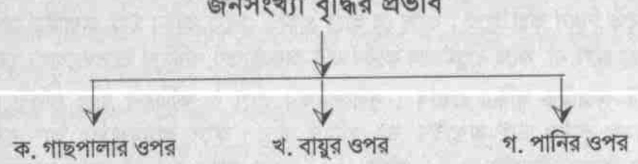

ক. **গাছপালার ওপর প্রভাব :** বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার বিপুল বাসগৃহ ও আসবাবপত্র তৈরি এবং জ্বালানি চাহিদা মেটানোর জন্য সংগ্রহ করতে হয় কাঠ। আর এর জন্য আজকাল ব্যাপকভাবে বন উজাড় করা হচ্ছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, গত ৪০ বছরে পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের প্রায় ৪০ শতাংশ বনভূমি ধ্বংস করা হয়েছে।

বায়ুর ওপর প্রভাব : জনসংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাব পড়ছে বায়ুমণ্ডলের ওপরও। আমরা শ্বাসকার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পাই বায়ুমণ্ডল থেকে। কিন্তু বাড়তি জনসংখ্যার চাপে বাড়তি যানবাহন ও শিল্প কারখানায় জ্বালানির জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে প্রচুর অক্সিজেন খরচ হয়ে যাচ্ছে। একই সাথে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড। বেড়ে যাচ্ছে গ্রিনহাউস গ্যাস। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরিবেশে বায়ুমণ্ডলের ওপর বিরূপ প্রভাবের কারণ হচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

. পানির ওপর প্রভাব : বর্ধিত জনসংখ্যার প্রভাব পড়ছে নদী-নালা, খাল-বিল এবং সমুদ্র নিয়ে গঠিত জলজ বাস্তুসংস্থানের ওপর। বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য পৃথিবীর অনেক অঞ্চলে সেচের পানির চাহিদা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে শিল্প কারখানায় ব্যবহারের জন্যও পানির চাহিদা বাড়ছে। এর ফলে স্বাদু পানির অভাব দেখা দিচ্ছে। আবার সাথে সাথে বাড়ছে দূষণও। গার্হস্থ্য ও শিল্পজাত, কঠিন এবং তরল বর্জ্য, কীটনাশক, সার প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ পানিকে দূষিত করে চলেছে অবিরামভাবে।

পরের আলোচনা থেকে এটা বোঝা যায়, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমগ্র পরিবেশের ওপর একটা বিরূপ প্রভাব ফেলছে। এ থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সকলকে অধিক সচেতন হতে হবে।

○ প্রশ্ন-৫৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কেন? এর প্রভাব উল্লেখ করুন।

উত্তর : আমাদের জীবনধারণের জন্য দরকার পরিমিত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডমুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির কারণগুলো নিম্নরূপ :

ক. মানুষের শ্বসন প্রক্রিয়া : মানুষ শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয়। এক হিসেবে দেখা যায়, প্রতিদিন প্রায় ১২০ কোটি পাউন্ড কার্বন ডাই-অক্সাইড বাতাসে মিশে যাচ্ছে।

খ. জ্বালানি পুড়ে : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা, যানবাহন ইত্যাদি অধিক হারে নির্মিত হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, মানুষের ঘরবাড়ি, শিল্পকারখানা এবং যানবাহনে ব্যবহৃত বিভিন্ন জ্বালানি; যেমন- কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি পুড়ে বছরে প্রায় ১,৫০০ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুতে মিশে যাচ্ছে। ফলে দিন দিনই বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ. বনাঞ্চল ধ্বংস : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি জনসংখ্যার বিভিন্ন চাহিদা; যেমন- বাসস্থান, প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, জ্বালানি, কৃষি জমি ইত্যাদি মিটানোর জন্য ব্যাপক হারে বনাঞ্চল ধ্বংস করে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। ফলে যে হারে প্রকৃতি থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারিত হওয়ার কথা তা হচ্ছে না, ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির প্রভাব : সূর্যালোকের তাপ ও ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবী থেকে বিকিরিত হওয়ার সময় কার্বন ডাই-অক্সাইড তা শোষণ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুযায়ী ১৮৬০ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত এ ১০০ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রতি মিলিয়ন জনসংখ্যা অধ্যুষিত অংশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ২৮৩ পিপিএম থেকে ৩৩০ পিপিএম-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। গত ৪০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায় তাপমাত্রাও ঐ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, এর ফলে মেরু প্রদেশের জমে থাকা বরফ গলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এভাবে তাপমাত্রা বাড়লে আগামী ৪০০ বছরে এন্টার্কটিকা মহাদেশের সব বরফ গলে পৃথিবীর বিরাট অংশ পানিতে ডুবে যাবে।

○ প্রশ্ন-৫৬. জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রকৃতিতে পানির ভারসাম্য কিভাবে নষ্ট হয় এবং পরিবেশের ওপর এর প্রভাব কি? বর্ণনা করুন।

উত্তর : বনাঞ্চল বা উদ্ভিদ প্রধান এলাকায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। কারণ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বায়ুতে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় এবং তাপ বৃদ্ধিকারী কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে পরিবেশকে শীতল করে। ফলে মহাসাগর, সাগর, নদী ও অন্যান্য জলাশয় থেকে বাষ্পীভূত পানি শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ কৃষি জমি, শিল্পকারখানা, জ্বালানি তৈরির জন্য এবং নগরায়ন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে উদ্ভিদ নিধন করে বনাঞ্চল ধ্বংস করা হচ্ছে। এতে বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা কমে যাচ্ছে এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পানির ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

পরিবেশের ওপর পানির ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার প্রভাব

পরিবেশের ওপর পানির প্রভাব অপরিসীম। তাই পানির ভারসাম্য নষ্ট হলে পরিবেশের যেসব দিক প্রভাবিত হয় তা নিম্নরূপ :

১. জলবায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়ে।
২. বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্য ঘটে।
৩. বনাঞ্চল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
৪. রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।
৫. তাপমাত্রার ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায় ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৫৭. পানি দূষণ কি? পরিবেশে পানি দূষণের ক্ষতিকর প্রভাব লিখুন।

উত্তর : পানির স্বাভাবিক বিন্যাসে পরিবেশের ক্ষতি করে এরূপ পদার্থসমূহের উপস্থিতিই পানি দূষণ। শিল্পকারখানার বর্জ্য পদার্থ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, মানববসতির বর্জ্য পদার্থ প্রভৃতি পানি দূষণের কারণ। শিল্পকারখানার বর্জ্য পদার্থে নানা ধরনের বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে। এ বিষাক্ত পদার্থ জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এর ফলে বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙ্গে যায় এবং খাদ্যচক্রের ক্ষতি হয়। পুকুরের পানিতে সাবান মিশলে বা জমিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করলে মাছের ডিম ও উপকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস হয়। এতে পরিবেশের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন ধরনের জলযান থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেট্রোলিয়াম এবং নানাবিধ আবর্জনা পানিতে মিশ্রিত হচ্ছে। এতে পানি ব্যবহারের অনুপযোগী হচ্ছে এবং পানিতে বসবাসকারী জীবকুল ধ্বংস হচ্ছে। ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্য উৎপাদনের প্রাথমিক একক সবুজ শৈবাল ও প্লাঙ্কটন বিনষ্ট হয়ে খাদ্য শৃঙ্খল ভেঙ্গে জীবকুলের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

○ প্রশ্ন-৫৮. বায়ুদূষণ জীবজগতে কি ক্ষতি সাধন করে?

উত্তর : জীবজগতের ওপর বায়ুদূষণের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। মোটরগাড়ি থেকে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড বৃষ্টি ঘটায়। এ এসিড বৃষ্টিই সবুজ গাছপালার ক্লোরোফিল নষ্ট করে উদ্ভিদ জগতের ক্ষতিসাধন করে। বায়ুমণ্ডলের অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি করে। এতে জমাটবদ্ধ বরফ গলে সমুদ্র সমতলস্থ নিম্নভূমিসমূহ পানিতে তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বায়ুদূষণকারী ক্ষতিকর পদার্থসমূহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা মানবদেহে হাঁপানি, ক্যান্সার, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

○ প্রশ্ন-৫৯. ঢাকা শহরের বাতাস শহরবাসীর জন্য ক্ষতিকর কেন?

উত্তর : মোটরগাড়ির ধোঁয়া, শিল্পকারখানার দাহ্যগ্যাস, পেট্রোলের সীসা প্রভৃতির কারণে ঢাকার বাতাসে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, সিএফসি প্রভৃতির মাত্রা ক্রমান্বয়ে বেড়ে বাতাস বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। মাত্রাতিরিক্ত পেট্রোলচালিত টু স্ট্রোক ইঞ্জিনের ব্যবহার পরিবেশ দূষণকে ত্বরান্বিত করছে। পেট্রোলে অগ্নিনিরোধ হিসেবে সীসা ব্যবহৃত হয়। বাতাসে সীসার সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মাত্রা হলো ২০০ মাইক্রো গ্রাম/ঘনমিটার। ঢাকার বাতাসে এই মাত্রা ৪৬০ মাইক্রো গ্রাম/ঘনমিটার-এর বেশি। এ পরিমাণ পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ। অতিরিক্ত এ সীসা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

○ প্রশ্ন-৬০. মাটি কিভাবে দূষিত হয়?

উত্তর : মাটি নানাভাবে দূষিত হয়। বন্যা, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি প্রাকৃতিক কারণে মাটি দূষিত হয়। বন্যার ফলে মাটি ক্ষয়ে গিয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ে। মাটিতে তখন গাছপালা জন্মাতে পারে না। বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ একইভাবে মাটির উপরের উর্বর স্তর সরিয়ে নিয়ে মাটি অনুর্বর করে ফেলে।

মানুষের নানা কাজ মাটিকে দূষিত করে। বন ও গাছপালার ধ্বংস সাধন, অতিমাত্রায় কৃষিকাজ, অতিরিক্ত পানিসেচ ইত্যাদি কারণে মাটি দূষিত হয়। গাছপালা না থাকলে এবং অতিমাত্রায় কৃষিকাজ করলে মাটির উর্বর স্তর ক্ষয় হয়ে মাটি অনুর্বর হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত পানিসেচের ফলে মাটিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। মাঠির নিচের লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে ওপরে উঠে এসে মাটিকে অনুর্বর করে তোলে। নানা ধরনের বর্জ্য পদার্থ মাটি দূষণের অন্যতম কারণ। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, প্রকৃতিতে ধীরে ধীরে মিশে যায় না এমন পদার্থ (পলিথিন, প্লাস্টিক) মাটিকে দূষিত করে।

○ প্রশ্ন-৬১. পানি দূষণের কারণগুলো কি কি?

উত্তর : জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য পানি দূষণ বাড়ছে। এছাড়া যেসব কারণে পানি দূষিত হচ্ছে তা হলো—

ক. মলমূত্র, মানুষের ব্যবহারকৃত বস্তু পানিতে পড়ে।
খ. শিল্পকারখানার বর্জ্য পানিতে মিশে।
গ. জমিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার প্রয়োগ এবং তা পানিতে পড়ে।
ঘ. তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে।
ঙ. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের উপস্থিতি।
চ. পানিতে তেলের সংমিশ্রণে।

○ প্রশ্ন-৬২. গৃহস্থালী কাজে ব্যবহারের জন্য কিভাবে পানি শোধন করা যায়?

উত্তর : গৃহস্থালী কাজে নিম্নোক্ত উপায়ে স্বল্প পরিমাণ পানি শোধন করা যায় :

ক. ফুটানো;
খ. ক্লোরিন, আয়োডিন, পটাসিয়াম পার-ম্যাংগানেট দিয়ে জীবাণুমুক্তকরণ;
গ. পরিস্রাবণ;
ঘ. নলকূপগুলো জীবাণুমুক্তকরণ।

○ প্রশ্ন-৬৩. শব্দ দূষণ কি? শব্দ দূষণ আমাদের কি ক্ষতি করে?

উত্তর : শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের ওপরে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই শব্দ দূষণ বলে। শব্দ পরিমাপের একক ডেসিবল। পূর্ণ বয়স্ক একজন লোক ৬০-৭০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ সহ্য করতে পারে। ৭০-৭৫ ডেসিবল অতিক্রম করলেই তাকে দূষণের পর্যায় বলে গণ্য করা যায়।

যানবাহনের জোরালো হর্ন, নির্বিচারে লাউড স্পিকারের ব্যবহার, উড়োজাহাজের শব্দ, আবাসিক এলাকায় কলকারখানার অবস্থান, প্রচণ্ড কোলাহল ইত্যাদি শব্দ দূষণের মূল কারণ।

শব্দ দূষণ মানবদেহে নিঃশব্দ ঘাতকের মতো কাজ করে। শব্দ দূষণে মানুষের মানসিক ও শারীরিক বিপত্তি ঘটতে পারে; রক্তচাপ ও হৃদকম্পন ব্যাহত হয়; শ্রবণশক্তি কমে আসে ও বধির হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়া কণ্ঠনালীর প্রদাহ, আলসার, মস্তিষ্কের রোগও হতে পারে। শব্দের তীব্রতা অনুযায়ী ভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বিরক্তি ভাব, ক্রোধ প্রবণতা, মানসিক উত্তেজনা, পড়াশোনা ও কর্মনিবিষ্টতায়ও বিঘ্ন ঘটে। অনবরত শব্দ দূষণের শিকার হলে শিশুদের ভাষাগত সমস্যা ছাড়া বুদ্ধিমত্তাও হ্রাস পেতে পারে।

○ প্রশ্ন-৬৪. বাংলাদেশে শব্দ দূষণের মানমাত্রাগুলো লিখুন।

উত্তর : বাংলাদেশে শব্দ দূষণের মানমাত্রাকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে–

১. নীরব এলাকা	৪৫ ডেসিবল
২. আবাসিক এলাকা	৫০ ডেসিবল
৩. মিশ্র এলাকা	৬০ ডেসিবল
৪. বাণিজ্যিক এলাকা	৭০ ডেসিবল
৫. শিল্প এলাকা	৭৫ ডেসিবল

○ প্রশ্ন-৬৫. গ্রিনপিস বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : গ্রিনপিস ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। পরিবেশ বিষয়ে প্রথাবিরোধী এবং উচ্চকিত প্রতিবাদের জন্য এটি আলোচিত। সংস্থাটি অহিংস পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিরোধে বিশ্বাসী। পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রে সংস্থাটির পদচারণা শুরু হয়। ঐ বছর কিছু সংখ্যক আমেরিকান ও কানাডীয় নাগরিক একটি জাহাজ ভাড়া করে আলাস্কার এমচিটকা দ্বীপে পৌঁছে। সেখানে পর পর অনেকগুলো পারমাণবিক পরীক্ষা ঘটানোর কথা ছিল। গ্রিনপিসের প্রতিবাদের কারণে একটি মাত্র পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। গ্রিনপিস এখনো এই একই কায়দায় তাদের প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৬৬. গ্রিনহাউস ইফেক্ট কি?

উত্তর : গ্রিনহাউস ইফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন সুইডিস রসায়নবিদ সোভনটে আরহেনিয়াস ১৮৯৬ সালে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার প্রতিক্রিয়াকে গ্রিনহাউস ইফেক্ট বলে। বায়ুমণ্ডলে CFC, CO_2, CH_4 ও N_2O প্রভৃতি গ্যাস দ্বারা স্তর সৃষ্টি হওয়ার কারণে বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে তাপ আটকে পড়ে এবং সার্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। এ তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠে যে প্রভাব পড়ে তাই গ্রিনহাউস ইফেক্ট।

○ প্রশ্ন-৬৭. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলাফল বর্ণনা করুন।

উত্তর : গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার প্রভাব খুবই বিপজ্জনক। নিচে তা উল্লেখ করা হলো :

i. **ভূপৃষ্ঠের নিচু এলাকায় প্লাবন :** পৃথিবীর উত্তাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এতে সমুদ্রের অনেক দ্বীপ, উপকূলীয় অঞ্চল, সমুদ্র উপকূলের দেশ ও শহর পানিতে ডুবে যাবে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাবে। এর ফলে অনেক জীবন এবং জীব বসতি বিপন্ন হবে।

ii. মরুভূমির বৈশিষ্ট্য : গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধি পেলে মাটিতে পানির পরিমাণ কমে যাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে।

iii. বনাঞ্চল ধ্বংস : পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের জীবনধারণের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হবে। এর ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

iv. এসিড বৃষ্টি : গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়ামণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে এসিড বৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পড়বে এবং ভূপৃষ্ঠের উর্বরতা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে এবং বনাঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-৬৮. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া রোধে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া রোধে করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

- যেসব গ্যাস ভূমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায়, তাদের নির্গমন কমাতে হবে।
- জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। যেমন–
  ক. অযথা ঘরের বাতি জ্বালিয়ে না রাখা।
  খ. রান্নার সময়টুকু ছাড়া গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখতে হবে।
  গ. উন্নত চুলা ব্যবহার করলে জ্বালানি খরচ কমবে, গ্যাস নির্গমন হ্রাস পাবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে।
- বনায়ন বাড়াতে হবে। কারণ গাছ ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে থাকে। গাছ অক্সিজেন দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।
- শিল্পকারখানায় যতটা সম্ভব জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে।
- পচাডোবা ও মজাপুকুর সংরক্ষণ করে মাছ চাষ করতে হবে। কারণ পচা পানিতে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয়।

সর্বোপরি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকলকে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

○ প্রশ্ন-৬৯. কি কি গ্যাস গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টি করে?

উত্তর : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও অন্যান্য কিছু গ্যাস গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ৪৯%, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ১৪%, মিথেন ১৮%, নাইট্রাস অক্সাইড ৬% ও অন্যান্য গ্যাস ১৩% ক্ষতি করে।

○ প্রশ্ন-৭০. সিএফসি (CFC) কি? এটা কি ক্ষতি করে?

উত্তর : সিএফসি হচ্ছে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (Chloro Floro Carbon)। এটি রেফ্রিজারেটর থেকেও নির্গত হয়। এ গ্যাস উর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ফুটো করে দেয়। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। এতে মানুষের চর্ম ক্যান্সার ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৭১. ওজোন স্তরের ক্ষতির কারণ কি কি?

উত্তর : রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশন, এরোসেল, নিউক্লিয়ার ও পারমাণবিক প্ল্যান্ট, উড়োজাহাজ ও বোমারু বিমান থেকে প্রচুর পরিমাণে CFC (Chloro Floro Carbon) নির্গত হয়ে আবহাওয়া জগতে প্রবেশ করে ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন করে।

○ প্রশ্ন-৭২. ওজোন স্তরের ক্ষয়ের ফলে জীবজগতের ওপর কি প্রভাব পড়বে?

উত্তর : ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে জীবজগতের জন্য ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসবে। এর ফলে জীবজগতে নিম্নোক্ত প্রভাব দেখা যাবে—

১. প্রাণিদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হবে।
২. প্রাণিদের চোখের ছানি, ত্বকের ক্যান্সার এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির উদ্ভব ঘটবে।
৩. অতিবেগুনি রশ্মি খাদ্যশস্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হবে।
৪. উদ্ভিদের পাতা আকারে ছোট হবে এবং বৃক্ষ ও অরণ্য নির্মূল হয়ে যাবে।
৫. ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যাবে।
৬. খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ শৈবাল, প্লাঙ্কটন প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-৭৩. তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণজনিত কারণে মানবদেহের ওপর কি প্রভাব পড়ে?

উত্তর : তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্রিয়ার ফলে মানবদেহের ক্রোমোজোমের ডিএনএ (DNA)-র গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এর প্রভাব বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। বংশগতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের বস্তিদেশ এক্স-রে করালেও গর্ভের শিশুটি জন্মগত বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ হতে পারে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রথমত বমি বমি ভাব, বমি, অজীর্ণতা, ক্ষুধাহীনতা, দুর্বলতা, ঠোঁট ফেটে যাওয়া, চামড়ার নিচে বা মুখ থেকে আপনা আপনি রক্তক্ষরণ, চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে।

○ প্রশ্ন-৭৪. আর্সেনিক কি? পানিতে কিভাবে আর্সেনিক দূষণ ঘটে?

উত্তর : আর্সেনিক একটি স্ফটিকাকার ধাতব মৌল। এটি পানিতে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার। তবে বাংলাদেশে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য ঘটে এবং পানির আর্সেনিক দূষণ ঘটে।

মাটিতে যৌগ হিসেবে আর্সেনিক থাকে। নলকূপের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর পানিশূন্য হয়। নলকূপের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন এ পানিশূন্য স্তরে পৌঁছে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক মুক্ত করে।

(AS) পাইরেট + $O_2 \rightarrow$ AS + ----------

এই মুক্ত আর্সেনিক নলকূপের পানির সাথে মিশে উপরে উঠে আসে।

○ প্রশ্ন-৭৫. আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে মানুষের কি রোগ হয়?

উত্তর : আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে বা শরীরে আর্সেনিকের দূষণ ঘটলে তাৎক্ষণিক ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা যায়। একে আর্সেনিকোসিস বলে। এর ফলে মানুষের–

১. গায়ের চামড়ায় বাদামি বা কালো রংয়ের দাগ দেখা দেয়।
২. হাত ও পায়ের তালু খসখসে হয় এবং ফুসকুড়ির ন্যায় ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়।
৩. হাতে পায়ে লাল ছোপ এবং কুষ্ঠের মতো ঘা হয়।
৪. জন্ডিস দেখা দেয় এবং কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
৫. পেটে যন্ত্রণা হয় এবং বমি বা রক্তবমি হয়।

○ প্রশ্ন-৭৬. আর্সেনিক দূষণ রোধকল্পে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

উত্তর : পানিতে আর্সেনিকের দূষণ রোধ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। দেখা গেছে, দু'শ ফুট থেকে চার'শ ফুট নিচের স্তরে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। অবশ্য একহাজার ফুট নিচের স্তরেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে। তাই–

ii. **মরুভূমির বৈশিষ্ট্য :** গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের তাপ বৃদ্ধি পেলে মাটিতে পানির পরিমাণ কমে যাবে। ফলে সমগ্র ভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবে। আমাদের দেশের উত্তরাঞ্চলে ইতোমধ্যে মরুভূমির বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। এতে ফসল উৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে।

iii. **বনাঞ্চল ধ্বংস :** পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদের জীবনধারণের স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট হবে। এর ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

iv. **এসিড বৃষ্টি :** গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার ফলে আবহাওয়ামণ্ডলে বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বাড়ছে। এসব ক্ষতিকর অক্সাইডসমূহ বৃষ্টির পানির সাথে এসিড বৃষ্টি হিসেবে ভূপৃষ্ঠে পড়বে এবং ভূপৃষ্ঠের উর্বরতা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাবে এবং বনাঞ্চলে এসিড বৃষ্টি হলে বনাঞ্চল ধ্বংস হয়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-৬৮. গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া রোধে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া রোধে করণীয় বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

– যেসব গ্যাস ভূমণ্ডলের উত্তাপ বাড়ায়, তাদের নির্গমন কমাতে হবে।
– জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। যেমন–
  ক. অযথা ঘরের বাতি জ্বালিয়ে না রাখা।
  খ. রান্নার সময়টুকু ছাড়া গ্যাসের চুলা বন্ধ রাখতে হবে।
  গ. উন্নত চুলা ব্যবহার করলে জ্বালানি খরচ কমবে, গ্যাস নির্গমন হ্রাস পাবে।
– জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করতে হবে।
– বনায়ন বাড়াতে হবে। কারণ গাছ ক্ষতিকর গ্যাস শোষণ করে থাকে। গাছ অক্সিজেন দিয়ে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে।
– শিল্পকারখানায় যতটা সম্ভব জ্বালানি সাশ্রয় করতে হবে।
– পচাডোবা ও মজাপুকুর সংরক্ষণ করে মাছ চাষ করতে হবে। কারণ পচা পানিতে ক্ষতিকর গ্যাস উৎপন্ন হয়।

সর্বোপরি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সকলকে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

○ প্রশ্ন-৬৯. কি কি গ্যাস গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টি করে?

উত্তর : কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (CFC), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) ও অন্যান্য কিছু গ্যাস গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টির জন্য দায়ী। এদের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ৪৯%, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ১৪%, মিথেন ১৮%, নাইট্রাস অক্সাইড ৬% ও অন্যান্য গ্যাস ১৩% ক্ষতি করে।

○ প্রশ্ন-৭০. সিএফসি (CFC) কি? এটা কি ক্ষতি করে?

উত্তর : সিএফসি হচ্ছে ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন (Chloro Floro Carbon)। এটি রেফ্রিজারেটর থেকেও নির্গত হয়। এ গ্যাস ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ফুটো করে দেয়। ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছে। এতে মানুষের চর্ম ক্যান্সার ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৭১. ওজোন স্তরের ক্ষতির কারণ কি কি?

উত্তর : রেফ্রিজারেশন, এয়ার কন্ডিশন, এরোসেল, নিউক্লিয়ার ও পারমাণবিক প্ল্যান্ট, উড়োজাহাজ ও বোমারু বিমান থেকে প্রচুর পরিমাণে CFC (Chloro Floro Carbon) নির্গত হয়ে আবহাওয়া জগতে প্রবেশ করে ওজোন স্তরের ক্ষতিসাধন করে।

○ প্রশ্ন-৭২. ওজোন স্তরের ক্ষয়ের ফলে জীবজগতের ওপর কি প্রভাব পড়বে?

উত্তর : ওজোন স্তরের ক্ষয়ের কারণে জীবজগতের জন্য ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি পৃথিবীতে চলে আসবে। এর ফলে জীবজগতে নিম্নোক্ত প্রভাব দেখা যাবে—

১. প্রাণিদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে এবং প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হবে।
২. প্রাণিদের চোখের ছানি, ত্বকের ক্যান্সার এবং অন্যান্য মারাত্মক ব্যাধির উদ্ভব ঘটবে।
৩. অতিবেগুনি রশ্মি খাদ্যশস্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হবে।
৪. উদ্ভিদের পাতা আকারে ছোট হবে এবং বৃক্ষ ও অরণ্য নির্মূল হয়ে যাবে।
৫. ফসলের রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেড়ে যাবে।
৬. খাদ্য উৎপাদনকারী সবুজ শৈবাল, প্লাঙ্কটন প্রভৃতি ধ্বংস হয়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-৭৩. তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণজনিত কারণে মানবদেহের ওপর কি প্রভাব পড়ে?

উত্তর : তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্রিয়ার ফলে মানবদেহের ক্রোমোজোমের ডিএনএ (DNA)-র গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এর প্রভাব বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। বংশগতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের বস্তিদেশ এক্স-রে করালেও গর্ভের শিশুটি জন্মগত বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ হতে পারে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রথমত বমি বমি ভাব, বমি, অজীর্ণতা, ক্ষুধাহীনতা, দুর্বলতা, ঠোঁট ফেটে যাওয়া, চামড়ার নিচে বা মুখ থেকে আপনা আপনি রক্তক্ষরণ, চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে।

○ প্রশ্ন-৭৪. আর্সেনিক কি? পানিতে কিভাবে আর্সেনিক দূষণ ঘটে?

উত্তর : আর্সেনিক একটি স্ফটিকাকার ধাতব মৌল। এটি পানিতে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার। তবে বাংলাদেশে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য ঘটে এবং পানির আর্সেনিক দূষণ ঘটে।

মাটিতে যৌগ হিসেবে আর্সেনিক থাকে। নলকূপের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর পানিশূন্য হয়। নলকূপের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন এ পানিশূন্য স্তরে পৌঁছে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক মুক্ত করে।

(AS) পাইরেট + $O_2 \rightarrow$ AS + ----------

এই মুক্ত আর্সেনিক নলকূপের পানির সাথে মিশে উপরে উঠে আসে।

○ প্রশ্ন-৭৫. আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে মানুষের কি রোগ হয়?

উত্তর : আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে বা শরীরে আর্সেনিকের দূষণ ঘটলে তাৎক্ষণিক ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা যায়। একে আর্সেনিকোসিস বলে। এর ফলে মানুষের–

১. গায়ের চামড়ায় বাদামি বা কালো রংয়ের দাগ দেখা দেয়।
২. হাত ও পায়ের তালু খসখসে হয় এবং ফুসকুড়ির ন্যায় ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়।
৩. হাতে পায়ে লাল ছোপ এবং কুষ্ঠের মতো ঘা হয়।
৪. জন্ডিস দেখা দেয় এবং কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
৫. পেটে যন্ত্রণা হয় এবং বমি বা রক্তবমি হয়।

○ প্রশ্ন-৭৬. আর্সেনিক দূষণ রোধকল্পে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

উত্তর : পানিতে আর্সেনিকের দূষণ রোধ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। দেখা গেছে, দু'শ ফুট থেকে চার'শ ফুট নিচের স্তরে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। অবশ্য একহাজার ফুট নিচের স্তরেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে। তাই–

ক. যে কোনো স্তরে বসানো নলকূপের পানিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প পানীয় জলের উৎস স্থাপন করতে হবে।

খ. আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিলের, পুকুরের বা নদীর পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে।

গ. ফিল্টারের সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করতে হবে।

ঘ. ব্যাপকভাবে মাটির নিচের পানির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক উৎসের পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

ঙ. নলকূপগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর সেচ ও পানীয় জলের জন্য প্রত্যেক গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় একটা বড় পুকুর বা দীঘি খনন বা একটা জলাধার নির্মাণ করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ।

চ. পুকুরগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে আবর্জনা, মলমূত্র এবং কৃষি জমি থেকে আসা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এ পানিতে না পড়ে।

○ প্রশ্ন-৭৭. পলিথিন কি?

উত্তর : পলিথিন সাদা অস্বচ্ছ কঠিন প্লাস্টিক। অতি উচ্চ চাপে (৫০০-১০০০ বায়ুচাপ) এবং ১০০-২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সামান্য অক্সিজেনের উপস্থিতিতে তরলীকৃত ইথিলিন যৌগের অসংখ্য অণু পরস্পর মিলিত হয়ে পলিথিন উৎপন্ন করে।

○ প্রশ্ন-৭৮. কৃষিক্ষেত্রে ও মানুষের ওপর প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব লিখুন।

উত্তর : পলিথিন হলো একপ্রকার পলিমার জাতীয় যৌগ। এর উৎপাদনকালে সম্পূর্ণ পলিমার ঘটে না এবং এ সময় বিভিন্ন মনোমারিক ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় যা অত্যন্ত বিষাক্ত।

কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব : পলিথিন মাটির উর্বরতা নষ্ট করে উদ্ভিদ জগতের ক্ষতি সাধন করে। ফসলের জমিতে পলিথিন সামগ্রী একবার পতিত হলে তা জৈব অবক্ষয়যোগ্য নয় বলে অপরিবর্তিত থাকে এবং এতে মাটির রন্ধ্রে বায়ু প্রবেশ করতে পারে না; মাটিতে উদ্ভিদের উপকারী ব্যাকটেরিয়া মারা যায়, মাটির স্তরে পলিথিন থাকলে উদ্ভিদের শিকড় পলিথিন ভেদ করে গভীরে যেতে পারে না এবং উদ্ভিদ তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি সংগ্রহে ব্যর্থ হয়। ফলে উদ্ভিদ অনুকূল পরিবেশ হারায় বলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ঘটে না; ফসলও হয় না।

মানুষের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব : প্লাস্টিকসামগ্রী জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি। প্লাস্টিক দহনে নির্গত হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের সৃষ্টি করে। প্লাস্টিকসামগ্রী থেকে নির্গত বিষাক্ত উপাদানগুলো মানুষের ক্যান্সার, ফুসফুসে সমস্যা, স্নায়ুতন্ত্রে বৈকল্য এমনকি জন্মত্রুটি ঘটায়। প্লাস্টিকজাত সামগ্রী উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পেট্রোক্যামিক্যালজাত উপাদান সংশ্লিষ্ট থাকে বলে এ শিল্পসংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী এবং শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্লাস্টিক কারখানার শ্রমিকরা নানা জটিল রোগে ভোগে এবং তাদের জীবনীশক্তি কমে আসে।

○ প্রশ্ন-৭৯. এসিড বৃষ্টি কি ও কেন হয়?

উত্তর : শিল্প এলাকায় বায়ুতে বিভিন্ন রকম দূষিত গ্যাস মিশ্রিত থাকে। কলকারখানার চিমনি, গাড়ি ইত্যাদি থেকে নির্গত ধোঁয়ার সাথে বিষাক্ত ও দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি গ্যাস মিশ্রিত থাকে যা বাতাসে মিশ্রিত হয়ে বাতাস দূষিত করে ফেলে। বৃষ্টির পানির সাথে বায়ুতে মিশ্রিত এসব গ্যাস মিশে নাইট্রিক এসিড, কার্বনিক এসিড, সালফিউরিক এসিড প্রভৃতি এসিডের সৃষ্টি হয় এবং মাটিতে পড়ে। এগুলোই এসিড বৃষ্টি নামে পরিচিত। ভারত ও স্কটল্যান্ডসহ পৃথিবীর শিল্পপ্রধান অঞ্চলে কখনও কখনও এ বৃষ্টিপাত হতে দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৮০. বায়ুপ্রবাহ কেমন করে হয়?

উত্তর : পৃথিবীপৃষ্ঠের কোনো স্থান সূর্যের তাপে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে তখন ঐ স্থানের বায়ুও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে ঐ বায়ুর আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং তার ঘনত্ব কমে যায়। তখন বায়ু হালকা হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং ঐ স্থানে বায়ুর চাপ কমে যায়। এসময় উচ্চ চাপযুক্ত ঠাণ্ডা অঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বায়ু বায়ুচাপের সমতা রক্ষার জন্য ঐ স্থানে ছুটে যায়। এভাবেই বায়ু প্রবাহ সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলের বাতাস দিনের বেলায় উত্তপ্ত হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং ঐ খালি জায়গা পূরণের জন্য সমুদ্রের ওপরের ঠাণ্ডা বায়ু স্থলের দিকে চলে আসে। রাতের বেলায় চলে এর বিপরীত প্রক্রিয়া। এজন্য সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে দিনরাত প্রবল বায়ুপ্রবাহ চলে।

প্রশ্ন-৮১. খাদ্য-শৃঙ্খল কি?

উত্তর : খাদ্যের উৎপাদন থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ খাদক পর্যন্ত শৃঙ্খল আকারে খাদ্য ও খাদকের যে সরল ধারাবাহিকতা দেখা যায়, তাকে বলা হয় খাদ্য-শৃঙ্খল।

নিচে খাদ্য-শৃঙ্খলের একটি রেখাচিত্র দেয়া হলো :

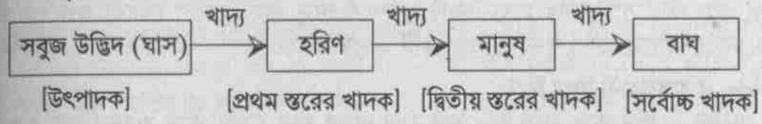

○ প্রশ্ন-৮২. বাংলাদেশে পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ কত? এ বনাঞ্চলে কি কি প্রাণী ও উদ্ভিদ জন্মে?

উত্তর : বাংলাদেশের বন এলাকার অর্ধেকেরও বেশি এলাকা জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বন। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও সিলেট জুড়ে এ বন রয়েছে। পাহাড়ি বনভূমির পরিমাণ ১৩.৬১ লাখ একর। পাহাড়ি বনের প্রধান প্রধান গাছ হচ্ছে সেগুন, গর্জন, চাপালিশ, কড়ই, তেলসুর, গামারী, জারুল ও চম্পা। এছাড়া প্রচুর বাঁশ জন্মে। হাতি, হরিণ, বাঘ, বানর, ভল্লুক, বনমুরগি ইত্যাদি প্রাণী এ বনে দেখতে পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-৮৩. এরোসল কি? এর ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তুকণার নাম এরোসল। এরোসল প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়, আবার মানুষও এরোসল তৈরি করছে। প্রাকৃতিক এরোসলের উৎস হিসেবে আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণকে উল্লেখ করা যায়। এর ফলে এরোসলের মেঘ তৈরি হয়। মানুষের তৈরি এরোসলের মধ্যে রয়েছে প্রপোলান্ট বা চাপসৃষ্টিকারী হিসেবে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লোরো কার্বন। চুলের স্প্রে, দুর্গন্ধনাশক, পালিশ ও অন্যান্য ভোগ্যসামগ্রীতে মানুষের তৈরি এরোসল ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৮৪. ইকোপার্ক কি?

উত্তর : মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সাথে পর্যটনের চাহিদা বাড়ে। পর্যটন শিল্প বহুক্ষেত্রে পরিবেশ অবক্ষয়ের কারণ হয়েছে। বহু দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের আশায় পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ না করেই পর্যটন আকর্ষণের যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তাতে দীর্ঘমেয়াদি স্থানীয় পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অপরদিকে পর্যটন মানুষের বিনোদনগত চাহিদা মেটায়। এর প্রয়োজনীয়তাও আছে। স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে পর্যটন আকর্ষণের জন্য যে পার্ক স্থাপন করা হয় তাই ইকোপার্ক। এ পার্কে প্রকৃতির সংরক্ষণমূলক কার্যক্রমই প্রধান।

প্রশ্ন-৮৫. আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে? এর উপাদান কয়টি ও কি কি?

উত্তর : প্রতিদিনের গড় তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাতের তথ্যের ভিত্তিতে কোনো এলাকায় যে অবস্থা প্রকাশ করে তাকেই আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ হতে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ৫টি। যথা : (১) বায়ুর তাপ, (২) বায়ুর চাপ, (৩) বায়ুপ্রবাহ, (৪) বায়ুর আর্দ্রতা ও (৫) বারিপাত।

প্রশ্ন-৮৬. SMOG কি?

উত্তর : SMOKE ও FOG শব্দ দুটির মিশ্রিত নাম SMOG। SMOKE অর্থ ধোঁয়া ও FOG অর্থ কুয়াশা। আর ধোঁয়া ও কুয়াশা মিলে হয় ধোঁয়াশা। শিল্পায়িত ভিক্টোরিয়ান যুগে শিল্পাঞ্চলে কুয়াশার সাথে ধোঁয়া মিশে এ ধোঁয়াশার সৃষ্টি হতো। তখন হতেই SMOG শব্দটি প্রচলিত। এ SMOG অবস্থা বেশিক্ষণ বিরাজ করলে মানুষের ফুসফুসে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৮৭. বায়োম কাকে বলে?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জলবায়ু ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্ম নেয় এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরূপ কোনো অঞ্চলের জীব সমষ্টিকে একত্রে বায়োম বলে। সুন্দরবন এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রশ্ন-৮৮. পরিবেশবাদী ফ্রিজ কি?

উত্তর : প্রচলিত ফ্রিজগুলোতে ভেতরের চেম্বার ঠান্ডা রাখার জন্য CFC গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ গ্যাস ওজোন স্তর ক্ষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে বর্তমানে ফ্রিজে CFC-র পরিবর্তে গ্যাজোলিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এগুলোই হলো পরিবেশবাদী ফ্রিজ। অর্থাৎ যে ফ্রিজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পরিবেশে CFC গ্যাস ছড়ায় না তাকেই পরিবেশবাদী ফ্রিজ বলা হয়।

প্রশ্ন-৮৯. SPM কি? ঢাকা শহরে এর মান কত?

উত্তর : শহরাঞ্চলের দূষিত বাতাসে যেসব ক্ষতিকর উপাদান; যেমন– সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতি থাকে তাদেরকে Suspended Perticulated Matter বা SPM বলে। ঢাকার বাতাসে SPM-এর মাত্রা ৪৬০ মিগ্রা/কিউবিক মিটার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাপ অনুযায়ী এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ২০০ মিগ্রা/কিউবিক মিটার। ঢাকা বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক পরিবেশ দূষিত নগরী।

প্রশ্ন-৯০. নাইট্রোজেন চক্র কি?

উত্তর : নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হলো বায়ু। বায়ুর নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মরণ এবং পচনের পর নাইট্রোজেন আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এভাবে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণের ভারসাম্য রক্ষা হয়। নাইট্রোজেন বায়ু থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পুনরায় মাটি হয়ে বায়ুতে ফিরে যাওয়ার চক্রকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

প্রশ্ন-৯১. পরিবেশ বান্ধব উপাদান কি?

উত্তর : মানুষের ব্যবহৃত যেসব উপাদান পরিবেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকে, তাকে পরিবেশ বান্ধব উপাদান বা Environmental Friendly Items বলে।

প্রশ্ন-৯২. লোকালয়ে কলকারখানা স্থাপন করা উচিত নয় কেন?

উত্তর : লোকালয়ে কলকারখানা স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ–

ক. কলকারখানার ধোঁয়া সেখানকার বাতাস দূষিত করে।

খ. কলকারখানায় অব্যবহৃত ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে তৈরি দ্রব্যাদি ঠিকমতো অপসারণ না করলে অনেক সময় সেসব পচে গিয়ে মাটি এবং বাতাস উভয়ই দূষিত হতে পারে।

গ. অনেক সময় উপজাত দ্রব্য হিসেবে কারখানার বর্জ্য পদার্থসমূহ নদী বা অন্য কোনো জলাশয়ে ফেলা হয়। এতে উক্ত জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে সেখানকার মাছ জাতীয় প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। ঐ দূষিত পানি ব্যবহার করলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

ঘ. লোকালয়ের মধ্যে উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী কলকারখানা স্থাপন করলে সেখানকার অধিবাসীরা শব্দ দূষণের শিকার হতে পারে।

পরিবেশ বিষয়ক কিছু পদের সংজ্ঞা
Definition of some terms related to environment

i. **দূষণ (Pollution) :** বায়ু পানি বা মাটিতে কোনো উপাদানের অন্তর্ভুক্তির ফলে যদি পরিবেশের প্রাকৃতিক গুণাগুণ বিনষ্ট হয় তখন একে দূষণ বলে। দূষণের ফলে কখনো কখনো প্রকৃতিতে ক্ষতিকর উপাদানের অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানের অপসারণও ঘটতে পারে।

ii. **দূষক (Pollutant) :** কোনো বস্তু বা ঘটনা সার্বিক বিচারে যা পরিবেশের কিংবা পরিবেশের অর্ন্তগত উপকারী কোনো জীব বা বস্তুর উপর 'নীট' ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাকে পরিবেশের দূষক বলে। অর্থাৎ যে বস্তু কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থায় প্রকৃতিতে এমন পরিমাণে উপস্থিত থাকে যার ফলে পরিবেশ মানুষের বা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন একে দূষক বলে। যেমন– লেড, মার্কারি, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড প্রভৃতি।

iii. **সংক্রামক (Contaminate) :** যে বস্তু পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত থাকে না, কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বা কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে পরিবেশে যুক্ত হয়, তাকে পরিবেশের সংক্রামক বলে। একে সংক্রমণজনিত দূষক বা বহিঃদূষকও বলে। পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থায় Cl_2 গ্যাস উপস্থিত থাকে না। কিন্তু গ্যাসটি যদি কোনো উৎস থেকে (যেমন–পরিবহন সিলিন্ডার) পরিবেশে প্রবেশ করে তখন তা পরিবেশের একটি সংক্রামক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পরিবেশের প্রবিষ্ট বা যুক্ত হওয়া ক্লোরিনের পরিমাণ যখন জীব ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন মাত্রায় পৌঁছায় তখন পরিবেশের জন্য এটি দূষক হয়।

iv. **উৎস (Source) :** উৎসই হলো দূষকের গোড়া। যন্ত্রযান থেকে নিঃসরিত বস্তু হলো CO, NO_2 দূষকের উৎস। জলাভূমি থেকে নির্গত গ্যাস মিথেনের উৎস।

v. **গ্রাহক (Receptor) :** দূষক দ্বারা আক্রান্ত যে কোনো Organism বা জীবজন্তুকে গ্রাহক বলে। যেমন– মানুষ হলো ধোঁয়াশা বা Smog এর গ্রাহক, কারণ এটি চোখে জ্বালা সৃষ্টি করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটায়। মানুষ আর্সেনিক দূষিত পানি পান করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে মানুষ আর্সেনিকের (AS) একটি গ্রাহক।

vi. **আধার (Sink) :** যে বস্তু বা মাধ্যমে বহুদিন পর্যন্ত কোনো দূষক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা টিকে থাকে, তাকে আধার বা ধারক বলে। যেমন– SO_2 তথা H_2SO_4 বায়ুমণ্ডলের একটি দূষক। ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসার পর চুনাপাথরের সাথে বিক্রিয়ায় $CaSO_4$ আকারে এটি আটকা পড়ে। চুনাপাথর তাই H_2SO_4- এর একটি আধার বা ধারক।

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

সমুদ্র হলো বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধার বা ধারক।

○ প্রশ্ন-৮৫. আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে? এর উপাদান কয়টি ও কি কি?

উত্তর : প্রতিদিনের গড় তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাতের তথ্যের ভিত্তিতে কোনো এলাকায় যে অবস্থা প্রকাশ করে তাকেই আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ হতে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ৫টি। যথা : (১) বায়ুর তাপ, (২) বায়ুর চাপ, (৩) বায়ুপ্রবাহ, (৪) বায়ুর আর্দ্রতা ও (৫) বারিপাত।

○ প্রশ্ন-৮৬. SMOG কি?

উত্তর : SMOKE ও FOG শব্দ দুটির মিশ্রিত নাম SMOG। SMOKE অর্থ ধোঁয়া ও FOG অর্থ কুয়াশা। আর ধোঁয়া ও কুয়াশা মিলে হয় ধোঁয়াশা। শিল্পায়িত ভিক্টোরিয়ান যুগে শিল্পাঞ্চলে কুয়াশার সাথে ধোঁয়া মিশে এ ধোঁয়াশার সৃষ্টি হতো। তখন হতেই SMOG শব্দটি প্রচলিত। এ SMOG অবস্থা বেশিক্ষণ বিরাজ করলে মানুষের ফুসফুসে নানাবিধ সমস্যা দেখা দেয়।

○ প্রশ্ন-৮৭. বায়োম কাকে বলে?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট এলাকার জলবায়ু ও তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্ম নেয় এবং জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এরূপ কোনো অঞ্চলের জীব সমষ্টিকে একত্রে বায়োম বলে। সুন্দরবন এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

○ প্রশ্ন-৮৮. পরিবেশবাদী ফ্রিজ কি?

উত্তর : প্রচলিত ফ্রিজগুলোতে ভেতরের চেম্বার ঠাণ্ডা রাখার জন্য CFC গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ গ্যাস ওজোন স্তর ক্ষয়ে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে বর্তমানে ফ্রিজে CFC-র পরিবর্তে গ্যাজোলিয়াম নামক মৌলিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এগুলোই হলো পরিবেশবাদী ফ্রিজ। অর্থাৎ যে ফ্রিজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে পরিবেশে CFC গ্যাস ছড়ায় না তাকেই পরিবেশবাদী ফ্রিজ বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৯. SPM কি? ঢাকা শহরে এর মান কত?

উত্তর : শহরাঞ্চলের দূষিত বাতাসে যেসব ক্ষতিকর উপাদান; যেমন– সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতি থাকে তাদেরকে Suspended Perticulated Matter বা SPM বলে। ঢাকার বাতাসে SPM-এর মাত্রা ৪৬০ মিগ্রা/কিউবিক মিটার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাপ অনুযায়ী এর গ্রহণযোগ্য মাত্রা ২০০ মিগ্রা/কিউবিক মিটার। ঢাকা বর্তমানে বিশ্বের সর্বাধিক পরিবেশ দূষিত নগরী।

○ প্রশ্ন-৯০. নাইট্রোজেন চক্র কি?

উত্তর : নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হলো বায়ু। বায়ুর নাইট্রোজেন বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মরণ এবং পচনের পর নাইট্রোজেন আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এভাবে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণের ভারসাম্য রক্ষা হয়। নাইট্রোজেন বায়ু থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদে, উদ্ভিদ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পুনরায় মাটি হয়ে বায়ুতে ফিরে যাওয়ার চক্রকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

○ প্রশ্ন-৯১. পরিবেশ বান্ধব উপাদান কি?

উত্তর : মানুষের ব্যবহৃত যেসব উপাদান পরিবেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকে, তাকে পরিবেশ বান্ধব উপাদান বা Environmental Friendly Items বলে।

○ প্রশ্ন-৯২. লোকালয়ে কলকারখানা স্থাপন করা উচিত নয় কেন?

উত্তর : লোকালয়ে কলকারখানা স্থাপন করা উচিত নয়। কারণ–

ক. কলকারখানার ধোঁয়া সেখানকার বাতাস দূষিত করে।

খ. কলকারখানায় অব্যবহৃত ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে তৈরি দ্রব্যাদি ঠিকমতো অপসারণ না করলে অনেক সময় সেসব পচে গিয়ে মাটি এবং বাতাস উভয়ই দূষিত হতে পারে।

গ. অনেক সময় উপজাত দ্রব্য হিসেবে কারখানার বর্জ্য পদার্থসমূহ নদী বা অন্য কোনো জলাশয়ে ফেলা হয়। এতে উক্ত জলাশয়ের পানি দূষিত হয়ে সেখানকার মাছ জাতীয় প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে। ঐ দূষিত পানি ব্যবহার করলে মানুষের ক্ষতি হতে পারে।

ঘ. লোকালয়ের মধ্যে উচ্চশব্দ সৃষ্টিকারী কলকারখানা স্থাপন করলে সেখানকার অধিবাসীরা শব্দ দূষণের শিকার হতে পারে।

পরিবেশ বিষয়ক কিছু পদের সংজ্ঞা
Definition of some terms related to environment

i. **দূষণ (Pollution) :** বায়ু পানি বা মাটিতে কোনো উপাদানের অন্তর্ভুক্তির ফলে যদি পরিবেশের প্রাকৃতিক গুণাগুণ বিনষ্ট হয় তখন একে দূষণ বলে। দূষণের ফলে কখনো কখনো প্রকৃতিতে ক্ষতিকর উপাদানের অন্তর্ভুক্তি ছাড়াও পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদানের অপসারণও ঘটতে পারে।

ii. **দূষক (Pollutant) :** কোনো বস্তু বা ঘটনা সার্বিক বিচারে যা পরিবেশের কিংবা পরিবেশের অর্ন্তগত উপকারী কোনো জীব বা বস্তুর উপর 'নীট' ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তাকে পরিবেশের দূষক বলে। অর্থাৎ যে বস্তু কঠিন, তরল বা বায়বীয় অবস্থায় প্রকৃতিতে এমন পরিমাণে উপস্থিত থাকে যার ফলে পরিবেশ মানুষের বা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন একে দূষক বলে। যেমন– লেড, মার্কারি, সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন-মনোক্সাইড প্রভৃতি।

iii. **সংক্রামক (Contaminate) :** যে বস্তু পরিবেশের স্বাভাবিক অবস্থায় উপস্থিত থাকে না, কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বা কোনো দুর্ঘটনার মাধ্যমে পরিবেশে যুক্ত হয়, তাকে পরিবেশের সংক্রামক বলে। একে সংক্রমণজনিত দূষক বা বহিঃদূষকও বলে। পরিবেশে স্বাভাবিক অবস্থায় Cl_2 গ্যাস উপস্থিত থাকে না। কিন্তু গ্যাসটি যদি কোনো উৎস থেকে (যেমন–পরিবহন সিলিন্ডার) পরিবেশে প্রবেশ করে তখন তা পরিবেশের একটি সংক্রামক হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পরিবেশের প্রবিষ্ট বা যুক্ত হওয়া ক্লোরিনের পরিমাণ যখন জীব ও সম্পদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে এমন মাত্রায় পৌঁছায় তখন পরিবেশের জন্য এটি দূষক হয়।

iv. **উৎস (Source) :** উৎসই হলো দূষকের গোড়া। যন্ত্রযান থেকে নিঃসরিত বস্তু হলো CO, NO_2 দূষকের উৎস। জলাভূমি থেকে নির্গত গ্যাস মিথেনের উৎস।

v. **গ্রাহক (Receptor) :** দূষক দ্বারা আক্রান্ত যে কোনো Organism বা জীবজন্তুকে গ্রাহক বলে। যেমন– মানুষ হলো ধোঁয়াশা বা Smog এর গ্রাহক, কারণ এটি চোখে জ্বালা সৃষ্টি করে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসে ব্যাঘাত ঘটায়। মানুষ আর্সেনিক দূষিত পানি পান করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে মানুষ আর্সেনিকের (AS) একটি গ্রাহক।

vi. **আধার (Sink) :** যে বস্তু বা মাধ্যমে বহুদিন পর্যন্ত কোনো দূষক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা টিকে থাকে, তাকে আধার বা ধারক বলে। যেমন– SO_2 তথা H_2SO_4 বায়ুমণ্ডলের একটি দূষক। ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসার পর চুনাপাথরের সাথে বিক্রিয়ায় $CaSO_4$ আকারে এটি আটকা পড়ে। চুনাপাথর তাই H_2SO_4- এর একটি আধার বা ধারক।

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

সমুদ্র হলো বায়ুমণ্ডলীয় কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধার বা ধারক।

vii. **দূষকের চলার পথ বা দূষকের পথ পরিক্রমা (Path ways of pollutant) :** একটি দূষক যে কৌশলে এর উৎস থেকে পরিবেশের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তার লাভ করে তাকে দূষকটির চলার পথ বা দূষকের পথ পরিক্রমা বলে। যেমন– পরিবেশে পারদের চলার পথ।

$$Hg^{++} \xrightarrow[\text{ব্যাকটেরিয়া}]{\text{অবায়ুজীবী}} CH_3Hg^+ \text{ প্লাঙ্কটন} \rightarrow \text{ছোট মাছ} \rightarrow \text{বড় মাছ} \rightarrow \text{মানুষ}$$

viii. **স্পেসিয়েশন (Speciation) :** পরিবেশে উপস্থিত একই মৌল জৈব, অজৈব, জৈব-ধাতব, জারিত, বিজারিত প্রভৃতি নানাবিধ রাসায়নিক অবস্থায় বিরাজ করতে পারে এবং রাসায়নিক অবস্থাভেদে পরিবেশের উপর এর প্রভাবও ভিন্ন হয়। তাই একটি দূষকের রাসায়নিক প্রজাতি (Chemical species) শনাক্ত করা দরকার। কারণ কিছু দূষক বা প্রজাতি অন্য প্রজাতি থেকে বেশি বিষাক্ত। যেমন– মিথাইল মার্কারি, CH_3Hg^+, $(CH_3)_2$ Hg অন্যান্য মার্কারি যৌগ থেকে অধিকতর বিষাক্ত। পারদের পানি দূষণ বলতে মূলত উক্ত দুই রাসায়নিক অবস্থায় পারদের পানি দূষক বুঝায়। জলাশয়ে পারদ প্রবেশ করলে পানিতে পারদ দূষণ ঘটছে কি না তা জানার জন্য পারদের রাসায়নিক অবস্থা জানা প্রয়োজন হয়। তাই পানিতে অজৈব পারদ ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে এক সময়ে জৈব পারদে অর্থাৎ CH_3Hg^+ রূপান্তরিত হতে পারে।

ix. **দ্রবীভূত অক্সিজেন (Dissolve Oxygen) :** অক্সিজেন হলো জীবন রক্ষাকারী হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্রবীভূত অক্সিজেন হলো পানিতে বিরাজমান একটি প্রজাতি। এটি পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। এটি জৈব যৌগের জারণে বা বিজারক পদার্থ দ্বারা পানিতে উদ্ভব ঘটে। এটি হলো গুরুত্বপূর্ণ পানির গুণাগুণ পরিমাপক বা প্যারামিটার (Parameter)। উত্তম গুণাগুণ সম্পন্ন পানির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ DO-এর মান 4-6 mg/of DO, যা water body সুস্বাস্থ্যসম্পন্ন aquatic জীবন নিশ্চিত করে। DO-এর মান যত কম হবে তত পানিতে দূষণ নির্দেশ করে।

x. **TD50 (Toxic Dose-50) :** কোনো ড্রাগের যে পরিমাণ বা dose প্রয়োগ করলে 50% প্রাণীর মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিষাক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাকে Medium Toxic Dose বলে।

xi. **MLD (Minimum Lethal Dose) :** প্রাণীর মধ্যে বাঁধাদানকারী জন্মানো জীবাণুসমূহকে ধ্বংস করতে কোনো ড্রাগের যে পরিমাণ বা dose প্রয়োজন হয় তাকে Minimum Lethal Dose বা MLD বলে।

xii. **PT (Persistence Time) :** যে সময়ের মধ্যে একটি কীটনাশক বা পেস্টিসাইড প্রয়োগ করার পর সাধারণ পরিবেশে তার 95% সক্রিয়তা হারায় সেই সময়কে PT বা Persistence Time বলে।

xiii. **সহনীয় মাত্রা ও অনুমোদিত মাত্রা (Tolerance level and recomended level) :** কোনো সংক্রামকের (Contaminant) সাপেক্ষে পানির গুণগত মান প্রকাশ করতে এ স্থিতিমাপ দু'টি ব্যবহার করা হয়। পানিতে একটি সংক্রামক (Contaminant) যে মাত্রার উর্ধ্বে উপস্থিত থাকলে পানীয় হিসেবে সে পানি ব্যবহার করা যায় না, সংক্রামকের সে মাত্রাকে পানীয় পানির জন্য তার সহনীয় মাত্রা বলে। সংক্রামকের অনুমোদিত মাত্রা এর সহনীয় মাত্রার নিচে নির্ধারিত থাকে। যেখানে পানীয় পানির উন্নততর উৎস পাওয়া যায় সেখানে এমন একটি উৎসের পানি ব্যবহার করা উচিত নয়, যাতে সংক্রামকটি তার অনুমোদিত মাত্রার উর্ধ্বে অবস্থান করে।

অধ্যায়
০৯

খাদ্য ও পুষ্টি
Food & Nutrition

*Syllabus— **Food and Nutrition :** Elements of food; carbohydrates; protein; fats and lipid; vitamins; types and sources of carbohydrates, proteins; nutritional value; menu of balanced diet; the pyramid of balanced diet; body mass index (BMI); fast food or junk food; preservation of food; various processes of storing food; use of chemicals for preservation of foods and its physiological effects.*

○ প্রশ্ন-১. খাদ্য কি? খাদ্যের কাজ কি?

উত্তর : যেসব জৈব উপাদান গ্রহণ করলে জীবদেহের গঠন ও ক্ষয়পূরণ এবং শক্তি উৎপাদন সাধিত হয় সেসব উপাদানকে খাদ্য বলে।

খাদ্যের কাজ : দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন, তাপ উৎপাদন, শক্তি উৎপাদন, পেশী পরিচালনা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে শরীরকে সুস্থ, সবল ও কার্যক্ষম রাখা ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২. বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : খাদ্য অনেকগুলো রাসায়নিক বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এ রাসায়নিক বস্তুগুলোকেই খাদ্যের উপাদান বলা হয়। অন্য কথায়, খাদ্যের যেসব রাসায়নিক পদার্থ দেহ গঠন করে, দেহের ক্ষয়পূরণ করে, দেহে তাপশক্তি উৎপন্ন করে এবং রোগ প্রতিরোধ করে শরীর সুস্থ রাখে সেসব রাসায়নিক পদার্থকে খাদ্যের উপাদান বলে।

খাদ্যের উপাদান ছয়টি

ক. **প্রোটিন** (Proteins) : মূল গঠন উপাদান হিসেবে প্রোটিন দেহের বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে।

খ. **শর্করা** (Carbohydrates) : শর্করা প্রধান শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান।

গ. **স্নেহ পদার্থ** (Fats) : স্নেহ পদার্থ শক্তি উৎপাদন করে। তবে স্নেহ পদার্থের শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা শর্করার প্রায় দ্বিগুণ।

ঘ. **ভিটামিন** (Vitamins) : পুষ্টির কাজে এবং দেহ সংরক্ষণে ভিটামিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঙ. **খনিজ লবণ** (Mineral Elements) : খনিজ লবণও দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণে অংশ নেয়।

চ. **পানি** (Water) : পানি দেহের গঠন ও বিভিন্ন কাজের সমন্বয় সাধন করে।

○ প্রশ্ন-৩. শর্করা কি?

উত্তর : শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এক ধরনের জৈব পদার্থ। শর্করা হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগ।

○ প্রশ্ন-৪. শর্করার কাজ কি?

উত্তর : দেহের তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই শর্করার প্রধান কাজ। এটি স্নেহজাতীয় পদার্থের দহনে সহায়তা করে, আমাদেরকে কিটোসিস নামক রোগ হতে রক্ষা করে। অতিরিক্ত শর্করা দেহে গ্লাইকোজেনরূপে সঞ্চিত থাকে; খাদ্যে শর্করার অভাব হলে গ্লাইকোজেন দেহের কর্মশক্তি উৎপন্ন করে। এছাড়াও এটা আমিষ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণে সহায়তা করে।

○ প্রশ্ন-৫. খাদ্যে শর্করার অভাবজনিত ফল কি?

উত্তর : শর্করার অভাবে স্নেহজাতীয় পদার্থের দহন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে পারে না। ফলে শরীরে এক ধরনের বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং 'কিটোসিস' রোগের সৃষ্টি হয়। খাদ্যে শর্করার স্বল্পতা থাকলে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন এবং অবশেষে সঞ্চিত চর্বি ও আমিষ ভেঙ্গে শক্তি উৎপন্ন হয়। এর ফলে দেহের ওজন কমতে থাকে, ক্ষুধা বেড়ে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কর্মদক্ষতা হ্রাস পায়।

○ প্রশ্ন-৬. মনোস্যাকারাইড কি?

উত্তর : মনো অর্থ এক। একটি স্যাকারাইড গ্রুপ নিয়ে যে শর্করা গঠিত তার নাম এক শর্করা বা মনোস্যাকারাইড। মনোস্যাকারাইড সরল শর্করা। একে মৌলিক শর্করাও বলা যায়। দ্বিশর্করা ও বহুশর্করা পরিপাকের মাধ্যমে সরল শর্করায় পরিণত হয়ে দেহে শোষণযোগ্য হয়। মানবদেহের পুষ্টির জন্য সরল শর্করা অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মনুষ্যদেহ শুধুমাত্র সরল শর্করাই শোষণ করতে পারে। গ্লুকোজ (Glucose), ফ্রুকটোজ (Fructose) এবং গ্যালাকটোজ (Galactose) এ তিনটি সরল শর্করা বা মনোস্যাকারাইড। এদের গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে দেহে পরিবাহিত হয়।

○ প্রশ্ন-৭. কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তর : কার্বোহাইড্রেট হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সমন্বয়ে গঠিত এক প্রকার জৈব রাসায়নিক পদার্থ। কার্বোহাইড্রেটের প্রতি অণু কার্বনের সাথে দুই অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেন থাকে। কার্বোহাইড্রেটকে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

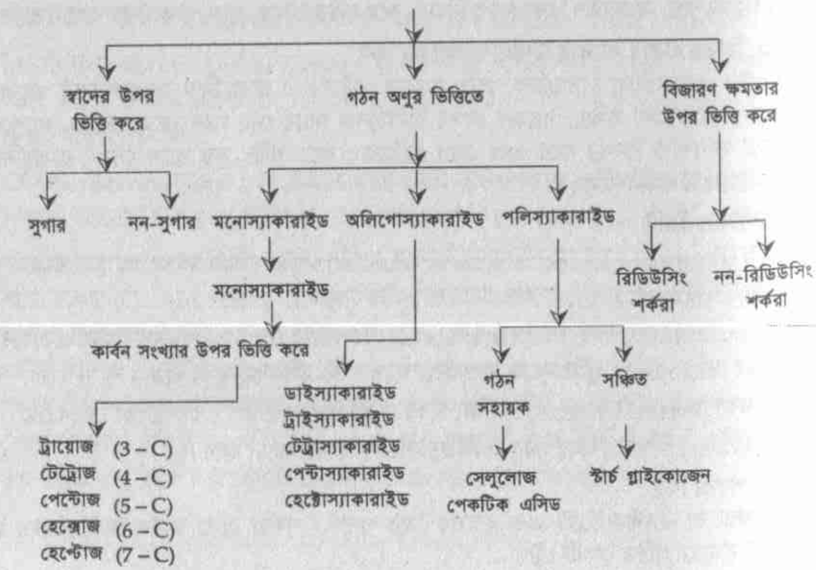

ক. স্বাদের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটের এর শ্রেণীবিভাগ :

স্বাদের উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেট ২ প্রকার। যথা–১. সুগার এবং ২. নন-সুগার

১. সুগার : এরা মিষ্ট, দানাদার এবং পানিতে দ্রবণীয়, যেমন— গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ইত্যাদি।

২. নন-সুগার : এরা মিষ্ট নয়, অদানাদার এবং পানিতে অদ্রবণীয়, যেমন— স্টার্চ, সেলুলোজ, গ্লাইকোজেন ইত্যাদি।

খ. গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ :

গঠন অণুর ভিত্তিতে কার্বোহাইড্রেটকে প্রধানত ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

যথা— ১. মনোস্যাকারাইড (Monosaccharide)
২. অলিগোস্যাকারাইড (Oligosaccharide)
এবং ৩. পলিস্যাকারাইড (Polysaccharide)

১. **মনোস্যাকারাইড :** যে কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে আর কোনো সরল কার্বোহাইড্রেট একক পাওয়া যায় না সেগুলোই মনোস্যাকারাইড। যেমন— ট্রায়োজ, টেট্রোজ, পেন্টোজ, হেক্সোজ ইত্যাদি।

২. **অলিগোস্যাকারাইড :** যেসব কার্বোহাইড্রেটকে হাইড্রোলাইসিস করলে ২ থেকে ১০ অণু মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাদেরকে অলিগোস্যাকারাইড বলে। যেমন— সুক্রোজ, মল্টোজ, র‍্যাফিনোজ ইত্যাদি।

৩. **পলিস্যাকারাইড :** যে কার্বোহাইড্রেটকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অনেকগুলো মনোস্যাকারাইড অণু পাওয়া যায় তাকে পলিস্যাকারাইড বলে। যেমন— স্টার্চ, সেলুলোজ ইত্যাদি।

গ. বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে শ্রেণীবিভাগ :

বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে কার্বোহাইড্রেটকে ২টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

যথা—১. রিডিউসিং বা বিজারক শর্করা এবং ২. নন রিডিউসিং বা অবিজারক শর্করা

১. **রিডিউসিং শর্করা :** যে সব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইড ও কিটোনমূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে তাদেরকে রিডিউসিং শর্করা বলে। যেমন—সুক্রোজ, ফ্রুক্টোজ ইত্যাদি।

২. **নন রিডিউসিং শর্করা :** যেসব কার্বোহাইড্রেটের অ্যালডিহাইড ও কিটোনমূলক মুক্ত অবস্থায় থাকে না এবং যারা ফেলিং বিকারক, বেনিডিক্ট বিকারক, বারফোর্ড বিকারকগুলোর সাথে কোনোরূপ বিক্রিয়া ঘটায় না তাদেরকে নন রিডিউসিং শর্করা বলে। যেমন— শর্করা।

○ প্রশ্ন-৮. রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করার মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : নিম্নে রাইবোজ ও ডিঅক্সিরাইবোজ শর্করার মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো—

রাইবোজ	ডিঅক্সিরাইবোজ
১. RNA এর অপরিহার্য উপাদান।	১. DNA এর অপরিহার্য উপাদান।
২. গাঢ় HCl এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে ফারফিউরাল এসিড তৈরি করে।	২. গাঢ় HCl এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লেভুলিনিক এসিড তৈরি করে।
৩. আণবিক গঠনে ৫টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।	৩. আণবিক গঠনে ৪টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে।
৪. ২নং কার্বন পরমাণুর সাথে –OH গ্রুপ থাকে।	৪. ২নং কার্বন পরমাণুর সাথে— OH গ্রুপ থাকে না।

○ প্রশ্ন-৩. স্টার্চ কি? এর ধর্ম ও ব্যবহার লিখুন

উত্তর : স্টার্চ (starch) : উদ্ভিদে স্টার্চ (শ্বেতসার) সঞ্চিত পদার্থরূপে বিরাজ করে। ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট চিনির অধিকাংশই পরিবর্তিত হয়ে স্টার্চ-এ পরিণত হয়। স্টার্চ সাধারণত ঘনীভূত দানা

হিসেবে (Starch grain) উদ্ভিদ কোষে বিরাজ করে এবং এদের দানার আকার ও আকৃতি বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন রকম। বীজ, ফল, কন্দ (tuber) প্রভৃতি সঞ্চয়ী অঙ্গে স্টার্চ জমা থাকে। ধান, গম, আলু স্টার্চের প্রধান উৎস।

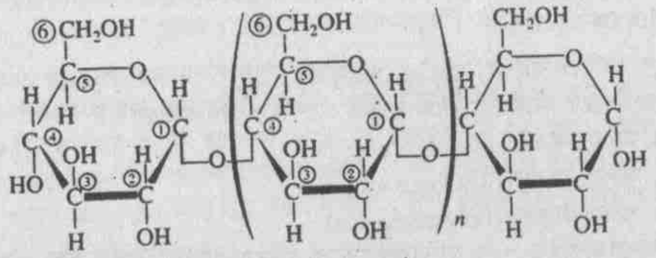

চিত্র : স্টার্চ-এর গঠন।

স্টার্চের ধর্ম (Properties of starch) :

১. স্টার্চ গন্ধহীন, বর্ণহীন, স্বাদহীন এক প্রকার সাদা নরম অদানাদার পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ।
২. সাধারণ তাপমাত্রায় স্টার্চ পানিতে, ইথার ও অ্যালকোহলে অদ্রবণীয়।
৩. আয়োডিন দ্রবণে স্টার্চ নীলবর্ণ ধারণ করে।
৪. উচ্চ তাপমাত্রায় স্টার্চ ভেঙ্গে ডেক্সট্রিনের বড় বড় কণায় পরিণত হয়।
৫. ফেহলিং দ্রবণ স্টার্চ কর্তৃক বিজারিত হয় না।

স্টার্চের ব্যবহার (Uses of starch) : স্টার্চ প্রধানত খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়। আঁশযুক্ত শাকসবজি স্টার্চে পরিপূর্ণ থাকে। কাগজের মূল উপাদান স্টার্চ।

○ প্রশ্ন-৯. সেলুলোজ কি? এর ধর্ম ও ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : সেলুলোজ (Cellulose) : সেলুলোজ উদ্ভিদের একটি প্রধান গাঠনিক পদার্থ। উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত। অসংখ্য β-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β-১-৪ কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ তৈরি করে। উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদ দেহে যেহেতু কোনো কঙ্কাল নেই, সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ।

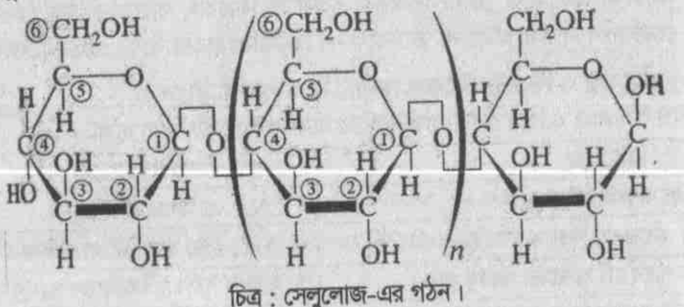

চিত্র : সেলুলোজ-এর গঠন।

সেলুলোজের ধর্ম : সেলুলোজ স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা ও কঠিন জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। এটি পানিতে অদ্রবণীয়, অবিজারক, আণবিক ওজন দুই লক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ। এটি মিষ্টি বিবর্জিত এবং বিজারণ ক্ষমতাহীন। আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে কোনো রঙ দেয় না। এটি ফাইবার সদৃশ ও শক্ত। এর কোনো পুষ্টিগুণ নেই।

সেলুলোজের ব্যবহার :

১. সেলুলোজ কাগজ ও বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপাদান।
২. এটি নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. এটি এসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহার করা হয়।
৪. নির্মাণ সামগ্রী ও আসবাবপত্র তৈরিতে সেলুলোজ প্রধান উপাদান হিসেবে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদান করে থাকে।
৫. কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পুষ্টিনালীতে বসবাসকারী এক ধরনের পরজীবী সেলুলোজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্যে করে।

○ প্রশ্ন-১০. গ্লাইকোজেন কি? এর ধর্ম ও ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : গ্লাইকোজেন (Glycogen) : গ্লাইকোজেন হলো একটি পুষ্টিজাত পলিস্যাকারাইড। এটি প্রাণিদেহের প্রধান সঞ্চিত খাদ্য উপাদান হলেও সায়ানোব্যাকটেরিয়া (নীলাভ সবুজ শৈবাল) ও কতিপয় ছত্রাকের (ঈস্ট) সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিরাজ করে।

গ্লাইকোজেনের ধর্ম (Properties of Glycogen) :

১. গ্লাইকোজেন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়।
২. এটি সাদা পাউডার জাতীয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ।
৩. আয়োডিন দ্রবণ প্রয়োগে লালচে বেগুনি বর্ণ ধারণ করে।
৪. ঠাণ্ডা পানিতে এটি সাসপেনশন তৈরি করে।

গ্লাইকোজেনের ব্যবহার (Uses of Glycogen) :

১. পেশীতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন পেশীর কাজে শক্তি যোগায়।
২. যকৃতের গ্লাইকোজেন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়।
৩. রক্ত এর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

○ প্রশ্ন-১১. স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : নিম্নে স্টার্চ ও সেলুলোজের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

স্টার্চ	সেলুলোজ
১. স্টার্চ অণুতে প্রায় 1,200 থেকে 6,000 গ্লুকোজ একক	১. সেলুলোজ প্রায় 300 থেকে 3,000 গ্লুকোজ
α-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	একক β-গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
২. এটি হলো α-D গ্লুকোজ পলিমার।	২. এটি হলো β-D গ্লুকোজ পলিমার।
৩. স্টার্চ অণু শাখান্বিত গ্লুকোজ পলিমার।	৩. সেলুলোজ অণু অশাখান্বিত অর্থাৎ সরল শিকল পলিমার।

○ প্রশ্ন-১২. জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : কার্বোহাইড্রেট জীবদেহের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে, যেমন—

জীবের শক্তির ভাণ্ডার ও উদ্ভিদের গঠনশৈলীর প্রধান কার্বোহাইড্রেট। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ, স্টার্চ, সেলুলোজ প্রভৃতি সবই হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট শ্রেণিভুক্ত জৈব যৌগ। মানুষের তিনটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় এর অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান কার্বোহাইড্রেট থেকেই আসে। আমাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম বাহন কাগজ তৈরি হয় কার্বোহাইড্রেট থেকে। অনেক শিল্পের কাঁচামাল হিসেবেও কার্বোহাইড্রেট ব্যবহৃত হয়।

কার্বোহাইড্রেট কোষে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়ে জীবদেহে প্রয়োজনীয় শক্তি যোগান দেয়। এগুলো জীবদেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে বিদ্যমান থাকে। এরা অ্যামিনো এসিড ও ফ্যাটি এসিড বিপাকে সহায়তা করে। কার্বোহাইড্রেট DNA, RNA ও এনজাইম গঠন করে। এরা উদ্ভিদদেহের গাঠনিক উপাদান হিসেবে বিদ্যমান থাকে। কোষপ্রাচীর গঠনে কার্বোহাইড্রেট প্রধান ভূমিকা রাখে।

o প্রশ্ন-১৩. কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জাতীয় খাদ্যের উৎস কি কি?

উত্তর : যে সব খাবারে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকে তাকে শর্করা জাতীয় খাদ্য বলে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা এ জাতীয় খাদ্যই বেশি খেয়ে থাকি। কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে আমরা শর্করা পেয়ে থাকি। যেমন : চাল, আটা, ময়দা, ভুট্টা, চিনি, গুড় ইত্যাদি।

o প্রশ্ন-১৪. প্রোটিন কি? প্রোটিনের কাজ কি কি?

উত্তর : প্রোটিন হচ্ছে কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দ্বারা গঠিত একটি জটিল জৈব যৌগ, যার প্রতিটি অণু বহুসংখ্যক অ্যামাইনো এসিড অণু দিয়ে গঠিত এবং অ্যামাইনো এসিডগুলো পেপটাইড বন্ধ দ্বারা পরস্পরযুক্ত।

কাজ : ১. প্রোটিন দেহের কোষ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ একক। ২. দেহের বাফার পদ্ধতি (Buffer System) গঠন করে। ৩. প্লাজমা প্রোটিনের লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে দেহরস ও রক্তের কলয়ডাল অসমোটিক চাপ রক্ষা করে। ৪. শক্তি সরবরাহ করে। ৫. এনজাইম ও হরমোন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

o প্রশ্ন-১৫. আমিষ জাতীয় খাদ্যের উৎস কি?

উত্তর : আমিষ বা প্রোটিন চারটি মৌলিক উপাদান– কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। কখনো কখনো ফসফরাস, লৌহ এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদানও আমিষে উপস্থিত থাকে। আমিষ অ্যামাইনো এসিডের জটিল যৌগ। পরিপাক প্রক্রিয়ায় এটি সরল ও শোষণ উপযোগী অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়।

o প্রশ্ন-১৬. আমিষের অভাবজনিত ফল কি?

উত্তর : আমিষের অভাবে দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এটি শিশুদের বেলায় বেশি দেখা যায়। এর ফলে ওজন হ্রাস পায়, ত্বক ও চুলের রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, মেজাজ খিটখিটে হয়। মানসিক দিক থেকে শিশু অসুস্থ হয়ে পড়ে। ২-৪ বছর বয়সের শিশুদের কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।

o প্রশ্ন-১৭. সম্পূরক প্রোটিন বা মিশ্র প্রোটিন কি? বিভিন্ন খাদ্যের সংমিশ্রণে সম্পূরক প্রোটিন তৈরি করার উপায় কি?

উত্তর : সম্পূরক প্রোটিন বা মিশ্র প্রোটিন : নিম্নমানের কয়েকটি প্রোটিনজাতীয় খাদ্য একত্রে মিশিয়ে খেলে সেই মিশ্রিত খাদ্যে সীমিত অ্যামাইনো এসিডের ঘাটতি পূরণ হয়। একাধিক প্রোটিনের অ্যামাইনো এসিডগুলো একত্রে মিলিত হয়ে পরস্পরের জৈবমূল্য বর্ধিত করে। উদ্ভিদজাত খাদ্যের সীমিত অ্যামাইনো এসিডগুলোর ঘাটতি পূরণ করার জন্য সেই অ্যামাইনো এসিড সমৃদ্ধ অন্য খাদ্য যোগ করে যে মিশ্র প্রোটিন পাওয়া যায় তাকেই সম্পূরক প্রোটিন বলা হয়।

সম্পূরক প্রোটিন তৈরির উপায়

ক. চালের সীমিত অ্যামাইনো এসিড লাইসিন পূরণ করার জন্য চালের সাথে দুধ যোগ করে পায়েশ, ফিরনী, ক্ষীর রান্না করা।

খ. ডালের সীমিত অ্যামাইনো এসিড মিথিওনিনের অভাব পূরণের জন্য ডালের সাথে চাল মিশিয়ে খিচুরি বা গম মিশিয়ে হালিম রান্না করা।

গ. ভাতের সাথে মাছ বা ডাল পরিবেশন করা।

ঘ. দুধের সাথে রুটি পরিবেশন করা।

ঙ. ডাল দিয়ে রুটি খাওয়া।

চ. মুগ, মসুর, ছোলা, মটর, মাষকলাই, অড়হর সব রকম ডাল সমপরিমাণ মিশিয়ে রান্না করা।

o প্রশ্ন-১৮. প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

উত্তর : প্রোটিন হলো উচ্চ আণবিক ওজন বিশিষ্ট বৃহৎ অণুর জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা হাইড্রোলাইসিস প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড উৎপন্ন করে।

নিম্নে প্রোটিনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো—

১. প্রোটিন কলয়েড প্রকৃতির, অধিকাংশ কেলাসিত।
২. এটি পানিতে, লঘু এসিডে, ক্ষার এবং মৃদু লবণের দ্রবণে দ্রবণীয়।
৩. বহুবিধ ভৌত প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো যায়।
৪. প্রোটিন কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন নিয়ে গঠিত। এতে সালফার, তামা ও আয়রণ থাকে।
৫. একে আর্দ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যামিনো এসিড পাওয়া যায়।
৬. এসিড প্রয়োগ করলে প্রোটিন তঞ্চিত হয়। এতে আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়।
৭. বহুবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রোটিনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

o প্রশ্ন-১৯. প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান কি?

উত্তর : ২০ প্রকার অ্যামিনো এসিডই প্রোটিনের প্রধান রাসায়নিক উপাদান। এছাড়াও যুগ্ম প্রোটিনে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক এসিড ইত্যাদি থাকে।

o প্রশ্ন-২০. উদাহরণসহ প্রোটিনের শ্রেণীবিন্যাস আলোচনা করুন।

উত্তর : American Society of Biological Chemists এবং American Physiological Society 'র যৌথভাবে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসারে প্রোটিনের শ্রেণিবিভাগ নিম্নরূপ :

প্রোটিন

সরল প্রোটিন	সংযুক্ত প্রোটিন	উদ্ভূত প্রোটিন
— অ্যালবুমিন	— নিউক্লিওপ্রোটিন	— প্রোটিওজ
— গ্লোবিউলিন	— গ্লাইকো-মিউকোপ্রোটিন	— পেপটাইড
— গ্লুটেলিন	— ক্রোমোপ্রোটিন	— পলিপেপটাইড
— প্রোলামিন	— ফসফোপ্রোটিন	
— স্ক্লেরোপ্রোটিন	— লিপোপ্রোটিন	
— হিস্টোন	— মেটালোপ্রোটিন	
— প্রোটামিন		

প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ : ভৌত, রাসায়নিক গুণাবলি এবং দ্রবণীয়তার ভিত্তিতে প্রোটিনকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

ক. সরল প্রোটিন (Simple protein), খ. যুগ্ম প্রোটিন (Conjugated proteins) এবং গ. উৎপাদিত প্রোটিন (Derived protein)।

ক. সরল প্রোটিন (Simple proteins) : যে প্রোটিনকে এনজাইম বা এসিড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র এমিনো এসিড পাওয়া যায়, তাকে সরল প্রোটিন বলে। দ্রবণীয়তার (Solubility) উপর ভিত্তি করে সরল প্রোটিনকে আবার ৭ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা :

১. অ্যালবিউমিন (Albumins) : যে সব প্রোটিন পানিতে সহজে দ্রবীভূত হয়ে ঘোলাটে দ্রবণ সৃষ্টি করে, তাকে অ্যালবিউমিন বলে। এরা পানিতে এবং লঘু দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপ দিলে এরা জমাট বাঁধে। বার্লির β-অ্যামাইলেজ অ্যালবিউমিন-এর উদাহরণ। ডিমের সাদা অংশে, রক্তরসে ও দুধে এ প্রোটিন আছে।

২. গ্লোবিউলিন (Globulins) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, তবে লঘু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে এরাও জমাট বাঁধে। বীজে এ ধরনের প্রোটিন বেশি থাকে। ডিমের কুসুম, রক্তরসেও গ্লোবিউলিন থাকে।

৩. গ্লুটেলিন (Glutelins) : এরা পানিতে অদ্রবণীয়। লঘু অ্যাসিড বা লঘু ক্ষার দ্রবণে দ্রবণীয়। তাপে এরা জমাট বাঁধে না। শস্যদানায় এ জাতীয় প্রোটিন অধিক থাকে। গমের গ্লুটেনিন (Glutenin) এবং চালের অরাইজেনিন (orygenin) গ্লুটেলিন প্রোটিনের উদাহরণ।

৪. প্রোলামিন (Prolamines) : যেসব প্রোটিন অ্যালকোহলে (৭০-৮০%) দ্রবীভূত হয়, তাকে প্রোলামিন বলে। হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা প্রচুর প্রোলিন ও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে। ভুট্টার জেইন (zein), গম ও রাইয়ের গ্লিয়াডিন (gliadin) এবং বার্লির হর্ডিন (hordein) প্রোলামিন প্রোটিনের উদাহরণ।

৫. হিস্টোন (Histones) : এ জাতীয় প্রোটিন পানিতে দ্রবণীয়। এদের মধ্যে বেশি পরিমাণে ক্ষারীয় (Basic) অ্যামিনো এসিড (যেমন-আরজিনিন, লাইসিন) থাকে। এরা তাপে জমাট বাঁধে না। এদেরকে নিউক্লিয়াসে এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথে বেশি দেখা যায়।

৬. প্রোটামিন (Protamines) : এরা সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রোটিন। প্রোটামিনগুলো পানিতে এবং অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড-এ দ্রবণীয়। এতে ক্ষারীয় অ্যামিনো এসিড (যেমন- আরজিনিন) বেশি থাকে। এদেরকে নিউক্লিয়াসে পাওয়া যায় এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের সাথেও দেখা যায়। প্রোটামিন-এ কোনো সালফার থাকে না এবং টাইরোসিন ও ট্রিপটোফ্যানও থাকে না। এরা তাপে জমাট বাঁধে না।

৭. স্ক্লেরোপ্রোটিন (Scleroproteins) : এরা পানি, মৃদু লবণ দ্রবণে দ্রবণীয় নয়। প্রাণিদেহের হাড়, চুল, নখ, ত্বক, সংযোগ টিস্যুতে এই প্রোটিন বেশি থাকে।

খ. যুগ্ম প্রোটিন (Conjugated proteins) : যে প্রোটিনের সাথে কোনো অপ্রোটিন অংশ (প্রোসথেটিক গ্রুপ- prosthetic group) যুক্ত থাকে তাকে বলা হয় কনজুগেটেড_প্রোটিন বা যুগ্ম প্রোটিন। কনজুগেটেড প্রোটিনকে সাধারণত নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. নিউক্লিওপ্রোটিন (Nucleoproteins) : হাইড্রোলাইসিস করলে যে প্রোটিন থেকে একটি সরল প্রোটিন ও একটি নিউক্লিক এসিড পাওয়া যায় তা হলো নিউক্লিওপ্রোটিন। এরা পানিতে দ্রবণীয়।

২. গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন (Glycoproteins or Mucoproteins) : প্রোটিনের সাথে বিভিন্ন ধরনের (বিশেষ করে মনোস্যাকারাইড) কার্বোহাইড্রেট যুক্ত হলে, তাকে গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন বলে। সেল মেমব্রেন-এ গ্লাইকোপ্রোটিন বা মিউকোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

৩. লিপোপ্রোটিন (Lipoproteins) : সরল প্রোটিন ও লিপিড এর সংমিশ্রণে গঠিত হয় লিপোপ্রোটিন। বিভিন্ন মেমব্রেনের গাঠনিক উপাদান হিসেবে লিপোপ্রোটিন পাওয়া যায়।

৪. ক্রোমোপ্রোটিন (Chromoproteins) : সরল প্রোটিনে রঞ্জক পদার্থ যুক্ত হয়ে ক্রোমোপ্রোটিন সৃষ্টি করে। ফ্ল্যাভোপ্রোটিন, বিলিপ্রোটিন, ক্যারটিনয়েড প্রোটিন, ক্লোরোফিল প্রোটিন, হিমোগ্লোবিন প্রোটিন ইত্যাদি হলো ক্রোমোপ্রোটিন।

৫. মেটালোপ্রোটিন (Metalloproteins) : অনেক এনজাইমে অ্যাকটিভ্যাটর হিসেবে কোনো ধাতু বা মেটাল Fe, Mn, Mg, Zn থাকে। ঐ ধাতু বা মেটাল সম্বলিত এনজাইমগুলো হলো মেটালোপ্রোটিন।

৬. ফসফোপ্রোটিন (Phosphoproteins) : যে সরল প্রোটিনের সাথে প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোরিক এসিড যুক্ত থাকে তাকে ফসফোপ্রোটিন বলে। দুধের কেসিনোজেন, ডিমের ভাইটেলিন এ জাতীয় প্রোটিন।

গ. উৎপাদিত প্রোটিন (Derived proteins): এসব প্রোটিন প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় থাকে না। তাপের প্রভাবে এনজাইমের বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অথবা কৃত্রিম উপায়ে প্রোটিন অণু থেকে তৈরি হয়। উদাহরণ-পেপটাইড (Peptides), প্রোটিয়োজ (proteoses)।

০ প্রশ্ন-২১. লিপিড কি? লিপিড-এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : লিপিড (Lipid) : উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে বিদ্যমান একটি গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক পদার্থের নাম লিপিড। কার্বন-হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত স্নেহজাতীয় পদার্থকে লিপিড বলা হয়। লিপিড প্রধানত স্নেহ ও তেলরূপে বিদ্যমান থাকে।

লিপিড-এর বৈশিষ্ট্য

১. লিপিড পানিতে প্রায় অদ্রবণীয়, এটি বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন।
২. এরা ইথার, অ্যালকোহল, বেনজিন, ক্লোরোফর্ম, অ্যাসিটোন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি দ্রবণে দ্রবণীয়।
৩. এরা ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার হিসেবে (Actual or potential) বিরাজ করে।
৪. লিপিড পানির চেয়ে হালকা; তাই এটি পানিতে ভাসে।
৫. হাইড্রোলাইসিস শেষে এরা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারোলে পরিণত হয়।
৬. লিপিডের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

০ প্রশ্ন-২২. লিপিড-এর রাসায়নিক উপাদান কি?

উত্তর : সাধারণভাবে গ্লিসারোল ও ফ্যাটি এসিডের সমন্বয়ে লিপিড গঠিত হয়। ফসফোলিপিড-এ গ্লিসারোল ও ফ্যাটি এসিড ছাড়া ফসফরাস এবং নাইট্রোজেন বেস থাকে। গ্লাইকোলিপিড-এ ফ্যাটি এসিড, সুগার (হেক্সোজ) ও নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থ থাকে। মোম জাতীয় লিপিড-এ গ্লিসারোল-এর পরিবর্তে অ্যালকোহল বা কোলেস্টেরোল থাকে।

০ প্রশ্ন-২৩. লিপিড-এর কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : লিপিড-এর উল্লেখযোগ্য কাজসমূহ নিম্নরূপ :

১. চর্বি ও তেল জাতীয় লিপিড উদ্ভিদ দেহে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। বিভিন্ন তেলবীজের (সরিয়া, তিল, সয়াবিন ইত্যাদি) অঙ্কুরোদগমকালে লিপিড খাদ্যরূপে গৃহীত হয়। এদের বিজারণকালে অধিক ATP তৈরি হয়।
২. ফসফোলিপিড ও গ্লাইকোলিপিড সেলমেমব্রেন ও অন্যান্য (কোষ অঙ্গাণুর) মেমব্রেন গঠনকারী পদার্থ হিসেবে কাজ করে।

৩. মোম জাতীয় লিপিড পাতার বহিরাবরণে স্তর (কিউটিকল) সৃষ্টি করে অতিরিক্ত প্রস্বেদন রোধ করে।
৪. কতিপয় এনজাইমের প্রোসথেটিক গ্রুপ হিসেবে ফসফোলিপিড কাজ করে। এছাড়া ফসফোলিপিড আয়নের বাহক হিসেবেও কাজ করে।
৫. সালোকসংশ্লেষণে গ্লাইকোলিপিড বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৬. প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে লিপোপ্রোটিন গঠন করে এবং লিপোপ্রোটিন শক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে।

o প্রশ্ন-২৪. লিপিডের উৎসমূহ কি কি?

উত্তর : প্রাণিজ উৎস : প্রাণিজ চর্বি, মাখন, ঘি ইত্যাদি।

উদ্ভিদ উৎস : উদ্ভিদের বীজ। যেমন— সয়াবিন, সরিষা, তিল, তিসি, সূর্যমুখী, বাদাম, পাম, নারিকেল, জলপাই ইত্যাদি।

o প্রশ্ন-২৫. স্নেহ পদার্থের উৎস কি?

উত্তর : স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার। যথা– উদ্ভিজ্জ স্নেহ ও প্রাণিজ স্নেহ। কোনো কোনো উদ্ভিদের বীজ থেকে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়। যেমন– সয়াবিন, সরিষা, বাদাম ও সূর্যমুখীর দানা পিষে তেল বের করা হয়। ভোজ্য তেলে ঘি, মাখন এবং চর্বি অপেক্ষা ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ বেশি থাকে। চর্বি, ঘি ও মাখন প্রাণিজ স্নেহ পদার্থের অন্তর্গত। ডিমের কুসুমে স্নেহ পদার্থ রয়েছে, কিন্তু সাদা অংশে স্নেহ পদার্থ নেই।

o প্রশ্ন-২৬. চর্বি ও তেল কি? চর্বি ও তেলের কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : চর্বি (Fat) : যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড সম্পৃক্ত (Saturated) ফ্যাটি এসিড তৈরি করে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) কঠিন অবস্থায় বিরাজ করে, তাকে চর্বি বলে। যেমন—উদ্ভিজ্জ চর্বি, নারকেল তেল ও পাম অয়েল। এর গলনাঙ্ক বেশি।

তেল (Oil) : যে সব ট্রাইগ্লিসারাইড অসম্পৃক্ত (unsaturated) ফ্যাটি এসিড তৈরি করে এবং সাধারণ তাপমাত্রায় (২০° সে.) তরল অবস্থায় থাকে, তাকে তেল বলে। যেমন— সাধারণ ভোজ্য তেল। এর গলনাঙ্ক খুব কম।

চর্বি ও তেলের কাজ : ১. ফল ও বীজে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে জমা থাকে। ২. বীজের অঙ্কুরোদগমকালে কার্বোহাইড্রেট-এ পরিবর্তিত হয়ে বর্ধিষ্ণু চারার খাদ্য ও শক্তি যোগায়।

o প্রশ্ন-২৭. তেল ও চর্বির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন।

উত্তর : নিম্নে তেল ও চর্বির মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

তেল	চর্বি
১. স্বাভাবিক তাপে তরল অবস্থায় থাকে।	১. স্বাভাবিক তাপে কঠিন (solid) অবস্থায় থাকে।
২. এক বা একাধিক দ্বি-বন্ধনীযুক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে।	২. সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড থাকে।
৩. গলনাংক কম। অলেয়িক এসিডের গলনাংক ১৬.৩° সে.।	৩. গলনাংক বেশি। স্টিয়ারিক এসিডের গলনাংক ৬৯.৬° সে.।
৪. পানির সাথে মিশে ইমালশন (emulsion) তৈরি করে।	৪. পানির সাথে মিশে না।
৫. দ্বি-বন্ধনীর সংখ্যা বাড়ার সাথে আয়োডিন মান বাড়ে।	৫. আয়োডিন মান নেই।
৬. উদ্ভিদ তেল প্রধান উৎস।	৬. প্রাণিজ স্নেহ প্রধান খাদ্য উৎস।

o প্রশ্ন-২৮. ক্যালরি কাকে বলে?

উত্তর : একগ্রাম পানির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন, ততটুকু তাপকে এক ক্যালরি বলে। একহাজার ক্যালরিতে এক কিলোক্যালরি। খাদ্য থেকে উৎপন্ন তাপ মাপা হয়

কিলোক্যালরি দিয়ে। দেহে শক্তির চাহিদাও কিলোক্যালরিতে নির্ণয় করা হয়। অতএব পুষ্টিবিজ্ঞানে তাপমাত্রার একক কিলোক্যালরি। কিলোক্যালরির সংজ্ঞা হিসেবে বলা যায়– এক কিলোগ্রাম পানির তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়াতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, সেই পরিমাণ তাপ ১ কিলোক্যালরি।

১ গ্রাম স্নেহপদার্থ থেকে উৎপন্ন হয় ৯ কিলোক্যালরি তাপ।
১ গ্রাম শর্করা থেকে উৎপন্ন হয় ৪ কিলোক্যালরি তাপ।
১ গ্রাম প্রোটিন থেকে উৎপন্ন হয় ৪ কিলোক্যালরি তাপ।

o প্রশ্ন-২৯. ভিটামিন কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : দ্রাব্যতার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

ক. পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন : ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্স (B_1, B_2, B_6, B_7, B_{12} ইত্যাদি), ভিটামিন 'সি' বা এসকরবিক এসিড।

খ. চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন :

ভিটামিন 'এ' বা রেটিনল; ভিটামিন 'ই' বা টোকোফেরল এবং
ভিটামিন 'ডি' বা কেলসিফেরল; ভিটামিন 'কে' বা ফাইলোকুইনন।

প্রশ্ন-৩০. সকল প্রকার ভিটামিনের উৎস ও অভাবজনিত রোগের নাম লিখুন।

উত্তর : নিচে তালিকা আকারে সকল প্রকার ভিটামিনের উৎস ও তাদের অভাবজনিত রোগের নাম দেয়া হলো :

বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের উৎস ও অভাবজনিত রোগ

ভিটামিনের নাম	প্রধান প্রধান উৎস	অভাবজনিত উপসর্গ বা রোগ
i. ভিটামিন A বা রেটিনল (চর্বিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : দুধ, পনির, মাখন, ডিমের কুসুম, কড মাছের যকৃত, তেলযুক্ত মাছ। উদ্ভিজ্জ : ভুট্টা, গাজর, আম, টমেটো, পেঁপে, বাঁধাকপি, পালংশাক।	১. রাতকানা রোগ হয় ২. দেহবৃদ্ধি রহিত হয় ৩. স্নায়ুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ল্যাথারিজমে নিম্নাঙ্গ ব্যাহত হয় ও ভ্রূণের মৃত্যু ঘটে।
ii. ভিটামিন B_1 বা থায়ামিন (পানিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : যকৃত, দুধ, মাংস ও ডিমের হলুদ অংশে। উদ্ভিজ্জ : শস্য জাতীয় খাদ্য, যথা—ঢেঁকিছাটা চাল, মসুর ডাল, গম, মটর, অঙ্কুরিত ছোলা, চিনাবাদাম, ইষ্ট, সয়াবিন ও সবুজ শাকসবজি।	১. বেরিবেরি রোগ হয়। ২. শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, আবেগ প্রবণতা, খিটখিটে মেজাজ, ক্ষুধামান্দ্য, দেহের ওজন হ্রাস ও দুর্বলতা দেখা দেয়। ৩. হজমে গণ্ডগোল, মাথাধরা, অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় করা, পা ভারি হওয়া ও পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়া।
iii. ভিটামিন B_2 বা রাইবোফ্লেভিন (পানিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : দুধ, ডিম, মাংস, মাছ, যকৃত, বৃক্ক, পেশী। উদ্ভিজ্জ : ইষ্ট, চীনাবাদাম, ডাল, কড়াইশুটি, বিন, শিম, অঙ্কুরিত মুগ ও ছোলা, সয়াবিন, বিভিন্ন শস্য ও সবুজ শাকসবজি।	১. ঠোঁটের দুপার্শ্বে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ২. জিহ্বায় প্রদাহ ও ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ৩. ত্বক খসখসে হয়, চুল উঠে যায়। ৪. শিশুদের বৃদ্ধি স্তিমিত হয়। ৫. দৃষ্টি ঝাপসা হয়, পানি পড়ে, চুলকায় ও ছানি পড়ে।
iv. ভিটামিন B_6 বা পাইরিডক্সিন (পানিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : যকৃত, ডিমের কুসুম, মাছ, মাংস ও দুধ। উদ্ভিজ্জ : ঢেঁকিছাটা চাল, ডাল, গম, ভুট্টা, সবুজ শাকসবজি ও ইষ্ট।	১. স্নায়ুর অস্বাভাবিক উদ্দীপনা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ, স্নায়ুতন্ত্রে ক্ষত দেখা দেয়। ২. রক্তশূন্যতা ও মৃগীরোগের মতো আক্ষেপ দেখা দেয়।
v. ভিটামিন B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন (পানিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : মাছ, মাংস, ডিম, বৃক্ক, যকৃত, দুধ ও পনির। ২. রক্তস্বল্পতার সৃষ্টি হয়। ৩. বিভিন্ন প্রান্তীয় অঙ্গ ও কলার স্নায়বিক অনুভূতি লোপ পায়।	১. লোহিত কণিকা অপরিণত থাকে।

ভিটামিনের নাম	প্রধান প্রধান উৎস	অভাবজনিত উপসর্গ বা রোগ
vi. ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড (পানিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : গরুর দুধ, মাছ ও মাংস। উদ্ভিজ্জ : টাট্‌কা টক জাতীয় ফল ও তরিতরকারি, যেমন– কমলালেবু, বাতাবিলেবু, পাতিলেবু, আনারস, আঙ্গুর, আম, জাম, আমলকি, টমেটো প্রভৃতি টক ফল এবং বাঁধাকপি, কাঁচামরিচ, শাক, বরবটি, অঙ্কুরিত ছোলা প্রভৃতি শাকসবজি।	১. স্কার্ভি রোগ হয়। ২. শিশুদের মাড়ি ফুলে যায়, দেহের ওজন হ্রাস পায়, গাঢ় নীল দাগ হয়, গোড়ালি বা কব্জি ফুলে ওঠে, পাঁজরের হাড়ে ব্যথা হয়, দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়ে। ৩. চামড়া শক্ত হয়, রক্তশূন্যতা হয়, দুর্বল লাগে এবং ক্ষত সারতে বা ভাঙা হাড় জোড়া লাগতে দেরি হয়।
vii. ভিটামিন D বা ক্যালসিফেরল (চর্বিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : মাছের তেল ও যকৃত, মৎস্যভুক প্রাণীর যকৃত, তৈলাক্ত মাছের মাংস, কড ও হাঙ্গরের যকৃত-তেল, ডিমের কুসুম। উদ্ভিজ্জ : ভোজ্য তেল।	১. শিশুদের রিকেটস হয় ২. দাঁতের গঠন ব্যহত হয়, দাঁত উঠতে দেরি হয় ৩. বয়স্কা মহিলাদের 'অস্টিও-ম্যালেসিয়া' রোগ হয়।
viii. ভিটামিন E বা টোকোফেরল (চর্বিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : শুধু যকৃতে সামান্য এবং ডিমের কুসুমে প্রচুর পরিমাণে আছে। উদ্ভিজ্জ : বিভিন্ন টাট্‌কা শাক, বিভিন্ন বীজশস্যের তেল, অঙ্কুরিত ছোলা, গম, সয়াবিন প্রভৃতি।	১. পেশীর বিকৃতি দেখায়। ২. প্রজনন শক্তি ব্যাহত হয় ৩. অসম্পৃক্ত চর্বিজাতীয় অ্যাসিড ও অন্যান্য কয়েকটি খাদ্যবস্তুর জারণ বন্ধ করে অপচয় রোধ করে।
ix. ভিটামিন K (চর্বিদ্রাব্য)	প্রাণিজ : শুঁটকি মাছ। উদ্ভিজ্জ : সবুজ শাকসবজি; প্রধানত বাঁধাকপি, টমেটো, পালংশাক, সয়াবিন ইত্যাদি।	রক্তপাত প্রবণতা দেখা দেয়।

○ প্রশ্ন-৩১. বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনের কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : ভিটামিনের কাজ : বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন দেহের গঠনগত ও বিপাকীয় কর্মকাণ্ড প্রভাবিত করে। নিচে এমন কয়েকটি ভিটামিনের কাজ সংক্ষেপে ছকে দেয়া হলো—

ভিটামিন	বিপাকীয় কাজ
১. B_1, B_2, নায়াসিন, B_6, প্যানটোথেনিক এসিড, বায়োটিন।	১. কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ হতে শক্তি উৎপন্নে সাহায্য করে।
২. ফলিক এসিড, B_6, B_{12}, ভিটামিন সি।	২. রক্ত তৈরি করে।
৩. ভিটামিন A, D ও C.	৩. অস্থি ও দাঁত গঠন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।
৪. A, B_1, নায়াসিন, B_6, B_{12}, প্যানটোথেনিক এসিড।	৪. নার্ভ ও পেশীর কাজে।
৫. A, C, B_6, B_2, নায়াসিন।	৫. চামড়ার সুস্থতা রক্ষা করে।
৬. ভিটামিন এ	৬. চোখের সুস্থতা রক্ষা করে।
৭. ভিটামিন K	৭. রক্ত জমাটকরণ।
৮. ভিটামিন ই, সি	৮. রক্ত কোষের ভাঙ্গন রোধ করে।
৯. ভিটামিন ডি (ক্যালসিয়াম বিপাকে)	৯. হরমোনের সাথে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-৩২. হাইপারভিটামিনোসিস কি?

উত্তর : হাইপারভিটামিনোসিস (Hypervitaminosis) : অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' গ্রহণে দেহে বিষাক্ততা দেখা দেয়। চাহিদার অতিরিক্ত ১০০ গুণ বেশি গ্রহণ করলে বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। শিশুদের অনুমোদিত চাহিদা হতে ২০ গুণ বেশি ভিটামিন 'এ' গ্রহণ করলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। বমি বমি ভাব, ক্ষুধামন্দা, মাথা ব্যথা, চামড়ার শুষ্কতা, হাড়ে ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়। তবে ভিটামিন 'এ'-এর গ্রহণ বন্ধ করা হলে এই উপসর্গগুলো মিলে যায়। গর্ভকালীন সময়ে অতিরিক্ত ভিটামিন 'এ' ভ্রূণের ক্ষতিসাধন করে।

○ প্রশ্ন-৩৩ পুষ্টি কি? খাদ্য ও পুষ্টির মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : পুষ্টি হলো জীবের একটি সার্বিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় জীবের নিজ পরিবেশে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে পরিপাক, খাদ্যসার শোষণ, কোষে আত্তীকরণ, দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন ও শক্তি উৎপাদিত হয় এবং অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে পুষ্টি বলে।

অন্যদিকে, যেসব জৈব দ্রব্য আহার করলে জীবদেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং শক্তি উৎপাদন সাধিত হয় তাকে খাদ্য বলে। খাদ্য বিভিন্ন ধরনের আহার্য জৈববস্তু আর পুষ্টি একটি সার্বিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আহার্য বস্তু বা খাদ্য গৃহীত হয়ে পরিপাক, আত্তীকরণ, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি সাধিত হয়। খাদ্যবস্তুর সুপ্ত স্থিতিশক্তি প্রাণিদেহের ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়াই পুষ্টি।

○ প্রশ্ন-৩৪. খাদ্যে পুষ্টিগত গুণাগুণ বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : খাদ্য বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক উপাদান দিয়ে গঠিত। এদের কিছু পুষ্টিসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ এবং কতক অপ্রয়োজনীয়। তবে সব প্রকারের প্রাকৃতিক খাদ্যে পানি, শ্বেতসার/শর্করা, প্রোটিন, চর্বি/তেল, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও আঁশ থাকে। সব খাদ্যেই কম-বেশি পরিমাণে পানি রয়েছে। এতে খাদ্য উপাদানসমূহ দ্রবীভূত থাকে। এছাড়াও অন্যান্য পুষ্টি উপাদানও কম-বেশি পরিমাণে আছে। আমাদের প্রতিদিনকার গৃহীত খাদ্য থেকে কতখানি খাদ্য উপাদান পেয়ে থাকি এবং তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কি না, ইত্যাদি জানার জন্য বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের পরিমাণ জানা আবশ্যক, যাতে করে আহার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

○ প্রশ্ন-৩৫. শস্য জাতীয় খাদ্যে পুষ্টির গুণাগুণ বর্ণনা করুন।

উত্তর : চাল, গম, ভুট্টা, যব, রাই ইত্যাদি হচ্ছে প্রধান শস্যজাতীয় খাদ্য।

বিভিন্ন শস্যদানার পুষ্টিমান (প্রতি ১০০ গ্রামে)

শস্য	শ্বেতসার (গ্রাম)	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	ক্যালরি	ক্যালসিয়াম (মি. গ্রাম)	বি-ভিটামিন (মি. গ্রাম)
আটা	৬৯	১২.১	১.৭	৩৪১	৪৮	৫.০৮
ময়দা	৭৪	১১.০	০.৯	৩৪৮	২৩	২.৫৯
চাল (সিদ্ধ, ঢেকি ছাঁটা)	৭৭	৮.৫	০.৬	৩৪৯	১০	৪.৩৯
চাল (আতপ, কলে ছাঁটা)	৭৮	৬.৮	০.৫	৩৪৫	১০	২.০২
ভুট্টা	৬৬	১১.১	৩.৬	৩৪২	১০	২.৩২
যব	৭৩	১০.৪	১.৯	৩৪৯	২৫	৩.৬০
চিড়া	৭৭	৬.৬	১.২	৩৪৬	২০	৪.২৬
মুড়ি	৭৩	৭.৫	০.১	৩২৫	২২	৪.২২

○ প্রশ্ন-৩৬. প্রোটিন প্রধান খাদ্যে (মাছ ও মাংস) পুষ্টির গুণাগুণ বর্ণনা করুন।

উত্তর : এ শ্রেণীতে ডিম, বিভিন্ন প্রকারের মাছ, মাংস, ডাল, বাদাম, বীচি অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত প্রাণিজ খাদ্য, যেমন ডিম, মাছ, মাংসে উন্নতমানের প্রোটিন ছাড়াও বি-ভিটামিন, স্নেহ পদার্থ ও খনিজ উপাদান পাওয়া যায়। ডাল, বাদাম, বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বেশি থাকলেও কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডের ঘাটতি থাকে।

৩. মোম জা
৪. কতিপয়
আয়নের
৫. সালোক
৬. প্রোটিনে
সাথে জা

○ প্রশ্ন-২৪.
উত্তর : প্রাণিজ
উদ্ভিদ উৎস :
জলপাই ইত্যা

○ প্রশ্ন-২৫.
উত্তর : স্নেহ প
স্নেহ পদার্থ পাও
ভোজ্য তেলে ঘি
স্নেহ পদার্থের অ

○ প্রশ্ন-২৬. চর্বি
উত্তর : চর্বি (F
সাধারণ তাপমাত্র
নারকেল তেল ও
তেল (Oil) : যে
তাপমাত্রায় (২০°
গলনাঙ্ক খুব কম।
চর্বি ও তেলের
অঙ্কুরোদগমকালে

○ প্রশ্ন-২৭. তেল
উত্তর : নিম্নে তেল

১. স্বাভাবিক তাপে
২. এক বা একাধিক
৩. গলনাংক কম। অ
৪. পানির সাথে মিশে
৫. দ্বি-বন্ধনীর সংখ্যা
৬. উদ্ভিদ তেল প্রধা

○ প্রশ্ন-২৮. ক্যালরি
উত্তর : একগ্রাম পানি
এক ক্যালরি বলে।

বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাংসে পুষ্টি মূল্য (১০০ গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	Ca (মি. গ্রাম)	Fe (মি. গ্রা.)	ক
রুই মাছ	১৭.৪	১.৪	৪.৮	৬৫০	১.০	
ইলিশ মাছ	২১.২	১৯.৪	২.৯	১৮০	২.১	
শিং মাছ	১৬.০	১.২	৪.২	৬৭০	২.৩	
চিংড়ী মাছ	১৯.০	১.০	০.৮	৩২৪	৫.৩	
গরুর মাংস	২১	১৪	-	৬	২.৩	
মুরগির মাংস	২০	৪	-	১৪	০.৭	

○ প্রশ্ন-৩৭. দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বর্ণনা করুন।
উত্তর : দুধ একটি প্রকৃতিজাত আদর্শ খাদ্য। দুধ হতে দই, মাখন, পনির, ঘোল, মিষ্টি, আই
শিশুখাদ্য প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি করা হয়।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের পুষ্টিমূল্য (প্রতি ১০০ গ্রামে)

	পানি	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	ক্যালরি	ভিটামিন এ
গরুর দুধ	৮৭.৬	৩.৩	৩.৬	৪.৮	১২০	০.২	৬৭	
টানা দুধ	৯০.০	৩.৫	০.১	৫.১	১২০	০.২	২৯	
গুঁড়া দুধ	২.০	২৬.৪	২৭.৫	৩৮.২	৯৫০	০.৫	৫০২	৩
দই	৯০.৩	২.৯	২.৯	৩.৩	১২০	০.৩	৫১	
পনির	৪০.৩	২৪.১	২৫.১	৬.৩	৭৯০	২.১	৩৪৮	৪

○ প্রশ্ন-৩৮. সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝেন? সুষম খাদ্যের মধ্যে কি কি খাদ্য উপাদান থাকা উ
উত্তর : যে খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে, কলাকোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রা
দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে সুষম খাদ্য বলে।
অন্যকথায়, যে খাদ্যে ছয়টি খাদ্য উপাদানের সবগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক অনুপাতে
রয়েছে এবং যে খাদ্য ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটায়, তাকেই সুষম খাদ্য বলে।
সুষম খাদ্যের খাদ্য উপাদান : সুষম খাদ্যের মধ্যে নিচের খাদ্য উপাদানগুলো থাকা প্রয়োজন। যে

খাদ্যের উপাদান	উদাহরণ
১. দেহ গঠনের উপযোগী খাদ্য বা আমিষ।	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, ছোলা, বাদাম, সয়াবিন, গ
২. শক্তি সরবরাহকারী খাদ্য বা শর্করা ও স্নেহ পদার্থ।	চাল, গম, আলু, চিনি, গুড়, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি
৩. প্রতিরক্ষামূলক খাদ্য বা ভিটামিন ও খনিজ লবণ।	শাকসবজি, দুধ, ফল ইত্যাদি।

বয়স, যৌন পার্থক্য, দৈহিক অবস্থা এবং শ্রমের পার্থক্যের ভিত্তিতে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপা
উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

○ প্রশ্ন-৩৯. কিভাবে একটি সুষম মূল খাদ্য তালিকা তৈরি করা যায়?
উত্তর : কতগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম মূল খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা :

i. প্রথমে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তি বিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থাভেদে
ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
ii. দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য থাকতে হবে।
iii. খাদ্যে দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমিষ সরবরাহ করতে হবে।

দ্যে যথোপযুক্ত ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি থাকতে হবে।
ভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রথমে খাদ্যের মূল
ভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করতে হবে। পরে প্রয়োজনমতো যে কোনো বিভাগ থেকে খাদ্য
ছাই করা যায়। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকতে হবে।
দ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে।
ক্তির বা পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
তু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

৪০. সুষম খাদ্য পরিবেশনে কি কি শর্ত পালন প্রয়োজন?
সুষম খাদ্য দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ক্যালরি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ সরবরাহ করে। সুতরাং
, ভাত-রুটি, শাকসবজি-ফল এসব বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য নিয়েই খাবার সুষম হয়। যেসব শর্ত
খাবার সুষম হয় সেগুলো হলো :
বেলায় খাবারে উক্ত তিন শ্রেণীর খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
্যক শ্রেণীর খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণে পরিবেশন করে পর্যাপ্ত উপাদান সরবরাহে নিশ্চয়তাদান।
প্রস্তুতে সতর্কতা অবলম্বন করে খাদ্য উপাদানের অপচয় রোধ।
ক মোট ক্যালরির ৬০% থেকে ৭০% শর্করাজাতীয় খাদ্য, ৩০% থেকে ৪০% স্নেহজাতীয়
এবং ১০% প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ।
ক মাথাপিছু কমপক্ষে ৩০ গ্রাম তেল (রান্নায়) এবং ২০ গ্রাম গুড়/চিনি পরিবেশন।
প্রস্তুত ও পরিবেশনে যথার্থভাবে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন।

১. আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলতে কি বোঝায়?
আদর্শ খাদ্য পিরামিড : তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচু স্তরে রেখে
পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে
য কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় তাকে আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলে।

চিত্র : আদর্শ খাদ্য পিরামিড

ডের শীর্ষে রয়েছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে শর্করা।

বিভিন্ন প্রকার মাছ ও মাংসে পুষ্টি মূল্য (১০০ গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	চর্বি (গ্রাম)	কার্বোহাইড্রেট (গ্রাম)	Ca (মি. গ্রাম)	Fe (মি. গ্রা.)	ক্যালরি
রুই মাছ	১৭.৪	১.৪	৪.৮	৬৫০	১.০	৯৭
ইলিশ মাছ	২১.২	১৯.৪	২.৯	১৮০	২.১	২৭৩
শিং মাছ	১৬.০	১.২	৪.২	৬৭০	২.৩	১২৪
চিংড়ী মাছ	১৯.০	১.০	০.৮	৩২৪	৫.৩	৮৯
গরুর মাংস	২১	১৪	-	৬	২.৩	১৮০
মুরগির মাংস	২০	৪	-	১৪	০.৭	১২১

○ প্রশ্ন-৩৭. দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : দুধ একটি প্রকৃতিজাত আদর্শ খাদ্য। দুধ হতে দই, মাখন, পনির, ঘোল, মিষ্টি, আইসক্রিম, শিশুখাদ্য প্রভৃতি দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি করা হয়।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের পুষ্টিমূল্য (প্রতি ১০০ গ্রামে)

	পানি	প্রোটিন (গ্রাম)	স্নেহ (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	ক্যালসিয়াম (গ্রাম)	লৌহ (মি. গ্রাম)	ক্যালরি	ভিটামিন এ (মাই. গ্রা.)
গরুর দুধ	৮৭.৬	৩.৩	৩.৬	৪.৮	১২০	০.২	৬৭	-
টানা দুধ	৯০.০	৩.৫	০.১	৫.১	১২০	০.২	২৯	-
গুঁড়া দুধ	২.০	২৬.৪	২৭.৫	৩৮.২	৯৫০	০.৫	৫০২	৩৩৯
দই	৯০.৩	২.৯	২.৯	৩.৩	১২০	০.৩	৫১	-
পনির	৪০.৩	২৪.১	২৫.১	৬.৩	৭৯০	২.১	৩৪৮	৪০০

○ প্রশ্ন-৩৮. সুষম খাদ্য বলতে কি বোঝেন? সুষম খাদ্যের মধ্যে কি কি খাদ্য উপাদান থাকা উচিত?

উত্তর : যে খাদ্যবস্তু দেহের ক্যালরি চাহিদা পূরণ করে, কলাকোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখে এবং দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাকে সুষম খাদ্য বলে।

অন্যকথায়, যে খাদ্যে ছয়টি খাদ্য উপাদানের সবগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণে এবং সঠিক অনুপাতে উপস্থিত রয়েছে এবং যে খাদ্য ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটায়, তাকেই সুষম খাদ্য বলে।

সুষম খাদ্যের খাদ্য উপাদান : সুষম খাদ্যের মধ্যে নিচের খাদ্য উপাদানগুলো থাকা প্রয়োজন। যেমন–

খাদ্যের উপাদান	উদাহরণ
১. দেহ গঠনের উপযোগী খাদ্য বা আমিষ।	মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, ছোলা, বাদাম, সয়াবিন, গম ইত্যাদি।
২. শক্তি সরবরাহকারী খাদ্য বা শর্করা ও স্নেহ পদার্থ।	চাল, গম, আলু, চিনি, গুড়, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি।
৩. প্রতিরক্ষামূলক খাদ্য বা ভিটামিন ও খনিজ লবণ।	শাকসবজি, দুধ, ফল ইত্যাদি।

বয়স, যৌন পার্থক্য, দৈহিক অবস্থা এবং শ্রমের পার্থক্যের ভিত্তিতে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

○ প্রশ্ন-৩৯. কিভাবে একটি সুষম মূল খাদ্য তালিকা তৈরি করা যায়?

উত্তর : কতগুলো নিয়ম মেনে একটি সুষম মূল খাদ্য তালিকা তৈরি করতে হবে। যথা :

i. প্রথমে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ব্যক্তি বিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থাভেদে যে বিভিন্ন ধরনের হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

ii. দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য থাকতে হবে।

iii. খাদ্যে দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী আমিষ সরবরাহ করতে হবে।

iv. খাদ্যে যথোপযুক্ত ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি থাকতে হবে।

v. বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমান ও খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলো থেকে খাদ্য বাছাই করতে হবে। পরে প্রয়োজনমতো যে কোনো বিভাগ থেকে খাদ্য বাছাই করা যায়। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য থাকতে হবে।

vi. খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির সময় খাদ্যাভ্যাস সম্বন্ধেও চিন্তা করতে হবে।

vii. ব্যক্তির বা পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির দিক ভেবে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

viii. ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।

○ প্রশ্ন-৪০. সুষম খাদ্য পরিবেশনে কি কি শর্ত পালন প্রয়োজন?

উত্তর : সুষম খাদ্য দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ক্যালরি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ সরবরাহ করে। সুতরাং মাছ-ডাল, ভাত-রুটি, শাকসবজি-ফল এসব বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য নিয়েই খাবার সুষম হয়। যেসব শর্ত পালনে খাবার সুষম হয় সেগুলো হলো :

ক. প্রতি বেলায় খাবারে উক্ত তিন শ্রেণীর খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।

খ. প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণে পরিবেশন করে পর্যাপ্ত উপাদান সরবরাহে নিশ্চয়তাদান।

গ. খাদ্য প্রস্তুতে সতর্কতা অবলম্বন করে খাদ্য উপাদানের অপচয় রোধ।

ঘ. দৈনিক মোট ক্যালরির ৬০% থেকে ৭০% শর্করাজাতীয় খাদ্য, ৩০% থেকে ৪০% স্নেহজাতীয় খাদ্য এবং ১০% প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ।

ঙ. দৈনিক মাথাপিছু কমপক্ষে ৩০ গ্রাম তেল (রান্নায়) এবং ২০ গ্রাম গুড়/চিনি পরিবেশন।

চ. খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে যথার্থভাবে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন।

○ প্রশ্ন-৪১. আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : আদর্শ খাদ্য পিরামিড : তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, শর্করাকে নিচু স্তরে রেখে পর্যায়ক্রমে পরিমাণগত দিক বিবেচনা করে শাকসবজি, ফলমূল, আমিষ, স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয় তাকে আদর্শ খাদ্য পিরামিড বলে।

চিত্র : আদর্শ খাদ্য পিরামিড

চিত্রে পিরামিডের শীর্ষে রয়েছে স্নেহ বা চর্বি জাতীয় খাদ্য আর সর্বনিম্ন স্তরে রয়েছে শর্করা।

○ প্রশ্ন-৪২. দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন?

উত্তর : খাদ্যের ছয়টি উপাদানই দুধে পরিমিত মাত্রায় থাকে বলে দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। যেমন–

i. শর্করা হিসেবে দুধে আছে ল্যাক্টোজ,
ii. আমিষ হিসেবে আছে কেজিন ও অ্যালবুমিন,
iii. স্নেহ হিসেবে আছে ছোট ছোট দানাদার পদার্থ,
iv. খাদ্যপ্রাণের মধ্যে ভিটামিন-সি ব্যতিরেকে সব ভিটামিন দুধে বিদ্যমান,
v. খনিজ হিসেবে আছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস
vi. পানি হলো দুধের অন্যতম উপাদান।

○ প্রশ্ন-৪৩. একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার জন্য সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করুন।

উত্তর : পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার দেহে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার ক্যালরি পেতে হলে তালিকায় উল্লিখিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। গর্ভবর্তী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হবে। কিশোর যুবা বয়সী ছেলেমেয়েদের বয়স অনুযায়ী পরিমাণে একটু কম খেলেও চলবে।

	পূর্ণবয়স্ক পুরুষ			পূর্ণবয়স্ক মহিলা		
খাদ্যশস্যের নাম	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমি (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমহীন (গ্রাম)	মোটামুটি পরিশ্রমী (গ্রাম)	পরিশ্রমী (গ্রাম)
সিম/বরবটি	২০	২৫	৩০	২০	২২.৫	২৫
ডিম/মাছ/মাংস	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম	১টি/৩০ গ্রাম
পাতাযুক্ত শাক	৪০	৪০	৪০	১০০	১০০	১৫০
অন্যান্য সবজি	৬০	৭০	৮০	৪০	৪০	১০০
মূল ও আলু	৫০	৬০	৮০	৫০	৫০	৬০
দুধ	১৫০	২০০	২৫০	১০০	১৫০	২০০
তেল/চর্বি	৪৫	৫০	৭০	২৫	৩০	৪৫
চিনি/গুড়	৩০	৩৫	৫৫	২০	২০	৪০

○ প্রশ্ন-৪৪. বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যসমূহের পুষ্টিমান নিরূপণ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশের সাধারণ খাদ্যশস্যসমূহের খাদ্যমান বা পুষ্টিমানের উপর ভিত্তি করে এ ছকটি তৈরি করা হয়েছে। এটি The Institute of Nutrition and Food Science (INFS, 1975) কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রকাশিত একটি ছক। প্রতি ১০০ গ্রাম গ্রহণযোগ্য খাদ্যাংশের ভিত্তিতে পুষ্টিমান নির্ধারণ করা হয়েছে।

খাদ্যদ্রব্যের নাম	আমিষ (গ্রাম)	তেল/চর্বি (গ্রাম)	মিনারেল (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরি)
চাল	৬.৪	০.৪	০.৭	৭৯.০	৩৪৬
গম (আটা)	১২.১	১.৭	২.৭	৬৯.৪	৩৪১
ছোলা	১৭.১	৫.৩	৩.০	৬০.৯	৩৬০
মসুর	২৫.১	০.৭	২.১	৫৬.০	৩৪৩
গাজর	০.৯	০.২	১.১	১০.৬	৪৮
গোল আলু	১.৬	০.১	০.৬	২২.৬	৯৭
কলমিশাক	২.৯	০.৪	২.১	৩.১	২৮

খাদ্যদ্রব্যের নাম	আমিষ (গ্রাম)	তেল/চর্বি (গ্রাম)	মিনারেল (গ্রাম)	শর্করা (গ্রাম)	শক্তি (কিলোক্যালরি)
পুঁইশাক	২.০	০.৭	১.৭	২.৯	২৬
কুমড়া (ছোট)	২.১	১.০	১.৪	১০.৬	৬০
বেগুন	১.৪	০.৩	০.৩	৪.০	২৪
ফুলকপি	২.৬	০.৪	১.০	৪.০	৩০
বাঁধাকপি	১.৮	০.১	০.৬	৪.৬	২৭
বরবটি	২.৫	০.১	২.০	৩.৭	২৬
শিম	৭.২	০.১	০.৪	১৫.৯	৯৬
ইলিশ মাছ	২১.৮	১৯.৪	২.২	২.৯	২৭৩
কাতলা মাছ	১৯.৫	২.৪	১.৫	২.৯	১১১
চিংড়ি	১৯.১	১.০	১.৭	০.৮	৮৯
গো-মাংস	২২.৬	২.৬	১.০	-	১১৪
ডিম	১৩.৩	১৩.৩	১.০	-	১৭৩
মুরগির মাংস	২৫.৯	০.৬	১.৩	-	১০৯
খাসির মাংস	১৮.৫	১৩.৩	১.৩	-	১৯৪
গরুর দুধ	৩.২	৪.১	০.৮	৪.৪	৬৭
মায়ের দুধ (মানুষ)	১.১	৩.৪	০.১	৭.৪	৬৫
গরুর দুধের ঘি	-	১০০.০০	-	-	৯০০
রান্নার তেল	-	১০০.০০	-	-	৯০০

○ প্রশ্ন-৪৫. সবুজ শাকসবজি কিছু তেল দিয়ে রান্না করতে হয় কেন?

উত্তর : কতগুলো ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় যেমন–ভিটামিন বি, সি, আর কতগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় যেমন– ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে। এদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়ে থাকে। আবার সবুজ শাকসবজি হচ্ছে ভিটামিন 'এ'-এর প্রধান উৎস। শাক সবজি যদি কিছু তেল দিয়ে রান্না করা হয় তাহলে ভিটামিন 'এ' সহ অন্যান্য চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো সহজেই তেলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। ফলে এদের অপচয় হয় না। তাই সবুজ শাকসবজি একটু তেল দিয়ে রান্না করলে দেহ সহজেই ভিটামিন 'এ' সহ অন্যান্য চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো পেতে পারে– এতে দেহে রাতকানাসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

○ প্রশ্ন-৪৬. খনিজ লবণের উপকারিতা কি?

উত্তর : শরীর গঠনে আমিষের পরেই খনিজ লবণ গুরুত্বপূর্ণ। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, সালফার, ক্লোরিন, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, আয়োডিন ইত্যাদি খনিজ লবণের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রতিদিনের এবং প্রতিবারের খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। বিশেষ করে খাদ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ ও আয়োডিনের উপস্থিতি অপরিহার্য।

খনিজ লবণ দেহের উপাদান গঠনে এবং দেহের কোনো অংশ কেটে গেলে ক্যালসিয়াম আয়ন রক্তকে জমাট বাঁধার কাজে অংশ নেয়। খাদ্য থেকে শক্তি উৎপাদন, দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষা, বিভিন্ন এনজাইমকে সক্রিয় রাখা এবং পেশী সংকোচনে সহায়তা করে। খনিজ লবণ অসমোটিক চাপ ও কোষাভ্যন্তরে তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

প্রশ্ন-৪৭. খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ কি?

উত্তর : ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থির পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং দাঁত ক্ষয় হয়ে যায়। ফসফরাসের অভাবেও অস্থি ও দাঁত পুষ্টিসাধন করতে পারে না। খাদ্যে লৌহঘটিত লবণের অভাব হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শরীর দুর্বল হয় এবং পরিশেষে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৪৮. মানব দেহে লৌহের কাজ বর্ণনা করুন।

উত্তর : রক্তের ৯৮% লৌহ হিমোগ্লোবিনে থাকে। 'হিম' নামক লৌহঘটিত যৌগ 'গ্লোবিন' নামক প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমোগ্লোবিন অণু তৈরি করে। এজন্য হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে লৌহ অপরিহার্য। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে আনা ও কোষের মধ্যে যুক্ত করে দেয়া এবং কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে ফুসফুসে ছেড়ে দেয়া। এছাড়া–

ক. লৌহ জীবিত প্রাণী কোষের শ্বসনের জন্য অপরিহার্য।

খ. অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ফিরিটিন নামক প্রোটিনের আকারে সঞ্চিত থাকে। দেহের প্রয়োজন মতো আন্ত্রিক ঝিল্লী লোহা মুক্ত করে এবং দেহে বিশোষিত হয়।

দেহের প্রধান সঞ্চয়, যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় লৌহ ফিরিটিনরূপে জমা থাকে। বিপাক কার্যে সাহায্যকারী কোনো কোনো এনজাইমেও লৌহ থাকে।

প্রশ্ন-৪৯. ডাবের পানি উপকারী কেন?

উত্তর : ডাবের পানিতে পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং কিছুটা গ্লুকোজ থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থের সাথে কিছুটা সোডিয়ামও বিদ্যমান। অন্য কোনো পানীয়তে এতো সব নেই। এজন্য শরীরের বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োজনমতো যোগান দিতে ডাবের পানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রশ্ন-৫০. অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কাকে বলে?

উত্তর : দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেহে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য কয়েকটি অ্যামাইনো এসিড প্রয়োজন। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড দেহে বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষ হতে পারে না। খাদ্য থেকে এই অ্যামাইনো এসিডগুলো সংগ্রহ করতে হয়। অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড ছাড়া দেহের বৃদ্ধি হয় না বলে খাদ্য থেকে অ্যামাইনো এসিডগুলো পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এজন্য এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। মানবদেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড ৮টি—

ক. ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan)
খ. ফিনাইল অ্যালানিন (Phenylalanine)
গ. লাইসিন (Lysine)
ঘ. ভ্যালিন (Valine)
ঙ. লিউসিন (Leucine)
চ. আইসোলিউসিন (Isoleucine)
ছ. থ্রিওনিন (Threonine)
জ. মেথিওনিন (Methionine)

প্রশ্ন-৫১. পানির কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : পানির কাজ

i. পানি কোষকে সজীব রাখতে সাহায্য করে।
ii. পানি প্রাণিদেহের ভেতরকার পরিবেশ গঠন করে এবং অক্সিজেন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।
iii. জীবের বহুমুখী শারীরবৃত্তীয় কাজে পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে পানি কাজ করে।
iv. পানির মাধ্যমেই উৎসেচক বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে।
v. বিভিন্ন বিপাকীয় কাজের আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় পানির দরকার হয়।
vi. প্রাণিদেহের রক্ত ও লসিকা তৈরিতে পানিতে ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন-৫২. দেহে পানির ঘাটতি থেকে কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে?

উত্তর : পানি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। প্রাণিদেহের ৬০–৭৫ ভাগই পানি। পানি প্রাণিদেহে দ্রাবকের কার্যসম্পাদন করে। দেহে পানির ঘাটতিতে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ :

পানির অভাবে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়। পাচক রস ও খাদ্যরসের তরলায়ন ব্যাহত হয়, যা পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। বৃক্কের রেচন পদার্থ নিষ্কাশন বিঘ্নিত হয়। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন দেহে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি আয়রনের ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে পেশীর দুর্বলতা ও অবসাদ দেখা যায়। পানির অভাবে ক্ষুধামান্দ্যও সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন-৫৩. পাস্তুরিত দুধ কি? এতে দুধের গুণাগুণের কি কোনো পরিবর্তন হয়?

উত্তর : পাস্তুরায়ন অর্থ আংশিক নির্জীব। বিশেষ করে দুধকে জীবাণুমুক্ত করা বা পরিশোধনকে পাস্তুরায়ন বলে। দুধকে ৩০ মিনিট ধরে ১৪৫°–১৫০° ফা. তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে হঠাৎ ৫০° ফা. তাপমাত্রায় নামিয়ে আনলে দুধ জীবাণুমুক্ত হয়। এমতাবস্থায় দুধকে ৫০° ফা. তাপমাত্রার নিচে রাখলে কমপক্ষে ৪৮ ঘণ্টা জীবাণুমুক্ত থাকে। এ পদ্ধতির আবিষ্কারক হলেন বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর। তার নামানুসারেই এই পদ্ধতির নাম পাস্তুরায়ন।

পাস্তুরিত দুধের অধিকাংশ ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়ার পাস্তুরণ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস হয়। এ কারণে টাটকা তরল দুধের মতো পাস্তুরিত দুধে ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় না। পাস্তুরণ পদ্ধতিতে দুধের ভিটামিন এ ও রাইবোফ্লাভিনের ক্ষতি হয় না। তবে প্রায় এক পঞ্চমাংশ থায়ামিন এবং প্রায় ২০% এসকরবিক এসিড নষ্ট হয়; খনিজ পদার্থের পরিমাণে কোনো পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন-৫৪. রাফেজযুক্ত খাবারের উপকারিতা কি?

উত্তর : শস্যদানা, ফল এবং সবজির অপাচ্য তন্তুময় অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর। রাফেজযুক্ত খাবার একটি দৃঢ় স্ফীত পিণ্ড গঠন করে। ফলে খাদ্যনালীর পেশীর ক্রমসংকোচন সঞ্চালনে সহজেই স্থানান্তরিত হয়। রাফেজযুক্ত খাদ্য বিষাক্ত বর্জনীয় বস্তুকে খাদ্যনালী থেকে পরিশোষণ করে। তন্তুযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস করে ক্ষুধার প্রবণতা হ্রাস করে। এটি যেসব খাবারে থাকে সেগুলো কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, খাদ্যনালীর ক্যান্সার ইত্যাদি হ্রাস করে।

প্রশ্ন-৫৫. বিএমআই (BMI) কি? কিভাবে বিএমআই মান নির্ণয় করা হয়?

উত্তর : বিএমআই (BMI) : বডি মাস ইনডেক্স (BMI) মানব দেহের গড়ন ও চর্বির একটি সূচক নির্দেশ করে। অর্থাৎ সুস্থ জীবনযাপনে মানব শরীরের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় কোনো নির্দিষ্ট বয়সে শরীরের দৈর্ঘ্যের সাথে চর্বির পরিমাণগত সম্পর্ক মান নির্দেশ করে। শরীরের সুস্থতা ও স্থূলতার মান নির্ণয়ে এ মানদণ্ড খুবই উপযোগী।

বিএমআই মান নির্ণয় : বিএমআই = দেহের ওজন (কেজি)/দেহের উচ্চতা (মিটার)^2

উদাহরণ হিসেবে ১২৫ সে.মি. (১.২৫ মিটার) উচ্চতা এবং ৫০ কেজি ওজনের একজন ব্যক্তির বিএমআই হচ্ছে ৩২।

প্রশ্ন-৫৬. ফাস্ট ফুড বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : 'ফাস্ট ফুডের' বিষয়টি ম্যাকডোনাল্ড নামক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রথম সূচনা করে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভাগে উদ্ভাবিত একটি শব্দ যা দিয়ে সে সকল খাবারকে বোঝানো হয় যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি তৈরি ও পরিবেশন করা যায়। যেকোনো খাবার যেটি তৈরিতে অল্প সময় লাগে তা ফাস্ট

ফুড হিসেবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু সচরাচর ফাস্ট ফুড বলতে সেই খাবারগুলোকে বোঝানো হয় যা মূলত হোটেল রেস্তোরাঁতে বিক্রি করা হয় এবং ক্রেতা চাহিবামাত্র পরিবেশন করা হয়। ফাস্টফুড বলতে প্রধানত বার্গার, ফ্রাইড চিকেন, হট ডগ, পিজা ইত্যাদি খাবারকে বোঝানো হয়। যদিও ফাস্ট ফুড জাঙ্ক ফুডের আওতাধীন।

○ প্রশ্ন-৫৭. জাঙ্ক ফুড বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : অনেক খাদ্য সুস্বাদু ও লোভনীয় হলেও দেহের জন্য তেমন কোনো উপকারে আসে না বরং অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে, এমন ধরনের খাদ্যদ্রব্যকে জাঙ্ক ফুড হিসেবে অভিহিত করা হয়। অতি লবণ, শর্করা, চর্বিযুক্ত ও নিম্ন পুষ্টি উপাদানসম্পন্ন খাবারগুলোই জাঙ্ক ফুড। এছাড়াও ক্যান্ডি, গাম এবং অধিকাংশ মিষ্টিজাতীয় দ্রব্য, ভাজাপোড়া ফাস্টফুড ও কার্বোনেটেড বেভারিজও জাঙ্ক ফুডের আওতাভুক্ত। তাছাড়া জাঙ্ক ফুডে খুব কম প্রোটিন, ভিটামিন বা খনিজ উপাদান থাকে।

○ প্রশ্ন-৫৮. অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড মানবদেহে কি ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তা আলোচনা করুন।

উত্তর : ফাস্টফুড বা জাঙ্ক ফুড অতিরিক্ত গ্রহণের ফলে মানবদেহে তা বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো—

ক. ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুডে অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় বেশি ক্যালরি থাকে। এই অতিরিক্ত ক্যালরি মানবদেহে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
খ. রক্তের সুগার লেবেল তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায়।
গ. ডায়াবেটিস সংক্রমণের প্রবণতা দেখা দেয়।
ঘ. অতিরিক্ত ওজন বেড়ে যায় এবং স্থূলতা দেখা দেয়।
ঙ. উচ্চ রক্তচাপ দেখা দেয়। ফলে হৃদরোগে আক্রান্তের সম্ভবনা থাকে।
চ. খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) বেড়ে যায়।
ছ. অতিরিক্ত স্থুলতার ফলে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
জ. অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড গ্রহণে মাথাব্যথা হয়।
ঝ. হৃদপিণ্ডের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয়ে যায়। তাই হৃদরোগ, স্ট্রোক দেখা দেয়।
ঞ. বিষণ্ণতা, চর্মরোগ এবং দাঁতে যন্ত্রণা দেখা দেয়।

○ প্রশ্ন-৫৯. ফুড প্রিজারভেশন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : খাদ্যদ্রব্যের গুণগত মান যথাসম্ভব বজায় রেখে বিভিন্ন পদ্ধতিতে এগুলোকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে দীর্ঘদিন তা সংরক্ষণ তথা খাবারের উপযোগী রাখার পদ্ধতিকেই ফুড প্রিজারভেশন বলে।

○ প্রশ্ন-৬০. ফুড প্রিজারভেশন এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বাঁচার জন্য মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন। তাই তাকে প্রতিদিন কোনো না কোনো খাদ্যগ্রহণ করতে হয়। এ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই দ্রুত পচনশীল। কাজেই পচনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রসেস করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। খাদ্যের গুণগত মান বজায় রাখতে হলে সংরক্ষণ করা অপরিহার্য।

যেসব খাদ্যদ্রব্য একটি নির্দিষ্ট সময়ে বা ঋতুতে পাওয়া যায়, বছরের অন্য সময় বা সারা বছর সেগুলো পাওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা দরকার। যেমন—বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজি। আবার যেসব খাদ্যদ্রব্য দেশের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় তাদের অন্য অঞ্চলে পাঠানোর জন্য কিছু সময়ের দরকার। ঐসময় পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য ভালো রাখতে হলে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে সংরক্ষণের আগে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় প্রসেস বা প্রক্রিয়াজাত করতে হবে।

কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় এবং ইঁদুর প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য নষ্ট করে যা খাদ্য অপচয়ের অন্যতম প্রধান কারণ, তাই এদের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানি করার জন্য তা প্রসেস করে সংরক্ষণ করা দরকার, বাংলাদেশে অনেক ফুড প্রসেসিং প্লান্ট বা শিল্পকারখানা আছে যেখানে খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করে সংরক্ষণ করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ে তা বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আমদানিকৃত খাদ্যশস্যও দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করতে হলে তা সংরক্ষণ করতে হবে।

আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান, ঋতু বৈচিত্র্যের কারণে এখানে বছর জুড়ে বিচিত্র রকম ফসলের আবির্ভাব ঘটে, দানাদার শস্য থেকে শুরু করে আমাদের দেশে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল শাকসবজির অফুরন্ত ভাণ্ডার, এছাড়াও নদীমাতৃক ও প্রাকৃতিক কারণে আমরা অন্যান্য সম্পদ যেমন— মৎস্য, পশুজ সম্পদের দিক দিয়েও অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী। আমাদের একদিকে যেমন রয়েছে পর্যাপ্ত কাঁচামাল অন্যদিকে রয়েছে পর্যাপ্ত জনশক্তি। সে দিক বিবেচনায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প অত্যন্ত সম্ভাবনাময়ী, উৎপাদনের মৌসুম ছাড়া অন্য সময়ে ব্যবহার করে দেশীয় খাদ্য চাহিদা পূরণের পাশাপাশি অতিরিক্ত খাদ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। তাই খাদ্য সংরক্ষণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ অত্যন্ত জরুরি।

○ প্রশ্ন-৬১. খাদ্য সংরক্ষণ কাকে বলে? খাদ্য সংরক্ষণের সাধারণ ২টি পদ্ধতির নাম লিখুন।

উত্তর : খাদ্য সংরক্ষণ : যে সমস্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের নিজস্ব গুণাগুণ যথাসম্ভব বজায় রেখে এগুলোকে পচনের হাত থেকে রক্ষা করে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়, তাকে খাদ্য সংরক্ষণ বলে।

খাদ্য সংরক্ষণের ২টি সাধারণ পদ্ধতি হলো—
ক. জীবাণু থেকে দূরে রেখে খাদ্য সংরক্ষণ।
খ. নিম্ন তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ।

○ প্রশ্ন-৬২. অ্যাসেপসিস কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

উত্তর : জীবাণু থেকে দূরে রেখে খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষিত রাখার পদ্ধতিকে অ্যাসেপসিস বলে। অ্যাসেপসিস প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো খাদ্যদ্রব্যকে প্যাকেটজাতকরণ।

○ প্রশ্ন-৬৩. খাদ্য সংরক্ষণের সাধারণ পদ্ধতিগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

উত্তর : খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের সাধারণ পদ্ধতিগুলোর নাম নিম্নরূপ—

১. জীবাণু থেকে দূরে রেখে খাদ্য সংরক্ষণ।
২. কম তাপমাত্রায় টাটকা খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে সংরক্ষণ।
৩. নিম্ন তাপমাত্রা বা ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ।
৪. বেশি তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ বা টিনজাতকরণ।
৫. পাস্তুরাইজেশন ও স্টেরিলাইজেশন প্রক্রিয়ায় খাদ্য সংরক্ষণ।
৬. শুষ্ককরণের মাধ্যমে খাদ্য সংরক্ষণ।
৭. ঘনকরণ বা চিনি দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ।
৮. পিকলিং বা কিউরিং বা লবণ দ্বারা খাদ্য সংরক্ষণ।
৯. রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে খাদ্য সংরক্ষণ।
১০. ইরাডিয়েশন বা গামা রশ্মি প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ।

○ প্রশ্ন-৬৪. খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে খাদ্যে উপস্থিত জীবাণুর ধরন এবং সংখ্যা জানা প্রয়োজন কেন?

উত্তর : খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে জীবাণুর ধরন জানা প্রয়োজন এই জন্য যে, তার মধ্যে থাকতে পারে অনাকাঙ্ক্ষিত পচনকারী, রোগ সৃষ্টিকারী বা আকাঙ্ক্ষিত চোলাইকারী জীবাণু। জীবাণুর সংখ্যা জানা

প্রয়োজন যে, পচনকারী জীবাণুর সংখ্যা যত বেশি হবে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে এবং সেই সাথে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করাও কঠিন হয়ে পড়বে। এছাড়াও রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপস্থিতিও বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থার কথা বিবেচনা করেই বাস্তবেও বহু খাবারের গুণগত মান তাতে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ে থাকে। এ জন্যই খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে খাদ্যে উপস্থিত জীবাণুর ধরন এবং সংখ্যা জানা প্রয়োজন।

○ প্রশ্ন-৬৫. কী কী উপায়ে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়? বর্ণনা করুন।

উত্তর : নিম্নলিখিত উপায়ে খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করা যেতে পারে, যেমন—

১. খাদ্যদ্রব্যকে অণুজীব থেকে দূরে রেখে। আর এটা করা যেতে পারে সুষ্ঠু প্যাকেজিং এর মাধ্যমে।
২. খাদ্যদ্রব্য থেকে অণুজীবকে পৃথক করে যেমন- মিলিপোর বা অতীব সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত ফিল্টার মিডিয়া দ্বারা ছেঁকে।
৩. অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা রোধ করে। এটি করা যেতে পারে নিম্ন তাপমাত্রা, রাসায়নিক দ্রব্য, বায়ুশূন্য অবস্থা ও খাদ্যদ্রব্যকে শুষ্ক করে।
৪. অণুজীব ধ্বংস করে। এটি করা যায় উচ্চ তাপমাত্রা ব্যবহার করে।
৫. এনজাইমের কার্যকারিতা রোধ করে। যেমন- ব্লাঞ্চিং বা তাপ প্রয়োগ করে।
৬. রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি রোধ করে। যেমন-অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যোগ করে।
৭. অণুজীব এর জন্য প্রয়োজনীয় জলীয় কণা দুষ্প্রাপ্য করে। এটি করা সম্ভব লবণ ও চিনির ঘন দ্রবণ ব্যবহার করে।

○ প্রশ্ন-৬৬. খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের অ্যাসেপসিস প্রক্রিয়া উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : অ্যাসেপসিস : জীবাণু থেকে দূরে রেখে খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষিত রাখার পদ্ধতিকে অ্যাসেপসিস বলে। অ্যাসেপসিস পদ্ধতি অবলম্বন করে খাদ্যদ্রব্যের শেলফ লাইফ বাড়ানোর প্রক্রিয়া উদাহরণসহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

১. **প্যাকেটজাতকরণ :** অ্যাসেপসিস প্রক্রিয়ার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো খাদ্যদ্রব্যকে প্যাকেটজাতকরণ। এ প্যাকেটটি হতে পারে যে কোনো ধরনের বস্তুর তৈরি অতি সাধারণ একটি ঠোঙ্গা, মোড়ক, কার্টুন বক্স, ব্যাগ, বোতল, কন্টেইনার, ক্যান ইত্যাদি। মোড়ক যে শুধুই খাদ্যদ্রব্যকে কলুষিত বা দূষিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে তা নয় বরং বায়ু নিরোধক কন্টেইনার হিসেবে খাদ্যদ্রব্যকে জীবাণুমুক্ত রাখে।
২. **দুগ্ধ শিল্পে :** দুগ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানে দুধ সংগ্রহ ও নাড়াচাড়া করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ রাখা হয়, যেন কোনোক্রমেই দুধ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত না হয়। বাস্তবক্ষেত্রেও দুধের কোয়ালিটি বিচার করা হয়, তাতে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যা নিরূপণ করে।
৩. **ক্যানিং বা টিনজাতকরণ শিল্পে :** এ শিল্পের ক্ষেত্রে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এর উপর নির্ভর করে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জীবাণু ধ্বংস করে খাদ্য সংরক্ষণ করার পদ্ধতি, সময়, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য আরও বহু বিষয়। বিশেষ করে যদি এতে থাকে তাপ সহনশীল এবং পচনকারী জীবাণু; যেমন— স্পোর উৎপাদক থার্মোফাইলস। যা হোক না কেন তাপ প্রয়োগের পর কিন্তু মুখ বন্ধ ক্যান জীবাণু দ্বারা পুনঃ কলুষিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
৪. **মাংস প্রসেসিং শিল্পে :** এ শিল্পে প্রতিরক্ষামূলক স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতিতে পশু জবাই, নাড়াচাড়াকরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে মাংস এবং মাংসজাত দ্রব্যের ভালো থাকার সময় দীর্ঘায়িত করা যায়। মাছের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য।

৫. **ফার্মেন্টেশনের ক্ষেত্রে :** এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারী জীবাণুর সংখ্যা ধাপে ধাপে প্রয়োজন মতো কমিয়ে বা নিয়ন্ত্রণ করে সাফল্যজনকভাবে মানসম্পন্ন আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব।

এছাড়া পরিষ্কার খাবার উপযোগী পানি দ্বারা ধুয়ে, গরম পানিতে চুবিয়ে, অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে, ছেঁকে, থিতিয়ে ইত্যাদি বিভিন্ন রকম সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করেও খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত জীবাণুর সংখ্যা কমিয়ে ফলমূল, শাকসবজি ও তরল খাবারের শেলফ লাইফ বাড়ানো যায়।

○ প্রশ্ন-৬৭. কম তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের মূলনীতি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : মূলনীতি : কম তাপমাত্রা খাদ্যদ্রব্যে সংরক্ষণে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর প্রভাবে খাদ্যস্থিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি, এনজাইমের ক্রিয়া এবং অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা বাধাগ্রস্ত হয় বা কমে যায়। তাপমাত্রা যতই কমানো যায় ততই কমে যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতি, এনজাইমের ক্রিয়া এবং অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা। অত্যধিক কম তাপমাত্রায় একেবারেই থেমে যায় অণুজীবের বৃদ্ধি ও কার্যকারিতা।

ব্যাখ্যা : প্রতিটি কাঁচা খাদ্যদ্রব্যেই বিভিন্ন ধরনের অণুজীব, যেমন— ব্যাক্টেরিয়া, ছত্রাক এবং ইস্ট উপস্থিত থাকে যেগুলো উপযুক্ত পরিবেশ পেলে খাদ্যদ্রব্যে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটায় এবং খাদ্যকে নষ্ট করে ফেলে। উপস্থিত প্রতিটি অণুজীবেরই একটি উপযুক্ত উচ্চ তাপমাত্রা আছে। যে তাপমাত্রায় এটির দ্রুত বৃদ্ধি বা বিস্তার ঘটে। ঠিক একইভাবে প্রতিটি জীবাণুর একটি উপযুক্ত নিম্ন তাপমাত্রা আছে যে তাপমাত্রার নিচে এরা বিস্তার লাভ করতে পারে না বা বৃদ্ধি ঘটে না। কাজেই দেখা যায় যে, সাধারণ তাপমাত্রার কোনো খাদ্যদ্রব্যকে ঠাণ্ডা করলে তার প্রভাব উপস্থিত বিভিন্ন অণুজীবের উপর বিভিন্নভাবে পড়ে। অর্থাৎ একটি খাদ্যদ্রব্যের তাপমাত্রা ১০° সে. কমালে হয়ত কোনো অণুজীবের বৃদ্ধি কমে যাবে, আবার ঐ একই সময় হয়ত অন্য কোনোটির বৃদ্ধি একেবারেই থেমে যাবে। তবে সেটা নির্ভর করবে অণুজীবের প্রকৃতির ধরনের উপর।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সর্বনিম্ন যে তাপমাত্রায় জীবাণু জন্মাতে পারে তা হলো, - ৩৪° সে. এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রাটি হলো ৯০° সে.।

○ প্রশ্ন-৬৮. প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্য কীভাবে ঠাণ্ডা গুদামজাত করে সংরক্ষণ করা যায় বর্ণনা করুন।

উত্তর : টাটকা প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্য যেমন— মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রধানত ২০—৩৫° সে. তাপমাত্রায় সিউডোমোনাডস নামক জীবাণুসমূহ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও কলিফর্ম ও মাইক্রোকক্কাই নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারাও প্রাণিজ খাদ্যদ্রব্য পচে থাকে। এ প্রক্রিয়া সাধারণত প্রথম থেকেই অবস্থিত অণুজীবের পরিমাণ এবং তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। নিম্নে সংরক্ষণ করার উপায় বর্ণনা করা হলো—

মাংস : এটি সাধারণত ০° সে. তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। প্রথমত চামড়া এবং নাড়িভুঁড়ি ছাড়ান অবস্থায় প্রাণীর সম্পূর্ণ দেহকে ২৪ ঘণ্টার জন্য ফ্রোজেন স্টোরে রাখা হয়। এ সময়ের মধ্যে প্রাণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং ক্যাথেপসিন নামক এনজাইমের প্রভাবে কিছু কিছু প্রোটিনের স্বভাবচ্যুতি ঘটে এবং মাংসপেশি নরম হয়। এরপর ঐ প্রাণিদেহে—১৭° থেকে - ২৩° সে. তাপমাত্রায় রেখে সংরক্ষণ করা হয়।

দুধ : এটি সাধারণত ২° সে. তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়।

ডিম : ১০° সে. তাপমাত্রায় এবং ৮২-৮৫% আর্দ্রতায় সংরক্ষিত হয়।

মাছ : ০° সে. তাপমাত্রার নিচে সংরক্ষিত হয়। তাপমাত্রা যত কমানো যায় তার সংরক্ষণকাল তত বাড়ে।

○ প্রশ্ন-৬৯. গুদামজাত খাদ্যদ্রব্যের স্থায়িত্বকাল কী কী বিষয়ের উপর নির্ভরশীল?

উত্তর : গুদামজাত খাদ্যদ্রব্যের স্থায়িত্বকাল নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভলশীল। যেমন—

১. ব্যবহৃত কাঁচামালের ধরন ও গুণগত বৈশিষ্ট্য।
২. প্রক্রিয়াজাতকরণের পদ্ধতি ও কার্যকারিতা।
৩. খাদ্যদ্রব্য প্যাকেজিং এর ধরন ও প্রকৃতি।
৪. প্যাকেজিং সামগ্রীর বৈশিষ্ট্য।
৫. গুদামের তাপমাত্রা।
৬. পরিবহন, বিতরণ ও গুদামজাতকরণের সময় আঘাতজনিত জখম ও বিকৃতি।
৭. গুদামের আর্দ্রতা ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৭০. কোল্ড স্টোরেজ কাকে বলে? কোল্ড স্টোরেজের সুবিধা কী কী?

উত্তর : কোল্ড স্টোরেজ : প্রধানত ০° সে. তাপমাত্রার উপরে খাদ্যসামগ্রীকে গুদামজাত করে সংরক্ষণ করার পদ্ধতিকে কোল্ড স্টোরেজ বলে।

কোল্ড স্টোরেজের সুবিধাসমূহ হলো :

১. স্টোরেজ লাইফ দীর্ঘায়িত হয়,
২. ন্যূনতম জলীয় কণার অপসারণ ঘটে,
৩. পচন হয় খুবই ধীরে,
৪. ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তনও হয় খুবই কম।

○ প্রশ্ন-৭১. উত্তাপ প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ কিভাবে করা হয়?

উত্তর : উত্তাপে অণুজীবের প্রোটিন সঞ্চিত হওয়ায় এবং বিপাককারী এনজাইমের কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়ার ফলে অণুজীব মরে যায় বা নির্জীব থাকে। আবার তাপ প্রয়োগে এনজাইমও নিষ্ক্রিয় হয়। সুতরাং খাদ্য সংরক্ষণের জন্য তাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্য হলো অণুজীব নিধন করা বা নির্জীব রাখা এবং এনজাইম-এর কাজ শ্লথ করা। তাপ প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি তিনটি–

ক. **পাস্তুরণ :** খাদ্য ১০০° সে. থেকে অপেক্ষাকৃত কম তাপে সংরক্ষণ।
খ. **স্ফুটন :** খাদ্য ১০০° সে. তাপে সংরক্ষণ এবং
গ. **প্রক্রিয়াজাতকরণ :** ১০০° সে.-এর অধিক তাপ প্রয়োগে খাদ্য বিনষ্টকারী অণুজীব নিধন করে এনজাইম নিষ্ক্রিয় করে মুখ বন্ধ পাত্রের মধ্যে অর্থাৎ টিনজাত বা বোতলজাত করে সংরক্ষণ।

○ প্রশ্ন-৭২. খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

উত্তর : খাদ্যসংরক্ষণের গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা : খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদানের গুণগত মান বজায় রাখা এবং খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ বহুদিনের জন্য অবিকৃত রাখাই খাদ্য সংরক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। খাদ্য যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য যে ব্যবস্থা নেয়া হয়, তাকে খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা বলে। খাদ্য সংরক্ষণের অন্যান্য গুরুত্বগুলো হচ্ছে—

১. খাদ্যের অপচয় রোধ করা। পরিবহন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাবে এক অঞ্চলের উদ্বৃত্ত খাদ্য অন্য অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয় না। ফলে প্রতি বছর আমাদের দেশে উদ্বৃত্ত আলু, টমেটো, আনারস, ফুলকপি ইত্যাদি পচে নষ্ট হয়। সময় মতো সংরক্ষণ করা হলে খাদ্যের পচনবিশিষ্ট অপচয় রোধ করা যায়। উপযুক্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে খাদ্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে উৎপাদক ও ক্রেতাগণ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

২. খাদ্য সংরক্ষণের আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাড়তি ফল, ফসল অপচয় না করে ভবিষ্যতের জন্য তুলে রাখা। খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা যায়। খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, যুদ্ধ প্রভৃতি দুর্যোগে যখন খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, তখন সংরক্ষিত মজুত করা খাদ্য সাময়িকভাবে দুর্যোগকালীন খাদ্য ঘাটতি মেটাতে সক্ষম হয়।

৩. খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবারের জন্য সুলভে পুষ্টিকর খাদ্য যোগানো যায়। মৌসুমী ফলমূল, শাকসবজি দামে সস্তা হয়। এসব খাদ্য যদি সংরক্ষণ করা যায় তবে অন্যান্য সময়ে এসব খাদ্যের ঘাটতি রোধ করা যায়। আহার বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর করার জন্য খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

○ প্রশ্ন-৭৩. রাসায়নিক সংরক্ষক বলতে কী বোঝায়? রাসায়নিক সংরক্ষক কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : রাসায়নিক সংরক্ষক : যে সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্য জীবাণুর বৃদ্ধি, কর্মক্ষমতা, তাদের এনজাইমের ক্রিয়া অথবা তাদের গাঠনিক প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে বা ধ্বংস করে তাদের রাসায়নিক সংরক্ষক বলে।

রাসায়নিক সংরক্ষকের প্রকারভেদ : রাসায়নিক সংরক্ষককে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. অজৈব সংরক্ষক
খ. জৈব সংরক্ষক
গ. ছত্রাক প্রতিরোধক দ্রব্যাদি।

○ প্রশ্ন-৭৪. কয়েকটি রাসায়নিক সংরক্ষকের নাম লিখুন।

উত্তর : খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। যেমন : প্রোপায়নিক এসিড ও তার লবণ, সারবিক এসিড ও তার লবণ, বেনজোইক এসিড ও তার লবণ, প্যারাবেনজোইক এসিড, সলফার ডাইঅক্সাইড ও সালফাইট সমূহ, ইথিলিন ও প্রোপাইলিন অক্সাইড, সোডিয়াম ডাইএসিটেড, ডিহাইড্রোএসিটিক এসিড, সোডিয়াম, নাইট্রেট, ক্যাপ্রিলিক এসিড, ইথাইল ফরমেট প্রভৃতি।

○ প্রশ্ন-৭৫. রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহারের পূর্বে কী কী বিষয় যাচাই করে দেখতে হয়?

উত্তর : রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো যাচাই করে দেখতে হবে–

১. বস্তুটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক কিনা,
২. শরীরের জন্য অস্বস্তিকর কিনা,
৩. সঠিকমাত্রায় কার্যকরী কিনা এবং
৪. সঠিভাবে প্রস্তুত কিনা।

○ প্রশ্ন-৭৬. রাসায়নিক সংরক্ষকের কার্যকারিতা প্রধানত কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

উত্তর : রাসায়নিক সংরক্ষকের কার্যকারিতা প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে–

ক. রাসায়নিক দ্রব্যের প্রকৃতি ও গাঢ়ত্ব
খ. উপস্থিত জীবাণুর ধরন, সংখ্যা, বয়স ও বৈশিষ্ট্য
গ. তাপমাত্রা
ঘ. সময়
ঙ. খাদ্যদ্রব্যের আর্দ্রতা, PH, দ্রবীভূত দ্রব্যের পরিমাণ ও উপস্থিত অন্যান্য রক্ষাকারী পদার্থের উপর।

○ প্রশ্ন-৭৭. ভিনেগার কি? এর ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : অ্যাসিটিক এসিডের ৪%–৮% জলীয় দ্রবণই ভিনেগার নামে পরিচিত। পুরনো মদে এবং কতকগুলো ফলের মধ্যকার উদ্ভিজ্জ তেলে অ্যাসিটিক এসিড পাওয়া যায়। এছাড়া 'ব্যাকটেরিয়াম অ্যাসেটি' নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিতে বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা ইথাইল অ্যালকোহল জারিত হয়ে ভিনেগার উৎপন্ন হয়। নানা ধরনের চাটনি প্রস্তুতিতে, মাছ-মাংস সংরক্ষণ, রাবার ঘন করতে, পরীক্ষাগারে বিকারক ও দ্রাবকরূপে এবং 'হোয়াইট লেড' নামে সাদা রঙ প্রস্তুতিতে ভিনেগার ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৭৮. রাসায়নিক সংরক্ষকের মাত্রা উল্লেখ করুন।

উত্তর : রাসায়নিক সংরক্ষকের মাত্রা :

সংরক্ষক	মাত্রা
প্রোপায়নিক এসিড ও তার লবণ	০.৩২%
সরবিক এসিড ও তার লবণ	০.২%
% বেনজোইক এসিড ও তার লবণ	০.১%
প্যারাবেনজোইক এসিড	০.১%
সালফার ডাই-অক্সাইড ও সালফাইটসমূহ	২০০ পিপিএম
ইথিলিন ও প্রোপাইলিন অক্সাইড	৭০০ পিপিএম
সোডিয়াম ডাইএসিটেড	০.৩২%
ডিহাইড্রো এসিটিক এসিড	৬৫ পিপিএম
সোডিয়াম নাইট্রাইট	১২০ পিপিএম
ক্যাপ্রিলিক এসিড	-
ইথাইল ফারমেট	১৫-২০০ পিপিএম

অধ্যায়

১০

জৈবপ্রযুক্তি
Biotechnology

Syllabus— Biotechnology : *Chromosome; shape, structure and chemical composition of chromosome; nucleic acid; deoxyribonucleic acid (DNA); ribonucleic acid (RNA); protein; gene; DNA test; forensic test; genetic disorder in human beings; Biotechnology and Genetic Engineering; cloning; social effects of cloning; transgenic plants and animals; Use of biotechnology in agricultural, milk products and pharmaceutics; Gene therapy; Genetically modified organism; Nanotechnology; Pharmacology; Pharmacokinetics.*

○ প্রশ্ন-১. ক্রোমোজোম কি? এর কাজ লিখুন।

উত্তর : ক্রোমোজোম : নিউক্লিয়াসের ভেতরে অবস্থিত নিউক্লিওপ্রোটিন-এ গঠিত যেসব তন্তুর মাধ্যমে জীবের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়, তাকে ক্রোমোজোম বলে।

গ্রীক শব্দ Chroma (অর্থ রং) এবং soma (অর্থ দেহ) এর সমন্বয়ে chromosome শব্দটি তৈরি। ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে স্ট্রাসবুর্গার সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

ক্রোমোজোমের কাজ :

i. DNA তথা জিন অণু ধারণ করে।
ii. প্রজাতির বৈশিষ্ট্যকে বংশ পরম্পরায় বহন করে।
iii. DNA-র মাধ্যমে প্রোটিন সংশ্লেষ করে কোষের যাবতীয় জৈব রাসায়নিক ও শারীরবৃত্তিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
iv. বিভিন্ন কারণে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও গঠনে যে পরিবর্তন ঘটে তা বিবর্তনের মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-২. মানবদেহে কতগুলো ক্রোমোজোম আছে? ক্রোমোজোমের অবস্থান কোথায়?

উত্তর : মানবদেহে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে, এর মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম। ক্রোমোজোমের অবস্থান কোষের নিউক্লিয়াসে।

○ প্রশ্ন-৩. ক্রোমোজোমের আকৃতি ও গঠন বর্ণনা করুন।

উত্তর : ক্রোমোজোমের আঙ্গিক গঠন পর্যবেক্ষণের উপযুক্ত সময় মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মেটাফেজ পর্যায়। এ সময় একটি আদর্শ ক্রোমোজোমে যেসব অংশ দেখা যায় তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হলো :

ক. ক্রোমোনেমা (Chromonema) : মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোম লম্বালম্বিভাবে যে দুটি অংশে বিভক্ত হয় তাদের প্রতিটির নাম ক্রোমাটিড। প্রতিটি ক্রোমাটিড লম্বালম্বিভাবে দুটি অথবা চারটি সূত্রাকার অংশ নিয়ে গঠিত। এ রকম একেকটি অংশের নাম ক্রোমোনেমা।

খ. সেন্ট্রোমিয়ার (Centromere) : মেটাফেজ দশায় প্রত্যেক ক্রোমোজোমে যে গোল, বর্ণহীন ও সংকুচিত স্থান দেখা যায় তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার। স্বল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক ক্রোমোজোমে একটি মাত্র সেন্ট্রোমিয়ার থাকে।

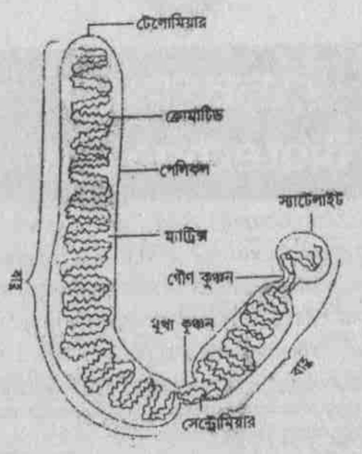

চিত্র : ক্রোমোজোমের স্থূল গঠন

গ. বাহু (Arm) : সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পাশের অংশকেই ক্রোমোজোমের বাহু বলা হয়।

ঘ. ক্রোমোমিয়ার (Chromomere) : মায়োটিক প্রোফেজ-এর সূচনালগ্নে ক্রোমোজোমের দেহে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা দেখা যায় সেগুলো ক্রোমোমিয়ার নামে পরিচিত। মায়োসিসের প্রথম প্রোফেজের প্যাকাইটিন উপদশায় ক্রোমোমিয়ারের সংখ্যা ও অবস্থান স্পষ্ট দেখা যায়।

ঙ. পেলিকল (Pellicle) : ম্যাক ক্লিনটক, সোয়ানসন প্রমুখ কোষবিজ্ঞানী ধারণা করতেন যে, ক্রোমোজোম দেহের অংশগুলো একটি বহিঃপর্দা দিয়ে আবৃত। কিন্তু ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্রে ক্রোমোজোমে বহিঃপর্দার অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

চ. ধাত্র (Matrix) : কোষবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পেলিকলে আবৃত অবস্থায় ক্রোমোনেমাটা একটি তরল ধাত্র বা ম্যাট্রিক্স-এ ভাসমান থাকে। কিন্তু ইলেকট্রন আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ধাত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নি।

ছ. সেকেন্ডারি কুঞ্চন (Secondary constriction) : ক্রোমোজোমের দেহে সেন্ট্রোমিয়ার ছাড়া অন্য কোনো কুঞ্চন থাকলে তা সেকেন্ডারি কুঞ্চন নামে অভিহিত হয়। SAT (Sine Acid Thymonucleic) নামক সেকেন্ডারি কুঞ্চন নিউক্লিওলাস গঠনে সাহায্য করে। সেকেন্ডারী কুঞ্চন অঞ্চলে DNA অণুর কুন্ডলন অন্যান্য স্থানের কুন্ডলন অপেক্ষা কম।

জ. স্যাটেলাইট (Satellite) : ক্রোমোজোমের একপ্রান্তে সেকেন্ডারি কুঞ্চন থাকলে সংলগ্ন ক্ষুদ্র অংশটিকে স্যাটেলাইট বলে। স্যাটেলাইট একটি সূক্ষ্ম তন্তুর সহায়তায় ক্রোমোজোমের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত থাকে।

ঝ. টেলোমিয়ার (Telomere) : প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এইচ. জে. মুলার ক্রোমোজোমের প্রান্তদেশে টেলোমিয়ার নামক একটি বিন্দুর অবস্থান কল্পনা করেন। তিনি ধারণা করেন, টেলোমিয়ারের অবস্থানের কারণেই কোনো ক্রোমোজোমের দুটি প্রান্ত পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হতে পারে না।

○ প্রশ্ন-৪. ক্রোমোজোম কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী ক্রোমোজোমকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যথা–
i. মেটাসেন্ট্রিক বা মধ্যকেন্দ্রিক; ii. সাবমেটাসেন্ট্রিক বা উপ-মধ্যকেন্দ্রিক; iii. অ্যাক্রোসেন্ট্রিক বা উপ-প্রান্তকেন্দ্রিক; iv. টেলোসেন্ট্রিক বা প্রান্তকেন্দ্রিক।

চিত্র : সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন আকৃতির ক্রোমোসোম।

○ প্রশ্ন-৫. ক্রোমোজোম (Chromosome) ও জিন (Gene)-এর পার্থক্য কি?

উত্তর : ক্রোমোজোম হচ্ছে নিউক্লিক এসিড (DNA, RNA) ও প্রোটিন দ্বারা গঠিত কোষের একটি জটিল ক্ষুদ্রাঙ্গ, যার মধ্যে জীবের সকল বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ক্রোমোজোমকে বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বলা হয়। জিন হচ্ছে DNA অণুর একটি নির্দিষ্ট অংশ, যা জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী একক। জিন সাধারণত ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে।

○ প্রশ্ন-৬. ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন লিখুন।

উত্তর : ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন বেশ জটিল। এটি নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, ধাতব আয়ন ও বিভিন্ন এনজাইম নিয়ে গঠিত।

ক্রোমোজোমে দুধরনের নিউক্লিক অ্যাসিডই পাওয়া যায়। যথা– DNA ও RNA। প্রোটিন রয়েছে দুধরনের। যথা– হিস্টোন ও নন-হিস্টোন। হিস্টোন প্রোটিন ৪ রকম। যথা– H_1, H_2 (A ও B), H_3 ও H_4। নন-হিস্টোন প্রোটিন রয়েছে প্রায় ৫০০ ধরনের। ক্রোমোজোমে DNA পলিমারেজ, RNA পলিমারেজ, নিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফাটেজ প্রভৃতি এনজাইম পাওয়া যায়। তাছাড়া, Ca^{++}, Fe^{++} প্রভৃতি ধাতব আয়নও রয়েছে। এগুলো ক্রোমোজোমের গঠনকে স্থায়ী করতে সাহায্য করে।

○ প্রশ্ন-৭. ক্রোমোজোমকে কেন বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়?

উত্তর : ক্রোমোজোমে জীন বা DNA অবস্থান করে, তাই এটি বংশগতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জীন বংশগতির একক যা বংশ হতে বংশান্তরে বংশগত বৈশিষ্ট্য ধারণ ও বহন করে। এক-একটি চরিত্র অনুযায়ী কোনো নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট জীন থাকে। তাছাড়া দেহের রং, আকার, আয়তন ইত্যাদি নির্দিষ্ট জীনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জীন তথা ক্রোমাজোমকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৮. নিউক্লিক অ্যাসিড কি? এর অবস্থান ও প্রকারভেদ লিখুন।

উত্তর : নিউক্লিক অ্যাসিড : যে বায়োপলিমার অণুসমূহ বংশগতির ধারা সংরক্ষণে এবং কোষস্থ প্রোটিন ও এনজাইম সংশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করে থাকে তাদেরকে নিউক্লিক অ্যাসিড বলে।

অবস্থান : নিউক্লিয়াসের ক্রোমোজোম ছাড়াও সাইটোপ্লাজমে এবং কিছু কিছু অঙ্গাণুতে নিউক্লিক অ্যাসিড থাকে। নিউক্লিক অ্যাসিড দুই প্রকার। যথা– ১. ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড (DNA) এবং ২. রাইবো-নিউক্লিক অ্যাসিড (RNA)।

○ প্রশ্ন-৯. নিউক্লিওসাইড কী?

উত্তর : একটি পেন্টোজ শর্করার সাথে একটি নাইট্রোজেন ক্ষারক যুক্ত হলে তাকে নিউক্লিওসাইড বলে।

○ প্রশ্ন-১০. নিউক্লিওটাইড কী?

উত্তর : একটি নিউক্লিওসাইডের সাথে ফসফোরিক এসিড যুক্ত হলে নিউক্লিওটাইড গঠিত হয়।

○ প্রশ্ন-১১. পিউরিন কী?

উত্তর : মূল পিউরিনের যৌগের সাথে অ্যামাইনো ($-NH_2$) মূলক ও হাইড্রোক্সি (–OH) মূলক সমন্বয়ে এটি গঠিত। এর অণুতে দুটি রিং একত্রে সংযুক্ত থাকে। এটি দুই প্রকার, যথা– অ্যাডেনিন (Adenine-A) ও গুয়ানিন (Guanine-G)। এরা ৫ সদস্যবিশিষ্ট বলয় (Ring) নিয়ে গঠিত। অ্যাডেনিনের রাসায়নিক সংকেত $C_5H_5N_5$ এবং গুয়ানিনের রাসায়নিক সংকেত হলো $C_5H_5N_5O$।

○ প্রশ্ন-১২. পাইরিমিডিন কী?

উত্তর : পাইরিমিডিন অণুতে মাত্র একটি রিং বিদ্যমান। এটি দুই রকম। যথা– i. থাইমিন (Thymine-T) ও ii. সাইটোসিন (Cytocine-C)। পাইরিমিডিন ক্ষারসমূহ কার্বন পরমাণুর একটি মূল কাঠামো নিয়ে গঠিত। থাইমিনের রাসায়নিক সংকেত $C_5H_6N_2O_2$ এবং সাইটোসিনের রাসায়নিক সংকেত হলো $C_4H_5N_3O$।

○ প্রশ্ন-১৩ . DNA (Deoxyribonucleic Acid) কি? এর কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : DNA ক্রোমোজোমের একমাত্র স্থায়ী রাসায়নিক পদার্থ এবং বংশগতি বৈশিষ্ট্যের বাহক। ১৮৬৮ সালে Miescher প্রথম DNA আবিষ্কার করেন। তিনি একে নিউক্লিন (nuclein) আখ্যা দিয়েছিলেন। DNA-র গঠন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় ওয়াটসন ও ক্রিক (James Watson & Francis Crick, 1953)-এর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে।

DNA এর কাজ/জৈবিক গুরুত্ব :

i. DNA বংশগতিয় বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক।
ii. DNA জীবদেহের সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করে।
iii. DNA প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।
iv. DNA প্রতিরূপ সৃষ্টির মাধ্যমে জীবের জাতিসত্তা অটুট রাখে।
v. DNA জীবের সকল বিপাকীয় কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে।
vi. DNA প্রজাতি শনাক্তকরণে ভূমিকা রাখে।

○ প্রশ্ন-১৪. DNA-এর ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করুন।

উত্তর : **DNA-এর ভৌত ধর্ম :** DNA-র আণবিক ওজন $১০^৬$ থেকে $১০^৯$ এর মধ্যে। ১০০°C তাপমাত্রায় DNA অণু ভেঙ্গে দুটি অণু গঠন করে। অতি বেগুনী (বা আল্ট্রা ভায়োলেট, UV) আলোকরশ্মি শোষণের ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি।

DNA-র রাসায়নিক গঠন : DNA গঠিত হয় পাঁচ কার্বনবিশিষ্ট ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট এবং অ্যাডেনিন (Adenine), গুয়ানিন (Guanine), সাইটোসিন (Cytosine) ও থাইমিন (Thymine) নামক নাইট্রোজেনযুক্ত বেস দিয়ে। অ্যাডেনিন ও গুয়ানিনকে বলা হয় পিউরিন (Purine) এবং সাইটোসিন ও থাইমিনকে বলে পাইরিমিডিন (Pyrimidine)।

এক অণু ডি-অক্সিরাইবোজ শর্করা, এক অণু নাইট্রোজেনযুক্ত বেসের সাথে সংযুক্ত হয়ে গঠন করে এক অণু নিউক্লিওসাইড। এক অণু নিউক্লিওসাইডের সঙ্গে এক অণু অজৈব ফসফেট সংযুক্ত হয়ে এক অণু নিউক্লিওটাইড গঠন করে। দুটি নিউক্লিওটাইড একসাথে যুক্ত হয়ে ডাইনিউক্লিওটাইড, তিনটি যুক্ত হয়ে ট্রাইনিউক্লিওটাইড এবং ততোধিক যুক্ত হয়ে পলিনিউক্লিওটাইড গঠন করে।

○ প্রশ্ন-১৫. ওয়াটসন ও ক্রিক প্রদত্ত DNA অণুর গঠনশৈলী বর্ণনা করুন।

উত্তর : ১৯৫৩ সালে ওয়াটসন এবং ক্রিক (J. D. Watson & Francis H. C. Crick— 1953) DNA অণুর যে ডবল হেলিক্স গাঠনিক মডেল প্রস্তাব করেন তাই সঠিক মডেল হিসেবে সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। এই মডেল প্রস্তাবের জন্য তাঁরা ১৯৬৩ সালে আরেক বিজ্ঞানী উইলকিন্স-সহ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ওয়াটসন এবং ক্রিক প্রদত্ত ডবল হেলিক্স মডেল অনুযায়ী DNA অণুর গঠন নিম্নরূপ :

i. DNA অণু দ্বিসূত্রক, বিন্যাস ঘুরানো (প্যাঁচানো) সিঁড়ির মত, যাকে বলা হয় ডবল হেলিক্স।
ii. সূত্র দুটি বিপরীতমুখী হয়ে (একটি ৫′ → ৩′ মুখী, অপরটি ৩′ → ৫′ মুখী) সমদূরত্বে পাশাপাশি অবস্থিত।

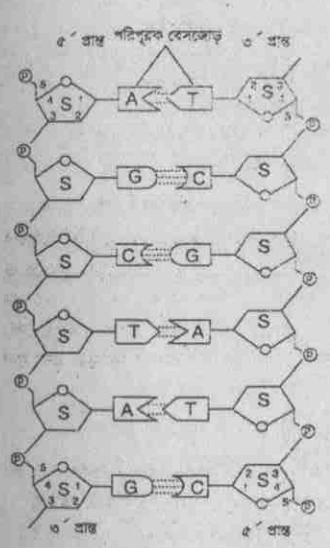

চিত্র : DNA অণুর বেসজোড়গুলোর সজ্জাক্রম (S = সুগার, P = ফসফেট; A, T, G, C নাইট্রোজেন বেস; :::: হাইড্রোজেন বন্ড)

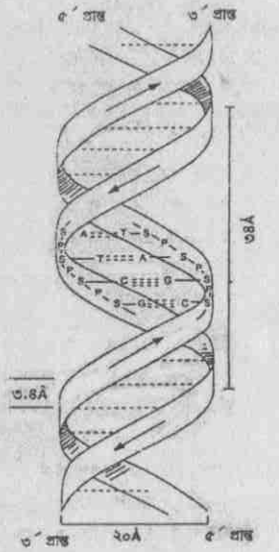

চিত্র : DNA অণুর ডাবল হেলিক্স, (P = ফসফেট, S = সুগার, A = অ্যাডেনিন, T = থাইমিন, G = গুয়ানিন, C = সাইটোসিন :::: হাইড্রোজেন বন্ড)

iii. সিঁড়ির দুই দিকের রেলিং তৈরি হয় ডিঅক্সিরাইবোজ শুগার ও ফসফেটের পর্যায়ক্রমিক (alternate) সংযুক্তির মাধ্যমে।
iv. দুই দিকের দুটি রেলিং এর মাঝখানের প্রতিটি ধাপ তৈরি হয় এক জোড়া নাইট্রোজিনাস বেস (ক্ষারক) দিয়ে। DNA অণুতে অ্যাডিনিন (A)-এর সাথে থাইমিন (T) এবং সাইটোসিনের (C) সাথে গুয়ানিন (G) যুক্ত হয়। এরা পরস্পর সম্পূরক।
v. এক দিকের অ্যাডিনিন অপর দিকের থাইমিনের সাথে দুইটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে সংযুক্ত থাকে (A = T বা T = A) এবং একদিকের সাইটোসিন অপর দিকের গুয়ানিনের সাথে তিনটি হাইড্রোজেন বন্ড দিয়ে যুক্ত থাকে (C ≡ G বা G ≡ C)। কাজেই সিঁড়ির ধাপ হয় A = T, অথবা C ≡ G।

vi. ক্ষারকগুলো (A, T, G, C) শ্যুগারের ১ নং কার্বনের সাথে যুক্ত থাকে।

vii. ডবল হেলিক্স-এর প্রতিটি ঘূর্ণনে (বা প্যাঁচে) ১০ জোড়া মনোনিউক্লিওটাইড থাকে। একজোড়া (পাশাপাশি অবস্থিত) মনোনিউক্লিওটাইডের দৈর্ঘ্য ৩.৪ Å, কাজেই ডবল হেলিক্স-এর প্রতিটি প্যাঁচ বা ঘূর্ণনের দূরত্ব ৩৪ Å (১০ × ৩.৪ Å)।

viii. ডবল হেলিক্স-এর ব্যাস ২০ Å; দৈর্ঘ্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভিন্নতর হতে পারে। সিঁড়ির এক ধাপ হতে অপর ধাপের দূরত্ব ৩.৪ Å।

ix. হেলিক্সের প্রতি ঘূর্ণন বা প্যাঁচে একটি গভীর ও একটি অগভীর খাঁজ বা ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

মোট কথা দুটি ডিঅক্সি পলিনিউক্লিওটাইডের সূত্র বিপরীতমুখীভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি দ্বিসূত্রক DNA অণু গঠন করে। অণুটি প্যাঁচানো সিঁড়ির মত বিন্যস্ত থাকে।

○ প্রশ্ন-১৬. DNA -এর অনুলিপন প্রক্রিয়ার বর্ণনা করুন। জীবজগতে এ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব কি?

উত্তর : DNA অণুর দ্বিত্বন, অনুলিপিকরণ বা প্রতিরূপ সৃষ্টি (Replication of DNA) : যে প্রক্রিয়ায় একটি DNA ডবল হেলিক্স হতে পূর্বানুরূপ দুটি অণুর সৃষ্টি করে, তাকে DNA অণুর দ্বিত্বন বা প্রতিরূপ সৃষ্টি বলে। DNA অণুর প্রতিরূপ সৃষ্টিই কোষ বিভাজনের পূর্বশর্ত। মাইটোটিক কোষ বিভাজনের ইন্টারফেজ পর্যায়ে সাধারণত DNA অণুর অনুলিপিকরণ ঘটে।

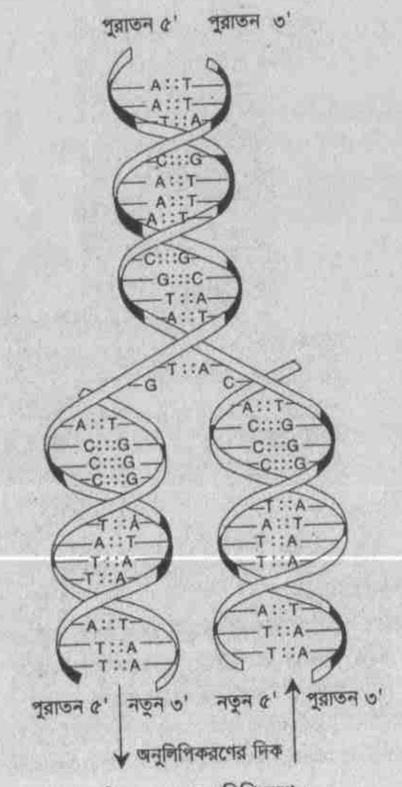

চিত্র : DNA অণুলিপিকরণ।

DNA অণুর দ্বিত্বন বা প্রতিরূপ সৃষ্টি প্রক্রিয়াটি নিম্নবর্ণিত চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়।

i. প্রথমে ডবল হেলিক্স-এর মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং ডবল হেলিক্স, একক হেলিক্স-এ পরিণত হয়।

ii. প্রতিটি একক হেলিক্স তার জন্য নতুন সম্পূরক একক হেলিক্স তৈরির টেম্পলেট (template = ছাঁচ) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

iii. DNA-পলিমারেজ এনজাইম মুক্ত নিউক্লিওটাইড এনে খোলা DNA অণুতে যুক্ত করে সম্পূরক একক হেলিক্স সৃষ্টি করে। DNA-পলিমারেজ সব সময়ই নিউক্লিওটাইডকে বর্ধিষ্ণু নতুন হেলিক্স-এর ৩'-প্রান্তে যুক্ত করে। কাজেই নতুন হেলিক্স সব সময়ই ৫' - ৩' অভিমুখী বৃদ্ধি পেতে থাকে।

iv. অনুলিপনের ফলে সৃষ্ট প্রতিটি নতুন ডবল হেলিক্স-এ একটি পুরাতন হেলিক্স থেকে যায়। এ একটি পুরাতন হেলিক্সকে ছাঁচ ধরে একটি সম্পূরক নতুন হেলিক্স তৈরিকে অর্ধরক্ষণশীল অনুলিপন (semiconservative replication) বলে। DNA অনুলিপনের জন্য DNA পলিমারেজ এনজাইম অত্যাবশ্যকীয়।

জীবন জগতে DNA অনুলিপনের গুরুত্ব অপরিসীম। কোষ বিভাজন এবং গ্যামিট সৃষ্টির জন্য DNA অনুলিপন অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ দেহের বৃদ্ধি ও জনন এবং এর মাধ্যমে বৈশিষ্ট্য পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর পুরুষে স্থানান্তর ইত্যাদির জন্য DNA অনুলিপন বাধ্যতামূলক।

○ প্রশ্ন-১৭. DNA -এর জৈবিক তাৎপর্য লিখুন।

উত্তর : DNA -এর জৈবিক তাৎপর্য (Biological significance of DNA) : DNA বংশগতি বিষয়ক বৈশিষ্ট্যাবলির ধারক ও বাহক। অধিকাংশ জীবের বংশগতির কাল্পনিক একক অর্থাৎ জিন (gene) DNA ছাড়া অন্য কিছুই নয়। নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্যই DNA-কে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।

i. DNA দ্বারা কোষ বিভাজনের সময় এক নির্ভুল প্রতিলিপি সৃষ্টি হয়।

ii. DNA কোষের জন্য নির্দিষ্ট প্রকারের প্রোটিন সংশ্লেষ করে।

iii. DNA বংশগতির সব ধরনের জৈবিক সংকেত বহন করার ক্ষমতা রাখে।

○ প্রশ্ন-১৮. DNA (Deoxyribonucleic Acid)-এর বৈশিষ্ট্য লিখুন।

উত্তর : DNA-এর বৈশিষ্ট্য :

ক. DNA বংশগতির বাহক।

খ. ক্রোমোজোমের ভেতর DNA একটি আবশ্যক সুনির্দিষ্ট অঙ্গ।

গ. কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজনের সময় এরা নির্ভুল প্রতিলিপি গ্রহণ করতে পারে।

ঘ. DNA অণু স্থায়ী, তথাপি প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম উপায়ে DNA-এর বেস পরিবর্তন করে স্থায়ীভাবে নতুন ধরনের DNA সৃষ্টি করতে পারে। এই পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে।

ঙ. কোনো কারণে এর বেস নষ্ট হলে নিউক্লিওপ্লাজম থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিলে DNA-এর স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না।

○ প্রশ্ন-১৯. RNA (Ribonucleic Acid) কি? এর অবস্থান বা বিস্তার লিখুন।

উত্তর : RNA : যে নিউক্লিক অ্যাসিডের পলিনিউক্লিওটাইডের মনোমার এককগুলোতে গাঠনিক উপাদানরূপে রাইবোজ শ্যুগার এবং অন্যতম বেস (ক্ষারক) হিসেবে ইউরাসিল থাকে, তাকে রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড (RNA) বলে।

অবস্থান বা বিস্তৃতি : সকল জীব কোষে RNA থাকে। কোষের শতকরা ৯০ ভাগ RNA থাকে সাইটোপ্লাজমে বাকি ১০ ভাগ নিউক্লিয়াসে। সাইটোপ্লাজম, রাইবোজোম, নিউক্লিয়াস, ক্রোমোজোম, মাইটোকনড্রিয়া এবং প্লাস্টিডেও RNA পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়োলাস এবং DNA- এর সহযোগী হিসেবে ক্রোমোজোমে RNA থাকে। ব্যাকটেরিয়া কোষেও RNA পাওয়া যায়। এছাড়া কিছু ভাইরাসেও RNA উপস্থিত থাকে।

○ প্রশ্ন-২০. RNA-এর ভৌত ও রাসায়নিক গঠন বর্ণনা করুন। RNA-এর কাজ লিখুন।

উত্তর : ভৌত গঠন : RNA এক সূত্রক চেইন-এর মতো। এটি স্থানে স্থানে কুণ্ডলিত অবস্থায় থাকে। এর গঠনে একাধিক U-আকৃতির ফাঁস (hairpin loop) বা লুপ থাকে।

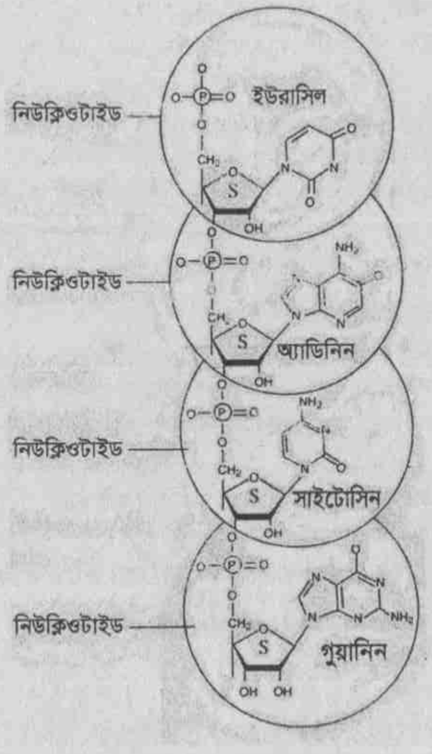

চিত্র ২.২.১৪ : RNA অণুর একাংশ।

রাসায়নিক গঠন : নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে RNA গঠিত হয়।

i. রাইবোজ শ্যুগার (পেন্টোজ শ্যুগার); এটি পাঁচ কার্বন বিশিষ্ট।
ii. নাইট্রোজিনাস বেস (ক্ষারক)-অ্যাডিনিন, গুয়ানিন, ইউরাসিল এবং সাইটোসিন।
iii. ফসফেট (ফসফোরিক অ্যাসিড)।
iv. উক্ত চারটি বেস ছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য বেসও থাকতে পারে।

RNA- এর কাজ :

i. RNA -এর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষ।

ii. tRNA -অ্যামিনো এসিড স্থানান্তর করে।
iii. rRNA রাইবোনিউক্লিও প্রোটিন গঠন করে।
iv. mRNA, DNA হতে বার্তা বহন করে রাইবোজোমে পৌঁছায়।

○ প্রশ্ন-২১. RNA-এর শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তর : গঠন ও কাজের ভিত্তিতে RNA-কে নিম্নোক্ত পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

i. **tRNA (ট্রান্সফার RNA = Transfer RNA) :** যে সব RNA জেনেটিক কোড অনুযায়ী একেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর করে প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে সেগুলোকে ট্রান্সফার RNA বলে। প্রতিটি কোষে প্রায় ৩১ - ৪২ ধরনের tRNA থাকে। নিউক্লিয়াসের ভেতরে tRNA সৃষ্টি হয়। প্রতিটি tRNA-তে মোটামুটি ৯০টি নিউক্লিয়োটাইড থাকে।
কাজ : প্রোটিন সংশ্লেষণের সময় জেনেটিক কোড অনুযায়ী অ্যামিনো অ্যাসিডকে mRNA অণুতে স্থানান্তর করা।

ii. **rRNA (রাইবোসোমাল RNA = Ribosomal RNA) :** যেসব RNA রাইবোসোমের প্রধান গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করে, তাকে রাইবোসোমাল বলে। কোষের সমস্ত RNA-এর শতকরা ৮০-৯০ ভাগই rRNA। কোষের রাইবোসোমে এদের অবস্থান।
কাজ : রাইবোসোম নামক কোষ অঙ্গাণু সৃষ্টিতে অবদান রাখে যার মাধ্যমে কোষে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

iii. **বার্তাবহ mRNA (মেসেঞ্জার RNA = Messenger RNA) :** যেসব RNA জিনের সংকেত অনুযায়ী প্রোটিন সংশ্লেষের ছাঁচ হিসেবে কার্যকর হয়ে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রম বাছাই করে, সেগুলোকে মেসেঞ্জার বা বার্তাবহ RNA বলে। DNA থেকে ট্রান্সক্রিপশনের মাধ্যমে mRNA সৃষ্টি হয়। mRNA লম্বা চেইনের মতো।
কাজ : নির্দিষ্ট প্রোটিন সংশ্লেষণের বার্তা নিউক্লিয়াস থেকে সাইটোপ্লাজমে বহন করে এবং রাইবোজোম ও tRNA-র সাহায্যে নির্দিষ্ট অ্যামিনো অ্যাসিড অনুক্রমের শৃঙ্খল তৈরি করে।

iv. **gRNA (জেনেটিক RNA = Genetic RNA) :** যেসব RNA কিছু ভাইরাস দেহে বংশগতি বস্তু হিসেবে কাজ করে তাকে জেনেটিক RNA বলে। এসব ক্ষেত্রে জীবদেহে DNA অনুপস্থিত থাকে।
কাজ : প্রধান কাজ প্রোটিন তৈরি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশগতির বস্তু হিসেবেও কাজ করে (যেমন- TMV)।

v. **মাইনর RNA (Minor RNA) :** সাইটোপ্লাজমীয় RNA ও নিউক্লীয় RNA নামে কিছু ক্ষুদ্র RNA রয়েছে যারা কোষে বিভিন্ন প্রোটিনের সাথে মিশে এনজাইমের কাঠামো দান করে।
কাজ : বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের কাঠামো দান করা এবং এনজাইম হিসেবে কাজ করা।

○ প্রশ্ন-২২. DNA ও RNA-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : DNA ও RNA-এর মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

DNA	RNA
i. ৫-কার্বনবিশিষ্ট শর্করা Deoxyribonucleic acid; এতে অক্সিজেন অণু কম থাকে।	i. ৫-কার্বনবিশিষ্ট শর্করা ribonucleic acid; এতে O_2 অণু বেশি থাকে।
ii. এতে N_2 বেস চার প্রকার; অ্যাডেনিন, গোয়ানিন, সাইটোসিন ও থাইমিন। এতে ইউরাসিল থাকে না।	ii. এতে থাইমিন কখনো থাকে না তার পরিবর্তে ইউরাসিল থাকে।

DNA	RNA
iii. নিউক্লিওটাইডের শৃংখল পরস্পরকে সর্পিলভাবে জড়িয়ে থাকে, অনেকটা পাকানো দড়ির মতো।	iii. RNA সরু শৃঙ্খলবিশিষ্ট এবং এর কোনো নির্দিষ্ট আকার নেই।
iv. DNA অণু নিজে নিজে উৎপন্ন হয়।	iv. RNA অণুর সংশ্লেষ DNA অণুর উপর নির্ভরশীল।
v. জীবের সবরকম বিপাকীয় কাজকর্মের চাবিকাঠি DNA অণু।	v. DNA অণুর আজ্ঞাবহ RNA অণু; এর মাধ্যমে DNA সবরকম কাজ সম্পাদন করে।
vi. একে বংশীয় দ্রব্য বলা হয়, যা বংশগতির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ করে।	vi. এটি কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণের সাথে জড়িত।
vii. DNA -এর প্রকারভেদ নেই।	vii. RNA প্রধানত তিন প্রকার। যথা : – Ribosomal বা rRNA – Transfer বা tRNA – Messenger বা mRNA

○ প্রশ্ন-২৩. মেন্ডেলিজম কি?

উত্তর : অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল প্রথম মটর গাছের উপর গবেষণা করে বংশগতির দুটি তত্ত্ব প্রকাশ করেন। বংশগতির উপর মেন্ডেলের এই গবেষণালব্ধ তত্ত্বকে 'মেন্ডেলিজম' বলে।

১ম সূত্র (পৃথকীকরণ সূত্র) : মনোহাইব্রিড ক্রসে অংশগ্রহণকারী বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরদ্বয় (জিনদ্বয়) মিশ্রিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জনন কোষ (গ্যামেট) সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করে।

২য় সূত্র (স্বাধীন সঞ্চালন তত্ত্ব) : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ক্রস ঘটলে প্রথম সংকর পুরুষে (F_1) কেবলমাত্র প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হবে; কিন্তু জনন কোষ উৎপাদনকালে বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেদে একে অপর হতে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন জনন কোষে প্রবেশ করবে।

○ প্রশ্ন-২৪. জিনতত্ত্ব কি?

উত্তর : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় বংশগতির রীতিনীতি অর্থাৎ বংশানুক্রমিক গুণাবলির উৎপত্তি, প্রকৃতি, বৃদ্ধির সময় ও আচরণ সম্পর্কে আলোচিত হয়, সে শাখাকে বংশগতিবিদ্যা বা জীনতত্ত্ব বলে।

○ প্রশ্ন-২৫. জিনতত্ত্বে ব্যবহৃত নিম্নলিখিত শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করুন।

i. ফ্যাক্টর; ii. লোকাস; iii. অ্যালিল বা অ্যালিলোমরফ; iv. হোমোজাইগাস; v. হেটারোজাইগাস; vi. প্রকট বৈশিষ্ট্য; vii. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য; viii. ফিনোটাইপ; ix. জিনোটাইপ; x. একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস; xi. দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস; xii. টেস্ট ক্রস; xiii. ব্যাক ক্রস।

উত্তর :

i. **ফ্যাক্টর (Factor) বা জিন (Gene) :** DNA অণুর একটি খণ্ডাংশ যা জীবের বংশগতির মৌলিক ভৌত ও কার্যিক একক এবং বংশ থেকে বংশান্তরে জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে, তাকে ফ্যাক্টর বা জীন বলে।

ii. **লোকাস (Locus) :** ক্রোমোজোমে একটি নির্দিষ্ট জীন বা এর অন্যতম অ্যালিলের নির্দিষ্ট অবস্থানকে লোকাস বলে।

iii. **অ্যালিল বা অ্যালিলোমরফ (Allele or Allelomorph) :** সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জীন-জোড়ার একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে। অ্যালিল দুটি একই ধর্মী (যেমন–TT) অথবা একে অপরের বিপরীত ধর্মী (যেমন–Tt) হতে পারে। যখন দুটি বিপরীতধর্মী অ্যালিল থাকে তখন একটিকে প্রকট অ্যালিল অর্থাৎ, T, অন্যটিকে প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বলে।

iv. **হোমোজাইগাস (Homozygous) :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি সমপ্রকৃতির হলে, তাকে হোমোজাইগাস বলে। এ ধরনের স্ত্রী-পুরুষ জীব থেকে শুদ্ধ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের জন্ম হয়। যেমন– BB = কালো পশম, bb = বাদামী পশম ইত্যাদি। এগুলো শুধু এক ধরনের জননকোষ উৎপন্ন করে।

v. **হেটারোজাইগাস (Heterozygous) :** কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিল দুটি অসমপ্রকৃতির হলে, তাকে হেটারোজাইগাস জীব বলে। এক্ষেত্রে অ্যালিলদুটির একটি অন্যটির উপর প্রকট বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন থাকে। যেমন T এবং t অর্থাৎ Tt-ধারী জীবটি লম্বা হলেও তা হেটারোজাইগাস জীব। এগুলো দুধরনের জননকোষ উৎপন্ন করে।

vi. **প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) :** একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হোমোজাইগাস জীবে (TT অর্থাৎ tt) সংকরায়ন ঘটালে F_1 বংশে সৃষ্ট হেটারোজাইগাস জীবে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাকে প্রকট বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন–F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের লক্ষণের জন্য একটি করে জীন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছের লম্বা বৈশিষ্ট্যটি প্রকট।

vii. **প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) :** হেটারোজাইগাস জীবে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপাদান একত্রে থাকলেও একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, অপরটি অপ্রকাশিত থাকে। জীবের অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বলে। যেমন– F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি করে জীন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে খাটো বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন। প্রচ্ছন্ন জীনটি নিজেকে প্রকাশে ব্যর্থ হলেও অপরিবর্তিত অবস্থায় পরবর্তী বংশধরে গমন করে।

viii. **ফিনোটাইপ (Phenotype) :** জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে ফিনোটাইপ বলে। এটি জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে। সদৃশ ফিনোটাইপধারী দুটি জীবের জিনোটাইপ একই রকম বা ভিন্ন হতে পারে। যেমন– বিশুদ্ধ লক্ষণযুক্ত লম্বা ও খাটো মটর গাছের মধ্যে পরাগ সংযোগ ঘটালে F_1 জনুতে সবগুলো উদ্ভিদই লম্বা আকৃতির হয় যদিও এদের মধ্যে দুধরনের ফ্যাক্টরই (Tt) থাকে। এখানে ফিনোটাইপ হলো 'লম্বা'।

ix. **জিনোটাইপ (Genotype) :** কোনো জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জীন যুগলের গঠনকে জিনোটাইপ বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা যায়। সদৃশ জিনোটাইপধারী জীবেরা যদি একই পরিবেশে বাস করে তাহলে ওদের ফিনোটাইপও সদৃশ হবে। একটি লম্বা গাছের জিনোটাইপ হতে পারে TT বা Tt আর খাটো গাছের জিনোটাইপ হবে tt ।

x. **একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) :** জীবের এক জোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয়, তাকে এক সংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। যেমন– কালো ও বাদামী বর্ণের গিনিপিগের মধ্যে ক্রস। মনোহাইব্রিড ক্রসে ২য় অপত্য বংশে (F_2) প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপাত সাধারণত ৩ : ১ হয়। মেন্ডেল তাঁর প্রথম সূত্রটি একসংকর ক্রসের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করেছিলেন।

xi. **দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) :** জীবের দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয়, তাকে দ্বিসংকর ক্রস বা ডাইহাইব্রিড ক্রস বলে। যেমন– কালোবর্ণ-ছোটলোমধারী ও বাদামীবর্ণ-লম্বালোমযুক্ত গিনিপিগের ক্রস। ডাইহাইব্রিড ক্রসে ২য় অপত্য বংশে (F_2) জীনের স্বাধীন সঞ্চারণের ফলে সাধারণত ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে চার ধরনের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সন্ততি পাওয়া যায়।

xii. **টেস্ট ক্রস (Test cross) :** F_1 বা F_2 জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবের সাথে যে সংকরায়ণ বা ক্রস করানো হয়, তাকে টেস্টক্রস বলে। এভাবে এদের F_1 এবং F_2 জনুর জিনোটাইপ বের করা যায়। যেমন– সংকর লম্বা মটর গাছ (Tt) এবং বিশুদ্ধ খাটো মটর গাছ (tt) এর সংকরায়ণ ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক এবং জিনোটাইপিক অনুপাত হবে ১ ঃ ১।

xiii. **ব্যাক ক্রস (Back cross) :** F_1 জনুর একটি হেটোরোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃ বংশীয় এক সদস্যের সঙ্গে সংকরায়ণকে ব্যাক ক্রস বলে।

○ প্রশ্ন-২৬. সিস্ট্রোন (Cistron) কী?

উত্তর : জিনের কার্যগত একককে সিস্ট্রোন বলে। সাধারণ অর্থে সিস্ট্রোনকেই জিন বলা হয়। একটি কার্যনির্বাহী এককের মধ্যে শতাধিক ক্ষুদ্রস্থান বিদ্যমান, যেখানে মিউটেশন ঘটে থাকে। কোনো কোনো সিস্ট্রোনের দৈর্ঘ্য ৩০,০০০ নিউক্লিওটাইডের সমান পর্যন্ত হয়ে থাকে।

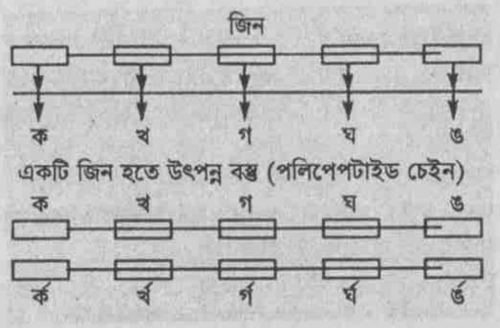

চিত্র : সিস্ট্রোন

○ প্রশ্ন-২৭. রেকন (Recon) কী?

উত্তর : DNA এর যে ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যে ক্রসিং-ওভার সম্পন্ন হয়, তাকে রেকন বলে। একে পুনঃসংযোগের চরম একক বলা হয়।

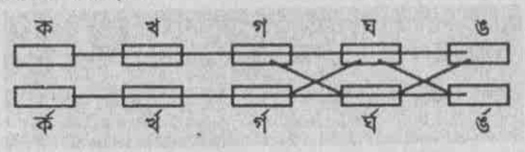

চিত্র : রেকন

○ প্রশ্ন-২৮. মিউটন (Muton) কী?

উত্তর : DNA অণুর ক্ষুদ্রতম যে অংশে মিউটেশন (পরিব্যক্তি) ঘটে তাকে মিউটন বলে। এই অর্থে যে কোনো একজোড়া ক্ষারককেই মিউটন বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মিউটন জিনের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ বিশেষ।

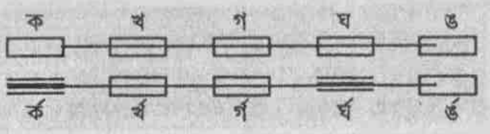

চিত্র : মিউটন

○ প্রশ্ন-২৯. মেন্ডেলের সূত্রদ্বয়ের ব্যতিক্রম বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : মেন্ডেলের সূত্রগুলো কেবল সম্পূর্ণ প্রকটতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তাছাড়া মেন্ডেলের সূত্রানুযায়ী প্রতিটা ফিনোটাইপিক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ কেবল একজোড়া করে এলিলিক জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলোর প্রকাশ একাধিক জোড়া জিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

এসব জিনের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে জীবের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে। ফলে সে সকল ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিপরীত বৈশিষ্ট্যাবলির অনুপাতও ভিন্ন ধরনের হয়। এসব অনুপাতসমূহ মেন্ডেলের সূত্রদ্বয়ের ব্যতিক্রম হিসেবে পরিচিত। সুতরাং বংশগতির যেসব ক্ষেত্রে ৩ ঃ ১ এবং ৯ ঃ ৩ ঃ ৩ ঃ ১ এর পরিবর্তে অন্য অনুপাত পাওয়া যায়, সেসব অনুপাতকে মেন্ডেলের সূত্রদ্বয়ের অনুপাতের ব্যতিক্রম বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৩০. জিন কি? জিনের কাজ উল্লেখ করুন।

উত্তর : জিন : একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী পলিনিউক্লিওটাইড চেইনের অংশ বিশেষ হলো জিন।

জিনের কাজ :

i. জিন হলো বংশগতির ধারক ও বাহক।
ii. কোষ বিভাজনের সময় জিন বা DNA তার নির্ভুল অনুলিপন কার্য সম্পন্ন করে।
iii. প্রোটিন সংশ্লেষণসহ অন্যান্য কাজের জন্য RNA সংশ্লেষণ করে।
iv. জিন জাইগোট থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবে রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
vi. জিন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোষের সকল জৈবিক কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
vii. জিন কোষে সকল প্রকার জৈবনিক সংকেত প্রেরণ করে।
viii. জিনের গঠন কাঠামো সাধারণত স্থায়ী হয়। তবে বিশেষ কারণে Mutation ঘটে থাকে।

○ প্রশ্ন-৩১. জিনের প্রকৃতি উল্লেখ করুন।

উত্তর : জিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

i. প্রতিটি জিন নিউক্লিক এসিড দ্বারা গঠিত।
ii. একটি জিনে গড়ে ১৫০০ নিউক্লিওটাইড বিদ্যমান।
iii. জিন ক্রোমোজোমের অভ্যন্তরে অবস্থান করে এবং এটি ক্রোমোজোমের অবিচ্ছিন্ন অংশ।
iv. সাধারণত একটি জিনের রাসায়নিক গঠন বৈশিষ্ট্য অপর জিনের বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে না।
v. ক্রোমোজোমে জিনের সংখ্যা অসংখ্য। এদের সংখ্যা তিনটি (ভাইরাস) থেকে কয়েক বা লক্ষ লক্ষ সহস্র (মানুষ) পর্যন্ত হতে পারে।
vi. নির্দিষ্ট ক্রোমোজোমে জিনগুলো বিশেষ রীতিতে সজ্জিত থাকে এবং প্রতিটি জিন ক্রোমোজোমের একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। প্রতিটি জিন দ্বারা অধিকৃত ক্রোমোজোমের বিশেষ স্থানকে ঐ জিনের লোকাস (Locus) বলে। একই ক্রোমাজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে Linked জিন বলে।
vii. জিনের আয়তন প্রায় ১/২০ µ।
viii. আকৃতি ও গঠন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন না ঘটিয়েও জিন আত্মোৎপাদন করতে পারে।

○ প্রশ্ন-৩২. জিনের গঠন বর্ণনা করুন।

উত্তর : একটি পূর্ণাঙ্গ জিন কয়েকটি অংশের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এর মধ্যে প্রধান অংশ দুটি হচ্ছে– ১. নিয়ন্ত্রক অংশ এবং ২. সংকেতবাহী অংশ।

ক. **নিয়ন্ত্রক অংশ :** জিনের নিয়ন্ত্রক (regulatory) অংশ জিন প্রকাশকে সঠিক গতিতে কোষের প্রয়োজন অনুযায়ী অগ্রসর করে। নিয়ন্ত্রক অংশে তিনটি ভাগ থাকতে পারে– প্রমোটার (promoter), রিপ্রেসর (repressor) এবং এনহ্যান্সার (enhancer)। জিনের প্রোমোটার অংশ আরএনএ তৈরির জন্য আরএনএ পলিমারেজ এনজাইম নিজের সাথে সংযুক্ত করে। ডিএনএ-র যে অনুক্রমটি জিন, আরএনএ অণুতেও ঠিক ঐ অনুক্রম প্রকাশিত হতে হয়। যেমন– 5'-GCTGCGAC-3' জিনটি যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে প্রথমে এই জিনের প্রোমোটার অংশে আরএনএ পলিমারেজ সংযুক্ত হবে। এই উৎসেচক ডিএনএ অণুর 5' – 3' সূত্রকের সম্পূরক সূত্রক 3' – 5' কে ছাঁচ (template) হিসেবে ব্যবহার করবে। 3' – 5' সূত্রককে ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করায় নতুন আরএনএ সূত্রকটি হবে 5' – 3' এবং এর ক্ষারক অনুক্রম হবে ডিএনএ অণুর 5' – 3' সূত্রকে অবস্থিত জিনটির ক্ষারক অনুক্রমের অনুরূপ।

জিনের নিয়ন্ত্রক অঞ্চলের আরেকটি অংশ হচ্ছে রিপ্রেসর (repressor) বা সংবাধক অঞ্চল। এ অঞ্চল জিনের অতিরিক্ত প্রকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ জিনটি যাতে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কার্যকারিতা না দেখায় তা নিশ্চিত করাই রিপ্রেসরের প্রধান কাজ। রিপ্রেসরের কাজকে বলা হয় ঋণাত্মক নিয়ন্ত্রণ (negative regulation)।

এনহ্যান্সার (enhancer) বা প্রবর্ধক অঞ্চল জিনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রক অংশ। প্রয়োজনের সময় একটি জিন থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন আদায় করে নেয় এনহ্যান্সার। এ অঞ্চলের অবস্থান জিন থেকে বহু দূরে (প্রায় হাজার ক্ষারক দূরে) হতে পারে। এতদূর থেকে কীভাবে সে জিনের কাজে প্রভাব বিস্তার করে তা এক রহস্য বটে। এনহ্যান্সারের কাজকে বলা হয় ধনাত্মক নিয়ন্ত্রণ (positive regulation)।

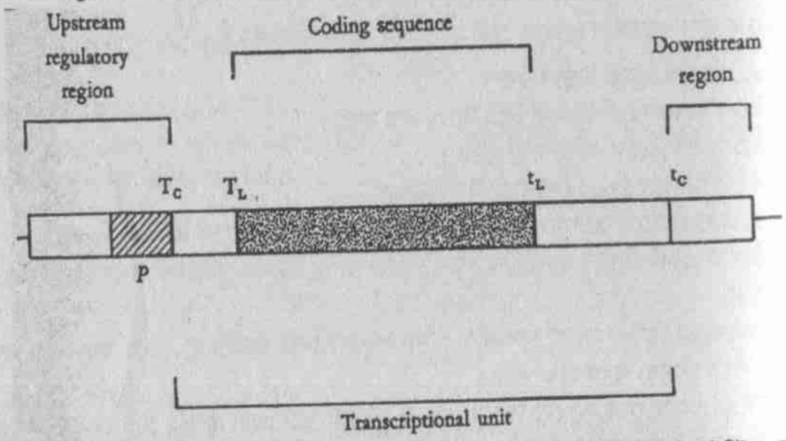

চিত্র : জিনের সম্পূর্ণ গঠন, T_c থেকে tc পর্যন্ত ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিট। T_L থেকে t_L পর্যন্ত ট্রান্সলেশন ইউনিট, p হচ্ছে প্রোমোটার অংশ। Urr এবং Dr যথাক্রমে upstream regulatory region এবং Downstream region নির্দেশ করছে।

খ. **সংকেতবাহী অংশ :** জিনের সংকেতবাহী অংশকে বলা হয় ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিট। এ অংশটুকুই প্রাথমিক আরএনএ তৈরি করে। ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিটটিও সম্পূর্ণরূপে প্রোটিন তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয় না। যেটুকু ব্যবহৃত হয় তাকে বলা হয় ট্রানস্লেশন ইউনিট (translation unit) এবং চূড়ান্ত আরএনএ অণুতে শুধু জিনের ট্রানস্লেশন ইউনিটের অনুক্রম থাকে। এই অনুক্রমগুলোই অ্যামিনো এসিডের সমন্বয় কেমন হবে তা নির্দেশ করে।

ট্রান্সক্রিপশনাল ইউনিটের উপরের দিকে 5' প্রান্তের অংশ যেখানে জিনের নিয়ন্ত্রক অঞ্চল অবস্থান করে তাকে বলা হয় upstream regulatory region (ঊর্ধ্বস্থিত নিয়ন্ত্রক অঞ্চল) আর 3' প্রান্তের নিচের দিকে জিনের কিছু বাড়তি অংশ থাকে। তাকে বলা হয় downstream region (নিম্নস্থিত অঞ্চল)।

○ প্রশ্ন-৩৩. লিথাল বা ঘাতক জিন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : কোনো একটি জিনের হোমোজাইগাস উপস্থিতি ঐ জীবের মৃত্যুর কারণ হলে তাকে লিথাল জিন বলে। লিথাল জিন বা ঘাতক জিন এক ধরনের রূপান্তরিত (Mutant) জিন। মানুষসহ অধিকাংশ জীবের দেহেই এক বা একাধিক লিথাল জিন থাকে। হেটারোজাইগাস অবস্থায় এই জিন মারাত্মক নয়। কারণ পিতা বা মাতা যে কোনো একজন থেকে প্রাপ্ত লিথাল জিনের ক্ষতিকর ভূমিকা অপরজনের স্বাভাবিক জিনের উপস্থিতিতে নষ্ট হয়ে যায়। (লিথাল জিনের কার্যকারিতা মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্রের অনুরূপ)। হোমোজাইগাস বা অমিশ্রিত অবস্থায় (Pure) লিথাল জিনধারী ভ্রূণ বা শিশুজীবের মৃত্যু ঘটে। ফলে এসব লিথাল জিনধারী জীবদের মধ্যে সংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বংশধরদের প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ২ : ১ হয়।

○ প্রশ্ন-৩৪. এপিস্ট্যাসিস কি?

উত্তর : বংশগতির ক্ষেত্রে একটি জিনের দ্বারা অন্য একটি নন-এলিলিক জিনের লক্ষণ প্রকাশে বাধা দেওয়ার পদ্ধতিকে এপিস্ট্যাসিস বলে।

এটি মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম। এর ফলে মেন্ডেলের সূত্রের অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১৩ : ৩ হয়।

○ প্রশ্ন-৩৫. এপিস্ট্যাটিক ও হাইপোস্ট্যাটিক জিন কাকে বলে?

উত্তর : এপিস্ট্যাটিক জিন : যে জিনটি অপর নন-এলিলিক জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দান করে তাকে এপিস্ট্যাটিক বা বাধক জিন বলে।

হাইপোস্ট্যাটিক জিন : যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় তাকে হাইপোস্ট্যাটিক জিন বা বাধাপ্রাপ্ত জিন বলে।

○ প্রশ্ন-৩৬. সেক্স লিংকড জিন ও সেক্সলিংকড ইনহেরিটেন্স কাকে বলে।

উত্তর : সেক্স লিংকড জিন : সেক্স (সাধারণত x) ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোকে সেক্স লিংকড জিন বলে। মানুষের ৫০টিরও অধিক সেক্সলিংকড জিনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়।

সেক্সলিংকড ইনহেরিটেন্স : সেক্স (সাধারণত x) ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর বংশ পরম্পরায় সঞ্চারণকে সেক্সলিংকড ইনহেরিটেন্স বলে।

○ প্রশ্ন-৩৭. ডিএনএ (DNA) টেস্ট কি?

উত্তর : ডিএনএ টেস্ট হলো একটি অত্যাধুনিক শনাক্তকরণ পদ্ধতি। যাতে কোষের মধ্যে অবস্থিত ডিএনএ এর মাধ্যমে কোনো মানুষকে সঠিকভাবে শনাক্ত করা যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে জেনেছেন যে মানুষের ডিএনএ এর মধ্যে এমন কিছু নিউক্লিওটাইড রিপিট থাকে যা নির্দিষ্ট মাতা এবং পিতার সঙ্গে কেবল তাদের সন্তানেরাই ভাগ করে নেয়। উল্লেখ্য, সহোদর যমজ ছাড়া প্রত্যেক মানুষেরই ডিএনএ সজ্জা আলাদা।

○ প্রশ্ন-৩৮. DNA ফিঙ্গার প্রিন্ট কি?

উত্তর : ফিঙ্গার প্রিন্ট হলো কোনো ব্যক্তির DNA এর সাথে অপর কোনো ব্যক্তির DNA-র সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করার একটি পদ্ধতি। ফিঙ্গার প্রিন্টিং কৌশলের ফরেনসিক ব্যবহারে অপরাধীর কোষ থেকে প্রাপ্ত ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের কোষের ফিঙ্গার প্রিন্টের সাথে তুলনা করা হয়। যদি প্যাটার্ন পুরোপুরি মিলে যায়, তখন নির্দিষ্ট শনাক্তকরণ রেকর্ড তৈরি করা হয়। পিতৃত্ব নির্ণয়ে মা, বাচ্চা ও ঘোষিত পিতার ফিঙ্গার প্রিন্ট তুলনা করা হয়। এক্ষেত্রে বাচ্চার ব্যান্ডের এক অর্ধ মা থেকে আসে এবং অপর অর্ধ পিতা থেকে আসে। শিশুর ফিঙ্গার প্রিন্টের সকল পৈতৃক ব্যান্ড ইতিবাচক পিতৃত্ব নির্ণয়ের জন্য সঠিকভাবে মিলিয়ে নিতে হবে।

○ প্রশ্ন-৩৯. DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর : A. Jeffreys-এর পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ধাপ অনুসরণ করা হয় :

i. রক্ত, বীর্যরস বা অন্যান্য ডিএনএ বহনকারী কোষের সামান্য নমুনা থেকে ডিএনএ পরিশুদ্ধ করা হয় এবং রেস্ট্রিকশান এন্ডোনিউক্লিয়েজ দ্বারা ডাইজেস্ট করে ক্ষুদ্রতর খণ্ড করা হয়।
ii. অ্যাগারোজ জেল ইলেকট্রোফোরেসিস দ্বারা খণ্ডগুলো পৃথক করা হয়।
iii. সাউদার্ন ব্লটিং কৌশল দ্বারা একটি নাইলন পর্দাতে পৃথকীকৃত খণ্ডগুলো স্থানান্তর করা হয়।

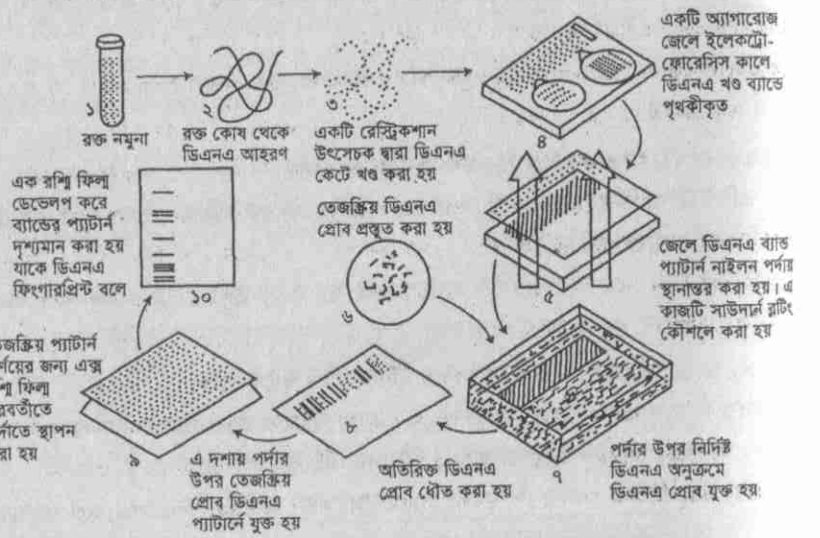

চিত্র : ডিএনএ ফিংগারপ্রিন্টিং পদ্ধতির ধাপ (Burns and Bottino, ১৯৮৯ অনুসারে)

iv. তেজস্ক্রিয় বস্তু দ্বারা লেবেল করা ডিএনএ প্রোব নাইলন পর্দা বহনকারী দ্রবণে যোগ করা হয়।
v. এখানে প্রোব ব্যান্ড তৈরি করে, যা লেগে থাকা ডিএনএ অনুক্রমের পুনরাবৃত্তি বহন করে।
vi. নাইলন ফিল্টারের বিপরীতে এক্সরে ফিল্ম প্রেস করা হয় এবং ব্রান্ডে প্রকাশিত হয়, যা ডিএনএ খণ্ডগুলোতে যুগ্ম তেজস্ক্রিয় প্রোব বহন করে।
vii. ফিল্মে প্রাপ্ত ব্যান্ডের প্যাটার্ন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ১০০% সঠিক। তবে যমজ শিশুর ক্ষেত্রে প্যাটার্ন একই হয়।

○ প্রশ্ন-৪০. DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এর প্রয়োগ উল্লেখ করুন।

উত্তর : আধুনিক যুগে ব্যক্তি ও ক্রিমিনাল শনাক্তকরণে DNA প্রযুক্তি ১০০% সঠিক। যেটি DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং নামে পরিচিত এবং ১৯৮৫ সাল থেকে তা সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে DNA প্রযুক্তির কয়েকটি ব্যবহার নিচে উল্লেখ করা হলো–

i. কখনো প্রয়োজন হলে পিতৃত্বের দাবির সমস্যায় মা, সন্তান ও কথিত বাবার কোষের DNA পরীক্ষা করে নিশ্চিতভাবে পিতা শনাক্ত করা সম্ভব। তেমনিভাবে মাতৃত্বের দাবিও নির্ধারণ করা যায়।
ii. হাসপাতালে যদি নবজাতক বদল হয়ে যায় বা ইচ্ছাকৃতভাবে বদল করানো হয় তবে মা এবং বাচ্চার কোষের DNA পরীক্ষা করে বাচ্চার মা সঠিকভাবে শনাক্ত করা সম্ভব।
iii. ধর্ষণকৃত মহিলার স্ত্রী যোনি থেকে প্রাপ্ত শুক্রকীট বা কাপড় ও শরীরের অন্যত্র থেকে প্রাপ্ত শুক্রকীটের DNA পরীক্ষা করে ধর্ষণকারীর রক্তের DNA-এর মিল দেখে ধর্ষণকারীকে শনাক্ত করা সম্ভব।
iv. কোনো ক্রিমিনাল তার ক্রাইম স্পটে যদি তার রক্ত বা চুলের গোড়াসহ চুল রেখে যায় তবে সন্দেহজনক ক্রিমিনালের রক্তের কোষের সঙ্গে প্রাপ্তকোষের DNA পরীক্ষা করে ১০০% সন্দেহাতীতভাবে ক্রিমিনাল শনাক্ত করা সম্ভব হয়।
v. কোনো লোক হারিয়ে গেলে বহুবছর পর তার বাবা, মা বা সন্তানের কোষের DNA পরীক্ষা করে সম্পর্ক নির্ধারণ করা যায়।
vi. অনেক সময় বিকৃত মৃতদেহ শনাক্তকরণে DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৪১. DNA সিকুয়েন্সিং বা জিন-সিকুয়েন্সিং কি?

উত্তর : কোনো DNA অণু বা DNA খণ্ডের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষার অনুক্রম বা নিউক্লিওটাইড অনুক্রম নির্ণয়ের পদ্ধতিকে DNA সিকুয়েন্সিং বলা হয়। এটি রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ কৌশল, যার মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সঠিকভাবে DNA অণুর ক্ষার অনুক্রম নির্ণয় সম্ভব হয়। বিনীত কয়েকটি জীবের ক্ষারক অনুক্রম নিম্নরূপ :

সম্পূর্ণ জীনোম	ক্ষার সংখ্যা (kbp)
১. SV 40	৫
২. Ø × ১৭৪	৫.৪
৩. T_7- কাজ	৩৯
৪. λ - কাজ	৪৯.৫
৫. *E. coli*	৪০৮
৬. ঈস্ট	২০,০০০
৭. মানুষ	২৮,০০,০০০ (এখনো কাজ চলছে)

○ প্রশ্ন-৪২. ফরেনসিক বিজ্ঞান বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : ফরেনসিক কথাটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'ফরেনসিস' থেকে, যার অর্থ প্রকাশ্যে উপস্থাপন। প্রাচীন রোমে কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারীকে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সামনে হাজির করা হতো, যেখানে উভয়পক্ষ তাদের পক্ষের যুক্তি সবার সামনে তুলে ধরতো। উপস্থাপিত প্রমাণ ও যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে বিচার সম্পন্ন হতো যা অনেকটা আমাদের দেশের গ্রাম্য সালিস বিচারের সাথে তুলনীয়। কালক্রমে এই প্রক্রিয়ার সাথে বিজ্ঞান সংযুক্ত হয়েছে অনিবার্য কারণে। বর্তমান বিশ্বে যে বিচারব্যবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেখানে অপরাধ তদন্ত বা বিচারকার্য সম্পাদনের যে কোনো পর্যায়ে বিজ্ঞানের ব্যবহারকে ফরেনসিক বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। বিজ্ঞানভিত্তিক যে কোনো তথ্যই আদালতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য, যা সত্য উদ্ঘাটনে বা অপরাধীকে শনাক্ত

করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সেই বিচারে বিজ্ঞানের যে কোনো শাখাই ফরেনসিক বিজ্ঞানের অংশ হতে পারে। এ যাবৎ বিজ্ঞানের যে সমস্ত শাখা ফরেনসিক বিজ্ঞানে প্রায়শ ব্যবহৃত হয়ে আসছে তার মধ্যে জীববিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও বিষবিদ্যা উল্লেখযোগ্য।

○ প্রশ্ন-৪৩. ফরেনসিক টেস্ট কি?

উত্তর : ফরেনসিক কথাটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'ফরেনসিস' থেকে যার অর্থ প্রকাশ্যে উপস্থাপন। বিজ্ঞানভিত্তিক যে কোনো তথ্যই আদালতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য, যা সত্য উদ্‌ঘাটনে বা অপরাধীকে শনাক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তাকে ফরেনসিক টেস্ট বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৪৪. ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং কি?

উত্তর : ডিএনএ প্রোফাইলিং মূলত ডিএনএ পরীক্ষার একটি অত্যাধুনিক পদ্ধতি, যার মাধ্যমে ডিএনএ-র বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে তুলনা করে একাধিক ব্যক্তির মাঝে মিল বা অমিল খুঁজে বের করা হয়। ডিএনএ পরীক্ষার পদ্ধতিকে সর্বপ্রথম বলা হয়েছিল ডিএনএ ফিঙ্গার প্রিন্টিং। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে এটি জেনোটিক ফিঙ্গার প্রিন্টিং, ডিএনএ টেস্টিং, ডিএনএ টাইপিং ইত্যাদি নামে পরিচিতি লাভ করে। তবে বর্তমান বিশ্বে এটি ডিএনএ প্রোফাইলিং নামে সর্বাধিক পরিচিত। একটি মানব কোষে (জনন কোষ ছাড়া) প্রায় তিন শত কোটি (বেইস পেয়ার ডিএনএ) ক্ষারক থাকে। এর মধ্যে ১০% ডিএনএ প্রায় ত্রিশ হাজারেরও বেশি জিনকে (gene) ধারণ করে। জিন হলো ডিএনএ-র এক একটি নির্দিষ্ট অংশ বা সেগমেন্ট, যা একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। একটি জিন তার কার্যকারিতা সম্পাদন করে প্রোটিন সংশ্লেষণের (protein synthesis) মাধ্যমে। বাকি ৯০% ডিএনএ-র কোনো কাজ নেই এবং কোনো বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করে না বলে মনে করা হয়। এ ধরনের ননকোডিং (noncoding) ডিএনএ সাধারণত দুটি জিনের মাঝে অবস্থান করে।

○ প্রশ্ন-৪৫. ডিএনএ প্রোফাইলিং-এর প্রযুক্তিগত দিক উল্লেখ করুন।

উত্তর : ডিএনএ প্রোফাইলিং সুসম্পন্ন করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন যে কোনো জৈবিক নমুনা (biological sample) যা ডিএনএ-র উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন ধরনের নমুনা যেমন- রক্ত, লালা, সীমেন, হাড়, দাঁত, চুল, পেশি কলা ইত্যাদি হতে পারে ডিএনএ-র গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কি ধরনের নমুনা ডিএনএ প্রোফাইলিং-এর জন্য ব্যবহার করতে হবে তা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে নমুনার প্রাপ্যতার (availability) ওপর। অপরাধ তদন্তে সাধারণত অপরাধস্থল (crime scene) অথবা অপরাধের শিকার কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত কোনো জৈবিক নমুনার ডিএনএ প্রোফাইলকে তুলনা করা হয় সন্দেহভাজনের কাছ থেকে নেওয়া রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ প্রোফাইলের সঙ্গে।

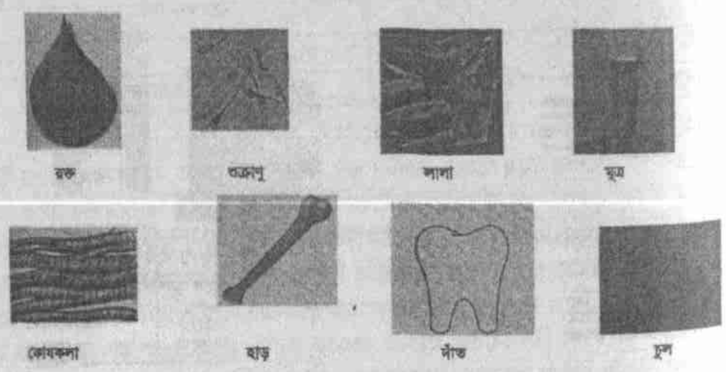

চিত্র : ফরেনসিক ডিএনএ-র বিভিন্ন উৎস

এ কাজে মোট দুই ধরনের পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। যথা—

ক. ছেদক উৎসেচকের দৈর্ঘ্যের বহুরূপতা (Restriction Fragment Length Polymorphism-RFLP)

খ. পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন অথবা পিসিআর (Polymerase Chain Reaction-PCR)।

○ প্রশ্ন-৪৬. RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) পদ্ধতি কি? এর সীমাবদ্ধতা লিখুন।

উত্তর : RFLP : আর.এফ.এল.পি. বিশ্বের সর্বপ্রথম পদ্ধতি যা ডিএনএ-প্রোফাইলিং-এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। এ পদ্ধতিতে প্রথমে যে কোনো জৈবিক নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ পৃথক করা হয়। তারপর এ ডিএনএ অণুকে ছেদক উৎসেচক দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করে এক্সরে ফিল্মের উপর স্থাপন করলে ডিএনএ টুকরাগুলোর সাথে যুক্ত ডিএনএ টোপগুলো দৃশ্যমান হবে কালো ব্যান্ডের সারির আকারে।

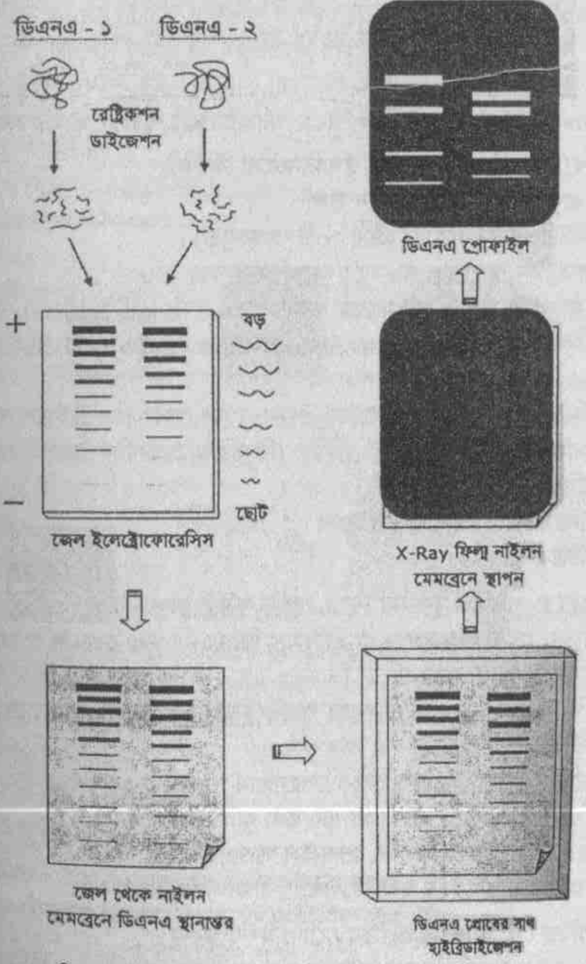

চিত্র : আরএফএলপি পদ্ধতিতে ডিএনএ প্রোফাইল তৈরির ধাপসমূহ

আর.এফ.এর. পি পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা :

i. অনেক বেশি ডিএনএ (কমপক্ষে এক মাইক্রোগ্রাম) দরকার হয় যা ক্রাইম সিন থেকে সচরাচর পাওয়া যায় না।
ii. রেডিওঅ্যাকটিভ আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়, যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।
iii. ডিএনএ পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ (১-২ সপ্তাহ সময় লাগে)।

○ প্রশ্ন-৪৭. PCR প্রযুক্তি কি?

উত্তর : বায়োটেকনোলজিতে PCR একটি কার্যকরী পদ্ধতি। যে পদ্ধতির সাহায্যে কোনো কাঙ্ক্ষিত DNA অণু থেকে সংগৃহীত কাঙ্ক্ষিত জিন বা ছোটো DNA খণ্ডকে স্বল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়, ঐ পদ্ধতিকে PCR প্রযুক্তি (Polymerase Chain Reaction Technology) বলা হয়। Kary Mullis ১৯৮৪ সালে PCR কৌশল আবিষ্কার করেন। DNA সমলিপনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মতো PCR কাজ করে থাকে। তাপ নিয়ন্ত্রণক্ষম যন্ত্র থার্মাল সাইক্লার (Thermal Cycler)-এর সাহায্যে PCR পরিচালনা করে জিন বা DNA -এর সংখ্যা বৃদ্ধি বা অ্যামপ্লিফাই (Amplification) করা হয় বলে এটিকে DNA অ্যামপ্লিফায়ার বা জিন অ্যামপ্লিফায়ারও বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৪৮. PCR প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : PCR প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত উপাদান হলো–

i. দুটি নিউক্লিওটাইড প্রাইমার (প্রায় ২০টি ক্ষারকযুক্ত)।
ii. কাঙ্ক্ষিত জিন বা DNA খণ্ড যাকে অ্যামপ্লিফাই করা হয়।
iii. তাপ সহ্যকারী DNA পলিমারেজ, যেমন– Taq (*Themus apuaticsu* ব্যাকটেরিয়া থেকে পৃথকীকৃত)' Pfu (*Pyrococcus furiosus* থেকে আহরিত) এবং Vent (*Themococcus litoralis* থেকে সংগৃহীত)।
iv. ৪টি নিউক্লিওসাইড ট্রাইফসফাটেজ, যেমন–TTP (থাইমিডিন ট্রাইফসফেট) dCTP (ডি-অক্সিসাইটিডিন ট্রাইফসপেট), dATP (ডিঅক্সিঅ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট) এবং dGTP (ডিঅক্সিগুয়ানিসিন ট্রাইফসফেট)।
v. তাপ নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্র থার্মাল সাইক্লাব।
vi. টেস্ট টিউব/কাচপাত্র।

○ প্রশ্ন-৪৯. RFLP পদ্ধতির তুলনায় PCR প্রযুক্তি সুবিধা কেন?

উত্তর : পলিমারেজ চেইন রিঅ্যাকশন বা পিসিআর ভিত্তিক ডিএনএ প্রোফাইলিং এখন পৃথিবীর প্রায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরির অনুসৃত পদ্ধতি। আর.এফ.এল.পি. পদ্ধতির তুলনায় পিসিআর পদ্ধতি নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে থাকে, ফলে এই পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে।

i. খুব সামান্য পরিমাণ ডিএনএ থেকে (ন্যানোগ্রাম পর্যায়ে) ডিএনএ প্রোফাইল পাওয়া সম্ভব।
ii. ফ্লুরেসেন্ট ডাই ব্যবহৃত হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয়।
iii. ডিএনএ ভেঙে গেলেও ডিএনএ প্রোফাইল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
iv. স্বল্প সময়ের মধ্যেই (২৪ ঘণ্টা) ডিএনএ পরীক্ষা সুসম্পন্ন করা সম্ভব।

○ প্রশ্ন-৫০. বিভিন্ন ক্ষেত্রে PCR প্রযুক্তির প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

উত্তর : PCR-এর ব্যাপক ব্যবহার ঘটানো হয় আণবিক জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা ক্ষেত্রে এবং বায়োটেকনোলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এ PCR প্রযুক্তির প্রয়োগসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো–

i. DNA ও RNA-এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা (Amplification)।
ii. বিভিন্ন প্রকার রোগ এবং রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু নির্ণয় করা। যেমন– এইডস (AIDS), ক্ল্যামাইডিয়া (Chlamydia), টিউবারকোলসিস (tuberculosis), হেপাটাইটিস (Hepatitis), হিউমেন প্যাপিলোমা ভাইরাস (Human Papilloma virus) এবং অন্যান্য সংক্রামক জীবাণু ও রোগ PCR-এর মাধ্যমে নির্ণয় করা হয় এবং বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এ সকল পরীক্ষা খুব দ্রুত, সংবেদনশীল, নির্দিষ্ট ও কার্যকরী।
iii. বিভিন্ন ধরনের জেনেটিক রোগ যেমন– Sickle cell anaemia, Phenylketonynria, Muscular dystrophy ইত্যাদি সনাক্তকরণে PCR ব্যবহৃত হচ্ছে।
iv. বর্তমানে অপরাধ বিজ্ঞানে (Forensic Science) DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং (DNA Fingerprinting) প্রযুক্তির মাধ্যমে অপরাধী শনাক্তকরণে PCR ব্যবহৃত হচ্ছে। এক্ষেত্রে খুবই সামান্য পরিমাণ জৈব নমুনা (Samples of biological materials) প্রয়োজন।
v. প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও পরীক্ষায় PCR প্রযুক্তি-এর প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ।
vi. DNA অনুক্রমীকরণ।
vii. ক্রোমোজোমে জিনের অবস্থান নির্ণয়।
viii. বিলুপ্ত প্রজাতির টিস্যুর বিশ্লেষণ।
ix. শ্রেণিবিন্যাসতত্ত্বে ব্যবহার।
x. ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ।

○ প্রশ্ন-৫১. জৈবপ্রযুক্তি (Biotechnology) কাকে বলে?

উত্তর : মানবকল্যাণে জীবের প্রযুক্তিগত ব্যবহারের কলাকৌশলকে জৈবপ্রযুক্তি বা বায়োটেকনোলজি বলে। আমেরিকার National Science Foundation প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী-কল্যাণের উদ্দেশ্যে জীবজ প্রতিনিধিদের, যেমন– অণুজীব বা কোষীয় উপাদানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহারকে জৈবপ্রযুক্তি বলা হয়। ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে হাঙ্গেরীয় প্রকৌশলী কার্ল এরেকি (Karl Ereky) সর্বপ্রথম Biotechnology শব্দটি প্রবর্তন করেন।

○ প্রশ্ন-৫২. রিকম্বিনেন্ট DNA কি?

উত্তর : একটি DNA অণুর কাঙ্ক্ষিত দুজায়গা কেটে খণ্ডটিকে আলাদা করে অন্য এক DNA অণুর নির্দিষ্ট জায়গায় আটকে দেওয়ার ফলে যে নতুন ধরনের DNA অণু পাওয়া যায়, তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA বলে। রিকম্বিনেন্ট তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকম্বিনেন্ট প্রযুক্তি বলা হয়। সাধারণত সম্পর্কহীন জীবের (যেমন– কোনো উদ্ভিদ ও ব্যাকটেরিয়ামের জীন) DNA -র মধ্যে এ ভাঙাগড়ার কাজ চালানো হয়। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Paul Berg ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম রিকম্বিনেন্ট DNA অণু তৈরি করেন। এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ১৯৭৩ সালে Herbert Boyer এবং Stanely cohen সর্বপ্রথম রিকম্বিনেন্ট DNA জীব সৃষ্টিতে সফল হন।

○ প্রশ্ন-৫৩. রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি পদ্ধতিটি বর্ণনা করুন।

উত্তর : নিম্নে বর্ণিত ৫টি ধাপে রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

প্রথম ধাপ : এ ধাপে গবেষককে দুধরনের জিন পৃথক করতে হয়। একটি হচ্ছে ব্যাকটেরীয় প্লাজমিড যা ভেক্টর হিসেবে কাজ করবে এবং দ্বিতীয়টি প্রাণিকোষের কাঙ্ক্ষিত DNA যা বহুগুণিত করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত *E. coli* ব্যাকটেরিয়াম থেকে প্লাজমিড সংগৃহীত হয়।

দ্বিতীয় ধাপ : এ ধাপে প্লাজমিড ও প্রাণিকোষের DNA-কে একই রেস্ট্রিকশন এনজাইম দিয়ে কাটা হয়। এনজাইমটি প্লাজমিড DNA-র নির্দিষ্ট স্থান কেটে দেয়। একই এনজাইম প্রাণিকোষের DNA-কে কেটে অসংখ্য খণ্ডাংশ তৈরি করে। এসব খণ্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে। এভাবে কাটার ফলে দ্বি-সূত্রক DNA অণুর দুপ্রান্তে ক্ষুদ্রাকায় একসূত্র বিশিষ্ট যে বর্ধিত অংশের সৃষ্টি হয় তাকে গাঁথন প্রান্ত (sticky ends) বলে।

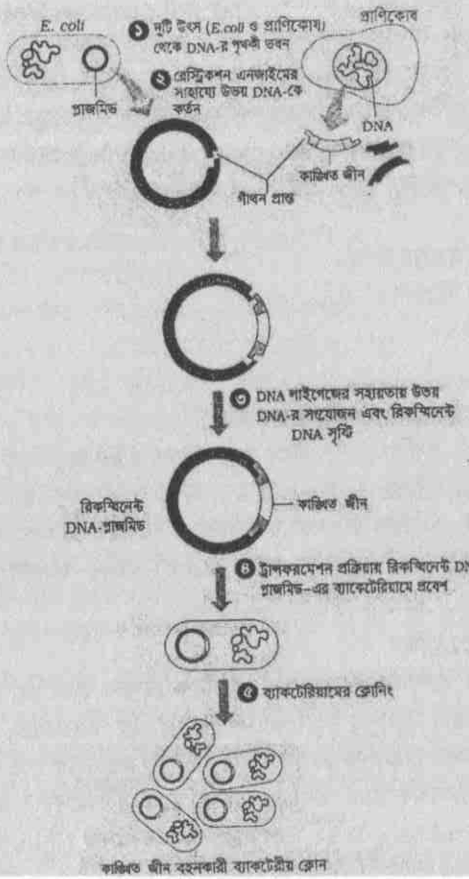

চিত্র : *রিকম্বিনেন্ট DNA প্রযুক্তি (ক্লোনিং)*

তৃতীয় ধাপ : এ ধাপে নির্দিষ্ট প্রাণী–DNA প্লাজমিডের কর্তিত প্রান্তে স্থাপন করা হয়। গাঁথন প্রান্ত প্রাণী DNA-র পরিপূরক একসূত্রক বর্ধিতাংশের সাথে হাইড্রোজেনের বন্ধনীযুক্ত বেস-জোড় (base pairs) সৃষ্টি করে যুক্ত হয়।

চতুর্থ ধাপ : এ ধাপে DNA লাইগেজ এনজাইম দিয়ে উভয় DNA অণুকে কোভ্যালেন্ট বন্ধনী (covalent bond)-র মাধ্যমে জোড়া লাগানো হয়। ফলে নির্দিষ্ট প্রাণী জিনসহ রিকম্বিনেন্ট DNA প্লাজমিডের সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম ধাপ : এটি হচ্ছে জিন ক্লোনিং-এর আসল ধাপ যার ফলে জিনের বহু কপি তৈরি হয়। এ ধাপে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে তা রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডসহ বংশবৃদ্ধি করতে দেওয়া হয়। এভাবে ব্যাকটেরিয়াদের বংশবৃদ্ধির ফলে রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডের সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। এভাবে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য বা গুণ বহনকারী জিনের বহুগুণন ঘটানো হয়।

◐ প্রশ্ন-৫৪. জেনেটিক রোগ কি?

উত্তর : জেনেটিক রোগ বলতে সাধারণত ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা, জিন মিউটেশন, ডিএনএ সিকুয়েন্সের বিভিন্ন অস্বাভাবিকতাকেই বোঝায়। আধুনিক বিশ্বে রোগকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। একটি জেনেটিক বা বংশগত অন্যটি এনভায়রনমেন্টাল বা পরিবেশগত। জেনেটিক রোগ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনেটিক রোগ জন্মের আগে নির্ণয় করা সম্ভব। এর ফলে মা গর্ভধারণ করার পর বাচ্চা প্রসব করবেন কি না তা নির্ধারণ করতে পারেন। অন্যদিকে জেনেটিক রোগের কারণে বাচ্চার যে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা হতে পারে এ ব্যাপারে বাবা-মা আগে থেকেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অনেক ধরনের জেনেটিক রোগ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– ডাউন্স সিনড্রোম, ক্লিনফিল্টার সিনড্রোম, মোজাইসিজম, ঠোঁট বা তালু কাটা, কিডনিতে সিস্ট হওয়া, হিমোফিলিয়া এ এবং বি, আলফা এবং বিটা থ্যালাসেমিয়া, হাইপোথায়রডিজম ইত্যাদি।

◐ প্রশ্ন-৫৫. নিম্নলিখিত বংশগত বা জেনেটিক রোগ সম্পর্কে লিখুন।

i. লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা
ii. বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক নারীর মধ্যে বিয়ে
iii. হিমোফিলিয়া
iv. মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি
v. থ্যালাসেমিয়া

উত্তর :

i. **লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা :** মানুষের চোখের রেটিনায় বর্ণসংবেদী কোণ কোষ উৎপাদনের জন্য একটি প্রকট X-লিংকড জিন প্রয়োজন। কোণ-কোষ তিন ধরনের। প্রত্যেকটি ধরন একেক বিশেষ রঙের প্রতি সংবেদনশীল। যেমন– লাল, সবুজ ও বেগুনী। এ জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল (অর্থাৎ বর্ণান্ধতার জন্য দায়ী X-লিংকড অ্যালিলের উপস্থিতি) বর্ণসংবেদী কোণ-কোষ উৎপাদনে অক্ষম। হোমোজাইগাস নারী (cc) ও পুরুষ (cY) লাল ও সবুজ বর্ণের সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না। অর্থাৎ নারীর ক্ষেত্রে এ জিনটি হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন না হলে বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায় না। কিন্তু পুরুষে একটি প্রচ্ছন্ন জিনই সে বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সক্ষম।

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮% পুরুষ এবং ০.৭% নারী বর্ণান্ধ। বাংলাদেশে কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও বর্ণান্ধ মানুষ দুর্লভ নয়।

ii. **বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক নারীর মধ্যে বিয়ে :** বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন নারীর মধ্যে বিয়ে হলে F_1 জনুর পুত্র বা কন্যা সবাই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কন্যাদের সবাই হবে বর্ণান্ধ জিনের বাহক এবং পরবর্তী বংশের অর্ধেকে এ জিন সঞ্চারিত হবে।

F_1 জনুর স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন (কিন্তু বাহক) মহিলার সাথে কোনো স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের বিয়ে হলে ঐ মহিলার চার সন্তানের মধ্যে দুজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্ম লাভ করবে।

সুতরাং বিয়ের আগে এ বিষয়গুলো ভেবে দেখা দরকার। কারণ রাস্তায় যান চলাচলে লাল ও সবুজ আলো গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক-সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পছন্দের ফুল উপহার দিতে কিংবা বাজার থেকে কাঁচা-পাকা ফল বা জামা-কাপড় কিনতেও বর্ণান্ধদের বেশ বিব্রত হতে হয়।

iii. **হিমোফিলিয়া :** হিমোফিলিয়া হলো বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একপ্রকার রক্ত তঞ্চন ঘটিত ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা। আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত তঞ্চিত হয় না এবং রক্ত ক্ষরণজনিত কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। বর্ণান্ধতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনহানির সম্ভাবনা থাকে না কিন্তু হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি মারাও যেতে পারে। X-ক্রোমোজোমের একটি প্রচ্ছন্ন মিউট্যান্ট জিনের কারণে হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে। হিমোফিলিয়া দুই প্রকারের হয়ে থাকে। যথা– ১. ক্লাসিক হিমোফিলিয়া বা হিমোফিলিয়া A এবং ২. খ্রিষ্টমাস ডিজিজ বা হিমোফিলিয়া B।

iv. **মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি :** মানুষের অনেক ধরনের বংশগত রোগ দেখা যায়। এসব রোগ জেনেটিক বা জিনঘটিত রোগ-ব্যাধি নামে পরিচিত। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিও একটি জিনঘটিত রোগ। প্রধানত কঙ্কালিক ও হৃৎপেশি এবং কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে এ রোগ দেখা যায়। একটি সেক্স-লিংকড জিনের বিশৃঙ্খলার কারণে প্রধানত শিশুদেহে প্রকাশিত হাত, পা, দেহকাণ্ড, হৃৎপিণ্ড ও আন্ত্রিক পেশির সঞ্চালন ও স্বাভাবিক কাজকর্মের সক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে যে দুর্বিসহ জীবনের সূত্রপাত ঘটায়, সেটি হচ্ছে মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি নামে এ বংশগত রোগ। অসুখটি ছেলে শিশুদের বেশি হয়।
তিরিশের বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি দেখা যায়। এর মধ্যে ৯টি হচ্ছে প্রধান অন্যগুলো দুর্লভ। দেহের আক্রান্ত ও আশ-পাশের অংশ, পেশি দুর্বলতার ধরন, কোন বয়সে দেখা দেয় এবং রোগের গতিধারা একেক রকম। রোগের সাধারণ শারীরিক লক্ষণগুলো হচ্ছে– পেশির দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাব; স্থূলতা দেখা দেয়া; দ্রুত পেশিক্ষয়, দুর্বলতা ও পেশি অকার্যকর হওয়া; অস্থিসন্ধির কুঞ্চন; কপালের উপরে টাক হওয়া (frontal broldness); চোখে ছানি পড়া; চোখের পাতা ঝুঁকে পড়া; মানসিক অস্বাভাবিকতা; জননাঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতা প্রভৃতি।

v. **থ্যালাসেমিয়া :** এটি একটি জেনেটিক বা বংশগত রোগ। পিতামাতার জিনের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে হয়ে থাকে। এটি লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিন অণুর একটি ব্যাধি। থ্যালাসেমিয়া দুই ধরনের। যথা– α (আলফা) এবং β (বিটা)।

○ প্রশ্ন-৫৬. জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering) কি?

উত্তর : এক কোষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট জিন নিয়ে অন্য কোষে স্থাপন ও কর্মক্ষম করার ক্ষমতাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, নতুন বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের DNA-তে পরিবর্তন ঘটানোকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা জিন প্রকৌশল বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৫৭. প্লাজমিড (Plassmid) কি?

উত্তর : প্লাজমিড হচ্ছে প্রজননক্ষম ও বহিঃক্রোমোজোমীয় বৃত্তাকার (দৈবাৎ রৈখিক) দ্বৈত DNA অণু। এদের সংখ্যা ব্যাকটেরীয় কোষ, ঈস্ট কোষ বা ইউক্যারিওটিক কোষের অঙ্গাণুর ভেতরে নির্দিষ্ট থাকে। সংখ্যা কোষপ্রতি ১–১০০০। এদের যথাক্রমে একক-কপি ও বহু-কপি প্লাজমিড বলে। বহু-কপি প্লাজমিডকে ক্লোনিং বাহক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

চিত্র : *Agrobacterium time faciens-এর প্লাজমিড DNA*

জৈবপ্রযুক্তিতে প্লাজমিডের ভূমিকা অপরিসীম। রিকম্বিনেন্ট DNA কে পোষক দেহে (ব্যাকটেরিয়ায়) প্রেরণ ও বহুগুণনের সাহায্যে ভ্যাকসিন উৎপাদন, হরমোন উৎপাদন ইত্যাদিসহ নানা রকম জৈবনিক কাজকর্ম করানো হয়। তাই প্লাজমিডকে জৈবপ্রযুক্তির অন্যতম মৌলিক হাতিয়ার বলে।

○ প্রশ্ন-৫৮. জিন ব্যাংক বা জিন লাইব্রেরি কি?

উত্তর : জীবের সম্পূর্ণ দেহে বিদ্যমান মোট জিন-এর সেটকে জিনোম (genome) বলে। একটি নির্দিষ্ট জীবের সকল জিনের ক্লোন (Clone)-এর সমষ্টিকেই Genomic library বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি জীবের পুরো জিনোম অনেক সময় কোনো প্রকার শনাক্তকরণ ছাড়াই Randomly clone করে সেটি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।
এক্ষেত্রে জিনোমিক DNA, রেস্ট্রিকশন এনজাইম দ্বারা কেটে খণ্ড খণ্ড অংশে পরিণত করে ক্লোনিং ভেক্টর (Cloning vector) এ প্রবেশ করানো হয় এবং কাইমেরিক ভেক্টর মলিকুল (Chimeric vector molecule) এর একটি পপুলেশন উৎপন্ন করা হয়। কোনো জিনোম-এর DNA খণ্ড বা জিন-এর ক্লোন এর পুরো সেটকে Genomic library/Gene library/Gene bank বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৫৯. মানবকল্যাণে জিন প্রকৌশলের অবদান উল্লেখ করুন।

উত্তর : কৃষি ও চিকিৎসাক্ষেত্রে তথা মানবকল্যাণে জিন প্রকৌশলের অবদান উল্লেখ করা হলো–
কৃষিক্ষেত্রে : পৃথিবীতে জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত খাদ্য উৎপাদনে তথা কৃষিক্ষেত্রে জিন প্রকৌশলের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো–

ক. রোগ প্রতিরোধক জাত সৃষ্টি।
খ. N_2 সংবন্ধনকারী ফসল উদ্ভাবন।
গ. শৈত্য সহনশীল ফসলের জাত উৎপাদন।
ঘ. পচনরোধী ফসলের জাত উৎপাদন।
ঙ. কীট-পতঙ্গ প্রতিরোধক জাত সৃষ্টি।
চ. অতি লবণাক্ত সহনশীল উদ্ভিদ সৃষ্টি।
ছ. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ সৃষ্টি।
জ. রোগ প্রতিরোধক্ষম ট্রান্সজেনিক শাক-সবজি উদ্ভাবন।

চিকিৎসাক্ষেত্রে :

ক. ইনসুলিন উৎপাদনে।
খ. মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন।
গ. ইন্টারফেরন উৎপাদন।
ঘ. Vaccine উৎপাদন।

তাছাড়াও শিল্পক্ষেত্রে এবং পরিবেশ রক্ষায় জিন প্রকৌশল ব্যবহার করা হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৬০. ক্লোনিং (Cloning) কি?

উত্তর : পরিণত প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে হুবহু একই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত প্রাণী জন্মদান প্রক্রিয়াকে ক্লোনিং বলে। স্কটল্যান্ডের এডিনবরার রোজলিন ইনস্টিটিউট-এর ভ্রূণতত্ত্ববিদ আয়ান উইলমুট (Ian Uilmut) ১৯৯৭ সালে ফিন ডারসেট ভেড়ির ওলান থেকে সংগৃহীত কোষের নিউক্লিয়াস একটি অন্য জাতের ভেড়ির ডিম্বকোষে প্রতিস্থাপিত করে হুবহু একই রকম একটি ফিন ডারসেট ভেড়ির বাচ্চা জন্মাতে সক্ষম হন। এর নাম রাখা হয় ডলি। এর আগে ভ্রূণকোষ থেকে প্রাণী জন্ম দেয়া হলেও এই প্রথম একটি পরিণত দেহকোষ থেকে নকল প্রাণী জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছে।

○ প্রশ্ন-৬১. জিন ক্লোনিং (Gene cloning) কি?

উত্তর : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে রিকম্বিনেন্ট DNA তৈরি করে কোনো বাহকের (যেমন– প্লাজমিড, ব্যাকটেরিয়া, বা ভাইরাস) DNA-র সহযোগিতায় কাঙ্ক্ষিত DNA-র অবিকল কপি সৃষ্টি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জৈব প্রযুক্তির যাবতীয় সাফল্য নির্ভর করে জিন ক্লোনিং-এর উপর। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে কোনো জীবের কাঙ্ক্ষিত জিন রেস্ট্রিকশন এনজাইমের সাহায্যে কেটে নেয়া হয়।

○ প্রশ্ন-৬২. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ কি? এ সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

উত্তর : জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যে সব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। এ প্রক্রিয়ায় রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে উৎপন্ন জীবকে হয় কোনো বাহকের মাধ্যমে নয়তো মাইক্রোইঞ্জেকশনের মাধ্যমে উদ্ভিদের প্রোটোপ্লাস্টে প্রবেশ করানো হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উচ্চতর উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাজর, মূলা, পেঁপে, আঙ্গুর কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, আপেল, নাশপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা প্রভৃতি।

ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে আগাছানাশক, পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। অনেক উদ্ভিদকে উষ্ণতা, শৈত্য, লবণাক্ততা, ভারী ধাতু, ফাইটোহরমোন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি মোকাবিলায় সক্ষম করে তোলা হয়েছে। পাকা টমেটোর ত্বক নরম হয়ে যাওয়া প্রতিরোধে কিংবা দেরিতে পাকানো অথবা সুক্রোজের পরিমাণ বাড়িয়ে স্টার্চের পরিমাণ কমিয়ে টমেটো উৎপাদন ট্রান্সজেনিক প্রক্রিয়ারই সুফল। আলুতে ২০-৪০% স্টার্চ বাড়ানোও সম্ভব হয়েছে এ প্রক্রিয়ায়।

○ প্রশ্ন-৬৩. ট্রান্সজেনিক প্রাণী কি?

উত্তর : রিকম্বিনেন্ট DNA কৌশল প্রয়োগ করে উৎপন্ন জিনকে মাইক্রোইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রাণীর ডিম্বাণুর প্রোনিউক্লিয়াইয়ে প্রবেশ করানো হয়। পরে সে ডিম্বাণু কোনো স্ত্রী প্রাণীর দেহে স্থাপন করা হয়। ভ্রূণের সমগ্র পরিস্ফুটন কালে সে জিনকে আবার নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এভাবে উদ্ভাবিত প্রাণীকে ট্রান্সজেনিক প্রাণী বলে।

○ প্রশ্ন-৬৪. ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের কৌশল ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : ট্রান্সজেনিক প্রাণী সৃষ্টির জন্য জিন স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে একমাত্র মাইক্রোইঞ্জেকশন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এ পদ্ধতির ধাপগুলো হচ্ছে :

i. রিকম্বিনেন্ট DNA উৎপাদন।
ii. রিকম্বিনেন্ট DNA-কে এককোষী ডিম্বাণুর প্রোনিউক্লিয়াসের ভেতরে মাইক্রোইঞ্জেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করানো।

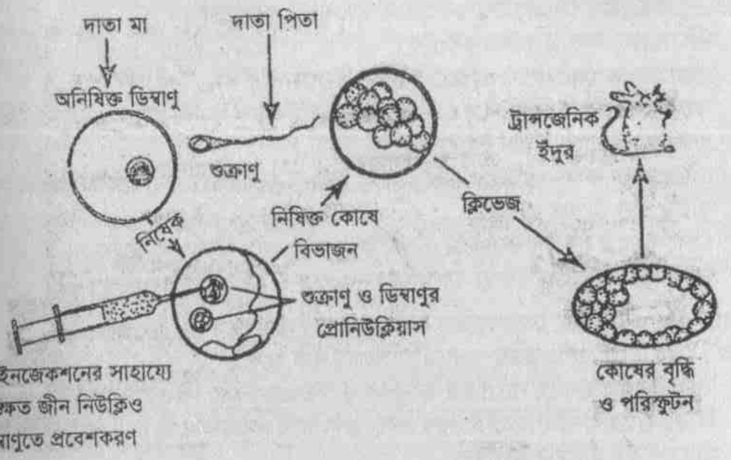

চিত্র : *মাইক্রোইনজেকশন পদ্ধতি*

iii. রূপান্তরিত ডিম্বাণুকে স্ত্রী প্রাণীতে স্থানান্তর।
iv. ভ্রূণের পরিস্ফুটন।
v. অন্তত কয়েকটি নবজাত প্রাণীর DNA-র মধ্যে প্রবেশিত জিন সম্পৃক্ত হয়েছে তা অনুধাবন করা।
vi. প্রবেশিত জিনের গুণ প্রকাশিত হয়েছে তা প্রমাণ করা।

১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এর পর থেকে ট্রান্সজেনিক গরু, ভেড়া, শূকর, খরগোস, মুরগি, মাছ উৎপাদন শুরু হয়েছে।

প্রাণী উদ্ভাবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে : ১. চর্বিযুক্ত মাংস উৎপাদন; ২. দ্রুত বিক্রিযোগ্য করা; ৩. রোগ প্রতিরোধী করে তোলা; ৪. বায়োরিএক্টর হিসেবে ব্যবহার করা।

○ প্রশ্ন-৬৫. ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : ট্রান্সজেনিক প্রাণী ও ক্লোন প্রাণীর মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

ট্রান্সজেনিক প্রাণী	ক্লোন প্রাণী
১. ট্রান্সজেনিক প্রাণীর ক্ষেত্রে শুক্রাণু বা ডিম্বাণু জাইগোটে বাহির থেকে DNA খণ্ড প্রবেশ করাতে হয়।	১. ক্লোন প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি অনিষিক্ত ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস অপসারণ করে উক্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর ভেতর (যে প্রাণীকে ক্লোন করা হবে তার) অন্য প্রাণীর দেহকোষের নিউক্লিয়াস প্রবেশ করাতে হয়।
২. বাহির থেকে জিন বা DNA প্রবেশ করানোতে জিনগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়।	২. দুটি প্রাণীর নিউক্লিয়ার জিন একত্রিত হয় না বিধায় জিনগত পার্থক্য উৎপন্ন হয় না।
৩. বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।	৩. কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পায় না।
৪. জিনোমগত পার্থক্য উৎপন্ন হয়।	৪. জিনোমগত বৈশিষ্ট্য হুবহু এক।
৫. মিউটেশন বা প্রকরণ সংঘটিত হয়।	৫. মিউটেশন বা প্রকরণ সংঘটিত হয় না।
৬. বাহ্যিক প্রকাশে ভিন্নতা প্রকাশ পায়।	৬. বাহ্যিক প্রকাশ হুবহু অনুরূপ।
৭. শুক্রাণু, ডিম্বাণু বা এককোষী জাইগোট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।	৭. কেবল ডিম্বাণুর খোলস ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৬৬. কৃষি উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

উত্তর : কৃষি উন্নয়নে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্বগুলো আলোচনা করা হলো :

১. উদ্ভিদকোষ, কলা ও অঙ্গের কালচার।
২. রোগ-পতঙ্গ-বালাইনাশক প্রতিরোধী উদ্ভিদ উৎপাদন।
৩. সালোকসংশ্লেষণে বেশি সক্ষম, নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও উন্নত সঞ্চয়ী প্রোটিন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন উদ্ভিদ উৎপাদন।
৪. যৌন জননে অক্ষম উদ্ভিদ-প্রজাতির মধ্যে দৈহিক সংকরায়ণের মাধ্যমে প্রত্যাশিত বুনো গুণকে কৃষিজ শস্য উদ্ভিদে স্থানান্তর।
৫. বেশি মাংস ও দুধ উৎপাদনকারী, দীর্ঘজীবী, সবল ও সুস্থ গবাদিপশু উদ্ভাবন।
৬. জৈবপ্রযুক্তির সাহায্যে উৎপন্ন গবাদিপশুর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে ওষুধ উৎপাদন।

○ প্রশ্ন-৬৭. ওষুধ শিল্পে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : ওষুধ শিল্পে জৈবপ্রযুক্তির ব্যবহার আলোচনা করা হলো :

১. ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষিত ইনসুলিন ও ইন্টারফেরনসহ বিভিন্ন হরমোন উৎপাদন।
২. বিভিন্ন মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক এবং রোগ-ব্যাধি সনাক্তকরণের জন্য অ্যান্টিবডি উৎপাদন।
৩. মানুষের বৃদ্ধি হরমোন উৎপাদন।
৪. রক্ত, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির DNA বা অ্যান্টিবডি থেকে খুনি সনাক্তকরণ।
৫. হৃদপিণ্ডে, মস্তিষ্কে ও ফুসফুসে রক্ত জমাট প্রতিরোধক উপাদান উৎপাদন।

○ প্রশ্ন-৬৮. দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরিতে জৈবপ্রযুক্তির গুরুত্ব উল্লেখ করুন।

উত্তর : দুধ থেকে দই, ছানা, পনির ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে বহু বছর আগে থেকেই। আইসক্রীম, ঘি, দুগ্ধশর্করা, চকলেট ইত্যাদি তৈরিতেও দুধ ব্যবহৃত হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন গ্রামীণ পদ্ধতি চালু থাকলেও প্রকৃত কারণটি জানা ছিল না। পরবর্তীতে গবেষণায় জানা যায় যে, বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এ জন্য দায়ী। ইতোমধ্যেই দুগ্ধজাত দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ ব্যাকটেরিয়ার কিছু নিজস্ব স্ট্রেন পৃথক করে নিয়েছেন, যার ফলে বিভিন্ন দোকানের দই, পনির ইত্যাদির স্বাদ ও গন্ধ ভিন্নতর। এ কারণেই ক্রেতা সাধারণ বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন দোকানের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। সঠিক জৈবপ্রযুক্তি প্রয়োগ এনে দিচ্ছে ব্যবসায়িক সাফল্য, তৈরি হচ্ছে উত্তম পণ্য। বর্তমানে দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবসা থেকে একদিকে সরকার পাচ্ছে লাখ লাখ টাকার ভ্যাট, অপর দিকে হাজার হাজার লোক এ শিল্পে কর্মরত আছেন। দই, মিষ্টি, পনির এগুলো বিদেশেও রপ্তানি হচ্ছে।

দুধে বিভিন্ন প্রকার এনজাইম আছে। দুধ থেকে এসব এনজাইম আহরণ করে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো লাইপেজ, প্রোটিয়েজ, ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ, অ্যাসিড ফসফ্যাটেজ, লাইসোজাইম ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৬৯. জিন থেরাপি কি?

উত্তর : জীবের ক্ষতিকারক জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপনকে জিন থেরাপি বলে। জিন থেরাপি প্রোটিন অথবা এমনকি সঠিক জেনেটিক পরিব্যক্তির অভিব্যক্তির হস্তক্ষেপ।

○ প্রশ্ন-৭০. জিন থেরাপিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

উত্তর : জিন থেরাপিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. সোমাটিক জিন থেরাপি; খ. জার্মিনাল জিন থেরাপি।

ক. **সোমাটিক জিন থেরাপি :** দেহগত জিন থেরাপি, থেরাপিউটিক জিন রোগীর দেহগত কোষ বা শরীরের মধ্যে স্থানান্তর করা হয়। কোনো পরিবর্তন এবং প্রভাব শুধুমাত্র পৃথক রোগীর ক্ষেত্রে সীমিত করা হয়। রোগীর সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্মের দ্বারা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয় না।

খ. **জার্মিনাল জিন থেরাপি :** জীবাণু কোষ (শুক্রাণু) তাদের জিনোমের মধ্যে একত্রিত করা হয় এবং কার্মিক জিন প্রবর্তনের দ্বারা পরিবর্তিত হয়। জীবাণু কোষ একটি প্রাণীর মধ্যে সমস্ত অন্যান্য কোষ উৎপাদন বন্টন করা হয় এবং একটি জীবাণু সেল জেনেটিক্যালি মডিফাই করা হয়। যদিও সব জীব কোষে পরিবর্তিত জিন থাকতে হয়। যা একটি ভ্রূণ গঠন করে একত্রিত হয়। এ থেরাপি উত্তরাধিকার সূত্রে অনুমিত এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর যোগ্য।

○ প্রশ্ন-৭১. GMO (Genetically Modified Organism) কি?

উত্তর : একটি জীবের জিনোম সিকোয়েন্স-এর সাথে নন-রিলেটেড স্পেসিস-এর জিন বা জিন সমষ্টি প্রবেশকরণের মাধ্যমে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব উৎপন্ন করা হলে তাকে GMO বলে। আর GMO থেকে উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যকে 'জেনেটিক ফুড' বলা হয়। পরিবেশ বিপর্যয়, পতঙ্গ ও রোগাক্রমণ থেকে রক্ষা এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে GMO-এর উদ্ভব হয়েছে।

○ প্রশ্ন-৭২. জেনেটিক ফুডের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

উত্তর : GMO-এর সুবিধা : জেনেটিক ফুডের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে। যথা :

ক. রোগব্যাধি, কীটপতঙ্গ ও আগাছানাশক এর উপর এরা বেশিমাত্রায় প্রতিরোধী;
খ. নতুন নতুন শস্য উৎপন্ন হয়;
গ. GMO খাদ্যের স্বাদ ও গুণগত মান অধিক;
ঘ. স্বল্প সময়ে পরিণতি লাভ করে।
ঙ. এর পুষ্টিমান ও ফলন বেশি এবং এরা বিভিন্ন পরিবেশীয় পীড়নে টিকে থাকতে সক্ষম;
চ. GM crop এর পুষ্টিমান, গুণগতমানসহ বিভিন্ন উন্নত বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাণীর উৎপাদনশীলতা ও খাদ্যগ্রহণ মাত্রা বৃদ্ধি পায়;
ছ. উদ্ভিদ এর মধ্যে নানারকম অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাক্সিন, এর জিন প্রবেশ করিয়ে বাণিজ্যিকভাবে এগুলো উৎপাদন করা যায়। ফলে প্রাণীর রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ অধিকতর সহজ হয়।

GMO-এর অসুবিধা : নানাবিধ সুবিধার পাশাপাশি GMO'র মারাত্মক কিছু অসুবিধাও রয়েছে। যেমন–

ক. GMO-এর কারণে অনেক সময় এলার্জি হতে পারে;
খ. GMO-এর অপ্রত্যাশিত প্রোটিন অনেক সময় মানবদেহে প্রভূত ক্ষতি সাধন করতে পারে;
গ. এতে মার্কার জিন ব্যবহার করা হয়। এই মার্কার জিন হতে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিক মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর;
ঘ. এর কারণে পেস্টিসাইড প্রতিরোধী পতঙ্গ উৎপন্ন হতে পারে;
ঙ. ক্রস ব্রিডিং প্রভাবের কারণে সুপার আগাছা উৎপন্ন হতে পারে। যাকে হয়ত কোনো হার্বিসাইড দিয়ে দমন করা কঠিন হবে;
চ. দেশীয় জাতের বিভিন্ন শস্য হারিয়ে যেতে পারে;
ছ. উন্নয়নশীল দেশগুলো শিল্পোন্নত দেশের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

○ প্রশ্ন-৭৩. ন্যানোপ্রযুক্তি (Nanotechnology) কি? এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ন্যানো শব্দটি গ্রিক nanos শব্দ থেকে এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো dwarft কিন্তু এটি মাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আর এই ন্যানোমিটার স্কেলে যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো সম্পর্কিত সেগুলোকে বলে ন্যানোপ্রযুক্তি। ন্যানোপ্রযুক্তি পদার্থকে আণবিক পর্যায়ে পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করার বিদ্যা। রিচার্ড ফাইনম্যানকে ন্যানোপ্রযুক্তির জনক বলা হয়।

১৯৮০ সালে IBM এর গবেষকরা প্রথম আবিষ্কার করেন STM (Scanning Tunneling Microscope) এ যন্ত্রটি দিয়ে অণুর গঠন পর্যন্ত দেখা সম্ভব। এ যন্ত্রটির আবিষ্কারই ন্যানোপ্রযুক্তিকে

বাস্তবে রূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। ন্যানোটেকনোলজির ক্ষেত্রে দুটি প্রক্রিয়া আছে। একটি হলো উপর থেকে নিচে (Top to Bottom) ও অপরটি হলো নিচ থেকে উপর (Bottom to Top)। টপ টু বটম পদ্ধতিতে কোনো জিনিসকে কেটে ছোট করে তাকে নির্দিষ্ট আকার দেয়া হয়। আর বটম টু টপ হলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারের ছোট জিনিস দিয়ে বড় কোনো জিনিস তৈরি করা। আমাদের বর্তমান ইলেকট্রনিক্স হলো টপ টু বটম প্রযুক্তি। আর ন্যানোটেকনোলজি হলো বটম টু টপ প্রযুক্তি।

ন্যানোপ্রযুক্তির ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, ইলেকট্রনিক্স, শক্তি উৎপাদনসহ বহু ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। অপরদিকে পরিবেশের উপর এর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নিয়েও সংশয় রয়েছে।

○ প্রশ্ন-৭৪. ফার্মাকোলজি (Pharmacology) কি?

উত্তর : ফার্মাকোলজি শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'Pharmacon' থেকে। যার আভিধানিক অর্থ 'বিষ' এবং 'Logos' যার অর্থ 'বিজ্ঞান'। ফার্মাকোলজি ফার্মেসি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো দেহের উপর ওষুধের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। সুতরাং ফার্মাকোলজি হলো দেহে বাহ্যিকভাবে প্রবেশক্রিত রাসায়নিক পদার্থের সাথে দেহের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া যা স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক প্রাণরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

○ প্রশ্ন-৭৫. ফার্মাকোলজির প্রধান শাখা কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ফার্মাকোলজির প্রধান শাখা হলো ২টি। যথা : i. Pharmacokinetics; এবং ii. Pharmacodynamics.

○ প্রশ্ন-৭৬. Pharmacokinetics কি?

উত্তর : যখন ওষুধ আমাদের দেহে প্রবেশ করে তখন দেহ সরাসরি তার উপর কাজ করতে শুরু করে। ওষুধের শোষণ, বণ্টন, বিপাক এবং নিষ্কর্ষণ নিয়েই হলো Pharmacokinetics।

○ প্রশ্ন-৭৭. Pharmacodynamics কি?

উত্তর : ওষুধ শরীরের উপর ক্রিয়া করে, একটি প্রক্রিয়া যা কি না কোনো রিসেপ্টরের ভূমিকা ছাড়া অনেকাংশেই অচল, যেহেতু এ রিসেপ্টরই তার নির্বাচনশীলতার গুণে ওষুধকে দেহের উপর ক্রিয়া করতে সহায়তা করে। সুতরাং দেহের উপর ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়াই মূলত Pharmacodynamics।

○ প্রশ্ন-৭৮. ফার্মাকোলজি-র অন্যান্য শাখা প্রশাখাগুলো সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : ফার্মাকোলজি-র বিভিন্ন শাখা প্রশাখা রয়েছে। নিম্নে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

ক. **ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজি :** চিকিৎসাবিজ্ঞানের শাখা যা আলোচনা করে জীব ও মানবদেহের ওপর চিকিৎসার প্রভাব।

খ. **নিউরোফার্মাকোলজি :** স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতার ওপর ওষুধের প্রভাব সম্পর্কিত শাখা।

গ. **সাইকোফার্মাকোলজি :** মস্তিষ্কের ওপর ওষুধের ক্রিয়া ও এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ, আচরণগত পার্থক্য নির্ণয় ও শারীরতাত্ত্বিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি এ শাখার আলোচ্য বিষয়।

ঘ. **পোসোলজি :** কিভাবে ওষুধ এর ডোজ নির্ধারণ করা হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান। তা নির্ভর করে রোগীর বয়স, ভর, লিঙ্গ, আবহাওয়া ইত্যাদির ওপর।

ঙ. **ফার্মাকোজেনেটিক্স :** বিভিন্ন জাত, বিভাগ, বর্ণ তারতম্য ভেদে ওষুধের প্রভাবের পার্থক্য নিরূপণ করা এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে সঠিক পরিমাণের ও সর্বনিম্ন প্রতিক্রিয়াযুক্ত ওষুধ নির্বাচন করা এ শাখার প্রধান বিষয়।

চ. **ফার্মাকোজেনোমিক্স :** ওষুধ প্রযুক্তিতে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা। এ সম্পর্কিত বিদ্যমান ওষুধের উন্নয়ন এবং নতুন ওষুধ আবিষ্কারের নিমিত্তে গবেষণা।

অধ্যায় ১১

রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা
Disease and Healthcare

Syllabus— Disease and Helthcare : *Dificiency, Infection, Antiseptic, Antibiotics, Stroke, Heart Attack, Blood Pressure, Hypertension and Diabetes, Dengue; Diarrhoea; Drug addiction, Vaccination, Cataract, food poisoning, X-ray; Ultrasonography; CT Scan; MRI; ECG; Endoscopy; Radiotherapy; Chemotherapy; Angiography; uses, risk and side-effects of above techniques; Basic concept of Cancer, AIDS and Hepatitis.*

ক রোগ
Disease

অভাবজনিত রোগ
Deficiency

○ প্রশ্ন-১. রোগ কি? রোগ হওয়ার প্রধান কারণগুলো লিখুন।

উত্তর : রোগ : মানবদেহ বা দেহের কোনো অঙ্গের সাময়িক বা দীর্ঘস্থায়ী অকার্যক্ষম অবস্থাকেই রোগ বলা হয়।

রোগ হওয়ার প্রধান কারণ :

i. পুষ্টির অভাব : যেমন– ভিটামিন, খনিজ, লৌহ ইত্যাদি।

ii. জীবাণু দ্বারা : যেমন– ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি।

iii. রাসায়নিক উপাদান : যেমন– মাত্রাতিরিক্ত রক্তের বিলিরুবিন, ইউরিয়া ইত্যাদি।

iv. প্রয়োজনীয় বস্তুর আধিক্য বা ঘাটতি : যেমন– ফ্যাট, শর্করা ইত্যাদি।

v. বাহ্যিক শক্তি : যেমন– তাপ, শব্দ, চাপ, বিকিরণ ইত্যাদি।

vi. মাদকাসক্তি : যেমন– ধূমপান, মদ্যপান ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২. Deficiency কি?

উত্তর : Deficiency বলতে বোঝায় কোনো কিছুর অভাব। মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতিকেই Deficiency বলে। এ Deficiency-এর কারণে মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

● প্রশ্ন-৩. চিকিৎসাবিজ্ঞান কি?

উত্তর : পরিবেশ বিপর্যয়ের ফলে প্রতিনিয়ত আমরা আক্রান্ত হই নানা ধরনের রোগ ব্যাধিতে কিংবা অবাঞ্ছিত স্বাস্থ্য সমস্যায়। এসব রোগ-ব্যাধি বা স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে প্রয়োজন সঠিক স্বাস্থ্য নির্দেশনা। বিজ্ঞানের যে শাখায় রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞান বলে।

● প্রশ্ন-৪. ভাইরাস কি? ভাইরাসজনিত রোগগুলো কি কি?

উত্তর : ভাইরাস : 'ভাইরাস' নিউক্লিও-প্রোটিন দ্বারা গঠিত, অকোষীয়, রোগ সৃষ্টিকারী, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম (কেবল ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃশ্যমান) এক প্রকার জীবাণু, যা সুনির্দিষ্ট পোষক কোষে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে কেবল সেখানেই বংশ বৃদ্ধি করতে পারে।

ভাইরাসজনিত রোগ :

১. **মানুষের রোগ :** ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও, হার্পিস, হাম, বসন্ত, ভাইরাল হেপাটাইটিস, এইডস, ক্যান্সার প্রভৃতি।

২. **গৃহপালিত পশুর রোগ :** গরু ও মহিষের 'পা ও মুখের ক্ষত রোগ' এবং কুকুর ও বিড়ালের 'জলাতঙ্ক', মুরগির 'রানীক্ষেত' ও 'বসন্ত রোগ' প্রভৃতি।

৩. **উদ্ভিদের রোগ :** উদ্ভিদের মোজাইক, বুসিস্ট্যান্ট, লিফরোল প্রভৃতি।

● প্রশ্ন-৫. ব্যাকটেরিয়া কি? ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগগুলো কি কি?

উত্তর : ব্যাকটেরিয়া : ব্যাকটেরিয়া সরলতম, অতি ক্ষুদ্রাকার, ক্লোরোফিলবিহীন, এককোষী জীব, যাদের নিউক্লিয়াসটি সুসংগঠিত ও স্বতন্ত্রিত নয়।

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ :

১. **প্রাণিজ রোগ :** যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, ডিপথেরিয়া, আমাশয়, ধনুষ্টঙ্কার, হুপিংকাশি, মেনিনজাইটিস ইত্যাদি।

২. **উদ্ভিদের রোগ :** আলুর রিং রোগ; ধান ও শিমের লেট ব্লাইট রোগ; টমেটো, আলু, শশা ও কুমড়া জাতীয় গাছের উইল্ট রোগ; লেবু গাছের কর্কট রোগ ইত্যাদি।

৩. **অন্যান্য রোগ :** মানবদেহ ছাড়াও ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণিদেহেও মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, যারা মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। এ ব্যাকটেরিয়াগুলো মাটির নাইট্রোজেনকে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত করে দেয়।

খাদ্যদ্রব্য, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদির পচন রোগ, ফুড পয়জনিংয়ের কারণও এ ব্যাকটেরিয়া। অনেক ব্যাকটেরিয়া পানির সঙ্গে মিশে পানি দূষণ ঘটায়।

● প্রশ্ন-৬. মানুষের দেহে প্রতিদিন আয়োডিনের চাহিদা কতটুকু? আয়োডিনের অভাবে কি হয়?

উত্তর : মানুষের দেহে প্রতিদিন আয়োডিনের চাহিদা মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ মাইক্রোগ্রাম। আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ ছাড়াও কর্মস্পৃহা লোপ, অল্প পরিশ্রমে ক্লান্তি, অলসতা, অস্থিরতা ইত্যাদি দেখা দেয়। বাংলাদেশে গলগণ্ডের হার ৪৭% এর মধ্যে ৩৮% অদৃশ্য। সামুদ্রিক মাছ এবং শাকসবজি আয়োডিনের প্রধান উৎস।

● প্রশ্ন-৭. নিউমোনিয়া ও পাইয়োরিয়া কি?

উত্তর : নিউমোনিয়া : নিউমোনিয়া হলো ফুসফুসের একটি রোগ, যা ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ রোগে ফুসফুস আক্রান্ত হয় এবং ফুসফুসের থলিতে অস্বস্তিকর যন্ত্রণা হয়। এর লক্ষণগুলো হচ্ছে জ্বর হওয়া, বুকে ব্যথা, কাশি, শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট অনুভূত হওয়া ইত্যাদি।

পাইয়োরিয়া : পাইয়োরিয়া হলো দাঁতের একটি রোগ। এ রোগে দাঁতের মাড়ি থেকে পুঁজ বা রক্ত নির্গত হয় ও মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। নিয়মিত দাঁত পরিষ্কার রাখা, ভিটামিন 'সি' যুক্ত খাবার খাওয়া এবং এন্টিবায়োটিক গ্রহণ করার মাধ্যমে এ রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায়।

● প্রশ্ন-৮. কুষ্ঠ রোগের কারণ কি?

উত্তর : 'মাইকোব্যাকটেরিয়াম লেপরিব্যাসিলাস' নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মানুষের কুষ্ঠ রোগ হয়। এ জীবাণুগুলো মানুষের শরীরের ত্বক ও স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে। ফলে ত্বকের বিভিন্ন স্থান বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ত্বকে গোলাকৃতি সাদা দাগ পড়ে। এ রোগ মুখে, নাকের ভেতরে ও অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ রোগ চোখে আক্রান্ত হলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষাঘাত পর্যন্ত হতে পারে।

● প্রশ্ন-৯. শ্বেতী বা ধবল রোগ কাকে বলে?

উত্তর : শ্বেতী বা ধবল হলো এক ধরনের বংশগত রোগ। এটি মেলানিন নামক এক প্রকার গাঢ় বাদামি রঞ্জক পদার্থের অভাবে হয়ে থাকে। জিনের পরিবর্তনের ফলে এ রোগ বংশ পরম্পরায় সংক্রমিত হতে পারে। মানুষের পাশাপাশি উদ্ভিদ ও অন্যান্য জীবজন্তুরও এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত ত্বক, চুল ও চোখে এ রোগ হয়। সাদা গোলাকৃতি ছোট ছোট বিন্দুতে অথবা শরীরের যে কোনো সীমিত স্থান জুড়ে এ ধবল রোগ দেখা যায়। তবে যাদের শরীরের সব কোষেই মেলানিন অনুপস্থিত থাকে তারা পূর্ণদেহ ধবল বা শ্বেতী রোগে আক্রান্ত হয়।

● প্রশ্ন-১০. সার্স (SARS) কি? এ রোগের তিনটি লক্ষণ লিখুন।

উত্তর : সার্স : সার্স একটি ভাইরাসবাহিত রোগ। SARS-এর পূর্ণরূপ 'Severe Acute Respiratory Syndrome'। 'করোনা' নামক ভাইরাসে আক্রান্ত হলে এ রোগ হয়। এ রোগের কোনো চিকিৎসা না থাকলেও আক্রান্তদের মৃত্যুহার ৫%।

সার্স-এর লক্ষণ :

১. এ রোগে জ্বরের মাত্রা ১০১° ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়।
২. এ রোগে কাশি ও শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
৩. এ রোগে মাথাব্যথা ও ক্ষুধামন্দা দেখা দেয়।

● প্রশ্ন-১১. কিসের অভাবে বেরিবেরি (Beriberi) রোগ হয়? এর উপসর্গগুলো ও প্রতিরোধ লিখুন।

উত্তর : বেরিবেরি হচ্ছে ভিটামিন বি$_১$-এর (থায়ামিন) অভাবজনিত একটি রোগ। আলফা-কিটো এসিড-এর ডি-কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় থায়ামিন একটি কো-এনজাইম (সহ-অনুঘটক) রূপে কাজ করে। শর্করার স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার জন্য এটা প্রয়োজনীয়। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক উদ্দীপনা পরিবহন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যও থায়ামিন দরকারি।

বেরিবেরির উপসর্গ/লক্ষণ : শরীরে পানি আসা, বুক ধড়ফড় করা, হৃৎপিণ্ড বড় হওয়া, মাংসপেশি শুকিয়ে যাওয়া, মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা যাওয়া, মাংসপেশি এবং হাড়ে ব্যথা হওয়া প্রভৃতি উপসর্গ বেরিবেরি রোগের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

বেরিবেরি প্রতিরোধ : ঢেঁকি ছাঁটা চাল, গমের আটা, শিম, বরবটি, ঈস্ট, মাছের ডিম, মাংস ইত্যাদি খাবারে প্রচুর ভিটামিন বি$_১$ থাকে। উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সহজেই বেরিবেরি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক
Stroke & Heart Attack

০ প্রশ্ন-১২. স্ট্রোক কি?

উত্তর : স্ট্রোক এক ধরনের স্নায়ু সম্পর্কিত জটিলতা যা মস্তিষ্কের সঙ্গে জড়িত। কোনো কারণে যদি হৃৎপিণ্ডের রক্তসঞ্চালনে গোলযোগ সৃষ্টি হয় বা মস্তিষ্কের কোনো সূক্ষ্ম শিরা ছিঁড়ে অতিরিক্ত রক্ত জমা হয় এবং এর ফলে শারীরিক অক্ষমতা দেখা দেয় তবে তাকে স্ট্রোক বলে।

০ প্রশ্ন-১৩. স্ট্রোকের লক্ষণগুলো কি কি? কারো স্ট্রোক হলে তাৎক্ষণিকভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

উত্তর : স্ট্রোক হঠাৎ দেখা দেয়া এক মারাত্মক রোগ। কোনো রকম পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চলাফেরা বা ঘুমের মধ্যেও ইহা আকস্মিকভাবে দেখা দিতে পারে। স্ট্রোকের ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ দ্রুত সংঘটিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে রোগী জ্ঞান হারায়। বমি হয়, অসাড়ে প্রস্রাব ও পায়খানা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল লাল হয়ে ফুলে ওঠে, নাকে ও কানে পরিলক্ষিত হয় নীলচে ভাব। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হয়, নাড়ির গতি মন্থর হয়ে নেমে যায় মিনিটে ৪০ থেকে ৫০ বার। শরীরের তাপ স্বাভাবিক বা উচ্চ হয়, চোখের পিউপিল আলোতে সংকুচিত হয় না। যে দিকে আক্রান্ত হয় তার উল্টো দিকের হাত-পা নরম ও অবশ হয়, নাক ও ঠোঁটের ভাঁজ চলে যায়, প্রশ্বাসের সঙ্গে গাল ফুলে ওঠে। মুখ ও চোখ অন্য দিকে প্রায়ই ফিরানো থাকে।

এ অবস্থায় রোগীকে যথাশীঘ্র হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। রোগীর মাথা পায়ের থেকে সামান্য উঁচুতে রেখে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। ঘড় ঘড় শব্দসহ শ্বাস-প্রশ্বাস চললে রোগীর মাথা এক পাশে কাৎ করে মুখ থেকে লালা পরিষ্কার করে দিতে হবে। অজ্ঞান রোগীর মাথা পেছন দিকে কাৎ করে হেলে দিতে হবে যাতে তার লালা বা বমি ফুসফুসে না গিয়ে মুখ দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় তার মুখে কোনো খাবার, পানীয় বা ওষুধ কিছুই দেয়া যাবে না। মাথায় বরফের ব্যাগ এবং পায়ে হটওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দেয়া যেতে পারে। স্ট্রোকের রোগীর জন্য নার্সিং কেয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে রোগীকে কিছুক্ষণ পর পর ডান পাশ, বাম পাশ করে শুইয়ে দিতে হবে। বিছানা, রোগীর শরীর পরিষ্কার রাখতে হবে। নিয়মিত চোখ, মুখ, নাক পরিষ্কার রাখতে হবে। রোগীর হাত-পায়ের ব্যায়াম করাতে হবে।

০ প্রশ্ন-১৪. হার্ট অ্যাটাক কাকে বলে?

উত্তর : মানবদেহে শিরা ও ধমনী হচ্ছে রক্ত বাহিকা নল। যেসব শিরা-ধমনী হার্টে রক্ত সরবরাহ করে তাদেরকে বলে করোনারি আর্টারি বা ধমনী। হার্ট একটা নিখুঁত পাম্পিং মেশিন। তেল চর্বি প্রভৃতি কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার ভেতরে গেলে তা রক্তে মিশে করোনারি আর্টারির ছিদ্র বন্ধ করে রক্ত চলাচল বন্ধ করে দেয়। ফলে হার্টের অংশ বিশেষ মরে যায়। তখন হার্ট বন্ধ হয় বা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ হয়। একেই হার্ট অ্যাটাক বলে।

০ প্রশ্ন-১৫. হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাকের কারণ কি?

উত্তর : হার্ট অ্যাটাকের বিবিধ কারণ রয়েছে। নিচে তা বর্ণনা করা হলো :

১. **রক্তে চর্বির আধিক্য (হাইপার লিপিডিমিয়া) :** আমরা যেসব চর্বিজাতীয় খাদ্য, বিশেষ করে প্রাণিজ চর্বি খাই তা ধমনীর ভেতরের গায়ে জমা হয় এবং প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

২. **ধূমপান :** করোনারি ধমনী সংকুচিত করে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ কমিয়ে দেয়। এছাড়াও–
– রক্তের উপকারী এইচডিএল কোলেস্টেরল-এর মাত্রা কমিয়ে দেয়,
– হার্টের অসুখে ব্যবহৃত ওষুধের কার্যকারিতা বেশ কমিয়ে দেয়।
–ধমনীর গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে।

৩. **উচ্চ রক্তচাপ :** অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। হঠাৎ করে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে হার্ট অ্যাটাকের প্রচুর সম্ভাবনা থাকে।

৪. **বহুমূত্র :** যদি বহুমূত্র নিয়ন্ত্রণে না থাকে তবে রোগীর করোনারি হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাই অবশ্যই বহুমূত্র বা ডায়াবেটিসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

৫. **কর্মবিমুখতা :** যারা শারীরিক পরিশ্রম করে না সাধারণত দেখা যায় তাদের করোনারি হৃদরোগের প্রবণতা বেশি। কারণ কাজ না করে বসে থাকলে শরীরে এলডিএল কোলেস্টেরল বেড়ে যায়, যা হৃৎপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর।

৬. **মানসিক দুশ্চিন্তা :** যারা নিজেদের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে করে এবং অত্যধিক উচ্চাভিলাষী হয় তাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হতে বেশি দেখা যায়।

৭. **জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি :** দেখা যায় যারা অনেকদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করেছেন তাদের মধ্যে হৃদরোগের প্রকোপ বেশি।

৮. **পারিবারিক ইতিহাস :** হার্ট অ্যাটাকের জন্য চিহ্নিত রিস্কফ্যাক্টরগুলো কমানো গেলে করোনারি হৃদরোগের প্রকোপ অনেকাংশেই কমে যেতে পারে।

০ প্রশ্ন-১৬. হার্ট অ্যাটাকের সাধারণ উপসর্গ কি?

উত্তর : হার্ট অ্যাটাকের উপসর্গগুলো নিম্নরূপ :

- বুকের মাঝখানে প্রচণ্ড ব্যথা। বাম হাতে ও ঘাড়ে মাঝে মাঝে ব্যথা চলে যায়।
- বুকে চাপ ভাব ও অস্বস্তি বোধ করা।
- পরিশ্রমে বুকের ব্যথা আরো বেড়ে যায়।
- অনেক সময় শুধুমাত্র রোগীর গলায় ব্যথা করা।
- ঘাম হতে পারে ও পেটের উপরের দিকে ব্যথা হতে পারে।

০ প্রশ্ন-১৭. কারো হার্ট অ্যাটাক হলে তাৎক্ষণিকভাবে করণীয় কি?

উত্তর : হার্ট অ্যাটাক হলে চিকিৎসক বা বিশেষজ্ঞ কিংবা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না। রোগীর হৃদযন্ত্রের কাজ দ্রুত পুনরায় চালু না হলে রোগীর মৃত্যুও ঘটতে পারে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যা করণীয় তা হচ্ছে–

- রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে বিছানায়, সোফায় বা হাতলযুক্ত চেয়ারে শুইয়ে দিতে হবে।
- রোগীর পরিধেয় কাপড় বিশেষ করে গলা ও কোমরের কাপড় ঢিলা করে দিতে হবে।
- রোগীর যদি প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয় তবে রোগীর মাথার নিচে বালিশ দিয়ে উঁচু করে দিতে হবে। রোগীর বিছানার নিচে চেয়ার উপুড় করে দিয়ে অবস্থার কিছুটা উন্নতি করা যায়। এক্ষেত্রে বিছানাটি দেয়াল সংলগ্ন হতে হবে।
- রোগীকে শুইয়ে দেয়ার মতো কিছু না পাওয়া গেলে সাহায্যকারীর শরীরের উপর রোগীর মাথাটা উপরের দিকে রাখা যেতে পারে।
- রোগীকে হালকা কাপড় দিয়ে নাভির উপরিভাগ পর্যন্ত ঢেকে দিতে হবে এবং রোগীর জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

- দ্রুত এম্বুলেন্স আনার ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগীর উদ্বেগ নিরসনের জন্য রোগীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে এবং আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে।
- রোগীর প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এম্বুলেন্স ডাকা হচ্ছে ইত্যাদি বলে আশ্বস্ত করতে হবে।
- যদি রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয় তবে তাৎক্ষণিকভাবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দু'ভাবে করা যায়। যেমন মুখে মুখ লেখে এবং বুকের উপর চাপ দিয়ে।

○ প্রশ্ন-১৮. হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায় কেন?

উত্তর : মানবদেহের শিরাসমূহের মধ্যে অসংখ্য ভালুব থাকে। পেশীর চাপে এবং ভালুবগুলোর অবস্থানের ফলে শিরায় রক্তপ্রবাহ চালু থাকে। যারা ব্যায়াম বা পরিশ্রম না করে অলস জীবনযাপন করে তাদের রক্তপ্রবাহ কেবল হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াতেই চালু থাকে। এর ফলে হৃদযন্ত্রের শক্তি অকালে নিঃশেষ হয়ে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয় এবং মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

○ প্রশ্ন-১৯. করোনারি থ্রম্বোসিস কি?

উত্তর : করোনারি থ্রম্বোসিস হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের একটি মারাত্মক রোগ। করোনারি ধমনীর গহ্বর অতিরিক্ত ছোট হয়ে গেলে হৃদপেশীতে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বুকে ব্যথা হয় এবং করোনারি থ্রম্বোসিস নামক রোগ হয়। এ রোগে হঠাৎ করে অনেকে মারা যায়।

○ প্রশ্ন-২০. অ্যানজিনস (Angins) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : করোনারি ধমনীতে প্ল্যাক (Plaque) বা চর্বির আস্তরণ জমে পর্যাপ্ত অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ডে বা হৃদপেশিতে সরবরাহে বাধার সৃষ্টি হলে মানবদেহে, বুকে এক ধরনের অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভূত হয়, একেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় অ্যানজিন্‌স (Angins) বলা হয়। অ্যানজিন্‌স অবস্থায় বুকে চাপ অনুভূত হয় এবং হৃৎপেশি সংকুচিত হয়ে আসছে বলে মনে হয়। এর কারণে কাধ, গলা, ঘাড়, চোয়াল, হাতের বাহু এমনকি পিঠেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। অ্যানজিনস কোনো রোগ নয় বরং রোগের উপসর্গ মাত্র। হৃদরোগের উপসর্গ হিসেবে অ্যানজিন্‌স আবির্ভূত হয় এবং পরবর্তীতে হার্ট অ্যাটাক এর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। অ্যানজিনস্‌ সাধারণত তিন প্রকার– ১. স্থায়ী (stable), ২. অস্থায়ী (unstable) ও ৩. পরিবর্তনশীল (variant)।

○ প্রশ্ন-২১. হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের পার্থক্য কি? বুঝিয়ে লিখুন।

উত্তর : Heart attack (হার্ট অ্যাটাক) ও Stroke (স্ট্রোক)-এর মধ্যে পার্থক্য : কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট অ্যাটাক বলে। হৃৎপিণ্ডে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (Coronary artery)। এ করোনারী ধমনী রক্তের জমাট বাঁধা পিণ্ড দ্বারা বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ড অক্সিজেন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং দেখা দেয় হার্ট অ্যাটাক। অর্থাৎ হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে একটি হৃদরোগ। অপরদিকে স্ট্রোক হচ্ছে একটি মস্তিষ্কের রোগ। কোনো কারণে মস্তিষ্কের কোথাও রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে অথবা মস্তিষ্কের কোনো রক্তনালী ফেটে রক্তক্ষরণ হলে সেই অবস্থাকে স্ট্রোক বলে। স্ট্রোকের ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ দ্রুত সংঘটিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে রোগী জ্ঞান হারায়।

○ প্রশ্ন-২২. মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন কি? এটির জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগের নাম লিখুন।

উত্তর : মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (Myocardial infarction) : কোনো কারণে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, তাকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলে, যা হার্ট

অ্যাটাক (Heart attack) নামে পরিচিত। হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে করোনারী ধমনী (coronary artery)। অনেক সময় এই করোনারী ধমনীর ভেতরের দিকের দেয়ালে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্ত চলাচলের পথে সরু হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয় এবং সৃষ্টি হয় মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন।

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশনের জন্য দায়ী প্রধান দুটি রোগ হলো :

i. উচ্চ রক্তচাপ (Hypertension)
ii. বহুমূত্র রোগ (Diabetes)

○ প্রশ্ন-২৩. কোলেস্টেরল কি এবং মানবদেহে এটি কি ক্ষতি করে?

উত্তর : কোলেস্টেরল হচ্ছে এক ধরনের স্টেরয়েড এলকোহল, যা সকল প্রাণিদেহের কোষ ঝিল্লিতে পাওয়া যায় এবং রক্তরসের মাধ্যমে সারা দেহে প্রবাহিত হয়।

মানবদেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেশি হলে রক্তনালীতে কোলেস্টেরল জমা হয়ে রক্তনালী সংকীর্ণ হয়ে যায়। রক্তনালী সংকীর্ণ হওয়ার কারণে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলশ্রুতিতে স্ট্রোক ও হৃদরোগ দেখা দেয়।

○ প্রশ্ন-২৪. কোলেস্টেরল, এলডিএল ও এইচডিএল কি? দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায় লিখুন।

উত্তর : কোলেস্টেরল এক জাতীয় স্টেরয়েড এলকোহল। এটি পানিতে অদ্রবণীয় এবং চর্বিতে দ্রবণীয় বলে স্নেহ জাতীয় পদার্থের দলভুক্ত। আমরা প্রোটিন, ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট জাতীয় যে খাবার খাই, তা আমাদের শরীরের ভেতর বিপাকের পর নানা বিক্রিয়ায় ভেঙে গিয়ে নতুন নতুন উপাদানে পরিণত হয়। এমনি একটি উপাদান হচ্ছে এসিটিক এসিড বা এসিটেট। কোলেস্টেরলের উৎপত্তি এই এসিটেট থেকে। কোলেস্টেরল আমাদের রক্তনালী ও কোষে অবস্থান করে, বিশেষ করে নার্ভাস টিস্যুতে এর পরিমাণ বেশি মাত্রায় দেখা যায়। এ কোলেস্টেরল যখন আমাদের রক্তনালীতে জমাট বাঁধতে শুরু করে তখনই দেখা দেয় হাইপারটেনশন ও হৃৎপিণ্ডের নানা অসুখ তথা হৃদরোগ।

এলডিএল (LDL)

এলডিএল-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি Low-density Lipoprotein, যা প্রাণিজ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। এটি রক্তনালীর প্রাচীরগাত্রে জমে রক্তনালী সংকুচিত করে এবং রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এটিকে খারাপ কোলেস্টেরলও বলা হয়।

এইচডিএল (HDL)

এইচডিএল-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি High-density Lipoprotein, যা উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়। রক্তের প্রায় ৩০% কোলেস্টেরল এতে সঞ্চিত থাকে। একে মানবদেহের ভালো কোলেস্টেরলও বলা হয়।

দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায় :

i. চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা,
ii. নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটার অভ্যাস করা।

○ প্রশ্ন-২৫. কোলেস্টেরল আমাদের হৃৎপিণ্ডে কিভাবে ক্ষতি করে?

উত্তর : আমাদের শরীরে রক্ত বয়ে চলে ধমনীর মধ্য দিয়ে। এই রক্তে যখন কোলেস্টেরল বেশি হয়ে যায় তখন ধমনীর গায়ে আঠার মতো করে এর প্রলেপ পড়তে থাকে। ধমনীর গায়ে যত পুরু করে প্রলেপ পড়ে রক্ত চলাচলের পথ ততই সরু হয়ে পড়ে। রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। এ সময় থেকে

বুকে ব্যথা শুরু হতে পারে। কারণ রক্তই অক্সিজেনকে বহন করে আনে। আর হৃৎপিণ্ডে রক্তবাহী ধমনীতে বাধার সৃষ্টি হলে হৃৎপিণ্ডে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পৌঁছে না। এভাবে নানা হৃদরোগের সূচনা হয়। এসব রোগকে এককথায় 'কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ' (Cardio vascular disease) বলে। রক্তবাহী নালীর গায়ে যখন স্নেহপদার্থের প্রলেপ পড়তে থাকে তখন নালীর ভেতরের দেয়ালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে অক্সিজেনের সরবরাহে বিঘ্ন ঘটে অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়।

○ প্রশ্ন-২৬. কোলেস্টেরল বিহীন এবং অধিক কোলেস্টেরল যুক্ত খাবারগুলো কি কি?

উত্তর : কোলেস্টেরল বিহীন খাদ্য : খাদ্যশস্য, চা, কফি, ফল, শাকসব্জি, উদ্ভিজ্জ তেল, ডিমের সাদা অংশ ইত্যাদি।

অধিক কোলেস্টেরল যুক্ত খাদ্য

১০০ গ্রাম খাদ্যবস্তু	কোলেস্টেরল (মিলিগ্রাম)
গরুর মগজ	২৩০০
ডিমের কুসুম	২০০০
খাশির কলিজা	৬১০
গরুর কিডনি	৪০০
গরুর কলিজা	৩২০

রক্ত, রক্তচাপ এবং উচ্চ রক্তচাপ
Blood, Blood Pressure & Hypertension

○ প্রশ্ন-২৭. রক্ত কি?

উত্তর : এক ধরনের বিশেষ তরল যোজক কলা হচ্ছে রক্ত। ভ্রূনের মেসোডার্মজাত কোষস্তর থেকে রক্ত উৎপন্ন হয়। তিন ধরনের কণিকা এবং তরল প্লাজমা নিয়ে রক্ত গঠিত। রক্তের রং লাল এবং স্বাদ মৃদু ক্ষারীয়। রক্তের উপাদানের মধ্যে সেলুলার উপাদান ৪৫% (লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা) তরল প্লাজমা বা রক্তরস ৫৫% (এর মধ্যে তরল ৯২% এবং কঠিন পদার্থ ৮%)। মানবদেহে এই রক্ত A, B, AB এবং O এই চারটি গ্রুপে বিভক্ত।

○ প্রশ্ন-২৮. রক্তের উপাদান কি কি? বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ বর্ণনা করুন।

উত্তর : রক্তের উপাদান : রক্ত দু'প্রকার উপাদান দ্বারা গঠিত।

যথা : —১. রক্তরস (৫৫%) ও
২. রক্তকণিকা (৪৫%)

রক্তের তরল অংশকে রক্তরস বলে। রক্তরসে রক্তকণিকা ভাসমান অবস্থায় থাকে।

বিভিন্ন উপাদানের গঠন ও কাজ :

১. রক্তরস :

গঠন : রক্তরস ৯০-৯২% জলীয় অংশ এবং ৮-১০% বিভিন্ন পদার্থ নিয়ে গঠিত। রক্তরসে তিন প্রকার পদার্থ থাকে। যথা–

ক. অজৈব পদার্থ : রক্তের অজৈব উপাদানগুলো হলো সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, তামা, আয়োডিন ইত্যাদি।

খ. জৈব পদার্থ : রক্তের জৈব উপাদানগুলো হলো :
i. শর্করা-গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ;
ii. প্রোটিন- অ্যালবুমিন, ফাইব্রিনোজেন;
iii. ফ্যাট- কোলেস্টেরল, লেসিথিন ইত্যাদি।

গ. গ্যাসীয় পদার্থ : অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি।

কাজ : ১. রক্তরস রক্তকণিকাকে ধারণ করে।
২. দূষিত পদার্থ অপসারণ করে।
৩. হজমকৃত খাদ্যবস্তু, কার্বন ডাই-অক্সাইড, ইউরিয়া, হরমোন ইত্যাদি রক্তরসের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়।
৪. রক্তরস হাইড্রোজেন (আয়ন) সাম্য বজায় রাখে।
৫. পানি ও তাপের সমতা রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

২. রক্তকণিকা : মানুষের রক্তে তিন ধরনের রক্তকণিকা থাকে। যথা :
i. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট
ii. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইড
iii. অনুচক্রিকা বা থ্রোম্বোসাইট

i. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট

গঠন : ১. ক্ষুদ্র গোলাকার।
২. দ্বি-অবতল।
৩. পূর্ণাঙ্গ লোহিত কণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন।
৪. হিমোগ্লোবিন নামক এক প্রকার রঞ্জক পদার্থ আছে বলে কণিকাগুলো লাল বর্ণের।

কাজ : ১. O_2 ও CO_2 বহন করা।
২. অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা করা।

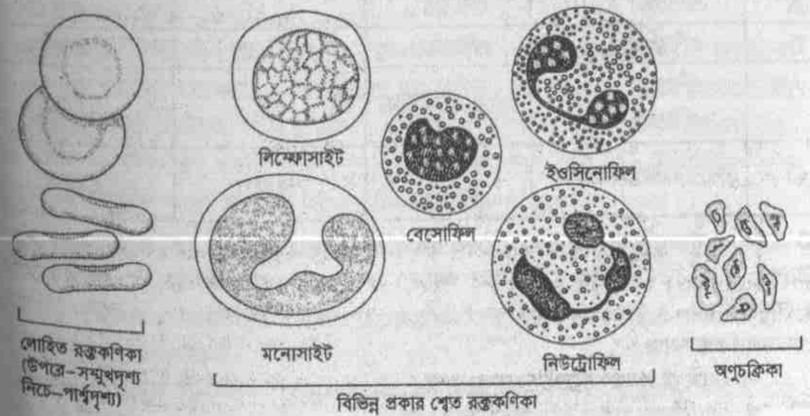

চিত্র : মানুষের রক্তের উপাদান

ii. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

গঠন : ১. অনিয়তাকার।
২. নিউক্লিয়াসযুক্ত।
৩. সাইটোপ্লাজম দানাযুক্ত বা দানাবিহীন ও
৪. লোহিত কণিকা অপেক্ষা বড়।

কাজ : ১. জীবাণু ধ্বংস করা।
২. দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করা।
৩. ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে রোগজীবাণু ভক্ষণ করা (ফ্যাগোসাইটোসিস)।

iii. অনুচক্রিকা বা থ্রোম্বোসাইট

গঠন : ১. ডিম্বাকার বা মাকু আকৃতির।
২. নিউক্লিয়াসযুক্ত।
৩. সবচেয়ে ক্ষুদ্র রক্তকণিকা ও
৪. গুচ্ছাকারে থাকে।

কাজ : রক্ত জমাট বাঁধতে সহায়তা করে।

○ প্রশ্ন-২৯. রক্তের শ্রেণিবিন্যাস কি? মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর : রক্ত কণিকায় কতগুলো অ্যান্টিজেন-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিভাগ করেন তা ABO রক্ত গ্রুপ বা সংক্ষেপে রক্ত গ্রুপ নামে পরিচিত। অনেক সময় একে ল্যান্ডস্টেইনারের রক্ত গ্রুপও বলে। রক্তের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে দু'রকম অ্যান্টিজেন এবং রক্তরসে দু'রকম অ্যান্টিবডি থাকে। এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতির রক্তকে চারটি শ্রেণি বা গ্রুপে ভাগ করা যায়। যথা : A, B, AB, O.

মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য :

রক্ত গ্রুপ	লাল রক্তকণিকায় উপস্থিত এন্টিজেন	সেরেমে উপস্থিত এন্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্তদান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	এন্টিজেন A	এন্টিবডি a	A, AB	A এবং O
B	এন্টিজেন B	এন্টিবডি b	B, AB	B এবং O
AB	এন্টিজেন A এন্টিজেন B	কোনো এন্টিবডি নেই	AB	সব গ্রুপ
O	কোনো এন্টিজেন নেই	এন্টিবডি a এন্টিবডি b	সব গ্রুপ	O গ্রুপ

○ প্রশ্ন-৩০. রক্তকণিকা কয় প্রকার? শ্বেত রক্তকণিকার কাজ কি?

উত্তর : রক্তে তিন প্রকার রক্তকণিকা আছে। যথা : ১. শ্বেত কণিকা, ২. লোহিত কণিকা, ৩. অনুচক্রিকা।

শ্বেত কণিকার কাজ :

ক. দেহে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।
খ. রোগজীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে দেয়।
গ. দেহাভ্যন্তরে রক্তনালীর ভেতর রক্তপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে।

○ প্রশ্ন-৩১. রক্তের গ্রুপ 'পজেটিভ' বা 'নেগেটিভ' হওয়ার কারণ কি?

উত্তর : লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমা মেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে রক্তের গ্রুপ পজেটিভ হবে নাকি নেগেটিভ। যদি কোনো ব্যক্তির রক্তের লোহিত কণিকায় 'Rh-এগ্লুটিনোজেন' নামক বিশেষ উপাদান থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ হবে পজেটিভ। আর লোহিত কণিকায় Rh-এগ্লুটিনোজেন না থাকলে রক্তের গ্রুপ হবে নেগেটিভ।

○ প্রশ্ন-৩২. রক্তে pH-এর মান কত? রক্তে লোহিত কণিকার কাজ কি?

উত্তর : রক্তে pH-এর মান গড়ে ৭.২–৭.৪।

লোহিত কণিকার কাজ :

ক. এদের প্রধান কাজ শরীরের সবখানে O_2 বহন করা।
খ. এরা রক্তে অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষায় সহায়তা করে।
গ. নিষ্কাশনের জন্য CO_2-কে কলা থেকে এরা ফুসফুসে বহন করে।

○ প্রশ্ন-৩৩. রেসাস ফ্যাক্টর বা Rh ফ্যাক্টর কি?

উত্তর : 'রেসাস বানর'-এর রক্তে একটি অ্যান্টিজেন থাকে। রেসাস বানরের নাম অনুসারে এটিকে রেসাস অ্যান্টিজেন বা Rh ফ্যাক্টর বলে। কোনো কোনো মানুষের রক্তের কণিকায় 'রেসাস বানরে'র অনুরূপ রেসাস অ্যান্টিজেন থাকে। এই অ্যান্টিজেনের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি বিবেচনা করেই মানুষের রক্তের গ্রুপ Rh পজেটিভ ও Rh নেগেটিভ এ দু'শ্রেণিতে বিভক্ত।

○ প্রশ্ন-৩৪. শরীরের ভেতর রক্ত জমাট বাঁধে না কেন?

উত্তর : শরীরের ভেতর হেপারিন নামক রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি, রক্তনালীর অভ্যন্তর ভাগের মসৃণতা এবং দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের জন্য শরীরের অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধে না।

○ প্রশ্ন-৩৫. কৃত্রিম রক্ত বা সিনথেটিক রক্ত কি?

উত্তর : কৃত্রিম উপায়ে উদ্ভাবিত রক্তের নাম সিনথেটিক রক্ত। এটা ফ্লোরো-কার্বন দিয়ে তৈরি। জাপানি বিজ্ঞানীরা এ রক্ত আবিষ্কার করেছেন। এ রক্ত দিয়ে রোগীকে ৭২ থেকে ৯৬ ঘণ্টা বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। হৃৎপিণ্ড থেকে টিস্যুসমূহে গ্যাস চলাচলে এ রক্ত সাহায্য করে।

○ প্রশ্ন-৩৬. রক্ত লাল দেখায় কেন?

উত্তর : লোহিত রক্তকণিকা (Red Blood Cell), শ্বেত রক্তকণিকা (White Blood Cell), অনুচক্রিকা (Platelate) এবং রক্তরস বা প্লাজমার সমসত্ত্ব মিশ্রণে রক্ত গঠিত। লোহিত রক্ত কণিকা হিমোগ্লোবিন, হিমোগ্লোবিন হিমাটিন ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত। এই হিমোগ্লোবিনে ৯৪% প্রোটিন (গ্লোবিন) এবং ৬% হিম (লৌহ ও সালফারের একটি পরফাইরিন) থাকে। মানবদেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে প্রায় ১৫ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে, আর এই হিমোগ্লোবিন থাকার জন্যই রক্ত লাল দেখায়।

○ প্রশ্ন-৩৭. রক্তের কাজ কি?

উত্তর : রক্তের কাজ :

ক. **অক্সিজেন পরিবহন :** লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিন ও প্লাজমার মাধ্যমে রক্ত ফুসফুস থেকে কলায় অক্সিজেন বহন করে।
খ. **কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবহন :** অন্তঃশ্বসনের ফলে সৃষ্ট কার্বন ডাই-অক্সাইড কলা থেকে ফুসফুসে বহন করে।
গ. **খাদ্যরস পরিবহন :** পরিপাককৃত খাদ্যসার অন্ত্র থেকে কলা কোষে পরিবহন করে।

ঘ. হরমোন পরিবহন : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হরমোন দেহের প্রয়োজনীয় কোষে পরিবহন করে।

ঙ. পানিসাম্য নিয়ন্ত্রণ : রক্ত দেহের বিভিন্ন তরল অংশকে এবং কোষের প্রোটোপ্লাজমকে পানি সরবরাহ করে।

চ. দৈহিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ : অধিকতর সক্রিয় কলায় উৎপাদিত তাপ দেহের সর্বত্র রক্তের সাহায্যে বন্টনের ফলে শরীরের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এছাড়াও অম্ল ও ক্ষারের সাম্যতা, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, জীবাণু প্রতিরোধ, ক্ষত নিরাময়, রোগ নির্ণয়, রক্তপাত প্রতিরোধ, বিলিরুবিন উৎপন্ন করা ইত্যাদিও রক্তের কাজ।

০ প্রশ্ন-৩৮. বিলিরুবিন (Bilirubin) কি?

উত্তর : বিলিরুবিন হচ্ছে পিত্তরসের কমলা রঙের প্রধান রঞ্জক পদার্থ। রক্তের হিমোগ্লোবিনের প্রধান দুটি উপাদান প্রোটিন অংশ গ্লোবিন ও লৌহযুক্ত অংশ হিম (heme)। হিম ভেঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিলিরুবিনে পরিণত হয়। এছাড়া অন্যান্য ক্রোমোপ্রোটিন থেকেও বিলিরুবিন তৈরি হয়। লোহিত রক্ত কোষের জীবনকাল গড়পড়তা ১২০ দিন। এরপর যকৃৎ, প্লীহা ও অস্থিমজ্জার রেটিকুলো-এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেমে লোহিত রক্তকোষ ভেঙে হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসে। হিমোগ্লোবিন থেকে গ্লোবিন অংশ বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হিম জারিত হয়ে ট্রেট্রাপাইরল চক্র উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ থেকে লোহার অণু সরে গেলে সবুজ রঙের বিলিভারডিন উৎপন্ন হয়। বিলিভারডিন বিজারিত হয়ে বিলিরুবিন উৎপন্ন হয়।

০ প্রশ্ন-৩৯. রক্তের গ্রুপ জানার প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির ওপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এ ধরনের শ্রেণিবিন্যাসকে ABO রক্তগ্রুপ বলে। বিভিন্ন কারণে আমাদের দেহে রক্তের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। দুর্ঘটনা, রক্তশূন্যতা অথবা কোনো কঠিন রোগ এবং অস্ত্রোপচার করার সময় অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়। এ সময় অন্য লোকের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজন মেটানো হয়। এখানে রক্তদাতা ও গ্রহীতার রক্তের রাসায়নিক গুণাগুণ একরূপ হওয়া দরকার। তা না হলে অঘটন ঘটে রোগী মারা যেতে পারে। তাই রক্ত রোগীর দেহে প্রয়োগের পূর্বে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত।

০ প্রশ্ন-৪০. হিমোগ্লোবিন কি? এর কাজ কি?

উত্তর : হিমোগ্লোবিন : সরল প্রোটিন গ্লোবিন (৯৬%) এবং লৌহঘটিত পদার্থ হিম (৪%)-এর সমন্বয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন লাল বর্ণের একটি শ্বাসরঞ্জক (respiratory pigment)। মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা ক্ষুদ্রাকার, দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন চাকতির মতো লাল রঙের কোষ। এতে হিমোগ্লোবিন নামক এক ধরনের রঞ্জক পদার্থ থাকে। দেহে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২০ লক্ষ কণিকা তৈরি হয়। একটি লোহিত কণিকার গড় আয়ু ৪ মাস। সুস্থ মানুষের দেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৫ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে।

হিমোগ্লোবিন-এর কাজ :

১. লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিন ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 এবং সামান্য পরিমাণ CO_2 পরিবহন করে।
২. রক্তের সান্দ্রতা (viscocity) রক্ষা করে।
৩. রক্তের অম্ল-ক্ষারের সাম্যতা রক্ষা করে।
৪. রক্তে বিলিরুবিন ও বিলিভার্ডিন উৎপাদনে সাহায্য করে।

০ প্রশ্ন-৪১. 'Eyanosis' কি?

উত্তর : রক্তে যখন কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) যুক্ত হিমোগ্লোবিন বেড়ে যায় তখন শরীরের বিশেষ কিছু জায়গায় যেমন– নাক, কান, জিহ্বা এবং আঙুল নীলাভ বর্ণ ধারণ করে, একে Eyanosis বলা হয়। জিহ্বার আগা, কানের লতি, ঠোঁট, নখের গোড়া, নাক প্রভৃতিতে এটি দেখা যায়।

প্রকারভেদ : ক. কেন্দ্রিকা (Central) ও; খ. Peripheral

০ প্রশ্ন-৪২. ব্লাড ব্যাংক কি?

উত্তর : যে স্থানে ৪°সে.–৬°সে. তাপমাত্রায় রক্ত সংরক্ষণ করা হয় তাকে ব্লাড ব্যাংক বলে। সংরক্ষিত রক্ত রোগীর প্রয়োজনে শরীরে প্রয়োগ করা হয়।

০ প্রশ্ন-৪৩. রক্তচাপ কি? এটা কত প্রকার?

উত্তর : হৃদযন্ত্র থেকে রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনীতে রক্তের যে চাপের সৃষ্টি হয় তাকে রক্তচাপ বলে। রক্তচাপ দুই ধরনের। যথা : ক. সিস্টোলিক চাপ, খ. ডায়াস্টোলিক চাপ।

ক. সিস্টোলিক চাপ : হৃৎপিণ্ডের সিস্টোল অবস্থায় ধমনীর প্রাচীরে রক্তচাপের মাত্রা সর্বাধিক হয়। একে সিস্টোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় সিস্টোলিক চাপ পারদ স্তম্ভের ১০০–১৫০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

খ. ডায়াস্টোলিক চাপ : হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোল অবস্থায় রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে। একে ডায়াস্টোলিক চাপ বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬৫–৯০ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়।

০ প্রশ্ন-৪৪. উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ ও কারণগুলো লিখুন।

উত্তর : রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ ১২০/৮০-এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে তখন ঐ ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আছে বলে ধরা হয়।

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনের লক্ষণ :

ক. সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথার পেছন দিকে ও ঘাড়ে ব্যথা হওয়া।
খ. মাথা ঘোরা, কানে ভো ভো করা, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা, অল্পতেই বিরক্ত হওয়া।
গ. বুকে ব্যথা, অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, রাতে হাঁপানি।
ঘ. পক্ষাঘাত।
ঙ. ঘনঘন প্রস্রাব, কখনও প্রস্রাবের সময় রক্ত যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ :

ক. বাবা মা'র উচ্চ রক্তচাপ থাকলে।
খ. শরীরের ওজন বেড়ে গেলে।
গ. গতি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়ে গেলে।
ঘ. অ্যালকোহল জাতীয় খাবার খেলে।
ঙ. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে।
চ. অধিক সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে।

০ প্রশ্ন-৪৫. উচ্চ রক্তচাপের প্রতিকারগুলো লিখুন।

উত্তর :
১. ধূমপান থেকে বিরত থাকা।
২. শরীরের ওজন সীমার মধ্যে রাখতে হবে।

৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা।
৪. অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
৫. নিয়মিত ব্যায়াম করা।
৬. ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো।
৭. মদ্যপান থেকে বিরত থাকা।
৮. মানসিক দুশ্চিন্তা পরিহার করা।
৯. অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ না করা।

বহুমূত্র
Diabetes

○ প্রশ্ন-৪৬. ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ কি? এ রোগের লক্ষণগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস : অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে, যে গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নামক হরমোন তৈরি হয়। এ হরমোন শরীরের শর্করা পরিপাক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অগ্ন্যাশয়ের যদি প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি না হয় তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত শর্করা বা গ্লুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হওয়ার দরুন যে রোগ হয় তাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে।

খালি পেটে না থাকা অবস্থায় একজনের রক্ত রসে যদি ৭.৮ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ এবং খাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে রক্ত রসে যদি ১১.১ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ থাকে তবে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়। ডায়াবেটিস সাধারণত বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়।

বহুমূত্র বা ডায়াবেটিসের লক্ষণ :

কোনো ব্যক্তি বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত হলে তার মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলো দেখা যাবে-(১) ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া (২) খুব বেশি পিপাসা লাগা (৩) ক্ষুধালাগা (৪) প্রচুর খাওয়া সত্ত্বেও শরীরের ওজন কমে যাওয়া (৫) ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করা (৬) চোখে কম দেখা (৭) চামড়া রুক্ষ হয়ে যাওয়া (৮) কেটে গেলে বা খোস পাঁচড়া হলে সহজে না শুকানো ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৪৭. ডায়াবেটিস রোগ কাদের বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে?

উত্তর : যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো বয়সে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হতে পারে। তবে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের ডায়াবেটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

১. কোনো ব্যক্তির বংশে যেমন- বাপ, মা, নিকট আত্মীয়ের বহুমূত্র রোগ থাকলে তাদের বহুমূত্র রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
২. কোনো ব্যক্তির অতিরিক্ত ওজন থাকে তাদের বহুমূত্র রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।
৩. যারা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে না তাদের বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

○ প্রশ্ন-৪৮. ইনসুলিন কি? এর কাজ কি?

উত্তর : ইনসুলিন : ইনসুলিন এক ধরনের হরমোন, যা অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত হয় এবং চিনির বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিন হচ্ছে একটি পলিপেপটাইড। এর আণবিক ওজন প্রায় ৬০০০ গ্রাম। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ইনসুলিন সাধারণত গুরুর অগ্ন্যাশয় থেকে প্রস্তুত করা হয়। ইনসুলিন অণুতে ৪৮টি অ্যামাইনো এসিড থাকে। রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়লে অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নির্গমন বৃদ্ধি করে

দেয়। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স টিস্যু চিনির বিপাক করার মতো ইনসুলিন উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে।

ইনসুলিনের কাজ : ইনসুলিন শ্বেতসার, আমিষ ও চর্বির বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। ইনসুলিনের প্রধান কাজ রক্তে শর্করার পরিমাণ স্বাভাবিক মাত্রায় রাখা। ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস রোগ দেখা দেয়। ডায়াবেটিস মেলিটাসের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়। পাকস্থলীর জারক-রসের কার্যকারিতা নষ্ট হবার কারণে ইনসুলিন মুখে খাবার পরিবর্তে ইনজেকশন মাধ্যমে নেয়া হয়। কার্যকাল হিসেবে একাধিক প্রকার ইনসুলিন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৪৯. ডায়াবেটিক ও ইনসুলিন-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : অগ্ন্যাশয়ের অভ্যন্তরে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে, যে গ্রন্থি থেকে ইনসুলিন নামক হরমোন তৈরি হয়। এ হরমোন শরীরের শর্করা পরিপাক কার্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি না হয় তখন রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায় এবং অতিরিক্ত শর্করা বা গ্লুকোজ প্রস্রাবের সঙ্গে নির্গত হওয়ার দরুন যে রোগ হয় তাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস বলে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহার করা হয়।

খালি পেটে থাকা অবস্থায় একজন লোকের রক্তরসে যদি ৭.৮ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ এবং খাওয়ার দুই ঘণ্টা পরে রক্তরসে যদি ১১.১ মি.লি. মোলের বেশি গ্লুকোজ থাকে তবে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগ হয়েছে বলে শনাক্ত করা হয়। ডায়াবেটিস সাধারণত বংশগত এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়।

ডেঙ্গু
Dengue

○ প্রশ্ন-৫০. ডেঙ্গু জ্বর কি?

উত্তর : ডেঙ্গু ফিভার বা জ্বর এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। শারীরিক দুর্বলতা, ফুসকুড়ি ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া, মাথা ব্যথা প্রভৃতি এ রোগের উপসর্গ। এডিস ইজিপটি নামক এক জাতীয় মশা এ ভাইরাসের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এরা সাধারণত দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়। সাধারণত গরমকালেই এদের বংশবিস্তার বেশি হয়ে থাকে। এ ভাইরাসকে ডেঙ্গু ভাইরাসও বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৫১. ডেঙ্গু রোগে রক্তের কোন কণিকা ভেঙে যায়? এ রোগ কিভাবে বাহিত হয়?

উত্তর : ডেঙ্গু রোগে রক্তের অণুচক্রিকা (Platelets) ভেঙে যায়।

যেভাবে বাহিত হয় : ডেঙ্গু ফিভার বা জ্বর এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা, ফুসকুড়ি ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। এডিস ইজিপটি নামক মশা এ ভাইরাসের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো এরা সাধারণত দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়, গরমকালে শহর এলাকায় জলাবদ্ধ স্থানে এরা বংশবিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে গরমকালেই এদের বংশবিস্তার বেশি হয়ে থাকে। এ ভাইরাসকে ডেঙ্গু ভাইরাসও বলা হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা যাদেরকে কামড়ায় তারাই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। এছাড়াও এ মশা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পরে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তিও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। তাই বলা যায়, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিও এ রোগ ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

○ প্রশ্ন-৫২. ম্যালেরিয়া জীবাণু কি?

উত্তর : ম্যালেরিয়া জীবাণু হলো প্লাজমোডিডা (Plasmodiidae) পরিবারের স্পোরোজোয়া (Sporozoa) শ্রেণিভুক্ত হেমোসপোর্ডিয়া (Haemosporidia) গ্রুপের একটি ক্ষুদ্র প্রোটজোয়া (Protozoa)। ম্যালেরিয়া জীবাণু ৪ ধরনের (ক) প্লাজমোডিয়াম ভিভাক্স, (খ) ফেলসিফেরাম, (গ) ম্যালেরাই ও (ঘ) ওভাল। ভিভাক্স গ্রুপের জীবাণু মানুষের দেহের লাল রক্তকণিকায় একটি গোলাকার রিং হিসেবে প্রকাশ পায় এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পরিপক্ব হয়ে ১৬-২৪টি জীবাণুতে বিভক্ত হয়। এরপর রক্তকণিকা ভেঙ্গে যায় এবং প্রত্যেকটি জীবাণু দেহের অন্য রক্তকণিকাকে আক্রমণ করে। এ সময় রোগীর দেহে কম্পন অনুভূত হয়। মানবসমাজে ম্যালেরিয়া বিস্তারে এনোফিলিস মশা-ই একমাত্র বাহক। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ মশার ৩৫টি প্রজাতি রয়েছে।

○ প্রশ্ন-৫৩. ম্যালেরিয়া জীবাণুর আক্রমণে রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা দেখা যায় কেন?

উত্তর : নিম্নলিখিত কারণে প্লাজমোডিয়াম দ্বারা আক্রান্ত রোগীর দেহে রক্তশূন্যতা দেখা যায় :

ক. লোহিত রক্তকণিকার ভেতর থেকে মেরোজোয়াইটগুলো যখন বের হয় তখন কণিকাগুলো ধ্বংস হয়।

খ. আক্রান্ত লোহিত কণিকাগুলোর প্রাচীর ভেঙ্গে গিয়ে তারা নষ্ট হয়।

গ. ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর প্লীহা (Spleen) ফুলে যায় ও তা লাইসোলেসিথিন নামক বস্তু নিঃসৃত করে, যা লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে থাকে।

ঘ. জীবাণুগুলো 'হিমোলাইসিন' নামক বস্তু উৎপন্ন করে যা লোহিত কণিকার 'হিমোলাইসিস' ঘটায়।

○ প্রশ্ন-৫৪. সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া কি?

উত্তর : সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হচ্ছে এমন এক ধরনের ম্যালেরিয়া, যা প্লাজমোডিয়া ফ্যালসিফেরাম নামক এক ধরনের প্যারাসাইট জাতীয় জীবাণুর কারণে হয়ে থাকে এবং এটি মস্তিষ্ককে আক্রান্ত করে। এ ম্যালেরিয়ায় মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয় বলেই একে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া নামকরণ করা হয়েছে। কোনো স্ত্রী এনোফিলিস মশা যদি সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীকে কামড় দেয় তাহলে রোগীর রক্তে অবস্থিত সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট (পরজীবী বা জীবাণু) মশার শরীরে ঢুকে পড়ে। মশার শরীরে ম্যালেরিয়ার এ জীবাণু ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে পরিণত হয়ে সংক্রমণযোগ্য একটা পর্যায়ে পৌছে। এ পর্যায়ে সংক্রমিত মশাটি কোনো মানুষকে কামড় দিলে মশার লালাগ্রন্থির মাধ্যমে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সেই মানুষের শরীরে ঢুকে পড়ে অর্থাৎ মানুষটি ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। সব ধরনের ম্যালেরিয়া এভাবেই ছড়ায়।

○ প্রশ্ন-৫৫. টাইফয়েড কি?

উত্তর : বেসিলাম টাইফোমাস নামক জীবাণু দ্বারা এ রোগের উৎপত্তি। এ ধরনের জীবাণু পানি, খাদ্য বা দুধের সাথে শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তে বিষ ছড়ায়। টাইফয়েড প্রতিরোধক টিকা নিলে ও পানি ফুটিয়ে খেলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৫৬. রিউমেটিক ফিভার বা বাতজ্বর কি? এ রোগের লক্ষণ কি কি?

উত্তর : এটি এক ধরনের রোগ, যা অল্প বয়স্কদের বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত রোগীর ঘনঘন জ্বর হয়, খাওয়ায় অরুচি আসে। হৃৎপিণ্ডের ভেতরের স্তরে প্রদাহ হয়ে রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

বাতজ্বরের লক্ষণ :

- অস্থি সন্ধিতে ব্যথা;
- জ্বর;
- হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ।

ডায়রিয়া
Diarrhoea

○ প্রশ্ন-৫৭. ডায়রিয়ায় ডাবের পানি উত্তম কেন?

উত্তর : ডায়রিয়ায় আক্রান্ত রোগীর ঘনঘন পাতলা পায়খানা ও বমির ফলে শরীরের প্রয়োজনীয় পানি ও অত্যাবশ্যকীয় খনিজ লবণের অভাব দেখা দেয়। ডাবের পানিতে পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং কিছুটা গ্লুকোজও থাকে। এসব রাসায়নিক পদার্থের সাথে কিছুটা সোডিয়ামও বিদ্যমান। অন্য কোনো পানীয়তে এত সব নেই। এজন্য ডায়রিয়া হলে ডাবের পানি অত্যন্ত উপকারী।

○ প্রশ্ন-৫৮. খাবার স্যালাইনে ব্যবহৃত চিনি/গুড় ও লবণের প্রয়োজন কি?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি ডায়রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে তার শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও বিভিন্ন ধরনের লবণ বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরে লবণ ও পানির অভাব দেখা দেয় এবং শরীর খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। লবণের এ ঘাটতি পূরণ করার জন্য খাবার স্যালাইনে কয়েকটি ধাতুর লবণ ব্যবহৃত হয়। আবার চিনি ও গুড় হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার, যা দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। যেহেতু ডায়রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, সেজন্য তার শরীরের শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিনি বা গুড় খাবার স্যালাইনের সাথে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৫৯. পেটে গ্যাস হলে কার্বন ট্যাবলেট সেবন করতে বলা হয় কেন?

উত্তর : পেটে গ্যাস হলে যদি কার্বন ট্যাবলেট সেবন করা হয় তাহলে ট্যাবলেট গ্যাসকে পানি ও কার্বন ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত করে। নিঃশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়ে যায় বলে রোগী আরাম বোধ করে।

○ প্রশ্ন-৬০. পাতলা পায়খানা হলে স্যালাইন খাওয়ানো হয় কেন?

উত্তর : ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা হলে ডিহাইড্রেশন হয় ও শরীরে ইলেকট্রোলাইটের পরিমাণ কমে যায়। তাই শরীরে পানি ও ইলেকট্রোলাইটের অভাব পূরণ করার জন্য স্যালাইন খাওয়ানো হয়। এতে দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা রক্ষা পায় এবং কোষের ভেতর ও বাইরের তরল পদার্থের চাপ ঠিক থাকে। স্যালাইন হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাশিয়াম ক্লোরাইড, ট্রাইসোডিয়াম সাইট্রেট, গ্লুকোজ ও পানি দিয়ে তৈরি। কলেরা বা ডায়রিয়ায় মারা যাওয়ার মূল কারণই হলো এ অবস্থায় রোগী পায়খানা ও বমির ফলে দ্রুত ইলেকট্রোলাইট হারাতে থাকে, যা খাবার স্যালাইন পূরণে সক্ষম।

○ প্রশ্ন-৬১. কলেরা রোগের কারণ ও প্রতিকার কি?

উত্তর : সাধারণত দূষিত খাবার গ্রহণের সময় মানুষ কলেরার জীবাণু গ্রহণ করে। মাছি এ রোগ বেশি ছড়ায়। টেট্রা সাইক্লিন এবং ওয়াল ফ্লুইড গ্রহণ করে এ রোগের প্রতিকার করা যায়। এ রোগ প্রতিরোধ করতে হলে কলেরা প্রতিরোধক টিকা নেয়া প্রয়োজন। আক্রান্ত রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে। রোগীর মলমূত্র মাটিতে পুতে রাখতে হবে ও পানি ফুটিয়ে খেতে হবে।

○ প্রশ্ন-৬২. আমাশয় কেন হয়?

উত্তর : অ্যান্টিঅ্যামিবা হিস্টোলাইটিকা নামক এক প্রকার প্রোটোজোয়া এবং সিগেলা নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়ে এ রোগ হয়। আমাশয় দুই ধরনের– অ্যামেবিক আমাশয় ও ব্যাসিলারি আমাশয়। এমবিকুইন এন্টারোভায়োফর্ম ও ফ্লাজিল অ্যামেবিক আমাশয়ের জন্য এবং সালফাগুয়ানিডিন, স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ব্যাসিলারি আমাশয়ের প্রতিকারের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ক্যান্সার, এইডস্ ও হেপাটাইটিসের প্রাথমিক ধারণা
Basic Concept of Cancer, AIDS and Hepatitis

○ প্রশ্ন-৬৩. ক্যান্সার কি?

উত্তর : অপ্রত্যাশিতভাবে দেহের কোনো নির্দিষ্ট অংশের কোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে, দ্রুতহারে, ক্রমাগত বিভাজনের (Cell division) ফলে যে জৈবনিক ক্রিয়াকলাপে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তাকে ক্যান্সার বলে। অর্থাৎ ক্যান্সার এমন এক ভয়াবহ ব্যাধি বা ব্যাধির সমষ্টি যার ফলে দেহের কোনো নির্দিষ্ট স্থানের কোষ কোনো কারণে স্বাভাবিক বিভাজন বা বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণে সাড়া দিতে অক্ষম হয় এবং ক্রমান্বয়ে বিভাজিত হয়ে অনেক কোষের সৃষ্টি করে পার্শ্ববর্তী কলাকে বিনষ্ট করে এবং আব বা টিউমার (Tumour)-এর আকারে স্ফিতি সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য, টিউমারের আশেপাশে পুষ্টির পর্যাপ্ত উপাদান থাকা পর্যন্ত এ বিভাজন চলতেই থাকে।

○ প্রশ্ন-৬৪. ব্লাড ক্যান্সার কি? এর কারণসমূহ উল্লেখ করুন।

উত্তর : ব্লাড ক্যান্সার : ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া রক্তের একটি অতি মারাত্মক রোগ, যেখানে রক্তকোষের অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে, যা অস্থিমজ্জা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বিস্তার লাভ করে। আমরা জানি, রক্তে তিন ধরনের কণিকা আছে– লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা। ব্লাড ক্যান্সারে যে কোনো ধরনের কণিকাই আক্রান্ত হতে পারে।

কারণসমূহ : ব্লাড ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে রক্তকোষ বিভাজনের সময় জিনগত ত্রুটি বা Mutation-এর ফলেই ক্যান্সারের উৎপত্তি। এ ত্রুটি বা Mutation-এর জন্য রেডিয়েশন (Radiation), বিভিন্ন কেমিক্যালস (যেমন– বেনজিন), ভাইরাস (যেমন– $HTLV_1$), ড্রাগস ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৬৫. ব্লাড ক্যান্সারে দেহের অভ্যন্তরে কিরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়?

উত্তর : সাধারণত অস্থিমজ্জায় অবস্থিত Stem cell বা আদিকোষ থেকে ব্লাড ক্যান্সার তৈরি হয়। ক্যান্সার আক্রান্ত কোষটি দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করে এবং অস্থিমজ্জার একটি বিরাট অংশ দখল করে নেয়। ফলে অন্যান্য কোষসমূহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। অস্বাভাবিক কণিকাসমূহ দ্রুত রক্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গে বিস্তার লাভ করে। এভাবে অল্প দিনেই ক্যান্সার সেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এতে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং কণিকাসমূহ দ্বারা রক্তনালী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। রোগী প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায়, বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়; লোহিত কণিকার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়, শরীর ফুলে যায়, ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে; অণুচক্রিকার সংখ্যা কমে গেলে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তক্ষরণ (যেমন– চোখে, নাকে, চামড়ার নিচে) হতে পারে।

○ প্রশ্ন-৬৬. ব্লাড ক্যান্সারের লক্ষণগুলো কি কি?

উত্তর : সাধারণত জ্বর, কাশি, শরীর ব্যথা করা (বিশেষ করে হাড় এবং জয়েন্টে), দুর্বলতা, রক্তক্ষরণ (নাক দিয়ে, চোখ দিয়ে বা মাসিকের মতো) ইত্যাদি উপসর্গেই রোগীরা বেশি ভোগে থাকে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন গ্রন্থিসমূহ ফুলে যেতে পারে, রক্তবমি হয় বা পায়খানার রাস্তা দিয়েও রক্ত যেতে পারে। প্রায় সব রোগীই রক্তশূন্যতায় ভোগে; তাই ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করে।

○ প্রশ্ন-৬৭. ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : লিউকোমিয়া সাধারণত দু ধরনের– একিউট (Acute) ও ক্রনিক (Chronic)। প্রথমটি দ্রুত প্রসারমান এবং সাধারণত ছোটদের বেশি হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি ধীরগতিতে প্রসারমান ও বড়দের বেশি হয়।

ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা ও করণীয় : রক্তের PBHF এবং Bone marrow পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজেই ব্লাড ক্যান্সার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্লাড ক্যান্সারের প্রায় সব চিকিৎসা সম্ভব এবং অত্যন্ত সফলভাবে চালু আছে। চিকিৎসা সাধারণত দু ধরনের। যথা– ১. ক্যান্সার কোষ নির্মূল করার চিকিৎসা; যেমন– কেমোথেরাপি, অস্থিমজ্জা ও রক্তকোষ প্রতিস্থাপন, ২. উপসর্গসমূহের চিকিৎসা; যেমন– রক্ত পরিসঞ্চালন, বিভিন্ন প্রকার ইনফেকশন দূর করা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা।

○ প্রশ্ন-৬৮. এইডস কি? এইডস কিভাবে ছড়ায় সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : এইডস : মানবদেহে এইচআইভি (HIV) সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। HIV (Human Immunodeficiency Virus)-এর আক্রমণে মানবদেহে এইডস (AIDS) রোগ হয়। AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) জন্মগত কোনো রোগ নয়। HIV এক ধরনের রেট্রো (Retro) ভাইরাস যা নির্দিষ্ট কয়েকটি উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়। ফলে আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্যান্য রোগে (যেমন : নিউমোনিয়া, যক্ষা, ডায়রিয়া ইত্যাদি) আক্রান্ত হয় এবং কোনো চিকিৎসাতেই এ রোগ ভালো হয় না। ফলে রোগীর একমাত্র পরিণতি মৃত্যু।

যেভাবে এইচআইভি/এইডস ছড়ায় :

ক. আক্রান্ত পুরুষ অথবা মহিলার সাথে অরক্ষিত যৌন মিলনের মাধ্যমে।
খ. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত শরীরে গ্রহণের মাধ্যমে।
গ. আক্রান্ত ব্যক্তির সিরিঞ্জ, রেজার, ব্লেড বা ক্ষুর জীবাণুমুক্ত না করে পুনরায় ব্যবহার করলে।
ঘ. আক্রান্ত মা থেকে গর্ভাবস্থায়, প্রসবকালে অথবা বুকের দুধের মাধ্যমে শিশুর শরীরে।

○ প্রশ্ন-৬৯. এইডস-এর লক্ষণ ও প্রতিরোধ সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : এইডস হচ্ছে এক ধরনের ভয়াবহ ব্যাধি। এ রোগের চিকিৎসা নেই। একবার এইডস হলে তার মৃত্যুই অনিবার্য। এ রোগের উৎপত্তি মূলত আফ্রিকা থেকে।

এইডস-এর লক্ষণ :

ক. মাঝে মাঝে জ্বর, মাথাব্যথা ও দৃষ্টি শক্তিহানি।
খ. গলা, বগল ও কুচকীর ব্যথাহীন গ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
গ. শুকনো কাশি, নিঃশ্বাসে কষ্ট, গলাব্যথা বিশেষ করে খাবার সময়ে।
ঘ. মুখের ভেতর, জিভে ও ঠোঁটে সাদা পর্দা পড়া।
ঙ. সীমাহীন দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তিহীনতা।
চ. অনিদ্রা, রাতে গা ঘামা ও ওজন হ্রাস।
ছ. হজম শক্তি কমে যাওয়া।
জ. পিঠে মুখে গলায় ফুসকুড়ি, চামড়ায় বিভিন্ন স্থানে লালচে দাগ; কোনো ব্যথা নেই কিন্তু ভেতরটা শক্ত এবং দেখতে বিশ্রী।

প্রতিরোধ :

ক. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা।
খ. বহুগামীতা ও পতিতালয়ে যাতায়াত পরিহার করা। যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে কনডম ব্যবহার করা।
গ. রক্ত, রক্তজাত দ্রব্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গ্রহণের পূর্বে HIV/AIDS পরীক্ষা করে নেয়া।
ঘ. একবার ব্যবহারযোগ্য সিরিঞ্জ (ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ), নতুন ব্লেড ব্যবহার করা অথবা ব্যবহারের পূর্বে ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, রেজার, ক্ষুর জীবাণুমুক্ত করে নেয়া।
ঙ. এইডস আক্রান্ত মায়ের দ্বারা তার শিশুর সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কাজেই আক্রান্ত হলে গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্ন-৭০. এইচআইভি কাকে বলে? এটি দেহের কি ক্ষতি করে এবং শেষ পর্যন্ত কি রোগ হয়?

উত্তর : এইচআইভি (HIV) : 'Human Immunodeficiency Virus' নামটির সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে HIV (এইচআইভি)।

এটি এমন এক বিশেষ প্রজাতির ভাইরাস যা শরীরে প্রবেশ করলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শরীরে বিভিন্ন ধরনের ব্যাধির সৃষ্টি হয়। এর ফলে শরীরে তৈরি হয় এইডস (AIDS) নামক এক ভয়ংকর রোগ যার শেষ পরিণতি মৃত্যু।

প্রশ্ন-৭১. হেপাটাইটিস কি?

উত্তর : যকৃতের আরেক নাম হেপাটিক; যকৃতের প্রদাহকে হেপাটাইটিস বলা হয়। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস অথবা অ্যান্টিবাইটের আক্রমণে যকৃতের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে হেপাটাইটিস বলে। হেপাটাইটিস-বি অত্যন্ত মারাত্মক। এ রোগে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

প্রশ্ন-৭২. হেপাটাইটিসের কারণগুলো কি কি?

উত্তর : হেপাটাইটিসের কারণগুলো হলো :

ভাইরাসজনিত : হেপাটাইটিস এ ভাইরাস; হেপাটাইটিস বি ভাইরাস; হেপাটাইটিস সি ভাইরাস; হেপাটাইটিস ডি ভাইরাস; হেপাটাইটিস ই ভাইরাস; সাইটোমোলো ভাইরাস ও হার্পিস ভাইরাস।

অ্যালকোহল : কিছু ওষুধ, যেমন– যক্ষ্মার ওষুধ।

প্রশ্ন-৭৩. কোন হেপাটাইটিস সবচেয়ে ক্ষতিকর?

উত্তর : হেপাটাইটিস সি।

প্রশ্ন-৭৪. কোন হেপাটাইটিস যৌনবাহিত?

উত্তর : হেপাটাইটিস বি ও হেপাটাইটিস সি।

প্রশ্ন-৭৫. হেপাটাইটিস কি কারণে হয়? দায়ী জীবাণু কত রকমের হয়? কোন জীবাণুগুলো রক্তের মাধ্যমে এবং কোনগুলো খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়? ৪

উত্তর : হেপাটাইটিসের কারণ : হেপাটাইটিস প্রধানত কয়েকটি প্রজাতির হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট যকৃতে (Liver) ইনফেকশনের কারণে হয়ে থাকে। আবার কোনো কারণে যকৃতের কোষগুলো অতিরিক্ত পরিমাণে ভাঙতে থাকলে হেপাটাইটিস দেখা দেয়। যেমন– অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিক সেবন, অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন ও ম্যালেরিয়া জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে যকৃতের কোষগুলোর অতিমাত্রায় ভাঙ্গনের ফলে হেপাটাইটিস সৃষ্টি হয়। এছাড়াও কোনো কারণে পিত্তনালী অবরুদ্ধ বা বন্ধ হয়ে গেলেও অবস্ট্রাক্টিক (Obstructive) হেপাটাইটিস দেখা দেয়।

হেপাটাইটিসের জন্য দায়ী জীবাণু : হেপাটাইটিস প্রধানত পাঁচ প্রকারের হেপাটাইটিস ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। যথা : হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, হেপাটাইটিস-ডি ও হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস। এছাড়াও সাইটোমোলা ভাইরাস ও হার্পিস ভাইরাসের কারণেও হেপাটাইটিস হয়ে থাকে।

রক্তের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস : হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি ভাইরাস রক্তের মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

খাদ্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হেপাটাইটিস ভাইরাস : হেপাটাইটিস-এ, হেপাটাইটিস-ই ভাইরাস খাবার ও পানির মাধ্যমে সংক্রমণ ঘটায়।

চোখের ছানি
Cataract

প্রশ্ন-৭৬. অন্ধত্ব কি? অন্ধত্বের লক্ষণগুলো কি কি?

উত্তর : অন্ধত্ব : যে কোনো কারণে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে প্রথমে রোগী ঝাপসা দেখে পরে কোনো এক সময় একেবারেই দেখতে পায় না এ অবস্থাকে আমরা অন্ধত্ব বলি।

অন্ধত্বের লক্ষণ : চোখের ছানি পড়লে যে সব লক্ষণ বা উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলো হলো– (১) প্রথমে চোখে ঝাপসা দেখা (২) দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া (৩) অল্প আলোতে দেখতে না পাওয়া (৪) দূরে কুয়াশার মত দেখা (৫) অনেক সময় একটি জিনিসকে দুটি হিসেবে দেখা ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৭৭. ক্যাটারাক্ট বা চোখের ছানি কি? এর কারণগুলো লিখুন।

উত্তর : কোনো কারণে চোখের লেন্স অস্বচ্ছ হয়ে গেলে তাকে ক্যাটারাক্ট বা চোখের ছানি পড়া বলা হয়।

চোখে ছানি পড়ার কারণ :

i. ছানি পড়ার প্রধান কারণ হলো বার্ধক্য;
ii. চোখে কোনো আঘাত পেলে;
iii. ডায়াবেটিস রোগ থাকলে;
iv. জন্মগত কোনো কারণে;

ফুডপয়জনিং
Food Poisoning

প্রশ্ন-৭৮. ফুড পয়জনিং কি?

উত্তর : ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নিঃসৃত বিষাক্ত দ্রব্য, রাসায়নিক বিষাক্ত দ্রব্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে উপস্থিত বিষাক্ত উপাদান দ্বারা আক্রান্ত খাবার খেলে অন্ত্রে যে প্রদাহ, অস্বাভাবিক অনুভূতি ও বিপদসংকুল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে ফুড পয়জনিং বলে।

প্রশ্ন-৭৯. ফুড পয়জনিং কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : ফুড পয়জনিং দুই প্রকার। যেমন—

i. ফুড ইনফেকশন এবং
ii. ফুড ইনটক্সিকেশন।

সংক্রমণ
Infection

প্রশ্ন-৮০. সংক্রামক কি?

উত্তর : মানবদেহে রোগ জীবাণু প্রবেশ করে তার বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টি করাকেই সংক্রামক বলা হয়।

প্রশ্ন-৮১. সংক্রামক রোগ কি?

উত্তর : যে সকল রোগ জীবাণু, বায়ু, পানি বা অন্য কোনো মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে তার বৃদ্ধি ও রোগ সৃষ্টি করে তাদের সংক্রামক রোগ বলে। যেমন— কলেরা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৮২. ছোঁয়াচে রোগ কি?

উত্তর : যে সকল রোগের বিস্তার রোগীর সংস্পর্শে বা ছোঁয়ায় অন্য মানবদেহে সহজেই বিস্তার লাভ করে তাদের ছোঁয়াচে রোগ বলে। যেমন— যক্ষ্মা, বসন্ত ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৮৩. কোন কোন সংক্রামক রোগ সাধারণত একবারের বেশি হয় না?

উত্তর : হাম, বসন্ত, পীতজ্বর প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সাধারণত একবারের বেশি হয় না। কারণ এসব রোগের জীবাণুর আক্রমণে কোনো রোগ হলে শরীরের মধ্যে এদের এন্টিবডি তৈরি হয় এবং পরবর্তীতে রোগ প্রতিরোধ করে। আস্তে আস্তে এ এন্টিবডিসমূহ কমে গেলেও বিশেষ বিশেষ রোগের এন্টিজেনের সান্নিধ্যে আবার বেড়ে ওঠে যাকে বুস্টার প্রতিক্রিয়া বলে।

প্রশ্ন-৮৪. যক্ষ্মা রোগের লক্ষণ ও প্রতিকারগুলো কি কি?

উত্তর : যক্ষ্মা একটি পরিচিত ছোঁয়াচে রোগ। যে কোনো লোক যে কোনো সময় এ রোগে সংক্রমিত হতে পারে। যারা অধিক পরিশ্রম করে, দুর্বল স্যাঁতস্যাঁতে বা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করে এবং অপুষ্টিতে ভোগে বা যক্ষ্মা রোগীর সাথে বাস করে তারা এ রোগের শিকার হয়ে থাকে।

লক্ষণ :

১. দেহের ওজন কমতে থাকে এবং আস্তে আস্তে শরীর দুর্বল হতে থাকে।
২. খুসখুসে কাশি হয় এবং কখনও কাশির সাথে রক্ত পড়তে দেখা যায়।
৩. রাতে শরীরে ঘাম হয় এবং বিকেলের দিকে অল্প জ্বর হয়।
৪. বুকে বা পিঠে ব্যথা হয়।
৫. ভালো খাবার খেলেও শরীরে শক্তি পাওয়া যায় না।
৬. পেটের অসুখ দেখা দেয়।

প্রতিকার :

১. শিশুদের বিসিজি টিকা দিতে হবে।
২. পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে।
৩. যক্ষ্মার চিকিৎসা দ্রুত শুরু করতে হবে।
৪. যক্ষ্মা রোগী থেকে আলাদা থাকতে হবে।
৫. যক্ষ্মা রোগীকে পৃথক রাখতে হবে।
৬. রোগীর কফ, থুথু মাটিতে পুঁতে ফেলা দরকার।
৭. হাঁচি বা কাশির সময় মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে নিতে হবে।

প্রশ্ন-৮৫. ব্রঙ্কাইটিসের লক্ষণ ও প্রতিকারগুলো আলোচনা করুন।

উত্তর : শ্বাসনালীর সংক্রমণকে ব্রঙ্কাইটিস বলে। এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ধূলিকণা মিশ্রিত আবহাওয়া, ঠাণ্ডা লাগা এবং ধূমপান থেকে এ রোগ হতে পারে।

লক্ষণ :

১. কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয়।
২. কাশির সাথে কফ থাকে।
৩. জ্বর হয়।
৪. শরীর ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়।

প্রতিকার :

১. ধূমপান বন্ধ করতে হবে।
২. ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

প্রশ্ন-৮৬. হাঁপানি কি? এর কারণ, লক্ষণ ও প্রতিকার উল্লেখ করুন।

উত্তর : এটি ফুসফুসঘটিত একটি কষ্টদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী রোগ। এতে মাঝে মাঝে কাশি ও শ্বাসকষ্ট রোগীকে অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়। ফুসফুসে অবস্থিত শ্বাসনালীতে বাধা সৃষ্টির ফলে এ রোগ হয়।

কারণ : এলার্জি আছে এমন কোনো জিনিস খেলে, বাতাসে উপস্থিত ধোঁয়া ও ধুলা প্রশ্বাসের সাথে ফুসফুসে প্রবেশ করলে হাঁপানি হতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণ সর্দি থেকে হাঁপানি হতে পারে।

লক্ষণ :

১. হঠাৎ শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. শ্বাসকষ্টে দম বন্ধ হওয়ার মতো হয়।
৩. জোরে জোরে শ্বাস নেয়ার চেষ্টা করে।
৪. ফুসফুসের বায়ুথলিতে ঠিকমতো অক্সিজেন সরবরাহ হয় না বলে বেশি কষ্ট হয়।
৫. শ্বাস নেয়ার সময় রোগীর পাঁজরের মাঝের চামড়া ভেতর দিকে ঢুকে যায়।
৬. কাশির সাথে কখনও কখনও সাদা কফ বের হয়।
৭. জ্বর থাকে না।
৮. রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রতিকার :

১. পরিষ্কার মুক্ত বাতাসে থাকার চেষ্টা করা।
২. যে জিনিসের সংস্পর্শে আসলে বা খেলে হাঁপানি বাড়ে তা থেকে বিরত থাকা।
৩. ডাক্তারের পরামর্শ মতো চলা।
৪. ধোঁয়া, ধুলা ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা।
৫. ধূমপান ছেড়ে দেয়া।

প্রশ্ন-৮৭. জন্ডিস কি? এর লক্ষণ ও প্রতিকার কি হতে পারে?

উত্তর : রক্তে বিলিরুবিনের পরিমাণ হলো প্রতি মিলি রক্তে ০.২ মিগ্রা থেকে ০.৮ মিগ্রা। এ পরিমাণ যখন বেড়ে যায় তখন শরীর ও চোখ হলুদ বর্ণ ধারণ করে, যা জন্ডিস নামে পরিচিত।

লক্ষণ :

১. শরীর ম্যাজম্যাজ করা,
২. মাথা ব্যথা করা এবং শীত শীত ভাব অনুভব করা,
৩. হঠাৎ করে বমি বমি ভাব অনুভব করা,
৪. ক্ষুধামন্দা হওয়া এবং দুর্বলতা অনুভব করা,
৫. বমি ও পাতলা পায়খানা হওয়া এবং পায়খানার রং সাদাটে হওয়া,
৬. যথেষ্ট পানি পান করা সত্ত্বেও চোখ, ত্বক ও প্রস্রাব হলুদ বর্ণের হওয়া,
৭. ডান দিকের পাঁজরের নিচে ব্যথা হওয়া,
৮. লিভার বড় হয়ে যাওয়া।

প্রতিকার : জন্ডিসের কোনো ওষুধ নেই। জন্ডিসের রোগীকে বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করা যায়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম জন্ডিস নিরাময়ের একমাত্র ব্যবস্থা।

প্রশ্ন-৮৮. অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগ কি?

উত্তর : মানুষের পরিপাকতন্ত্রে অবস্থিত বৃহদান্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মাঝে অ্যাপেন্ডিক্স নামে একটি বড় সিকাম রয়েছে। কোনো কারণে এটি ক্ষতিগ্রস্ত অথবা পচে দৈহিক বৈকল্য দেখা দিলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় তাকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস রোগ বলে।

প্রশ্ন-৮৯. গলগণ্ড রোগ কেন হয়?

উত্তর : আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড রোগ হয়। এটি অনেক স্থানে ঘ্যাগ নামেও পরিচিত। গলার থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যাওয়া এ রোগের প্রধান লক্ষণ। আমাদের দেশের প্রায় ৫% লোক এ রোগে আক্রান্ত।

প্রশ্ন-৯০. আলসার কেন হয়?

উত্তর : আলসার এক ধরনের ঘা। পাকস্থলীর অভ্যন্তরস্থ ঝিল্লিতে এ ধরনের ঘা হলে তাকে গ্যাস্ট্রিক আলসার এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিতে এ ধরনের ঘা হলে তাকে ডিওডেনাল আলসার বলে। এ দুই ধরনের আলসারকে একত্রে পেপটিক আলসার বলে। অতিরিক্ত এসিড ক্ষরণ এবং মানসিক আবেগের জন্য এটা হতে পারে।

প্রশ্ন-৯১. রিকেট রোগ কি?

উত্তর : এটি হচ্ছে ভিটামিন D-এর অভাবজনিত একটি শিশু রোগ। এ রোগের ফলে হাড় বেঁকে যায় ও পেট ফুলে ওঠে। শিশুরা খুব দুর্বল হয়ে পড়ে ও আকারে ছোট হয়ে যায়। সাধারণত ২-৩ বছরের শিশুদের দৈহিক বৃদ্ধিকালীন সময়ে এ রোগ দেখা যায়।

প্রশ্ন-৯২. পিঁপড়া বাত বা Urticaria কি?

উত্তর : এলার্জিজনিত বা ওষুধের কারণে বিশেষ বিশেষ খাবার গ্রহণ করলে শরীরে যে সংবেদনশীলতা দেখা দেয় তাই পিঁপড়া বাত। এর কারণে শরীরের জায়গায় জায়গায় ফুলে চাকা চাকা হয়ে যায়।

প্রশ্ন-৯৩. লিভার সিরোসিস কি?

উত্তর : এটি যকৃতের একটি রোগ, যা যকৃতের ভিজা ও নরম কোষে ক্ষত সৃষ্টির মাধ্যমে হয়। এ রোগের কারণে যকৃত অকেজো হয়ে যায়। অতিরিক্তি মদ্যপান, বিষাক্ত ধোঁয়া এ রোগের কারণ হতে পারে।

প্রশ্ন-৯৪. ল্যাথারিজম কি?

উত্তর : এটি পায়ের রোগ। এ রোগে আক্রান্ত হলে মানুষের পা অচল হয়ে যায়। অতিরিক্ত খেসারির ডাল গ্রহণ এ রোগের কারণ।

প্রশ্ন-৯৫. বসন্ত রোগের উপসর্গ ও প্রতিষেধক কি?

উত্তর : বসন্ত ভাইরাসজনিত রোগ। বাতাসের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। এ রোগ অতিশয় সংক্রামক এবং সাধারণত মহামারিরূপে দেখা যায়। বসন্ত রোগে আক্রান্ত রোগীর কপালে, নাকে, হাতে-পায়ে গুটি ওঠে। বুকে পিঠেও সামান্য গুটি দেখা যায়। এ রোগে খুব জ্বর এবং শরীর ব্যথাযুক্ত হয়। বসন্ত রোগের প্রতিষেধক হিসেবে টিকা দেয়া হয়। একবার টিকায় না সারলে বারবার টিকা দিতে হয়।

প্রশ্ন-৯৬. ম্যাড কাউ ডিজিজ কি?

উত্তর : ম্যাড কাউ ডিজিজ বা পাগলা গরু রোগ গরুর মাংসের মাধ্যমে মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। কিছুদিন আগে এ রোগ ইউরোপ মহাদেশে এক আতঙ্কময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ কারণে ইউরোপ থেকে অনেক দেশে গরু আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এ রোগাক্রান্ত গরুর মাংস খেলে মানুষের মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রে গোলযোগ দেখা দেয়। তবে খাওয়ার সাথে সাথেই এ রোগ দেখা দেয় না, বেশ কয়েক বছর পর রোগ দেখা দেয়।

প্রশ্ন-৯৭. জলবসন্ত কি ধরনের রোগ?

উত্তর : জলবসন্ত ভাইরাসজনিত একটি সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগ সাধারণত শিশু-কিশোরদের মধ্যে মহামারী আকারে দেখা যায়। এ রোগে পিছনের স্নায়ুমূল এবং স্নায়ুগুটিকাতে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং আক্রান্ত স্নায়ু কর্তৃক সরবরাহকৃত ত্বকে পানিপূর্ণ ফোস্কা সৃষ্টি হয়। জলবসন্ত রোগে গায়ে ফোস্কা উঠার আগে জ্বর থাকে এবং গা ম্যাজ ম্যাজ করে। ফোস্কা ওঠার পরেও জ্বর থাকে এবং ফোস্কাসমূহ ঝাঁকে ঝাঁকে উঠতে থাকে।

প্রশ্ন-৯৮. ডিপথেরিয়া কি?

উত্তর : জীবাণুঘটিত একটি অতি পরিচিত সংক্রামক ব্যাধি হলো ডিপথেরিয়া। এ রোগের জীবাণু সাধারণত শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে ত্বকের উপরেও বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এটি শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর আপাত পর্দার মতো প্রসারণশীল পুঁজ জাতীয় পর্দা তৈরি করে, যা কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালী বন্ধ করতে পারে। আগে এ রোগের বিস্তার ছিল পৃথিবী জুড়ে, কিন্তু ডিপথেরিয়া টক্সয়েড দ্বারা সর্বজনীন টিকাদান কর্মসূচির ফলে আজকাল এ রোগের প্রকোপ অনেক কমে গেছে।

প্রশ্ন-৯৯. আলঝাইমার কি ধরনের রোগ?

উত্তর : অজ্ঞাত কারণে সংঘটিত প্রাক-বার্ধক্যকালীন স্নায়ুরোগ হলো আলঝাইমার। এর ফলে রোগীর স্মৃতিশক্তি এবং চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায় এবং রোগী নানারকম অস্বাভাবিক আচরণ করে। এ রোগ ৬৫ বছরের আগে শুরু হলে তাকে আলঝাইমার ব্যাধি (Alzheimer's disease) এবং ৬৫ বছরের পর শুরু হলে তাকে 'আলঝাইমার জাতীয় বুদ্ধিভ্রংশতা' বলা হয়।

এ রোগে আক্রান্ত রোগী প্রথমদিকে ভুলো মনের হয়। এরপর স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে থাকে এবং স্বাভাবিক আচার-আচরণ হ্রাস পেতে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এ রোগ হলেও এটি সরাসরি বার্ধক্যজনিত রোগ নয়। এ রোগের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই।

প্রশ্ন-১০০. এলার্জি কাকে বলে?

উত্তর : কোনো কোনো পদার্থ বিশেষ করে প্রোটিন জাতীয় পদার্থের প্রতি শরীরের অস্বাভাবিক সংবেদনশীলতাকে এলার্জি বলে। ত্বক বা গাত্রচর্মের উপর চক্রাকারে লালাভ স্ফীতি, কোনো বিশেষ ইনজেকশনের প্রতিক্রিয়া এবং বিশেষ ধরনের হাঁপানি এলার্জিরূপে মানুষের শরীরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন-১০১. হিমোফিলিয়া (Heamophillia) কি?

উত্তর : এটি এক প্রকার Sex Linked রোগ। এ রোগের বাহক হচ্ছে নারীরা কিন্তু এর ক্ষতির শিকার পুরুষরা। এক্ষেত্রে রক্ত জমাট বাঁধতে বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয়।

প্রকারভেদ :

১. হিমোফিলিয়া — A (85%) Factor-VIII অনুপস্থিত থাকলে।
২. হিমোফিলিয়া — B (15%) Factor-IX অনুপস্থিত থাকলে।

প্রশ্ন-১০২. স্কার্ভি কি?

উত্তর : এটি এমন একটি রোগ, যা ভিটামিন 'সি'র অভাবে হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১. নাক, মুখ, চোয়াল দিয়ে রক্ত পড়া।
২. মাংসপেশি দুর্বল হওয়া।
৩. মাড়ি ফুলে যায়, ব্যথা হয়।
৫. ক্ষত সহজে ভালো হয় না।
৬. দাঁত পড়ে যায়।
৭. হাড়ের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।
৮. Micro-organism-এর আক্রমণ বেশি হয়।

প্রশ্ন-১০৩. Rabies বা জলাতঙ্ক রোগ কি?

উত্তর : Rabies Virus এ রোগের জন্য দায়ী। Rabied প্রাণী যারা Rabies Virus ধারণ করে তাদের কামড়ে এ রোগ হয়। যেমন– কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি।

বৈশিষ্ট্য : জ্বর, ক্ষুধামন্দা, অনুভূতিহীনতা, দ্বিধাদ্বন্দ্বতা, মুখে লালা আসা, ব্যথাময় পেশির সংকোচন, পানির প্রতি ভয় ইত্যাদি।

প্রতিকারসমূহ : ৫টি টিকা দেয়া হয় যথাক্রমে ০, ৩, ৭, ১৪, ২৮ দিনে। কিন্তু বাংলাদেশে ১৪ দিনে ১৪টি টিকা দেয়া হয়।

○ প্রশ্ন-১০৪. আর্সেনিকোসিস রোগ কি এবং এর লক্ষণগুলো কি কি?

উত্তর : আর্সেনিক দূষিত পানি পান করলে বা শরীরে আর্সেনিকের দূষণ ঘটলে তাৎক্ষণিক ক্ষতি না হলেও পরবর্তীতে নানা ধরনের রোগের উপসর্গ দেখা যায়। একে আর্সেনিকোসিস বলে। এর ফলে মানুষের–

১. গায়ের চামড়ায় বাদামি বা কালো রংয়ের দাগ দেখা দেয়।
২. হাত ও পায়ের তালু খসখসে হয় এবং ফুসকুড়ির মতো ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়।
৩. হাতে পায়ে লাল ছোপ এবং কুষ্ঠের মতো ঘা হয়।
৪. জন্ডিস দেখা দেয় এবং কিডনির কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।
৫. পেটে যন্ত্রণা হয় এবং বমি বা রক্তবমি হয়।

○ প্রশ্ন-১০৫. পাইয়োরিয়া ও ফাইলেরিয়ার মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : পাইয়োরিয়া হচ্ছে দন্তরোগ। এ রোগের ফলে দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় এবং পুঁজ পড়ে। মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। দাঁত ব্রাশ করলে রক্ত ঝরে এবং পরিণামে দাঁত আলগা হয়ে যায়।

অপরপক্ষে নেমাটোড নামীয় সুতার মতো কীটের এক বা একাধিক প্রজাতির আক্রমণে ফাইলেরিয়া রোগ হয়। অনেকে মনে করেন এটা এক বিশেষ ধরনের মশা বা মাছি দ্বারা আক্রান্ত সংক্রমিত রোগ। এই রোগ হলে প্রচণ্ড জ্বর ও শরীরের গিট ফুলে যায় এবং প্রচণ্ড ব্যথা অনুভূত হয়।

○ প্রশ্ন-১০৬. গ্লুকোমা কি?

উত্তর : কোনো বিশেষ ত্রুটির জন্য অক্ষিগোলক থেকে জলীয় পদার্থ নির্গত হতে পারে না। এটি গ্লুকোমা। এ রোগ হলে চোখের ভেতরে চাপ বৃদ্ধি পায় এবং চোখ অন্ধত্বপ্রাপ্ত হতে পারে।

○ প্রশ্ন-১০৭. ব্লু বেবি কি?

উত্তর : যে শিশুর জন্মাবধি কোনো ত্রুটির জন্য হৃদযন্ত্র বা ফুসফুসে ধমনীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয় না, ফলে শিশুর শরীর নীল দেখায়। এজন্য তাকে ব্লু বেবি বলে।

○ প্রশ্ন-১০৮. স্মৃতিভ্রংশতা বা সিজোয়ফ্রেনিয়া কি?

উত্তর : মস্তিষ্কের অনেক রোগে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়ার অক্ষমতা দেখা যায়। ফলে রোগী অনেক কিছু ভুলে যায়। উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে পারে না, এমনকি সহজ হিসাব-নিকাশেও ভুল হয়ে যায়। এ রকম অবস্থাকে এক কথায় স্মৃতিভ্রংশতা বলা হয়। এ অবস্থায় রোগী অনেকটা কাল্পনিক জগতে বাস করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এমনিতেও স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দিতে পারে। 'আলজিমার ডিজিজ' ও মস্তিষ্কের অনেক রক্তনালী বন্ধ হলেও স্মৃতিভ্রংশতা দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-১০৯. Acromegaly কি?

উত্তর : যখন কোনো পূর্ণ বয়স্ক মানুষের গ্রোথ হরমোন বেশি কাজ করে তখন অতিরিক্ত ক্ষরণের ফলে মানুষ গরিলাদশায় (Acromegaly) উপনীত হয়।

কারণ : পিট্যুইটারি গ্রন্থির Tumour.

বৈশিষ্ট্য :

১. নিচের চোয়াল লম্বা হয়।
২. হাত-পা অতিরিক্ত লম্বা হয়।

৩. মাথা বড় হয়ে যায়।
৪. চামড়া মোটা হয়ে যায়।
৫. অতিরিক্ত ঘামানো।
৬. ঠোঁট মোটা হয়ে যায়।
৭. যকৃত, প্লীহা বড় হয়ে যায়।

○ প্রশ্ন-১১০. Cretinism কি?

উত্তর : থাইরয়েড হরমোনের কম কাজ করার জন্য শিশু-কিশোরদের যে রোগ হয় তাকে Cretinism বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১. লম্বা কম হয়।
২. নির্বোধ হয়ে থাকে।
৩. জিহ্বা বের হয়ে থাকা।
৪. ঠোঁট মোটা হয়ে যায়।
৫. মুখ দিয়ে লালা পড়া।
৬. মানসিক বৃদ্ধি হয় না।
৭. চামড়া খসখসে হয়ে যায়।

মাদকাসক্ত
Drug addiction

○ প্রশ্ন-১১১. মাদকাসক্তি কি? মানুষ কেন মাদকের প্রতি আসক্ত হয়?

উত্তর : মাদকসক্তি : যখন কোনো ব্যক্তি মাদক দ্রব্য সেবন ছাড়া চলতে পারে না অর্থাৎ এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন আমরা ঐ ব্যক্তির ঐ অবস্থাকে মাদকাসক্তি বলে থাকি।

মাদকের প্রতি আসক্তির কারণ :

মানুষ কেন মাদকাসক্ত হয় তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। এ সব কারণসমূহকে পরিবেশগত, সামাজিক, মানসিক, ওষুধ সংক্রান্ত ইত্যাদি শ্রেণিতে আওতাভুক্ত করা যায়। মানুষ যেসব সুনির্দিষ্ট কারণে মাদকদ্রব্য অপব্যবহার করে নেশাগ্রস্ত হয় সেগুলো হলো :

(১) মাদকদ্রব্যের প্রতি কৌতূহল (২) বন্ধু বান্ধব ও সঙ্গীদের প্রভাব(৩) নতুন অভিজ্ঞতা লাভের আশা (৪) সহজ আনন্দ লাভের বাসনা (৫) মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা (৬) নৈতিক শিক্ষার অভাব (৭) কৈশোর ও যৌবনের বেপরোয়া মনোভাব (৮) পরিবারে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার (৯) পারিবারিক কলহ ও অশান্তি (১০) বেকারত্ব, আর্থিক অনটন ও জীবনের প্রতি হতাশা (১১) মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞতা।

○ প্রশ্ন-১১২. মাদকদ্রব্য কি? মাদকদ্রব্য কোনগুলো ?

উত্তর : মাদকদ্রব্য : যে সব দ্রব্য সেবনে মানুষের শারীরিক ও মানসিক অবসন্নতা আনয়ন করে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্নায়ুর উত্তেজনা সৃষ্টি এবং ব্যথা উপশম করে তাই হলো মাদকদ্রব্য।

মাদকদ্রব্য কোনগুলো :

আমাদের দেশে সাধারণত গাঁজা, ভাং, চরস, আফিম, মরফিন, হেরোইন, কোকেন, মদ ইত্যাদি মাদকদ্রব্য হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া বিশ্বে কোকেন ও আফিম থেকে তৈরি পেথেড্রিন, থিরাইন, কোডেইন এবং বার্বিচুরেট ও এলএসডি থেকে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি মেথাডন, ডায়াজেপাম (সিডাক্সেন, রিলাক্সেন) তৈরি করা হচ্ছে। এর সঙ্গে আরও রয়েছে তরল অ্যালকোহল শ্রেণির মদ, যেমন- রাম, ভদকা, হুইস্কি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১১৩. মাদকাসক্তির কুফল এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় আলোচনা করুন।

উত্তর : মাদকাসক্তির কুফল :

মাদকদ্রব্য সেবনের ফলে মানুষের যে যে দিকে ক্ষতি হয় তা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো :

১. **মানসিক :** উত্তেজনা, চরম অবসাদ, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, অসংলগ্ন ব্যবহার, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়।

২. **শারীরিক :** ক্ষয় রোগ, রক্ত দূষণ, কর্মক্ষমতা হ্রাস, অনিদ্রা, পেটে ব্যথা, ক্ষুধা মন্দা, স্নায়বিক দুর্বলতা ইত্যাদি দেখা যায়।

৩. **সামাজিক :** জীবনের প্রতি হতাশা, কাজে অনীহা, পারিবারিক অশান্তি, অপরাধ প্রবণতা, সমাজের ঘৃণ্য ব্যক্তি হিসেবে গণ্য ইত্যাদি।

৪. **আর্থিক :** সর্বস্বান্ত পরিবার পরিজনকে অনটনে ফেলা, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি প্রবণতা বৃদ্ধি, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে হাত পাতা, শেষ বয়সে অতিকষ্টে ও নিঃসঙ্গ জীবনযাপন ইত্যাদি।

মাদকাসক্তি থেকে পরিত্রাণের উপায় :

১. নৈতিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রসার করা।
২. বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৩. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা রোধ করা।
৪. মাদকদ্রব্যের কুফল সবার কাছে তুলে ধরা।
৫. অসৎ বন্ধুদের নিকট থেকে দূরে থাকা।
৬. মাদকদ্রব্য আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।
৭. সমাজের মাদকদ্রব্যের প্রসাররোধে সামাজিকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা।
৮. কাহিনী, গল্পের আকারে মাদকদ্রব্য সেবনকারীর পরিণতি তুলে ধরা।
৯. মাদকাসক্তদের সমাজে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা।
১০. মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা।

প্রশ্ন-১১৪. বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোধে গৃহীত পদক্ষেপগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে মাদকাসক্তি রোধে গৃহীত পদক্ষেপ : ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ অধিদপ্তর ২ জানুয়ারি ১৯৯০ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। মহাপরিচালক হলেন এ অধিদপ্তরের প্রধান। দেশের মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধকল্পে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় চারটি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে। এ সব আঞ্চলিক অফিস ও অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য অপব্যবহার রোধে যথেষ্ট অবদান রাখছে। নিম্নে প্রধান প্রধান অবদান উল্লেখ করা হলো :

১. মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ সালে প্রবর্তন করে। এ আইনে বিভিন্ন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

২. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা ও চট্টগ্রামে ৪টি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে। ঢাকা কেন্দ্রে বহির্বিভাগ ও অন্তঃবিভাগ রয়েছে। বাকি তিনটিতে কেবল বহির্বিভাগ আছে।

৩. বাংলাদেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার নিরোধকল্পে গৃহীত মহাপরিকল্পনার প্রধান তিনটি অঙ্গ হলো— (ক) আইন প্রয়োগ এবং আইনগত সহায়তামূলক প্রকল্প (খ) নিরোধ শিক্ষা এবং তথ্য প্রকল্প এবং (গ) মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রকল্প।

খ স্বাস্থ্য পরিচর্যা
Healthcare

প্রশ্ন-১১৫. স্বাস্থ্য কি?

উত্তর : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর দেয়া সংজ্ঞানুসারে, 'স্বাস্থ্য হচ্ছে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আত্মিকভাবে সম্পূর্ণ ভালো থাকা কেবল রোগ বা অক্ষমতা থেকে মুক্তি নয়।'

প্রশ্ন-১১৬. বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যাগুলো হলো : —

ক. জনসংখ্যা সমস্যা,
খ. সংক্রামক ব্যাধি,
গ. অপুষ্টি,
ঘ. অপ্রতুল চিকিৎসা ব্যবস্থা ও
ঙ. অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

প্রশ্ন-১১৭. স্বাস্থ্য পরিচর্যা কি?

উত্তর : এটি স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা বহুমুখী স্বাস্থ্যসেবা, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১১৮. বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যায়গুলো কি কি?

উত্তর : বাংলাদেশে স্বাস্থ্য পরিচর্যার পর্যায়গুলো হলো : —

প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র : ইউনিয়ন সাব সেন্টার ও উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্র।
মাধ্যমিক বা সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র : জেলা হাসপাতালসমূহ।
চূড়ান্ত বা টারসিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র : মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসমূহ, বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহ।

প্রশ্ন-১১৯. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কি?

উত্তর : ১৯৭৮ সালে কাজাখস্তানের আলমাআতায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সম্মেলনে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার বিষয়টি পাদপ্রদীপের নিচে আসে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হচ্ছে অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা যা বিজ্ঞানসম্মত ও সামাজিকভাবে গৃহীত, যা ব্যক্তি এবং পরিবার সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পেতে পারে।

প্রশ্ন-১২০. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়সমূহ কি কি?

উত্তর : প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার বিষয়সমূহ হচ্ছে —

১. রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা;
২. খাদ্য ও পুষ্টির উন্নয়ন;
৩. পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;
৪. পরিবার পরিকল্পনাসহ মা ও শিশুর স্বাস্থ্য পরিচর্যা;
৫. সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ টিকা প্রদান;
৬. এনডেমিক রোগ প্রতিরোধ করা;
৭. সাধারণ রোগগুলোর সঠিক চিকিৎসা;
৮. প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা করা।

○ প্রশ্ন-১২১. মানুষের স্বাস্থ্য কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : একজন মানুষের স্বাস্থ্য যেসব বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা হলো : —

ক. বংশগতি;
খ. পরিবেশ প্রকৃতি;
গ. জীবনযাপনের ধরন;
ঘ. আর্থ-সামাজিক অবস্থা;
ঙ. স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ;
চ. শিক্ষা;
ছ. সামাজিক সচেতনতা।

জীবাণু প্রতিরোধক এবং জীবাণুনাশক
Antiseptic & Antibiotics

○ প্রশ্ন-১২২. এন্টিসেপটিক কি? উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এন্টিসেপটিকের নাম লিখুন।

উত্তর : এন্টিসেপটিক : যে সব বস্তু জীবাণুর বিস্তার ও বৃদ্ধিকে সীমিত করে অসংক্রামক অবস্থায় রাখে তাদের এন্টিসেপটিক বলে।

উল্লেখযোগ্য এন্টিসেপটিকের নাম—

i. ডেটল বা স্যাভলন
ii. এন্টিবায়োটিক ক্রিম।
iii. হাইড্রোজেন পারক্সাইড
iv. বিটা আয়োডিন
v. $KMnO_4$

○ প্রশ্ন-১২৩. এন্টিবায়োটিক কি?

উত্তর : এন্টিবায়োটিক হচ্ছে এক ধরনের জীবন্ত পদার্থ যার সামান্য পরিমাণও অন্য অণুজীবকে ধ্বংস করে বা বৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করতে সমর্থ হয়। বিভিন্ন জীব থেকে এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়। তবে বেশির ভাগই পাওয়া যায় ব্যাকটেরিয়া, স্ট্রেপটোমাইটিস ও মোল্ড জাতীয় ছত্রাক থেকে। এন্টিবায়োটিক উৎপাদনকারী অণুজীবের আবাসস্থল হচ্ছে মাটি।

○ প্রশ্ন-১২৪. অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ও ইমিউনিটি কি?

উত্তর : অ্যান্টিবডি রক্তে উৎপন্ন প্রতিরোধক পদার্থবিশেষ। দেহে যখন কোনো রোগজীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি প্রবেশ করে, তখন তাদের প্রতিহত করার জন্য লিম্ফোসাইট শ্বেত কণিকা থেকে এক প্রকার প্রোটিনজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। একে অ্যান্টিবডি বলে। অ্যান্টিবডি যেসব প্রোটিন কণাকে ধ্বংস করে বা যে প্রোটিনের প্রবেশের ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে। অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে প্রতিহত করার ক্ষমতাকে ইমিউনিটি বা অনাক্রমতা বলে।

○ প্রশ্ন-১২৫. ডিজইনফেক্ট্যান্ট এবং এ্যান্টিসেপটিক-এর মধ্যে প্রভেদ কি এবং এদের প্রয়োগস্থান কোথায়?

উত্তর : ডিজইনফেক্ট্যান্ট (Disinfectant) ও অ্যান্টিসেপটিকের (antiseptic) মধ্যকার পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো :

i. ডিজইনফেক্ট্যান্ট দ্বারা কোনো বস্তুকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করা যায়। এর দ্বারা জীবাণু ধ্বংসের হার শতকরা ৯৯.৯৯ ভাগ।

অপরদিকে, অ্যান্টিসেপটিক দেহে জীবাণু সংক্রমণের (infection) সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়ে দেয় কিন্তু দেহকে সম্পূর্ণরূপে জীবাণুমুক্ত করতে পারে না।

ii. ডিজইনফেক্ট্যান্ট শরীরের জীবন্ত কোষ ও টিস্যুতে প্রয়োগ করা যায় না। কারণ এটি জীবদেহের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কিন্তু অ্যান্টিসেপটিক তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকর হওয়ায় এটি শরীরের যে কোনো অংশে প্রয়োগ করা যায়।

iii. আয়োডিন দ্রবণ, তুঁতে, ওজোন ও ক্লোরিন গ্যাস ইত্যাদি হলো ডিজইনফেক্ট্যান্ট-এর উদাহরণ। অপরদিকে, ৭০% ইথানল দ্রবণ, ৩% হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্রবণ ইত্যাদি হলো অ্যান্টিসেপটিকের উদাহরণ।

প্রয়োগস্থান :

ডিজইনফেক্ট্যান্ট : যে কোনো প্রাণহীন বস্তুতে প্রয়োগ করা হয়।

অ্যান্টিসেপটিক : মানবদেহের ত্বকে অথবা যে কোনো প্রাণিদেহের ত্বকে প্রয়োগ করা যায়।

○ প্রশ্ন-১২৬. পেনিসিলিন কি এবং কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর : পেনিসিলিন একটি এন্টিবায়োটিক ওষুধ। এটি সাধারণত *Penicillium notatum* এবং *Penicillium chrygamum* নামক ছত্রাক থেকে উৎপাদন করা হয়। স্কটিশ জীবাণুবিদ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৯ সালে এটা আবিষ্কার করেন।

টিকাদান
Vaccination

○ প্রশ্ন-১২৭. Vaccine কি? ভ্যাক্সিন-এর প্রয়োগ লিখুন।

উত্তর : Vaccine (ভ্যাক্সিন) : আমাদের দেহের জীবাণুঘটিত প্রত্যেকটি রোগ একেকটি নির্দিষ্ট জীবাণু দ্বারা সংক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। কোনো একটি রোগের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট জীবাণুগুলোকে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এমন মাত্রায় দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয় যেন উক্ত জীবাণুগুলো আমাদের শরীরে প্রবেশ করলে কোনো রোগ সৃষ্টি করতে না পারে। এ দুর্বল ও প্রক্রিয়াজাত জীবাণুগুলোকে যখন আমাদের রক্তে তথা শরীরে প্রবেশ করানো হয় তখন এটি আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে জাগ্রত করে তোলে কিন্তু কোনো রোগ সৃষ্টি করে না। এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জাগ্রত হওয়ার কারণে উক্ত জীবাণুর বিরুদ্ধে এক ধরনের শক্তিশালী এন্টিবডি তৈরি হয় যা উক্ত জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। পরবর্তীতে উক্ত রোগের কোনো সক্রিয় জীবাণু যখন আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তখন পূর্বে সৃষ্ট ঐ এন্টিবডিগুলো রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে। ফলে কোনো রোগ সৃষ্টি হয় না। এভাবে কোনো রোগের জন্য দায়ী জীবাণুগুলোকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাত করে উক্ত রোগের বিরুদ্ধে আমাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলাকেই ভ্যাক্সিন বলা হয়।

○ প্রশ্ন-১২৮. Vaccination বলতে কি বোঝায়? বাংলাদেশে মানবদেহের জন্য প্রচলিত Vaccine গুলো কি কি?

উত্তর : সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সুনির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে অনুরূপ জীবাণু সম্ভাব্য সংক্রমণ রোধের প্রতিষেধক ব্যবস্থাকে Vaccination বা টিকাদান বলে।

বাংলাদেশে যে সকল টিকা দেয়া হয় তা হলো বিসিজি (যক্ষ্মা), ডিপিটি (ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার), মিজেলস (হাম), পোলিও। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি ও হেমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেরও টিকা প্রদান করা হয়। কলেরা রোগের টিকা পূর্বে প্রদান করা হলেও বর্তমানে এর বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো টিকা নেই।

○ প্রশ্ন-১২৯.. EPI কি?

উত্তর : EPI-এর পূর্ণরূপ হলো Expanded Programme on Immunization. ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে ৬টি মারাত্মক রোগ থেকে বিশ্বের সকল শিশুকে রক্ষার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বব্যাপী এই কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ ছয়টি রোগ হলো– ডিপথেরিয়া, হাম, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, পোলিও ও যক্ষ্মা। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে EPI কর্মসূচি চালু হয়।

○ প্রশ্ন-১৩০. শিশুদের মারাত্মক রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য কখন টিকা দিতে হয়?

উত্তর : শিশুদের মোট নয়টি মারাত্মক রোগের টিকা জন্মের পর এক বছরের মধ্যে দিতে হয়।

রোগের নাম	টিকার নাম	ডোজের মধ্যে বিরতি	টিকা শুরুর সঠিক সময়
যক্ষ্মা	বিসিজি	—	জন্মের পর থেকে
ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস-বি, হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি (হিব)	পেন্টাভালেন্ট ভ্যাকসিন (ডিপিটি হেপাটাইটিস-বি, হিব)	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ
পোলিও মাইলাইটিস	ওপিভি*	৪ সপ্তাহ	৬ সপ্তাহ
হাম ও রুবেলা	এমআর	—	৯ মাস পূর্ণ হলে
হাম	হামের টিকা	—	১৫ মাস বয়স পূর্ণ হলে

**১৪ সপ্তাহ বয়সে OPV'র সাথে ইনজেকশনের মাধ্যমে শিশুকে দেয়া হবে ১ ডোজ Inactivated Polio Vaccine (IPV)। এর ফলে শিশুকে আর ৯ মাস বয়সে পোলিও'র OPV'র চতুর্থ ডোজটি নিতে হবে না।*

○ প্রশ্ন-১৩১. গুটি বসন্তের টিকা কিভাবে তৈরি হয়?

উত্তর : গুটি বসন্তের টিকা তৈরির প্রক্রিয়া : গুটি বসন্ত দ্বারা আক্রান্ত কোনো প্রাণীর দেহ থেকে প্রথমে গুটি বসন্তের জন্য দায়ী নির্দিষ্ট প্রজাতির ভাইরাস সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে সংগৃহীত এই নির্দিষ্ট প্রজাতির ভাইরাসকে বিশেষভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গুটি বসন্তের টিকা তৈরি করা হয়।

এক্স-রে, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি
X-ray, Ultrasonography, CT Scan, MRI, ECG

○ প্রশ্ন-১৩২. x-ray কি? চিকিৎসাবিজ্ঞানে x-ray-এর গুরুত্ব কি?

উত্তর : এক্স-রে (X-ray) : দ্রুতগতিসম্পন্ন ইলেকট্রন কোনো ধাতব পদার্থের উপর পতিত হলে ধাতব পদার্থ হতে উচ্চ ভেদন ক্ষমতাসম্পন্ন যে বিকিরণ নির্গত হয় তাই এক্স-রে বা রঞ্জন রশ্মি। ১৮৯৫ সালে বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী উইলিয়াম রন্টজেন এক্স-রে আবিষ্কার করেন।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে X-ray-এর গুরুত্ব : আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে-এর ব্যবহার রোগ নির্ণয়ে ও চিকিৎসায় বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক্স-রে-এর গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. দাঁতের গোড়ায় ঘা, হাড় ভাঙার সমস্যা নির্ণয়ে ও অস্ত্রোপচারের পূর্বে ও পরে এক্স-রে-এর ব্যবহার অপরিহার্য।
২. শরীরের কোনো অংশের হাড় স্থানচ্যুত হলে, হাড় ভেঙে গেলে বা শরীরের কোনো অংশে অবাঞ্ছিত কোনো বস্তু প্রবেশ করলে এক্সরে-এর দ্বারা তা নির্ণয় করা যায়।
৩. আলসার, ক্যান্সার, টিউমার, যক্ষ্মা, কিডনির পাথর প্রভৃতি রোগ নির্ণয় এবং রোগের সঠিক চিকিৎসায় এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৩৩. আল্ট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography) কি? রোগ নির্ণয়ে এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : আল্ট্রাসনোগ্রাফি : আল্ট্রাসনোগ্রাফি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল। উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশি থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়।

রোগ নির্ণয়ে আল্ট্রাসনোগ্রাফির কার্যপ্রণালী : রোগ নির্ণয়ের জন্য যে আল্ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় সেই শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে। আল্ট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে ট্রান্সফিউসার নামক একটি স্ফটিককে বৈদ্যুতিকভাবে উত্তেজিত বা উদ্দীপিত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। আল্ট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে আল্ট্রাসনিক তরঙ্গগুলোকে একটি সরু বীম-এ পরিণত করা হয়। পরে এই বীমটিকে যে অঙ্গের প্রতিবিম্ব রেকর্ড করতে হবে তার দিকে প্রেরণ করা হয়। যে অঙ্গের দিকে এটি নির্দেশ করা হয় সেই তলের প্রকৃতি অনুযায়ী বীমটি প্রতিফলিত, শোষিত হয়। যখন বীমটি বিভিন্ন ঘনত্বের পেশির (যেমন- মাংসপেশি, রক্ত) বিভেদতলে আপতিত হয় তখন তরঙ্গের একটি অংশ প্রতিধ্বনি হিসাবে পুনরায় ট্রান্সফিউসারে ফিরে আসে। পরে এই প্রতিধ্বনিগুলোকে তড়িৎ সংকেতে রূপান্তরিত করা হয়। এই তড়িৎ সংকেতগুলো একত্রে মনিটরের পর্দায় পরীক্ষণীয় বস্তু বা পেশির একটি প্রতিবিম্ব গঠন করে।

○ প্রশ্ন-১৩৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানে আল্ট্রাসনোগ্রাফির ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : আল্ট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে লক্ষ করা যায়। এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার, পূর্ণতা, ভ্রূণের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়। প্রসূতিবিদ্যায় এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য কৌশল। আল্ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে জড়ায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের (Pelvic Mass) উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।

বিভিন্ন ধরনের ডাক্তারী পরীক্ষা যেমন— পিত্তপাথর, হৃদযন্ত্রের ত্রুটি এবং টিউমার শনাক্তকরণে আল্ট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৩৫. সিটি স্ক্যান (CT Scan) কি? এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : সিটি স্ক্যান : সিটি স্ক্যান শব্দটি ইংরেজি Computed Tomography Scan-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এক্স-রে ব্যবহারের মাধ্যমে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গের ত্রিমাত্রিক ইমেজ বা ছবি তৈরি করার পদ্ধতিকে সিটি স্ক্যান বলা হয়।

CT Scan (সিটি স্ক্যান)-এর কার্যপ্রণালী : এ পদ্ধতিতে প্রথমে এক্স-রে ব্যবহার করে দেহের অভ্যন্তরস্থ কোনো অঙ্গের অনেকগুলো দ্বিমাত্রিক ছবি তোলা হয়। পরবর্তীতে এ দ্বিমাত্রিক ছবিগুলোকে একত্রিত করে কম্পিউটারের সাহায্যে অঙ্গটির ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করা হয়। মস্তিষ্ক, যকৃত, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক, প্লীহা এবং দেহের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠনগত অস্বাভাবিকতা ও রোগ নির্ণয়ে সিটি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৩৬. টমোগ্রাফি কাকে বলে?

উত্তর : টমোগ্রাফি : যে প্রক্রিয়ায় কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তুর কোনো ফালি (slice) বা অংশের দ্বিমাত্রিক প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয় সে প্রক্রিয়াকে টমোগ্রাফি বলে।

○ প্রশ্ন-১৩৭. চিকিৎসা বিজ্ঞানে CT Scan এর ব্যবহার বর্ণনা করুন।

১. সিটিস্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনী, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির ত্রিমাত্রিক ছবি পাওয়া যায়। যকৃত, ফুসফুস এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার সনাক্ত করার কাজে সিটিস্ক্যান ব্যবহৃত হয়।
২. সিটিস্ক্যানের প্রতিবিম্ব চিকিৎসককে টিউমার সনাক্তকরণ, টিউমারের আকার, অবস্থান এবং টিউমারটি পার্শ্ববর্তী অন্য টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে তা নির্ধারণেও সাহায্যে করে।
৩. মাথার সিটিস্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতরে কোনো ধরনের রক্তপাত, ধমনীর ফুলা এবং টিউমারের উপস্থিতি সম্পর্কে জানা যায়।
৪. সিটিস্ক্যানের দ্বারা রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কিনা তাও জানা যায়।

প্রশ্ন-১৩৮. এমআরআই (MRI) কি? এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : এমআরআই : এমআরআই ইংরেজি Magnetic Resonance Imagine -এর সংক্ষিপ্তরূপ। এটি ব্যথাহীন এবং নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। এ যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়।

MRI-এর কার্যপ্রণালী : এই যন্ত্রে এক্সরে বা অন্য কোনো ধরনের বিকিরণ ব্যবহার করা হয় না। শরীরের যে অংশের এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেখান থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিবর্তিত করে সেই অংশের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব শরীরের কোনো স্থানের এক একটি ফালি বা স্লাইসের মতো কাজ করে। এভাবে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়, যেগুলো শরীরের ঐ অংশের সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে।

প্রশ্ন-১৩৯. চিকিৎসা বিজ্ঞানে MRI এর ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : এমআরআই হলো ব্যথাহীন এক নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি। নিম্নে এর ব্যবহার উল্লেখ করা হলো—

i পায়ের গোড়ালির মচকানো এবং পিঠের ব্যথায় এমআরআই ব্যবহার করে জখমের বা আঘাতের তীব্রতা নিরূপণ করা হয়।

ii. ব্রেন এবং মেরু রুজ্জুর (spinal card) বিস্তৃতি প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১৪০. ইসিজি (ECG) কি? ECG-এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন।

উত্তর : ইসিজি : ইসিজি হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসিজি এমন একটি রোগ নির্ণয় পদ্ধতি যার সাহায্যে নিয়মিতভাবে কোনো ব্যক্তির হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যায়।

ECG-এর কার্যপ্রণালী :

ECG শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত তড়িৎদ্বার বা ইলেকট্রোডসমূহ হৃদযন্ত্রের বিভিন্ন দিক থেকে আগত বৈদ্যুতিক সংকেতগুলোকে সনাক্ত করে। হৃৎপিণ্ডের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাবার জন্য দশটি ইলেকট্রোড ব্যবহার করে বারোটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে সনাক্ত করা হয়। প্রত্যেকটি হাতে এবং পায়ে একটি করে মোট চারটি এবং বাকি ছয়টি ইলেকট্রোড হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর বরাবর স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড দ্বারা সংগৃহীত তড়িৎ সংকেতকে রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ডসমূহের মুদ্রিত রূপই হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

প্রশ্ন-১৪১. ECG পরীক্ষা কেন করতে হয়?

উত্তর : সাধারণত কোনো রোগের বাহ্যিক লক্ষণ যেমন- বুকের ধড়ফড়ানি, অনিয়মিত ও দ্রুত হৃৎস্পন্দন, বুকে ব্যথা ইত্যাদির কারণ নির্ণয় করার জন্য ইসিজি পরীক্ষা করতে হয়। এছাড়াও নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ হিসেবে যেমন—অপারেশনের পূর্বে ইসিজির সাহায্যে নেওয়া হয়।

হৃৎপিণ্ডের যে সকল অস্বাভাবিক প্রকৃতি ইসিজির মাধ্যমে সনাক্ত করা যায় এগুলো হলো—

১. হার্ট অ্যাটাক যা সম্প্রতি বা কিছুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

২. সম্প্রসারিত হৃৎপিণ্ড অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে যাওয়া।

এনডোসকপি
Endoscopy

প্রশ্ন-১৪২. এনডোসকপি (Endoscopy) কি?

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবারের সাহায্যে শরীরের ভেতরে আলোক উৎস প্রবেশ করিয়ে গ্যাস্ট্রো ইনটেস্টিনাল ট্র্যাক্টে সরাসরি পর্যবেক্ষণকে এনডোসকপি বলে। ফাইব্রোটিক এনডোসকপি ব্যবহারের

মাধ্যমে আলোক উৎসের অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনকে কাজে লাগিয়ে পাকস্থলীর ঘা পর্যবেক্ষণ করা হয়। এক্স-রে রিপোর্ট সন্দেহজনক হলে গ্যাস্ট্রিক আলসার, পেপটিক আলসার, ডিউডেনাম আলসার, ক্যান্সার কোষ, অবাঞ্ছিত বস্তু অপসারণের পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে এনডোসকপি করা হয়।

প্রশ্ন-১৪৩. এনডোসকপির কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন।

উত্তর : এনডোসকপি যন্ত্রে দুটি নল থাকে, এদের একটির মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গে আলো প্রেরণ করা হয়। আলোক তন্তুর ভেতরের দেয়ালে আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে উজ্জ্বল আলো রোগীর দেহ গহ্বরে প্রবেশ করে। এ আলো রোগাক্রান্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গকে আলোকিত করে। দ্বিতীয় আলোক তন্তু নলের ভেতর দিয়ে আলোর প্রতিফলিত অংশ একইভাবে ফিরে আসে। প্রতিফলিত আলো অভিনেত্র লেন্সের মাধ্যমে চিকিৎসকের চোখে প্রবেশ করে। ফলে চিকিৎসক পরীক্ষণীয় অঙ্গের অভ্যন্তরে কী ঘটছে বা হচ্ছে তা দেখতে পারেন।

প্রশ্ন-১৪৪. মানবদেহের কোন কোন অঙ্গের পরীক্ষায় এনডোসকপি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : এনডোসকপির মাধ্যমে চিকিৎসকগণ শরীরের অভ্যন্তরে যে কোনো ধরনের অস্বস্তিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষবৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন অঙ্গ পরীক্ষা করার জন্য এডোসকপি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হলো— (ক) ফুসফুস, বুকের কেন্দ্রীয় বিভাজন অংশ; (খ) পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত বা কোলন; (গ) স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ; (ঘ) উদর এবং পেলভিস; (ঙ) মূত্রথলির অভ্যন্তরভাগ, (চ) নাসাগহ্বর এবং নাকের চারপাশের সাইনাসসমূহ; (ছ) কান।

প্রশ্ন-১৪৫. EEG কি? রোগ নির্ণয়ে EEG এর কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : EEG (ইইজি) : EEG-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Electroencephalography। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রম পরীক্ষার একটি পদ্ধতি হচ্ছে EEG।

EEG-এর কার্যপ্রণালী : এ পদ্ধতিতে ঘাড় ও মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় তড়িৎদ্বার স্থাপনের মাধ্যমে মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক কার্যক্রমকে গ্রাফ আকারে রেকর্ড করা হয়। মৃগী, স্ট্রোক প্রভৃতি রোগ নিরূপণ ও চিকিৎসায় EEG ব্যবহৃত হয়।

রেডিওথেরাপি ও কেমোথেরাপি
Radiotherapy and Chemotherapy

প্রশ্ন-১৪৬. রেডিওথেরাপি কি? কয় ধরনের ও কি কি?

উত্তর : রেডিওথেরাপি শব্দটি ইংরেজি 'Radiation Therapy' শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ যেমন— ক্যান্সার, থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিক প্রকৃতি, রক্তের কিছু ব্যাধির চিকিৎসা করা হয়। সাধারণত রেডিওথেরাপি উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে। এটি টিউমার কোষের অভ্যন্তরস্থ ডিএনএ (DNA)-কে ধ্বংসের মাধ্যমে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলে। মূলত এটি হলো কোনো রোগের চিকিৎসায় আয়নসৃষ্টিকারী (তেজস্ক্রিয়) বিকিরণের ব্যবহার।

রেডিওথেরাপি দুই ধরনের : (১) বাহ্যিক বীম বিকিরণ ও বাহ্যিক রেডিওথেরাপি (২) অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি।

প্রশ্ন-১৪৭. বাহ্যিক রেডিওথেরাপি এবং অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : বাহ্যিক রেডিওথেরাপি : বাহ্যিক রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে শরীরের বাহির থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক্সরে, কোবাল্ট বিকিরণ, ইলেকট্রন বা প্রোটন বীম ব্যবহার করা হয়। শরীরের যে স্থানে টিউমারটি অবস্থিত, সেদিকে তাক করে বীমটি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে ক্যান্সার কোষের বৃদ্ধি এবং বিভাজন

ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়ায় অল্প সংখ্যক সুস্থ কোষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবুও আমাদের উদ্দেশ্য হলো যত কম সংখ্যক সুস্থ কোষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে যত বেশি সংখ্যক ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা। ক্ষতিগ্রস্ত অধিকাংশ সুস্থ কোষ নিজে থেকে এই ক্ষতি মেরামত করে ফেলে।

অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপি : অভ্যন্তরীণ রেডিওথেরাপির ক্ষেত্রে রোগীকে শরীরের ভেতর থেকে রেডিওথেরাপি দেয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় রোগী তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে। অথবা ইনজেকশনের মাধ্যমে রোগীর দেহে তেজস্ক্রিয় তরল পদার্থ প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। রক্তের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এ তরল পদার্থে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস, হাড়ের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় স্ট্রনশিয়াম এবং থাইরয়েড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্ন-১৪৮. কেমোথেরাপি (Chemotheraphy) কি? এটা কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : কেমোথেরাপি : রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে চিকিৎসা করার একটি বিশেষ পদ্ধতি হলো কেমোথেরাপি। এর জনক হলেন জার্মান চিকিৎসক পল এহর্লিক। সাধারণত জীবাণুর সংক্রমণ এবং ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। অ্যান্টিক্যান্সার ড্রাগ প্রয়োগে ক্যান্সারের চিকিৎসাকে কেমোথেরাপি বলে।

যে জন্য ব্যবহার করা হয় : ক্যান্সারে আক্রান্ত কোষ যখন দেহের ব্যাপক অংশে ছড়িয়ে পড়ে তখন অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব হয় না। এজন্য কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়। মূলত শরীরের ব্যাপক ও স্পর্শকাতর অংশে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়লে কেমোথেরাপি প্রয়োগ করা হয়।

প্রশ্ন-১৪৯. ফিজিওথেরাপি (Physiotheraphy) কি?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি আহত বা আঘাতপ্রাপ্ত হলে কিংবা কোনো কারণে রোগাক্রান্ত হলে ব্যায়াম করানোর মাধ্যমে বা অন্য কোনো প্রাকৃতিক উপকরণের সাহায্যে তার চিকিৎসা করানো হলে সে পদ্ধতিকে ফিজিওথেরাপি বা প্রাকৃতিক চিকিৎসা বলা হয়।

প্রশ্ন-১৫০. আকুপাংচার কি?

উত্তর : আকুপাংচার এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি। Acus ও Puncture শব্দ দুটি থেকে আকুপাংচার (Acupuncture) কথাটি এসেছে। Acus শব্দের অর্থ সুই এবং Puncture শব্দের অর্থ ফোটানো। সুতরাং আকুপাংচার শব্দের আক্ষরিক অর্থ সুই ফোটানো। রোগ নিরাময়ে স্টেইনলেস স্টিলের সুই-এর প্রয়োগ প্রণালীই হলো আকুপাংচার। আকুপাংচার বা সুই ফুটিয়ে রোগের চিকিৎসা চীনের মানুষের হাজার হাজার বছরের গবেষণার ফল। এ চিকিৎসা পদ্ধতিতে শরীরের বিভিন্ন বিন্দুতে ছোট ছোট সুই ফুটানো হয়। উক্ত সব বিন্দুর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের একটি মানচিত্র চীনের আকুপাংচার বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছেন। তারা মানব শরীরে সর্বমোট ৭৮৭টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু নির্ধারণ করেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সুচগুলো গভীরে ফোটানো হয় না এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রণাবিহীন। এ ধরনের কোনো চিকিৎসা মাত্র দশ মিনিটকাল স্থায়ী হয়। অবশ্য এই পদ্ধতিতে প্রথমে পাথরের সুই এবং পরে বাঁশের সুই ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে স্টেইনলেস স্টিলের সুই ব্যবহৃত হয়।

এনজিওগ্রাফি
Angiography

প্রশ্ন-১৫১. এনজিওগ্রাফি (Angiography) কি? এনজিওগ্রাম পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : এনজিওগ্রাফি : এনজিওগ্রাফি হলো এমন একটি প্রতিবিম্ব তৈরির পরীক্ষা যেখানে শরীরের রক্তনালিকাসমূহ দেখার জন্য এক্সরে ব্যবহার করা হয়। এ পরীক্ষার মাধ্যমে রক্তবাহী শিরা বা ধমনীগুলো সরু, ব্লক ও প্রসারিত হয়েছে কি না তা নির্ণয় করা যায়। রক্তনালিতে ব্লক এবং রক্তনালি সরু এবং অপ্রশস্ত হলে শরীরে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়।

এনজিওগ্রাম পদ্ধতি : এনজিওগ্রাম করার সময় চিকিৎসক রোগীর দেহে একটি তরল পদার্থ একটি সরু ও নমনীয় নলের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে দেন। তরল পদার্থটিকে 'ডাই' এবং নলটিকে ক্যাথেটার বলে। এই ডাই ব্যবহারের ফলে রক্তবাহী নালিকাগুলো এক্সরের সাহায্যে দৃশ্যমান দেখা যায়। এই ডাই পরে কিডনি এবং মূত্রের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। একটি নির্দিষ্ট প্রবেশ বিন্দুর মধ্য দিয়ে ক্যাথেটারটিকে নির্দিষ্ট ধমনী বা শিরার মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। প্রবেশ বিন্দুটি শরীরের যে কোনো স্থানের রক্তনালিতে হতে পারে। ব্যবহৃত ডাইটিকে কখনো কখনো বৈসাদৃশ্য বা Contrast হিসেবে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন-১৫২. চিকিৎসকগণ কি কি কারণে রোগীকে এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন?

উত্তর : সাধারণত যে সকল কারণে চিকিৎসগণ এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন, এগুলো হলো-

ক. হৃৎপিণ্ডের বাহিরে ধমনীতে ব্লকেজ হলে;

খ. ধমনী প্রসারিত হলে:

গ. কিডনির ধমনীর অবস্থা বুঝার জন্য;

ঘ. শিরার কোনো সমস্যা হলে।

প্রশ্ন-১৫৩.. পেসমেকার কি?

উত্তর : পেসমেকার (Pacemaker) হচ্ছে দুর্বল বা অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন কাটিয়ে উঠার জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক বা বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিশেষ, যা রোগীর হার্টের কাছাকাছি ত্বকের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হয়। পেসমেকারের মধ্যে ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক আছে যা ওই সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে খবর পায় হার্ট চলছে না থেমে গেছে। হার্টের স্পন্দন থামলেই পেসমেকার বুঝতে পারে হার্টে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটেছে।

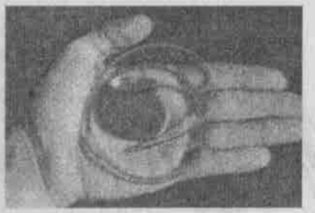

চিত্র : *একটি পেসমেকার*

তখনই পেসমেকারের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক ঐ তারের মধ্য দিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে পাঠিয়ে দেয়। হার্টে আবার পাম্প দিতে আরম্ভ করে। এ ঘটনাগুলো এতো নিমিষে ঘটে যায় যে, হার্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না।

প্রশ্ন-১৫৪. ইকোকার্ডিওগ্রাফি কি?

উত্তর : হৃৎপিণ্ডের কর্মক্ষমতা এবং রোগ শনাক্ত করার বিশেষ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি হলো ইকোকার্ডিওগ্রাফি। বুকের উপর একটি ট্রান্সডিউসারের সাহায্যে উঁচু কম্পাঙ্কের শব্দ তরঙ্গ হৃৎপিণ্ডের ভেতর চালনা করা হয়; শব্দ তরঙ্গ হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয় ও ট্রান্সডিউসারে ফিরে আসে এবং তা অসিলোস্কোপের সাহায্যে রেকর্ড করা হয়। ক্লিনিক্যাল পরীক্ষা, এক্সরে এবং ইসিজির সাথে সমন্বিতভাবে ইকোকার্ডিওগ্রাফি ব্যবহার করে হৃদরোগ শনাক্ত করা যায়।

○ প্রশ্ন-১৫৫. হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা হৃৎপিণ্ড সংযোজন কি? এ শল্য চিকিৎসা কবে প্রথম শুরু হয়?

উত্তর : রোগাক্রান্ত কোনো হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে অপারেশনের মাধ্যমে অন্য কোনো সুস্থ হৃৎপিণ্ড (দুর্ঘটনায় নিহত কোনো ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড হতে পারে) সংযোজন করার নামই হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্ট বা হৃৎপিণ্ড সংযোজন। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে হার্টলাঙ্গ মেশিন নামে এ ধরনের মেশিনের প্রচলন ঘটে। এ যন্ত্র হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে রক্তের প্রবাহ না ঘটিয়ে হৃৎপিণ্ডের রক্তবাহী শিরা থেকে রক্তকে সরাসরি ধমনীতে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় সকল যন্ত্রই রক্তে অক্সিজেন যোগ করে দেয়, ফলে রক্তকে ফুসফুস দিয়েও যেতে হয় না। এ যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে চার ঘণ্টা পর্যন্ত হৃৎপিণ্ডকে বন্ধ করে রাখা যায় এবং অপারেশনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়।

এ যন্ত্র ব্যবহার করে সর্বপ্রথম হৃৎপিণ্ড সংযোজন করা হয় ১৯৬৭ সালের ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন শহরের গ্রুট সুউর হাসপাতালে। ডা. ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড-এর নেতৃত্বে শল্য চিকিৎসকগণ এ অপারেশন করেন।

○ প্রশ্ন-১৫৬. করোনারি বাইপাস ও এনজিওপ্লাস্টি কি?

উত্তর : করোনারি বাইপাস : যে রক্তবাহিকাগুলো হৃৎপিণ্ডে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ করে তাদের করোনারি আর্টারি বলে। করোনারি আর্টারিগুলোর গাত্রে অতিরিক্ত চর্বি জমে এবং অভ্যন্তরভাগ উঁচু-নিচু-অমসৃণ ও সরু হলে রক্তপ্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রক্ত চলাচলের বাধা দূর করার জন্য সাধারণত যে চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার হয় তাই করোনারি বাইপাস। এ পদ্ধতিতে শরীরের অন্য কোনো স্থান থেকে শিরা কেটে এনে রক্তবাহী নালিকাগুলোর বাধাপ্রাপ্ত স্থানের উপর-নিচে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। এতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এনজিওপ্লাস্টি : হৃৎপিণ্ড হতে পাম্পকৃত রক্ত তিনটি বৃহৎ ধমনীর মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। ধমনী দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে এর চিকিৎসায় এনজিওপ্লাস্টি চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সমস্যাযুক্ত ধমনীর সংকুচিত স্থান বিশেষ ধরনের বেলুন দ্বারা প্রসারিত হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

চিত্র : বিভিন্ন ধরনের এনজিওপ্লাস্টি

○ প্রশ্ন-১৫৭ Coronary angiography কি?

উত্তর : Coronary অর্থ ধমনী এবং angiography অর্থ প্রদর্শনবিদ্যা। অর্থাৎ চিকিৎসাবিদ্যার সাহায্যে ধমনীতন্ত্রের প্রদর্শনকে Coronary angiography বলা হয়। সাধারণত হার্টঅ্যাটাক বা স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের হৃৎপিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি অংশের ধমনীর অবস্থা জানতে চিকিৎসকগণ এ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

○ প্রশ্ন-১৫৮. ETT বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : ইংরেজি Exercise Tolerence Test এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো ETT বা ইটিটি। উদ্দীপিত হৃৎযন্ত্রের একটি পরীক্ষা হলো ইটিটি। ব্যায়াম বা অনুশীলন চলাকালীন হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সক্রিয়তা বা কার্যকলাপ (স্পন্দনের হার, ছন্দময়তা) ইটিটি পরীক্ষার মাধ্যমে রেকর্ড করা হয়। এটি আসলে অনুশীলনরত অবস্থায় রোগীর ইসিজি পরীক্ষা। করোনারি আর্টারি রোগের রোগ নিরূপণের জন্য এ পরীক্ষাটি খুবই উপকারী।

মানবদেহ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ক আরো কিছু প্রশ্নোত্তর

○ প্রশ্ন-১৫৯. অঙ্গ (Organ) এবং অঙ্গতন্ত্র (Organ System) বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : অঙ্গ বলতে একই ধরনের কতকগুলো কলা বা বিভিন্ন ধরনের কলা দিয়ে তৈরি আকৃতিগত গঠনকে বোঝায় যা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। যেমন– হৃৎপিণ্ড।

অন্যদিকে, একই ধরনের কাজ সম্পন্নকারী অঙ্গ অথবা ভিন্ন ধরনের কাজ সম্পন্নকারী কতকগুলো অঙ্গ যখন একত্রিতভাবে প্রাণীদেহে অবস্থান করে একটিমাত্র নির্দিষ্ট এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় কাজ সমাধার লক্ষ্যে কাজ করে, তখন অঙ্গগুলোর একক সমন্বয় ও সহাবস্থানকে অঙ্গতন্ত্র বলে। যেমন–রক্ত সংবহনতন্ত্র।

○ প্রশ্ন-১৬০. অস্থি কি? এর কাজ কি?

উত্তর : অস্থি : অস্থি দেহের সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ভঙ্গুর এবং অনমনীয় সংযোজক কলা। এদের মাতৃকায় চুন জাতীয় পদার্থ জমা হয়ে অস্থির দৃঢ়তা প্রদান করে।

অস্থির কাজ :

ক. গঠনের বৈচিত্র্যের জন্য অস্থি দেহের কাঠামো তৈরি করে।
খ. পেশি সংযোজনের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।
গ. কতকগুলো অস্থি দেহের নরম অংশকে সুরক্ষিত রাখে (যেমন : মাথার খুলির অস্থি)।
ঘ. রক্ত থেকে কিছু দূষিত বস্তু (Pb, As) নিষ্কাশন করে।
ঙ. মজ্জাকে আবৃত রাখে।
চ. ক্যালসিয়ামকে জমা রাখে (Store house for Calcium)।
ছ. রক্তকণিকা তৈরি করে।
জ. চলনে সহায়তা করে।

○ প্রশ্ন-১৬১. যকৃতের কার্যাবলি উল্লেখ করুন।

উত্তর : মানবদেহের যকৃতের কার্যাবলি নিচে উপস্থাপন করা হলো :

ক. পিত্তরস নিঃসরণ করে।
খ. লোহিত কণিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।
গ. 'A' ও 'D' ভিটামিন সঞ্চয় করে।
ঘ. ভবিষ্যতের জন্য গ্লাইকোজেন ও চর্বি জাতীয় খাদ্য জমা করে রাখে।

ঙ. প্রোটিন সংশ্লেষণ করে।

চ. অ্যামাইনো এসিড থেকে এলবুমিন তৈরি করে, যা দেহের পানি ও লবণের মধ্যে সমতা আনয়ন করে।

ছ. ফাইব্রিনোজেন তৈরির প্রধান অঙ্গ, যা রক্ত জমাট বাঁধাতে সহায়তা করে।

জ. বিপাকীয় কার্যাবলি সংঘটিত করে।

○ প্রশ্ন-১৬২. বৃক্ক কি? এর কাজ লিখুন।

উত্তর : **বৃক্ক :** বৃক্ক হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের তথা মানুষের প্রধান রেচন অঙ্গ। এটি অন্তর্দেশীয় সাম্যাবস্থা বজায় রাখার মুখ্য যন্ত্র।

বৃক্কের কাজ

১. বিপাকজাত দূষিত পদার্থগুলোকে মূত্রের সঙ্গে দেহের বাইরে নির্গত করা।

২. দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য বজায় রাখা।

৩. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা।

৪. ভিটামিন 'ডি' ও লোহিত কণিকা তৈরিতে অংশ নেয়া।

৫. রক্তের কয়েকটি উপাদানের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখতে সহায়তা করা।

○ প্রশ্ন-১৬৩. ধমনী ও শিরা কি?

উত্তর : **ধমনী :** যেসব রক্তবাহী নালী হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে, সেগুলোকে ধমনী বলে।

শিরা : কৈশিক নালী থেকে উৎপন্ন হয়ে যেসব নালী হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে সেগুলোকে শিরা বলে।

○ প্রশ্ন-১৬৪. লালাগ্রন্থিগুলোর নাম ও কাজ লিখুন।

উত্তর : লালাগ্রন্থি এক প্রকার পৌষ্টিকগ্রন্থি। এগুলো মুখগহ্বরে অবস্থিত। মানবদেহে তিন জোড়া লালাগ্রন্থি বিদ্যমান। এগুলো হলো :

১. প্যারোটিড লালাগ্রন্থি– ১ জোড়া।

২. সাব-লিঙ্গুয়াল লালাগ্রন্থি– ১ জোড়া।

৩. সাব-ম্যাক্সিলারি লালাগ্রন্থি– ১ জোড়া।

লালাগ্রন্থিসমূহের কাজ

১. লালা উৎপন্ন করা এবং তা নিঃসৃত করা, লালাতে পানি, মিউসিন ও টায়ালিন রয়েছে।

২. লালা খাদ্যবস্তুকে সিক্ত করে।

৩. খাদ্য পিচ্ছিল করে; ফলে গলাধঃকরণ সহজ হয়।

৪. টায়ালিন এনজাইম শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে আংশিক পরিপাক করে।

○ প্রশ্ন-১৬৫. মেরুদণ্ডের কাজগুলো লিখুন।

উত্তর : মেরুদণ্ডের কাজসমূহ নিম্নরূপ :

১. মেরুদণ্ড দেহের ভার বহন করে।

২. মেরুদণ্ড উর্ধ্বাঙ্গ ও নিম্নাঙ্গের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।

৩. পিঠ বাঁকাতে সাহায্য করে।

৪. মেরুদণ্ড সুষুম্নাকাণ্ডকে রক্ষা করে।

৫. বক্ষপিঞ্জর গঠনে অংশ নেয়।

৬. পিঞ্জরাস্থিগুলো আটকাতে ও শ্বাস কাজে সহায়তা করে।

○ প্রশ্ন-১৬৬. পেশিতন্ত্রে পেশি কত প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার পেশিকলার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

উত্তর : পেশিকলা পেশি দিয়ে গঠিত। এটি দেহের কাঠামো গঠনে এবং চলনে-গমনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সংকোচন পেশির একটি বিশেষ ধর্ম।

পেশির প্রকারভেদ : প্রধানত তিন প্রকারের পেশি নিয়ে মানবদেহের পেশিতন্ত্র গঠিত। যথা : ১. ঐচ্ছিক পেশি, ২. অনৈচ্ছিক পেশি ও ৩. হৃৎপেশি।

বিভিন্ন প্রকার পেশির বর্ণনা

১. **ঐচ্ছিক পেশি :** যে পেশির কাজ ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয় তাকে ঐচ্ছিক পেশি বলে। দেহকে নড়াচড়া ও চলনে সাহায্য করে বলে এ ধরনের পেশিকে কঙ্কাল পেশিও বলা হয়। ঐচ্ছিক পেশিই মাংস নামে পরিচিত। বড় বড় অস্থির সংযোগ স্থলে এ পেশি থাকে।

২. **অনৈচ্ছিক পেশি :** যে পেশির কাজ ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল নয় তাকে অনৈচ্ছিক পেশি বলে। পৌষ্টিকনালী, রক্তনালী, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গ প্রাচীরে এ পেশি থাকে।

৩. **হৃৎপেশি :** হৃদযন্ত্রের প্রাচীরে বিশেষ ধরনের অনৈচ্ছিক পেশিকে হৃৎপেশি বলে। হৃদযন্ত্রের সংকোচন প্রসারণ ঘটিয়ে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হৃৎপেশির কাজ।

○ প্রশ্ন-১৬৭. একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্তদান করা উচিত কেন?

উত্তর : রক্তের কোনো বিকল্প নেই। তাই কোনো মুমূর্ষু রোগীকে বা দুর্ঘটনায় আহত কোনো মানুষ যার রক্ত দরকার তাকে অবশ্যই অন্য কোনো মানুষের রক্ত দিতে হবে। পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের দেহে ৫-৬ লিটারের বেশি রক্তের প্রয়োজন নেই। কোনো ব্যক্তি রক্তদান করলে তা ৪ মাসের মধ্যে পূর্ণ হয়ে যায়। ৪ মাস পর আবার রক্ত না দিলে অতিরিক্ত রক্ত নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। যারা রক্ত দেন না তাদের প্রতিদিন বিশ হাজার কোটি লোহিত রক্তকণিকা তৈরি ও ধ্বংস হয়। এভাবে যে কোনো পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রতি চার মাস অন্তর রক্ত দিতে পারে। এতে নিজের কোনো ক্ষতি হয় না। অপরদিকে একটি মূল্যবান জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়। এ কারণেই যে কোনো পূর্ণবয়স্ক মানুষের নিয়মিত রক্তদান করা উচিত।

○ প্রশ্ন-১৬৮. গ্যাস্ট্রিক রস কি? এর উপাদান কয়টি ও কি কি?

উত্তর : পাকস্থলীর প্রাচীরে থাকে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি। এ গ্রন্থি নিঃসৃত রসের নামই হলো গ্যাস্ট্রিক রস বা পাচক রস, যা বর্ণহীন ও তীব্র অম্লধর্মী তরল।

গ্যাস্ট্রিক রসের উপাদান ৩টি। যথা– ১. হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl), ২. পেপসিন ও ৩. রেনিন।

○ প্রশ্ন-১৬৯. টনসিল কি? মানবদেহে এটা কি কাজ করে?

উত্তর : টনসিল গলদেশের এক বিশেষ গ্রন্থি। এর কাজ হলো :

ক. রোগজীবাণুর প্রতিষেধক তৈরি করা।

খ. শরীরকে রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা।

গ. ব্যাকটেরিয়া বা অন্য জীবাণুকে খাদ্যনালী ও শ্বাসনালীতে যেতে বাধা দেয়া।

ঘ. রক্তের লিউকোসাইট ও প্লাজমা সেল তৈরি করা।

○ প্রশ্ন-১৭০. পাকস্থলীতে কোন এসিড থাকে এবং এর কাজ কি?

উত্তর : পাকস্থলীতে যে এসিড থাকে সেটি হলো হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)। এই এসিড পাকস্থলীতে তৈরি হওয়ায় পেপসিন সক্রিয় হয় এবং পাকস্থলীতে অম্লভাব বিরাজ করে। যার ফলে শর্করা পরিপাক সহজতর হয়।

○ প্রশ্ন-১৭১. হরমোন কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার হরমোনের কাজ লিখুন।

উত্তর : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নির্গত এক বিশেষ ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ, যা সরাসরি রক্তে মিশে রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় জৈব কার্যসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে তাকেই হরমোন বলে। নিচে বিভিন্ন প্রকার হরমোনের কাজ বর্ণনা করা হলো :

ক. গ্রোথ হরমোন : দেহ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এর অভাবে মানুষ বেটে হয়।

খ. থাইরক্সিন হরমোন : দেহের বিপাকে সহায়তা করে।

গ. ইনসুলিন : রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায় এবং শর্করা বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। এর অভাবে ডায়াবেটিস রোগ হয়।

ঘ. গ্লুকাগন : রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

ঙ. প্রোল্যাকটিন হরমোন : স্তন বর্ধনে এবং দুগ্ধ নিঃসরণে সহায়তা করে।

চ. এড্রেনালিন হরমোন : জরুরি বিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। বিপদ মোকাবিলায় সহায়তা করে।

ছ. টেস্টোস্টেরন : পুরুষের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং শুক্রাণু উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

জ. ইস্টোজেন ও প্রজেস্টেরন : স্ত্রীলোকের আনুষঙ্গিক যৌন বৈশিষ্ট্য প্রকাশে সহায়তা করে এবং অমরা গঠনে সহায়তা করে।

ঝ. রিলাক্সিন : স্ত্রীলোকের গর্ভাবস্থায় শ্রোণীবন্ধনী শিথিল করে।

○ প্রশ্ন-১৭২. কৃত্রিম লিভার/যকৃত কি?

উত্তর : সুস্থ ও স্বাভাবিক লিভারের মতো বিপাকীয় কার্য সম্পাদনকারী বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও নলের সাহায্যে তৈরি লিভারকে কৃত্রিম লিভার বলে। কৃত্রিম লিভার তৈরিতে ব্যবহৃত হেপাটোসাইটেস কোষ অন্য প্রাণী বা মানুষের লিভার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়। কুকুরের লিভার কোষের ব্যবহার এক্ষেত্রে বেশ সুবিধাজনক। কৃত্রিম লিভার স্বাভাবিক লিভারের মতোই রক্ত বিশোধন ও বিপাকীয় কাজ সম্পাদন করতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৭৩. কচু খেলে গলা চুলকায় কেন?

উত্তর : কচু গাছের কোষে ক্যালসিয়াম অক্সালেটের কেলাস (crystal) থাকে। এ সকল কেলাস সূক্ষ্ম প্রান্তবিশিষ্ট। কচু খেলে এ সকল কেলাসের সূক্ষ্ম প্রান্ত গলার নরম ঝিল্লিতে আটকে যায়। ফলে গলা চুলকায়।

○ প্রশ্ন-১৭৪. সাইনেসথেটিক মানুষ কি?

উত্তর : কোনো কোনো মানুষ আছেন যারা শব্দের রং দেখেন এবং রঙের গন্ধ পান। এ ধরনের মানুষকে বলা হয় সাইনেসথেটিক মানুষ। মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্র ও দর্শনকেন্দ্রের মাঝে একটি অস্বাভাবিক স্নায়ুর সংযোগের ফলে এমনটি হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে প্রতি ২৫ হাজারে একজন সাইনেসথেটিক মানুষ আছে।

○ প্রশ্ন-১৭৫. ট্রান্সসেক্সুয়ালিজম কাকে বলে?

উত্তর : দৈহিকভাবে পুরুষ কিন্তু মানসিকভাবে নারী—মানুষের এ অবস্থাকে ট্রান্সসেক্সুয়ালিজম বলা হয়। মানসিক ত্রুটি, বিভিন্ন গ্রন্থির ক্ষরণের গোলমাল, হরমোন সংক্রান্ত সমস্যা ও ক্রোমোজোম সংক্রান্ত ত্রুটির কারণে এরকম হয়ে থাকে। বিদেশে সেক্স রি-এ্যাসাইনমেন্ট-এর মাধ্যমে এ বিষয়ে কিছু চিকিৎসা হয়।

○ প্রশ্ন-১৭৬. কালার ভিশন (Color Vision) কি?

উত্তর : কালার ভিশন বা রঙের দৃশ্যমানতা বলতে বিভিন্ন রঙের পার্থক্য তথা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে আলোর পার্থক্য নির্ণয়ে চোখের ক্ষমতাকে বোঝায়। এই ক্ষমতা মানুষের, অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রজাতির পাখি, মাছ, সরীসৃপ ও কীটের রয়েছে। চোখের এই ক্ষমতার ক্রিয়াকৌশল সম্পর্কে এখনো

সম্যক জ্ঞানের অভাব আছে। তবে মনে করা হয় যে, রেটিনার তিন ধরনের কোন কোষ (Cone Cell) লাল, সবুজ ও নীল আলোর ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এসব আলোর প্রত্যেকটির প্রাখর্য অনুসারে স্নায়ুসংকেত মস্তিষ্কে রঙের ভিন্নতা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া পৌঁছে দেয়। চোখ এভাবেই রঙের ভিন্নতা নির্ণয় করতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, লাল, সবুজ ও নীল হচ্ছে মৌলিক রঙ। এ তিনটি রঙের সংমিশ্রণেই অন্যান্য রঙ সৃষ্টি হয়। বস্তুত রঙের ভিন্নতা আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ভিন্নতার কারণেই ঘটে থাকে।

○ প্রশ্ন-১৭৭. পরিপাকযন্ত্রের হজমে সাহায্যকারী উপাদান কি কি?

উত্তর : খাদ্যবস্তু পরিপাকযন্ত্রের নির্দিষ্ট হরমোন ও এনজাইমের প্রভাবে আর্দ্র বিশ্লেষিত হয়ে হজমের উপযোগী হয়। এক্ষেত্রে মুখবিবর থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রান্ত্রে হজম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মুখবিবরের লালাগ্রন্থি থেকে হজমে সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে নিঃসৃত হয় টায়ালিন। এরপর পাকস্থলি থেকে নিঃসৃত হয় পেপসিন, রেনিন ও লাইপেজ। পাকস্থলি থেকে খাদ্য ডিওডেনামে আসলে আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়। অতঃপর অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত ট্রিপসিন, লাইপেজ ও অ্যামাইলেজ এবং পিত্তথলি থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে খাদ্যের হজম প্রক্রিয়া সম্পন্নকরণে সহায়তা করে।

○ প্রশ্ন-১৭৮. গরমের সময় বেশি রোদে কেউ কেউ রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে কেন?

উত্তর : তাপ সহ্য করার ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছলেই একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে। একে বলে হিটস্ট্রোক (Heatstroke)। ঘাম প্রচণ্ড গরম থেকে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু একটানা বেশিক্ষণ গরম থাকলে ঘামার হার কমতে থাকে। বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে সে হার আরও কমে। আবার কোনো মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেই ঘামার হার খুব কমে আসে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়ে। তাপ বেরোনোর উপায় বন্ধ হয়ে গেলে খুব ক্লান্ত লাগে। কিন্তু ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় একেবারেই ঘাম হয় না। এ অবস্থায় হিটস্ট্রোক হতে পারে। মোটা মানুষ বা বয়স্কদের এতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

○ প্রশ্ন-১৭৯. কেউ কেউ বর্ণান্ধ হয় কেন?

উত্তর : মৌলিক বর্ণ হলো তিনটি। যথা : নীল, সবুজ ও লাল। যারা এ রঙের পার্থক্য বুঝতে পারে না তাদেরকে বর্ণান্ধ বলা হয়। অপটিক নার্ভের ত্রুটির জন্য এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি বর্ণত্রয়ের যে কোনো একটি কিংবা দুটি কিংবা তিনটিতেই অন্ধ হতে পারে। লাল রঙ চিনতে না পারলে সেই অন্ধত্বকে 'প্রোটানোপিয়া', সবুজ রঙ চিনতে না পারলে সেই অন্ধত্বকে 'ডিউটারানোপিয়া' এবং নীল রঙ চিনতে না পারলে সেই অন্ধত্বকে 'ট্রাইটোনোপিয়া' বলা হয়।

○ প্রশ্ন-১৮০. ফিজিক্যাল মেডিসিন কি?

উত্তর : ওষুধের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদানের পদ্ধতি হলো ফিজিক্যাল মেডিসিন। তাপ, পানিপ্রবাহ, আলো, বিদ্যুৎ, আলট্রা সাউন্ড বা অতিশব্দ ব্যবহার করে এ পদ্ধতিতে রোগের চিকিৎসা করা হয়। এটি কোনো ধরনের ব্যায়াম বা ফিজিওথেরাপি নয়। প্যারালাইসিস, স্ট্রোক, বাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে এটি খুবই কার্যকর।

○ প্রশ্ন-১৮১. চোখে ধোঁয়া লাগলে চোখ জ্বালা করে কেন?

উত্তর : মানুষের চোখে অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার ও নানা ধরনের তরল পদার্থ থাকে। এ তরলগুলো জীবাণুনাশক বা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল। চোখে ধোঁয়া প্রবেশ করলে জীবাণুনাশক এ তরল ধোঁয়ার সাথে লড়াইয়ের মাধ্যমে চোখকে রক্ষায় সচেষ্ট হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় চোখ জ্বালা করে।

○ প্রশ্ন-১৮২. সাপে কাটা রোগীকে কি চিকিৎসা দিতে হয়?

উত্তর : বিষধর সাপে কামড়ালে ক্ষতস্থান ফুলে ওঠে, ভয়ানক জ্বালা করে, এর চতুস্পার্শ্বে রক্ত জমে নীল বর্ণ ধারণ করে। সাপের বিষ রক্তের সাথে না মিশলে মানুষের মৃত্যু হয় না। সাপে কামড়ালে তৎক্ষণাৎ আক্রান্ত স্থানের ৪/৫ ইঞ্চি ওপরে একবার এবং আরো খানিকটা ওপরে (একাধিক হার নেই এমন স্থানে) আরেকবার শক্ত করে বাঁধতে হবে যাতে রক্ত চলাচল করতে না পারে। এরপর তাড়াতাড়ি ক্ষতস্থান ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে এবং ক্ষতস্থানের ওপরে টিপে কালো রক্ত বের করে ফেলতে হবে এবং ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে। সাপের বিষ পানিতে দ্রবণীয়, তাই পিচকারী দিয়ে পানি দিলে বিষের ক্রিয়া কম হয়। সাপে কাটা রোগীকে ঘুমাতে দিতে নেই।

○ প্রশ্ন-১৮৩. শরীরের কোনো স্থান আগুনে পুড়ে গেলে কিরূপে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়?

উত্তর : শরীরের কোনো স্থান আগুনে পুড়ে গেলে ডিম ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিতে হয়। প্রয়োজনীয় বার্নল বা মলম ব্যবহার করতে হয়। ফোস্কা পড়লে ফোস্কা গালানো উচিত নয়। এপিসি বা ডিসপ্রিন জাতীয় ট্যাবলেট রোগীর ব্যথা নিরাময় করে। বর্তমানে নানা ধরনের অয়েনমেন্ট রয়েছে যা পুড়ে যাওয়া শরীরের জন্য অত্যন্ত কার্যকর।

○ প্রশ্ন-১৮৪. পানিতে ডুবে যাওয়া রোগীকে কিভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয়?

উত্তর : রোগীকে পানি থেকে তুলে মাথার দিক নিচু করে শোয়াতে হয় এবং মাথা কাত করে মুখ খুলে দিতে হয়। মুখ ও গলার ভিতর রুমাল বা কাপড় দ্বারা পরিষ্কার করে দিতে হয়। এরপর মুখ কাপড় দ্বারা ঢেকে মুখ লাগিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস আনার চেষ্টা করতে হয়। পেটে চাপা দিয়ে পানি বের করতে হয়। এছাড়া বুকে চাপ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস করাতে হয়।

○ প্রশ্ন-১৮৫. ফার্স্ট এইড বক্স কি?

উত্তর : প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী সরঞ্জাম সম্বলিত বক্স হলো ফার্স্ট এইড বক্স। এ বক্সে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক, এন্টিসেপটিক, তুলা, ব্যান্ডেজ, কাঁচি, ছোট ছুরি প্রভৃতি থাকে।

○ প্রশ্ন-১৮৬. স্বাস্থ্য রক্ষার উপায় উল্লেখ করুন।

উত্তর : সুস্থ দেহ সুস্থ মনকে স্বাস্থ্য বলে। উত্তম শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত স্বাস্থ্যবিধি পালন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সুস্বাস্থ্যের জন্য চাই নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ পানি, পরিচ্ছন্ন বাসস্থান, সুষম খাদ্য, নিয়মিত ব্যায়াম বা কায়িক পরিশ্রম। মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য চাই সুশিক্ষা, সৎচিন্তা, সৎসঙ্গ, সুস্থ বিনোদন, পারিবারিক উষ্ণতা, উত্তম সামাজিক ও মানসিক পরিবেশ।

○ প্রশ্ন-১৮৭. হঠাৎ কারো দম বন্ধ হলে কিরূপ প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে?

উত্তর : হঠাৎ কারো দম বন্ধ হলে আক্রান্ত ব্যক্তির মাথা কিছুটা উঁচু করে শুইয়ে দিতে হবে। মাথা বরফ বা ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং পায়ে গরম পানিভর্তি বোতলের সেঁক দিতে হবে। মুখে পাতলা কাপড় দিয়ে মুখে মুখ রেখে প্রতি মিনিটে ২০-২১ বার ফুঁ দিতে বা বাতাস টেনে শ্বাস-প্রশ্বাস করাতে হবে। মুখ খোলা রেখে কাত করে শুইয়ে কয়েকবার বুকের দু পাশে হাত দ্বারা চাপ দিয়ে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস করানোর চেষ্টা করতে হবে।

○ প্রশ্ন-১৮৮. ইলেকট্রো ডায়াগনোসিস কি?

উত্তর : বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে রোগ নির্ণয়ের কৌশলকে ইলেকট্রো ডায়াগনোসিস বলা হয়। মস্তিষ্কের বৈদ্যুতিক উদ্দীপনা পর্যবেক্ষণ এবং পরিমাপের জন্য ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফী, হৃৎপিণ্ডের জন্য ইলেকট্রো কার্ডিওগ্রাফি এবং মাংসপেশীর জন্য ইলেকট্রো মায়োগ্রাফী– প্রধানত এ তিন ধরনের

বৈদ্যুতিক রোগ নির্ণয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। পদ্ধতিগুলো একটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তা হলো 'প্রতিটি জীবিত কোষের বাইরের এবং ভিতরের অন্তর্বর্তী বৈদ্যুতিক বিভব পার্থক্য বিদ্যমান'। ইলেকট্রো ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে এ বিভব পার্থক্য বর্ধিত আকারে রেকর্ড করে রোগ নির্ণয় করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৮৯. ফরেনসিক মেডিসিন কি?

উত্তর : দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সমাধানের জন্য মেডিক্যাল সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা চিকিৎসকের মতামতের প্রয়োজন হয়। এ সংক্রান্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ শাখাটি ফরেনসিক মেডিসিন নামে পরিচিত। আইনগত বিতর্ক এড়াতে সাধারণত ফরেনসিক রোগতত্ত্ব, ফরেনসিক মানসিক রোগতত্ত্ব, ফরেনসিক দন্তবিজ্ঞান, ফরেনসিক বিষবিজ্ঞান, আর্থোপেডিকস, সাধারণ শল্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করা হয়।

লাশের ময়নাতদন্ত, পচে-গলে যাওয়া লাশ সনাক্ত করা, অস্থির বয়স, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ, বিকৃতভাবে পুড়ে যাওয়া দেহাবশেষ সনাক্তকরণ, আঘাতের প্রকৃতি নির্ণয়, যৌন নির্যাতনের প্রকৃতি নির্ণয়, পোশাক কিংবা দেহে লেগে থাকা রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা, দেহবিশেষ থেকে বের করা গুলির অংশবিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরেনসিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎকগণ মতামত দিয়ে থাকেন।

○ প্রশ্ন-১৯০. গ্যাংগ্রিন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : সাধারণত রক্ত সরবরাহের ঘাটতির কারণে দেহকলার মৃত্যু বা পচন হলো গ্যাংগ্রিন। তবে গ্যাংগ্রিন বলতে মূলত আর্দ্র গ্যাংগ্রিনকেই বোঝায়।

গ্যাংগ্রিনস্থলে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমিত হলে সেখানে পচন শুরু হয়, যা আর্দ্র গ্যাংগ্রিন নামে পরিচিত। গ্যাস সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ ঘটলে গ্যাস গ্যাংগ্রিন সৃষ্টি হয়। এর ফলে আক্রান্ত স্থান ফুলে যায়, দেহকলার রং বদলে যায় এবং পচা দুর্গন্ধ বের হয়। শরীরের যে কোনো বড় ক্ষতস্থানে গ্যাংগ্রিন হতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৯১. প্লাস্টিক কনটেইনার ব্যবহারে কি ধরনের ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর : বিভিন্ন প্লাস্টিক কনটেইনারের মাধ্যমে বিদেশ থেকে নানা বিষাক্ত ক্যামিকেলস কাঁচামাল হিসেবে আমদানি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল খালি কনটেইনার বাজারে বিক্রি করা হয়। সহজে সংরক্ষণযোগ্য বলে এ সকল কনটেইনারে বিভিন্ন খাদ্যশস্য মজুদ করা হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে, এ সকল কনটেইনারে কি রাসায়নিক দ্রব্য এসেছিল বা তার রাসায়নিক গুণাগুণ কি? এ সকল কনটেইনারে Heavy Metals (পারদ, নিকেল, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, সীসা, আর্সেনিক প্রভৃতি) থাকে যা সাধারণত সাবান বা সোডা ওয়াশেও বিমুক্ত করা যায় না। অথচ এগুলো খাদ্যের সাথে আমাদের শরীরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাবার বা প্লাস্টিক শিল্পের প্রধান উপাদান হলো অ্যারোমিটিক। যার মধ্যে আছে 'অ্যামাইন' ও 'এনিলিন'। এ দুটো উপাদানই মূত্রথলির ক্যান্সার সৃষ্টি করে। এ কারণে যে সকল শ্রমিক প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করে তাদের মধ্যে মূত্রথলির ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। 'অ্যামাইন' ও 'এনিলিন' থেকে মস্তিষ্কে ও শ্বাসতন্ত্রে সমস্যাসহ অস্থিসন্ধিতেও সমস্যা দেখা দিতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৯২. খেলোয়াড়রা মাঠে নামার আগে ওয়ার্মিং আপ করে কেন?

উত্তর : মাঠে নামার আগে খেলোয়াড়রা যে ছুটোছুটি করে নেয়, খেলাধুলার ভাষায় একে ওয়ার্মিং আপ বলা হয়। ওয়ার্মিং আপ করলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এতে শরীরে বিপাকের হার বাড়ে। কোষে অক্সিজেনও বেশি পৌছায়। ফলে শরীরে বেশি শক্তি পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এভাবে শরীরে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে বিপাকের হার ১৩% বেড়ে যায়।

○ প্রশ্ন-১৯৩. মানুষের দেহে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থি ও সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অস্থি কোনটি?

উত্তর : মানুষের দেহের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অস্থি উরু অস্থি। মোট ২০৬ খানা অস্থির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন এ অস্থিটি বিজ্ঞানের ভাষায় Femur (ফিমার) নামে পরিচিত। দেহের উরুতে মোটা ও শক্তিশালী হাড়টিই ফিমার। আর সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম অস্থিটি হলো স্টেপিস (Stapes)। কানের অভ্যন্তরে সংযুক্ত ৩টি হাড়ের একটি হলো স্টেপিস। ফিমার ও স্টেপিস-এর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৫০ সেন্টিমিটার ও ০.১০ থেকে ০.১৭ সেন্টিমিটার।

○ প্রশ্ন-১৯৪. মানুষ নাক ডাকে কেন?

উত্তর : কারো'যদি নাক ডাকে, তখন দুটো জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। প্রথম ব্যাপারটি হলো যার নাক ডাকছে দেখা যাবে তিনি চিত হয়ে শুয়ে আছেন। দ্বিতীয়ত, তখন তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসও গভীর হয়। যখন কেউ চিত হয়ে শুয়ে থাকে তখন তার জিহ্বা গলবিলের ভেতরে চলে যায়। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার পথ কিছুটা সংকীর্ণ হয়ে আসে। যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন নিঃশ্বাস নেয়ার সময় ওই সংকীর্ণ পথে বাতাস যেতে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এর ফলে বাতাসের বেগ আরো বেড়ে যায়।

তালুর পেছনে যে নরম তালু আছে বাতাসের তীব্রতার জন্য তখন সেখানে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং এক ধরনের আওয়াজ হয়। তাকেই আমরা বলি নাক ডাকা বা নাশিকা গর্জন। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার সময় কারো যদি নাক ডাকে, তখন উচিত হবে তাকে কাত করে শুইয়ে দেয়া। তখন আপনা থেকেই নাক ডার্কা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ পাশ ফিরিয়ে শোয়ানোর ফলে জিহ্বা আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসবে। নাকের ছিদ্রপথ খোলা হয়ে যাবে। বাতাস যেতে আসতে আর বাধাগ্রস্থ হবে না। তখন আপনা থেকে নাক ডাকাও বন্ধ হয়ে যাবে।

○ প্রশ্ন-১৯৫. নোংরা জিনিস দেখলে মুখে থুথু আসে কেন?

উত্তর : আমরা যখন কোনো নোংরা জিনিস দেখি, তখন আমাদের শরীরে এক ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। শরীরের বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয় থেকে উত্তেজনা মস্তিষ্কের কোষে চলে যায় এবং কোষের সংকেত আবার ফিরে আসে পেশিতে।

আমাদের মুখে ফ্রেনিক নার্ভ বলে এক ধরনের নার্ভ আছে। ফ্রেনিক নার্ভের উত্তেজনার সময়ই মুখে অতিরিক্ত রস নিঃসরণ হয়। মুখে থু থু আসে। কখনও কখনও এ ফ্রেনিক নার্ভের উত্তেজনার জন্য বুকের এবং পেটের পেশিরও সংকোচন হয়। তখন বমি বমি ভাবও হয়। অনেক সময় পেটও ফুলতে থাকে। কোনো কোনো সময় কটুগন্ধ নাকে গেলেও থুথু আসে এবং শরীরের ফ্রেনিক নার্ভ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পেট পাকায়, বেশি মাত্রায় হলে বমি পর্যন্ত হতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৯৬. শীতকালে ঠোঁট ফাটে কেন?

উত্তর : শীতকালে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। শরীরে ঘামও হয় না। তাই মানুষের শরীরের সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে যে তৈলাক্ত পদার্থটি বের হয়ে আসে তা শরীরের সর্বত্র ছড়াতে পারে না। এ জন্য শীতকালে শরীরটা বেশ খসখসে মনে হয়। এই খসখসে অবস্থা দূর করার জন্য অনেকে শীতকালে শরীরে তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করে। অর্থাৎ শরীরে কৃত্রিমভাবে তৈলাক্ত পদার্থ সরবরাহ করা হয়।

শীতকালে অনেকের শরীরের চামড়া ফেটে যায়। তবে শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠোঁট বেশি ফাটে। এর কারণ হলো শরীরের অন্যান্য চামড়ার তুলনায় ঠোঁটের চামড়া অপেক্ষাকৃত বেশি পাতলা।

আর যেহেতু ঠোঁট রয়েছে নাকের খুব কাছাকাছি, তাই ঠোঁটের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব বেশি পড়ে। প্রতিবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সময়েই একটা গরম বাতাসের ঝাপটা বয়ে যায় ঠোঁটের উপর দিয়ে। তাই ঐ পাতলা চামড়ার জায়গাটি আরো বেশি শুকনো হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় শীতকালে ঠোঁট বেশি ফাটে।

○ প্রশ্ন-১৯৭. জিহ্বা কিভাবে স্বাদ নেয়?

উত্তর : জিহ্বার পেরিফ্যারাল নার্ভাস সিস্টেমের সেন্সরি নিউরন জিহ্বার বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন রকম বার্তা মস্তিষ্কে পাঠায় আর মস্তিষ্কে বিভিন্ন রকম স্বাদের অনুভূতি জাগে। আমাদের জিহ্বায় ছোট ছোট দানা আছে এগুলোকে স্বাদ নালিকা বলা হয়। এগুলো অসংখ্য কোষের সমষ্টি এবং এর উপরিভাগে সূক্ষ্ম শিরা আছে। এরাই জিহ্বাকে স্বাদ নিতে সাহায্য করে। জিহ্বার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম স্বাদ গৃহীত হয়। জিহ্বার গোড়া ঝাল আর মিষ্টি স্বাদ, দু'পাশ নোনতা টক আর কষা স্বাদ, পেছনের দিক তেতো স্বাদ গ্রহণ করে। মাঝখানে কোনো স্বাদ নালিকা না থাকায় কোনো স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না।

○ প্রশ্ন-১৯৮. মানুষ লম্বা বা বেঁটে হয় কেন?

উত্তর : লম্বা বা বেঁটে হওয়া নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে, যা আসে বাবা ও মায়ের ক্রোমোজোম থেকে। বংশগত কারণ ছাড়াও গ্রোথ হরমোনের প্রভাব লম্বা বা বেঁটে হওয়ার ওপর যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। গ্রোথ হরমোন মস্তিষ্কে অবস্থিত পিট্যুইটারি গ্রন্থি থেকে বের হয়। অস্থি তৈরি করতে ও লম্বা অস্থির (Long bone) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই হরমোন। অস্থি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগে এই হরমোনের ক্ষরণ বেশি হলে তৈরি হয় অতিকায় লম্বা মানুষ। অস্থি তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই হরমোন বেশি বেরোলে চওড়া হাড়যুক্ত মানুষের সৃষ্টি হয়। এ বৈশিষ্ট্যকে বলে অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly)। গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণ খুব কম হলে তৈরি হয় বামনাকৃতি মানুষ। আবার, থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid) থেকে বেরোনো থাইরক্সিন ও ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন হরমোন দুটির ওপরেও মানুষের লম্বা বা বেঁটে হওয়া নির্ভর করে।

○ প্রশ্ন-১৯৯. সব মানুষের গায়ের রঙ এক রকম নয় কেন?

উত্তর : মানুষের ত্বকে দুটি স্তর আছে। এর বাইরেরটি বহিঃত্বক বা এপিডার্মিস (Epidermis) আর ভেতরেরটিকে বলে অন্তঃত্বক বা ডার্মিস (Dermis)। বহিঃত্বককে আবার কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে ভেতরেরটির নাম স্ট্র্যাটাম বেসাল (Stratum basale)। এই স্তরে কতগুলো বিশেষ ধরনের কোষ আছে তাদের বলে মেলানোসাইট (Melanocyte)। সাধারণত স্ট্র্যাটাম বেসালে প্রতি বর্গ মিলিমিটারে ১০০০ থেকে ৩০০০ মেলানোসাইট থাকে।

মেলানোসাইটগুলোর মধ্যে আছে রঞ্জক কণা মেলানিন। গাঢ় রঙের এই কণাগুলোই ত্বকের কালো রঙের জন্য দায়ী। যাদের ত্বকে মেলানিনের পরিমাণ খুব বেশি তাদের গায়ের রঙ কালো। ত্বকে মেলানিন কম থাকলে গায়ের রং ফর্সা হয়। পিট্যুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte stimulating hormone) নামে এক বিশেষ হরমোন মেলানিন তৈরিতে সাহায্য করে।

ত্বকে মেলানিন বেশি থাকবে না কম থাকবে তা যেমন নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে, তেমনি কোনো বিশেষ দেশের মানুষের গায়ের রঙের সাথে সে জায়গার ভৌগোলিক অবস্থান, সূর্যের আলো সেখানে কতোটা বেশি এসব কিছুরও সম্পর্ক আছে।

○ প্রশ্ন-২০০. নখ ও চুল কিভাবে বাড়ে?

উত্তর : নখ বা চুল তৈরি হয় মৃত এপিথেলিয়াল কোষ দিয়ে। এই কোষগুলো কেরাটিন (Keratin) নামে বিশেষ এক ধরনের প্রোটিনে পূর্ণ।

নখ বহিঃত্বকের যে অংশের সাথে যুক্ত থাকে তাকে বলে নেল বেড (Nail bed)। নেল বেডের কোষগুলো ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এর ফলেই নখের দৈর্ঘ্য বাড়ে। এখন নতুন যে কোষগুলো তৈরি হচ্ছে তারা মৃত কোষে পরিণত হয় এবং কেরাটিনে পূর্ণ হয়ে উপর দিকে ওঠে আসে। হাতের আঙ্গুলের নখ আবার পায়ের আঙ্গুলের নখের চেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে। তাছাড়া গরমে বা বেশি তাপমাত্রায় আর কম বয়সেও নখ তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে।

অন্তঃত্বকের বা তারও নিচে অর্থাৎ অধঃত্বকে (Sub cutaneous layer) আছে কেশ থলি (Hair follicle)। কেশ থলির নিচের দিকে একগুচ্ছ কোষ আছে যাদের বলে হেয়ার বাল্ব (Hair bulb)। এরাই চুল সৃষ্টি করে। এখানকার কোষগুলো ক্রমাগত সংখ্যাবৃদ্ধি করে ক্রমে বহিঃত্বকের দিকে উঠতে থাকে। পুষ্টির অভাবে ওপরে তারা মৃত কোষে পরিণত হয়। পরে কেরোটিনে পূর্ণ হয়ে শক্ত হয়ে আসে। চুলের যে অংশটি দেহত্বকের বাইরে থাকে তাকে বলে স্যাফট (Shaft) আর ভেতরের অংশটিকে বলে কেশমূল (Hair root)। হেয়ার বাল্বের কোষের সংখ্যা বেড়ে ওঠে বলেই চুল বড় হয়।

○ প্রশ্ন-২০১. আমরা কিভাবে বিভিন্ন রকম গন্ধ পাই?

উত্তর : নাক আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের একটি। নাকের মধ্যে আছে গন্ধের অনুভূতি বোঝার জন্য গ্রাহক বা রিসেপ্টর। এদের নাম ঘ্রাণ গ্রাহক (Smell receptor)। গ্রাহক কোষের পাশে আছে বাওম্যান গ্রন্থি (Bowman's gland)। গন্ধযুক্ত কোনো উদ্বায়ী অর্থাৎ সহজে বাষ্পীভূত হয়ে যায় এমন পদার্থ ঐ গ্রাহক কোষগুলোর সংস্পর্শে এলে বাওম্যান গ্রন্থি থেকে বেরোনো তরল, গন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থটিকে দ্রবীভূত করে। গ্রাহক কোষ ঐ দ্রবীভূত পদার্থের সংস্পর্শে উত্তেজিত হয়। ঐ উত্তেজনা স্নায়ুর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কের ঘ্রাণকেন্দ্রে (Olfactory center) গিয়ে পৌছায়। তখন আমরা গন্ধ পাই। সাধারণত গন্ধযুক্ত পদার্থের রাসায়নিক গঠন, গন্ধের তীব্রতা, গন্ধযুক্ত পদার্থের গ্রাহক কোষের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষমতা–এসবের পার্থক্যের জন্যই আমরা গন্ধগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে বুঝতে পারি।

○ প্রশ্ন-২০২. ডায়া সেন্সর–১০০০ কি?

উত্তর : দেহের রক্তে চিনির পরিমাণ নির্ণয়ের এক প্রকার যন্ত্র যা শরীরে কোনো সূচ ফোটানো ব্যতিরেকে কর্ম সম্পাদন করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বায়োকন্ট্রোল টেকনোলজি নামক সংস্থা কর্তৃক উদ্ভাবিত এ যন্ত্রটি থেকে বিচ্ছুরিত অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet ray) শরীরে প্রবেশ করে রক্তের মধ্যে চলে যায় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই চিনির পরিমাণ নির্ণয় করে ফেলে, যা টিভি স্ক্রিন বা কম্পিউটার স্ক্রিনে ভেসে ওঠে।

○ প্রশ্ন-২০৩. ওষুধ প্রতিরোধী ক্ষমতা বা Drug Resistance কি?

উত্তর : কোনো রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতিকর প্রভাবের প্রতি জীবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা হলো ওষুধ প্রতিরোধী ক্ষমতা। এ ধরনের প্রতিরোধ এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থের প্রতি হতে পারে। বিভিন্ন ওষুধের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শরীরে ক্রমশ প্রতিরোধ অর্জিত হতে থাকে। ওষুধ প্রতিরোধ ক্ষমতা বিকাশের নানারকম কারণ রয়েছে। যেমন– কোষের ভেতরে ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া, ওষুধের বিপাকের হার বেড়ে যাওয়া, বিকল্প বিপাক ক্রিয়ার পথ সৃষ্টি হওয়া ইত্যাদি।

৩৫ তম বিসিএস

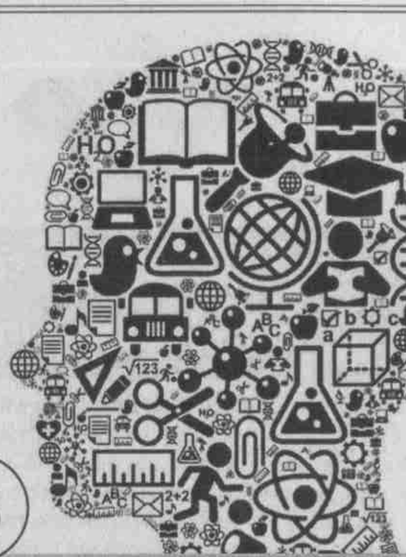

পার্ট B

কম্পিউটার এবং তথ্যপ্রযুক্তি

মান-২৫

অধ্যায় ০১	কম্পিউটার প্রযুক্তি Computer Technology
অধ্যায় ০২	তথ্যপ্রযুক্তি Imformation Technology

অধ্যায় ০১

কম্পিউটার প্রযুক্তি
Computer Technology

*Syllabus— **Computer Technology :** Organization of modern personal computer and its major functional units, computer generations, History of computers, Central processing unit and microprocessor, Computer memories and their classification and characteristics, Input and output devices with characteristics and uses. The role of BIOS. Bus architecture, Motherboard and its components, functions and organization of microprocessors, Arithmetic Logic Unit (ALU), Control unit, Language translator, Text editor, Compiler, Interpreter, Computer software, System software, Operating system, Application software with examples of applications, Computer virus, Office automation. Computational biology; Role of computer in Drug design; Programming languages, their type; and levels, Steps for software development. Impacts of computer on society.*

ক পার্সোনাল কম্পিউটারের সংগঠন, কম্পিউটার জেনারেশন ও ইতিহাস
Organization of Personal Computer & Computer Generations & History of Computers

প্রশ্ন-১. কম্পিউটার কি?

উত্তর : কম্পিউটার (Computer) শব্দটি গ্রিক কম্পিউট (Compute) শব্দ থেকে এসেছে। Compute শব্দের অর্থ গণনা করা। Computer শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। পূর্বে কম্পিউটার দিয়ে শুধু হিসাব-নিকাশের কাজই করা হতো বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কম্পিউটার হচ্ছে এমন এক ধরনের যন্ত্র যা মানুষের দেয়া যুক্তিসঙ্গত তথ্যের ভিত্তিতে অতি দ্রুত সঠিকভাবে কোনো নির্ণয় কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং এটার ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে। বর্তমান যুগে কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে এর সংজ্ঞা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। কাজের অনেক নির্দেশ কম্পিউটারের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং প্রয়োজনে এটি একটির পর একটি করে সেসব নির্দেশ নির্ভুলভাবে ত্বরিত গতিতে নির্বাহ করতে পারে। হিসাব সিদ্ধান্ত ও যুক্তিমূলক সমস্যার দ্রুত ও নির্ভুল সমাধান দিয়ে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে কম্পিউটার। এর গতি, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা মানুষের অনুরূপ ক্ষমতার তুলনায় অনেক উন্নত।

○ প্রশ্ন-২. কম্পিউটারের শ্রেণিবিভাগ দেখান।

উত্তর : প্রয়োগের তারতম্যের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার এবং
২. বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটার।

আবার, কম্পিউটারের গঠন ও প্রচলন নীতির ভিত্তিতে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. অ্যানালগ কম্পিউটার
২. ডিজিটাল কম্পিউটার এবং
৩. হাইব্রিড কম্পিউটার

আকার, সামর্থ্য, দাম ও ব্যবহারের গুরুত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মেইনফ্রেম কম্পিউটার
২. মিনি কম্পিউটার
৩. মাইক্রো কম্পিউটার এবং
৪. সুপার কম্পিউটার

নিচে ছকের সাহায্যে কম্পিউটারের পূর্ণাঙ্গ শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো :

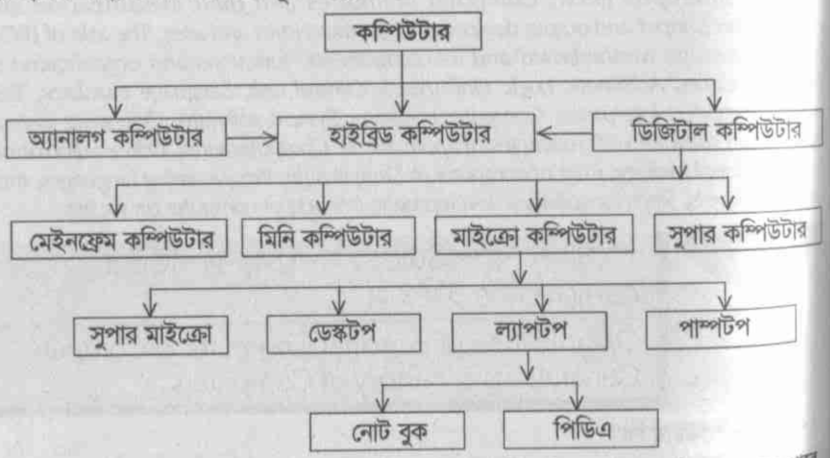

অ্যানালগ কম্পিউটার : যে কম্পিউটার একটি রাশিকে অপর একটি রাশির সাপেক্ষে পরিমাপ করতে পারে, তাই অ্যানালগ কম্পিউটার। এটি উষ্ণতা বা অন্যান্য পরিমাপ যা নিয়মিত পরিবর্তিত হয় তা রেকর্ড করতে পারে। মোটর গাড়ির বেগ নির্ণায়ক যন্ত্র অ্যানালগ কম্পিউটারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ডিজিটাল কম্পিউটার : যে কম্পিউটার সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে তাই ডিজিটাল কম্পিউটার। এটি যে কোনো গণিতের যোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে এবং বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মতো অন্যান্য অপারেশন যোগের সাহায্যে সম্পাদন করে।

হাইব্রিড কম্পিউটার : হাইব্রিড কম্পিউটার হলো এমন একটি কম্পিউটার যা এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রযুক্তি ও ভিত্তিগত দিক থেকে অ্যানালগ ও ডিজিটালের আংশিক সমন্বয়ই হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার।

Mainframe Computer

মেইনফ্রেম কম্পিউটার : মেইনফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি বড় কম্পিউটার যার সঙ্গে অনেকগুলো ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে এক সঙ্গে অনেকে কাজ করতে পারে। জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উচ্চস্তরের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শৈল্পিক ব্যবহারে এটা কাজে লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। CYBER-170, IBM-4300 এ ধরনের কম্পিউটার।

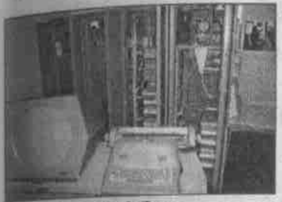
পিডিপি-১

মিনি কম্পিউটার : যে কম্পিউটারে টার্মিনাল লাগিয়ে প্রায় এক সাথে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে তাই মিনি কম্পিউটার। এটা শিল্প-বাণিজ্য ও গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। NCRS/9290, PDP-II, IBM S/36 ইত্যাদি এ শ্রেণীর কম্পিউটার। প্রথম মিনি কম্পিউটার পিডিপি-১।

মাইক্রো কম্পিউটার : মাইক্রো কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলেও অভিহিত করা হয়। ইন্টারফেস চিপ, একটি মাইক্রোপ্রসেসর CPU এবং RAM, ROM সহযোগে মাইক্রো কম্পিউটার গঠিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যায়। ম্যাকিনটোস আইবিএম পিসি এ ধরনের কম্পিউটারের উদাহরণ।

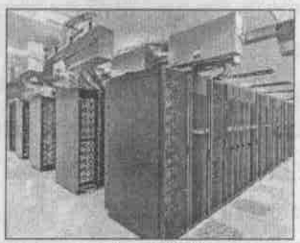
সুপার কম্পিউটার

সুপার কম্পিউটার : অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে। এ কম্পিউটারের গতি প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১ বিলিয়ন ক্যারেক্টর। পৃথিবীর আবহাওয়া বা কোনো দেশের আদমশুমারির মতো বিশাল তথ্য ব্যবস্থাপনা করার মতো স্মৃতিভাণ্ডার বিশিষ্ট কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। Supers XII, CRAY 1 ইত্যাদি সুপার কম্পিউটারের উদাহরণ।

○ প্রশ্ন-৩. কম্পিউটার বিবর্তনের ইতিহাস উল্লেখ করুন।

উত্তর : ইতিহাস ঘেটে যতটুকু জানা যায়, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে চীনাদের তৈরি অ্যাবাকাস নামক গণনাকারী যন্ত্রটিই প্রথম গণনাকারী যন্ত্র। যাকে কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ বলা হয়। তখন থেকে আজ অবধি অনেক পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান আধুনিক কম্পিউটার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটারের মৌলিক রূপরেখা তৈরি করেন ব্রিটিশ গণিত বিশারদ চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage)। ১৮৩৩ সালে তিনি পূর্ব প্রজন্মের সব যন্ত্রগণকের জন্য স্মৃতিভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'অ্যানালিটিকেল' নামক একটি যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন কারণে তাঁর এ প্রচেষ্টা বাস্তব রূপদানে সমর্থ না হলেও তাঁর এ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই আজকের আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কারণে চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের আদি পিতা বা কম্পিউটারের জনক বলা হয়ে থাকে।

১৮৮৭ সালে ড. হারম্যান হলেরিথ যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি কাজে ব্যবহারের জন্য ইলেকট্রো মেকানিক্যাল ব্যবস্থায় পাঞ্চকার্ডের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত আদমশুমারির রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে হলেরিথ এ যন্ত্র তৈরির জন্য 'হলেরিথ টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি' নাম দিয়ে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীতে এ জাতীয় আরো কয়েকটি কোম্পানি মিলে বিখ্যাত কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন' সংক্ষেপে IBM-এর জন্ম হয়।

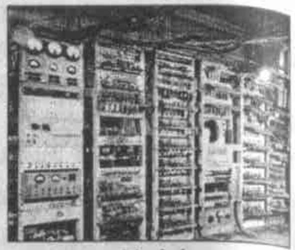

Mark-1

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হাওয়ার্ড এইচ. আইকেন আইবিএম-এর চারজন প্রকৌশলীর সহযোগিতায় ১৯৪৪ সালে Mark-1 নামে প্রথম স্বয়ংক্রিয় সাধারণ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি করেন।

১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জন মউসলি এবং তাঁর এক ছাত্র প্রেসপার একার্ট ENIAC নামে তৈরি করেন প্রথম প্রজন্মের ডিজিটাল কম্পিউটার।

১৯৪৬ সালে হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান 'সংরক্ষিত প্রোগ্রাম' (Internal Stored Program') ধারণাটি উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথম কম্পিউটারের 'তথ্য ও নির্দেশ' সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন।

এরপর জন মউসলি ও প্রেসপার একার্ট নিজেদের কোম্পানিতে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ইউনিভ্যাক-১ (UNIVAC = Universal Automatic Calculator) তৈরি করেন। এটিই সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর (Transistor) আবিষ্কৃত হওয়ার পর কম্পিউটারে ভাল্বের বদলে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার শুরু হয়। ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলো আকারে ছোট হয়ে যেতে শুরু করে। এ কম্পিউটারগুলো আগের কম্পিউটার অপেক্ষা উন্নত ছিল।

ট্রানজিস্টরের পর আসে আইসি (IC)-এর ব্যবহার। সিলিকন বা সেমিকন্ডাক্টর-এর একটি ক্ষুদ্র অংশে একাধিক ট্রানজিস্টর সন্নিবেশিত করা হলে তাকে বলা হয় আইসি বা সমন্বিত সার্কিট (Integrated Circuit-IC)। আইসি ব্যবহার করে তৈরি হলো নতুন প্রজন্মের কম্পিউটার।

কম্পিউটারের সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে। ১৯৭১ সালে আমেরিকার ইন্টেল (Intel) নামক কোম্পানি সর্বপ্রথম মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) তৈরি করে। ফলে দাম কমে যায়, ব্যবহারের সুবিধা বেড়ে যায় এবং কাজের ক্ষমতা হাজার হাজার গুণ বেড়ে যায়। মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটারকেই আধুনিক মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৪. কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি?

উত্তর : কম্পিউটার নিম্নলিখিত চারটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। যথা :

১. সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী কর্তৃক তৈরি প্রোগ্রাম (Program) কম্পিউটার গ্রহণ করে, মেমোরিতে (Memory) সংরক্ষণ করে এবং ব্যবহারকারীর নির্দেশে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নির্বাহ (Execute) করে।
২. কীবোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ডিস্ক ইত্যাদি ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটার ডেটা (Data) গ্রহণ করে।
৩. ডেটা প্রসেস (Process) করে এবং
৪. মনিটর, প্রিন্টার, ডিস্ক ইত্যাদি আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে কম্পিউটার ফলাফল প্রকাশ করে।

○ প্রশ্ন-৫. অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অ্যানালগ কম্পিউটার	ডিজিটাল কম্পিউটার
অ্যানালগ কম্পিউটারে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সংকেত বা অ্যানালগ সংকেত ব্যবহার করা হয়। অ্যানালগ সংকেতের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পর্যায়ক্রমিকভাবে ওঠানামা করা।	ডিজিটাল কম্পিউটারে ডিজিটাল সংকেত বা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু বা বন্ধ করে হিসাবকার্য করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এটি '০' ও '১' দিয়ে সব ধরনের কাজের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
চাপ, তাপ, তরলের প্রবাহ ইত্যাদি পরিবর্তনশীল ডেটার জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে অ্যানালগ কম্পিউটারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	ডিজিটাল কম্পিউটারে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের জন্য ইনপুট হিসেবে বর্ণ ও অঙ্ক ব্যবহার করা হয়।
অ্যানালগ কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত ফলাফলকে সাধারণত কাঁটার সাহায্যে অথবা প্লোটারের সাহায্যে অঙ্কিত গ্রাফের আকারে বা ছবি এঁকে প্রকাশ করা হয়।	ডিজিটাল কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল সরাসরি মনিটরে বা অন্য কোনো আউটপুট ডিভাইসে প্রদর্শিত হয়।
অ্যানালগ কম্পিউটারে সূক্ষ্মতা কম, অর্থাৎ মোটামুটি ০.১%।	ডিজিটাল কম্পিউটারের সূক্ষ্মতা অনেক বেশি, কারণ যোগ-বিয়োগ করার সময় দশমিকের পর অনেক বেশি ঘর (নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত) ব্যবহার করা যায়।
মোটর গাড়ির স্পিডোমিটার, স্লাইড রুল, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি অ্যানালগ কম্পিউটার।	সাধারণত আধুনিক কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকেই বুঝায়। এর সাহায্যে সব ধরনের কাজ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৬. ডেটা এবং ইনফরমেশনের পার্থক্য কি? *[২৯তম; ২৭তম বিসিএস]*

উত্তর :

ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য

ডেটা বা উপাত্ত	ইনফরমেশন বা তথ্য
সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে।	ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ডেটা যা সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য (Useful)।
ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা।	ডেটাকে প্রসেস করে ইনফরমেশন পাওয়া যায়।
ডেটা পুরোপুরি কোনো ভাবার্থ প্রকাশ করে না।	ইনফরমেশন কোনো বিষয়ের ভাবার্থ প্রকাশ করে যা ব্যবহারকারী বুঝতে পারে।
ডেটা ইনফরমেশনের ওপর নির্ভর করে না। উদাহরণ : ফলাফল, দ্বিতীয়, ০০১, মিরাজ, ০০২, প্রথম, সুমাইয়া, পরীক্ষা, বার্ষিক ইত্যাদি ডেটা।	ইনফরমেশন ডেটার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ : বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল রোল / নাম / মেধাস্থান ০০১ / মিরাজ / প্রথম ০০২ / সুমাইয়া / দ্বিতীয়

০ প্রশ্ন-৭. কম্পিউটার প্রজন্ম কি? বিভিন্ন প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যাবলি উল্লেখ করুন।

উত্তর : কম্পিউটার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় এসেছে। পরিবর্তন বা বিকাশের একেকটি পর্যায় বা ধাপকে একেকটি প্রজন্ম (Generation) বলা হয়। একেকটি প্রজন্মের পরিবর্তনের সময় নতুন বৈশিষ্ট্যগুলো প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং একইসঙ্গে পুরনো ব্যবস্থাও পাশাপাশি অবস্থান করে। পরবর্তীতে এক সময় পুরনো ব্যবস্থা উঠে যায় এবং নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হয়। এভাবেই এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মের সূচনা হয়।

কম্পিউটারে ইলেকট্রনিক্সের প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটারকে কয়েকটি প্রজন্মে বা জেনারেশনে ভাগ করা যায়। নিচে বিভিন্ন প্রজন্মের (Generation) কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্যাবলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

প্রথম প্রজন্ম কম্পিউটার (First Generation Computer) (১৯৫১-১৯৫৯) : পঞ্চাশ দশকের কম্পিউটারকেই প্রথম প্রজন্মের কম্পিউটার হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। বায়ুশূন্য টিউব দ্বারা এ সময়ের কম্পিউটার তৈরি হতো। হাজার হাজার ডায়োড ও ট্রায়োড ভাল্ব, রেজিস্টার, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি হতো বলে এরা আকারে অনেক বড় ছিল এবং এসব টিউব ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ খরচও পড়তো অনেক বেশি।

বৈশিষ্ট্য :

১. ভ্যাকুয়াম টিউববিশিষ্ট ইলেকট্রনিক বর্তনীর বহুল ব্যবহার,
২. চুম্বকীয় ড্রাম মেমোরির ব্যবহার,
৩. মেশিন ভাষার মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান ও প্রোগ্রামে অর্থসূচক নির্দেশ সংকেত বা কোড-এর ব্যবহার।
৪. ডেটা সংরক্ষণের জন্য ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক টিউব অথবা মার্কারি ডিলে লাইন-এর ব্যবহার এবং সীমিত ডেটা ধারণক্ষমতা,
৫. ইনপুট/আউটপুট ব্যবস্থার জন্য পাঞ্চকার্ডের ব্যবহার,
৬. বিশাল আকৃতির ও সহজে বহন অযোগ্য,
৭. কম নির্ভরশীলতা ও স্বল্প গতিসম্পন্ন,
৮. অত্যধিক বিদ্যুৎ শক্তির খরচ ও
৯. রক্ষণাবেক্ষণ ও উত্তাপ সমস্যা।

উদহারণ : UNIVAC-I, IBM 650, IBM 704, IBM 709, Mark II, Mark III ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রজন্ম কম্পিউটার (Second Generation Computer) (১৯৫৯-১৯৬৫) : ১৯৫৯ সাল থেকে কম্পিউটারে ভাল্বের পরিবর্তে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালে আমেরিকার বেল ল্যাবরেটরিতে উইলিয়াম বি শকলে (William B. Shokly), জন বার্ডিন (Jon Berdeen) এবং এইচ ব্রাটেন (H. Bratain) সম্মিলিতভাবে ট্রানজিস্টর তৈরি করেন। ট্রানজিস্টর আবিষ্কৃত হওয়ার পর কম্পিউটার প্রযুক্তির জন্য এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

বৈশিষ্ট্য :

১. ট্রানজিস্টরের ব্যবহার।
২. চুম্বকীয় কোর মেমোরির ব্যবহার ও ম্যাগনেটিক ডিস্কের উদ্ভব।
৩. উচ্চ গতিবিশিষ্ট ইনপুট/আউটপুট সরঞ্জাম।
৪. ফরট্রান ও কোবলসহ উচ্চতর ভাষাক উদ্ভব।

৫. আকৃতির সংকোচন।
৬. তাপ সমস্যার অবসান।
৭. টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে ডেটা প্রেরণের ব্যবস্থা।
৮. গতি ও নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি।

এ প্রজন্মের একটি কম্পিউটার IBM 1620 দিয়ে ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে কম্পিউটার ব্যবহারের সূচনা হয়। এ কম্পিউটারটি ঢাকার পরমাণু শক্তি কেন্দ্রে সুদীর্ঘ কয়েক বছর চালু ছিল।

উদাহরণ : Honeywell 200, IBM 1620, IBM 1400, CDC 1604, RCA 301, RCA 501, NCR 300, GE 200, IBM 1600 ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রজন্ম কম্পিউটার (Third Generation Computer) (১৯৬৫-১৯৭১) : তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা সমন্বিত চিপ (Integrated Circuit বা IC) থাকে যাতে অনেক অর্ধপরিবাহী ডায়োড, ট্রানজিস্টর এবং অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রাংশ থাকে। এর ফলশ্রুতিতে কম্পিউটারের আকার আরো ছোট হয়ে আসে, দাম কমে যায়, বিদ্যুৎ খরচ কমে যায়; কাজের গতি ও নির্ভরশীলতা বহুগুণে বেড়ে যায়।

বৈশিষ্ট্য :

১. একীভূত বর্তনী বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের (IC) ব্যাপক প্রচলন।
২. অর্ধপরিবাহী মেমোরির উদ্ভব ও বিকাশ।
৩. আকৃতির সংকোচন।
৪. উন্নত কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা।
৫. মিনি কম্পিউটারের প্রচলন।
৬. উচ্চতর ভাষার বহুল প্রচলন।
৭. ভিডিও মনিটর ও লাইন প্রিন্টারের প্রচলন এবং নির্বাহী পদ্ধতির উন্নয়ন।

উদাহরণ : IBM 360, IBM 370, PDP-8, PDP-11, GE 600 ইত্যাদি।

চতুর্থ প্রজন্ম কম্পিউটার (Fourth Generation Computer) (১৯৭১-বর্তমানকালে) : বর্তমানে আমরা যে সকল কম্পিউটার ব্যবহার করছি এ সকল কম্পিউটারই চুতর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার হিসেবে পরিচিত। এ সময় থেকে কম্পিউটারে অর্ধপরিবাহী মেমোরি প্রবর্তিত হয় এবং LSI (Large Scale Integration) ও VLSI (Very Large Scale Integration) প্রযুক্তি মাধ্যমে তৈরি মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) ব্যবহার হয়। ফলে কম্পিউটারের আকার ও দাম আরো কমে যায় এবং কাজ করার ক্ষমতা কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

বৈশিষ্ট্য :

১. বৃহদাকার একীভূত বর্তনী (VLSI)।
২. মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) ও মাইক্রোকম্পিউটার (বা পার্সোনাল কম্পিউটার) এর প্রসার ও প্রচলন।
৩. বর্ধিত ডেটা ধারণক্ষমতা।
৪. নির্ভরযোগ্যতার উন্নতি।
৫. সরাসরি প্রয়োগের জন্য প্রোগ্রাম প্যাকেজের ব্যাপক প্রচলন।

উদাহরণ : IBM 3033, HP 3000, IBM 4341, TRS 80, Sharp PC-1211, IBM PC Power PC ইত্যাদি।

পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার (Fifth Generation Computer) (ভবিষ্যৎ প্রজন্ম)।

Super VLSI (Very Large Scale Integration) চিপ ও অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার তৈরি হবে। এটি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রচুর ডেটা ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার। এ কম্পিউটারের বিশেষত্ব হলো প্রতি সেকেন্ডে ১০০ থেকে ১৫০ কোটি লজিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। মানুষের কণ্ঠস্বর শনাক্ত করার ক্ষমতা ও কণ্ঠে দেয়া নির্দেশ বুঝতে পেরে কাজ করতে পারবে এ কম্পিউটার। আমেরিকা ও জাপান পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার চালুর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমানে আমরা যেসব কম্পিউটার ব্যবহার করি সেগুলো চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার।

বৈশিষ্ট্য :

১. বহু মাইক্রোপ্রসেসরবিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।
২. কৃত্রিম বুদ্ধির ব্যবহার।
৩. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবারের (Optical Fiber) ব্যবহার।
৪. প্রোগ্রাম সামগ্রীর উন্নতি।
৫. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ।
৬. চৌম্বক বাবল মেমোরি।
৭. ডেটা ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
৮. অধিক সমৃদ্ধশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার।
৯. বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার-কম্পিউটারের উন্নয়ন ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৮. পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার বলতে কি বোঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন। *[৩৩তম ও ৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : *উপরের প্রশ্নোত্তরে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার অংশ দেখুন।*

○ প্রশ্ন-৯. ৬ষ্ঠ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : ৬ষ্ঠ প্রজন্মের কম্পিউটারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

i. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন।
ii. মৌখিক ভাষা ব্যবহার করে কম্পিউটার চালনা।
iii. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবারের ব্যবহারের ফলে গতিবৃদ্ধি।
iv. পেন্টিয়াম প্রসেসর ব্যবহার।
v. মেমোরি ও ডেটা ধারণক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
vi. বহু মাইক্রোপ্রসেসর বিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।

○ প্রশ্ন-১০. আধুনিক কম্পিউটারের সংগঠন বর্ণনা করুন।

উত্তর : আধুনিক কম্পিউটারের প্রধান সাংগঠনিক অংশগুলো হলো : ১. ইনপুট ইউনিট (Input Unit); ২. অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit) বা গাণিতিক যুক্তি অংশ; ৩. কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ; ৪. মেমোরি (Memory); ৫. আউটপুট ইউনিট (Output Unit)। অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও মেমোরিকে একত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বলা হয়।

১. **ইনপুট ইউনিট :** ইনপুট দিয়ে কম্পিউটারকে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজের নির্দেশ ও নির্দেশ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা দেয়া হয়। এ ইউনিটে বিশেষ মাধ্যম থেকে ডেটা ও প্রোগ্রাম গ্রহণ করে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরের পর কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষণ করে। কিছু ইনপুট যন্ত্রপাতির নাম : ক. কী-বোর্ড, খ. মাউস, গ. জয়স্টিক, ঘ. ডিস্ক, ঙ. স্ক্যানার, চ. কার্ড রিডার, ছ. ডিজিটাল ক্যামেরা, জ. মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

২. **সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ :** কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ যা কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। সিপিইউ যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, হিসাব-নিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। সিপিইউ'র মধ্যে তিনটি প্রধান ইউনিট থাকে। যেমন–
ক. অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট (ALU) বা গাণিতিক যুক্তি অংশ।
খ. কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ ও
গ. মেমোরি বা স্মৃতি ভাণ্ডার।

৩. **আউটপুট ইউনিট :** আউটপুট ইউনিট প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল মানুষের অনুধাবনযোগ্যরূপে উপস্থাপন করে। কিছু আউটপুট যন্ত্রপাতি হলো :
ক. মনিটর, খ. প্রিন্টার, গ. প্লোটার, ঘ. মাইক্রোফিল্ম, ঙ. ডিস্ক, চ. স্পিকার ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-১১. কম্পিউটার সিস্টেম কি? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : সিস্টেম হলো কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. একটি সিস্টেমে একাধিক উপাদান (Elements) থাকবে।
২. সিস্টেমের উপাদানগুলোর একটি অপরটির সাথে লজিক্যাল সম্পর্ক থাকবে।
৩. সিস্টেমের সকল উপাদানগুলো এমনভাবে কন্ট্রোল করা হবে যাতে সিস্টেমের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

কম্পিউটার সিস্টেম কতগুলো ইন্টিগ্রেড উপাদান (ইনপুট/ আউটপুট যন্ত্রপাতি, মেমরি, সিপিইউ ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত যা প্রোগ্রামের লিখিত নির্দেশাবলী পালন করে। ইনপুট বা আউটপুট যন্ত্রপাতিগুলো সিপিইউ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজ করতে পারে না। অনুরূপভাবে মেমোরিও এককভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। কাজেই সকল উপাদান একত্রে মিলে কাজ করে একটি উদ্দেশ্য সাধন করে।

○ প্রশ্ন-১২. কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদান আলোচনা করুন।

উত্তর : সিস্টেম হলো কতগুলো ইন্টিগ্রেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো নিম্নরূপ : ১. হার্ডওয়্যার ২. সফটওয়্যার ৩. হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী ও ৪. ডেটা/ ইনফরমেশন।

১. **হার্ডওয়্যার (Hardware) :** কম্পিউটারের বাহ্যিক আকৃতিসম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও ডিভাইসসমূহকে হার্ডওয়্যার বলে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে প্রাথমিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
ক. **ইনপুট যন্ত্রপাতি :** কী-বোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, ডিস্ক, স্ক্যানার, কার্ড রিডার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, অপটিক্যাল বা আলোকীয় বর্ণ রিডার, ভিজুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট ইত্যাদি।

খ. **সিস্টেম ইউনিট (System Unit) :** সিপিইউ বা মাইক্রোপ্রসেসর, র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, মাদারবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, ভিজিএ/এজিপি কার্ড, নেটওয়ার্ক কার্ড, সাউন্ড কার্ড, সিডিরম ড্রাইভ, কনসোল ইত্যাদি।

গ. **আউটপুট যন্ত্রপাতি :** মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, মাইক্রোফিল্ম, ডিস্ক, স্পিকার ইত্যাদি।

২. **সফটওয়্যার (Software) :** সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফটওয়্যার বলে। কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. **সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software) :** সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে নিয়োজিত রাখে।

খ. **অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার :** ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার বলা হয়। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য অনেক রকম তৈরি প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রামও বলা হয়।

৩. **হিউম্যানওয়্যার :** ডেটা সংগ্রহ, প্রোগ্রাম বা ডেটা সংরক্ষণ ও পরীক্ষাকরণ, কম্পিউটার চালানো তথা প্রোগ্রাম লেখা, সিস্টেমগুলো ডিজাইন ও রেকর্ড লিপিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণ, সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যারের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কাজগুলোর সাথে যুক্ত সকল মানুষকে একত্রে বলা হয় হিউম্যানওয়্যার (Humanware)।

৪. **ডেটা/ইনফরমেশন :** ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম একককে ডেটা বলে। ডেটা হলো সাজানো নয় এমন কিছু বিশৃঙ্খল ফ্যাক্ট (Raw Fact)। ডেটা প্রধানত দুরকম। যথা : (ক) নিউমেরিক (Numeric) ডেটা বা সংখ্যাবাচক ডেটা। যেমন— ২৫, ১০০, ৪৫৬ ইত্যাদি এবং (খ) অ-নিউমেরিক (Non-numeric) ডেটা। যেমন— মানুষ, দেশ ইত্যাদির নাম, জীবিকা, জাতি কিংবা ছবি, শব্দ ও তারিখ প্রভৃতি।

○ প্রশ্ন-১৩. কম্পিউটার কি পদ্ধতিতে কাজ করে?

উত্তর : কম্পিউটার কাজ করে বিদ্যুতের স্রোতবাহিত সংকেতের মাধ্যমে। কম্পিউটারে আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজের জন্য কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় তথ্য (Data) প্রদান করতে হয়। আর সেই তথ্য প্রদান করার কাজটিকে বলা হয় কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া। তথ্য বা ইনপুট (Input) পাওয়ার পর কম্পিউটার তার ব্যবহারকারীর নির্দেশ মতো ঐ তথ্য নিয়ে কাজ করে বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ হলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে ঐ কাজের ফলাফল জানিয়ে দেয়।

○ প্রশ্ন-১৪. কম্পিউটার ও মানুষের অমিল কোথায়?

উত্তর : কম্পিউটার ও মানুষের কাজ করার পদ্ধতির মধ্যে বেশ অমিল পরিলক্ষিত হয়। সবচেয়ে প্রধান যে বৈসাদৃশ্য তা হলো কম্পিউটার নিজে থেকে কোনো কিছু করতে পারে না। মানুষ তাকে যা নির্দেশ দিবে কম্পিউটার কেবল তাই করতে পারে। তবে কম্পিউটার মানুষের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেও তা করে অতিশয় বিশ্বস্তভাবে, নির্ভুলভাবে ও দ্রুতগতিতে। মানুষ চিন্তা করতে পারে, কম্পিউটার তা পারে না। মানুষের উদ্ভাবনী (IQ) শক্তি আছে, কম্পিউটারের তা নেই। মানুষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে কম্পিউটারকে কি করতে হবে, কিভাবে করতে হবে ইত্যাদি নির্দেশাবলী আগে দিয়ে দেয়। আর কম্পিউটার ঐ নির্দেশ অনুযায়ী দ্রুতগতিতে সমস্যার সমাধান করে দেয়।

○ প্রশ্ন-১৫. কম্পিউটার ও মানুষের কাজ করার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়?

উত্তর : কম্পিউটারে আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজের জন্য কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় তথ্য (Data) প্রদান করতে হয়। আর এই তথ্য প্রদানের কাজটিকে বলা হয় কম্পিউটারে ইনপুট (Input) দেয়া। ইনপুট পাওয়ার পর কম্পিউটার তার ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ তথ্য নিয়ে কাজ করে বা তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ হলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে ঐ কাজের ফলাফল জানিয়ে দেয়। এবার মানুষের কাজের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, কারো শরীরে একটি মশা কামড় দিলো। সঙ্গে সঙ্গে খবরটি মস্তিষ্কে চলে যাবে। এটা হলো ইনপুট (Input)। এরপর মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাজ শুরু করে দিল। এ পর্যায়ের কাজটিই হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণের (Processing) কাজ। প্রক্রিয়াকরণের পর মস্তিষ্ক হাতকে নির্দেশ দিল মশাকে মারার জন্য। নির্দেশ অনুযায়ী হাত মশাকে থাপ্পড় দিল। এই থাপ্পড় দেয়াটা হচ্ছে আউটপুট (Output)। তাই বলা যায়, কম্পিউটার ও মানুষের কাজের পদ্ধতিগত বেশ মিল রয়েছে।

○ প্রশ্ন-১৬. ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : ক্যালকুলেটর একটি ছোট আকারের গণক যন্ত্র। এটা দ্বারা কেবল গণনা করা যায়। অন্যদিকে কম্পিউটার একটি বড় আকারের গণনা যন্ত্র। তবে গণনা ছাড়াও কম্পিউটারের রয়েছে সীমাহীন প্রোগ্রামিং ক্ষমতা। ক্যালকুলেটরে ব্যবহৃত ডিজিট সংখ্যা সাধারণত কম। যেমন— ৮-১০ বা ১২-১৩ ডিজিট। কম্পিউটারে ব্যবহৃত ডিজিট সংখ্যার কোনো সীমাবদ্ধতা নেই। এটা দিয়ে যে কোনো সংখ্যার কাজ করা যায়। ক্যালকুলেটরের স্মৃতিভাণ্ডার খুব ছোট, অনেক সময় ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে, কম্পিউটারের রয়েছে বিশাল স্মৃতিভাণ্ডার। এতে অস্থায়ী এবং স্থায়ী দু'ধরনের স্মৃতিভাণ্ডারই কাজ করে। ক্যালকুলেটরের তথ্য বিশ্লেষণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু কম্পিউটারের তথ্য বিশ্লেষণ ক্ষমতা অসীম।

○ প্রশ্ন-১৭. নেপিয়ারের হাড় কি?

উত্তর : ভাগ ও গুণের কাজের সহায়তার জন্য যন্ত্রের প্রচলন করেন জন নেপিয়ার নামক একজন স্কটিশ গণিতবিদ। তিনি ১৬১৭ সালে হিসাবে সহায়তার জন্য দাগ কাটা ও সংখ্যা বসানো কাঠি ব্যবহার করে এক ধরনের যন্ত্রের প্রচলন করেন। কাঠি দিয়ে তৈরি হওয়ায় এ যন্ত্রটির নাম হয়েছে নেপিয়ার হাড় (Napier's Bone)। নেপিয়ারের যন্ত্রে দশটি দণ্ড আছে। প্রত্যেক দণ্ডে দশটি সংখ্যা আছে।

○ প্রশ্ন-১৮. 'HAL-9000' কি?

উত্তর : একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার। এটি মানুষের মুখের ভাষা বুঝে কোনো বিষয়ে যৌক্তিক আলোচনা করতে পারে। ভালো দাবাও খেলে। ১৯৯৭ সালের ১২ জানুয়ারি মার্কিন বিজ্ঞানী স্ট্যানাল কুবরিক এটি কম্পিউটার আধুনিকায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করেন।

○ প্রশ্ন-১৯. আইবিএম (IBM) এবং এপল (Apple) কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : আইবিএম (IBM) এবং এপল (Apple) কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য হলো—

ক. আইবিএম-এ DOS এবং চিত্রভিত্তিক উইন্ডোজ দুই পরিবেশেই কাজ করা যায়। কিন্তু এপল ম্যাকিনটোশের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়েছে শুধু চিত্রভিত্তিক GUI (Graphical User Interface) যা বর্ণভিত্তিক থেকে খুবই সহজ।

খ. আইবিএম কম্পিউটারে ইন্টেল বা অন্যান্য কোম্পানির তৈরি ইন্টেলের অনুরূপ প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। এপল ম্যাকিনটোশে মটোরোলার তৈরি প্রসেসর ব্যবহৃত হয়।

গ. এপল ম্যাকিনটোশ শুধুমাত্র Apple নামক একটি কোম্পানি তৈরি করে বলে এর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু IBM অনেক দেশেই তৈরি হয়। তাই প্রতিযোগিতার জন্য এদের দাম দিন দিন কমে যাচ্ছে।

ঘ. এপল কম্পিউটার সাধারণত প্রকাশনা জগতে বেশি ব্যবহৃত হয়। IBM কম্পিউটার প্রকাশনা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ঙ. এপল কম্পিউটারের সিপিইউ (সিস্টেম ইউনিট) তুলনামূলকভাবে IBM কম্পিউটারের চেয়ে ছোট আকৃতির।

○ প্রশ্ন-২০. ফ্রিওয়্যার ও শেয়ারওয়্যার কি?

উত্তর : ফ্রিওয়্যার ও শেয়ারওয়্যার দুই ধরনের ব্যবহারিক সফটওয়্যার। ফ্রিওয়্যারের জন্য কোনো খরচ দিতে হয় না। অনেক প্রোগ্রামার বা প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত সফটওয়্যার সর্বসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এ সফটওয়্যারকে বলা হয় ফ্রিওয়্যার। সামান্য রেজিস্ট্রেশন ফি এর বিনিময়ে শেয়ারওয়্যার ব্যবহার করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক রকম ফ্রিওয়্যার ও শেয়ারওয়্যার সংগ্রহ করা যায়।

○ প্রশ্ন-২১. এবাকাস কি?

উত্তর : গণনার জন্য সর্বপ্রথম অঙ্কভিত্তিক যে যন্ত্রটির নাম জানা যায় তা হলো এবাকাস। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০/৫০০ অব্দে চীন/মিশরে গণনার জন্য এই ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এবাকাস দেখতে একটি ট্রে-এর মতো। একটি আয়তাকার কাঠের ট্রেতে উল্লম্বভাবে নয়-দশটি তার আটকানো থাকে। ট্রেটির মাঝখানে একটি পার্টিশন দিয়ে ওপর ও নিচ অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক তারের উপরের অংশে দুটি ও নিচের অংশে পাঁচটি ছিদ্র করা গুটি ঢুকানো থাকে।

খ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (সিপিইউ), মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমোরি ও মেমোরির শ্রেণিবিন্যাস

Central Processing Unit (CPU), Microprocessor and Computer Memories & their Classification

○ প্রশ্ন-১২. সিপিইউ কি? এর প্রধান কাজগুলো কি? *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ বলে। সিপিইউ কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক' বা 'ব্রেইন' স্বরূপ। কম্পিউটারের কাজ করার গতি এবং ক্ষমতা সিপিইউ-এর ওপর নির্ভরশীল।

সিপিইউ-এর কিছু কাজ নিচে দেয়া হলো :

১. কম্পিউটারের সব অংশের নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ সংকেত (Timing & Control signals) প্রদান করা।
২. মেমোরি ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে ডেটার আদান-প্রদান করা (Transferring data)
৩. মেমোরি থেকে ডেটা ও ইন্সট্রাকশন নেয়া (Fetching instructions & data)
৪. ইন্সট্রাকশন ডিকোড করা (decode)
৫. গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বা সিদ্ধান্তমূলক কাজ করা (Arithmetic & logical operations)
৬. কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা ও
৭. ইনপুট ও আউটপুট অংশগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন করা ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২৩. সিপিইউ কোন কোন অংশ নিয়ে গঠিত? বর্ণনা করুন।

উত্তর : সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত। যথা :

১. রেজিস্টার সমূহ (Register Set)
২. গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic & Logic Unit—ALU)
৩. নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit)

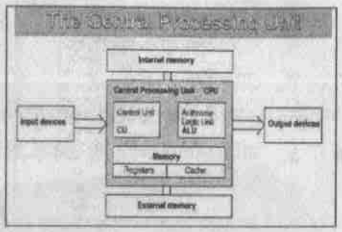

রেজিস্টার সেট : প্রক্রিয়াকরণের সময় অস্থায়ীভাবে ডেটা সংরক্ষণের জন্য সিপিইউ-এর ভেতর ইলেক্ট্রনিক সার্কিট দিয়ে গঠিত রেজিস্টারসমূহ দরকার হয়। এ রেজিস্টারগুলো অ্যাকিউমুলেটর রেজিস্টার, ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার, অ্যাড্রেস রেজিস্টার, সাধারণ রেজিস্টার, বিশেষ ব্যবহারকার্যের রেজিস্টার ইত্যাদি।

গাণিতিক যুক্তি অংশ (Arithmetic Logic Unit–ALU) : অ্যারিথম্যাটিক অ্যান্ড লজিক্যাল ইউনিট কম্পিউটারের ইন্সট্রাকশনগুলো নির্বাহ (Execution) করার জন্য মাইক্রো অপারেশনগুলো (Micro Operation) পালন করে। এটি কম্পিউটারের গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বা সিদ্ধান্তমূলক কাজ করে।

নিয়ন্ত্রণ অংশ (Control Unit) : কন্ট্রোল ইউনিট সিপিইউ-এর রেজিস্ট্রেশনসমূহ এবং গাণিতিক যুক্তি অংশের মধ্যে ডেটার আদান-প্রদান তদারকি করে এবং গাণিতিক অংশ কি কাজ করবে তার ইনস্ট্রাকশন প্রদান করে। তাছাড়া কম্পিউটারের সব অংশের নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ সংকেত প্রদান করে।

○ প্রশ্ন-২৪. মাইক্রোপ্রসেসর কি? এর প্রধান প্রধান কাজগুলো কি?

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI– Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ (Chip)। কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউকে ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়।

মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রো কম্পিউটার বা মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক পদ্ধতির 'মস্তিষ্ক' বা 'ব্রেইন' স্বরূপ। মাইক্রোপ্রসেসরের প্রকৃতি ও ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে মাইক্রো কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সমাধান করা হয়। নিচে এ ধরনের কয়েকটি কাজের নাম দেয়া হলো :

১. কম্পিউটারের সব অংশের নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ সংকেত প্রদান করা;
২. মেমোরি ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে ডেটার আদান-প্রদান করা;
৩ মেমোরি থেকে ডেটা ও ইনস্ট্রাকশন নেয়া;
৪. ইনস্ট্রাকশন ডিকোড করা;
৫. গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বা সিদ্ধান্তমূলক কাজ করা;
৬. কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা;
৭. ইনপুট ও আউটপুট অংশগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

এসব প্রক্রিয়ার জন্য মাইক্রোপ্রসেসর চিপের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিট থাকে। মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে প্রোগ্রামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের মেমোরি অংশে সংরক্ষণ করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৫. মাইক্রোপ্রসেসরের গঠন ও প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরে সংগঠনকে মোটামুটিভাবে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো হলো :

ক. নিয়ন্ত্রণ অংশ ও সময় নির্ধারণ

খ. গাণিতিক যুক্তি অংশ ও

গ. রেজিস্টার

সংগঠন অনুযায়ী মাইক্রোপ্রসেসরসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. মাইক্রোকন্ট্রোলার বা একক-চিপ মাইক্রোকম্পিউটার

২. বিট-স্লাইস মাইক্রোপ্রসেসর ও

৩. সাধারণ প্রয়োগ মাইক্রোপ্রসেসর।

অনেক অর্ধপরিবাহী কোম্পানি এসব মাইক্রোপ্রসেসর বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুত করে। যেমন— ইন্টেল কর্পোরেশন, সাইরিক্স লি, অ্যাডভান্সড মাইক্রো ডিভাইস লি, মটরোলা ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২৬. সিপিইউ এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সিপিইউ বলে। কম্পিউটারের কাজ করার গতি সিপিইউ-এর উপর নির্ভরশীল।

মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI-Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ (Chip)। মাইক্রো কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়।

মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন ও কাজ এবং সিপিইউ-এর সংগঠন ও কাজ একই রকম। মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য (কাজ) চিপের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিট থাকে। মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে প্রোগ্রামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের মেমোরি অংশে সংরক্ষণ করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৭. কম্পিউটার মেমোরি বা স্মৃতি কি? মেমোরি বা স্মৃতি কত প্রকার ও কি কি? *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : ডেটা (Data) সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মাধ্যম বা ধারককে কম্পিউটারের মেমোরি বা স্মৃতি বলা হয়। প্রক্রিয়াকরণের সুবিধার জন্য মেমোরিতে ডেটা জমা রাখা যায় এবং প্রয়োজনে তা সহজে কাজে লাগানো যায়।

মেমোরি বা স্মৃতির প্রকারভেদ : কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত মেমোরিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

১. প্রধান বা মুখ্য (Main বা Primary) মেমোরি।

২. সহায়ক বা গৌণ (Auxiliary বা Secondary) মেমোরি।

৩. ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) বা প্রসেসর মেমোরি।

নিচে ছকের সাহায্যে মেমোরির প্রকারভেদ দেখানো হলো :

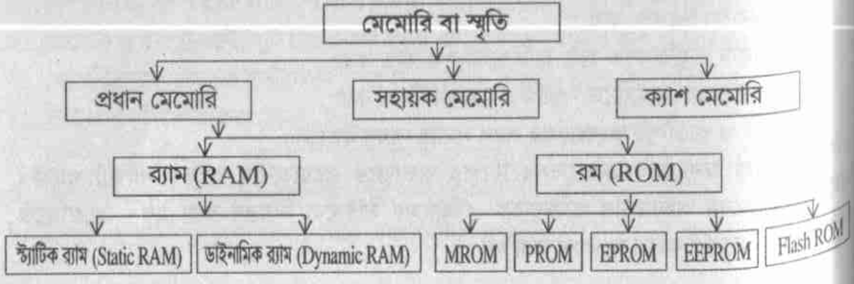

১. **প্রধান বা মুখ্য মেমোরি (Main memory, Main Storage বা Primary Storage) :** যে মেমোরির সঙ্গে অ্যারেথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট (ALU) প্রত্যক্ষ অ্যাকসেস থাকে তাকে প্রধান মেমোরি বলে। অত্যন্ত দ্রুত গণনা করতে সক্ষম ALU-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ অ্যাকসেস থাকায় প্রধান মেমোরিকেও অত্যন্ত দ্রুত গতিসম্পন্ন হতে হয়।

প্রধান মেমোরির প্রকারভেদ : নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রধান মেমোরির নাম দেয়া হলো :

ক. চৌম্বক কোর (Magnetic core) মেমোরি

খ. পাতলা পর্দা (Thin film) মেমোরি

গ. অর্ধপরিবাহী (Semiconductor) মেমোরি

ঘ. চৌম্বক বাবল (Magnetic bubble) মেমোরি ও

ঙ. চার্জ কাপলড (Charge coupled) মেমোরি।

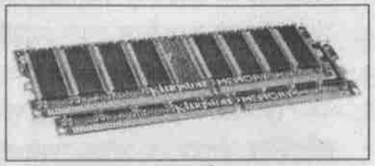
মেমোরি

২. **সহায়ক বা গৌণ (Secondary, Auxiliary বা Back-up) মেমোরি :** সহায়ক মেমোরিতে সেসব ডেটা ও নির্দেশই থাকে যা মুহূর্তে গণনার জন্য প্রয়োজন না হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রয়োজন হয়। নিচে কয়েকটি সহায়ক মেমোরির নাম দেয়া হলো :

ক. হার্ড ডিস্ক (Hard Disk)

খ. সিডি (CD – Compact Disk)

গ. সিডি-আর (CD-R – Copact Disk Readable)

ঘ. সিডি-আরডব্লিউ (CD-RW–Copact Disk Rewritable)

ঙ. ডিভিডি-র‍্যাম (Digital Video Disk-Random Access Memory)

চ. ডিভিডি-আর (DVD-R-DVD- Recordable)

ছ. ডিভিডি-আর ডব্লিউ (DVD-RW Digital Versatile Disk–Rewritable)

জ. পেনড্রাইভ (Pen Drive)

ঝ. রিমুভাল হার্ড ড্রাইভ (Removal Hard Drive)

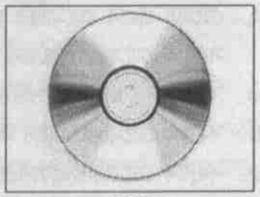
সিডি

এছাড়াও অধুনালুপ্ত সহায়ক মেমোরিগুলো হচ্ছে :

ক. ম্যাগনেটো অপটিক্যাল ডিস্ক (Magneto Optical Disk)

খ. জিপ ডিস্ক (ZIP Disk)

গ. ডিজিটাল টেপ (Digital Tape)

ঘ. চৌম্বক টেপ (Magnetic Tape)

ঙ. চৌম্বক ড্রাম (Magnetic Drum)

চ. ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk)

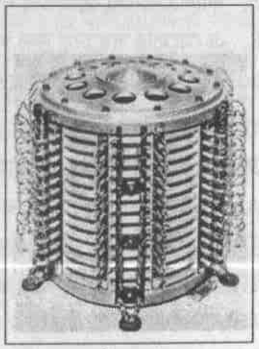
চৌম্বক ড্রাম

৩. **ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) :** যেসব নির্দেশ ও ডেটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদের কোনো উচ্চ গতিসম্পন্ন মেমোরিতে রাখলে গড় অ্যাকসেস সময় কম হওয়ায় কম্পিউটার অতি দ্রুত কাজ করে। এজন্য এসব নির্দেশ ও ডেটা রাখা হয় ক্যাশ মেমোরিতে।

○ প্রশ্ন-২৮. কম্পিউটার মেমোরি কয়ভাগে ভাগ করা যায়? এদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটার মেমোরির শ্রেণিবিভাগ : উপরের প্রশ্নোত্তর দেখুন।

মেমোরির বৈশিষ্ট্য : তিন প্রকার মেমোরির বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো :

প্রধান বা মুখ্য মেমোরি : প্রধান মেমোরির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

১. কম্পিউটার চালু করার পর অপারেটিং সিস্টেমের একটি অংশ সহায়ক মেমোরি হতে প্রধান মেমোরিতে চলে এসে কম্পিউটারকে নিয়ন্ত্রণ করে।

২. কম্পিউটার বন্ধ করে দিলে প্রধান মেমোরিতে সংরক্ষিত তথ্য মুছে যায়।

৩. প্রসেসরের সাথে সরাসরি সংযোগ থাকায় প্রধান মেমোরিতে তথ্য সংরক্ষণ ও তা পঠনের গতি দ্রুত হয়।

৪. প্রধান মেমোরি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতি কোষ নিয়ে গঠিত।

৫. কম্পিউটার মাধ্যমে যে কোনো সফটওয়্যারে কাজ করতে হলে প্রথমে ঐ সফটওয়্যারটি সহায়ক মেমোরি হতে প্রধান মেমোরিতে নিয়ে আসতে হয়।

সহায়ক বা গৌণ মেমোরি : সহায়ক মেমোরির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো নিম্নরূপ :

১. কম্পিউটারে বিভিন্ন তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য সহায়ক মেমোরিগুলো ব্যবস্থা করা হয়।

২. যেহেতু প্রধান মেমোরির RAM/ROM-এ কিছু লেখা যায় না তাই সকল তথ্য লেখার জন্য সহায়ক মেমোরি প্রয়োজন হয়।

৩. বিদ্যুৎ চলে গেলে বা কম্পিউটার বন্ধ করলেও সহায়ক মেমোরির তথ্যে কোনো সমস্যা হয় না বা মুছে যায় না।

৪. সহায়ক মেমোরির ধারণ ক্ষমতা প্রধান মেমোরির তুলনায় অনেক বেশি।

৫. সহায়ক মেমোরির প্রকারভেদ অনেক বেশি এবং নিত্য নতুন সহায়ক মেমোরির উদ্ভব হচ্ছে।

ক্যাশ মেমোরি : ক্যাশ মেমোরির বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

১. ক্যাশ মেমোরি সিপিইউ এর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে।

২. ক্যাশ মেমোরি সরাসরি মাইক্রোপ্রসেসরের কাজে ব্যবহৃত হয়।

৩. ক্যাশ মেমোরি রেজিস্টার নামক ক্ষুদ্রতম মেমোরি ইউনিট নিয়ে গঠিত।

৪. এ মেমোরি সবচেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন।

৫. ক্যাশ মেমোরির ধারণক্ষমতা সবচেয়ে কম।

○ প্রশ্ন-২৯. 'র‍্যাম (RAM)' এবং 'রম (ROM)' কি?

উত্তর : র‍্যাম (RAM) : র‍্যাম (RAM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে র‍্যানডম এক্সেস মেমোরি (Random Access Memory)। এটি কম্পিউটারের অস্থায়ী তথ্য রাখার ভাণ্ডার যেখানে কম্পিউটারের প্রতি মুহূর্তে চলমান সব ডেটা এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। র‍্যামে সব তথ্য জমা থাকে অস্থায়ী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে, যার ফলে কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে এর সব তথ্য মুছে যায়, যা আর পুনরুদ্ধার করা কখনই সম্ভব হয় না।

রম (ROM) : রম (ROM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি (Read Only Memory)। এটি কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি। কম্পিউটার বন্ধ করলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে রমের স্মৃতিতে রক্ষিত সব তথ্যাবলী অক্ষত বা অপরিবর্তিত থাকে। রমের রক্ষিত তথ্যের কোনো সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় না।

○ প্রশ্ন-৩০. র‍্যাম ও রমের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : র‍্যাম (RAM) কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতি, এটি অস্থায়ী মেমোরি। আবার রম (ROM) কম্পিউটারের প্রধান স্মৃতি, এটি স্থায়ী মেমোরি এবং কম্পিউটার পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী। ইনপুট ডিভাইস থেকে আগত সমস্ত তথ্য RAM-এ এসে জমা হয় এবং প্রক্রিয়াজাত হওয়ার জন্য অবস্থান করে। ROM-এ কোনো তথ্য আসতে পারে না। র‍্যাম-এ যে কোনো ধরনের তথ্য সংযোজন-সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়। রমে এ ধরনের কিছুই করা যায় না।

○ প্রশ্ন-৩১. হার্ড ডিস্ক কি?

উত্তর : অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন শক্ত ম্যাগনেটিক ডিস্ককে হার্ড ডিস্ক বলা হয়। এর ধারণ ক্ষমতা সাধারণত ৪০ মেগাবাইট থেকে কয়েক গিগাবাইট পর্যন্ত হতে পারে। হার্ড ডিস্ক ফ্লপি ডিস্ক-এর চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ও টেকসই হয়। হার্ড ডিস্কে অনেকগুলো শক্ত ডিস্ক একটি দণ্ডে স্থায়ীভাবে পরপর সাজানো থাকে। প্রতিটি ডিস্কের উপর ও নিচে রিড বা রাইট হেড থাকে এবং এরা ডিস্কের যে কোনো ট্র্যাকে কাজ করতে পারে। মিনিটে ১০০০ থেকে ৭২০০ বার বা তার উপরে ঘুরতে পারে। জোরে ঘূর্ণায়নের সময় রিড বা রাইট হেডগুলো ডিস্কের উপর ভেসে থাকে। ফলে ঘূর্ণনের জন্য হেডের কোনো ক্ষতি হয় না।

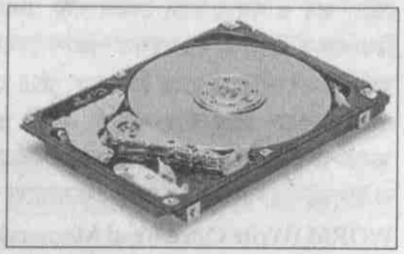

○ প্রশ্ন-৩২. কম্প্যাক্ট ডিস্ক (Compact Disk) বা সিডি কি?

উত্তর : অডিও, ভিডিও কিংবা উপাত্ত সংরক্ষণের অপটিক্যাল সংরক্ষক (Storage device)। এই পদ্ধতিতে একটি ঘূর্ণায়মান ডিস্কে মাইক্রোস্কোপিক পিট আকারে ডিজিটাল সংকেতকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। যা পরবর্তী সময়ে অপটিক্যাল পদ্ধতি বা লেজারের মাধ্যমে পড়া হয়। অডিও মাধ্যমে কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা সিডি (CD) বর্তমানে বহুল প্রচলিত। পাশাপাশি ভিডিও ও কম্পিউটার উপাত্ত সংরক্ষণের জন্যও এর প্রয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

যেহেতু ফোকাসকৃত লেজার বিন্দুর আকার খুব ছোট, সেহেতু একটি ডিস্কে অনেক বেশি তথ্য ধরে রাখা সম্ভব হয়। যেমন বর্তুলাকৃতির দুটি ট্র্যাকের মাঝখানের ব্যবধান মাত্র ১.৬ মাইক্রোমিটার হলেই হয়। কাজেই, ১২ সে.মি. ব্যাসের একটি ডিস্কে ২০,০০০ ট্র্যাকের সন্নিবেশ করা সম্ভব। ভিডিও রেকর্ডিং-এর জন্য যেহেতু অধিকতর ব্যাপ্তিসীমা (bandwidth)-এর প্রয়োজন সেহেতু ভিডিও সিডি জনপ্রিয় হতে আরও কিছু সময় লাগতে পারে। তবে, ইতিমধ্যে রেকর্ডিং-এর ভুলের মাত্রা শূন্যে নেমে আসাতে উপাত্ত স্টোরেজের ক্ষেত্রে সিডি ক্রমাগত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

○ প্রশ্ন-৩৩. ফ্লপি ডিস্ক কি?

উত্তর : অপেক্ষাকৃত কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চৌম্বকীয় পদার্থের আবরণ লাগানো পাতলা ডিস্ককে ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk) বলে। সাধারণ ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ৭২০/৮০০ কিলোবাইট পর্যন্ত এবং হাই ডেনসিটি (High Density) ফ্লপি ডিস্কের ধারণ ক্ষমতা ১.২/১.৪ মেগাবাইট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন আকারের স্থায়ী প্লাস্টিকের খাম বা জ্যাকেটের মধ্যে গানের রেকর্ডের মতো মাইলারের তৈরি চাকতি থাকে। জ্যাকেটের মধ্যে চাকতিটি প্রতি মিনিটে ৩০০ থেকে ৪০০ পাক ঘুরতে পারে। এ চাকতিটি অত্যন্ত পাতলা বলে এর নাম Floppy Disk। ৮, ৫.২৫, ৩.৫ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ফ্লপি ডিস্ক পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-৩৪. ম্যাগনেটিক টেপ ডিস্ক কি?

উত্তর : গোলাকার নমনীয় বা ধাতব চাকতির উপর চৌম্বক পদার্থের আবরণ দিয়ে তাতে টেপের মতই ডেটা সংরক্ষণ করা হয়। নমনীয় চাকতিগুলো ফ্লপি ডিস্ক বা ডিস্কেট এবং শক্ত চাকতিগুলো হার্ড ডিস্ক নামে পরিচিত। ফ্লপি ডিস্ক সাধারণত ৮˝, ৫.২৫˝ এবং ৩.৫˝ মাপের হয়ে থাকে। ডিস্কগুলোতে কতগুলো পর পর সাজানো সমকেন্দ্রিক বৃত্তের মতো তথ্যগুলো বিন্যস্ত থাকে। এই বৃত্তগুলোকে বলা হয় Track। প্রতিটি ট্র্যাক সমান সংখ্যক ক্যারেক্টার ধারণ করতে পারে।

○ প্রশ্ন-৩৫. CD ROM এবং WORM কি?

উত্তর : CD ROM : CD ROM হলো Compact Disk Read Only Memory। সিডি থেকে ডেটা, ছবি ও শব্দ ইত্যাদি কেবল পড়া, দেখা এবং শোনা যায় কিন্তু লেখা যায় না। সাধারণত এ ডিস্কগুলোর ধারণক্ষমতা ছয়শত পঞ্চাশ মেগাবাইটের বেশি। অর্থাৎ ডিমাই সাইজের সাড়ে তিন লক্ষ পৃষ্ঠার বইয়ে যে পরিমাণ লেখা থাকতে পারে তার সবটুকু একটি ৭০০ মেগাবাইট ক্ষমতাসম্পন্ন সিডি রমে ধারণ করা যায়। বর্তমান বিশ্বে আধুনিক বা ইলেকট্রনিক্স লাইব্রেরি সিডি রম এর সাহায্যে স্থাপিত হচ্ছে।

WORM (Write Once Read Memory) : এটি একটি লিখনযোগ্য অপটিক্যাল ডিস্ক। এ ডিস্কের ব্যবহারকারী তাদের প্রয়োজনীয় বিষয় মাত্র একবারই রেকর্ড করতে পারে। এতে লেজার রেকর্ডিং পদ্ধতিতে ডেটা রেকর্ড করার সময় ডিস্কের উপরিভাগের প্রলেপ লেজার রশ্মির সাহায্যে পুড়িয়ে, গলিয়ে বা অন্যভাবে রূপান্তর করে ডেটা লিখনের কাজ করা হয়। অপরিবর্তিত অংশ শূন্য (0) বিট হিসেবে বিবেচিত হয়। ডিস্ক ব্যবহারের সময় কম শক্তির লেজার রশ্মির 0 (শূন্য) এবং 1 বিট থেকে প্রতিফলিত ডেটা সনাক্ত করা হয়। এ ডিস্কের ধারণকৃত ডেটা পরিবর্তনযোগ্য নয়।

○ প্রশ্ন-৩৬. EPROM এবং EEPROM এর বৈশিষ্ট্য লিখুন?

উত্তর : EPROM হলো Erasable Programmable Read Only Memory। ইপিরমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

ক. প্রোগামের মাধ্যমে ব্যবহারকারী নিজেই ইপিরমে ডেটা সংরক্ষণ করতে পারেন। সংরক্ষিত ডেটা মুছে ইপিরমকে পুনঃ প্রোগ্রাম করা সম্ভব।

খ. ইপিরম উদ্বায়ী নয় অর্থাৎ প্রোগ্রামকৃত ডেটা কোনো অবস্থায়ই মুছে ফেলা যায় না।

গ. সাধারণত অতি বেগুনী রশ্মি ব্যবহারের মাধ্যমে ইপিরমে সংরক্ষিত ডেটা মুছে দেয়া হয়।

EEPROM হলো Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. ইইপিরমের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো :

ক. ব্যবহারকারী প্রোগ্রামের মাধ্যমে ইইপিরমে ডেটা সংরক্ষণ করতে পারেন। এতে সংরক্ষিত ডেটা ইলেকট্রিক্যাল পদ্ধতিতে মুছে পুনঃ পুনঃ প্রোগ্রাম করা যায়।

খ. প্রোগ্রাম করার সময় ইইপিরমকে সকেট থেকে খুলতে হয় না।

গ. ইইপিরমে ডেটা সংরক্ষণ করতে এবং এতে সংরক্ষিত ডেটা মুছতে ইপিরমের তুলনায় অনেক কম সময় লাগে।

○ প্রশ্ন-৩৭. বিট, বাইট এবং ওয়ার্ড কি?

উত্তর : বিট (Bit) : Bit শব্দটি Binary Digit-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ যাবতীয় কার্যপ্রণালী বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিই হলো কম্পিউটারের কার্য নির্বাহের মূল ভিত্তি। এ বাইনারি পদ্ধতির মৌলিক দু'টি অঙ্ক '0' এবং '1'। '0' এবং '1' কে বিট বলে।

বাইট (Bite) : আটটি বিট নিয়ে একটি বাইট গঠিত। কম্পিউটারের বাইটের দ্বারা বর্ণ, অংশ এবং বিশেষ চিহ্নকে নির্দিষ্ট করা হয়। এক্ষেত্রে স্মৃতিস্থানে বাইট সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা থাকে।

শব্দ (Word) : কয়েকটি বিট নিয়ে একটি কম্পিউটার শব্দ গঠিত হয়। একটি কম্পিউটার শব্দ তৈরিতে এক বা একাধিক বাইট ব্যবহৃত হতে পারে। কম্পিউটারের ডেটা নির্দেশক শব্দকে ডেটা ওয়ার্ড (Data Word) এবং নির্দেশ (Instruction) নির্দেশক শব্দকে ইনস্ট্রাকশন ওয়ার্ড (Instruction word) বলে। কম্পিউটার শব্দ গঠনে ব্যবহৃত বিট সংখ্যাকে বলে শব্দ দৈর্ঘ্য (Word Length)। শব্দ দৈর্ঘ্য সাধারণত ৮ বা ৮-এর গুণিতক।

○ প্রশ্ন-৩৮. মেমোরি ও অ্যাড্রেস কি?

উত্তর : প্রত্যেক মেমোরি সেলে একটি নির্দিষ্ট অ্যাড্রেস থাকে, যার সাহায্যে ঐ মেমোরি সেলকে শনাক্ত করা বা খুঁজে বের করা যায় অনুরূপভাবে প্রত্যেক শব্দ বা রেজিস্টারের একটি বিশেষ নম্বর থাকে যার দ্বারা সেই শব্দ বা রেজিস্টারের অবস্থান জানা যায়। একে বলে অ্যাড্রেস।

○ প্রশ্ন-৩৯. মেমোরির ধারণ ক্ষমতা কি?

উত্তর : কম্পিউটার মেমোরিতে বাইটের সংখ্যাকে তার ধারণ ক্ষমতা বলে। একে প্রকাশ করা হয় বাইট, কিলোবাইট, মেগাবাইট, গেগাবাইট ইত্যাদি দ্বারা।

১ বাইট (Byte) = ৮ বিট (Bit)

১ কিলোবাইট (KB) = $২^{১০}$ বাইট বা ১০২৪ বাইট

১ মেগাবাইট (MB) = $২^{২০}$ বাইট বা ১০২৪ কিলোবাইট

১ গেগাবাইট (GB) = $২^{৩০}$ বাইট বা ১০২৪ মেগাবাইট

○ প্রশ্ন-৪০. ডিভিডি (DVD) কি?

উত্তর : ডিভিডির পূর্ণ রূপ হচ্ছে Digital Versatile Disk বা Digital Video Disk। সিডি-রম প্রযুক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ডিভিডি নামক নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ডিভিডি সিডি রম-এর চাইতে বহুগুণ বেশি ডেটা ধারণ করতে পারে। সিডিতে এক পার্শ্বে ডেটা সংরক্ষণ করা হয় কিন্তু ডিভিডিতে এক পার্শ্বে কিংবা উভয় পার্শ্বেই ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। আবার ডিভিডিতে সিঙ্গেল লেয়ার কিংবা ডবল লেয়ার ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। এসব কারণে সিডি রমের উন্নততর ডেটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা হচ্ছে ডিভিডি। একটি ডিভিডিতে ৪.৭ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট পর্যন্ত ডেটা সংরক্ষণ করা যায়।

ডিভিডি সিডি রমের মতোই অডিও-ভিডিও ধারণ করতে সক্ষম। একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য মুভি সংরক্ষণ করার জন্য একটি সিঙ্গেল সাইডের ডিভিডিই যথেষ্ট। ডিভিডি ড্রাইভ প্রচলিত সিডি রমও পাঠ করতে পারে। এসব কারণেই ডিভিডির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। ডিভিডির মূল্যও সাধারণের নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে।

প্রশ্ন-৪১. ভারচ্যুয়াল মেমোরি কি?

উত্তর : আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমোরির (যেমন– হার্ডডিস্কে) ফাঁকা স্থানকে প্রধান মেমোরির অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ অবস্থাকে ভারচ্যুয়াল মেমোরি বলে। যদি ভারচ্যুয়াল মেমোরি অন করা হয় তাহলে কোনো হার্ডডিস্কের যে পরিমাণ স্থান প্রধান মেমোরির অংশ তথা ভারচ্যুয়াল মেমোরি হিসেবে ব্যবহার করা হবে হার্ডডিস্কে ডেটা সংরক্ষণের জন্য সে পরিমাণ স্থান কম পাওয়া যাবে। আবার ভারচ্যুয়াল মেমোরি অফ করে দিলেই হার্ডডিস্কের যে খালি স্থান ভারচ্যুয়াল মেমোরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ডেটা সংরক্ষণের জন্য খালি পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন-৪২. ক্যাশ মেমোরি কি?

উত্তর : কম্পিউটারের কাজের দ্রুততা আনয়নের জন্য প্রসেসর ও প্রধান মেমোরির মধ্যবর্তী সস্থানে সস্থাপিত এক বিশেষ ধরনের মেমোরিকে ক্যাশ মেমোরি বলে। ক্যাশ মেমোরির কাজের গতি বেশি, ধারণক্ষমতা অন্যান্য মেমোরির তুলনায় অনেক কম। ক্যাশ মেমোরি প্রধান মেমোরির তুলনায় দ্রুতগতিতে কাজ করতে পারে।

গ ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস
Input and Output Devices

প্রশ্ন-৪৩. ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ইনপুট ডিভাইস : ইনপুট হলো বাইরে থেকে কোনো ডেটা বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো। কম্পিউটারের যেসব যন্ত্রাংশের মাধ্যমে এতে বিভিন্ন ধরনের ডেটা এন্ট্রি করা হয় সেসব যন্ত্রাংশকে ইনপুট ডিভাইস বা গ্রহণমুখ যন্ত্রাংশ বলে। কীবোর্ড ও মাউস হলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইস।

উদাহরণ : কীবোর্ড, মাউস, স্ক্যানার, ওসিআর (OCR), ওএমআর (OMR), ডিজিটাইজার, ডিজিটাল ক্যামেরা, বারকোড রিডার ইত্যাদি।

আউটপুট ডিভাইস : ইনপুট প্রদানের পর CPU প্রক্রিয়াকরণের কাজ সম্পন্ন করে ও প্রয়োজনীয় ফলাফল প্রদান করে। ফলাফল পাওয়ার জন্য যেসব যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় আউটপুট ডিভাইস বা আউটপুট যন্ত্রাংশ। ইনপুটকৃত ডেটা কম্পিউটার মেমোরি সংরক্ষণ করে ও প্রসেসরের সাহায্যে প্রক্রিয়াকরণ করে আউটপুট ডিভাইসের মাধ্যমে প্রদর্শন করে।

উদাহরণ : মনিটর, প্রিন্টার, হার্ডডিস্ক, স্পিকার, প্লটার ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৪৪. 'কী-বোর্ড' ও 'স্ক্যান কোড' কি?

উত্তর : কী-বোর্ড : এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের মতো। টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের বোতামগুলো শুধু অক্ষর টাইপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, কম্পিউটারের কী-বোর্ডের বোতামের সাহায্যে টাইপ ছাড়াও কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

স্ক্যান কোড : কী-বোর্ডে প্রত্যেকটি কীর একটি অনন্য কোড আছে, যাকে স্ক্যান কোড বলা হয়। এ কোড কী-বোর্ডের নকশার ওপর নির্ভর করে না। একই অক্ষর একাধিক কীতে পরিদৃষ্ট হলেও প্রত্যেকটি কীর কোড কিন্তু ভিন্ন। যেমন– ডান ও বাম Shift কী দুটির স্ক্যান কোড আলাদা।

প্রশ্ন-৪৪. কী-বোর্ড কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : কম্পিউটার কী-বোর্ডের সাথে অনুক্রমিক বা সিরিয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। কী-বোর্ডের সাথে কম্পিউটারকে সংযুক্ত করার জন্য সাধারণত পাঁচ বা ছয় পিনের DIN সংযোজন ব্যবহার করা হয়। এ সংযোজনের মাধ্যমে আট বিট প্রস্থের ডেটা অনুক্রমিকভাবে বিনিময় করা হয়। কী-বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যেমন কী-বোর্ডের অভ্যন্তরে মাইক্রোপ্রসেসর থাকে, তেমনি কম্পিউটার অভ্যন্তরে কী-বোর্ড সংক্রান্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানের জন্য কী-বোর্ড কন্ট্রোলার চিপ থাকে।

কী-বোর্ডে কোনো একটি কী চাপ দেয়ার মুহূর্তের মাঝেই সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি মনিটরের পর্দায় প্রতীয়মান হয়। কোনো একটি অক্ষরের সাথে সংশ্লিষ্ট কী চাপ দেয়ার সময় থেকে মনিটরের পর্দায় অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত কি ঘটে তার প্রতি ধাপের পর্যানুক্রমিক বর্ণনা নিচে দেয়া হলো :

১. কী-বোর্ডের অভ্যন্তরস্থ চিপ প্রথমে কোন কীটি চাপ দেয়া হয়েছে তা নির্ধারণ করে।
২. কী-বোর্ড কন্ট্রোলার চিপ এরপর কীর সাথে জড়িত কী-কোডট কী-বোর্ড বাফারে (Keyboard buffer) সংরক্ষণ করে এবং একই সাথে কী-বোর্ড ক্যাবল দিয়ে কী-কোডটি কম্পিউটারকে পাঠায়।
৩. কী-বোর্ড কন্ট্রোলার কীবোর্ডের জন্য নির্ধারিত ইনপুট মুখ দিয়ে কী কোডটি পড়ে এবং কী বোর্ডের নকশার ওপর ভিত্তি করে কী-কোডকে স্ক্যান কোডে রূপান্তরিত করে।
৪. কী-বোর্ড কন্ট্রোলার এরপর ৯ নং বায়োস ইন্টেরাপ্টের মাধ্যমে কম্পিউটারকে একটি স্ক্যান কোডের উপস্থিতির কথা অবগত করায়। বায়োসে এ পর্যায় থেকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
৫. কী-বোর্ডের ইন্টেরাপ্ট হ্যান্ডলার স্ক্যান কোডটি পড়ে এবং কোন কীটি চাপ দেয়া বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে তা নির্ধারণ করে এবং স্ক্যান কোডটি কোন কন্ট্রোল অক্ষরের ইন্টেরাপ্ট হ্যান্ডলার ঐ কন্ট্রোল অক্ষরের নির্ধারিত কাজটি সম্পন্ন করে। অর্থাৎ অক্ষরটি মনিটরে দেখা যায়।

প্রশ্ন-৪৬. OMR ও OCR কি? এদের সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।

অথবা, **Optical Mark Reader (OMR) কি? এর ব্যবহার লিখুন। OMR এর সুবিধা-অসুবিধা লিখুন।** *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : OMR (অপটিক্যাল মার্ক রিডার) : এটি একটি যন্ত্র যা পেন্সিল বা কালির দাগ বুঝতে পারে। পেন্সিলের দাগ বোঝা যায় পেন্সিলের সীসের উপাদান গ্রাফাইটের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতা বিচার করে। কালির দাগ বোঝা যায় কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করে। বিশেষ ব্যবস্থায় এ দাগগুলো তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন ঘটায়, ফলে কম্পিউটার দাগের অস্তিত্ব বুঝতে পারে।

সাধারণত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, জনমত জরিপ, আদমশুমারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। OMR ব্যবহারের জন্য প্রথমে কাগজের উপর সুনির্দিষ্ট নিয়মে তৈরি ছকের বিভিন্ন ঘর কালি অথবা নরম পেন্সিল দিয়ে পূরণ করতে হয়। OMR পূরণ করা চিহ্নের সংকেত কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রেরণ করে। যে ঘরের চিহ্ন পূরণ করা হয় সেই ঘরে আলোর প্রতিফলন ঘটে এবং যে ঘরের চিহ্ন

পূরণ করা হয় না সে ঘরে আলো প্রতিফলিত হয় না। পূরণ করা ঘরগুলোর ভিত্তিতে তৈরি সংকেত কম্পিউটারের প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটে প্রেরিত হয়। প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বা প্রসেসর সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের সাহায্যে ঐ সব সংকেত থেকে প্রকৃত তথ্য গঠনপূর্বক ফলাফল বা আউটপুট প্রদান করে থাকে।

সুবিধা :

১. কোনো উত্তরপত্র বা ডকুমেন্ট পরীক্ষা করলে ভুল বা পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে না।
২. দ্রুতগতিতে পরীক্ষা করা যায়।

অসুবিধা :

১. পেন্সিলের গ্রাফাইটের উপাদানগত সমস্যা থাকলে পড়তে পারে না।
২. কালির উপাদানগত সমস্যা থাকলে পড়তে পারে না।
৩. দামি কাগজের প্রয়োজন হয়।

OCR (অপটিক্যাল ক্যারেক্টর রিডার) : OCR শুধু দাগই বোঝে না, বিভিন্ন রঙের পার্থক্যও বোঝে। OCR কোনো বর্ণ পড়ার সময় সেই বর্ণের গঠন অনুযায়ী কতগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে। OCR-এ আগে থেকেই প্রত্যেক বর্ণের বৈদ্যুতিক সংকেত কম্পিউটারে জমা রাখা থাকে। এর সাথে মিলিয়ে কোন বর্ণ পড়া হচ্ছে OCR তা বুঝতে এবং কম্পিউটারে জমা রাখতে পারে। চিঠির পিন কোড, ইলেকট্রিক বিল, ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম নোটিস ইত্যাদি পড়ার জন্য OCR ব্যবহৃত হয়।

সুবিধা :

১. কম্পিউটারে তথ্য দেয়ার জন্য মানুষকে একই কাজ বারবার করতে হয় না।
২. সময় বাঁচায়।
৩. ডেটার সূক্ষ্মতা বিচারে সাহায্য করে।
৪. ডেটা খুব তাড়াতাড়ি প্রসেস করা যায়।

অসুবিধা :

১. লেখা যদি আঁকাবাঁকা বা ঝাপসা হয় তবে ভুল ফলাফল প্রদান করতে পারে।
২. যদি পেন্সিলের গ্রাফাইটের উপাদানগত সমস্যা থাকে তাহলে পড়তে পারে না।
৩. যদি কালির উপাদানগত সমস্যা থাকে তাহলে পড়তে পারে না।

○ প্রশ্ন-৪৭. OMR ও OCR এর পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : OMR এবং OCR দুটোই ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। OCR এবং OMR এর পার্থক্য নিম্নরূপ :

অপটিক্যাল মার্ক রিডার (OMR)	অপটিক্যাল ক্যারেক্টর রিডার (OCR)
১. OMR এর পূর্ণরূপ Optical Mark Reader.	১. OCR এর পূর্ণরূপ Optical Character Reader.
২. OMR এর সাহায্যে কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করা হয় এবং পেন্সিলের সীসের উপাদান গ্রাফাইটের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বিচার করা হয়।	২. এটি কোনো বর্ণ পড়ার সময় সেই বর্ণের গঠন অনুযায়ী কতগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে।
৩. এটি পেন্সিলের বা কালির দাগ বুঝতে পারে।	৩. এটি কাগজে পেন্সিল বা কালির দাগ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন বা বর্ণ পঠন সম্ভব।
৪. পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র পরীক্ষণে OMR ব্যবহৃত হচ্ছে।	৪. চিঠির পিন কোড, ইলেকট্রিক বিল, বাজার সমীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে OCR ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৪৮. MICR (ম্যাগনেট ইংক ক্যারেক্টার রিডার) কি?

উত্তর : এক্ষেত্রে ম্যাগনেট ইংক বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালির সাহায্যে লেখা হয়। এ কালিতে লেখা কাগজ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) চুম্বকে পরিণত হয়। এরপর এ বর্ণচুম্বকগুলো তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে। এ আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান থেকে MICR কোন বর্ণ পড়া হচ্ছে বুঝতে পারে ও কম্পিউটারে তা সঞ্চিত রাখে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয়। MICR প্রতি মিনিটে আড়াই হাজারের বেশি চেক পাঠ করে কম্পিউটারের প্রসেসরে প্রেরণ করতে পারে।

MICR-এর সুবিধা :

১. ব্যাংক চেক যদি দলিত-মথিত, ভাঁজযুক্ত বা স্টাম্পড (Stamped) করাও হয়ে থাকে তবু MICR সূক্ষ্মভাবে চেক নাম্বার পড়তে পারে।
২. দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে।

MICR-এর অসুবিধা :

১. MICR গাণিতিক দশটি সংখ্যা এবং বিশেষ সংখ্যা ছাড়া কিছুই পড়তে পারে না।

○ প্রশ্ন-৪৯. মাউস (Mouse) কি?

উত্তর : মাউস হচ্ছে ক্যাবল (Cable) বা তারের সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত ছোট একটি যন্ত্রাংশ। তারের প্রান্ত ধরে যন্ত্রটি ঝুলিয়ে ধরলে যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মত দেখায়। মাউসটি নাড়াচড়া করলে কম্পিউটারের পর্দায় একটি তীর (Arrow) নড়াচড়া করে। তীরটির গতিবিধি বা চলাচল টেবিলের উপর রাখা মাউস নাড়াচড়া করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং পর্দার তীরটিকে বিভিন্ন নির্দেশের (Command) উপর ক্লিকিং করে কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করতে হয়। তাছাড়া মাউসের সাহায্যে পর্দায় লিখিত বিষয়, গ্রাফ, ছবি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণসহ আরও নানা কাজ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৫০. স্ক্যানার কি?

উত্তর : স্ক্যানার দেখতে অনেকটা ফটোকপি মেশিনের মতো। উচ্চতা প্রায় চার/পাঁচ ইঞ্চি। স্ক্যানারের সাহায্যে ক্যামেরায় তোলা ছবি বা যে কোনো মুদ্রিত ছবি, লেখা ইত্যাদি হুবহু কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া যায়। স্ক্যানারের সাহায্যে কম্পিউটারে নেয়া ছবি, লেখা ইত্যাদি যে কোনো প্রোগ্রামের বিষয়বস্তুর মধ্যে বসিয়ে প্রিন্ট করা যায়। এর সাহায্যে কম্পিউটারে নেয়া ছবি ইচ্ছামত সম্পাদনা করা যায়। অর্থাৎ ছোট বড় করা যায়, অংশ বিশেষ বা যে কোনো দিক কেটে বাদ দেয়া যায়, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যায় ও রঙের কাজ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৫১. জয়স্টিক (Joystick) কি?

উত্তর : আয়তাকার বেসের উপর বসানো একটি দণ্ড। বেসের সঙ্গে কম্পিউটারের যোগ থাকে। মনিটরের পর্দার একটি ছোট আলোক চিহ্নকে বলে কার্সর (Cursor)। জয়স্টিকের সাহায্যে কার্সরকে পর্দার উপর ইচ্ছামত যে কোনো জায়গায় সরানো যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে ভিডিও গেম খেলার জন্য একটি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস হচ্ছে জয়স্টিক।

○ প্রশ্ন-৫২. ইন্টারফেস কাকে বলে? ইন্টারফেসের প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : কম্পিউটারের সাথে পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো অর্থাৎ I/O (input/output) ডিভাইসগুলোর সংযোগের প্রক্রিয়াকে ইন্টারফেস বলে। সাধারণত কোনো ডিজিটাল ব্যবস্থার দুই অংশের মধ্যে সংযুক্ত লজিক সার্কিটই ইন্টারফেস।

সিপিইউ এবং বিভিন্ন ইনপুট/আউটপুট (I/O) ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ প্রক্রিয়াকে I/O ইন্টারফেস বলে। প্রত্যেক I/O ব্যবস্থার জন্য একটি ইন্টারফেস দরকার হয়।

ইন্টারফেসের প্রয়োজনীয়তা :

১. ইন্টারফেস ইনপুট ডিভাইস থেকে সিপিইউতে ডেটা ইনপুট করা ও সিপিইউ থেকে ফলাফল আউটপুট ডিভাইসে পাঠানোর কাজ নিয়ন্ত্রক।
২. সিপিইউ-এর গতির সাথে ইনপুট ও আউটপুটের গতিকে Synchronize বা সমন্বয় করার জন্য ইন্টারফেস ব্যবহৃত হয়।
৩. বাইরে থেকে অনাহুত কোনো ডেটার প্রবেশ ও নির্গম ঠেকানোর জন্য ইন্টারফেস-এর প্রয়োজন হয়। ইন্টারফেস সব পেরিফেরালদের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, যাতে CPU বা অন্য পেরিফেরালের কাজে বাধা সৃষ্টি না করে।

○ প্রশ্ন-৫৩. মনিটর কি? মনিটরের প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

উত্তর : কম্পিউটারের সাথে টিভির পর্দার মতো যে অংশ থাকে তাকে মনিটর বলে। সিপিইউ-এর নির্দেশ অনুযায়ী কোনো তথ্যাবলী মনিটরের পর্দায় প্রদর্শিত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মনিটরে সাধারণত ২৫ লাইন লেখা ধরে এবং ৭৫ থেকে ৮০টি বর্ণ ধরে।

প্রচলিত সকল মনিটরকে রঙের উপর ভিত্তি করে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. রঙিন (Colour) মনিটর : পর্দায় সকল রং ফুটে উঠে।
২. একরঙা বা মনোক্রম (Monochrome) মনিটর : কালো পর্দায় সাদা বা অন্য রঙের অক্ষর ফুটে উঠে।
৩. গ্রে স্কেল (Grey scale) মনিটর : পর্দায় সকল রং সাদা-কালোতে ফুটে উঠে।

প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে মনিটরকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. ক্যাথোড রশ্মি টিউব (Cathod Ray Tube-CRT) মনিটর ও
২. ফ্ল্যাট প্যানেল (Flat Panel) মনিটর।

○ প্রশ্ন-৫৪. VDU কি?

উত্তর : VDU-এর পূর্ণরূপ ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট। এটিকে ইনপুট ও আউটপুট উভয় ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যা, VDUতে একটি মনিটর ও একটি কী বোর্ড থাকে। কী বোর্ডের সাহায্যে ইনপুটকৃত ডেটা মনিটরে আউটপুট হিসেবে দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর কম্পিউটারে VDU বেশ প্রচলিত ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থা।

○ প্রশ্ন-৫৫. প্লটার কি?

উত্তর : প্লটার হচ্ছে এক ধরনের প্রিন্টার। প্রিন্ট করার পদ্ধতি ডট মেট্রিক্সের মতো। ডট মেট্রিক্সে প্রিন্ট হয় প্রিন্ট হেড-এর সাহায্যে। প্লটারে প্রিন্ট হয় পেন (Pen)-এর সাহায্যে। প্লটারে অধিক চিকন থেকে মোটা বিভিন্ন ধরনের পেন (Pen) ব্যবহার করা যায়। স্থপতি, প্রকৌশলী, নকশাবিদ এবং মানচিত্র অংকনের কাজে প্লটার বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। লেজার বা ডট মেট্রিক্সে ১৪ ইঞ্চির চওড়া কাগজে প্রিন্ট নেয়া যায় না। কিন্তু প্লটারে অনেক চওড়া কাগজে প্রিন্ট নেয়া যায়, যা মানচিত্র এবং বিভিন্ন প্রকার নকশার জন্য অপরিহার্য।

○ প্রশ্ন-৫৬. মনিটরের পিক্সেল কি?

উত্তর : কম্পিউটারের তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পিক্সেল (Pixel)। এ শব্দটি ইংরেজি Picture Element-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। পিক্সেল হচ্ছে ডেটা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাধ্যমের ক্ষুদ্রতম এলাকা যার বর্ণ ও উজ্জ্বলতা স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পিক্সেলের শারীরিক আকার পর্দার বিশ্লেষণের ও আকারের উপর নির্ভর করে।

○ প্রশ্ন-৫৭. রেজুলেশন কি?

উত্তর : ডিসপ্লে পর্দা বা স্ক্রীনে প্রদর্শিত ছবির সূক্ষ্মতাকে রেজুলেশন বলে। পর্দার প্রতি ইঞ্চিতে যত বেশি পিক্সেল থাকবে ছবি তত বেশি সূক্ষ্ম হবে। যেমন–৩২০ × ২০০ পিক্সেল, ৩৪০ × ৪৮০ পিক্সেল, ১০২৪ × ৭৬৮ পিক্সেল ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৫৮. ডট পিচ কি?

উত্তর : রঙিন মনিটরের পর্দার ভিতরের পিঠে লাল, সবুজ, আসমানী এ তিনটি বর্ণের ফসফর দানার সম্মিলনে গঠিত অসংখ্য ফসফর বিন্দুত্রয়ী দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। পাশাপাশি দুটি বিন্দুত্রয়ীর একই বর্ণের দুটি ফসফর বিন্দুর কোণাকোণি দূরত্বকে ইংরেজিতে Dot Pitch বলে। প্রচলিত মনিটরে ডট পিচ সাধারণত ০.২৬ মিলিমিটার থেকে ০.৩১ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

○ প্রশ্ন-৫৯. রিফ্রেশ রেট কি?

উত্তর : রিফ্রেশ রেট হলো পিক্সেলের উজ্জ্বলতা ঠিক রাখার জন্য প্রতি সেকেন্ডে পিক্সেলগুলো কতবার রিচার্জ হয় তার সংখ্যা। রিফ্রেশ রেট যত বেশি হবে ইমেজ স্ক্রীনে তত দৃঢ় দেখাবে।

○ প্রশ্ন-৬০. ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস (USB) ইন্টারফেস কি?

উত্তর : এ প্রযুক্তির সাহায্যে সংযোগ দেয়া I/O যন্ত্রগুলো প্রতি সেকেন্ডে ১২ মেগাবাইট গতিতে ডেটা পারাপার করতে পারে। পিসি এবং মেকিন্টোস উভয় প্লাটফরমেই এ ইন্টারফেসটি জনপ্রিয়। এ ইন্টারফেসের বড় সুবিধা হলো যে এতে ডেটা ট্রান্সফারের গতি যখন তখন উঠা-নামা করে না।

○ প্রশ্ন-৬১. স্ক্যাজি (SCSI) ইন্টারফেস কি?

উত্তর : স্ক্যাজি (SCSI) হচ্ছে স্মল কম্পিউটার সিস্টেম ইন্টারফেস (Small Computer System Interface)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। স্ক্যাজি আনসি (ANSI) বা আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট (American National Standards Institute) কর্তৃক সংজ্ঞায়িত শিল্পমান ইন্টারফেস। একটি তার বা ক্যাবলের ভেতর দিয়ে ১ বাইট ডেটা বা তথ্যের ৮টি বিট পাশাপাশি ৮টি পৃথক লাইনের মাধ্যমে আদান-প্রদানকে প্যারালাল কমুনিকেশন (Parallel communication) বলা হয়। স্ক্যাজি (SCSI) ডিভাইসগুলো প্যারালাল কমুনিকেশন পদ্ধতিতে ডেটা আদান-প্রদান করে। আর স্ক্যাজি ডিভাইসগুলো যেসব পোর্টের মাধ্যমে সংযোগ দেওয়া হয় সেসব পোর্টকে বলা হয় স্ক্যাজি পোর্ট।

○ প্রশ্ন-৬২. ইনপুট আউটপুট কার্ড কি? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : কার্ড হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট বোর্ড। কম্পিউটারের বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য নির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের কার্ড স্লটে বসিয়ে নিতে হয়। যেমন– কম্পিউটারের পর্দায় টেলিভিশন প্রোগ্রাম দেখা বা কম্পিউটারের পর্দার বিষয়বস্তুকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানোর জন্য বিশেষ ধরনের

ইনপুট/আউটপুট কার্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ কার্ডকে টিভি টিউনার কার্ড বলে। কম্পিউটারের সাহায্যে মডেম ও ফ্যাক্স যন্ত্রের মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদানের জন্য মডেম ও ফ্যাক্স কার্ড ব্যবহার করতে হয়। এ ছাড়া অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে কম্পিউটারের ডেটা আদান-প্রদানের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইনপুট/ আউটপুট কার্ড ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোনো ইনপুট/আউটপুট কার্ড কেনার পূর্বে যে কম্পিউটারে এটি লাগানো হবে তাতে কি ধরনের স্লট আছে তা জেনে নিতে হবে। যেমন আইএসএ কোনো কার্ডে লাগানোর জন্য আইএসএ স্লট থাকা প্রয়োজন তেমনি পিসিআই কোনো কার্ডে লাগানোর জন্য পিসিআই স্লট থাকা প্রয়োজন।

○ প্রশ্ন-৬৩. ডিজিটাইজার ও এইচডব্লিউআর কি?

উত্তর : মাইক্রোচার্ট সিস্টেমে Flat Panel-এর জন্য তৈরি করা চার্ট পেনকেই বলা হয় ডিজিটাইজার। কাগজে আঁকা কোনো ছবি বা লেখা এ যন্ত্রের মাধ্যমে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো যায়। সাধারণত কাগজে কোনো গ্রাফ বা ছবি এঁকে তা ডিজিটাইজার বোর্ডের উপর রেখে স্টাইলাম বুলিয়ে মনিটরে প্রদর্শন করা যায় এবং কম্পিউটারে তার স্থানাংক ইনপুট করা যায়। এটি দিয়ে ড্রয়িং, ড্রাফটিং, ম্যাপিং, এনিমেশন, গ্রাফিক্স ইত্যাদি কাজগুলো খুব সহজে এবং সুন্দরভাবে সম্পাদন করা যায়।

HWR-এর পূর্ণরূপ Hand Writing Recognition. এ যন্ত্রটি সাধারণত হাতের লেখা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন মানুষের হাতের লেখা বিভিন্ন রকম এবং একেকজনের হাতের টান একেক রকম থাকে। একজনের হাতের লেখার সাথে অপরজনের হাতের লেখার মিল থাকে না। এছাড়া হাতের টানেও মিল থাকে না। তাই কখনো যদি কোনো মানুষের হাতের লেখা পরীক্ষা করার দরকার পড়ে তখন এ যন্ত্রের সাহায্য নেয়া হয়।

○ প্রশ্ন-৬৪. সিপিইউ (CPU) এবং মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সিপিইউ বলে। কম্পিউটারের কাজ করার গতি সিপিইউ-এর উপর নির্ভরশীল।

মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI-Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ (Chip)। মাইক্রো কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়।

মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন ও কাজ এবং সিপিইউ-এর সংগঠন ও কাজ একই রকম। মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য (কাজ) চিপের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিট থাকে। মাইক্রোপ্রসেসরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে প্রোগ্রামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের মেমোরি অংশে সংরক্ষণ করা হয়।

○ প্রশ্ন-৬৫. মনিটর, প্রিন্টার ও কীবোর্ডের কার্যপদ্ধতি লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : মনিটরের কার্যপদ্ধতি : মনিটরের প্রধান অংশ ক্যাথোড রশ্মির (Cathode Ray Tube-CRT) টিউবের পেছন দিকে অবস্থিত ইলেকট্রন গান থেকে ইলেকট্রন রশ্মি বা বিম বিচ্ছুরিত হয় এবং পর্দার দিকে ধাবিত হয়। পর্দার ভিতরের পৃষ্ঠে ফসফরাসের প্রলেপ থাকে। ইলেকট্রন বিম ফসফরাসের উপর পতিত হলে ফসফরাস থেকে উজ্জ্বল আলো নির্গত হয়। ফসফরাসের ধরনের ভিত্তিতে মনিটরের

পর্দায় প্রদর্শিত বিষয় এক রঙের বা বহু রঙের হতে পারে। মনিটরের পর্দায় প্রত্যেক বর্ণের সঠিক আকারকে, যাকে বলে ডট ম্যাট্রিক্স প্যাটার্ন (Dot Matrix Pattern) ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ মেমোরি ভাণ্ডারে সব বর্ণের প্যাটার্ন সঞ্চিত রাখা হয়। এই মেমোরি ভাণ্ডারকে বলে বর্ণ উৎপাদক (Character Generator)।

প্রিন্টারের কার্যপদ্ধতি : প্রিন্টার কম্পিউটারের একটি আউটপুট ডিভাইস। প্রিন্টার বিভিন্ন প্রকারের হয় এবং এর কার্যপ্রণালীও বিভিন্ন। বর্তমানে ব্যবহৃত লেজার প্রিন্টারে মুদ্রণের জন্য লেজার রশ্মির একটি আলোক সংবেদনশীল ড্রামের উপর মুদ্রণযোগ্য বিষয়ের ছাপ তৈরি করে। তখন লেজার রশ্মি প্রক্ষেপিত অংশ টোনার আকর্ষণ করে। এরপর ড্রাম সেই টোনারকে কাগজে স্থানান্তরিত করে। কাগজের উপর পতিত টোনার উচ্চ তাপে গলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসে যায়। এভাবেই লেজার প্রিন্টারে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়।

কীবোর্ডের কার্যপদ্ধতি : কীবোর্ড কম্পিউটারের একটি ইনপুট ডিভাইস। কীবোর্ডের প্রতিটি Key আসলে একটি বৈদ্যুতিক সুইচ, এর সাথে এনকোডার (Encoder) যুক্ত থাকে। কীবোর্ডের কোনো Key চাপলে এনকোডার সেই বর্ণের ASCII ইত্যাদি কোনো কোডের ডিজিটাল বৈদ্যুতিক সংকেত (O বা 1) উৎপন্ন করে। ফলে একটি ইনপুট রেজিস্টারে বর্ণের কোড লেখা হয়ে যায়। তারপর প্রসেসর রেজিস্টারে চলে যায় এবং ইনপুট রেজিস্টারে লেখা মুছে যায়। সুতরাং আবার কোনো কী চাপলে সেই বর্ণের কোড ইনপুট রেজিস্টারে উঠে যায়।

○ প্রশ্ন-৬৬. কম্পিউটারে সাধারণত কি কি পোর্ট থাকে? কোন পোর্ট-এ প্রিন্টার সংযোগ দেয়া হয়? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : পোর্ট : কম্পিউটারের সিপিইউ তথা মাদারবোর্ডের সাথে মনিটর, প্রিন্টার, মাউস, কীবোর্ডসহ যে কোনো পেরিফেরালস ডিভাইস সংযোগ প্রদানের জন্য বিভিন্ন পোর্ট বা বৈদ্যুতিক সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

পোর্ট মূলত দুই প্রকার : (১) সিরিয়াল পোর্ট ও (২) প্যারালাল পোর্ট।

পূর্বে কম্পিউটারের প্রিন্টার প্যারালাল পোর্টের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করা হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রিন্টারসহ প্রায় সকল পেরিফেরালস ডিভাইসই ইউএসবি (USB–Universal Serial Bus) নামক সিরিয়াল পোর্টের মাধ্যমে সংযোগ প্রদান করা হয়।

○ প্রশ্ন-৬৭. মাউস কি? মাউসের কাজ কি কি? কী বোর্ড ও মাউসের পার্থক্য উল্লেখ করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : মাউস হলো তারের সাহায্যে সংযুক্ত ছোট একটি যন্ত্র। এটি দেখতে অনেকটা ইঁদুর সদৃশ যা দিয়ে কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া হয়। এটি একটি জনপ্রিয় বহুল ব্যবহৃত ইনপুট ডিভাইস।

- মাউস এর সাহায্যে কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করা যায়।
- মাউসকে ব্যবহার করে কম্পিউটারের পর্দার কার্সর ওঠা-নামা করানো যায়।
- মাউসের সাহায্যে মনিটরের পর্দায় বিভিন্ন সফটওয়্যার ব্যবহার করে লেখা, ছবি আঁকা, গ্রাফ তৈরি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণসহ আরো বহু প্রকারের কাজ করা যায়।

মাউস ও কী বোর্ড এর মধ্যে পার্থক্য :

- মাউস হাত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত একটি পয়েন্টিং ডিভাইস। এটি কী বোর্ডের নির্দেশ প্রদান ছাড়াই একটি কম্পিউটার নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। অন্যদিকে কী বোর্ড দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটারের মতো। এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। কী বোর্ডকে কনসোলও (Console) বলে।
- মাউস হচ্ছে একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন ইনপুট সিস্টেম। পক্ষান্তরে, কী বোর্ড হচ্ছে একটি ধীরগতি সম্পন্ন ইনপুট সিস্টেম।
- মাউস এর সাহায্য ছাড়া কম্পিউটার পরিচালনা করা সম্ভব। কিন্তু কী বোর্ড ছাড়া কম্পিউটার এর অনেক কাজ পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
- মাউস-এ সাধারণত দুটি বা তিনটি বাটন থাকে। যেমন রাইট বাটন ও লেফট বাটন। কিন্তু কী বোর্ডে বর্ণ কী ছাড়াও অনেকগুলো মডিফায়ার কী (Modifier key) থাকে।
- কী বোর্ড দ্বারা কম্পিউটার পরিচালনা করার জন্য বাংলা বা ইংরেজি টাইপসহ অনেক নিয়মকানুন জানতে হয়। পক্ষান্তরে, মাউস এর সাহায্যে কম্পিউটারে নির্দেশনা প্রদান করতে তেমন দক্ষতার প্রয়োজন হয় না।
- কী বোর্ডের সাহায্যে অনেক জটিল কাজ সম্পন্ন করা যায়। কিন্তু মাউসের সাহায্যে অনেক কাজ সম্পন্ন করা যায় না।
- কী বোর্ডের সাহায্যে টাইপ করা যায়। কিন্তু মাউস এর সাহায্যে টাইপ করা সম্ভব নয়।

○ প্রশ্ন-৬৮. সিপিইউ (CPU) এবং সফটওয়্যার (Software) বলতে কি বোঝায়? *[২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : সিপিইউ (CPU) : কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ বলে। সিপিইউ কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বা ব্রেইনস্বরূপ।

সফটওয়্যার : সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকে সফটওয়্যার বলে।

○ প্রশ্ন-৬৯. Laser Printing প্রযুক্তি বলতে কি বুঝেন? *[৩৪তম ও ২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : Laser Printing (লেজার প্রিন্টিং) প্রযুক্তি : লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তি বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের প্রিন্টিং প্রযুক্তি যেখানে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয়। লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে ছাপানোর কাজে লেজার প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। লেজার প্রিন্টারে একটি লেজার বীম (beam) ব্যবহৃত হয় যা একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর CRT-এর মতো রাস্টার স্ক্যান ইমেজ উৎপন্ন করে। ড্রামটি একটি আলোক সংবেদী প্লাস্টিক (Photosensitive plastic) দ্বারা প্রলেপযুক্ত থাকে যার পৃষ্ঠদেশে (surface) ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ প্রদান করা হয়। লেজার বীমটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর স্পট তৈরি করে। লেজার দ্বারা লিখিত স্পটসমূহ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে। উক্ত ধনাত্মক চার্জসমূহ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত টোনার ম্যাটেরিয়ালকে আকর্ষণ করে। ঘূর্ণায়মান ড্রামে কাগজ দেয়া হয়। টোনারটি কাগজে স্থানান্তরিত হয়। এভাবেই লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়।

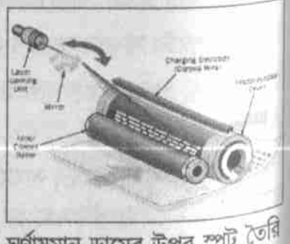

ঘ বায়োস ও কম্পিউটার আর্কিটেকচার
BIOS and Computer Architecture

○ প্রশ্ন-৭০. বায়োস কি? বায়োস কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : বায়োস (BIOS) শব্দটির পূর্ণ অর্থ হলো Basic Input/Output System বা মৌলিক ইনপুট.আউটপুট পদ্ধতি। কম্পিউটার মাইক্রোপ্রসেসরের সাথে সংযুক্ত মাদারবোর্ডে অবস্থিত একটি চিপ হলো বায়োস চিপ, যার মধ্যে বায়োস প্রোগ্রাম লোড করা থাকে। উইন্ডোস ভিত্তিক কম্পিউটারে কম্পিউটার শুরু হওয়ার জন্য প্রাথমিক সকল নির্দেশনা বায়োস প্রোগ্রামের মধ্যে থাকে। বায়োস কম্পিউটারের সকল ইনপুট/আউটপুট ইউনিটের যন্ত্রাংশ যেমন– কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি ঠিক আছে কি না তা মাদারবোর্ড ও প্রসেসরকে জানায় এবং কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমকে শুরু হতে নির্দেশ দেয়।

বায়োস ব্যবহারের কারণ : বায়োস ব্যবহারের মূল কারণ হলো কম্পিউটার চালুর শুরুতেই সকল হার্ডওয়্যার ইউনিট ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা এবং অপারেটিং সিস্টেম বা বুট লোডার প্রোগ্রামকে মেমোরি থেকে নির্দেশ দিয়ে সচল করা। বায়োসের অতিরিক্ত একটি কাজ হলো অপারেটিং সিস্টেম ও কম্পিউটারের ইনপুট/আউটপুট যন্ত্রাংশের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করা।

সকল কম্পিউটারে বর্তমানে বায়োস ROM চিপের মধ্যে অবস্থান করে এবং বায়োসের প্রোগ্রামকে ফার্মওয়্যার (firmware) বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৭১. কম্পিউটার বাস কি? বাস কয় প্রকার ও কি কি? বিভিন্ন প্রকার বাসের কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

অথবা, মাইক্রোকম্পিউটারের বাস সংগঠন বলতে কি বোঝায়? আলোচনা করুন।

উত্তর : কম্পিউটার বাস : কম্পিউটার বিট বা ডিজিটাল সংকেত (০ বা ১) হিসেবে ডেটাকে প্রসেস ও সংরক্ষণ করে। এ বিটগুলো কম্পিউটারের অভ্যন্তরের সার্কিটে চলাচল করে। বাস হলো এমন একগুচ্ছ তার যার মধ্য দিয়ে ডিজিটাল সংকেত ০ বা ১ চলাচল করতে পারে। বাসের সাহায্যেই কম্পিউটারের অভ্যন্তরের বিভিন্ন অংশ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বাস ইনপুট ডিভাইস থেকে মেমোরিতে, মেমোরি থেকে আউটপুট কিংবা স্টোরেজ ডিভাইসে বিট স্থানান্তর করে।

বাসের প্রকারভেদ : একটি কম্পিউটারে মূলত দুই ধরনের বাস থাকে। যথা–

১. সিস্টেম বাস (System bus) ও
২. এক্সপানশন বাস (Expansion bus)

সিস্টেম বাস (System Bus) : সিপিইউ সিস্টেম বাসের সাহায্যে কম্পিউটারের মেমোরি এবং চিপসেটের সাথে যোগাযোগ করে। কম্পিউটারের বাস বলতে মূলত সিস্টেম বাসকেই বোঝানো হয়। কম্পিউটারের সিস্টেম বাস তিন ধরনের বাস নিয়ে গঠিত। যথা–

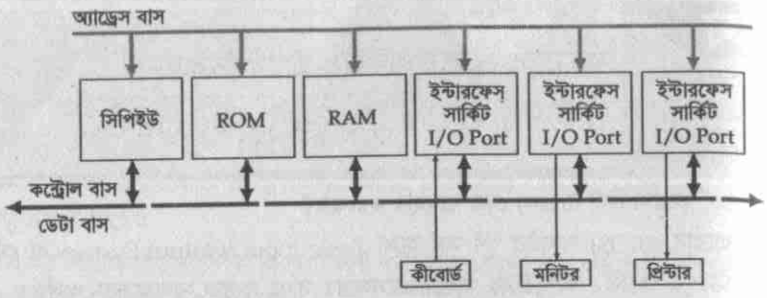

চিত্র : কম্পিউটারের বিভিন্ন বাস

১. **এড্রেস বাস (Address Bus) :** এড্রেস বাসের সাহায্যে CPU প্রধান মেমোরির কোনো বিশেষ এড্রেস সংযোগ করে অর্থাৎ রমের যে অবস্থানের ডেটা পড়তে বা র‍্যামের যে অবস্থানের ডেটা পড়তে বা লিখতে হবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করে।

২. **কন্ট্রোল বাস (Control Bus) :** কন্ট্রোল বাস বা নিয়ন্ত্রণ বাস মাইক্রোপ্রসেসর থেকে সংকেত বা নির্দেশ বহনপূর্বক সংশ্লিষ্ট অংশগুলোতে প্রেরণ করে থাকে। কন্ট্রোল বাসের সাহায্যে CPU যে এড্রেসে সংযোগ হয়েছে সেখানে মেমোরি পড়া (Memory Read), মেমোরিতে লেখা (Memory write), ইনপুট পড়া বা আউটপুটে লেখা ইত্যাদি নির্দেশ পাঠায়।

৩. **ডেটা বাস (Data Bus) :** ডেটা বাসের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন চিপের মধ্যে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা। যেমন– র‍্যাম চিপ থেকে প্রসেসরে ডেটা নিয়ে যাওয়া বা প্রসেসর থেকে র‍্যাম চিপে ডেটা বা তথ্য নিয়ে যাওয়া। যে এড্রেসে Read নির্দেশ পাঠানো হয়েছে ডেটা বাসের মাধ্যমে সেই এড্রেস থেকে ডেটা আসে। আবার যে এড্রেসে write নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ডেটা বাসের সাহায্যে ডেটা সেই এড্রেসে যায়।

এক্সপানশন বাস (Expansion Bus) : সিপিইউ এক্সপানশন বাসের সাহায্যে কম্পিউটারের ইনপুট/আউটপুট ও অন্যান্য পেরিফেরাল ডিভাইসের সাথে যোগাযোগ করে। সিস্টেম ইউনিটের বাইরের যন্ত্রপাতিগুলো সাধারণত কোন কার্ডের পোর্টে লাগানো থাকে। এ কার্ডগুলো কোনো এক্সপানশন স্লটে বসানো থাকে। এক্সপানশন স্লটগুলো এক্সপানশন বাসের দ্বারা সিপিইউকে পেরিফেরাল ডিভাইসগুলোর সাথে সংযুক্ত করে।

অনেক ধরনের এক্সপানশন বাস আবিষ্কৃত হয়েছে। তারমধ্যে যে সকল এক্সপানশন বাস জনপ্রিয় হয়েছে সেগুলো হলো–

- আইএসএ (ISA-Industry Standards Architecture)
- লোকাল বাস (Local bus)
  - ভেসা (VESA)
  - পিসিআই (PCI)
- ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস বা ইউএসবি (USB)
- ফায়ারওয়্যার বা IEEE 1394
- এজিপি (AGP)

প্রশ্ন-৭২. কম্পিউটারের সংগঠন চিত্রসহ আলোচনা করুন।

উত্তর : কম্পিউটারের সংগঠন : কম্পিউটারের সংগঠন বলতে বোঝানো হয় কম্পিউটার কি কি অংশ নিয়ে গঠিত এবং এ অংশগুলো কিভাবে কাজ করে। কম্পিউটারকে কাজের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল অংশের যন্ত্রগুলো সঠিকভাবে নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থাপন করতে হয় এবং যন্ত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় সকল অংশের যন্ত্রগুলোর মধ্যে পাস্পরিক সংযোগ স্থাপনকেই কম্পিউটারের সংগঠন বলা হয়।

আধুনিক কম্পিউটারের প্রধান সাংগঠনিক অংশ পাঁচটি। এগুলো হলো :

১. ইনপুট ইউনিট (Input Unit)
২. অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit) বা গাণিতিক যুক্তি অংশ
৩. কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit) বা নিয়ন্ত্রণ অংশ
৪. মেমোরি ইউনিট (Memory Unit) বা স্মৃতি অংশ
৫. আউটপুট ইউনিট (Output Unit) বা ফলাফল অংশ

অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও মেমোরি ইউনিটকে একত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ (Central processing Unit or CPU) বলা হয়।

নিচে বল্টক ডায়াগ্রাম চিত্রের মাধ্যমে কম্পিউটারের সংগঠন দেখানো হলো :

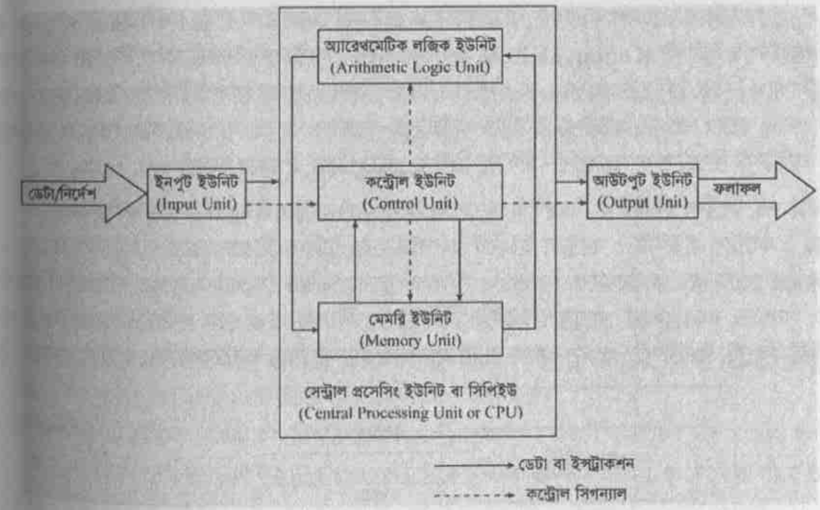

চিত্র : কম্পিউটারের সংগঠন

১. **ইনপুট ইউনিট (Input Unit) :** ইনপুট ইউনিটের মাধ্যমে কম্পিউটারে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজের নির্দেশ ও ডাটা কম্পিউটারে প্রদান করা হয়। এ ইউনিটে কম্পিউটারের ইনপুট যন্ত্রগুলোর মাধ্যমে ডেটা ও নির্দেশ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ আকারে কম্পিউটারে প্রবেশ করে। ইনপুট যন্ত্রগুলো হলো– কীবোর্ড, মাউস, জয়স্টিক, স্ক্যানার, কার্ড রিডার, ডিজিটাল ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ (Central Processing Unit or CPU) : কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ। একে কম্পিউটারের Brain বা মস্তিষ্ক বলা হয়। আধুনিক কম্পিউটারে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ হিসেবে মাইক্রোপ্রসেসর

ব্যবহার করা হয়। সিপিইউ বা মাইক্রোপ্রসেসর কম্পিউটারের যাবতীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ, হিসাব নিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ এর তিনটি অংশ : ক. অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit–ALU) বা গাণিতিক যুক্তি অংশ; খ. কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit) বা নিয়ন্ত্রণ অংশ এবং গ. মেমোরি ইউনিট (Memory Unit) বা স্মৃতি অংশ।

ক. **অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit–ALU) :** অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট সংক্ষেপে ALU নামে পরিচিত। এ অংশটি মূলত কম্পিউটারের সকল গাণিতিক (যেমন– যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) ও যুক্তিমূলক সমস্যার সমাধান করে। অর্থাৎ এই অংশটি যাবতীয় হিসাব নিকাশ ও ডাটা বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রদান করে।

খ. **কন্ট্রোল ইউনিট (Control Unit) বা নিয়ন্ত্রণ অংশ :** কন্ট্রোল ইউনিট কম্পিউটারের অন্যান্য ইউনিটগুলোকে সময়মতো সঠিক নির্দেশ প্রদান করে কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে। কম্পিউটারের ডাটা কোথায় যাবে, কখন যাবে, কি কাজ সম্পাদন করবে ইত্যাদির মধ্যে সমন্বয়সাধন ও নিয়ন্ত্রণ করাই কন্ট্রোল ইউনিট এর কাজ। কন্ট্রোল ইউনিট কম্পিউটারের অন্যান্য যন্ত্রগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. **মেমোরি ইউনিট (Memory Unit) বা স্মৃতি অংশ :** প্রসেসিং এর জন্য ডাটাকে প্রধান মেমোরি ইউনিটে সংরক্ষণ করা হয়। প্রোগ্রাম নির্বাহের সময় সাময়িক সময়ের জন্য ফলাফলকেও এ মেমোরিতে সংরক্ষণ করা হয়। এ মেমোরিকে প্রাইমারি মেমোরি বা RAM বলা হয়।

২. **আউটপুট ইউনিট (Output Unit) বা ফলাফল অংশ :** আউটপুট ইউনিট কম্পিউটারের মনিটরের মাধ্যমে কিংবা প্রিন্টারের মাধ্যমে যে কোনো প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল কম্পিউটার ব্যবহারকারির নিকট প্রদান করে। এজন্য আউটপুট ইউনিটে আউটপুট ডিভাইস বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের আউটপুট ডিভাইস বা যন্ত্র হলো– মনিটর, প্রিন্টার, প্লটার, ডিস্ক, স্পিকার ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৭৩. কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ বলতে কি বুঝায়? কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ বর্ণনা করুন।

উত্তর : কন্ট্রোল ইউনিট : কন্ট্রোল ইউনিট কম্পিউটারের ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করে। এটি সিপিইউ এর অভ্যন্তরে থেকে এর কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ ও সুসংহত করে। মস্তিষ্ক যেভাবে মানুষের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ এবং সুসংহত করে তেমনি কন্ট্রোল ইউনিট সিপিইউকে নিয়ন্ত্রণ এবং কো-অর্ডিনেট করে। কন্ট্রোল ইউনিট ইনপুট, আউটপুট, প্রসেস অথবা ডেটা সংরক্ষণ করে না কিন্তু কার্যক্রমগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে।

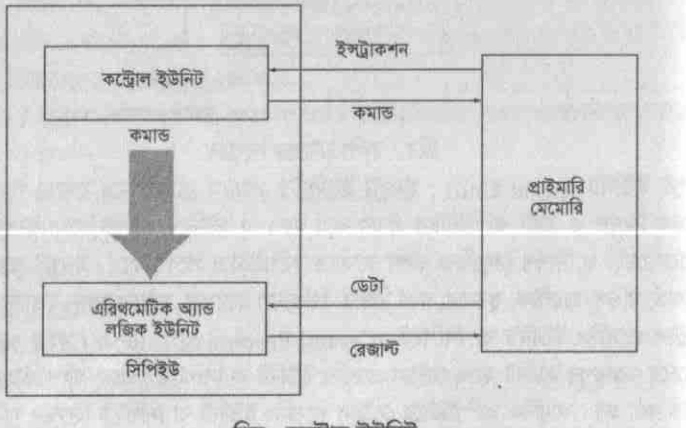

চিত্র : কন্ট্রোল ইউনিট

কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ সমস্ত কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করে পরিচালিত করা। আবার RAM ও ROM এ রক্ষিত ইন্সট্রাকশন অনুযায়ী কন্ট্রোল ইউনিট নিজে পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কন্ট্রোল ইউনিট ROM ও RAM এ রক্ষিত ইন্সট্রাকশন অনুসারে কাজ করতে কম্পিউটারের অন্য সব অংশকে আদেশ দেয়।

নিয়ন্ত্রণ অংশ বা কন্ট্রোল ইউনিটের কার্যাবলি : কন্ট্রোল ইউনিট যেসব কাজ করে থাকে, নিচে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১. কন্ট্রোল ইউনিট প্রধান মেমোরি থেকে একটির পর একটি ইন্সট্রাকশন এবং সেই ইন্সট্রাকশন পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা বা অপারেন্ড আহরণ করে।
২. কন্ট্রোল ইউনিট Arithmetic Logic Unit-কে ইন্সট্রাকশন অনুসারে যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়া সম্পাদন করার আদেশ দান করে।
৩. কন্ট্রোল ইউনিট Arithmetic Logic Unit এর গণনার ফলাফল প্রধান মেমোরিতে পাঠায়।
৪. কন্ট্রোল ইউনিট ইনপুট ও সেকেন্ডারী মেমোরির প্রোগ্রাম প্রধান মেমোরিতে নিয়ে আসে।
৫. কন্ট্রোল ইউনিট প্রধান মেমোরিতে রাখা গণনার ফলাফল আউটপুটে পাঠায়।

○ প্রশ্ন-৭৪. অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট বা গাণিতিক যুক্তি অংশ কি?

উত্তর : অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট হচ্ছে কম্পিউটারের ক্যালকুলেটর স্বরূপ। এটা সব গাণিতিক এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ (Decision making function) করে থাকে। আধুনিক প্রসেসরের কাজে গতি বাড়ানোর জন্য এক বা একাধিক গাণিতিক যুক্তি অংশ ব্যবহার করা হয়। অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিটের কার্যাবলীকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. গাণিতিক কাজ (Arithmetic operations),
২. যুক্তিমূলক কাজ (Logical operatios) এবং
৩. ডেটা সঞ্চালন (Data manipulation)।

গাণিতিক কাজ : যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ হলো গাণিতিক কাজের উদাহরণ। বড়, ছোট সমান যাচাইয়ের জন্য বিয়োগের সহায়তায় দুটি সংখ্যার তুলনাও গাণিতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত।

যুক্তিমূলক কাজ : যুক্তি বর্তনীতে ব্যবহৃত AND, OR, NOT, NOR ইত্যাদি কিংবা এদের সমন্বয়ে গঠিত জটিল যুক্তিমূলক কাজও গাণিতিক যুক্তি অংশ দিয়ে করা যায়।

ডেটা সঞ্চালন : কোনো রেজিস্টার পরিষ্কারকরণ এ ধরনের কাজের একটি উদাহরণ। এ কাজের ফলে রেজিস্টার শূন্য থাকবে। স্থানান্তর (Shift) দ্বারা রেজিস্টারে রক্ষিত বাইনারি সংখ্যাকে ডানে বা বামে শুধু এক বিট স্থান সরানো হয়।

○ প্রশ্ন-৭৫. কন্ট্রোল ইউনিটের প্রধান কার্যাবলী কি?

উত্তর : কন্ট্রোল ইউনিটের কাজকে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রধান মেমোরি থেকে একটির পর একটি ইনস্ট্রাকশন (ও সেই ইনস্ট্রাকশন পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা বা অপারেন্ড) আহরণ।
২. ALU-কে এ ইনস্ট্রাকশন অনুসারে যোগ, বিয়োগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়া সম্পাদন করার আদেশ দান।
৩. ALU-এর গণনার ফলাফল প্রধান মেমোরিতে পাঠানো।
৪. ইনপুট ও সহায়ক মেমোরির প্রোগ্রাম প্রধান মেমোরিতে আনা।
৫. প্রধান মেমোরিতে রাখা গণনার ফলাফল আউটপুটে পাঠানো।

ঙ

অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার
Operating System and Software

○ প্রশ্ন-৭৬. অপারেটিং সিস্টেম কি? বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলোর নাম লিখুন।

উত্তর : অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট কন্ট্রোল, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, স্টোরেজ অ্যাসাইনমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে। বর্তমানে মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসিতে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলো হলো :

1. MS-DOS, PC-DOS, 2. MS WINDOWS 95/98/2000, 3. UNIX, 4. XINIS, 5. LINUX, 6. Mac OS, 7. MS WINDOWS NT, 8. MS WINDOWS XP, 9. OS/2 Warp, 10. Solaries. 11. Ms WINDOWS VISTA, 12. MS WINDOWS 7, 13. Ubuntu.

○ প্রশ্ন-৭৭. অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান কাজগুলো কি?

উত্তর : কম্পিউটারের আকার, গঠন ও প্রয়োগের উপর নির্ভর করেই অপারেটিং সিস্টেমের গঠন, আকার ছোট বা বড় এবং কাজের পরিধি কম বা বেশি হয়। নিচে অপারেটিং সিস্টেমের প্রধান কাজগুলো দেওয়া হলো :

ইউজার ইন্টারফেস : ইউজার ইন্টারফেস অপারেটিং সিস্টেমের এমন একটি অংশ যা ব্যবহারকারীর সাথে বিভিন্ন সফটওয়্যারের সংযোগ, সমন্বয় সাধন, পরিচালনা ও নির্দেশ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া সফটওয়্যারগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন প্রোগ্রাম লোড করা ও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। অপারেটিং সিস্টেমে সাধারণত তিন ধরনের ইউজার ইন্টারফেস দেখা যায়। যথা– কমান্ড চালিত, মেনু চালিত ও গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস।

রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট : অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারকে সচল ও ব্যবহার উপযোগী করে তোলে। এটি কম্পিউটারের বিভিন্ন রিসোর্স যেমন ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস (প্রিন্টার, ফ্লপি/হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, মাউস, মনিটর ও কীবোর্ড ইত্যাদি) ও অন্যান্য ডিভাইসগুলোর নিয়ন্ত্রণ, ত্রুটি ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং সমন্বয় সাধন করে। তাছাড়া মেমোরি ম্যানেজমেন্ট করে কম্পিউটারের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

টাস্ক ম্যানেজমেন্ট : অপারেটিং সিস্টেমের টাস্ক ম্যানেজমেন্টে প্রোগ্রাম ব্যবহারকারীর নির্দেশ গ্রহণ, বিশ্লেষণ এবং ব্যাচ প্রসেসিং করে। সিপিইউর টাইম স্লাইসকে বিভিন্ন টাস্কের মধ্যে বন্টন করে এবং ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল করে যাতে সকল টাস্কই সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়।

ফাইল ম্যানেজমেন্ট : অপারেটিং সিস্টেম ফাইল ম্যানেজমেন্ট যেমন ফাইল তৈরি, ডিলেট, অ্যাকসেস, কপি, মুভ, সংরক্ষণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। তাছাড়া ডেটা ও প্রোগ্রাম ম্যানিপিউলেশন (Manipulation) যেমন : ডেটা আদান-প্রদান, স্থানান্তর সংরক্ষণের কাজ করে থাকে।

ইউটিলিটিস : অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহারকারীকে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা যেমন– ফাইল ডিফ্রাগমেন্টেশন, ডেটা কম্প্রেশন, ব্যাকআপ, ডেটা রিকোভারি, এন্টি-ভাইরাস ইউটিলিটিস ইত্যাদি প্রদান করে।

○ প্রশ্ন-৭৮. অপারেটিং সিস্টেমের প্রকারভেদ বা শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তর : অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণিবিভাগ :

ক. ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম

১. এক্ষেত্রে একটির পর একটি ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহ করা হয়।

২. ব্যবহারকারীর কোনো বিরতি প্রয়োজন হয় না।

খ. রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম

১. প্রোগ্রামের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।

২. ব্যবহারকারী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কাজ করতে পারে।

গ. মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম

১. একাধিক প্রসেসর দ্বারা প্রসেসিং করানো হয়।

২. সিপিইউ কখনো অলস থাকে না।

ঘ. মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম

১. এ অপারেটিং সিস্টেম একসাথে একাধিক প্রোগ্রাম চালাতে পারে।

২. এক্ষেত্রে ধাপ তিনটি– i. Ready, ii. Running iii. Blocked.

ঙ. টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম

১. প্রসেসিং সময়কে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।

২. একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে কাজ করতে পারে।

চ. ভারচুয়াল স্টোরেজ অপারেটিং সিস্টেম

১. সহায়ক মেমোরির কিছু অংশকে প্রধান মেমোরি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২. প্রধান মেমোরির স্বল্পতা দূরীকরণ ও সহায়তার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছ. ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম

একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাহায্যে একাধিক কম্পিউটারের সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কম্পিউটারের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এ সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।

জ. অনলাইন অপারেটিং সিস্টেম

○ প্রশ্ন-৭৯. অপারেটিং সিস্টেমের সংগঠন কি রূপ?

উত্তর : অপারেটিং সিস্টেম দুই ধরনের প্রোগ্রাম দিয়ে গঠিত। এগুলো হচ্ছে–

ক. নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (Control Program)

খ. সার্ভিস প্রোগ্রাম (Service Program)

এ প্রোগ্রামগুলো আবার বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত। যেমন–

ক. নিয়ন্ত্রণ বা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম গঠিত ৩ ধরনের রুটিন প্রোগাম নিয়ে–

১. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম (Supervisor Program)

২. জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (Job-control Program)

৩. ইনপুট/ আউটপুট কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (I/O control Program)

খ. সার্ভিস প্রোগ্রাম গঠিত হয় ৩ ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে–

১. অনুবাদ/ প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম (Processors Program)
২. ইউটিলিটি প্রোগ্রাম (Utility Program)
৩. সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম (System Support Program)

অপারেটিং সিস্টেমের অংশসমূহকে নিচের ছকের সাহায্যে দেখানো গেল–

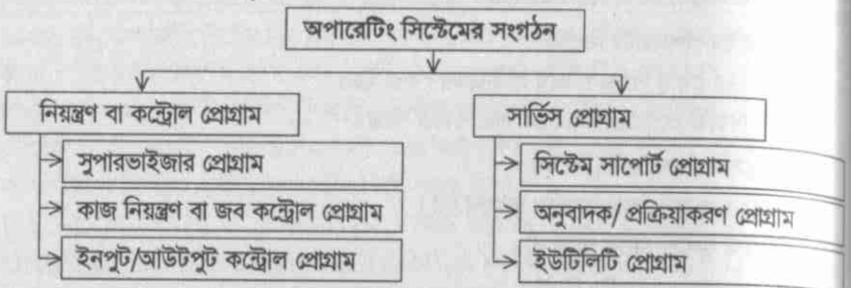

○ প্রশ্ন-৮০. কন্ট্রোল প্রোগ্রাম কি কি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে?

উত্তর : কন্ট্রোল প্রোগ্রামগুলো (Control Programs) অনেকগুলো কাজ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেমন–

১. ইনপুট/ আউটপুট নিয়ন্ত্রণ (I/O Control),
২. ইন্টারাপ্টের নিরসন (Resolving Interrupts),
৩. ভুল অপারেশন (Error-Handing) দেখা,
৪. ব্যবহারকারীর নিকট ডেটা প্রেরণ (Sending messages to users),
৫. ব্যবহারকারীকে কম্পিউটার ব্যবহারে এবং হিসেবে নিরাপত্তা বিধান করা (User Protection and Accounting),
৬. সময় বণ্টন (Time Allocation),
৭. রিসোর্স কন্ট্রোল বা কৌশল নিয়ন্ত্রণ (Resource Control) এবং
৮. কর্মসূচি তৈরি (Job scheduling) করে।

এছাড়াও কন্ট্রোল প্রোগ্রামগুলো কম্পিউটার সিস্টেম (CPU-এর) অপারেশনের নির্দেশগুলো নিয়ন্ত্রণ করে।

○ প্রশ্ন-৮১. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম কি? এ প্রোগ্রাম কি কাজ করে?

উত্তর : কম্পিউটার অন করার পর নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের সুপারভাইজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি প্রাইমারি মেমোরি বা র‍্যাম (RAM)-এ লোড হয় বলে এটিকে 'রেসিডেন্ট রুটিন' বলা হয়। সুপারভাইজারের বাকি অংশ সেকেন্ডারী মেমোরিতে থাকে তাই তাকে 'ক্ষণস্থায়ী বা ট্রানজিয়েন্ট রুটিন' বলা হয়। সুপারভাইজার প্রোগ্রামের কাজ নিম্নরূপ–

১. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসগুলোর সাথে CPU-এর সংযোগ স্থাপন করে ডেটা আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে।
২. কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে যে কোনো Error Message সুপারভাইজার প্রোগ্রাম জানিয়ে দেয়।
৩. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম প্রয়োজনমত ক্ষণস্থায়ী বা ট্রানজিয়েন্ট রুটিন প্রোগ্রামকে সহায়ক মেমোরি থেকে প্রধান মেমোরিতে নিয়ে এসে কাজে লাগায়।

○ প্রশ্ন-৮২. জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম প্রয়োজন কেন?

উত্তর : কম্পিউটার ব্যবহারকারী কোনো নির্দিষ্ট কাজ (Job অর্থাৎ প্রোগ্রাম) সম্পন্ন করার জন্য 'কাজ নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রাম' (Job Control Program-JCP)-এর সাহায্যে CPU-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। সুপারভাইজার ও জব কন্ট্রোল প্রোগ্রাম একত্রে কাজ করে ব্যবহারকারীকে প্রয়োজনীয় কাজ সময়মত করার নির্দেশ প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, টেপ অথবা ডিস্ক মাউন্ট করা, প্রিন্টারে পেপার দেয়া, কালি শেষ হলে নতুন কালি লাগানো ইত্যাদি। কাজ নিয়ন্ত্রণ ভাষা (Job Control Language-JCL) দ্বারা প্রোগ্রামের শুরু, অনুক্রম ধারায় সাজানো প্রোগ্রাম হতে কোনো বিশেষ প্রোগ্রাম এবং প্রয়োজনীয় ইনপুট এবং আউটপুট অংশ নির্দিষ্ট করা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৩. সার্ভিস প্রোগ্রাম সম্বন্ধে যা জানেন লিখুন।

উত্তর : সার্ভিস প্রোগ্রামগুলো তিন ধরনের প্রোগ্রাম নিয়ে গঠিত। যথা :

ক. অনুবাদক/ প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম (Processors Program),
খ. ইউটিলিটি প্রোগ্রাম (Utility Program) ও
গ. সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম (System Support Program)।

ক. **অনুবাদক/প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম :** অপারেটিং সিস্টেমের এ অংশে উচ্চতর ভাষার উৎস প্রোগ্রামগুলোকে (Source Programs) মেশিনের ভাষার অবজেক্ট প্রোগ্রামে রূপান্তর করার ব্যবস্থা থাকে। কিছু অনুবাদক/ প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রামের উদাহরণ হলো কম্পাইলার, অ্যাসেম্বলার, ইন্টারপ্রেটার।

খ. **ইউটিলিটি প্রোগ্রাম :** মেইনফ্রেম ও মিনি কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমের অনেকগুলো ইউটিলিটি প্রোগ্রাম থাকে। অপারেটিং সিস্টেমে ফাইল তৈরি, সংরক্ষণ, মোছা, ডিস্ক ফরমেট ও অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম লোড করা ইত্যাদি ইউটিলিটি প্রোগ্রামের কাজ।

গ. **সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম :** কখনও কখনও কন্ট্রোল প্রোগ্রামগুলো অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে গণ্য করা হলেও এর অন্যান্য অংশসমূহ সিস্টেমস্ সফট্ওয়্যার বা সাপোর্ট প্রোগ্রাম হিসেবে ধরা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৪. ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম কি?

উত্তর : ব্যাচ প্রসেসিং (বা ব্যাচ মোড) অপারেটিং সিস্টেমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি প্রোগ্রাম অথবা কিছু সময়ব্যাপী সংগৃহীত ডেটা প্রসেস করার পর অন্য আরেকটি প্রোগ্রাম বা ডেটা একসঙ্গে প্রসেস করা হয়। যেমন– কোনো দোকানে সারাদিনে কোন জিনিস কি পরিমাণে কত দামে বিক্রি হয়েছে তার সব ডেটা রাত্রে একবারেই প্রসেস করা হয় অথবা সারাদিনের সংগৃহীত ব্যাংক চেক দিনের শেষে ব্যাচ মোডে সব হিসাব আপডেট করে প্রয়োজন হলে রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৫. মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম কি?

উত্তর : একটি কম্পিউটার সিস্টেমে একাধিক প্রসেসরের সাহায্যে প্রোগ্রাম প্রসেস করা হলে তাকে মাল্টিপ্রসেসিং এবং এ অপারেটিং সিস্টেমটিকে বলা হয় মাল্টিপ্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম।

○ প্রশ্ন-৮৬. মাল্টি-টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম কি?

উত্তর : মাল্টিপ্রোগ্রামিং বা মাল্টিটাস্কিং সিস্টেমে একটি কম্পিউটার এক সঙ্গে একাধিক প্রোগ্রাম চালাতে পারে অথবা ডেটা প্রসেসিং করতে পারে। এ একাধিক প্রসেসিং বা প্রোগ্রাম চালানোকে মাল্টিপ্রোগ্রামিং বা মাল্টিটাস্কিং বলা হয়।

মাল্টিপ্রোগ্রামিং-এর ক্ষেত্রে RAM-এ একাধিক প্রোগ্রাম সঞ্চিত থাকে। CPU একটি প্রোগ্রাম প্রসেসিং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে করার পর তখন I/O পেরিফেরাল ব্যবস্থা এই প্রোগ্রামের বা অন্য আরেকটি প্রোগ্রামের ইনপুট নেওয়ার কিংবা আউটপুট দেয়ার কাজে হাত দেয়। আর এ সময়ে CPU অন্য আরেকটি প্রোগ্রামের প্রসেসিং শুরু করে। সুতরাং CPU এমনকি I/O পেরিফেরাল ব্যবস্থাও কখনও অবসর অবস্থায় থাকে না। অর্থাৎ যখন CPU একটি প্রোগ্রাম চালায় তখন পেরিফেরালগুলো অন্য প্রোগ্রামের I/O অপারেশনের কাজ চালায়।

○ প্রশ্ন-৮৭. টাইম শেয়ারিং কি?

উত্তর : টাইম শেয়ারিং (Time Sharing) এক ধরনের স্থানীয় বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম। টাইম শেয়ারিং নেটওয়ার্ক তৈরি হয় সার্ভারকে কেন্দ্র করে।

টাইম শেয়ারিং পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যবহারকারী নিজ নিজ টার্মিনালে বসে তাদের স্ব-স্ব প্রোগ্রাম একটি কম্পিউটারের সিপিইউতে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারেন। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রসেস করে। শেষ ব্যবহারকারী প্রোগ্রামটি প্রসেস করার পর আবার প্রথম ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম প্রসেস করার জন্য ফিরে আসে। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না সব প্রোগ্রাম কার্যকরী করা শেষ হয়।

○ প্রশ্ন-৮৮. বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম এবং চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম কি?

উত্তর : বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম : বর্ণভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে কী-বোর্ডের সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ টাইপ করে এবং কী-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে হয়।

চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম : চিত্রভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেম ডিস্ক ফরমেটিং থেকে শুরু করে ফাইল ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ব্যবহারের সকল পর্যায়ের কাজই করতে হয় বিভিন্ন প্রকার আইকন (Icon) এবং পুল-ডাউন মেনু কমান্ড ব্যবহার করে।

○ প্রশ্ন-৮৯. এমএস ডস কি?

উত্তর : এমএস ডস (MS-DOS)-এর পুরো অর্থ হচ্ছে 'মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম'। এমএস ডস হচ্ছে একটি অপারেটিং সিস্টেম প্রোগ্রাম, যা কম্পিউটারকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে। কম্পিউটার সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটারের মেমোরিতে তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহকে পরিচালনা করার পদ্ধতি, কম্পিউটারের সাথে ব্যবহারকারীর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্যাবলী এমএস ডস প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

○ প্রশ্ন-৯০. উইন্ডোজ কি?

উত্তর : উইন্ডোজ বলতে উইন্ডোজ প্রোগ্রাম উইন্ডোজ ৯৫-এর উত্তরণের আগের অবস্থাকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ, উইন্ডোজ-৩.১১ ভার্সন। এ অবস্থায় উইন্ডোজ ডসভিত্তিক একটি গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেজ। ডসকে প্লাটফরম হিসেবে ব্যবহার করে প্রোগ্রামটি কাজ করে।

○ প্রশ্ন-৯১. উইন্ডোজ এনটি কি?

উত্তর : মাইক্রোসফট কর্পোরেশন উইন্ডোজ প্রোগ্রাম উইন্ডোজ ৯৫-তে উত্তরণের আগে ৩২ বিটের একটি অপারেটিং সিস্টেম বাজারে ছাড়ে। এটা উইন্ডোজ এনটি নামে পরিচিত। এটা পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য শক্তিশালী অপারেটিং সিস্টেম। এর আছে একটি চমৎকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একসাথে একাধিক অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালানো ছাড়াও বহু কম্পিউটার ব্যবহার করার সুবিধার জন্য উপযোগী।

○ প্রশ্ন-৯২. উইন্ডোজ ৯৫ (Windows 95) কি?

উত্তর : উইন্ডোজ ৯৫ হচ্ছে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। এটি একটি ৩২ বিটের স্বয়ংসম্পূর্ণ অপারেটিং সিস্টেম। উইন্ডোজ ৯৫ চালানোর জন্য ডস-এর প্রয়োজন হয় না। ডসনির্ভর উইন্ডোজের চেয়ে এতে কাজের সুবিধা অনেক বেশি। উইন্ডোজ ৯৫-কে অনেকাংশে ম্যাকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেমের কাছাকাছি মনে করা হয়।

○ প্রশ্ন-৯৩. ইউনিক্স কি?

উত্তর : ইউনিক্স হচ্ছে বিভিন্ন পর্যায়ের কম্পিউটারের ব্যবহারযোগ্য অপারেটিং সিস্টেম। মেইনফ্রেম কম্পিউটার থেকে শুরু করে মাইক্রো কম্পিউটারে ইউনিক্স (Unix) অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করা যায়। মাল্টিটাস্কিং এবং মাল্টি ইউজার অপারেটিং সিস্টেমের জন্য ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেম খুবই উপযোগী।

○ প্রশ্ন-৯৪. কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম (Customized Program) কি?

উত্তর : প্যাকেজ প্রোগ্রামের সাহায্যে যেসব কাজ পুরোপুরি করা যায় না, সেসব কাজের জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করে নিতে হয়। বিশেষভাবে তৈরি করে নেয়া ব্যবহারিক কর্মসূচিকেই কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কোনো সুনির্দিষ্ট কাজ বা সমস্যা সমাধানের জন্য প্যাকেজ প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বা অন্য কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করে ব্যবহারকারীর কাজের ধরন ও সমস্যা অনুযায়ী ব্যবহারকারী কর্তৃক অথবা কোনো সফটওয়্যার এক্সপোর্ট বা কোনো সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত সফটওয়্যারকে কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম বলে।

প্যাকেজ প্রোগ্রামকে বাজারের নোট বইয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর কাস্টমাইজ প্রোগ্রাম হলো নিজের তৈরি হ্যান্ডনোট যা একান্তই নিজের।

○ প্রশ্ন-৯৫. বর্তমানে কোন অপারেটিং সিস্টেম বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে?

উত্তর : অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাথে যোগসূত্র রক্ষা করে। অপারেটিং সিস্টেম ছাড়া কম্পিউটার চালনা করা যায় না। অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাথে অবস্থান করে এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের কাজগুলো করিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান আইবিএম পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার ও ক্লোন-এ এমএস-ডস (MS-DOS), Windows XP, Windows Vista, Windows 7 উইন্ডোজ ৯৫/৯৮ অপারেটিং সিস্টেম এবং অ্যাপেলের ম্যাকিনটোশ অপারেটিং সিস্টেম (MacOS) সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত। এমএস-ডস সংক্ষেপে ডস (DOS) হিসেবে পরিচিত। অপারেটিং সিস্টেমের ভিত্তিতে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম বা ব্যবহারিক কর্মসূচি তৈরি করা হয়। দুর্বল অপারেটিং সিস্টেমে শক্তিশালী বা বড় আকারের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম চালানো যায় না।

○ প্রশ্ন-৯৬. Mac OS কি?

উত্তর : এটি একটি অপারেটিং সিস্টেম। Macintosh Operating System বা Mac OS কেবল Apple Computer Inc-এর তৈরি Apple Macintosh কম্পিউটারগুলোতেই ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৪ সালে ম্যাকিনটোশ কম্পিউটারের জন্য আমেরিকার জেরক্স কোম্পানি থেকে তাদের লিজা অপারেটিং সিস্টেমের লাইসেন্সের মাধ্যমে Mac OS তৈরি করা হয়। এটি একটি চিত্রভিত্তিক

অপারেটিং সিস্টেম। সাধারণ ব্যবহারকারীরা এটি সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। শক্তিশালী গ্রাফিক্স ইন্টারফেস এবং ব্যবহারকারীর সাথে বন্ধুত্বভাবাপন্ন বলে এটি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে। বর্তমানে Apple Company-এর তৈরি কম্পিউটার ছাড়াও অন্যদের তৈরি কম্পিউটারে এটি ব্যবহৃত হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৯৭. Mac OS/2 কি ধরনের অপারেটিং সিস্টেম?

উত্তর : Mac OS/2 বা Macintosh Operating System/2 হচ্ছে MS-DOS-এর উন্নত সংস্করণ, যা আইবিএম এর নতুন প্রজন্মের কম্পিউটার পার্সোনাল সিস্টেম-২ এর জন্য করা হয়। এটি একটি মাল্টিটাস্কিং (Multitasking) বা একসাথে একাধিক কাজের উপযোগী প্রোগ্রাম। এটি একটি ৩২ বিটের অপারেটিং সিস্টেম এবং এতে MS-DOS এর সীমাবদ্ধতা নেই। MS-DOS মাত্র ৬৪০ কিলোবাইট র‍্যাম-এ কাজ করতে পারে। OS/2 তে অনেক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর ব্যবহার খুবই কম। কারণ সফটওয়্যার তৈরির প্রতিষ্ঠানগুলো OS/2-এর জন্য সফটওয়্যার তৈরিতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না।

○ প্রশ্ন-৯৮. 'I/O বাউন্ড' ও 'প্রসেসর বাউন্ড' কি?

উত্তর : যেসব প্রোগ্রামে প্রসেসিং-এর চেয়ে বেশি ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করতে হয় ঐসব প্রোগ্রামকে বলা হয় I/O বাউন্ড প্রোগ্রাম।

প্রসেসর বাউন্ড (Processor Bound) : যেসব প্রোগ্রামে প্রসেসিং-এর কাজ বেশি কিন্তু ডেটা ইনপুট বা আউটপুট করতে হয় কম সেসব প্রোগ্রামকে বলে প্রসেসর বাউন্ড প্রোগ্রাম।

○ প্রশ্ন-৯৯. সফটওয়্যার বলতে কি বোঝায়?

অথবা, What do you understand by software? *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : সফটওয়্যার (Software) : সফটওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের ভাষায় লিখিত কতকগুলো নির্দেশনার সমষ্টি যার সাহায্যে কম্পিউটার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। হার্ডওয়্যার ও কম্পিউটার ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তোলাই সফটওয়্যারের কাজ। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন।

○ প্রশ্ন-১০০. সফটওয়্যার কি? সফটওয়্যার উন্নয়নের ধাপসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তর : কম্পিউটারের যান্ত্রিক সরঞ্জামগুলোতে আছে সুপ্ত ক্ষমতা, আর এই সুপ্ত ক্ষমতা কাজে লাগানোর জন্য দরকার নির্দেশমালা বা প্রোগ্রাম। এই প্রোগ্রামগুলোকে বলে সফটওয়্যার।

সফটওয়্যার উন্নয়নের ধাপসমূহ :

সফটওয়্যার উন্নয়নের ধাপসমূহ নিম্নরূপ :

১. **তথ্যানুসন্ধান :** কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য সমস্যা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গ্রহণ করা হয়।
২. **সমস্যার বিশ্লেষণ :** সমস্যা চিহ্নিত করার পর তা বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধান করার উপায় বের করতে হয়।
৩. **প্রোগ্রাম ডিজাইন :** মূলত আউটপুট ও ইনপুট ডিজাইন করা হয়।
৪. **প্রোগ্রাম কোডিং :** অ্যালগরিদম ও ফ্লোচার্ট অনুযায়ী প্রোগ্রাম রচনা করা হয়।
৫. **প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন :** প্রোগ্রাম ডিবাগিং ও প্রোগ্রাম টেস্টিং করা হয়।
৬. **প্রোগ্রাম ডকুমেন্টেশন :** সমস্যার বিবরণ, অ্যালগরিদম, ফ্লোচার্ট, গ্রাফ, কোডিং, পরীক্ষার ফলাফল, ব্যবহারকারীর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ ইত্যাদির লিখিত বিবরণ প্রস্তুত করা হয়।
৭. **প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ :** বিভিন্ন প্রয়োজনে ও প্রোগ্রামের উন্নতির লক্ষ্যে প্রোগ্রাম আধুনিকীকরণ, পরিবর্তন, প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন ইত্যাদি রক্ষণাবেক্ষণ এর অন্তর্ভুক্ত।

○ প্রশ্ন-১০১. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পার্থক্য নিম্নরূপ :

হার্ডওয়্যার	সফটওয়্যার
কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো বা বাহ্যিক আকৃতিসম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, ডিভাইসসমূহকে হার্ডওয়্যার বলে।	প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফট্ওয়্যার বলে।
ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, মাদার বোর্ড, ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার।	বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যেমন–MS Office, Adobe Photoshop, Visual Basic ইত্যাদি, বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম যেমন– Windows XP, Windows Vista, Windows, UNIX, Mac OS ইত্যাদি সফটওয়্যার।
হার্ডওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের বাহ্যিক কাঠামো যা আমরা স্পর্শ করতে পারি।	সফটওয়্যারের কোনো বাহ্যিক কাঠামো নেই তাই একে আমরা স্পর্শ করতে পারি না।
হার্ডওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যার অর্থহীন।	সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অচল। অর্থাৎ এরা একে অন্যের পরিপূরক।

○ প্রশ্ন-১০২ : সফটওয়্যার (Software)-এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

উত্তর : কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)
২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার

নিচে সফটওয়্যারের প্রকারভেদ ছকে দেখানো হলো :

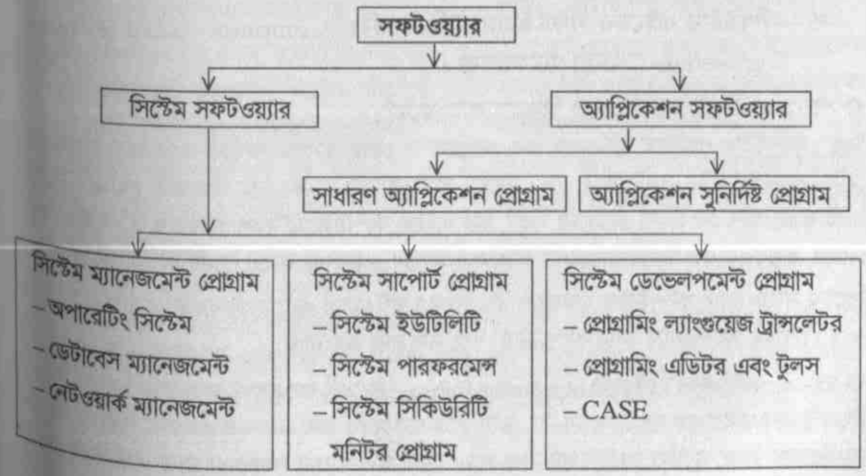

○ প্রশ্ন-১০৩. সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software) কি? বিভিন্ন প্রকার সিস্টেম সফটওয়্যার বর্ণনা করুন। *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে কাজের সমন্বয় রক্ষা করে ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম্পিউটারের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে নিয়োজিত রাখে। সিস্টেম সফটওয়্যারকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, ২. সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম ও ৩. সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

১. **সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম :** সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, ডেটা এবং নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত ইউনিটগুলো নিয়ে গঠিত। যথা :
   - ক. অপারেটিং সিস্টেম (Operating System)
   - খ. ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট (Database Management) সিস্টেম ও
   - গ. নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট (Network Management) প্রোগ্রাম।

২. **সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম :** সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটার ব্যবহারকারী সার্ভিস প্রোগ্রাম, নিরাপত্তা প্রদানের প্রোগ্রাম এবং কাজের হিসাব নিকাশসহ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করতে পারে। সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম নিম্নলিখিত প্রোগ্রামগুলো নিয়ে গঠিত। যথা–
   - ক. সিস্টেম ইউটিলিটি প্রোগ্রাম
   - খ. সিস্টেম পারফরমেন্স (Performance) মনিটর প্রোগ্রাম ও
   - গ. সিস্টেম সিকিউরিটি মনিটর প্রোগ্রাম।

৩. **সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম :** ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
   - ক. প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ ট্রান্সলেটর বা অনুবাদক,
   - খ. প্রোগ্রামিং এডিটর এবং টুলস,
   - গ. কম্পিউটার এইডেড সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং (Computer Aided Software Engineering- CASE) প্যাকেজসমূহ।

○ প্রশ্ন-১০৪. সিস্টেম সফটওয়্যার কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : কম্পিউটার পদ্ধতিতে হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোকে কার্যরত রাখার জন্য সাহায্যকারী প্রোগ্রামসমূহকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। সিস্টেম সফটওয়্যারের আরেক নাম অপারেটিং সিস্টেম। সিস্টেম সফটওয়্যার এমন এক প্রকার প্রোগ্রামের সমষ্টি, যার সাহায্যে কম্পিউটারের সকল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং সফটওয়্যারগুলোর পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরী করতে সমর্থন এবং সাহায্য করে। সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের যোগাযোগ স্থাপন করে। সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার পরিচালনা করা যায় না।

○ প্রশ্ন-১০৫. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) কি? এটি কত প্রকার? এর প্রয়োগের উদাহরণ দিন।

উত্তর : ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার বা ব্যবহারিক সফট্ওয়্যার বলা হয়। ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য নানা রকম তৈরি

প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়, যাকে সাধারণত প্যাকেজ প্রোগ্রাম বলা হয়। অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : ১. সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম ও ২. অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক বা ব্যবহার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম।

১. **সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম :** সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যবহারকারী প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ কাজগুলো যেমন– ওয়েব ব্রাউজ, ই-মেইল, ওয়ার্ড প্রসেসিং, স্প্রেডশীট প্রোগ্রাম, ডেটাবেজ ম্যানেজম্যান্ট, গ্রাফিক্স এবং ডেস্কটপ পাবলিশিং ইত্যাদি সম্পন্ন করতে পারেন। কিছু উল্লেখযোগ্য সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম হচ্ছে–

   সফটওয়্যার স্যুইট : এমএস অফিস, লোটাস স্মার্ট স্যুইট, কোরেল ওয়ার্ড পারফেক্ট অফিস ইত্যাদি।

   ওয়েব ব্রাউজার : ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার, মজিলা ফায়ারবক্স, ওপেরা, গুগল ক্রোম নেটস্কেপ কমিউনিকেটর ইত্যাদি।

   ইলেকট্রনিক মেইল বা ই-মেইল : ইন্টারনেট মেইল, ইউডোরা প্রো ইত্যাদি।

   ডেস্কটপ পাবলিশিং : পেজ মেকার, পাবলিশার, ফটোশপ প্রভৃতি।

২. **অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক বা ব্যবহার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম :** কোনো বিশেষ সুনির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত নির্দিষ্ট প্রোগ্রামকে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক বা ব্যবহার সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম বলে। উদাহরণস্বরূপ একাউন্টিংয়ের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের একাউন্টিং সফটওয়্যার, সেলস ম্যানেজমেন্ট, ইলেকট্রনিক কমার্স, ইনভেন্টরি কন্ট্রোল, পে-রোল সিস্টেম, টিকেট রিজারভেশন, ট্রান্সেকশন প্রসেসিং, ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সফট্ওয়্যার।

○ প্রশ্ন-১০৬. সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

উত্তর : সিস্টেম সফটওয়্যার ও অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো :

সিস্টেম সফটওয়্যার	অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম
১. সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।	১. ব্যবহারিক সমস্যা সমাধান বা ডাটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. এ সফটওয়্যার কম্পিউটারের বিভিন্ন ইউনিটের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে।	২. ব্যবহারিক সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি নানারকম প্রোগ্রাম বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে পাওয়া যায়।
৩. এ সফটওয়্যার তিন প্রকার : সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, সিস্টেম সাপোর্ট প্রোগ্রাম, সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।	৩. এ সফটওয়্যার প্রধানত দুই ধরনের সাধারণত অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম এবং অ্যাপ্লিকেশন সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম।
৪. সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম দিয়ে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, ডাটা ও নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।	৪. সাধারণ অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যবহারকারী প্রাত্যহিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করে থাকে।

○ প্রশ্ন-১০৭. প্যাকেজ সফটওয়্যার বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : যেসব সফটওয়্যারে নির্দিষ্ট ব্যবহারিক প্রয়োজনের সম্ভাব্য সকল প্রকার নির্দেশ তৈরি করে দেয়া থাকে, ব্যবহারকারীকে নিজে কোনো নির্দেশ তৈরি করতে হয় না, দৈনন্দিন সাধারণ সব সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবহৃত হয় তাকে প্যাকেজ সফটওয়্যার বলে। তাই প্যাকেজ সফটওয়্যার হলো ব্যবহারকারী কর্তৃক প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে কম্পিউটার প্রস্তুতকারক বা কোনো স্বাধীন সফটওয়্যার সরবরাহকারী কর্তৃক নির্মিত সফটওয়্যার, যা অনেক ব্যবহারকারীকে সম্ভাব্য সব প্রয়োজনীয় নির্দেশের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়।

○ প্রশ্ন-১০৮. কম্পোনেন্ট সফটওয়্যার কাকে বলে?

উত্তর : কম্পোনেন্ট সফটওয়্যার হচ্ছে কোনো সফটওয়্যারের ছোট ছোট এমন অংশ যা প্রয়োজনবোধে অন্য কোনো সফটওয়্যারে জুড়ে দেয়া যায় এবং ব্যবহার করা যায়। আজকাল ছোট ছোট মডিউল আকারে সফটওয়্যার রচনা করা যায়, যাতে এক প্রোগ্রামের কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ মডিউল অন্য প্রোগ্রামে ব্যবহার করা যায়। এই ছোট ছোট মডিউলগুলোকে কম্পোনেন্ট সফটওয়্যার বলে।

○ প্রশ্ন-১০৯. কম্পিউটার সফটওয়্যার কি? সফটওয়্যারের প্রয়োগগুলো লিখুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটার সফটওয়্যার : সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফটওয়্যার বলে। হার্ডওয়্যার সত্যিকার অর্থে কম্পিউটিং-এর কাজ করে এবং সফটওয়্যার হার্ডওয়্যারকে চালায়। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। উপযুক্ত সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে কম্পিউটার গাণিতিক শক্তিসম্পন্ন বুদ্ধিমান যন্ত্রে রূপ নেয়। চিত্রে কম্পিউটার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ দেখানো হলো :

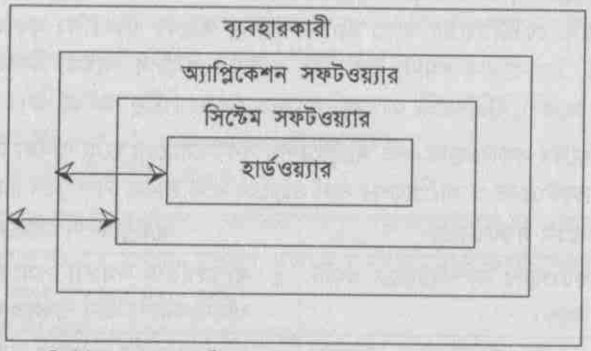

চিত্র : কম্পিউটার ব্যবহারকারী, সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ

কম্পিউটার সফটওয়্যার মডিউল বা সাবমডিউলে রচিত হয়। এই মডিউলগুলো সংঘবদ্ধভাবে এক বা একাধিক ফাইল আকারে সংরক্ষিত থাকে। কাজেই একটি প্রোগ্রাম আলাদা আলাদা অনেক ফাইলে সংরক্ষিত থাকতে পারে। প্রত্যেকটি ফাইলই নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে। যেমন কিছু ফাইল কম্পিউটারের জন্য নির্দেশ বা ইন্সট্রাকশন বহন করে, কিছু ফাইল ডেটা বহন করে।

সফটওয়্যারের প্রয়োগ : সফটওয়্যারের প্রধান প্রয়োগগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

অপারেটিং সিস্টেম : কম্পিউটারের সকল হার্ডওয়্যার ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে ও নিয়ন্ত্রণ করতে অপারেটিং সিস্টেম কাজ করে। অপারেটিং সিস্টেমের অপর নাম সিস্টেম সফটওয়্যার।

অফিস প্রোগ্রাম : অফিস ব্যবস্থাপনার কাজে অফিস প্রোগ্রাম সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। অফিস প্রোগ্রাম সফটওয়্যারে এক সাথে টাইপ করা, ডেস্কটপ পাবলিশিং, স্প্রেডশীট ও প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা থাকে।

রিজার্ভেশন সিস্টেম : আন্তর্জাতিক বিমান ব্যবস্থায় টিকেট কাটা ও আসন সংরক্ষণ এবং ফ্লাইটের শিডিউল ঠিক রাখতে রিজার্ভেশন সিস্টেম সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়।

কাস্টম সফটওয়্যার : বিভিন্ন কোম্পানি নিজেদের প্রয়োজনে অফিস ব্যবস্থাপনা ও পণ্য বিপণনের জন্য নিজেদের মতো কাস্টম সফটওয়্যার তৈরি করে।

○ প্রশ্ন-১১০. Computer Software কি? Software এর প্রয়োগ আলোচনা করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : Computer Software (কম্পিউটার সফ্টওয়্যার) : প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই কম্পিউটার সফটওয়্যার বলে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

Software (সফটওয়্যার)-এর প্রয়োগ : বর্তমান কালে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর বহু বিচিত্রমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর প্রধান কয়েকটি প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো :

শিল্পক্ষেত্র : শিল্পক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যাপক প্রয়োগ যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। রাসায়নিক কারখানা, ইস্পাত প্ল্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিল্পক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস কন্ট্রোল ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়াও রোবট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় কম্পিউটার সফটওয়্যার। রোবট বা এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো কোনো বিরতি ছাড়াই কাজ করতে পারে। ফলে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষাক্ষেত্র : আজকাল বাজারে প্রচুর শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এ ধরনের সফটওয়্যারের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ এসব শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের সাহায্যে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি হয় বিধায় এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষালাভ খুব আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। এ ধরনের কিছু সফটওয়্যার-এর উদাহরণ হলো : এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ওয়ার্ল্ড বুক, আমেরিকান টকিং ডিকশনারি ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা : বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান সব গবেষণাতেই কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয়। কারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশ কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর সাহায্যে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা যায়।

প্রকাশনা শিল্প : পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রকাশনার জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কাঙ্ক্ষিত অবয়বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠা সাজানো, ভুল সংশোধন, সংরক্ষণ, প্যারা স্থানান্তর ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিং ও ডিটিপি প্যাকেজ সফ্টওয়্যার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটার সফ্টওয়্যার-এর ব্যবহার প্রকাশনা শিল্পে উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্যতার এক অনন্য আবহ সৃষ্টি করেছে।

ডিজাইন তৈরি : শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে ইমারত, সেতু, পাতাল সড়ক, ফ্লাইওভার, রাস্তা, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদির ডিজাইন তৈরিতে কম্পিউটার সফ্টওয়্যার ব্যবহার করা হয় যা কম্পিউটার গ্রাফিক্স নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে একই জিনিসের অনেকগুলো ডিজাইন তৈরি করে তাদের সুবিধা, অসুবিধা ও উপযোগিতা তুলনা করে দেখা যায়। প্রয়োজনবোধে ডিজাইন সংশোধনও করা যায়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা : কম্পিউটার সফ্টওয়্যার-এর বদৌলতে এখন ব্যাংকগুলোতে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার সফ্টওয়্যার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় টাকা তোলার বিশেষ যন্ত্রে

(ATM–Automated Teller Machine) ক্রেডিট কার্ড ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ যন্ত্রের সংখ্যা গণনার বোতামগুলোতে চাপ দিয়ে টাকার পরিমাণ জানিয়ে দিলে সাথে সাথে যন্ত্রের ভিতর থেকে টাকা বেরিয়ে আসে। এভাবে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার যে কোনো সময়েই ব্যাংক থেকে টাকা তোলা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র : ইতোমধ্যে বাজারে বেরিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সফ্ট্‌ওয়্যার যা সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের সফ্ট্‌ওয়্যারকে মিডি (MIDI—Musical Instruments Digital Interface) সফ্ট্‌ওয়্যার বলে। বর্তমানে এমন সুর সৃষ্টির সফ্ট্‌ওয়্যার তৈরি হয়েছে যা বিশ্বের বড় বড় নামীদামী সুর স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত বেটোভেন, বাখ, মোজার্ট প্রমুখ খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞের নতুন নতুন সুর সৃষ্টিতে সক্ষম। এ ধরনের একটি সফ্‌টওয়্যার-এর নাম হচ্ছে Mozart 42nd।

বিনোদন : বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ প্রবেশ করেছে কম্পিউটার সফ্ট্‌ওয়্যার। অবাস্তব সব দৃশ্যকে আশ্চর্য বাস্তব রূপ দেয় সফ্ট্‌ওয়্যার। ইটি, জুরাসিক পার্ক, টারমিনেটর, ম্যাট্রিক্স, সিন্দাবাদ, স্পাইডারম্যান ইত্যাদিসহ আরো অনেক ছবিতে যে আশ্চর্য দৃশ্য দেখানো হয়েছে তার সবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার সফ্ট্‌ওয়্যার-এর বদৌলতে। সফ্ট্‌ওয়্যার-এর কারসাজিতে দর্শক মুহূর্তেই চলে যান সেই কোটি কোটি বছর আগের জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের কাছে। আবার খেলাধুলার জন্য রয়েছে সর্বাধুনিক সব ভিডিও গেম্‌স্‌ সফ্ট্‌ওয়্যার। এর পাশাপাশি প্রচলিত তাস বা দাবা খেলাও বাদ পড়েনি। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কম্পিউটার সফ্ট্‌ওয়্যার-এর ব্যাপক হারে প্রয়োগ মানব সভ্যতার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছে।

০ প্রশ্ন-১১১. কম্পিউটার (সফ্টওয়্যার)-এর সোর্স কোড কি? সোর্স কোড উন্নয়নে ব্যবহার হয় এমন দুটি সফটওয়্যার-এর নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : সোর্স কোড : কোনো সফটওয়্যার তৈরির জন্য প্রোগ্রামারগণ যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষা বা প্রোগ্রামিং টুলস ব্যবহার করে যে প্রোগ্রাম রচনা করে তাকে সোর্স কোড বলে। অর্থাৎ যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় লিখা কোডই হলো সোর্স কোড।

কম্পিউটার সোর্স কোড উন্নয়নে ব্যবহার করা হয় এমন দু'টি সফটওয়্যার হলো : (১) মাইক্রোসফট ভিজ্যুয়াল স্টুডিও ডট নেট; (২) জাভা এন্টারপ্রাইজ ম্যানেজমেন্ট টুলস।

চ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ
Programming Languages

০ প্রশ্ন-১১২. কম্পিউটারের ভাষা কি?

উত্তর : কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ইলেকট্রনিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটারের ভাষা। গণিতের বাইনারি পদ্ধতিতে যে কোনো সংখ্যাকে 1 এবং 0 দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এরূপ বাইনারি যে কোনো সংখ্যাকে ইলেক্ট্রনিক অন/অফ করে প্রকাশিত ভাষাই হলো ইলেকট্রনিক ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পিউটারের ভাষা। বাইনারি হলো এমন সংখ্যা পদ্ধতি, যাতে যে কোনো সংখ্যাকে ০ এবং ১ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন, ২৯ কে ১১১০১ দ্বারা, ২০৩ কে ১১০০১০১১ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এভাবে যে কোনো সংখ্যাকে ১ এবং ০ দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

কম্পিউটার কেবল ইলেকট্রনিক সংকেত অর্থাৎ সার্কিটে বিদ্যুৎ আছে কি নেই তা বোঝে। অর্থাৎ কম্পিউটার শুধু দুটি অবস্থা বোঝে। বাইনারি 1 দ্বারা বিদ্যুৎ আছে (On) এবং 0 দ্বারা বিদ্যুৎ নেই (Off) এর উপর ভিত্তি করেই কম্পিউটারের ভাষা তৈরি করা হয়েছে। এভাবে যে কোনো শব্দ বা চিহ্ন কম্পিউটারকে বোঝার উপযোগী করে অর্থাৎ 0 এবং 1 এ রূপান্তরিত করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে।

০ প্রশ্ন-১১৩. প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কি? প্রোগ্রামিং লাঙ্গুয়েজের স্তর কয়টি ও কি কি? *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটার দিয়ে সহজে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারকে তার নিজস্ব বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারের নিজস্ব ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী শব্দ, বর্ণ, সংকেত ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট বিন্যাস হচ্ছে প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বর্ণ, শব্দ, সংকেত ইত্যাদি নির্দিষ্ট গঠনে তৈরি হয় প্রোগ্রামের ভাষা।

বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা : প্রোগ্রামের ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তরে (Level) বা প্রজন্মে (Generation) ভাগ করা যায়। যথা–

ক. **প্রথম প্রজন্ম ভাষা (১৯৪৫) :** মেশিন ভাষা (Machine Language);
খ. **দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৫০) :** অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language);
গ. **তৃতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৬০) :** উচ্চতর বা হাই লেভেল (High Level) ভাষা;
ঘ. **চতুর্থ প্রজন্ম ভাষা (১৯৭০) :** অতি উচ্চতর বা ভেরি হাই লেভেল (Very High Level) ভাষা ও
ঙ. **পঞ্চম প্রজন্ম ভাষা (১৯৮০) :** স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল (Natural) ভাষা।

উল্লেখ্য, মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষাকে লো লেভেল ভাষা বলে।

০ প্রশ্ন-১১৪. ফার্স্ট জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা মেশিন ভাষা কি? এর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

উত্তর : ভাষার সর্বনিম্ন স্তর হলো মেশিনভাষা যা কম্পিউটারের মৌলিক ভাষা। মেশিন ভাষায় 0 ও 1 এ দুই বাইনারি অঙ্ক অথবা হেক্স পদ্ধতি ব্যবহার করে সবকিছু লেখা হয়। কম্পিউটার একমাত্র মেশিন ভাষাই বুঝতে পারে, অন্যভাষায় প্রোগ্রাম করলে কম্পিউটার আগে উপযুক্ত অনুবাদকের সাহায্যে তাকে মেশিনভাষায় পরিণত করে নেয়।

মেশিন ভাষায় যেসব নির্দেশ দেয়া হয় তাদের চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

১. গাণিতিক (Arithmetic)	অর্থাৎ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ
২. নিয়ন্ত্রণ (Control)	অর্থাৎ লোড (Load), স্টোর (Srore) ও জাম্প (Jump)।
৩. ইনপুট-আউটপুট	অর্থাৎ পড় (Read) ও লেখ (Write)
৪. প্রত্যক্ষ ব্যবহার (Direct use)	অর্থাৎ আরম্ভ কর (Start), থাম (Halt) ও শেষ কর (End)।

মেশিনভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলে বস্তু প্রোগ্রাম (Object program) এবং অন্য যে কোনো ভাষায় লেখা প্রোগ্রামকে বলে উৎস প্রোগ্রাম (Source program)

মেশিন ভাষার সুবিধা :

১. সবচেয়ে কম পরিমাণ লজিক ও মেমোরি পরিসরে এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম নির্বাহ সম্ভব।
২. কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা অর্জন করতে হলে মেশিন ভাষা একান্ত প্রয়োজন।

৩. মেশিন ভাষা অন্যান্য ভাষা থেকে দ্রুত।
৪. এই ভাষা দিয়ে বর্তনী অথবা মেমোরি-অ্যাড্রেসের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ সাধন সম্ভব। তাই কম্পিউটার বর্তনীর ভুল-ত্রুটি সংশোধনের জন্য মেশিন ভাষা ব্যবহার করা হয়।

মেশিন ভাষার অসুবিধা :

১. মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লেখা অত্যন্ত ক্লান্তিকর ও সময়সাপেক্ষ; কারণ এই প্রোগ্রামের জন্য কম্পিউটারের প্রতিটি নির্দেশ ও মেমোরি-অ্যাড্রেসের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দরকার।
২. মেশিন ভাষা মেশিনের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ এক ধরনের মেশিনের জন্য লিখিত প্রোগ্রাম অন্য ধরনের মেশিনে ব্যবহার করা অসম্ভব।
৩. মেশিন ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে দক্ষ প্রোগ্রামার দরকার।
৪. মেশিন ভাষা ডিবাগ করা বা পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য।

০ প্রশ্ন-১১৫. অ্যাসেম্বলি ভাষা বা সেকেন্ড জেনারেশন ভাষা কি? এর সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

উত্তর : অ্যাসেম্বলি ভাষাকে সাংকেতিক (Symbolic) ভাষাও বলে। এর প্রচলন শুরু হয় ১৯৫০ সাল থেকে, দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে এই ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

অ্যাসেম্বলি ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ ও ডেটার অ্যাড্রেস বাইনারি বা হেক্স সংখ্যার সাহায্য না দিয়ে সংকেতের সাহায্যে দেয়া হয়। এ সংকেতকে বলে সাংকেতিক কোড (Symbolic Code) বা নেমোনিক (Nemonic অর্থাৎ যে সংকেতের সাহায্যে কোনো বড় সংখ্যা বা কথাকে মনে রাখার সুবিধা হয়)। যেমন অ্যাকিউমুলেটরে রাখা, এর নেমোনিক LDA। ডেটা ও ডেটার অ্যাড্রেসও নেমোনিকের সাহায্যে দেয়া হয়। এর জন্য নিউমারিক ও আলফানিউমারিক বর্ণ ব্যবহৃত হয়। একসঙ্গে এক বা একাধিক বর্ণ ব্যবহার করা যায় তবে সর্ববামের বর্ণ সর্বদা অক্ষর হয় যেমন– A, B, A1, B2 ইত্যাদি।

অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা :

১. অ্যাসেম্বলি ভাষায় দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব।
২. এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রামে ভুলের পরিমাণ কম হয় এবং সহজেই তা নির্ণয় ও সংশোধন করা সম্ভব।
৩. এই ভাষার প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল। তাই এ ভাষা ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ধারণা দরকার।
৪. মেমোরির জন্য অ্যাসেম্বলি শব্দের ব্যবহারের ফলে প্রোগ্রাম রচনার মেমোরি-অ্যাড্রেসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অপ্রয়োজনীয়।

অ্যাসেম্বলি ভাষার অসুবিধা :

১. প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং মেশিনের আভ্যন্তরিক সংগঠনের ধারণা ছাড়া প্রোগ্রাম রচনা অসম্ভব। তাছাড়া এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে নাও চলতে পারে।
২. এই ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা মেশিনের ভাষার তুলনায় সহজতর হলেও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ।

০ প্রশ্ন-১১৬. থার্ড জেনারেশন ভাষা (১৯৬০) বা হাই লেভেল ভাষা কি? এই ভাষার বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : থার্ড জেনারেশন ভাষায় আমাদের পরিচিত বাক্য বর্ণ ও সংখ্যা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। এ ভাষায় খুব দ্রুত এবং সহজে প্রোগ্রাম লিখা যায়। এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে খুব দক্ষতার প্রয়োজন

নেই। এ ভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। ২৫টিরও বেশি হাই লেভেল বা উচ্চতর ভাষা আছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো :

বেসিক (BASIC)	অ্যালগল (ALGOL)
প্যাসকেল (PASCAL)	লগো (LOGO)
ফোর্ট্রান (FORTRAN)	লিস্প (LISP)
কোবল (COBOL)	অ্যাডা (ADA)
টার্বো সি (TURBO C)	প্রোলগ (PROLOG)

বৈশিষ্ট্য : স্বাভাবিক ভাষার মতো হাই লেভেল ভাষার গঠনগত (Syntax) নিয়ম-কানুন আছে। নিচে হাই লেভেল ভাষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

১. হাই লেভেল ভাষায় স্বাভাবিক ভাষার (যেমন ইংরেজি) অনেক শব্দ ব্যবহার করা যায়।
২. প্রোগ্রামের কার্যবর্ণনা বা স্টেটমেন্ট অনেকগুলো মেশিন (বা অ্যাসেম্বলি) স্টেটমেন্টের সমকক্ষ অর্থাৎ প্রোগ্রাম সংক্ষিপ্ত হয়।
৩. অসংখ্য তৈরি লাইব্রেরি প্রোগ্রামের সুবিধা বিদ্যমান।
৪. প্রোগ্রাম রচনার সময় কম্পিউটার মেশিনের কথা ভাবতে হয় না।

হাই লেভেল ভাষার প্রধান সুবিধাগুলো হলো :

১. হাই লেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।
২. মানুষের পক্ষে লো লেভেলের চেয়ে হাই লেভেল ভাষা শেখা সহজ।
৩. হাই লেভেল ভাষায় তাড়াতাড়ি প্রোগ্রাম লেখা যায়।
৪. লো লেভেল ভাষার চার বা পাঁচটি নির্দেশের জায়গায় হাই লেভেল ভাষার মাত্র একটি বাক্য লিখলেই চলে।
৫. প্রোগ্রাম লেখার জন্য কম্পিউটার সম্পর্কে ধারণা প্রয়োজন নেই।

হাই লেভেল ভাষার প্রধান অসুবিধাগুলো হলো :

১. কম্পিউটার সরাসরি এই ভাষা বুঝতে পারে না। তাই এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে কম্পিউটারে চালাতে হলে অনুবাদকের প্রয়োজন হয়।
২. প্রোগ্রাম রান করতে বেশি সময় লাগে এবং বেশি মেমোরি দরকার। তাই লো লেভেল ভাষা থেকে দক্ষতা কম।
৩. এ ভাষা লো লেভেল ভাষা থেকে কম অনমনীয় (Lack of Flexibility)।

০ প্রশ্ন-১১৭. ফোর্থ জেনারেশন ভাষা বা অতি উচ্চতর ভাষা সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : কম্পিউটারে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটি ভাষাকে 4GL বলে। 4GL ব্যবহার করে সহজে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তারিতভাবে প্রক্রিয়াকরণের বর্ণনা দিতে হয় না বলে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাকে ননপ্রসিডিউলার ল্যাংগুয়েজও বলা হয়। অধিকাংশ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষায় কথোপকথন রীতিতে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে ব্যবহারকারীর যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

বৈশিষ্ট্য :

১. এ ভাষায় লিখিত কোনো প্রোগ্রাম বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি কম্পিউটারে একই সাথে কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।
২. এটি ইন্টারেক্টিভ মোডে কার্যক্ষম।

৩. এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার পর পুরোটা কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না। একটি কমান্ড লেখার সাথে সাথেই কম্পাইল হয়ে যায়।
৪. স্বাভাবিক ইংরেজি ভাষার মতো নির্দেশ দিয়ে ডেটাবেজের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়।

উদাহরণ : SQL/DS, INTELECT

০ প্রশ্ন-১১৮. ন্যাচারাল ভাষা কি?

উত্তর : ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ দু প্রকার। একটি হলো মানুষের ভাষা যেমন– বাংলা, ইংরেজি, আরবি, স্প্যানিশ ইত্যাদি এবং অন্যটি হলো প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ যা মানুষের ভাষা ব্যবহার করে কম্পিউটারের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি করে।

ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ সাধারণত অনেকটা ইংরেজি অথবা মানুষের ভাষার মত। মানুষের ভাষার মত স্বাভাবিক ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য এখনও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। এ ধরনের ভাষাকে মেশিনের ভাষায় রূপান্তরের জন্য ব্যবহৃত অনুবাদককে বুদ্ধিমান বা ইনটেলিজেন্ট কম্পাইলার বলা হয়। এটি মূলত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র।

০ প্রশ্ন-১১৯. মাইক্রো কম্পিউটারের নিচুস্তরের ও উঁচুস্তরের ভাষা বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : নিচুস্তরের ভাষা : মাইক্রো কম্পিউটারের নিচুস্তরের ভাষা বলতে মেশিনের ভাষা ও এসেম্বলি ভাষা এ দুই স্তরের ভাষাকে বোঝায়। এ দু স্তরের ভাষা কম্পিউটারের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং নিচুস্তরের ভাষা একটি মেশিনের জন্য রচিত প্রোগ্রাম, যা অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। নিচুস্তরের ভাষার এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য উঁচুস্তরের ভাষার প্রচলন হয়।

উঁচুস্তরের ভাষা : মাইক্রো কম্পিউটারের উঁচুস্তরের ভাষা মেশিননির্ভর নয়। অর্থাৎ উঁচুস্তরে ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটারে ব্যবহার করা সম্ভব। মাইক্রো কম্পিউটারের উঁচুস্তরের ভাষাগুলো হচ্ছে বেসিক, প্যাস্কেল, মডুলা, ফরট্রান, অ্যাডা, অ্যালগল, কোবল, পিএল ওয়ান প্রভৃতি।

০ প্রশ্ন-১২০. হাই-লেভেল ও লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এর মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : হাই-লেভেল ও লো-লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এর মধ্যে দুটি পার্থক্য নিচে দেয়া হলো —

লো লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ	হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ
১. নিচুস্তরের ভাষা একটি মেশিনের জন্য রচিত প্রোগ্রাম, যা অন্য ধরনের কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায় না। নিচু স্তরের ভাষা বলতে মেশিনের ভাষা ও এসেম্বলি ভাষাকেই বোঝায়।	১. উঁচু স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। এটি মেশিন নির্ভর নয়। যেমন– বেসিক, প্যাস্কেল, মডুলা, ফরট্রান ইত্যাদি।
২. নিচু স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ।	২. উঁচু স্তরের ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা করা সহজ ও তাড়াতাড়ি করা যায়।

০ প্রশ্ন-১২১. Fiber optic কত প্রকার ও কি কি? Optical fiber-এর মাধ্যমে কিভাবে ডাটা আদান প্রদান করা যায়? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ফাইবার অপটিকের প্রকারভেদ : ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ফাইবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index fiber)
২. গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index fiber) ও
৩. মনোমোড ফাইবার (Monomode fiber)

স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং এর ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে। কোরের প্রতিসরাঙ্কের ভিন্নতার জন্য এ দু ধরনের ফাইবারের আলোক রশ্মির গতিপথও ভিন্ন হয়। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের ব্যাসার্ধ বেশি।

প্রেরক যন্ত্র, প্রেরণ মাধ্যম এবং গ্রাহক যন্ত্র—এ তিনটি মূল অংশ নিয়ে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সংগঠিত। প্রেরক যন্ত্র উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ফাইবারের মাধ্যমে তা গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়।

অপটিক্যাল ফাইবার সরাসরি অ্যানালগ বা ডিজিটাল ডেটা পরিবহনে সক্ষম নয়। একে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মডুলেটর ও লাইট ইমিটিং ডায়োডের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গে পরিণত করে ফাইবারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোক রশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্রে মূলত দুটি অংশ থাকে— ফটো ডিটেকটর এবং প্রসেসিং ইউনিট। ফটো ডিটেকটরের কাজ হলো ফাইবার থেকে ডেটা উদ্ধার করা (Detection)। প্রসেসিং ইউনিটে থাকে অ্যামপ্লিফায়ার, ফিল্টার, ডিমডুলেটর ইত্যাদি। এরা ডেটাকে যথার্থভাবে ডিমডুলেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন এবং ফিল্টারেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়।

০ প্রশ্ন-১২২. Fiber Optic Communication System এর গুরুত্ব লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় Fiber Optic Communication System (ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম) এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম-এর গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো :

উচ্চ ব্যান্ডউইড্থ (Bandwidth) : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য পরিবহনের জন্য ফাইবার অপটিক (বা অপটিক্যাল ফাইবার) ব্যবহৃত হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার-এর মধ্য দিয়ে যে তথ্য পাঠানো হয় তা আলোক তরঙ্গ হিসেবে সঞ্চালিত হয়। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ব্যান্ডউইড্থ (Bandwidth) তথ্য পরিবহনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে একই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তথ্য প্রেরণ করা যায় যা ডেটা বা তথ্য সঞ্চালনের অন্যান্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

উচ্চ গতিসম্পন্ন : আমরা জানি আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ কিলোমিটার। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলোর মাধ্যমে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে অতি উচ্চ গতিতে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

শক্তিক্ষয় তুলনামূলক কম : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয় তা এক ধরনের কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি। এই অপটিক্যাল ফাইবার-এর শোষণ ক্ষমতা খুবই কম কিন্তু প্রতিসরাঙ্ক তুলনামূলক বেশি। অপটিক্যাল ফাইবার-এর মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা বা তথ্য সঞ্চালিত হয়। আবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির সম্পূর্ণ অংশই প্রতিফলিত হয়, কোনো অংশই শোষিত বা প্রতিসরিত হয় না। ফলে এ পদ্ধতিতে শক্তির অপচয় কম হয়।

বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবমুক্ত : আলোক রশ্মি বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যেহেতু ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলোক তরঙ্গ হিসেবে তথ্য বা ডেটা আদান-

প্রদান করা হয় কাজেই এই পদ্ধতিতে প্রেরিত তথ্য বা ডেটা কোনো বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত বা বিকৃত হয় না। ফলে প্রেরণ পথে কোনো বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র থাকলেও সম্পূর্ণ অবিকৃত তথ্য পাওয়া যায়।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় থাকে : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পথে ডেটা বা তথ্য পাঠানো হয়। ফলে এ পদ্ধতিতে তথ্য চুরি বা পাচার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এ ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই পদ্ধতির সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

○ প্রশ্ন-১২৩. ভি-স্যাট বলতে কি বোঝায়?

অথবা, **What do you understand by VSAT?** *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : V-SAT হচ্ছে Very Small Aperture Terminal-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন (ডিস)। এটিতে একটি ছোট এন্টেনা থাকে যা ০.৮ থেকে ২.৪ মিটার ডায়ামিটারের। যেখানে তার যোগাযোগ নেই বা যেসব এলাকায় লোকবসতি/ জনসংখ্যার ঘনত্ব কম সেসব জায়গায় ব্যান্ড প্রস্থ (band width) ডিস্ট্রিবিউট করার সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে ভিস্যাট। ভিস্যাটের মাধ্যমে সাধারণত ২৫৬ কিলোবাইট/সেকেন্ডে থেকে ৫১২ কিলোবাইট/সেকেন্ড ব্যান্ড প্রস্থ (band width) বিতরণ করা সম্ভব। তবে সরবরাহকারীর (Provider) উপর নির্ভর করে এটি সর্বোচ্চ ২০ মেগাবাইট/সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে। VSAT-এ Uplink-এর চেয়ে Downlink কিছুটা মন্থর গতির।

○ প্রশ্ন-১২৪. স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সুবিধা ও অসুবিধা লিখুন।

অথবা, **Give a brief description on pros and cons of satellite networks.** *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সুবিধা (pros) : আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর একপ্রান্তের সংঘটিত কোনো ঘটনাকে অন্য প্রান্তে ন্যূনতম সময় ব্যবধানে সরাসরি দেখানো যাচ্ছে। বড় বড় টেলিমিডিয়াগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখছে তাদের টেলিকাস্টের মাধ্যমে। বিশ্ব পরিস্থিতি সাধারণ জনগণের কাছে অতি দ্রুত উপস্থাপিত হচ্ছে।

স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের অসুবিধা (cons) : স্যাটেলাইটকে তার কক্ষপথে স্থাপনের জন্য যে উৎক্ষেপণ মান ব্যবহৃত হয় তা খুবই ব্যয়বহুল, যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পক্ষেই মেটানো সম্ভব নয়। অপরদিকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়ে। তদুপরি, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

○ প্রশ্ন-১২৫. প্রোগ্রামের ভাষা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : প্রোগ্রাম লিখে কম্পিউটার দিয়ে সমস্যা সমাধানের পূর্বে সঠিক প্রোগ্রামের ভাষা নির্বাচন করা দরকার। সমস্যার ধরন (যেমন বাণিজ্যিক, বৈজ্ঞানিক, গ্রাফিক ইত্যাদি)সহ ভাষা নির্বাচনের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ :

১. সমস্যার প্রকৃতি যেমন বৈজ্ঞানিক, বাণিজ্যিক।
২. ভাষার গঠনগত বিষয়াদি যেমন ডেটার গঠন প্রকৃতি, প্রোসিডিউর বা রীতি-নীতি, ফাংশন ইত্যাদি।
৩. প্রাপ্যতা যেমন ভাষার কম্পাইলর বা ইন্টারপ্রেটার থাকা দরকার।

৪. ভাষা ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, যেমন ব্যবহারকারী তাঁর পরিচিত ভাষা পছন্দ করতে পারেন।
৫. ভাষা ব্যবহারের ও শেখার সুবিধা।
৬. প্রোগ্রাম নির্বাহের গতি ও দক্ষতা এবং মেমোরি পরিসরের পরিমাণ।
৭. ভুল নির্ণয়ের সুবিধা।
৮. প্রয়োজনীয় লেখ্য বা ডকুমেন্টেশনের প্রাপ্যতা।

○ প্রশ্ন-১২৬. প্রোগ্রাম তৈরির ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : কম্পিউটারের সাহায্যে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য প্রোগ্রাম তৈরির পাঁচটি ধাপ আছে। যথা–

ক. সমস্যা বিশ্লেষণ
খ. প্রোগ্রাম ডিজাইন
গ. প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং
ঘ. প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন (টেস্টিং ও প্রোগ্রামের ডিবাগিং)
ঙ. প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ।

ক. **সমস্যা বিশ্লেষণ (Problem analysis) :** সমস্যা নির্দিষ্ট করার পর সমস্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ডেটা সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করতে হয়। এর জন্য সমস্যাকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করা হয়। প্রয়োজনে চার্ট, তালিকা, গ্রাফ ইত্যাদির আশ্রয় নিতে হয়। একে বলে সিস্টেম বিশ্লেষণ। সমস্যার বিশ্লেষণে বর্তমান সিস্টেমের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হয়– ইনপুট শনাক্তকরণ ও আউটপুট শনাক্তকরণ।

খ. **প্রোগ্রাম ডিজাইন (Program design) :** প্রোগ্রাম ডিজাইন বলতে বোঝায় সমস্যা সমাধান করার জন্য বর্তমান সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নতুন সিস্টেমের মূল রূপরেখা নির্ণয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো জটিল সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলেই তার সহজ সমাধান বেরিয়ে আসে। সমাধানের জন্য সমস্যাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধে পৃথকভাবে ও সব অংশ সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হয়। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধও বিচার করতে হয়। নতুন সিস্টেমের আর্থিক দিকও ভেবে দেখতে হয়। প্রোগ্রাম ডিজাইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত। যথা–

- ইনপুট ডিজাইন,
- আউটপুট ডিজাইন,
- ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক ডিজাইন।

অতঃপর সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ কার্যকরী করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তৈরি করতে হয়।

- অ্যালগোরিদম,
- ফ্লোচার্ট ও
- সুডোকোড।

গ. **প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট বা কোডিং (Program coding) :** অ্যালগোরিদম, ফ্লোচার্ট ও সুডোকোড থেকে সুবিধামত কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে হয়। এ হলো প্রোগ্রামিং-এর সবচেয়ে সহজ অংশ, একে প্রোগ্রাম কোডিং (Coding) বলে।

ঘ. প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন (Program development) : প্রোগ্রাম কোডিং করার পর প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হয়। এ পর্বের প্রথমে প্রোগ্রামকে টেস্টিং করা হয় এবং টেস্টিং করার পর প্রয়োজন অনুসারে সংশোধন করা হয়। প্রোগ্রামে ভুল থাকলে তা সংশোধন করা হয়। প্রোগ্রামের ভুলকে প্রোগ্রামের বাগ বলা হয়। আর এ বাগ সংশোধন করাকে ডিবাগিং বলা হয়।

ঙ. প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ (Program maintenance) : বাইরের পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য মাঝে মাঝে প্রোগ্রামে ছোটখাট পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয়। একে বলে রক্ষণাবেক্ষণ। সাধারণত কোনো প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার স্থাপনের কয়েক বছর পর থেকে নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করার চেয়ে পুরানো প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণে বেশি সময় ব্যয় হয়। জটিল প্রোগ্রামকে সাধারণত কতগুলো ছোট অংশে ভাগ করা হয়, প্রত্যেক অংশকে বলে মডিউল (Module)। প্রত্যেক মডিউল একটি নির্দিষ্ট কাজ করে। প্রোগ্রাম রক্ষণাবেক্ষণ সহজ করার জন্য প্রোগ্রামের সঠিক ডকুমেন্টেশান তৈরি করতে হবে।

○ প্রশ্ন-১২৭. জব কন্ট্রোল ভাষা কি?

উত্তর : জব কন্ট্রোল ভাষা হলো একটি ব্যাচ নির্ভরশীল ভাষা, যা জব চিহ্নিতকরণ এবং কোন প্রোগ্রাম পরিচালনা করতে হবে তা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে। জব কন্ট্রোল ভাষার কার্যাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. **ব্যবহারকারী শনাক্তকরণ :** অপারেটিং সিস্টেম নিরাপত্তার স্বার্থে কম্পিউটারে প্রবেশের পূর্বে কম্পিউটার ব্যবহারকারীর নাম বা পাসওয়ার্ড গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবহারকারী শনাক্ত করে।

২. **প্রোগ্রাম চিহ্নিতকরণ :** একটি অপারেটিং সিস্টেমে নানা ধরনের রুটিন, ফাংশন, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম থাকতে পারে। ব্যবহারকারী কোন প্রোগ্রামটি ব্যবহার করতে চায় তা সে জব কন্ট্রোল ভাষার মাধ্যমে উল্লেখ করে থাকে।

৩. **প্রয়োজনীয় ডিভাইস চিহ্নিতকরণ :** জব কন্ট্রোল ভাষা ব্যবহার করে ব্যবহারকারী মূলত কোন ডিভাইস ব্যবহার করতে চায় তা উল্লেখ করে থাকে।

৪. **ইন্টারাপ্ট :** জব কন্ট্রোল ভাষার আরেকটি বৈশিষ্ট্য ইন্টারাপ্ট। এটি প্রোগ্রাম নির্বাহকালীন সময়ে জরুরিভিত্তিতে কর্মরত প্রোগ্রাম বন্ধ করাকে বুঝায়।

ছ প্রোগ্রাম ডিজাইন ও অনুবাদক প্রোগ্রাম
Program Design and Translator Program

○ প্রশ্ন-১২৮. অনুবাদক প্রোগ্রাম বলতে কি বুঝেন? এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

অথবা, ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর কি? বিভিন্ন প্রকার ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেটর আলোচনা করুন।

উত্তর : অনুবাদক প্রোগ্রাম : উৎস প্রোগ্রামকে (Source Program) বস্তু প্রোগ্রামে (Object Program) পরিণত করতে যে সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম বা Language Translator বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে সফটওয়্যারের সাহায্যে উচ্চস্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তর করা যায় তাকে অনুবাদক প্রোগ্রাম (Translator Program) বলে।

যান্ত্রিক ভাষা ছাড়া অন্য স্তরের ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে উৎস প্রোগ্রাম (Source Program) এবং যান্ত্রিক ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রাম (Object Program) বলে।

যে কোনো উৎস প্রোগ্রামে লিখিত প্রোগ্রাম কম্পিউটারে ইনপুট নেয়ার পর অনুবাদক প্রোগ্রাম সে ভাষাকে মেশিন ভাষায় পরিবর্তন করে CPU-এর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। নিম্নে অনুবাদক প্রোগ্রামের কাজ ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যে দেখানো হলো :

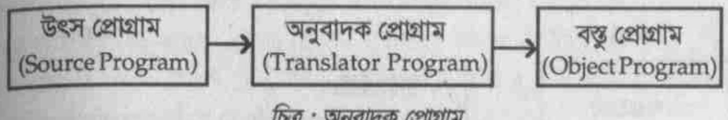

চিত্র : অনুবাদক প্রোগ্রাম

অনুবাদক প্রোগ্রামের শ্রেণিবিভাগ : অনুবাদক প্রোগ্রামকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. কম্পাইলার (Compiler)
২. ইন্টারপ্রিটার (Interpreter)
৩. এসেম্বলার (Assembler)

১. **কম্পাইলার (Compiler) :** কম্পাইলারের কাজ হাই লেভেল লেঙ্গুয়েজে লেখা সোর্স প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের ভাষা অবজেক্ট প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। এসেম্বলার ও কম্পাইলার কম্পিউটারের সেকেন্ডারী মেমোরিতে থাকে। প্রয়োজনের সময় তাদেরকে RAM এ লোড করে আনা হয়। এসেম্বলী ভাষার তুলনায় হাই লেভেল ল্যাঙ্গুজকে অনুবাদ করার কাজটি কঠিন এবং এজন্য মেমোরিতে বেশি জায়গার প্রয়োজন হয়।

কম্পাইলারের ব্লক ডায়াগ্রাম : নিচে কম্পাইলারের ব্লক ডায়াগ্রাম উপস্থাপন করা হলো :

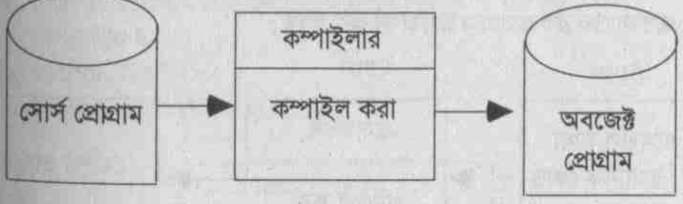

চিত্র : কম্পাইলার

কাজ :

ক. সোর্স প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
খ. প্রোগ্রামকে লিঙ্ক করা।
গ. প্রোগ্রাম লেখায় ভুল হলে তা জানানো ও সংশোধন করা।
ঘ. মেইন মেমোরির মেমোরি স্পেস ব্যবস্থাপনা করা।
ঙ. প্রোগ্রাম কোড এর প্রিন্ট নেওয়া।

২. **ইন্টারপ্রিটার (Interpreter) :** ইন্টারপ্রিটারেরও কাজ হলো হাই লেভেল ভাষায় লিখিত সোর্স প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করা। তবে কম্পাইলার সেখানে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে

তারপর তা অবজেক্ট কোডে পরিণত করে। সেখানে ইন্টারপ্রেটার হাইলেভেল ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম কোডের একটি লাইনকে বা একটি নির্দেশকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করার জন্য কাজ করে এরপর লাইন থেকে লাইনে সমগ্র প্রোগ্রামকেই অনুবাদ করে।

ইন্টারপ্রিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম : নিচে ইন্টারপ্রিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম : নিচে ইন্টারপ্রিটারের ব্লক ডায়াগ্রাম উপস্থাপন করা হলো :

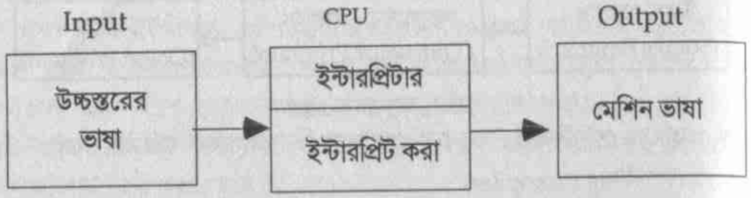

চিত্র : ইন্টারপ্রিটার

কাজ :

ক. হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজে লিখিত মেশিন ভাষায় রূপান্তর করা।

খ. এটি প্রোগ্রামকে এক লাইন থেকে এক লাইন করে অনুবাদ করে।

গ. এটি প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে ও সংশোধনের সুযোগ দেয়।

ঘ. ডিবাগিং ও টেস্টিং এর ক্ষেত্রে দ্রুত কাজ করে।

৩. **এসেম্বলার (Assembler) :** এসেম্বলারের কাজ হলো এসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষার বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। এসেম্বলার প্রোগ্রাম লিখিত হয় মেশিন ভাষায়।

এসেম্বলারের ব্লক ডায়াগ্রাম :

নিম্নে এসেম্বলারের ব্লক ডায়াগ্রাম উপস্থাপন করা হলো :

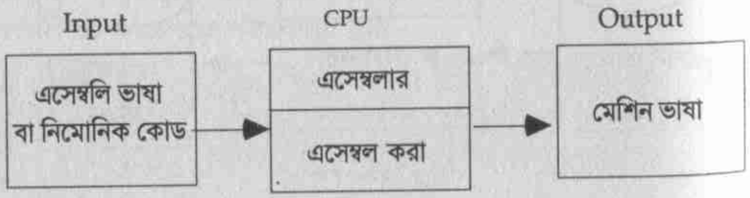

চিত্র : এসেম্বলার

কাজ :

ক. নেমোনিক কোডকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করা।

খ. এসেম্বলি এড্রেসকে মেশিন ভাষায় লিখে এড্রেসে পরিণত করে।

গ. প্রত্যেক নির্দেশ ঠিক আছে কি-না পরীক্ষা করা, ঠিক না থাকলে ঠিক করা।

ঘ. সব নির্দেশ বা ডেটা প্রধান মেমোরিতে রাখে।

ঙ. সব ভুল সংশোধনের পর প্রথম নির্দেশ থেকে কাজ শুরু করতে কন্ট্রোল ইউনিটকে বলা।

○ প্রশ্ন-১২৯. টেক্সট এডিটর কি? এটি কেন ব্যবহার করা হয়? কয়েকটি টেক্সট এডিটর প্রোগ্রামের নাম লিখুন।

উত্তর : টেক্সট এডিটর (Text Editor) : টেক্সট এডিটর হলো এক প্রকার প্রোগ্রাম যার মাধ্যমে প্লেইন টেক্সট লেখা ও এডিট করা যায়।

টেক্সট এডিটর সাধারণত অপারেটিং সিস্টেমের সাথেই প্রোগ্রাম হিসেবে থাকে। তবে বিভিন্ন সুবিধা সম্পন্ন টেক্সট এডিটর রয়েছে যা সফটওয়্যার প্যাকেজ হিসেবে পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সোর্স কোড এর ডকুমেন্টেশন ফাইল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টেক্সট এডিটর ব্যবহারের কারণ : টেক্সট এডিটর ব্যবহারের কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. টেক্সট এডিটরে প্লেইন টেক্সটে লেখা যায়। প্লেইন টেক্সট হলো ASCII বা UTF-8 ক্যারেকটার এনকোডিং পদ্ধতি যা সাধারণ টেক্সট থেকে ভিন্ন।

২. হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ (HTML) সহ বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ডকুমেন্ট ফাইল টেক্সট এডিটরের মাধ্যমে করতে হয়।

টেক্সই এডিটর প্রোগ্রাম : উইন্ডোস অপারেটিং সিস্টেমে নোটপ্যাড (Notepad), এপল ম্যাকিনটোশ এর জন্য সিম্পল টেক্সট (simple Text) ও টেক্সট এডিট (Text Edit), নোটপ্যাড ++, এডিটপ্যাড ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-১৩০. প্রোগ্রাম ডিজাইনিং ও টেস্টিং বলতে কি বুঝায়?

***অথবা,* প্রোগ্রাম ডিজাইনিং ও প্রোগ্রাম টেস্টিং কি?**

উত্তর : প্রোগ্রাম ডিজাইনিং : প্রোগ্রাম ডিজাইন বলতে বুঝায় সমস্যা সমাধান করার জন্য বর্তমান সিস্টেমের প্রয়োজনীয় করে নতুন সিস্টেমের মূল রূপরেখা নির্ণয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো জটিল সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলেই তার সহজ সমাধান বেরিয়ে আসে। সমাধানের জন্য সমস্যাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশ সম্বন্ধে পৃথকভাবে ও সব অংশ সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করতে হয়। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্বন্ধও বিচার করতে হয়। নতুন সিস্টেমের আর্থিক দিকও ভেবে দেখতে হয়। প্রোগ্রাম ডিজাইনিংয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :

১. ইনপুট ডিজাইন,
২. আউটপুট ডিজাইন ও
৩. ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে সম্পর্ক।

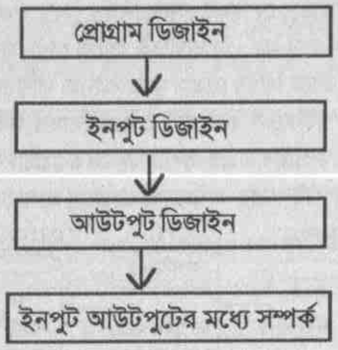

চিত্র : প্রোগ্রাম ডিজাইনের ধাপসমূহ

অতঃপর সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে প্রোগ্রামের বিভিন্ন অংশ কার্যকর করার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তৈরি করতে হয় :

১. এলগরিদম
২. ফ্লোচার্ট ও
৩. সুডোকোড

এলগরিদম, ফ্লোচার্ট ও সুডোকোডের সাহায্যে প্রোগ্রাম ডিজাইনিং শেষ হলে যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে সহজেই প্রোগ্রাম রচনা করা যায়।

প্রোগ্রাম টেস্টিং : প্রোগ্রামে ডেটার কিছু বিশেষ মান বসিয়ে কম্পিউটারের সাহায্য ছাড়া নিজেরা গণনা করে ফলাফল বের করতে হয়। এ পদ্ধতিকে Dry Run বলে। এবার কম্পিউটারে ডেটার এই বিশেষ মানগুলো ইনপুট করে প্রোগ্রাম চালিয়ে দেখা হয় কম্পিউটারের ফলাফল গণনার সাথে মিলেছে কি-না। না মিললে বুঝা যায় প্রোগ্রামে ভুল আছে। ডেটার এ বিশেষ মানগুলোকে বলে টেস্ট ডেটা। প্রোগ্রাম বড় হলে তাকে কতকগুলো ছোট অংশে ভাগ করে কম্পিউটারকে প্রত্যেক অংশের গণনার ফল আলাদাভাবে ছাপতে বলা হয়। এবার কোনো অংশের গণনার ফল ভুল হলে বুঝা যায় সেই অংশে ভুল আছে। সেই অংশ তখন ভালো করে পরীক্ষা করতে হয়। ভুল সংশোধনের পরে অপ্রয়োজনীয় প্রিন্ট নির্দেশ বাদ দেয়া হয় যাতে আউটপুট সংক্ষিপ্ত ও সহজবোধ্য হয়। প্রোগ্রাম সম্পূর্ণ নির্ভুল হলে ইনপুট ডেটার সম্ভাব্য সব মানেই গণনার সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে।

○ প্রশ্ন-১৩১. কম্পাইলার কি? এর কাজগুলো কি? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পাইলারের কাজ হাই লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। এটি গৌণ মেমোরিতে থাকে। কোনো নির্দিষ্ট কম্পাইলার একটিমাত্র হাই লেভেল ভাষাকে মেশিন ভাষায় পরিণত করতে পারে। তাই ভিন্ন ভিন্ন হাই লেভেল ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার প্রয়োজন। কম্পাইলারের প্রধান কাজ হলো :

১. উৎস প্রোগ্রামের উপাত্ত বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা।
২. প্রোগ্রামের সাথে প্রয়োজনীয় রুটিন যোগ করা।
৩. প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৪. প্রধান মেমোরিতে প্রয়োজনীয় স্মৃতি অবস্থানের ব্যবস্থা করা।

○ প্রশ্ন-১৩২. Machine Language কি? Compiler কিভাবে কাজ করে? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : Machine Language : কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র হওয়ায় শুধু বাইনারি সংকেত যা 0 ও 1 দ্বারা গঠিত ভাষা বুঝতে পারে। কম্পিউটার যে ভাষায় কোনো নির্দেশ বুঝতে সক্ষম সেই ভাষাকেই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ (Machine Language) বা যান্ত্রিক ভাষা বলে। যে ভাষাতেই প্রোগ্রাম লেখা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত কম্পিউটারে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। এই ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম মূলত বাইনারি গাণিতিক রাশি দ্বারা তৈরি।

কম্পাইলারের কার্যপ্রণালি : কম্পাইলারের কাজ হাই লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে বস্তু প্রোগ্রাম তথা মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজে অনুবাদ করা। কম্পাইলার এক প্রকার অনুবাদক প্রোগ্রাম বা Translator Program। নিচে ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কম্পাইলারের কার্যপ্রণালী দেখানো হলো :

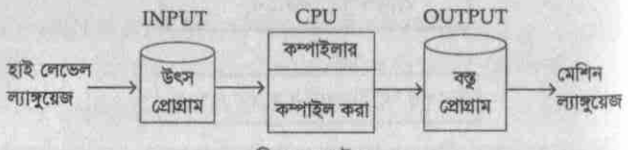

চিত্র : কম্পাইলার

○ প্রশ্ন-১৩৩. ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কি এবং কিভাবে কাজ করে? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো টেলিফোন ও ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তর। এ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার হিসাবের মধ্যে প্রকৃত অর্থের আদান-প্রদান না ঘটিয়ে শুধু হিসাবের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণের সমন্বয় সাধন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। লেনদেন কার্যে সুবিধা ও নিরাপত্তার নিমিত্তে ব্যাংকে অটোমেটেড টেলার টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়। ডেটা দিয়ে ব্যাংকের লেনদেন কার্য সম্পাদনের জন্য চৌম্বক কালির রেখা বিশিষ্ট ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করা হয়। সংক্ষিপ্ত কী প্যাডের মাধ্যমে ডেটা দেয়া হয় এবং ব্যাংক কার্ড টার্মিনালে প্রবেশ করানো হয়। ফেরৎ সংকেতের জন্য ক্ষুদ্রাকার ভিডিও ডিসপ্লে ও প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড ব্যাংকের কম্পিউটারে ইনপুট করে দিনে রাতে যে কোনো সময় টাকা তোলা যায়। কম্পিউটারই গ্রাহকের স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখে, এর জন্য কোনো কর্মীর প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অটোমেটেড টেলার মেশিনগুলোকে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হয়। ফলে ব্যাংকের ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। অটোমেটেড টেলার মেশিনের সাহায্যে ব্যাংকে সার্বক্ষণিক গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-১৩৪. কম্পাইলারের প্রধান সুবিধাগুলো কি?

উত্তর : কম্পাইলারের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলো হলো–

১. পুরো প্রোগ্রামটিকে একবারেই বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করে।
২. প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকলে তা জানানো।
৩. প্রধান মেমোরিতে প্রয়োজনীয় স্মৃতি অবস্থানের ব্যবস্থা করা (Allocation)।
৪. প্রয়োজনে বস্তু বা উৎস প্রোগ্রামকে ছাপিয়ে বের করা।

কম্পাইলারের অসুবিধা হলো কম্পাইলার যেহেতু পুরো প্রোগ্রামটিকে একবারেই বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করে, তাই ধাপে ধাপে এর ভুল শনাক্ত করা যায় না ফলে সাথে সাথে সংশোধনও করা যায় না।

○ প্রশ্ন-১৩৫. ইন্টারপ্রেটার কি? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন।

উত্তর : ইন্টারপ্রেটারের কাজ হাই লেভেল ভাষার উৎস প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষায় পরিণত করা। এটি একটি নির্দেশ মেশিন ভাষায় অনুবাদ করে তা কার্যে পরিণত করতে পারে এবং এরপর পরবর্তী নির্দেশে হাত দেয়।

ইন্টারপ্রেটারের সুবিধা : এর ব্যবহারে প্রোগ্রামের ভুল সংশোধন করা বা প্রোগ্রাম পরিবর্তন করা সহজ হয়। ইন্টারপ্রেটার প্রোগ্রাম আকারে ছোট বলে এর ব্যবহারে মেমোরি অবস্থানের জায়গা বাঁচে। অনূদিত বস্তু প্রোগ্রামকে মেমোরিতে সঞ্চয় করে রাখতে হয় না।

ইন্টারপ্রেটারের অসুবিধা : ইন্টারপ্রেটার ব্যবহারে প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে প্রচুর সময় লাগে। কারণ ইন্টারপ্রেটারের ক্ষেত্রে প্রোগ্রাম কার্যকরী করার সময়ের মধ্যে অনুবাদের সময়ও ধরতে হয়। ইন্টারপ্রেটার ব্যবহারে যতবার প্রোগ্রাম কার্যকরী করতে হয় ততবারই প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো একটির পর একটি অনুবাদ করতে হয়।

○ প্রশ্ন-১৩৬. কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

উত্তর : কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য নিচে তুলে ধরা হলো :

কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি একসাথে অনুবাদ করে। কম্পাইলার প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল একসাথে প্রদর্শন করে।	ইন্টারপ্রেটার এক লাইন করে পড়ে এবং অনুবাদ করে। ইন্টারপ্রেটার প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে অনুবাদ কার্য বন্ধ করে দেয়।
ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে ধীর গতিসম্পন্ন।	ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে দ্রুত গতিসম্পন্ন।
কম্পাইলারের মাধ্যমে প্রোগ্রাম রূপান্তরের পর পুনঃরূপান্তরের প্রয়োজন অর্থাৎ একবার কম্পাইলার করা হলে পরবর্তিতে আর কম্পাইল করা প্রয়োজন হয় না।	ইন্টারপ্রেটারের সব ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের পূর্বে অনুবাদ করা প্রয়োজন হয়।
কম্পাইলারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয়। এই প্রোগ্রামকে অবজেক্ট প্রোগ্রাম বলে।	ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে রূপান্তরিত প্রোগ্রাম পূর্ণাঙ্গ যান্ত্রিক প্রোগ্রামে রূপান্তরিত হয় না।
বড় ধরনের কম্পিউটারে একে বেশি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	মাইক্রো কম্পিউটারে এবং পকেট কম্পিউটারে এর অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে।
এই প্রোগ্রামটি সাধারণত বড় হয়ে থাকে এবং প্রধান মেমোরিতে বেশি জায়গা প্রয়োজন হয়।	এই প্রোগ্রামটি সাধারণত ছোট হয়ে থাকে এবং প্রধান মেমোরিতে কম জায়গা প্রয়োজন হয়।
প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম সময় প্রয়োজন।	প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য বেশি সময় প্রয়োজন।

○ প্রশ্ন-১৩৭. অ্যাসেম্বলারের প্রধান কাজ কি?

উত্তর : অ্যাসেম্বলারের কাজ অ্যাসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে মেশিন ভাষার বস্তু প্রোগ্রামে অনুবাদ করা। অ্যাসেম্বলারের প্রধান কাজ নিম্নরূপ :

১. নেমোনিক কোডকে মেশিন ভাষায় অনুবাদ করা।
২. অ্যাসেম্বলি অ্যাড্রেসকে মেশিন ভাষায় লেখা অ্যাড্রেসে পরিণত করা।
৩. প্রত্যেক নির্দেশ ঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা, ঠিক না থাকলে তা জানানো।
৪. সব নির্দেশ ও ডেটা প্রধান মেমোরিতে রাখা।
৫. সব ভুল সংশোধনের পর প্রথম নির্দেশ থেকে কাজ শুরু করতে কন্ট্রোলকে বলা।

অ্যাসেম্বলি ভাষার প্রত্যেক নির্দেশকে অ্যাসেম্বলার মেশিন ভাষার একটি নির্দেশে পরিণত করে।

○ প্রশ্ন-১৩৮. ডিবাগিং (Debugging) কি?

উত্তর : প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা দূর করাকে বলে ডিবাগিং। এর আক্ষরিক অর্থ পোকা বাছা। ১৯৪৫ সালে মার্ক 1 কম্পিউটারটির ভেতরে একটি মথপোকা ঢোকায় কম্পিউটারটি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। এ থেকেই ডিবাগিং কথাটির উৎপত্তি। সব ভুলত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রোগ্রামই ব্যবহার করা যায় না। ডিবাগিং এর জন্য প্রথমে প্রোগ্রামের আগাগোড়া ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রোগ্রামের ছোটখাট ভুল এতেই দূর হয়ে যায়। এরপরও যেসব ভুল থেকে যায় সেগুলো দূর করতে হলে প্রথমে সিনট্যাক্স ভুল দূর করে তারপর লজিক ভুল দূর করা হয়।

○ প্রশ্ন-১৩৯. অ্যালগোরিদম (Algorithm) কি?

উত্তর : অ্যালগোরিদম শব্দটি আরব দেশের গণিতবিদ 'আল খারিজমী'র নাম থেকে উৎপত্তি হয়েছে। অ্যালগোরিদম অর্থ ধাপে ধাপে সমস্যা সমাধান অর্থাৎ একটি সমস্যাকে কয়েকটি ধাপে ভেঙ্গে প্রত্যেকটি ধাপ পরপর সমাধান করে সমগ্র সমস্যা সমাধান করা।

অ্যালগোরিদম চারটি শর্ত সিদ্ধ করে। যথা–

১. অ্যালগোরিদম সহজবোধ্য হবে।
২. কোনো ধাপই দ্ব্যর্থবোধক হবে না, প্রত্যেকটি ধাপ স্পষ্ট হবে যাতে কম্পিউটার সহজেই তা বুঝতে পারে।
৩. সসীমসংখ্যক ধাপে সমস্যার সমাধান হবে, কম্পিউটারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ সময়েই সমাধান পাওয়া যাবে।
৪. একে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

কম্পিউটার নিজে চিন্তা করে কোনো কিছু করতে পারে না বলেই এভাবে অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে তাকে পরপর কি করতে হবে সেই নির্দেশ দিতে হয়। অ্যালগোরিদম হাই লেভেল ভাষায় অনুবাদ করে তবেই ইনপুটে দিতে হয়।

○ প্রশ্ন-১৪০. ফ্লোচার্টিং (Flowcharting) কি? এর প্রকারভেদ ও সুবিধাবলি উল্লেখ করুন।

উত্তর : ফ্লোচার্ট হলো এমন কতগুলো ছবি যা থেকে বোঝা যায় সমস্যা সমাধান করতে হলে পরপর কিভাবে অগ্রসর হতে হবে। একে ফ্লোচার্ট বলার কারণ এ থেকে প্রোগ্রামের প্রবাহ (Flow) কিভাবে হচ্ছে তা বোঝা যায়। ফ্লোচার্ট প্রোগ্রাম বুঝতে প্রভূত সাহায্য করে ফলে বিভিন্ন প্রোগ্রামার, সিস্টেম বিশ্লেষক, কম্পিউটার ব্যবহারকারী প্রমুখের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা হয়।

ফ্লোচার্টকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. সিস্টেম ফ্লোচার্ট এবং
২. প্রোগ্রাম ফ্লোচার্ট।

একটি উন্নতমানের ফ্লোচার্ট নিম্নলিখিত সুবিধা প্রদান করে :

১. সহজে প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য বোঝা যায়।
২. প্রোগ্রামের ভুল নির্ণয়ে সহায়তা করে।
৩. প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সহায়তা করে।
৪. প্রোগ্রাম রচনায় সহায়তা করে।
৫. সহজে ও সংক্ষেপে জটিল প্রোগ্রাম লেখা সম্ভব হয়।

○ প্রশ্ন-১৪১. ফ্লোচার্ট আঁকার নিয়মগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : ফ্লোচার্ট আঁকার নিয়মাবলী নিচে বর্ণনা করা হলো :

১. প্রবাহ রেখার দ্বারা কোন চিহ্নের পর কোন চিহ্নের কাজ হবে তা বোঝানো হয়। সাধারণত উপর থেকে নিচে বা বাঁ থেকে ডানদিকে প্রবাহ অগ্রসর হয়।
২. একাধিক প্রবাহরেখা পরস্পরকে ছেদ করলেও তাদের মধ্যে কোনো লজিক্যাল সম্পর্ক বা যোগাযোগ বোঝায় না।
৩. চিহ্নগুলো ছোট বা বড় যে কোনো সাইজের হতে পারে কিন্তু তাদের বিশিষ্ট আকৃতি যেন বজায় থাকে।
৪. প্রত্যেক ফ্লোচার্টের একটি নাম থাকবে, তাছাড়া রচয়িতার নাম ও তারিখ দিতে হবে।

৫. প্রয়োজনে চিহ্নের সঙ্গে মন্তব্যও দেওয়া যায়।
৬. যতদূর সম্ভব রেখার ছেদ কম হওয়া ভালো।
৭. বেশি সংযোগ রেখার পরিবর্তে সংযোগ প্রতীক ব্যবহার করা ভালো।
৮. প্রতিটি ব্লকের লেখা সংক্ষেপে অথচ সহজবোধ্য হওয়া দরকার।
৯. ফ্লোচার্ট বিশেষ কোনো প্রোগ্রামের ভাষায় লেখা ঠিক নয়।
১০. ফ্লোচার্টের কোনো অংশের বিস্তারিত বর্ণনা প্রয়োজন হলে সে অংশের জন্য পৃথকভাবে বিস্তারিত ফ্লোচার্ট ব্যবহার করা ভালো।

জ

কম্পিউটার ভাইরাস, ম্যালফাংশনিং প্রোগ্রাম ও এন্টি-ভাইরাস
Computer Virus, Malfunctioning Program & Anti-Virus

○ প্রশ্ন-১৪২. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে virus কি? কিভাবে virus এর উদ্ভব হয়?

উত্তর : ভাইরাস (Virus) : কম্পিউটার ভাইরাস আসলে এক প্রকার খারাপ কম্পিউটার প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার সিস্টেমে রক্ষিত বিভিন্ন ডেটা, সফটওয়্যার কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে হার্ডডিস্কেরও ক্ষতি করতে পারে। ভাইরাস (Virus) শব্দটি vital Information Resources Under Seize এর সংক্ষিপ্ত রূপ যার অর্থ দাঁড়ায় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ বাজেয়াপ্ত হয়েছে।

ভাইরাস শব্দের উদ্ভব : প্রখ্যাত গবেষক ফ্রেড কোহেন ভাইরাস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। গত কয়েক বছরে তথ্য প্রযুক্তি খাতের যে বিষয়গুলোতে সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কম্পিউটার ভাইরাস ও ইন্টারনেট।

১৯৪০ সালের দিকে গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান সেলফ-রেপলিকেটিং (নিজে নিজে বংশবৃদ্ধি করতে পারে এমন) গাণিতিক মেকানিজমের উপর গবেষণা পরিচালনা করেন তত্ত্বগতভাবে এসব রিপ্রডিউসিং অপারেশনগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে কিছু পূর্ব নির্ধারিত কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম।

এরপর থেকে বিভিন্ন ধরনের গবেষণার কাজে নিয়ন্ত্রিতভাবে এসব সেলফ-রেপলিকেটিং প্রোগ্রাম ব্যবহার হচ্ছিল। তবে গত শতব্দীর ৮০'র দশকের শুরুর দিক পর্যন্ত এগুলোর ব্যবহার কম্পিউটার পেশাজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর পরেই মূলত প্রথম কম্পিউটার ভাইরাসের উদ্ভাবন হয় যার নাম 'EIK Cloner' এবং এটি তখনকার বহুল ব্যবহৃত Apple II কম্পিউটারের জন্য প্রযোজ্য ছিল।

○ প্রশ্ন-১৪৩. ভাইরাস আক্রান্ত কম্পিউটারের লক্ষণ কি? কিভাবে কম্পিউটার ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটে?

উত্তর : ভাইরাস আক্রান্ত কম্পিউটারের লক্ষণ : কোনো কম্পিউটার ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে এর অস্তিত্ব বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়। যেমন :

১. কোনো প্রোগ্রাম স্বাভাবিক লোডের সময়ের চেয়ে বেশি সময় নিবে।
২. অপারেশনের সময় স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি ডিস্কের কার্যক্রম ধরা পড়ে।
৩. ডিস্কের ভলিউমের নাম পরিবর্তন হয়।
৪. হার্ডডিস্কে Bad Sectors দেখায়।
৫. EXE ফাইলের আকার পরিবর্তন হয়।

৬. ফাইল, তারিখ ও সময়ের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটায়।
৭. ফ্রি মেমোরির পরিমাণ কম দেখায়।
৮. হঠাৎ করে অপ্রত্যাশিত Error Message দেখায়।
৯. হার্ডডিস্কের পার্টিশন নষ্ট করে ফেলে ফলে, সকল ডেটা হারিয়ে যায় এবং কম্পিউটার ঠিক মত সচল হতে চায় না।
১০. অনেক সময় কম্পিউটারের বায়োস (BIOS) এর ডেটা মুছে ফেলে ফলে, কম্পিউটার অচল হয়ে যায়।
১১. হার্ডডিস্কের সকল ডেটা মুছে ফেলে।

ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যম : ভাইরাস নিজে নিজে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিম্নলিখিত কারণে সংক্রমিত হতে পারে। যেমন–

১. ফ্লপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক বা অন্য কোনো ডিস্কের মাধ্যমে প্রোগ্রাম বা ডেটার আদান-প্রদান হলে।
২. পাইরেটেড সফটওয়্যার ব্যবহার করলে।
৩. নেটওয়ার্ক (ইন্টারনেট বা ই-মেইল ইত্যাদি) কম্পিউটিং এর ক্ষেত্রে এক কম্পিউটার এর সাথে অন্য কম্পিউটারের সংযোগের কারণে।

○ প্রশ্ন-১৪৪. বিভিন্ন প্রকার কম্পিউটার ভাইরাসের নাম লিখুন।

উত্তর : কম্পিউটার হ্যাকাররা প্রতিদিনই নতুন নতুন কম্পিউটার ভাইরাস তৈরি করছে। কম্পিউটারে আক্রমণের ধরন অনুসারে ভাইরাস বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। যথা—

১. বুট সেক্টর ভাইরাস (Boot sector Virus)
২. ফাইল সংক্রামক ভাইরাস (File Infector Virus)
৩. ট্রজান হর্স (Trojan Horse)
৪. মিউটেটিং ভাইরাস (Mutating virus)
৫. কমান্ড পারপাস ভাইরাস (Command purpose virus)
৬. জেনারেল পারপাস ভাইরাস (General Purpose Virus)
৭. মাল্টিপারপাস ভাইরাস (Multipurpose Virus)
৮. মেমোরি-রেসিডেন্ট ভাইরাস (Memory-Resedent Virus)
৯. ম্যাক্রো ভাইরাস (Macro Virus)
১০. কমপেনিয়ন ভাইরাস (Companion Virus)
১১. পলিমরফিক ভাইরাস (Polymorphic Virus)
১২. ওভার রাইটিং ভাইরাস (Over writing Virus)
১৩. স্টিলথ ভাইরাস (Stealth Virus) ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-১৪৫. কম্পিউটার স্প্যাম কি? অথবা স্প্যামিং কি?

উত্তর : ই-মেইল একাউন্টে প্রায়ই কিছু কিছু অচেনা ও অপ্রয়োজনীয় ই-মেইল পাওয়া যায় যা আমাদের বিরক্তি ঘটায়। এ ধরনের ই-মেইলকে সাধারণত স্প্যাম (spam) বলে। আর যখন কোনো প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি কোনো একটি ই-মেইল এড্রেসে শতশত এমনকি লক্ষ লক্ষ মেইল প্রেরণের মাধ্যমে মেমোরি দখল করে, এ পদ্ধতিকে স্প্যামিং বলে।

সাধারণত কোনো ওয়েব সার্ভারকে ব্যস্ত রাখা অথবা এর মেমোরি ও স্টোরেজ অপ্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দ্বারা পূর্ণ করে এর পারফরমেন্সের ক্ষতি করার জন্য স্প্যামিং করা হয়। ওয়েব

সার্ভারগুলো এই স্প্যামিং এর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যে ডোমেইন থেকে স্প্যাম আসছে সেই ডোমেইনকে ব্লক করে দেয়। ফলে ঐ ডোমেইন থেকে আর কেউ কোনো মেইলই পাঠাতে পারে না। তবে কোনো ওয়েব সার্ভারই স্প্যাম মেইল থেকে পুরোপুরি মুক্ত নয়।

○ প্রশ্ন-১৪৬. হ্যাকিং কি?

উত্তর : সাধারণত অনুমতি ব্যতীত কোনো কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রবেশ করে কম্পিউটার ব্যবহার করা অথবা কোনো কম্পিউটারকে মোহাচ্ছন্ন করে তার পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়াকে হ্যাকিং (Hacking) বলে। হ্যাকিং বৈধ ও অবৈধ হতে পারে। কিছু প্রতিষ্ঠান তাদের সিস্টেমের সিকিউরিটির পরীক্ষা-নীরিক্ষার জন্য হ্যাকার নিয়োগ করেন। এ নিয়োগ প্রাপ্ত হ্যাকারদের কাজকে বৈধ হ্যাকিং বলে। এরা সিস্টেম সিকিউরিটি চেক করে, তবে সিস্টেমের কোনো ক্ষতি করে না। যেমন—Vnix সিস্টেম চেক করার জন্য অনেক বৈধ হ্যাকার রয়েছে।

○ প্রশ্ন-১৪৭. কয়েকটি এন্টি-ভাইরাসের নাম লিখুন। কিভাবে ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকা যায়?

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস নিরসনের জন্য দরকার শক্তিশালী এন্টিভাইরাস প্রোগ্রাম। এসব এন্টিভাইরাসের মধ্যে রয়েছে— Norton Antivirus, Avast, ESET NODE 32, Bit Defender, Kaspersky, Avira ইত্যাদি।

ভাইরাসমুক্ত থাকার উপায় : কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভাইরাসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় :

১. বাইরের কোনো পেনড্রাইভ বা ফ্লপি বা মেমোরি কার্ড ব্যবহার না করা।
২. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সংক্রমিত প্রোগ্রাম কপির মাধ্যমে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। তাই কপির পূর্বে ভাইরাস আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
৩. পাইরেটেড বা নকল সফটওয়্যারের ব্যবহার বন্ধ করতে পারলে ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকা যায়।
৪. ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকলে ভাইরাসমুক্ত থাকা যায়।
৫. অশ্লীল ভিডিও বা অপরিচিত সফটওয়্যার ডাউনলোড না করলে ভাইরাস থেকে মুক্ত থাকা যায়।

○ প্রশ্ন-১৪৮. কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং বলতে কি বুঝায়? হ্যাকিং-এর একটি উদাহরণ লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং : যে কোনো কম্পিউটার সিস্টেম যেমন- ই-মেইল একাউন্ট, স্কাইপ একাউন্ট বা অনলাইন ক্রেডিট একাউন্টে কোনো অনাদিষ্ট (unauthorized) ব্যক্তি কর্তৃক ক্ষতির উদ্দেশ্যে পাসওয়ার্ড ভেঙ্গে প্রবেশ করে তথ্য চুরি বা তথ্যের অপব্যবহার করাকে কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাকিং বলে।

উদাহরণ : সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক বিচারপতি নিজামুল হকের স্কাইপ একাউন্ট হ্যাক করে তার কথপোকথন রেকর্ড করা হয় ও তা ফাঁস করা হয়। ফলে তিনি পদত্যাগ করেন।

○ প্রশ্ন-১৪৯. কম্পিউটার ভাইরাস কিভাবে কাজ করে? ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবহার হয় এমন দুটি সফটওয়্যারের নাম লিখুন। *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস হলো এক ধরনের ক্ষতিকর প্রোগ্রাম (Malware) যা কম্পিউটারে রক্ষিত ডেটা ও অন্যান্য সফটওয়্যার এবং অপারেটিং সিস্টেমের ক্ষতিসাধন করে। এছাড়া কম্পিউটার ভাইরাস ইন্টারনেটের গতিকে মন্থর করে দেয় ও নেটওয়ার্কে জ্যাম সৃষ্টি করে। কম্পিউটার ভাইরাস সাধারণত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে পরে।

কম্পিউটার ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবহার করা হয় এমন দুটি সফটওয়্যার হলো (১) Kaspersky ও (২) Norton Antivirus।

○ প্রশ্ন-১৫০. সিআইএইচ ভাইরাস সম্পর্কে লিখুন।

উত্তর : সিআইএইচকে মাদার অব অল ভাইরাস বলা হয়। এটি হার্ডডিস্ক ও ফ্লাশ বায়োস উভয় ডিভাইসকেই অচল করে দেয়। ইন্টারনেট ডাউনলোডিং, ই-মেইল এটাচমেন্ট, পাইরেটেড সফটওয়ার ব্যবহার, ভাইরাস আক্রান্ত নেটওয়ার্ক সার্ভার ইত্যাদির মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। এ ভাইরাস EXE ফাইলে ইফেক্ট করার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে তবে নির্দিষ্ট কিছু টিগারিং তারিখে ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। ১৯৮৬ সালের ২৬ এপ্রিল চেরনোবিলে মর্মান্তিক তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এজন্য এ তারিখে আঘাতকারী CIH কে চেরনোবিল ভাইরাস বলে।

ঝ অফিস অটোমেশন, কম্পিউটেশনাল বায়োলজি এবং ওষুধের নকশা প্রণয়নে কম্পিউটারের ভূমিকা

Office Automation, Computational Biology, Role of Computer in Drug Design

○ প্রশ্ন-১৫১. অফিস অটোমেশন সিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

***অথবা,* নলেজ ও ইনফরমেশনকে কেন্দ্র করে কিভাবে কম্পিউটারভিত্তিক অফিস ব্যবস্থাপনা করা যায়?**

উত্তর : নিজের বিচার বুদ্ধি ব্যবহার করে ডেটা বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হলে তাকে নলেজ ওয়ার্ক বলে। কোনো প্রতিষ্ঠানের নলেজ পর্যায়ে যে সব ইনফরমেশনের প্রয়োজন হয় তা নলেজ ওয়ার্ক ও অফিস ইনফরমেশন সিস্টেম সরবরাহ করে। নলেজ ওয়ার্ক ও অফিস সিস্টেমের কাজ হলো ডেটা ওয়ার্ক করা। অর্থাৎ বিভিন্ন ডেটা নিয়ে কাজ করা। সাধারণত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী গবেষকগণ নলেজ ওয়ার্ক করে থাকে।

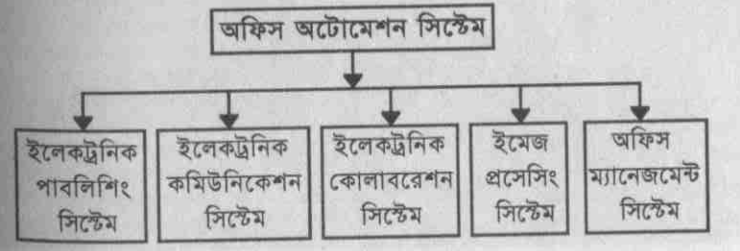

চিত্র : অফিস অটোমেশন সিস্টেম

আদর্শ অফিস অটোমেশন সিস্টেমে ইলেকট্রনিক পাবলিশিং সিস্টেম, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সিস্টেম, ইলেকট্রনিক কলেবরেশন সিস্টেম, ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম, অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত থাকে। এ সকল সিস্টেমের সমন্বয়ে কোনো অফিসকে অটোমেশন করা যায়। তাই এগুলোকে অফিস অটোমেশন সিস্টেমও বলা হয়।

ইলেকট্রনিক পাবলিশিং সিস্টেম ওয়ার্ড প্রসেসিং, ডেস্কটপ পাবলিশিং ও কপিং সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত। ওয়ার্ড প্রসেসিংয়ে সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে কোনো ডকুমেন্টকে তৈরি, সংশোধন এবং প্রিন্ট করা হয়ে থাকে।

ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে ইলেকট্রনিক মেইল, ভয়েস মেইল, ফ্যাক্স, ভিডিও কনফারেন্সিং কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সকল স্তরে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। ইলেকট্রনিক কলেবরেটিং সিস্টেমে ইলেকট্রনিক মিটিং, কলেবরেটিভ ওয়ার্ক সিস্টেম, টেলি কনফারেন্সিং ও টেলিফোনের মাধ্যমে অনেকে একত্রে মিটিং কিংবা অন্য কোনো কাজ করতে পারে। ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেমে ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ডকুমেন্ট ইমেজিং, ডিজিটাল ফিল্মের মাধ্যমে সংরক্ষণ, মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন সিস্টেম, অন্যান্য ইমেজ প্রসেসিং সিস্টেম যেমন-ডিজিটাল ক্যামেরা ও স্ক্যানার অন্তর্ভুক্ত থাকে। ডকুমেন্ট ইমেজিং সিস্টেম এমন একটি পদ্ধতি যেখানে টেক্সট, অডিও, ইমেজ ও ভিডিওকে ডিজিটাল ফর্মে রাখা হয় যাতে কম্পিউটার দ্বারা সহজে দেখা, সরবরাহ ও সংরক্ষণ করা যায়। অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ইলেকট্রনিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে জব সিডিউল, টাস্ক ম্যানেজমেন্ট, অন্যান্য অফিস এক্সেসরিজ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

○ প্রশ্ন-১৫২. কম্পিউটেশনাল বায়োলজি কি?

অথবা, বায়োইনফরমেটিক্স কি?

উত্তর : কম্পিউটেশনাল বায়োলজি বা বায়োইনফরমেটিক্স : কম্পিউটেশনাল বায়োলজি হলো আধুনিক বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমকে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল ডেটা ব্যবহার করে গাণিতিক পদ্ধতিতে এলগরিদম এর মাধ্যমে সহজে বিশ্লেষণ করা যায়। কম্পিউটেশনাল বায়োলজির অপর নাম হলো বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics)। বায়োইনফরমেটিক্স আসার আগে জীববিজ্ঞানীদের পক্ষে বিশাল ডেটা নিয়ে কাজ করা খুব কষ্টসাধ্য ছিল। এক্ষেত্রে ডেটা অন্তর্ভুক্ত থাকে ডিএনএ, জীন, এমিনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিডসহ অন্যান্য জটিল ডেটা।

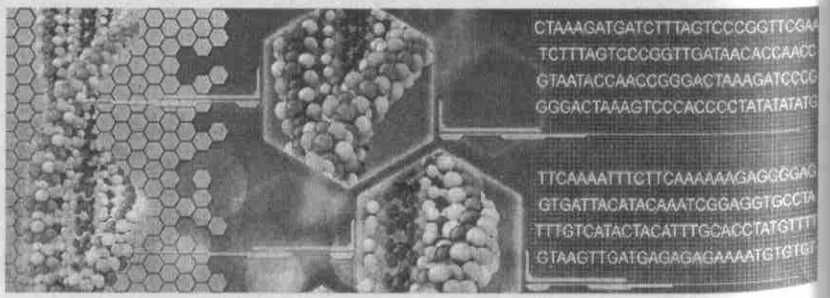

চিত্র : বায়োইনফরমেটিক্স

বায়োইনফরমেটিক্স এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো : কম্পিউটার সায়েন্স, এপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স, এনিমেশন, পরিসংখ্যান, বায়োকেমিস্ট্রি, কেমিস্ট্রি, বায়োফিজিক্স, মলিকিউলার বায়োলজি, জেনেটিক্স, জেনোম, ইকোলজি, ইভোলুশন, এনাটমি, নিউরোসায়েন্স এবং ভার্চুয়ালাইজেশন।

বায়োইনফরমেটিক্স এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জৈবিক পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা। আর এ ধারণা লাভ করার জন্য অনেক গাণিতিক হিসাবের প্রয়োজন হয়। সে পদ্ধতিতে গাণিতিক এলগরিদম প্রয়োগ করে বায়োইনফরমেটিক্স গড়ে উঠেছে এর মধ্যে রয়েছে প্যাটার্ন রিকগনিশন, ডেটা মাইনিং ও ম্যাকানিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং।

কম্পিউটেশনাল বায়োলজি এর ব্যবহার ক্ষেত্র :

১. মলিকিউলার মেডিসিন
২. পার্সোনালাইজড মেডিসিন
৩. প্রিভেনটিভ মেডিসিন
৪. জিন থেরাপি
৫. ড্রাগ ডিজাইন ও ডেভেলপমেন্ট
৬. ওয়াস্ট ক্লিনআপ
৭. বিকল্প শক্তি উৎস
৮. বায়োটেকনোলজি
৯. এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স
১০. মাইক্রোবেস এর ফরেনসিক বিশ্লেষণ
১১. বায়ো-অস্ত্র উৎপাদন
১২. শস্য উন্নয়ন
১৩. কীট প্রতিরোধ
১৪. পুষ্টির মান উন্নয়ন
১৫. খরা প্রতিরোধ উন্নয়ন ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-১৫৩. কম্পিউটার এইডেড ড্রাগ ডিজাইন বলতে কি বুঝেন?

অথবা, ঔষধ শিল্পে আজকাল কি ধরনের কম্পিউটার ভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে?

উত্তর : কম্পিউটার এইডেড ড্রাগ ডিজাইন (Computer Aided Drug Design –CADD) : সাম্প্রতিক প্রযুক্তি উন্নয়নে যুক্ত হয়েছে নতুন একটি প্রযুক্তি যার নাম কম্পিউটার এইডেড ড্রাগ ডিজাইন এবং ডেলিভারি সিস্টেম। মলিকিউল এর উপর আলাদাভাবে গবেষণা করে এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রয়োগ ঘটিয়ে নির্দিষ্ট রোগ নিরাময়ের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত নিরাপদ ঔষধ উৎপাদন হলো কম্পিউটার এইডেড ড্রাগ ডিজাইন।

কম্পিউটার এইডেড-ড্রাগ ডিজাইনের কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হলো :

ইনসুলিন তৈরি : মানবদেহের ইনসুলিন তৈরির জীনকে ব্যাকটেরিয়া কোষে প্রবেশ করিয়ে বাণিজ্যিকভাবে ইনসুলিন হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও কম্পিউটার এইডেড ড্রাগ-ডিজাইনের সবচেয়ে বড় সুফল। ইনসুলিন ডায়াবেটিস রোগের চিকিৎসায় ড্রাগ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

রোগের চিকিৎসা : জিন থেরাপি কম্পিউটার এইডেড ড্রাগ ডিজাইনের একটি ব্যবহার। জিন থেরাপির মাধ্যমে মানুষের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা এবং ত্রুটিপূর্ণ মানুষের জীন পরিবর্তন করে সুস্থ করে তোলা যায়।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন : নির্দিষ্ট জিনের ক্লোনিং দ্বারা নতুন অনেক জটিল ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য উৎপাদন করা হয়।

হরমোন তৈরি : শিল্পজাত ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপাদিত গ্রোথ হরমোন বামনত্ব রোধ করে এবং পোড়া ত্বক, ফেঁটে যাওয়া হাঁড় এবং খাদ্যনালীর আলসারের চিকিৎসা ব্যবহৃত হয়।

ভাইরাসনাশক : জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ফলে জৈব কারখানায় প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন ও এনজাইম উৎপাদন করা যায়। এর থেকে উৎপাদিত ইন্টারফেরন ভাইরাস নাশক হিসেবে কাজ করে।

৫৩ কম্পিউটারের সামাজিক প্রভাব ও কম্পিউটার সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য

Impacts of Computer on Society & Computer Related Other Information

○ প্রশ্ন-১৫৪. হোম কম্পিউটার কি?

উত্তর : যে কম্পিউটারগুলো কেবলমাত্র খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ, বাচ্চাদের পড়ালেখা ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে হোম কম্পিউটার বলে। এগুলোর গতি খুব কম এবং কখনো ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহৃত হয় না।

○ প্রশ্ন-১৫৫. র‍্যাম ক্যাশ (RAM Cache) কি?

উত্তর : কাজের গতি বাড়ানোর জন্য র‍্যামের অংশবিশেষ র‍্যাম ক্যাশ (RAM Cache) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। র‍্যামের এই অংশে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের যে তথ্যগুলো বার বার ব্যবহৃত হয় সেই তথ্যগুলো জমা থাকে। কাজেই মাইক্রোপ্রসেসরের ঐ তথ্যগুলো খুঁজতে বার বার ডিস্কে যেতে হয় না।

○ প্রশ্ন-১৫৬. ফটোশপ প্রোগ্রাম কি?

উত্তর : ফটোশপ হচ্ছে কম্পিউটারে ছবি সম্পাদনার একটি প্রোগ্রাম। আমরা সচরাচর যেসব ছবি তুলি তা কম্পিউটার ব্যবহারকারী ইচ্ছেমতো এই প্রোগ্রাম দ্বারা সম্পাদনা করতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৫৭. গিবারিশ কি?

উত্তর : কম্পিউটারে দেয়া অপ্রয়োজনীয় তথ্য বা ইনফরমেশনকে বলে গিবারিশ।

○ প্রশ্ন-১৫৮. পামটম কি?

উত্তর : এক ধরনের ছোট কম্পিউটার। হাতের তালুতে নিয়ে কাজ করা যায়। ওজন মাত্র ১৭০ গ্রাম।

○ প্রশ্ন-১৫৯. জিআইএস (GIS-Geographic Information System) কি?

উত্তর : জিআইএস এমন একটি কম্পিউটার সিস্টেম, যা প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি, পরিবেশ তথা ভৌগোলিক অবকাঠামো ও পারিপার্শ্বিক বিষয় সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ ও সংগঠন করতে পারে।

○ প্রশ্ন-১৬০. জিপিএস (GPS-Global Positioning System) কি?

উত্তর : জিপিএস এমন একটি স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটার সিস্টেম, যা ভৌগোলিক কোনো স্থাপনার নিয়ত পরিবর্তনশীল বিষয়সমূহের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উক্ত অবস্থানের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে।

○ প্রশ্ন-১৬১. ইউনিকোড কাকে বলে?

উত্তর : পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের ভাষা বিভিন্ন রকম। আবার প্রত্যেক ভাষাতে রয়েছে অসংখ্য বর্ণ। যেমন, শুধু চীনা ভাষাতেই রয়েছে পঁচিশ হাজার বর্ণ। কিন্তু আগে কম্পিউটারে মাত্র ২৫৬টি বর্ণ ব্যবহার করা যেত। ফলে কম্পিউটারের ব্যবহারও ছিল সীমিত। এক সাথে অনেক ভাষা ব্যবহার করা যেত না; এই অসুবিধা দূর করতে APPLE কম্পিউটার, মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে কম্পিউটার কোডের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে। এই কনসোর্টিয়ামকে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম বলে।

○ প্রশ্ন-১৬২. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : অনেকগুলো কম্পিউটার প্রোগ্রামের সমন্বয়ে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) অথবা উপাত্ত ঘাঁটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠিত হয়। ডেটাবেজ নিয়ন্ত্রণ, সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য এই প্রোগ্রাম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটা সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের একটি অংশ। এটা ডেটাবেজ ও ডেটাবেজ ব্যবহার করার মধ্যে সমন্বয়কারী সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-১৬৩. CAE (Computer Aided Engineering) বা কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রকৌশল কি?

উত্তর : CAE হচ্ছে প্রকৌশল-সমস্যাদি সমাধানে সহায়তা করার জন্য কম্পিউটারভিত্তিক যন্ত্রাদির ব্যবহার। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রকৌশলকে চারটি পরস্পর সম্পর্কিত সমস্যা-সমাধানকারী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সেগুলো হলো— কম্পিউটার ডেটাবেজ উপাত্ত-সন্নিবেশ ও যোগাযোগ; কম্পিউটার চিত্রণ (graphics) ও মডেলিং; কম্পিউটার অনুকরণ (simulations) ও বিশ্লেষণ এবং উপাত্ত আত্তীকরণ (data acquisition), ভৌত প্রোটোটাইপ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রকৌশলের প্রয়োগ চলতে পারে চূড়ান্ত উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত, যে সময়ে অনুরূপ কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রয়োগকে সাধারণত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন (CAM—Computer-Aided Manufacturing) বা কম্পিউটার সমন্বিত উৎপাদন (CIM—Computer Integrated Manufacturing) বলা হয়।

○ প্রশ্ন-১৬৪. Computer Security বা কম্পিউটার নিরাপত্তা কি?

উত্তর : আকস্মিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে বা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি কর্তৃক কম্পিউটারে ব্যবহৃত তথ্যের ক্ষতিসাধন, পরিবর্তন বা গোপনীয়তা ফাঁসের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাকে কম্পিউটারের নিরাপত্তা বলে। প্রশাসনিক ও কারিগরি এ দুই ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। বাইরের ভয় ছাড়াও থাকে কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ (logical) ব্যবস্থার ক্ষতি সাধিত হওয়ার ভয়।

○ প্রশ্ন-১৬৫. ওয়েব-সার্ভার বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : ইন্টারনেটের সাথে পরস্পর স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থেকে যে কম্পিউটারটি অন্যান্য কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ ঘটিয়ে দেয় তাকেই বলে ওয়েব-সার্ভার।

○ প্রশ্ন-১৬৬. ইন্টারকম কি?

উত্তর : ইন্টারকম হলো স্বল্প দূরত্বে কার্যক্ষম ব্যক্তিগত টেলিফোন নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্কে অল্প কিছু টেলিফোনের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকে। যেসব টেলিফোনের মধ্যে সংযোগ থাকে, সেগুলোতে শুধু বোতাম টিপেই কথা বলা যায়।

○ প্রশ্ন-১৬৭. এম পি-থ্রী কি?

উত্তর : এম পি-থ্রী হচ্ছে কম্পিউটার কমপ্রেস পদ্ধতির একটি নাম। এই পদ্ধতিতে ডিজিটাল ডেটাকে কমপ্রেস করা হয়। এম পি-থ্রীর বিপ্লব শুরু মূলত ইন্টারনেট থেকে। তিন মিনিটের একটি গানের আকার প্রায় ৩০ মেগাবাইটের সমান। কিন্তু এমপি-থ্রীর কারণে ঐ ৩০ মেগাবাইট-এর গানটিকে কমপ্রেস করে ৩ মেগাবাইট করা সম্ভব সাধারণ একটি সিডির ধারণক্ষমতা ৭০০ মেগাবাইট, যা ১৫ থেকে ২০টি গান ধারণে সক্ষম। কিন্তু এমপি-থ্রী ফরম্যাটে গান রেকর্ড করলে ঐ সিডিতে ৩৫০ থেকে ৪০০টি পর্যন্ত গান ধারণ করা যাবে।

○ প্রশ্ন-১৬৮. কম্পিউটার ভাইরাস ও কম্পিউটার ভ্যাকসিন বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : কম্পিউটার ভাইরাস কোনো জীবাণু নয়। এগুলো প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারী কর্তৃক তৈরি এক প্রকার প্রোগ্রাম, যা কম্পিউটার সিস্টেমে জমা করে রাখা সফটওয়্যার বা উপাত্তকে (data) ধ্বংস করে দেয়। ফলে কম্পিউটার যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হয়।

আর কম্পিউটার ভ্যাকসিন হলো প্রোগ্রাম প্রস্তুতকারী কর্তৃক উদ্ভাবিত এক ধরনের প্রোগ্রাম যা ভাইরাসকে চিহ্নিত করে, বা দূরীভূত করে এবং কম্পিউটার সিস্টেমকে ভাইরাস প্রতিরোধী করে তোলে।

○ প্রশ্ন-১৭৯. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি?

উত্তর : মানুষ যেভাবে চিন্তাভাবনা করে, কৃত্রিম উপায়ে কম্পিউটারে সেভাবে চিন্তাভাবনার রূপদান প্রক্রিয়াকে Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়। পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারগুলো একই সময়ে বহুবিধ কাজ অতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে পারবে। কিন্তু মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন চিন্তা করতে পারে না। Artificial Intelligence বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হচ্ছে কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে মানবজাতির বুদ্ধিমত্তার মতো কম্পিউটার আচরণ করতে পারে। কম্পিউটার কিভাবে মানুষের মতো চিন্তা করবে, কিভাবে অসম্পূর্ণ তথ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ সিদ্ধান্তে পৌঁছবে, কিভাবে সমস্যা সমাধান করবে, কিভাবে বিচক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, কিভাবে সফলতার সাথে খেলাধুলা করবে ইত্যাদি বিষয়গুলোকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর গবেষণা করা হচ্ছে। বর্তমানে রোবটের উপলব্ধি প্রাকৃতিকভাবে ভাষায় প্রক্রিয়াকরণ, নিপুণ ব্যবস্থা, নিরপেক্ষ নেটওয়ার্ক, স্বপ্নময় সত্য, যুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিশেষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-১৭০. MIS কি?

উত্তর : MIS হলো Management Information System. কোনো অফিসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কার্যাবলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত উপাত্ত ও ডেটা কম্পিউটারে সংরক্ষণ করা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, ছাপানো রিপোর্টের মাধ্যমে উপাত্ত গ্রহণ ও তথ্য পুনরুদ্ধার করার একটি কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাই হলো MIS.

○ প্রশ্ন-১৭১. সমাজে কম্পিউটার প্রযুক্তির প্রভাব আলোচনা করুন।

অথবা, Briefly describe the impacts of computer on society. *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশে তথ্য প্রযুক্তির প্রভাব অপরিসীম। কম্পিউটারে নির্ভুল কর্ম সম্পাদন, দ্রুতগতি, স্মৃতি, স্বয়ংক্রিয় কর্ম সম্পাদন প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জন্য এর প্রয়োগক্ষেত্র আজ সুবিস্তৃত। তথ্য প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য অবদান হলো– ১. এতে ব্যয় সংকোচন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি হয়; ২. সময় ও শক্তির অপচয় কম হয় এবং ৩. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ সম্ভব।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তি মানুষকে সঠিক পণ্য বা সেবা গ্রহণে সহায়তা করে। প্রযুক্তি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় তথ্যের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক সভ্যতার উন্নয়ন তথ্য প্রযুক্তির সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। কম্পিউটিং, মাইক্রো ইলেক্ট্রনিক্স, টেলিকমিউনিকেশন ইত্যাদি বিষয় তথ্য প্রযুক্তির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ডেটাবেস উন্নয়ন প্রযুক্তি, সফটওয়্যার উন্নয়ন প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক, মুদ্রণ ও রিপ্রোগ্রাফিক প্রযুক্তি, তথ্যভাণ্ডার প্রযুক্তি, বিনোদন প্রযুক্তি ইত্যাদি সবই তথ্য প্রযুক্তির একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

○ প্রশ্ন-১৭২. ডিজিটাল স্বাক্ষর কি এবং তা কেন গুরুত্বপূর্ণ? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : ডিজিটাল স্বাক্ষর বা ইলেকট্রনিক ডিজিটাল সিগনেচার হলো কম্পিউটার সিস্টেমে ব্যবহৃত একপ্রকার গাণিতিক পদ্ধতি যা কম্পিউটারে রক্ষিত ও আদান-প্রদানকৃত কোনো ডকুমেন্টের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। ডিজিটাল স্বাক্ষর কম্পিউটার ক্রিপ্টোগ্রাফিতে ব্যবহৃত এক প্রকার প্রযুক্তি যেখানে ডিজিটাল ডকুমেন্ট আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

গুরুত্ব :

১. ডিজিটাল ফাইলের নিরাপত্তা প্রদান করে।
২. নেটওয়ার্ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে।
৩. সফটওয়্যার সিস্টেমে প্রতারণা ও অনাদিষ্ট (unauthorized) ব্যবহার থেকে রক্ষা করে।

অধ্যায় ০২

তথ্যপ্রযুক্তি
Imformation Technology

*Syllabus— **Information Technology :** Data and information, information collection, processing and distribution, System analysis and information systems, expert systems. Basics of multimedia systems with examples hardware and software, concept of data compression, multimedia system development life cycle. Local area, metropolitan area and wide area computer networks. TCP/IP protocol suit, Internet, Internet services and protocols, Internet service providers and their responsibilities, intranet and extranet, World Wide Web and Web technology. Major components of telecommunication systems, mobile telephone systems, satellite communication systems and VSAT, importance of fibre optic communication system, Electronic commerce and technology for electronic commerce.*

ক ডেটা প্রসেসিং এবং সিস্টেম অ্যানালাইসিস
Data Processing and System Analysis

○ প্রশ্ন-১. ডেটা প্রসেসিং কি? এর ধাপগুলো লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : ডেটা প্রসেসিং : ডেটাকে প্রসেসিং বা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমেই ব্যবহারযোগ্য ইনফরমেশন বা তথ্যে পরিণত করা হয়। প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ, বিন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটাকে অর্থপূর্ণ তথ্যে বা ইনফরমেশনে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডেটা প্রসেসিং। ডেটা প্রসেসিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ আমাদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য ডেটাকে প্রসেস করার প্রয়োজন হয়।

ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতির ধাপ : ডেটা প্রসেসিং সিস্টেমে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে ডেটা সংগ্রহ, ডেটা সংরক্ষণ ও ডেটার বিন্যাস চূড়ান্তকরণ ইত্যাদি কাজগুলো পর্যায়ক্রমে সম্পাদন করতে হয়। ডেটা প্রসেসিংয়ের প্রধান তিনটি ধাপ হচ্ছে–

১. **ইনপুট :** ইনপুট হিসেবে ব্যবহারের জন্য ডেটা সংগ্রহ ও কম্পিউটারে ডেটা এন্ট্রি;
২. **প্রসেসিং :** সংগৃহীত ডেটার প্রসেসিং এবং
৩. **আউটপুট :** প্রসেসিং পরবর্তী ইনফরমেশন বা তথ্য ব্যবহার।

প্রশ্ন-২. ইনফরমেশন (Information) বা তথ্য কি? ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করুন। অথবা, ডেটা ও ইনফরমেশনের সংজ্ঞা লিখুন। [৩০তম বিসিএস]

উত্তর : ডেটা হলো সাজানো নয় এমন কিছু বিশৃঙ্খল ফ্যাক্ট (Raw Fact)। আর ইনফরমেশন বা তথ্য মানে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ডেটা যা সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য (Useful)। যেমন কোনো ছাত্রের বিভিন্ন বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর ডেটা কিন্তু তার প্রোগ্রেস রিপোর্ট হচ্ছে ইনফরমেশন। ইনফরমেশন নির্ভুল, স্পষ্ট, সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় হওয়া দরকার।

সব ইনফরমেশনই মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন অবশ্যই সহজ, সঠিক, সম্পূর্ণ, নির্ভরযোগ্য, বিষয়-সংশ্লিষ্ট, নিরাপদ, সময়োপযোগী হওয়া উচিত। মানুষ বিভিন্ন কাজে ইনফরমেশন ব্যবহার করে।

ডেটা ও ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য

ডেটা বা উপাত্ত	ইনফরমেশন বা তথ্য
সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে।	ইনফরমেশন বা তথ্য হলো সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ডেটা যা সহজবোধ্য, কার্যকর ও ব্যবহারযোগ্য (Useful)।
ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা।	ডেটাকে প্রসেস করে ইনফরমেশন পাওয়া যায়।
ডেটা পুরোপুরি কোনো ভাবার্থ প্রকাশ করে না।	ইনফরমেশন কোনো বিষয়ের ভাবার্থ প্রকাশ করে যা ব্যবহারকারী বুঝতে পারে।
ডেটা ইনফরমেশনের ওপর নির্ভর করে না। উদাহরণ : ফলাফল, দ্বিতীয়, ০০১, মিরাজ, ০০২, প্রথম, সুমাইয়া, পরীক্ষা, বার্ষিক ইত্যাদি ডেটা।	ইনফরমেশন ডেটার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ : বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল রোল | নাম | মেধাস্থান ০০১ | মিরাজ | প্রথম ০০২ | সুমাইয়া | দ্বিতীয়

প্রশ্ন-৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি?

উত্তর : তথ্যপ্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। একে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইটি (Information Technology – IT) নামে অভিহিত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি মূলত একটি সমন্বিত প্রযুক্তি যা যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও, কমপিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তির সম্মিলনে দীর্ঘদিন ধরে চর্চার ফলে সমৃদ্ধি লাভ করে তথ্যপ্রযুক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

প্রশ্ন-৪. তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ ধারা বর্ণনা করুন।

উত্তর : তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চোখে দেখে, কথা বলে ও শুনে, আকার ইঙ্গিতে তথ্য আদান-প্রদানের পর মানুষ এসব তথ্য সংরক্ষণের উপায় বের করার চেষ্টা করে। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে, ছবি এঁকে, গাছের বাঁকলে চিহ্ন দিয়ে তথ্য

সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। পরে এসব তথ্যকে আরো স্থায়ী রূপ দিতে তৈরি হয় কাগজ ও কালি। এতেই সংরক্ষিত হতো তথ্যাদি। ধীরে ধীরে ছাপাখানার উদ্ভবের ফলে তথ্যব্যবস্থায় আসে অভাবনীয় সাফল্য। এতে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ, সংরক্ষণ, আদান-প্রদান ও চর্চার সুবিধা সৃষ্টি হলো। ছাপাখানার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল তথ্যের প্রচার এবং প্রসার ততই হলো বিস্তৃত। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সাথে সাথে তথ্যের আদান-প্রদানও বাড়তে থাকে। একই সাথে উদ্ভব ঘটতে শুরু করে নানা ধরনের গণনা যন্ত্রের (অ্যাবাকাস, পাঞ্চকার্ড, যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর)। এসব যন্ত্রাদি যুগের পর যুগ আরো উন্নত হতে থাকে। উদ্ভব ঘটে ইন্টিগ্রেটর সার্কিট (IC), মাইক্রোপ্রসেসরের মতো উন্নত প্রযুক্তির, যা ব্যবহার করে নানা ধরনের যোগাযোগ যন্ত্রপাতি তৈরি করা সহজ হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো পরিবর্তন আসতে শুরু করে। ফলে দূরবর্তী স্থানে কথা বলা ও যোগাযোগ সম্ভবপর হয়। ধীরে ধীরে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে এখন টেলিফোনে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে ছবিসহ তথ্য সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ধীরে ধীরে এগুলো শক্তিশালী তথ্য মাধ্যম রূপে আবির্ভূত হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় উদ্ভব ঘটে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের। এতে তথ্য সম্প্রচার ও আদান-প্রদান পদ্ধতি হয় আরো লাগসই। তথ্যের আদান-প্রদানের হারও যায় বেড়ে। স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। এর ফলে একইসাথে কয়েক লক্ষ ফোন কল, টেলিভিশনের একাধিক চ্যানেল সম্প্রচার, চিত্রসহ বিবিধ তথ্যাদি আদান-প্রদান করা যায়। বর্তমানে ফ্যাক্স, সেলুলার ফোন, পেজার, স্যাটেলাইট টেলিফোনের মতো উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে তথ্যের আদান-প্রদানের গতিও যাচ্ছে বেড়ে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের উদ্ভব বিপুল পরিমাণ তথ্যের আদান-প্রদানকে প্রচণ্ড গতিশীল করে তুলেছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। এ প্রযুক্তিতে আলোকরশ্মি পরিবাহী সূক্ষ্ম ফিলামেন্টের তৈরি স্বচ্ছ তারের ভেতর দিয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিসরণের মাধ্যমে একই সাথে বয়ে নেয়া যায় অসংখ্য টেলিফোন কল, টেলিভিশন সংকেত আর বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত। আজকাল বিপুল পরিমাণ উপাত্ত পরিবহনে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপিত হয়েছে। কম্পিউটার নির্ভর ইন্টারনেট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র বিশ্বই আজ এক বিশাল তথ্য আকারে পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে আজ সৃষ্টি হয়েছে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। বিশ্বের কম্পিউটারগুলো আজ একে অন্যের সাথে এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত রয়েছে। মুহূর্তেই তথ্য আদান-প্রদান, টেলিকনফারেন্সিং, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো স্থানে ফোনে কথা বলার সুযোগও এতে স্থাপিত হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বিস্তৃতি ঘটলেও একে একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির উপাদান বলা হয় না বরং বিভিন্ন প্রযুক্তির সম্মিলিত রূপই হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। দীর্ঘদিন ধরে এটি বিকাশ লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রশ্ন-৫. ডেটা (Data) বা উপাত্ত কি? বিভিন্ন ধরনের ডেটা বা উপাত্তের বর্ণনা দিন।

উত্তর : সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে। ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা। ডেটাকে প্রসেস করেই ইনফরমেশন পাওয়া যায়।

Datum শব্দের বহুবচন হলো ডেটা (Data) যার অর্থ ফ্যাক্ট (Fact)। কোনো ধারণা (Idea), বস্তু (Object), শর্ত (Condition), অবস্থা (Situation) ইত্যাদির ফ্যাক্ট, চিত্র (Figure) বা বর্ণনা (Description) ডেটার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি কার্যকলাপ ডেটার জন্ম দেয়। কোনো ঘটনায় (Event) বহু ডেটা জড়িত থাকে। ডেটা এক বা একাধিক বর্ণ, চিহ্ন বা সংখ্যা বিশিষ্ট হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের ডেটা : বিষয় (Content) এবং প্রকাশ পদ্ধতি (representation) অনুযায়ী ডেটা অনেক রকমের হতে পারে। যেমন :

নিউমেরিক (Numeric) ডেটা : সংখ্যা দিয়ে ডেটা প্রকাশ করা হয়, যেমন— বয়স, ওজন, আয়, লোকসংখ্যা ইত্যাদি।

অ্যালফাবেটিক (Alphabetic) ডেটা : অক্ষর দিয়ে ডেটা প্রকাশ করা হয়, যেমন— নাম, পদ ইত্যাদি।

অ্যালফানিউমেরিক (Alphanumeric) ডেটা : যে ডেটাতে অক্ষর এবং সংখ্যা দুটোই ব্যবহার করা হয়, যেমন গাড়ির নম্বর। এ ধরনের ডেটা অনেক দিন ধরে প্রচলিত। কম্পিউটার আসার পর নতুন কয়েক ধরনের ডেটা তৈরি হয়েছে। যেমন :

গ্রাফিক (Graphic) ডেটা : ছবি বা রেখা সংক্রান্ত ডেটা, যেমন ফটোগ্রাফ, চার্ট, ড্রইং ইত্যাদি।

অডিও (Audio) ডেটা : শব্দ সম্বন্ধীয় ডেটা, যেমন- গান, কথা ইত্যাদি।

ভিডিও (Video) ডেটা : চলমান ছবি সম্বন্ধীয় ডেটা, যেমন— সিনেমা, অ্যানিমেশন, কোনো অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং ইত্যাদি।

এছাড়া মাধ্যম হিসেবেও ডেটার প্রকারভেদ হতে পারে। যেমন :

ডিজিটাল (Digital) ডেটা : কম্পিউটার ডেটা প্রসেস করার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যমের ডেটা লাগে। এ মাধ্যমের নাম হলো ডিজিটাল মাধ্যম। তাই, কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য সব ডেটাই ডিজিটাল ডেটা।

নন-ডিজিটাল (Non digital) ডেটা : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ডেটা যে মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোর প্রায় কোনোটিই ডিজিটাল ডেটা নয়। যেমন কাগজে লেখা অক্ষর এবং সংখ্যা, ফটোগ্রাফ, ফিল্মের ছবি, আঁকা ছবি, যন্ত্রের শব্দ, গান, কথা ইত্যাদি। এগুলো সবই নন-ডিজিটাল ডেটা এবং সরাসরি কম্পিউটারে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। এসব বিভিন্ন মাধ্যমের নন-ডিজিটাল ডেটাকে, ডিজিটাল ডেটাতে পরিবর্তিত করে তবে কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।

○ প্রশ্ন-৬. তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক মাধ্যমগুলো কি কি? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক মাধ্যম : তথ্যপ্রযুক্তির সূচনালগ্ন থেকে বিভিন্ন মাধ্যম বা ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিচে এরূপ কয়েকটি মাধ্যম উল্লেখ করা হলো :

১. **টেলেক্স (Telex) :** টেলেক্স পদ্ধতি হচ্ছে মোর্স-কোডের উন্নততর সংস্করণ। এ পদ্ধতিতে সংকেত গ্রহণ ও প্রদর্শন উভয় ক্ষেত্রেই টাইপ রাইটার (বৈদ্যুতিক) ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পার্সোনাল কম্পিউটার টেলেক্স প্রেরণ ও গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. **টেলিটেক্সট (Teletext) :** টেলিটেক্সট একটি একমুখী সম্প্রচার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ডেটাবেস থেকে পৃষ্ঠার আকারে টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার করা হয়। আবহাওয়ার খবর, স্টক মার্কেটের রিপোর্ট, সংবাদ, বাণিজ্যিক পণ্যের খবর, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তথ্য প্রচারের জন্য টেলিটেক্সট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩. **ভিডিওটেক্সট (Videotext) :** এ ব্যবস্থায় ব্যবহারকারী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বৃহৎ ডেটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে পারে। আহরিত তথ্য টেলিভিশন পর্দায় প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যবস্থায় টেলিটেক্সট-এর মতো তথ্য সম্প্রচার না করে শুধু অনুসন্ধানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সংবাদ, বাণিজ্যিক খবরাখবর, স্টক মার্কেট রিপোর্ট ইত্যাদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

৪. **ইলেক্ট্রনিক মেইল (Electronic Mail) :** ইলেক্ট্রনিক মেইলকে সংক্ষেপে 'ই-মেইল' বলা হয়। এটি এক ধরনের উন্নত ও দ্রুত ডাকব্যবস্থা। এছাড়াও এটি একটি আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ও বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যম।

৫. **টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing) :** টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে টেলিকনফারেন্সিং বলা হয় এবং এ সভাকে টেলিকনফারেন্স বলে। ১৯৭৫ সালে মরি টারফ এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

৬. **ভিডিও কনফারেন্সিং (Videoconferencing) :** ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থায় টেলিভিশনের পর্দায় অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে একে অন্যকে দেখে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেন। এটি একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

৭. **ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (Electronic Fund Transfer) :** ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো টেলিফোন ও ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তর। এ প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার হিসাবের মধ্যে প্রকৃত অর্থের আদান-প্রদান না ঘটিয়ে শুধু হিসাবের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণের সমন্বয় সাধন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অটোমেটিক টেলার মেশিনগুলোকে এ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

○ প্রশ্ন-৭. সমাজে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বর্ণনা করুন।

উত্তর : সমাজে আজ তথ্যপ্রযুক্তির জয়জয়কার। ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং শিল্প সংস্কৃতিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। কলকারখানায় অধিকতর দক্ষতা এনে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

১. **ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে :** তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া আজকাল ব্যাংক, বীমা, ক্রেডিট কোম্পানি, বিমান পরিবহন এবং উন্নত বিশ্বের সাধারণ কেনাকাটাসহ অনেক কর্মকাণ্ড অচল। ব্যবসায় বাণিজ্যে কম্পিউটারসহ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় অচল, বিশেষত উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার বুলেটিন বোর্ড, ইলেক্ট্রনিক মেইল ওয়েভ সাইট এবং ইন্টারনেট বাণিজ্যিক যোগাযোগসহ সব রকম যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত আধুনিক ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানীতে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২. **যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি :** আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথে এবং আকাশপথের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে সহজতর, দ্রুত এবং লাভজনক। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে সংরক্ষিত। টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক মেইল ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যমে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে :** শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শিক্ষাকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এখন ইচ্ছা করলে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কোনো লাইব্রেরি থেকে বই পড়তে পারছে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি কিংবা গবেষণা কর্ম সাথে সাথে ইন্টারনেটে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। তাছাড়া টেলিভিশন, টেলিফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট সর্বোপরি কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার যাবতীয় তথ্য সম্প্রচারিত হচ্ছে।

৪. **বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে :** বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে টেলিফোন, টেলিভিশন, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং গবেষণা কর্ম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। ফলে বিজ্ঞান সামনের দিকে এগিয়ে চলছে রকেটের গতিতে। আজ থেকে একশ বছর আগে যে গবেষণা শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আজ কেউ গবেষণা করছে না, যা অতীতে করত। বর্তমানে সর্বশেষ গবেষণা কর্মটি যেখানে শেষ, সেখান থেকে অন্য গবেষক গবেষণা শুরু করছেন। ফলে বিজ্ঞান নিত্যনতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দ্বারে হাজির হচ্ছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ ঘরে বসে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন নতুন ওষুধের উদ্ভাবন এবং রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ পদ্ধতি আজ সবাই জেনে যাচ্ছেন।

৫. **শিল্প-সাহিত্য এবং বিনোদনে তথ্যপ্রযুক্তি :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ফলাফল আজ মুহূর্তে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষের কল্যাণে সেসব কর্ম অবদান রেখে যাচ্ছে।

বিনোদনের কথাতো বলাই বাহুল্য। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। সারা বিশ্বের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান আজ ঘরে বসে উপভোগ করা যাচ্ছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের বিনোদনের সব চাহিদাকে পূরণ করে যাচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৮. ডেটা সংগ্রহের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

উত্তর : উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা–
– লিখিত ডকুমেন্ট (Written documents) তৈরি করে;
– সাক্ষাৎকার (Interviews) গ্রহণ করে;
– প্রশ্নাবলী (Questionnaires) তৈরি ও পূরণ করে;
– পর্যবেক্ষণ (Observations) করে ও
– নমুনায়ন (Sampling) করে ইত্যাদি।

তাছাড়া OMR, OCR, Barcode Reader, Light Pen, MICR ইত্যাদি ইনপুট যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারে সরাসরি ডেটা গ্রহণ করতে পারে।

○ প্রশ্ন-৯. মেনুয়াল ডেটা প্রসেসিং ও অটোমেটিক ডেটা প্রসেসিংয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করুন।

উত্তর : ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ মেনুয়াল পদ্ধতিতে অথবা কম্পিউটারের সাহায্যে অটোমেটিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। কম্পিউটারসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ব্যতীত হাতেকলমে ডেটা প্রসেসিং করা হলে তাকে মেনুয়াল ডেটা প্রসেসিং বলা হয়। মেনুয়াল ডেটা প্রসেসিংয়ে পরিশ্রম বেশি হয় কিন্তু সে তুলনায় আউটপুট কম হয়। তাছাড়া সময় বেশি প্রয়োজন এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে।

অন্যদিকে কম্পিউটারের সাহায্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি (যেমন– স্ক্যানার, ওসিআর-OCR, এমআইসিআর-MICR, ওএমআর-OMR ইত্যাদি ইনপুট যন্ত্রপাতি) সহযোগিতায় অতি দ্রুত গতিতে, কম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে অটোমেটিক পদ্ধতিতে ডেটা প্রসেসিং করা যায়।

পূর্বে ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ সাধারণত মেনুয়াল পদ্ধতিতে করা হতো কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটারের কল্যাণে অতি দ্রুতগতিতে ও কম পরিশ্রমে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অটোমেটিক পদ্ধতিতে ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ করা হয়।

উভয় ক্ষেত্রে প্রসেসিংয়ের ফলাফল একই হয়, তবে প্রসেসিংয়ের বৈশিষ্ট্য বা নমুনায় অবশ্যই কিছু পার্থক্য থাকে। নিচে উভয় প্রকার ডেটা প্রসেসিং তুলনা করা হলো :

তুলনার বিষয়	মেনুয়াল	অটোমেটিক
কাজের গতি	মন্থর	খুব দ্রুত
দীর্ঘ সময় করার ক্ষমতা	দুর্বল	খুব ভালো
মেমরি ক্ষমতা	কম	বেশি
নির্ভুল কাজ করার ক্ষমতা	ভুল হতে পারে	ভুল করার সম্ভাবনা নেই
মনোযোগসহ নির্দেশ পালন	সঠিক হয় না	সঠিক হয়
বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সংযোজন ও সংশোধন ক্ষমতা	আছে	নেই

আলোচ্য ছক থেকে দেখা যায় যে মেনুয়াল একটি অনুন্নত ডেটা প্রসেসর। মানুষের কাজের গতি, সহ্য-ক্ষমতা এবং তথ্য মনে রাখার ক্ষমতা খুব সীমিত। তবে পরিবেশের সাথে মিল রেখে নতুন কিছু সংযোজন এবং পরীক্ষণের ভুল নির্ণয় করে তা সংশোধনের পথ নির্দেশের ক্ষমতা শুধু মানুষেরই আছে, কম্পিউটারের নেই। সুতরাং যেখানে বুদ্ধি, বিবেচনা, কারণ নির্ণয় এবং নতুন আবিষ্কার প্রয়োজন সেখানে মেনুয়াল সর্বোত্তম। আবার ক্যালকুলেশন, বিশ্লেষণ, সাজানো এবং তুলনা করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা উত্তম।

○ প্রশ্ন-১০. আধুনিক বা কম্পিউটারাইজড ডেটা প্রসেসিং-এর বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : আধুনিক ডেটা প্রসেসিং বা কম্পিউটারাইজড ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতি প্রধানত দু প্রকার। যথা :
১. ব্যাচ প্রসেসিং (Batch Processing) ও ২. ট্রানজেকশন প্রসেসিং (Transaction Processing)

ব্যাচ প্রসেসিং (Batch Processing) : ব্যাচ প্রসেসিং এমন এক পদ্ধতি যাতে অফলাইন বা অনলাইন পদ্ধতিতে কম্পিউটার ডেটা সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত একত্র করে। তারপর সংগৃহীত ডেটা নির্ধারিত সময় পর প্রসেস করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো কোম্পানিতে সারা মাস ধরে কর্মীদের দৈনন্দিন কাজের হিসাব কম্পিউটারে ইনপুট নেয়া হয় এবং মাসের শেষে বেতন হিসাব করা হয়। ব্যাচ প্রসেসিংয়ের বড় অসুবিধা হলো মাস্টার ফাইল ডেটা সংগ্রহ করার সময় আপডেট হয় না। শুধু প্রসেসিং করার সময় আপডেট হয়।

ট্রানজেকশন প্রসেসিং (Transaction Processing) : ট্রানজেকশন প্রসেসিং একটি অনলাইন প্রসেসিং পদ্ধতি যেখানে ডেটার কোনো ট্রানজেকশন ঘটার সাথে সাথেই ডেটা প্রসেসিং করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট ফাইল আপডেট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ কোনো এয়ার লাইন্সের প্লেনের টিকেট ক্রয় করার সাথে সাথেই টিকিট বিক্রয় সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদির মাস্টার ফাইল আপডেট হয়ে যাবে। এ পদ্ধতিকে রিয়েল টাইম প্রসেসিং বা অনলাইন প্রসেসিং পদ্ধতিও বলা হয়।

ট্রানজেকশন প্রসেসিং পদ্ধতিতে ডেটার কোনো ট্রানজেকশন ঘটার সাথে সাথেই তা প্রসেস হয় এবং মাস্টার ফাইল আপডেট হয়। কাজেই এ পদ্ধতিতে সবসময় মাস্টার ফাইল আপডেট থাকে।

○ প্রশ্ন-১১. ডেটার গুণগত মান কিভাবে বৃদ্ধি করা যেতে পারে?

উত্তর : ডেটা প্রসেসিং করার পূর্বে ডেটাকে প্রি-প্রসেস করা হলে ডেটার গুণগত মান আরও বৃদ্ধি পায়। ডেটা প্রি-প্রসেসিং করার জন্য অনেকগুলো উপায় রয়েছে। নিচে কতগুলো উপায় বর্ণনা করা হলো :

১. ডেটা ক্লিনিং (Cleaning) বা পরিচ্ছন্নকরণ
২. ডেটা ইনটিগ্রেশন (integretion) বা সমন্বয়করণ
৩. ডেটা ট্রান্সফরমেশন (Transformation) বা রূপান্তরকরণ ও
৪. ডেটা রিডাকশন (Reduction) বা লঘুকরণ ইত্যাদি।

১. **ডেটা ক্লিনিং (Cleaning) বা পরিচ্ছন্নকরণ :** বাস্তব জগতের ডেটার প্রবণতা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তা অসম্পূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ, অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলবিশিষ্ট ও বিশৃঙ্খল। ডেটা ক্লিনিং (Cleaning) বা পরিচ্ছন্নকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে ডেটাকে এসব অনাকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করা হয়।

২. **ডেটা ইনটিগ্রেশন (Integretion) বা সমন্বয়করণ :** ডেটা প্রসেসিং করার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করার প্রয়োজন হতে পারে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারকে একত্র করা হয়। ডেটা কিউব কিংবা ডেটা ওয়্যারহাউজ এমনই এক ধরনের ধারক। অতঃপর এ ধারকের ডেটাকে প্রসেসিং করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

৩. **ডেটা ট্রান্সফরমেশন (Transformation) বা রূপান্তরকরণ :** সংগৃহীত ডেটাকে প্রসেস করার জন্য উপযুক্ত ফর্মে রূপান্তর করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন–

-2, 32, 100, 59, 48 Transformation -0.02, 0.32, 1.00, 0.59, 0.48

৪. **ডেটা রিডাকশন (Reduction) বা লঘুকরণ :** ডেটা রিডাকশন বা লঘুকরণ পদ্ধতির প্রয়োগের ফলে ডেটাসেটের উপস্থাপনা লঘু করা যায় যা তুলনামূলকভাবে কম আয়তন বিশিষ্ট হয়। ডেটা রিডাকশন করার সময় অপ্রয়োজনীয় অ্যাট্রিবিউট ও ভেল্যুকে বাদ দেয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মূল ডেটার ইন্টিগ্রিটি রক্ষা করতে হবে।

○ প্রশ্ন-১২. ডেটা কোডিং কি? এর শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন।

উত্তর : কোডিং (Coding) হলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কোনো জিনিসকে সংক্ষেপে সংখ্যা বা অক্ষর বা চিহ্ন দ্বারা ইউনিক (Unique) সংকেত বা কোডের সাহায্যে বোঝানো। ইউনিক মানে কোনো কোডই একাধিক জিনিস বোঝাবে না। ডেটা কোডিংয়ের সাহায্যে দুরূহ ও জটিল ডেটাকে সহজে ও সংক্ষিপ্তাকারে কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়। কোডিং কাজের দক্ষতা ও নির্ভুলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ডেটা প্রসেসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সর্টিং বা সাজানোর কাজে সাহায্য করে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কোড : কোড প্রধানত ৬ ধরনের। যথা :

১. অ্যালফাবেটিক;
২. নিউমেরিক;
৩. আলফানিউমেরিক;
৪. নেমোনিক;
৫. অ্যাক্রোনিম ও
৬. সেলফ চেকিং।

○ প্রশ্ন-১৩. ডেটা কোডিং-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা উল্লেখ করুন।

উত্তর : ডেটা কোডিংয়ের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. ডেটার গতিবিধি লক্ষ্য করা;
২. ইনফরমেশনের শ্রেণীবিভাগ করা;
৩. ইনফরমেশনকে গোপন রাখা;
৪. গোপন ইনফরমেশনকে প্রকাশ করা এবং
৫. প্রয়োজনীয় কাজের উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করা।

ডেটা কোডিংয়ের নীতিমালা

১. কোড যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত;
২. কোড স্থায়ী (Stable) হওয়া উচিত;
৩. কোড ইউনিক (Unique) হওয়া উচিত;
৪. কোড এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সাজানো যায়;
৫. কোড বিভ্রান্তিকর হওয়া উচিত নয়;
৬. কোড ইউনিফর্ম (Uniform) হওয়া দরকার;
৭. কোড পরিবর্তনযোগ্য হওয়া উচিত;
৮. কোড অর্থবোধক হওয়া উচিত।

○ প্রশ্ন-১৪. ডেটার সত্যতা নির্ধারণ ও বৈধতা যাচাইয়ের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : সাধারণত দু ভাবে সত্যতা ও বৈধতা যাচাই করা যায়। যথা–

ক. ট্রান্সজেকশন বৈধতা (Transaction Validating) ও খ. ডেটার বৈধতা (Validating data)।

ক. **ট্রান্সজেকশন বৈধতা (Transaction Validating) :** ইনপুট লেনদেনের বৈধতা ব্যাপকভাবে সফটওয়্যারের মাধ্যমে যাচাই করা হয় যা একজন প্রোগ্রামারের দায়িত্ব। ইনপুট লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রধানত তিনটি সমস্যা হতে পারে। যথা–

১. ভুল ডেটা উপস্থাপন করা;
২. অনার্দিষ্ট (Unauthorized) ব্যক্তি কর্তৃক ডেটা উপস্থাপন করা ও
৩. সিস্টেমকে অগ্রহণযোগ্য (Unacceptable) কোনো কাজ বা ফাংশন করতে নির্দেশ দেয়া।

খ. **ডেটার বৈধতা :** ইনপুট ট্রান্সজেকশন বৈধতার পাশাপাশি ডেটার বৈধতা ও সত্যতা যাচাই করা অপরিহার্য। ডেটার বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টেস্ট সফটওয়্যার সংযোজন করা হয়। এখানে ডেটার বৈধতা যাচাইয়ের কতগুলো উপায় আলোচনা করা হলো :

১. **মিসিং ডেটা টেস্ট :** ডেটার প্রথম বৈধতা টেস্ট হলো কোনো আইটেম মিসিং (Missing) আছে কিনা তা দেখা। উদাহরণস্বরূপ পরীক্ষার ফলাফল তৈরির ক্ষেত্রে কোনো ছাত্রের রোল নম্বর মিসিং হলে তা অবৈধ হবে। তাই প্রসেসের পূর্বে সব ডেটার উপস্থিতি থাকতে হবে।

২. **সঠিক ফিল্ড লেনথ (Field length) টেস্ট :** ডেটার দ্বিতীয় বৈধতা টেস্ট হলো সঠিক ফিল্ড লেনথ চেক করা। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের সব শহরকে যদি তিন অক্ষর বিশিষ্ট কোড (DHA, CTG, RAJ ইত্যাদি) দিয়ে প্রকাশ করা হয় তখন ভুলবশত দু অক্ষর দিয়ে কোনো শহরকে প্রকাশ করলে তা অবৈধ হবে। তাই প্রসেসের পূর্বে সঠিক ফিল্ড লেনথ চেক করতে হবে।

৩. **শ্রেণীবিন্যাস বা সাজানো (Class or Composition) টেস্ট :** বৈধতার এ পরীক্ষায় ডেটা যদি সংখ্যাবাচক হয় তাহলে ডেটার মধ্যে ভুলবশত কোনো স্ট্রিং আছে কিনা তা চেক করা হয়। আবার স্ট্রিং ডেটার মধ্যে ভুলবশত কোনো সংখ্যা আছে কিনা তাও চেক করা হয়। যেমন– কোনো পরীক্ষায় ছাত্রদের প্রাপ্ত নম্বরে কোনো স্ট্রিং থাকে না, একটি সংখ্যাবাচক হয়।

৪. **ব্যাপ্তি পরীক্ষা (Range of Reasonableness) :** এ পরীক্ষা মূলত সাধারণ বুদ্ধিমত্তার ওপর ভিত্তি করে করা হয়। কোনো ডেটার মান সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন কত হতে পারে কিংবা ডেটার মান কতটা যুক্তিসঙ্গত তা চিন্তা করে ডেটার বৈধতা যাচাই করা হয়। যেমন—কোনো ছাত্রের কলেজে ভর্তির তারিখ ৩২ সেপ্টেম্বর হতে পারে না কিংবা কারো বয়স ২১০ বছর হতে পারে না।

৫. **অবৈধ মানের পরীক্ষা (Invalid Values) :** ইনপুট ডেটার সম্ভাব্য মান যদি স্বল্পসংখ্যক হয় তাহলে এ পরীক্ষায় ডেটার সম্ভাব্য মানের বাহিরে কোনো অবান্তর মান যাতে গ্রহণ করতে না পারে সে পরীক্ষা করা হয়। যেখানে ডেটার সম্ভাব্য মান কয়েকটি হতে পারে সেখানে ডেটার এ পরীক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যাংকে দু প্রকার একাউন্ট আছে। ১ = কারেন্ট একাউন্ট ও ২ = সেভিংস একাউন্ট। এখন একাউন্ট ক্যাটাগরি এ দুটি ছাড়া অন্য ডেটা দিলে তা অবৈধ হবে।

৬. **সংরক্ষিত ডেটার সাথে তুলনা :** কম্পিউটারে যদি কোনো ডেটা সংরক্ষিত থাকে তবে নতুনভাবে প্রবেশকৃত ডেটা ঐ সংরক্ষিত ডেটার সাথে তুলনা করলে ডেটার বৈধতা যাচাই করা হয়। যেমন কোনো পার্ট নম্বর যদি ডেটা এন্ট্রি করা হয় তা পূর্ব থেকে সংরক্ষিত পার্ট নম্বরের সাথে মিলিয়ে ভুল সংশোধন করা যেতে পারে।

৭. **অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য পরীক্ষা (Consistency) :** সাধারণত দুই বা ততোধিক সংশ্লিষ্ট ফিল্ডের মধ্যে কোনো লজিক্যাল শর্তের ভিত্তিতে এ পরীক্ষা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ লাইব্রেরিতে কোনো ছাত্রের বই ধার নেয়ার ক্ষেত্রে বই নেয়ার তারিখ বই জমা দেয়ার তারিখের পরে হতে পারে না কিংবা বই জমা দেয়ার তারিখ বই নেয়ার তারিখের পূর্বে হতে পারে না।

○ প্রশ্ন-১৫. ডেটা কমিউনিকেশন কি? ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম আলোচনা করুন। ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদানগুলো কি?

উত্তর : ডেটা কমিউনিকেশন : তথ্যকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নির্ভরযোগ্যভাবে আদান-প্রদান করার নাম ডেটা কমিউনিকেশন। এ প্রক্রিয়ায় ৪টি উপাদান ক্রিয়াশীল হয়। যথা : ১. তথ্যের উৎস বা প্রেরক, ২. তথ্যের বাহক মাধ্যম, ৩. গ্রাহক বা তথ্য গ্রহণকারী ও ৪. ফিডব্যাক বা প্রাপ্তি স্বীকার,

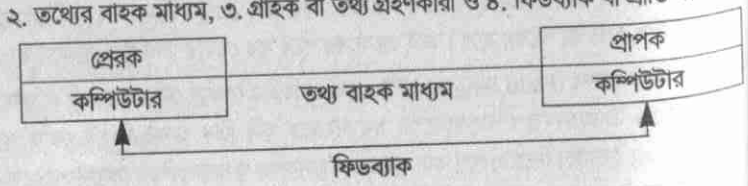

যোগাযোগ ব্যবস্থা

চিত্রের এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রেরক একটি কম্পিউটার এবং গ্রাহকও একটি কম্পিউটার। তথ্য টেলিফোন লাইন বা কেবল বহন করে গ্রাহকের নিকট নিয়ে আসে।

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম

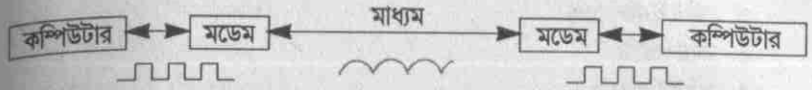

ডেটা কম্পিউটার থেকে বর্গ তরঙ্গ আকারে রওনা দেয়। মডেমে সাইন তরঙ্গ গিয়ে এ তরঙ্গের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। Modulation ও Demodulation কথাদ্বয়ের প্রথম বর্ণ সমষ্টি দিয়ে MODEM শব্দটি রচিত। এ মডেম সাইন তরঙ্গ আকারে কম্পিউটার প্রদত্ত বর্গ তরঙ্গটিকে ক্যাবল টেলিফোনকে হস্তান্তর করে। ক্যাবল/টেলিফোন সেটা আবার দ্বিতীয় মডেমে পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় মডেমটি আবার রূপান্তর করে মূল বর্গ তরঙ্গ করে দ্বিতীয় কম্পিউটারকে হস্তান্তর করে বলে একই লাইন দিয়ে বর্ণ বা শব্দ দিয়ে গঠিত যে কোনো সঙ্কেত গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান : কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো–

১. উৎস (Source);
২. প্রেরক (Transmitter);
৩. মাধ্যম (Medium);
৪. গ্রাহক বা প্রাপক (Receiver) ও
৫. গন্তব্য (Destination)।

○ প্রশ্ন-১৬. ইনফরমেশন সিস্টেম কি? ইনফরমেশন সিস্টেমের ধরন ও উপাদান উল্লেখ করুন।

উত্তর : ডেটা সংগ্রহ, সত্যতা ও বৈধতা যাচাই, সংরক্ষণ, প্রসেস, উপস্থাপনা ও আপডেটিং করে আউটপুট হিসেবে ইনফরমেশন সরবরাহ করাই হলো ইনফরমেশন সিস্টেম। ইনফরমেশন সিস্টেমে ইনপুট হিসেবে ডেটা গ্রহণ করে এবং ডেটাকে প্রসেস করে আউটপুট হিসেবে ইনফরমেশন উৎপন্ন করে। ইনফরমেশন সিস্টেমকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. অপারেশনাল ইনফরমেশন সিস্টেম ও
২. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম।

একটি প্রতিষ্ঠানের রুটিন অপারেশনের জন্য অপারেশনাল ইনফরমেশন সিস্টেম প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন এবং ডকুমেন্ট তৈরি করে। অন্যদিকে কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্টকে ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন উৎপন্ন করে। ইনফরমেশন সার্ভিস, ডেটা প্রসেসিং, ইনফরমেশন প্রসেসিং, ইনফরমেশন টেকনোলজি, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সার্ভিস, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদি ইনফরমেশন সিস্টেমের ভিন্ন ভিন্ন নাম।

কম্পিউটার নির্ভর ইনফরমেশন সিস্টেম তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত ৬টি উপাদান প্রয়োজন। যথা :

১. হার্ডওয়্যার
২. সফটওয়্যার
৩. ডেটা/ইনফরমেশন
৪. কার্য পদ্ধতি
৫. কমিউনিকেশন ও
৬. মানুষ।

○ প্রশ্ন-১৭. ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড কি? এর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

উত্তর : একস্থান থেকে অন্যস্থানে কিংবা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। এ ট্রান্সমিশন স্পিডকে অনেক সময় Bandwidth বলা হয়। এ ব্যান্ডউইথ সাধারণত Bit Per Second (bps) এ হিসাব করা হয়। ডেটা ট্রান্সফার গতির ওপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন গতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band) [৪৫-৩০০bps পর্যন্ত]
২. ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band) [৯৬০০bps পর্যন্ত]
৩. ব্রড ব্যান্ড (Broad Band) [কমপক্ষে ১ mbps]

○ প্রশ্ন-১৮. সিস্টেম কি? সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট কর্ম সহজে ও সঠিকভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সুসংবদ্ধভাবে বিন্যস্ত রীতি-নীতিকে সিস্টেম বলা হয়।

এখানে সিস্টেম বলতে আসলে সামগ্রিক ডেটা প্রসেসিং ব্যবস্থাকে বোঝায়। সিস্টেমের মূল তিনটি অংশ হলো :

১. ডেটা গ্রহণ,
২. প্রসেসিং ও
৩. ফলাফল প্রদান।

সিস্টেম সম্পর্কে ধারণার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জানা প্রয়োজন—

১. সিস্টেম নির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তৈরি করা হয়।
২. সিস্টেমের একাধিক উপাদান থাকবে এবং উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতা থাকবে।
৩. সিস্টেমের উদ্দেশ্য সিস্টেমের অন্তর্গত উপাদানগুলোর উদ্দেশ্যের চেয়ে অধিক অগ্রাধিকার পাবে।

সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য : সব সিস্টেমেরই কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। যথা :

১. সংগঠন (Organization);
২. মিথস্ক্রিয়া (Interaction);
৩. পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependence);
৪. একত্রীকরণ (Integration) এবং
৫. উদ্দেশ্য (Objective)।

সিস্টেমের উপাদান : যে কোনো সিস্টেম তৈরি করার জন্য নিম্নলিখিত প্রধান উপাদানগুলো অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। যথা—

১. ইনপুট ও আউটপুট (Input and Output);
২. প্রসেসর (Processor);
৩. কন্ট্রোল (Control);
৪. ফিডব্যাক (Feedback);
৫. পরিবেশ (Environment) এবং
৬. সীমানা (Boundaries)।

○ প্রশ্ন-১৯. সিস্টেম উন্নয়ন চক্র (System Development Life Cycle) কি? সিস্টেম উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ধাপগুলোর আলোচনা করুন।

উত্তর : ইনফরমেশন সিস্টেম গড়ে তোলার নিমিত্তে এর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজগুলো ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে সিস্টেম উন্নয়ন চক্র। সিস্টেম উন্নয়ন চক্রের মাধ্যমে ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়নসহ অন্য যে কোনো সফটওয়্যার উন্নয়ন করা যায়। কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য সিস্টেম উন্নয়ন চক্রে যে ধাপগুলো প্রয়োজন সেগুলো হলো :

১. তথ্যানুসন্ধান বা ইনভেস্টিগেশন;
২. বিশ্লেষণ বা অ্যানালাইসিস;
৩. পরিকল্পনা বা ডিজাইন;
৪. সফটওয়্যার উন্নয়ন;
৫. সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং
৬. সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ।

এ ধাপগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। চিত্রে সিস্টেম উন্নয়ন ধাপসমূহ দেখানো হলো :

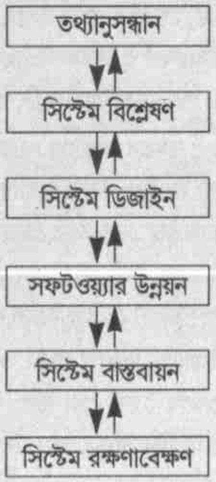

১. **তথ্যানুসন্ধান (Investigation) :** প্রসেসিংয়ের এ ধাপে সমস্যার প্রকৃতি, সমস্যার কারণ ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনার কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা হয়। তথ্যানুসন্ধানের এ ধাপে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো :

ক. বিদ্যমান পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োজনে পরিদর্শন করা।

খ জরিপমূলক কাজের মাধ্যমে সিস্টেম নির্বাচন।

গ. সিস্টেম সমাধানের সম্ভাবনা এবং

ঘ. সিস্টেমের প্রস্তুতকরণ।

অতঃপর রিপোর্ট, ডকুমেন্ট ইত্যাদি হতে ডেটা সংগ্রহ করে প্রস্তাবিত পদ্ধতির উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিভিন্ন সিস্টেম তুলনা ও বিশ্লেষণ করে সিস্টেমের সম্ভাব্যতা বিচার করা হয়। তথ্যানুসন্ধানের পর সিস্টেমের সম্ভাব্যতার রিপোর্ট তৈরি করা হয়। রিপোর্টে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে :

ক. বৈশিষ্ট্যসহ প্রস্তাবিত সিস্টেমের প্রাথমিক বর্ণনা,

খ. প্রস্তাবিত পদ্ধতির অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিচালনাগত সম্ভাব্যতা এবং

গ. প্রস্তাবিত পদ্ধতি উন্নয়নের রূপরেখা।

২. **সিস্টেম বিশ্লেষণ (System Analysis) :** সিস্টেম বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সিস্টেমে ব্যবহৃত উপাদান ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সময় নিরূপণ, সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ, ডেটা সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন সিস্টেম তৈরির সর্বোচ্চ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট অনুমোদনের পর সিস্টেম বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ ধাপে ডেটা প্রসেসিংয়ের সমস্যাটি চিহ্নিত করে তা সমাধানের বিভিন্ন পথ বিশ্লেষণ করা হয়। সিস্টেম বিশ্লেষণ ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডেটা প্রসেসিংয়ের মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে এখানে চিহ্নিত হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। ডেটাকে মূল্যবান তথ্যে রূপান্তরের জন্য সংগঠনে ব্যবহৃত যান্ত্রিক সরঞ্জাম, প্রোগ্রাম সামগ্রী, লোকবল প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনা করা হয়। সংগঠনের এসব সম্পদ কিভাবে ডেটা গ্রহণ, প্রসেসিং, তথ্য সংরক্ষণ ও ফলাফল প্রদানে সহায়তা করে তা বিশ্লেষণ করা দরকার হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নির্দিষ্ট করার পর এসব বিষয়াদির রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

৩. **সিস্টেম ডিজাইন বা পরিকল্পনা :** সমস্যা সমাধান করার জন্য বর্তমান সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নতুন সিস্টেমের মূল রূপরেখা নির্ণয় করাকে সিস্টেম ডিজাইন বা পরিকল্পনা বলে। সিস্টেম বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর জন্য তৈরি ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতির রিপোর্ট চূড়ান্ত করার পর শুরু হয় সিস্টেম ডিজাইন এর কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো জটিল সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে তার সহজ সমাধান বেরিয়ে আসে।

৪. **সফটওয়্যার উন্নয়ন :** সিস্টেম ডিজাইন রিপোর্ট তৈরি করার পর শুরু হয় সফটওয়্যার উন্নয়ন অংশের কাজ। এ অংশে সব প্রোগ্রাম তৈরি এবং তার পরীক্ষা করার কাজ শেষ করতে হয়। এছাড়া প্রোগ্রামগুলো ব্যবহারের ধারাবাহিকতাও এ ধাপে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

৫. **সিস্টেম বাস্তবায়ন :** সিস্টেম বাস্তবায়নের এ অংশে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার ও সরঞ্জাম সংগ্রহ পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও পরীক্ষণ, ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণ প্রভৃতি কাজ করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পদ্ধতি পরিচালনার উপযুক্ত জনবল তৈরি করার কাজও এ অংশে করা হয়। এছাড়াও পুরানো বা বিদ্যমান পদ্ধতির জনশক্তি, নিয়মনীতি, যন্ত্রপাতি, ইনপুট-আউটপুট তথ্যের প্রকৃতি ও গঠন এবং ডেটাবেস প্রভৃতিকে নতুন সিস্টেমের উপযুক্ত করে পরিবর্তন করতে হয়।

৬. **সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ :** প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা উন্নয়নের জন্য সিস্টেমের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয়। সিস্টেমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিকমতো বাস্তবায়িত হলো কিনা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয়।

০ প্রশ্ন-২০. সিস্টেম বিশ্লেষণের বিভিন্ন টুলসগুলো বর্ণনা করুন।

উত্তর : সুসংহতভাবে সিস্টেম বিশ্লেষণ করার জন্য কতগুলো টুলস (Tools) আছে। যথা–

১. **ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম (Data flow diagram) :** সিস্টেম বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ হলো ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম বা DFD তৈরি করা। ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামের সাহায্যে সিস্টেমের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো এবং এদের পরিবর্তনসমূহ চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। একে 'বাবল চার্ট'ও বলা হয়। কারণ কতগুলো 'বাবল' লাইন দ্বারা যুক্ত করে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রাম তৈরি করা হয়। বাবলগুলো সিস্টেম ডেটার পরিবর্তনসমূহ এবং লাইনগুলো ডেটার ফ্লো প্রকাশ করে।

২. **ডেটা ডিকশনারি (Data dictionary) :** ডেটা ডিকশনারি হলো সুসংহত গুদাম বা ভাণ্ডার যেখানে ডেটা ফ্লো ডায়াগ্রামের সব ডেটা উপাদান ও ডেটা স্ট্রাকচারের ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা থাকে। ডেটা ডিকশনারিতে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় থাকে। যথা–

ক. ডেটা উপাদান;

খ. ডেটা স্ট্রাকচার এবং

গ. ডেটা ফ্লো ও ডেটা স্টোর।

ডেটাবেস তৈরি করার ক্ষেত্রেও ডেটা ডিকশনারি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৩. **স্ট্রাকচার্ড ইংলিশ (Structured English) :** স্ট্রাকচার্ড ইংলিশ স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিংয়ের মতো কাজের নির্দেশগুলোকে নির্দেশমূলক বাক্য ও লজিক্যাল কনস্ট্রাকশনের (IF, ELSE, END IF) মাধ্যমে প্রকাশ করে। স্ট্রাকচার্ড ইংলিশের (IF, THEN, ELSE ইত্যাদি) মাধ্যমে সাধারণত সিদ্ধান্ত গঠন করা হয়।

৪. **ডিসিশন ট্রি (Decision Tree) :** ডিসিশন ট্রি এমন একটি টুল যার মাধ্যমে সিস্টেম অ্যানালিস্ট খুব সহজেই সিস্টেম পলিসির যুক্তি (Logic) গুলো উপস্থাপন করে থাকেন। ডিসিশন ট্রিতে অনেকগুলো ব্রাঞ্চ (Branch) থাকে যা বিকল্প যুক্তি প্রকাশ করে।

৫. **ডিসিশন টেবিল (Decision Table) :** ডিসিশন টেবিলে কোনো সমস্যার বর্ণনা ও ক্রিয়াকলাপ একত্রে দেখানো হয়। এটা কোনো সমস্যার শর্ত (Condition) ও ক্রিয়াকলাপের (Action) মধ্যে সম্পর্ক প্রকাশ করে।

ডিসিশন টেবিলের তিনটি অংশ থাকে, যথা :

১. শর্ত বা কন্ডিশন (Conditions);

২. ক্রিয়া বা অ্যাকশন (Actions) ও

৩. নিয়ম বা রুল (Rules)।

○ প্রশ্ন-২১. সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান কাজগুলো কি?

উত্তর : সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান কাজগুলো নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায় :

ক. সিস্টেমের হার্ডওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ : সিস্টেমে ব্যবহৃত বেশির ভাগ যন্ত্রপাতিই ইলেকট্রোনিক, কাজেই বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট, হাই ভোল্টেজ বা লো ভোল্টেজের কারণে যাতে কোনো যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাছাড়া ধুলাবালি, তরল পদার্থ, আর্দ্রতা বা শুষ্কতা ইত্যাদি থেকেও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

খ. সিস্টেমের সফটওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ : সিস্টেমে রেডিমেড সফটওয়্যার ও ডেভেলপ্ট সফওয়্যার ব্যবহৃত হয়। ডেভেলপ্ট সফটওয়্যারের সোর্স কোডের হার্ডকপি ও সফটকপি সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। কোনো কারণে ইন্সটল করা সফটওয়্যারের ক্ষতি হলে পুনরায় সোর্সকোড থেকে ইন্সটল করা যায়। তাছাড়া রেডিমেড সফটওয়্যারেরও কমপক্ষে একটি কপি সিরিয়াল নম্বর বা কীসহ সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। ভাইরাস কম্পিউটার সিস্টেমকে আক্রান্ত করে সিস্টেম বিকল করে দিতে পারে। কাজেই ভাইরাসের ব্যাপারে সবসময়ই সচেতন থাকতে হবে। সর্বশেষ ভার্সনের এন্টি ভাইরাস প্রোগ্রাম সংগ্রহ করে বা তৈরি করে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। ভাইরাস প্রতিষেধকের চেয়ে প্রতিরোধ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই ভাইরাস যাতে আক্রমণ করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

গ. সিস্টেমের ডকুমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ : সিস্টেমের ম্যানুয়েল, ডেভেলপ্ট সফটওয়্যারের মেনুয়েল, রেডিমেড সফটওয়্যারের ম্যানুয়েলসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট ও সোর্স কোড যত্নসহকারে সংরক্ষণ করতে হবে।

○ প্রশ্ন-২২. এক্সপার্ট সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা কি?

উত্তর : এক্সপার্ট সিস্টেম এমন একটি সফটওয়্যার যার মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে কোনো জটিল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কাজ করা যায়। এ সিস্টেম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিতে কাজ করে। বর্তমানে মানুষের দক্ষতাকে সম্পূর্ণরূপে এক্সপার্ট সিস্টেমে রূপান্তরের চেষ্টা চলছে।

এ সিস্টেমের গুরুত্ব আজকের সভ্যতার গতি পাল্টে দিচ্ছে। এ সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা গড়ে উঠেছে মূলত দুটো চাহিদার ওপর নির্ভর করে–

১. মানুষের বিকল্প হিসেবে কাজ করার জন্য এর উন্নয়ন করা হচ্ছে।
২. জটিল ও সময়বহুল কাজ, ঝুঁকিপূর্ণ এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ এবং যেসব কাজ মানুষের দক্ষতা ও ডেটাবেসের ওপর নির্ভর করে করা সম্ভব সেসব কাজ এক্সপার্ট সিস্টেমের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

উদাহরণ : জেট বিমান চালনা করা, রোগ নির্ণয়, কোনো ডিভাইসের ত্রুটি সংশোধন এবং আর্থিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২৩. রিজার্ভেশন সিস্টেম কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : রিজার্ভেশন সিস্টেম হলো ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে সিট ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে এয়ার লাইন, হোটেল, মোটেল ও ট্রেনের সিট রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্য এয়ার লাইনের অফিস, হোটেল, মোটেল ও ট্রাভেল এজেন্টের অফিসে কম্পিউটার টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ–যে কোনো বিমান অফিসে কম্পিউটারের মেমরিতে বিমান কোম্পানির উড্ডয়ন ও আসন সম্পর্কিত সব তথ্য থাকে। সুতরাং, যাত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়া যায় তার আসন সংরক্ষণ সম্ভব কিনা। এছাড়া বিভিন্ন বিমান কোম্পানির মধ্যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক

যোগাযোগ থাকায় কেউ অন্য দেশে গিয়ে সেখানকার বিমানে আসন পাবেন কিনা তাও বলে দেয়া সম্ভব। এভাবে ট্রেনে, বাসে কিংবা হোটেলেও আসন সংরক্ষণ করা যায়। এ পদ্ধতি মানুষের সময়, অর্থ ও শ্রমের অপচয় কমিয়ে দিয়েছে এবং যোগাযোগ দ্রুত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের SABRE সিস্টেম বিমানের সিট রিজার্ভেশনের জন্য ব্যবহৃত একটি পদ্ধতি।

○ প্রশ্ন-২৪. ভয়েস প্রসেসিং (Voice Processing) কি?

উত্তর : ভয়েস প্রসেসিং হলো কণ্ঠস্বর থেকে সৃষ্ট ডেটা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং প্রয়োজনে তা অন্য স্থানে প্রেরণ। এ পদ্ধতিকে ভয়েস মেইলও বলা হয়, যা মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন এক্সচেঞ্জ বিশেষ। কণ্ঠস্বর সংরক্ষণ ও প্রেরণ পদ্ধতি অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, যা বর্তমানে অফিসের একস্থান থেকে অন্যস্থানে ভয়েস স্থানান্তরের জন্য টেলিফোনের বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এতে গ্রাহক প্রান্তে একটি মেইলবক্স থাকে। কোনো প্রেরক যখন কোনো টেলিফোন করেন, তখন ভয়েস অ্যানালগ সিগন্যাল থেকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত হয়। পরে এ সংবাদ গিয়ে ভয়েস মেইলবক্সে জমা থাকে। অবসর সময়ে কিংবা প্রয়োজন হলে যখন গ্রাহক ভয়েস মেইলবক্সে ডায়াল করেন তখন সংবাদটি ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তরিত হয়। এভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সংবাদ প্রেরিত হয় এবং এ পুরো প্রক্রিয়াকে বলে ভয়েস প্রসেসিং।

খ

ডেটাবেজ ও ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
Database and Database Management Systems

○ প্রশ্ন-২৫. ডেটাবেজ বলতে কি বুঝেন? কিভাবে ডেটাবেজ গড়ে উঠে?
অথবা, ডেটাবেজ এর ধারণা দিন। ডেটাবেজ এর structure বা সংগঠন আলোচনা করুন।

উত্তর : ডেটাবেজ : ডেটাবেজ হলো এক বা একাধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিছু ডেটা নিয়ে গঠিত টেবিল বা ফাইল। অর্থাৎ কম্পিউটারে বিভিন্ন ডেটাকে সম্পর্কের মাধ্যমে অর্থবহ আকারে টেবিল ও ফাইলে সাজিয়ে উপস্থাপনা করাকেই ডেটাবেজ বলে।

ডেটাবেজ এর সংগঠন বা Structure : ডেটাবেজের সংগঠন বা Structure তৈরির জন্য প্রতিটি ডেটা টেবিলে অন্তর্ভুক্ত করার একটি পদ্ধতি রয়েছে। সাধারণত কোনো একটি ফিল্ডের উপর ভিত্তি করে ফাইলের রেকর্ড সনাক্তকরণ, অনুসন্ধান, সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি কাজগুলো করা হয়। এই ফিল্ডগুলোকে কী (Key) ফিল্ড বলা হয়। এক বা একাধিক অবস্থা বা ঘটনা বর্ণনার জন্য কী ফিল্ড ব্যবহার করা হয়। যেমন– কোনো শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রীদের রোল নম্বরের ভিত্তিতে সনাক্তকরণ, ফলাফল ঘোষণা, ভর্তি করা, বৃত্তি দেয়া ইত্যাদি, তাই রোল নম্বরকে কী ফিল্ড বলা যায়।

প্রাইমারি কী (Primary Key) : কোনো ফাইলে সাধারণত একাধিক ফিল্ড থাকে। এই ফিল্ডগুলোর মধ্যে কমপক্ষে একটি ফিল্ড থাকবে যার ডেটাগুলো অদ্বিতীয় (unique) হবে, অর্থাৎ প্রতিটি ডেটা ভিন্ন ভিন্ন হবে। যেমন– ব্যাংকের একাউন্ট হোল্ডারদের একাউন্ট নম্বর। কোনো একটি ব্যাংকে একই নম্বরের কেবলমাত্র একটিই একাউন্ট থাকতে পারে। তাই কোনো ফাইলে যে ফিল্ডের ডেটাগুলো অদ্বিতীয় (unique) হবে তাকে প্রাইমারি কী বলা হয়। প্রাইমারি কী এর মাধ্যমে একাধিক ফাইলের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে রিলেশনাল ডেটাবেজ তৈরি করা হয়।

কম্পোজিট প্রাইমারি কী (Composite primary key) : অনেক ক্ষেত্রে দুটি ফিল্ডের সমন্বয়ে প্রাইমারি কী গঠন করা হয়ে থাকে। এ ধরনের প্রাইমারি কী কে কম্পোজিট প্রাইমারি কী বলা হয়।

ফরেন কী (Foreign key) : রিলেশনাল টেবিলের ক্ষেত্রে কোনো একটি টেবিলের প্রাইমারি কী যদি অন্য টেবিলে ব্যবহৃত হয় তখন ঐ কী-কে ফরেন কী বলে।

○ প্রশ্ন-২৬. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কী? ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্টের প্রাথমিক কাজগুলো কী?

উত্তর : ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম : ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বা DBMS হলো এমন একটি সফটওয়্যার যেটা ডেটাবেজ তৈরি, পরিবর্তন, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের সফটওয়্যারের উদাহরণ হল– Oracle, MySQL, Microsoft Access, DB2 ইত্যাদি। ডেটাবেজকে সাধারণ থেকে শুরু করে প্রফেশনাল সকল শ্রেণির ব্যবহারকারীই ব্যবহার করতে পারে। ব্যবহারকারী একই সাথে ডেটাবেজকে অনলাইন টার্মিনাল বা এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের মাধ্যমে নিজস্ব কম্পিউটারে ব্যবহার করতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেজ তৈরির পর ঐ ডেটাবেজটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করাই হচ্ছে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রধান কাজ। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উদ্দেশ্য হল ডেটাবেজকে সব সময় সুন্দর ও নিখুঁতভাবে সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত রাখা। যাতে ব্যবহারকারী যে কোনো সময় তাঁর প্রয়োজন অনুযায়ী সর্বশেষ তথ্য লাভ করতে পারে।

চিত্র : ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম।

ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের কাজ :

১. প্রয়োজন অনুযায়ী ডেটাবেজ তৈরি করা;
২. নতুন ডেটা/রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত করা;
৩. ডেটার বানান ও সংখ্যার ভুল অনুসন্ধান এবং সংশোধন;
৪. অপ্রয়োজনীয় ডেটা/রেকর্ড বাদ দেয়া অর্থাৎ মুছে ফেলা;
৫. চূড়ান্ত সম্পাদনার কাজ সম্পন্ন করা;
৬. প্রয়োজনীয় ডেটা/রেকর্ড খুঁজে বের করা ও ব্যবহার করা;
৭. প্রয়োজন অনুযায়ী পুরো ডেটাবেজকে অথবা আংশিক ডেটাবেজকে যে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে অক্ষরভিত্তিক, সংখ্যানুক্রমিক, পদবি বা উপাধি ভিত্তিক বা অন্য কোনোভাবে বিন্যাস্ত করা তথা সাজিয়ে উপস্থাপন করা;
৮. প্রয়োজনীয় ডেটাবেজের রিপোর্ট প্রিন্ট নেয়া;
৯. ডেটার নিরাপত্তা বিধান করা;
১০. ডেটা সংরক্ষণ করা;
১১. ব্যবহারকারীদের ডেটা ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

○ প্রশ্ন-২৭. এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল কী? এনটিটি রিলেশনশীপ ডায়াগ্রামের ব্যবহার বর্ণনা করুন।

উত্তর : এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল : ডেটাবেজ এ যে কোনো উপাদান সন্নিবেশ করার জন্য যে একক ডেটা উপাদান চিন্তা করা হয় তাকে এনটিটি (Entity) বলা হয়। কোনো একটি এনটিটি সেটের যে প্রোপার্টিজগুলো ঐ এনটিটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে তাকে এট্রিবিউট (Attribute) বলা হয়। একটি এনটিটি সেটে বিভিন্ন প্রকার এনটিটি থাকে। প্রতিটি এনটিটির কিছু বৈশিষ্ট্য তথা এট্রিবিউট আছে। আবার একই এট্রিবিউটের একাধিক এনটিটি থাকতে পারে। এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল হলো একটি এনটিটি সেটের বিভিন্ন এনটিটিগুলোর মধ্যকার সম্পর্ক ডায়াগ্রাম ব্যবহার করে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার একটি পদ্ধতি। এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল ডেটাবেজ ডিজাইনে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত লজিক্যাল ডেটাবেজ মডেল ডিজাইনে এনটিটি রিলেশনশীপ মডেল ব্যবহার করা হয়।

এনটিটি রিলেশনশীপ ডায়াগ্রাম : ডেটাবেজের লজিক্যাল গঠনকে বা সম্পর্ককে ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যেও দেখানো সম্ভব যাকে এনটিটি রিলেশনশীপ ডায়াগ্রাম বলে। ডেটাবেজ সম্পর্ককে ব্লক ডায়াগ্রামের সাহায্যে প্রকাশ করার জন্য কতকগুলো সাধারণ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয় এবং কতকগুলো প্রতীক ব্যবহার করা যায়। এনটিটি রিলেশনশীপ মডেলে বহুল ব্যবহৃত কতকগুলো সাধারণ প্রতীকের চিত্র নিচে দেখানো হলো :

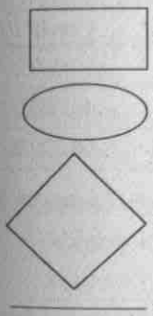

ধরা যাক, Organization-এর এনটিটি সেটে Employee এবং Dept নামে দু'টি এনটিটি রয়েছে। ছাত্র Employee এনটিটিতে Emp Id, Name ও Address এই তিনটি এট্রিবিউট আছে। Dept এনটিটির আওতায় Emp Id, Dept name ও Dept location এই তিনটি এট্রিবিউট আছে। এখন এট্রিবিউটসমূহের উপর ভিত্তি করে একটি এনটিটি রিলেশনশীপ ছক তৈরি করা যায়।

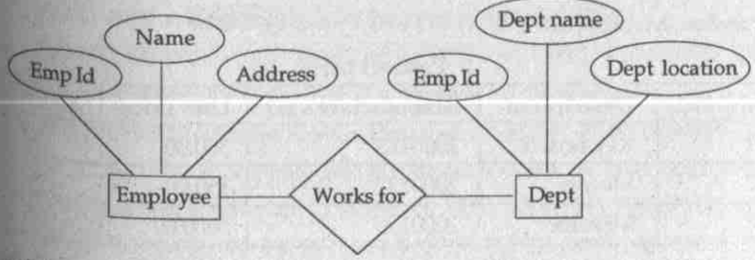

উভয় এনটিটি সেটের মধ্যে Emp Id একটি কমন এট্রিবিউট। এ কমন এট্রিবিউটের উপর ভিত্তি করে এনটিটি সেটদ্বয়ের মধ্যে রিলেশন প্রতিষ্ঠা করা যায়।

○ প্রশ্ন-২৮. রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল বর্ণনা কর।

অথবা, রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর : রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল হলো একাধিক টেবিলের সমন্বয়ে গঠিত মডেল, যা ডেটা ও ডেটার মধ্যে সম্পর্ককে প্রকাশ করে। প্রত্যেকটি টেবিলে একাধিক কলাম ও রো বা রেকর্ড থাকে। প্রত্যেকটি কলামের আবার একটি নাম থাকে যা ফিল্ড নামে পরিচিত। ডেটাবেজের টেবিলগুলো প্রাইমারি কী ও ফরেন কীর মাধ্যমে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে বিধায় এই মডেলকে রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল বলা হয়।

এখানে রিলেশনাল ডেটাবেজের একটি উদাহরণ দেয়া হলো। সুবিধার জন্য এখানে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত চারটি table ব্যবহার করা হলো :

১. Customer table : এখানে প্রতিটি customer সম্পর্কে তথ্য থাকে। যেমন– Customer Id, Customer name, Credit limit, employee Id (যিনি এই customer এর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেন) এই ফিল্ডগুলো থাকে। এই টেবিলের প্রাইমারি কী হলো Customer Id।

Customer Table

Customer ID	Customer Name	Employee ID	Credit limit
1112	CSM Network	102	30,000.00
2321	Specturm Net	105	40,000.00
1008	Lisbone	207	50,000.00

২. Employee table : এখানে Employee Id, Name, Hire date, Manager এবং sales volume সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। এই টেবিলের প্রাইমারি কী হলো Employee Id.

Employee Table

Employee Id	Name	Title	Hire Date	Manager	Sales Volume
105	Md. Ruhul Kuddus	SALES REP	02.12.98	205	345,618.00
107	Golam Ali	SALES REP	08.12.89	206	123,681.00
101	Hemel Khan	SALES REP	12.10.96	207	224,378.00

৩. Product table : এখানে প্রতিটি Product সম্পর্কে তথ্য রয়েছে। যেমন : Product ID, Description, Manufacture's Id, Unit Price, Qty stock ইত্যাদি।

Product table

Product Id	Description	Manufacture's ID	Unit Price	Qty Stock
1001	Key board	2000123	300.00	90
1002	Mouse	2000127	150.00	80
1003	Monitor	2000125	6000.00	25

৪. Sales table : এখানে Sales সম্পর্কিত তথ্য যেমন : Invoice ID, sales date, customer Id, Product Id, Employee Id, Salesperson Id ইত্যাদি রয়েছে। এই টেবিলের প্রাইমারি কী হলো Invoice ID।

Sales table

Invoice Id	Sales date	Customer Id	Product Id	Employee Id	Qty	Amount
112691	08.03.15	2117	1001	105	7	2100.00
112692	08.03.15	2115	1002	107	35	5250.00
112693	09.03.15	2113	1003	102	8	4800.00

উপরের ডেটা টেবিলগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রতিটি টেবিল একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ একটি টেবিলের সাথে অন্য টেবিলের সম্পর্ক আছে। এটাই হলো রিলেশনাল ডেটাবেজ মডেল।

○ প্রশ্ন-২৯. বিভিন্ন প্রকার ডেটাবেজ মডেলের নাম লিখুন। ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুবিধাগুলো কী?

উত্তর : ডেটা সংরক্ষণ ও ব্যবহারের পদ্ধতিকে দক্ষভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার ডেটাবেজ মডেলের ধারণা প্রতিষ্ঠিত আছে। এগুলো হলো :

১. লিস্ট স্ট্রাকচার মডেল (List structure model)
২. হায়ারার্কিক্যাল মডেল (Hierarchical Model)
৩. নেটওয়ার্ক মডেল (Network Model)
৪. রিলেশনাল মডেল (Relational Model)
৫. মাল্টিডাইমেনশনাল মডেল (Multidimensional Model)
৬. অবজেক্ট-ওরিয়েন্টেড মডেল (Object-Oriented Model)

রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সুবিধা : রিলেশনাল ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহারের সুবিধা হলো :

১. ডেটা খুঁজে বের করার সুবিধা বা ডেটা কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Query Language-DQL);
২. ডেটা নির্দিষ্ট করে দেয়ার সুবিধা বা ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Defination Langauge–DDL);
৩. ডেটা সাজানোর সুবিধা বা ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Manipulation Language);
৪. ডেটা নিয়ন্ত্রণের সুবিধা বা ডেটা কন্ট্রোল ল্যাঙ্গুয়েজ (Data Control Language–DCL) ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৩০. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

অথবা, ক্লায়েন্ট সার্ভার ও ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে ডেটা ডিস্ট্রিবিউশনের উপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১. ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ ও ২. ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ।

ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ (Client-Server Database) : ক্লায়েন্ট সার্ভার নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশন দুই জায়গায়ই ডেটা প্রসেসিং এর কাজ করা হয় অর্থাৎ সার্ভার এবং ওয়ার্ক স্টেশন উভয়ই কাজ করতে পারে ফলে প্রয়োজনবোধে নির্দিষ্ট কাজের কিছু অংশ সার্ভার এবং কিছু অংশ ওয়ার্ক স্টেশনে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। ওয়ার্ক স্টেশন সার্ভারের রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে এবং সার্ভার ওয়ার্ক স্টেশনকে প্রক্রিয়াকরণের কাজে সহায়তা করতে পারে। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

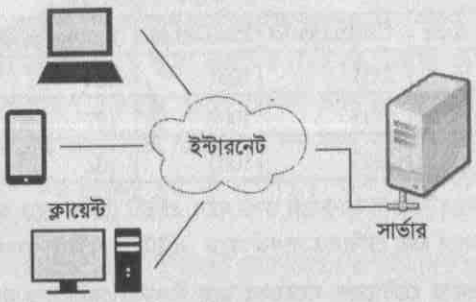

চিত্র : ক্লায়েন্ট-সার্ভার সাধারণ সম্পর্ক

ক্লায়েন্ট সার্ভারে কোনো সার্ভিস পাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট (Request) পাঠায়; সার্ভার ক্লায়েন্টের অনুরোধ ও অন্যান্য নিয়ম অনুসারে ডেটা সার্ভিস প্রদান করে।

ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ (Distributed Database) : একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ সিস্টেমে DBMS এবং ডেটাগুলো একটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় রাখা হয় এবং ডেটাগুলোর নিয়ন্ত্রণ ও প্রসেসিং ঐ ঠিকানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একে সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেজ বা কেন্দ্রীয়ভূত ডেটাবেজও বলে।

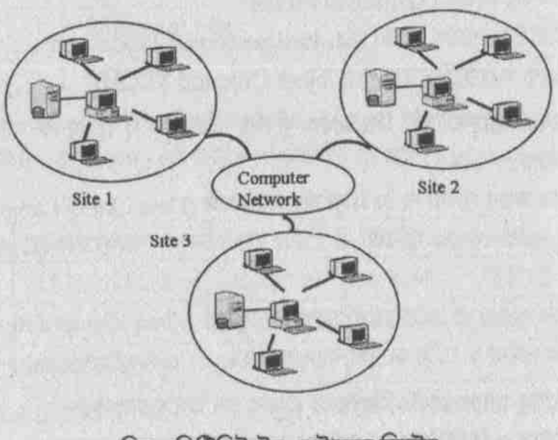

চিত্র : ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ সিস্টেম

ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ হচ্ছে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী সার্ভারের সঙ্গে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্পর্কযুক্ত একাধিক ওয়ার্কস্টেশন বা কম্পিউটার সিস্টেম। এ পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ওয়ার্ক স্টেশনে স্বতন্ত্রভাবে ডেটাবেজ তৈরি, সংশোধন, সম্পাদনা ইত্যাদির কাজ করা হয় এবং সার্ভারে রক্ষিত কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ ওয়ার্কস্টেশনগুলোর ডেটাবেজের সর্বশেষ অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত বা আপডেট (Update) হয়। সার্ভারের কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ আবার ওয়ার্কস্টেশনগুলোর ডেটাবেজের ডেটা পাঠ, ডেটা বর্ণনার ভাষা ইত্যাদি পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারে। এভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ পদ্ধতিতে সার্ভারের কেন্দ্রীয় ডেটাবেজের মাধ্যমে ওয়ার্ক স্টেশনগুলোর ডেটাবেজ থেকে সর্বশেষ তথ্য সংগ্রহ এবং ওয়ার্ক স্টেশনের ডেটাবেজগুলোর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করা যায়।

গ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ও নেটওয়ার্কিং ডিভাইস
Computer Network & Networking Device

○ প্রশ্ন-৩১. নেটওয়ার্কের মৌলিক উপাদানসমূহ কি?

অথবা, নেটওয়ার্কিং এর জন্য কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : কম্পিউটার নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য যেসব যন্ত্রপাতি নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়। সেগুলোকে একত্রে কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর মৌলিক উপাদান বলে। নিচে এসব মৌলিক উপাদান প্রসঙ্গে আলোচনা করা হলো :

নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা NIC (Network Interface Card) : কম্পিউটারকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করার জন্য একটি বিশেষ সার্কিটের প্রয়োজন হয়। এই সার্কিট যে প্রিন্টেড কার্ডের উপর সজ্জিত করা হয় তাকেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বা সংক্ষেপে NIC বলে।

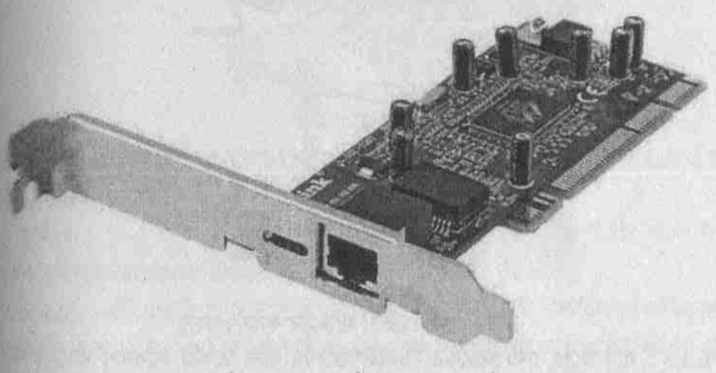

চিত্র : নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড

মাদারবোর্ডের বিভিন্ন আকৃতির স্লটের মধ্যে কার্ডগুলো বসাতে হয়। এই কার্ডগুলো কম্পিউটার অনুযায়ী বিভিন্ন বিটের ও আকৃতির হয়ে থাকে। মূলত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় যুক্ত হওয়ার প্রাথমিক উপকরণই হলো এই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড।

মডেম (Modem) : 'Modulation' শব্দের 'Mo' এবং 'Demodulation' শব্দের 'Dem' নিয়ে Modem শব্দটি গঠিত হয়েছে। নেটওয়ার্কিং-এ তথ্যাবলি আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে মডেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যখন কম্পিউটার হতে ইনফরমেশন মডেমে যায় তখন এটি ইনফরমেশনকে ডিজিটাল বিট হতে এনালগ সিগন্যালে রূপান্তর করে। আবার যখন রূপান্তরিত এনালগ সিগন্যাল অপর প্রান্তে অন্য কম্পিউটারে যুক্ত মডেমে পৌঁছে তখন তা আবার এনালগ সিগন্যাল কম্পিউটারের বোধগম্য ডিজিটাল বিটসে রূপান্তর করা হয়। এভাবেই দু'টি কম্পিউটারের মধ্যে মডেমের সাহায্যে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। মডেল টেলিফোন লাইন, কো-এক্সিয়াল কেবল, ফাইবার অপটিকস ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করে।

চিত্র : মডেম

মডেমের কাজ/ব্যবহার : মডেম টেলিফোন লাইন কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, ফাইবার অপটিকস ইত্যাদির মাধ্যমে ডেটা আদান-প্রদান করে। কোনো কম্পিউটার থেকে আসা তথ্যকে মডেম ডিজিটাল বিট হতে অ্যানালগ সিগন্যালে রূপান্তরিত করে। এই কাজটিকে মডুলেশন বলে। আবার এনালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করার কাজকে ডি-মডুলেশন বলে। সিগন্যালকে মডুলেশন ও ডিমডুলেশন করাই হলো মডেমের কাজ।

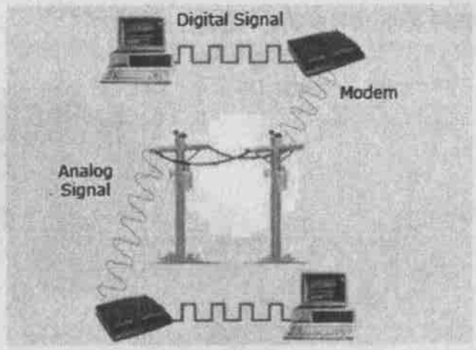

চিত্র : ডেটা প্রেরণে মডেমের কাজ/ব্যবহার

হাব (Hub) : হাব হলো নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর জন্য একটি সাধারণ কানেকশন পয়েন্ট। LAN-এর সিগমেন্টগুলো সংযোগ দেয়ার জন্য সাধারণভাবে হাব ব্যবহার করা হয়। হাবের মধ্যে কতকগুলো পোর্ট থাকে। স্টার টপোলজিতে হাব হলো মূল নেটওয়ার্কিং ডিভাইস।

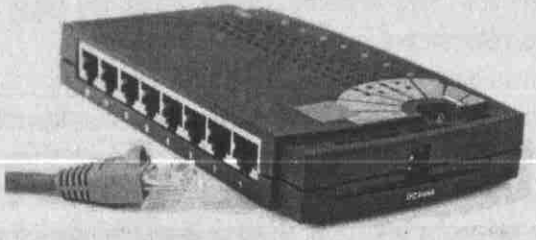

চিত্র : হাব

হাবের সুবিধা : ১. দাম কম; ২. বিভিন্ন মিডিয়ামকে নেটওয়ার্কে যুক্ত করতে পারে।

হাবের অসুবিধা : ১. নেটওয়ার্কে ট্রাফিক বৃদ্ধি পায়; ২. ডেটা আদান-প্রদানে বাধার সম্ভাবনা থাকে; ৩. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয় না।

সুইচ (Switch) : সুইচ হলো একপ্রকার নেটওয়ার্কিং সংযোগ ডিভাইস যা মিডিয়া সিগমেন্টগুলোকে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থানে এনে একত্রিত করে। হাবের সাথে সুইচের পার্থক্য হলো সুইচ প্রেরক প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত ডেটাকে প্রাপক কম্পিউটারের সুনির্দিষ্ট পোর্টটিতে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু হাব ঐ ডেটা সিগন্যাল প্রাপক কম্পিউটারের সবগুলো পোর্টেই পাঠিয়ে দেয়।

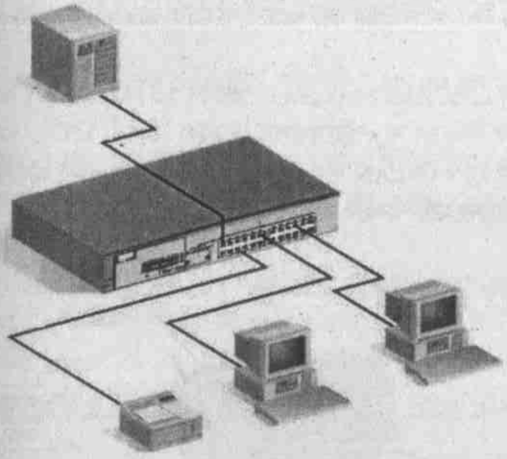

চিত্র : সুইচ

সুইচের সুবিধা : ১. ডেটা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়। ২. ভার্চুয়াল LAN ব্যবহার করে ব্রডকাস্ট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সুইচের অসুবিধা : ১. হাবের তুলনায় মূল্য কিছুটা বেশি; ২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব নয়; ৩. কনফিগারেশন তুলনামূলকভাবে জটিল।

রাউটার (Router) : এটি একটি বুদ্ধিমান ইন্টারনেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস যা লজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল এড্রেস ব্যবহার করে দুই বা ততোধিক নেটওয়ার্ক সিগমেন্টের মধ্যে ডেটা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করে। রাউটার উৎস কম্পিউটার থেকে গন্তব্য কম্পিউটারে ডেটা প্যাকেট পৌঁছে দেয়। রাউটার বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন– ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।

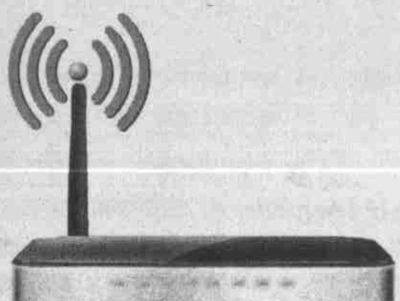

চিত্র : রাউটার

রাউটারের সুবিধা : ১. ডেটা ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে বাধার সম্ভাবনা কমায়; ২. ডেটা ফিল্টারিং সম্ভব হয়; ৩. বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক। যেমন– ইথারনেট, টোকেন, রিং ইত্যাদিকে সংযুক্ত করতে পারে।

রাউটারের অসুবিধা : ১. রাউটারের দাম বেশি; ২. রাউটার একই প্রোটোকল নেটওয়ার্ক ছাড়া সংযুক্ত হতে পারে না; ৩. কনফিগারেশন তুলনামূলকভাবে জটিল; ৪. ধীর গতির।

○ প্রশ্ন-৩২. LAN কি? কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত তারবিহীন প্রযুক্তির নাম কি? এ প্রযুক্তির মূল অসুবিধা কি?

উত্তর : LAN হলো Local Area Network। সাধারণত ১০ কি.মি. বা তার কম এলাকার মধ্যে বিস্তৃত কয়েকটি কম্পিউটার টার্মিনাল বা পেরিফেরালস ডিভাইস (যেমন– প্রিন্টার, স্ক্যানার) সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। একটি LAN সাধারণ একটি প্রতিষ্ঠান যেমন– স্কুল, কলেজ, অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবহার করা হয়।

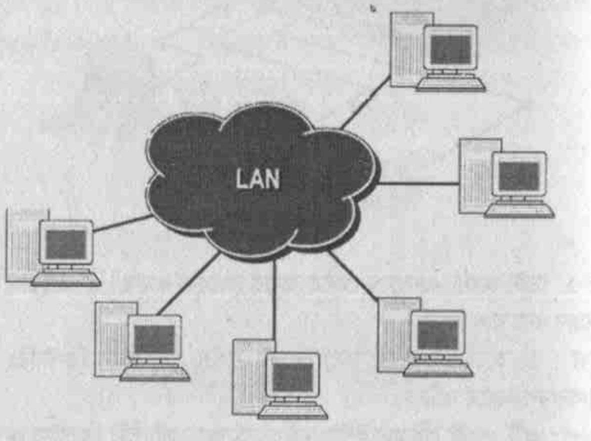

চিত্র : LAN

কম্পিউটারের তারবিহীন প্রযুক্তি : কম্পিউটারের তারবিহীন প্রযুক্তিকে বলা হয় Wireless communication technology। এই প্রযুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : ১. মাইক্রোওয়েভ; ২. রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি; ৩. ওয়াইফাই (Wifi); ৪. ব্লুটুথ; ৫. ওয়াইম্যাক্স ইত্যাদি।

অসুবিধা :

১. তারবিহীন প্রযুক্তি দূরবর্তী স্থানে ডেটা আদান-প্রদানে ধীর গতিসম্পন্ন।

২. আবহাওয়ার উপাদান যেমন– কুয়াশা, ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদির কারণে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হতে পারে।

৩. একাধিক সিগন্যালের মধ্যে ওভারল্যাপিং (overlaping) হয়ে যোগাযোগ বাধাগ্রস্ত হয়।

○ প্রশ্ন-৩৩. Band width কি? Amplifier এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

উত্তর : Bandwidth : Bandwidth হচ্ছে ডেটা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চ্যানেল। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন মাত্রায় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সময় উক্ত চ্যানেলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির ব্যবধান।

Amplifier কে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যুগল বর্তনীর উপর ভিত্তি করে দুইভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যথা– (১) রোধ-ধারক যুগল বিবর্ধক (R-C Coupled Amplifier) ও (২) ট্রান্সফর্মার যুগল বিবর্ধক (Transformer Coupled Amplifier)। আবার কাজের ধরন অনুসারে Amplifier কে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– (১) Class A (২) Class B (৩) Class C ও (৪) Class D।

○ প্রশ্ন-৩৪. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা LAN কি? কয়েকটি LAN এর উদাহরণ দিন। LAN এর উপকারিতা ও প্রয়োগগুলো লিখুন।

উত্তর : সাধারণত ১০ কিমি বা তার কম এরিয়ার মধ্যে বেশ কিছু কম্পিউটার টার্মিনাল বা অন্য কোনো পেরিফেরাল ডিভাইস সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। এর পূর্ণ অভিব্যক্তি হচ্ছে—Local Area Network.

Ethernet Co-axial 10base2 Cable নামে যে কো-অক্সিয়াল ক্যাবলটি বাজারে প্রচলিত আছে তার দ্বারা LAN তৈরি করলে LAN-এর সর্বোচ্চ 185 Meter এবং একটি LAN-এ সর্বোচ্চ চারটি রিপিটার স্টেশন ব্যবহার করা যাবে।

কয়েকটি LAN হলো : পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (PAN), হোম এরিয়া নেটওয়ার্ক (HAN), ক্যাম্পাস নেটওয়ার্ক (Campus Network) প্রভৃতি।

উপকারিতা :

১. প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম ইত্যাদি ডিভাইসগুলোর মধ্যে শেয়ারিং দেয়ার মাধ্যমে যে কোনো ইউজার (User) তার নিজস্ব ওয়ার্কস্টেশন থেকে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে পারে।

২. ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং সুবিধা পাওয়া যায়।

৩. ইলেকট্রনিক মেইলিং সিস্টেমে সুবিধা হয়।

প্রয়োগ : সাধারণত বাড়ি, স্কুল-কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, কম্পিউটার ল্যাবরেটরী, কোনো বড় অফিস বিল্ডিং এবং পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি বিল্ডিং-এ LAN ব্যবহার করা হয়।

ঘ ইন্টারনেট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব
Internet & World Wide Web

○ প্রশ্ন-৩৫. ইন্টারনেট কি? ইন্টারনেটের প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

উত্তর : ইন্টারনেট পৃথিবীর বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এটি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি নেটওয়ার্ক। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) প্রটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রয়োজন–

১. কম্পিউটার, ২. মডেম, ৩. টেলিফোন লাইন, ৪. ইন্টারনেট সংযোগ এবং ৫. সফটওয়্যার।

ইন্টারনেটের প্রকারভেদ :

সাধারণত ব্যবহারকারীগণ দুভাবে ইন্টারনেট গ্রাহক হতে পারেন। যথা–

১. অনলাইন ইন্টারনেট ও ২. অফলাইন ইন্টারনেট।

১. **অনলাইন ইন্টারনেট :** Online Internet হচ্ছে একটি কম্পিউটারে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ রাখা। এর জন্য কম্পিউটারের একটি নির্দিষ্ট IP (Internet Protocol) Address-এর প্রয়োজন পড়ে। অনলাইন ইন্টারনেটে সাধারণত বড় বড় কোম্পানি সংযোগ স্থাপন করে থাকে।

২. **অফলাইন ইন্টারনেট:** ব্যবহারকারীর নিকটবর্তী কোনো ISP (Internet Service Provider)-এর সার্ভারের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করার প্রক্রিয়াই অফলাইট ইন্টারনেট বলে পরিচিত।

০ প্রশ্ন-৩৬. ইন্টারনেট কি? কিভাবে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করা যায়? *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : ইন্টারনেট শব্দটির পূর্ণ অর্থ হলো International Network বা আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। পৃথিবীর সব দেশের যোগাযোগের নেটওয়ার্ক মিলে গড়ে উঠেছে ইন্টারনেট। কাজের পরিধি বিবেচনা করে ইন্টারনেট হলো নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক (Network of Networks)। অসংখ্য LAN, MAN, WAN, ISDN সংযোগ মিলে এই আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে সহজেই যোগাযোগ করা সম্ভব। আরপানেট (ARPANET) নামের একটি মার্কিন সামরিক গবেষণা প্রজেক্ট থেকে ইন্টারনেটের শুরু। স্নায়ুযুদ্ধকালীন ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের একটি গবেষণা প্রজেক্টের অংশ হিসেবে সে দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/ আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) প্রোটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়।

ইন্টারনেট সংযোগ কিভাবে বন্ধ করা যায় :

ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করার জন্য যে কোনো ওয়েব পেইজ ব্রাউজ করার পর নিচের নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নিতে হবে :

১. প্রথমে যে Web Page টি খোলা রয়েছে তা বন্ধ করতে হবে। এজন্য Web page-এর সর্ব উপরের ডানদিকে ক্রস (×) বাটনে ক্লিক করে Web Pageটি বন্ধ করতে হবে। অথবা Web page-এর File Option থেকে Exit বা Close সিলেক্ট করতে হবে। E-mail ওপেন করা থাকলে আগে Sign Out বা Log Out করে নিতে হবে।

২. কম্পিউটার স্ক্রিনের ডানদিকে সবচেয়ে নিচে নেটওয়ার্ক সংযোগের যে আইকনটি রয়েছে তাতে ক্লিক করে Connect to উইন্ডোটি Maximize করতে হবে এবং তারপর Disconnect লেখা বাটনে ক্লিক করে ইন্টারনেট থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

৩. Connect to ডায়ালগ বক্সটি যখন দুটি কম্পিউটারের ছবির মতো হয়ে Minimize হয়ে থাকে তখন ডিসকানেক্ট হতে হলে ঐ ছবিতে ডাবল ক্লিক করতে হবে এবং তারপর Disconnect বাটনে ক্লিক করতে হবে।

০ প্রশ্ন-৩৭. ইন্টারনেট কি? ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করুন। *[৩৩তম ও ২৯তম বিসিএস]*

উত্তর : ইন্টারনেট : INTERNET-এর পূর্ণরূপ International Network বা Interconnected Networks। ইন্টারনেট পৃথিবী বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এটি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি নেটওয়ার্ক।

আরপানেট (ARPANET) দিয়ে ইন্টারনেটের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষামূলক কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত করে। এ নেটওয়ার্কের নাম আরপানেট।

১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/Internet Protocol) প্রোটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ১৯৮৩ সালের আরপানেটে টিসিপি/আইপি প্রোটোকল ব্যবহার শুরু হয়। এরপর ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়।

১৯৮৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন নেটওয়ার্ক (NSFNET) প্রতিষ্ঠার ফলে আরপানেটের প্রভাব কমে যায় এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নেটওয়ার্ক উন্নয়নে শরীক হয়। অবশেষে ১৯৯০ সালে আরপানেটের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় এবং এটি ইন্টারনেট নামে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৯ সালে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান (বা সার্ভিস প্রোভাইডার) চালুর ফলে সকলের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইন্টারনেটের সুবিধাবলি নিচে আলোচনা করা হলো :

। **বিশাল তথ্যসম্ভার :** ইন্টারনেট তথ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। ইন্টারনেট দিয়ে পৃথিবীব্যাপী ছড়ানো-ছিটানো অসংখ্য অনলাইন ডেটাবেস থেকে নানা রকম তথ্য আহরণ সম্ভব। সর্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য এসব ডেটাবেসে সংরক্ষিত আছে জার্নাল, ম্যাগাজিন, পুস্তক, খবরের কাগজ, নানা রকম পণ্যের বিজ্ঞাপন, বিমান, রেল ইত্যাদির সময়সূচি, আবহাওয়ার খবর, খেলার খবর, স্টক রিপোর্ট এবং আরও অনেক কিছু, যা সংক্ষেপে বর্ণনা প্রায় অসম্ভব। অবস্থা এমন যে, যে কোনো প্রকার তথ্যের জন্য ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আর দিন দিন এ তথ্যের সমারোহ বেড়েই চলেছে।

। **ইলেক্ট্রনিক মেইল (e-mail) :** যে কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী তার যে কোনো তথ্য অন্য কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারীকে পাঠাতে পারে। ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য পাঠানোর কিছু সুবিধা রয়েছে। প্রথমত এর দ্রুতগতি, এটি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে তথ্য পৌছে দিতে পারে এবং তথ্য গ্রহীতা সে তথ্য গ্রহণ করতে পারে।

। **গবেষণা (Research) :** অনেক সময় একজন গবেষকের এমন কোনো তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে যা খুঁজে পাওয়া তার জন্য হতে পারে অত্যন্ত জটিল, সময়সাপেক্ষ ও কষ্টকর। কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে এ ব্যাপারটি অতি সহজে মাউস ক্লিক করে উদ্ধার করা যায়।

। **সফটওয়্যার :** ইন্টারনেট থেকে অজস্র সফটওয়্যার ডাউন-লোড করা যায় বিনা খরচে।

- **অনলাইন কেনাকাটা :** ইন্টারনেট এখন ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিশাল বিপণি। একজন ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নানা ধরনের পণ্যদ্রব্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে অতি সহজে কেনা-কাটা করতে পারেন। অনলাইনের এ বাণিজ্যকে E-commerce বলে।

এছাড়া ইন্টারনেটে অনেক ধরনের সেবা পাওয়া যায়। সেগুলো হলো Telnet, FTP, IRC, Video Conferencing, Iphone, Usenet, Archie, Gofer, Veronica & WAIS-সহ আরো অনেক কিছু। তাছাড়াও নিত্যনতুন উদ্ভাবনের ফলে ইন্টারনেটের সুযোগ সুবিধা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের অসুবিধা :

১. ইন্টারনেট ব্যবহারের কারণে অনেক সময় ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।
২. ইন্টারনেট ব্যবহারের ফলে ঘরে বসে কাজ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে জনগণের মধ্যে অলসতা ও পরিশ্রমবিমুখতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
৩. অনলাইন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় অনেক সময় হ্যাকারদের সৃষ্ট সমস্যা ও অন্য কারণে গুরুত্বপূর্ণ দলিল, প্রয়োজনীয় উপাত্ত বিনষ্ট হয়ে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করছে।
৪. ব্যবহারকারীর নানা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল, ডেটা অবাঞ্ছিত ভাইরাস প্রোগ্রামে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।
৫. উন্মুক্ত যোগাযোগের কারণে কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের মাঝে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দিচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৩৮. ই-মেইল কি? এটা কিভাবে কাজ করে? *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : ইলেকট্রনিক মেইল বা সংক্ষেপে ই-মেইল (E-mail) হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ব্যবস্থা। এ যন্ত্রটি নীতিগতভাবে ফ্যাক্স যন্ত্রের মতো কাজ করে। এটি কম্পিউটার, মডেম, মডুলেটর এবং স্যাটেলাইটের একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। ই-মেইল দ্বারা স্বল্প খরচে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করা যায় এবং দীর্ঘ বার্তা প্রেরণে ই-মেইল খুবই সুবিধাজনক।

○ প্রশ্ন-৩৯. কিভাবে ই-মেইল চেক করা হয়? কিভাবে ই-মেইল পড়া যাবে এবং কিভাবে ই-মেইল মোছা যাবে? *[৩৪তম ও ৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : ই-মেইল চেক করার নিয়ম : ই-মেইল এসেছে কিনা তা চেক করার নিয়মগুলো নিচে ধাপে ধাপে উপস্থাপন করা হলো :

১. ই-মেইল চেক করার জন্য প্রথমেই ইন্টারনেট সংযোগ চালু করতে হবে।
২. Internet Explorer অথবা Mozilla Firefox কিংবা অন্য কোনো Web Browser ব্যবহার করে ইন্টারনেট এড্রেসে E-mail সার্ভারের ঠিকানা লিখে সেই E-mail সার্ভারের Login page এ যেতে হবে।
৩. Login page এ ই-মেইল ব্যবহারকারী নিজের Email Account ID এবং Passward টাইপ করে Login বাটনে ক্লিক করলে Mail Server এ প্রবেশ করতে পারবেন।
৪. Mail Server এ নিজের E-mail Page এ যেসব Mail এসেছে সেগুলো তালিকা আকারে সাজানো থাকে। এই Mail তালিকা থেকে যে কোনো ই-মেইলের উপর ক্লিক করে সংশ্লিষ্ট মেইলটি চেক করা যাবে।

ই-মেইল পড়ার নিয়ম : ই-মেইল পড়ার জন্য Mail Server এ Login করে Inbox এ ক্লিক করলে আগত E-mail গুলোর একটি তালিকা প্রদর্শিত হয়। এখন এসব Mail-এর তালিকা থেকে যে কোনো একটি মেইলের উপর ক্লিক করলে অন্য একটি Page এ সংশ্লিষ্ট মেইলটি ওপেন হয়। এবার প্রদর্শিত Mail টি পড়া যায় ও ইচ্ছেমতো Reply করা যায়।

ই-মেইল মোছার নিয়ম : ই-মেইল চেক করার জন্য Mail Server এ Login করার পর Inbox এ ক্লিক করলে যে ই-মেইলগুলোর তালিকা প্রদর্শিত হয় সেগুলোর বামপাশে ছোট একটি Check Box থাকে। এই চেক বক্সে ক্লিক করে টিক চিহ্ন দিলে সংশ্লিষ্ট ই-মেইলটি Select হয়ে যায়। এখন এই সিলেক্ট করা ই-মেইলটি মুছতে হলে মেইল তালিকার উপরে Delete বাটনে ক্লিক করলে সংশ্লিষ্ট Mail টি তালিকা থেকে তথা Inbox থেকে মুছে যায়।

○ প্রশ্ন-৪০. ই-মেইল কি? ই-মেইল অ্যাড্রেসের মূল গঠন কি রকম? E-mail এর সুবিধা-অসুবিধাগুলো লিখুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ই-মেইল হলো ইলেক্ট্রনিক মেইল এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এর কাজ হচ্ছে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে বা ফ্যাক্স মেশিনে তথ্য পাঠানো। এটি বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। পোস্টাল ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা যেমন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারি তেমনি কম্পিউটারের সাহায্যেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা যায়। অতএব, কম্পিউটারের সাহায্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের এ ব্যবস্থাকে বলে ই-মেইল।

ই-মেইলের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করতে চাইলে প্রত্যেকের একটি ই-মেইল অ্যাড্রেস (E-mail Address) থাকা জরুরি। এ ঠিকানা Username @ Domain নিয়ে গঠিত হয়। যেমন ananda@bdlink.com.bd একটি ই-মেইল ঠিকানা। এখানে Username হলো ananda এবং @ চিহ্নের পরের অংশকে বলে Domain name; Domain name (.) চিহ্ন দ্বারা কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়। এটিই হচ্ছে ই-মেইল অ্যাড্রেসের মূল গঠন।

ব্যবহারের সুবিধা : বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে টেলিফোন বা ফ্যাক্সে মিনিটে যেখানে ৩০ টাকার উপর খরচ হয় সেখানে E-mail-এ খরচ হয় ১ টাকারও কম।

যদি কোনো ঠিকানায় বারবার ই-মেইল পাঠাতে হয় তবে সে ঠিকানাসমূহ Address book-এ সংরক্ষিত করে রাখা যায়। এ ক্ষেত্রে সুবিধা হলো ই-মেইল করার সময় সে ঠিকানা পুনরায় টাইপ করতে হয় না।

- এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে যেমন দ্রুততর তেমনি বিশ্বস্ত ও সাশ্রয়ী।
- Autoresponders প্রোগ্রাম ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় ই-মেইল পাঠানো সম্ভব।
- পোস্টাল মেইলে যেখানে প্রচুর কাগজ ব্যবহৃত হয় এবং সে কাগজ উৎপাদন করতে গিয়ে আবার অনেক ব্যয় করতে হয়। ই-মেইলের ক্ষেত্রে তা হয় না। ফলে অনেক সাশ্রয় হয়।
- অনেক সময় ই-মেইলের মাধ্যমে গ্রাফিক্স ব্যবহার করে শুভেচ্ছা কার্ড এবং ছবি পাঠানো হয়ে থাকে।
- অনেক কোম্পানি ই-মেইলের মাধ্যমে নিজ পণ্যের ও সেবার বিজ্ঞাপন প্রচার করে থাকে।

অসুবিধাসমূহ :

- ইমেইলের মাধ্যমে অনেক সময় কম্পিউটারে ভাইরাসের সংক্রমণ হয়ে থাকে, যা কম্পিউটারের অনেক ক্ষতি করতে পারে।
- অনেক সময় অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত মেসেজগুলো স্পাম (Spam) হিসেবে মেইলে এসে জমা হয়, যেগুলো চেক করা এবং বাতিল করার জন্য প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়।
- ই-মেইল খুলতে গিয়ে হ্যাকিং (Hacking)-এর মাধ্যমে অনেক সময় কম্পিউটারের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
- ই-মেইল পাঠাতে গিয়ে অনেক সময় তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে থাকে।
- কোনো মেইল যদি খুব বেশি দীর্ঘায়িত হয় তবে প্রাপক অনেক সময় পড়তে গিয়ে বিরক্তি বোধ করতে পারে।
- ব্যবসায়িক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেমন জরুরি লেনদেন এবং বিশেষ করে অনেক সময় প্রযোজ্য স্বাক্ষর গ্রহণ এগুলো ই-মেইলের মাধ্যমে করা যায় না।
- এক্ষেত্রে অনেক সময় কম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাসেজের মাধ্যমে ইনবক্স লোড হয়ে যেতে পারে।
- মেইল আপডেট করতে হলে নিয়মিত চেক আপ করতে হয় যা অনেক সময় বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

○ প্রশ্ন-৪১. TCP/IP কি? UPS কি? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর :TCP/IP : ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রযুক্তিগত একগুচ্ছ নিয়মকানুনকে TCP/IP বলা হয়। TCP/IP-এর অর্থ হলো Transmission Control Protocol/Internet Protocol বা সম্প্রচার নিয়ন্ত্রণ বিধান/ইন্টারনেট বিধান। এ প্রটোকল হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের এক সেট Rules (বিধান), যা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্ভুলভাবে ডেটা কমিউনিকেশনে সহায়তা করে। অর্থাৎ নেটওয়ার্কে যুক্ত কম্পিউটারগুলোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত রীতিনীতি হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রটোকল। TCP/IP প্রটোকল পাঁচটি লেয়ার (Layer) বা পর্যায়ে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-৪২. Information Technology বলতে কি বুঝায়? TCP/IP Protocol Suit বর্ণনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : Information Technology বা তথ্যপ্রযুক্তি : Information Technology, or IT, is the study, design, creation, utilization, support and management of computer based information system, especially software applications and computer hardware. আবার তথ্যপ্রযুক্তির অন্য সংজ্ঞায় রয়েছে : Information Technology is the development, installation and implementation of computer system and application. ইন্টারনেটভিত্তিক বিশ্বকোষ Wikipedia'র সংজ্ঞা অনুযায়ী :

Information Technology (IT) is the acquisition, processing, storage and dissemination of vocal, pictorial, textual and numberical information by a microelectronics based combination of computing and telecommunication.

মূলত তথ্যপ্রযুক্তি একটি সামগ্রিক বিষয়। কম্পিউটার প্রযুক্তি, ওয়্যারলেস প্রযুক্তি, টেলিকমিউনিকেশন প্রযুক্তি ও অন্যান্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন প্রক্রিয়াই বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

| **TCP/IP Protocal Suite :** The TCP/IP protocol architecture is a result of protocol research and development conducted on the experimental packet-switched network, ARPANET, funded by the Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) of USA, and is generally referred to as the TCP/IP protocol suite. This protocol suite consists of a large collection of protocols that have been issued as internet standards by the Internet Architecture Board (IBA).

| **The TCP/IP Layers :** The TCP/IP model organizes the communication task into five relatively independent layers : 1. Physical layer, 2. Physical access layer, 3. Internet layer, 4. Host-to-host, or transport layer, 5. Application layer

| **The Physical Layer :** The physical layer covers the physical interface between a data transmission device (e.g, workstation, computer) and a transmission medium or network.

| **The Network Access Layer :** The network access layer is concerned with the exchange of data between end system (server, workstation etc) and the network to which it is attached. The specific software used at this layer depends on the type of network to be used; different standards have been developed for circuit switching, packet switching (e.g., frame relay), LANs (e.g. Ethernet) and others.

| **The Internet Layer :** The internet protocol (IP) is used at this layer to provide the routing function accross multiple networks.

| **Host-to-host or Transport Layer :** The mechanisms for providing relibility are essentially independent of the nature of the applications. Thus, it makes sense to collect those mechanisms in a common to as the host-to -host layer, or transport layer.

| **The Application Layer :** The application layer contains the logic needed to support the various user applications. For each different type of application, such as file transfer, a separate module is needed that is peculiar to that application.

○ প্রশ্ন-৪৩. Briefly describe the functions of any three layers of the TCP/IP Protocol suite. *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : TCP/IP-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Transmission Control Protocol/ Internet Protocol অর্থাৎ ট্রান্সমিশন নিয়ন্ত্রণ আইন/বিধি এবং ইন্টারনেট আইন বিধি। এ প্রোটোকল হচ্ছে ডেটা ট্রান্সমিশন সিস্টেমের এক Set rules যা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের মধ্যে নির্ভুলভাবে ডেটা কমিউনিকেশনে সহায়তা করে। এক কথায়, নেটওয়ার্ক কম্পিউটারগুলোর জন্য সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারিত রীতিনীতি হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল।

TCP/IP প্রোটোকলকে পাঁচটি লেয়ারে (Layer) ভাগ করা যায়। এর উল্লেখযোগ্য তিনটি লেয়ার হলো :

- **Application Layer :** এই লেয়ারে কম্পিউটার ব্যবহারকারী ফাইল ম্যানেজমেন্ট, ফাইল ট্রান্সফার, ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি সুবিধা পায় এবং ডেটা গ্রহণ করার পর ডেটা ম্যানেজমেন্ট করা ফাইল সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।
- **Transport Layer :** এই লেয়ারে ডেটার উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত ডেটা আদান-প্রদানের কাজ করে। এক প্রান্ত থেকে প্রান্ত ডেটাকে ছোট ছোট ম্যাসেজ আকারে নির্ধারিত প্রান্তে ট্রান্সমিশন মিডিয়ার মাধ্যমে ধাপে ধাপে প্রেরণ করা হয়।
- **Internet Layer :** বিভিন্ন নেটওয়ার্ক সিস্টেম থেকে আগত ডেটাকে তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়াই এ লেয়ারের কাজ। এই লেয়ার ইন্টারনেট প্রোটোকল মেনে চলে।

○ প্রশ্ন-৪৪. What is the Internet? Discuss the responsibilities of Internet Service Providers. *[২৭তম বিসিএস]*

অথবা, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের দায়িত্বাবলি উল্লেখ করুন।

উত্তর : ইন্টারনেট পৃথিবীর বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। এটি অসংখ্য নেটওয়ার্কের সংযোগে তৈরি নেটওয়ার্ক। ১৯৮২ সালে বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে সংযোগের উপযোগী টিসিপি/আইপি (TCP/IP : Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) প্রোটোকল উদ্ভাবনের সাথে ইন্টারনেট শব্দটি চালু হয়। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য প্রধানত নিম্নলিখিত উপাদানগুলো প্রয়োজন : i. কম্পিউটার, ii. মডেম, iii. ইন্টারনেট সংযোগ এবং iv. সফটওয়্যার।

ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের দায়িত্ব : ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারের যেসব দায়িত্ব রয়েছে তা হলো :

i. কাস্টমারের সম্পূর্ণ প্রাইভেসি নিশ্চিত করা। কাস্টমারের PIN (Personal Indentification Number)-এর সাহায্যে এটা করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট ঐ PIN ছাড়া তার Account Enable হবে না।

ii. ইনফরমেশন প্রসেসিং স্পিড ভালো রাখা, এটি করা যায় নয়েজ কমিয়ে।

iii. কোনো প্রকার বিঘ্ন ছাড়া সার্ভিস চালু রাখা, এর জন্য IPS-এর ব্যাক সার্ভিস ভালো থাকা খুব প্রয়োজনীয়।

iv. যে কোনো প্রকার ডিজাস্টারের রিপেয়ার করার তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা রাখা। দক্ষ টেকনিশিয়ান নিয়োগের মাধ্যমে এটি করা সম্ভব।

○ প্রশ্ন-৪৫. 'আইপি অ্যাড্রেস' কি?

উত্তর : ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি ঠিকানা থাকে। এ ঠিকানাকে বলা হয় আইপি অ্যাড্রেস (IP Address)। অংক দিয়ে লেখা হয় এ ঠিকানা। তবে সহজে মনে রাখার জন্য ডোমেইন নাম ব্যবহার করা হয়। আইপি অ্যাড্রেসের প্রতিটি সংখ্যার ৮ বিট এবং সম্পূর্ণ ঠিকানার জন্য ৩২ বিট প্রয়োজন। কিন্তু ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় আইপি অ্যাড্রেসের জন্য ৩২বিট অপ্রতুল হয়ে পড়েছে। আগামীতে এ ঠিকানার ৪৮বিট ব্যবহারের প্রস্তুতি চলছে। এ ব্যবস্থা আইপি ভার্সন ৬ (IPV 6.0) নামে পরিচিত।

যেমন : 120.256, 176. 56 এই আইপি অ্যাড্রেসে হোস্ট আইডি হলে 176.56 এবং 120.256 হলো নেটওয়ার্ক আইডি। হোস্ট আইডিকে হোস্ট অ্যাড্রেস বা নোড অ্যাড্রেসও বলে।

○ প্রশ্ন-৪৬. ইন্টারনেটওয়ার্কিং প্রটোকল বা আইপি সম্বন্ধে লিখুন।

উত্তর : TCP/IP-র প্রটোকলগুলোর মধ্যে IP ডেটা আদান-প্রদানের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। IP-তে ডেটাকে অনেকগুলো প্যাকেট হিসেবে পাঠানো হয়, যাকে বলা হয় ডেটাগ্রাম (datagram)। ডেটাগ্রামগুলোকে বিভিন্ন রুট পাঠানো হয় এবং এর ফলে সেগুলো গন্তব্যস্থলে পরপর না পৌঁছতেই পারে। কিন্তু IP এই বিভিন্নভাবে পৌঁছনো ডেটাগ্রামগুলোকে সাজায় না এবং কোন রুট দিয়ে এসেছে তার কেনো হিসাব রাখে না।

IP-র মধ্যে চার ধরনের প্রটোকল থাকে। যথা– ক. অ্যাড্রেস রেজোলিউশন প্রটোকল (ARP), খ. রিভার্স অ্যাড্রেস রেজোলিউশন প্রটোকল (RARP), গ. ইন্টারনেট কন্ট্রোল মেসেজ প্রটোকল (ICMP) এবং ঘ. ইন্টারনেট গ্রুপ মেসেজ প্রটোকল (IGMP)। এই প্রত্যেকটি প্রটোকলের কাজ আলাদা।

ক. **অ্যাড্রেস রেজোলিউশন প্রটোকল (ARP) :** ডেটাকে যে ঠিকানায় পাঠানো হয়, অর্থাৎ ডেটাতে যে ইন্টারনেট অ্যাড্রেস থাকে, সেটি কোন কম্পিউটারের অ্যাড্রেস তা বের করার দায়িত্ব ARP-র। সাধারণ নেটওয়ার্কিং, যেমন LAN এর প্রত্যেক কম্পিউটারে অন্তত একটি নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) থাকে এবং কম্পিউটারের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস এই NIC তে লেখা থাকে।

খ. **রিভার্স অ্যাড্রেস রেজোলিউশন প্রটোকল (RARP) :** RARP হলো ARP-র ঠিক উল্টো, অর্থাৎ কম্পিউটারের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস জানা থাকলে সেখান থেকে ইন্টারনেট অ্যাড্রেস বের করার জন্য RARP-কে ব্যবহার করা হয়।

গ. **ইন্টারনেট কন্ট্রোল মেসেজ প্রটোকল (ICMP) :** ডেটাগ্রাম পাঠাতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সেই সংক্রান্ত মেসেজ, যেখান থেকে ডেটা পাঠানো হয়েছে সেখানে জানিয়ে দেয়া হয়। এর একটি সহজ উদাহরণ হলো ভুল ঠিকানায় ই-মেইল পাঠানো। ই-মেইলের ঠিকানা যদি ভুল থাকে, তাহলে সেটি পাঠানো যায় না এবং এর জন্য সার্ভারে মেইল ডেলিভারি স্ট্যাটার্স হিসেবে জানিয়ে দেয়া হয় যে মেইলটি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছানো যায়নি। এই ধরনের মেসেজ পাঠানোর জন্য ICMP- কে ব্যবহার করা হয়।

ঘ. **ইন্টারনেট গ্রুপ মেসেজ প্রটোকল (IGMP) :** অনেক সময় একই ডেটা অনেকগুলো ঠিকানায় পাঠানো হয়। তার জন্য একটি ডেটাতেই অনেকগুলো ইন্টারনেট অ্যাড্রেস লেখা হয়। ডেটা যাতে প্রত্যেক ঠিকানায় আলাদা আদালাভাবে পৌঁছায়, তার জন্য IGMP-কে ব্যবহার করা হয়।

IP প্রটোকলের সাথে সাধারণ ডাক ব্যবস্থার অনেক মিল রয়েছে। কোনো চিঠিকে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাতে হলে যেমন চিঠির উপরে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধিতিতে ঠিকানা লিখতে হয় (এবং স্ট্যাম্প লাগাতে হয়), তেমনই কোনো ডেটাকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোথাও পাঠাতে হলে সেখানে IP প্রটোকল অনুযায়ী ইন্টানেট অ্যাড্রেস লিখতে হয়। প্রথম পোস্টঅফিসে ঠিকানাটি পড়ে সেই অনুযায়ী পরের পোস্টঅফিসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। একই রকমভাবে IP-র ক্ষেত্রে ডেটাগ্রামকে পরের রাউটারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কোনো চিঠি পোস্টঅফিসে এলে পোস্টম্যান ঠিকানা দেখে বের করে যে কোন বাড়ির চিঠি এবং সেখানে চিঠি দিয়ে আসে। একই রকমভাবে ডেটাগ্রাম এলে তার ইন্টারনেট অ্যাড্রেস থেকে বের করা হয় নেটওয়ার্কের মধ্যে কোন কম্পিউটারের অ্যাড্রেস সেটি এবং ডেটাগ্রাম সেখানে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

○ প্রশ্ন-৪৭. www (world wide web) সম্বন্ধে সংক্ষেপে লিখুন।

উত্তর : ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব সংক্ষেপে www নামে পরিচিত। www হলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা Web Page. এই Web Page পরিদর্শন করাকে Web Browsing বলে। www ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হাজার হাজার কম্পিউটারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ডকুমেন্ট

(Linked document) ব্যবহারকারীর গ্রহণ উপযোগী হিসেবে উপস্থাপনের কাঠামো। এটি পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত শত শত সার্ভারের শ্রেণীবদ্ধগত রূপ। www-এর সূচনা হয়েছে ১৯৮৯ সালে ECNR (The European Centre for Nuclear Research)-এ। ১৯৯৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে Mosaic নামক গ্রাফিক্যাল Web Browser আবিষ্কারের এক বছর পর www-এর বহুল প্রচলন শুরু হয়।

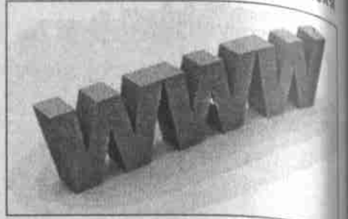

Web Browsing করার জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার রয়েছে। এর মধ্যে জনপ্রিয় Web Browsing সফটওয়্যার হচ্ছে নেস্কটেপ ও ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার। Web Browsing-এর জন্য http বা hyper text transfer protocol ব্যবহৃত হয়।

Web Browsing সফটওয়্যারে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দ নিচে দেয়া হলো :

http : hyper text transfer protocol.
URL : Uniform Resource Locator.
Web Page : সার্ভারে রাখা ফাইল।
Home Page : কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিজস্ব Web Page.
Search : কোনো কিছু খোঁজাই Search.
Bookmark : Bookmark হচ্ছে একটি Web Page-এর লিস্ট।
Reload/Refresh : যে Web Page-এর ডেটা অনবরত পরিবর্তন হয়, সেসব Web Page পড়ার সময় মাঝে কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা জানার কমান্ড।
Stop : ডাউনলোড বন্ধ করার কমান্ড।

○ প্রশ্ন-৪৮. HTML-এর পূর্ণরূপ লিখুন। HTML কিভাবে কাজ করে? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : HTML-এর পূর্ণরূপ হলো Hyper Text Markup Language। ওয়েব পেজ তৈরি করতে ব্যবহৃত সাধারণ প্রোগ্রামিং ভাষা হলো HTML।

HTML এর কার্যাবলী : ইন্টারনেট হলো পৃথিবীর সকল কম্পিউটারের মধ্যে যোগাযোগের সবচেয়ে বড় নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা। ইন্টারনেটে তথ্য প্রদর্শনের জন্য বিভিন্ন ওয়েব পেজ রয়েছে। ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রক্ষিত বিভিন্ন ফাইলই হলো ওয়েব পেজ, যা ইন্টারনেট ব্যবহারকারীগণ ব্রাউজ করে দেখেন। এসব ওয়েব পেজ মূলত HTML ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে (WWW) রাখা হয়। HTML প্লাটফর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে World Wide Web ডকুমেন্টের বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও উপকরণ তৈরি করে ও web page-এ প্রদর্শন করে।

○ প্রশ্ন-৪৯. ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন কি?

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তথ্যের সংশ্লিষ্ট ওয়েব সার্ভারের অ্যাড্রেসটি জানা থাকলে খুব সহজেই ওয়েব ব্রাউজারে নির্দিষ্ট করে ঐ তথ্যটি খুঁজে বের করা যায়। কিন্তু যদি ওয়েব সার্ভারের ঠিকানাটি জানা না থাকে তাহলে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে সহজেই যে কোনো তথ্য খুঁজে বের করা যায়। সার্চ ইঞ্জিন এমন একটি টুল, যা সব ইন্টারনেট বিস্তৃত ওয়েব সাইটগুলোকে আয়ত্তের মধ্যে রাখে। বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এমন জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন Google, Yahoo, Altavista, MSN Bing ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৫০. ওয়েব অ্যাড্রেস কি?

উত্তর : প্রতিটি ওয়েব অ্যাড্রেসের পেছনে একটি আইপি অ্যাড্রেস কাজ করে। ইন্টারনেটে যখন কোনো ওয়েব অ্যাড্রেস লিখে এন্টার প্রেস করা হয় তখন DNS-এর মাধ্যমে তা আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট কম্পিউটারকে খুঁজে পায়। মূলত ওয়েব অ্যাড্রেস ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত একটি কম্পিউটারের পরিচয় বহন করে যা ওয়েব সার্ভিস প্রদান করে।

○ প্রশ্ন-৫১. IRC সম্বন্ধে লিখুন।

উত্তর : IRC হচ্ছে Internet Relay Chat-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ১৯৮৮ সালে জারকো ঐকারিনেন (Jarkko Oilkarinen) প্রথম IRC সম্বন্ধে লিখেন। এটি ফিনল্যান্ড থেকে শুরু হয়। বর্তমানে ৬০টিরও বেশি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। IRC হচ্ছে এমন একটি গল্পের আসর যেখানে বিভিন্ন লোক একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবহারকারীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে বা সকলের সাথে গল্প করতে পারেন। IRC তে যে কোনো লোক যে কোনো চ্যানেলের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে গল্প করতে পারেন, এর জন্য কোনো বিধি-নিষেধ নেই। IRC-এর Server গুলো Inter Connected হয়ে ব্যবহারকারীর মধ্যে Message স্থানান্তর করে। একটি সার্ভার একই সময়ে কয়েকটি Server এবং একশতরও বেশি লোকের Message স্থানান্তর করতে পারে।

ইন্টারনেটে গল্প করতে হলে আমাদের কমপক্ষে দুটো জিনিস অতি আবশ্যক। যথা :

ক. ইন্টারনেট কানেকশন ও
খ. ইন্টারনেট গল্প করার সফটওয়্যার (Software)

ইন্টারনেটে গল্প করার সফটওয়্যারগুলো হচ্ছে MSN Messenger, Yahoo Messenger, Net Meeting, Microsoft Chat, MIRC ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৫২. 'ওয়েব সার্ভার' ও 'ওয়েব পেজ' কি?

উত্তর : ওয়েব সার্ভার : আমরা আমাদের কম্পিউটারের ওয়েব ব্রাউজারে একটি URL টাইপ করলাম এবং পৃথিবীর কোনো একটি কম্পিউটারে রাখা সেই ওয়েব পেজটি আমাদের কম্পিউটারে এলো এবং আমরা ওয়েব পেজটিকে দেখতে পেলাম। কি করে এটা সম্ভব হয়?

এ কাজটির জন্য একটি ওয়েব সার্ভারের প্রয়োজন হয়। কোনো একটি কোম্পানির বা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পেজগুলোকে একটি ওয়েব সার্ভারে রাখতে হয়। আমরা যখন সেই ওয়েব পেজগুলোর মধ্য থেকে কোনো একটি URL আমাদের কম্পিউটারের ব্রাউজারে লিখি তখন এ ব্রাউজার প্রথমে URL থেকে ডোমেন নেমটিকে বের করে। তারপর আমাদের নেটওয়ার্কের ডোমেন নেম সার্ভারকে জিজ্ঞাসা করে এ ডোমেন নেম এর IP অ্যাড্রেস কি? IP অ্যাড্রেস পাবার পরে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সেই অ্যাড্রেসে যায় এবং http প্রটোকলের মাধ্যমে সেখানকার ওয়েব সার্ভারের সাথে যোগাযোগ করে। ওয়েব সার্ভার নির্দিষ্ট পেজটিকে বের করে এবং সেখান থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের নেটওয়ার্ক সার্ভারে আসে। নেটওয়ার্ক সার্ভার থেকে আমাদের কম্পিউটারের ব্রাউজারে চলে আসে এবং আমরা দেখতে পাই। এই পুরো পদ্ধতিটি এতটাই মসৃণভাবে হয় যে, আমরা বুঝতেই পারি না যে এর মধ্যে এতগুলো বিষয় আছে।

ওয়েব পেজ : ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের সার্ভারে রাখা ফাইলকে Web Page বলে। এটি সাধারণত html Language দ্বারা লেখা হয়। hyper text mark-up language-এর সংক্ষিপ্ত রূপ html। world wide web (www) এ ফাইল তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়। এ ফাইলসমূহ সাধারণভাবে ওয়েব পেইজ নামে পরিচিত। কার্যকরভাবে html হলো প্লাটফরম স্বনির্ভর সমন্বয়। আর এ সমন্বয়ের মাধ্যমে world wide web ডকুমেন্টের বিভিন্ন ধরনের উপাদান ও উপকরণ তৈরি করা যায়। জেনেভায় অবস্থিত European Laboratory for Particle Physics CERN এ কাজ করার সময় টিম বার্নাস লি সর্বপ্রথম html আবিষ্কার করেন। যে কোনো ধরনের text এডিটর ব্যবহার করে ওয়েব পেইজের জন্য নিয়ম মাফিক লিখিত যা আবার ASCII নামে পরিচিত ফাইল-ই html ডকুমেন্ট। উইন্ডোজের, নোটপ্যাড, ম্যাকিন্টোশের Simple Text বা ইউম্যাক্স মেশিনের Emacs বা VI ব্যবহার করে html ডকুমেন্ট লেখা যায়। ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার যেমন মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ব্যবহার করে html ডকুমেন্ট তৈরি করা যাবে; তবে সেক্ষেত্রে ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করার সময় 'Text Only With Line Breaks' ফরমেট বা Save As html বেছে নিতে হবে।

○ প্রশ্ন-৫৩. ইন্ট্রানেট ও এক্সট্রানেট কি?

উত্তর : ইন্ট্রানেট হলো ইন্টারনেটের আরেকটি ভার্সন। ইন্ট্রানেট হলো একটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত ওয়েবসাইট যা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই ব্যবহার করতে পারেন। ইন্ট্রানেটে প্রতিষ্ঠানের কর্মী ব্যতীত আর কারও প্রবেশাধিকার থাকে না। আর ইন্টারনেটে যে কেউ প্রবেশ করতে পারবে। ইন্টারনেট ও ইন্ট্রানেট ছাড়াও আরেক ধরনের নেটওয়ার্ক রয়েছে, তা হচ্ছে এক্সট্রানেট। একটি প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটকে যখন অন্য প্রতিষ্ঠানের ইন্ট্রানেটের সাথে সংযোগ করা হয় তা-ই এক্সট্রানেট।

ঙ

ট্রান্সমিশন মিডিয়াম ও টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম
Transmission Media & Telecommunication System

○ প্রশ্ন-৫৪. অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fibre) কি? এই ফাইবার এর প্রয়োগ উল্লেখ করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : অপটিক্যাল ফাইবার একসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের স্বচ্ছ কাচ নির্মিত তার বিশেষ। বেশ কয়েকটি স্তরে সজ্জিত কাচের ঘনত্ব বাইরের দিক থেকে ভেতরে ক্রমশ ঘন হয়ে থাকে। ফলে প্রতিসরাঙ্ক ভেতর দিকে বাড়তে থাকে। এই অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্য দিয়ে যখন কোনো শব্দ পাঠানো হয়, তখন সেই শব্দ প্রথমে বিদ্যুৎ শক্তি এবং পরে আলোক সিগন্যালে রূপান্তরিত হয় এবং দ্রুত স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে এই আলোক সিগন্যাল প্রথমে বিদ্যুৎ এবং পরে শব্দে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অপটিক্যাল ফাইবার বা আলোকতন্তু বর্তমানে টেলিফোন শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি মাত্র অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে অসংখ্য পৃথক সিগন্যাল অবিকৃত অবস্থায় প্রেরণ করা যায়। ডিজিটাল টেলিফোনে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৫৫. টেলিকমিউনিকেশন কি? স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন ও অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : টেলিকমিউনিকেশন : টেলিকমিউনিকেশন বলতে সাধারণত ইলেকট্রনিক্যালী ইনফরমেশন-এর আদান প্রদানকে বুঝায়। অর্থাৎ এটি টেলিফোন তার ব্যবহার করে কমিউনিকেশন ব্যবস্থা। এর সাথে Data, Voice Transmission যুক্ত থাকে। এর প্রধান উপাদানগুলো হলো—

i. কম্পিউটার
ii. টারমিনালস
iii. কমিউনিকেশন সফটওয়্যার
iv. কমিউনিকেশন প্রসেসর
v. কমিউনিকেশন মিডিয়াম।

আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত কয়েকটি টেলিকমিউনিকেশন হলো— রেডিও, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন, টেলেক্স, ইন্টারনেট, স্যাটেলাইট, অপটিক্যাল ফাইবার ইত্যাদি।

স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম : স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মহাশূন্যে অবস্থিত রেডিও মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে যোগাযোগ রক্ষা করাকে স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। স্যাটেলাইট পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২২০০০ মাইল উঁচুতে স্থাপন করে ভূপৃষ্ঠ থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

সুবিধা :

১. মহাকাশ পর্যবেক্ষণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও দ্রুত সময়ে টেলিযোগাযোগ করা যায়।
২. যুদ্ধ পর্যবেক্ষণসহ বিশ্বের যে কোনো স্থানের সরাসরি সঠিক সংবাদ ও তথ্য যে কোনো স্থানে প্রেরণ করা যায়।

অসুবিধা :

১. ব্যয়বহুল উৎক্ষেপণ যানের প্রয়োজন।
২. আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।
৩. সংকেত প্রেরণ ও গ্রহণের মধ্যে সময় নষ্ট হয়।

অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম : অপটিক্যাল ফাইবারকে ব্যবহার করে গঠিত কমিউনিকেশন সিস্টেমকে অপটিক্যাল কমিউনিকেশন সিস্টেম বলে।

ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দ্বারা তৈরি অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন এর মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোক রশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বারবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলের মাধ্যমে গ্রাহকযন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

সুবিধা : এ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বড় সুবিধা অতি অল্প সময়ে অবিকৃত ডেটা প্রেরণ।

অসুবিধা : এখন পর্যন্ত এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

○ প্রশ্ন-৫৬. স্যাটেলাইট কি? এটা কত প্রকার ও কি কি? *[৩৩তম বিসিএস]*

উত্তর : স্যাটেলাইট : উপগ্রহ বা স্যাটেলাইট বলতে বুঝানো হয় কোনো গ্রহের চারদিকে ঘূর্ণায়মান কোনো প্রাকৃতিক বস্তুকে। তবে বর্তমান যুগে স্যাটেলাইট হলো মনুষ্য নির্মিত নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী এক প্রকার যন্ত্র যা রকেটের মাধ্যমে উৎক্ষেপণ করে পৃথিবীর অর্বিটালে বা কক্ষপথে স্থাপন করা হয়। তিন স্তরের রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় তুলে পরে ভূপৃষ্ঠের সমান্তরালে নির্দিষ্ট বেগ দেয়া হয়। এতে উপগ্রহটি পৃথিবীর চারপাশে কৃত্রিম চাঁদের মতো ঘুরতে থাকে। এসব স্যাটেলাইট স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্দেশ গ্রহণ করে সে অনুপাতে কাজ করে পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ কক্ষে তথ্য প্রেরণ করে।

স্যাটেলাইটের প্রকারভেদ : কাজের উপর ভিত্তি করে স্যাটেলাইটকে নয় ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. নভোপর্যবেক্ষণ বা এস্ট্রোনমি স্যাটেলাইট
২. এটমসফিয়ারিক স্যাটেলাইট
৩. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট
৪. নেভিগেশন স্যাটেলাইট
৫. রিকনাইসেন্স স্যাটেলাইট
৬. রিমোট সেনসিং স্যাটেলাইট
৭. সার্চ ও রেসকিউ স্যাটেলাইট
৮. স্পেস এক্সপ্লোরেশন স্যাটেলাইট
৯. ওয়েদার স্যাটেলাইট।

○ প্রশ্ন-৫৭. কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিভাবে সংবাদ প্রেরণ করা হয়। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তর : কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট হচ্ছে মহাশূন্যে অবস্থিত কৃত্রিম স্যাটেলাইট, যার কাজ যোগাযোগ রক্ষা করা। আর সেটা করে রেডিও মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে। অধিকাংশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট জিওসিনক্রোনোয়াস (Geosynchronous) অরবিটস (Orbits) অথবা নেয়ার-জিওস্টেশনারি অরবিটস (Near-geostationary orbits) ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বর্তমানে কিছু কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম লো-আর্থ অরবিটিং স্যাটেলাইট (Low-Earth-Orbiting Satellite) ব্যবহার করে থাকে। ভূমির জায়গায় স্যাটেলাইট ডিস রাখা হয় এবং ট্রান্সমিট রিসিভ যার কাজ তাকে আর্থ স্টেশন (earth station) বলে।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটে ফাইবার অপটিক ব্যবহার করায় এর দ্রুততা বেড়েছে। কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ইনফরমেশন ট্রান্সফার রেট। অন্যভাবে একে বিট রেট (Bit Rate)ও বলা যায়। অপটিক ফাইবার ব্যবহার না করলে কমিউনিকেশন ২৭০ মিলিসেকেন্ড দেরিতে হয়। আর এ সময়টুকুতে রেডিও সিগনাল ৩৫,৮৮০ কিমি. পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইটে গিয়ে আবার পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য ভিডিও ফোন (VOIP - Voice Over Internet Protocol) সম্ভব হচ্ছে।

প্রথম জিওসিনক্রোনোয়াস (Geosynchronous) কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট Hughes Syncom-2 ২৬ জুলাই ১৯৬৩ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের জন্য আজ পৃথিবীতে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

ব্যবহারকারী ভূ-কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকে সম্প্রচার বা টেরিস্ট্রিয়াল ব্যবস্থার মাধ্যমে। বিভিন্ন সম্প্রচার ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি অবলম্বন করে এর কাজ করে, যেমন টেলিফোন সুইচ বা ভূ-কেন্দ্রের সাথে সরাসরি লিঙ্কের মাধ্যমে। ব্যবহারকারী দ্বারা উৎপন্ন সিগন্যাল প্রক্রিয়াজাত করার পর ভূ-কেন্দ্র থেকে স্যাটেলাইটে পাঠানো হয়। স্যাটেলাইটে মডুলেটেড বেতার তরঙ্গ গ্রহণ করে এবং স্যাটেলাইট সব ভূ-কেন্দ্র থেকে একটি অনুমোদিত আপলিংক (পৃথিবী থেকে স্যাটেলাইট) কম্পাঙ্কে। তারপর এ সিগন্যালকে বিবর্ধিত করে এবং তাদেরকে ভূ-কেন্দ্রগুলোয় প্রতিপ্রেরণ করে ডাউন লিংক কম্পাঙ্কে।

আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর একপ্রান্তের সংঘটিত কোনো ঘটনাকে অন্য প্রান্তে ন্যূনতম সময় ব্যবধানে সরাসরি দেখানো যাচ্ছে। বড় বড় টেলিমিডিয়াগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখছে তাদের টেলিকাস্টের মাধ্যমে। বিশ্ব পরিস্থিতি সাধারণ জনগণের কাছে অতি দ্রুত উপস্থাপিত হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৫৮. স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কিভাবে রেডিও ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়?

উত্তর : বেতার সিগন্যাল এবং টেলিভিশন সিগন্যালের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে উচ্চ অ্যান্টিনাযুক্ত বুস্টার স্টেশন দ্বারা বেতার সিগন্যাল পৃথিবীব্যাপী সম্প্রচার সম্ভব। কিন্তু টেলিভিশন সিগন্যালের যোগাযোগ হচ্ছে Sight communication অর্থাৎ এক অ্যান্টিনা অন্য অ্যান্টিনার বাধাহীন সোজা সরল রেখায় থাকতে হবে। যেহেতু পৃথিবী পৃষ্ঠ বাঁকা, কমলালেবুর মতো গোলাকার এবং বিস্তৃত মহাসাগর বিদ্যমান ফলে এরূপ Straight line যোগাযোগ করতে হাজার হাজার অতি উচ্চ অ্যান্টিনাযুক্ত বুস্টার ও রিলে স্টেশনের প্রয়োজন যা সম্ভব নয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলের পরে একটি বৃত্তাকার কক্ষ পথে সমান দূরত্বে তিনটি বুস্টার রিলে স্টেশন করতে পারলে সমগ্র পৃথিবী সবস্থান থেকে সোজা সরল রেখায় যোগাযোগ সম্ভব; এক্ষেত্রে তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে তিনটি স্টেশন বানানো হয়। এ উপগ্রহগুলো পৃথিবীতে যেমন সিগন্যাল পাঠায় তেমনি পার্শ্ববর্তী উপগ্রহ সিগন্যাল পাঠায় অর্থাৎ উপগ্রহগুলো প্রতিফলক (Reflector) হিসেবে কাজ করে।

যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহে (Communication satellite) থাকে একটি প্রেরক যন্ত্র ও একটি গ্রাহক যন্ত্র। গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত সংকেতকে বিবর্ধকের (Amplifier) সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। যন্ত্র দুটিকে শক্তি জোগানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সৌর কোষের (Solar cell) এক সজ্জা (Array)। সৌরকোষ সৌর শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। টেলিফোন ও দূরদর্শন বার্তার (Signal) জন্য কৃত্রিম উপগ্রহে থাকে ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল। উচ্চ কম্পাঙ্কযুক্ত সূক্ষ্ম তরঙ্গের (Microwave) সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহে বার্তা বা সংকেত পাঠানো হয়। উপগ্রহের সাথে সংযুক্ত এন্টেনায় ঐ বার্তা ধরা পড়ে। বিবর্ধনের পর বার্তাকে প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে পুনঃ প্রেরণ করা হয়। ট্রান্সপন্ডারের সাহায্যে এর শক্তিকে বাড়ানো হয়ে থাকে। এমনি করে কোনো বার্তা হাজার মাইল দূরে প্রেরিত হয়।

○ প্রশ্ন-৫৯. সাবমেরিন ক্যাবল কি? এর কাজ কি? *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : সাবমেরিন ক্যাবল : সাবমেরিন ক্যাবল হলো সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে একদেশ থেকে অন্য দেশে টেলিযোগাযোগের জন্য স্থাপিত ক্যাবল বা তার। মূলত সাবমেরিন ক্যাবলে অনেকগুলো যোগাযোগ ক্যাবল এক সাথে বান্ডেল আকারে এক দেশের ল্যান্ডিং স্টেশনের সাথে অন্য দেশের ল্যান্ডিং স্টেশনকে যুক্ত করে।

সর্বপ্রথম যে সাবমেরিন ক্যাবল ইংলিশ চ্যানেলে স্থাপন করা হয়েছিল তা ছিল মূলত টেলিগ্রাফিক ক্যাবল। পরবর্তীতে সাবমেরিন ক্যাবল দিয়ে টেলিযোগাযোগ সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং বর্তমানে ডেটা কমিউনিকেশন তথা ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থায় সাবমেরিন ক্যাবল ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে সকল সাবমেরিন ক্যাবলে অপটিক্যাল ফাইবার প্রযুক্তি ব্যবহার করে আলোর গতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়। এসব ক্যাবল সাধারণত ৬৯ মিলিমিটার ব্যাস এবং প্রতি মিটারে ১০ কেজি ভর বিশিষ্ট।

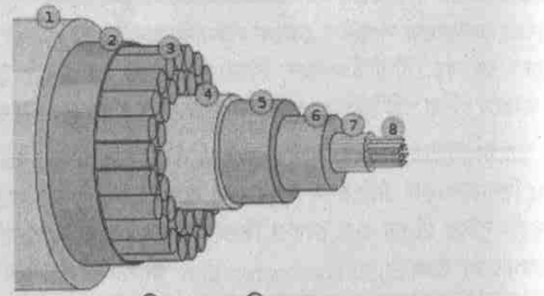

চিত্র : সাবমেরিন ক্যাবল

সাবমেরিন ক্যাবলের কাজ :

১. দুটি দেশের বা স্থানের ল্যান্ডিং স্টেশনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।
২. আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থায় মেরুদণ্ড (Backbone) হিসেবে কাজ করে।
৩. ডেটা কমিউনিকেশন তথা ইন্টারনেটে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে।
৪. আলোর গতিতে অতি সহজে তথ্য আদান-প্রদান করে।
৫. পরিবেশ সহায়ক প্রযুক্তি তাই অন্যান্য প্রযুক্তির চেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধবভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে।

○ প্রশ্ন-৬০. Fiber optic কত প্রকার ও কি কি? Optical fiber-এর মাধ্যমে কিভাবে ডাটা আদান প্রদান করা যায়? *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ফাইবার অপটিকের প্রকারভেদ : ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ফাইবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index fiber)
২. গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index fiber) ও
৩. মনোমোড ফাইবার (Monomode fiber)

স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং এর ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে। কোরের প্রতিসরাঙ্কের ভিন্নতার জন্য এ দু ধরনের ফাইবারের আলোক রশ্মির গতিপথও ভিন্ন হয়। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের ব্যাসার্ধ বেশি।

প্রেরক যন্ত্র, প্রেরণ মাধ্যম এবং গ্রাহক যন্ত্র—এ তিনটি মূল অংশ নিয়ে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সংগঠিত। প্রেরক যন্ত্র উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ফাইবারের মাধ্যমে তা গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়। অপটিক্যাল ফাইবার সরাসরি অ্যানালগ বা ডিজিটাল ডেটা পরিবহনে সক্ষম নয়। একে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মডুলেটর ও লাইট ইমিটিং ডায়োডের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গে পরিণত করে ফাইবারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোক রশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্রে মূলত দুটি অংশ থাকে— ফটো ডিটেকটর এবং প্রসেসিং ইউনিট। ফটো ডিটেকটরের কাজ হলো ফাইবার থেকে ডেটা উদ্ধার করা (Detection)। প্রসেসিং ইউনিটে থাকে অ্যামপ্লিফায়ার, ফিল্টার, ডিমডুলেটর ইত্যাদি। এরা ডেটাকে যথার্থভাবে ডিমডুলেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন এবং ফিল্টারেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়।

○ প্রশ্ন-৬১. Fiber Optic Communication System এর গুরুত্ব লিখুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় Fiber Optic Communication System (ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম) এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম-এর গুরুত্ব নিচে তুলে ধরা হলো :

উচ্চ ব্যান্ডউইড্থ (Bandwidth) : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য পরিবহনের জন্য ফাইবার অপটিক (বা অপটিক্যাল ফাইবার) ব্যবহৃত হয়। এই অপটিক্যাল ফাইবার-এর মধ্য দিয়ে যে তথ্য পাঠানো হয় তা আলোক তরঙ্গ হিসেবে সঞ্চালিত হয়। এ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত ব্যান্ডউইড্থ (Bandwidth) তথ্য পরিবহনের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় বেশি হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে একই সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তথ্য প্রেরণ করা যায় যা ডেটা বা তথ্য সঞ্চালনের অন্যান্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

উচ্চ গতিসম্পন্ন : আমরা জানি আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ৩ (তিন) লক্ষ কিলোমিটার। ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলোর মাধ্যমে সিগন্যাল ট্রান্সমিট করা হয়ে থাকে। ফলে এ পদ্ধতিতে অতি উচ্চ গতিতে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।

শক্তিক্ষয় তুলনামূলক কম : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহৃত হয় তা এক ধরনের কাচ বা প্লাস্টিকের তৈরি। এই অপটিক্যাল ফাইবার-এর শোষণ ক্ষমতা খুবই কম কিন্তু প্রতিসরাঙ্ক তুলনামূলক বেশি। অপটিক্যাল ফাইবার-এর মধ্য দিয়ে আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা বা তথ্য সঞ্চালিত হয়। আবার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ক্ষেত্রে আলোক রশ্মির সম্পূর্ণ অংশই প্রতিফলিত হয়, কোনো অংশই শোষিত বা প্রতিসরিত হয় না। ফলে এ পদ্ধতিতে শক্তির অপচয় কম হয়।

বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব মুক্ত : আলোক রশ্মি বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত হয় না। যেহেতু ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে আলোক তরঙ্গ হিসেবে তথ্য বা ডেটা আদান-প্রদান করা হয় কাজেই এই পদ্ধতিতে প্রেরিত তথ্য বা ডেটা কোনো বহিঃস্থ বৈদ্যুতিক বা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা প্রভাবিত বা বিকৃত হয় না। ফলে প্রেরণ পথে কোনো বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র থাকলেও সম্পূর্ণ অবিকৃত তথ্য পাওয়া যায়।

নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় থাকে : ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেমে অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট পথে ডেটা বা তথ্য পাঠানো হয়। ফলে এ পদ্ধতিতে তথ্য চুরি বা পাচার হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে। অর্থাৎ এ ধরনের কমিউনিকেশন সিস্টেমে তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা সংরক্ষিত হয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন সিস্টেম আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই পদ্ধতির সঠিক ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করা সম্ভব।

○ প্রশ্ন-৬২. What do you understand by VSAT? *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : V-SAT হচ্ছে Very Small Aperture Terminal-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন (ডিস)। এটিতে একটি ছোট এন্টেনা থাকে যা ০.৮ থেকে ২.৪ মিটার ডায়ামিটারের। যেখানে তার যোগাযোগ নেই বা যেসব এলাকায় লোকবসতি/ জনসংখ্যার ঘনত্ব কম সেসব জায়গায় ব্যান্ড প্রস্থ (band width) ডিস্ট্রিবিউট করার সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে ভিস্যাট। ভিস্যাটের মাধ্যমে সাধারণত ২৫৬ কিলোবাইট/সেকেন্ডে থেকে ৫১২ কিলোবাইট/সেকেন্ড ব্যান্ড প্রস্থ (band width) বিতরণ করা সম্ভব। তবে সরবরাহকারীর (Provider) উপর নির্ভর করে এটি সর্বোচ্চ ২০ মেগাবাইট/সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে। VSAT-এ Uplink-এর চেয়ে Downlink কিছুটা মন্থর গতির।

○ প্রশ্ন-৬৩. Give a brief description on pros and cons of satellite networks. *[২৭তম বিসিএস]*

উত্তর : (i) স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের সুবিধা (pros) : আধুনিক বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ প্রযুক্তির কল্যাণে পৃথিবীর একপ্রান্তের সংঘটিত কোনো ঘটনাকে অন্য প্রান্তে ন্যূনতম সময় ব্যবধানে সরাসরি দেখানো যাচ্ছে। বড় বড় টেলিমিডিয়াগুলো বিশ্বব্যাপী তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখছে তাদের টেলিকাস্টের মাধ্যমে। বিশ্ব পরিস্থিতি সাধারণ জনগণের কাছে অতি দ্রুত উপস্থাপিত হচ্ছে।

(ii) স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের অসুবিধা (cons) : স্যাটেলাইটকে তার কক্ষপথে স্থাপনের জন্য যে উৎক্ষেপণ মান ব্যবহৃত হয় তা খুবই ব্যয়বহুল যা বিশ্বের অধিকাংশ দেশের পক্ষেই মেটানো সম্ভব নয়। অপরদিকে, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক অকার্যকর হয়ে পড়ে। তদুপরি, স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের ফলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

○ প্রশ্ন-৬৪. টেলিগ্রাফ কি? টেলিগ্রাফ যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ উল্লেখ করে কিভাবে সংবাদ আদান প্রদান করা হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করা হয় তাকে টেলিগ্রাফ বলে। স্যামুয়েল মোর্স (১৭৯১-১৮৭২) নামক একজন মার্কিন বিজ্ঞানী ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ১৮৪৪ সালে তিনি বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সংবাদ প্রেরণ করতে সমর্থ হন। ইংরেজি বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষর নির্দেশ করার জন্য মোর্স বিন্দু ও রেখার সহযোগে কতগুলো সংকেত আবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে একে মোর্স সংকেত বলা হয়। সাধারণত টেলিগ্রাফ যন্ত্রের তিনটি অংশ থাকে : ১. প্রেরক যন্ত্র, ২. গ্রাহক যন্ত্র ও ৩. রীলে।

ক. **প্রেরক যন্ত্র :** প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপলে বৈদ্যুতিক বর্তনী সম্পূর্ণ হয় এবং এর ফলে তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ সঞ্চালিত হয়। চাবি ছেড়ে দিলে বর্তনী সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ফলে তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। এভাবেই পর্যায়ক্রমে গ্রাহক যন্ত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ একবার চলে এবং পরক্ষণে বন্ধ হয়। এ চাবি চেপে ধরা ও ছেড়ে দেয়ার সময় কম-বেশির ওপর গ্রাহক যন্ত্রের দু প্রকার শব্দ উৎপন্ন হয়, হ্রস্ব শব্দ টরে ও দীর্ঘ শব্দ টক্কা। মোর্স এ শব্দ দুটো বিভিন্নভাবে সাজিয়ে তার বর্ণমালার সংকেত উদ্ভাবন করেন।

খ. **গ্রাহক যন্ত্র (সাউন্ডার) :** এ যন্ত্রে একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক ও একটি আর্মেচার থাকে। প্রেরক যন্ত্রের চাবি টিপলে বিদ্যুৎ প্রবাহ গ্রাহক যন্ত্রের বৈদ্যুতিক চুম্বকের মধ্য দিয়ে চলে যায়। ফলে, তা আর্মেচারকে আকর্ষণ করে এবং আর্মেচারটি একটি ধাতুনির্মিত পাতে টুক করে আঘাত করে ট্যাপিং চাবি ছেড়ে দিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আর্মেচারটি স্প্রিং-এর টানে আবার স্বস্থানে ফিরে আসে এবং অন্য একটি ধাতুনির্মিত পাতে টুক করে আঘাত করে। এভাবে গ্রাহক স্টেশনে বিন্দু ও রেখা সংকেত দ্বারা বিভিন্ন শব্দ গ্রহণ করা হয়। এ স্টেশনের টেলিগ্রাফ অপারেটর তা লিখে নেন। এভাবে দ্বিতীয় স্টেশন থেকেও মোর্সের সংকেত প্রথম স্টেশনে পাঠানো হয়।

গ. **রীলে :** কোনো কোনো সময় টেলিগ্রাফ লাইন বহু দূর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়ার ফলে গ্রাহক যন্ত্রে অতি মৃদু সাড়া পৌছায় এবং স্পষ্টভাবে সংবাদ গ্রহণ করা যায় না। এক্ষেত্রে রীলে ব্যবহার করা হয়। রীলে দ্বারা প্রেরক যন্ত্রের মৃদু সংকেতসমূহকে বিবর্ধিত করা হয়।

○ প্রশ্ন-৬৫. টেলিফোন যন্ত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দিন। কিভাবে টেলিফোনে দেশ-বিদেশে সরাসরি কথা বলা যায়?

উত্তর : বৈদ্যুতিক তারের মাধ্যমে দূরবর্তী লোকের সাথে কথা বলার যন্ত্রই টেলিফোন। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল (১৮৪৭-১৯২২) টেলিফোন যন্ত্র আবিষ্কার করেন। বৈদ্যুতিক টেলিফোনে সধারণত দুটো প্রধান অংশ থাকে:

ক. প্রেরক যন্ত্র ও খ. গ্রাহক যন্ত্র। তাছাড়া থাকে সংযোগকারী তার ও একমুখী (ডিসি) বিদ্যুতের উৎস।

ক. **প্রেরক যন্ত্র :** প্রেরক যন্ত্রে সাধারণত ধাতু নির্মিত একটি পাত থাকে। একে ডায়াফ্রাম বলে। এ পাতের সামনে কথা বললে এটা কাঁপতে থাকে এবং ডায়াফ্রামের এ কম্পন কার্বন কুঁচি ভর্তি একটি বক্সের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। ডায়াফ্রামের সামনে কথা বললে তা ভেতরের দিকে চাপ দেয়, ফলে কার্বন কুঁচিগুলো সংকুচিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। কথা না বললে বা আস্তে আস্তে কথা বললে ডায়াফ্রামটি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং কার্বন কুঁচিগুলো প্রসারিত হয়ে আলাদা হয়ে পড়ে। ফলে, কম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। ডায়াফ্রাম ও কার্বন কুঁচি মিলে কার্বন মাইক্রোফোন তৈরি হয়।

খ. **গ্রাহক যন্ত্র :** গ্রাহক যন্ত্রেও লোহার পাতলা ডায়াফ্রাম বা পাত থাকে এবং এর সঙ্গে গায়ে তারের কুণ্ডলী জড়ানো একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি স্থায়ী চুম্বক থাকে। লোহার পাতটি তারকুণ্ডলীযুক্ত চুম্বকের মেরুদ্বয়ের সামনে আলতোভাবে সংলগ্ন থাকে। প্রেরক যন্ত্রের মাইক্রোফোনের সামনে কথা বললে এর পাতটি কাঁপতে থাকে। এ কম্পন মাইক্রোফোনে অবস্থিত কার্বন কণাগুলোতে পর্যায়ক্রমে একবার চাপ দেয় এবং পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়। ফলে, বিদ্যুৎ প্রবাহে তারতম্য ঘটে।

বিদ্যুৎ প্রবাহ বেশি হলে গ্রাহক যন্ত্রে চুম্বকের শক্তি বেশি হবে এবং তা বেশি জোরে গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামকে আকর্ষণ করবে। বিদ্যুৎ প্রবাহ কম হলে চুম্বকের শক্তি কম হবে এবং তা লোহার পাতকে কম জোরে আকর্ষণ করবে। সুতরাং, প্রেরক যন্ত্রের পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ প্রবাহ গ্রাহক যন্ত্রে (রিসিভারে) প্রবেশ করে প্রেরক যন্ত্রের পাতটি যেভাবে কাঁপছিল ঠিক সেভাবেই গ্রাহক যন্ত্রের পাতটিকে কম্পিত

করে। কাজেই মাউথ পিসে যেরূপ কথা বলা হয়, ইয়ার পিসেও ঠিক সেরূপ কথারই সৃষ্টি হয়ে থাকে। টেলিফোন প্রেরক যন্ত্রে 'হ্যালো' বললেই অন্য প্রান্তে গ্রাহক যন্ত্রের ডায়াফ্রামে কম্পন সৃষ্টি হবে এবং সেখান থেকে শোনা যাবে 'হ্যালো'।

টেলিফোনে ০ থেকে ৯ পর্যন্ত নম্বর লেখা থাকে। এ নম্বরগুলো ডায়াল করে এক টেলিফোন সেট থেকে অন্য সেটে দুই জনে কথাবার্তা বলতে পারে। টেলিফোনে সংবাদ বা কথোপকথন দুভাবে আদান-প্রদান করা হয়। ১. এনালগ ব্যবস্থার মাধ্যমে শব্দকে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে প্রেরণ ও ২. ডিজিটাল ব্যবস্থার মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তিকে ডিজিটাল সংবাদে রূপান্তরিত করে প্রেরণ। বর্তমানে ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটির সুবিধা হলো প্রেরণ সহজ হয় এবং কম্পিউটার ব্যবস্থার সাথে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। সুবিধার জন্য এখন তারবিহীন বা কর্ডলেস টেলিফোনের ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে। এ ব্যবস্থায় তারের সংযোগ ছাড়াই মূল টেলিফোন সেট থেকে দূরে বসে অনায়াসে টেলিফোন করা যায়।

টেলিফোনের সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে আবার দু রকম ব্যবস্থা আছে। একটি হলো এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে এবং অন্যটি হলো সরাসরি ডায়ালিং করে। প্রথমটিতে অপারেটরকে নম্বর বললে নির্দিষ্ট স্থানে বিশেষ করে মফস্বল শহরে এমনকি ছোট থানা শহরে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এ পদ্ধতিকে ট্রাঙ্ককল বলে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গ্রাহক নিজ দেশে এবং বিদেশে সরাসরি ডায়ালিং করে কথা বলতে পারেন। বর্তমানে ঢাকা থেকে বাংলাদেশের যে কোনো শহরে এমনকি কোনো কোনো থানা শহরে সরাসরি টেলিফোন করা যায়। একে NWD বা নেশন ওয়াইড ডায়ালিং বলে। তাছাড়া বাংলাদেশের বড় বড় শহর থেকে পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের সাথে সরাসরি ডায়ালিংয়ের মাধ্যমে কথা বলা যায়। একে ISD বা ইন্টারন্যাশনাল সাবস্ক্রাইবার ডায়ালিং বলে। টেলিফোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে এত বেশি উন্নতি সাধিত হয়েছে যে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয় এসে গেছে।

○ প্রশ্ন-৬৬. ফ্যাক্স কি? ফ্যাক্সের ব্যবহার ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন।

উত্তর : ফ্যাক্স (Fax) একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি শব্দ, যার পূর্ণ অর্থ হলো ফ্যাক্সিমিলি (Faxcimile)। ফ্যাক্স হচ্ছে একটি যন্ত্র, যার দ্বারা লিখিত বক্তব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছানো হয়। ফ্যাক্সের পাঠক যন্ত্রে লিখিত বক্তব্য স্থাপন করলে তা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এবং প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো হয়। গ্রাহক যন্ত্র এ বক্তব্য গ্রহণ করে পূর্ববৎ করে প্রিন্টারের সাহায্যে অবিকলভাবে প্রকাশ করে, মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়।

ব্যবহার : লিখিত বক্তব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছবি, ম্যাপ, ইত্যাদিও ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এর সাহায্যে টেলিফোন ও ফটোকপিও করা যায়। রেকর্ডার হিসেবেও এ যন্ত্র অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

যেভাবে কাজ করে : লিখিত বক্তব্য পাঠক যন্ত্রে স্থাপন করলে তা ইলেকট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এবং প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো হয়। গ্রাহকযন্ত্র এ বক্তব্য পূর্ববৎ করে প্রিন্টারের সাহায্যে অবিকলভাবে প্রকাশ করে।

○ প্রশ্ন-৬৭. টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টগুলো কি কি?

উত্তর : টেলিযোগাযোগ সিস্টেমের প্রধান প্রধান কম্পোনেন্টগুলো :

১. Source বা উৎস
২. Transmitter বা প্রেরক
৩. Transmission System বা মাধ্যম
৪. Receiver বা প্রাপক
৫. Destination বা গন্তব্য।

উদাহরণ : টেলিফোন সার্ভিস, টেলেক্স, টেলিগ্রাফ, ইন্টারনেট, ট্রাঙ্ক অটোমেটিক এক্সচেঞ্জসহ আরো বহুবিধ সিস্টেম টেলিযোগাযোগের আওতায় গড়ে উঠেছে।

○ প্রশ্ন-৬৮. মোবাইল টেলিফোন প্রযুক্তি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : আমাদের বর্তমান জীবনে মোবাইল ফোন একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। তার ছাড়া কথা শোনার এক অনবদ্য মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল ফোন। শুধু নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সিগন্যালকে ডিজিটালে শনাক্ত করে তার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা হয়। আধুনিক মোবাইল ব্যবস্থায় সাধারণত নিম্নলিখিত যে কোনো একটি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় :

ক. এফডিএমএ (FDMA - Frequency Division Multiple Access)
খ. সিডিএমএ (CDMA - Code Division Multiple Access)
গ. জিএসএম (GSM-Global System for Mobile)

মোবাইল ফোন হলো এমন একটি যন্ত্র যা সাধারণত টেলিফোনের মতো আচরণ করে কিন্তু এটি একটি বিস্তৃত জায়গায় কাজ করে (কর্ডলেস টেলিফোনের মতো লিমিটেড রেঞ্জ নয়)। টেলিফোন নেটওয়ার্কের মতো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে এক মোবাইল ফোন থেকে সরাসরি নম্বর টিপে আর এক নম্বরে যোগাযোগ করা যায়। বর্তমান সময়ের মোবাইল ফোনগুলোতে রেডিও ওয়েভ ট্রান্সমিশন এবং কনভেনশনাল টেলিফোন সার্কিট সুইচিং-এর সমন্বয় ব্যবহৃত হয়। প্যাকেট সুইচিং-এর মাধ্যমে মোবাইল ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ও ওয়াপ (WAP) ফ্যাসিলিটি দেয়া সম্ভব হচ্ছে। মোবাইল ফোন সেলুলার নেটওয়ার্কের জন্য ডিজাইন করা হয় এবং এগুলোতে স্ট্যান্ডার্ড কিছু সার্ভিস ফ্যাসিলিটি থাকে। এর মাধ্যমে শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, এক দেশ থেকে আর এক দেশে যোগাযোগ সম্ভব। মোবাইল ফোন ব্যবহারের আগে মোবাইল ফোন কোম্পানিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিতে হয় এবং তারা সিম কার্ড দিয়ে থাকে। ফোনসেটে সিম কার্ড ঢুকালেই সার্ভিস দেয়া সম্ভব হয়। মোবাইল ফোন শুধু ভয়েস কল সাপোর্ট করে না, এটির মাধ্যমে ডেটা পাঠানো বা রিসিভ করাও যায়।

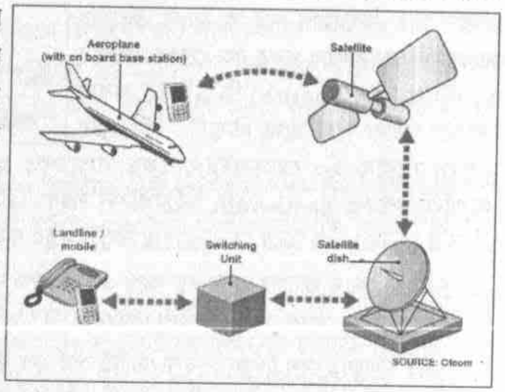

কর্ডলেস সেটে যেমন মূল টেলিফোনের সাথে ওয়্যারলেস যোগাযোগ থাকে তেমনি সেলুলার ফোনের যোগাযোগ থাকে ঐ সেলে স্থাপিত ট্রান্সমিটারের সাথে। তবে কর্ডলেস সেট একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরে কার্যকর নয় কিন্তু সেলুলার সেট কার্যকর। সেক্ষেত্রে সেলুলার সেট পূর্ববর্তী ট্রান্সমিটারের সাথে যোগাযোগ পরিবর্তন করে ঐ সেলের ট্রান্সমিটারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। অসংখ্য টেলিফোনকে আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ করা যেমন কঠিন তেমনি জ্যামিং হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাই সমগ্র এলাকাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল (cell) বা কোষে ভাগ করা হয় এবং প্রতিটি সেলে পৃথক সম্প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। এর ফলে একই ফ্রিকোয়েন্সি একাধিক দূরবর্তী সেলে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়। প্রতিটি সম্প্রচার কেন্দ্র টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে একটি মূল কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে। একই সেলে অবস্থিত সেলুলার টু সেলুলার সংযোগ স্থানে ঐ সেলে শুধু ট্রান্সমিটারের ভূমিকা থাকে। সেল ভিন্ন হলে উভয় সেলের সম্প্রচার কেন্দ্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়ে থাকে। কোনো সেলুলার ও টেলিফোন বিভাগের সেটের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সেলের সম্প্রচার কেন্দ্র টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সাথে সংযোগ স্থাপন করে অর্থাৎ সেলুলার সেট থেকে সেলের সম্প্রচার কেন্দ্র সেখান থেকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এবং সেখান থেকে টেলিফোন সেট। তবে সমুদয় সংযোগ কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের বদৌলতে সহজেই স্থাপিত হয়। এভাবে ট্রাঙ্ককল বুক করে ভিন্ন এলাকার এমনকি বিদেশেও টেলিফোন করা যায়। এক এলাকার ফোন পৃথক কোনো এলাকায় ব্যবহার করার জন্য ঐ এলাকার কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ অর্থাৎ ঐ এলাকার সেলুলার ফোন কোম্পানির অনুমতি ও সহায়তা নিতে হবে। চলন্ত গাড়ি থেকে গাড়িতে কথা বলার সময় সেল পরিবর্তনেও কোনো অসুবিধা হয় না। কম্পিউটারের বদৌলতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তন হয়ে সংযোগ অব্যাহত থাকে।

○ প্রশ্ন-৬৯. V-SAT কি? সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

উত্তর : V-SAT হচ্ছে Very Small Apperture Terminal-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি স্যাটেলাইট গ্রাউন্ড স্টেশন (ডিস)। এটির একটি ছোট এন্টেনা থাকে যা ০.৮ থেকে ২.৪ মিটার, ডায়ামিটারের। যেখানে তার যোগাযোগ নেই বা বিস্তৃত এলাকায় লোকবসতি/জনসংখ্যার ঘনত্ব কম সেসব জায়গায় ব্যান্ডউইথ (Bandwidth) ডিস্ট্রিবিউট করার সবচেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে ভিস্যাট। ভিস্যাটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ২০ মেগাবাইট/সেকেন্ড সাধারণত ৫১২ কিলোবাইট/সেকেন্ড অথবা ২৫৬ কিলোবিট/সেকেন্ড Bandwidth ডিস্ট্রিবিউশন সম্ভব। এটা নির্ভর করে প্রোভাইডারের ওপর। V-SAT-এ Uplink-এর চেয়ে Down link কিছুটা মন্থর গতির।

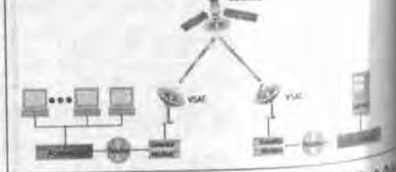

- V-SAT যে কোনো জায়গায় স্থাপন করা সহজ এবং অতিদ্রুত তা করা যায়। যেখানে Infrastructure দুর্বল বা মারাত্মকভাবে (যে কোনো কারণে) ক্ষতিগ্রস্থ সেখানে V-SAT স্থাপন করে সহজে Communication করা সম্ভব।
- V-SAT সাধারণত সেল ট্রানজেকশন যা ক্রেডিট কার্ড এবং RFID Application (Mobil speedpass) ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ১,০০,০০০টির বেশি গ্যাস স্টেশন এবং লটারিজের নিজস্ব V-SAT আছে।
- অফসোর (Offshore) অয়েল কোম্পানি, মিলিটারি ইউনিটসমূহে non DVB V-SAT ব্যবহার করে যার মাধ্যমেই High end High data rate সম্ভব।
- DVB V-SAT সাধারণত মাল্টিকাস্টিং, ভিডিও স্ট্রিমস, রেডিও, টিভি চ্যানেল ইন্টারনেট (যেসব জায়গায় ইন্টারনেট প্রভাইডার নেই) এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৭০. অপটিক্যাল ফাইবারের গঠন ও সুবিধাবলি বর্ণনা করুন।

উত্তর : ফাইবারের গঠন উপাদান : ফাইবার তৈরির অন্তরক পদার্থ হিসেবে সিলিকা এবং মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচ বহুলভাবে ব্যবহার করা যায়। এসব অন্তরক পদার্থের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অতি স্বচ্ছতা
২. রাসায়নিক সুস্থিরতা বা নিষ্ক্রিয়তা
৩. সহজ প্রক্রিয়াকরণ যোগ্যতা।

ফাইবার তৈরির জন্য সোডা বোরো সিলিকেট, সোডা লাইম সিলিকেট, সোডা অ্যালুমিনা সিলিকেট ইত্যাদি মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো ফাইবারের ক্ল্যাডিং হিসেবে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে পূর্ণ প্লাস্টিক ফাইবারের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্ষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। সাধারণ কাচ ফাইবার তৈরির জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। কারণ এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি কিছু দূর যেতে না যেতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাছাড়া সাধারণ কাচ দূর থেকে স্বচ্ছ মনে হলেও অপটিক্যাল কমিউনিকেশনের জন্য যতটা স্বচ্ছতা দরকার ঠিক ততটা নয়।

ফাইবারের সুবিধা : বিভিন্ন ধরনের সুবিধার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এসব সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. উচ্চ ব্যান্ডউইথ,
২. আকারে ছোট এবং ওজন অত্যন্ত কম,
৩. শক্তি ক্ষয় করে কম,
৪. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত,
৫. ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা।

○ প্রশ্ন-৭১. অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে কিভাবে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়?

উত্তর : প্রেরক যন্ত্র, প্রেরণ মাধ্যম এবং গ্রাহক যন্ত্র—এ তিনটি মূল অংশ নিয়ে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সংগঠিত। প্রেরক যন্ত্র উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ফাইবারের মাধ্যমে তা গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়।

অপটিক্যাল ফাইবার সরাসরি অ্যানালগ বা ডিজিটাল ডেটা পরিবহনে সক্ষম নয়। একে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মডুলেটর ও লাইট ইমিটিং ডায়োডের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গে পরিণত করে ফাইবারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার আলোকরশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোকরশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্রে মূলত দুটি অংশ থাকে—ফটো ডিটেকটর এবং প্রসেসিং ইউনিট। ফটো ডিটেকটরের কাজ হলো ফাইবার থেকে ডেটা উদ্ধার করা (Detection)। প্রসেসিং ইউনিটে থাকে অ্যামপ্লিফায়ার, ফিল্টার, ডিমডুলেটর ইত্যাদি। এরা ডেটাকে যথার্থভাবে ডিমডুলেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন এবং ফিল্টারেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়।

চ

ই-কমার্স এবং ই-কমার্স প্রযুক্তি
E-commerce and E-commerce Technology

○ প্রশ্ন-৭২. ই-কমার্স (E-commerce) কি? আধুনিক বিশ্বে এর ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করুন। *[৩৪তম বিসিএস]*

উত্তর : ই-কমার্স (E-Commerce) : ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)-এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স (E-commerce)। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মধ্যে বিস্তৃত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনকে ই-কমার্স বলে।

E-Commerce-এর প্রয়োগ : ই-কমার্স দ্রুতগতিতে আর্থিক লেনদেনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পরিচালিত ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার পদ্ধতি এ ধরনের লেনদেনের জন্য বহুল পরিচিত। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের যে কোনো স্থানের একটি ব্যাংক দূরবর্তী যে কোনো ব্যাংকের সাথে লেনদেনে সক্ষম। ফলে অবস্থানগত দূরত্ব বেশি বা কম হলেও আর্থিক লেনদেন একই সময়ে এবং দ্রুতগতিতে করা সম্ভব হচ্ছে।

ই-কমার্স ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়িক সমঝোতা ও বন্ধন তৈরির জন্য ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরস্পরের মধ্যে লেনদেন, চুক্তি এবং পরস্পরের ব্যবসা সম্বন্ধে জানার জন্য একদেশ থেকে অন্যদেশে বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সশরীরে যেতে হচ্ছে না। ই-কমার্স সুবিধা ব্যবসায়ীকে দূরবর্তী আরেকজন ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসায়িক কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে।

ই-কমার্স আজকের দিনে একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল হাতিয়ার। বিশেষত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অফিস এবং শাখা অফিসের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা পর্যবেক্ষণ, পরিচালনা এবং সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

ই-কমার্স কাস্টমারকে উন্নত সার্ভিস প্রদানের সুবিধা দেয়। কম সময়ে কাস্টমার সার্ভিস প্রদান এবং সঠিক তথ্য প্রদান ই-কমার্সের বৈশিষ্ট্য।

ই-কমার্স ব্যবসা বাণিজ্যের বিজ্ঞাপন এবং বিপণনের ক্ষেত্রে নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। যে কোনো পণ্য বা সেবা বিশ্বব্যাপী বিপণন করার জন্য কোম্পানিগুলো নিজস্ব ওয়েবসাইট অথবা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ের উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৭৩. E-commerce কি? Cyber-Criminal গণ কিভাবে এর অবৈধ সুবিধা নিচ্ছে?

উত্তর : ই-কমার্স (E-Commerce) : ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)-এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স (E-commerce)। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সকল দেশের মধ্যে বিস্তৃত ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে লেনদেনকে ই-কমার্স বলে।

Cyber Criminal-গণ নানাভাবে E-Commerce-এর অবৈধ সুবিধা নিচ্ছে। বর্তমানে পাসওয়ার্ড চুরি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাঙা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণত Cyber-Criminal-গণ নেটওয়ার্কে আড়ি পাতে এবং গোপন তথ্য জেনে নেয়। এর ফলে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে।

○ প্রশ্ন-৭৪. বাংলাদেশে ই-কমার্সের বর্তমান অবস্থা ও ই-কমার্স প্রসারে সরকারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

উত্তর : বাংলাদেশে বাণিজ্য ঢুকছে আন্তর্জাতিক রীতি অনুসরণ করে। এখন বই, সিডি প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিস বিক্রয় হচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। এরপর সবচেয়ে বড় জোয়ার আসবে মাঝারি মাপের সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে। ই-কমার্স যে নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি করেছে, সেখানে চাকরি জোটাতে প্রচুর আগ্রহ, উৎসাহ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু নিজের ব্যবসাকে 'নেটবন্দি' করার দৌড়ে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা বেশ পিছিয়ে। ই-কমার্সকে নিজের ব্যবসায় কাজে লাগানোর জন্য সবচেয়ে বেশি তৎপরতা এখন শুধু ঢাকাতে।

ই-কমার্স প্রসারে সরকারের ভূমিকা : এ দেশে ই-কমার্সের প্রসার কত দ্রুত হতে পারে তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে বিভিন্ন মহলে। অনেকের মতেই ই-কমার্সের প্রচলন যে শুধু অনিবার্য তাই নয়, আগামী দশকের মধ্যেই এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে যাবে এ দেশে। কেউ কেউ অবশ্য প্রসারের মাত্রা নিয়ে কিছুটা সন্দিহান। তবে সবাই যে ব্যাপারে একমত তা হলো, গতানুগতিক ব্যবসা ও লেনদেনের পদ্ধতিকে পিছনে ফেলে দিয়ে ই-কমার্সকে যদি সত্যিই জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠতে হয় তাহলে সরকারকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু দেশেই নয়, ই-কমার্সের মাধ্যমে যেহেতু বাণিজ্য চলবে বিশ্বজুড়ে, তাই নতুন আইনের প্রয়োজন বিশ্বজুড়েই। আর এর জন্য সরকারের উচিত আন্তর্জাতিক স্তরে বিশেষজ্ঞদের আলোচনা সভার আয়োজন করা। ইন্টারনেট বিশ্ববাজারকে এক মঞ্চে নিয়ে এসেছে। সে কারণেই এ নতুন আইন বিশ্বজুড়ে অবাধ বাণিজ্যের পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখেই তৈরি করা উচিত।

আমাদের দেশের প্রধান দুর্বলতা, এখানে ইন্টারনেটের ব্যবহার এখনও এতটা প্রচলিত নয়। কিন্তু আশার কথা, ই-কমার্সের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিল্পমহলকে অবহিত করতে বিভিন্ন সংগঠনগুলো দেশজুড়ে আলোচনার আয়োজন করেছে। বাংলাদেশেও ই-কমার্সের সুযোগ ব্যাপক। কারণ বিশ্বায়নের এ যুগে কোনো একটি দেশের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাব তো আর সে দেশে আটকে থাকে না। আমেরিকার কিছু পাল্টালে তার ধাক্কা কিন্তু বাংলাদেশের গায়ে এসেও লাগবে।

○ প্রশ্ন-৭৫. ই-কমার্স কি? এর প্রকারভেদ ও সুবিধাবলি আলোচনা করুন।

উত্তর : ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাণিজ্য করতে পারেন। অনলাইনের এ বাণিজ্যকে E-Commerce বলে। Electronic Commerce-এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স। উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা পণ্যের বিবরণ বিজ্ঞাপন আকারে তাদের ওয়েব পেজে প্রদর্শন করেন। ক্রেতা কোনো পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী হলে ওয়েব পেজের অর্ডার ফরম পূরণ করে বিক্রেতার নিকট অর্ডার প্রদান করেন এবং একই পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন। বিক্রেতা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছে দেন। ইন্টারনেটভিত্তিক এরূপ ক্রয় পদ্ধতিকে অনলাইন শপিং বলা হয় এবং সামগ্রিক এ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনাই ই-কমার্স।

ব্যবহার : শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতিতে ই-কমার্স ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদ : ই-কমার্স সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

১. বিজনেস টু কনজিউমার (B2C) ই-কমার্স
২. বিজনেস টু বিজনেস (B2B) ই-কমার্স
৩. কনজিউমার টু কনজিউমার (C2C) ই-কমার্স

সুবিধা : ই-কমার্সের জন্য যে কোনো দেশে বসে অন্য এক দেশের পণ্য বা সেবা কেনা-বেচা করা সম্ভব। EDI—Electronic Data Interchange হওয়ায় টাকা হারানোর ভয় থাকে না। সপ্তাহে সাত দিন এবং প্রতিদিনের ২৪ ঘণ্টাই কেনা-বেচা করা সম্ভব। ই-কমার্সের ফলে কেনা-বেচার সময় কম লাগে এবং পণ্য বা সেবা দ্রুত কাস্টমার/ভোক্তা/ক্রেতার দোড়গোড়ায় পৌঁছে যায়। ই-কমার্সের ফলে ভার্চুয়াল অরগানাইজেশন/ডিজিটাল ফার্ম গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ফিজিক্যাল লোকেশন ছাড়াও অর্গানাইজেশন তাদের ব্যবসা করতে পারছে। ই-কমার্স বিশ্ব বাণিজ্যে যেমন বিপ্লব এনেছে তেমনি এনে দিয়েছে নিরাপত্তা ও দ্রুততা। ই-টেকনোলজির বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো পেমেন্ট সিস্টেম। এই পেমেন্ট সিস্টেম ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড, ইলেকট্রনিক চেক, ফোন বা আইভিপি (IVP) গ্রহণ করে যা সাধারণ পে-সিস্টেমের চেয়ে অনেক বৈচিত্র্যময়, সুবিধাজনক এবং নিরাপদ।

○ প্রশ্ন-৭৬. ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কিভাবে করা হয়?

উত্তর : ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো টেলিফোন ও ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তর। এ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক উপায়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার হিসাবের মধ্যে

প্রকৃত অর্থের আদান-প্রদান না ঘটিয়ে শুধু হিসাবের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণের সমন্বয় সাধন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। লেনদেন কার্যে সুবিধা ও নিরাপত্তার নিমিত্তে ব্যাংকে অটোমেটিক টেলার টার্মিনাল ব্যবহার করা হয়। ডেটা দিয়ে ব্যাংকের লেনদেন কার্য সম্পাদনের জন্য চৌম্বক কালির রেখা বিশিষ্ট ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করা হয়। সংক্ষিপ্ত কী প্যাডের মাধ্যমে ডেটা দেয়া হয় এবং ব্যাংক কার্ড টার্মিনালে প্রবেশ করানো হয়। ফেরত সংকেতের জন্য ক্ষুদ্রাকার ভিডিও ডিসপ্লে ও প্রিন্টার ব্যবহার করা হয়। এ কার্ড ব্যাংকের কম্পিউটারে ইনপুট করে দিনে রাতে যে কোনো সময় টাকা তোলা যায়। কম্পিউটারই গ্রাহকের স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখে, এর জন্য কোনো কর্মীর প্রয়োজন হয় না। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখায় অটোমেটিক টেলার মেশিনগুলোকে যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হয়। ফলে ব্যাংকের ফান্ড ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। অটোমেটিক টেলার মেশিনের সাহায্যে ব্যাংকে সার্বক্ষণিক গ্রাহকদের ব্যাংকিং সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৭৭. Facebook কি? Facebook-এর ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন। *[৩০তম বিসিএস]*

উত্তর : ফেসবুক হলো সামাজিক যোগাযোগের (সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং) একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। এটি ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা। এই জনপ্রিয় ওয়েবসাইটটি ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

সুবিধা :

১. ফেসবুক বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোকজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
২. বিদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ফেসবুক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৩. ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ফেসবুক একটি ভালো মাধ্যম।
৪. ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত প্রদান, কিংবা ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা আদান-প্রদান করা যায়।
৫. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা খবর ফেসবুকের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সবার সাথে শেয়ার করা যায়।

অসুবিধা :

১. ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।
২. অফিস চলাকালীন সময়ে ফেসবুকের ব্যবহার কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
৩. ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।
৪. ফেসবুকে অনেকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করে।
৫. ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক সময় ব্যবহারকারীর ছবি বিকৃত করে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়।

○ প্রশ্ন-৭৮. Facebook account খোলার পদ্ধতি বর্ণনা করুন। *[৩১তম বিসিএস]*

উত্তর : Facebook Account খোলার পদ্ধতি : Facebook এ Account খুলতে হলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় :

১. প্রথমে ইন্টারনেট ব্রাউজারের Address bar-এ www.facebook.com লিখে Enter দিতে হবে।
২. ফেসবুকের Home Page ওপেন হলে ডান পাশে Sign Up অপশন পাওয়া যায়। Sign Up বাটনে ক্লিক করলে একটি অনলাইন ফর্ম আসবে। এ Online Form-এ নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে Formটি পূরণ করতে হবে।
৩. পরবর্তীতে Security Check Box এ ভেসে ওঠা লেখাগুলো সঠিকভাবে লিখে Sign Up এ ক্লিক করতে হবে।
৪. পরবর্তী Page এ নিজের মেইল একাউন্ট প্রবেশ করে Friend খুঁজে নেয়া যেতে পারে অথবা Skip This Step ক্লিক করতে হবে।
৫. Profile Info Page টিকে High School, College, University এবং Employer এর নাম লিখে Save বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৬. পরের Page এ Profile Picture Upload বাটনে ক্লিক করে নিজের ছবি আপলোড করতে হবে।
৭. সবশেষে যে ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে Sign Up করা হয়েছিল সেটির Inbox এ গিয়ে Facebook থেকে পাঠানো Mail এর Confirmation Link এ ক্লিক করলেই Account খোলা সম্পন্ন হবে।

ছ

স্মার্ট ফোন ও জিপিএস
Smart Phone and GPS

○ প্রশ্ন-৭৯. মোবাইল ফোন কি? এর সুবিধাগুলো লিখুন।

উত্তর : মোবাইল ফোন : মোবাইল ফোন হলো একটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা বেজ স্টেশনের একটি সেলুলার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ফুল ডুপ্লেক্স উভমুখী রেডিও টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেমকে ব্যবহার করে থাকে। এ ফোনকে মোবাইল, সেলুলার ফোন, সেলফোন নামেও ডাকা হয়। মোবাইল ফোন কভারেজের আওতায় যেকোনো স্থানে এটি বয়ে বেড়ানো যায়। রোমিং সেবার আওতায় মোবাইল ফোনগুলো এক দেশ থেকে অন্য দেশে নিয়েও ব্যবহার করা যায়।

চিত্র : বিভিন্ন প্রকার মোবাইল ফোন

মোবাইল ফোনের সুবিধা :

১. সাথে করে সহজে সব জায়গায় বহন করা যায় ও যে কোনো স্থান থেকে যোগাযোগ করা যায়।
২. স্থান পরিবর্তন করা অবস্থায় নিরবিচ্ছিন্ন সংযোগ স্থাপন।
৩. কল ডাইভার্ট, হোল্ড রাখা কিংবা বাতিল করা।
৪. স্থির বা ভিডিও চিত্র ধারণ, অডিও-ভিডিও কিংবা রেডিও-টিভির ব্যবহার।
৫. ইন্টারনেট সংযুক্ত করে ওয়েব ব্রাউজিং করা যায় এবং ই-মেইল ব্যবহার করা যায়।
৬. SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) এর মাধ্যমে বিকল্প যোগাযোগ করা যায়।
৭. টাচ স্ক্রীন ও হাতের লেখা সনাক্ত করা।
৮. একই সেটে একাধিক SIM ব্যবহার করা যায়।
৯. Global Positioning System (GPS) সুবিধা, কল ট্রাকিং বা ব্যবহারকারী ও তার অবস্থান সনাক্ত করা।
১০. Bluetooth, Infrared প্রভৃতি ওয়্যারলেস সিস্টেম ব্যবহার করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮০. স্মার্টফোন কি? স্মার্টফোনে ব্যবহৃত বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের পরিচয় দিন।

উত্তর : স্মার্টফোন (Smart Phone) : স্মার্টফোন হলো এক প্রকার মোবাইল ফোনই তবে এতে অতিরিক্ত সুবিধা হল কম্পিউটারের মতই এতে অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে এবং বিভিন্ন সফটওয়্যার এপস (Apps) হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সাধারণ মোবাইল ফোনের মতো ফোন করার পাশাপাশি স্মার্টফোনের বাড়তি সুবিধা হলো–এটি একটি পার্সোনাল ডিজিটাল এসিসটেন্ট বা PDA, এর সাথে শক্তিশালী ক্যামেরা রয়েছে, মিডিয়া প্লেয়ার রয়েছে এবং জিপিএস নেভিগেশন ইউনিট। অধিকাংশ স্মার্টফোনেরই টাচ স্ক্রিন ইউজার ইন্টারফেস রয়েছে এবং এতে থার্ড পার্টি সফটওয়্যার এপস ব্যবহারের সুবিধা পাওয়া যায়। মোবাইল ব্রাউজিং, মোশন সেনসর এবং মোবাইল পেমেন্টের সুবিধা থাকায় স্মার্টফোনের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে।

স্মার্টফোনের উদাহরণ হলো : Samsung Galaxy, Microsoft Lumia, Apple iPhone, Sony Xperia ইত্যাদি।

স্মার্টফোনে ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম :

- **অ্যান্ড্রয়েড (Android) :** অ্যান্ড্রয়েড হলো গুগল কর্তৃক উদ্ভাবিত স্মার্টফোনের জন্য একটি ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম। ওপেন সোর্স হওয়ায় এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় স্মার্টফোন অপারেটিং সিস্টেম এবং যেকোনো স্মার্টফোনেই এটি ব্যবহার করা যায়। স্যামসং, মটোরোলা, এইচটিসি-সহ অনেক স্মার্টফোনেই এখন এই অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।
- **আইওএস (iOS) :** ২০০৭ সালে অ্যাপল মাল্টি টাচ ইন্টারফেস সমৃদ্ধ আইফোন বাজারে আনে, যার অপারেটিং সিস্টেম হলো আইওএস।
- **উইন্ডোস ফোন Windows Phone) :** ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে মাইক্রোসফট বাজারে ছাড়ে Windows Phone 7, যার সাথে নিজেদের তৈরি মোবাইল ভার্সন অপারেটিং সিস্টেম ছিল।
- **ফায়ারফক্স ওএস (Firefox OS) :** ২০১২ সালে মোজিলা নিয়ে আসে ZTE ও Alcatel এর জন্য অপারেটিং সিস্টেম ফায়ারফক্স ওএস।
- **সিম্বিয়ান (Symbian) :** অ্যান্ড্রয়েড জনপ্রিয় হওয়ার আগ পর্যন্ত সিম্বিয়ানই ছিল সাধারণ স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম।

○ প্রশ্ন-৮১. জিপিএস কি? এটি কি কাজে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : জিপিএস (GPS) : গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো জিপিএস। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় গত শতাব্দীর সত্তর দশকের শুরুর দিকে এর উদ্ভব ঘটায়। প্রথম দিকে এর প্রয়োগ ছিল পুরোপুরি সামরিক। পরে জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য এটি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এটি একটি স্যাটেলাইট ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা। যে কোন আবহাওয়ায় পৃথিবীর যে কোনো স্থানের কোনো চলমান বা স্থির অবস্থানের তথ্য সরবরাহ করা এর মূল কাজ।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ২৪টি স্যাটেলাইট পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করেছে। যা পৃথিবীর গতির সাথে সাথে ঘুরছে এবং প্রতি মুহূর্তের কিছু তথ্য পৃথিবীর প্রতিটি স্থানে পাঠাচ্ছে। একটি ছোট বহনক্ষম রিসিভার বা তথ্য সংগ্রাহক যন্ত্র সেসব স্যাটেলাইটের পাঠানো কিছু তথ্য সংগ্রহ করে তা থেকে কিছু উপাত্ত প্রদান করতে পারে। এটাই হল গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম রিসিভার বা সংক্ষেপে জিপিএস।

চিত্র : নাসার জিপিএস স্যাটেলাইট

জিপিএস এর ব্যবহার :

১. জিপিএস এর মাধ্যমে যে কোনো স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা যায়। ফলে খুব সহজেই ঐ স্থানের অবস্থান পৃথিবীর কোথায় তা জানা যায়।
২. যে কোনো স্থানের উচ্চতা কত তা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কত উঁচু তা নির্ণয় করা যায়।
৩. জিপিএস এর মাধ্যমে যে কোনো স্থানের সঠিক সময় জানা যায়।
৪. জিপিএস ট্যাকারের সাহায্যে যে কোনো স্থানের গতিপথ নির্ণয় ও লিপিবদ্ধ করা যায়।
৫. জিপিএস ট্যাকার নিয়ে চলাচল করলে এর চলার গতি ঘণ্টায় কত তা জানা যায়।
৬. কোনো নির্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রাও জিপিএস প্রদর্শন করে।
৭. যে কোনো স্থানের বাতাসের চাপ ও গতিবেগও জিপিএস প্রদর্শন করে।
৮. প্রতিটি জিপিএস কম্পাসের মতো দিক নির্ণয় করে। ফলে একটি আধুনিক ডিজিটাল কম্পাসের সকল তথ্য জিপিএস সরবরাহ করে।

জ মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম
Multimedia System

○ প্রশ্ন-৮২. মাল্টিমিডিয়া কি? মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন মিডিয়াগুলো উল্লেখ করুন। *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বহুমাধ্যম। কাজেই মাল্টিমিডিয়া হলো এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যাতে একাধিক মিডিয়া (যেমন– লেখা বা টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ইমেজ ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে সচল, সজীব ও আকর্ষণীয় ভুবন তৈরি করা যায়।

মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন মিডিয়া : মূলত তিনটি মিডিয়াকেই মাল্টিমিডিয়ার মিডিয়া বলে গণ্য করা হয়। এগুলো হলো : ক. বর্ণ, খ. চিত্র, গ. শব্দ (সাউন্ড)।

ক. **বর্ণ :** মানুষের লিখিত ভাষা হলো বর্ণ। কম্পিউটারে এ বর্ণ কোনো না কোনো ধরনের আকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়।

খ. **চিত্র :** মানুষের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফ সবই গ্রাফিক্স। গ্রাফিক্স স্থির এবং চলমান উভয়ই হতে পারে। চলমান গ্রাফিক্সকে এনিমেশন বা ভিডিও বলা হয়।

গ. **শব্দ (সাউন্ড) :** শব্দ হচ্ছে মানুষের প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের চারপাশে যত প্রকারের শব্দ আছে তার সবই মাল্টিমিডিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিমিডিয়ার মিডিয়াসমূহ

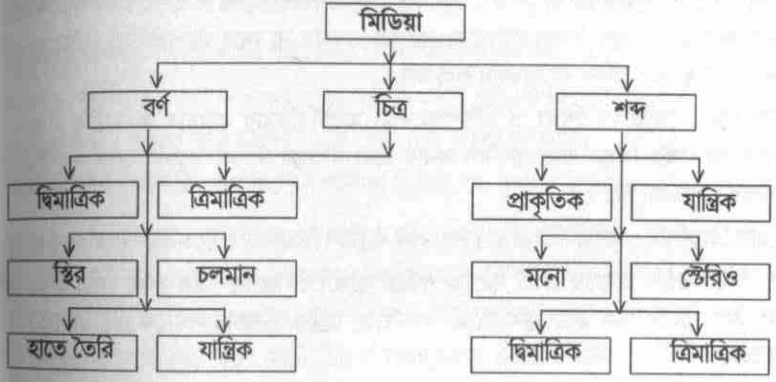

○ প্রশ্ন-৮৩. মাল্টিমিডিয়ার প্রকারভেদ ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : মিডিয়ার প্রকারভেদ : মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন মিডিয়াকে দুটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– ১. ডিসক্রিট মিডিয়া ও ২. কনটিনিউয়াস মিডিয়া।

১. **ডিসক্রিট মিডিয়া (Discrete Media) :** যেসব মিডিয়া সময়ের ওপর নির্ভরশীল নয় অর্থাৎ Time independent, সেসব মিডিয়াকে ডিসক্রিট মিডিয়া বলে। লেখা বা টেক্সট ও ইমেজ ডিসক্রিট মিডিয়ার উদাহরণ।

২. **কনটিনিউয়াস মিডিয়া (Continuous Media) :** যেসব মিডিয়া সময়ের ওপর নির্ভরশীল অর্থাৎ Time dependent, সেসব মিডিয়াকে কনটিনিউয়াস মিডিয়া বলে। অডিও, ভিডিও কনটিনিউয়াস মিডিয়ার উদাহরণ।

মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার : প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে সর্বত্রই মাল্টিমিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিচে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো–

১. **বিনোদন :** মাল্টিমিডিয়া বিনোদনে এনেছে নতুন দিগন্ত। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ভিডিও গেমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

- **শিক্ষাক্ষেত্রে :** শিক্ষাক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার শিক্ষাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। কম্পিউটার এইডেড লারনিং মাল্টিমিডিয়ারই প্রয়োগ।
- **ইন্টারনেট :** ইন্টারনেটে মাল্টিমিডিয়ার বিকল্প নেই— এ কথা ইন্টারনেট ব্রাউজ করলে যে কেউই বুঝতে পারে।

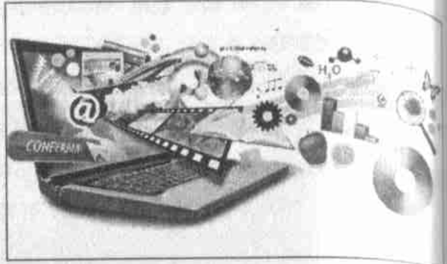

- **বাণিজ্য :** কোনো পণ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপন কিংবা বিস্তারিত তথ্য এখন মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারেই প্রকাশ করা হয়, যাতে যে কেউ পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে।
- **প্রকাশনায় :** বই পুস্তক কিংবা কোনো ডকুমেন্ট এখন পেপারব্যাকের পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়াতেও প্রকাশ করা হয়। ফলে বিশাল আকারের বইপত্র ব্যবহার না করে মাল্টিমিডিয়া সিডিতে একই জিনিস অনেক বেশি সুবিধাসহ ব্যবহার করা যায়।
- **মেডিকেল :** মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার বর্ণনাতীত। রোগ ও রোগের প্রতিবছর কিংবা ডায়াগনেসিস করার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার পাওয়া যায়।
- **ভার্চুয়াল রিয়েলিটি :** মাল্টিমিডিয়ার কল্যাণে এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি জগতে ভ্রমণ করা সম্ভব হচ্ছে।

আসলে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার এতই ব্যাপক পর্যায়ে হচ্ছে যে সংক্ষেপে এর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার হচ্ছে।

○ প্রশ্ন-৮৪. মাল্টিমিডিয়ার বিবর্তন উল্লেখ করুন।

উত্তর : ১৯৯০ সালের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন মাল্টিমিডিয়া সংযোগ করার জন্য পার্সোনাল কম্পিউটারের ন্যূনতম কনফিগারেশন (Configuration) ঘোষণা করেন। এ কনফিগারেশন COMPAQ, Creative Labs, PHILIPS, Zenith Data Systems, FUJITSU ইত্যাদি সাপ্লাইয়ার কর্তৃক সমর্থিত হয় এবং সকলে মিলে মাল্টিমিডিয়া মার্কেটিং কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন তৈরি করে যার কাজ হলো মাল্টিমিডিয়ায় এ কনফিগারেশন প্রচলন করা এবং মাল্টিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রোডাক্টের লাইসেন্স প্রদান করা।

MPC Level 1 : মাল্টিমিডিয়া পিসির প্রথম স্পেসিফিকেশনটি MPC Level 1 নামে পরিচিত।

MPC Level 2 : MPC Level 1-এর কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এ সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য MPC Level 2 স্পেসিফিকেশনের প্রচলন করা হয়।

১৯৯৫ সালের জুন মাসে Multimedia PC Working Group মাল্টিমিডিয়া পিসির স্পেসিফিকেশন বা MPC Level 3-এর স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেন।

○ প্রশ্ন-৮৫. মাল্টিমিডিয়া সিস্টেমের অংশগুলো কি কি?

উত্তর : পার্সোনাল কম্পিউটারে যথারীতি সিপিইউ, মনিটর, কী-বোর্ড, মাউস ইত্যাদি থাকে। মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম মানে পার্সোনাল কম্পিউটারের সাথে আরো অন্তত নিম্নলিখিত জিনিসগুলো সংযুক্ত থাকবে। যথা— ক. সাউন্ড কার্ড, খ. সিডি-রম ড্রাইভ বা ডিভিডি ড্রাইভ, গ. স্পিকার ও ঘ. মাইক্রোফোন।

মাল্টিমিডিয়া কম্পিউটারের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো সিডি-রম ড্রাইভ। এ সিডি-রম ড্রাইভটি কম্পিউটারের ফ্লপি ড্রাইভ, হার্ডডিস্ক ড্রাইভ, রিমোভেবল ড্রাইভ, ড্যাট ড্রাইভ ইত্যাদির অতিরিক্ত থাকে। এ ড্রাইভে Audio-Video-Text-Graphics সম্বলিত সিডি-রম ব্যবহার করা যায়।

মানুষের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে মাল্টিমিডিয়া পিসিতে অনেক নতুন কিছু সংযোজন করা হচ্ছে। যেসব নতুন সামগ্রী মাল্টিমিডিয়া পিসি'র অংশ হয়ে থাকে সেগুলো হলো :

১. **মডেম :** মডেম তথ্য পারাপার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়।
২. **ডিজিটাল ক্যামেরা :** ছবি বা ইমেজ, ড্রয়িং, লেখা ইত্যাদি কম্পিউটারে ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়।
৩. **স্ক্যানার :** ছবি বা ইমেজ, ড্রয়িং, লেখা ইত্যাদি কম্পিউটারে ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়।
৪. **টিভি কার্ড :** টিভি কার্ডের সাহায্যে কম্পিউটারে টেলিভিশন সম্প্রচার প্রদর্শিত হয়।
৫. **টেলিফোন কার্ড :** টেলিফোন কার্ডের সাহায্যে কম্পিউটার টেলিফোন অ্যানসারিং মেশিন এর কাজ করে থাকে।
৬. **MPEG কার্ড :** MPEG কার্ড-এর সাহায্যে সিডি থেকে ফুল মোশনে ফুল স্ক্রিনে ছবি দেখা যায়।
৭. **রেডিও কার্ড :** রেডিও কার্ড কম্পিউটারকে রেডিওতে রূপান্তরিত করে।
৮. **ডিভিডি কার্ড :** ডিভিডির সাহায্যে কম্পিউটারে ডিভিডি রম ব্যবহার করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮৬. মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট সম্বন্ধে বর্ণনা করুন।

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার ডেভেলপ করতে হলে মাল্টিমিডিয়া পিসিতে কিছু অতিরিক্ত হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে। ডেভেলপ্ট মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার সাধারণত সিডিতে সংরক্ষণ করে ব্যবহার করা হয়। মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার তৈরিতে যেসব অতিরিক্ত জিনিসপত্র প্রয়োজন হতে পারে সেগুলো হলো :

অডিও সেটআপ : মাল্টিমিডিয়ায় অডিও ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের (MIDI) হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও অডিও ধারণ, সংরক্ষণ, প্লেব্যাকের অন্যান্য উপকরণের প্রয়োজন হবে। এর সাথে উপযুক্ত সফটওয়্যার দরকার হবে।

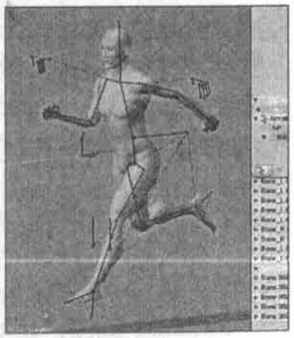
এনিমেশন ও থ্রি ডি

ভিডিও সেটআপ : মাল্টিমিডিয়ায় ভিডিও ব্যবহার করতে হলে প্রয়োজন অনুযায়ী পেশাদার ভিডিও সেট এবং কম্পিউটারে ভিডিও সম্পাদনার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে।

এনিমেশন ও থ্রি ডি : এনিমেশন ও থ্রি ডি চিত্র ব্যবহার ব্যতীত মাল্টিমিডিয়ার পূর্ণতা হয় না। তাই মাল্টিমিডিয়া সেট-আপে এনিমেশন ও থ্রি ডি এর হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার যুক্ত করা হয়।

সিডি-আর : সিডি-আরের সাহায্যে ব্যবহারকারী সিডিতে প্রয়োজনীয় ডেটা Read/Write করতে পারেন। সাধারণ CD- তে কেবলমাত্র Read করা যায়। কিন্তু CD-R-এ তথ্য রেকর্ড করা যায় বলে এর সাহায্যে সিডি-রম তৈরি করা যায়। বর্তমানে রিরাইটেবল সিডি-আর (Rewritable CDR) ড্রাইভ পাওয়া যাচ্ছে যার সাহায্যে একই সিডিতে একাধিকবার ডেটা সংরক্ষণ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৮৭. মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মিডিয়াগুলো কি কি?

উত্তর : মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার সংরক্ষণ করার জন্য বিভিন্ন প্রকার মিডিয়া বা মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে প্রচলিত সকল মিডিয়ার মধ্যে সিডি-রমই সর্বাধিক জনপ্রিয় স্টোরেজ মিডিয়া। নিচে কিছু মিডিয়ার নাম উল্লেখ করা হলো :

মিডিয়া বা মাধ্যমের নাম	উদাহরণ
অ্যানালগ মিডিয়া (Analogue media)	ভিডিও ডিস্ক, লেজার ডিস্ক ইত্যাদি
অপটিক্যাল মিডিয়া (Optical media)	বিভিন্ন ধরনের অপটিক্যাল মিডিয়া যেমন-কম্প্যাক্ট ডিস্ক (CD) ইত্যাদি।
ম্যাগনেটিক মিডিয়া (Magnetic media)	সিডিরম (CDROM), ম্যাগনিটো-অপটিক্যাল (MO) ডিস্ক, বিভিন্ন ধরনের হার্ডডিস্ক যেমন-ইআইডিই (EIDE) হার্ডডিস্ক, স্কাজি (SCSI) হার্ডডিস্ক ইত্যাদি।
ডিজিটাল মিডিয়া (Digetal media)	সিডি রম (CD ROM), ম্যাগনিটো অপটিক্যাল (MO) ডিস্ক, বিভিন্ন ধরনের হার্ডডিস্ক; যেমন—ইআইডিই (EIDE) হার্ড ডিস্ক, স্কাজি (SCSI) হার্ড ডিস্ক ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৮৮. সিডি রমের বিভিন্ন ফরমেটের বর্ণনা দিন।

উত্তর : সিডি রমকে তার মধ্যে রক্ষিত ডেটার ফরমেট অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ইয়োলো বুক (Yellow Book)	কম্পিউটারে ডেটা ধারণ ও প্রদর্শন করার জন্য ব্যবহৃত সিডিকে সাধারণত ইয়োলো বুক বলা হয়। এ সিডি শুধু পাঠযোগ্য।
সিডি রম এক্স এ (CD ROM-XA)	১৯৮৬ সালে আবিষ্কৃত যা মাইক্রোসফট, সনি, ফিলিপস কর্তৃক সমর্থিত। Extended Architecture এর কম্পিউটারে ব্যবহার্য সিডি রম এ ধরনের সিডি গোষ্ঠীর।
গ্রিন বুক (CDI-CD-Interactive)	ইন্টারেক্টিভ অডিও-ভিডিও-টেক্সট-গ্রাফিক্স-এর জন্য গ্রিন বুক সিডি ব্যবহার করা হয়। গ্রিন বুকের মধ্যে CD-I-Sound শব্দ এবং CD-I-Video ভিডিও'র জন্য ব্যবহৃত হয়।
অরেঞ্জ বুক (CDR-CD ROM Recordable)	যেসব সিডিতে ডেটা রেকর্ড করা যায় তাকে বলা হয় অরেঞ্জ বুক বা CD-R। সিডি রম টাইটেল তৈরি বা ডেটা সংরক্ষণের জন্য অরেঞ্জ বুক জনপ্রিয় হচ্ছে।
রেড বুক (Red Book)	অডিওর জন্য ব্যবহার্য সিডি রমকে বলা হয় রেড বুক। এ ধরনের সিডিকে CD-DA বলা হয়। অবশ্য এর ব্যতিক্রমও আছে। যাকে CD+ Grapphics বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৯. অ্যানিমেশন কি? বিভিন্ন প্রকার অ্যানিমেশনের বর্ণনা দিন।

উত্তর : কম্পিউটারের মাধ্যমে টেক্সট, ড্রয়িং, ইমেজ, পেইন্টিং ইত্যাদি স্থির বস্তুকে বিভিন্ন ডাইমেনশনে গতিশীল বা সচল করার কৌশলকে অ্যানিমেশন বলা হয়। অ্যানিমেশনের সাহায্যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জগতে বিচরণ করা সম্ভব হয়েছে। অ্যানিমেশন দুই প্রকার। যথা– ক. দ্বিমাত্রিক (2D) অ্যানিমেশন ও খ. ত্রিমাত্রিক (3D) অ্যানিমেশন।

ক. **দ্বিমাত্রিক (2D) অ্যানিমেশন :** দ্বিমাত্রিক ফ্লাট ইমেজ, টেক্সট, ড্রয়িং বা কোনো বস্তুকে গতিশীল বা সচল করতে দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশন ব্যবহার করা হয়। যেমন– কার্টুন ছবি। দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশনের জন্য অবজেক্ট অ্যানিমেশন প্রোগ্রাম যেমন অটোডেস্কের (Autodesk) অ্যানিমেটর (Animator) এবং সিনেমেশন (Cinemation) ইত্যাদি বহুল প্রচলিত। এ সকল প্রোগ্রামে গ্রাফিক অবজেক্টগুলোকে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর সচল করা হয়। গ্রাফিক অবজেক্টগুলো এসব প্রোগ্রাম দ্বারা তৈরি করা অথবা ক্যাপচার করা অথবা অন্য প্রোগ্রাম থেকে ইম্পোর্ট করা হতে পারে।

খ. **ত্রিমাত্রিক (3D) অ্যানিমেশন :** ত্রিমাত্রিক তলে (3D Plane) তৈরি করা কোনো ইমেজ, ড্রয়িং টেক্সট, ফটো ইত্যাদিকে গতিশীল বা সচল করাই হলো ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশন। থ্রী-ডি মডেলিং সফটওয়্যার দ্বারা থ্রী-ডি অবজেক্টের জ্যামিতিক আকার বা Wirefarme তৈরি করা হয় যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা থাকে। এ জাতীয় কাজের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি থ্রী-ডি মডেলিং সফটওয়্যার হলো ম্যাক্রোমিডিয়ার ম্যাক্রোমডেল (Macro Model), অটোডেস্কের অটোক্যাড (Auto CAD), BD Studio Man ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৯০. শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

উত্তর : আজকাল বাজারে প্রচুর শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এ ধরনের সফটওয়্যারের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলছে। কারণ এসব শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের সাহায্যে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি হয় বিধায় এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষা লাভ খুব আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। নিচে কয়েকটি শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারের পরিচিতি দেওয়া হলো :

সফটওয়্যারের নাম	পরিচিতি
এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা Encyclopedia Britanica	এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার ইলেক্ট্রনিক ভার্সন হলো এই সফটওয়্যার। এর সাহায্যে সম্পূর্ণ এনসাইক্লোপিডিয়া ব্যবহার করা যায়। টেক্সট, অডিও ও ভিডিও অপূর্ব সমন্বয়ে এই সফটওয়্যার আকর্ষণীয় হয়েছে। এতে যে কোনো বিষয় খুঁজে বের করার ব্যবস্থা রয়েছে ফলে ব্যবহারকারী সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারেন।
ওয়ার্ল্ড বুক (World Book)	ওয়ার্ল্ড বুক এনসাইক্লোপিডিয়ার ইলেক্ট্রনিক সংস্করণ হলো এ মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার। পুরো ওয়ার্ল্ড বুকের যাবতীয় তথ্য এই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে ব্যবহার করা যায়। টেক্সট, অডিও ও ভিডিও অপূর্ব সমন্বয়ে এই সফটওয়্যার আকর্ষণীয় হয়েছে। এতে যে কোনো বিষয় খুঁজে বের করার ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ব্যবহারকারী সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারেন।
আমেরিকান টকিং ডিকশনারি American Talking Dictionary	এটি একটি চমৎকার ইংরেজি ডিকশনারি। টেক্সট, অডিও ও ভিডিও সংমিশ্রণে তৈরি এই মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে যে কোনো ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, উচ্চারণ এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ভিডিও দেখা যায়। বিশেষ করে সঠিক উচ্চারণ জানার জন্য এই ডিকশনারিটি খুবই প্রয়োজনীয়।
My First Incredible Amazing Dictionary	ছোটদের ইংরেজি শিক্ষার চমৎকার মাল্টিমিডিয়া। ইংরেজি অক্ষর পরিচিতি, অক্ষর লেখার উপায় এবং ছোটদের উপযোগী ইংরেজি শব্দের অর্থ, উচ্চারণ ও ভিডিও এতে পাওয়া যায়। এটি ব্যবহার করে ছোটরা সঠিক উচ্চারণসহ ইংরেজি শিখতে পারে।

○ প্রশ্ন-৯১. মাল্টিমিডিয়াতে ব্যবহৃত কিছু সাউন্ড এডিটিং সফটওয়্যারের নাম লিখুন।

উত্তর : সাউন্ড এডিটিং সফটওয়্যার বলতে সাধারণত ডিজিটাল অডিও ও MIDI এডিটিং সফটওয়্যারকে বুঝায়। সাউন্ড এডিটিং সফটওয়্যারে ডিজিটাল অডিওর ওয়েবফর্ম (Wabeform) দেখা এবং মেনিপুলেট করা যায়। কাট (Cut), কপি (Copy), পেস্ট (Paste) ইত্যাদি অপারেশন এবং অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ বা নীরবতা ইত্যাদি বাদ দেয়া, শব্দ বা মিউজিক ছোট বা বড় করে নির্ধারিত স্থানে সাটানোর (Fit) ইত্যাদি কাজে অডিও এডিটিং সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। কিছু জনপ্রিয় সাউন্ড এডিটিং সফটওয়্যারের নাম–

১. সাউন্ড ডিজাইনার (Sound Designer)
২. ভয়েট্রা (Voyetra)
৩. অডিও সপ (Audio Shop)
৪. আলকেমি (Al Chemey)
৫. মিডিয়া মিউজিক (Media Music)
৬. অডিওট্রাক্স (Audio Trax) ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৯২. মাল্টিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো কি কি?

উত্তর : মাল্টিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হলো :

১. ইন্টারঅ্যাকটিভ টিভি সিস্টেম (Interactive TV System),
২. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality),
৩. ভিডিও টেলিফোন (Video Telephone),
৪. হোম শপিং (Home Shoping),
৫. হোম এডুকেশন (Home Education),
৬. ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing) ও
৭. রিমোট অপারেশন (Remote Operation) ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৯৩. ডেটা কম্প্রেসন কেন করা হয়?

উত্তর : ডেটা কম্প্রেসন বলতে ডেটা সংকুচিত অবস্থায় সংরক্ষণ করা বুঝায়। ডেটা কম্প্রেসনের উদ্দেশ্য প্রধানত দুটি–

১. ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
২. কম্পিউটারের মেমোরির অপচয় রোধ করা।

যেসব পিসিতে বৃহদায়তন ডেটাবেস ব্যবহার করা হয় সে সকল পিসিতে ডেটা কম্প্রেসনের মাধ্যমে কম্পিউটারের মেমোরিকে ফ্রি রাখা হয়।

○ প্রশ্ন-৯৪. ডিজিটাল ভিডিও-এর উৎস কি? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

উত্তর : ডিজিটাল ভিডিও-এর উৎস :

১. ভিডিও ক্যামেরার সাহায্যে চলমান দৃশ্যকে রেকর্ডিং করে কম্পিউটারে প্রবেশ করানো হয়।
২. কতগুলো গ্রাফিক্স ইমেজ যেমন কার্টুন ডিজিটাল ভিডিও-এর উৎস হতে পারে।
৩. ফিল্মের স্থিরচিত্র, ভিডিও টেপ প্রভৃতি ডিজিটাল ভিডিও-এর উৎস।

○ প্রশ্ন-৯৫. ডিজিটাল ভিডিও-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Digital Video) লিখুন।

উত্তর : ফ্রেম হচ্ছে ডিজিটাল ভিডিও-এর প্রথম সংগঠন। তাছাড়া দ্বি-মাত্রিক কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মতো উচ্চতা, প্রস্থ এবং Color depth প্রভৃতি নিয়ে ডিজিটাল ভিডিও গঠিত।

নিচে ডিজিটাল ভিডিও-এর তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেয়া হলো :

১. **ফ্রেম রেট (Frame Rate) :** Frame rate একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো ইমেজ প্রদর্শিত হয় তা প্রকাশ করে। Frame rate-কে fps দিয়ে প্রকাশ করা হয়।
২. **ফ্রেম সাইজ (Frame Size) :** এটি প্রত্যেক ইমেজের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্দেশ করে।
৩. **Color depth or Resolution :** এটি প্রতি পিক্সেলে কতটুকু কালার আছে তা প্রকাশ করে।

○ প্রশ্ন-৯৬. ব্রডকাস্ট টিভি ও ভিডিওর আদর্শগুলো কি কি?

উত্তর : বিশ্বের সর্বত্র টেলিভিশন ও ভিডিও রয়েছে কিন্তু সব টিভি ও ভিডিওর আদর্শ এক নয়। বর্তমান বিশ্বে টিভি ও ভিডিওর নিম্নলিখিত আদর্শগুলো দেখা যায়। যথা–

ক. NTSC-National Television System Committee,
খ. PAL-Phase Alternation Line,
গ. SECAM-Systeme Electronique Couleur Avec Memoire ও
ঘ. HDTV-High Definition Television

○ প্রশ্ন-৯৭. ভিডিও ক্যাপচার সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

উত্তর : প্রচলিত ব্রডকাস্ট টিভি, অডিও ও ভিডিও সিগন্যালগুলো অ্যানালগ। কিন্তু কম্পিউটার ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে কাজ করে। মাল্টিমিডিয়া সিস্টেম অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় ধরনের ইনফরমেশন নিয়ে কাজ করতে সমর্থ হয়। কারণ–

ক. অ্যানালগ অডিও ও ভিডিও সিগন্যাল ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করা হয়, যাতে কম্পিউটার সহজেই ম্যানিপুলেট করা যায়।
খ. কম্পিউটারের তৈরি করা অ্যাপ্লিকেশন প্লেব্যাক করার জন্য আবার অ্যানালগে রূপান্তর করার প্রয়োজন হয়, যেমন–ভিডিও টেপ।
গ. একই অ্যাপ্লিকেশনে অ্যানালগ ও ডিজিটাল উভয় ধরনের সিগন্যাল নিয়ে কাজ করার প্রয়োজন হতে পারে। যেমন— ব্রডকাস্ট টিভি যদি কম্পিউটার স্ক্রিনের কোনো উইন্ডোতে চালানো হয়।
ঘ. কম্পিউটারে ভিডিও ক্যাপচার করার জন্য ভিডিও ডিজিটাইজার (Digitizer) ব্যবহার করা হয়। ভিডিও ডিজিটাইজার এড অন কার্ড (Add on cards) অথবা অত্যাধুনিক কম্পিউটারে ডেডিকেটেড সার্কিট্রি (Dedicated Circitry) এ দুই ফর্মে হতে পারে। ভিডিও ডিস্ক প্লেয়ার, VCR, ভিডিও ক্যামেরা ইত্যাদি থেকে ডিজিটাইজার বা ফ্রেমগ্রাবারে ইনপুট হিসেবে PAL বা NTSC ভিডিও গ্রহণ করে এবং ডিজিটালে রূপান্তর করে। তাছাড়া ফুল স্ক্রিন ভিডিওকে যে কোনো সাইজে এবং স্ক্রিনের যে কোনো জায়গায় বসানো যায়।

○ প্রশ্ন-৯৮. ভিডিও কম্প্রেশন কি এবং কেন প্রয়োজন?

উত্তর : আমরা জানি PAL ভিডিও সিস্টেম 25 fps (frames per second)-এ চলে এবং NTSC ভিডিও 29.97 fps-এ চলে। NTSC সিস্টেমে ১ সেকেন্ডের ভিডিওর জন্য প্রায় ২৭ মেগাবাইট ডিস্ক স্পেস প্রয়োজন। এই হিসেবে মাত্র এক মিনিটের জন্য প্রায় ১৬২০ মেগাবাইট ডিস্ক স্পেস প্রয়োজন। আজকাল কম্পিউটারের স্টোরেজ ক্ষমতা মারাত্মকভাবে বেড়েছে তবুও সর্বোচ্চ গতিসম্পন্ন কম্পিউটার এবং সর্বোচ্চ হার্ডডিস্কের ক্ষেত্রেও এই বিশালায়তনের ডেটা সংরক্ষণ করা একটি মহাসংকট বটে। এ সমস্যার সমাধানও অবশ্য তৈরি হয়েছে এবং তা হলো ভিডিও কম্প্রেশন। কোনো ভিডিও কম্পিউটারে ধারণের জন্য ভিডিওকে কম্প্রেশ করা প্রয়োজন হয়।

স্টিল ইমেজের ক্ষেত্রে স্পেস সংক্রান্ত (Spatial) কম্প্রেশন করা হয় কিন্তু ভিডিওর ক্ষেত্রে এই স্পেস সংক্রান্ত কম্প্রেশনের পাশাপাশি সময় সংক্রান্ত (Temporal) কম্প্রেশনও করা হয়।

○ প্রশ্ন-৯৯. Video Conferencing কি? *[২৮তম বিসিএস]*

উত্তর : Video Conferencing (ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং) : ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং বলতে বোঝায় কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সাহায্যে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে অবস্থিত দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা যেখানে আলোচনায় অংশগ্রহণকৃত ব্যক্তিগণ পরস্পরের কথা শোনার পাশাপাশি একে অপরের ছবিও কম্পিউটার মনিটরে দেখতে পারেন। দুইজন ব্যক্তি আলোচনা সভায় মিলিত হলে তাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং (Point-to-point video conferencing) বলে। অপরদিকে দুই-এর অধিক ব্যক্তি আলোচনা সভায় মিলিত হলে তাকে মাল্টিপয়েন্ট ভিডিও কন্‌ফারেন্সিং (Multipoint video conferencing) বলে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো হলো : ক. পার্সোনাল কম্পিউটার (P. C); খ. ভিডিও ক্যামেরা; গ. মাইক্রোফোন; ঘ. লাউড স্পীকার এবং ঙ. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) অথবা ইন্টারনেট সংযোগ।

○ প্রশ্ন-১০০. কম্পিউটার ভিশন (Computer Vision) কি?

উত্তর : কম্পিউটার চিত্রের উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল বর্ণ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তোলে কম্পিউটার ভিশন। কম্পিউটারের মাধ্যমে চিত্রের কোনো প্রদর্শনীর জন্য বিভিন্ন রঙের সমন্বয় করা হয়। ফলে চিত্র খুবই চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত হয়। সাধারণভাবে চিত্রের প্রতিস্থাপনের জন্য কম্পিউটার রঙের বৈচিত্র্য আনয়ন করে এবং উপস্থাপনের কারণে কোনো চিত্র, গ্রাফিক্স এদের প্রকৃত আকার-আকৃতি নিয়ে ফুটে ওঠে। তবে কোনো গ্রাফিক্সে বেশি রকমের রং ব্যবহার করলে উজ্জ্বল বর্ণগুলোই শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনুজ্জ্বল বর্ণগুলো দৃষ্টির সীমানাকে ফাঁকি দিতে পারে। তাই গ্রাফিক্স এবং রঙের বিন্যাস সূক্ষ্ম ও সঠিক হতে হয়। কোনো চিত্রে বিভিন্ন রঙ থাকলে কম্পিউটার তা সহজে পড়ে নিতে পারে। উজ্জ্বল এবং অনুজ্জ্বল বর্ণের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে কম্পিউটার প্রকৃত চিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারে।

অধ্যায় ০৩

কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক পরিভাষা
Computer & IT Related Terminology

A

○ আসকি (ASCII) : আসকি (ASCII)-এর পূর্ণ অর্থ হলো আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড কোড ফর ইনফরমেশন ইন্টারচেঞ্জ (American Standard Code for Information Interchange)। এটি মাইক্রো বা পার্সোনাল কম্পিউটারের জন্য বহুল ব্যবহৃত ও বর্তমানে প্রচলিত কম্পিউটার কোড। যেমন- A-এর আসকি কোড ৬৫ এবং a-এর আসকি কোড ৯৭।

○ এজিপি (AGP) : এজিপি (AGP)-এর পূর্ণ অর্থ হলো এক্সিলারেটেড গ্রাফিক্স পোর্ট (Accelerated Graphics Port)। কম্পিউটারের মনিটরে ছবি দেখার জন্য মাদারবোর্ডের সাথে এজিপি (AGP) কার্ড লাগাতে হয়। বর্তমানে মাদার বোর্ডের সাথে এজিপি কার্ড বিল্ডইন থাকে।

○ এডিএসএল (ADSL) : এডিএসএল (ADSL)-এর পূর্ণ অর্থ হলো অ্যাসমেট্রিক ডিজিটাল সাবসক্রিপার লাইন (Asymmetric Digital Subscriber Line)। এডিএসএল-এ সিগন্যাল থেকে ভয়েস ও ডাটা খুব সহজেই পৃথক করা যায়। এডিএসএল সর্বোচ্চ ৮ মেগাবাইট/সেকেন্ড গতিতে ডাউনলোড করতে পারে। তবে এডিএসএল-এর আপলোড স্পিড ডাউনলোডের চেয়ে কিছুটা কম থাকে। আর এজন্যই এটা এসিমেট্রিক বা অসম।

○ এএলইউ (ALU) : এএলইউ (ALU)-এর পূর্ণ অর্থ অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit)। সিপিইউ-এর যৌক্তিক অংশ হিসেবে যাবতীয় সব তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ এই ইউনিট করে থাকে। বিভিন্ন প্রকার ইলেকট্রনিক সার্কিটের সাহায্যে যুক্তি অংশটি গঠিত। এ অংশে সব হিসাব-নিকাশ, গাণিতিক সমস্যার সমাধান এবং ডাটা বিশ্লেষণ করে ফলাফল তৈরি করে।

○ এসেম্বলার (Assembler) : এসেম্বলার হলো এসেম্বলি ভাষায় লিখিত প্রোগ্রামকে অনুবাদ করে যান্ত্রিক বা মেশিন ভাষায় রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত অনুবাদক প্রোগ্রাম। মাইক্রোসফট এসেম্বলার (MASM) একটি এসেম্বলার।

○ একুমুলেটর (Accumulator) : এটি একটি বাফার রেজিস্টার। যে কোনো কম্পিউটার রান করার ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকালীন ফলাফল ধারণ করার জন্য একুমুলেটর (Accumulator) ব্যবহৃত হয়।

○ আরপানেট (Arpanet) : আরপানেট (Arpanet)-এর পূর্ণ অর্থ হলো অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্ট এডমিনিস্ট্রেশন নেটওয়ার্ক (Advanced Research Projects Administration Network)। এর মাধ্যমেই প্রথম ইন্টারনেটের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৬৯ সালে সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসের UCLA ল্যাবরেটরিতে আরপানেটের মাধ্যমে বিশেষ ব্যবস্থায় প্রথম কম্পিউটার যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়।

○ অ্যান্ড গেট (AND Gate) : এই গেটে দুই বা দুইয়ের অধিক Input এবং একটি Output থাকে। যদি দুইটি Input A এবং B হয়, তাহলে এর Output হবে X = A.B। এক্ষেত্রে A = 1 এবং B = 1 হয় তবে কেবলমাত্র X = 1 হবে।

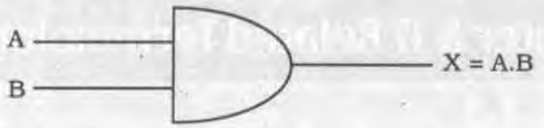

চিত্র : AND gate

○ অ্যাপলেট (Applet) : সাধারণত যে কোনো বড় ধরনের এপ্লিকেশনের ক্ষুদ্রতম রূপই হলো অ্যাপলেট। হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাংগুয়েজে বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট জাভা এপ্লিকেশনে এটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অ্যাপলেট বলতে জাভানির্ভর ছোট ছোট এপ্লিকেশনকেই বুঝানো হয়ে থাকে।

○ অ্যারে (Array) : একই জাতীয় কোনো তথ্য বা উপাত্তের সমাবেশ হলো অ্যারে। এর প্রধান উদ্দেশ্যে হলো স্বল্পসময়ের মধ্যে উপযুক্ত পদ্ধতিতে কম্পিউটারে তথ্য স্থাপন এবং তথ্যসমূহকে কম্পিউটার স্মৃতিতে সূচারুরূপে সাজানো।

○ এআরসি নেট (ARCnet) : ARCnet-এর পূর্ণরূপ হলো Attached Resource Computer Network. এটি একটি নেটওয়ার্ক পদ্ধতি বিশেষ। এই পদ্ধতিটি সাধারণত ছোটখাটো নেটওয়ার্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এতে কোয়াক্সিয়াল কেবল, টুইস্টেট পেয়ার এবং ফাইবার অপটিক ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।

○ এআরএফ (ARF) : ARF-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Alarm Reporting Function. এটি সাধারণত এস আই নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অকার্যকরী অবস্থার কারণ, ত্রুটিসহ অন্যান্য সমস্যার বিবরণ প্রদান করে।

○ আরপা (ARPA) : ARPA-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Advanced Research Project Agency. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ ইন্টারনেট উন্নয়নের জন্য এই এজেন্সি চালু করে। এই এজেন্সির তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছিল আরপানেট (Arpanet).

○ এআরকিউ (ARQ) : ARQ-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Automatic Repeat Request। ইন্টারনেট যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি নিয়ন্ত্রণ সংকেতরূপে ব্যবহৃত হয়। এআরকিউ তথ্য সঞ্চালনের বিবিধ ত্রুটি নির্ধারণ করে এবং পুনরায় তথ্য সঞ্চালনের অনুরোধ প্রদান করে।

○ আর্ম একসেস (Arm Access) : হার্ডডিস্কের ট্র্যাকসমূহে তথ্যসমূহ লেখা ও পড়ার জন্য যে দণ্ডের সাথে হেড সংযুক্ত থাকে তাকে আর্ম একসেস বলে। এই দণ্ডের যে প্রান্তে হেড সংযুক্ত থাকে তা ডিস্কের প্লাটারের ওপর চলাচল করে লেখা ও পড়ার কাজে সহায়তা করে।

○ অ্যাসেনডিং (Assending) : কম্পিউটারে তথ্য সাজানোর সময় ডেটাগুলো বিভিন্নভাবে রাখা হয়। অ্যাসেনডিং হলো সেরূপ একটি পদ্ধতি বিশেষ। সাধারণত ছোট থেকে বড় ক্রমানুসারে বিভিন্ন তথ্য বা ফাইলগুলোকে সাজানোর প্রক্রিয়াকে অ্যাসেনডিং বলে। যেমন– ০,১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯,১০ ইত্যাদি।

B

○ বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra) : শুধু ০ এবং ১ এ দুটি বাইনারি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে অন্য সকল প্রকার সংখ্যার প্রদর্শন ও হিসাবনিকাশের বীজগণিতীয় পদ্ধতিকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় প্রতিটি চলকের মান কেবল ০ কিংবা ১ হতে পারে। কোনো চলকের মান সত্য হলে ১ এবং মিথ্যা হলে ০ ধরা হয়। লজিক গেইট বা যুক্তি বর্তনীর উচ্চ ভোল্টেজ ১ এবং নিম্ন ভোল্টেজ ০ ধরা হয়।

○ বিসিডি কোড (BCD Code) : বিসিডি (BCD) কোডের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে বাইনারি কোডেড ডেসিমাল (Binary Coded Decimal)। কোনো দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় কিংবা বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি সহজতর করার জন্য বিসিডি কোড ব্যবহার করা হয়। বিসিডি কোড সাধারণত ৪, ৬, ৮ বিটের হতে পারে। তবে ৮ বিটের বিসিডি কোডকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়।

○ বায়োস (BIOS) : বায়োস (BIOS)-এর পূর্ণ অর্থ বেসিক ইনপুট-আউটপুট সিস্টেম (Basic Input-Output System)। বায়োস মূলত বিভিন্ন চিপে সংরক্ষিত একটি সফটওয়্যার (Software), যা কম্পিউটারের পাওয়ার অন করার সাথে সাথে সিস্টেমের সব হার্ডওয়্যারকে ডিটেক্ট করে। কম্পিউটার বুট হওয়ার সময় ফ্লপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক বা সিডি ড্রাইভ থেকে অপারেটিং সিস্টেম লোড করার মতো জরুরি প্রাথমিক কাজগুলো করে এই বায়োস (BIOS)।

○ বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি (Binary Digital System) : সাধারণ ০ এবং ১ এ দুই সংখ্যার পদ্ধতিকে বলা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি। বাইনারির সবচেয়ে সহজ একটি পদ্ধতি এটা, যার ভিত্তি হচ্ছে ২। এ পদ্ধতি বোঝার জন্য সবচেয়ে ভালো একটি উদাহরণ হচ্ছে অডোমিটার।

○ বেসিক (BASIC) : বেসিক (BASIC)-এর পুরো নাম হলো Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code। এ ভাষা সাধারণত কথোপকথন রীতির জন্য ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৫ সালে আমেরিকার জন কিমিনে ও টমাস কার্টজ, কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য এ ভাষা উদ্ভাবন করেন। প্রথম প্রোগ্রামিং ভাষা হিসেবে শেখার জন্য এটা খুবই উপযোগী।

○ ব্যাড সেক্টর (Bad Sector) : কম্পিউটার ডিস্কের যেসব অংশসমূহ তথ্য সংরক্ষণ করতে পারে না বা সংরক্ষিত তথ্য পড়তে বা উত্তোলন করতে পারে না, সেসব অংশকে ব্যাড সেক্টর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ ব্যাংক মেমোরি (Bank Memory) : কম্পিউটারের গতিবৃদ্ধি করার জন্য মাদারবোর্ডের যে অংশে SIM সংযোজন করা হয় সে অংশকে মেমোরি ব্যাংক হিসেবে অভিহিত করা হয়। উক্ত ব্যাংকগুলো সাধারণত Bank 0, Bank 1, Bank 2 ইত্যাদি নামে পরিচিত।

○ ব্যাচ ফাইল (Batch File) : Batch অর্থাৎ এক দল বা বহু। কম্পিউটারের কিছু কিছু কার্যাবলী রয়েছে যেগুলো বার বার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়। সাধারণভাবে যা ব্যবহারে অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। প্রয়োগকৃত উক্ত কমান্ডসমূহকে একটি ফাইলে আবদ্ধ রেখে প্রয়োজনের সময় কেবল উক্ত ফাইলের নামটি প্রয়োগ করা হলে নির্দেশিত সকল কমান্ড কার্যকর হয়। কম্পিউটারের উক্ত ফাইলকে ব্যাচ ফাইল বলে।

○ বিটা সফটওয়্যার (Beta Software) : অনেক সময় নতুন তৈরি করা কোনো সফটওয়্যার বাজারজাত করার পূর্বে উক্ত সফটওয়্যারটি কিছু ব্যবহারকারীর মধ্যে বিতরণ করে তাদের পরামর্শ ও মতামত যাচাই করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিতরণকৃত সফটওয়্যারসমূহকে বিটা সফটওয়্যার বলা হয়।

○ বাবল মেমোরি (Bubble Memory) : এটি একটি চৌম্বকীয় বুদবুদ স্মৃতি; অবিরাম পরিবর্তনশীল চৌম্বক ক্ষেত্রের মাধ্যমে চৌম্বক পদার্থের পাতলা ফিল্মে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বুদবুদের মাধ্যমে সংরক্ষিত তথ্যকে চৌম্বকীয় বুদবুদ স্মৃতি বা Magnetic bubble memory হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটি একটি সলিড স্টেট মেমোরি।

○ বাফার (Buffer) : এটি কম্পিউটারের এক ধরনের মেমোরি, যা কম্পিউটারের দুর্যোগপূর্ণ সময় এর তথ্যাবলী সংরক্ষণ করে রাখে। কম্পিউটারে সাধারণত দু ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হয়। Upper memory এবং Lower memory, উক্ত দু ধরনের মেমোরি ছাড়াও মধ্যবর্তী আরেকটি মেমোরি রয়েছে। উক্ত মধ্যবর্তী মেমোরিকে বাফার বলে। কম্পিউটারের তথ্যসমূহ সাময়িকভাবে ধারণ করার জন্য বাফার এলাকা ব্যবহৃত হয়।

○ বাগ (Bug) : বাগ হলো প্রোগ্রামিং ত্রুটি; কম্পিউটারে প্রোগ্রাম তৈরির সময় এতে বিভিন্ন ত্রুটির ফলে ভুল ফলাফল প্রদান করতে পারে। কম্পিউটারের এ ধরনের ত্রুটিকে Bug বলা হয়।

C

○ কম্পিউটার ডিস্ক (Computer Disk) : কম্পিউটারে প্রোগ্রাম এবং ডাটা বা উপাত্ত রাখার আঁধারকে ডিস্ক বলা হয়। ডিস্কে ইচ্ছামতো ডাটা বা উপাত্ত, প্রোগ্রাম, সংবাদ ইত্যাদি লেখা ও পড়া যায়। সাধারণত তিন ধরনের ডিস্ক দেখা যায়, ১. ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk), ২. হার্ড ডিস্ক (Hard Disk), ৩. সিডি (CD—Compact Disk), ৪. ডিভিডি (DVD)।

○ কোবল (COBOL) : COBOL-এর পুরো নাম হলো Common Business Oriented Language। কোবলের উৎপত্তির পর থেকে হিসাবনিকাশের খতিয়ান, বেতনের হিসাব এবং পদ্ধতিগত কিছু হিসাবরক্ষণের জন্য এ ভাষা চালু হয়। COBOL-এর আবির্ভাবের ফলে পঞ্চাশ দশকের কিছু ভাষা, যেমন– ALMACO, FLOMATC ও COMTRAN বন্ধ হয়ে যায়।

○ কার্সর (Cursor) : কার্সর হলো একটি ছোট আলোক রেখা। এ রেখা দিয়ে মনিটরের পর্দায় কাজের স্থান নির্দিষ্ট করা হয়। কম্পিউটারে সাধারণত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্সর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকে।

○ কোডিং (Coding) : কম্পিউটারে যেসব তথ্য ইনপুট করা হয় কম্পিউটার তা সরাসরি বুঝতে পারে না। কারণ কম্পিউটার তার যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করে বাইনারি পদ্ধতিতে। ফলে কম্পিউটারে ইনপুটকৃত বিভিন্ন বর্ণ, সংখ্যা, প্রতীক ইত্যাদিকে সমতুল্য বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তরিত করে নেয়। আর এই রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় কোডিং।

○ কম্পাইলার (Compiler) : কম্পাইলার একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম। কম্পাইলার প্রথমে উচ্চ স্তরের ভাষায় লেখা প্রোগ্রাম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখে। কোনো প্রকার ভুল না পাওয়া গেলে কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে একেবারে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে। প্রতিটি প্রোগ্রামিং ভাষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কম্পাইলার থাকে।

○ নিয়ন্ত্রণ ইউনিট (Control Unit) : নিয়ন্ত্রণ ইউনিট কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে কম্পিউটারের অভ্যন্তরে সকল প্রকার স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির কাজ পরিচালিত এবং সম্পাদিত হয় তার সরাসরি পরিচালনায়। নিয়ন্ত্রণ ইউনিট তথ্যের আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও কম্পিউটারের যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

○ C প্রোগ্রামিং ভাষা (C Programming Language) : ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেল ল্যাবরেটরিতে ডেনিস রিচি (Denis Ritchi) সি (C) ভাষার উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় উচ্চতর ভাষা হিসেবে সি পরিচিত। বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটারে এবং বিভিন্ন অপারেটিং সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণে 'সি' ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। সি একটি মধ্যস্তরের ভাষা। সি ভাষায় সহজেই অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধান করা হয়।

○ সিপিইউ CPU) : সিপিইউ শব্দটির পূর্ণ অর্থ হলো সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (Central Processing Unit)। সিপিইউকে কম্পিউটারের মস্তিষ্কের সাথে তুলনা করা হয়। কম্পিউটারের যাবতীয় কাজ সিপিইউ (CPU) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কম্পিউটার তার ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে তথ্য মেমোরিতে রক্ষিত নির্দেশের ভিত্তিতে সিপিইউ সমস্যাটির সমাধান আউটপুটের মাধ্যমে দিয়ে থাকে।

○ ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) : কম্পিউটারের কাজের দ্রুততা আনয়নের জন্য প্রসেসর ও প্রধান মেমোরির মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত এক বিশেষ ধরনের মেমোরিকে ক্যাশ মেমোরি (Cache Memory) বলা হয়। একটি প্রসেসর সাধারণত কতটুকু সময়ের মধ্যে কোনো ডাটা ইনস্ট্রাকশনকে নির্বাহ করবে তা পুরোপুরি নির্ভর করে ক্যাশ মেমোরির উপর।

○ সিস্ক (CISC) : সিস্ক (CISC)-এর পূর্ণ রূপ হলো কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটিং (Complex Instruction Set Computing)। যেসব প্রসেসরের মেমোরিকে কাজে লাগানোর জন্য লজিক সার্কিটের প্রতিটি নির্দেশ প্রক্রিয়াকরণ করতে তার অন্তর্বর্তী একাধিক চিপ অপারেশন ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হয় তাকে সিস্ক (CISC) প্রসেসর বলে।

○ ক্লায়েন্ট (Client) : নেটওয়ার্কের প্রতিটি ওয়ার্ক স্টেশনকে (Work Station) ক্লায়েন্ট বলা হয়। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক সার্ভার ব্যতীত সকলেই ক্লায়েন্ট। ইন্টারফেস কার্ড এবং সংযোগ তারের মাধ্যমে সার্ভারের সাথে ওয়ার্কস্টেশন সংযুক্ত থাকে। নেটওয়ার্কের ক্লায়েন্ট পিসিগুলো সার্ভার থেকে সার্ভিস নিয়ে থাকে।

○ চ্যাট (Chat) : চ্যাট (Chat) অর্থ খোশগল্প। এ ব্যবস্থায় একজন ব্যবহারকারী তার কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে গল্প করতে পারেন। চ্যাটে অংশগ্রহণকারীগণ হয়তো পরস্পরের অপরিচিত অথবা একজন অন্যজনকে কোনোদিন দেখেওনি। অথচ তারা কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ে খোশগল্প করতে পারেন। এভাবে গল্পের পরিচিত বন্ধুত্ব অনেক সময় খুব আন্তরিকও হয়ে ওঠে।

○ সিডি রোম (CD ROM) : সিডি রোম (CD ROM)-এর পূর্ণ অর্থ হলো কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড অনলি মেমোরি (Compact Disk Read Only Memory)। কম্পিউটারে স্থায়ীভাবে কোনো তথ্য সংরক্ষণের জন্য সিডি রোম (CD ROM) ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ডিস্ক ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারে আলাদা সিডি ড্রাইভ লাগাতে হয়। লেজার রশ্মির সাহায্যে এ ডিস্কে ডাটা সংরক্ষণ করা হয়।

○ সিডি ড্রাইভ (CD Drive) : সিডি হতে সব তথ্য পঠনের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয় তাকে সিডি ড্রাইভ বলা হয়। সিডি ড্রাইভের গতিকে X দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। 40X, 50X, 52X ইত্যাদি ক্ষমতার বিভিন্ন কোম্পানির সিডি ড্রাইভ বাজারে পাওয়া যায়।

○ কম্পিটার বাস (Computer Bus) : কম্পিউটার বাস হলো সিস্টেমের মাধ্যমে কম্পিউটারের বিভিন্ন সাংগঠনিক অংশগুলোর মধ্যে ডাটা ও তথ্যের আদান-প্রদান এবং বিনিময় ঘটায়। সাধারণত কম্পিউটারে দু ধরনের বাস দেখা যায়।

১. ইন্টারনাল বাস (Internal Bus) ও

২. এক্সটারনাল বাস (External Bus)।

○ কন্ট্রোল বাস (Control Bus) : কন্ট্রোল বাস (Control Bus) সাধারণত মাইক্রো প্রসেসর থেকে বিভিন্ন নির্দেশসমূহ কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। কন্ট্রোল বাস দ্বিমুখী (Bidirectional) বাস।

○ সিডি (CD) : CD-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Compact Disk। বর্তমানে কম্পিউটারের তথ্যসমূহকে সংরক্ষণের জন্য যে সব মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে সিডি হচ্ছে অন্যতম। সাধারণ আকৃতির একটি সিডি প্রচলিত ফ্লপি ডিস্কগুলোর তুলনায় হাজারগুণ বেশি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন। বর্তমানে সব চলমান ছবি, গান, কার্টুন ইত্যাদি ধারণ ও ব্যবহার করে কম্পিউটার রাজ্যে সিডি এক নতুন বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়েছে।

○ সিজিএ (CGA) : CGA-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Colour Graphics Adapter। মনোক্রম মনিটরের পরবর্তী পর্যায়ে ৬৪০×২০০ রেজুলেশনের কিছু মনিটরের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। উক্ত মনিটরসমূহকে কালার গ্রাফিক্স মনিটর হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ ধরনের মনিটরসমূহ পরিচালনার জন্য যেসব কার্ড ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে CGA Card বলে।

○ ক্লায়েন্ট ডেটাবেজ (Client Database) : কম্পিউটারের উপাত্তসমূহ স্বল্প সময়ে খুব সহজে নির্বাহ করার নিমিত্তে নেটওয়ার্ক পদ্ধতিতে উপাত্ত নিবিষ্ট করার প্রক্রিয়া। এ ব্যবস্থায় উপাত্ত গ্রহণ, নির্গমন এবং স্ক্রীন পরিক্রমায় কাজ করা যায়।

○ কমপ্রেস (Compress) : কমপ্রেস হলো কোনো কিছুকে চাপানো, অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত করে সংরক্ষণ করা। কম্পিউটার ডিস্কে ধারণ ক্ষমতার অধিক সব তথ্য চাপিয়ে বা ঠাসাঠাসি করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা হলো কমপ্রেস।

○ কোরেল ড্র (Corel Draw) : কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের চিত্র, নকশা বা প্রকৌশলিক বিভিন্ন ধরনের চিত্রাদি অংকনের জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের জনপ্রিয় গ্রাফিক্স প্যাকেজ।

○ সিআরটি (CRT) : CRTটির পূর্ণরূপ হচ্ছে Cathode Ray Tube। এটি এমন এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যার সাহায্যে কোনো Electrical Signal কে প্রদর্শন করানো যায়। এটি একটি Special Type Vacuum Tube।

○ কনট্রোল প্যানেল (Control Pannel) : উইন্ডোজ পরিবেশে কাজ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদনকারী মাধ্যমটির নাম হলো কন্ট্রোল প্যানেল। কন্ট্রোল প্যানেলের সাহায্যে কম্পিউটারে ব্যবহৃত বিভিন্ন ডিভাইস নিয়ন্ত্রণ, নতুন হার্ডওয়্যার সংযোজন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম সংযোজন বা মুছে ফেলা কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর, মডেম, মাল্টিমিডিয়া, নেটওয়ার্ক, প্রিন্টার ইত্যাদি সব ডিভাইস নিয়ন্ত্রণে কন্ট্রোল প্যানেল ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

○ কমপ্যাকশন মেমোরি (Compaction Memory) : কম্পিউটার মেমোরিতে ধারণ ক্ষমতার অধিক তথ্য ধারণ করার জন্য উপাত্তসমূহকে সংকুচিত করে সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়া হলো Compaction Memory।

D

○ ডিএসএল (DSL) : ডিএসএল (DSL)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ডিজিটাল সাবস্ক্রিপার লাইন (Digital Subscriper Line)। এটি সাধারণত এনালগ সিস্টেমের পরিবর্তে ডিজিটাল সংযোগ পদ্ধতি ব্যবহার করে। ডিএসএল-এর প্রধান সুবিধা হলো একই সংযোগে ইন্টারনেট এবং টেলিফোন ব্যবহার করা যায়।

○ ডস (DOS) : ডস (DOS)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (Disk Operating System)। এই অপারেটিং সিস্টেম কি-বোর্ডের বিভিন্ন বোতাম ব্যবহার করে কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হয়।

○ ডিটিপি (DTP) : ডিটিপি (DTP)-এর অর্থ হচ্ছে ডেস্কটপ পাবিলিশিং (Desktop Publishing)। বইপুস্তক ও পত্রপত্রিকা, সাময়িকী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যাটালগ, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি কাগজে মুদ্রণ করার প্রক্রিয়াকে ডেস্কটপ পাবলিশিং বলা হয়।

○ ডি র‍্যাম (D RAM) : ডি র‍্যাম (D RAM) হচ্ছে ডাইনামিক র‍্যানডম এক্সেস মেমোরি (Dynamic Random Access Memory)। এসব র‍্যাম সাধারণত ক্যাপাসিটর দিয়ে তৈরি। এর দাম তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু আকারে বড়।

○ ডিএম (DM) : ডিএম (DM)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ডাটা মেনিপুলেশন (Data Manipulation)। কোনো রেজিস্টারের কার্য সম্পাদনের পর তার স্মৃতিকে খালি করাই এর প্রধান কাজ।

○ ডাটা বাস (Data Bus) : ডাটা বাস (Data Bus) হলো নির্দিষ্ট কোনো ডাটা বা ইনস্ট্রাকশনকে বিভিন্ন কম্পোনেন্টে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত নির্দিষ্ট লাইন। একে দ্বিমুখী (Bidirectional) বাস বলা হয়।

○ ডেবাগিং (Debuging) : কোনো প্রোগ্রামের ভুলত্রুটি খুঁজে বের করে তা দূর করার প্রক্রিয়াকে ডেবাগিং বলে। সব ভুলত্রুটি দূর না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রোগ্রামই তার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল প্রদানে সক্ষম হয় না। ডেবাগিং-এর জন্যই প্রথমে প্রোগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়।

○ ডেস্কটপ (Desktop) : উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম সম্বলিত কোনো কম্পিউটার চালু করলে স্থির অবস্থায় মনিটরের স্ক্রিনে যে উইন্ডোজ বিরাজ করে তাকে ডেস্কটপ বলা হয়। ডেস্কটপে বিভিন্ন আইকন এবং ফোল্ডার থাকে।

○ ড্রাইভ (Drive) : ড্রাইভ হলো কম্পিউটারে ফ্লপি ডিস্ক, হার্ডডিস্ক এবং সিডি ড্রাইভ নির্দেশক আইকন। ডেস্কটপের মাই কম্পিউটার আইকোনে ক্লিক করলে কার্যকরী সব ড্রাইভগুলোর তালিকা দেখা যায়। কম্পিউটারে সাধারণত ফ্লপি ড্রাইভ, হার্ড ড্রাইভ এবং সিডি ড্রাইভ এই তিন ধরনের ড্রাইভ থাকে। ড্রাইভের মধ্যে ডিরেক্টরি বা ফোল্ডার এবং বিভিন্ন ধরনের ফাইল থাকে।

○ ডকুমেন্ট (Document) : ডস, উইন্ডোজ ও অন্যান্য অপারেটিং সিস্টেম এবং এপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহে যেসব ফাইল তৈরি করা হয় বা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হয় সেগুলোকে ডকুমেন্ট বলা হয়। ডকুমেন্টে লিখিত টেক্সটসমূহ ফাইল হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

○ ডিএমএ (DMA) : ডিএমএ (DMA) হচ্ছে ডাইরেক্ট মেমোরি এক্সেস (Direct Memory Access)। এর সাহায্যে মেমোরিতে সঞ্চিত তথ্যকে পঠন বা লিখনের জন্য ক্রমিক ও সিধা নাগাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

○ ডাটা ইনটিগ্রিটি (Data Integrity) : কম্পিউটার পরিচালনায় অনেক সময় উদ্ভূত সমস্যার কারণে সংরক্ষিত উপাত্তসমূহ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ব্যবহারকারী কর্তৃক উক্ত ত্রুটিপূর্ণ উপাত্তসমূহ সংশোধন করার প্রক্রিয়া হলো ডাটা ইনটিগ্রিটি।

○ ডাটা প্রসেসিং (Data Processing) : সাধারণত ডাটা বা উপাত্ত সঞ্চালন, রেজিস্টারের সমস্ত কার্যপ্রক্রিয়া সম্পাদনের পর উক্ত রেজিস্টারটি খালি বা শূন্য অবস্থায় রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকে উপাত্ত সঞ্চালন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ ডাটা ট্রান্সপারেনসি (Data Transparency) : ডাটা ট্রান্সপারেনসি হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় উপাত্তসমূহের যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বাঁধাবিঘ্ন ছাড়াই উপাত্তসমূহ সম্প্রচারের একটি পদ্ধতি।

○ ডাটাবেজ সফটওয়্যার (Database Software) : ডাটাবেজ সফটওয়্যার সাধারণত বিভিন্ন ডাটা বা উপাত্তের ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াকরণে ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের সফটওয়্যারের সাহায্যে অনুক্রমিত তথ্যসমূহ খুব সহজে প্রক্রিয়াকরণ করা যায়। যেমন– ডিবেস, ফক্সপ্রো, এক্সেস, ওরাকল, ভিজ্যুয়াল বেসিক ইত্যাদি হলো ডাটাবেজ সফটওয়্যার। এই সফটওয়্যারের সাহায্যে ডাটা বা উপাত্তসমূহের কাজ খুব সহজে ও সূচারুরূপে সম্পাদন করা যায়।

○ ডটার বোর্ড (Daughter Board) : কম্পিউটারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক অংশ, যেমন– সিপিইউ, মেমোরি, I/O কার্ড, প্রসেসর ইত্যাদি স্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত বোর্ড। এটিকে প্রধান প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড বা মাদার বোর্ড হিসেবেও অভিহিত করা হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের এক্সপানশন কার্ড স্থাপনের জন্য এক্সপানশন স্লট বসানো থাকে।

○ ডায়াল-আপ-লাইন (Dial-up-line) : ডাটা বা উপাত্ত প্রেরণের বা গ্রহণের জন্য সার্ভার কম্পিউটারে টেলিফোন ব্যবহার করে সম্পাদিত কার্যব্যবস্থাই হলো ডায়াল-আপ-লাইন।

○ ডাউনলোড (Download) : কম্পিউটারের নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় স্থানীয় সার্ভার থেকে অথবা দূরবর্তী কম্পিউটার থেকে কোনো ডকুমেন্ট বা তথ্য নিজস্ব কম্পিউটারে আনয়ন করার প্রক্রিয়াকে ডাউনলোড বলে। ডাউনলোড প্রক্রিয়ায় ইন্টারনেটের Web page থেকে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারটি কপি করে নিয়ে আসা যায়।

○ ডিস্ক ম্যাগনেটিক (Disk Magnetic) : এটি এক ধরনের চৌম্বকীয় ডিস্ক। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক এবং ফ্লপি ডিস্কসমূহকে ম্যাগনেটিক ডিস্ক বলে।

E

○ ই-মেইল (E-mail) : ই-মেইল (E-mail) হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল (Electronic mail), যা বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। ই-মেইল (E-mail) -এর আবির্ভাবে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। পোস্টাল সার্ভিস ও কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা যেমন চিঠিপত্র আদান-প্রদান করতে পারি তেমনি কম্পিউটারের সাহায্যেও চিঠিপত্র আদান-প্রদান করা যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে চিঠিপত্র আদান-প্রদানের এ ব্যবস্থাকে বলে ই-মেইল (E-mail)।

○ ইবিসিডিআইসি (EBCDIC) : ইবিসিডিআইসি (EBCDIC)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে এক্সটেন্ডেড বাইনারি কোডেড ডেসিমাল ইনফরমেশন কোড (Extended Binary Coded Decimal Information Code)। বিশ্ব বিখ্যাত আইবিএম কোম্পানি তাদের নিজস্ব কম্পিউটারে ব্যবহারের জন্য এই কোড উদ্ভাবন করেছে। এটি ৮ বিটের কোড, যার ডান দিকের ৪টি এবং অবশিষ্ট ৪ বিটের মধ্যে মাঝের ৩ বিট হলো জোনাল বিট এবং সর্ব বামের বিটটি প্যারাটি বিট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

○ ইনিয়াক (ENIAC) : ইনিয়াক (ENIAC)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ইলেকট্রনিক নিউমেরিক্যাল ইন্টিগ্রেটর অ্যান্ড ক্যালকুলেটর (Electronic Numerical Integrator and Calculator)। এটিই হলো প্রথম প্রজন্মের ডিজিটাল কম্পিউটার। আকারে এটি ছিল বৃহদাকার কম্পিউটার।

○ ইভেন্ট ড্রাইভেন প্রোগ্রামিং (Event Driven Programming) : এ পদ্ধতিতে কোনো ইভেন্ট যখন প্রোগ্রামের কোনো অংশের কোড কার্যকর করার জন্য সক্রিয় করে তখনই মাত্র সংশ্লিষ্ট নির্দেশ কার্যকর হয়। কী-বোর্ডের কোনো বোতামে চাপ দেয়া, কোনো বিশেষ কন্ট্রোলের উপর মাউস পয়েন্টার ক্লিক করা ইত্যাদি কাজ হলো ইভেন্ট। আর ড্রাইভেন হলো কোনো প্রসিডিউরের নির্বাহের কাজ হওয়া।

○ ই-কমার্স (E-Commerce) : ই-কমার্স (E-Commerce)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইলেকট্রনিক কমার্স (Electronic Commerce)। এটা হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাহায্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে ইলেকট্রনিক অন লাইনের মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেন ও পণ্যের আদান-প্রদান করা হয়।

○ ই-মেইল এড্রেস (E-mail Address) : ই-মেইল এড্রেস (E-mail Address)-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইলেকট্রনিক মেইল এড্রেস (Electronic Mail Address)। প্রত্যেকটি হোস্ট কম্পিউটারের একটি করে ই-মেইল এড্রেস থাকে, যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রান্তের কম্পিউটারসমূহের সাথে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। যেমন– একটি ই-মেইল এড্রেস হলো mos_cst03@yahoo.com।

○ এডিটর (Editor) : এডিটর হলো একধরনের প্রোগ্রাম যা মেমোরিতে জমা থাকে এবং ব্যবহারকারী এর সাহায্যে কোনো প্রোগ্রাম লিখতে, টেক্সট তৈরি বা পরিবর্তন এবং সংযোজন করতে পারে। যেমন বলা যায়, যদি কোনো নতুন প্রোগ্রাম সংশোধনের প্রয়োজন হয় তখন Editor প্রোগ্রামের সাহায্যে প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধন করা যায়।

○ ইজিএ (EGA) : EGA-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Enhanced Graphics Adapter. ১৯৮৪ সালের দিকে আইবিএম কোম্পানি এক ধরনের গ্রাফিক্স স্ট্যান্ডার্ড কার্ডের উদ্ভাবন করে, যা ইজিএ নামে পরিচিত।

○ ইআইএসএ (EISA) : EISA-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Extended Industry Standard Architecture। মাদারবোর্ডে সংযুক্ত ৩২ বিটের Expansion bus সমূহকে EISA হিসেবে অভিহিত করা হয়। EISA সংযোজনে ডিস্ক ড্রাইভ, ডিসপ্লে এডাপটার ইত্যাদি যন্ত্রাংশসমূহ সহজে সংযোজন করা যায়।

○ ইরোর কারেকটিং কোড (Error Correcting Code) : কম্পিউটারে নির্ণীত ভুলসমূহ সংশোধনের জন্য চিহ্নিত এক বিশেষ ধরনের কোড।

○ ইরোর ডিটেকটিং কোড (Error Detecting Code) : ইরোর ডিটেকটিং হলো কম্পিউটারের ভুল নির্ণায়ক; কম্পিউটারের কার্যাবলী সম্পাদনের সময় প্রয়োজনীয় সব ভুল-ভ্রান্তি নির্ণয় করার প্রক্রিয়া এটি।

○ ইথারনেট (Ethernet) : ডিজিটাল ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন, জেরক্স এবং বিশ্বখ্যাত ইন্টেল কোম্পানির সমন্বিত প্রচেষ্টায় উদ্ভাসিত লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক সিস্টেম।

F

○ ফরম্যাট (Format) : প্রতিটি ডিস্ক (Desk) প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন Desket বাজারজাত করা হলে সাধারণত এগুলো কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীর কম্পিউটারের ব্যবহারযোগ্য থাকে না। তাই যদি কোনো কম্পিউটারের জন্য Desket কে ব্যবহারের উপযোগী করে নিতে হয় তাহলে তাকে Format করে নিতে হবে।

○ ফার্মওয়্যার (Firmware) : ফার্মওয়্যার হলো একধরনের সফটওয়্যার। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের মাঝামাঝি গাঠনিক অবস্থা বলে একে ফার্মওয়্যার বলে। এ প্রোগ্রামগুলো স্থায়ীভাবে মেমোরিতে সংরক্ষিত থাকে। কম্পিউটার অন, অফ, স্টার্ট, রিস্টার্ট, ইনপুট এবং আউটপুটের যে কার্যধারা তা ফার্মওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ফার্মওয়্যারকে মনিটর প্রোগ্রাম নামেও অভিহিত করা যায়।

○ ফাইল (File) : কম্পিউটারের মেমোরিতে বিভিন্ন তথ্য এবং নির্দেশ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ডকুমেন্টকে ফাইল বলে। কোনো ডকুমেন্ট তৈরির পর তা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য একটি নাম দিতে হয়, যাকে ফাইলের নাম বলা হয়। ফাইলের নামে সাধারণত দুটি অংশ থাকে; একটি মূল অংশ এবং অপরটি বর্ধিত অংশ।

○ ফোল্ডার (Folder) : ফোল্ডারসমূহ হলো ড্রাইভের অন্যতম প্রধান উপাদান। প্রতিটি ড্রাইভে সাধারণত এক বা একাধিক ফোল্ডার থাকে। তবে একই নামে একটি ড্রাইভে একের বেশি ফোল্ডার থাকতে পারে না। ড্রাইভে ফাইলগুলো সাধারণত ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রেখে একটি ফোল্ডারের মধ্যে রাখা হয়। ফলে সেগুলো খুঁজে পেতে সহজ হয় এবং একটি ফাইলকে অন্যটি থেকে সহজে পৃথক করা যায়।

○ ফন্ট (Font) : ফন্ট হলো কোনো ভাষা লেখার জন্য সাংকেতিক চিহ্নগুলোর লিপিমালা বা স্টাইল। আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা বা সামঞ্জস্যপূর্ণতার ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন লিপিমালা বা ফন্ট ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়। বর্তমান বাজারে বিভিন্ন ধরনের ফন্ট পাওয়া যায়। যেমন– ইংরেজিতে আরিয়াল, বুকম্যান, জেনেভা ইত্যাদি। বাংলায় সুলেখা, বিজয়, প্রবর্তন লিপি, আনন্দ ইত্যাদি।

○ ফ্যাক্স (Fax) : ফ্যাক্স (Fax)-এর পূর্ণ নাম হলো ফ্যাসিমাইল (Facsimile)। দূরে কোনো সংবাদ পাঠানোর সঙ্গে কোনো দৃশ্য বা ছবি পাঠানোর এক প্রকার যন্ত্র। মূলত ফ্যাক্স হলো বর্তমান যুগের এক ধরনের অত্যাধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি।

○ ফ্লপি ডিস্ক (Floppy Disk) : বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত কম ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চৌম্বকীয় পদার্থের পাতলা ধাতব পাতের আবরণ লাগানো ডিস্ককে ফ্লপি ডিস্ক বলা হয়।

○ ফ্লিপ-ফ্লপ (Flip-Flop) : ফ্লিপ-ফ্লপ হচ্ছে লজিক গেট দ্বারা তৈরি এক ধরনের মেমোরি উপাদান, যা একটি বাইনারি বিট সংরক্ষণ করতে পারে। এর দুটি স্থায়ী অবস্থা ০ এবং ১ আছে। এটি এই দুটি স্থায়ী অবস্থার যে কোনো একটিতে থাকতে পারে।

○ এফটিপি (FTP) : এফটিপি (FTP) হচ্ছে ফাইল ট্রান্সফার প্রটোকল (File Transfer Protocol)। এই প্রটোকল ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ বা প্রেরণ করা হয়। এটি একটি ক্লায়েন্ট সার্ভার প্রটোকল, যা সার্ভার ও ক্লায়েন্ট কম্পিউটারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

○ ফরট্রান (FORTRAN) : ফরট্রান (FORTRAN) শব্দটির পূর্ণরূপ হলো ফরমুলা ট্রান্সলেশন (Formula Translation)। গাণিতিক উপায়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলিক সমস্যা সমাধানের জন্য এ ভাষা অত্যন্ত উপযোগী। বিশ্ববিখ্যাত আইবিএম কোম্পানি ১৯৫৭ সালে এ ভাষা চালু করে। বর্তমানে এ ভাষার ব্যবহার কমে এসেছে।

○ এফডিস্ক (FDisk) : এফডিস্ক হলো এক ধরনের ডস কমান্ড। যেমন– কোনো হার্ডডিস্ক ব্যবহার করার জন্য হার্ডডিস্কে কোনো অপারেটিং সিস্টেম বা ডস স্থাপন করতে হয়। অপারেটিং সিস্টেম স্থাপনার পূর্বে উক্ত কমান্ড দ্বারা হার্ডডিস্কের Configuration ঠিক করে নিতে হয়। অর্থাৎ নতুন স্থাপিত যে কোনো হার্ডডিস্কে কমান্ডটি প্রয়োগ করে পার্টিশন করে নিতে হয়। কমান্ডটি প্রয়োগ করলে মেনু সম্বলিত একটি স্ক্রীন প্রদর্শিত হয়। সেখান থেকে প্রয়োজনীয় অপশন নির্বাচন করা যায়।

○ ফ্যাট (FAT) : FAT-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ফাইল এলোকেশন টেবিল(File Allocation Table)। ডিস্কের সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য এ অংশেই সংরক্ষিত থাকে। এক কথায় ডিস্কের 'ইনডেক্স' হিসেবেও এটিকে আখ্যায়িত করা যায়। ডসের পূর্ববর্তী ভার্সনে FAT অংশে মেমোরির পরিমাণ ১৬ বিট পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান সময়ে ডস পার্টিশনের FAT অংশে মেমোরির পরিমাণ ৩২ মেগাবাইট।

○ ফ্লাগ রেজিস্টার (Flag Register) : কম্পিউটারে প্রাপ্ত নির্দেশাবলী নির্বাহের পর এটিউমুলেটর বা অন্যান্য রেজিস্টারসমূহের অবস্থা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত রেজিস্টার।

G

○ জিএএন (GAN) : GAN-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Global Area Network. যখন কোনো দূরবর্তী শহরগুলোতে অবস্থিত ল্যান বা ম্যান বা কম্পিউটারের বিশেষ স্থাপনার সাথে সংযুক্ত হয়ে যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তাকে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN বলে। বিভিন্ন শহরের মধ্যে তথ্য প্রযুক্তির সংযোগ ঘটে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

○ গেটওয়ে (Gateway) : লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের সাথে মেইনফ্রেম বা সুপার কম্পিউটারের মধ্যে অপর একটি শক্তিশালী কম্পিউটার সংযুক্ত করতে যে সংযোগ ব্যবস্থা বা আলাদা ডিভাইস ব্যবহৃত হয় তাকে গেটওয়ে (Gateway) বলা হয়।

○ গিগাবাইট (Gigabyte) : এটি কম্পিউটারের তথ্যসমূহ ধারণ ক্ষমতার উচ্চতর একক। ১০২৪ মেগাবাইটের সমপরিমান স্থানকে এক গিগাবাইট হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ জিআইএস (GIS) : GIS-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Geographic Information System. মানচিত্র, নকশা প্রভৃতির মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রে নিক্ষেপিত যুদ্ধযান নিয়ন্ত্রণ, গাড়ির গতিপথ নির্ধারণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এটি করে থাকে।

o গোফার (Gopher) : কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় তথ্য আহরণের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রক্রিয়া। FTP অথবা Telnet session-এর মধ্যে এটিকে চালনা করে হোস্ট কম্পিউটার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা যায় বলে ব্যবহারকারীগণ এটি ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। গোফার ব্যবহারে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলীকে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট মেনুতে ক্লিক করে সম্পাদন করা যায় বলে এটির ব্যবহার সুবিধাজনক।

o গার্ড মেমোরি (Guard Memory) : মেমোরি বা স্মৃতিতে সংরক্ষিত উপাত্তসমূহ নিরাপদে সংরক্ষণের নিমিত্তে বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ বা ব্যবহারকারীর পছন্দনীয় পদ্ধতিতে মেমোরিকে সুরক্ষা করা।

o জিইউআই (GUI) : GUI এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Graphical User Interface। কম্পিউটারের বর্ণভিত্তিক অবস্থাকে দূরীভূত করে চিত্র ভিত্তিক অবস্থায় রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে জিইউআই বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের গ্রাফিকাল ইলিমেন্ট যেমন- বাটন, আইকন, স্লাইড বার, ডায়ালগ বক্স, সিলেকশন লিস্ট ইত্যাদি ব্যবহার করে নির্দেশনা প্রয়োগ করা হয়।

H

o হার্ডওয়্যার (Hardware) : কম্পিউটারের যে কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশকেই হার্ডওয়্যার বলে। হার্ডওয়্যারকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায়। হার্ডওয়্যারকে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সম্মিলিত কার্যকলাপের মাধ্যমে কম্পিউটার তার কাজ সম্পন্ন করে থাকে। হার্ডওয়্যার প্রধান ইনপুট ডিভাইস, সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট এবং আউটপুট ডিভাইসের সমন্বয়ে গঠিত।

o এইচটিএমএল (HTML) : এইচটিএমএল (HTML)-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট মারকাপ ল্যাংগুয়েজ (Hyper Text Markup Language)। এটি ওয়েব পেজ তৈরির জন্য ব্যবহৃত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা। এটি মূলত টেক্সট ভিত্তিক প্রোগ্রাম ভাষা। এইচটিএমএল ব্যবহার করে সহজেই খুব সুন্দর ডকুমেন্ট পেজ তৈরি করা যায়। HTML ফাইলে টেক্সট ছাড়াও শব্দ সংযোজন এবং স্থির ও সচল ছবি প্রদর্শন করা যায়।

o হার্ডডিস্ক (Hard Disk) : হার্ডডিস্ক হচ্ছে অপেক্ষাকৃত অধিক ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন চৌম্বকীয় পদার্থের পাতলা ধাতব পাতের সমন্বয়ে গঠিত শক্ত ম্যাগনেটিক ডিস্ককে হার্ডডিস্ক বলে। এটি কম্পিউটারের সহায়ক স্মৃতি। এর ধারণ ক্ষমতা সাধারণত কয়েক মেগা বাইট থেকে কয়েক গিগাবাইট পর্যন্ত হয়।

o এইচটিটিপি (HTTP) : এইচটিটিপি (HTTP)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে হাইপার টেক্সট ট্রান্সফার প্রোটোকল (Hyper Text Transfer Protocol)। ডব্লিউ ডব্লিউ ডব্লিউ (www = World Wide Web) এর জন্য আদর্শ প্রোটোকল হলো এইচটিটিপি। এর কারণেই ওয়েবপেজগুলো পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করা যায়।

o হেড ক্র্যাশ (Head Crash) : ডিস্কে সংরক্ষিত তথ্যসমূহ পাঠ করার জন্য প্রতিটি ডিস্ক ড্রাইভে একটি করে হেড রয়েছে। ডিস্কের সাথে উক্ত হেডটির ঘর্ষণের ফলে তথ্যসমূহ কম্পিউটারের মেমোরিতে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত হেড এ ধূলাবালি জমে থাকা বা অন্য কোনো ঘর্ষণজনিত কারণে অনেক সময় ডিস্ক বা হেডটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ড্রাইভ হেড-এর কারণে ডিস্ক নষ্ট হয়ে যাওয়াকে হেড ক্র্যাশ বলে।

o হায়ারার্কি মেমোরি (Hierarchy Memory) : হায়ারার্কি মেমোরি হলো গঠনতান্ত্রিক স্মৃতি; কম্পিউটার স্মৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অংশের সামগ্রিক কার্যকলাপ।

o হোস্ট (Host) : কম্পিউটার নেটওয়ার্কে সংযোজিত প্রতিটি কম্পিউটারকে একেকটি হোস্ট কম্পিউটার হিসেবে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ স্থানীয় সার্ভারের মাধ্যমে সংযোজিত একেকটি ঠিকানা সম্বলিত কম্পিউটারকে হোস্ট কম্পিউটার বলে। অনেক সময় হোস্ট কম্পিউটারের সহায়তায় লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে কেবল কী-বোর্ড এবং মনিটরের মাধ্যমে একাধিক ব্যক্তি একই কম্পিউটারে কার্য সম্পাদন করে থাকে।

o হেড রিড (Head Read) : ডাটা বা উপাত্তসমূহ পঠনের জন্য চৌম্বকীয় ডিস্ক ড্রাইভে সংযোজিত একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ।

I

o ইন্টারনেট ফোন (Internet Phone) : ইন্টারনেট ফোনকে সংক্ষেপে ই-ফোন বা নেট ফোন বলা হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমন্বয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে টেলিফোনে কথা বলার অত্যাধুনিক পদ্ধতি। ইন্টারনেট ফোনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এই ফোনের মাধ্যমে লোকাল ফোনের রেটে পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই কথা বলা যায়।

o আইএসডিএন (ISDN) : আইএসডিএন (ISDN)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইনটিগ্রেটেড সার্ভিসেস ডিজিটাল নেটওয়ার্ক (Integrated Services Digital Network)। একটি সাধারণ বাহকের মাধ্যমে একই সাথে ডাটা, কথা, ছবি প্রভৃতি আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সংগঠিত ডিজিটাল নেটওয়ার্ককে আইএসডিএন বলা হয়।

o ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে (Information Super Highway) : বর্তমানে তথ্য পরিবহনের জন্য বিভিন্ন ধরনের তথ্য পরিবহন ক্ষমতাবিশিষ্ট পরিবহন মাধ্যম চালু আছে। কথা বা ডাটা ধীর গতিতে প্রেরণের চেয়ে সচল চিত্র বা মুভি প্রেরণ, ভিডিও কনফারেন্সিং, মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রাম প্রভৃতির প্রেরণের জন্য সংযোগ পথ দিয়ে একই সাথে কথা, ছবি ইত্যাদি স্থানান্তর করার প্রয়োজন হয়। এজন্য অতি উচ্চ গতিসম্পন্ন পরিবহন মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এরূপ পরিবহন মাধ্যমকে ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ে বলে।

o ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) : ইন্টারপ্রেটার একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম যা উচ্চ স্তরের প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় পরিণত করে। এ প্রোগ্রাম এক লাইন এক লাইন করে পড়ে প্রোগ্রামকে যান্ত্রিক ভাষায় রূপান্তরিত করে।

o আইআরসি (IRC) : আইআরসি (IRC)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ইন্টারনেট রিলে চ্যাট (Internet Relay Chat)। এটি একটি ইন্টারনেট সার্ভিস। এ ব্যবস্থায় একজন ব্যবহারকারী তার কম্পিউটার হতে অন্য একজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে গল্প করতে পারেন।

o আইসি (IC) : IC-এর অর্থ হলো Integrated Circuit. অর্ধপরিবাহী বস্তুর সামান্য ও পাতলা চিকরোর উপর অসংখ্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশ দিয়ে তৈরি একধরনের বর্তনী। এটিই সংক্ষেপে আইসি নামে পরিচিত। আইসি আবিষ্কৃত হওয়ার পর কম্পিউটারের আকৃতি অনেক ছোট হয়ে এসেছে।

o আইপিএস (IPS) : IPS-এর পূর্ণ অর্থ হলো Instant Power Supply। এটি এক ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই মেশিন। আইপিএস এর ভিতরে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাটারি থাকে। বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার সাথে সাথে আইপিএস কয়েক মিলি সেকেন্ডের মধ্যে তার ব্যাটারি হতে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। আইপিএস এর সাথে ইউপিএস ব্যবহার করলে আরও ভালো ফল পাওয়া যায়।

○ ইনডেক্সিং (Indexing) : ইনডেক্সিং হলো এক ধরনের কৌশল যাতে ডাটার মানগুলো একটি ক্রম তালিকায় বিন্যস্ত থাকে এবং তালিকা থেকে নির্দিষ্ট ডাটার মান জানা যায় ও পরবর্তী ডাটার অবস্থান বোঝা যায়।

○ ইনডেক্স রেজিস্ট্রার (Index Resister) : এটি এক ধরনের রেজিস্ট্রার যা সিপিইউতে অবস্থিত যার প্রধান কাজ হলো Instruction গুলোকে ইনডেক্স করা।

○ ইনফরমেশন (Information) : ইনফরমেশন বা তথ্য বলতে এমন একটি বিষয়ের সম্পূর্ণ খবরাখবরকে বোঝায় যা ডাটা বা উপাত্তের একটি বৃহৎরূপ। সাধারণভাবে বলা যায়, কোনো উপাত্তকে নির্দিষ্ট নিয়মে একটি বিশেষ সজ্জায় সজ্জিত করলে তাকে ইনফরমেশন বা তথ্য বলা হয়।

○ উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ (Information Processing) : ডাটা বা উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ হলো এমন এক ধরনের পদ্ধতি যার সাহায্যে কোনো উপাত্তকে তথ্যে পরিণত করা যায়। মূলত কোনো উপাত্তকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে সজ্জিত করা হলে তা তথ্যে পরিণত হয়।

○ ইনস্ট্রাকশন সেট (Instruction Set) : সাধারণত একটি কম্পিউটার যত ধরনের ইনস্ট্রাকশনকে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে তার একটি তালিকা বা সেট হলো ইনস্টাকশন সেট। এটি বিভিন্ন প্রোগ্রামে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

○ ইন্টারফেস (Interface) : ইন্টারফেস হলো দুটি ডিভাইসের মধ্যস্থিত একটি মিশানো বা পৃথকীকরণ দেয়াল। কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ইন্টারফেস সব সময় এই অর্থ বহন করে না। এটি দ্বারা কোনো ডিভাইসের সাথে অন্য কোনো ডিভাইসের সংযোগকে বোঝায়। যেমন সিপিউ-এর সাথে কিবোর্ড ইন্টারফেস অথবা সিপিউ-এর সাথে মাউসের ইন্টারফেস ইত্যাদি।

○ ইন্টারনেট প্রটোকল (IP = Internet Protocol) : ইন্টারনেট প্রটোকল সাধারণত এক বা একাধিক লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ককে ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করতে সহায়তা করে। যেমন– ইন্টারেটে সংযুক্ত সবগুলো কম্পিউটার বা টার্মিনালের একটি নির্দিষ্ট ও পৃথক পৃথক IP Address থাকে।

○ ইন্টারনেটওয়ার্কিং (Internetworking) : একের অধিক কম্পিউারের মধ্যস্থিত সংযোগের মাধ্যমে একটি বিশাল নেটওয়ার্ক গঠন করার পদ্ধতিকে ইন্টারনেটওয়ার্কিং বলা হয়। ইন্টারনেটওয়ার্কিং সাধারণত কোনো LAN, MAN বা WAN এর ইন্টারনেটের সাথে কানেকশনকে বোঝায়।

○ ইন্টারপ্ট (Interrupt) : এটি এক ধরনের সিগন্যাল যা কম্পিউটারকে বুঝতে দেয় যে, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হয়েছে এবং এই মুহূর্তে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন– কম্পিউটারে কোনো প্রোগ্রাম রান করার সময় যদি অন্য আরেকটি প্রোগ্রাম রান করানো হয় বা ইনপুট ডিভাইস থেকে ডাটা প্রেরিত হয় তখন এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।

○ ইনভার্টার (Inverter) : এটি এক ধরনের লজিক্যাল বা যৌক্তিক বর্তনী যার কাজ হলো কোনো সিগন্যাল এর বিপরীত সিগন্যাল তৈরি করা। এটি সাধারণত Not operation হিসেবে পরিবর্তিত হয়।

○ আই/ও প্রসেসর (I/O Processor) : আই/ও প্রসেসর সাধারণত গ্রহণ ও নির্গমন অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে; কম্পিউটারের গ্রহণ মুখ ও নির্গমনমুখ যন্ত্রাংশসমূহের সাথে প্রধান মেমোরির যোগাযোগের মাধ্যমকে আই/ও প্রসেসর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ আইবিএম (IBM) : IBM-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে International Business Machine। কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের জন্য ১৮৯৬ সালে স্থাপিত একটি কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান।

○ আইকন (Icon) : বর্ণভিত্তিক (ডস) কম্পিউটার সিস্টেমকে চিত্রভিত্তিক (উইন্ডোজ) কম্পিউটার সিস্টেমে রূপান্তর করায় এর ব্যবহার ও পরিচালনা অত্যন্ত সহজ ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। চিত্রভিত্তিক কম্পিউটার সিস্টেমে কমান্ডসমূহকে বিভিন্ন চিত্র দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে কমান্ড মুখস্থ করার কোনো ঝামেলা নেই। প্রতিটি চিত্রকে একেকটি কমান্ড দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে। উইন্ডোজ সিস্টেমে প্রদর্শিত উক্ত চিত্রসমূহকে আইকন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ ইনটেলিজেন্স আর্টিফিসিয়াল (Intellegence Artificial) : কম্পিউটারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। যে বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পাদন করতে পারে।

J

○ জয়স্টিক (Joystic) : এটি হাতল যুক্ত এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস। এর হাতলটি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সিপিইউতে সরাসরি বিভিন্ন তথ্য প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও এটির সহায়তায় কম্পিউটারের কার্সরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কম্পিউটারের সাহায্যে ভিডিও গেম খেলার জন্য একটি অতি জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইসের নাম হচ্ছে 'জয়েস্টিক'।

○ জাম্পার (Jumper) : কম্পিউটারের মাদারবোর্ডে স্থাপিত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রাংশ সংযোজন বা বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যম হলো জাম্পার।

○ জাংশন (Junction) : বৈদ্যুতিক বর্তনীর সংযোগস্থল। ভিন্নধর্মী বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে দুই বা ততোধিক সেমিকন্ডাক্টরের মিলনস্থল।

○ জেসিএল (JCL) : JCL-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Job Control Language. চলমান সব কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে বিভিন্ন ধরনের কমান্ড সম্বলিত প্রোগ্রামিং ভাষা।

K

○ কী-ফরম্যাট (Key-format) : ডকুমেন্ট সম্পাদিত তথ্যকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য কী বোর্ডের যেসব কী ব্যবহৃত হয়ে থাকে সেসকল কী কে ফরম্যাট কী হিসেবে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন প্যাকেজে ফরম্যাট কী বিভিন্ন হতে পারে।

○ কী-লক (Key-lock) : প্রক্রিয়াকরণ অংশের সম্মুখভাগে অবস্থিত বোতামটি তালা আকৃতির। চাবির সাহায্যে এতে কাজ করতে হয়। চাবি দিয়ে বন্ধ করে রাখলে প্রক্রিয়াকরণ অংশের সাথে কী-বোর্ড বা অন্য কোনো ইনপুট ডিভাইস-এর কোনো সম্পর্ক থাকে না। ফলে কম্পিউটার কাজ করে না।

○ কী-বোর্ড কানেকটর (Key-board Connector) : কী-বোর্ডের সংযোজনকারী, মাদারবোর্ডে স্থাপিত সংযুক্ত এ কানেক্টরটির সাহায্যে কী-বোর্ডকে কম্পিউটারের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়।

○ কী-ওয়ার্ড (Key-word) : কী-ওয়ার্ড হলো প্রোগ্রামিং ভাষায় কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিশেষ চিহ্ন বা শব্দ। যেমন– PRINT, THEN ইত্যাদি।

L

○ ল্যাচ (Latch) : ল্যাচ হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা সাময়িকভাবে এক বিট ডাটা ধারণ করতে পারে। একে অনেক সময় সাধারণ মানের ফ্লিপ ফ্লপও বলা হয়।

○ লজিক সার্কিট (Logic Circuit) : যেসব বর্তনী বা সার্কিট লজিক্যাল অপারেটর বা বুলিয়ান অপারেটর ব্যবহার করে কোনো যৌক্তিক অপারেশন সংঘটিত করে থাকে তাকে লজিক সার্কিট বলা হয়। যেমন– বাইনারি লজিক সার্কিট।

○ লজিক গেট (Logic Gate) : লজিক বা যৌক্তিক গেট হলো এক ধরনের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ডিভাইস যা বুলিয়ান এলজেবরা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের যৌক্তিক অপারেশন বা লজিক অপারেশন করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের লজিক গেটের মধ্যে মৌলিক গেট হলো– AND গেট, OR গেট এবং NOT গেট। এসব গেট ব্যবহার করে অন্যান্য যৌক্তিক গেট তৈরি করা যায়।

○ ল্যান (LAN) : ল্যান (LAN)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network)। একই বিল্ডিং বা স্বল্প পরিসর জায়গার মধ্যে অবস্থিত কতগুলো কম্পিউটার নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্ককে বলা হয় লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান।

○ লেজার প্রিন্টার (Laser Printer) : লেজার প্রিন্টার হলো উচ্চ ঘনত্বের মুদ্রণ যন্ত্র। এই প্রিন্টারের প্রিন্ট কোয়ালিটি খুবই উন্নত। এ প্রিন্টারে লেজার রশ্মি দ্বারা কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা যায়। লেজার প্রিন্টারে ব্যবহৃত কার্টিজকে টোনার বলে।

○ লাইট পেন (Light Pen) : লাইট পেন (Light Pen) হচ্ছে এক ধরনের আলোক সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক পেন যা কম্পিউটারের ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লাইট পেনের সাহায্যে গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ এবং মাউসের ন্যায় মেনু কমান্ড সিলেক্ট করা যায়।

○ লিফো (LIFO) : লিফো (LIFO)-এর পূর্ণ রূপ হলো লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট (Last In First Out)। এর অন্য নাম হলো স্ট্যাক (Stack)। যেসব ক্ষেত্রে সবচেয়ে শেষের ডাটা সবচেয়ে আগে ব্যবহৃত হয় তাকে লিফো (LIFO) বলা হয়। যেমন এক সাথে অনেকগুলো থালা একটির উপর আরেকটি রাখা হলে সবচেয়ে শেষে রক্ষিত থালাটি সবার আগে উঠানো যায়।

○ লাইন প্রিন্টার (Line Printer) : লাইন প্রিন্টার প্রতিবারে এক এক লাইনের তথ্য প্রিন্ট করে। এই প্রিন্টারে প্রতিমিনিটে ২০০ থেকে ৩০০ লাইন পর্যন্ত প্রিন্ট করতে পারে।

○ লগ ইন (Log in) : লগ ইন হলো এক ধরনের কৌশল যার সাহায্যে কোনো ইউজার (U কোনো একটি মাল্টি ইউজার অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করার জন্য অনুমতি পায়।

○ লগ অফ (Log off) : লগ অফ হলো কোনো ইউজার অপারেটিং সিস্টেমে তার কাজ শেষ যাওয়ার একটি কৌশল।

○ ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer) : ক্ষুদ্রাকৃতির কম্পিউটার, যেটি আকারে খুবই অর্থাৎ এ ধরনের কম্পিউটার সাধারণত কোলের উপর রেখে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়।

○ লাইন ডায়াল আপ (Line dial-up) : ডাটা বা উপাত্ত প্রেরণের বা গ্রহণের নিমিত্তে সার্ভার কম্পিউটারের টেলিফোন ব্যবহার করে সম্পাদিত কার্যব্যবস্থা।

○ লিনিয়ার অ্যারে (Linear Array) : খুব স্বল্প সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে গাণিতিক কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য লিনিয়ার পদ্ধতিতে কম্পিউটারে তথ্য সন্নিবেশন করা যায়।

○ এল আই এস পি (LISP) : LISP এর পূর্ণরূপ হচ্ছে List Processing। এটি নিউমেরিক্যাল নয় এমন ধরনের উপাত্তসমূহ প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামিং ভাষা।

○ লুপিং (Looping) : যার মাধ্যমে কোনো কাজ বার বার সমাধান করা। এক্ষেত্রে যদি কোনো একটি নির্দিষ্ট শর্তকে সমর্থন করে তবে প্রোগ্রামের নির্দিষ্ট কমান্ডটি বার বার পড়তে থাকে, যতক্ষণ না উক্ত শর্তটি মিথ্যা বা সত্য প্রমাণিত হয়। যেমন– Do, While-Loop।

M

○ ম্যাগনেটিক ডিস্ক (Magnetic Disk) : এটি এক ধরনের মেমোরি ডিভাইস। যাতে এক বা একাধিক গোলাকার প্লেট থাকে এবং প্লেটগুলোর উপর ও নিচে ম্যাগনেটিং ফিল্মের প্রলেপ থাকে। এই প্রলেপ সাধারণত ফেরিক অক্সাইড অথবা কোবাল্ট বা নিকেলের হয়ে থাকে।

○ ম্যাগনেটিক ড্রাম (Magnetic Drum) : এটি এক ধরনের ঘূর্ণায়মান চৌম্বকীয় মেমোরি ডিভাইস। এগুলো তখনই ব্যবহৃত হতো। যখন র‍্যানডম একসেস (Random Access) ডিভাইসগুলো উদ্বায়ী এবং ব্যয়বহুল ছিল।

○ মিকার (MICR = Magnetic Ink Character Recognizer) : এটি এক ধরনের স্ক্যানার যা ম্যাগনেটিক ইঙ্ক (Magnetic Ink) দ্বারা লিখিত তথ্য পড়তে বা বুঝতে পারে।

○ মেমোরি (Memory) : মানুষের মতো কম্পিউটারেরও মেমোরি বা স্মৃতি রয়েছে। গাণিতিক যুক্তি অংশের কাজের ফলাফল সংরক্ষণ করা এবং প্রাপ্ত ফলাফল পরবর্তীতে ব্যবহার করার জন্য নিয়ন্ত্রণ ইউনিটের সাথে দু ধরনের স্মৃতি সংযুক্ত থাকে।

i. প্রধান স্মৃতি (Main Memory)

ii. সহায়ক স্মৃতি (Auxiliary Memory)

○ মনিটর (Monitor) : কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত টিভির পর্দার মতো যে অংশটি থাকে তাকে মনিটর বলে। সিপিইউ এর নির্দেশে কম্পিউটারের ব্যবহৃত যাবতীয় তথ্যাবলী, লেখা, ছবি ইত্যাদি মনিটরের পর্দায় প্রদর্শিত হয়। টেলিভিশনের ন্যায় মনিটরও সাদা কালো বা রঙিন হতে পারে। টিভি কার্ড ব্যবহার করে মনিটরে টিভির ন্যায় সকল প্রকার অনুষ্ঠানও দেখা যায়।

○ ম্যাগনেটিক টেপ (Magnatic Tape) : ম্যাগনেটিক টেপ হলো আয়রণ অক্সাইডের প্রলেপযুক্ত প্লাস্টিকের ফিতা। এ ফিতা রীলে জড়ানো অবস্থায় বা ক্যাসেট আকারে পাওয়া যায়। এর ডিস্কের সংরক্ষণ পদ্ধতি হার্ড ডিস্কের সংরক্ষণ পদ্ধতির অনুরূপ। বর্তমানে এর ব্যবহার খুব কম।

○ মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft Word) : মাইক্রোসফট ওয়ার্ডকে সংক্ষেপে এমএস ওয়ার্ড (MS Word) বলে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন কর্তৃক বাজারজাতকৃত মাইক্রোসফট অফিস প্রোগ্রামের অন্তর্গত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ওয়ার্ড প্রসেসিং প্রোগ্রাম। এটি ব্যবহার করে খুব সহজেই ডকুমেন্ট তৈরিকরণ, সংরক্ষণ, বানান ও ব্যাকরণ জনিত ভুল সংশোধন, লেখা ছোট-বড় করা, বিভিন্ন ফন্ট আঙ্গিকে লিখন, চিত্র অঙ্কন, প্রভৃতি কাজ করা যায়।

○ এমএআর (MAR) : এমএআর (MAR)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে মেমোরি এড্রেস রেজিস্টার (Memory Address Register)। এই রেজিস্টারের সাহায্যে স্মৃতি থেকে ডাটাগুলো পাঠ করা হয়। এ রেজিস্টার প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের কম্পিউটার থেকে পরবর্তী নির্দেশের এড্রেস এমএআর (MAR) এ প্রেরণ করে। এই নির্দেশ বাসের মাধ্যমে মেমোরি এড্রেস রেজিস্টার থেকে স্মৃতিতে যায়।

○ এমবিআর (MBR) : এমবিআর (MBR)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে মেমোরি বাফার রেজিস্টার (Memory Buffer Register)। স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত বা স্মৃতিতে প্রেরিত কোনো নির্দেশ, কোড, ডাটা বা উপাত্ত এই রেজিস্টারে সাময়িকভাবে জমা থাকে। এই রেজিস্টার ডাটা বাসের সাথে সংযুক্ত।

○ ম্যান (MAN) : ম্যান (MAN)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network)। একই শহরের মধ্যে একাধিক কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ককে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ম্যান (MAN) বলে।

○ মাইক্রোওয়েভ (Microwave) : খুব উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি বিশিষ্ট তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গকে মাইক্রোওয়েভ বলে। এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিমি থেকে ৩০ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। এর ফ্রিকোয়েন্সি ১ গিগা হার্জ থেকে ১ টেরা হার্জ পর্যন্ত হয়।

○ মাইক্রোফোন (Microphone) : মাইক্রোফোনে একটি পাতলা ধাতব খণ্ড থাকে যাকে ডায়াফ্যাম বলে। ডায়াফ্যাম শক্ত যন্ত্রের সাথে আটকিয়ে দেয়া হয়। ফলে তা বৈদ্যুতিক সার্কিটের অংশ হিসেবে কাজ করে। যখন শব্দতরঙ্গ এ ডায়াফ্রামে আঘাত করে তখন এতে কম্পনের সৃষ্টি হয় যা সার্কিটের মধ্য দিয়ে চলমান বিদ্যুৎ তরঙ্গকে বৈদ্যুতিক সংঘাতে রূপান্তরিত করে।

○ মিস (MIS = Management Information System) : এটি এক ধরনের তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি যার প্রধান কাজ হলো ম্যানেজমেন্ট (Management) অংশকে ইনফরমেশন (Information) প্রদান করা। এটি বর্তমানে খুবই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

○ মাস-স্টোরেজ (Mass-Storage) : মাস-স্টোরেজ হলো এক ধরনের অন লাইন স্টোরেজ সিস্টেম যা বিপুল পরিমাণ তথ্য সঞ্চয় করতে ব্যবহৃত হয়। এটি অনেক ক্ষেত্রে বেকিং স্টোরেজ (Backing Storage) হিসেবে পরিচিত।

○ মাস্টার ফাইল (Master File) : মাস্টার ফাইল বলতে ঐসব ফাইলগুলোকে বোঝায় যাদের মধ্যে অন্যান্য ফাইলের রেকর্ড (Record) এর সংক্ষিপ্ত বিন্যাস থাকে। ফাইল প্রসেসিং এর সময় প্রতি সাইকেল (Cycle) এ এই ফাইলটি আপগ্রেড হয়।

○ মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) : মাইক্রোপ্রসেসর হলো এক ধরনের সেমিকন্ডাক্টর চিপ যা কোনো কম্পিউটারের সিপিইউতে অবস্থান করে। এর প্রধান কাজ হলো কম্পিউটারে ইনপুট হিসেবে প্রেরিত উপাত্তগুলোকে তথ্যে পরিণত করার জন্য নির্দেশ প্রদান, গাণিতিক কাজ সনাক্তকরণ অথবা মেমোরিতে জমাকরণ। এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটারের সকল কাজের উৎস হলো এই মাইক্রোপ্রসেসর। এজন্য একে কম্পিউটারের ব্রেইন বা মস্তিষ্ক বলা হয়। মাইক্রোপ্রসেসরের গতির উপর একটি কম্পিউটারের গতি অনেকাংশে নির্ভর করে।

○ মডেম (Modem) : মডেম হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যা একই সাথে মডুলেশন ও ডিমডুলেশন এর কাজ করতে পারে। মডুলেশন হলো ডিজিটাল সিগন্যালকে সুবিধাজনক এনালগ সিগন্যালে পরিণত করা। ডিমডুলেশন হলো মডুলেটেড এনালগ সিগন্যালকে আবার ডিজিট্যাল সিগন্যালে পরিণত করে।

○ মাউস (Mouse) : মাউস হলো এক ধরনের ইনপুট ডিভাইস। এটি দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো। সাধারণত GUI (Graphical User Interface) সিস্টেমে এটি ব্যবহৃত হয়। এর সাহায্যে সহজেই কোনো অংশ সিলেক্ট করা যায়। বর্তমান বাজারে বিভিন্ন রকম বাটন বিশিষ্ট মাউস পাওয়া যায়।

○ ম্যানেজমেন্ট ফাইল (Management File) : কম্পিউটারের মেমোরিতে উপাত্তসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য এগুলো উক্ত মেমোরির প্রয়োজনীয় অংশে সংরক্ষণ করা। যেমন– বিভিন্ন ডিরেক্টরি বা সাব-ডিরেক্টরিতে তথ্য সংরক্ষণ করে এগুলো প্রয়োজনানুযায়ী বিন্যস্ত করা হয়।

○ মেমোরি হায়ারারকি (Memory Hierarchy) : কম্পিউটারের গঠনতান্ত্রিক স্মৃতি, কম্পিউটার স্মৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন অংশের সামগ্রিক কার্যকলাপ।

○ মিমড প্রসেসর (MIMD Processor) : MIMD-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Multiple Instruction Multiple Date। বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা ব্যবহারের মাধ্যমে একই ধরনের উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতিকে মিমড প্রসেসর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ ম্যাথড র‍্যানডম এক্সেস (Method Rendom Access) : কম্পিউটারের কাজের গতিময়তা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন ও পরিচালনার কলাকৌশল।

N

○ নয়েজ (Noise) : নয়েজ হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক সিগন্যাল যা কোনো ডিভাইসে অবস্থান করে মূল সিগন্যালকে পরিবর্তন করে এবং যার ফলে মূল ডাটা ট্রান্সমিশনে ব্যাঘাত ঘটে।

○ নেগেটিভ লজিক (Negative Logic) : এটি এক ধরনের লজিক সিস্টেম যেখানে High ভোল্টেজকে Logic শূন্য ধরা হয় এবং Low voltageকে 1 ধরা হয়।

○ নেটওয়ার্ক (Network) : নেটওয়ার্ক হচ্ছে যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে পরস্পর আন্তঃসংযোগ বিশিষ্ট কতকগুলো কম্পিউটারের সমষ্টি যেগুলো পরস্পর ডাটা ও তথ্য আদান-প্রদান করে।

○ নেম ডাটা (Name data) : কম্পিউটারের উচ্চতর ভাষার উপাত্তসমূহকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে প্রোগ্রামার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের চিহ্নের মাধ্যমে উপাত্তসমূহ নামকরণের প্রক্রিয়া।

○ নেটওয়ার্ক আর্কিটেকচার (Network Architecture) : কম্পিউটারের যোগাযোগ ব্যবস্থায় গৃহীত নকশা। যেটি ব্যবহারকারীর প্রয়োজনানুযায়ী গৃহীত যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করে।

○ নেটওয়ার্ক ইথারনেট (Network Ethernet) : লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর আওতায় ইথারনেট কার্ড ও ক্যাবলের সাহায্যে যে নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয় তাকে ইথারনেট নেটওয়ার্ক বলা হয়। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর উক্ত ক্ষেত্রটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল বিধায় এটি কেবল বড় বড় প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যবহৃত হয়।

○ নেটওয়ার্ক লেয়ার (Network Layer) : নেটওয়ার্ক লেয়ার হলো Open System Interconnection (OSI) মডেলের ৩নং স্তর। সঠিক গন্তব্যে উপাত্ত বা ডাটা পৌঁছল কিনা তা নির্ধারণের জন্য প্রটোকল তৈরি করা হলো এর প্রধান কাজ।

O

○ ওওপি (OOP-Object Oriented Programming) : এটি এক ধরনের প্রোগ্রামিং সিস্টেম, যাতে প্রসিডিউর (Procedure)-এর পরিবর্তে অবজেক্ট ও মেসেজ নিয়ে কাজ করা হয়। অবজেক্ট হলো অনেকগুলো ডাটার সমষ্টিতে ডাটাগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তার পরিচয় কৌশল। আবার মেসেজ হলো একটি অবজেক্ট কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার বর্ণনা।

○ অফ লাইন (Off Line) : কম্পিউটার ব্যবহারকারীগণ নিকটবর্তী কোনো সার্ভারকে মাধ্যম হিসেবে ধরে কম্পিউটার বিশ্বে বিচরণ করার প্রক্রিয়াকে অফ লাইন (Off Line) বলে।

○ অন লাইন (On Line) : টেলিফোনের মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউটারকে ইন্টারনেটের অন্য যে কোনো সার্ভিস প্রোভাইডারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে অন লাইন (On Line) বলে।

○ ওএস (OS-Operating System) : অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এক বা একাধিক প্রোগ্রামের সমষ্টি একটি সফটওয়্যার যা ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী কম্পিউটারের অভ্যন্তরে হার্ডওয়্যার ও এপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমগ্র কর্ম পরিচালনা করে।

○ অপটিক্যাল ফাইবার (Optical Fiber) : বিশ্বব্যাপী কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থায় অপটিক্যাল ফাইবার একটি জনপ্রিয় মাধ্যম। এ ক্যাবল ইলেকট্রনিক সিগন্যালের পরিবর্তে আলো সিগন্যালট্রান্সমিট করে। এটি তৈরিতে গ্লাস ও প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়। অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল সিলিন্ডার আকৃতির। এটি তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত কোর, ক্লাডিং এবং জ্যাকেট। অপটিক্যাল ফাইবারের ডাটা স্থানান্তরের হার কয়েক গিগা বাইট পর্যন্ত হয়।

○ অক্টাল নোটেশন (Octal Notation) : সংখ্যা পদ্ধতির যে পদ্ধতিতে ০ থেকে ৭ পর্যন্ত অঙ্কগুলো ব্যবহার করে সবগুলো সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাকে অক্টাল নোটেশন (Octal Notation) বলে।

○ অড পার্টি (Odd Party) : এটি এক ধরনের প্যারটি বিট যা তখনই অন (1) হবে তখন ইনপুট বা আউটপুটের সবগুলোর সামঞ্জস্যতা হবে একটি অড নম্বর (Odd Number)।

○ আউটপুট (Output) : কম্পিউটারে কোনো নির্দেশ বা ডাটা/উপাত্ত ইনপুটের মাধ্যমে গ্রহণ করে তা প্রক্রিয়াকরণে পর কম্পিউটারে তার ফলাফল প্রদান করে। এ ফলাফল প্রদান করাকে কম্পিউটারের আউটপুট (Output) বলে। কম্পিউটারের আউটপুট ডিভাইস হলো মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার ইত্যাদি।

○ ওসিআর (OCR) : ওসিআর (OCR)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিডার (Optical Character Reader)। ওসিআর স্ক্যান করা ইমেজকে তার স্মৃতিতে ধারণ করে তার অক্ষরের আকৃতির সাথে মিলিয়ে পাঠযোগ্য বর্ণে রূপান্তর করে। কোনো বিশেষ আকৃতিকে কোনো বিশেষ কোড হিসেবে ওসিআর সফটওয়্যার চিনে থাকে। ফলে ব্যবহারকারী যখন কম্পিউটারের পর্দায় ছবিটি আনেন তখন সেটি বর্ণে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

○ ওএমআর (OMR) : ওএমআর (OMR)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে অপটিক্যাল মার্ক রিডার (Optical Mark Reader)। ওএমআর আলোর প্রতিফলনের সাহায্যে কোনো বিষয়কে মার্ক করে শুধুমাত্র তার চিহ্নগুলো পাঠ করে কম্পিউটারকে জানায়। বর্তমানে মাধ্যমিক ও বিসিএস পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর খুব দ্রুত যাচাই করে তার ফলাফল প্রদানের জন্য ওএমআর পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে।

○ ওএসআই (OSI) : ওএসআই (OSI)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ওপেন সিস্টেম ইন্টারকানেকশন (Open System Interconnection)। এটি একটি প্রোটোকলের রেফারেন্স মডেল। এ মডেলটি কমিউনিকেশন সফটওয়্যারের সকল স্ট্যান্ডার্ড শর্ত পূরণ করে। এর সাতটি স্তর বা লেয়ার বিশেষ কোনো নেটওয়ার্ক ফাংশন বা কার্যাবলী নির্দেশ করে থাকে।

○ ওভার ফ্লো (Overflow) : ওভার ফ্লো হলো এক ধরনের অবস্থা (Condition)। যখন কোনো গাণিতিক অপারেশনের ফলাফল কোনো মেমোরি স্থানান্তরের জায়গা থেকে বেশি হয় তখন একটি ইরোর মেসেজ (Error Message) আসে যাকে ওভার ফ্লো বলা হয়।

○ অবজেক্ট আর্কিটেকচার (Object Architecture) : কম্পিউটারের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রসেসর, ফাইল এবং বিভিন্ন ইনপুট-আউটপুট ডিভাইস সংযোজনের জন্য বিভিন্ন ধরনের নকশা অংকন করার প্রক্রিয়া অবজেক্ট আর্কিটেকচার করে থাকে।

○ অপারেটর রিলেশনাল (Operator Relational) : সাধারণত দুজন কম্পিউটার ব্যবহারকারীর কার্যাবলীর মধ্যে পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে সঠিক কাজটি বের করার প্রণালী হলো অপারেটর রিলেশনাল।

○ ওরাকল (Oracle) : বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত বা ডাটা তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের ডাটাবেস প্যাকেজ হলো ওরাকল।

○ অপটিক্যাল ক্যারেক্টার রিকগনিশন (Optical Character Recognition) : স্ক্যানারের সাহায্যে স্ক্যান করে ইমেজ বা প্রয়োজনীয় বস্তুটিকে কম্পিউটারে নেয়ার পর এটিকে বিভিন্নভাবে মেনিপুলেট করা হয়ে থাকে। এ পরিস্থিতিতে OCR সফটওয়্যারের সাহায্যে ডাটাকে স্ক্যান করার পর এগুলোকে কম্পিউটার ক্যারেক্টারে রূপান্তরিত করা যায়।

P

○ প্যারামিটার (Parameter) : যে ভেরিয়েবল চলকের সাহায্যে সব উপাত্তকে কোনো সাবরুটিন প্রসিডিউর থেকে মেইন ফাংশন (Main Function)-এ পাঠানো হয় তাকে প্যারামিটার বলে।

○ প্যাসকেল (Pascal) : প্যাসকেল সাধারণের ব্যবহার উপযোগী একটি হাই লেভেল প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ (High Level Programming Language)। ফরাসি বিজ্ঞানী ব্লেইজ প্যাসকেলের নামানুসারে এ ভাষার নামকরণ করা হয় প্যাসকেল।

○ পোর্ট (Port) : পোর্ট শব্দটির বাংলা আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বন্দর। অর্থাৎ এমন একটি স্থান যেখানে মালামাল উঠানামা করা হয়, অর্থাৎ আদান-প্রদান করা হয় এবং যেখানে মালামাল সাময়িক অবস্থান করে। কম্পিউটারের বেলায়ও পোর্ট কথাটি ব্যবহৃত হয়। কম্পিউটারের পোর্ট হলো যে স্থান দিয়ে ডাটা সিরিয়াল বা প্যারালাল পদ্ধতিতে এক স্থান থেকে অন্য কোনো কম্পিউটারে অথবা অন্য কোনো ডিভাইস; যেমন– প্রিন্টারে যাতায়াত করে। পোর্ট সাধারণত দু ধরনের হয়। যথা–১. সিরিয়াল পোর্ট (Serial Port) ও ২. প্যারালাল পোর্ট (Parallel Port)।

○ প্রাইমারি মেমোরি (Primary Memory) : সিপিইউ-এর সাথে সরাসরি যুক্ত কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ স্মৃতিকে প্রধান স্মৃতি বা প্রাইমারি মেমোরি বলা হয়। এর প্রধান কাজ হলো তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়াকৃত বা প্রক্রিয়াধীন মানগুলো জমা রাখা।

০ প্রসিডিউর (Procedure) : প্রসিডিউর হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ের বা হাইলেভেল প্রোগ্রামিং এর একটি অংশ যেখানে কোনো একটি প্রোগ্রামের সমষ্টিক কাজের কিছু অংশ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

০ প্রসেসর (Processor) : প্রসেসর হচ্ছে কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি আইটেম যাকে কম্পিউটারের ব্রেন বলা হয়। সিপিইউ বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশই হলো প্রসেসর। কম্পিউটারের পারফরমেন্স থেকে শুরু করে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ কাজ; যেমন– উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, যুক্তি ও সিদ্ধান্তমূলক কাজ, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ইত্যাদি এখানে সংগঠিত হয়। সাধারণত প্রসেসর ক্ষমতার উপরই কম্পিউটারের ক্ষমতা নির্ভর করে।

০ প্রোগ্রাম (Program) : প্রোগ্রাম হলো কতকগুলো নিয়মে সজ্জিত একটি স্টেটমেন্ট, যার মূল কাজ হলো কোনো একটি সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান বা আউটপুট তৈরি করা।

০ প্রোগ্রামিং ভাষা (Programming Language) : কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো সমস্যার সমাধান তথা প্রোগ্রাম রচনার জন্য ব্যবহৃত শব্দ, বর্ণ, অংক, চিহ্ন প্রভৃতির সমন্বয়ে গঠিত রীতিনীতিকে প্রোগ্রামিং ভাষা বলা হয়।

০ পিডিএল (PDL– Program Design Language) : এটি এক ধরনের ল্যাংগুয়েজ বা ভাষা যা কোনো প্রোগ্রাম ডিজাইন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

০ প্যাকেজ (Package) : কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্তে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরি ও বাজারজাতকৃত সফটওয়্যারসমূহ প্যাকেজ হিসেবে পরিচিত। প্যাকেজ সফটওয়্যারসমূহ সাধারণত কতগুলো কমান্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে ব্যবহারকারীগণ সংযোজিত কমান্ডসমূহের বাইরে কোনো কমান্ড প্রয়োগ করতে পারে না।

০ প্যাকেজ ডাটাবেজ (Package Database) : বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত প্যাকেজ। যেমন– ডিবেস, ফক্সপ্রো ইত্যাদি।

০ পার্টিশন (Partition) : পার্টিশন অর্থ হলো বিভক্ত বা বিভাজন করা। কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ককে পার্টিশন করে প্রয়োজনীয় সব তথ্য আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

০ পাসওয়ার্ড (Password) : পাসওয়ার্ড হলো গুপ্তসংকেত, ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করার সময় একটি গোপন সংকেতের সাহায্যে তা সংরক্ষণ করা হলে সহজে যে কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।

০ পিআইপিও (PIPO) : PIPO-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Parallel In-Parallel Out। সমান্তরাল পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্যকে সমান্তরাল পদ্ধতিতে নির্গমন করার প্রক্রিয়া।

Q

০ কিউ (Queue) : কিউ হলো এক ধরনের লিনিয়ার ডাটা স্ট্যাকচার, যাতে প্রথম আগত ডাটাই প্রথমে বের হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি FIFO (First In First Out) লিস্ট হিসেবে কাজ করে।

০ স্ট্যাক (Stack) : এটি এক ধরনের ডাটা স্টাকচার যেখানে সর্বশেষে ইনপুটকৃত ডাটাকে প্রথমে ডিলিট করা হয়। অর্থাৎ LIFO (Last In First Out) সিস্টেম অনুকরণ করে। স্ট্যাক-এর ডাটা যোগ করাকে বলা হয় Push করা এবং ডাটা বাদ দেয়াকে বলা হয় Pop করা।

০ কুইক সর্ট (Quick Sort) : এটি এক ধরনের সর্টিং পদ্ধতি যাতে কোনো সংখ্যাকে প্রথমে প্রথম দিক থেকে তুলনা করে দেখা হয় এর চেয়ে বড় সংখ্যা আছে কিনা। পাওয়া গেলে স্থান পরিবর্তন করা হয়। আবার ডান দিক (অপর দিক) থেকে তুলনা করা হয় দেখা হয় এর চেয়ে ছোট সংখ্যা আছে কিনা। পাওয়া গেলে স্থান পরিবর্তন করা হয় এবং এভাবে লিস্টের মধ্যে সংখ্যাটির প্রকৃত স্থান নির্ধারণ করা হয়ে গেলে দুটি উপতালিকা তৈরি হয়। ঐ তালিকাগুলোতে আবার এ পদ্ধতিতে সার্টিং করা হয়।

০ কিউবেসিক (Qbasic) : কিউবেসিক হলো বেসিকের একটি উপভাষা। এটি উদ্ভাবন করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাইক্রোসফট কোম্পানি। Qbasic শব্দটি Quick Basic থেকে এসেছে বলে বেসিকের সাথে কিউবেসিকের বেশ মিল রয়েছে।

০ কোয়ার্ক এক্সপ্রেস (Quark Xpress) : বিভিন্ন ধরনের তথ্য সম্বলিত লেখা কাগজে ছাপানোর পূর্বে এগুলো ছাপানোর উপযোগী করার নিমিত্তে ব্যবহৃত এক ধরনের ডেস্কটপ পাবলিশিং প্যাকেজ।

০ কুয়েরি ল্যাংগুয়েজ (Query Language) : ডাটা বা উপাত্ত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব উপাত্তসমূহকে খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহৃত এক ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা।

০ কুয়েরি প্রসেসিং (Query Processing) : কুয়েরি প্রসেসিং হলো ডাটাবেজ ফাইল থেকে প্রয়োজনীয় সব উপাত্ত খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া।

০ কোয়ালিটি কনট্রোল (Quality Control) : কম্পিউটার পরিচালনার ক্ষেত্রে এর হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদিত কার্যাবলীর মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে তা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার এক ধরনের পদ্ধতি।

R

০ র‍্যাম (RAM) : র‍্যাম (RAM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে র‍্যানডম এক্সেস মেমোরি (Random Access Memory)। এটি কম্পিউটারের অস্থায়ী তথ্য রাখার ভাণ্ডার, যেখানে কম্পিউটারের প্রতিমুহূর্তে চলমান সব ডাটা এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। র‍্যামে সব তথ্য জমা থাকে অস্থায়ী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে, যার ফলে কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে এর সব তথ্য মুছে যায় যা আর পুনরুদ্ধার করা কখনই সম্ভব হয় না।

০ রম (ROM) : রম (ROM)-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি (Read Only Memory)। এটি কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি। কম্পিউটার বন্ধ করলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে রম-এর স্মৃতিতে রক্ষিত সব তথ্যাবলী অক্ষত বা অপরিবর্তিত থাকে। রম এ রক্ষিত তথ্যের কোনো সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় না।

০ রিস্ক (RISC) : রিস্ক-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে রিডিউসড ইনস্ট্রাকশন সেট কম্পিউটিং (Reduced Instruction Set Computing)। যেসব প্রসেসরে কম সংখ্যক চিপ অপারেশন করে কার্য সম্পাদন করা হয় তাকে রিস্ক প্রসেসর বলে।

০ রেডিও লিঙ্ক (Radio Link) : ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রে লিঙ্ক একটি অত্যন্ত সহজ পদ্ধতি। এটিকে ওয়ারলেস ক্যাবল সংক্ষেপে বলা হয়। এটি অনেকটা টেলিভিশনের মতো কাজ করে। এজন্য আইএসপিগুলো তাদের সিগন্যাল আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে ছড়িয়ে দেয় এবং নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে গ্রাহক তাদের বিশেষ এন্টেনা দিয়ে এ সিগন্যাল ব্যবহার করে ইন্টারনেটে সংযুক্ত হয়।

○ রিয়েল টাইম সিস্টেম (Real Time System) : এটি এক ধরনের অপারেটিং সিস্টেম, যাতে কোনো অপারেশন সংগঠিত হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট পিরিয়ড বেধে দেয়া হয়। এই নির্দিষ্ট টাইম পিরিয়ডকেই রিয়েল টাইম বলা হয়। সাধারণত দু ধরনের রিয়েল টাইম সিস্টেম রয়েছে।

১. **Hard Real Time System :** এ ধরনের সিস্টেমে নির্দিষ্ট সময়ে অপারেশন সংঘটিত না হলে আর কখনো সংঘটিত হয় না বা হবে না। যেমন– পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

২. **Soft Real Time System :** এ ধরনের সিস্টেম একটি নির্দিষ্ট সময় হতে হবে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের পরও এর অপারেশনকে সংঘটিত করা যায়। যেমন– রেলওয়ে টিকিট বুকিং সিস্টেম।

○ রেজিস্টার (Register) : মাইক্রোপ্রসেসর ও কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ অংশে প্রক্রিয়াকরণের সময়ে সাময়িকভাবে উপাত্ত ও নির্দেশ সংরক্ষণের জন্য যেসব অস্থায়ী মেমোরি ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে রেজিস্টার বলা হয়।

○ রিসাইকেল বিন (Recycle Bin) : রিসাইকেল বিন হলো কম্পিউটারের হার্ডডিস্কের বিশেষ অঞ্চল নির্দেশক আইকন, যেখানে উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমের প্রাথমিকভাবে মুছে দেয়া ফাইল ও ফোল্ডার জমা হয়। প্রাথমিকভাবে মুছে দেয়া ফাইল বা ফোল্ডারসমূহ প্রয়োজনে রিসাইকেল বিন তার পূর্ববর্তী অবস্থানে ফেরত আনা যায়।

○ রাউটার (Router) : দুটি ভিন্ন প্রকৃতির নেটওয়ার্কের পারস্পরিক সংযুক্তির জন্য যে ব্যবস্থা বা ডিভাইস ব্যবহৃত হয় তাকে রাউটার বলা হয়। গেটওয়ে বা রাউটার দুটি সিস্টেমের মধ্যে অবস্থান করে অনুবাদকের মতো কাজ করার পাশাপাশি তথ্যের ফিল্টারিং ও নিরাপত্তা প্রদান করে।

○ রিমোট কম্পিউটিং (Remote Computing) : এক স্থান থেকে দূরবর্তী কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করে সেই কম্পিউটার থেকে ফাইল আনয়নের প্রক্রিয়াকে রিমোট কম্পিউটিং বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দূরবর্তী কম্পিউটারকে কল করে ফাইল অনুসন্ধান, এমনকি দূরবর্তী কম্পিউটারের পর্দায় ব্যবহারিক প্রোগ্রাম পরিচালনা করা যায়। ব্যবহারকারীর কম্পিউটারের পর্দায় প্রকাশিত তথ্য রিমোট প্রোগ্রাম চালিত কম্পিউটারের পর্দায় দেখানো যায়।

○ র‍্যানডম এক্সেস (Random Access) : ধীরগতি ব্যবস্থা সম্পন্ন কম্পিউটারের স্মৃতিতে অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দকে একবারই Access করা যায়।

○ র‍্যানডম ভেরিয়েবল (Random Variable) : র‍্যানডম ভেরিয়েবল হলো একধরনের অসজ্জিত চলক, এটি প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অসজ্জিত কোনো চলকেরই ব্যবহার।

○ রিকভ্যারি (Recovery) : রিকভ্যারি হলো কোনো কিছু পুনরুদ্ধার করা। সংগঠিত সব ভ্রান্তিসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে পূর্বাবস্থায় ফেরৎ আনাই হলো রিকভার।

○ রিফ্রেস (Refresh) : কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা, অতিরিক্ত সব ভুল যন্ত্রাংশ সংযোজনের মাধ্যমে কম্পিউটারের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

○ রোবোটিক্স (Robotics) : ডাটা বা উপাত্ত প্রেরণের নিমিত্তে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কৌশলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত যন্ত্র। যা কম্পিউটারের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানে সহায়তা করে থাকে।

S

○ সার্চিং (Searching) : সার্চিং হলো এক ধরনের পদ্ধতি যেখানে তথ্যগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট টাইপ বা ধরন অনুযায়ী খোঁজা হয়।

○ সেমিকন্ডাক্টর (Semiconductor) : যেসব পদার্থের মধ্যে পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি গুণ বিদ্যমান অর্থাৎ যেসব পদার্থ কখনো পরিবাহী, কখনো অপরিবাহী হিসেবে কাজ করে তাদেরকে সেমিকন্ডাক্টর বলা হয়। যেমন– সিলিকন (Si)।

○ সার্ভার (Server) : সার্ভার হলো কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মূল নিয়ন্ত্রক। কারণ সার্ভারই বলে দিবে কোন ক্লায়েন্ট পিসি নেটওয়ার্কে কতটুকু এক্সেস পাবে। আর নেটওয়ার্কে সার্ভারের কাজই হচ্ছে ক্লায়েন্ট পিসি থেকে আসা রিকোয়েস্টের দ্রুত সাড়া দেয়া এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ সময়মতো পাঠিয়ে দেয়া।

○ সিগন্যাল (Signal) : সিগন্যাল হলো এক ধরনের ডাটা। সাধারণত ডিজিটাল ডাটা যা কোনো কানেকশন ওয়্যারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তাকে সিগন্যাল বলে। যেমন– ইনপুট সিগন্যাল হতে ইনপুট ডাটা এবং আউটপুট সিগন্যাল হতে আউটপুট ডাটা পাওয়া যায়।

○ সফটওয়্যার (Software) : সফটওয়্যার হলো একটি প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রামের সমষ্টি বা কতকগুলো কার্যনির্দেশের তালিকা। সফটওয়্যার হলো কম্পিউটারের প্রাণস্বরূপ। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারগুলোকে ব্যবহার করার জন্য এবং হার্ডওয়্যার দিয়ে কোনো কাজ করানোর জন্য ব্যবহৃত প্রোগ্রামগুলোই হলো সফটওয়্যার।

○ স্টোরেজ (Storage) : এটি এক ধরনের ডিভাইস যা ডাটা সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়। মেমোরিকে অনেক সময় স্টোরেজ বলা হয়। এটি সাধারণত বেকিং স্টোরেজ (Backing Storage)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ।

○ সিস্টেম (System) : সিস্টেম হলো এমন একটি বিষয় যাকে আমরা সমস্যা সমাধানের সঠিক উপায় হিসেবে কল্পনা করতে পারি।

○ সিস্টেম ডিজাইন (System Design) : কোনো একটি সিস্টেমকে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার পূর্বে সঠিক পরিকল্পনা ও ডিজাইন অত্যাবশ্যকীয়। প্রথমত, কোনো সিস্টেমের পরিকল্পনা করার পর তার ডিজাইন করতে হয়। সিস্টেম ডিজাইনে সম্পূর্ণ সিস্টেমটি গ্রহণ উপযোগী হয়ে থাকে।

○ সিস্টেম লাইফ সাইকেল (System Life Cycle) : কোনো সিস্টেম ডিজাইনের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত যে সময় লাগে তাকে সিস্টেম ডিজাইন লাইফ সাইকেল বা শুধু লাইফ সাইকেল বলে।

○ সিস্টেম এনালাইসিস (System Analysis) : সিস্টেম এনালাইসিস হলো কোনো নির্দিষ্ট কাজ সহজ ও সঠিকভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সুসংবদ্ধভাবে এর নিয়মকানুনকে বিশ্লেষণ করা এবং বাস্তবায়ন করা। সিস্টেম এনালাইসিসের মূল বিষয়গুলো হলো :

- তথ্যের অনুসন্ধান
- বিশ্লেষণ
- পরিকল্পনা
- সফটওয়্যার উন্নয়ন
- সিস্টেম বাস্তবায়ন
- সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ

o সিস্টেম ডিস্ক (System Disk) : কম্পিউটারের সিস্টেম ফাইলগুলো যে ডিস্কে থাকে সেই ডিস্কের সিস্টেম ডিস্ক বা স্টার্টআপ ডিস্ক বলে। বর্তমানে কম্পিউটারে হার্ডডিস্কে অপারেটিং সিস্টেম থাকে, কাজেই কম্পিউটারের হার্ডডিস্কই স্টার্টআপ ডিস্ক হিসেবে কাজ করে। অনেক সময় ফ্লপি ডিস্ককে সিস্টেম ডিস্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

o সিস্টেম ফাইল (System File) : সিস্টেম ফাইলগুলোর মধ্যে Command. Com, io. sys, msdos, says ও drvspace.bin হলো আবশ্যিক ফাইল। এছাড়া সিস্টেম ফাইলগুলোর মধ্যে autoexe.bat, Config-sys, fdisk.exe, extract. exe ইত্যাদি অন্যতম।

o স্টার্ট মেনু (Start Menu) : ডেস্কটপ উইন্ডোর স্ট্যাটাস বারের নিচের বামপ্রান্তে অবস্থিত স্টার্ট (Start) লেখা বাটনটিকে স্টার্ট মেনু বা স্টার্ট বার বলা হয়। সাধারণত কম্পিউটার বন্ধ করা, পুনরায় কম্পিউটার চালু করাসহ যে কোনো প্রোগ্রাম চালনার জন্য প্রথমে স্টার্ট বাটন নির্বাচন করতে হয়।

o সাব মেনু (Sub Menu) : কোনো কোনো মেনুর অভ্যন্তরে সাধারণত এক বা একাধিক মেনু থাকতে পারে। এরূপ মধ্যবর্তী মেনুসমূহকে সাব মেনু বলা হয়। কোনো মেনুতে ক্লিক করলে তার সাব মেনুসমূহ দেখা যায়।

o স্যাটেলাইট (Sattalite) : অনেক সময় ক্যাবল অথবা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভবপর হয় না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি নেটওয়ার্কের মধ্যবর্তী স্থানে উঁচু পর্বত, দালান বা সমুদ্র থাকলে এমনটি হয়। তখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নেটওয়র্কিং কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এজন্য অবশ্য কম্পিউটারের সাথে মডেম লাগবে। বর্তমানে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সিস্টেমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কম্পিউটারসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনে স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হয়।

o এসডিএলসি (SDLC) : SDLC-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Synchronous Data Link Control. বিভিন্ন ধরনের সমন্বিত উপাত্তকে সমন্বয়ের জন্য বিশ্বখ্যাত আইবিএম কর্পোরেশন কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি নিয়ন্ত্রক প্রোটোকল।

o সেক্টর (Sector) : কম্পিউটার ডিস্কের বৃত্তাকার রেখাসমূহের খণ্ডিত অংশকে সেক্টর হিসেবে অভিহিত করা হয়।

o সেগমেন্ট (Segment) : কম্পিউটারের প্রয়োজনীয় উপাত্তসমূহকে প্রধান স্মৃতি বা অতিরিক্ত স্মৃতিতে স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত রেজিস্টার।

o সিগন্যাল বেজব্যান্ড (Signal Baseband) : কম্পিউটারের তথ্য প্রেরণের সময় বাইনারী বিটকে অপরিবর্তিত অবস্থায় নেটওয়ার্কের সংযোগ পথে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় একই সময়ে একাধিক সংকেত প্রেরণ করা যায় না।

o এসআইএসডি (SISD) : SISD-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Single Instruction Single Date। একক প্রসেসর যুক্ত এ ধরনের কম্পিউটার সিস্টেমে একটি ডাটা স্ট্রীমের ওপর একটি মাত্র ইনস্ট্রাকশন বা নির্দেশনা কাজ করে থাকে।

o স্ট্রাকচার্ড প্রোগ্রামিং (Structured Programning) : এ প্রোগ্রামশৈলীর জন্য সিকুয়েন্স, সিলেকশন ও ইটারেশন এ তিনটি স্ট্রাকচার ব্যবহার করা হয়। এ প্রোগ্রামশৈলীতে GOTO কার্য বর্জন করা হয়। এজন্য এ শৈলীকে অনেক সময় Goto less শৈলী বলা হয়।

T

o টেক্সট এডিটর (Text Editor) : এটি এক ধরনের প্রোগ্রাম যাতে কোনো টেক্সট জাতীয় ডাটাকে মডিফাই বা সম্পাদনা করা যায়। এসব ডাটা কোনো হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজের প্রোগ্রাম লেখা অথবা ওয়েব ডকুমেন্ট হতে পারে।

o টাইমিং ডায়াগ্রাম (Timing Diagram) : একটি সার্কিট বা বর্তনীর অপারেশনের গ্রাফিক্যাল বর্ণনাকে সাধারণত টাইম ডায়াগ্রাম বলা হয়। এসব ডায়াগ্রামের একটি প্রধান উপাদান অবশ্যই টাইম।

o ট্রানজেকশন ফাইল (Transaction File) : যেসব ফাইলে ডাটাগুলো সাময়িকভাবে জমা থাকে, অর্থাৎ জমাকৃত ডাটাগুলো খুব বেশি আপডেট বা পরিবর্তন হয় তাকে ট্রানজেকশন ফাইল বলে। কোনো সিস্টেম ব্যবহারকারী ডাটা ইনপুট করালে প্রথমে ট্রানজেকশন ফাইলে সেই ডাটা জমা হয়।

o ট্রান্সলেটর (Translator) : ট্রান্সলেটর হলো কম্পিউটারে ব্যবহৃত এক ধরনের সফটওয়্যার যা কোনো এক ধরনের ল্যাংগুয়েজকে অন্য ল্যাংগুয়েজে পরিবর্তন করে। যেমন– কম্পাইলার হলো এক ধরনের ট্রান্সলেটর, যা হাইলেভেল ল্যাংগুয়েজকে মেশিন ল্যাংগুয়েজে পরিণত করে।

o ট্রান্সমিশন চ্যানেল (Transmission Channel) : ট্রান্সমিশন চ্যানেল হলো কোনো ট্রান্সমিশন বা কমিউনিকেশন সিস্টেমের প্রেরক থেকে প্রাপক পর্যন্ত ডাটা আদান-প্রদানের জন্য এক ধরনের মাধ্যম। যেমন– টেলিফোনের তার, স্যাটেলাইট ইত্যাদি।

o ট্রান্সমিশন রেট (Transmission Rate) : কোনো ট্রান্সমিশন চ্যানেলের মধ্য দিয়ে ডাটা যে গতিতে আদান-প্রদান করে তাকে ঐ চ্যানেলের ট্রান্সমিশন রেট বলা হয়। এর একক হলো বিট/সেকেন্ড। আবার অনেক সময় একে বাড রেটও বলা হয়।

o সত্যক সারণি (Truth Table) : যৌক্তিক বর্তনী বা লজিক গেটগুলো ইনপুটে বিভিন্ন ধরনের ডাটা আদান-প্রদানের ফলে যে ধরনের আউটপুট পাওয়া যায় তাদেরকে যে টেবিল আকারে লেখা হয় তার নাম Truth Table বা সত্যক সারণি।

o ট্যাব কী (Tab key) : কম্পিউটারের কার্সরকে দ্রুত স্থানান্তরের জন্য উক্ত কী-টি ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো প্যাকেজে রয়েছে যেখানে কমান্ড মেনুর এক কমান্ড থেকে অন্য কমান্ডে কার্সর স্থানান্তর করার জন্য ট্যাব কী টির প্রয়োজন হয়।

o টক ক্রস (Talk-cross) : টক ক্রস হলো কম্পিউটারের মাধ্যমে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিভিন্ন ধরনের ভুল সংকেত প্রাপ্ত হওয়া।

o টেলনেট (Telnet) : কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় দূরবর্তী টারমিনালসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ব্যবহৃত প্রোটোকল।

o টারমিনাল (Terminal) : কম্পিউটারে ডাটা বা উপাত্ত গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ বা প্রদর্শনের নিমিত্তে ব্যবহৃত একটি গ্রহণ/নির্গমন যুক্ত যন্ত্রাংশ। কোনো কোনো টারমিনালে উপাত্ত সংযোজনের জন্য কী-বোর্ড সংযোজিত থাকে।

o থ্রোপুট (Throughput) : কম্পিউটার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতি একক সময়ে অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে কতটি নির্দেশ পালিত হলো তা নির্ধারণের চিত্র।

U

○ ইউপিএস (UPS) : ইউপিএস-এর পূর্ণরূপ হলো Uninterrupted Power Supply। এটি এক বিশেষ ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যা বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাকালীন ভোল্টেজ সঞ্চিত করে রাখে এবং কোনো কারণে প্রবাহে ব্যাঘাত ঘটলে কিছু সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ সরবরাহ করে। প্রকারভেদে ইউপিএস পনের/বিশ মিনিট থেকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

○ আন্ডার ফ্লো (Underflow) : যখন কোনো গাণিতিক অপারেশনের ফলাফল নির্দিষ্ট শর্তের চেয়ে কম হয় তখন এর ফলাফলের অবস্থাকে আন্ডার ফ্লো (Underflow) বলা হয়।

○ ইউনিভ্যাক (UNIVAC) : UNIVAC-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Universal Automatic Calculator. ১৯৫১ সালে ড. জন মউসলি এবং প্রেসপার কর্তৃক আবিষ্কৃত প্রথম ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

○ ইউনিভার্সাল গেইট (Universal Gate) : ইউনিভার্সাল গেইট হলো সার্বজনীন যুক্তি বর্তনী। বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটের মাধ্যমে ডিজিটাল বর্তনীকে শুধুমাত্র ন্যান্ড গেইট বা নর গেইট দিয়ে তৈরি করা যায় বলে উক্ত গেইটকে ইউনিভার্সাল গেইট বা সর্বজনীন যুক্তি বর্তনী হিসেবে অভিহিত করা হয়।

○ আপডেটিং ফাইল (Updating File) : বিভিন্ন ধরনের ফাইল সংস্কার করা, অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাঠামো ঠিক রেখে নতুন উপাত্ত সংযোজনের মাধ্যমে এতে নতুনত্ব সৃষ্টি করাই হলো এর প্রধান কাজ।

○ ইউটিলিটি সফটওয়্যার (Utility Softwere) : কম্পিউটারের সব ফাইল ব্যবস্থাপনা, ফাইল রক্ষণাবেক্ষণ, স্থানান্তর, ব্যাকআপকরণ, সিস্টেমের ত্রুটি সনাক্তকরণ, ত্রুটি সংশোধন, হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। এসব সফটওয়্যারকে ইউটিলিটি সফটওয়্যার বলা হয়।

V

○ ভেরিয়েবল (Variable) : যেসব রাশির মান কখনো স্থির নয় অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে তাকে ভেরিয়েবল বলে। বিভিন্ন রকমের ভেরিয়েবল রয়েছে। যথা– ১. ইন্টিজার (Integer), ২. রিয়েল (Real) ও ৩. ক্যারেক্টার (Character)।

○ ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing) : ভিডিও কনফারেন্সিং হলো দুই বা ততোধিক স্থানের মধ্যে ইমেজ (ভিডিও) এবং স্পিচ (অডিও) ট্রান্সমিট করা। এটা করার জন্য প্রথমে দরকার ওয়েব ক্যামেরা, যার সাহায্যে ইমেজ ধারণ এবং প্রেরণ করা যায় এবং মাইক্রোফোন যার সাহায্যে শব্দ ধারণ এবং প্রেরণ করা যায়।

○ ভয়েস মেইল (Voice mail) : কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে সৃষ্ট উপাত্ত গ্রহণ করে তা সংরক্ষণ ও অন্য স্থানে প্রেরণ করার পদ্ধতিকে ভয়েস মেইল (Voice mail) বলা হয়। এটি একটি মৌখিক প্রশ্নের উত্তর দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন টেলিফোন এক্সচেঞ্জ বিশেষ।

○ ভিজ্যুয়াল বেসিক (Vasual Basic) : ভিজ্যুয়াল বেসিক বর্তমানে সবচেয়ে জনপ্রিয় একটি প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট প্যাকেজ। দ্রুত এবং সহজে প্রোগ্রাম উন্নয়নের জন্য ভিজ্যুয়াল বেসিক অতুলনীয় হয়ে উঠেছে। ভিজ্যুয়াল বেসিক খুব সহজে বিভিন্ন ডাটাবেস বিষয়ক সফটওয়্যারের সাথে সংযোগ করা যায়। এছাড়া ভিজ্যুয়াল বেসিক স্ক্রিপ্ট সহজে ওয়েব পেজ উন্নয়নের সুবিধা প্রদান করে।

○ ভিএলএসআই (VLSI = Very Large Scale Integration) : এটি এক ধরনের জটিল সার্কিট যেখানে দশ লক্ষ ট্রানজিস্ট্রার সম্বলিত হতে পারে। অর্থাৎ এর একটি মাত্র চিপে দশ লক্ষ ট্রানজিস্ট্রার থাকতে পারে।

○ ভিডিও টার্মিনাল (Video terminal) : এটি একটি VDU (Video Display Unit) যা শুধু কোনো চিত্র প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়।

○ ভার্চুয়াল মেমোরি (Virtual Memory) : ভার্চুয়াল মেমোরি সহায়ক বা সেকেন্ডারি মেমোরির একটি অংশ যেটা প্রয়োজনের সময় প্রধান মেমোরি হিসেবে কাজ করে। যদি প্রধান মেমোরিতে তুলনামূলকভাবে কোনো বড় প্রোগ্রাম রান করাতে হয় তখন ভার্চুয়াল মেমোরির প্রয়োজন পড়ে।

○ ভিস্যাট (VSAT = Very Small Aperture Terminal) : ডিস এন্টেনার মতো দেখতে এক ধরনের ইলেকট্রনিক যন্ত্র। যার প্রধান কাজ হলো স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে এমপ্লিফাই করা এবং কোনো তথ্যকে সহজে স্যাটেলাইটে পাঠানো। এছাড়াও এটি নিজস্ব সার্ভারের সাথে গ্রাহকদের কম্পিউটারকে ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ করে দেয়।

○ ভেক্টর অ্যাক্সিস (Vector Access) : কম্পিউটারের মেমোরিতে অগোছালো তথ্যসমূহ সুবিন্যস্তকরণ অর্থাৎ তথ্যসমূহ সুবিন্যস্তভাবে সাজানো হলো ভেক্টর অ্যাক্সিসের প্রধান কাজ।

○ ভিজিএ কার্ড (VGA card) : VGA-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে Video Graphics Array. বর্তমানে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ১৫ পিন সমৃদ্ধ কার্ডসমূহকে ভিজিএ কার্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ১৫ পিন সমৃদ্ধ কার্ডসমূহকে ভিজিএ কার্ড হিসেবে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ব্যবহৃত ভিজিএ কার্ডসমূহে Video Connector, Edge Connector, Bios, DRAM, Crystal, Video chip ইত্যাদি অংশ বিদ্যমান থাকে।

○ ভিডিও টেলিফোনি (Video Telephony) : দূরবর্তী স্থানে বসবাসরত ব্যক্তির সাথে টেলিফোনে আলাপকালে আলাপরত ব্যক্তির ছবি কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখার প্রক্রিয়া হলো ভিডিও টেলিফোনি।

○ ভার্চুয়াল কানেকশন (Virtual Connection) : নেটওয়ার্কভুক্ত দুটি কম্পিউটারের মধ্যে যুক্তিমূলক পদ্ধতিতে সমন্বয়ের ব্যবস্থা হলো ভার্চুয়াল কানেকশন।

○ ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality) : বাস্তবের অবস্থাকে অনুভবে রূপ দেয়ার জন্য কম্পিউটারে সংবেদনশীল গ্রাফিক্স তৈরির প্রক্রিয়া হলো ভার্চুয়াল রিয়েলিটি।

W

○ ওয়ান (WAN – Wide Area Network) : বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকাব্যাপী গড়ে ওঠা নেটওয়ার্ককে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN বলে। ইন্টারনেট ওয়ান এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

○ ওয়াপ (WAP) : ওয়াপ-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ওয়ারলেস এপ্লিকেশন প্রোটোকল (Wireless Application Protocol) বর্তমান সময়ে বহুল ব্যবহৃত এবং আলোচিত একটি ইন্টারনেট সার্ভিস। এ পদ্ধতিতে মোবাইল ফোনের পর্দায় ওয়েব পেজ ব্রাউজ করা যায়। তবে এতে খরচ বেশি হওয়ায় এবং মোবাইল প্রযুক্তি সর্বজনীন না হওয়ায় আমাদের দেশে এখনো ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

ওয়েব পেজ (Web page) : ওয়েব অর্থ জাল। এটি একটি টেক্সট ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ। বর্তমানে ওয়েব পেজে সাধারণত টেক্সট এর পাশাপাশি বিভিন্ন রঙ ও স্টাইলের ফন্ট, বিভিন্ন ধরনের বাটন, টেবিল, চার্ট, স্থির ও সচল চিত্র, শব্দ ইত্যাদি স্থাপন করা যায়।

ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser) : ওয়েব ব্রাউজার হলো এক বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম যা ওয়েব পেজ প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়। HTML ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ প্রদর্শনের জন্য ইউনিক্স ভিত্তিক প্রথম গ্রাফিক্স ব্রাউজার প্রণীত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ও নেটস্কেপ নেভিগেটর, মজিলা, ওপেরা, গুগল ক্রোম বর্তমানে বহুল প্রচলিত দুটি ওয়েব ব্রাউজার।

ডব্লিউ-ডব্লিউ-ডব্লিউ (www) : ডব্লিউ-ডব্লিউ-ডব্লিউ-এর পূর্ণ অর্থ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web)। ইন্টারনেটের অনেকগুলো জনপ্রিয় সার্ভিসসমূহের মধ্যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব অন্যতম। এটি একটি হাইপারটেক্সট ভিত্তিক। ডিস্ট্রিবিউটেড ইনফরমেশন সিস্টেম। এর মাধ্যমে হাইপার টেক্সট ভিত্তিক ডকুমেন্ট তৈরি ও সম্পাদনা করা যায়।

ওয়েব এড্রেস (Web Address) : ইন্টারনেট সিস্টেমে সার্ভার বা দূরবর্তী কম্পিউটারে রক্ষিত প্রতিটি ওয়েব পেজের একটি নির্দিষ্ট আলাদা ঠিকানা থাকে, যাকে ওয়েব এড্রেস বলা হয়।

ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন (Web Search Engine) : সার্চ ইঞ্জিন এক ধরনের টুল। যে টুল ইন্টারনেটের সকল ওয়েব সাইটের ভাণ্ডার তার বুকে ধরে রাখে। সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে ক্যাটাগরি অনুসারে ওয়েব সাইট খুঁজে বের করা যায়। এরকম জনপ্রিয় কিছু সার্চ ইঞ্জিন হলো, ইয়াহু, গুগল, বিং, এমএসএন ইত্যাদি।

ওয়েব সাইট (Web Site) : ইন্টারনেটে সংযুক্ত কোনো কম্পিউটার এইচটিএমএল কর্তৃক সূচিত এবং মাল্টিমিডিয়া সমৃদ্ধ অনেকগুলো ওয়েব পেজ সংরক্ষণ করে রাখে বলে এ কম্পিউটারকে ওয়েব সার্ভার বা ওয়েব সাইট বলে।

ওয়ার্ড র‍্যাপ (Word Wrap) : কোনো ডকুমেন্টে তথ্যসমূহ টাইপ করার সময় লাইনের শেষে বড় কোনো শব্দ টাইপ করার ক্ষেত্রে তা ঐ লাইনে সংকুলান না হলে স্বয়ংক্রীয়ভাবে পরবর্তী লাইনে চলে আসার প্রক্রিয়াটি হলো ওয়ার্ড র‍্যাপ।

ওয়ার্ড পারফেক্ট (Word Perfect) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার্ড পারফেক্ট কোম্পানি কর্তৃক আবিষ্কৃত এটি একটি জনপ্রিয় ওয়ার্ড প্রসেসিং প্যাকেজ প্রোগ্রাম।

ওয়ার্ড প্রসেসর প্যাকেজ (Word Processor Package) : বিভিন্ন ধরনের চিঠিপত্র তৈরি সম্পাদনা এবং ছাপার কাজ করার জন্য এ ধরনের সফটওয়্যারসমূহ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওয়ার্ড পারফেক্ট, মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ওয়ার্ডস্টার ইত্যাদি সফটওয়্যারসমূহ ওয়ার্ড প্রসেসর প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত।

ওয়ার্কশিট (Worksheet) : বিভিন্ন ধরনের হিসাব-নিকাশের কার্যাবলী সম্পাদন ও এর ফলাফল উপস্থাপনের জন্য কলাম ও সারির সমন্বয়ে বিন্যস্ত প্রোগ্রাম হলো ওয়ার্কশিট।

৩৫ তম বিসিএস

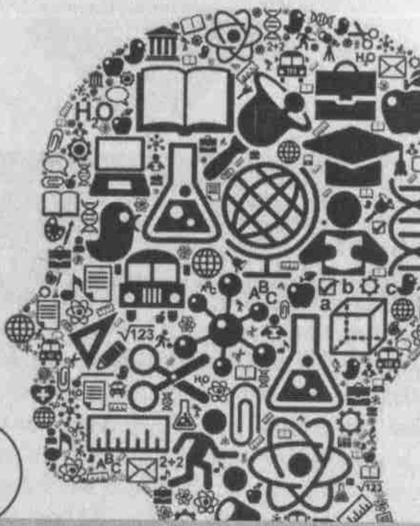

পার্ট C

ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি

মান-১৫

অধ্যায় ০১	ইলেকট্রিক্যাল প্রযুক্তি Electrical Technology
অধ্যায় ০২	ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি Electronics Technology

অধ্যায় ০১

ইলেকট্রিক্যাল প্রযুক্তি
Electrical Technology

Syllabus— Electrical Technology : *Electrical components, voltage, current, Ohm's Law, Electrical power and energy, Electromagnet and magnetic field, electromagnetic induction, Circuits Breakers, GFCI's and Fuses. Power Distribution in a series circuit, voltage sources in a series, Kirchoff's voltage law, voltage division in a series circuit, Interchanging series elements, voltage regulation and the internal resistance of voltage sources, parallel resistors, parallel circuits, power distribution in a parallel circuits, Kirchoff's current law, open and short circuits. Generation of AC and DC voltage, thermal, hydraulic and nuclear power generators, Electric motors and their applications. Transformers, AC transmission and distribution, Electrical instruments, voltage stabilizers, IPS and UPS.*

১.১ বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ, বিভব, বিদ্যুৎ, ও'মের সূত্র, বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এবং শক্তি, তড়িৎ চুম্বক এবং চুম্বকক্ষেত্র, তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ, সার্কিট ব্রেকার, জিএফসিআই এবং ফিউজ

Electrical components, voltage, current, Ohm's Law, Electrical power and energy, Electromagnet and magnetic field, electromagnetic induction, Circuits Breakers, GFCI's and Fuses.

কারেন্ট, ভোল্টেজ, ওহম'স ল এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ও ক্ষমতা
Current, voltage, Ohm's Law, Electrical power and energy

প্রশ্ন-১. বিদ্যুৎ কি? বিদ্যুৎ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : বিদ্যুৎ শব্দটিকে গ্রিক শব্দ 'Elektron' থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। Elektron শব্দের অর্থ সোলেমানী পাথর বা অ্যাম্বার (Amber) (পাইন গাছের শক্ত আঠা)। খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে গ্রিক দার্শনিক থেলস (Thales) লক্ষ্য করেন যে, অ্যাম্বারকে রেশমি কাপড় দ্বারা ঘর্ষণ করলে তার মধ্যে একটি অদৃশ্য শক্তির উদ্ভব হয় এবং অ্যাম্বার আকর্ষণ গুণপ্রাপ্ত হয়। ফলে তা ছোট ছোট কাগজের টুকরা আকর্ষণ করে। এ অদৃশ্য শক্তিকে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ (Electricity) বলে।

অতএব, বিদ্যুৎ এক প্রকার শক্তি। বিদ্যুতকে অন্য শক্তিতে এবং অন্য শক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তর করা যায় এবং বিদ্যুতের সাহায্যে কাজ সম্পাদন করা যায়।

বিদ্যুৎ দু প্রকার এবং একে আমরা দু শাখায় অধ্যয়ন করি। যথা :

ক. স্থির বিদ্যুৎ (Electrostatic or Statical electricity) ও

খ. চল বিদ্যুৎ বা গতি বিদ্যুৎ (Electrodynamics or Current electricity)।

○ প্রশ্ন-২. বিদ্যুৎ প্রবাহ কি? বিদ্যুৎ প্রবাহ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : পরিবাহীর কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অভিলম্বভাবে বাহ্যিক বলের প্রভাবে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা বলে। এক কথায় বলা যায়, বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহের হারকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বলে।

বিদ্যুৎ প্রবাহ দু প্রকার। যথা : ১. সম বা একমুখী প্রবাহ (Direct Current বা D.C) এবং ২. পরিবর্তী প্রবাহ বা দ্বিমুখী প্রবাহ (Alternating Current বা A. C)।

বিদ্যুৎ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় তবে তাকে একমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে। আর যদি প্রবাহের অভিমুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সময়মুখী হয় এবং সাধারণভাবে পরিবর্তনের ধরনটি একটি সাইন লেখ (sine curve) হয় তবে তাকে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ বা দ্বিমুখী প্রবাহ বলে।

○ প্রশ্ন-৩. চল তড়িৎ কি? সমপ্রবাহ ও পর্যাবৃত্ত প্রবাহ কি?

উত্তর : দুটি ভিন্ন বিভবের বস্তুকে যখন পরিবাহক তার দ্বারা যুক্ত করা হয় তখন নিম্ন বিভবের বস্তু থেকে উচ্চ বিভবের বস্তুতে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিভব পার্থক্য বর্তমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রবাহ চলে। কোনো প্রক্রিয়ায় যদি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বিভবান্তর বজায় রাখা যায় তাহলে এ ইলেকট্রন প্রবাহ নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। ঋণাত্মক আধান বা ইলেকট্রনের এ নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই চল তড়িৎ।

সমপ্রবাহ : তড়িৎ প্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় বা সময়ের সাথে যদি তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে সেই প্রবাহকে সমপ্রবাহ বলে। তড়িৎ কোষ থেকে আমরা সমপ্রবাহ পাই।

পর্যাবৃত্ত প্রবাহ : যে তড়িৎ প্রবাহ নির্দিষ্ট সময় পর পর দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহের দিক পর্যাবৃত্ত হারে পরিবর্তিত হয় তাকে পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বলে।

○ প্রশ্ন-৪. স্থির বিদ্যুতের গুণাবলী লিখুন।

উত্তর : স্থির বিদ্যুতের গুণাবলীগুলো নিচে দেয়া হলো :

ক. সমজাতীয় স্থির বিদ্যুতাবিষ্ট বস্তু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে এবং বিপরীত জাতীয় বিদ্যুতাবিষ্ট বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

খ. ঘর্ষণ বা অন্য কোনো প্রক্রিয়ার ফলে কোনো বস্তু স্বাভাবিক অবস্থায় ইলেকট্রন সংগ্রহ করলে তাকে ঋণাত্মক বিদ্যুতাবিষ্ট বলে। পক্ষান্তরে, যে বস্তু ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে ধনাত্মক বিদ্যুতাবিষ্ট বলে।

গ. উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভবে বৈদ্যুতিক ধনাত্মক আধান প্রবাহিত হয়।

ঘ. উচ্চ বিভব থেকে নিম্ন বিভব বস্তুতে বিদ্যুৎপ্রবাহ ততক্ষণই চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তু দুটি সমান বিভবের অধিকারী না হবে।

○ প্রশ্ন-৫. চার্জ কি? মাধ্যম কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : যার স্থিতিতে কোনো বস্তুতে স্থির বিদ্যুৎ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, স্থির বিদ্যুৎ শক্তির সঞ্চার হয় ও বস্তু ছোট ছোট কাগজের হালকা টুকরা আকর্ষণ করার সামর্থ্য রাখে এবং যার গতিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বক ক্ষেত্রের উদ্ভব হয় তাকে চার্জ বলে।

যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে চার্জ বা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বা প্রবাহিত হতে চায়, তাদেরকে বৈদ্যুতিক মাধ্যম বলে। মাধ্যম তিন প্রকার। যথা :

ক. **পরিবাহী (Conductor) :** যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে চার্জ বা বিদ্যুৎ অতি সহজেই প্রবাহিত হয় তাদেরকে পরিবাহী বলে। ধাতু (যেমন— তামা, রূপা, সোনা, লোহা ইত্যাদি), মানবদেহ, এসিড, সবজি, মাটি, এসিড মিশ্রিত পানি, অম্ল, ক্ষার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে সঞ্চালিত হয়। সুতরাং এরা পরিবাহী। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে পরিবাহী পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা হ্রাস পায়।

খ. **অর্ধ-পরিবাহী (Semi-conductor) :** যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে আংশিকভাবে চার্জ বা বিদ্যুৎ চলাচল করে তাদেরকে অর্ধ-পরিবাহী বলে। যেমন— জার্মেনিয়াম, সিলিকন, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ইত্যাদি। ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরির কাজে অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের ব্যবহার সর্বাধিক। তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

গ. **অপরিবাহী বা অন্তরক (Non-conductor or insulator) :** যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করে না তাদেরকে অপরিবাহী বা অন্তরক বলে। কাচ, রেশম, রবার, ইবোনাইট, অভ্র, পোর্সেলিন, মোম, গন্ধক, শুকনা কাঠ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে না। এরা অপরিবাহী।

○ প্রশ্ন-৬. রোধ (Resistance) কি? রোধের শর্তগুলো কি?

উত্তর : পরিবাহীর যে ধর্ম এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচলে বাধা প্রদান করে তাকে রোধ বলে। একে মূলত r বা R দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

পুনঃ ওহমের সূত্র হতে পাই,

$$R = \frac{V_A - V_B}{I} = \frac{V}{I}$$

উক্ত সমীকরণ থেকে রোধের আরও একটি সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে— সুষম তাপমাত্রায় কোনো একটি পরিবাহীর দু প্রান্তে বিভব পার্থক্য এবং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রার অনুপাতকে ঐ পরিবাহীর রোধ বলে।

কোনো একটি পরিবাহীর রোধ নিম্নলিখিত শর্তগুলোর ওপর নির্ভর করে :

ক. **পরিবাহীর দৈর্ঘ্য :** কোনো নির্দিষ্ট প্রস্থচ্ছেদ ও তাপমাত্রার কোনো পরিবাহীর রোধ এর দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেলে রোধ বৃদ্ধি পায়।

খ. **পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ :** নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রার কোনো পরিবাহীর রোধ এর প্রস্থচ্ছেদের ওপর নির্ভর করে। প্রস্থচ্ছেদ বৃদ্ধি পেলে রোধ হ্রাস পায় এবং প্রস্থচ্ছেদ হ্রাস পেলে রোধ বৃদ্ধি পায়।

গ. **পরিবাহীর উপাদান :** একই ভৌত অবস্থায় বিভিন্ন পদার্থের রোধ বিভিন্ন হয়।

ঘ. **পরিবাহীর তাপমাত্রা :** পরিবাহীর রোধ তার তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সাধারণত পরিবাহীর রোধ বৃদ্ধি পায় এবং তাপমাত্রা হ্রাস পেলে পরিবাহীর রোধ হ্রাস পায়। যদি 0°C তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর রোধের মান R_0 এবং t°C তাপমাত্রায় এর রোধের মান R_t হয়, তবে আমরা পাই,

$$R_t = R_0 (1 + \alpha t) \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (i)$$

এখানে α একটি ধ্রুবক। একে রোধের তাপমাত্রা গুণাঙ্ক বা তাপাঙ্ক (Temperature coefficient of resistance) বলে।

$$\therefore \alpha = \frac{R_t - R_0}{R_0 \times t} \quad \ldots \quad \ldots \quad \ldots \quad (ii)$$

তবে কার্বনের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে এর রোধ হ্রাস পায়।

ঙ. **আলোকের প্রভাব :** বস্তুর রোধের ওপর আলোকের প্রভাব আছে। সেলিনিয়াম এবং ক্ষারজাতীয় পদার্থের ওপর আলোক আপতিত হলে তাদের রোধ হ্রাস পায়। বস্তুর এ ধর্মকে কাজে লাগিয়ে আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে পরিণত করা যায়।

চ. **চুম্বকত্বের প্রভাব :** পরিবাহীর রোধের ওপর চুম্বকত্বের প্রভাব দৃষ্ট হয়। চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য বৃদ্ধি পেলে বিসমাথ ধাতুর রোধ বৃদ্ধি পায়।

ছ. **চাপের প্রভাব :** পরিবাহীর রোধের ওপর চাপের প্রভাব আছে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা যায় কার্বন গুঁড়ার ওপর চাপ বৃদ্ধির ফলে এর রোধ হ্রাস পায়। কার্বন গুড়ার এ ধর্মের সাহায্যে কার্বন মাইক্রোফোন যন্ত্র নির্মিত হয়েছে।

জ. **পরিবাহীর বিশুদ্ধতা :** পরিবাহীর রোধ বিশুদ্ধতার ওপর নির্ভর করে। কতগুলো সঙ্কর ধাতুর রোধ তাদের উপাদানের রোধ অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরিবাহীর রোধ কম।

রোধের সূত্র : রোধের দুটি সূত্র আছে। এগুলো হলো :

ক. **দৈর্ঘ্যের সূত্র (Law of length) :** তাপমাত্রা, প্রস্থচ্ছেদ এবং উপাদান স্থির থাকলে কোনো একটি পরিবাহীর রোধ তার দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : মনে করি L দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহীর রোধ R।

$\therefore R \propto L$

অর্থাৎ একই উপাদান ও প্রস্থচ্ছেদের লম্বা তারের রোধ বেশি এবং ছোট তারের রোধ কম।

খ. **প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের সূত্র (Law of area of cross-section) :** তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য এবং উপাদান স্থির থাকলে কোনো একটি পরিবাহীর রোধ তার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের ব্যস্তানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরি A প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহীর রোধ R.

$\therefore R \propto \frac{1}{A}$

অর্থাৎ একই উপাদান ও দৈর্ঘ্যের সরু তারের রোধ বেশি ও মোটা তারের রোধ কম।

○ প্রশ্ন-৭. আপেক্ষিক রোধ কি? রোধ ও আপেক্ষিক রোধের পার্থক্য দেখান।

উত্তর : একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহী তার প্রস্থচ্ছেদের অভিলম্বভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহে যে পরিমাণ বাধা প্রদান করে, তাকে তার আপেক্ষিক রোধ বলে।

রোধ ও আপেক্ষিক রোধের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

রোধ	আপেক্ষিক রোধ
১. পরিবাহী যে ধর্মের ফলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে কম-বেশি বাধার সৃষ্টি করে তাকে এর রোধ বলে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক মাত্রা বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য কোনো পরিবাহীর দু প্রান্তে যে বিভব পার্থক্যের প্রয়োজন হয় সেটাই উক্ত তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধের পরিমাণ নির্দেশ করে।	১. কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক আয়তনের কোনো একটি ঘনক আকৃতির বা একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি পরিবাহীর দু বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রোধকে ঐ তাপমাত্রায় উক্ত পরিবাহীর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে।
২. রোধের একক ওহম Ω।	২. আপেক্ষিক রোধের একক ওহম মিটার (Ωm)।
৩. কোনো পরিবাহীর রোধের মান নির্ভর করে তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, পরিবাহীর উপাদান ইত্যাদির ওপর।	৩. কোনো পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে এর তাপমাত্রা ও উপাদানের ওপর।
৪. রোধ হয় কোনো পরিবাহীর।	৪. আপেক্ষিক রোধ হয় পরিবাহীর উপাদানের।

○ প্রশ্ন-৮. রোধের সমবায় বা সংযোজন কি? এর প্রকারভেদ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : কোনো কোনো সময় রোধ কমানো বা বাড়ানোর জন্য বা বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা বা বিভব পার্থক্য বিভক্ত করার প্রয়োজনে কতগুলো রোধ সুবিধামতভাবে যুক্ত করে ব্যবহার করা হয়। একে রোধের সমবায় বলে। সংযুক্ত রোধগুলো একত্রে একটি রোধের মতো ক্রিয়া করে। রোধের কোনো সমবায়ের পরিবর্তে একটি মাত্র যে রোধ ব্যবহার করলে বর্তনীর প্রবাহমাত্রা ও বিভব পার্থক্য অপরিবর্তিত থাকে তাকে ঐ সমবায়ের তুল্য রোধ (Equivalent resistance) বলে। রোধের সমবায় প্রধানত দু প্রকার; যথা :

(i) শ্রেণী সমবায় (Series combination) এবং (ii) সমান্তরাল সমবায় (Parallel combination)।

i. **শ্রেণী সমবায় :** যদি কয়েকটি রোধকে এমনভাবে যুক্ত করা হয় যে প্রথম রোধের শেষ প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত, দ্বিতীয় রোধের শেষ প্রান্তের সাথে তৃতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত ইত্যাদি পর পর অনুরূপভাবে সংযুক্ত থাকে এবং প্রত্যেক রোধে একই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তবে রোধের এ সংযোজনই শ্রেণী সমবায়।

ii. **সমান্তরাল সমবায় :** যদি কয়েকটি রোধের প্রত্যেকের এক প্রান্ত কোনো এক বিন্দুতে এবং অপর প্রান্তগুলো অন্য এক বিন্দুতে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, একই বিভব পার্থক্য রোধগুলোর প্রত্যেকের দু প্রান্তে ক্রিয়া করে তবে রোধের এ সমবায়কে সমান্তরাল সমবায় বলে।

○ প্রশ্ন-৯. ওহমের সূত্র কি?

উত্তর : কোনো পরিবাহীর দু প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলে। এ প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য, পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এবং পরিবাহীর তাপমাত্রার ওপর। একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ চলে তা শুধু এর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে জর্জ সাইমন ওহম (১৭৮৬-১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যা ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-১০. ওহমের সূত্রটির গাণিতিক প্রকাশসহ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তরের সমানুপাতিক।

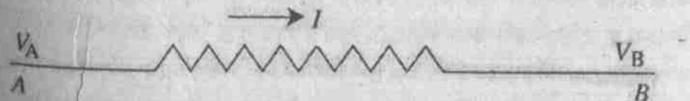

ব্যাখ্যা : ধরা যাক, AB একটি পরিবাহক, এর দু প্রান্তের বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B।

যদি $V_A > V_B$ হয়, তাহলে পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তর হবে,

$V = V_A - V_B$ এবং A থেকে B বিন্দুর দিকে তড়িৎ প্রবাহ চলবে।

এখন স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হলে,

ওহমের সূত্রানুসারে, $I \propto V$

বা, $I = GV$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, একে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা বলে। G-এর বিপরীত রাশি $R = \frac{1}{G}$। উপরিউক্ত সমীকরণে বসালে আমরা পাই, $I = \frac{1}{R}.V$.............(i)

এখানে R একটি ধ্রুব সংখ্যা। একে পরিবাহকের রোধ বলে। (i) নং সমীকরণ থেকে ওহমের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়। তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা ঐ পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তরের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-১১. বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কি? বৈদ্যুতিক ক্ষমতার গাণিতিক প্রকাশ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : বৈদ্যুতিক ক্ষমতা : কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে কৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড ধরে তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে কাজ সম্পন্ন হয় বা যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি অন্য শক্তিতে (আলো, তাপ, যান্ত্রিকশক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়, তাকে তাড়িৎ ক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে।

গাণিতিক প্রকাশ : আমরা জানি, তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে আধানের প্রবাহ। ধরা যাক, AB পরিবাহকের মধ্য দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ আধান প্রবাহিত হচ্ছে। A ও B বিন্দুদ্বয়ের বিভবান্তর $V_a - V_b = V$-এর আধান স্থানান্তরের জন্য কৃত কাজ W হবে।

$\therefore W = VQ$ এবং ক্ষমতা, $P = \frac{W}{t}$

বা, $P = \frac{VQ}{t}$

বা, $P = \frac{V.It}{t}$ [$\because$ তড়িৎ প্রবাহ, $I = \frac{Q}{t}$]

বা, $P = VI$ ....(i)

পরিবাহকের রোধ R হলে, ওহমের সূত্র থেকে পাই, $V = IR$.

সুতরাং (i) নং-এ V-এর মান বসিয়ে পাই, $P = I^2R$ ....(ii)

আবার, $V = IR$ হলে, $I = \frac{V}{R}$

সুতরাং (ii) নং সমীকরণে I-এর মান বসিয়ে পাই, $P = \frac{V^2}{R}$ .... (iii)

অতএব, (i), (ii) এবং (iii) নং সমীকরণ অনুযায়ী, তাড়িত ক্ষমতার গাণিতিক প্রকাশ হলো, $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$.

○ প্রশ্ন-১২. বৈদ্যুতিক শক্তি কি? এর গাণিতিক প্রকাশ ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলে। কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রটি কাজ করার যে সামর্থ্য লাভ করে তাকে তড়িৎশক্তি বলে।

গাণিতিক প্রকাশ : V বিভবান্তর বিশিষ্ট AB পরিবাহকের ভেতর দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ আধান পরিবাহিত হলে কৃত কাজ বা ব্যয়িত শক্তি বা অন্য শক্তিতে (আলোক, তাপ, যান্ত্রিকশক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত শক্তির পরিমাণ,

$W = VQ$

বা, $W = V.It$ .... (i) [$\because$ তড়িৎ প্রবাহ, $I = \frac{Q}{t}$]

পরিবাহকের রোধ R হলে, ওহমের সূত্র থেকে পাই, $V = IR$

সুতরাং (i) নং-এ V-এর মান বসিয়ে পাই, $W = IRIt$

বা, $W = I^2Rt$ ....(ii)

আবার,

$V = IR$ হলে, $I = \frac{V}{R}$.

সুতরাং (i) নং সমীকরণে I-এর মান বসিয়ে পাই, $W = V.\frac{V}{R}.t$

বা, $W = \frac{V^2t}{R}$ .... (iii)

অতএব, (i), (ii) এবং (iii) নং সমীকরণ অনুযায়ী তড়িৎশক্তির গাণিতিক প্রকাশ হলো, $W = VIt = I^2Rt = \frac{V^2t}{R}$.

○ প্রশ্ন-১৩. তড়িৎ পরিবাহকত্বের ওপর তাপের প্রভাব কি?

উত্তর : পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অন্তরকের পরিবাহকত্বের ওপর তাপের প্রভাব নিম্নরূপ :

ক. **পরিবাহীর পরিবাহকত্বের ওপর তাপের প্রভাব :** সাধারণ তাপমাত্রায় প্রায় সব ধাতুরই পরিবাহকত্ব অত্যন্ত বেশি। এদেরকে পরিবাহক বলে। তাপমাত্রা বাড়ালে তথা তাপ দিলে পরিবাহকের পরিবাহকত্ব হ্রাস পায় অর্থাৎ রোধ বৃদ্ধি পায়।

খ. **অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্বের ওপর তাপের প্রভাব :** সাধারণ তাপমাত্রায় কিছু কিছু ধাতব পদার্থের পরিবাহকত্ব খুবই সামান্য। এদেরকে অর্ধপরিবাহী বলে। যেমন– সিলিকন, জার্মেনিয়াম ইত্যাদি। তাপমাত্রা বাড়ালে তথা তাপ দিলে অর্ধপরিবাহী ধাতুর পরিবাহকত্ব উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ রোধ কমে যায়। তবে কার্বন অর্ধপরিবাহী না হওয়া সত্ত্বেও তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায়।

গ. **অন্তরকের পরিবাহকত্বের ওপর তাপের প্রভাব :** অন্তরক হলো সেসব পদার্থ, যা সাধারণ তাপমাত্রায় তড়িৎ পরিবহন করে না। কিন্তু অন্তরক পদার্থে অতি উচ্চ তাপ প্রয়োগ করলে এরা অর্ধপরিবাহীর মতো আচরণ করে অর্থাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে অন্তরকের পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায়।

○ প্রশ্ন-১৪. তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়ার কিছু বাস্তব ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তা দৈনন্দিন অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন— বৈদ্যুতিক বাল্ব (Electric bulb); বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি (Electric iron); বৈদ্যুতিক চুল্লি (Electric heater); বৈদ্যুতিক ফিউজ (Electric fuse) ইত্যাদি অনেক কিছুতে।

ক. **বৈদ্যুতিক বাল্ব (Electric bulb) :** আমরা বাসাবাড়িতে যে বৈদ্যুতিক বাল্ব ব্যবহার করি সেখানে তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়ার ব্যবহার নিম্নরূপে সম্পন্ন হয় :

বৈদ্যুতিক বাল্বে একটি সরু ধাতব তার থাকে। এ তার টাংস্টেন নামক এক প্রকার সংকর ধাতুর তৈরি। এটি একটি কাচের বাল্ব বা পাত্রের মধ্যে সিল করা থাকে। কাচের বাল্বের ভেতরটা বায়ুশূন্য অথবা নিষ্ক্রিয় গ্যাস দ্বারা পূর্ণ করা থাকে। তবে আজকাল বেশির ভাগ বাল্ব নিষ্ক্রিয় গ্যাসপূর্ণ থাকে। টাংস্টেন তারকে ফিলামেন্ট বলা হয়। এ ফিলামেন্টের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চললে তারটি উত্তপ্ত হয় এবং আলো বিকিরণ করে। এভাবে আমরা তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়াকে আলোর উৎস হিসেবে ব্যবহার করি।

খ. **বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি (Electric iron) :** বৈদ্যুতিক ইস্ত্রির নিচের ভারী ধাতব অংশের উপরিভাগ খাঁজকাটা থাকে। এ খাঁজের মধ্যে তারের কুণ্ডলী থাকে। তারের কুণ্ডলী যাতে ধাতব অংশের সংস্পর্শে না আসে সেজন্য কুণ্ডলী এবং ধাতব অংশের মাঝখানে অভ্র (mica) দ্বারা অন্তরীত করা হয়। অভ্র তাপ সুপরিবাহী; কিন্তু বিদ্যুৎ কুপরিবাহী। কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চললে কুণ্ডলী উত্তপ্ত হয় এবং অভ্রের ভেতর দিয়ে ঐ উৎপন্ন তাপ ধাতব অংশে পরিবাহিত হয়। ফলে ধাতব অংশ উত্তপ্ত হয়। এভাবে তড়িৎ প্রবাহের তাপীয় ক্রিয়া বৈদ্যুতিক ইস্ত্রিতে ব্যবহৃত হয়।

গ. **বৈদ্যুতিক চুল্লি (Electric heater) :** বৈদ্যুতিক চুল্লি বা হিটারে এক ধরনের তারের কুণ্ডলী ব্যবহার করা হয়। সাধারণত নাইক্রোম (nichrome) বা এ জাতীয় উচ্চ রোধের তার দিয়ে কুণ্ডলী তৈরি করা হয়। এ তারের কুণ্ডলী খাঁজকাটা চিনামাটি বা অন্য ধরনের সিরামিক কাঠামো (Formar)-এর মধ্যে শক্তভাবে আটকানো থাকে। কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহের ফলে তার খুবই উত্তপ্ত হয়ে লালচে রং ধারণ করে। কুণ্ডলীর রোধ যত বেশি হয় উৎপন্ন তাপ তত বেশি হয়।

ঘ. **বৈদ্যুতিক ফিউজ (Electric fuse) :** আমাদের বাসাবাড়ি বা বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে ফিউজ ব্যবহার করা হয়। বাসাবাড়ি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা যে কোনো তড়িৎ বর্তনীতে হঠাৎ কোনো কারণে তড়িৎ প্রবাহ বেশি হলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হতে পারে বা অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। বর্তনীতে হঠাৎ প্রবাহমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ বৈদ্যুতিক লাইনের দুপ্রান্ত সংস্পর্শে এসে শর্টসার্কিট গঠন করে। এ দুর্বিপাক থেকে রক্ষার জন্য বর্তনীতে শ্রেণী সমবায়ে কম গলনাঙ্কের পরিবাহী তার যুক্ত করা হয়। এ তারকে একটি চিনামাটি বা সিরামিকের বা অন্য কোনো অন্তরকের একটি কাঠামোর দুপ্রান্তে স্ক্রু দ্বারা অথবা সোল্ডার (solder) করে আটকানো থাকে। বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ কোনো কারণে নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি হলে তারটি উত্তপ্ত হয়ে গলে যায় এবং বর্তনী সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে; ফলে যন্ত্রপাতি রক্ষা পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, বৈদ্যুতিক ফিউজ নিরাপত্তার জন্য ব্যবহৃত একটি উপকরণ। ফিউজের তার গলে বা পুড়ে গেলে পরিবাহী তারটি পরিবর্তন করে পুনরায় বর্তনী সচল করা হয়। তবে তা করার আগে ফিউজ গলে যাওয়ার, অর্থাৎ অত্যধিক প্রবাহের কারণ নির্ণয় করে তার প্রতিকার করতে হবে।

○ প্রশ্ন-১৫. বিভব ও বিভব পার্থক্য কি?

উত্তর : বিভব : অসীম দূর থেকে একটি একক ধন চার্জকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হয় তাকে উক্ত ক্ষেত্রের দরুন ঐ বিন্দুর বৈদ্যুতিক বিভব বলে। একে সাধারণত V দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিভব পার্থক্য : বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে একটি একক ধন চার্জকে স্থানান্তর করতে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হয় তাকে ঐ দুটি বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য বলে।

একটি বিন্দু থেকে অপর একটি বিন্দুতে একক ধন চার্জকে আনতে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তাই ঐ দু বিন্দুর বিভব পার্থক্যের পরিমাপ। কাজেই দুটি বিন্দুর বিভব যথাক্রমে V_1 এবং V_2 হলে বিভব পার্থক্য, $V = V_1 - V_2$।

চার্জ এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে প্রবাহিত হলে বুঝতে হবে যে, বস্তু দুটির বিভব অসম বিভব এবং না হলে বস্তু দুটির বিভব সম-বিভব।

○ প্রশ্ন-১৬. নিম্নোক্ত ব্যবহারিক এককগুলোর সংজ্ঞা ও তাৎপর্য লিখুন এবং অন্যান্য এককের সাথে সম্পর্ক দেখান। অ্যাম্পিয়ার, কুলম্ব, ভোল্ট, ওহম।

উত্তর :

i. **অ্যাম্পিয়ার :** অ্যাম্পিয়ার হলো তড়িৎপ্রবাহের একক। তড়িৎবিজ্ঞানে একে মৌলিক একক হিসেবে ধরা হয়।
সংজ্ঞা : 1 cm দীর্ঘ পরিবাহী তারকে 1 cm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের আকারে বাঁকিয়ে তাতে যে পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হলে বৃত্তের কেন্দ্রে 0.1 ওয়েবস্টেড চৌম্বক প্রাবল্য সৃষ্টি হয় তাকে এক অ্যাম্পিয়ার (amp) বলে। বর্তমানে অ্যাম্পিয়ারের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয় 'বায়ুশূন্য স্থানে 1 মিটার দূরত্বে অবস্থিত অসীম দৈর্ঘ্যের এবং উপক্ষেণীয় প্রস্থচ্ছেদের দুটি সমান্তরাল সরল পরিবাহীর প্রত্যেকটিতে যে পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ চললে পরস্পরের মধ্যে প্রতি মিটার দৈর্ঘ্য 2×10^{-7} নিউটন বল উৎপন্ন হয় তাকে 1 অ্যাম্পিয়ার বলে।'
তাৎপর্য : 5 amp প্রবাহ বলতে বোঝায় 1 cm দীর্ঘ পরিবাহী তারকে 1 cm ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের আকারে বাঁকিয়ে তাতে ঐ পরিমাণ প্রবাহ চালনা করা হলে ঐ বৃত্তের কেন্দ্রের $5 \times 0.1 = 0.5$ oersted চৌম্বক প্রাবল্যের সৃষ্টি হয়।
অন্যান্য এককের সাথে সম্পর্ক : 1 amp $= 10^{-1}$ e.m.u. প্রবাহ $= 3 \times 10^9$ e.s.u প্রবাহ।

ii. **কুলম্ব :** কুলম্ব হলো তড়িৎ আধানের একক। অ্যাম্পিয়ারের সাহায্যে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়।
সংজ্ঞা : কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার প্রবাহ এক সেকেন্ড চললে এর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে এক কুলম্ব (Coul) বলে।
$\therefore$ 1 Coul = 1 amp × 1 sec
তাৎপর্য : 10 Coul আধান বলতে বোঝায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে 1 amp প্রবাহ 10 সেকেন্ড চললে এর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে ঐ পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয়।
অন্যান্য এককের সাথে সম্পর্ক : 1 Coul $= 10^{-1}$ e.m.u আধান $= 3 \times 10^9$ e.s.u আধান।

iii. **ভোল্ট :** ভোল্ট হলো বিভব পার্থক্যের একক। কুলম্বের সাহায্যে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়।
সংজ্ঞা : কোনো পরিবাহীর এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে এক কুলম্ব আধান স্থানান্তর করতে যদি এক জুল কাজ সম্পন্ন হয় তবে ঐ দু বিন্দুর বিভব পার্থক্যকে এক ভোল্ট (Volt) বলে।
$\therefore$ 1 Volt = $\frac{1 \text{ Joule}}{1 \text{ Coul}}$.
তাৎপর্য : কোনো পরিবাহীর দু বিন্দুর বিভব পার্থক্য 5 Volt বলতে বোঝায় ঐ পরিবাহীর এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে 1 Coul আধান স্থানান্তর করতে 5 Joule কাজ সম্পন্ন হয়।
অন্যান্য এককের সাথে সম্পর্ক : 1 Volt $= 10^8$ e.m.u বিভব পার্থক্য $= \frac{1}{300}$ e.s.u বিভব পার্থক্য।

iv. **ওহম :** ওহম হলো রোধের একক। অ্যাম্পিয়ার ও ভোল্টের সাহায্যে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়।
সংজ্ঞা : যে পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে তার মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎপ্রবাহ চলে সেই পরিবাহীর রোধকে এক ওহম (Ω) বলে।
$\therefore 1\,\Omega = \frac{1 \text{ Volt}}{1 \text{ amp}}$.
তাৎপর্য : কোনো পরিবাহীর রোধ 20 Ω বলতে বোঝায় এর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য 20 Volt হলে এর মধ্য দিয়ে 1 amp তড়িৎ প্রবাহ চলবে।
অন্যান্য এককের সম্পর্ক : 1 ohm $= 10^9$ e.m.u রোধ $= \frac{1}{9 \times 10^{11}}$ e.s.u রোধ।

○ প্রশ্ন-১৭. বৈদ্যুতিক বলরেখা কি? বৈদ্যুতিক বলরেখার ধর্ম বর্ণনা করুন।

উত্তর : বৈদ্যুতিক চার্জের চারদিকে যে স্থান জুড়ে বৈদ্যুতিক চার্জের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র বলে। চৌম্বক ক্ষেত্রকে যেমন কতগুলো রেখা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়, তেমনি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রকেও কতগুলো রেখা দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। এদেরকে বৈদ্যুতিক বলরেখা বলে। বৈদ্যুতিক বলরেখার নিম্নলিখিত যে কোনো একটি সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে।

সংজ্ঞা : (i) বৈদ্যুতিক বলরেখা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মধ্যে অঙ্কিত খোলা বক্ররেখা, যার কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুতে লব্ধি বলের দিক নির্দেশ করে।
(ii) বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে যে পথে একক ধন চার্জ আকৃষ্ট বা বিকৃষ্ট হয় তাকে বৈদ্যুতিক বলরেখা বলে।

বৈদ্যুতিক বলরেখার ধর্ম : বৈদ্যুতিক বলরেখার নিম্নলিখিত ধর্ম রয়েছে।

ক. বৈদ্যুতিক বলরেখা খোলা বক্ররেখা।
খ. রেখাগুলো ধন চার্জ থেকে উৎপন্ন হয়ে ঋণ চার্জে শেষ হয়।
গ. এটি ধন চার্জগ্রস্ত পরিবাহীর তল থেকে অভিলম্বভাবে বের হয় এবং কোনো তলে বা ঋণ চার্জগ্রস্ত তলে অভিলম্বভাবে শেষ হয়।
ঘ. দুটি বলরেখা পরস্পরকে ছেদ করে না।
ঙ. প্রত্যেক বলরেখার দুই প্রান্তে বিপরীত চার্জ থাকে।
চ. বলরেখাগুলো পরস্পরের উপর পার্শ্ব চাপ প্রয়োগ করে।
ছ. এরা পরস্পরকে পার্শ্বের দিকে বিকর্ষণ করে।
জ. পরিবাহীর অভ্যন্তরে বলরেখার কোনো অস্তিত্ব নেই।

○ প্রশ্ন-১৮. মানবদেহের রোধ কিরূপ?

উত্তর : গায়ের চামড়া শুকনো থাকলে মানবদেহের রোধের পরিমাণ প্রায় 50,000 ওহম হয়। কিন্তু চামড়া ভেজা থাকলে এর রোধ অনেক কমে যায়; প্রায় 10,000 ওহম হয়। সুতরাং ভেজা অবস্থায় শরীরের রোধ কম হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বেশি প্রবাহ চলতে পারে। কোনো ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সুইচ, বাল্ব, পাখা, হিটার, ইস্ত্রি, টেলিভিশন প্রভৃতি থেকে দেহের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ মাটিতে চলে যায়।

একে আমরা বৈদ্যুতিক শক (Shock) বলি। যদি তড়িৎপ্রবাহ মাটিতে চলে না যেত তাহলে শক অনুভব করতাম না। সুতরাং ভেজা অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্পর্শ করা বিপজ্জনক এবং এ কারণে ভেজা মাটিতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে সুইচ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। কাঠ অন্তরক পদার্থ বলে সাধারণত কাঠের উপর দাঁড়িয়ে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা হয়। কাঠ ভেজা হলে তড়িৎবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু শুকনো কাঠের উপর দাঁড়িয়ে যদি তড়িৎপ্রবাহের দুটি তারের প্রান্ত স্পর্শ করা হয় তাহলে শক লাগবে। এজন্য হাতে রবারের দস্তানা পরা উচিত।

○ প্রশ্ন-১৯. চার্জ বা আধানের নিত্যতা (সংরক্ষণশীলতা) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : চার্জকে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। এ মহাবিশ্বের মোট চার্জের (ধনাত্মক বা ঋণাত্মক) পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। চার্জ এক বস্তু হতে অন্য বস্তুতে সঞ্চালিত হতে পারে তবে, মোট চার্জ সর্বদা ধ্রুব। দুটি বস্তুর মধ্যে চার্জ বিনিময়কালে একটি বস্তু যে পরিমাণ চার্জ হারায় অন্য বস্তুটি ঠিক সে পরিমাণ চার্জ লাভ করে। চল বিদ্যুতের বিদ্যুচ্চালক বলের উৎসের এক পাত্র হতে অন্য পাত্রে চার্জ প্রবাহিত হয় এবং এক্ষেত্রে এক পাত্র যে পরিমাণ চার্জ হারায় অপর পাত্র ঠিক সে পরিমাণ চার্জ লাভ করে অর্থাৎ এক পাত্রের ঋণ চার্জ অপর পাত্রের চার্জের সমান। আয়ন তৈরির ক্ষেত্রেও ধন আয়নসমূহের মোট ধন চার্জ মোট ঋণ চার্জের সমান।

○ প্রশ্ন-২০. আধানের (চার্জের) কোয়ান্টায়ন কাকে বলে?

উত্তর : আধানের (চার্জের) কোয়ান্টায়ন : একটি ইলেকট্রন বা প্রোটনের চার্জই হলো প্রকৃতিতে ন্যূনতম মানের চার্জ। একটি ইলেকট্রনের চার্জকে ($-$ e) এবং একটি প্রোটনের চার্জকে (+ e)দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। এর মান $e = 1.60218 \times 10^{-19}$ C। অন্য সকল চার্জই এ ক্ষুদ্রতম চার্জের পূর্ণসংখ্যার গুণিতক মাত্র; অর্থাৎ ইলেকট্রনের চার্জের গুণিতক হবে, একে চার্জের কোয়ান্টায়ন বলে। উদাহরণস্বরূপ, 1 কুলম্ব চার্জে 6.24×10^{-19} সংখ্যক ইলেকট্রনের চার্জের সমান চার্জ রয়েছে। প্রকৃতিতে 2.5e, $-$3.7e মানের ভগ্নাংশ কোনো চার্জের অস্তিত্ব নেই। যেমন, 2.5e, $-$3.7e ইত্যাদি পরিমাণ চার্জ পাওয়া সম্ভব নয়।

○ প্রশ্ন-২১. কুলম্ব (বা 1 কুলম্ব) কী?

উত্তর : কুলম্ব : চার্জ বা আধানের একক কুলম্ব। কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার (1A) প্রবাহ এক সেকেন্ড (1s) চললে এর যে কোনো প্রস্থচ্ছেদ দিয়ে যে পরিমাণ আধান প্রবাহিত হয় তাকে এক কুলম্ব (1C) বা একক চার্জ বলে। অর্থাৎ $1C = 1A \times 1s$.

অন্যভাবে বলা যায়, দুটি সমধর্মী এবং সমপরিমাণ বিন্দুচার্জ শূন্য মাধ্যমে বা বায়ুতে 1m দূরে থেকে পরস্পরের ওপর 9×10^9N বল প্রয়োগ করলে তাদের প্রত্যেকটিকে 1 কুলম্ব বা সংক্ষেপে কুলম্ব বলে।

○ প্রশ্ন-২২. পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক (Dielectric Constant) বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক : যে কোনো দুটি বিন্দু চার্জের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে শূন্যস্থানে ক্রিয়াশীল বল ও ঐ দুই চার্জের মধ্যে একই দূরত্বে অন্য কোনো মাধ্যমে ক্রিয়াশীল বলের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এ ধ্রুব সংখ্যাকে সেই মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বা তড়িৎ মাধ্যমাঙ্ক বলে। অর্থাৎ, কোনো মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা ও শূন্যস্থানের ভেদন যোগ্যতার অনুপাতকে ঐ মাধ্যমটির পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলে। এ অনুপাতকে মাধ্যমটির আপেক্ষিক ভেদন যোগ্যতাও বলা হয়।

ব্যাখ্যা : সংজ্ঞানুসারে, কোনো মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক K হলে,

$$K = \frac{\text{মাধ্যমের ভেদন যোগ্যতা}}{\text{শূন্যস্থানের ভেদন যোগ্যতা}} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \frac{F_0}{F}$$

বা, $\epsilon = K\epsilon_0$

পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক দুটি ভেদন যোগ্যতার অনুপাত বলে এটি একটি সংখ্যা মাত্র। এর কোনো একক নেই এবং যেকোনো পরিমাপ পদ্ধতির ক্ষেত্রে এর মান একই থাকে। শূন্য মাধ্যমের ক্ষেত্রে K =1; অর্থাৎ $\epsilon = K\epsilon_0$।

○ প্রশ্ন-২৩. ইলেকট্রনের তাড়ন বেগ কাকে বলে?

উত্তর : তাড়ন বেগ : কোনো পরিবাহকের মধ্যে মুক্ত ইলেকট্রনগুলো যে গড় বেগে প্রবাহিত হয়ে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তাকে ইলেকট্রনের তাড়ন বেগ বলে। অন্য কথায়, তড়িৎ প্রবাহের সময় ইলেকট্রন যে বেগে চলে বা ধাবিত হয় তাকে তাড়ন বেগ বলে। এটি সঞ্চারণ বেগ নামেও পরিচিত। একে v দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

একক : তাড়ন বেগের একক ms^{-1}।

○ প্রশ্ন-২৪. প্রবাহ ঘনত্ব কাকে বলে?

উত্তর : প্রবাহ ঘনত্ব : কোনো পরিবাহকের প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহকে প্রবাহ ঘনত্ব বলে।

কোনো পরিবাহকের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A এবং তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হলে, প্রবাহ ঘনত্ব J হবে,

$$J = \frac{I}{A}$$

কিন্তু, $I = nAve$

$$\therefore J = \frac{nAve}{A}$$

$$\therefore J = nve$$

○ প্রশ্ন-২৫. একটি সরল পূর্ণ বর্তনীতে ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে প্রবাহের জন্য রাশিমালা নির্ণয় করুন।

উত্তর : সরল পূর্ণ বর্তনীতে ও'মের সূত্রের প্রয়োগ : যে বর্তনীতে সর্বত্র একই প্রবাহ চলে তাকে সরল বর্তনী বলে। E তড়িচ্চালক শক্তি ও r অভ্যন্তরীণ রোধের একটি কোষের সাথে R রোধের রোধক চাবি k-এর সাহায্যে যুক্ত করে বর্তনী পূর্ণ করা হলো। চাবি বন্ধ করলে প্রবাহ চলে। ধরি, এ প্রবাহের মান I। কোষের তড়িচ্চালক শক্তি E ভোল্টের মানে 1 C আধানকে পূর্ণবর্তনীতে A বিন্দু থেকে রোধক R-এর মধ্য দিয়ে চালনা করে পুনরায় A-তে আনতে কোষ E জুল শক্তি সরবরাহ করে। এ E শক্তির এক অংশ V ব্যয় হয় 1 কুলম্ব আধানকে R-এর মধ্যদিয়ে A বিন্দু থেকে B বিন্দুতে চালনা করতে এবং বাকি অংশ V' ব্যয়িত হয় অভ্যন্তরীণ রোধ r এর মধ্য দিয়ে B থেকে A-তে আধান চালনা করতে। সুতরাং শক্তির নিত্যতা সূত্রানুসারে, $E = V + V'$

কিন্তু, $V = IR$ এবং $V' = Ir$

$\therefore E = IR + Ir$

বা, $I(R + r) = E$

$$\therefore I = \frac{E}{R + r}$$

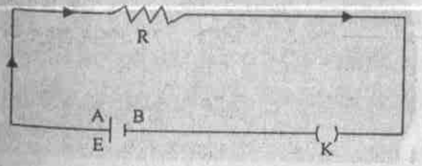

অতএব সরল পূর্ণ বর্তনীতে ও'মের সূত্র প্রয়োগ করে তড়িৎ প্রবাহের রাশিমালা যা তড়িচ্চালক শক্তি ও প্রবাহের সম্পর্ক নির্দেশ করে।

○ প্রশ্ন-২৬. তাপমাত্রা বাড়ালে কোনো পরিবাহীর রোধের কীরূপ পরিবর্তন ঘটে এবং কেন?

উত্তর : তাপমাত্রা বাড়লে পরিবাহীর রোধের যেরূপ পরিবর্তন ঘটে তার ব্যাখ্যা : ধাতব পরিবাহীর কেলাসস্থিত অণুগুলো সর্বদা কম্পনরত অবস্থায় থাকে। পদার্থের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কেলাসস্থিত অণুগুলোর কম্পনের বিস্তার বেড়ে যাওয়ার জন্য অণুগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব কমে যায়। ফলে পরিবাহীর মধ্যে প্রবাহ সৃষ্টিকারী গতিসম্পন্ন মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর সাথে কম্পনরত অণুগুলোর সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ কারণেই উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে পরিবাহীর রোধ বেড়ে যায়। কিন্তু জার্মেনিয়াম, সিলিকন ইত্যাদির ক্ষেত্রে এ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় অর্থাৎ, উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে রোধ হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে মুক্ত ইলেকট্রনের অণুগুলোর সংঘর্ষ বাড়ার সাথে সাথে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাও বেড়ে যায়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে অর্ধপরিবাহী পদার্থের রোধ কমে যায় এবং প্রবাহ বেড়ে যায়।

○ প্রশ্ন-২৭. রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক কাকে বলে?

উত্তর : রোধের উষ্ণতা গুণাঙ্ক : 0°C তাপমাত্রার একক রোধের কোনো পরিবাহকের তাপমাত্রা প্রতি একক বৃদ্ধিতে তার রোধের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে ঐ পরিবাহকের উপাদানের রোধের উষ্ণতা সহগ বা গুণাঙ্ক বলে।

ব্যাখ্যা : 0°C তাপামাত্রায় কোনো পরিবাহকের রোধ R_0 এবং θ তাপমাত্রায় রোধ R_θ হলে রোধের উষ্ণতা সহগ,

$$\alpha = \frac{R_\theta - Ro}{R_0\theta}$$

বা, $R_\theta = Ro(1 + \alpha\theta)$

বিভিন্ন পদার্থের রোধের উষ্ণতা সহগ বিভিন্ন হয়।

একক : রোধের উষ্ণতা সহগের একক হলো প্রতি কেলভিন (K^{-1})।

○ প্রশ্ন-২৮. আপেক্ষিক রোধের সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্যের ও একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলের কোনো পরিবাহকের রোধকে বা একক বাহুবিশিষ্ট কোনো ঘনকের রোধকে সেই তাপমাত্রায় সেই পরিবাহকের উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে। অর্থাৎ, নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো পরিবাহীর রোধই হলো আপেক্ষিক রোধ বা রোধাঙ্ক। একে ρ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৯. তড়িচ্চালক বল বা শক্তি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : তড়িচ্চালক বল বা শক্তি : প্রতি একক আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর এক বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আবার ঐ বিন্দুতে আনতে যে কাজ সম্পন্ন হয় অর্থাৎ কোষ যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করে তাকে ঐ কোষের তড়িচ্চালক বল বা শক্তি বলে। অন্যভাবে, খোলা তড়িৎ কোষের দু'পাতের বিভব পার্থক্যকে কোষের বিদ্যুচ্চালক বা তড়িচ্চালক বল বা শক্তি বলে। একে E দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ব্যাখ্যা : q আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর একবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে পুনরায় ঐ বিন্দুতে আনতে যদি W পরিমাণ কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে কোষের তড়িচ্চালক বল বা শক্তি।

$$E = \frac{w}{q}$$

একক : তড়িচ্চালক বল বা শক্তির একক Joule/Coulomb (JC^{-1}) বা Volt (v).

○ প্রশ্ন-৩০. 'হারানো ভোল্ট' কি?

উত্তর : হারানো ভোল্ট : ধরি, E শক্তির এক অংশ V ব্যয় হয় ,R-এর ওপর দিয়ে আধান চালনা করতে এবং বাকি অংশ V ব্যয় হয় কোষের অভ্যন্তরীণ রোধের ওপর দিয়ে আধান চালনা করতে।

সুতরাং, শক্তির নিত্যতা সূত্রানুসারে, E = V + V,

কিন্তু, V হলো R-এর দুপ্রান্তের বিভব পার্থক্য এবং V' হলো অভ্যন্তরীণ রোধ r-এর দুপ্রান্তের বিভব পার্থক্য

V = IR এবং V' = Ir [যেখানে I = তড়িৎ প্রবাহমাত্রা]

E = IR + Ir = I(r + R)

V' = Ir বিভব পার্থক্য মূল প্রবাহ চালিত করতে কোনোরকম সাহায্য করে না বলে একে সুপ্ত ভোল্ট বা অচয় ভোল্ট বা হারানো ভোল্ট বলা হয়।

সুতরাং তড়িচ্চালক শক্তি = প্রাপ্ত ভোল্ট + হারানো ভোল্ট। I = 0 হলে, হারানো ভোল্ট শূন্য হয়।

○ প্রশ্ন-৩১. তড়িচ্চালক শক্তি ও বিভব পার্থক্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

পার্থক্যের বিষয়	তড়িচ্চালক শক্তি	বিভব পার্থক্য
১. সংজ্ঞাগত	খোলা তড়িৎ কোষের দুই পাতের বিভব পার্থক্যই সেই কোষের তড়িচ্চালক শক্তি।	তড়িৎ প্রবাহ চলাকালে বর্তনীর এক বিন্দু হতে অন্য বিন্দুতে একক ধনাত্মক চার্জ আনতে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হয়, তাকে সেই দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য বলে।
২. বিদ্যুৎ চালনার ক্ষেত্রে	তড়িচ্চালক শক্তি কোষের ভেতরে ও বাইরে বিভব পার্থক্যের কারণ।	বিভব পার্থক্য বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যে তড়িৎ চালনা করে।
৩. পারস্পরিক সম্পর্ক	এটি বিভব পার্থক্যের কারণ।	এটি তড়িচ্চালক বলের ফল।
৪. মানের স্থিতি	এটি স্থির থাকে।	এটি স্থির থাকে না।

○ প্রশ্ন-৩২. ওয়াট-ঘণ্টা কি?

উত্তর : ওয়াট-ঘণ্টা : এক ভোল্ট বিভব পার্থক্যে এক অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহ এক ঘণ্টা প্রবাহিত হলে যে কাজ সম্পন্ন হয় তাকে এক ওয়াট ঘণ্টা বলে। অর্থাৎ 1 ওয়াট ক্ষমতা 1 ঘণ্টা কাজ করলে যে শক্তি ব্যয় হয়, তাকে এক ওয়াট-ঘণ্টা বলে।

$$\therefore 1\,Wh = 1\,W \times 1\,hr$$
$$= 1\,J/s \times 60 \times 60s$$
$$= 3600\,J.$$

○ প্রশ্ন-৩৩. কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kwh) বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : কিলোওয়াট-ঘণ্টা : ক্ষমতার একক কিলোওয়াট এবং সময়ের একক ঘণ্টা হিসেবে প্রকাশ করলে শক্তির একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে প্রকাশিত হয়। এক কিলোওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো যন্ত্র এক ঘণ্টা ধরে যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ বা ব্যয় করে তার পরিমাণকে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (1 kwh) বলে। কিলোওয়াট-ঘণ্টা পরিমাণকে N দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore 1kWh = 1\,kW \times 1\,hr$$
$$= 1000\,W \times 3600\,s$$
$$= 3600000\,Ws$$
$$= 36 \times 10^5\,J.$$

প্রশ্ন-৩৪। B.O.T Unit কি?

উত্তর : B.O.T Unit : বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো বাড়িতে, দোকানে বা কলকারখানায় যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তার পরিমাপ শক্তির একক অনুযায়ী কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে পরিমাপ করে। যেহেতু সমগ্র পৃথিবীর বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলো এ একক ব্যবহার করে, সেজন্য একে বোর্ড অব ট্রেড একক (B.O.T Unit) বা বাণিজ্যিক একক বলা হয়।

B.O.T Unit অনুযায়ী,

ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির খরচ = ব্যয়িত বিদ্যুৎ শক্তির একক সংখ্যা × প্রতি এককে খরচ

বা, $B = W \times b$

প্রশ্ন-৩৫. কোনো বালবের (বৈদ্যুতিক বাতি) গায়ে 220 V – 60 W লেখা থাকলে কী বোঝায়?

উত্তর : বৈদ্যুতিক বাতির গায়ে 220 V – 60 W লেখা থাকলে যা বোঝায় : বৈদ্যুতিক বাতির গায়ে 220V – 60 W লেখা থাকলে এর অর্থ হলো 220 V বিদ্যুৎ উৎসের সাথে যুক্ত করলে এটি সর্বাধিক উজ্জ্বলতায় আলো দেবে। 60 W কথার অর্থ হলো বাতিটি প্রতি সেকেন্ডে 60 J বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় করে।

প্রশ্ন-৩৬. কোনো বাড়ির মেইন মিটার 6 amp – 220V চিহ্নিত করা আছে। কতগুলো 60 Watt-এর বাতি ঐ বাড়িতে নিরাপত্তার সাথে ব্যবহার করা যাবে?

সমাধান : এখানে, বিভব পার্থক্য, V = 220 Volt

তড়িৎ প্রবাহ, I = 6 A

প্রতিটি বাতির ক্ষমতা, P = 60 Watt

আমরা জানি, $P = VI = 220 \times 6$ Watt

$\therefore P = 1320$ Watt

সুতরাং, নিরাপত্তার সাথে ব্যবহৃত মোট বাতির সংখ্যা = 1320 / 60 = 22টি

প্রশ্ন-৩৭. কোনো একটি বাড়িতে 100 W এর 10 টি, 60 W এর ৫টি এবং 3kW এর একটি হিটার আছে। বাতিগুলো প্রতিদিন 6 ঘণ্টা জ্বলে এবং হিটারটি 2 ঘণ্টা চলে। জানুয়ারি মাসে ঐ বাড়িতে কত ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যয় হবে?

সমাধান : বাতির জন্য প্রতিদিন খরচ হয়

$= \{(100 \times 10 + 60 \times 5) \times 6\}$ Wh

$= \{(1000 + 300) \times 6\}$ Wh

$= 1300 \times 6$ Wh

= 7800 Wh

= 7.8 kWh = 7.8 unit

প্রতিদিন হিটার এর জন্য খরচ = $(3 \times 1) \times 2$ kWh

= 6 kWh

= 6 unit

প্রতিদিন মোট খরচ হয় = 7.8 + 6 = 13.8 unit

$\therefore$ জানুয়ারি মাসে খরচ হয় = $13.8 \times 31 = 427.8$ unit

প্রশ্ন-৩৮. ঘন্টায় একটি 250W টিভি সেট বা 10 মিনিটে একটি 1200W ইস্ত্রি কোনটি বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করবে?

সমাধান : এখানে, টিভি সেটের ক্ষমতা, $P_1 = 250W$

সময় $t_1 = 1h = 3600s$

ইস্ত্রির ক্ষমতা, $P_2 = 1200W$

সময় $t_2 = 10 \text{ min} = 600s$

আমরা জানি,

ব্যবহৃত শক্তি, $W = P \times t$

টিভি সেট কর্তৃক ব্যবহৃত শক্তি,

$W_1 = P_1 \times t_1$

$= 250 \times 3600$ Joule

$= 9 \times 10^5$ Joule

ইস্ত্রি কর্তৃক ব্যবহৃত শক্তি,

$W_2 = P_2 \times t_2$

$= 1200 \times 600$ Joule

$= 7.2 \times 10^5$ Joul

এখানে, $W_1 > W_2$

সুতরাং, টিভি সেট বেশি শক্তি ব্যবহার করবে।

প্রশ্ন-৩৯. একটি ছাত্রাবাসে 25টি কক্ষ আছে। প্রতিটি কক্ষে 40 ওয়াট এর একটি করে বাতি প্রতিদিন 5 ঘণ্টা জ্বলে। সাধারণ কক্ষে 500 ওয়াটের একটি রেডিও প্রত্যহ 2 ঘণ্টা করে চলে। যদি প্রতি ইউনিটের দাম 1.50 টাকা হয়, তবে প্রতি মাসে কত ব্যয় হয়?

সমাধান : 40 Watt এর বাতির জন্য

ব্যয়িত শক্তি, $W = \frac{P \times t}{1000}$ kWhr

$= \frac{25 \times 40 \times 5 \times 30}{1000}$ kWh

= 150 kWn

500 watt এর রেডিও ক্ষেত্রে,

ব্যয়িত শক্তি, $W = \frac{P \times t}{1000}$ kWhr

$= \frac{500 \times 2 \times 30}{1000}$

= 30 kWhr

মোট খরচ = $(150 + 30) \times 1.50$ টাকা

= 270 টাকা।

তড়িৎচৌম্বক ও তড়িৎচৌম্বক আবেশ
Electromagnet and electromagnetic induction

○ প্রশ্ন-৪০. তাড়িত চুম্বক কাকে বলে?

উত্তর : সলিনয়েডের ভেতর কোনো লোহার দণ্ড ঢুকিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করলে লোহার দণ্ড চুম্বকে পরিণত হয়। একে তাড়িত চুম্বক বলে। অর্থাৎ তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে চুম্বকের সৃষ্টি হয় তাকে তাড়িত চুম্বক বলে। তড়িৎ চুম্বক এক ধরনের অস্থায়ী চুম্বক। তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করলে এর চুম্বকত্ব থাকে না।

○ প্রশ্ন-৪১. তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া কি? এ প্রসঙ্গে বায়োট-স্যাভার্টের সূত্র বর্ণনা করুন।

উত্তর : কোনো পরিবাহীর ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে এর আশেপাশে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। একে তড়িৎ প্রবাহের চৌম্বক ক্রিয়া বলে।

বায়োট-স্যাভার্টের সূত্র : ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলার ফলে এর আশেপাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুর চৌম্বক প্রাবল্যের মান পরিবাহীর দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক, প্রবাহ মাত্রার সমানুপাতিক, পরিবাহীর মধ্য বিন্দু থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বে বর্গের ব্যস্তানুপাতিক, পরিবাহী এবং পরিবাহীর মধ্য বিন্দুর ও ঐ বিন্দুর সংযোজন সরলরেখার অন্তর্ভুক্ত কোণের সাইনের সমানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-৪২. তড়িৎ চৌম্বকক্ষেত্র কি? তড়িৎ প্রবাহের ফলে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্যের অভিমুখ সম্বন্ধে অ্যাম্পিয়ার, ম্যাক্সওয়েল এবং ফ্লেমিং-এর সূত্রগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : পরিবর্তনশীল চৌম্বকক্ষেত্র সবসময় বিদ্যুৎক্ষেত্র সৃষ্টি করে এবং এর বিপরীতক্রমে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎক্ষেত্র সবসময় চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে। বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক বলসমূহের এ মিথষ্ক্রিয়া সংশ্লিষ্ট স্থানে যে অবস্থা সৃষ্টি করে তা বিদ্যুৎ-চৌম্বকক্ষেত্র নামে পরিচিত। বিদ্যুৎ চৌম্বকক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ ম্যাক্সওয়েল সমীকরণের সাহায্যে গাণিতিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

অ্যাম্পিয়ারের সন্তরণ সূত্র : কোনো ব্যক্তি যদি তড়িৎবাহী তার বরাবর প্রবাহের অভিমুখে এমনভাবে সাঁতার কাটতে থাকেন যে তার মুখ সর্বদা চুম্বক শলাকার দিকে থাকে তাহলে তার বাম হাত যেদিকে প্রসারিত হয় চুম্বক শলাকার উত্তর মেরু সেদিকে বিক্ষিপ্ত হবে অর্থাৎ ঐ দিকই হবে চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখা তথা প্রাবল্যের অভিমুখ।

ম্যাক্সওয়েলের কর্ক-স্ক্রু সূত্র : একটি তড়িৎবাহী তার বরাবর প্রবাহের অভিমুখে একটি ডানপাকের স্ক্রুকে ঘুরালে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি যেদিকে ঘোরে চুম্বক শলাকার উত্তর মেরু সেদিকে বিক্ষিপ্ত হবে অর্থাৎ ঐ দিকই হবে চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখা তথা প্রাবল্যের অভিমুখ।

ফ্লেমিং-এর ডান হস্ত সূত্র : একটি তড়িৎবাহী তারকে প্রবাহের অভিমুখে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করে ডান হাত দিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করে ধরলে অন্য আঙ্গুলগুলোর মাথা চৌম্বক বলরেখার তথা প্রাবল্যের অভিমুখ নির্দেশ করে।

○ প্রশ্ন-৪৩. তড়িৎ চুম্বকের প্রাবল্য কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়?

উত্তর : তড়িৎবাহী সলিনয়েডের ভেতর কোনো লোহার দণ্ড বা পেরেক ঢোকালে তা চুম্বকে পরিণত হয়। লোহার দণ্ড বা পেরেক শুধু চুম্বকেই পরিণত হয় না, সলিনয়েডের নিজের যে চৌম্বকক্ষেত্র আছে তাকেও শক্তিশালী করে। এর কারণ হলো, দণ্ড বা পেরেকটি যখন তাড়িত চুম্বকে পরিণত হয় তখন এটি তার নিজের চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে। ফলে সলিনয়েডের চৌম্বকক্ষেত্র পাওয়া যায়। তড়িৎ প্রবাহকালীন সময়ে এটি বেশ শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়। তড়িৎ চুম্বকের প্রাবল্য নিম্নোক্তভাবে ও পেরেকের চৌম্বকক্ষেত্র মিলে সলিনয়েড থেকে বেশি চৌম্বকক্ষেত্র বাড়ানো যায় যেমন–

১. সলিনয়েডের তারের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ বাড়িয়ে,
২. সলিনয়েডের পাক বা প্যাঁচের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং
৩. লোহা দণ্ড বা পেরেককে U অক্ষরের মতো বাঁকিয়ে মেরু দুটিকে আরো কাছাকাছি এনে।

○ প্রশ্ন-৪৪. তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কি? তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে ফ্যারাডের পরীক্ষাসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তর : কোনো তার বা তার কুণ্ডলীর কাছে আমরা যদি কোনো চুম্বককে নাড়াচাড়া করি, বা আনা-নেয়া করি বা কোনো চুম্বকের নিকট কোনো তার কুণ্ডলীকে আনা-নেয়া করি তাহলে কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। কোনো তড়িৎবাহী তার বা বর্তনীর নিকট কোনো তার কুণ্ডলী আনা-নেয়া করলেও তার কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তড়িত চৌম্বক আবেশ বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি গতিশীল চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি সংবদ্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল ও তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে তাড়িতচৌম্বক আবেশ বলে।

পরীক্ষা-১ : কার্ড বোর্ডের একটি চোঙের গায়ে অন্তরীত তার পেঁচিয়ে তারের দু প্রান্তে একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার যুক্ত করা হয়। এখন একটি দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে দ্রুত চোঙের ভেতর আনা-নেয়া করলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটবে। চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ যে দিকে ঘটবে চুম্বককে বের করানোর সময় বিক্ষেপ ঘটবে তার বিপরীত দিকে।

চুম্বকটিকে স্থির রেখে এবার যদি গ্যালভানোমিটারসহ কুণ্ডলীটিকে চুম্বকের দিকে দ্রুত নেয়া হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। কুণ্ডলীটিকে চুম্বক থেকে দূরে সরিয়ে নিলে বিক্ষেপ বিপরীত দিকে দেখা যাবে।

পরীক্ষা-২ : অন্তরীত তামার তারের দুটি বদ্ধ কুণ্ডলী নেয়া হয়। প্রথম কুণ্ডলীতে শুধু একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত। দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে একটি তড়িচ্চালক শক্তির উৎস, একটি পরিবর্তনশীল রোধ ও একটি টেপা চাবি সংযুক্ত। যে কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তির উৎস সংযুক্ত তাকে মুখ্য কুণ্ডলী বলে। আর যে কুণ্ডলীতে গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত সেটি গৌণ কুণ্ডলী। মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ চালালে গৌণ কুণ্ডলীর গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যায়। আবার তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করার সময়ও গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যায়। তবে এবার বিক্ষেপ বিপরীত দিকে হয়।

মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তন করতে থাকলে গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যাবে। এক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধির সময় বিক্ষেপ যেদিকে হবে তড়িৎপ্রবাহ হ্রাসের সময় বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে।

মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ স্থির রেখে যদি কুণ্ডলীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। দূরত্ব বৃদ্ধি করলে বিক্ষেপ যেদিকে হবে, দূরত্ব হ্রাস করলে বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে।

উপরের পরীক্ষা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়। গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ বর্তনীতে তড়িচ্চালক শক্তি তথা তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ তড়িচ্চালক শক্তিকে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি এবং প্রবাহকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ বলে।

চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি বন্ধ হয়ে গেলে গ্যালভানোমিটারে শূন্য বিক্ষেপ দেখা যায়। আপেক্ষিক গতি যত বেশি হয় বিক্ষেপের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায়, চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ থাকে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এর মান আপেক্ষিক গতির মানের ওপর নির্ভর করে।

চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। চুম্বকের মেরু শক্তি বৃদ্ধি করলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

○ প্রশ্ন-৪৫. কোনো তার দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালালে যে চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় তার বর্ণনা দিন। তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তনের সাথে চৌম্বকক্ষেত্রের কিরূপ পরিবর্তন হয়?

উত্তর : ওয়েরস্টেড ১৮২০ সালে আবিষ্কার করেন যে, তড়িৎবাহী তারের সাথে চৌম্বকক্ষেত্র বিজড়িত। কোনো সোজা খাড়া তারের দরুন চৌম্বকক্ষেত্র রেখা বা বলরেখাগুলো হলো তারটিকে ঘিরে কতগুলো সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। এ বৃত্তগুলো সমতল তারের সাথে লম্ব। তারের কাছাকাছি চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বেশি। তার থেকে দূরে যেতে থাকলে চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য কমতে থাকে।

এ চৌম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ ডানহাতি নিয়মে বের করা যায়। বৃদ্ধাঙ্গুলি খাড়া রেখে ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করলে বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ নির্দেশ করে তাহলে অন্য আঙ্গুলি দিয়ে চুম্বকক্ষেত্রের অভিমুখ নির্দেশিত হবে।

চৌম্বকক্ষেত্রের বলরেখাগুলো ঘড়ির কাঁটার দিকাভিমুখে যায়। তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে ক্ষেত্রের অভিমুখও বিপরীতমুখী হয়ে যায়। কিন্তু ক্ষেত্র-প্যাটার্ন বা বিন্যাস একই থাকে। তারটিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে সলিনয়েড তৈরি করে চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্য বাড়ানো যায়।

○ প্রশ্ন-৪৬. ফ্যারাডের তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের সূত্রাবলী বর্ণনা করুন।

উত্তর : ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বিখ্যাত বিজ্ঞানী ফ্যারাডে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের চারটি সূত্র আবিষ্কার করেন। তার নামানুসারে এদেরকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে ফ্যারাডের সূত্র বলে। সূত্রগুলো নিচে বিবৃত হলো :

প্রথম সূত্র : যখনই কোনো বদ্ধ তার কুণ্ডলীতে আবদ্ধ চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বা চৌম্বক ফ্লাক্স-এর পরিবর্তন ঘটে তখনই উক্ত কুণ্ডলীতে একটি বিদ্যুৎ চালক শক্তি আবিষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূত্র : তার কুণ্ডলীতে আবিষ্ট বিদ্যুৎ চালক শক্তির মান সময়ের সাথে কুণ্ডলী দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক বলরেখার সংখ্যা বা চৌম্বক ফ্লাক্স-এর পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক।

তৃতীয় সূত্র : তার কুণ্ডলীতে আবদ্ধ চৌম্বক ফ্লাক্স-এর বাড়তি বিপরীত বিদ্যুৎ চালক শক্তি এবং ফ্লাক্স-এর ঘাটতি সমমুখী বিদ্যুৎ চালক শক্তি উৎপন্ন করে।

চতুর্থ সূত্র : তার কুণ্ডলীতে আবিষ্ট বিদ্যুৎ চালক বলের মান গৌণ কুণ্ডলীর পাক সংখ্যার সমানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-৪৭. সলিনয়েড কি? তড়িৎবাহী সলিনয়েড দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে– ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : সলিনয়েড হলো কাছাকাছি বা ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলো প্যাঁচযুক্ত লম্বা বেলনাকার কয়েল বা তার কুণ্ডলী। একটি লম্বা অন্তরীত পরিবাহক তারকে স্প্রিংয়ের মতো বহুপাকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে সাজালে বা কয়েল তৈরি করলে সলিনয়েড তৈরি হয়। অন্তরীত বেলনাকার চোঙের ওপর তার পেঁচিয়ে সলিনয়েড তৈরি করা যেতে পারে। তারের প্রতিটি পাক বেলনের অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকে।

তড়িৎবাহী সলিনয়েড দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে : সলিনয়েড দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালালে সলিনয়েডের প্রতিটি প্যাঁচ একটি কয়েল হিসেবে কাজ করে এবং চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এছাড়াও প্যাঁচগুলো একত্রে যে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, তা কোনো দণ্ড চুম্বকের চারদিকের চৌম্বকক্ষেত্রের সদৃশ। কয়েলটি এমনভাবে আচরণ করে যেন এর এক প্রান্তে উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি

হয়েছে। কোনো সলিনয়েডে বলরেখার প্রকৃতি ঠিক একটি দণ্ড চুম্বকের বলরেখার মতো। দণ্ড চুম্বকের মতোই সলিনয়েডের দুই প্রান্ত বিপরীত চৌম্বক মেরুর মতো আচরণ করে। সলিনয়েডের যে প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে সে প্রান্তে দক্ষিণ মেরু সৃষ্টি হয়। আর যে প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে সে প্রান্তে উত্তর মেরু সৃষ্টি হয়।

যখন কোনো চুম্বক শলাকাকে সলিনয়েডের B প্রান্তে আনা হয়, শলাকার দক্ষিণ মেরু এর দিকে আকৃষ্ট হয়। শলাকাকে অপর প্রান্তে (A প্রান্তে) আনা হলে এর উত্তর মেরু A প্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। সলিনয়েডে তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ বিপরীত করলে এর মেরুদ্বয়ও পাল্টে যায় এবং বলরেখাগুলোর অভিমুখ বিপরীতমুখী হয় অর্থাৎ এটি একটি দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে।

○ প্রশ্ন-৪৮. তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ দু প্রকার। যথা :

ক. স্বকীয় আবেশ (Self induction) ও

খ. পারস্পরিক আবেশ (Mutual induction)

ক. স্বকীয় আবেশ : একটি মাত্র বদ্ধ কুণ্ডলীতে অসম বিদ্যুৎ প্রবাহের দরুন চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের ফলে অথবা কোনো চৌম্বকক্ষেত্রে বদ্ধ কুণ্ডলীর গতির ফলে যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ ঘটে তাকে স্বকীয় আবেশ বলে।

খ. পারস্পরিক আবেশ : মুখ্য বর্তনীতে অসম বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে গৌণ কুণ্ডলীতে যে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ ঘটে, তাকে পারস্পরিক আবেশ বলে। সাধারণভাবে বলা যায়, এক কুণ্ডলীতে অসম বিদ্যুৎ প্রবাহে সৃষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তনের ফলে যদি অপর বদ্ধ কুণ্ডলীতে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ ঘটে তবে ঐ আবেশই পারস্পরিক আবেশ।

○ প্রশ্ন-৪৯. লেঞ্জের সূত্রটি লিখুন এবং ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : লেঞ্জের সূত্র : যে কোনো তড়িচ্চুম্বকীয় আবেশের বেলায় আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি বা তড়িৎ প্রবাহের দিক এমন হয় যে, তা সৃষ্ট হওয়া মাত্রই যে কারণে সৃষ্টি হয় সেই কারণকেই বাধা দেয়।

গাণিতিক ব্যাখ্যা : কোনো বদ্ধ কুণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে অতিক্রান্ত ফ্লাক্স ϕ হলে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময় dt এর জন্য ফ্লাক্সের পরিবর্তন $d\phi$ এর জন্য ফ্যারাডের সূত্র ও লেঞ্জের সূত্র সমন্বয়ে পাই, আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল, $\in \alpha -\frac{d\phi}{dt}$

বা, $\in = -K\frac{d\phi}{dt}$

এখানে, K সমানুপাতিক ধ্রুবক।

S.I. পদ্ধতিতে, $\in = 1$ Volt, ϕ

$= 1$ Wb, $t = 1$ s

$\therefore K = 1$ একক।

$\therefore \in = -\frac{d\phi}{dt}$

আবার, পাক সংখ্যা N হলে, $\therefore \in = -N\frac{d\phi}{dt}$

এখন –ve চিহ্ন $\in$ ও $\frac{d\phi}{dt}$ এর বিপরীত অভিমুখের ক্রিয়া বুঝায়।

○ প্রশ্ন-৫০. দেখান যে, লেঞ্জের সূত্র শক্তির নিত্যতা সূত্র মেনে চলে।

উত্তর : লেঞ্জের সূত্র ও শক্তির নিত্যতার সূত্র : তড়িতচৌম্বক আবেশের ফলে মনে হয় কোনো বদ্ধ কুণ্ডলীতে সৃষ্ট তড়িৎচালক শক্তি উৎস ছাড়াই তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে। আপাতদৃষ্টিতে এটি শক্তির নিত্যতা সূত্রের ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ চৌম্বক আবেশে শক্তির নিত্যতা সূত্র বিরোধী কোনো ঘটনা ঘটে না।

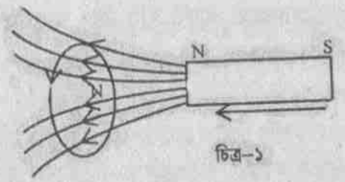

চিত্র–১

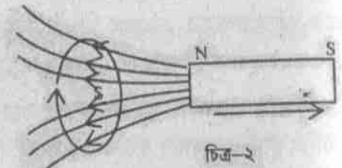

চিত্র–২

লেঞ্জের সূত্র মতে কোনো কুণ্ডলীতে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল, এর সৃষ্টির কারণকেই বাধা দেয়। যেমন– কোনো দণ্ড চুম্বককে কোনো কুণ্ডলীর দিকে আনতে থাকলেই দুই সমমেরু (চিত্র-১) N-N এর মধ্যে বিকর্ষণ বল সৃষ্টি হয় এবং দণ্ড চম্বককে কুণ্ডলীর কাছ থেকে দূরে সরাতে চাইলে দুই বিষম মেরু (চিত্র-২) S-N এর মধ্যে আকর্ষণ বল সৃষ্টি হয়। সুতরাং চুম্বকের স্বাভাবিক গতি বজায় রাখতে চাইলে সর্বদা কিছু যান্ত্রিক শক্তি ব্যয় করতে হয়। এই যান্ত্রিক শক্তিই তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি করে। হিসাব করে দেখা গেছে ব্যয়িত যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন তড়িৎ শক্তির সমান। কাজেই লেঞ্জের সূত্র শক্তির নিত্যতার সূত্র মেনে চলে।

○ প্রশ্ন-৫১. এক হেনরি কি?

উত্তর : এক হেনরি (1 Henry) : কোনো কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে এক অ্যাম্পিয়ার হারে পরিবর্তিত হলে যদি ঐ কুণ্ডলীতে এক ভোল্ট তড়িচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হয় তাহলে ঐ কুণ্ডলীর স্বকীয় আবেশ গুণাঙ্ককে এক হেনরি (1 Henry) বা সংক্ষেপে হেনরি বলে।

অর্থাৎ $1H = \frac{1V}{1As^{-1}} = 1VsA^{-1}$

আবার, $L = \frac{\phi}{I}$

$\therefore\ 1H = 1WbA^{-1}$

সার্কিট ব্রেকার, ফিউজ, GFCI's
Circuits Breakers, Fuses, GFCI's

○ প্রশ্ন-৫২. বৈদ্যুতিক সুইচ কি?

উত্তর : সুইচ হচ্ছে বিদ্যুৎ বর্তনীতে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন বা বিচ্ছিন্ন করার একটি কৌশল। বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদি যে কোনো যন্ত্রের সাথে একটি করে সুইচ পৃথক পৃথকভাবে সিরিজে সংযুক্ত থাকে। বাতির সুইচ অন করলে বাতি জ্বলে, টিভির সুইচ অন করলে টিভি চলে। আবার যখন যেটার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়, তখন সেটি অফ করে দেয়া যায়। এভাবে প্রয়োজনমতো বৈদ্যুতিক যন্ত্র ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তির অপচয় রোধ করা যায়।

○ প্রশ্ন-৫৩. ফিউজ কি? কেন এটা ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : ফিউজ হচ্ছে টিন ও সীসার একটি সংকর ধাতুর তৈরি ছোট সরু তার। এটি একটি চিনামাটির কাঠামোর উপর আটকানো থাকে। তারটি সরু এবং এর গলনাঙ্ক কম। এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে গলে যায়। ফলে বিদ্যুৎবর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দিয়ে ফিউজ যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে। বর্তনীতে ফিউজ সিরিজে সংযোগ করতে হয়।

○ প্রশ্ন-৫৪. বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ ব্যবহার করা হয় কেন?

উত্তর : ফিউজ বিভিন্ন মানের হয়। সাধারণত আমরা ৫ অ্যাম্পিয়ার, ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ৩০ অ্যাম্পিয়ার এবং ৬০ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করে থাকি। ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ মানে এর মধ্য দিয়ে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে এটি গলে যাবে। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিভিন্ন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাতি, পাখা, টিভি ইত্যাদির জন্য ৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ এবং ইলেকট্রিক কেটলি বা ইস্ত্রির জন্য ১৫ অ্যাম্পিয়ার ফিউজ ব্যবহার করতে হয়। বাড়ির মেইন ফিউজ হয় ৩০ বা ৬০ অ্যাম্পিয়ারের।

টেলিভিশনের সাথে ৩০ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগালে কি হবে? টেলিভিশন ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য পুড়ে যায়। তাই এই ফিউজ কোনো কাজে আসবে না। ইলেকট্রিক কেটলির সাথে ৫ অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগালে কি হবে? সুইচ অন করলেই ফিউজটি গলে যাবে। কারণ ইলেকট্রিক কেটলিতে ৫ অ্যাম্পিয়ারের বেশি বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়। যেখানে যা প্রয়োজন সেখানে তেমন মানের ফিউজ ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি মানের ফিউজ ব্যবহার করলে কোনো কাজ হবে না, অর্থাৎ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা এড়ানো যাবে না। আবার কম মানের ফিউজ ব্যবহার করলে বারবার ফিউজ তার পুড়ে গিয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করবে।

○ প্রশ্ন-৫৫. সার্কিট ব্রেকার কি?

উত্তর : সার্কিট বেকার এক ধরনের ফিউজ যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তনী ভেঙ্গে দেয় আবার জোড়া লাগায়। বর্তনীতে কোনো কারণে হঠাৎ করে বিদ্যুৎ প্রবাহ বেড়ে গেলে সার্কিট ব্রেকার অফ হয়ে যায়। আবার বিদ্যুৎ প্রবাহ স্বাভাবিক হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন হয়ে যায়। এভাবে সার্কিট ব্রেকার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে।

○ প্রশ্ন-৫৬. আর্থ তার কি? কেন এটা ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি বা কেটলির আবরণ স্টীলের তৈরি। এগুলোর ভিতরে থাকে তারের কুণ্ডলী যার মধ্যদিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। অপরিবাহী পদার্থ দিয়ে তারকে ঢেকে রাখা হয় বলে তারের বিদ্যুৎ আবরণকে স্পর্শ করতে পারে না। কোনো ত্রুটির কারণে যদি বিদ্যুৎ পরিবাহী তার আবরণকে স্পর্শ করে তবে আবরণটিও বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে। সে অবস্থায় আবরণটি কেউ স্পর্শ করলে সে প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক পাবে। এ জন্য এ ধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সংযোগের জন্য তিনটি তার থাকে। দুটি বৈদ্যুতিক সংযোগের জন্য থাকে আর একটি আর্থ তার অর্থাৎ মাটির সঙ্গে সংযোগের জন্য। এই আর্থ তারটি যন্ত্রের আবরণের সাথে লাগান থাকে। তাই আবরণটি বিদ্যুতায়িত হলে সেই বিদ্যুৎ এই তারের মধ্য দিয়ে সরাসরি মাটিতে চলে যায়। এই তারের ভিতর দিয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় বলে ফিউজ তার পুড়ে বিদ্যুৎ বর্তনী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এভাবে যন্ত্রটিও রক্ষা পায়, বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার সম্ভাবনা দূর হয়।

○ প্রশ্ন-৫৭. GFCI কি?

উত্তর : The ground-fault circuit interrupter, or GFCI হলো এক ধরনের সার্কিট ব্রেকার যা $\frac{১}{৪০}$ সেকেন্ডের মধ্যে কোনো বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহকে বন্ধ করে দিতে পারে। পরিবাহীর মধ্যদিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ যাচ্ছে এবং কোনো যন্ত্রের মধ্য থেকে কতটুকু বিদ্যুৎ ফিরে আসছে এই বিষয়ের উপর GFCI কাজ করে।

○ প্রশ্ন-৫৮. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা কি? এতে কি হয়?

উত্তর : বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার ফলে প্রধানত দু ধরনের ক্ষতি হতে পারে :

i. বৈদ্যুতিক শক লাগা

ii. ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যাওয়া

মানুষের দেহ বিদ্যুৎ পরিবাহী। তবে সাধারণ অবস্থায় দেহের রোধ প্রায় ৫০,০০০ ওহম বলে অল্প পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ তেমন ক্ষতি করে না। কিন্তু অত্যাধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ শরীরের মধ্য দিয়ে চললে প্রচুর শক লাগে যাকে বৈদ্যুতিক শক বলে। বৈদ্যুতিক শকে দেহের কোষ নষ্ট হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ চললে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা এবং স্থিতিকাল যত বেশি হয়, মৃত্যুর সম্ভাবনা তত বাড়ে।

বৈদ্যুতিক তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তার উত্তপ্ত হয়। বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা কোন কারণে অত্যন্ত বেড়ে গেলে তার এতো বেশি উত্তপ্ত হয় যে তা থেকে ঘরবাড়িতে আগুন লেগে যেতে পারে।

○ প্রশ্ন-৫৯. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা যেসব কারণে হতে পারে তা লিখুন?

উত্তর : বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা যেসব কারণে ঘটতে পারে তা হলো :

i. শর্ট সার্কিট,

ii. ওভারলোড

শর্ট সার্কিট : বৈদ্যুতিক বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহের যে পথ ঘুরে যাওয়ার কথা সে পথের পরিবর্তে কোনো কারণে সংক্ষিপ্ত পথে বিদ্যুৎ প্রবাহ যাওয়াকে শর্ট সার্কিট বলে। দুটি রাবার বা প্লাস্টিকের আবরণ দেয়া তার দিয়ে বাড়িতে সব বৈদ্যুতিক সংযোগ দেয়া হয়। এই তার দিয়ে বিদ্যুৎ বাল্বে যায় তারপর বাল্বের মধ্য দিয়ে অপর তার দিয়ে ফিরে আসে। বাল্বের মধ্যে যে সরু তার আছে তার বাধার কারণে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা কম থাকে। এখন যদি কোনো কারণে বাল্ব পর্যন্ত যাওয়ার আগেই তার দুটি একে অপরটির সাথে লেগে যায় তখনই শর্ট সার্কিট হয়। তারের মধ্য দিয়ে তখন প্রবল বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। কারণ বাধা দেয়ার জন্য মাঝে কিছু থাকে না।

ওভার লোড : ওভার লোড হলো বর্তনীতে যতটুকু পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া নিরাপদ, তার চেয়ে বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়া।

শর্ট সার্কিট বা ওভারলোড হতে পারে :

i. নিম্নমানের বৈদ্যুতিক তার বা সরঞ্জাম ব্যবহার করলে

ii. ক্রটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগের ফলে।

বৈদ্যুতিক সংযোগ তারের উপর প্লাস্টিক বা রবারের আবরণ থাকে এই কারণে যে, রাবার এবং প্লাস্টিক অন্তরক পদার্থ। এই আবরণ যদি নিম্নমানের হয় তবে তা গলে গিয়ে অন্তরক নষ্ট হয়ে যায়। তাই তার দুটি একে অপরকে স্পর্শ করলেই শর্ট সার্কিট হয়। অনেক সময় একই বর্তনীতে অনেকগুলো বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সংযোগ করা হয়। এতে বর্তনী ওভারলোডেড হয়। কখনো একই সকেটে এক সাথে বাতি, টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি লাগানো উচিৎ নয়। ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সকেট ব্যবহার করা উচিৎ।

○ প্রশ্ন-৬০. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে কি করা উচিত?

উত্তর : বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে–

i. ঠিক মানের ফিউজ তার ব্যবহার করতে হবে।

ii. যে ক্ষেত্রে প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে আর্থ সংযোগ করতে হবে।

iiii. উন্নতমানের বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করতে হবে।

iv. মাঝে মাঝেই তার পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে অন্তরক নষ্ট হয়ে গেছে কিনা।

○ প্রশ্ন-৬১ প্রটেকটিভ ডিভাইজ কি? বর্তনীতে এটি ব্যবহারের কারণ উল্লেখ করুন।

উত্তর : বৈদ্যুতিক বর্তনীতে ব্যবহৃত তার অথবা বৈদ্যুতিক বর্তনীতে যেসব যন্ত্রপাতি লাগানো থাকে, তাদেরকে কোনো কারণে সৃষ্টি বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য বৈদ্যুতিক বর্তনীতে যে সকল যন্ত্র বা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়, তাদেরকে প্রোটেকটিভ ডিভাইজ বলে। যেমন– ফিউজ, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত কারণে বৈদ্যুতিক বর্তনীতে প্রোটেকটিভ ডিভাইস ব্যবহৃত হয় :

i. শর্ট সার্কিট, ওভারলোড অথবা অন্য কোনো কারণে প্রবাহিত অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে সার্কিট এবং তদসংলগ্ন যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করতে।

ii. আর্থ ফল্ট বা আর্থ লিকেজ কারেন্ট থেকে সার্কিটকে রক্ষা করতে।

○ প্রশ্ন-৬২. নিউট্রাল লাইনে ফিউজ লাগানো হয় না কেন?

উত্তর : যদি নিউট্রাল লাইনে ফিউজ তার লাগানো হয় এবং কোনো কারণে পজিটিভ লাইনের ফিউজ তার না পুড়ে যদি নিউট্রাল তারে লাগানো ফিউজ পুড়ে যায় তবে সার্কিট অফ হয়ে যায়। ঐ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই মনে করে পজিটিভ তারে হাত দিলে ইলেকট্রিক শক পেতে পারে এ ধরনের বিপদ এড়ানোর জন্য নিউট্রাল তারে ফিউজ দেয়া হয় না।

○ প্রশ্ন-৬৩. ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের মধ্যে পার্থক্য লিখ।

উত্তর : নিচে সার্কিট ব্রেকার ও ফিউজের মধ্যে পার্থক্য বর্ণিত হলো :

সার্কিট ব্রেকার	ফিউজ
১. সার্কিট ব্রেকার সার্কিটের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক উভয় অবস্থায়ই কাজ করে।	১. ফিউজ শুধু অস্বাভাবিক অবস্থায় কাজ করে।
২. সার্কিট ব্রেকার একবার কাজ করার পর পুনরায় ব্যবহার করা যায়।	২. ফিউজ তার নতুন করে লাগিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যায়।
৩. এটি সুইচ হিসেবে কাজ করতে পারে।	৩. এটি সুইচ হিসেবে কাজ করতে পারে না।
৪. সার্কিট ব্রেকার নিম্ন, মাঝারি এবং উচ্চ ভোল্টেজ গ্রেডের হয়।	৪. ফিউজ শুধু নিম্ন ও মাঝারি ভোল্টেজ গ্রেডের হয়।
৫. সার্কিট ব্রেকার একই সাথে নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।	৫. ফিউজ শুধু রক্ষণযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

১.২

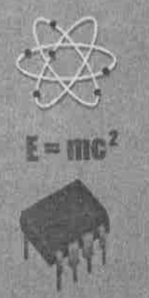

শ্রেণী সমবায়ে ক্ষমতার বণ্টন, শ্রেণী সমবায়ে বিভব উৎস, কার্শফের বিভব সূত্র; শ্রেণী সমবায়ে বিভব বিভাজন, শ্রেণী সমবায়ের উপাদানগুলোর বিনিময়, বিভব নিয়ন্ত্রণ এবং বিভব উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ, সমান্তরাল সমবায়, সমান্তরাল সমবায়ে ক্ষমতার বণ্টন, কার্শফের বিদ্যুৎ সূত্র; মুক্ত এবং বর্তক্ষেপ বর্তনী

Power Distribution in a series circuit, voltage sources in a seris, Kirchoff's voltoge law, voltage division in a seris circuit, Interchanging series elements, voltage regulation and the internal resistance of voltage sources, parallel resistors, parallel circuits, power distribution in a parallel circuits, Kirchoff's eurrent law, open and short circuits.

রোধের সমবায়, তুল্য রোধ, তড়িৎচালক শক্তি ও অভ্যন্তরীণ রোধ
Combination of Resistances, Equivalent resistance, e. m. f and internal resistance

○ প্রশ্ন-৬৪. রোধের সমবায় কি এবং উহা কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : একাধিক রোধকে একত্রে ব্যবহার করাকেই রোধের সমবায় বা সন্নিবেশ বলে।

প্রকারভেদ : রোধের সমবায় দুই ধরনের–১. শ্রেণী বা অনুক্রমিক সমবায় ও ২. সমান্তরাল সমবায়।

○ প্রশ্ন-৬৫. তুল্য রোধ কি?

উত্তর : তুল্য রোধ : রোধের কোনো সমবায়ের রোধগুলোর পরিবর্তে যে একটি মাত্র রোধ ব্যবহার করলে বর্তনীর প্রবাহ ও বিভব পার্থক্যের কোনো পরিবর্তন হয় না, তাকে ঐ সমবায়ের তুল্য রোধ বলে।

○ প্রশ্ন-৬৬. রোধের শ্রেণী সমবায়ের সংজ্ঞা দিন।

উত্তর : শ্রেণী সমবায় : কতগুলো রোধ যদি পরপর এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, প্রথম রোধের শেষ প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত, দ্বিতীয় রোধের শেষ প্রান্তের সাথে তৃতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত এবং এরূপ বাকিগুলোও সংযুক্ত থাকে এবং প্রতিটি রোধের ভিতর দিয়ে একই পরিমাণ তড়িৎ প্রবাহ চলে, তখন সেই সমবায়কে রোধের শ্রেণী সমবায় বলে।

○ প্রশ্ন-৬৭. তড়িৎচালক শক্তি বা e.m.f কি?

উত্তর : তড়িচ্চালক শক্তি : প্রতি একক আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর একবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে আবার ঐ বিন্দুতে আনতে যে কাজ সম্পন্ন হয়, অর্থাৎ কোষ যে তড়িৎ শক্তি সরবরাহ করে তাকে ঐ কোষের তড়িচ্চালক শক্তি বলে।

q আধানকে কোষ সমেত কোনো বর্তনীর একবিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ঘুরিয়ে পুনরায় ঐ বিন্দুতে আনতে যদি W কাজ সম্পন্ন হয়, তাহলে কোষের তড়িচ্চালক শক্তি, $E = \frac{W}{q}$

○ প্রশ্ন-৬৮. বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক সার্কিটের নাম লিখুন। সিরিজ প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিট কি?

উত্তর : ইলেকট্রিক সার্কিটকে মূলত ৩ (তিন) ভাগে ভাগ করা হয়। যথা–

১. সিরিজ সার্কিট (Series Circuit)
২. প্যারালাল সার্কিট (Parallel Circuit) ও
৩. সিরিজ প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিট (Series Parallel or Mixed Circuit)।

মিশ্র সার্কিট (Mixed Circuit) : দুই বা ততোধিক রোধ প্যারালালে যুক্ত করে একটি ইউনিট তৈরি করে অন্য প্যারালাল গ্রুপের সাথে সিরিজ সংযোগ করে মিশ্র সার্কিট তৈরি করা যায়। আবার দুই বা ততোধিক রোধ সিরিজে সংযোগ করে অপরাপর প্যারালাল গ্রুপের সাথে সিরিজে বা প্যারালালে সংযোগ করে মিশ্র সার্কিট তৈরি করা যায়। উপরোক্ত উভয় পদ্ধতিতে মিশ্র সার্কিট তৈরি করা যায়।

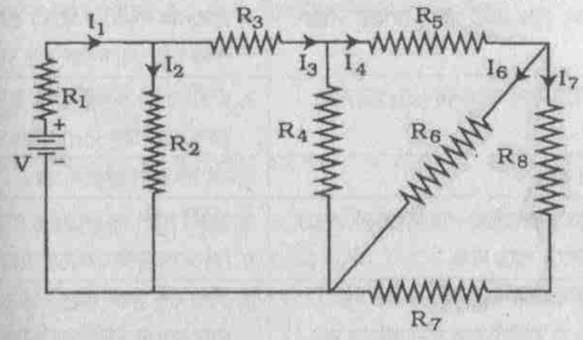

চিত্র : মিশ্র সার্কিট

○ প্রশ্ন-৬৯ সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

উত্তর : সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য : সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. সিরিজ সার্কিটে প্রযুক্ত ভোল্টেজ (Supply voltage) সার্কিটের প্রতিটি লোডের বা প্যারামিটারের ভোল্টেজের (ড্রপ ভোল্টেজের) যোগফলের সমান।
অর্থাৎ $V = V_1 + V_2 + V_3 + ...$
২. সিরিজ সার্কিটের প্রতিটি লোড বা রোধ বা প্যারামিটারের মধ্য দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয়।
অর্থাৎ $I = I_1 = I_2 = I_3 = ...$
৩. সিরিজ সার্কিটের সমতুল্য রোধ বা মোট রোধ সার্কিটের সবগুলো রেজিস্ট্যান্সের যোগফলের সমান।
অর্থাৎ $R_S = R_1 + R_2 + R_3$
৪. সিরিজ সার্কিটের সাথে সিরিজে অতিরিক্ত রোধ সংযোগ করলে সার্কিটের সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স বৃদ্ধি পায়, এবং সার্কিটের কারেন্ট ও পাওয়ার কমে যায়।

প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. প্যারালাল সার্কিটের প্রতিটি লোড বা রোধের ভোল্টেজ সমান এবং তা সরবরাহ ভোল্টেজের সমান। অর্থাৎ
$V = V_1 = V_2 = V_3 = ...$
২. প্যারালাল সার্কিটের সবগুলো লোড বা কারেন্টের যোগফল সার্কিটের মোট কারেন্টের সমান। অর্থাৎ
$I = I_2 + I_2 + I_3 + ...$
৩. প্যারালাল সার্কিটের প্রতিটি শাখা রোধের বিপরীত মানের যোগফল সার্কিটের মোট রোধ বা সমতুল্য রোধের বিপরীত মানের সমান। অর্থাৎ
$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + ...$
৪. প্যারালাল সার্কিটের সাথে প্যারালালে অতিরিক্ত রোধ সংযোগ করলে সার্কিটের মোট রোধ কমে যায় ফলে কারেন্টের মান বৃদ্ধি পায়।

○ প্রশ্ন-৭০. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করুন।

উত্তর : সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধা :

সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট
১. সিরিজ সার্কিটের সকল লোড একটি মাত্র সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।	১. প্যারালাল সার্কিটের প্রতিটি লোডকে পৃথক পৃথক সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
২. একটি লোড বিচ্ছিন্ন হলে সকল লোড বন্ধ (off) হয়ে যায়।	২. একটি লোড বিচ্ছিন্ন হলেও অন্যান্য লোডগুলো চালু (on) থাকে।
৩. কারেন্ট কম প্রবাহিত হয়।	৩. কারেন্ট বেশি প্রবাহিত হয়।
৪. সিরিজে বাতিগুলো কম ভোল্টেজ পায় বিধায় বাতিগুলো পূর্ণ ক্ষমতানুসারে চলতে পারে না।	৪. প্রতিটি বাতি পূর্ণ ভোল্টেজ পায় বিধায় পূর্ণ ক্ষমতানুসারে চলতে পারে।
৫. লোড যত বৃদ্ধি পায় কারেন্ট তত কম প্রবাহিত হয় বিধায় সেল (Cell) বা ব্যাটারী দ্রুত ডিসচার্জ হয় না।	৫. লোড বৃদ্ধি পেলে কারেন্ট বৃদ্ধি পায় বিধায় সেল বা ব্যাটারী দ্রুত ডিসচার্জ হয়ে যায়।
৬. অতিরিক্ত সাপ্লাই ভোল্টেজে সিরিজ সার্কিটের তেমন ক্ষতি হয় না।	৬. অতিরিক্ত সাপ্লাই ভোল্টেজে লোডগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
৭. এর ব্যবহার ক্ষেত্র সীমিত।	৭. প্রায় সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার দেখা যায়।

কারেন্ট সোর্স, ভোল্টেজ সোর্স, কার্শফের কারেন্ট ও ভোল্টেজ সূত্র, কার্শফের সূত্রের প্রয়োগ
Current source, voltage source, Kirchoff's current and voltage law, applitcations of Kirchoff's law

○ প্রশ্ন-৭১. বৈদ্যুতিক সার্কিট কী? বিভিন্ন সার্কিট প্যারামিটার-এর বর্ণনা দিন।

উত্তর : বৈদ্যুতিক সার্কিট : বৈদ্যুতিক সার্কিট এমন একটি বদ্ধপথ, যা বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস, রেজিস্ট্যান্স এবং অন্যান্য সার্কিট উপাদান দ্বারা গঠিত এবং যার মধ্য দিয়ে সহজেই বৈদ্যুতিক কারেন্ট প্রবাহিত হয় বা হতে পারে।

বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানকে (Elements) এর প্যারামিটারস বলে। যেমন— রেজিস্ট্যান্স, ইনডাকট্যান্স, ক্যাপাসিট্যান্স, ইম্পিড্যান্স।

বিভিন্ন সার্কিট প্যারামিটার-এর বর্ণনা :

ক. **রেজিস্ট্যান্স :** পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহী পদার্থের যে বৈশিষ্ট্য বা ধর্মের কারণে তা বাধাগ্রস্ত হয়, উক্ত বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকেই রেজিস্ট্যান্স বা রোধ বলে। এর প্রতীক R বা r.

খ. **ইনডাকট্যান্স :** এটি কয়েলের এমন একটি বিশেষ ধর্ম, যা কয়েলে প্রবাহিত কারেন্ট বা কয়েলের চারদিকের ফ্লাক্সের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে বাধা দান করে। এর প্রতীক L.

গ. **ক্যাপাসিট্যান্স :** ক্যাপাসিটরের প্লেটগুলোর মধ্যে যখন পটেনশিয়াল পার্থক্য বিরাজমান থাকে, তখন তাতে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে রাখা ক্যাপাসিটরের একটি বিশেষ ধর্ম। এ বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকেই ক্যাপাসিট্যান্স বলে। এর প্রতীক C.-

ঘ. **ইম্পিড্যান্স :** এ. সি. সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহে মোট বাধাকে ইম্পিড্যান্স বলে। এর প্রতীক Z.

○ প্রশ্ন-৭২. কারেন্ট সোর্স কি? বাস্তব কারেন্ট সোর্স ও আদর্শ কারেন্ট সোর্স বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : কারেন্ট সোর্স (Current source) : কারেন্ট উৎস বা সোর্স এমন একটি উৎস, যা লোড রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তন যাই হোক না কেন, তার প্রান্তদ্বয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট বিতরণ করে। কোনো কোনো ইলেকট্রনিক সার্কিটের নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট বিতরণের এ বৈশিষ্ট্য আছে।

i. **বাস্তব কারেন্ট সোর্স :** চিত্রে Rs সোর্স-রেজিস্ট্যান্স বিশিষ্ট একটি কারেন্ট সোর্স দেখানো হয়েছে, যা একটি লোড রেজিস্ট্যান্স R_L-এ কারেন্ট সরবরাহ করছে।

লোড কারেন্ট, $I_L = I_o \frac{R_S}{R_S + R_L}$

যদি R_L-এর তুলনায় Rs অত্যন্ত ক্ষুদ্রতর হয়, তবে

$I_L = Lo$

যখন লোড রেজিস্ট্যান্সের (R_L) তুলনায় সোর্স-রেজিস্ট্যান্স (Rs) অত্যন্ত ক্ষুদ্রতর হয়, তখন লোডে সরবরাহকৃত কারেন্ট সোর্স (I_L) সোর্স-কারেন্টের (I) প্রায় সমান হয়।

ii. **আদর্শ কারেন্ট সোর্স :** আবার যখন সোর্স-রেজিস্ট্যান্স (Rs) অসীম হয়, তখন কারেন্ট-সোর্সকে একটি আদর্শ কারেন্ট-সোর্স বলা হয়।

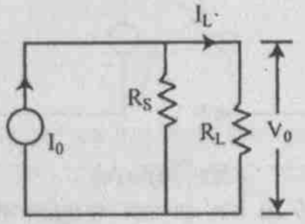

○ প্রশ্ন-৭৩. ভোল্টেজ সোর্স কি? বাস্তব ও আদর্শ ভোল্টেজ সোর্স বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : ভোল্টেজ সোর্স এমন একটি উৎস বা সোর্স, যা লোড রেজিস্ট্যান্সের পরিবর্তনের উপর নির্ভর না করেই তার প্রান্তদ্বয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভোল্টেজ পাওয়া যায়। একটি ব্যাটারিকে স্থির (constant) ভোল্টেজের উৎস (বা সোর্স) হিসেবে ধরা হয়।

i. **বাস্তব ভোল্টেজ সোর্স :** চিত্রে দেখানো হয়েছে, ওপেন -সার্কিট ভোল্টেজ E বিশিষ্ট একটি লোড রেজিস্ট্যান্সে কারেন্ট সরবরাহ করছে, যদি ব্যাটারি একটি লোড রেজিস্ট্যান্সে R_L, সোর্স-রেজিস্ট্যান্স Rs এর তুলনায় অত্যন্ত বেশি হয়, তবে $V_o = E\frac{R_L}{R_L + R_s}$

অর্থাৎ আউটপুট ভোল্টেজ (Vo) সোর্স-ভোল্টেজের (E) প্রায় সমান হয়।

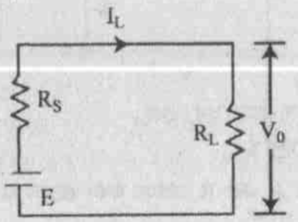

ii. **আদর্শ ভোল্টেজ সোর্স :** একটি আদর্শ ভোল্টেজ-সোর্স হল সেটাই, যার সোর্স-রেজিস্ট্যান্স শূন্য।

○ প্রশ্ন-৭৪. কয়েকটি কারেন্ট সোর্স ও ভোল্টেজ সোর্সের উদাহরণ দিন।

উত্তর : কারেন্ট সোর্স এবং ভোল্টেজ সোর্সের উদাহরণ :

কারেন্ট সোর্স : কোনো কোনো ইলেকট্রনিক সার্কিট নির্দিষ্ট পরিমাণ কারেন্ট সরবরাহ করতে পারে।

ভোল্টেজ সোর্স : একটি ব্যাটারিকে স্থির ভোল্টেজের উৎস বা সোর্স হিসেবে ধরা হয়।

○ প্রশ্ন-৭৫. ভোল্টেজ সোর্সকে কিভাবে কারেন্ট সোর্সে রূপান্তর করা যায়?

উত্তর : একটি সিরিজ রেজিস্ট্যান্সসহ প্রদত্ত একটি ভোল্টেজ সোর্সকে একটি প্যারালাল রেজিস্ট্যান্সসহ একটি সমতুল্য কারেন্ট সোর্সে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। ধরা যাক, ভোল্টেজ সোর্সকে একটি সমতুল্য কারেন্ট সোর্সে রূপান্তরিত করতে চাই, তাহলে প্রথমেই সোর্স কর্তৃক সবরাহকৃত কারেন্টের মান বের করতে হবে। এখন A এবং B প্রান্তদ্বয় আড়াআড়ি শর্ট করতে হবে, যা (খ) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে, তখন এ কারেন্ট হবে– $I = \frac{V}{R}$

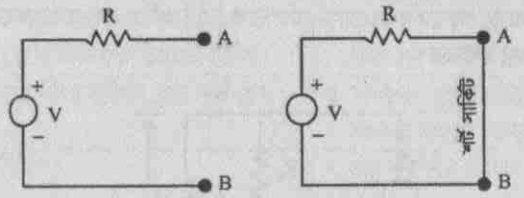

চিত্র : (ক) ও (খ)

একটি কারেন্ট সোর্স, যা এ কারেন্ট (I) এবং এর সাথে প্যারালালে সংযুক্ত একই রেজিস্ট্যান্স সহযোগে সরবরাহ করছে, সমতুল্য সোর্স হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করে।

○ প্রশ্ন-৭৬. কারেন্ট সোর্সকে কিভাবে ভোল্টেজ সোর্সে রূপান্তর করা যায়?

উত্তর : কারেন্ট I এবং একটি প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স R-এর একটি কারেন্ট সোর্সকে ভোল্টেজ V = IR এবং এর সাথে সিরিজে R-রেজিস্ট্যান্সের একটি ভোল্টেজ সোর্সে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একটি ভোল্টেজ সোর্স-সিরিজ রেজিস্ট্যান্স সমবায় একটি কারেন্ট সোর্স-প্যারালেল রেজিস্ট্যান্স সমবায়ের সমতুল্য হতে পারে, যদি–

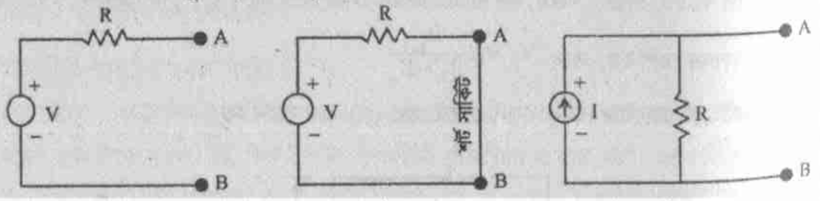

i. স্ব-স্ব ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজগুলো সমান হয়, এবং
ii. স্ব-স্ব শর্ট সার্কিট কারেন্টগুলো সমান হয়।

উদাহরণস্বরূপ (ক) চিত্র ধরা যাক। A এবং B প্রান্তদ্বয় যখন ওপেন বা খোলা থাকে, তখন ভোল্টেজ হয় V, কারণ R-এর আড়াআড়িতে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ হয় না। A এবং B আড়াআড়ি শর্ট-সার্কিট কারেন্ট– $I = \frac{V}{R}$

এখন (গ) নং চিত্র ধরা যাক। A ও B এর আড়াআড়িতে ওপেন-সার্কিট ভোল্টেজ = R এর আড়াআড়িতে ভোল্টেজ ড্রপ = IR = V যদি A ও B প্রান্তদ্বয়কে শর্ট করা হয় তবে I কারেন্টের সবটুকুই সেটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, কারণ R কে সম্পূর্ণ রূপে শর্ট করা হয়েছে। এভাবেই কারেন্ট সোর্স ভোল্টেজ সোর্সে পরিণত হয়।

○ প্রশ্ন-৭৭. কারশফের সূত্রের ব্যাখ্যা দিন।

উত্তর : কারশফের সূত্রের ব্যাখ্যা (Explanation of Kirchoff's law) :

ক. কারেন্ট সূত্র বা প্রথম সূত্র : কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কে এক বিন্দুতে মিলিত কারেন্টসমূহের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হয়। অথবা, কোনো বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কের একটি সংযোগস্থলে আগত কারেন্টসমূহের বীজগাণিতিক যোগফল, ঐ সংযোগস্থল হতে নির্গত কারেন্টসমূহের বীজগণিতের যোগফলের সমান।

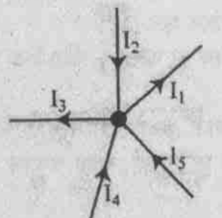

চিত্রে পাঁচটি পরিবাহী তারকে একটি বিন্দুতে [O] সংযোগ করা হয়েছে। ধরা যাক, I_1, I_2, I_3, I_4 ও I_5 কারেন্ট উক্ত তার দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। I_1 ও I_3 কারেন্টসমূহ O সংযোগস্থল হতে নির্গত হচ্ছে এবং I_2, I_4 ও I_5 কারেন্টসমূহ O সংযোগস্থলে আগমন করছে।

$\therefore\ I_1 + I_3 = I_2 + I_4 + I_5$

অথবা, $I_1 - I_2 + I_3 - I_4 - I_5 = 0$

খ. ভোল্টেজ সূত্র বা দ্বিতীয় সূত্র : কোনো বদ্ধ (Closed) বৈদ্যুতিক সার্কিটে সকল ই.এম.এফ (EMF) এবং সকল ভোল্টেজ-ড্রপের বীজগাণিতিক যোগফল শূন্য হয়।

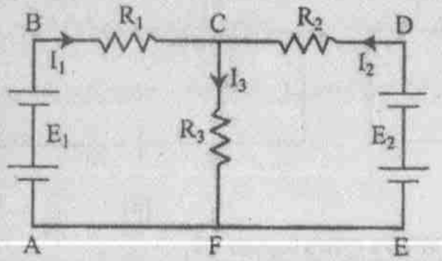

উপরোক্ত বদ্ধ সার্কিটে তিনটি লুপ আছে, যথা– ABCFA, EDCFE এবং ABCDEFA.

কারশফের দ্বিতীয় সূত্র বা ভোল্টেজ সূত্র প্রয়োগ করে, আমরা তিনটি বদ্ধ লুপে তিনটি সমীকরণ পেতে পারি–

i. ABCFA লুপ-এ

$$E_1 - I_1R_1 - R_3R_3 = 0$$

ii. EDCFE লুপ-এ

$$E_2 - I_2R_2 - I_3R_3 = 0$$

iii. ABCDEFA লুপ-এ

$$E_1 - I_1R_1 + I_2R_2 - E_2 = 0$$

○ প্রশ্ন-৭৮. কি কি উপায় অবলম্বন করলে বর্তনী সমস্যা সহজভাবে সমাধান করা যায়?

উত্তর : সমাধান কৌশল : সমস্যা সমাধানে যখন কারশফের সূত্র ব্যবহৃত হয়, তখন ধারাবাহিক কৌশল অবলম্বন অযথা শ্রম ও ভ্রান্তি লাঘব করতে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে নিম্নলিখিত কার্যপ্রণালী যথেষ্ট সাহায্য করবে :

i. সার্কিটের একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র আঁকতে হবে।
ii. সকল সংযোগস্থল (Junction-point) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করতে হবে, যাতে কারেন্ট পরিক্রমার বিভিন্ন পথ শনাক্ত করা যায়।
iii. ই.এম.এফ-এর উৎসগুলোর জ্ঞাত ভোল্টেজ এবং মেরু (Polarity) যথার্থ চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করতে হবে।
iv. সকল রেজিস্ট্যান্সের মান যথাস্থানে বসাতে হবে।
v. কারেন্ট বিতরণের সবচেয়ে সম্ভাব্য দিক বা অভিমুখ, তীর-চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করতে হবে এবং সকল জ্ঞাত মান বসাতে হবে।
vi. উপযুক্ত অক্ষর দ্বারা সার্কিটের অজ্ঞাত ধ্রুবকগুলো শনাক্ত করতে হবে (E_2, R_5, I_1 ইত্যাদি)। সংযোগস্থলে কারশফের কারেন্ট সূত্র প্রয়োগের বেলায় অজ্ঞাত ধ্রুবকের সংখ্যা যত কম রাখা যায়, ততই ভালো।
vii. কারশফের ভোল্টেজ সূত্র প্রয়োগকালে, কোনো একটি সম্পূর্ণ পথ অনুসরণ করে ভোল্টেজের সমীকরণ লিখতে হবে। এভাবে যতগুলো অজানা ধ্রুবক আছে, এদের পথ চিহ্নিত করে সমীকরণ লিখতে হবে।
viii. ধারাবাহিকভাবে সমীকরণগুলোর সমাধান করতে হবে।

○ প্রশ্ন-৭৯. Series বর্তনীর ক্ষেত্রে কারশফের সূত্রের প্রয়োগ দেখান।

উত্তর : একটি সরল বর্তনী বিবেচনা করা যাক। এতে একটি রোধ R এর সাথে E তড়িচ্চালক শক্তির একটি উৎস যুক্ত রয়েছে চিত্র (ক)। এই বর্তনীর যে কোনো বিন্দুতে যে কোনো সময়ে তড়িৎ বিভবের একটিমাত্র মান পাওয়া যাবে।

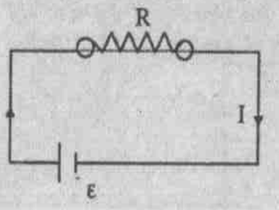

(ক)

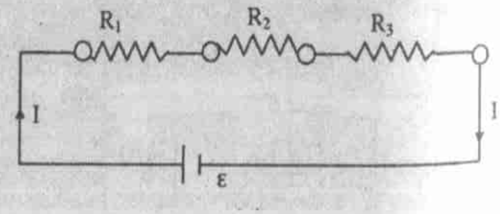

(খ)

বর্তনীর প্রবাহ মাত্রা I হলে, কার্শফের লুপতত্ত্ব অনুসারে পাই,

$$\varepsilon = IR$$

আবার, 'খ' চিত্রে R_1, R_2 ও R_3 রোধকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করে E তড়িচ্চালক শক্তির উৎসের সাথে সংযুক্ত দেখানো হয়েছে। এই বর্তনীকে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে পরিভ্রমণ করে লুপতত্ত্বানুসারে পাই,

$$\varepsilon = IR_1 + IR_2 + IR_3$$
$$= I(R_1 + R_2 + R_3)$$

দেখা যায় $(R_1 + R_2 + R_3)$ একটি একক রোধের ন্যায় আচরণ করছে যার মধ্য দিয়ে I মাত্রার তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। এই রোধের মান R হলে,

$$\varepsilon = IR$$

যখন $R = R_1 + R_2 + R_3$ এবং R-কে শ্রেণী সমবায়ের সমতুল্য রোধ বলে। অতএব দেখা যায়, কার্শফের সূত্র থেকে রোধের শ্রেণী সমন্বয়ের সূত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-৮০. সমান্তরাল বর্তনীর ক্ষেত্রে কারশফের সূত্রের প্রয়োগ দেখান।

উত্তর : চিত্রে প্রদর্শিত বর্তনী বিবেচনা করা যাক। এতে R_1, R_2 ও R_3 রোধক সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হয়েছে। ধরা যাক, বর্তনীর a ও b বিন্দুর বিভবান্তর V। তাহলে, R_1, R_2 ও R_3 রোধের প্রবাহমাত্রা হবে যথাক্রমে,

$$I_1 = \frac{V}{R_1}, I_2 = \frac{V}{R_2} \text{ এবং } I_3 = \frac{V}{R_3}$$

এখন a বিন্দু হতে পাই $I = I_1 + I_2 + I_3$

$$= \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3}$$
$$= V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)$$

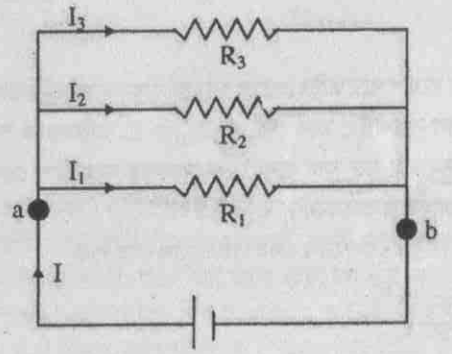

এখন যদি রোধ সমবায়ের পরিবর্তে কোনো একক রোধ R ব্যবহার করা হয় যার মধ্য দিয়ে একই মাত্রায় তড়িৎ I প্রবাহিত হবে, তবে $I = \frac{V}{R}$

সুতরাং $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

এক্ষেত্রে R-কে রোধের সমান্তরাল সমবায়ের সমতুল্য রোধ বলে। অতএব, কার্শফের সূত্র থেকে রোধের সমান্তরাল সমন্বয়ের সূত্র পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-৮১. কার্শফের সূত্র প্রয়োগ করে তড়িৎ কোষের শ্রেণী সমবায়ের তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয় করুন।

উত্তর : তড়িৎ কোষের শ্রেণী সমবায় : নিচের চিত্রে তিনটি তড়িৎ কোষ শ্রেণীতে যুক্ত রয়েছে। এদের তড়িচ্চালক শক্তি যথাক্রমে E_1, E_2 ও ,E_3 এবং অভ্যন্তরীণ রোধ যথাক্রমে r_1, r_2 ও r_3। কোষগুলোর সাথে একটি রোধ R শ্রেণীতে যুক্ত করায় এর মধ্য দিয়ে I মাত্রার তড়িৎ প্রবাহিত হয়। বর্তনীতে কার্শফের দ্বিতীয়

সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$E_1 + E_2 + E_3 = Ir_1 + Ir_2 + Ir_3 + IR$$
$$= I(r_1 + r_2 + r_3 + R)$$

$$\therefore \; I = \frac{E_1 + E_2 + E_3}{r_1 + r_2 + r_3 + R}$$

যদি n সংখ্যক কোষ শ্রেণীতে যুক্ত থাকে তবে,

$$I = \frac{E_1 + E_2 + \dots\dots + E_n}{R + r_1 + r_2 + \dots\dots r_n}$$

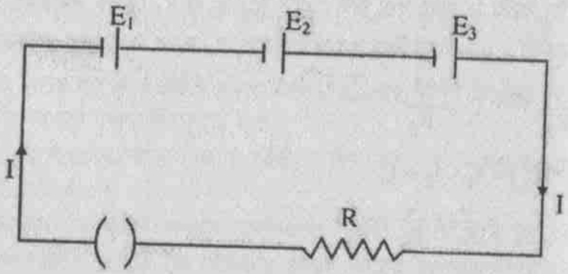

প্রতিটি কোষের তড়িচ্চালক শক্তি E এবং অভ্যন্তরীণ রোধ r হলে,

$$I = \frac{nE}{R + nr}$$

○ প্রশ্ন-৮২. কার্শফের সূত্র প্রয়োগ করে তড়িৎ কোষের সমান্তরাল সমবায়ের তড়িৎ প্রবাহ নির্ণয় করুন।

উত্তর : কোষের সমান্তরাল সমবায় : মনে করি, E_1, E_2, ও E_3 তড়িচ্চালক শক্তির তিনটি কোষকে R রোধের সাথে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করা হলো । কোষগুলোর অভ্যন্তরীণ রোধ যথাক্রমে r_1, r_2 ও r_3 এবং কোষ থেকে নির্গত প্রবাহমাত্রা যথাক্রমে I_1, I_2 ও I_3।

এখন বর্তনীর P অথবা Q বিন্দুতে কার্শফের প্রথম সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$I = I_1 + I_2 + I_3$ ....(i)

পুনঃ কার্শফের দ্বিতীয় সূত্রানুসারে,

PE_1QRP বদ্ধ বর্তনী হতে, $I_1r_1 + IR = E_1$

PE_2QRP বদ্ধ বর্তনী হতে, $I_2r_2 + IR = E_2$

PE_3QRP বদ্ধ বর্তনী হতে, $I_3r_3 + IR = E_3$

সমীকরণগুলোর যথাক্রমে r_1, r_2 ও r_3 দিয়ে ভাগ করে এবং যোগ করে পাই,

$$I_1 + I_2 + I_3 + I\left(\frac{R}{r_1} + \frac{R}{r_2} + \frac{R}{r_3}\right) = \frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \frac{E_3}{r_3}$$

(i) নং সমীকরণ ব্যবহার করে পাই,

$$I\left(1 + \frac{R}{r_1} + \frac{R}{r_2} + \frac{R}{r_3}\right) = \frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \frac{E_3}{r_3}$$

$$\therefore \; I = \frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \frac{E_3}{r_3}}{1 + \frac{R}{r_1} + \frac{R}{r_2} + \frac{R}{r_3}}$$

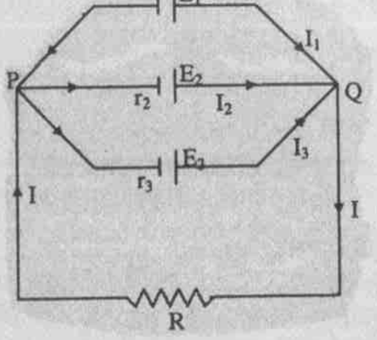

যদি n সংখ্যক কোষ সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত থাকে তবে,

$$I = \frac{\frac{E_1}{r_1} + \frac{E_2}{r_2} + \dots\dots \frac{E_n}{r_n}}{1 + R\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} + \dots\dots \frac{1}{r_n}\right)}$$

প্রতিটি কোষের তড়িচ্চালক শক্তি E এবং অভ্যন্তরীণ রোধ r হলে,

$$I = \frac{nE/r}{1 + nR/r} = \frac{nE}{nR + r}$$

○ প্রশ্ন-৮৩ কার্শফের সূত্র প্রয়োগ করে হুইটস্টোন ব্রিজ নীতি প্রতিষ্ঠা করুন।

উত্তর : P, Q, R, S রোধবিশিষ্ট চারটি পরিবাহীকে চিত্র অনুযায়ী একটি গ্যালভানোমিটার, একটি কোষ ও একটি চাবির সঙ্গে সংযোগ করলে যে বর্তনী পাওয়া যায় তাকে হুইটস্টোন ব্রিজ বলে।

ব্রিজ নীতি প্রতিপালন : P ও Q-এর সংযোগ বিন্দু B এবং R ও S-এর সংযোগ বিন্দু D-এর মাঝে গ্যালভানোমিটার যুক্ত থাকে। P ও R-এর সংযোগ বিন্দু A বিন্দুতে পৌঁছে বিভিন্ন রোধ ও গ্যালভানোমিটার দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় C বিন্দুতে মিলিত হবে এবং গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপ হবে। তবে P, Q, R, S রোধের মান পরিবর্তন করে এমনভাবে সমন্বয় করা যায় যাতে গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ না হয়। অর্থাৎ গ্যালভানোমিটার দিয়ে কোনো তড়িৎ প্রবাহিত হবে না। এ অবস্থাকে সাম্যাবস্থা বলে। এ অবস্থায় ig = 0 হয়।

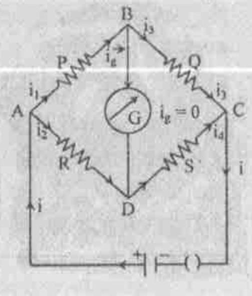

মনে করি, ব্যাটারির তড়িচ্চালক বল E এবং গ্যালভানোমিটারের রোধ G।

B বিন্দুতে কার্শফের প্রথম সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$i_1 = i_3 + ig$

বা, $i_3 = i_1$ .... (i) ; কারণ, ig= 0

আবার D বিন্দুতে পাই,

$i_2 + i_g = i_4$

বা, $i_2 = i_4$ .... (ii); কারণ ig = 0

কার্শফের দ্বিতীয় সূত্র প্রয়োগ করে বর্তনীর ABDA অংশের জন্য পাই,

$i_1P + igG - i_2R = 0$

বা, $i_1P = i_2R$ .... (iii); কারণ ig = 0

আবার BCDB অংশের জন্য পাই,

$i_3Q - i_4S - igG = 0$

বা, $i_3Q = i_4S$ .... (iv); কারণ, ig = 0

সমীকরণ (i) ও (ii) হতে,

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{i_3}{i_4}$$

বা, $\frac{i_1}{i_3} = \frac{i_2}{i_4}$ .... (v)

সমীকরণ (iii) ও (iv) হতে,

$$\frac{i_1P}{i_3Q} = \frac{i_2R}{i_4S}$$

বা, $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ .... (vi)

(vi) নং সমীকরণটিকে হুইটস্টোন ব্রিজ নীতির সমীকরণ বা হুইটস্টোন ব্রিজের সাম্যবস্থার শর্ত বলে।

সমপ্রবাহ ও পরিবর্তী প্রবাহ উৎপাদন, তাপীয়, হাইড্রোলিক ও নিউক্লিয় শক্তির উৎপাদক, বৈদ্যুতিক মটর এবং এর প্রয়োগ, বিবর্ধক, পরিবর্তী প্রবাহ প্রেরণ ও বণ্টন, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বিভব স্থিতিকারক, আই. পি. এস এবং ইউ. পি.এস

Generation of AC and DC voltage, thermal, hydraulic and nuclear power generators, Electric motors and their applications, Transformers, AC transmission and distribution. Electrical instruments, voltage stabilizers, IPS and UPS

বিদ্যুৎ উৎপাদন, বৈদ্যুতিক মোটর ও এর ব্যবহার, ট্রান্সফর্মার
Generation of current, Electric motors and their applications, Transformers

প্রশ্ন-৮৪. সম প্রবাহ (DC) এবং পরিবর্তী প্রবাহ (AC) কাকে বলে? এদের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : সম প্রবাহ : যখন কোনো বর্তনীর মধ্য দিয়ে একদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাকে সম প্রবাহ বা একমুখী (DC) প্রবাহ বলে। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের (বিদ্যুৎ উৎসের) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর প্রকৃতি পাল্টায় না। কিন্তু পরিবর্তী প্রবাহের (AC) ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর প্রকৃতি অবিরত পাল্টাতে থাকে। একমুখী প্রবাহের সময় কোনো তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত চার্জের প্রকৃতি ও দিক বদলায় না। শিল্প-কারখানায় মোটর চালাতে ও পরিবহন শিল্পে একমুখী প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ রাসায়নিক শিল্পে ও ধাতুকে ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে একমুখী প্রবাহ ব্যবহৃত হয়।

সাধারণত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে তা পরিবর্তী বিদ্যুৎ। এ বিদ্যুৎকে প্রয়োজন অনুসারে একমুখী কারকের (rectifier) সাহায্যে একমুখী প্রবাহে পরিণত করা হয়।

পরিবর্তী প্রবাহ : যে তড়িৎ প্রবাহের মান সবসময়ে পরিবর্তনশীল এবং তড়িৎ প্রবাহের দিকও কিছুক্ষণ পর পর বদলায় তাকে পরিবর্তী প্রবাহ বলে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একমুখী প্রবাহের চেয়ে পরিবর্তী প্রবাহের প্রচলন অনেক বেশি। পরিবর্তী প্রবাহী তড়িৎ উৎপন্ন হয় অল্টারনেটরে কিন্তু একমুখী প্রবাহী তড়িৎ উৎপন্ন হয় ডায়নামোতে। ডায়নামোর মধ্যস্থিত আর্মেচার ঘুরালে যে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় কম্যুটেটরের সাহায্যে তাকে একমুখী প্রবাহে পরিণত করা হয়। একমুখী তড়িতের অভিমুখ একই দিকে হওয়ার ফলে ডায়নামোর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তে কোনো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তী প্রবাহের মান একটি আবর্তনে তরঙ্গাকৃতিতে এক অভিমুখে শূন্য থেকে সর্বোচ্চ এবং সর্বোচ্চ থেকে শূন্য হয়। সেজন্য অল্টারনেটরের কোনো বিশেষ প্রান্তকে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বলা যায় না।

একমুখী তড়িৎ প্রবাহের চেয়ে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহার উপযোগিতা অনেক। পরিবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ছাড়াও ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স-এর দ্বারা প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় কম হয়। পরিবর্তী তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রে ফেজের সংখ্যা বাড়িয়ে সমআয়তনের সমপ্রবাহী তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের তুলনায় অধিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। এছাড়া পরিবর্তী তড়িৎব্যবস্থায় ভোল্টেজকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজনমতো বাড়ানো এবং স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজনমতো কমানো যায়। এজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বণ্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তী প্রবাহের প্রচলন সর্বত্র।

প্রশ্ন-৮৫. পরিবর্তী প্রবাহের (AC) উৎপত্তি রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ধরি N এবং S একটি চুম্বকের দুটি মেরু যা H প্রাবল্যের একটি সুষম চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করেছে। মনে করি AB একটি বদ্ধ কুণ্ডলী। এটি চৌম্বক ক্ষেত্রের অভিলম্ব তলে অবস্থিত। কুণ্ডলীটি তার নিজস্ব অনুভূমিক অক্ষে ω কৌণিক বেগে ঘুরছে।

মনে করি কুণ্ডলীটির পাক সংখ্যা n এবং তার ক্ষেত্রফল A। অতএব কুণ্ডলীর তল চৌম্বক বলরেখার অভিলম্ব হলে তার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্স,

$\varphi = n\mu AH$ ... ... (i)

এখন ধরি কুণ্ডলীটি t সময়ে θ কোণে ঘুরে $A_1 B_1$ অবস্থানে গিয়েছে। এমতাবস্থায় চৌম্বকক্ষেত্রের অভিলম্ব উপাংশ, $= H\cos\theta$

∴ অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্স বা বলরেখার সংখ্যা

$\varphi_N = n\mu AH\cos\theta$

$= n\mu AH\cos\omega t$ ... ... (ii) $[\because \theta = \omega t]$

যেহেতু কুণ্ডলীটির ঘূর্ণনের জন্য অতিক্রান্ত চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটবে, সেহেতু ফ্যারাডের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় আবেশের ফলে কুণ্ডলীতে বিদ্যুচ্চালক শক্তি আবিষ্ট হবে এবং আবিষ্ট বিদ্যুচ্চালক শক্তির মান,

$E = -\frac{d\varphi_N}{dt}$

$= -\frac{d}{dt}(n\mu AH\cos\omega t)$

$= n\mu AH\omega\sin\omega t$

$= E_0\sin\omega t$ ... ... (iii)

এখানে, $E_0 = n\mu AH\omega$ = সর্বোচ্চ বিদ্যুচ্চালক বল বা শক্তি

সমীকরণ (iii)-কে সাইনসাইডাল (sinusoidal) সমীকরণ বলা হয়।

(ক) এখন কুণ্ডলীটির পর্যায়কাল T হলে $\omega = \frac{2\pi}{T}$ হবে।

(খ) সমীকরণ (iii) থেকে দেখা যায় E-এর মান ωt-এর ওপর নির্ভর করে।

(গ) যখন $t = 0, \frac{T}{2}, T, \frac{3}{2}T, 2T$ ইত্যাদি হয়, তখন বিদ্যুচ্চালক শক্তি E শূন্য হয়।

(ঘ) $t = \frac{T}{4}, \frac{5}{4}T$ ইত্যাদি হলে $E = +E_0$ এবং $t = \frac{3}{4}T, \frac{7}{4}T$ ইত্যাদি হলে $E = -E_0$ হবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কুণ্ডলীর সাথে বিদ্যুচ্চালক শক্তি E-এর মান শূন্য হতে বৃদ্ধি পেয়ে $+E_0$ এবং এর পর ক্রমশ হ্রাস পেয়ে পুনরায় শূন্য মানে পৌঁছায়। অতঃপর বিপরীত দিকে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে $-E_0$ হয় এবং আবার হ্রাস পেয়ে শূন্য মানে আসে। এমনিভাবে বিদ্যুচ্চালক শক্তির পরিবর্তনের একটি চক্র (cycle) T সময়ে সম্পন্ন হয়।

প্রবাহমাত্রা : মনে করি কুণ্ডলীটির রোধ R। অতএব যে কোনো মুহূর্ত t-তে প্রবাহমাত্রা,

$i = \frac{E}{R} = \frac{E_0\sin\omega t}{R} = i_0\sin\omega t$ ... ... (iv)

এখানে, $i_0 = \frac{E_0}{R}$ = সর্বোচ্চ প্রবাহমাত্রা। বিদ্যুচ্চালক শক্তির পরিবর্তনের ফলে প্রবাহমাত্রাও পরিবর্তিত হয়। এজন্য একে পরিবর্তী প্রবাহ (Alternating current) সংক্ষেপে AC বলা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৬. পরিবর্তী প্রবাহের (AC) ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় রাশিগুলো কি?

উত্তর : পরিবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রয়োজনীয় রাশি নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. **বিস্তার (Amplitude) :** যে কোনো অভিমুখে বিদ্যুচ্চালক শক্তি বা প্রবাহের সর্বোচ্চ মানকে তার বিস্তার বা শীর্ষমান বলে।

খ. **পরিবর্তন চক্র (Cycle of variation) :** পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তি বা প্রবাহের মান শূন্যমান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে শীর্ষমান, তৎপর হ্রাস পেয়ে শূন্যমানে এসে বিপরীত অভিমুখে পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে ঐ শীর্ষমানে পৌঁছে আবার হ্রাস পেয়ে শূন্যমানে উপনীত হওয়াকে বিদ্যুচ্চালক শক্তি বা প্রবাহের পরিবর্তন চক্র বলে।

গ. **দোলনকাল বা পর্যায়কাল (Time period) :** যে সময়ে পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তি বা প্রবাহের একটি পরিবর্তন চক্র সম্পন্ন হয় তাকে পর্যায়কাল বলে। একে T দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

ঘ. **কম্পাঙ্ক বা কম্পনি (Frequency) :** পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তি বা প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে যত সংখ্যক পরিবর্তন চক্র সম্পন্ন করে তাকে উক্ত বিদ্যুচ্চালক শক্তি বা প্রবাহের কম্পাঙ্ক বলে। একে f বা n দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

○ প্রশ্ন-৮৭. সম প্রবাহ (DC) এবং পরিবর্তী প্রবাহের (AC) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

উত্তর : সমপ্রবাহ এবং পরিবর্তী প্রবাহের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

সম প্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ	পরিবর্তী প্রবাহ
১. সম প্রবাহের অভিমুখ সর্বদা স্থির থাকে।	১. পরিবর্তী প্রবাহের মুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিবর্তিত হয়।
২. সম প্রবাহের মান স্থির থাকে, আবার নাও থাকতে পারে।	২. কিন্তু পরিবর্তী প্রবাহের মান একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন হয়।
৩. সম প্রবাহ ওহমের সূত্র ও কার্শফের সূত্র মেনে চলে।	৩. কিন্তু পরিবর্তী প্রবাহ ও পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তির সম্পর্ক বর্তনীর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। এটি ওহম এবং কার্শফের সূত্র মেনে চলে না।

○ প্রশ্ন-৮৮. ড্রাই সেল (Dry Cell) বা শুষ্ক কোষের গঠন ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : গঠন : এ কোষে একটি দস্তার চোঙের মধ্যস্থলে একটি কার্বন দণ্ড বসানো থাকে। কার্বন দণ্ডটি কোষের ধনাত্মক পাত ও দস্তার চোঙ ঋণাত্মক পাত হিসেবে কাজ করে। কার্বন দণ্ডের উপরে একটি পিতলের টুপি থাকে। কার্বন দণ্ডের চারদিকে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড ও কাঠ-কয়লার গুড়ার মিশ্রণ রাখা হয়। মিশ্রণসহ কার্বন দণ্ডটিকে দস্তার চোঙের মধ্যে স্থাপন করে চোঙের ফাঁকা অংশ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ঘন পেস্ট দ্বারা পূর্ণ করা হয়। পেস্ট যাতে শুকিয়ে না যেতে পারে সেজন্য দস্তার চোঙের উপরের মুখ পিচ, গালা, কাঠের গুড়ো ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ থাকে। গ্যাস বের হওয়ার জন্য পিচের মধ্যে একটি ছোট ছিদ্র থাকে। অতঃপর সব জিনিস কাগজে মুড়ে দেয়া হয়।

ক্রিয়া : এ কোষকে যখন কোনো বর্তনীতে সংযুক্ত করা হয়, তখন দস্তা ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হতে থাকে এবং ইলেকট্রন ছেড়ে দেয়।

$Zn \rightarrow Zn^{++} + 2e^-$

দস্তার আয়ন এবং বিভব পার্থক্য সৃষ্টিকারী NH_4Cl-এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় এবং দস্তা NH_4Cl থেকে ধনাত্মক আয়ন H^+ মুক্ত করে নিজে ঋণাত্মক আধান ধারণ করে, ফলে দস্তার খোলের বিভব হ্রাস পায়।

$Zn^{++} + 2NH_4Cl \rightarrow ZnCl_2 + 2NH_3 + 2H^+$

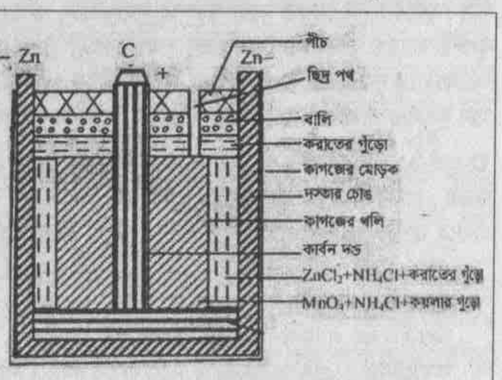

চিত্র : একটি শুষ্ক কোষের অভ্যন্তরীণ গঠন

এদিকে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) কার্বন দণ্ডের কাছে গিয়ে কার্বন দণ্ড থেকে দুটি ইলেকট্রন নিয়ে নিস্তারিত হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কার্বন দণ্ড ইলেকট্রন দান করে ধনাত্মক আধানযুক্ত হয় এবং এর বিভব বৃদ্ধি পায়। ফলে দস্তার খোল থেকে কার্বন দণ্ডের দিকে ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়ে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে। চিত্রে পিতলের টুপির নিকট একটি সরু ছিদ্র পথ থাকে যার মধ্য দিয়ে NH_3 গ্যাস বাইরে নির্গত হয়।

ব্যবহার : টর্চ লাইট, ট্রানজিস্টর, ক্যালকুলেটর, সাইকেলের আলো জ্বালানো ইত্যাদিতে এই কোষের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

প্রশ্ন-৮৯. জেনারেটর বা ডায়নামো কি? এটি কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত?

উত্তর : যে তড়িৎ যন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে ডায়নামো বা জেনারেটর বলে। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের ওপর ভিত্তি করে এই যন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। ডায়নামো দুরকমের হতে পারে। যথা— একমুখী ডায়নামো এবং পরিবর্তী ডায়নামো। একমুখী ডায়নামোর গঠন প্রণালী পরিবর্তী ডায়নামোর মতোই। তবে পার্থক্য হচ্ছে এখানে পরিবর্তী প্রবাহকে একমুখী প্রবাহে পরিণত করার ব্যবস্থা থাকে।

নীতি : এর ক্রিয়া নীতি বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আবেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই যন্ত্রে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত করা হয়। যদি কোনো বদ্ধ কুণ্ডলীকে কোনো চৌম্বকক্ষেত্রে অবিরত আবর্তন করা হয় তবে বদ্ধ কুণ্ডলীতে চৌম্বক বলরেখার পরিবর্তন ঘটে। সুতরাং বদ্ধ কুণ্ডলীতে আবিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই কুণ্ডলীর দু প্রান্ত কোনো বহিঃবর্তনীর সাথে যুক্ত করলে বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলে। তাকে কম্যুটেটরের সাহায্যে সম-বিদ্যুৎ প্রবাহ বা একমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহে পরিণত করা হয়। আবিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহের মান কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, চুম্বকের শক্তি এবং আবর্তনের বেগের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৯০. এসি জেনারেটর বা ডায়নামোর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন।

উত্তর : গঠন : এতে একটি চুম্বক থাকে। একে ক্ষেত্র চুম্বক (field magnet) বলে। চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাঁচা লোহার পাতের ওপর একটি তারের আয়তাকার কুণ্ডলী থাকে। কাঁচা লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটিকে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে সমগতিতে ঘুরানো হয়। আয়তাকার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুটি স্লিপ রিং-এর সাথে সংযুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুটি আর্মেচারের সাথে একই অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে। দুটি কার্বন নির্মিত ব্রাশ এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন তারা যখন আর্মেচার ঘুরতে থাকে তখন স্লিপ রিং দুটিকে স্পর্শ করে থাকে। ব্রাশ দুটির সাথে বহিঃবর্তনী R সংযুক্ত থাকে।

কার্যপ্রণালী : বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের ওপর ভিত্তি করে এ যন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের দুই মেরুর মাঝে একটি পরিবাহী কুণ্ডলীকে যান্ত্রিক উপায়ে ঘুরিয়ে তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট করা যায়। চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে পরস্পর সমান্তরালে বলরেখাগুলো নির্গত হয়। জেনারেটরের আর্মেচার কুণ্ডলী তারের ঘূর্ণনের ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংখ্যক বলরেখা এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। আর্মেচারের দু প্রান্তের সাথে সংযুক্ত বহিঃবর্তনীকে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ বলে। আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, চুম্বকের শক্তি এবং ঘূর্ণনের বেগের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন-৯১. জেনারেটর বা ডায়নামোতে কিভাবে ডিসি ভোল্টেজ তৈরি করা যায়?

উত্তর : পরিবর্তী প্রবাহ ডায়নামো যে পরিবর্তী প্রবাহ সৃষ্টি করে এ যন্ত্রের সাহায্যে তা একমুখী বা সম-প্রবাহে রূপান্তরিত করা যায়। এ যন্ত্রে নিম্নলিখিত অংশসমূহ আছে :

ক. **ক্ষেত্র-চুম্বক :** এটি একটি স্থায়ী অথবা বৈদ্যুতিক চুম্বক।

খ. **ঘূর্ণায়মান কুণ্ডলী বা আর্মেচার :** এটা চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত কাঁচা লোহার উপর অন্তরীত বহু পাকবিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলী।

গ. **কম্যুটেটর :** এটা অর্ধবৃত্তাকার দুটি ধাতব পাত। পাত দুটি কুণ্ডলীর দুপ্রান্তের সাথে যুক্ত হচ্ছে। পাত দুটির মধ্যবর্তী স্থান ফাঁকা এবং পরস্পরের সাথে অন্তরীত থাকে। কম্যুটেটর এবং কুণ্ডলীর অক্ষ একই তলে অবস্থান করে।

ঘ. **ব্রাশ :** দুটি ব্রাশ স্প্রিং-এর সাহায্যে সংযুক্ত থাকে। এদের অপর প্রান্তের সাথে একটি বহিঃবর্তনী যুক্ত করা হয়। এ বর্তনীতে যে বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যাবে তা একমুখী প্রবাহ হবে।

কার্যপদ্ধতি : একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে কুণ্ডলী বা আর্মেচারকে চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সমগতিতে ঘুরানো হয়। কুণ্ডলী চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ঘুরতে থাকলে এতে পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তি এবং পরিবর্তী প্রবাহ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ব্রাশ দুটি এমনভাবে স্থাপিত যে আর্মেচার কুণ্ডলীতে বিদ্যুচ্চালক শক্তি এবং বিদ্যুৎ

প্রবাহ ঠিক যখন অভিমুখ পরিবর্তন করে, তখন ব্রাশ দুটিও পরস্পর কম্যুটেটরের পাত পরিবর্তন করে অর্থাৎ যে কোনো একটি ব্রাশ একটি পাত ত্যাগ করে অন্য পাত স্পর্শ করে। ফলে একটি নির্দিষ্ট ব্রাশ সর্বদা ধন বিদ্যুৎ বা চার্জ এবং অপরটি ঋণ বিদ্যুৎ বা চার্জ সংগ্রহ করে। অতএব বহিঃবর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সর্বদা একমুখী প্রবাহ। এটাই হলো একমুখী প্রবাহ ডায়নামোর কার্যপদ্ধতি।

প্রশ্ন-৯২. এসি ও ডিসি ডায়নামোর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : যে ডায়নামোর সাহায্যে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে এসি ডায়নামো বলে। আবার, যে ডায়নামোর সাহায্যে একমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায় তাকে ডিসি ডায়নামো বলে। এসি ডায়নামোতে চৌম্বকক্ষেত্রে অবস্থিত একটি কুণ্ডলীকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ঘুরিয়ে তড়িৎ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু ডিসি ডায়নামোর তারের কুণ্ডলীকে যান্ত্রিকভাবে ঘুরিয়ে তারের তড়িৎ সৃষ্টি করা হয়।

এসি ডায়নামোর কুণ্ডলীর দুপ্রান্তে দুটি স্লিপ রিং থাকে। ডিসি ডায়নামোর কুণ্ডলীর দুপ্রান্তে দুটি অর্ধ বৃত্তাকার পাত থাকে, একে কম্যুটেটর বলে।

এসি ডায়নামোর তড়িৎ প্রবাহ একবার একদিকে এবং পর মুহূর্তে অন্যদিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু ডিসি ডায়নামোর বিদ্যুৎ শুধু একদিকে প্রবাহিত হয়।

প্রশ্ন-৯৩. বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

উত্তর : নিচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণনা করা হলো :

ক. **জেনারেটরের সাহায্যে :** জেনারেটরে একটি স্থায়ী চুম্বকের (অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন জেনারেটরের ক্ষেত্রে) দু চৌম্বক মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে কাঁচা লোহার পাতের উপর বহু পাকবিশিষ্ট একটি আয়তাকার কুণ্ডলীকে চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে সমগতিতে ঘুরালে ঐ কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়, ফলে পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটতে থাকে। এ প্রবাহ স্লিপরিং ও ব্রাশের মাধ্যমে বহিঃবর্তনীতে সরবরাহ করা হয়।

খ. **নদীর স্রোতের সাহায্যে :** খরস্রোতা নদীর পানিতে প্রচুর স্থৈতিক শক্তি ও গতিশক্তি সঞ্চিত থাকে। নদীতে বাঁধ নির্মাণ করে সে পানিশক্তিকে পানি-চ্যানেলের মাধ্যমে পরিচালিত করলে, পানিতে সঞ্চিত স্থৈতিক শক্তি গতিশক্তিতে পরিণত হয়ে টারবাইন ঘুরাতে সক্ষম হয়, ফলে টারবাইনে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটরে ঘূর্ণন গতি উৎপন্ন হয় এবং বিদ্যুৎ চৌম্বক আবেশের সৃষ্টি করে। জেনারেটরে গতিশক্তি আর চৌম্বকক্ষেত্রের মিলিত কার্যকলাপে উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ শক্তি।

গ. **বিভিন্ন রকম বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের (পাওয়ার প্লান্ট) সাহায্যে :** যে কেন্দ্রে কোনো প্রাকৃতিক শক্তির উৎস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাইমমোভার (Prime mover) এবং বৈদ্যুতিক জেনারেটর চালিত করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে পাওয়ার প্লান্ট বলে। পাওয়ার প্লান্ট প্রধানত দু প্রকার। যথা :

১. **হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট :** যে পাওয়ার প্লান্টে পানিতে মজুদ স্থৈতিক শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করে তার মাধ্যমে টারবাইন ঘুরিয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করা হয় এবং টারবাইনে সংযুক্ত বৈদ্যুতিক জেনারেটর যান্ত্রিকশক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, তাকে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্ট বলে। বাংলাদেশের কাপ্তাইয়ে হাইড্রোইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্টের উৎপাদন ক্ষমতা ১৩০ মেগাওয়াট।

২. **থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট :** যে পাওয়ার প্লান্টে থার্মো কেমিক্যাল পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়, তাকে থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট বলে। থার্মাল পাওয়ার প্লান্ট আবার নিম্নরূপ কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত :

i. **স্টিম পাওয়ার প্লান্ট :** যে পাওয়ার প্লান্টে পানি থেকে বাষ্প উৎপন্ন করে উক্ত বাষ্প দ্বারা প্রথমে টারবাইন এবং পরে টারবাইন দ্বারা জেনারেটরের শ্যাফট ঘুরিয়ে বিদ্যুৎশক্তি

উৎপন্ন করা হয়, তাকে স্টিম পাওয়ার প্লান্ট বলে। এর বয়লার প্লান্টে প্রথমে গ্যাসের সাহায্যে পানি থেকে বাষ্প উৎপন্ন করে টারবাইনে পাঠানো হয়, তারপর টারবাইন ঘুরিয়ে উক্ত স্টিম একটি কনডেন্সারে প্রবেশ করে, কনডেন্সড হয়ে পুনরায় ফিড ওয়াটার হিসেবে বয়লারে ফিরে আসে।

ii. **গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট :** যে পাওয়ার প্লান্টে উচ্চ তাপ ও চাপে বায়ুমণ্ডলীয় বাতাসের সাথে গ্যাস মিশ্রিত করে ঐ মিশ্রিত গ্যাসকে পুড়িয়ে যান্ত্রিকশক্তি উৎপন্ন করে টারবাইনের সাথে সংযুক্ত অল্টারনেটরকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়, তাকে গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্লান্ট বলে।

iii. **ডিজেল পাওয়ার প্লান্ট :** যে পাওয়ার প্লান্টে জেনারেটরের প্রাইমমোভারকে ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয় তাকে ডিজেল পাওয়ার প্লান্ট বলে।

iv. **ডিজেল ইঞ্জিন :** যে ইঞ্জিন বাইরের বাতাসকে সিলিন্ডারের ভেতর সঙ্কুচিত করে অত্যধিক উত্তপ্ত করে এবং ইনজেক্টর থেকে ডিজেলকে স্প্রে করে উত্তপ্ত বাতাস দ্বারা তা জ্বালিয়ে শক্তি উৎপাদন করে তাকে ডিজেল ইঞ্জিন বলে। ডিজেল ইঞ্জিনচালিত জেনারেটরগুলো জরুরি কাজ ও অতিরিক্তি পাওয়ার (জরুরি ভিত্তিতে) সরবরাহ বা বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সমন্বয়ে অনেক সময় সিজনাল লোড বা পিক লোড সরবরাহের জন্য ব্যবহৃত হয়।

v. **নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট :** যে পাওয়ার প্লান্টে তাপশক্তি উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে টারবাইন চালানো হয় তাকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট বলে। প্রথমে রিঅ্যাকটরের মধ্যে ইউরেনিয়াম (U^{235}) নিউক্লিয়াসে এর বিভাজন ক্রিয়া ঘটানো হয়। এ বিভাজনের ফলে প্রচণ্ড তাপশক্তির উদ্ভব ঘটে। তারপর এ তাপশক্তি কুল্যান্ট লাইন-এর মাধ্যমে হিট-এক্সচেঞ্জারে নেয়া হয়। এ এক্সচেঞ্জারে আগত পানি উক্ত তাপের মাধ্যমে স্টিমে পরিণত করে স্টিমের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। ইউরেনিয়াম (U^{235})-এর তাপ উৎপাদন ক্ষমতা কয়লার চেয়ে ২০ লক্ষ গুণ বেশি।
বাংলাদেশের রায়পুর এবং পাবনায় ৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্র নির্মাণাধীন রয়েছে। ঢাকার সাভারে ৩ মেগাওয়াটের একটি কেন্দ্র পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে।

vi. **সোলার পাওয়ার প্লান্ট :** যেসব দেশে সূর্য লম্বালম্বিভাবে কিরণ দেয়, যেমন– কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির মধ্যস্থলে অবস্থিত দেশসমূহে সূর্যকিরণ থেকে দিনের বেলায় হিট অ্যাকুমুলেটরের সাহায্যে তাপ সংগ্রহ করে রাতেও সে তাপের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

vii. **উইন্ড পাওয়ার প্লান্ট :** বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সাধারণত বহুফলাযুক্ত টারবাইন চক্র ও উচ্চ গতিসম্পন্ন প্রপেলার শ্যাফট বিশেষ ব্যতিচক্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় অত্যন্ত কম এবং পরিচালনার জন্য তেমন বেশি লোকের প্রয়োজন হয় না। বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় দুই থেকে চার মাইল থাকলেও এ ধরনের বিদ্যুৎ পাম্প চালানো হচ্ছে। ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের কেন্দ্রের সাহায্যে পানির পাম্প চালানো হচ্ছে। চট্টগ্রামের সমুদ্র উপকূলেও এ ধরনের কিছু কেন্দ্র চালু রয়েছে।

○ প্রশ্ন-৯৪. বৈদ্যুতিক মোটর কি? ডিসি মোটরের গঠন, কার্যপ্রণালী ও ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : যে তড়িৎযন্ত্র তড়িৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে তড়িৎ মোটর বলে। জেনারেটরের মতো তড়িৎ মোটরও দু প্রকারের; যথা–

ক. একমুখী প্রবাহ মোটর বা ডিসি মোটর এবং

খ. পরিবর্তী প্রবাহ মোটর বা এসি মোটর।

নিচে ডিসি মোটরের গঠন ও কার্যপ্রণালী আলোচনা করা হলো :

গঠন : ডিসি মোটরের গঠনপ্রণালী ডিসি জেনারেটরের মতো। এর প্রধান অংশগুলো হচ্ছে :

(i) ক্ষেত্র চুম্বক, (ii) আর্মেচার, (iii) কম্যুটেটর ও (iv) ব্রাশ।

i. **ক্ষেত্র চুম্বক :** U আকৃতির একটি স্থায়ী বা তড়িৎ চুম্বক এ যন্ত্রের ক্ষেত্রে চুম্বকের কাজ করে।

ii. **আর্মেচার :** কাঁচা লোহার মজ্জার ওপর অন্তরীত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়।

iii. **কম্যুটেটর :** শক্ত তামার কতগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরীত করে কম্যুটেটর তৈরি করা হয়।

iv. **ব্রাশ :** কার্বন অথবা তামার দ্বারা ব্রাশ তৈরি করা হয়। আর্মেচারে কুণ্ডলীর দু প্রান্তে কম্যুটেটরের দু পাতে সংযুক্ত থাকে। ব্রাশের মাধ্যমে কম্যুটেটরের সাথে বহির্বর্তনী সংযুক্ত বিবর্তনীতে একটি তড়িচ্চালক বলের উৎস ও পরিবর্তনশীল রোধ থাকে।

ক্রিয়া : বহির্বর্তনী থেকে আর্মেচার কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হলে কুণ্ডলীটি ঘুরতে শুরু করে। দুটি চৌম্বক বলের ক্রিয়ায় উদ্ভূত দ্বন্দ্বের জন্য কুণ্ডলীতে ঘূর্ণন উৎপন্ন হয়। ঘূর্ণনের অভিমুখ ফ্লেমিংয়ের বাম হস্ত সূত্র থেকে পাওয়া যায়। কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ বাড়ালে ঘূর্ণনের বেগও বৃদ্ধি পায়। যখন কুণ্ডলীটি ঘোরে তখন এতে অল্প পরিমাণ তড়িচ্চালক বল আবিষ্ট হয়। এ সময় কুণ্ডলীটি ঐ চৌম্বক ক্ষেত্রে ঘুরে চৌম্বক বলরেখার সাথে নিজেকে স্থাপিত করতে চায়। কুণ্ডলীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে কম্যুটেটরও ঘুরে। কুণ্ডলীর তল যখন উলম্ব অবস্থায় আসে তখন কুণ্ডলীর ওপর কোনো দ্বন্দ্ব ক্রিয়া করে না। কিন্তু গতিজড়তার জন্য কুণ্ডলীটি একই দিকে আরো একটু এগিয়ে যায়।

কুণ্ডলীর এ অবস্থায় ব্রাশ ও কম্যুটেটর অংশের মধ্যে স্থান পরিবর্তন হয় এবং কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় এবং কুণ্ডলীকে একই দিকে আরো ঘুরিয়ে দেয়।

বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিলে তড়িৎ মোটরের ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-৯৫. ডায়নামো ও তড়িৎ মোটরের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে ডায়নামো বলে। আবার, যে যন্ত্রের সাহায্যে তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় তাকে তড়িৎ মোটর বলে। তড়িৎ চৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে ডায়নামো তৈরি করা হয়েছে। অন্যদিকে, তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তড়িৎ মোটর তৈরি করা হয়েছে।

ঘর-বাড়ি, অফিস-আদালতে তড়িৎ সরবরাহের কাজে ডায়নামো ব্যবহৃত হয়। আবার, বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প ইত্যাদিতে তড়িৎ মোটর ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৯৬. ট্রান্সফরমার (Transformer) কি? এর গঠন উল্লেখ করুন।

উত্তর : তড়িৎ বিভব বা তড়িৎ প্রবাহকে বাড়াতে বা কমাতে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়। তারের প্রস্থচ্ছেদের ওপরই বিদ্যুতের প্রবাহ নির্ভর করে। তাই দূরে বিদ্যুৎ পাঠাতে হলে অধিক প্রস্থচ্ছেদের তার প্রয়োজন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আবার উচ্চ অ্যাম্পিয়ারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে লাইন লস অনেক বেড়ে যায়। এ জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিদ্যুৎ পাঠাতে বৈদ্যুতিক বিভব বা ভোল্টেজ বাড়ানো হয়। এতে অ্যাম্পিয়ার আনুপাতিক হারে কমে যায়। আবার বেশি ভোল্টেজ ব্যবহার করলে তারের ইনসুলেটরের খরচ অনেক বেড়ে যায়। এসব কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সাধারণত ১১০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সঞ্চালন ক্ষতি কমানোর জন্য একে ২,৩০,০০০ ভোল্টে উন্নীত করা হয় আবার গ্রাহকদের জন্য একে কমিয়ে ১১০০০, ৪৪০ অথবা ২২০ ভোল্ট হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এভাবে ভোল্টেজকে কমানো বা বাড়ানো যন্ত্রের নাম ট্রান্সফরমার।

ট্রান্সফরমারে থাকে নরম লোহার পাতের তৈরি অভ্যন্তরীণ দণ্ড। এ দণ্ডের উপর প্যাঁচানো পরস্পর থেকে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন তামার তারের দুটো কুণ্ডলী। এ কুণ্ডলী দুটি এক বাহুর ওপর বা ভিন্ন ভিন্ন বাহুর ওপর হতে পারে। দুই তারের আবর্তন বা পাক সংখ্যা আলাদা আলাদা থাকে। কুণ্ডলীর তারের এক প্রান্তে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসের সংযোগ এবং অপর প্রান্তে গ্রাহক প্রান্তের সরবরাহ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়। উৎসের কুণ্ডলীকে প্রাইমারি এবং অন্য কুণ্ডলীকে সেকেন্ডারি কুণ্ডলী বলে। সেকেন্ডারির পাকসংখ্যা কম হলে প্রাইমারি অপেক্ষা বেশি ভোল্টেজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দু কুণ্ডলীর পাকসংখ্যার অনুপাতে দু পার্শ্বে দু রকম ভোল্টেজ পাওয়া যাবে সেই সাথে বিপরীত অনুপাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ, অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যাবে। পাওয়ার হাউস বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কেন্দ্রে 11 KV/132 KV (KV= Kilovolt), 11 KV/230 KV সঞ্চালনে 230 KV/132 KV, 132 KV/33 KV এবং বিতরণ ব্যবস্থায় 33 KV/11 KV, 11 KV/44 KV ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয়।

০ প্রশ্ন-৯৭. ট্রান্সফর্মার কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা করুন।

উত্তর : ট্রান্সফর্মার কয়েক ধরনের হতে পারে। যথা :

(i) কার্যপ্রণালীর ভিত্তিতে ট্রান্সফর্মার দু ধরনের হয়ে থাকে :

ক. উচ্চধাপী বা আরোহী ট্রান্সফর্মার ও খ. নিম্নধাপী বা অবরোহী ট্রান্সফর্মার।

ক. উচ্চধাপী বা আরোহী ট্রান্সফর্মার (Step up) : যে ট্রান্সফর্মার নিম্ন ভোল্টেজকে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে তাকে বলা হয় আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার (Step up transformer). এ ধরনের ট্রান্সফর্মারের প্রাথমিক অংশে মোটা তারের কম সংখ্যক পাক (ampere turns) ও মাধ্যমিক অংশে অপেক্ষাকৃত চিকন তারের কম সংখ্যক পাক থাকে।

খ. নিম্নধাপী বা অবরোহী ট্রান্সফর্মার (Step down) : যে ট্রান্সফর্মার উচ্চ ভোল্টেজকে নিম্ন ভোল্টেজে রূপান্তরিত করে তাকে বলা হয় অবরোহী বা স্টেপ-ডাউন ট্রান্সফর্মার (Step down transformer)। এ ধরনের ট্রান্সফর্মারের প্রাথমিক কয়েলে সূক্ষ্ম তারের অধিক সংখ্যক ও মাধ্যমিক কয়েলে অপেক্ষাকৃত মোটা তারের কম সংখ্যক পাক থাকে।

(ii) আকৃতি ও গঠন অনুসারে ট্রান্সফর্মার দু প্রকার :

ক. কোর আকৃতি (Core Type) : লোহার কোরের উপর তার পেঁচিয়ে যে ট্রান্সফর্মার তৈরি করা হয় তাকে কোর আকৃতি ট্রান্সফর্মার বলে। কোর আকৃতি ট্রান্সফর্মার আবার দুই প্রকার।

i. খোলা কোর (Open Core) : একটি এবোনাইট বা বেকেলাইট চোঙের উপর অথবা অনেকগুলো পাতলা আয়তাকার সিলিকন স্টিলের পাত একত্র করে কোর তৈরি করে তার উপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ওয়াইনডিং পাশাপাশি জড়ানো অবস্থায় থাকে। খোলা কোর ট্রান্সফর্মারে চৌম্বকক্ষেত্র কখনো কোর আবার কখনো বাতাসের মধ্যে হয়।

ii. বদ্ধ কোর (Close Core) : এই কোরের আকৃতি ফাঁপা চতুর্ভুজের মতো। আয়তাকারের পাতলা সিলিকন স্টিলের পাত আবরণযুক্ত বার্নিশ দিয়ে সংযোজিত করে এর এক বাহুতে প্রাথমিক ও অন্য বাহুতে মাধ্যমিক কয়েল জড়ানো হয়।

খ. শেল আকৃতি (Shell Type) : এই ট্রান্সফর্মার দেখতে শেল বা মোচার মতো। অর্থাৎ মাঝখানে অপেক্ষাকৃত মোটা। অনেকগুলো পাতলা সিলিকন স্টিলের পাত E.F.I.L. আকৃতির করে কেটে আবরণযুক্ত বার্নিশের সাহায্যে একত্রে সংযোজিত করে কোর তৈরি করে প্রথমে প্রাথমিক ও তার উপর আবরক কাগজ দিয়ে মাধ্যমিক কয়েল জড়ানো হয়। এই ধরনের ট্রান্সফর্মারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কয়েল অতি নিকটে অবস্থান করে। এই অবস্থানকে নিবিড় জোড় (Close coupling) বলে। এটিতে চৌম্বক ফ্লাক্স মধ্য বাহু থেকে শুরু করে পার্শ্বস্থ দুই বাহুর মধ্যে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মধ্য বাহুতে ফিরে আসে। এভাবে প্রায় সব ফ্লাক্সই মাধ্যমিক কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ ধরনের ট্রান্সফর্মার অধিক শক্তিশালী এবং এগুলোর ব্যবহার অত্যধিক।

(iii) তল করার পদ্ধতি অনুসারে ট্রান্সফর্মার দু প্রকার :

ক. তেল দ্বারা শীতলীকৃত ট্রান্সফর্মার : ট্রান্সফর্মারকে বিদ্যুৎ ভার দিয়ে চালনা করা হলে উভয় ওয়াইনডিং-এ তাপ উৎপন্ন হয়, ফলে কোরে শক্তির অপচয় ঘটে। এ অপচয় কমানোর জন্য কোর ও ওয়াইনডিংসমূহকে একটি ধাতব চৌবাচ্চার (tank) মধ্যে রেখে বিশেষ ধরনের অন্তরক তেল (Insulting oil) বা অদাহ্য (non-inflamable) তরল পদার্থে ডুবিয়ে রাখা হয়। এতে কোর এবং ওয়াইনডিংসমূহ শীতল থাকে।

খ. বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত ট্রান্সফর্মার : যেসব জায়গায় তেল দ্বারা শীতলীকৃত ট্রান্সফর্মার ব্যবহার নিরাপদ নয়, সেখানে বায়ু দ্বারা শীতলীকৃত ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ট্রান্সফর্মারে বায়ু নিষ্কাশনের মাধ্যমে কোরসমূহকে শীতল করার ব্যবস্থা থাকে। বিদ্যুৎ প্রবাহিত হওয়ার সময় ট্রান্সফর্মার যাতে অধিক গরম হতে না পারে সেজন্য তাতে বাতাস ঢুকার সুবন্দোবস্ত থাকে। বাতাসের জলীয় বাষ্প যাতে ট্রান্সফর্মারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য জলীয়বাষ্প শোষক এক প্রকার কুচি পাথর (silicagel) সেখানে ব্যবহার করা হয়।

(iv) স্থাপন প্রণালী অনুসারে ট্রান্সফর্মার দুই প্রকার :

ক. গৃহমধ্যে অবস্থিত (Indoor Type) : এ ধরনের ট্রান্সফর্মার সাধারণত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিভিশন, এয়ার কুলার তথা ঘরের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হয়।

খ. উন্মুক্ত স্থানে অবস্থিত (Outer Type) : এ ধরনের ট্রান্সফর্মার বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ করার জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদক কেন্দ্র, উপকেন্দ্র, বণ্টন কক্ষ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

(v) বিদ্যুৎ সরবরাহ ক্ষেত্র ও কাজের উপর ভিত্তি করে ট্রান্সফর্মার দুই প্রকার :

ক. সিঙ্গেল ফেজ (Single phase) ও খ. থ্রি-ফেজ (Three phase)।

গৃহে অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়। রেডিওর অ্যাডাপ্টর (adaptor) হিসেবে বহির্গামী ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়। প্রক্ষেশান মেশিন ও আর্ক ওয়েলডিং-এর কাজে সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফ্রেজ ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বণ্টন ব্যবস্থায়, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র প্রভৃতি জায়গায় থ্রি-ফেজ ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়।

(vi) বিশেষ ব্যবহার অনুসারে ট্রান্সফর্মার আবার কয়েক প্রকার :

সরঞ্জাম ট্রান্সফর্মার (Instrument Transformer) : বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, যেমন– মোটর, স্টার্টার, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি উচ্চ ভোল্টেজসম্পন্ন সরবরাহ লাইনে সরাসরি স্থাপন করা নিরাপদ নয়। এসব যন্ত্রপাতিকে নিরাপদ রাখতে অর্থাৎ উচ্চ ভোল্ট ও প্রবাহ কমাতে সরঞ্জাম ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া এ ধরনের ট্রান্সফর্মার অন্তরক (Perating personnel) হিসেবেও কাজ করে। ফলে যন্ত্রপাতি এমনকি যন্ত্রচালককেও উচ্চ ভোল্ট থেকে নিরাপদে রাখে।

সরঞ্জাম ট্রান্সফর্মার আবার দুই প্রকার :

ক. ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার (Voltage Transformer) : ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার সরবরাহ লাইনে ভোল্টেজের সংযোগের মাধ্যমে মিটার, যন্ত্রপাতি ও বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতিতে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ভোল্ট সরবরাহ করে। প্রাথমিক ওয়াইনডিংকে লাইনের সাথে সংযোগ করা হলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে কোরের উপর চৌম্বক ফ্লাক্স উৎপন্ন করে এবং মাধ্যমিক কয়েলে বিদ্যুৎচালক বলের সৃষ্টি করে। এই আবেশজাত বিদ্যুৎচালক বল প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কয়েলের তারের পাকের সমানুপাতিক। ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মারের প্রাথমিক কয়েলে নির্দিষ্ট ভোল্ট

সরবরাহ দেয়ার পর মাধ্যমিক কয়েলে ১১৫ বা ১২০ ভোল্ট পাওয়া যায়। কাজেই ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার যে বিদ্যুৎ ভার সরবরাহ করে তা অতি নগণ্য। এই ট্রান্সফর্মারসমূহ ৫০, ২০০ ও ৬০০ VA মানের পাওয়া যায়।

খ. প্রবাহ ট্রান্সফর্মার (Current Transformer) : প্রবাহ ট্রান্সফর্মারের প্রাথমিক অংশ এক পাক ও মাধ্যমিক অংশ বহু পাকবিশিষ্ট কয়েল দ্বারা তৈরি করা হয়। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাকের অনুপাতে যন্ত্রের মধ্যে প্রবাহ চলে। কিন্তু যন্ত্রে যে দাগ কাটা থাকে তা ঐ যন্ত্রের প্রকৃত যে প্রবাহ চলে তা নির্দেশ না করে নির্দেশ করে সরবরাহ লাইনের প্রবাহ। এতে পাতলা লোহার তৈরি কোর থাকে এবং তার উপরই এক পাকের প্রাথমিক ও বহু পাকের মাধ্যমিক কয়েল জড়ানো হয়। এর প্রাথমিক কয়েল লাইনের সঙ্গে সিরিজ উপায়ে এবং মাধ্যমিক কয়েলের দুই প্রান্তের মধ্যে অ্যামিটার সংযুক্ত করা হয়।

প্রবাহ ট্রান্সফর্মারের প্রাথমিক ওয়াইনডিং-এর প্রতিবন্ধকতা অতি নগণ্য। প্রাথমিক প্রবাহ, মাধ্যমিক বিদ্যুৎ ভারের চেয়ে প্রাথমিক বিদ্যুৎ ভারের উপরই অধিক নির্ভরশীল। মাধ্যমিক বর্তনীকে বন্ধ করার সাথে সাথে মাধ্যমিক বর্তনীতে চৌম্বক চালক বলে উৎপন্ন হয়ে প্রাথমিক চৌম্বক চালককে বাধা প্রদান করে, ফলে কোরের মধ্যে চৌম্বক ফ্লাক্সের ঘনত্ব সীমিত থাকে। মাধ্যমিক বর্তনী খোলার সাথে সাথে মাধ্যমিক বর্তনীতে বিপরীত চৌম্বক বলের অবস্থান শূন্য হয়ে যায়। এর প্রভাবে ফ্লাক্সের ঘনত্ব অত্যধিক বেড়ে যায়। ফলে খোলা অবস্থায় মাধ্যমিক ওয়াইনডিং-এ অধিক ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। এই আঘাত থেকে যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রচালককে রক্ষা করার জন্য পুনঃ চালনার (removing) পূর্বে মাধ্যমিক প্রান্তদ্বয়কে সর্ট সার্কিট করে নিতে হয়। আধুনিক প্রবাহ ট্রান্সফর্মারসমূহ মাধ্যমিক ওয়াইনডিং-এর সর্ট সার্কিটিং কৌশল (Short circuiting device) হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৯৮. ট্রান্সফর্মারের ব্যবহার উল্লেখ করুন। ট্রান্সফর্মারের দক্ষতা বলতে কি বোঝেন?

উত্তর : আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে ট্রান্সফর্মারের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। নিচে ব্যবহারসমূহ উল্লেখ করা হলো :

ক. এসি সরবরাহের নানাবিধ ব্যবহারিক প্রয়োজনে আরোহী ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে নিম্নমানের বিভবকে উচ্চমানে উন্নীত করা হয় এবং অবরোহী ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে উচ্চমানের বিভবকে নিম্নমানের বিভবে আনয়ন করা হয়।

খ. বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ বণ্টন কেন্দ্রসমূহ পর্যন্ত বহু কিলোমিটার বিস্তৃত বিদ্যুৎপ্রেরক লাইনে খুব সামান্য প্রবাহ ও খুব উচ্চ বিভবে বিদ্যুৎ পাঠানো প্রয়োজন ও লাভজনক। ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে তা করা হয়।

গ. বেতার গ্রাহক যন্ত্রে, বেতার টেলিফোন বা টেলিগ্রাফে মূলত আরোহী ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

ঘ. বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়।

ঙ. ধাতব সংযোজনে এক ধরনের অবরোহী ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।

চ. পরিবর্তী প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত সব যন্ত্রে ট্রান্সফর্মার ব্যবহৃত হয়।

ট্রান্সফর্মারের দক্ষতা : কোনো ট্রান্সফর্মারের গৌণ কুণ্ডলীর প্রান্তে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা এবং মুখ্য কুণ্ডলীর প্রান্তে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষমতার অনুপাতকে এর দক্ষতা বলে। একে সাধারণত শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়।

$$\therefore \text{দক্ষতা} = \frac{\text{প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা}}{\text{প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক ক্ষমতা}}$$

$$= \frac{\text{প্রযুক্ত ক্ষমতা} - \text{নষ্ট ক্ষমতা}}{\text{প্রযুক্ত ক্ষমতা}} \times ১০০\%$$

○ প্রশ্ন-৯৯. ট্রান্সফর্মারে কতভাবে শক্তির অপচয় ঘটে?

উত্তর : ট্রান্সফর্মারের কর্মক্ষমতা অতি উচ্চমানের। বড় বড় ট্রান্সফর্মারের কর্মক্ষমতা ৫০% থেকে ১০০% হয়। এতদসত্ত্বেও ট্রান্সফর্মারে কিছু শক্তির অপচয় হয়। এ শক্তি অপচয় হতে পারে বিভিন্ন কারণে। এগুলো হলো :

i. কোর বা তামার অপচয়,
ii. আবর্ত প্রবাহ,
iii. চৌম্বকাবেশজনিত ক্ষতি,
iv. ল্যামিনেশন ও
v. ফ্লাক্স অপচয়।

○ প্রশ্ন-১০০. কি কি উপায়ে ট্রান্সফর্মারে সংযোগ দেয়া যায়?

উত্তর : কয়েকটি উপায়ে ট্রান্সফর্মারে সংযোগ দেয়া সম্ভব। সংযোগ উপায়গুলো হলো :

i. সিঙ্গেল-ফেজ সংযোগ (Single phase connections)
ii. টু-ফেজ সংযোগ (Two phase connections)
iii. থ্রি-ফেজ সংযোগ (Three phase connections)
iv. সিক্স-ফেজ সংযোগ (Six phase connections)
v. স্টার সংযোগ (Star phase connections)

○ প্রশ্ন-১০১. একটি সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফর্মারের গঠন বর্ণনা করুন।

উত্তর : ট্রান্সফর্মার প্রধানত তিনটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত–

ক. কাঠামো : বিদ্যুৎ অপরিবাহী পদার্থের তৈরি, এটি ট্রান্সফর্মারের বাহ্যিক আবরণ।

খ. কোর (Core) : প্রয়োজনমতো অস্থায়ী চুম্বক পাওয়ার জন্য ট্রান্সফর্মারে কাঁচা লোহা বা সিলিকন স্টিলের (Silicon steel) পাতলা পাত একত্র করে এক প্রকার আঠালো পদার্থ দ্বারা জোড়া লাগিয়ে এই কোর তৈরি করা হয়। শুধু বিদ্যুৎ প্রবাহ চলাকালেই কোর চুম্বকে পরিণত হয়, কিন্তু প্রবাহ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে এর চুম্বকত্ব লোপ পায়।

গ. তার (Wire) : ট্রান্সফর্মারে এনামেলের মসৃণ আবরণ (Silver anamel insulation) দেয়া তামার তার ব্যবহার করা হয়। এনামেল বার্নিশ আবরণ পাতলা হওয়া সত্ত্বেও এর রোধ অধিক হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে রোধের অবচয় (Leak) হতে পারে না।

○ প্রশ্ন-১০২. ট্রান্সফর্মার ব্যবহারে কোন কোন বিষয়ের উপর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখতে হয়?

উত্তর : ট্রান্সফর্মার ব্যবহারে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর সতর্কতা রাখতে হয়।

i. ট্রান্সফর্মারের 'গা' দিয়ে কোনো রকম তেল বের হয় কিনা।
ii. থার্মোমিটার ও কনজারভেটর গেজ ঠিকমতো আছে কিনা এবং সেগুলোর পাঠ (reading) ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে কিনা।
iii. অন্তরীত বুশিংগুলোর মধ্যে কোনো রকম ফাটল আছে কিনা।
iv. কনজারভেটরের তেল ঠিকমতো আছে কিনা, তেলের উচ্চতা, তাপ পরিবহন ক্ষমতা ঠিক আছে কিনা।
v. আর্থিং সংযোগ সঠিক কিনা।
vi. ব্রিদার (breather)-এর কুচিপাথর ঠিক আছে কিনা।
vii. কনজারভেটরের সাথে পাত্রের (tank) তেলের সংযোগ আছে কিনা।
viii. ট্রান্সফর্মারের কোথাও কোনো ময়লা বা পানি জমে আছে কিনা।

প্রশ্ন-১০৩. দেশের দূর-দূরান্তে কিভাবে এসি কারেন্ট প্রেরণ এবং সরবরাহ করা হয়?

উত্তর : উৎপাদিত তড়িৎ দূর-দূরান্তে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়, তাই তড়িৎকে উৎপাদন কেন্দ্র থেকে একটি প্রেরণ ব্যবস্থায় মাধ্যমে সারা দেশে পাঠানো হয়। এই ব্যবস্থায় পাওয়ার স্টেশনগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ব্যবস্থার নাম জাতীয় গ্রিড। তড়িৎ প্রেরণ করা হয় তারের মাধ্যমে। এ তার উঁচু টাওয়ারের মাধ্যমে টানানো থাকে। এসব তারে অনেক উচ্চ ভোল্টেজের তড়িৎ থাকে। কিন্তু তড়িৎ প্রবাহের মান থাকে কম। এসব তারে ২,৭৫,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ পর্যন্ত তড়িৎ থাকে। পাওয়ার স্টেশন থেকে তড়িৎকে ২৫,০০০ V পাঠানো হয় এবং তড়িৎ প্রবাহের মান থাকে ২০,০০০ অ্যাম্পিয়ার। এই ভোল্টেজকে একটি বিরাট আরোহী (স্টেপ আপ) ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। তখন ভোল্টেজের মান হতে পারে ২,৭৫,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ V। এ জন্য তড়িৎ প্রবাহ (তড়িৎ কারেন্ট)-কে অনেক কমিয়ে ফেলতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ৪০,০০০A থেকে কমিয়ে ১২৫ V করা হয়। প্রেরক তারে যে রোধ থাকে তা খুবই সামান্য কিন্তু এই রোধ তাৎপর্যপূর্ণ। তারের ভেতর দিয়ে যত বেশি তড়িৎপ্রবাহ চলে, ততই এটি উত্তপ্ত হতে থাকে। এই তাপশক্তি পারিপার্শ্বিক বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। তাপশক্তির উৎপাদনে তড়িৎ ব্যয় হয় এবং অপচয় ঘটে। এছাড়া তার যত বেশি উত্তপ্ত হয় এর রোধও বাড়তে থাকে। সুতরাং V বাড়ালে এবং তড়িৎ প্রবাহের মান কমালে শক্তি বা ক্ষমতার অপচয় কম হয়। উচ্চ ভোল্টেজের এবং কম মানের তড়িৎ প্রবাহ গ্রাহকের ব্যবহার উপযোগী নয়, তাই এই ভোল্টেজ আবার অনেকগুলো অবরোহী বা নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এতে ভোল্টেজ কমে যায় এবং তড়িৎ প্রবাহের মান বৃদ্ধি পায়। ফলে এই তড়িৎ গ্রাহক ব্যবহারের উপযোগী হয়। বাংলাদেশে এই উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে ২২০V নিয়ে আসা হয়।

প্রশ্ন-১০৪. দূরবর্তী স্থানে বিদ্যুৎ প্রেরণের ক্ষেত্রে ডিসি অপেক্ষা এসি ব্যবহার সুবিধাজনক কেন?

উত্তর : আমরা জানি, $I \propto V$. অর্থাৎ ভোল্টেজ অনেকগুণ বৃদ্ধি করে এবং প্রবাহ একই অনুপাতে কমিয়ে অথবা বিপরীত ব্যবস্থা করে প্রেরিত তড়িৎ ক্ষমতা সমান রাখা যায়। প্রত্যেক লাইন-তারের কিছু রোধ (R) আছে এবং ঐ তারের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ গেলে জুল-প্রভাবজনিত তাপের উদ্ভব হবে এবং শক্তির অপচয় হবে। লাইন-তার যত দীর্ঘ হবে, ক্ষতির পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। দু রকম উপায়ে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়—

i. লাইন তার নির্মাণে মোটা তামার তার ব্যবহার করা, কারণ মোটা তারের রোধ খুব কম তবে মোটা তারে খরচ অনেক বেশি পড়ে।

ii. প্রবাহমাত্রা I খুব কম প্রয়োগ করা। এজন্য ভোল্টেজ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করতে হবে, কারণ তড়িৎ ক্ষমতা অপরিবর্তিত রাখতে হবে। কিন্তু জেনারেটরে খুব উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন করা এবং ব্যবহারকারীর পক্ষে উচ্চ ভোল্টেজ ব্যবহার করা খুবই বিপজ্জনক। এ সমস্যার সমাধান করা যায় এসি সরবরাহ ব্যবস্থায় ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে। ডিসি সরবরাহ ব্যবস্থায় এই সুবিধা নেই, কারণ সেখানে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা যায় না। তাই আজকাল তড়িৎশক্তি প্রেরণে সর্বত্র এসি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রশ্ন-১০৫. ডিসি সরবরাহের সুবিধাগুলো কি কি?

উত্তর : ডিসি সরবরাহের নিম্নলিখিত সুবিধা আছে :

ক. ব্যাটারি চার্জিং, তড়িৎ প্রলেপন, ইলেকট্রোটাইপিং, তড়িৎ পদ্ধতিতে ধাতুর শোধন প্রভৃতি কাজে ডিসি সরবরাহ প্রয়োজন।

খ. ডিসি সরবরাহ লাইনে দুটি তার থাকে সেখানে এসি সরবরাহ লাইনে তিনটি তার থাকে।

গ. যেসব কাজে একটি লাইন উপযুক্ত নয় (যেমন– নদীর ভিতর দিয়ে ডুবন্ত তারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহ প্রেরণ) সেসব কাজে ডিসি লাইন ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন-১০৬. এসি সরবরাহের সুবিধাগুলো কি কি?

উত্তর : এসি সরবরাহের নিম্নলিখিত সুবিধা আছে :

ক. ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে এসি ভোল্টেজ উচ্চমান থেকে নিম্ন অথবা নিম্নমান থেকে উচ্চে রূপান্তরিত করা সহজ।

খ. এসিকে সহজে একমুখীকারকের (rectifier) সাহায্যে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

গ. এসি মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা অনেক সহজ, তাছাড়া যন্ত্রপাতিগুলো অনেক বেশি টেকসই হয় এবং এদের প্রতি খুব বেশি নজর দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

ঘ. পরিবর্তী প্রবাহমাত্রা হ্রাস করার জন্য নিরোধক-কুণ্ডলী (choke coil) অথবা ধারক ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে শক্তির অবক্ষয় হয় অতি সামান্য কিন্তু সমপ্রবাহমাত্রা হ্রাস করতে হলে রোধক ব্যবহার করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তাপজনিত শক্তিক্ষয় প্রচুর পরিমাণে হয়।

প্রশ্ন-১০৭. তড়িৎবাহী তারের ওপর চুম্বকের প্রভাব কি?

উত্তর : কোনো তড়িৎবাহী তারকে চুম্বকের দুটি মেরুর মধ্যে আনা হলে তা উপর-নিচে উঠানামা করে নিজস্ব একটি চৌম্বকক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। শক্তিশালী চুম্বকের বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র এবং তড়িৎবাহী তারের চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে তারটি উপরের দিকে লাফিয়ে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের দিক পরিবর্তন করলে তা নিচের দিকে নামে।

চৌম্বক বলরেখাগুলো পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। এই বিকর্ষণ নিচের দিকে বৃদ্ধি পায় এবং বলরেখার উৎস তড়িৎবাহী তারকে উপরের দিকে ঠেলে দেয়। তারে তড়িৎ প্রবাহের অভিমুখ বিপরীত করা হলে তারটি নিচের দিকে বল লাভ করবে।

প্রশ্ন-১০৮. বাইসাইকেলে ব্যবহৃত ডায়নামো কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : বাইসাইকেলে ব্যবহৃত ডায়নামো সাইকেলের বাতি জ্বালানোর জন্য প্রয়োজনীয় তড়িৎ কারেন্ট উৎপাদনের কাজ করে। এজন্য ডায়নামোতে একটি অতিরিক্ত খাঁজকাটা ছোট চাকা থাকে। এ ছোট চাকাটিকে চাকার সংস্পর্শে আনলে সাইকেলের চাকার ঘূর্ণনের সাথে সাথে ডায়নামোর ছোট চাকাটিও ঘুরতে থাকে। আবার ডায়নামোর চাকার ঘূর্ণনের ফলে তৎসংলগ্ন তারের কুণ্ডলীও ঘুরতে থাকে এবং প্রয়োজনীয় তড়িৎ উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন-১০৯. পোলারায়ন বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : সাধারণ বিদ্যুৎ কোষের বিদ্যুৎ প্রবাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে তামার পাতের উপর হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদবুদ জমে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। সাধারণ বিদ্যুৎকোষের এ দোষটিকে পোলারায়ন বলে। একটি ব্রাশের সাহায্যে মাঝে মাঝে তামার পাতখানা ঘষে সারিয়ে নিলে বিদ্যুৎ প্রবাহ আবার চলতে থাকে। অর্থাৎ পোলারায়ন ত্রুটি দূরীভূত হয়।

প্রশ্ন-১১০. বিদ্যুৎ প্রবাহের তাপন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে কি কি বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা যায়?

উত্তর : কোনো পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে তড়িৎশক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে পরিবাহীটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। একেই বিদ্যুৎ প্রবাহের তাপন ক্রিয়া বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহের তাপন ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা হয়েছে। যথা—বৈদ্যুতিক বাল্ব, টিউব লাইট, বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি, মাইক্রোওভেন, বৈদ্যুতিক হিটার বা চুল্লী, ওয়েলডিং যন্ত্র ইত্যাদি।

প্রশ্ন-১১১. ট্রান্সফর্মার কি? ট্রান্সফর্মারের প্রধান উপাদানগুলো কি কি?

উত্তর : ট্রান্সফর্মার : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পরিবর্তী প্রবাহের বিভবকে উচ্চ থেকে নিম্নমানে বা নিম্ন থেকে উচ্চমানে পরিবর্তন করা যায় তাকে ট্রান্সফর্মার বলে। তাড়িত চৌম্বক আবেশের উপর ভিত্তি করে এই যন্ত্র তৈরি করা হয়।

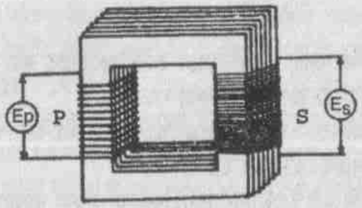

চিত্র : উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মার।

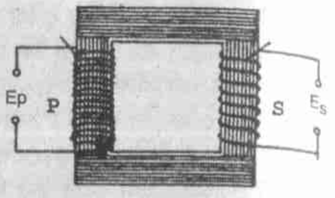

চিত্র : নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মার।

ট্রান্সফর্মারের গঠন : একটি ট্রান্সফর্মারের নিম্নলিখিত অংশ থাকে :

ক. **কোর বা মজ্জা :** কাঁচা লোহার কতগুলো আয়তাকার পাতকে একত্রিত করে কোর তৈরি করা হয়। কোরের বিপরীত বাহুতে অন্তরীত তারের পেঁচানোর ফলে দু'টি কুণ্ডলী তৈরি হয়।

খ. **মুখ্য কুণ্ডলী :** কোরের যে বাহুর কুণ্ডলীটিকে পরবর্তী প্রবাহ বা বিভব প্রয়োগ করা হয় তাকে মুখ্য কুণ্ডলী বা মুখ্য কয়েল বলে।

গ. **গৌণ কুণ্ডলী :** মুখ্য কুণ্ডলীর বিপরীত গৌণ কুণ্ডলী। এখানে পরিবর্তী বিভব আবিষ্ট হয়। উচ্চধাপী ট্রান্সফর্মারের মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীতে পাকসংখ্যা বেশি থাকে। আর নিম্নধাপী ট্রান্সফর্মারে মুখ্য কুণ্ডলীর চেয়ে গৌণ কুণ্ডলীর পাকসংখ্যা কম থাকে।

○ প্রশ্ন-১১২. তড়িৎ মোটর কি? ট্রান্সফর্মারের সাথে এর পার্থক্য কি?

উত্তর : তড়িৎ মোটর (Electric Motor) : তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর। একে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে; যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে। তড়িৎ মোটর দুই প্রকারের; যথা– (ক) ডিসি মোটর, (খ) এসি মোটর।

একটি তড়িৎ মোটর নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

i. **ক্ষেত্র চৌম্বক :** U আকৃতির একটি স্থায়ী বা তাড়িত চুম্বক এই যন্ত্রের ক্ষেত্রে চুম্বকের কাজ করে।

ii. **আর্মেচার :** কাঁচা লোহার মজ্জার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। আর্মেচার মূলত একটি আয়তকার কুণ্ডলী বা কয়েল।

iii. **কমুটেটর :** শক্ত তামার কতগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরিত করে কমুটেটর তৈরি করা হয়।

iv. **ব্রাস :** কার্বন অথবা তামা দ্বারা ব্রাস তৈরি করা হয়।

ট্রান্সফর্মারের সাথে তড়িৎ মোটরের পার্থক্য :

নিচে ট্রান্সফরমার ও তড়িৎ মোটরের মধ্যে পার্থক্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সফর্মার	তড়িৎ মোটর
১. সংজ্ঞা	যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভব এবং নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তাকে রূপান্তরক বা ট্রান্সফর্মার বলে।	যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে।
২. কার্যকরী নীতি	একটি কয়েলে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কয়েলে আবিষ্ট তড়িৎ চালক শক্তি বা তড়িৎ উৎপাদনের পরিচিতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস রয়েছে ট্রান্সফর্মারে।	তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর।

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সফর্মার	তড়িৎ মোটর
৩. প্রকারভেদ	ট্রান্সফর্মার সাধারণত দুই প্রকার– (i) উচ্চধাপী বা আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার (ii) নিম্নধাপী বা অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।	তড়িৎ মোটর দুই প্রকার–(i) ডিসি মোটর (ii) এসি মোটর
৪. মূল কাজ	দূরদূরান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।	ছোট ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।
৫. ব্যবহার	বাসা-বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।	বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিল ইত্যাদিতে তড়িৎ মোটর ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-১১৩. Direct Current এবং Alternating Current বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : Direct Current (সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ) : তড়িৎ প্রবাহ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় বা সময়ের সাথে যদি তড়িৎ প্রবাহের দিকের কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে সে প্রবাহকে Direct Current (D. C) বা সমপ্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ বলে। তড়িৎ কোষ থেকে আমরা একমুখী প্রবাহ পাই।

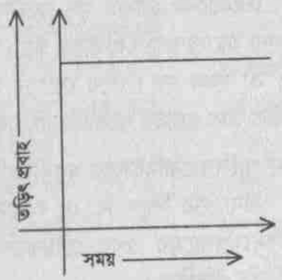

চিত্র : Direct Current

Alternating Current (পর্যাবৃত্ত বা পরিবর্তী প্রবাহ) : যে তড়িৎ প্রবাহ নির্দিষ্ট সময় পর পর দিক পরিবর্তন করে অর্থাৎ যে তড়িৎ প্রবাহের দিক পর্যাবৃত্তভাবে পরিবর্তিত হয় তাকে Alternating Current (A.C) বা পর্যাবৃত্ত প্রবাহ বা পরিবর্তী প্রবাহ বলে। আমাদের দেশে যে Alternating Current ব্যবহৃত হয় তা প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার দিক পরিবর্তন করে।

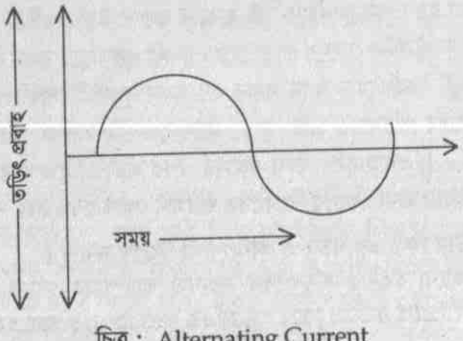

চিত্র : Alternating Current

ইলেকট্রিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, আইপিএস এবং ইউপিএস
Electrical instruments, voltage stablizers, IPS and UPS

○ প্রশ্ন-১১৪. ভোল্টমিটার কি? ভোল্টমিটার কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর যে কোনো দুই বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য সরাসরি ভোল্ট এককে পরিমাপ করা যায় তাকে ভোল্টমিটার বলে।

বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হবে ভোল্টমিটারকে সেই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। এ যন্ত্রে একটি চলকুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলী তলের সমকোণে একটি সূঁচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি ভোল্ট এককে দাগাঙ্কিত একটি স্কেলের ওপর ঘুরতে পারে। কুণ্ডলীর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে একটি উচ্চমানের রোধ সংযুক্ত থাকে। বর্তনীর যে দুই বিন্দুর বিভব পার্থক্য পরিমাপ করতে হয় ভোল্টমিটারটিকে সেই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়। যেহেতু ভোল্টমিটারটি বর্তনীর দুই বিন্দুর সাথে সমান্তরালে সংযুক্ত করতে হয়, প্রবাহ ভোল্টমিটারের মধ্য দিয়েও প্রবাহিত হয়, সুতরাং মূল প্রবাহের পরিবর্তন ঘটে। বর্তনীতে মূল প্রবাহের যাতে কোনো পরিবর্তন না হয় সেজন্য এর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে একটি উচ্চমানের রোধ যুক্ত করা হয়। এ উচ্চমানের রোধটি মূল বর্তনীর সাথে সমান্তরালে যুক্ত হওয়ায় ভোল্টমিটারের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত নগণ্য মানের তড়িৎ প্রবাহিত হয়। তাত্ত্বিকভাবে ভোল্টমিটারের রোধ অসীম হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। তবে রোধের মান যথাসম্ভব বেশি নেয়া হয়। ভোল্টমিটারকে একটি ভোল্টে দাগাঙ্কিত উচ্চ রোধের গ্যালভানোমিটার হিসেবে ধরা যায়।

○ প্রশ্ন-১১৫. গ্যালভানোমিটার কি? গ্যালভানোমিটারের মূলনীতি উল্লেখ করুন।

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো পরিবাহীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ পরিমাপ করা যায় তাকে গ্যালভানোমিটার বলে। বিদ্যুৎপ্রবাহের ওপর চৌম্বকক্ষেত্রের ক্রিয়া বা চুম্বকের ওপর বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্রিয়ার ওপর এর কার্যনীতি প্রতিষ্ঠিত।

গ্যালভানোমিটারের মূলনীতি : বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা পরিমাপক যন্ত্র অ্যামিটার (Ammeter) বা বিভব পার্থক্য পরিমাপক যন্ত্র ভোল্টমিটার (Voltmeter)-এর মূল যন্ত্রাংশ হলো গ্যালভানোমিটার। গ্যালভানোমিটারের মধ্যে অনেক পাঁকবিশিষ্ট একটি কুণ্ডলী স্থায়ী চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে বসানো থাকে। কুণ্ডলীর একটি শ্যাফট (shaft) বা দণ্ডের সাথে সংযুক্ত থাকে, যাতে দণ্ডের সাপেক্ষে কুণ্ডলীটি বাধাহীনভাবে ঘুরতে পারে। দণ্ডের সাথে একটি নির্দেশক কাঁটা ও একটি স্প্রিং যুক্ত থাকে। কুণ্ডলীতে যখন বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হয় তখন কুণ্ডলীতে সৃষ্ট ব্যবর্তন বল বা টর্ক কুণ্ডলীতে ঘূর্ণনের সৃষ্টি করে। কুণ্ডলী ঘুরলে এর সাথে সংযুক্ত কাঁটাটিও স্কেলের ওপর ঘুরে। কুণ্ডলী যখন ঘুরে তখন স্প্রিংয়ের মধ্যে বিপরীতমুখী টর্কের সৃষ্টি হয়। এ দুটি টর্কের মান যখন সমান হয় তখন কুণ্ডলীটি সাম্যাবস্থায় আসে। বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ যত বাড়ে টর্কের পরিমাণও তত বাড়ে, ফলে কুণ্ডলীটি অধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন মানের প্রমাণ (standard) প্রবাহমাত্রার জন্য স্কেলের ওপর কাঁটার বিক্ষেপ ক্রমাঙ্কিত করা থাকে। ফলে কোনো অজানা প্রবাহমাত্রার জন্য স্কেলের বিক্ষেপের পরিমাণ দেখে প্রবাহমাত্রা পরিমাপ করা যায়।

○ প্রশ্ন-১১৬. অ্যামিটার কি? এর গঠন ও কার্যপ্রণালী উল্লেখ করুন।

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায় তাকে অ্যামিটার বলে। অ্যামিটারকে বর্তনীর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে যুক্ত করা হয়।

এ যন্ত্রে একটি কুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র, যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এ গ্যালভানোমিটারের কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলীর তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার, মিলিঅ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের ওপর ঘুরতে থাকে। যেহেতু অ্যামিটারকে বর্তনীতে অনুক্রমিক সংযোগে যুক্ত করতে হয় তাই এর রোধ বর্তনীতে কার্যকর হয়, ফলে বর্তনীতে প্রবাহের মানের পরিবর্তন হতে পারে। এজন্য কুণ্ডলীর সাথে সমান্তরালে একটি অল্প মানের রোধ সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে অ্যামিটারের তুল্য রোধ খুব কমে যায় এবং এটি বর্তনীতে সংযুক্ত করলে বর্তনীর প্রবাহের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

অ্যামিটার একটি সমান্তরালে অল্পমানের রোধ সংযুক্ত অ্যাম্পিয়ারে দাগাঙ্কিত গ্যালভানোমিটার।

○ প্রশ্ন-১১৭. অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

উত্তর : অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ:

অ্যামিটার	ভোল্টমিটার
১. কোনো বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা সরাসরি (অ্যাম্পিয়ারে) পরিমাপ করার যন্ত্রকে অ্যামিটার বলে।	১. কোনো বর্তনীর দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব বৈষম্য সরাসরি (ভোল্টে) পরিমাপ করার যন্ত্রকে ভোল্টমিটার বলে।
২. অ্যামিটার একটি কম রোধবিশিষ্ট চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার। একটি চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের সাথে নিম্নমানের রোধ সমান্তরালে যুক্ত করে এটি তৈরি।	২. ভোল্টমিটার একটি উচ্চ রোধবিশিষ্ট চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার। একটি চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের সাথে উচ্চমানের রোধ শ্রেণীতে যুক্ত করে এটি তৈরি।
৩. যে বর্তনীর বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা নির্ণয় করতে হবে তার সাথে তাকে সিরিজ সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।	৩. বর্তনীর যে দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব বৈষম্য নির্ণয় করতে হবে ঐ দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের সাপেক্ষে একে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।
৪. অ্যামিটারের কার্যকর রোধ নিম্নমানের বলে কোনো বর্তনীর সাথে তাকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করলে বর্তনীর মূল বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটে না ধরা যায়।	৪. ভোল্টমিটারের কার্যকর রোধ খুব বেশি বলে একটি বর্তনীর কোনো অংশের সাপেক্ষে তাকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে ঐ অংশের বিভব বৈষম্যের কোনো পরিবর্তন হয় না ধরা যায়।

প্রশ্ন-১১৮. মাল্টিমিটার কি? মাল্টিমিটারের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : মাল্টিমিটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র, যার সাহায্যে রোধ, কারেন্ট এবং ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায়। এর সাহায্যে এসি এবং ডিসি উভয় ধরনের কারেন্ট এবং ভোল্টেজ মাপা যায়। একে AVO মিটারও বলা হয়। AVO তিনটি শব্দের [A = Ampere, V = Volt, O = Ohm] সংক্ষিপ্ত নাম। মাল্টিমিটার এনালগ এবং ডিজিটাল উভয় ধরনের পাওয়া যায়।

মাল্টিমিটারের ব্যবহার :

ক. **ভোল্টমিটার হিসেবে মাল্টিমিটারের ব্যবহার :** যখন একটি উচ্চ মানের রোধ গ্যালভানোমিটারের সাথে সিরিজে সংযুক্ত করা হয়, তখন মাল্টিমিটার ভোল্টমিটার হিসেবে কাজ করে। সর্বোচ্চ সঠিক মান পরিমাপ করার জন্য মাল্টিমিটার অনেকগুলো রেঞ্জে বা পাল্লায় বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন মানের উচ্চ রোধ গ্যালভানোমিটারের সাথে সংযুক্ত করার ব্যবস্থা থাকে। প্রতিটি রোধ একটি রেঞ্জ নির্দেশ করে। ঐ রেঞ্জে মাল্টিমিটারের সিলেক্টর সুইচ স্থাপন করলে সংশ্লিষ্ট রোধটি বর্তনীতে যুক্ত হয়। মাল্টিমিটার

দ্বারা এসি এবং ডিসি উভয় ধরনের ভোল্টেজ পরিমাপ করা যায়। সিলেক্টর সুইচটি ঘুরিয়ে এসি বা ডিসি মাপার অংশে স্থাপন করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রয়োজনীয় বর্তনীর সংযোগ স্থাপিত হয়।

খ. **অ্যামিটার হিসেবে মাল্টিমিটারের ব্যবহার :** একটি স্বল্পমানের রোধ যখন গ্যালভানোমিটারের সাথে সমান্তরাল বর্তনী সংযোগ দেয়া হয় তখন এটি অ্যামিটার হিসেবে কাজ করে। মাল্টিমিটারে কারেন্ট মাপার জন্য প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলো স্বল্পমানের রোধের সমান্তরাল সংযোগ ব্যবস্থা থাকে। সিলেক্টর সুইচের সাহায্যে এদের যে কোনো একটির সাথে সংযোগ দেয়া যায় এবং মাল্টিমিটার তখন ঐ রেঞ্জের কারেন্ট মাপতে পারে।
মাল্টিমিটার এসি এবং ডিসি উভয় ধরনের কারেন্ট পরিমাপ করতে পারে। এর জন্য সিলেক্টর সুইচ ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট অংশে স্থাপন করলে প্রয়োজনীয় বর্তনী গ্যালভানোমিটারের সাথে সংযুক্ত হয়।

গ. **ওহম মিটার হিসেবে মাল্টিমিটারের ব্যবহার :** পরিবাহীর রোধ মাপার যন্ত্রকে বলা হয় ওহম মিটার। মাল্টিমিটারকে ওহম মিটার হিসেবে ব্যবহারের সময় সংযোগ দিতে হয়। লক্ষণীয় যে, ভোল্টমিটার বা অ্যামিটার হিসেবে ব্যবহারের সময় মাল্টিমিটারে কোনো অভ্যন্তরীণ ব্যাটারির প্রয়োজন হয় না, কিন্তু এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়।

○ প্রশ্ন-১১৯. ডিজিটাল মাল্টিমিটারের সুবিধাবলী উল্লেখ করুন।

উত্তর : i. এনালগ মাল্টিমিটারের তুলনায় ডিজিটাল মাল্টিমিটার আকারে ছোট এবং হালকা। ফলে সহজেই বহনযোগ্য।

ii. খুব দ্রুত পরিমাপ করতে পারে।

iii. সংখ্যা দ্বারা কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রোধ নির্দেশ করে বিধায় দ্রুত এবং সঠিক পাঠ নেয়া যায়।

iv. তুলনামূলক নির্ভুল মান নির্দেশ করে।

v. এনালগ মিটারে কাঁটার অবস্থান দেখতে অনেক সময় ব্যক্তিগত ত্রুটি থাকে, যা ডিজিটাল মিটারে থাকে না।

○ প্রশ্ন-১২০. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার কি? বিভিন্ন প্রকার ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজারের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

উত্তর : ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার হচ্ছে এমন এক ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যা বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের পরিবর্তনকে বাধা প্রদান করে। যেমন– সর্ট সার্কিটের ফলে অত্যধিক প্রবাহ, বিদ্যুৎ লোড শেডিংয়ের এর সময় এর প্রবাহের পরিবর্তন ইত্যাদি। অর্থাৎ এ প্রকার বৈদ্যুতিক পরিবর্তনকে স্ট্যাবল করে। স্ট্যাবিলাইজার বিদ্যুৎ প্রবাহকে গ্রহণযোগ্য করে গ্রাহককে নিরাপত্তার সাথে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিশ্চয়তা দেয়।

Stabilizer-কে অন্য কথায় Protection Device'ও বলা যায়। এতে এক প্রকার রিলে কাজ করে, যা একটি নির্দিষ্ট Voltage-এ নির্দিষ্ট থাকে। ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ঐ নির্দিষ্ট Voltage-এর অতিরিক্ত প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নির্ধারিত মানের Voltage Supply দেয়। যদি Stabilizer-এর ক্ষমতার অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ হয় এবং যা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির জন্য বিপজ্জনক। এ অবস্থায় Stabilizer-এর অভ্যন্তরীণ ফিউজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিকে রক্ষা করে।

প্রকারভেদ : ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার সাধারণত দু রকমের হয়। যথা : (i) লিনিয়ার রেগুলেটর ও (ii) সুইসিং রেগুলেটর।

(i) লিনিয়ার রেগুলেটরের সুবিধাসমূহ :

ক. সরল
খ. আউটপুটে ভোল্টেজ প্রবাহ কম হয়।
গ. লোড রেগুলেশন ও লাইন খুবই ভালো।
ঘ. লোড ও লাইন চেঞ্জ দ্রুত রেসপন্স করে।
ঙ. কম নয়েস (noise) তৈরি করে।

লিনিয়ার রেগুলেটরের অসুবিধাসমূহ :

ক. ইফিসিয়েন্সি কম।
খ. হিট সিঙ্ক (Heat Sink) প্রয়োজন হলে বেশি জায়গার দরকার।
গ. ইনপুটের চেয়ে ভোল্টেজ বাড়াতে পারে না।

(ii) সুইসিং রেগুলেটরের সুবিধাসমূহ :

ক. ইফিসিয়েন্সি বেশি।
খ. হাই পাওয়ার ডেনসিটিজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
গ. ইনপুট ভোল্টেজের চেয়ে ভোল্টেজ চাহিদা অনুযায়ী কমাতে বা বাড়াতে পারে।

সুইসিং রেগুলেটরের অসুবিধাসমূহ :

ক. আউটপুটে বেশি ভোল্টেজ প্রবাহ।
খ. Transien Recovery সময় খুব কম।
গ. বেশি Noise তৈরি করে।
ঘ. বেশি দামি।

○ প্রশ্ন-১২১. ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে?

উত্তর : স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা কত লোড গ্রহণ করতে পারবে। স্ট্যাবিলাইজারের ক্ষমতা সাধারণত ভোল্টঅ্যাম্পিয়ার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন লোডের স্ট্যাবিলাইজার বাজারে পাওয়া যায়। ব্যবহারিক যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে কি ধরনের স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে। বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষমতা বা VA নির্ধারণ করে স্ট্যাবিলাইজার ক্রয় করতে হবে। একটি সাধারণ কম্পিউটার ও প্রিন্টারের জন্য 500VA বা 600VA স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহার করতে হবে। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ব্যবহৃত লোড যাতে স্ট্যাবিলাইজারের গ্রহণযোগ্য লোডের বেশি হয় না। সাধারণত কম্পিউটার, ফ্রিজ, টেলিভিশন, PABX ইত্যাদিকে বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষার জন্য স্ট্যাবিলাইজার ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-১২২. ইউপিএস কি? এটি কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : ইউপিএস হলো এক বিশেষ ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই, যা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এর পূর্ণ নাম Uninterruptible Power Supply. আমাদের দেশে বিদ্যুৎ কখন যায়, কখন আসে এর কোনো নিয়মনীতি নেই। হয়তো দিনভর অনেক কাজ কম্পিউটারে জমা হয়েছে। ভুলবশত সেগুলো সেভ করা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে তখন সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে বা মুছে যাবে। এতে করে সারা দিনের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এ কাজগুলো পুনরায় করতে হবে। এ অসুবিধা দূর করা এবং আকস্মিক বিদ্যুৎ বন্ধের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য ইউপিএস বা আনইন্টারাপটেবল পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ইউপিএস-এর ব্যাটারি বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। ফলে হঠাৎ করে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন ইউপিএস সাধারণত এক থেকে দুই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ব্যাটারির সঞ্চিত বিদ্যুৎ থেকে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। প্রকারভেদে ইউপিএস দশ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। ইউপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে র‍্যামের ডাটার ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

○ প্রশ্ন-১২৩. ইউপিএস ব্যবহারের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

উত্তর : ইউপিএস ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় –

i. ইউপিএস পুরোপুরি কতটা বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ করতে পারে। এটাকে Wattage Capacity বলে। Wattage Capacity-এর সাথে আরেকটা জিনিস জড়িত। সেটা হচ্ছে Power fector, যা সাধারণত ১ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব নয়। তবে এটা যেন ০.৮-এর নিচে না যায়। কোনো কোনো ইউপিএস-এর পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৬-এর নিচে নেমে যায়। এটা সুলক্ষণ নয়।

ii. কত তাড়াতাড়ি Change Over করতে পারে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবার পর কত তাড়াতাড়ি সে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। এটা যেন দুই থেকে চার মিলি সেকেন্ডের বেশি না হয়।

iii. বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হবার পর কতক্ষণ পর্যন্ত সে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে। সাধারণত চাহিদার ওপর ভিত্তি করে ১০-৩০ মিনিট, এমনকি কোনো কোনো ইউপিএস ৪৫ মিনিট পর্যন্ত কাজ চালাতে পারে। এখানে Full load, Half load বলে দুটি কথা আছে। Full load বলতে ইউপিএস-এর ধারণ ক্ষমতা সমান বোঝায়। তবে অবশ্যই একটা ইউপিএস-এর ধারণ ক্ষমতার ৮০%-এর বেশি লোড দেয়া উচিত নয়।

iv. ইউপিএস-এর সাথে অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর (AVR) কিংবা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার আছে কিনা। কোনো অবস্থাতেই অটো ভোল্টেজ রেগুলেটর (AVR) বা স্ট্যাবিলাইজার ছাড়া ইউপিএস কেনা উচিত নয়। কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহের উঠানামা ইউপিএস ও কম্পিউটারের মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে।

○ প্রশ্ন-১২৪. ইউপিএস-এর ক্ষতি এড়িয়ে স্থায়িত্ব বাড়ানো যায় কিভাবে?

উত্তর : কম্পিউটার কক্ষে এসে Main Line ও UPS চালু করে কাজ করে বেরুনোর সময় UPS ও Main line বন্ধ করে চলে গেলে UPS-এর কিছু ক্ষতি হয়। এর ক্ষতিটা তাৎক্ষণিক নয়, অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। প্রতিদিন এভাবে ইউপিএস চালালে এর ব্যাটারি ভালোভাবে চার্জ নেয়ার সময় হয় না। এটা ঠিক যখন বিদ্যুৎ প্রবাহ থাকে তখন UPS-এর ভেতরে Charger চালাতে থাকে। আর ব্যাটারিকে চার্জ দেয়। তবুও No-Load-এ UPSকে অন্তত দু ঘণ্টা চার্জে রাখা খুবই ভালো, না থাকলে দু বছর পর দেখা যাবে ব্যাটারি ফেলে দিতে হচ্ছে, না হয় Inverter বোর্ড জ্বলে গেছে, অথবা ঘন ঘন Fuese কেটে যাচ্ছে। ইত্যাদি।

একটা অভ্যাস করতে পারলে ভালো হবে তা হলো কম্পিউটার অন করার বেশ কিছু সময় পূর্বে মেইন লাইন আর UPS অন করতে হবে যাতে No-Load-এ UPS অন্তত কিছুক্ষণ চার্জ হতে পারে। আবার মেশিনটা আগে বন্ধ করে বেশ কিছুক্ষণ পর UPS ও মেইন লাইন বন্ধ করতে হবে। এতে UPS-এর স্থায়িত্ব দীর্ঘদিন হবে।

○ প্রশ্ন-১২৫. IPS কি? এ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

উত্তর : IPS-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো Instant Power System। যা মূলত Power Storage হিসেবে কাজ করে থাকে। IPS এমন একটি Device যা বৈদ্যুতিক Power রিজার্ভ করে এবং পরবর্তীতে Main line বা বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্ধে Back up দেয়। UPS-এর মতো IPS বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধের সাথে সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে পারে না। 1/10 Sec পরে সরবরাহ Automatically প্রদান করে থাকে। UPS অল্প সময়ের জন্য Back up দিয়ে থাকে কিন্তু UPS এর তুলনায় IPS বহুগুণ Back up দিয়ে থাকে। তাই IPS বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালনায় বেশি জনপ্রিয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্র : IPS মূলত যেসব ক্ষেত্রে বেশি সময় বৈদ্যুতিক সরবরাহের প্রয়োজন হয় সেখানেই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় লোডশেডিংয়ের ফলে বাসা বাড়ির টিভি, ভিসিপি, ফ্যান, ফ্রিজ প্রভৃতি বেশি সময় চালনার কাজে IPS বেশ জনপ্রিয়। Computer পরিচালনায় IPS ব্যবহার করা যাবে তবে সে ক্ষেত্রে UPSও ব্যবহার করতে হবে, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ Continue থাকে। এর ফলে কোনো বড় কাজ (প্রায় ২ ঘণ্টা) Computer এ করা সম্ভব হবে অথবা কোনো কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে Save করতে IPS ও UPS ব্যবহার করা খুবই কার্যকর।

অধ্যায় ০২

ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি
Electronics Technology

Syllabus— Electronic Technology : *Electronic components, analog and digital signals, analog electronic device, amplifirs and oscillators, resistance, types of resistors, conductance, ohmmeters capacitance, capacitors, Inductors, Inductance, Sinusoidal Alternating waveforms, Frequency spectrum, The sinusoidal waveform, General format for the sinusoidal voltage of current, phase relations, The Basic Elements and Phasors, Respons of Basic R, L and C. Elements to a sinusoidal voltage of current. Frequency response of the Basic Elements, Average power and power factor, complex numbers, Rectangular Form, Polar form, conversion between forms, Impedance and the phasor Diagram, Introduction to 3 phase systems, Elementary concepts of generation, Transmission, and Distribution, Various Levels of power, Basic concepts of transformers, radio television and radar, digital devices and digital integrated circuits. impact of digital integrated circuits, counters and digital display devices, digital instruments.*

২.১

ইলেকট্রনিক্স উপাদানসমূহ, অ্যানালগ ও ডিজিটাল সংকেত, অ্যানালগ তড়িৎ কৌশল, বিবর্ধক এবং দোলক, রোধ, রোধের প্রকারভেদ, পরিবাহিতা, ওহমমিটার, ধারকত্ব, ধারক, আবেশক ও আবেশ

Electronic components, analog and digital signals, analog electronic devices, amplifiers and oscillators, resistance, types of resistor, conductance, ohmmeters, capacitance, capacitors, Inductors, Inductance.

ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট, অ্যানালগ-ডিজিটাল, অ্যামপ্লিফায়ার ও অসিলেটর
Electronic Component, analog-digital, amplifirs and oscillators

○ প্রশ্ন-১. ইলেকট্রনিক্স কি?

উত্তর : প্রতিটি মৌলিক পদার্থ অসংখ্য ছোট ছোট কণা দিয়ে তৈরি। কোনো পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে বলা হয় পরমাণু। পরমাণু ভাঙলে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ইলেকট্রন নেগেটিভ বা ঋণাত্মক চার্জযুক্ত, প্রোটন পজেটিভ বা ধনাত্মক চার্জ আর নিউট্রনের কোনো চার্জ বা তড়িৎ আধান নেই। প্রোটন ও নিউট্রন থাকে পরমাণুর কেন্দ্রে আর ইলেকট্রন তাদের ঘিরে কক্ষপথে পাক খায়।

বিদ্যুৎপ্রবাহ মানেই অসংখ্য ইলেকট্রনের প্রবাহ। কঠিন মাধ্যমে যেমন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়, তেমনি শূন্য বা গ্যাস মাধ্যমেও বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে। এ ছাড়া অর্ধপরিবাহী বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও কোনো কোনো শর্ত পূরণ করলে বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে শাখা শূন্য মাধ্যম, গ্যাস মাধ্যম বা অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রনের প্রবাহ এবং গতি-প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করে, তাকেই বলে ইলেকট্রনিক্স। এই শাখায় ইলেকট্রনের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহ সৃষ্টি করে তৈরি করা হয় বিশেষ ধরনের বর্তনী, যাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক বর্তনী বা সার্কিট। নানা জটিল ইলেকট্রনিক বর্তনী কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-২. মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স কাকে বলে?

উত্তর : ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি যতই উন্নত হচ্ছে ততই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র মাপে ছোট হচ্ছে। যেমন প্রথম ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটারের মাপ ছিল প্রায় ৩০ মিটার লম্বা, ৩ মিটার উঁচু এবং ১ মিটার পুরু। আর এখন কম্পিউটার শুধু টেবিলের ওপরেই বসানো থাকে না ল্যাপটপ কম্পিউটারকে নিজের কোলে বসানো যায়। এর কারণ, অর্ধপরিবাহী দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, যেমন— ট্রানজিস্টর, ডায়োড ইত্যাদি ক্রমেই মাপে ছোট হচ্ছে। মাপে ছোট করার এই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চার এই শাখাকে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স বলে।

উদাহরণ হিসেবে একটি মাইক্রো ট্রানজিস্টরের কথা বলা যেতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি এই ট্রানজিস্টরের মাপ ০.৮ মি. মি. বাই ০.৮ মি. মি.। আর তার বেধ ৪ মিলিমিটারের প্রায় এক কোটি ভাগের এক ভাগ। এ রকম ৫০ ট্রানজিস্টরকে যদি একটির ওপরে আরেকটি রাখা যায় তাহলে হয়তো খবরের কাগজের একটা পাতার মতো পুরু হবে।

○ প্রশ্ন-৩. অ্যানালগ ও ডিজিটাল সিগ্যনাল বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : অ্যানালগ সিগনাল : এটা এমন এক ধরনের সাংকেতিক প্রক্রিয়া, একটানা চলমান পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ যা কোনো মাধ্যমে বিচরণে সক্ষম। এটি সাইনুসোইডাল বা ননসাইনুসোইডাল হতে পারে এবং এর মান একটি সর্বনিম্ন মান থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মান পর্যন্ত যে কোনো মান হতে পারে। সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মানের মধ্যবর্তী যে কোনো মানের জন্য বহির্গামীতে একটি সিগনাল পাওয়া যাবে।

ডিজিটাল সিগনাল : এটা এমন এক ধরনের থেকে থেমে যাওয়া সংকেত যা বৈদ্যুতিক সংকেত 'On' এবং 'Off'-এর মত কাজ করে। ডিজিটাল সিগনাল কেবল ০ এবং 1 নিয়ে কাজ করে অর্থাৎ অন্তর্গামীতে ০ কিংবা ১ এর জন্য বহির্গামীতে একটি সিগনাল পাওয়া যাবে।

○ প্রশ্ন-৪. অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তর প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন।

উত্তর : অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তনে কোয়ান্টাইজিং প্রক্রিয়া জড়িত। কোয়ান্টাইকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অ্যানালগ সংকেতের ব্যপ্তিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা এবং মূল সংকেত কোন স্তরে পড়ে তা খুঁজে বের করা। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকেতকে কতভাগে ভাগ করা হবে তা ফোরিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করতে হবে। এর পরবর্তী প্রক্রিয়া হচ্ছে অ্যাবকেডিং যা কোয়ান্টাইজকৃত স্তরকে ডিজিট্যাল মান প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি কোয়ান্টাইজকৃত স্তরের জন্য নির্দিষ্ট ডিজিট্যাল কোড দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিচিত সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে বাইনারি পদ্ধতি। এছাড়াও অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতিতেও করা হয়– যেমন হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি।

○ প্রশ্ন-৫. ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ রূপান্তর কিভাবে হয়?

উত্তর : ডিজিটাল পদ্ধতিতে মান নির্দেশ করার জন্য ডিজিটাল কোড ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ডিজিটাল গ্রহণ অবস্থার জন্য একটি করে অ্যানালগ মান থাকে। গ্রহণ সংকেতে প্রতিটি বিটের অবস্থানের উপর নির্ভর করে বিটটির স্থানিক মান বা ওজন নির্ধারণ করা হয়। ফলাফল প্রদান/প্রদর্শনের জন্য অধিকাংশ পরিবর্তকসমূহের মৌলিক বর্তনী একটি ভোল্টেজ প্রতিরোধযোগ্য ক্রমোন্নতি নেটওয়ার্ক (Ladder Network) যা ভারযুক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্গত করে।

○ প্রশ্ন-৬. অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস কি?

উত্তর : যেসব ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস অ্যানালগ সিগন্যাল ব্যবহার করে, মাধ্যমে চলে, কাজ করে সেগুলোই অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস। যেমন– অ্যানালগ কম্পিউটার, অটোমাবাইল, স্পিডোমিটার, অ্যানালগ টেলিফোন, টেলিভিশন ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-৭. এ/ডি কনভের্টার কি?

উত্তর : এ/ডি কনভের্টার এমন এক ধরনের যন্ত্র, যা অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিট্যাল সংকেতে পরিবর্তন করে এবং পরিবর্তিত ডিজিট্যাল সংকেত পূর্বের অ্যানালগ সংকেতের সকল গুণাগুণ বহন করবে।

অ্যানালগ থেকে ডিজিট্যাল সংকেতে পরিবর্তন কয়েকভাবে হতে পারে :

১. কম্পিউটার অথবা যুক্তি বর্তনীর (Logic Circuit) মাধ্যমে
২. পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সঞ্চিত রাখা
৩. আঙ্কিক অথবা লেখচিত্র চিত্রিত করে

○ প্রশ্ন-৮. সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী কি?

উত্তর : যে বস্তুর পরিবাহিতা (Conductivity) পরিবাহী (Conductor) এবং অপরিবাহী (insulator) বস্তুর মাঝামাঝি তাকে অর্ধপরিবাহী বস্তু বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। সাধারণ অবস্থায় এদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এরা পরিবাহী।

○ প্রশ্ন-৯. সেমিকন্ডাক্টর কত প্রকার ও কি কি বর্ণনা করুন।

উত্তর : অর্ধপরিবাহী পদার্থকে দু ভাগে ভাগ করা যায় : ১. সহজাত বা বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী, ২. বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী।

বিশুদ্ধ বা সহজাত অর্ধপরিবাহী : যেসব অর্ধপরিবাহীতে ইলেকট্রন ও হোলের সংখ্যা সমান থাকে সেগুলোকে বিশুদ্ধ বা সহজাত অর্ধপরিবাহী বলে। এসব অর্ধপরিবাহীতে কোনো ভেজাল থাকে না।

বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহী : বহিঃজাত বা অবিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে বাহক আধানের ভিন্নতা অনুসারে আবার দু ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ক. n টাইপ অর্ধপরিবাহী এবং খ. p টাইপ অর্ধপরিবাহী।

n টাইপ অর্ধপরিবাহী : বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে খুব সামান্য পরিমানে পঞ্চযোজী মৌল মিশ্রিত করে যে অর্ধপরিবাহী পাওয়া যায় তাকে n টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

P টাইপ অর্ধপরিবাহী : বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে খুব সামান্য পরিমাণে ত্রিযোজী মৌল মিশ্রিত করে যে অর্ধপরিবাহী তৈরি হয় তাই p টাইপ অর্ধপরিবাহী। এসব পদার্থে তড়িৎ পরিবহনে ধনাত্মক 'হোল' মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

○ প্রশ্ন-১০. তাপমাত্রা বৃদ্ধি করলে অর্ধপরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধি পায় কেন?

উত্তর : সাধারণত তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্ধপরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ কমে যায়। অর্ধপরিবাহীর ইলেকট্রন ধাতুর ইলেকট্রন অপেক্ষা বেশি দৃঢ়ভাবে এবং অধাতুর ইলেকট্রনের চেয়ে কম দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। অর্ধপরিবাহীর তাপমাত্রা বাড়ালে এসব ইলেকট্রন কাঁপতে থাকে। ফলে এদের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায় বা মুক্ত হয়। এ কারণে রোধ কমে যায় এবং সে কারণে অর্ধপরিবাহীর তাপ পরিবাহকত্ব বাড়ে।

○ প্রশ্ন-১১. ট্রায়োড ভালভ কি?

উত্তর : তিনটি ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার বিশিষ্ট ভালভকে ট্রায়োড ভালভ বলা হয়। ট্রায়োড ভালভের তিনটি তড়িৎদ্বার হচ্ছে ক্যাথোড, প্লেট ও গ্রীড। ট্রায়োড ভালভের ফিলামেন্ট সাধারণত থোরিয়েটেড টাংস্টেন বা প্লাটিনাম অক্সাইড প্রলেপ দিয়ে তৈরি। ফলে সামান্য তাপে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়।

○ প্রশ্ন-১২. পরিবাহক, অন্তরক ও অর্ধপরিবাহীর মধ্যে তড়িৎ পরিবাহিতার দিক দিয়ে পার্থক্য নির্দেশ করুন।

উত্তর :

পরিবাহক	অন্তরক	অর্ধপরিবাহী
১. যেসব পদার্থে সহজেই বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে তাকে পরিবাহক বলে।	১. যেসব পদার্থের মধ্যে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না তাকে অন্তরক বলে।	১. যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে আংশিক বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে তাকে অর্ধপরিবাহী বলে।
২. এর কোনো অংশে তড়িৎ সঞ্চিত হলে সব অংশে তড়িৎ ছড়িয়ে পড়ে।	২. এর কোনো অংশ তড়িৎ সঞ্চিত হলে ঐ অংশেই আবদ্ধ থাকে।	২. অতি নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না।
৩. পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ কম, প্রায় $10^{-8}\Omega m$	৩. অন্তরকের আপেক্ষিক রোধ বেশি, $10^{11}\Omega m$	৩. অর্ধপরিবাহীর রোধ $10^{-4}\Omega m$ প্রায়।
৪. তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সকল পরিবাহকের আপেক্ষিক রোধ বৃদ্ধি পায়।	৪. অতি উচ্চ তাপমাত্রায় এর আপেক্ষিক রোধ হ্রাস পায়, তখন এটি অর্ধপরিবাহী বস্তুর মতো আচরণ করে।	৪. এর বৈশিষ্ট্য হলো তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর আপেক্ষিক রোধ কমতে থাকে।
৫. পরিবাহীতে মুক্ত ইলেকট্রন সহজে চলতে পারে।	৫. চলাচল করতে পারে না বা বাইরে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে না।	৫. কি পরিমাণ ইলেকট্রন প্রবাহিত হবে তা ঐ পদার্থের ভেজালের উপর নির্ভরশীল।

○ প্রশ্ন-১৩. গাইগার-মুলার কাউন্টার কি?

উত্তর : গাইগার-মুলার কাউন্টার বা জিএম (GM) কাউন্টার সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় বিকিরণ ডিটেকটর (radiation detector)। এই কাউন্টার উচ্চলাভ বিবর্ধক (high gain amplifier) ছাড়াই আলফা, বিটা, গামা ও এক্স-রে বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে। গাইগার-মুলার কাউন্টারে একটি ধাতব নল থাকে এবং এই নলের অক্ষ বরাবর ঢুকানো হয় একটি সূক্ষ্ম তার। সূক্ষ্ম তারের দু'প্রান্ত নল থেকে অন্তরীত থাকে। এই নলের ভিতর অতি সহজে আয়নিত হতে পারে এমন কোনো গ্যাস বা গ্যাসের মিশ্রণ এবং এর সাথে মিশ্রিত খুব অল্প অনুপাতে নিবৃত্তি বাষ্প (quencing vapour) থাকে। ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত চোঙ্গাকৃতি নলটি সাধারণত এক সেন্টিমিটার থেকে দুই সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় সূক্ষ্ম তারটি অ্যানোড হিসেবে কাজ করে এবং উচ্চ বিভব পার্থক্য সম্পন্ন ব্যাটারির সাহায্যে তারকে ধনাত্মক বিভব এবং নলটিকে ঋণাত্মক বিভব দেয়া হয়।

○ প্রশ্ন-১৪. Energy Band বা শক্তি ব্যান্ড কি?

উত্তর : একটি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর বিভিন্ন কক্ষপথের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তর কেলাসের কোটি কোটি ঘন সংঘবদ্ধ শক্তিস্তরের রূপ নেয়। অর্থাৎ বোর (Bohr) পরমাণুর এককেটি শক্তিস্তর এককেটি ব্যান্ড বা পাল্লার রূপ নেয়, একেই শক্তি ব্যান্ড বলে।

○ প্রশ্ন-১৫. Valence band বা যোজন ব্যান্ড ও Conduction band বা পরিবহন ব্যান্ড কি?

উত্তর : যোজন ব্যান্ড : পরমাণুর যোজন ইলেকট্রনগুলোর দরুন যে শক্তি ব্যান্ড তৈরি হয় তাকে যোজন ব্যান্ড বলে।
পরিবহন ব্যান্ড : পরমাণুর মুক্ত ইলেকট্রনগুলোর জন্য যে ব্যান্ড বা পাল্লা তৈরি হয় তাকে পরিবহন ব্যান্ড বলে। পরিবহন ব্যান্ডের ইলেক্ট্রনগুলো বিদ্যুৎ পরিবহনে অংশগ্রহণ করে।

○ প্রশ্ন-১৬. নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান বা ফাঁক কি?

উত্তর : পরিবহন ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে যেখানে ইলেকট্রন থাকতে পারে না তাকে নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান বা নিষিদ্ধ ফাঁক বলে।

○ প্রশ্ন-১৭. জাংশন ডায়োড কি?

উত্তর : একটি p টাইপ এবং একটি n টাইপ অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে সংযুক্ত করলে সংযোগ পৃষ্ঠকে p-n জাংশন বা জাংশন ডায়োড বলে। জাংশন ডায়োডে একমুখী তড়িৎ প্রবাহ ঘটে।

○ প্রশ্ন-১৮. সম্মুখ ঝোঁক ও বিপরীত ঝোঁক কাকে বলে?

উত্তর : সম্মুখ ঝোঁক : যখন জাংশনে এমনভাবে বাহ্য ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় যাতে জাংশনের বিভব প্রাচীর হ্রাস করে তড়িৎ প্রবাহ চালু করে তখন একে সম্মুখ ঝোঁক প্রয়োগ বলে।
বিপরীত ঝোঁক : যদি এমন হয় যে বিভব প্রাচীরের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তখন একে বিপরীত ঝোঁক প্রয়োগ বলে।

○ প্রশ্ন-১৯. p-n জাংশন কি? একে p-n জাংশন ডায়োড বলা হয় কেন?

উত্তর : একটি p টাইপ ও একটি n টাইপ অর্ধপরিবাহী কেলাসকে পাশাপাশি জোড়া লাগালে তাদের মধ্যবর্তী অন্তঃস্তরকে p-n জংশন বলে।
p-টাইপ সিলিকন + n-টাইপ সিলিকন = p-n জাংশন

p-n জংশন ডায়োড বলার কারণ : ডায়োড এক ধরনের ইলেকট্রনিক ক্ষুদ্র বস্তু যা তড়িৎ প্রবাহকে একমুখী করে। p-n জাংশনে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে তা ইলেকট্রনকে এক অভিমুখে প্রবাহের অনুমতি দেয়। তাই p-n জাংশনকে ডায়োড বলা হয়।

○ প্রশ্ন-২০. রেকটিফায়ার কাকে বলে?

উত্তর : দ্বিতড়িৎদ্বার বা সংক্ষেপে ডায়োডকে রেকটিফায়ার বলা হয়। একটি p- টাইপ সিলিকন এবং n টাইপ সিলিকন পাশাপাশি সংযোগে p-n জংশন করা হয়। এ p-n জাংশন ডায়োডকে রেকটিফায়ার বলে। এর কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহকে একমুখীকরণ। বিভিন্ন ধরনের রেকটিফায়ারের মধ্যে অর্ধ তরঙ্গ রেকটিফায়ার (Half wave rectifier) এবং পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার (Full wave rectifier) উল্লেখযোগ্য।

○ প্রশ্ন-২১. p-n জাংশন ডায়োড কিভাবে রেকটিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় বর্ণনা করুন।

উত্তর : রেকটিফায়ার হিসেবে p-n জাংশন

ক. **সম্মুখী প্রবাহ ও সম্মুখী ঝোঁক :** p-n জাংশনে যদি কোনো বহিঃস্থ ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ব্যাটারি বা সেলের ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপ বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ইলেকট্রনগুলোকে বামে অর্থাৎ p-টাইপ বস্তুর দিকে এবং ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত হোলগুলোকে ডানে অর্থাৎ n-টাইপ বস্তুর দিকে টানবে। ফলে p-n জাংশন ও বহিঃস্থ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ চলবে। এ প্রবাহকে বলা হয় সম্মুখী প্রবাহ। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় সম্মুখী ঝোঁক।

খ. **বিমুখী ঝোঁক :** ভোল্টেজ যদি বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যদি n-টাইপ এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যদি p-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে n-টাইপ বস্তুর মুক্ত ইলেকট্রন ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের আকর্ষণের ফলে n-টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে; p-n জাংশন পার হয়ে p-টাইপ বস্তুতে যেতে পারবে না। p-টাইপ বস্তুর হোলও p-টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে। এতে জাংশন দিয়ে কোন তড়িৎ প্রবাহ চলবে না। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় বিমুখী ঝোঁক।

উপরিউক্ত ঘটনা থেকে বোঝা যায়, ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে p-n জাংশন ডায়োড শুধু ইলেকট্রন এক অভিমুখে প্রবাহের অনুমতি দেয়। অর্থাৎ এ জাংশনে ইলেকট্রনের একমুখী প্রবাহ এটি। এভাবে এটি রেকটিফায়ার হিসেবে কাজ করে।

○ প্রশ্ন-২২. ট্রানজিস্টর ও অ্যামপ্লিফায়ার কাকে বলে?

উত্তর : দুই ধরনের অর্ধপরিবাহী দিয়ে গঠিত ইলেকট্রনিক যন্ত্র হচ্ছে ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টরে একই অর্ধপরিবাহীর দুটি স্তরের মাঝখানে অপর একটি অর্ধপরিবাহী বস্তুর স্তর স্থাপন করা হয়। যদি দুটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে একটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহী বসানো হয় তবে তাকে n-p-n ট্রানজিস্টর বলে। একইভাবে দুটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহী বসালে p-n-p ট্রানজিস্টর তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক সংকেতকে নিয়ন্ত্রিত ও বিস্তারিত করার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট ইত্যাদিতে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয়।

অ্যামপ্লিফায়ার : অ্যামপ্লিফাই (Amplify) শব্দটির অর্থ বিবর্ধন। যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (Input-এর) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে (Output-এ) বিবর্ধিত (Amplify) করে সে যন্ত্রকে অ্যামপ্লিফায়ার বলে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৩. ট্রানজিস্টর কিভাবে বিবর্ধন ঘটায়?

উত্তর : তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি করতে বা বিবর্ধিত করতে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। অন্তর্গামী হতে পারে তড়িৎ প্রবাহ বা ভোল্টেজ। ট্রানজিস্টরের পীঠ-প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে।

○ প্রশ্ন-২৪. অ্যামপ্লিফায়ার কিভাবে সংকেত বিবর্ধিত করে?

উত্তর : ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সংকেতকে বৃহৎ বহির্গামী সংকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টরই অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ট্রানজিস্টর পীট প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে। পীঠ প্রবাহের ক্ষুদ্র পরিবর্তন সংগ্রাহক প্রবাহের অধিকতর বৃহৎ পরিবর্তন ঘটায়। সংগ্রাহক বর্তনীতে একটি ইয়ারফোন আছে, যার সাহায্যে মূল শব্দের বিবর্ধিত রূপ শোনা যায়। এভাবেই অ্যামপ্লিফায়ার সংকেতকে বিবর্ধিত করে।

○ প্রশ্ন-২৫. ট্রানজিস্টরকে কিভাবে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (Input) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে বিবর্ধিত (amplify) করে তাকে বলা হয় অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সংকেতকে বৃহৎ বহির্গামী সংকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি করতে বা বিবর্ধিত করতে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। অন্তর্গামী হতে পারে তড়িৎপ্রবাহ বা ভোল্টেজ। ট্রানজিস্টরের পীঠ প্রবাহের (base current) সামান্য পরিবর্তন সংগ্রাহক প্রবাহের (collector current) বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। ট্রানজিস্টর পীঠ-প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৬. জেনার ডায়োড (Zener Diode) কি? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এক নাগাড়ে একই পরিমাণ ডিসি ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য 'পাওয়ার সাপ্লাইতে' এটা ব্যবহার করা হয়। এর গঠন প্রণালী অনেকটা সাধারণ অর্ধপরিবাহী ডায়োডের মতো হলেও এর কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক।

সাধারণ ডায়োডে বিপরীত ভোল্টেজ জেনার ভোল্টেজে বা ব্রেকডাউন ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হলে এটি পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জেনার ডায়োডের গঠন এমন যে এটি নষ্ট হয় না। রিজার্ভ ভোল্টেজ বা বিপরীত ভোল্টেজ ব্রেক ডাউন ভোল্টেজে পৌছালেই জেনার ডায়োডের মধ্য দিয়ে প্রবাহ শুরু হয়। জেনার ডায়োডের ইনপুট ভোল্টেজ কম-বেশি হলেও আউটপুট ভোল্টেজ নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থির থাকে। তাই এটি ভোল্টেজ স্থির রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-২৭. LED কি? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন?

উত্তর : লাইট এমিটিং ডায়োড (Light Emitting Diode) সাধারণত এলইডি নামেই অধিক পরিচিত। আভিধানিক অর্থের সঙ্গে এর কার্যকারিতারও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটি এমন একটি ডায়োড যা থেকে আলো নির্গত হয়। এ ডায়োডের ভেতর দিয়ে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন এটা আলোকিত হয়ে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

বিভিন্ন অডিও সিস্টেমে যথা- রেডিও, টেপরেকর্ডার, অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদিতে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিটার এবং ক্যালকুলেটরে সংখ্যা ফুটিয়ে তোলার কাজে LED ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-২৮. LED কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : LED অন্যান্য ডায়োডের মতো একটা সরল p-n জাংশন ডায়োড। এটিও সম্মুখ ঝোঁকে কাজ করে। সম্মুখ ঝোঁক যুক্ত ডায়োডে ইলেকট্রন ও হোল জাংশন স্থলে একসঙ্গে মিলিত হয়। কনভেনশনাল বা সাধারণ প্রচলিত ডায়োড সিলিকন বা জার্মেনিয়াম দিয়ে তৈরি। এসব ডায়োডে জাংশনে ইলেকট্রন ও হোলের মিলনের ফলে যে শক্তি মুক্ত হয় তা তাপ হিসেবে প্রকাশ পায়। তাই এ সব ডায়োড উত্তপ্ত হয়ে যায়। LED তৈরি হয় গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফসফাইড, গ্যালিয়াম ফসফাইড বা গ্যালিয়াম আর্সেনাইড থেকে। LED-এ সম্মুখ ঝোঁকে ইলেকট্রন হোলের মিলনে মুক্ত শক্তি তাপ হিসেবে নির্গত না হয়ে আলো হিসেবে বেরিয়ে আসে।

○ প্রশ্ন-২৯. ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) কি? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর 'তিন টার্মিনাল' বা প্রান্ত বিশিষ্ট এক ধরনের সলিডস্টেট ডিভাইস। এ ডিভাইসের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তন করে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বলে এ নামকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কারেন্ট শুধু 'সংখ্যাগুরু' (majority) বাহক দ্বারা পরিচালিত হয় বলে একে একধ্রুবী (unipolar) ডিভাইস বলা হয়।

FET-এর ব্যবহার

i. বাইপোলার ট্রানজিস্টর যেসব কাজে ব্যবহৃত হয় FET-ও প্রায় সেসব কাজে ব্যবহার করা যায়। তবে FET এককভাবে অনেক কাজে ব্যবহৃত হয় যেখানে বাইপোলার ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা যায় না।
ii. FET-এর ইনপুটে উচ্চ প্রতিবাধা (Impedance) এবং আউটপুটে স্বল্প প্রতিবাধা থাকার কারণে বাইপোলার ট্রানজিস্টরের চেয়ে এটি অনেক উন্নতমানের। ফলে এর ব্যবহারও বেশি।
iii. FET-এর ইনপুটে উচ্চ প্রতিবাধার জন্য বর্তনীতে লোডিং ক্রিয়া খুব কম হয়। তাই উন্নতমানের ভোল্টমিটার, বিভিন্ন পরিমাণ যন্ত্রপাতিতে, দোলনদর্শী (oscilloscope) ইত্যাদিতে বহুল পরিমাণে এর ব্যবহার হয়।
iv. লজিক বর্তনীতে FET-এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।
v. FM এবং TV গ্রাহকযন্ত্রে মিশ্রণ ক্রিয়া সম্পাদনে FET ব্যবহৃত হয়।
vi. ক্ষুদ্র আকৃতির জন্য LSI বর্তনী এবং কম্পিউটারের মেমোরিতে FET ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৩০. বাইপোলার ট্রানজিস্টর কাকে বলে? ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) ও বাইপোলার ট্রানজিস্টরের পার্থক্য দেখান।

উত্তর : সাধারণ ট্রানজিস্টরে হোল ও ইলেকট্রনিক উভয়েই বিদ্যুৎ পরিবহনে অংশ নেয়। এজন্য এদেরকে বাইপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) এবং বাইপোলার ট্রানজিস্টরের পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো :

i. ফেট (FET) শুধু এক ধরনের বাহক কাজ করে, এজন্য একে বলা হয় ইউনিপোলার (unipolar) ট্রানজিস্টর; পক্ষান্তরে সাধারণ ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে উভয় ধরনের বাহক কাজ করে, এজন্য একে বাইপোলার (bipolar) ট্রানজিস্টর বলে।

ii. ফেটের গেটে বিপরীত বায়াস প্রয়োগ করা হয় ফলে ইনপুট রোধ উচ্চমানের হয়; কিন্তু বাইপোলার ট্রানজিস্টরে ইনপুট সার্কিট সম্মুখ বায়াস হওয়ায় ইনপুট রোধ কম মানের হয়।

iii. ফেট হচ্ছে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস আর সাধারণ ট্রানজিস্টর হচ্ছে কারেন্ট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।

○ প্রশ্ন-৩১. R-C কাপলড বা রোধ-ধারক যুগল বিবর্ধক কি? এ ধরনের অ্যামপ্লিফায়ারের সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : অ্যামপ্লিফায়ারে সাধারণত একের অধিক ধাপ বা stage থাকে। পর পর দুটি ধাপ কি ধরনের যুগল বর্তনীর মাধ্যমে যুক্ত থাকে তার মধ্যেই অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। R-C কাপলড বিবর্ধকে পর পর দুটি ধাপের মাঝে থাকে রোধ ধারক যুগল বর্তনী এবং এজন্য এ ধরনের বিবর্ধককে বলা হয় রোধ-ধারক যুগল বা R-C কাপলড।

সুবিধা :

i. ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স ভালো, কারণ অডিও রেঞ্জেও এর গেইন মোটামুটি।

ii. অন্যান্য কাপলিং-এর চেয়ে ওভারঅল অ্যামপ্লিফিকেশন বেশি।

iii. এতে তেমন কোনো দামি বা বড় আকৃতির কম্পোনেন্ট প্রয়োজন হয় না বলে এটা ছোট আকৃতির, হালকা ও দামে সস্তা।

iv. কোনো ট্রান্সফর্মার বা কয়েল ব্যবহৃত হয় না বলে এর নন-লিনিয়ার ডিসটরশন খুব কম।

v. এ অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিট খুব কমপ্যাক্ট হয় কারণ আজকাল ছোট হালকা রেজিস্টার পাওয়া যায়।

অসুবিধা :

i. পরবর্তী স্টেজের লোডিং ইফেক্টের জন্য ভোল্টেজ গেইন তুলনামূলকভাবে কম হয়।

ii. ভেজা আবহাওয়ায় দীর্ঘ দিন ব্যবহারে এটা নয়েজী (Noisy) হয়ে যায়।

iii. স্পিকারে কম পাওয়ার ট্রান্সফার করে বলে ইম্পিডেন্স মেচিং খুব ভালো হয় না।

ব্যবহার :

i. একটি বেশ বিস্তৃত ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে অ্যামপ্লিফায়ারের ভালো অডিও বিশ্বস্ততা আছে। এজন্য এরা ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার অর্থাৎ অডিও সার্কিটে বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৩২. ট্রান্সফর্মার কাপলড অ্যামপ্লিফায়ার কি? এর সুবিধা-অসুবিধা ও ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : যে অ্যামপ্লিফায়ারে পর পর দুটি ধাপের মাঝে একটি ট্রান্সফর্মার থাকে তাকে ট্রান্সফর্মার কাপলড অ্যামপ্লিফায়ার বলে।

সুবিধা :

i. স্টেজগুলোর মধ্যে ভালো ইম্পিডেন্স মেচিং প্রদান করে যা সর্বোচ্চ পাওয়ার ট্রান্সফারের একটি অন্যতম শর্ত।

ii. ট্রান্সফর্মার কাপলিং অধিক কার্যকরী, কারণ কালেক্টর ও বেস সার্কিটে সংযুক্ত প্রাইমারি ডিসি রেজিস্টার কম এবং পাওয়ার খরচ কম।

অসুবিধা :

i. ব্যবহৃত কাপলিং ট্রান্সফর্মার বেশি দামি এবং আকৃতিও তুলনামূলক বড়।

ii. রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে এর ইন্ডাকট্যান্স ও ওয়াইন্ডিং ক্যাপাসিট্যান্স অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে।

iii. ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কম।

iv. কাজের সময় এতে গুঞ্জন (Hum)-এর সৃষ্টি হয়।

ব্যবহার : ইম্পিডেন্স মেচিং ডিভাইস হিসেবে এটা সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। মাল্টিস্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের পাওয়ার স্টেজে ট্রানজিস্টরের আউটপুট ইম্পিডেন্স এবং লোড ইম্পিডেন্সের মধ্যে সমতা বা মেচিংয়ের উদ্দেশ্যে এটা ব্যবহৃত হয়। আর এ ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারটি অবশ্যই একটি স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।

○ প্রশ্ন-৩৩. ডাইরেক্ট কাপলড অ্যামপ্লিফায়ার বলতে কি বোঝায়? এর সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : যে অ্যামপ্লিফায়ারে প্রথম স্টেজের এনপিএন ট্রানজিস্টরের কালেক্টর ও দ্বিতীয় স্টেজের পিএনপি ট্রানজিস্টরের বেস এবং অনুরূপভাবে অন্যান্য স্টেজ এ সরাসরি সংযোগ থাকে তাকে ডাইরেক্ট কাপলড অ্যামপ্লিফায়ার বলা হয়।

সুবিধা :

i. এ সার্কিটের গঠন খুব সহজ, কারণ কম কম্পোনেন্ট ব্যবহৃত হয়।

ii. ডাইরেক্ট কারেন্ট বা লো-ফ্রিকোয়েন্সি সিগনালকে বেশি অ্যামপ্লিফাই করতে পারে।

iii. দামে একদম সস্তা।

অসুবিধা :

i. হাই ফ্রিকোয়েন্সি সিগনালকে অ্যামপ্লিফাই করতে পারে না।

ii. তাপীয় স্থিরতা কম।

ব্যবহার : ইলেকট্রনিক পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমের রেগুলেটর সার্কিটে, পালস অ্যামপ্লিফায়ারে, ডিফারেনশিয়াল অ্যামপ্লিফায়ারে, কম্পিউটার সার্কিটে ইলেকট্রনিক ইন্সট্রুমেন্টে এটা ব্যবহৃত হয়।

○ প্রশ্ন-৩৪. অ্যামপ্লিফায়ারে কি কি কাপলিং বা সংযোগ ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : সব অ্যামপ্লিফায়ারেই কাপলিং নেটওয়ার্কের প্রয়োজন হয়। এমনকি একটি সিঙ্গেল স্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারেও ইনপুট আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে কাপলিং করতে হয়। মাল্টিস্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের ক্ষেত্রে ইন্টারস্টেজ কাপলিং থাকে। আর কাপলিংয়ের শ্রেণীভেদের উপরই একটি ক্যাসকেডেড অ্যামপ্লিফায়ারের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। কাপলিং পদ্ধতি প্রধানত চার প্রকার। যথা–

i. রেজিস্ট্যান্স ক্যাপাসিটর কাপলিং (R-C Coupling)

ii. ইম্পিডেন্স কাপলিং বা ইন্ডাকটিভ কাপলিং (L-C Coupling)

iii. ট্রান্সফর্মার কাপলিং (Transformer Coupling)

iv. ডাইরেক্ট কাপলিং (Direct Coupling)

○ প্রশ্ন-৩৫. অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স কি? R-C কাপলড অ্যামপ্লিফায়ারের হাই ও লো ফ্রিকোয়েন্সি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : কোনো অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স বলতে উক্ত অ্যামপ্লিফায়ার, এর নির্ধারিত রেঞ্জের মধ্যে সব ফ্রিকোয়েন্সিকে সমভাবে অ্যামপ্লিফাই করে কিনা তা বোঝায়। সমভাবে অ্যামপ্লিফাই না করলে সাউন্ড অস্পষ্ট এবং বিকৃত হয়। ট্রান্সফর্মার কাপলড অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স সাধারণত কম হয়। অপরদিকে R-C কাপলড অ্যামপ্লিফায়ারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স সাধারণত ভালো হয়। রেসপন্স যত ভালো হবে সাউন্ড তত ভালো শোনা যায়।

কাপলিং ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিট্যান্স রিয়েকট্যান্স খুব কম বলে এটি সর্ট সার্কিটের মতো কাজ করে। এ ফ্রিকোন্সিতে বেস ইমিটার ফাংশনের ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাকট্যান্স খুব কম বলে বেস কারেন্ট বৃদ্ধি পায়। এটা পরবর্তী স্টেজের লোডিং ইফেক্ট বাড়িয়ে দেয় এবং কারেন্ট অ্যামপ্লিফিকেশন ফ্যাক্টর, β কে কমিয়ে দেয়। ফলে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে (<20KHz) গেইন কম হয়।

কাপলিং ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাকট্যান্স বেশি বলে সিগনালের খুব সামান্য অংশ এক স্টেজ থেকে অন্য স্টেজে যায় অর্থাৎ রিকোয়ার্ড এনার্জি যেতে পারে না। আবার বাইপাস ক্যাপাসিটরের ক্যাপাসিটিভ রিয়্যাকট্যান্স বেশি হওয়ায় এটা ইমিটার রেজিস্ট্যান্সকে ভালোভাবে শান্টিং করিতে পারে না। ফলে লো ফ্রিকোয়েন্সি (<50Hz) তে গেইন কম হয়।

○ প্রশ্ন-৩৬. মাল্টিস্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার বলতে কি বোঝায়? এর প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : একটি সিঙ্গেল স্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার থেকে প্রাপ্ত ভোল্টেজ এবং কারেন্ট গেইন সাধারণত অধিকাংশ কাজের জন্য পর্যাপ্ত নয়। তাই একাধিক অ্যামপ্লিফায়ার স্টেজকে পর্যায়ক্রমে সংযোগ করা হয়, যাতে চূড়ান্ত আউটপুটকে কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা যায়। একাধিক স্টেজ সংযোগের ক্ষেত্রে এক স্টেজের আউটপুট যে কোনো পদ্ধতিতে পরবর্তী স্টেজের ইনপুটে সংযোগ করা হয়। এ ধরনের একাধিক এক স্টেজযুক্ত অ্যামপ্লিফায়ারের ক্যাসকেডেড সিস্টেমকে মাল্টিস্টেজ অ্যামপ্লিফায়ার বলে।

প্রয়োজনীয়তা : ইলেকট্রনিক্স সার্কিটে অ্যামপ্লিফাই একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অ্যান্টেনার সাহায্যে রিসিভারে যে সিগনাল ধরা হয় তা খুবই দুর্বল। প্রথমে কয়েকটি স্টেজ দ্বারা ভোল্টেজকে অ্যামপ্লিফাই করা হয় এবং শেষের স্টেজ এমনভাবে ডিজাইন করা হয় যা পাওয়ারকে অ্যামপ্লিফাই করে। অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে ইনপুট সিগনালকে আউটপুটে বর্ধিত আকারে পাওয়া যায় কিন্তু সিগনালের ওয়েভশেপ একই থাকে এবং অবাঞ্ছিত সিগনাল অ্যামপ্লিফাই হয় না। এজন্য ইলেকট্রনিক সার্কিটে মাল্টিস্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক।

○ প্রশ্ন-৩৭. ক্লাস 'এ', ক্লাস 'বি' ও ক্লাস 'সি' অ্যামপ্লিফায়ারের সুবিধা, অসুবিধা ও ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : ক্লাস 'এ' অ্যামপ্লিফায়ারের সুবিধা :

i. হারমনিক ডিসটরশন কম।
ii. সরবরাহ ভোল্টেজটি ভালো রেগুলেশনের না হলেও চলে।
iii. সেলফ বায়াস করা যায়।
iv. ক্রসওভার ডিসটরশন কম।

অসুবিধা :

i. আউটপুট পাওয়ার কম।
ii. দক্ষতা কম (৩৫%)
iii. সিগনালবিহীন অবস্থায় বেশি পাওয়ার লস হয়।

ব্যবহার : ক্লাস 'এ' অ্যামপ্লিফায়ার বিশ্বস্তরূপে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি এবং ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ অ্যামপ্লিফায়ারে ব্যবহার করা হয়।

ক্লাস 'বি' অ্যামপ্লিফায়ারের সুবিধা :

i. আউটপুট পাওয়ার বেশি।
ii. দক্ষতা বেশি (৫০%-৬০%)।
iii. এতে ১৮০° ফেজ পার্থক্য থাকে বলে তেমন ডিসটরশন হয় না।

অসুবিধা :

i. হারমোনিক ডিসটরশন বেশি।
ii. সেলফ বায়াস ব্যবহার করা যায় না।
iii. সরবরাহ ভোল্টেজের রেগুলেশন ভালো হতে হয়।

ব্যবহার : এটা রেডিও রিসিভারে, রেকর্ড প্লেয়ারে এবং বহনযোগ্য অডিও সিস্টেমে পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ক্লাস 'সি' অ্যামপ্লিফায়ারের অসুবিধা :

i. আউটপুট পাওয়ার বেশি।
ii. দক্ষতা বেশি।
iii. ডিসটরশন বেশি হয়।

ব্যবহার : অসিলেটর এবং রেডিও ট্রান্সমিটারে টিউন্ড অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-৩৮. অসিলেটর কি? এর বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ ও সুবিধা লিখুন।

উত্তর : অসিলেটর এমন একটি ডিভাইস যা ডিসি এনার্জিকে এসি এনার্জিতে রূপান্তরিত করতে পারে। এর সাহায্যে বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির এবং বিভিন্ন আকৃতির (সাইন, স্কয়ার ইত্যাদি) ভোল্টেজ ওয়েভ উৎপন্ন করা যায়। অসিলেটর সাধারণত কয়েক হার্টজ থেকে বহু মেগাহার্টজ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জের সাইনুসোইডাল এবং নন-সাইনুসোইডাল উভয় ধরনের ওয়েভ উৎপন্ন করতে সক্ষম। অসিলেটর প্রকৃতপক্ষে একটি পজেটিভ ফিডব্যাকসম্পন্ন আনস্ট্যাবল (Unstable) অ্যামপ্লিফায়ার।

অসিলেটরের বৈশিষ্ট্য : অসিলেটর মূলত–

i. পজেটিভ ফিডব্যাক কাজ করে।
ii. একটি নন-রোটেটিং ইলেকট্রনিক ডিভাইস।
iii. ডিসি এনার্জিকে এসি এনার্জিতে রূপান্তরিত করে।
iv. কম ফ্রিকোয়েন্সি সিগনালকে (20 হার্টজ) বেশি ফ্রিকোয়েন্সি (প্রায় 100 মেগাহার্টজ) সিগনালে পরিণত করে।

অসিলেটরের শ্রেণীবিভাগ : উৎপন্ন এসি সিগনালের প্রকারভেদ অনুযায়ী অসিলেটরকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

i. সাইনুসোইডাল (Sinosoidal) বা হারমোনিক অসিলেটর
ii. নন-সাইনুসোইডাল বা রিলাক্সেশন (Relaxation) অসিলেটর

সাইনুসোইডাল অসিলেটরকে আবার সার্কিটের গঠন অনুযায়ী পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. টিউন্ড সার্কিট অসিলেটর (Tuned Circuit Oscillator)
খ. আরসি কাপলড অসিলেটর (RC Coupled Oscillator)
গ. ক্রিস্টাল অসিলেটর (Crystal Oscillator)
ঘ. নেগেটিভ রেজিস্ট্যান্স অসিলেটর (Negative Resistance Oscillator)
ঙ. হেটেরোডাইন (Heterodyne) বা বিট (Beat) ফ্রিকোয়েন্সির অসিলেটর

একইভাবে নন-সাইনুসোইডাল অসিলেটরকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

ক. মাল্টি ভাইব্রেটর (Multivibrator)
খ. ব্লকিং অসিলেটর (Blocking Oscillator)
গ. স টুথ (Saw Tooth) বা সুইপ (Sweep) জেনারেটর
ঘ. ভেন্ডার পোল (Vendar Pole) অসিলেটর
ঙ. গ্লো টিউব (Glow Tube) ডিসচার্জ অসিলেটর
চ. স্কয়ার (Square) ওয়েভ জেনারেটর

অসিলেটরের সুবিধা :

i. অসিলেটর একটি ননরোটেটিং ডিভাইস হওয়ায় এটা দীর্ঘস্থায়ী।
ii. মুভিং পার্টসের অনুপস্থিতির জন্য একটি অসিলেটরের কাজ সম্পূর্ণ নীরবে হয়।
iii. একটি অসিলেটর লো (২০ হার্জ) থেকে আল্ট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি (>১০০ MHz) তৈরি করতে পারে।
iv. কাঙ্ক্ষিত ফ্রিকোয়েন্সি পাওয়ার জন্য অসিলেশন ফ্রিকোয়েন্সি সহজেই পরিবর্তন করা যায়।

v. সময়ের সাথে এর ফ্রিকোয়েন্সি অপরিবর্তিত থাকে।
vi. এর দক্ষতা খুবই ভালো।
vii. এটা তৈরি করতে খরচ কম পড়ে।
viii. একে সহজে বহন করা যায়।

○ প্রশ্ন-৩৯. অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ার এর মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অ্যাসিলেটর	অ্যামপ্লিফায়ার
১. অসিলেটরে কোনো ইনপুট সিগনাল এর প্রয়োজন হয় না।	১. অ্যামপ্লিফায়ারে ইনপুট সিগনালের প্রয়োজন হয়।
২. অসিলেটর নিজে নিজেই আউটপুট সিগনাল উৎপন্ন করে।	২. অ্যামপ্লিফায়ারে আউটপুট সিগনাল ইনপুট সিগনালের ওপর নির্ভরশীল।
৩. অসিলেটরের ইনপুটে ডিসি দিলে আউটপুট-এ এসি পাওয়া যায়।	৩. অ্যামপ্লিফায়ারে ইনপুট সিগনাল আউটপুটে বর্ধিত আকারে পাওয়া যায়।
৪. অসিলেটরে পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার হয়।	৪. অ্যামপ্লিফায়ারে নেগেটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার হয়।
৫. অসিলেটরে টিউনড সার্কিট থাকে।	৫. অ্যামপ্লিফায়ারে টিউনড সার্কিট থাকে না।
৬. অসিলেটরের ফিডব্যাক গেইন A_f ইনফিনিটি হয়।	৬. অ্যামপ্লিফায়ারের ফিডব্যাক গেইন A_f ইনফিনিটি হয় না।

○ প্রশ্ন-৪০. কলপিটস, হার্টলি, ক্রিস্টাল ও ফেজ অসিলেটরের সুবিধা ও অসুবিধা উল্লেখ করুন।

উত্তর : কলপিটস অসিলেটরের সুবিধা :

i. এর ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি সবচেয়ে বেশি।
ii. ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি অপারেশনের জন্য এটা খুব ভালো।
iii. হার্টলি অসিলেটর থেকে অপারেশনের দিক দিয়ে এর খরচ কম পড়ে।

অসুবিধা :

i. একে ট্যাংক সার্কিটের দুই ক্যাপাসিটরের মাঝ থেকে টেপিং করতে হয়।
ii. এর ফ্রিকোয়েন্সি রিজোনেন্ট ফ্রিকোয়েন্সির সমান হয়।

হার্টলি অসিলেটরের সুবিধা :

i. হার্টলি অসিলেটরে মাত্র একটি কয়েল ব্যবহৃত হয়।
ii. এর ট্যাংক সার্কিটে এনার্জি কারেন্ট ফেজে সরবরাহ হয়।
iii. আরমাস্ট্রং অসিলেটর থেকে এর ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি খুব ভালো।

অসুবিধা :

i. এতে জেপেড কয়েল বা অটো ট্রান্সফর্মারের প্রয়োজন হয়।
ii. সিরিজ হার্টলি অসিলেটরে এসি এবং ডিসির জন্য কোনো ভিন্ন পথ নেই বলে ডিসির ওপর এসি ইফেক্ট পরিলক্ষিত হয়।

ক্রিস্টাল অসিলেটরের সুবিধা নিম্নরূপ :

i. ক্রিস্টালের ফ্রিকোয়েন্সি তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে না।
ii. ডিসির ওপর এসি কোনো প্রভাব বিস্তার করে না।
iii. ক্রিস্টাল অসিলেটরের ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি উচ্চমানের।

অসুবিধা :

i. এর প্যারালাল রিজোনেন্স ফ্রিকোয়েন্সিতে সবচেয়ে বেশি ফিডব্যাক হয়।
ii. এর ফ্রিকোয়েন্সি সহজে পরিবর্তন করা যায় না।
iii. ক্রিস্টাল অসিলেটর দুর্বল বলে একমাত্র লো পাওয়ার সার্কিটে ব্যবহৃত হয়।

ফেজ শিফট অসিলেটরের সুবিধা :

i. এতে কোনো ট্রান্সফরমার বা ইন্ডাক্টরের দরকার হয় না।
ii. খুব কম ফ্রিকোয়েন্সি উৎপন্ন করা যায়।
iii. ফ্রিকোয়েন্সি স্ট্যাবিলিটি খুব ভালো।
iv. প্রকৃত সাইন ওয়েভ সৃষ্টি করতে পারে।

অসুবিধা :

i. পরিবর্তনশীল ফ্রিকোয়েন্সির জন্য উপযুক্ত নয়।
ii. খুব কম মানের আউটপুট পাওয়া যায়।
iii. ফিডব্যাক ফ্যাক্টর খুব কম থাকে বলে অসিলেশন শুরু করতে দেরি হয়।

রোধ, পরিবাহিতা, ধারকত্ব ও আবেশ
Resistance, Conductance, Capacitance and Inductance

○ প্রশ্ন-৪১. ও'মের সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : ও'মের সূত্র

বিবৃতি : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্যদিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ চলে, তা পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরা যাক, AB পরিবাহকের A ও B বিন্দুর বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B এবং $V_A > V_B$। A ও B বিন্দুর বিভব পার্থক্য, $V = V_A - V_B$। সুতরাং A হতে B প্রান্তে তড়িৎ প্রবাহিত হবে। ধরি, প্রবাহ মাত্রা I।

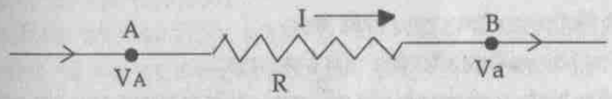

ও'মের সূত্রানুসারে, $I \propto V$

বা, $I = GV$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক যাকে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা বলে এবং $G = \frac{1}{R}$ (যেখানে R পরিবাহীর রোধ)।

সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণ হতে, $I = \frac{1}{R}V$

অর্থাৎ $R = \frac{V}{I}$

এই সমীকরণ থেকে নিম্নোক্তভাবে রোধের সংজ্ঞা দেয়া যায়—

"নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোন পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও প্রবাহমাত্রার অনুপাতকে রোধ বলে।"

○ প্রশ্ন-৪২. পরিবাহিতা কি?

উত্তর : পরিবাহিতা :

ও'মের সূত্র হতে, $I = GV$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক। একে মাধ্যমের পরিবাহিতা বলে। এটি রোধের উল্টো রাশি অর্থাৎ $G = \frac{1}{R}$।

একক : সিমেন্স।

০ প্রশ্ন-৪৩. তড়িৎ পরিবাহিতাঙ্ক বলতে কি বুঝ?

উত্তর : তড়িৎ পরিবাহিতাঙ্ক : একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য একক হলে ঐ পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে পরিমাণ তড়িৎ পরিবাহিত হয় তাকে ঐ পরিবাহকের পরিবাহিতাঙ্ক বলে। পরিবাহিতাঙ্কের একক হলো সিমেন্স/মি বা Sm^{-1}।

০ প্রশ্ন-৪৪. রোধ কি?

উত্তর : রোধ : পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে রোধ বলে।

ও'মের সূত্র হতে রোধের সংজ্ঞা : স্থির তাপমাত্রায় কোনো একটি পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য ও এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের অনুপাত উক্ত পরিবাহীর রোধ নির্দেশ করে।

একক : রোধের একক ওহম (Ohm)।

০ প্রশ্ন-৪৫. বিভিন্ন প্রকার রোধের নাম লিখুন।

প্রচলিত কয়েক প্রকারের রোধ হলো :

i. Wire-Wound Resistors.
ii. Carbon–Composition Resistors
iii. Film type Resistors
iv. Cermet Resistors
v. Fusible Resistors
vi. Non-linear Resistors.

০ প্রশ্ন-৪৬. কি কি বিষয়ের উপর রোধ নির্ভর করে?

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর পরিবাহীর রোধ নির্ভর করে—

i. **পরিবাহীর দৈর্ঘ্য:** দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বৃদ্ধি পায় এবং দৈর্ঘ্য কমলে রোধ হ্রাস পায়।
ii. **পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ :** পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ বেশি হলে রোধ কম হয়; প্রস্থচ্ছেদ কম হলে রোধ বেশি হয়।
iii. **পরিবাহীর তাপমাত্রা :** পরিবাহীর তাপমাত্রা হ্রাস বৃদ্ধিতে রোধের হ্রাস বৃদ্ধি হয়।
iv. **পরিবাহীর উপাদান :** পরিবাহীর উপাদানের বিভিন্নতার জন্য রোধ বিভিন্ন হয়।
v. **আলোর প্রভাব :** কিছু কিছু কুপরিবাহী পদার্থ যেমন ZnS এর উপর আলোক রশ্মি পড়লে রোধ কমে।
vi. **চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব :** কোনো বিদ্যুৎবাহী পরিবাহীর প্রবাহের দিকের সাথে অভিলম্বভাবে চৌম্বকক্ষেত্র প্রযুক্ত হলে রোধের পরিবর্তন হয়।
vii. **পরিবাহীর বিশুদ্ধতা :** পরিবাহীতে অপদ্রব্য থাকলে রোধের পরিবর্তন হয়।
viii. **চাপের প্রভাব :** পরিবাহীতে চাপ প্রয়োগ করলে রোধের পরিবর্তন হয়। যেমন কার্বন গুঁড়ার উপর চাপ বৃদ্ধির ফলে রোধ কমে যায়।

০ প্রশ্ন-৪৭. রোধের কালার কোড কাকে বলে?

উত্তর : কালার কোড বা বর্ণ কোড : সাধারণত ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রে যে রোধ ব্যবহার করা হয় তা কার্বন দিয়ে তৈরি বলে এদের কার্বন রোধ বলে। কার্বন রোধ আকারে খুব ছোট বলে এর গায়ে রোধের

মান লেখার জায়গা থাকে না। এজন্য বিভিন্ন রঙের ডোরা কেটে রোধের মান প্রকাশ করা হয়। এ পদ্ধতিকে কালার কোড পদ্ধতি বলে।

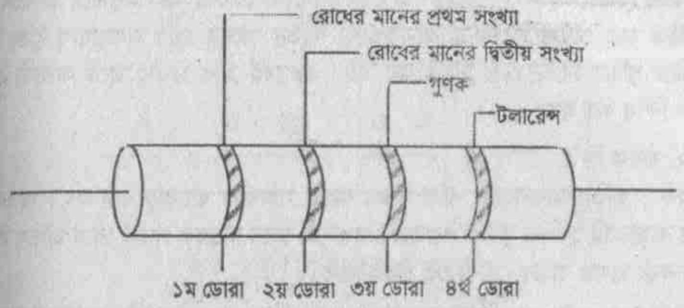

০ প্রশ্ন-৪৮. ব্যান্ডের রং দেখে কিভাবে রোধ নির্ণয় করা যায়?

উত্তর : রোধ নির্ণয় পদ্ধতি :

রোধের উপর সাধারণত চারটি রঙিন ডোরা এঁকে রোধের মান নির্দেশ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় ডোরার সংখ্যাগত মান পাশাপাশি বসিয়ে যা পাওয়া যায় তাকে তৃতীয় ডোরার গুণিতকের মান দ্বারা গুণ করলে রোধের মান পাওয়া যায়। চতুর্থ ডোরাটি টলারেন্স নির্দেশ করে। চতর্থ ডোরা না থাকলে বুঝাবে টলারেন্স + 20%।

০ প্রশ্ন-৪৯. পটেনশিওমিটার কাকে বলে?

উত্তর : পটেনশিওমিটার হলো এক বিশেষ ধরনের যন্ত্র, যার সাহায্যে পরিবাহী তারের দৈর্ঘ্য বরাবর ক্রমগত বিভব পতন সৃষ্টি করা যায় এবং কোনো বৈদ্যুতিক কোষের তড়িৎচ্চালক শক্তি অথবা কোনো বৈদ্যুতিক বর্তনীর যে কোনো বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য নির্ণয় করা যায়।

০ প্রশ্ন-৫০. মাল্টিমিটার কি?

উত্তর : মাল্টিমিটার : যে যন্ত্রের সাহায্যে বৈদ্যুতিক রোধ বিভব পার্থক্য ও তড়িৎ প্রবাহ মাপা যায় তাকে মাল্টিমিটার বলে। মাল্টিমিটার রোধ (ohm meter), বিভব (Volt meter) ও অ্যাম্পিয়ার মিটার (Ampere meter) এর সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য এটি Avometer নামেও পরিচিত।

০ প্রশ্ন-৫১. ও'ম-মিটার কি? মাল্টিমিটারকে কিভাবে ও'ম মিটার হিসেবে ব্যবহার করা যায় ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর : পরিবাহীর রোধ মাপার যন্ত্রকে বলা হয় ও'ম-মিটার। মাল্টিমিটারকে ও'ম মিটার হিসেবে ব্যবহারের সময় প্রথমেই বর্তনী সংযোগ দিতে হয়।

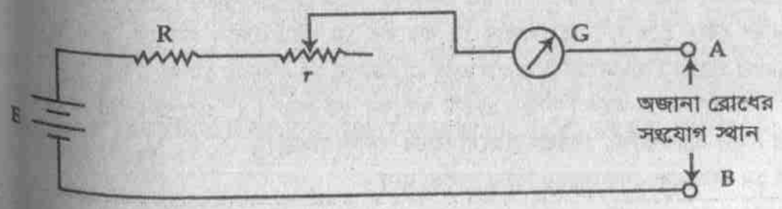

যে পরিবাহীর রোধ মাপতে হবে সেটিকে A ও B প্রান্তে সংযোগ দিতে হয়। এখন বর্তনীতে বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা বা কারেন্টের মান সংযুক্ত রোধের উপর নির্ভর করবে। সুতরাং গ্যালভানোমিটারের বিক্ষেপের মাত্রা কারেন্টের সমানুপাতিক। ও'ম-মিটার স্কেল রোধের মান অনুসারে ক্রমাঙ্কিত থাকে। সর্বোচ্চ সঠিক মান পরিমাপের জন্য অনেকগুলো বিভিন্ন মানের রোধ সমান্তরাল যুক্ত করা হয়। সিলেক্টর সুইজ ঘুরিয়ে বিভিন্ন রেঞ্জ নির্দিষ্ট করা হয়। এভাবেই A ও B এর মাঝে অজানা রোধ রেখে রোধের মান নির্ণয় করা হয়।

○ প্রশ্ন-৫২. ধারক কি?

উত্তর: ধারক : তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করার সামর্থকে ধারকত্ব বলা হয়। ধারকত্ব বজায় রাখার জন্য কাছাকাছি স্থাপিত দুটি পরিবাহকের মধ্যবর্তী স্থানে অন্তরক পদার্থ রেখে তড়িৎ আধানরূপে শক্তি সঞ্চয় করে রাখার যান্ত্রিক কৌশলকে ধারক বলে।

○ প্রশ্ন-৫৩. পরিবাহকের ধারকত্ব বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ধারকত্ব : কোনো একটি পরিবাহীর এক একক বিভব বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় চার্জের পরিমাণকে তার ধারকত্ব বলে। ধারকত্ব, $C = \frac{Q}{V}$

এখানে, $Q =$ চার্জের পরিমাণ

$V =$ বিভব

○ প্রশ্ন-৫৪. ফ্যারাডের সংজ্ঞা দিন।

অথবা, এক ফ্যারাড বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ফ্যারাডের সংজ্ঞা : ধারকত্বের S.I বা ব্যবহারিক একক হল ফ্যারাড। কোনো পরিবাহীর বিভব এক ভোল্ট পরিবর্তন করতে যদি এক কুলম্ব (1C) চার্জের প্রয়োজন হয়, তবে ঐ পরিবাহকের ধারকত্বকে এক ফ্যারাড (1F) বলে।

$$\therefore 1F = \frac{1C}{1V} = 1CV^{-1}$$

○ প্রশ্ন-৫৫. তুল্য ধারকত্ব কি?

উত্তর : তুল্য ধারকত্ব : একাধিক ধারকের সমবায়ের পরিবর্তে যে একটি মাত্র ধারক ব্যবহার করলে সমবায়ের বিভব পার্থক্য ও আধানের কোনো পরিবর্তন হয় না তার ধারকত্বকে সমবায়ের তুল্য ধারকত্ব বলে।

○ প্রশ্ন-৫৬. কতকগুলো ধারকের শ্রেণি সংযোজনীতে তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় করুন।

উত্তর : শ্রেণি সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব : ধারকের যে সমবায়ে প্রথম ধারকের ২য় পাত এর সাথে ২য় ধারকের ১ম পাত, ২য় ধারকের ২য় পাতের সাথে ৩য় ধারকের ১ম পাত এবং এরূপের ধারকগুলো সংযুক্ত থাকে এবং সর্বশেষ ধারকের শেষপাত ভূ-সংযুক্ত থাকে। তাকে ধারকের শ্রেণি সমবায় বলে। কোনো তড়িৎ কোষ হতে যদি +Q আধান ১ম ধারকের ১ম পাতে প্রদান করা হয়, তবে তা অন্য পাতের ভেতর পৃষ্ঠে –Q আধান আবিষ্ট করবে এবং +Q আধান ২য় ধারকের ১ম পাতে আবিষ্ট হবে। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। সুতরাং প্রতিটি ধারকের এক পাত + Q এবং অন্যপাত –Q আধান লাভ করে। যদি ধারকগুলোর পাতদ্বয়ের মধ্যে বিভব পার্থক্য যথাক্রমে V_1, V_2, V_3 হয় তবে শ্রেণি সমবায়ের ১ম পাত এবং শেষ পাতের বিভব পার্থক্য হবে।

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \text{ .... (i)}$$

যদি ধারকগুলোর ধারকত্ব যথাক্রমে C_1, C_2, C_3 হয় তবে

$$V_1 = \frac{Q}{C_1}, V_2 = \frac{Q}{C_2}, V_3 = \frac{Q}{C_3} \text{ .... (ii)}$$

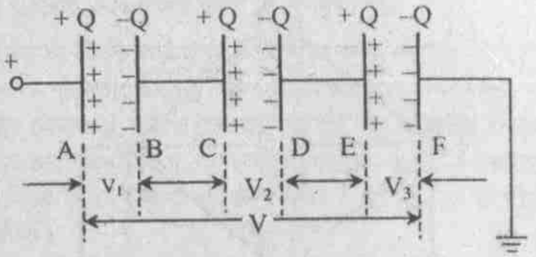

চিত্র : শ্রেণি সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব

যদি ধারকের সমবায়ের পরিবর্তে এমন একটি ধারক ব্যবহার করা হয় যার দু'টি পাতের বিভব পার্থক্য V এবং তার আধান Q হয় তবে তার ধারকত্ব তথা সমবায়ের তুল্য ধারকত্ব,

$$C_s = \frac{Q}{V}$$

$$\text{বা, } V = \frac{Q}{C_s} \text{.................. (iii)}$$

(i) এ (ii) ও (iii) হতে মান বসিয়ে পাই,

$$\frac{Q}{C_s} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$$

$$\therefore \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

সমবায়ে তিনটি ধারকের পরিবর্তে n সংখ্যক ধারক থাকলে

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \text{..........} + \frac{1}{C_n}$$

সুতরাং শ্রেণি সমবায়ে তুল্য ধারকের বিপরীত রাশির মান ধারকগুলোর ধারকত্বের বিপরীত রাশির মানের সমষ্টির সমান।

○ প্রশ্ন-৫৭. কতকগুলো ধারকের সমান্তরাল সংযোজনীতে তুল্য ধারকত্ব নির্ণয় করুন।

উত্তর : সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব : যে সমবায়ে ব্যবহৃত ধারকগুলোর প্রত্যেকটির একদিকের পাতগুলো একটি বিন্দুতে এবং অন্যদিকের পাতগুলো অন্য একটি বিন্দুতে যুক্ত করা হয় তাকে সমান্তরাল সমবায় বলে। চিত্রে তিনটি ধারকের সমান্তরাল সমবায় দেখানো হলো, যেখানে ধনাত্মক পাতসমূহ কোষের ধনাত্মক প্রান্তে এবং ঋণাত্মক পাতসমূহ কোষের ঋণাত্ম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত। তড়িৎ কোষ হতে +Q আধান প্রদান করা হলে, এ আধান ধারকগুলো তাদের ধারকত্ব অনুসারে ভাগ করে নেয়। যদি ধারকগুলোতে আধানের পরিমাণ যথাক্রমে Q_1, Q_2, Q_3 হয় তবে মোট আধান,

$$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 \text{ .... (i)}$$

যেহেতু প্রতিটি ধারকের দু'টি পাত কোষের দু'প্রান্তে যুক্ত, সুতরাং প্রতিটি ধারকের বিভব একই হবে। ধরা যাক, বিভব পার্থক্য V । যদি ধারকগুলোর ধারকত্ব যথাক্রমে C_1, C_2, C_3 হয়, তবে

$Q_1 = C_1V, Q_2 = C_2V, Q_3 = C_3V$ ...... (ii)

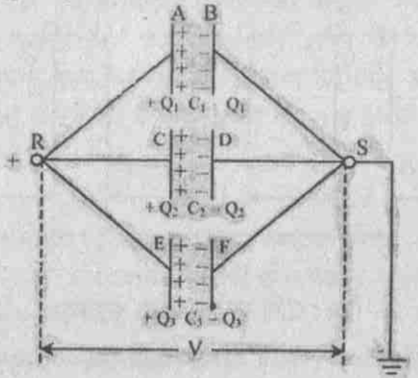

চিত্র : সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব

যদি ধারকের সমবায়ের পরিবর্তে একটি ধারক ব্যবহার করা হয় যার দুটি পাতের বিভব পার্থক্য V এবং যাতে আধান Q হয় তবে তার ধারকত্ব তথা সমবায়ের তুল্য ধারকত্ব $C_p = \frac{Q}{V}$ বা $Q = C_pV$ .... (iii)

সুতরাং (i), (ii) ও (iii) নং সমীকরণ, ব্যবহার করে পাই,

$$C_pV = C_1V + C_2V + C_3V$$

বা, $C_p = C_1 + C_2 + C_3$

সমবায়ে তিনটির ধারকের পরিবর্তে n সংখ্যক ধারক থাকলে $C_p = C_1 + C_2 + C_3 + ... + C_n$

সুতরাং সমান্তরাল সমবায়ে তুল্য ধারকত্ব ধারকগুলোর ধারকত্বের সমষ্টির সমান।

○ প্রশ্ন-৫৮. একটি গোলাকার পরিবাহীর ধারকত্বের রাশিমালা বের করুন।

অথবা দেখান যে, বায়ুতে অবস্থিত কোনো গোলাকার পরিবাহকের ধারকত্ব সংখ্যাগতভাবে ঐ পরিবাহকের ব্যাসার্ধের $4\pi\epsilon_0$ গুণের সমান।

উত্তর : গোলাকার ধারকত্বের রাশিমালা নির্ণয় : মনে করি, শূন্য মাধ্যমে বা বায়ুতে অবস্থিত r(m) ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি গোলাকার পরিবাহী A এর কেন্দ্র O এবং গোলকটিতে +Q পরিমাণ চার্জ রয়েছে। ধরি, গোলকের ধারকত্ব C এবং পৃষ্ঠের বিভব V। অতএব, ধারকত্বের সংজ্ঞা অনুসারে—

$$C = \frac{Q}{V}$$

অথবা, $V = \frac{Q}{C}$ .... (i)

আমরা জানি, পরিবাহীতে চার্জ সমভাবে তার পৃষ্ঠের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই চার্জগ্রস্থ এ গোলকের কেন্দ্র হতে বলরেখাগুলো বের হয়ে আসছে বলে মনে হবে। গোলকের কেন্দ্র O-এ +Q পরিমাণ চার্জ আছে কল্পনা করলেও ঐ চার্জ হতে বলরেখাগুলো একই ভাবে নির্গত হবে। এ কারণে চার্জগ্রস্ত গোলাকার পরিবাহীর ক্ষেত্রে সমস্ত চার্জ তার কেন্দ্রে অবস্থিত কল্পনা করা যায়।

∴ গোলাকার পরিবাহীর পৃষ্ঠে বিভব তথা গোলকের বিভব

$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q}{r}$ .... (ii)

সমীকরণ (i) ও (ii) অনুসারে $\frac{Q}{C} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q}{r}$

$\therefore C = 4\pi\epsilon_0 r$ .... (iii)

অর্থাৎ, গোলাকার ধারকের ধারকত্ব তার ব্যাসার্ধের সমানুপাতিক।

○ প্রশ্ন-৫৯. ধারকত্ব কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে বর্ণনা করুন।

উত্তর : কোনো একটি পরিবাহীর ধারকত্ব নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের উপর নির্ভর করে—

i. **পরিবাহীর ক্ষেত্রফল :** চার্জিত ক্ষেত্রফল যত বৃদ্ধি পায় পরিবাহীর ধারকত্ব তত বেড়ে যায়।

ii. **পরিবাহীর চারপার্শ্বস্থ মাধ্যম :** পরিবাহীর চতুর্দিকের মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবকের উপর ধারকত্ব নির্ভর করে। কোনো পরিবাহীর ধারকত্ব এর সন্নিহিত মাধ্যমের তড়িৎ মাধ্যমাংকের সমানুপাতিক।

iii. **অপর কোনো পরিবাহী বা ভূ-সংযুক্ত পরিবাহীর সান্নিধ্য:** চার্জযুক্ত পরিবাহীর নিকটে অন্যকোনো চার্জ শূন্য বা ভূ-সংযুক্ত পরিবাহী থাকলে, বৈদ্যুতিক আবেশের দরুন পরীক্ষাধীন পরিবাহীর ধারকত্ব বৃদ্ধি পাবে।

○ প্রশ্ন-৬০. ডাই-ইলেকট্রিক বা পরবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলতে কি বুঝেন?

উত্তর : পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক : পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলতে একই দূরত্বে অবস্থিত দুটি বিন্দু চার্জের মধ্যকার শূন্য স্থানের বল এবং নির্দিষ্ট মাধ্যমের বলের অনুপাতকেই বুঝায়।

অর্থাৎ, দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু চার্জ একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকলে শূন্যস্থানে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল এবং একই দূরত্বে অন্য কোন মাধ্যমে তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা। এ ধ্রুব সংখ্যাকে উক্ত মাধ্যমের পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক বলে।

গাণিতিকভাবে, $k = \frac{F_o}{F_m}$ এখানে K পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক,

একই জাতীয় দুটি রাশির অনুপাত বলে এর কোনো একক নেই।

○ প্রশ্ন-৬১. ক্যাপাসিটরের ব্যবহার লিখুন।

উত্তর : বিভিন্ন প্রকারের ক্যাপাসিটরের ব্যবহার নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. **পেপার কনডেনসারের ব্যবহার :** অ্যামপ্লিফায়ার সার্কিটে AF(Audio Frequency) ও পাওয়ার সাপ্লাইয়ে এটা প্রধানত ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. **মাইকা কনডেনসারের ব্যবহার :** এটা উচ্চ ফ্রিকুয়েন্সি সার্কিটে ব্যবহার করা হয়। এটা গ্রাহক এবং প্রেরক RF সার্কিটে প্রধানত ব্যবহার করা হয়।

৩. **সিরামিক কনডেনসারের ব্যবহার :** এটি টিউনিং সার্কিটে, ডিকাপলিং বাইপাস সার্কিটে এবং কাপলিং করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৪. **পলিয়েস্টার কনডেনসারের ব্যবহার :** এটি কাপলিং এবং বাইপাস ইত্যাদি সার্কিটে ব্যবহার হয়।

৫. **ট্রিলোফ্লেক্স কনডেনসারের ব্যবহার :** এটি সাধাণত টিউনিং অসিলেটর ও ফ্রিকুয়েন্সি ডিটামিনিং সার্কিটে বেশি ব্যবহার করা হয়।

৬. **ইলেকট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটরের ব্যবহার :** যে সকল স্থানে উচ্চ মানের ক্যাপাসিটেন্স প্রয়োজন সে সকল স্থানে এটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত রেকটিফায়ারের ভোল্টেজ তরঙ্গে মৃদু উথান-পতন দূরীকরণার্থে এটি ব্যবহৃত হয়।

৭. **এয়ার কনডেনসারের ব্যবহার :** রেডিওতে ব্যবহৃত গ্যাং (Gang) ক্যাপাসিটর।

○ প্রশ্ন-৬২. তড়িৎ আবেশ ব্যাখ্যা করুন :

উত্তর : তড়িৎ আবেশ : কোনো পরিবাহকের নিকটে একটি আহিত বস্তুকে রেখে আহিত বস্তুর প্রভাবে পরিবাহকটিকে সাময়িকভাবে আহিত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ আবেশ বলে।

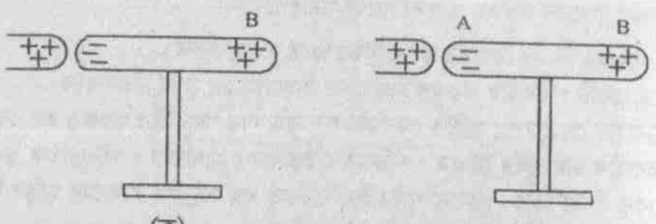

(ক) (খ)

চিত্র : তড়িৎ আবেশ

ব্যাখ্যা : একটি শুকনো কাচদণ্ডকে রেশম দিয়ে ভাল করে ঘষে ধনাত্মকভাবে আহিত করা হলো। এরপর এর এক প্রান্ত হাত দিয়ে ধরে অপর প্রান্তে একটি অনাহিত পরিবাহক দণ্ড AB এর নিকটে আনলে পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো কাচদণ্ডের ধনাত্মক আধান দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে A প্রান্তে সরে আসে। (চিত্র ক)। ফলে B প্রান্তে ইলেকট্রন ঘাটতি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ B প্রান্তে ধনাত্মক আধানে আহিত হয় এবং A প্রান্ত ঋণাত্মক আধানযুক্ত হয়। আধান সংগ্রাহক (একটি অপরিবাহী হাতলের প্রান্তে লাগানো ক্ষুদ্র ধাতব বা বল) দিয়ে B প্রান্ত থেকে কিছু আধান সংগ্রহ করে (চিত্র খ) তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর প্রকৃতি নির্ণয় করলে উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

○ প্রশ্ন-৬৩. দেখান যে, পূর্বে আবেশ, পরে আকর্ষণ।

উত্তর : পূর্বে আবেশ, পরে আকর্ষণ : একটি আহিত বস্তু ছোট কাগজের টুকরো বা অন্য কোনো আহিত বস্তুকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণের কারণ হচ্ছে তড়িৎহীন বস্তুটির যে প্রান্ত তড়িতাহিত বস্তুর কাছে থাকে, আবেশের জন্য সে প্রান্তে বিপরীত জাতীয় ও দূরের প্রান্তে সমজাতীয় আধান উৎপন্ন হয়। নিকটবর্তী বিপরীত জাতীয় আধানের মধ্যে যে আকর্ষণীয় ক্ষমতা দেখা যায় তা দূরে অবস্থিত সমজাতীয় আধানের মধ্যকার বিকর্ষণীয় ক্ষমতার চেয়ে বেশি। এর ফলে আহিত বস্তুটি আবিষ্ট বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট হয়। সে কারণে বলা হয় যে, আকর্ষণের পূর্বে আবেশ।

○ প্রশ্ন-৬৪. বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আবেশ বলতে কি বুঝুন?

উত্তর : বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ : একটি গতিশীল চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অথবা একটি স্থির তড়িৎবাহী বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করে অন্য একটি সংবদ্ধ বর্তনীতে তড়িচ্চালক বল ও তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ বলে।

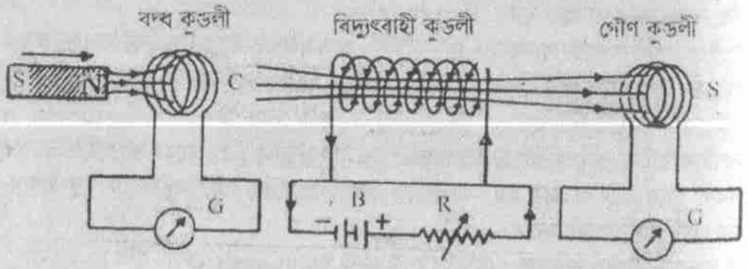

ব্যাখ্যা : কোনো কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে অতিক্রান্ত মোট চৌম্বক বলরেখাকে চৌম্বক ফ্লাক্স বলা হয়। কোনো কুণ্ডলীতে চৌম্বক ফ্ল্যাক্সের পরিবর্তন হলে ঐ কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক বল এবং তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয় অর্থাৎ তাড়িত চৌম্বক আবেশ ঘটে। আবিষ্ট তড়িচ্চালক বল ও প্রবাহ ততক্ষণ স্থায়ী হয় যতক্ষণ কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে বিস্তৃত চৌম্বক বলরেখাসমূহের পরিবর্হন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তন নানা উপায়ে ঘটানো যায়—

i. একটি কুণ্ডলীর সামনে একটি চুম্বককে বা তড়িৎবাহী কুণ্ডলীকে আনা-নেয়া করে অথবা কোন স্থির চুম্বকের বা তড়িৎবাহী কুণ্ডলীর নিকট কোনো কুণ্ডলীকে আনা-নেয়া করে।

ii. একটি কুণ্ডলীর সান্নিধ্যে অপর একটি কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহমাত্রার পরিবর্তন করে।

○ প্রশ্ন-৬৫. স্বকীয় আবেশ ও পারস্পরিক আবেশ কি?

উত্তর : স্বকীয় আবেশ : একটি মাত্র বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে অথবা কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রে বর্তনীর গতির ফলে বর্তনীর সাথে সংশ্লিষ্ট চৌম্বক ফ্লাক্সের পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের জন্য যে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ ঘটে তাকে স্বকীয় আবেশ বা স্বাবেশ বলে।

পারস্পরিক আবেশ : কোনো একটি কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ পরিবর্তন করলে নিকটবর্তী অন্য একটি কুণ্ডলীতে যে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সৃষ্টি হয় তাকে পারস্পরিক আবেশ বলে।

দিক পরিবর্তী প্রবাহের সাইন-ওয়েভ, কম্পাঙ্কের বিস্তৃতি, সাইন-ওয়েভ সম্পর্কিত ভোল্টেজ ও কারেন্টের সাধারণ রূপ, দশা সম্পর্ক, মৌলিক উপাদানসমূহ এবং দশাচিত্র, রোধ, ইন্ডাক্টর ও ধারকের প্রভাব, সাইন-ওয়েভের ক্ষেত্রে R, L ও C এর ভোল্টেজ ও প্রবাহ মাত্রার সম্পর্ক, গড় ক্ষমতা এবং ক্ষমতার রাশিমালা, জটিল সংখ্যা, জটিল সংখ্যার আয়তকার ও পোলার অবস্থান, আয়তকার ও পোলার অবস্থানের মধ্যকার সম্পর্ক, প্রবাহের প্রতিরোধ এবং দশাচিত্র।

Sinusoidal Alternating waveforms, Frequency spectrum, The sinusoidal wave form, General format for the sinusoidal voltage of current, Phase relations, The basic elements and phasors, Response of basic R, L and C, Elements to a sinusoidal voltage or current, Frequency response of the basic elements, Average power and power Factor, complex numbers, Rectangular form, Polar form, conversion between forms, Impedance and the phasor diagram.

সাইন ওয়েভ ও সাইন ওয়েভের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক
Sin Wave and the relationship among the elements

○ প্রশ্ন-৬৬. সাইন ওয়েভ কি? বিভিন্ন আকার আকৃতির ওয়েভ চিত্র অঙ্কন করুন।

উত্তর : ক. সাইন ওয়েভ (Sine wave) : অল্টারনেটিং ভোল্টেজ বা কারেন্ট প্রতি মুহূর্ত সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তিত হয়, যার ফলে মসৃণ তরঙ্গাকৃতির একটি বক্ররেখা পাওয়া যায়, তাকে সাইন-ওয়েভ বলে। সাইনোসয়ডাল, বা সাইন ওয়েভ বা তরঙ্গ ছাড়াও বিভিন্ন আকার আকৃতির ওয়েভ বা তরঙ্গের অল্টারনেটিং কারেন্ট বা ভোল্টেজ পাওয়া যায়, যথা—

ক. স্কয়ার বা রেক্ট্যাঙ্গুলার ওয়েভ,

খ. ট্রায়্যাঙ্গুলার বা ত্রিভুজাকৃতির ওয়েভ,

গ. স' টুথ বা করাত দাঁতাকৃতির ওয়েভ,

ঘ. ট্রাপিজয়েড ওয়েভ।

নিম্নে বিভিন্ন আকার-আকৃতির ওয়েভ-ফরমের চিত্র দেয়া হল :

সাইন ওয়েভ

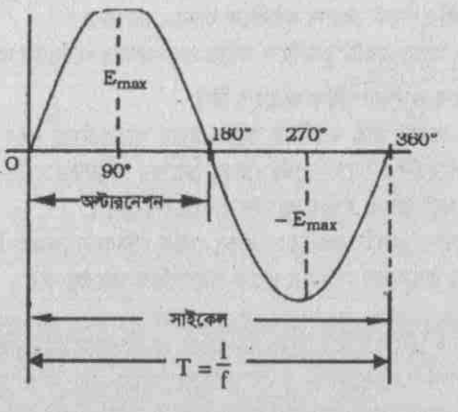

ক. ট্রায়্যাঙ্গুলার বা ত্রিভুজাকৃতির ওয়েভ

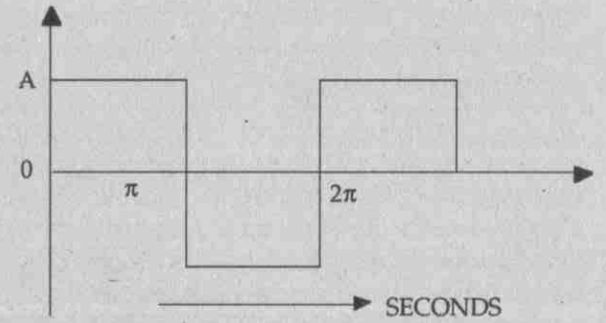

খ. ট্রায়্যাঙ্গুলার বা ত্রিভুজাকৃতির ওয়েভ

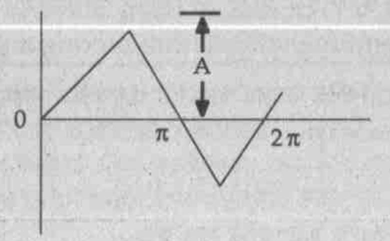

গ. স' টুথ বা করাত দাঁতাকৃতির ওয়েভ

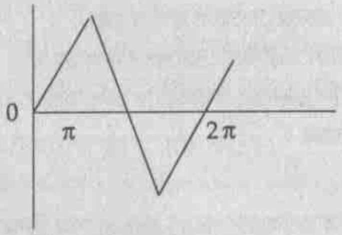

ঘ. ট্রাপিজয়েড ওয়েভ

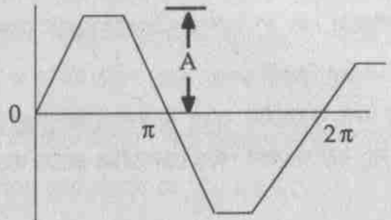

○ প্রশ্ন-৬৭. সাইন ওয়েভ-ফরমকে কেন বেশি পছন্দ করা হয়?

উত্তর : অন্যান্য ওয়েভের চেয়ে সাইন-ওয়েভ-ফরমকে বেশি পছন্দ করা হয় নিম্নলিখিত কারণে, যথা—

(i) এসি মেশিন ও ট্রান্সফরমারে সাইনোসয়ডাল ভোল্টেজ এবং কারেন্ট একটি নির্দিষ্ট পাওয়ার আউটপুটের জন্যে সবচেয়ে কম আয়রন এবং কপার লস হয়। সুতরাং কর্মদক্ষতা উন্নততর হয়।

(ii) টেলিফোন লাইনে সাইনোসয়ডাল ভোল্টেজ ও কারেন্ট কম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

(iii) সাইন ওয়েভ-ফরম বৈদ্যুতিক সার্কিটে সবচেয়ে কম বিঘ্নের সৃষ্টি করে।

(iv) সাইন ওয়েভ-ফরম সবচেয়ে মসৃণ এবং দক্ষ ওয়েভ-ফরম, ফলে হিসাব-নিকাশ সহজতর হয়।

(v) সাইন ওয়েভ-ফরমে হারমোনিক্স নাই বিধায় ডিস্টরশন (Distortion) কম হয়।

উপরোক্ত সুবিধাসমূহের কারণে বিশ্বের সকল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানিগুলো সাইনোসলয়ডাল অল্টারনেটিং ভোল্টেজ ও কারেন্ট উৎপন্ন করে। উল্লেখ্য যে, যদি বলা না থাকে,তবে অল্টারনেটিং ভোল্টেজ এবং কারেন্ট মানেই সাইনোসয়ডাল অল্টারনেটিং ভোল্টেজ এবং কারেন্ট বুঝতে হবে।

○ প্রশ্ন-৬৮. ফ্রিকুয়েন্সি কি? বাণিজ্যিক ফ্রিকুয়েন্সি কাকে বলে? কম ফ্রিকুয়েন্সির সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন।

উত্তর : ফ্রিকুয়েন্সি : এক সেকেন্ডে যতগুলো সাইকেল সম্পন্ন হয় তাকে ফ্রিকুয়েন্সি বলে। একে f প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর একক সাইকেল/সেকেন্ড বা (Hz)। বিদ্যুৎ-উৎপাদক সংস্থা কতিপয় সুবিধা ও অসুবিধা বিবেচনা করে তাদের উৎপাদিত বিদ্যুতের ফ্রিকুয়েন্সি নির্ধারণ করে। সর্বসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত বিদ্যুতের এ ফ্রিকুয়েন্সিকেই বাণিজ্যিক ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয়।

আমাদের দেশে বাণিজ্যিক ফ্রিকুয়েন্সি একটাই। আর তা হল 50 সাইকেল/সেকেণ্ড। কিন্তু পাশ্চাত্যের কোনো কোনো উন্নত দেশে (যেমন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, প্রভৃতি) দুধরনের বাণিজ্যিক ফ্রিকুয়েন্সি আছে; যথা—

(ক) 25 সাইকেল/সেকেন্ড, (খ) 60 সাইকেল/সেকেন্ড।

কম ফ্রিকুয়েন্সির কতিপয় সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ :

সুবিধাসমূহ :

i. কারেন্টের এবং দূরত্বের প্রতি এককে ভোল্টেজ-ড্রপ কম হয়।

ii. প্রেরণ (Transmission) লাইনে ভোল্টেজ রেগুলেশন ভাল হয়।

iii. এ ফ্রিকুয়েন্সিতে মোটর এবং সিন্‌ক্রোনাস কনভারটার ভাল কাজ দেয়, তবে এটি কতিপয় বিশেষ ধরনের মিশনের বেলায়ই প্রযোজ্য।

অসুবিধাসমূহ :

i. ইনক্যানডিসেন্ট বাতির চঞ্চল-আলোকচ্ছটা (Flickering) কম ফ্রিকুয়েন্সিতেদূষণীয়।

ii. এ ফ্রিকুয়েন্সিতে ব্যবহৃত ট্রান্সফরমার ও ইনডাকশন মোটর বেশ ভারী এবং দামি হয়ে থাকে। শিল্পের প্রথম যুগে 133 সাইকেল এবং 40 সাইকেল-এর ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহৃত হতো।

○ প্রশ্ন-৬৯. ফেজ এবং ফেজ পার্থক্য কি?

উত্তর : অল্টারনেটিং ভোল্টেজ এবং কারেন্টের তরঙ্গ বা ওয়েভ অবিচ্ছিন্ন। একটি সাইকেল সম্পূর্ণ হওয়ার পরও এরা থেমে থাকে না; বরং যতক্ষণ পর্যন্ত জেনারেটর চলতে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এদের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে।

ফেজ হল পরিবর্তনশীল রাশির (Alternating quantity) একটি নির্দিষ্ট-মান, টাইম পিরিয়ড বা সাইকেলের ভগ্নাংশমাত্র, যার মধ্য দিয়ে রাশিটি রেফারেন্সের নির্ধারিত শূন্য অবস্থান হতে সম্মুখ পানে অগ্রসর হয়।

ফেজ পার্থক্য (Phase difference) : যখন একটি সার্কিটে একটি অল্টারনেটিং (পরিবর্তনশীল) ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন উক্ত সার্কিটটির মধ্য দিয়ে একই ফ্রিকুয়েন্সির একটি অল্টারনেটিং কারেন্টও প্রবাহিত হয়। অধিকাংশ বাস্তব সার্কিটে, ভোল্টেজ এবং কারেন্টে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু (ধরা যাক শূন্য বিন্দু) একই দিকে একই মুহূর্তে অতিক্রম করে না। এরূপে বলা যায় যে, যে মুহূর্তে ভোল্টেজ এর শূন্য-বিন্দু অতিক্রম করে গেছে অথবা অতিক্রম করতে যাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে কারেন্ট একই দিকে এর শূন্য-বিন্দু অতিক্রম করে গেছে। এজন্যেই আমরা বলতে পারি যে, ভোল্টেজ এবং কারেন্টের মধ্যে একটি পার্থক্য বিদ্যমান। একেই ফেজ পার্থক্য বলে।

সুতরাং, যখন একই ফ্রিকুয়েন্সির দুটি পরবর্তনশীল রাশির (Alternating quantities) বিভিন্ন শূন্য বিন্দু থাকে, তখন তাদের মধ্যে ফেজ-পার্থক্য বিদ্যমান বলা যায়।

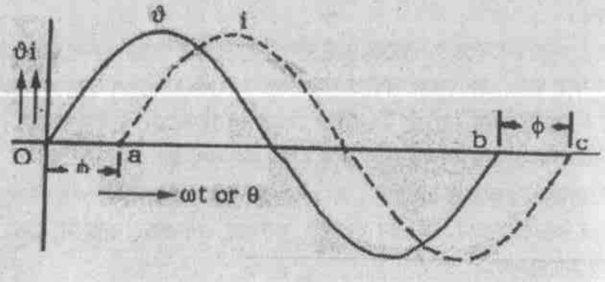

শূন্য-বিন্দু দুটির মধ্যবর্তী কোণকে ফেজ-পার্থক্যের কোণ বলা হয়। এর প্রতীক ϕ বা θ এবং এটি ডিগ্রি বা রেডিয়ানে পরিমাপ করা হয়। যে রাশিটি এর শূন্য-বিন্দু আগে অতিক্রম করে, তাকে লিডিং (Leading) এবং যে রাশিটি এর শূন্য বিন্দু পরে অতিক্রম করে, একে ল্যাগিং (Lagging) বলা হয়।)

○ প্রশ্ন-৭০. দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক বল বা শক্তি কী?

উত্তর : দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক বল : যে তড়িৎ চালক বলের ক্রিয়ায় কোনো বর্তনীতে প্রবাহমাত্রা একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর বার বার বিপরীতমুখী হয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান প্রাপ্ত হয়, সেই তড়িৎ চালক বলকে দিক পরিবর্তী তড়িৎচালক বল বলে। দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক বল এর গাণিতিক সমীকরণ $\in_0 = \in_0 \sin \omega t$, যেখানে যে কোনো t সময়ে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের মান $\in_o$ = আবিষ্ট তড়িৎ চালক বলের শীর্ষমান।

○ প্রশ্ন-৭১. দিক পরিবর্তী প্রবাহের গড়মান ও শীর্ষমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করুন।

অথবা, দিক পরিবর্তী প্রবাহের জন্য দেখান যে, $\bar{I} = 0.637 I_0$

উত্তর : পরিবর্তী প্রবাহের জন্য $\bar{I} = 0.637 I_0$ সম্পর্ক প্রমাণ : কোন সময় ব্যবধানের তড়িৎ প্রবাহের সকল মানের গড়কে ঐ সময় ব্যবধানের গড় তড়িৎ প্রবাহ বলে।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময় ব্যবধানের প্রবাহ ও সময় ব্যবধানের গুণফলের সমষ্টি নিয়ে মোট সময় ব্যবধান দ্বারা ভাগ করলে ঐ সময় ব্যবধানের গড় তড়িৎ প্রবাহ পাওয়া যায়। পরিবর্তী প্রবাহের গড়মান বলতে অর্ধ পর্যায়কালে প্রবাহের গড়মান বুঝায়।

পর্যায়কাল T হলে, আমরা জানি, অর্ধচক্রের জন্য গড় তড়িৎ প্রবাহ হবে,

$$\bar{I} = \frac{1}{\frac{T}{2}} \int_0^{\frac{T}{2}} I dt$$

$$= \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} I_0 \sin \omega t \, dt \; [\because I = I_0 \sin \omega t]$$

$$= \frac{2I_0}{\omega T} [-\cos \omega t]_0^{\frac{T}{2}}$$

$$= -\frac{2I_0}{\omega T} [\cos \frac{\omega T}{2} - \cos 0]$$

$$= -\frac{2I_0}{2\pi} [\cos \pi - \cos 0] \; [\because \omega = \frac{2\pi}{T}]$$

$$= -\frac{I_0}{\pi} [-1 - 1] = \frac{2I_0}{\pi}$$

$$\therefore \bar{I} = 0.637 I_0$$

সুতরাং, অর্ধচক্রের জন্য গড় তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে তড়িৎ প্রবাহের শীর্ষমানের 0.637 গুণ বা 63.7%। (দেখানো হলো)

প্রশ্ন-৭২. সাইনসদৃশ দিক পরিবর্তী প্রবাহের গড় বর্গের বর্গমূল মান নির্ণয় করুন।

অথবা, দেখান যে, $I_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_o = 0.707 \ I_0$ [এখানে, প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।]

উত্তর : গড় বর্গবেগের বর্গমূল নির্ণয় : কোন এসি বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহের বর্গের গড় মানকে বর্গমূল করে গড় বেগের বর্গমূল মান পাওয়া যায়। যেকোনো সময় t-তে দিক পরিবর্তী প্রবাহের মান,

$I = I_0 \sin \omega t$; এখানে, I_0 = প্রবাহের শীর্ষমান, ω = কৌণিক কম্পাঙ্ক

$\therefore I^2 = I_0^2 \sin^2 \omega t$ .... (1)

সুতরাং I^2 একটি ধনাত্মক রাশি।

সুতরাং সমগ্র পর্যায়কালে অর্থাৎ পূর্ণ চক্রের জন্য এদের গড় মান শূন্য হবে না।

সুতরাং, $\bar{I}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T I^2 dt$ এখানে, T = পর্যায়কাল

$$\therefore \bar{I}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T I_0^2 \sin^2\omega t dt \quad [\because I = I_0 \sin \omega t]$$

$$= \frac{I_0^2}{T}\int_0^T \sin^2\omega t \ dt$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}\int_0^T 2\sin^2\omega t \ dt$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}\int_0^T (1 - \cos 2\omega t) \ dt$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}\left[t - \frac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right]_0^T$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}\left[\left(T - \frac{\sin 2\omega T}{2\omega}\right) - (0 - \sin 0)\right]$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}\left(T - \frac{\sin 2.\frac{2\pi}{T}.T}{2\omega}\right)$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}\left(T - \frac{\sin 4\pi}{2\omega}\right)$$

$$= \frac{I_0^2}{2T}(T - 0) = \frac{I_0^2}{2}\left[\because \omega = \frac{2\pi}{T}\right]$$

$$\therefore I_{r.m.s} = \sqrt{\bar{I}^2} = \sqrt{\frac{I_0^2}{2}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

$$= 0.707 I_0$$

সুতরাং, দিক পরিবর্তী প্রবাহের গড়বর্গের বর্গমূল মান এর শীর্ষমানের .707 গুণ বা 70.7%।

প্রশ্ন-৭৩. দিক পরিবর্তী তড়িৎ চালক বলের গড় বর্গের বর্গমূল মান ও এর শীর্ষমানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করুন।

অথবা, দেখান যে, দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক শক্তির গড় বর্গের বর্গমূল মান-এর শীর্ষমানের 0.707 গুণ বা 70.7%।

অথবা, দিক পরিবর্তী প্রবাহের দরুণ দেখান যে, $\varepsilon_{r.m.s} = 0.707 \, \varepsilon_0$ বা $\frac{1}{\sqrt{2}} \varepsilon_0$

প্রমাণ : কোনো বদ্ধ কুণ্ডলীকে একটি সুষম চৌম্বক ক্ষেত্রে ω কৌণিক বেগে ঘুরানোর ফলে আবিষ্ট তড়িচ্চালক বলের শীর্ষমান ε_0 হলে, আমরা জানি, t সময়ে পরিবর্তী তড়িচ্চালক বলের মান,

$\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$

$\therefore \varepsilon^2 = \varepsilon_0^2 \sin^2 \omega t$ .... (1)

সুতরাং ε^2 সর্বদা ধনাত্মক রাশি

কাজেই সমগ্র পর্যায়কাল T- তে বা একটি পূর্ণচক্রে ε^2 এর গড় মান শূন্য হবে না।

সুতরাং একটি পূর্ণচক্রে ε^2-এর গড়,

$$\bar{\varepsilon}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T \varepsilon^2 dt$$

$$= \frac{1}{T}\int_0^T \varepsilon^2{}_0 \sin^2 \omega t \ dt; (1) \text{ হতে}$$

$$= \frac{\varepsilon_0^2}{2T}\int_0^T 2\sin^2\omega t \ dt$$

$$= \frac{\varepsilon_0^2}{2T}\int_0^T (1 - \cos 2\omega t) \ dt$$

$$= \frac{\varepsilon_0^2}{2T}\left[t - \frac{\sin 2\omega t}{2\omega}\right]_0^T$$

$$= \frac{\varepsilon_0^2}{2T}\left[T - \frac{\sin 2\omega T}{2\omega}\right]_0^T$$

$$= \frac{\varepsilon_0^2}{2T}\left[T - \frac{\sin 4\pi}{2\omega}\right]; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$= \frac{\varepsilon_0^2}{2T}[T - 0]; \sin 4\pi = 0$$

বা, $\bar{\varepsilon}^2 = \frac{\varepsilon^2{}_0}{2}$

বা, $\varepsilon_{r.m.s} = \sqrt{\frac{\varepsilon^2{}_0}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon_0 = 0.707\varepsilon_0$ (দেখানো হল)

প্রশ্ন-৭৪. দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক বলের মান ও শীর্ষ মানের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করুন।

অথবা, কোনো দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক বলের জন্য দেখান যে, $\bar{\varepsilon} = 0.637\varepsilon_0$

উত্তর : কোনো দিক পরিবর্তী তড়িচ্চালক বলের গড় মান বলতে সম্পূর্ণ চক্রের এক অর্ধে তড়িচ্চালক বলের যে বিভিন্ন মান পাওয়া যায় তার গড় মানকে বুঝায়।

তড়িচ্চালক বল, $\varepsilon = \varepsilon_0 \sin \omega t$

ε_0 = তড়িচ্চালক বলের শীর্ষমান

t = সময়

এখন অর্ধচক্রের জন্য সময়, $t = \frac{T}{2}$

পর্যায়কাল T হলে, আমরা জানি অর্ধচক্রের জন্য গড় তড়িচ্চালক শক্তি হবে,

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{T/2}\int_0^{T/2} \varepsilon \, dt$$

$$= \frac{2}{T}\int_0^{T/2} \varepsilon_0 \sin \omega t \, dt$$

$$= \frac{-2\varepsilon_0}{\omega T}[\cos \omega t]_0^{T/2}$$

$$= -\frac{2\varepsilon_0}{\omega T}[\cos\frac{\omega T}{2} - \cos 0]$$

$$= -\frac{2\varepsilon_0}{2\pi}[\cos \pi - \cos 0] \quad [\because \omega = \frac{2\pi}{T}]$$

$$= -\frac{\varepsilon_0}{\pi}[-1-1] = \frac{2\varepsilon_0}{\pi} = \frac{2}{\pi}\varepsilon_0$$

$$\therefore \ \varepsilon^{\bar{2}} = 0.637\, \varepsilon_0$$

সুতরাং অর্ধচক্রের জন্য গড় তড়িচ্চালক শক্তি হচ্ছে তড়িচ্চালক শক্তির শীর্ষ মানের 0.637 গুণ বা 63.7%।

○ প্রশ্ন-৭৫. একটি বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

উত্তর : বিশুদ্ধ রেজিস্টিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সম্পর্ক Current and voltage relation in pure resistive Ckt.) :

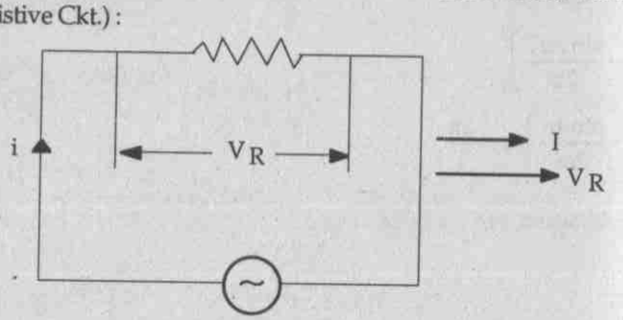

$V = V_m \sin \omega t$

যখন বিশুদ্ধ রেজিস্ট্যান্সের আড়াআড়িতে একটি অল্টারনেটিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ (অর্থাৎ কারেন্ট) সরবরাহের প্রথম অর্ধ-সাইকেল একদিকে এবং অপর অর্ধ-সাইকেল বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। এভাবেই সার্কিটে অল্টারনেটিং কারেন্ট কাজ করে।

উপরোক্ত সার্কিটটিই বিবেচনা করা যাক, যাতে R ওহ্ম বিশিষ্ট একটি বিশুদ্ধ রেজিস্ট্যান্স একটি অল্টারনেটিং ভোল্টেজ উৎসের আড়াআড়িতে সংযোগ করা হয়েছে। মনে করি, অল্টারনেটিং ভোল্টেজটির সমীকরণ।

$v = V_{max} \sin\omega t$ .... (i)

এ ভোল্টেজের কারণে, সার্কিটে একটি অল্টারনেটিং কারেন্ট i প্রবাহিত হবে। প্রয়োগকৃত ভোল্টেজকে শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্স ড্রপকেই অতিক্রম করতে হবে, অর্থাৎ

$v = iR$

অথবা $i = v/R$

(i) নং সমীকরণে v-এর মান বসিয়ে আমরা পাই

$i = \frac{V_{max}}{R} \sin\omega t$ .... (ii)

i-এর মান সর্বোচ্চ I_{max} হবে তখন, যখন $\sin\omega t = 1$ হবে।

$\therefore I_{max} = V_{max}/R$

সুতরাং (ii) নং সমীকরণটি দাঁড়াবে—

$i = I_{max} \sin\omega t$ .... (iii)

এটিই নির্ণেয় সম্পর্ক

○ প্রশ্ন-৭৬. একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সম্পর্ক প্রতিপাদন করুন।

উত্তর : বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে ভোল্টেজ এবং কারেন্ট সম্পর্ক (Current and voltage relation in a pure capacitive ckt) : যখন একটি ক্যাপাসিটরের প্লেটের আড়াআড়িতে একটি অল্টারনেটিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, তখন ক্যাপাসিটর একদিকে চার্জ হয়। আবার যখন ভোল্টেজের দিক পরিবর্তিত হয়, তখন তা অন্যদিকে চার্জ হয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, প্লেটগুলোকে সংযুক্ত রেখে ইলেকট্রন একবার একদিকে এবং আবার অন্যদিকে ঘুরে বেড়ায়; ফলে অল্টারনেটিং কারেন্টের সৃষ্টি হয়।

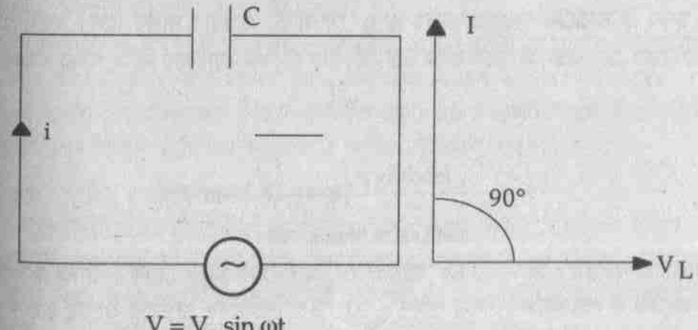

$V = V_m \sin \omega t$

চিত্রে ধরা যাক C ফ্যারাড ক্যাপসিট্যান্সের একটি ক্যাপাসিটরে একটি অল্টারনেটিং ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলো। মনে করি, প্রয়োগকৃত অল্টারনেটিং ভোল্টেজের সমীকরণ—

$v = V_{max} \sin\omega t$ .... (i)

এ অল্টারনেটিং ভোল্টেজের কারণে সার্কিটটিতে অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রবাহিত হবে। মনে করি, যে কোনো মুহূর্তে কারেন্ট i এবং প্লেটের চার্জ q,

ক্যাপাসিটরে চার্জ, $Q = CV$

$= CV_{max} \sin\omega t$

$\therefore$ সার্কিটে কারেন্ট, $i = \frac{d}{dt}(q)$

$$= \frac{d}{dt}(CV_{max}\sin\omega t)$$

$$= \omega C V_{max}\cos\omega t$$

অথবা, $i = \omega CV_{max}\sin(\omega t + \pi/2)$ .... (ii)

i-এর মান সর্বোচ্চ (I_{max}) হবে তখন, যখন $\sin(\omega t + \pi/2) = 1$ হবে।

$\therefore I_{max} = \omega CV_{max}$

(ii) নং সমীকরণে $\omega CV_{max} = I_{max}$ বসিয়ে আমরা পাই,

$i = I_{max}\sin(\omega t + \pi/2)$ .... (iii)

এটিই নির্ণেয় সম্পর্ক

○ প্রশ্ন-৭৭. ল্যাগিং, লিডিং ও ইউনিট পাওয়ার ফ্যাক্টর বলতে কি বোঝায়?

উত্তর : ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : যখন কোন সার্কিটে ক্যাপাসিটিভ লোডের চেয়ে Inductive লোডের পরিমাণ বেশি থাকে তখন ঐ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর (p.f) কে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ যে সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজের পিছনে থাকে, তাকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

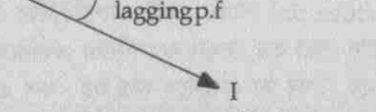

চিত্র : ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর

লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : যখন কোনো সার্কিটে Inductive লোডের চেয়ে Capacitive লোডের পরিমাণ বেশি থাকে তখন ঐ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর (P.f) কে লীডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ যে সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজের চেয়ে অগ্রগামী থাকে তখন উক্ত সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

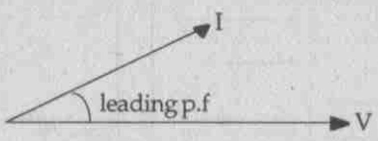

চিত্র : লীডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর

ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর : বিশুদ্ধ রোধে কারেন্ট ও ভোল্টেজের মধ্যে কোন কৌণিক ব্যবধান থাকে না। অর্থাৎ কারেন্ট ও ভোল্টেজের ফেজ কোণ $\varphi = 0$, উক্ত সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর এক বা ইউনিট ($\cos 0° = 1$) হয়। একে ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

চিত্র : ইউনিটি পাওয়ার ভেক্টর

○ প্রশ্ন-৭৮. একটি ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে থাকে কেন?

উত্তর : ইন্ডাকট্যান্স-এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়, অর্থাৎ কারেন্ট বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাধা দেয় এবং কমতে থাকলেও বাধা দেয়। সেই কারণে, কারেন্ট প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের পিছনে থাকতে বাধ্য হয়।

○ প্রশ্ন-৭৯. একটি ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের অগ্রগামী হয় কেন?

উত্তর : ক্যাপাসিট্যান্স ভোল্টেজের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজের হ্রাস বৃদ্ধিতে বিলম্ব ঘটায়। এ কারণে ভোল্টেজ কারেন্টের পিছনে পড়ে যায়। অর্থাৎ কারেন্ট, ভোল্টেজের অগ্রবর্তী থাকে।

○ প্রশ্ন-৮০. একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকট্যান্সে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

উত্তর : পাওয়ার ওয়েভের সাইকেলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সাইকেলের অর্ধাংশ যখন পজিটিভ, তখন এনার্জি বা শক্তি ইনডাকটরের চারদিকে চৌম্বক ক্ষেত্র বিনির্মাণ করে। আবার সাইকেলের পরবর্তী অর্ধাংশ যখন নেগেটিভ, তখন চৌম্বক শক্তি উৎসে ফিরে আসে। যেহেতু এক সাইকেল জুড়ে সরবরাহকৃত পাওয়ার ফেরতকৃত পাওয়ারের সমান, সেহেতু ইনডাকটর কর্তৃক ব্যয়িত প্রকৃত পাওয়ার শূন্য হয়।

○ প্রশ্ন-৮১. একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটরে পাওয়ার অপচয় শূন্য হয় কেন?

উত্তর : পাওয়ার ওয়েভের সাইকেলের দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, সাইকেলের অর্ধাংশ যখন পজিটিভ, তখন শক্তি বা এনার্জি ক্যাপাসিটরের প্লেট দু'টির মধ্যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফিল্ড বিনির্মাণে প্রয়োগ হয়। আবার সাইকেলের পরবর্তী অর্ধাংশ যখন নেগেটিভ, তখন ইলেকট্রো স্ট্যাটিক ফিল্ড এনার্জি উৎসে ফেরত আসে। যেহেতু এক সাইকেল জুড়ে সরবরাহকৃত পাওয়ার, ফেরতকৃত পাওয়ারের সমান; সেহেতু ক্যাপাসিটর কর্তৃক ব্যয়িত প্রকৃত পাওয়ার শূন্য।

○ প্রশ্ন-৮২. 'ইন-ফেজ' কারেন্ট বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এসি রেজিস্টিভ সার্কিটে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ এবং সার্কিট কারেন্টের মধ্যে সময় কোণের ব্যবধান নেই, অর্থাৎ ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই মুহূর্তে তাদের শূন্য মান অতিক্রম করে এবং একই সময়ে তার সর্বোচ্চ পজিটিভ ও সর্বোচ্চ নেগেটিভ মানে পৌঁছে। এ কারেন্টকে 'ইন-ফেজ' কারেন্ট বলে।

○ প্রশ্ন-৮৩. 'ল্যাগিং কারেন্ট' বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ইন্ডাকট্যান্স, তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অল্টারনেটিং কারেন্টের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে, অর্থাৎ কারেন্ট বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাধা দেয় এবং কমতে থাকলেও বাধা দেয়। সেই কারণে, কারেন্ট প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের পিছনে থাকতে বাধ্য হয়। একটি বিশুদ্ধ ইন্ডাকট্যান্সে কারেন্ট ভোল্টেজের ৯০° পিছনে থাকে। এ কারেন্টকে 'ল্যাগিং-কারেন্ট' বলে।

○ প্রশ্ন-৮৪. 'লিডিং কারেন্ট' বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : ক্যাপাসিট্যান্স অল্টারনেটিং ভোল্টেজের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা প্রদান করে, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিলম্ব ঘটায়। এ কারণে ভোল্টেজ কারেন্টের পিছনে পড়ে যায়; অর্থাৎ কারেন্ট, ভোল্টেজের অগ্রগামী থাকে। একটি বিশুদ্ধ ক্যাপাসিট্যান্সে কারেন্ট ভোল্টেজের ৯০° অগ্রগামী থাকে। এ কারেন্টকে 'লিডিং-কারেন্ট বলে।

○ প্রশ্ন-৮৫. কোন্ ধরনের সার্কিটে 'ইন-ফেজ' কারেন্ট থাকে এবং কেন?

উত্তর : এসি রেজিস্টিভ সার্কিটে 'ইন-ফেজ' কারেন্ট থাকে। এ সার্কিটে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ এবং সার্কিট কারেন্টের মধ্যে সময় কোণের পার্থক্য নেই, অর্থাৎ ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই মুহূর্তে তাদের শূন্য-মান অতিক্রম করে এবং একই সময়ে এটির সর্বোচ্চ পজিটিভ ও সর্বোচ্চ নেগেটিভ মানে পৌঁছে।

○ প্রশ্ন-৮৬. কোন্ ধরনের সার্কিটে 'ল্যাগিং কারেন্ট' থাকে এবং কেন?

উত্তর : এসি ইন্ডাকটিভ সার্কিটে কারেন্ট 'ল্যাগ' করে অর্থাৎ কারেন্ট ভোল্টেজে পিছনে থাকে। এ কারণে এ কারেন্টকে 'ল্যাগিং কারেন্ট' বলে। ইন্ডাকটিভ সার্কিটে ইন্ডাকট্যান্স, এটির মধ্য দিয়ে

প্রবাহিত কারেন্টের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়; অর্থাৎ কারেন্ট বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাধা দেয় এবং কমতে থাকলেও বাধা দেয়। সেজন্য কারেন্ট প্রয়োগকৃত ভোল্টেজের পিছনে থাকতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন-৮৭. কোন্ ধরনের সার্কিটে 'লিডিং কারেন্ট' থাকে এবং কেন?

উত্তর : এসি ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে কারেন্ট 'লিড' করে, অর্থাৎ কারেন্ট ভোল্টেজের অগ্রবর্তী থাকে। এ কারণে এ কারেন্টকে 'লিডিং কারেন্ট' বলে। ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে ক্যাপাসিট্যান্স ভোল্টেজের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়, অর্থাৎ ভোল্টেজের যে কোনো পরিবর্তনে বাধা দেয়, অর্থাৎ ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজের হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিলম্ব ঘটায়। এ কারণে ভোল্টেজ কারেন্টের পিছনে পড়ে যায়।

বর্তনীর বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সম্পর্ক এবং দশা চিত্র
Relationship among the elements of the circuit and phasor diagram

প্রশ্ন-৮৮. Complex number কি?

উত্তর : a এবং b বাস্তব সংখ্যা হলে a + jb আকারের সংখ্যাকে complex number (জটিল সংখ্যা) বলে। এখানে a ও jb যথাক্রমে জটিল সংখ্যার বাস্তব এবং কাল্পনিক অংশ। জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশ শূন্য হলে, জটিল সংখ্যাটিকে কাল্পনিক সংখ্যা এবং কাল্পনিক অংশ শূন্য হলে জটিল সংখ্যাটিকে বাস্তব সংখ্যা বলে।

প্রশ্ন-৮৯. পোলার ভেক্টর ও রেক্ট্যাংগুলার ভেক্টর কি?

উত্তর : পোলার ভেক্টর (Vector in polar form) : স্থানাঙ্ক-তলে (Coordinate plane) অবস্থিত যে ভেক্টরকে তার পরিমাণ (Magnitude) এবং 'রেফারেন্স অ্যাক্সিস'-এর সাথে সৃষ্ট কোণ (angle) দ্বারা নিরূপণ করা হয়, তাকে পোলার ভেক্টর বলে।

পোলার ভেক্টরের পরিমাণ (Magnitude) কে 'মডুলাস' (modulus) এবং নির্দেশক কোণকে 'আরগুমেন্ট' (Argument) বলে। যথা—$120 \angle 30°$ একটি পোলার ভেক্টর। এখানে 120 মডুলাস এবং 30° আরগুমেন্ট।

রেকট্যাংগুলার ভেক্টর (Vector in rectangular form) : যে ভেক্টরকে এর অনুভূমিক (Horizontal) এবং উল্লম্ব (Vertical) উপাদানের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়, তাকে রেকট্যাংগুলার ভেক্টর বলে।'

এ ভেক্টরকে দ্বিপদ বা জটিল-রাশি হিসেবে প্রকাশ করা হয়, যার প্রথম পদ অনুভূমিক উপাদান এবং দ্বিতীয়-পদ উল্লম্ব উপাদান দ্বারা গঠিত।

ভেক্টরটির অবস্থান কোন্ পাদে (Quadrant) তা প্রতিটি উপাদানের পূর্বের চিহ্ন (Sign) দ্বারা নির্ণয় করা হয়। +H এবং + V উপাদান দ্বারা গঠিত একটি রেকট্যাংগুলার ভেক্টরের অবস্থান প্রথম পাদে; –H এবং +V দ্বিতীয় পাদে; এবং –H এবং –V তৃতীয় পদে; +H এবং –V চতুর্থ পাদে। 'J' প্রতীক ব্যবহার করে উল্লম্ব উপাদানকে অনুভূমিক উপাদান হতে পৃথক করা হয় এবং J- কে বলা হয় জটিল-চালক (Complex-operator)।

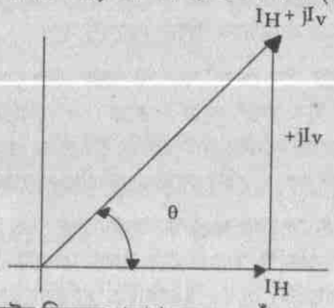

E ভেক্টরকে রেকট্যাংগুলার ভেক্টর হিসেবে প্রকাশ করলে এ দাঁড়াবে— $E = E_H + JE_v$

প্রশ্ন-৯০. পোলার ও রেকট্যাংগুলার ভেক্টরের মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

উত্তর : পোলার এবং রেকট্যাংগুলার ভেক্টরের মধ্যে সম্পর্ক (Relationship between polar and rectangular vectors) :

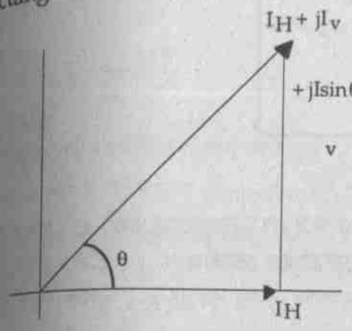

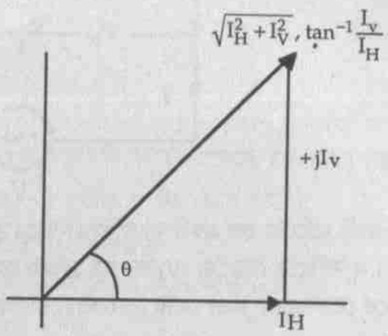

একটি পোলার ভেক্টরকে রেকট্যাংগুলার ভেক্টরে রূপান্তরিত করা যায় এবং তা চিত্রে দেখানো হয়েছে। এ রূপান্তরের জন্যে ব্যবহৃত সমীকরণটি নিম্নে প্রদত্ত হলো :

$I\angle\theta = I\cos\theta + j\ I\sin\theta$

এখানে Icosθ, I<θ ভেক্টরটির আনুভূমিক উপাদান (Horizontal component) এবং j Isinθ উল্লম্ব উপাদান (Vertical component)।

অনুরূপভাবে, রেকট্যাংগুলার ভেক্টরকে পোলার ভেক্টরে নিম্নলিখিতভাবে রূপান্তরিত করা যায়, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে ঃ

$$\sqrt{I_H^2 + I_v^2}\ \underline{\left|\tan^{-1}\left(\frac{I_V}{I_H}\right)\right.}$$

প্রশ্ন-৯১. R–L ও R–C সার্কিট কি?

উত্তর : রেজিস্ট্যান্স এবং ইন্ডাকট্যান্স সিরিজ (Circuit containing resistance and inductance) : সার্কিট চিত্র :

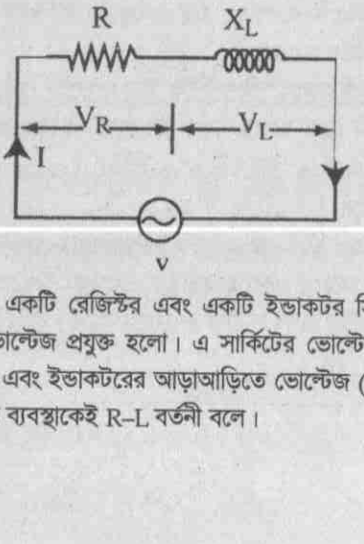

উপরোক্ত চিত্রটি ধরা যাক। একটি রেজিস্টর এবং একটি ইন্ডাকটর সিরিজে সংযুক্ত করে সেটির আড়াআড়িতে একটি এসি ভোল্টেজ প্রযুক্ত হলো। এ সার্কিটের ভোল্টেজ (V) অবশ্যই রেজিস্টরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ (V_R) এবং ইন্ডাকটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ (V_L)-এর ভেক্টর (বা ফেজর) যোগফলের সমান হবে। প্রদত্ত ব্যবস্থাকেই R–L বর্তনী বলে।

R–C সার্কিট :

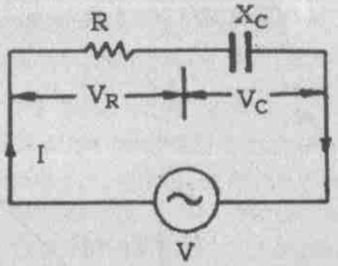

ধরা যাক, একটি রেজিস্টর এবং একটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত করে এর আড়াআড়িতে একটি এসি ভোল্টেজ প্রযুক্ত হল। এ সার্কিটের ভোল্টেজ (V) অবশ্যই রেজিস্টরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ (V_R) এবং ক্যাপাসিটরের আড়াআড়িতে ভোল্টেজ (V_C)-এর ভেক্টর (বা ফেজর) যোগফলের সমান। প্রদত্ত ব্যবস্থাই R–C বর্তনী।

○ প্রশ্ন-৯২. R-L সার্কিটের ভেক্টর বা ফেজর চিত্র অংকন করুন এবং ইম্পিড্যান্সের সংজ্ঞা দিন।

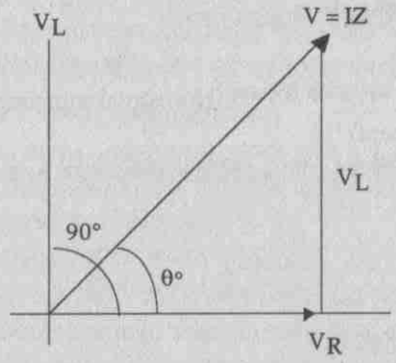

উত্তর : R–L সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজের ভেক্টর (বা ফেজর) চিত্রে দেখানো হয়েছে। ভেক্টর চিত্র অঙ্কনের সময় কারেন্টকে 'রেফারেন্স অ্যাক্সিস' ধরা হয়েছে। কারণ, সিরিজ সার্কিটের সকল অংশে কারেন্ট একই থাকে এবং ভোল্টেজ বিভক্ত হয়। তাই এ ধরনের সার্কিটের ভেক্টর (বা ফেজর) চিত্রে কারেন্টকে সবসময় রেফারেন্স' ভেক্টর ধরা হয়।

চিত্রানুযায়ী কারেন্ট ভেক্টরকে অনুভূমিকভাবে দক্ষিণ দিকে টানা হয়েছে। রেজিস্টরে IR-ড্রপের সমান V_R ভোল্টেজকে কারেন্টের সাথে একই রেখা বরাবর অর্থাৎ 'ইন ফেজ'-এ টানা হয়েছে। কয়েলে IX_L-ড্রপের সমান V_L ভোল্টেজকে কারেন্টের চেয়ে 90° অগ্রগামী অর্থাৎ 'লিডিং' (Leading)-এ টানা হয়েছে।

R–L সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স :

চিত্রে দু'টি ভোল্টেজ ড্রপ (V_R এবং V_L)-এর যোগফলই প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ V-এর সমান দেখানো হয়েছে। যেহেতু এ ভোল্টেজ ড্রপদ্বয় 90° দূরত্বে অবস্থিত, সেহেতু সরবরাহ ভোল্টেজ বা প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ (V), এ ভোল্টেজ-ড্রপদ্বয়ের বর্গের সমষ্টির বর্গমূলের সমান। গাণিতিকভাবে—

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2} \quad .... (i)$$

$$= \sqrt{(IR)^2 + (IX_L)^2}$$

$$= \sqrt{I^2(R^2 + V_L^2)}$$

$$= I\sqrt{R^2 + X_L^2}$$

$$\therefore I = \frac{V}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{V}{Z}$$

উপরোক্ত সমীকরণটি হতে দেখা যায় যে, $\sqrt{R^2 + X_L^2}$ রাশিটি কারেন্ট প্রবাহে বাধা প্রদান করে এবং একেই সার্কিটের ইম্পিড্যান্স (Impedance) বলে। এর প্রতীক Z এবং একক ওহম।

○ প্রশ্ন-৯৩. R-C সার্কিটের ভেক্টর বা ফেজর চিত্র অংকন করুন।

উত্তর : R–C সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজের ভেক্টর (বা ফেজর) চিত্রে দেখানো হয়েছে।

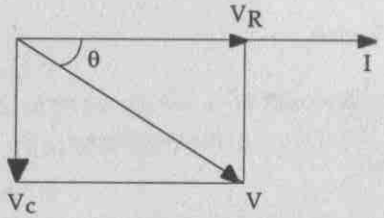

R-L সার্কিটের ন্যায় R–C সিরিজ সার্কিটের সকল অংশেই কারেন্ট একই থাকে বিধায় কারেন্টকে 'রেফারেন্স অ্যাক্সিস' ধরা হয়েছে এবং সার্কিটের বিভিন্ন অংশের ভোল্টেজের ভেক্টর যোগফল সরবরাহ ভোল্টেজের সমান হবে। চিত্রানুযায়ী, কারেন্ট ভেক্টরকে অনুভূমিকভাবে দক্ষিণ দিকে আঁকা হয়েছে। রেজিস্টরে IR ড্রপের সমান V_R ভোল্টেজকে কারেন্টের সাথে একই রেখা বরাবরে অর্থাৎ 'ইন ফেজে' আঁকা হয়েছে। ক্যাপাসিটরে IX_C ড্রপের সমান, V_c ভোল্টেজকে কারেন্টের চেয়ে 90° পিছনে অর্থাৎ 'ল্যাগিং'-এ (lagging) টানা হয়েছে।

○ প্রশ্ন-৯৪. R–L–C সার্কিট কি?

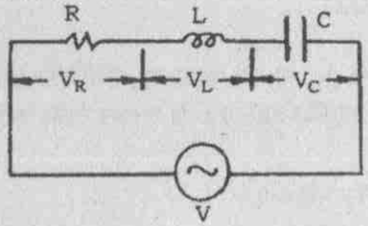

যখন, রেজিষ্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স দ্বারা গঠিত সিরিজ সার্কিটে এসি ভোল্টেজ প্রযুক্ত হয়, তখন এটি নিশ্চিত যে, সার্কিটের সর্বত্র কারেন্ট একই থাকে এবং সরবরাহকৃত ভোল্টেজ, প্রতিটি অংশের ভোল্টেজের ভেক্টরের যোগফলের সমান হয়। একেই R–L–C সার্কিট বলে।

○ প্রশ্ন-৯৫. R-L, R–C এবং R–L–C সার্কিটের পাওয়ার, পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় করুন।

উত্তর : R–L সিরিজ সার্কিট :

পাওয়ার : আমরা জানি,

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P = v \times i$

$$= V_{max} \sin\omega t \times I_{max} \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m [2 \sin\omega t \sin(\omega t - \theta)]$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m [\cos\theta - \cos(2\omega t - \theta)$$

$$= \frac{1}{2} V_m I_m \cos\theta - \frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t - \theta)$$

তাৎক্ষণিক পাওয়ারের দুটি অংশ :

১. স্থির অংশ : $= \frac{1}{2} V_m I_m \cos\theta$

২. পালসেটিং অংশ : $\frac{1}{2} V_m I_m \cos(2\omega t - \theta)$

এক সাইকেলে যার গড় মান শূন্য।

$\therefore$ গড় পাওয়ার, $P = \frac{V_m I_m}{2} \cos\theta$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} \times \cos\theta$$

$$P = VI \cos\theta$$

পাওয়ার ফ্যাক্টর :

$\cos\theta$ অংশটিকে সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে এবং এর মান ভেক্টর চিত্র হতে নির্ণয় করা যায়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos\theta = \frac{IR}{IZ}$

$$= R/Z$$

অন্যভাবে, $P = VI \cos\theta$

$$= (IZ)\, I(R/Z)$$

$[\because V = IZ$ এবং $\cos\theta = R/Z]$

$$P = I^2 R$$

এর অর্থ হলো, শুধুমাত্র রেজিস্ট্যান্সেই (R) পাওয়ার অপচয় হয়, ইনডাকট্যান্সে কোনো পাওয়ার অপচয় হয় না। ইন্ডাক্টিভ সার্কিটে ফেজ-কোণ নেগেটিভ হয় বিধায় এর পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং (Lagging) হয়।

R–C সিরিজ সার্কিট :

পাওয়ার : ভোল্টেজ এবং কারেন্টের সমীকরণ :

$v = V_{max} \sin\omega t$

$i = I_{max} \sin(\omega t + \theta)$

পূর্বের ন্যায়

গড় পাওয়ার, $p = vi$-এর গড়

$$= VI \cos\theta$$

অন্যভাবে, $P = R$-এ পাওয়ার $+ C$-এ পাওয়ার

$$= I^2 R + 0$$

$$= IR \times I$$

$$= IR \times \frac{V}{Z}$$

$$= VI \times \frac{R}{Z}$$

$$= VI \cos\theta \, [\because \cos\theta = \frac{R}{Z}]$$

পাওয়ার ফ্যাক্টর :

R–L সিরিজ সার্কিটের ন্যায় R–C সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় করা হয়।

পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos\theta = \frac{IR}{IZ}$

$$= R/Z$$

ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে ফেজ-কোণ পজিটিভ হয় বিধায় এর পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং (leading) হয়।

R – L – C সিরিজ সার্কিট :

পাওয়ার :

যদি R–L–C সিরিজ সার্কিটে প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ সমীকরণ $v = V_{max} \sin\omega t$ হয়, তবে কারেন্ট সমীকরণ হবে $i = I_{max} \sin(\omega t \pm \theta)$ তাৎক্ষণিক পাওয়ার $p = v \times i$

$= V_{max} \sin\omega t \times I_{max} \sin(\omega t \pm \theta)$

θ-এর মান পজিটিভ বা নেগেটিভ হবে, তা নির্ভর করবে রিয়্যাকট্যান্স (X_L অথবা Xc) এর উপর। যদি $X_L > X_c$ হয়, তবে θ পজিটিভ হবে এবং যদি $X_c > X_L$ হয়, তবে θ নেগেটিভ হবে।

যা হোক, উপরোক্ত সমীকরণটি সমাধান করলে, আমরা পাই,

$P = VI \cos\theta = (IZ)\, I \times \frac{R}{Z}$

$= I_2 R$

এর কারণ হলো L অথবা C কোনটাতেই পাওয়ার অপচয় হয় না।

পাওয়ার ফ্যাক্টর :

R–L–C সিরিজ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর,

$\cos\theta = \frac{R}{Z}$

$= \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_c)^2}}$

১. যখন $X_L > X_c$ হবে, তখন ফেজ-কোণ θ নেগেটিভ হবে এবং সার্কিটটি ইন্ডাক্টিভ হবে। এরূপ ক্ষেত্রে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে (lagging) থাকবে, অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে ল্যাগিং।

২. আবার যখন $X_c > X_L$ হবে, তখন ফেজ-কোণ θ পজিটিভ হবে এবং সার্কিটটি হবে ক্যাপাসিটিভ। এরূপ ক্ষেত্রে, সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজের অগ্রগামী (Leading) থাকবে অর্থাৎ পাওয়ার ফ্যাক্টর হবে লিডিং।

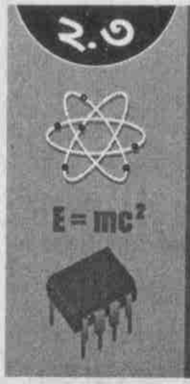

তিন ফেজ পদ্ধতির সূচনা, উৎপাদন, প্রেরণ ও বন্টনের প্রাথমিক ধারণা, ক্ষমতার বিভিন্ন ধাপ, বিবর্ধকের মৌলিক ধারণা, (রেডিও, টেলিভিশন এবং রাডার), আধুনিক যন্ত্রাংশ এবং আধুনিক অখণ্ড বর্তনী, অখণ্ড বর্তনীর সংঘাত, আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রদর্শন যন্ত্র।

Introduction to 3 phase system, Elementary concepts of Generation, Transmission and distribution, Various levels of power, Basic Concepts of transformers, radio, television and radar, Digital devices and digital integrated circuits, impact of digital integrated circuits, counters and digital display devices, digital instruments.

○ প্রশ্ন-৯৬. তিন ফেজ পদ্ধতি (3 phase system) কি?

উত্তর : দুই বা ততোধিক অনুরূপ এক ফেজ পদ্ধতি সমবায়ে পলি ফেজ বা বহু ফেজ পদ্ধতি গঠিত হয়; যাতে স্বতন্ত্র ভোল্টেজ তরঙ্গের সর্বোচ্চ মান একই ক্ষণে অনুষ্ঠিত হয় না। যখন তিনটি এক ফেজ পরস্পরের সাথে 120° ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রিতে অন্ত:সংযুক্ত থাকে তখন তাকে তিন ফেজ পদ্ধতি বলে।

○ প্রশ্ন-৯৭. তিন ফেজ পদ্ধতির ভেক্টর চিত্র অংকন করুন।

উত্তর : পলি-ফেজ (তিন) পাওয়ার সিস্টেমের ভেক্টর চিত্র (Vector diagram for a poly-phase power system) :

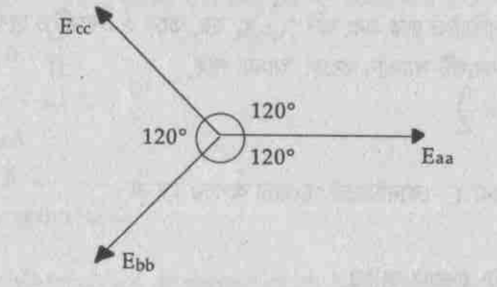

○ প্রশ্ন-৯৮.. এক ফেজ পদ্ধতির চেয়ে পলিফেজ পদ্ধতির সুবিধা সমূহ লিখুন।

উত্তর : এক-ফেজ পদ্ধতির চেয়ে পলি-ফেজ পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:

নিম্নলিখিত সুবিধাগুলোর জন্যে এক-ফেজ পদ্ধতির চেয়ে পলি-ফেজ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় :

(i) এক-ফেজ পদ্ধতির চেয়ে পলি-ফেজ পদ্ধতিতে একই দূরত্বে একই পাওয়ার প্রেরণে তামা কম লাগে।

(ii) এক-ফেজ মটর কর্তৃক সৃষ্ট ঘূর্ণন (torqule) স্পন্দনযুক্ত, যেখান পলি-ফেজ মটর কর্তক সৃষ্ট ঘূর্ণন স্থির প্রকৃতির। এটা এই কারণে হয় যে, এক-ফেজ সরবরাহ কর্তৃক সৃষ্ট-ফ্লাক্স স্পন্দনযুক্ত, যেখানে পলি-ফেজ সরবরাহ কর্তৃক সৃষ্ট-ফ্লাক্স ঘূর্ণয়মান।

(iii) একই উৎপাদনের (Output) জন্যে এক-ফেজ মটরের তুলনায় পলি-ফেজ মটরের আকার ছোট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ও দক্ষতা (Efficiency) অনেক ভাল।

(iv) কম্যুটেটর মটর ব্যতীত এক-ফেজ মটরের স্টার্টিং টর্ক নেই-কিন্তু পলি-ফেজ মটর সেলফ স্টার্টিং।

(v) একই ভোল্টেজ এবং কে. ভি. এ. এর জন্যে এক-ফেজ ট্রান্সফরমারের তুলনায় পলি-ফেজ ট্রান্সফরমার হালকা, দক্ষ ও সস্তা।

(vi) পরিবর্তনশীল আরমেচার প্রতিক্রিয়ার (Reaction) কারণে এক-পেজ অল্টারনেটর সমলয় (Synchronize) কারা অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু পলি-ফেজ অল্টারনেটরের বেলায় তা নয়।

(vii) এক-ফেজ লোডকে পলি-ফেজ পদ্ধতি হতে উদ্যমশীল (energize) করা যায়, কিন্তু পলি ফেজ লোডকে এক-ফেজ পদ্ধতি হতে উদ্যমশীল করা যায় না- যদি না এক-ফেজ পদ্ধতিকে পলি-ফেজ পদ্ধতিতে রূপান্তরিত করা হয়। এ পরিবর্তনের জন্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি জটিল এবং ব্যয়বহুল।

○ প্রশ্ন-৯৯. ত্রি-ফেজ পাওয়ার সিস্টেমের ফেজ-সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম অংকন করুন।

উত্তর : ত্রি-ফেজ পাওয়ার সিস্টেমের ফেজ-সিকুয়েন্স ডায়াগ্রাম অংকন : তিন-ফেজ অলটারনেটরের ফেজ-ভোল্টেজ সমূহের ফেজ ক্রম $E_{aa'}$, $E_{bb'}$, $E_{cc'}$ যখন ফিল্ড দক্ষিণ বর্তে ঘুরে, অর্থাৎ $E_{aa'}$ ভোল্টেজ-তরঙ্গের 120° টাইম ডিগ্রি পরে $E_{bb'}$ তরঙ্গ এবং উহারও 120° পরে $E_{cc'}$, তরঙ্গ অনুসরণ করে। এক্ষেত্রে ফেজ-সিকুয়েন্স R–Y-B।

চিত্রের ভোল্টেজ তরঙ্গ-এ ফেজ-ক্রম ক্লক-ওয়াইজ হয়েছে।

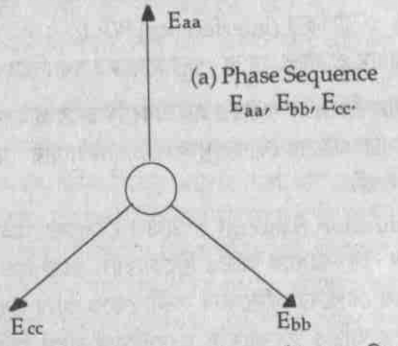

চিত্র : ফেজ-সিকুয়েন্স a – b – c (ক্লক-ওয়াইজ ফেজ-সিকুয়েন্স)

অন্যদিকে অল্টারনেটরের ফিল্ড বামাবর্তে ঘুরলে ফেজ-ক্রম হয় $E_{aa'}$, $E_{cc'}$, $E_{bb'}$। এ ক্ষেত্রে ফেজ-সিকুয়েন্স R – B – Y বা a – c – b।

চিত্রের ভোল্টেজ তরঙ্গ-এ ফেজ-ক্রম অ্যান্টিক্লক-ওয়াইজ হয়েছে।

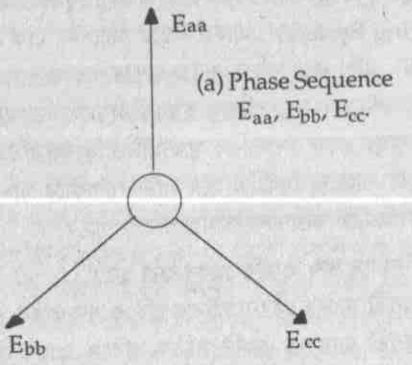

চিত্র : ফেজ-সিকুয়েন্স a – c – b (অ্যান্টি-ক্লক-ওয়াইজ ফেজ-সিকুয়েন্স)

○ প্রশ্ন-১০০. তাড়িৎ চৌম্বক বিকিরণ বলতে কি বুঝেন? এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

উত্তর : তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ (Electromagnetic Radiation) : আলোক তরঙ্গ তাড়িতচৌম্বক বর্ণালি নামে পরিচিত একটি বিস্তৃত পাল্লার তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অংশ বিশেষ। আমরা জানি, তাড়িতচৌম্বক বর্ণালিতে থাকে দৃশ্যমান আলো, অবলোহিত বিকিরণ, বেতার তরঙ্গ, অতিবেগুনি বিকিরণ, এক্সরশ্মি ও গামারশ্মি। যদিও বিভিন্ন তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের উৎস বিভিন্ন এবং তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিরাট পার্থক্য বর্তমান কিন্তু কিছু কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এদের মধ্যে মিল আছে। এসব বৈশিষ্ট্য হলো :

(i) তাড়িতচৌম্বক বিকিরণ ভ্যাকুয়ামে আলোর দ্রুতিতে ($3 \times 10^8 m/s$) সরলরেখায় চলে।

(ii) উৎস থেকে বিশেষ দূরত্বে বিকিরণের বিপরীত বর্গীয় নিয়ম (Inverse square law) মেনে চলে। অর্থাৎ দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে এদের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকে। দূরত্ব দ্বিগুণ হলে তীব্রতা এক-চতুর্থাংশ হয়ে যাবে।

(iii) এই তরঙ্গ তাড়িত চৌম্বক এবং আড় তরঙ্গ।

(iv) যথোপযুক্ত শর্তসাপেক্ষে তাড়িতচৌম্বক বিকিরণের সব ধরনের বিকিরণে প্রতিফলন, প্রতিসরণ, অপবর্তন (diffraction) ও ব্যতিচার (interference) ঘটে।

(v) এদের সঞ্চালনে কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না। শূন্য মাধ্যমের মধ্য দিয়ে এরা সঞ্চালিত হতে পারে।

○ প্রশ্ন-১০১. রেডিওতে শব্দকে কিভাবে পাঠানো হয় এবং কিভাবে গ্রাহক যন্ত্রে তা শোনা যায়?

উত্তর : রেডিওতে শব্দ প্রেরণ এবং গ্রহণের কৌশল দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

ক. প্রেরণ পদ্ধতি ও খ. গ্রহণ পদ্ধতি।

ক. প্রেরণ পদ্ধতি (Transmission System) : রেডিও স্টেশনের মাইক্রোফোনে কোনো ব্যক্তি কথা বললে মাইক্রোফোন শব্দ তরঙ্গকে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজে (V_A) পরিণত করে, যা নিম্ন কম্পাঙ্কবিশিষ্ট। রেডিও স্টেশনের অসিলেটর বর্তনী থেকে আসা উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট ভোল্টেজ (V_C), যা বাহক সংকেতে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজের সাথে মিশ্রিত হয়ে মড্যুলেটেড বা রূপারোপিত তরঙ্গের (V_M) সৃষ্টি হয়।

$$V_M = V_C + V_A V_C$$

এ মড্যুলেটেড কারেন্ট পাওয়ার অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে বিবর্ধিত হয়ে অ্যান্টেনাতে আসে এবং অসিলেটিংয়ের ফলে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে পড়ে।

খ. গ্রহণ পদ্ধতি (Receiving System) : গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনা এক প্রকার পরিবাহী, যা শূন্য থেকে তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ গ্রহণ করে তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে। এ তড়িৎ সংকেত টিউনিং বর্তনীতে মড্যুলেটেড ভোল্টেজে (V_H) পরিণত হয়। ডিমড্যুলেটেড সার্কিটে V_M রেকটিফাইড এবং উচ্চ কম্পাঙ্কবিশিষ্ট বাহক তরঙ্গ অপসারিত হয়ে অডিও ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজে (V_A) পরিণত হয়। যা অ্যাম্পলিফায়ারের সাহায্যে বিবর্ধিত হয়ে লাউড স্পিকারে যায়। লাউড স্পিকার তড়িৎ প্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে এবং আমরা শুনতে পাই।

○ প্রশ্ন-১০২. টেলিভিশনে কিভাবে শব্দ ও ছবি প্রেরণ করা হয়?

উত্তর : যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানের কোনো ঘটনার ছবি ও শব্দ একই সঙ্গে দেখা ও শোনা যায়, তাকে টেলিভিশন বলে। দূরবর্তী জায়গায় একটি সক্রিয় ছবিকে প্রেরণ করে পুনরুৎপাদন করার কৌশলকে টেলিভিশন প্রক্রিয়া বলে।

টেলিভিশনে থাকে দুটি প্রেরক যন্ত্র। সম্প্রচারের একটি প্রেরক যন্ত্র শব্দ প্রেরণ করে এবং অন্য প্রেরক যন্ত্রটি চিত্র প্রেরণ করে। টেলিভিশনে শব্দ পাঠানো হয় সাধারণ বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে। ছবি পাঠাতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় যে দৃশ্য প্রেরণ করতে হবে তার একটি বিম্ব বা ছবি টেলিভিশনের পর্দায় ফেলা হয়। ক্যামেরার ভিতর একটি ফটোটিউব থাকে। এই টিউব একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দুকে জোরালো বিদ্যুৎস্পন্দনে বা ঝলকে এবং অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুকে কম জোরালো বিদ্যুৎ ঝলকে রূপান্তরিত করে। টেলিভিশনের ছবিকে স্ক্যানিং করে প্রেরণ করা হয়। স্ক্যানিং করার সময় ছবির ঔজ্জ্বল্য ও অনুজ্জ্বলের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো রেখায় বিভক্ত করা হয়। সমস্ত ছবিকে এতো দ্রুত স্ক্যানিং করা হয় যে, প্রতি সেকেন্ডে ৩০টি চিত্র সম্প্রচারিত হয়।

○ প্রশ্ন-১০৩. স্ক্যানিং কি? টেলিভিশনে ছবি প্রেরণে স্ক্যানিং কিভাবে ব্যবহার করা হয়?

উত্তর : স্ক্যানিং : ছবিকে যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা বিন্দুতে ভাগ করা হয় তাকে স্ক্যানিং বলে।

ছবি প্রেরণে এর ব্যবহার : টেলিভিশন ক্যামেরা কোনো দৃশ্যকে তড়িৎ চার্জে রূপান্তরিত করে। ক্যামেরা লেন্সের পিছনে থাকে একটি পর্দা বা মোজাইক, তার ওপর সিজিয়াম নামক পদার্থের বিন্দুর আকার আস্তরণ থাকে। প্রতিটি সিজিয়াম বিন্দু এক একটি ক্ষুদ্র আলোক তড়িৎ সেল হিসেবে কাজ করে। যখনই আলো এসব কিছুর উপর পতিত হয়, তখন তারা ইলেকট্রন নিঃসরণ বা ত্যাগ করে। ফলে তড়িৎ চার্জের সৃষ্টি হয়। লেন্স দৃশ্যমান ছবিকে মোজাইক পর্দায় ফোকাস করে যার ফলে সিজিয়াম বিন্দুগুলো ইলেকট্রন নির্গমন করে। ছবির উজ্জ্বল অংশ অধিক ইলেকট্রন এবং অনুজ্জ্বল অংশ কম ইলেকট্রন নিঃসরণ করে। অর্থাৎ ছবির বিভিন্ন অংশের পার্থক্যের জন্য সিজিয়াম বিন্দু থেকে নির্গত ইলেকট্রনের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। সুতরাং টেলিভিশন ক্যামেরায় পূর্ণাঙ্গ ছবিটি হয় তড়িৎ চার্জ বা ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ অভিন্ন ছবি। সিজিয়ামে বিন্দুর তড়িৎ চার্জ নির্গমনের জন্য অন্য কারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী ধাপ হলো এ ক্ষুদ্র চার্জ বা আধান দ্বারা প্রবাহ বা কারেন্টের সৃষ্টি হয়, যা বিবর্ধনের পর তাড়িত চৌম্বক বেতার তরঙ্গ হিসেবে টেলিভিশন অ্যান্টেনায় প্রেরণ করা হয়। সম্পূর্ণ কাজটি করে ইলেকট্রনগানের সাহায্যে। ইলেকট্রনগান এমন একটি যন্ত্র যা দ্রুতগতিতে ইলেকট্রনের স্রোতকে সুইয়ের মতো চিকন রশ্মি হিসেবে ছুঁড়ে দেয়। ইলেকট্রনগানের মুখের নিকট চৌম্বক পাতে বা চৌম্বক বিসরক কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ কারেন্টকে সমন্বিত করে ইলেকট্রনগানকে এমনভাবে তাক করা হয় যে, নির্গত রশ্মি মোজাইক পর্দার উপর অগ্র-পশ্চাৎ ও উপরে-নিচে আসা-যাওয়া করে। বীমের এ অগ্র-পশ্চাৎ এবং উপরে-নিচে গমনকে বলা হয় স্ক্যানিং। ইলেকট্রন স্রোতকেও ফোকাস করে এমনভাবে চালনা করা হয় যেন ইলেকট্রন সম্পূর্ণ ছবিটি বাম থেকে ডানে স্ক্যান করে।

○ প্রশ্ন-১০৪. টিভি ক্যামেরায় কি ফিল্ম থাকে?

উত্তর : টিভি ক্যামেরায় ফিল্ম থাকে না। টিভি ক্যামেরার কয়েকটি অংশ থাকে। ক্যামেরার প্রথমেই যে অংশটি থাকে সেটি হলো অপটিক্যাল লেন্স সিস্টেম। এর মধ্যে কতকগুলো সূক্ষ্ম ও নিখুঁত লেন্সের সমষ্টি থাকে। ক্যামেরায় যে দৃশ্যের ছবি 'ধরা' হবে তা থেকে প্রতিফলিত আলো এই লেন্স সমষ্টির ওপরে এসে পড়ে। লেন্স সমষ্টি সেই আলো যথাযথ ভাবে ফোকাস করে দ্বিতীয় অংশ 'ক্যামেরার টিউব'-এর ওপরে। ক্যামেরা টিউবই হলো টিভি ক্যামেরার প্রাণ। কারণ যে আলোক রশ্মি তার উপর এসে পড়ে তা থেকে উপযুক্ত বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে ক্যামেরা টিউব। ক্যামেরা টিউব নানা রকমের হয়। যেমন— ইকনোস্কোপ, ইমেজ ডিসেক্টর, এমিট্রন, প্লাম্বিকন, ডিডিকন, অর্থিকন ইত্যাদি। ক্যামেরা টিউবে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক সংকেত 'ইনপুট' হিসেবে ঢুকিয়ে দেয়া হয় টিভি ক্যামেরার শেষ অংশ প্রি-অ্যামপ্লিফায়ারে। প্রি-অ্যামপ্লিফায়ার থেকে যে বৈদ্যুতিক সংকেত পাওয়া যায় তাকে আরও জোরালো ও নিখুঁত করার জন্য নানা অ্যামপ্লিফায়ার ও নিয়ন্ত্রক বর্তনীর মধ্য দিয়ে চিত্র প্রেরক যন্ত্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

○ প্রশ্ন-১০৫. রাডার (RADAR) কি? রাডার কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : রাডার হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যার সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির বাইরের কোনো বস্তুকে খুঁজে বের করা যায় এবং দূরত্বও নির্ণয় করা যায়। রাডার (RADAR)-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Radio Detection And Ranging।

প্রেরক, গ্রাহক ও সূচক সম্বলিত ও প্রতিধ্বনি সৃষ্টির নীতি অনুসারে রাডার কাজ করে। রাডার ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গের চেয়ে অধিক কম্পাংক বিশিষ্ট তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এই বেতার তরঙ্গ বা সূক্ষ্ম তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। প্রেরক যন্ত্র থেকে অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ সামনের দিকে পাঠানো হয়। এই তরঙ্গগুলো সরলরেখায় চলে এবং উদ্দিষ্ট অভিলক্ষ্য বস্তুটির গায়ে লেগে প্রতিফলিত হয়ে এর কিছু অংশ ফিরে আসে। প্রতিফলিত রশ্মির যে অংশ রাডার কেন্দ্রে ফিরে আসে, গ্রাহক যন্ত্র প্রথমে তা গ্রহণ করে, পরে সংকেতকে পরিবর্তিত করে নির্দেশক যন্ত্রে বা পর্দায় বিম্ব গঠন করে। ঐ বিম্বের প্রকৃতি থেকে রাডার দূরবর্তী অবস্থানের বিমান, জাহাজ বা নিম্নচাপের পরিষ্কার ধারণা দেয়। প্রেরক যন্ত্র থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সময়কে আলোর গতিবেগ দিয়ে গুণ করে রাডার থেকে ঐ বস্তুর দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব পাওয়া যায়। এর অর্ধেকই হচ্ছে রাডার থেকে ঐ বস্তুর দূরত্ব। এভাবেই রাডার বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করে। ১৯৩৫ সালে রাডার আবিষ্কৃত হয় তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

○ প্রশ্ন-১০৬. রাডারের ব্যবহারগুলো লিখুন।

উত্তর : রাডারের ব্যবহার :

যুদ্ধে ব্যবহার

i. দূর পাল্লায় শত্রু বিমান বা শত্রু জাহাজ খুঁজে বের করতে রাডার ব্যবহার করা হয়।
ii. আক্রমণাত্মক (offensive) ও রক্ষণাত্মক (defensive) যুদ্ধাস্ত্রের সঠিক নিয়ন্ত্রণে রাডার ব্যবহৃত হয়।
iii. মিশাইল ব্যবস্থাকে ব্যবহারের নির্দেশনা (Guidance) ও আদেশ (command) দানে ব্যবহৃত হয়।

শান্তিকালীন ব্যবহার: রাডারের বহুবিধ শান্তিকালীন ব্যবহার রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি হলো :

i. বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ।
ii. সামুদ্রিক জাহাজ নিয়ন্ত্রণ ও সমুদ্রবন্দরের নিকট জাহাজের গতি নিয়ন্ত্রণ।
iii. বিমানের উঠা-নামা নিয়ন্ত্রণ।
iv. চাঁদ ও নিকটবর্তী গ্রহদের নিয়ে গবেষণা।
v. প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির পূর্বাভাস।

○ প্রশ্ন-১০৭. রেডিও, টেলিভিশন ও রাডারে অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

উত্তর : রেডিওতে অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবহার : রেডিওতে প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্র দু জায়গাতেই অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করা হয়। যেমন :

ক. **প্রেরক যন্ত্র :** বেতার তরঙ্গকে অ্যামপ্লিফায়ার বিবর্ধিত করে প্রেরক যন্ত্রের অ্যান্টেনার সাহায্যে শূন্যে প্রেরণ করে, যা গ্রাহক যন্ত্রের অ্যান্টেনায় পৌঁছায়।

খ. **গ্রাহক যন্ত্র :** গ্রাহক যন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে এবং তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে। এরপর অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহকে বিবর্ধিত করে এবং লাউড স্পিকারে প্রবেশ করে।

প্রয়োজনীয়তা : অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে রেডিওর শব্দ আমরা স্পষ্ট শুনতে পাই। গ্রাহক যন্ত্র বেতার তরঙ্গকে গ্রহণ করে একে তড়িৎ প্রবাহে রূপান্তরিত করে। এরপর অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে তড়িৎ প্রবাহকেও বিবর্ধিত করে ও লাউড স্পিকারে প্রেরণ করে। লাউড স্পিকার তাড়িত প্রবাহকে পুনরায় শব্দে রূপান্তরিত করে, যা আমরা শুনতে পাই।

টেলিভিশনে অ্যামপ্লিফায়ারের ব্যবহার : টেলিভিশনে শব্দ ও ছবি প্রেরণ— এ দুক্ষেত্রেই অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করা হয়। যথা—

ছবি প্রেরণ : বেতার তরঙ্গ আমাদের বাড়ির ছাদে রাখা অ্যান্টেনা বা ইনডোর অ্যান্টেনায় সামান্য তড়িৎ কারেন্ট সৃষ্টি করে। এ কারেন্ট অ্যান্টেনা দিয়ে আমাদের টিভি সেটে যায় ও বিবর্ধিত হয়ে ছবিতে রূপান্তরিত হয়। অ্যামপ্লিফায়ারের মাধ্যমে এ বিবর্ধন ঘটানো হয়।

শব্দ প্রেরণ : আমরা জানি মাইক্রোফোন শব্দে যে তড়িৎ রূপান্তরিত করে এর বহির্গমন ঘটে পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজ হিসেবে। এ পর্যাবৃত্ত ভোল্টেজকে বিবর্ধিত করা হয়, যাতে শব্দ সংকেত আমাদের ঘরে রাখা টিভি সেটে আসে। এ বিবর্ধনের কাজটি সম্পন্ন করে অ্যামপ্লিফায়ার।

প্রয়োজনীয়তা : ছবি প্রেরণ ও শব্দ প্রেরণে অ্যামপ্লিফায়ারের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাডারে প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত মাইক্রোওয়েভের ক্ষমতা কয়েক হাজার কিলোওয়াট হলেও বহু দূরবর্তী লক্ষ্যবস্তু থেকে ঐ তরঙ্গ যখন প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে তখন তার ক্ষমতা খুব অল্প থাকে। এজন্য প্রতিফলিত তরঙ্গকে বহুগুণ বিবর্ধিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ তরঙ্গের বিবর্ধনের জন্য অ্যামপ্লিফায়ার ব্যবহার করা হয়। অ্যামপ্লিফায়ারের সাহায্যে প্রতিফলিত সংকেতকে বিবর্ধিত করে ছবিতে রূপান্তরিত করে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

○ প্রশ্ন-১০৮. রেডিও টেলিভিশন যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহ কিভাবে কাজ করে?

উত্তর : যোগাযোগকারী কৃত্রিম উপগ্রহে একটি প্রেরক যন্ত্র ও একটি গ্রাহক যন্ত্র থাকে। গ্রাহক যন্ত্রে গৃহীত সংকেতকে বিবর্ধকের সাহায্যে বিবর্ধিত করা হয়। যন্ত্র দুটোকে শক্তি জোগানোর জন্য ব্যবহৃত হয় সৌরকোষের এক সজ্জা। টেলিফোন ও দূরদর্শন বার্তার জন্য কৃত্রিম উপগ্রহে থাকে ভিন্ন ভিন্ন চ্যানেল। উচ্চ কম্পাংকযুক্ত সূক্ষ্ম তরঙ্গের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহে বার্তা বা সংকেত পাঠানো হয়। উপগ্রহের সাথে সংযুক্ত অ্যান্টেনায় ঐ বার্তা ধরা পড়ে। বিবর্ধনের পর বার্তাকে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে পুনঃপ্রেরণ করা হয়। এভাবে কোনো বার্তা হাজার মাইল দূরে প্রেরিত হয়।

○ প্রশ্ন-১০৯. বেতার তরঙ্গ কি? রেডিও, টেলিভিশন ও রাডারে এ তরঙ্গের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : অ্যান্টেনা দ্বারা বিকীর্ণ যে তাড়িত শক্তি মুক্তস্থানে তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ হিসেবে সঞ্চারিত হয়ে থাকে তাকে বলা হয় বেতার তরঙ্গ। বেতার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের পাল্লা 10^{-4}m থেকে 5×10^{4}m। এ তরঙ্গকে নিম্নোক্ত কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করা যায়–

(i) মিডিয়ামওয়েভ (MW)
(ii) শর্টওয়েভ (SW)
(iii) রাডারওয়েভ
(iv) মাইক্রোওয়েভ বা টেলিভিশন তরঙ্গ

○ প্রশ্ন-১১০. ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি কি?

উত্তর : ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা আইসি হচ্ছে একটি সূক্ষ্ম সার্কিট। খুব ছোট অর্ধপরিবাহী পদার্থের টুকরার মধ্যে ডায়োড, ট্রানজিস্টর, রোধ, ক্যাপাসিটর ইত্যাদি বহুসংখ্যক বৈদ্যুতিক যন্ত্র সংযুক্ত করে একটি বৈদ্যুতিক বর্তনী তৈরি করা হয়। পরিভাষায় এই অর্ধপরিবাহী পদার্থের টুকরাকে বলা হয় সেমি কান্ডাক্টর চিপ। বর্তমানে এই কাজে সিলিকন চিপ ব্যবহার করা হয়। আই সি প্রযুক্তি যতই উন্নত হচ্ছে ইলেকট্রনিক বর্তনী মাপে ততই ছোট হচ্ছে। কোনো একটি জটিল ইলেকট্রনিক বর্তনীতে তিন চারটি আইসি ব্যবহার করলে বর্তনীটি যে শুধুই মাপে ছোট হবে তা নয়, তার কারিগরি জটিলতাও অনেক কমে যাবে।

○ প্রশ্ন-১১১. আইসির সুবিধাগুলো কি?

উত্তর : আইসির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে :

(i) স্বল্পসংখ্যক সংযোগ থাকায় এর বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability) অনেক বেশি হয়।
(ii) একটি ক্ষুদ্র আইসির মধ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস বা পার্টস খুবই অল্প জায়গার মধ্যে তৈরি করা হয় বলে এর আকার অত্যন্ত ছোট হয়।
(iii) ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য ওজনও খুব সামান্য হয়।
(iv) তাপমাত্রার কম-বেশি হলেও এর কার্যকারিতা সহজে নষ্ট হয় না।
(v) আইসি চালনার জন্য খুব সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়।
(vi) বিভিন্ন পার্টস ক্রয় করে ডিভাইস বা বর্তনী তৈরি করলে যে খরচ পড়বে তার চেয়ে কম খরচে আইসি পাওয়া যায়।
(vii) বহু সংখ্যক আইসি একসাথে তৈরি করা হয় বলে এদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্য থাকে না বললেই চলে।
(viii) মেরামতের ঝামেলামুক্ত এবং কম খরচে পরিবর্তন করা যায়।

○ প্রশ্ন-১১২. আইসির গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন।

উত্তর : আইসি তৈরির জন্য মূলত চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা– ক. মনোলিথিক; খ. পাতলা ফিল্ম; গ. স্থূল ফিল্ম এবং ঘ. হিবরিড বা বর্ণ সঙ্কর পদ্ধতি। বাস্তবে মনোলিথিক বহুল প্রচলিত বলে এ পদ্ধতিটি নিচে বর্ণনা করা হলো :

মনোলিথিক আইসি তৈরির পদ্ধতি : মনোলিথিক আইসিতে বর্তনীর সব উপাদান এবং এদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ একটি একক পাতলা ওয়েফার (thin wafer)-এর উপর তৈরি করা হয়। এ ওয়েফারকে 'সাবস্ট্রেট' (substrate) বলে। মনোলিথিক আইসি তৈরিতে নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণ করা হয় :

ক. **p-সাবস্ট্রেট তৈরি :** আইসি তৈরির এটি প্রথম ধাপ। প্রথমে একটি অনেক বড় আকারের p-টাইপ সিলিকন কেলাস তৈরি করা হয়। এরপর ডায়মণ্ড করাত দিয়ে এ কেলাস থেকে প্রচুর সংখ্যক খুবই পাতলা ওয়েফার কেটে নেয়া হয়। ওয়েফারের বেধ সাধারণত 200 μm করা হয়। এ ওয়েফারের একপৃষ্ঠ মসৃণভাবে ঘষা হয়, যাতে বাহ্যিক কোনো অপদ্রব্য মিশ্রিত না থাকে। এ ওয়েফারকে বলা হয় 'সাবস্ট্রেট'।

খ. **অ্যাপিট্যাক্সিয়াল n-স্তর (Epitaxial n-layer) তৈরি :** এ ধাপে সাবস্ট্রেটটি ডিফিউশন (Diffusion) বা ব্যাপন চুল্লিতে স্থাপন করা হয়। এরপর সিলিকন পরমাণু এবং পঞ্চযোজী পরমাণুর মিশ্রণ গ্যাস ওয়েফারের উপর দিয়ে উষ্ণতাপে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে সাবস্ট্রেটের উত্তপ্ত পৃষ্ঠে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি স্তর জমা হয়। এ পাতলা স্তরকে 'অ্যাপিট্যাক্সিয়াল স্তর' (epitaxial layer) বলে। এ স্তর সাধারণত 10 μm বেধের হয়। এ পাতলা স্তরের মধ্যে আইসির বিভিন্ন অংশ (Components) তৈরি করা হয়।

গ. **অক্সাইড কোটিং বা মাস্কিং (Oxide coating or Masking) :** বাইরের কোনো পদার্থ দ্বারা যাতে অ্যাপিট্যাক্সিয়াল স্তর দূষিত বা সংক্রমিত না হতে পারে এবং বিভিন্ন পার্টস যাতে একটির সাথে অন্যটি লেগে না যায়, তাই এর ওপর সিলিকন ডাই-অক্সাইডের একটি খুবই পাতলা স্তর (প্রায়1 μm বেধ) তৈরি করা হয়। উষ্ণতাপে অক্সিজেন গ্যাস অ্যাপিট্যাক্সিয়াল স্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে এ অক্সাইড স্তর তৈরি করা হয়। ওয়েফারের বিভিন্ন অংশ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাহায্যে অক্সাইড স্তর সরিয়ে দেয়া হয় এবং কেবলমাত্র সে বিশেষ বিশেষ স্থানে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় আইসির বিভিন্ন কম্পোনেন্ট (component) বা পার্টস স্থাপন করা হয়। বিশেষ বিশেষ জায়গায় অক্সাইড স্তর সরানোর প্রক্রিয়াকে 'এচিং' (etching) করা বলা হয়। নির্দিষ্ট অবস্থানে এচিং পদ্ধতি অনুসরণ করে অক্সাইড স্তর সরিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত সংযোজন তৈরি করা হয়।

এর প্রত্যেকটি এক একটি চিপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটি ওয়েফার থেকে অনেকগুলো একই ধরনের চিপ তৈরি করা সম্ভব। এ চিপই হলো আইসি, যার মধ্যে বর্তনীর বহু কম্পোনেন্ট সংযোজিত থাকে।

○ প্রশ্ন-১১৩. MOS সমন্বিত বর্তনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা দিন।

উত্তর : সমন্বিত বর্তনীর অন্য প্রধান দলের নাম MOS, কারণ তার প্রধান যন্ত্রাংশ হলো একটা ধাতব অক্সাইড অর্ধপরিবাহী ফিল্ড-এফেক্ট ট্রানজিস্টর (MOSFET)। বৃহৎ পরিসরের সমন্বয়ে (LSI) এটা দ্বিমেরু বর্তনীর তুলনায় বেশি উপযোগী কারণ MOS ট্রানজিস্টর আপনাআপনি বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং তাদের গড় আকৃতি হলো একবর্গ ইঞ্চির দশ লাখ ভাগের এক ভাগ (6×10^{-4} mm^2)। এ কারণেই প্রতি বর্তনীতে লক্ষাধিক ট্রানজিস্টর ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। এ উচ্চঘনত্বের ক্ষমতার কারণেই MOS ট্রানজিস্টর ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় RAM, ROM এবং মাইক্রোপ্রসেসরে। কয়েক ধরনের MOS যন্ত্রাংশ তৈরির প্রযুক্তির উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এগুলো হলো, মেটাল-গেট p চ্যানেল MOS, যার মধ্যে ইলেকট্রোড এবং আন্তসংযোগের জন্য অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করা হয়; সিলিকন-গেট p চ্যানেল MOS যার মধ্যে বহুকেলাসের সিলিকন ব্যবহার হয় গেট ইলেকট্রোড এবং প্রথম আন্তঃসংযোগ স্তর হিসেবে; n চ্যানেল MOS, যা সাধারণত সিলিকনগেট এবং পরিপূরক MOS, যার মধ্যে p চ্যানেল এবং n চ্যানেল উভয় যন্ত্রাংশই ব্যবহার করা হয়। সিলিকন গেট n চ্যানেল এবং পরিপূরক MOS হলো প্রধান প্রযুক্তি।

○ প্রশ্ন-১১৪. দ্বি মেরু সমন্বিত বর্তনী সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

উত্তর : সম্পূর্ণ ডিজিটাল সমন্বিত বর্তনীতে সাধারণত কয়েকশত ইনভার্টার ও গেট থাকে, যার আন্তঃসংযোগ হলো কাউন্টার, গাণিতিক অংশ এবং অন্যান্য প্রস্তুতকারী অংশ। সিলিকন কেলাসের একটিমাত্র টুকরায় এ ধরনের শত শত বর্তনী তৈরি করা হয়। সমতল প্রযুক্তির এ বৈশিষ্ট্য— যেখানে একই সাথে অনেক বর্তনী তৈরি করা হয়— এ কারণেই তার অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং এর জন্যই সমন্বিত বর্তনীর ব্যাপক ব্যবহার।

একটা সহজ দ্বিমেরু সমন্বিত বর্তনী তৈরির জন্য প্রয়োজন একটিমাত্র ট্রানজিস্টর এবং রেজিস্ট্রার। ট্রানজিস্টর এবং রোধক উভয়ই তৈরি করা একটি n-প্রকৃতির অর্ধপরিবাহী পৃথক গহ্বরের পকেটের মধ্যে যার চারপাশে থাকে p প্রকৃতির অঞ্চল। যখন ইনভার্টার বর্তনী দিয়ে কাজ করা হয়, n প্রকৃতির

পকেট এবং পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটি উল্টোমুখী বিভব প্রভাব (reverse bias) সৃষ্টি হয়। *n*-প্রকৃতি এবং *p*-প্রকৃতির অঞ্চলের মধ্যে হ্রাসকৃত (depletion) অঞ্চলে থাকে যা একটা অত্যন্ত বেশি পরিমাণের রোধক। এর ফলে প্রতিটি ট্রানজিস্টর এবং রোধক পরস্পরের কাছ থেকে অন্তরীত থাকে, যদিও তারা উভয়ই একই অর্ধপরিবাহী কেলাসের মধ্যে তৈরি।

সমন্বিত বর্তনী যে অ্যামপ্লিফায়ারের ওপর ভিত্তি করে গড়া তাদের বলে রৈখিক, কারণ অ্যামপ্লিফায়ার সাধারণত প্রদত্ত সংকেত পরিবর্তনের রৈখিক আনুপাতিক সাড়া জাগায়।

○ প্রশ্ন-১১৫. পোলারয়েড ক্যামেরায় কিভাবে তাৎক্ষণিক আলোকচিত্র প্রস্তুত হয়?

উত্তর : পোলারয়েড ক্যামেরায় পরস্পর সমান্তরালভাবে যুক্ত দুটি ফিল্ম রোল ভরা হয়। এর একটি রোল নেগেটিভ ও অন্যটি পজিটিভ। আলোকচিত্রের রাসায়নিক পূর্ণ ক্ষুদ্র আধার (pad) পজিটিভ রোলটির সাথে যুক্ত থাকে। ক্যামেরায় লেন্সের মাধ্যমে ফিল্মের উপর আলো এসে পড়ার পর নেগেটিভ ও পজিটিভ ফিল্মদ্বয় দুটি রোলারের মধ্য দিয়ে চালিত হয়। এর ফলে রাসায়নিকপূর্ণ আধারগুলো ভেঙ্গে যায়। রাসায়নিক পদার্থগুলো এরপর নেগেটিভ ফিল্মটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। এর ফলেই আলোক পৃষ্ঠের রোলারটির উপর নেগেটিভ চিত্র সৃষ্টি হয়ে যায়। এরপর আধা নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে পজিটিভ ফিল্মের ওপর লাগানো রাসায়নিক পদার্থ মিশে নতুন বিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পজিটিভ আলোক চিত্র ফুটে ওঠে।

○ প্রশ্ন-১১৬. ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ কেমন করে কাজ করে?

উত্তর : ভাইরাস, টিস্যু, ব্যাকটেরিয়া প্রভৃতি অতিক্ষুদ্র জীবাণুর পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ব্যবহৃত হয়। আমরা জানি, আলো তরঙ্গ আকারে চলে। তেমনি করে গতিশীল ইলেকট্রনের সাথেও তরঙ্গ জড়িত থাকে। এই ধরনের তরঙ্গকে বলা হয় কণাতরঙ্গ। ইলেকট্রনের সাথে জড়িত কণা তরঙ্গকে কাজে লাগিয়েই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ গঠন করা হয়েছে। ইলেকট্রনের সাথে জড়িত তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থেকে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি। এইজন্য ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের বিশ্লেষণী ক্ষমতা আলোক মাইক্রোস্কোপের বিশ্লেষণী ক্ষমতার চেয়ে বেশি হয়।

○ প্রশ্ন-১১৭. ডিজিটাল পদ্ধতি কাকে বলে?

উত্তর : ডিজিটাল পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা যায় এটি তার (wire) ও বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশের (Mechanical part) সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি নেটওয়ার্ক যা ভোল্টেজের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংকেতিক তথ্য (coded information) বহন করে। অন্যভাবে বলা যায়, এটি কতগুলো যৌক্তিক উপাদানের (logical element) সমষ্টি এবং প্রতিটি উপাদানের কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা (rules) বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। উঁচু পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, কোনো ডিজিটাল পদ্ধতি হলো বিভিন্ন ক্রিয়ামূলক অংশের (functional units) সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন তথ্য পড়তে (input), লিখতে (write), সংরক্ষণ করতে (store) ও ব্যবহার করতে পারে।

○ প্রশ্ন-১১৮. ডিজিটাল ডিভাইস কি? কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইসের নাম লিখুন।

উত্তর : কতগুলো ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন— ট্রানজিস্টার, ডায়োড, অপারেশনাল অ্যামপ্লিয়ার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আরেকটি ডিভাইস যেটি বিভিন্ন ডিজিটাল কাজ সম্পাদন করে, একে ডিজিটাল ডিভাইস বলে। কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইস হলো রেজিস্টার, কাউন্টার, ফ্লিপ-ফ্লপ, ডিকোডার, এনকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার, ডি-মাল্টিপ্লেক্সার ইত্যাদি।

○ প্রশ্ন-১১৯. ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিভাইস বর্ণনা করুন।

উত্তর : বেশিরভাগ ডিজিটাল যন্ত্রপাতির তথ্য ডিসপ্লে করার সামর্থ্য থাকে যাতে অপারেটর বা ব্যবহারকারী সহজেই তথ্য পড়তে পারে। ডিসপ্লে সাধারণত সংখ্যাগত বা বর্ণসংখ্যাগতও হতে পারে। একটি ডিজিটাল ডিসপ্লে হচ্ছে সেভেন-সেগমেন্ট ডিসপ্লে যা 0 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যাগুলোকে ডিসপ্লে করতে পারে। লাইট ইমিটিং ডায়োড (LED) দ্বারা এটি তৈরি করা যায়। LED-এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে এটি করা হয়। যে সেগমেন্টের ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে সেটি উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে আর যেটির ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হবে না, সেটি অন্ধকার হয়ে যাবে। যেমন—এর দ্বারা 2 ডিসপ্লে করতে হলে a, b, d, e, g সেগমেন্টগুলোর ভেতর দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করতে হবে এবং c, f সেগমেন্ট দুটি অন্ধকার থাকবে।

এ রকম আরেকটি ডিসপ্লের নাম LCD (লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে)। LCD-তে একটি ব্যাকপ্ল্যান থাকে যা সব সেগমেন্টগুলোতে কমন থাকে। কোনো সেগমেন্টকে অন করতে হলে ঐ সেগমেন্ট ও ব্যাকপ্ল্যানের মধ্যে AC ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। যখন ব্যাকপ্ল্যান ও সেগমেন্টের মধ্যে কোনো ভোল্টেজের পার্থক্য না থাকে তখন সেই সেগমেন্টটিকে অন্ধকার দেখায়।

○ প্রশ্ন-১২০. কাউন্টার কি? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন।

উত্তর : কাউন্টার হলো এমন একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট, যা তাতে দেয়া ইনপুট পালসের সংখ্যা গুণতে পারে। কাউন্টার এক ধরনের রেজিস্টার, যা বিশেষ কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়। কাউন্টারের ইনপুট পালস (যাকে কাউন্ট পালসও বলে) ক্লক পালস বা অন্য কোনো পালস হতে পারে। কাউন্ট নির্দিষ্ট সময় পরপর আসতে পারে বা অনিয়মিতভাবেও আসতে পারে। কাউন্টার বিভিন্ন ধরনের সিকোয়েন্স (Sequence) অনুসরণ করতে পারে। তবে সবচেয়ে সরল ও সহজ সিকোয়েন্স হলো বাইনারি সিকোয়েন্স। যে কাউন্টার বাইনারি সিকুয়েন্স অনুসরণ করে তাকে বাইনারি কাউন্টার বলে।

কাউন্টারের ব্যবহার : ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স কাউন্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন—

(i) ক্লক পালসের সংখ্যা গণনার কাজে।
(ii) টাইমিং সিগন্যাল প্রদানের কাজে।
(iii) ডিজিটাল ঘড়িতে।
(iv) ডিজিটাল কম্পিউটারে।
(v) অ্যানালগ সিগনালকে ডিজিটাল সিগনালে রূপান্তর করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

○ প্রশ্ন-১২১. কাউন্টারের প্রকারভেদ সম্বন্ধে লিখুন।

উত্তর : ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্সে বিভিন্ন ধরনের কাউন্টার ব্যবহার করা হয়। যেমন—

(i) সিনক্রোনাস কাউন্টার (Synchronous counter) ও
(ii) অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার (Asynchronous counter) বা রিপল কাউন্টার।

রিং কাউন্টার, মড-১০ কাউন্টার, সুইচেনেশিয়াল কাউন্টার হলো সিনক্রোনাস কাউন্টার, কারণ একটি কমন ক্লক পালস কাউন্টারে ব্যবহৃত ফ্লিপ-ফ্লপের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।

রিপল কাউন্টার হলো অ্যাসিনক্রোনাস কাউন্টার। রিপল কাউন্টার আবার দু'ধরনের। যথা :

১. রিপল আপ কাউন্টার ও ২. রিপল ডাউন কাউন্টার।

○ প্রশ্ন-১২২. মডিউলাস (Modulus) কি?

উত্তর : কাউন্টার সর্বাধিক যতটি সংখ্যা গুণতে পারে তাকে তার মডিউলাস (Modulus) বা মোড নম্বর বলে। কোনো কাউন্টারে nটি ফ্লিপ-ফ্লপ থাকতে তার মডিউলাস 2^n। একটি n বিট বাইনারি কাউন্টার nটি ফ্লিপ-ফ্লপ এবং সংশ্লিষ্ট গেইট নিয়ে গঠিত যা বাইনারি n বিট অর্থাৎ 0 থেকে 2^n-1 পর্যন্ত গণনার সিকোয়েন্সকে অনুসরণ করতে পারে। কাজেই এর মোড নম্বর বা মডিউলাস হলো 2^n।

○ প্রশ্ন-১২৩. ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট বলতে কি বুঝায়? কয়েকটি ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের বর্ণনা দিন।

উত্তর : ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট এমন ধরনের যন্ত্র যা পরিমাপকৃত রাশি সরাসরি দশমিক সংখ্যায় দৃশ্যমান করে প্রকাশ করে। এতে চোখের দৃষ্টিজনিত ভুল বা এনালগ ইনস্ট্রুমেন্টের মতো প্যারালাক্স ত্রুটি হয় না। ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের ব্যাপক উন্নতির ফলে ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের দাম কম হচ্ছে এবং ব্যবহার বাড়ছে।

কয়েকটি ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট

ডিজিটাল গণনাযন্ত্র (Digital Counter) : একটি যন্ত্র, যার আউটপুট বা উৎপাদন হলো ইনপুট বা প্রবেশ মুখে প্রেরিত সংকেত সংখ্যার সমানুপাতিক। দু ধরনের গণক আছে। ১. মুর (moore) মেশিন ও ২. মিলি (mealy) মেশিন।

মুর (moore) মেশিন হলো একটি গণক প্রবেশ মুখ সম্বলিত সহজ যন্ত্র (যাকে ঘড়ি ইনপুট অথবা পালস ইনপুট বলা হয়)। অন্যদিকে মিলি (mealy) মেশিনে অতিরিক্ত ইনপুট থাকে যা গণনার ধারাবাহিকতাকে প্রভাবিত করে। ডিজিটাল গণকের বিভিন্ন রূপ আছে, যার মধ্যে গিয়ার সম্বলিত যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্ত (টেপ কাউন্টার ও ওহম মিটার) রিলে (পুরাতন পিন বল মেশিন ও পুরাতন টেলিফোন সুইচ ব্যবস্থা) ভ্যাকুয়াম টিউব (পুরাতন টেস্ট যন্ত্র) এবং কঠিন অবস্থায় অর্ধপরিবাহী বর্তনী (বেশিরভাগ আধুনিক ইলেকট্রনিক কাউন্টার)।

ডিজিটাল রেকর্ডিং (Digital Recording) : রেকর্ডের ওপর সঙ্গীত ধারণ করা এবং তা পুনরায় উৎপাদন করার ব্যবস্থায় ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার। রেকর্ডিং করার সময়ে মাইক্রোফোন অ্যামপ্লিফায়ারের আউটপুট ডিজিটাল বিটের স্রোতে পরিবর্তন করা হয়। নমুনা বা স্যামপ্লিং হার হলো প্রতি সেকেন্ডে ৪৪ হাজার থেকে ৫৫ হাজার নমুনা যেখানে প্রতি নমুনায় ১৫টি বিট থাকে। ডিজিটকৃত প্রোগ্রাম চুম্বক টেপ রেকর্ড করা হয়।

ডিজিটাল ভোল্টমিটার (Digital Voltmeter) : বৈদ্যুতিক বিভব মাপার যন্ত্র যাতে প্রাপ্ত মান সরাসরি ডিজিটাল রূপে দেখা যায়। সচল কাঁটা (moving point) ভোল্টমিটারের তুলনায় ডিজিটাল ভোল্টমিটারের সুবিধা এই যে, এর দ্বারা তাড়াতাড়ি মাপা যায়, একে যে কেউ সহজে ব্যবহার করতে পারে এবং অপারেটর ত্রুটি নেই বললেই চলে। বৈদ্যুতিক বিভব পার্থক্য মাপা ছাড়াও অন্যান্য ডিজিটাল সিস্টেমে ডিজিটাল ভোল্টমিটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

ডিজিটাল কম্পিউটার (Digital Computer) : এ যন্ত্র সাধারণত কোনো রাশি (number) বা রাশিমালার গাণিতিক সমাধান বের করার কাজে ব্যবহৃত হয় অথবা এর সাহায্যে যথাযথ প্রক্রিয়ায় কোনো প্রতীক

ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা হয়। ডিজিটাল কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণ (সাধারণত কয়েক হাজার বা লক্ষ) সংখ্যা বা অন্যান্য তথ্য সংরক্ষিত থাকে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন জটিল গাণিতিক সমস্যার নিয়ন্ত্রণ ও সমাধান বের করা হয়। এ ছাড়াও প্রয়োজনীয় নির্দেশ (instruction) অনুযায়ী সংরক্ষিত তথ্য ব্যবহার করে বিভিন্ন কার্য সম্পাদন এবং তার তথ্য সংরক্ষণেও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

ডিজিটাল ঘড়ি (Digital Clock) : ডিজিটাল ঘড়ি দিয়ে সময়, অর্থাৎ ঘণ্টা, মিনিট ও সেকেন্ডকে দশমিক সংখ্যায় প্রদর্শন করা হয়। অনেক ঘড়িতে তারিখ, অর্থাৎ দিন, মাস ও বছর প্রদর্শনের ব্যবস্থাও থাকে। ডিজিটাল ঘড়ির জন্য প্রতি সেকেন্ডে একটি করে স্পন্দন সৃষ্টি করে এমন একটি স্পন্দন উৎস দরকার। একটি স্থির কম্পক থেকে কম্পাঙ্ক বিভাজনের মাধ্যমে ১ হার্জ হারে স্পন্দন সৃষ্টি হয়। ব্যাটারি চালিত ঘড়িতে এ জন্য সাধারণত কেলাস কম্পক (Crystal Oscilliator) ব্যবহার করা হয়। সরবরাহ লাইনের সাথে সংযুক্ত ঘড়ির জন্য এসি সরবরাহের ৫০ হার্জ হারে স্পন্দন তৈরি করা হয়।

এক হার্জ হারের স্পন্দনকে সেকেন্ড গণক দিয়ে গণনা করা হয়। এই গণকে প্রতি সেকেন্ডে একটি করে স্পন্দন আসে। সুতরাং এই গণনা হলো সেকেন্ডের গণনা। সেকেন্ড গণক ০০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত গণনা করে। গণনার এই সংখ্যাকে ডিকোডারের মাধ্যমে ৭-সেগমেন্ট ডিসপ্লে দিয়ে দেখানো হয়।

সেকেন্ড গণকের একটি গণনা-চক্র (০০-৫৯) শেষ হলে, অর্থাৎ শুরু থেকে ১ মিনিট শেষ হলে একটি স্পন্দন সৃষ্টি হয়। এক মিনিট হারের এই স্পন্দকে মিনিট গণকে সরবরাহ করা হয়। এই গণক ০০ থেকে ৫৯ পর্যন্ত মিনিট গণনা করে। সেকেন্ড অংশের মতো এই গণনাকে ডিকোডারের মাধ্যম ৭-সেগমেন্ট ডিসপ্লে দিয়ে প্রদর্শন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মিনিট গণকটি সেকেন্ড গণকের অনুরূপ।

মিনিট অংশ থেকে প্রতি ঘণ্টার পরপর একটি স্পন্দন ঘণ্টা গণকে যায়। এ গণক ১ থেকে ১২ পর্যন্ত গণনা করে এবং গণনাকে ডিকোডারের মাধ্যমে ৭-সেগমেন্ট ডিসপ্লে দিয়ে প্রদর্শন করে। অপর দুটি অংশের মতো ঘণ্টা গণকের অবস্থা কখনই ০০ হয় না। সে জন্য ঘণ্টা গণকের বিশেষ বর্তনী দরকার হয়।

ঘড়িতে সময় পরিবর্তন বা ঠিক করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। এজন্য সাধারণত ১ সেকেন্ড হারের স্পন্দনটি ব্যবহার করা হয়। এই স্পন্দনকে অতিরিক্ত যুক্তি বর্তনীর মাধ্যমে সেকেন্ড, মিনিট অথবা ঘণ্টা অংশে দিয়ে দ্রুত গণনা পরিবর্তন করে ঘড়ির সময় ঠিক করা হয়। একীভূত বর্তনী ডিজিটাল ঘড়ি বর্তনীও কিনতে পাওয়া যায়; MM 53108 এমন ঘড়ি বর্তনীর উদাহরণ।

○ প্রশ্ন-১২৪. ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্টের কার্যপ্রণালী লিখুন।

উত্তর : কোনো রাশিকে এনালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তরের জন্য পাঁচটি বেসিক ব্লক দ্বারা ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট গঠিত হয়। ব্লকগুলো হলো :

(i) ইন্টিগ্রেটর লেভেল

(ii) কমপারেটর

(iii) বেসিক ব্লক

(iv) ডেসিমেল কাউন্টার সেট

(v) লজিক সার্কিট ব্লক

যে রাশিটি পরিমাপ করতে হবে তা গ্রহণ প্রান্তে প্রয়োগ করা হয়। ইন্টিগ্রেটর, R ও C-এর মানের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ কম্পারেটরে সাপ্লাই দেয়া হয়। কম্পারেটরের প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ

এবং অসিলেটর থেকে উৎপন্ন Saw tooth ভোল্টেজ তুলনা করে কম্পারেটর আউটপুট গেটকে পরিচালনা করে। Saw tooth ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে সাথেই গেট সার্কিট Open হয় এবং High frequency-এর ক্লক প্লাস কাউন্টারে যায়, যা যতক্ষণ পর্যন্ত গেট বন্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কাউন্টার গণনা করে। গেটে ভোল্টেজ বেশি দিলে অনেকক্ষণ গেট খোলা থাকবে কাউন্টার বেশি গণনা করবে, আর ভোল্টেজ কম দিলে গেট অল্প সময়ের জন্য খোলা থাকবে কাউন্টার কম সময় পাবে গণনার জন্য। গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ইনপুট ভোল্টেজের মান দেখা যায়।

○ প্রশ্ন-১২৫. আইসির শ্রেণী বিভাগ উল্লেখ করুন।

উত্তর : আইসির ইন্টিগ্রেশন ক্ষমতা বা বর্তনী ও কম্পোনেন্টসের সংখ্যা অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা : ক. স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Small Scale Integration, SSI), খ. মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Medium Scale Integration, MSI), গ. লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (LSI), ঘ. ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Very Large Scale Integration, VLSI) এবং ঙ. মাইক্রোপ্রসেসর (Micro Processor)।

ক. **স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Small Scale Integration, SSI) :** এ শ্রেণীর একটি আইসি প্যাকেজের মধ্যে 30-এর কম বর্তনী এবং 50-এর কম কম্পোনেন্টস থাকে।

খ. **মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Medium Scale Integration, MSI) :** এ শ্রেণীর আইসির মধ্যে বর্তনীর সংখ্যা 30টি থেকে 100টি পর্যন্ত এবং কম্পোনেন্টস 50 থেকে 500-এর মধ্যে থাকে।

গ. **লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (LSI) :** যেসব আইসিতে একটি সাবস্ট্রেটের ওপর 100 থেকে 1,00,000 পর্যন্ত বর্তনী এবং 500 হতে 3,00,000 এর মধ্যে কম্পোনেন্টস থাকে, সেগুলোকে লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন আইসি বলে।

ঘ. **ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন (Very Large Scale Integration, VLSI) :** এসব আইসিতে লক্ষাধিক বর্তনী থাকে।

ঙ. **মাইক্রোপ্রসেসর (Micro Processor) :** মাইক্রোপ্রসেসর শুধু ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টসের সমষ্টিমাত্র নয়। এটি হচ্ছে একটি আইসির মধ্যে একটা সম্পূর্ণ ইলেকট্রনিক সিস্টেম। এটি প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারে। প্রত্যেক মাইক্রোপ্রসেসরের কতগুলো ইনস্ট্রাকশন (instruction) বা নির্দেশ থাকে, যা এটি বুঝতে পারে এবং কাজে পরিণত করতে পারে। এ ইনস্ট্রাকশনকে বলে প্রোগ্রাম। মানুষের মাথা ঘামানোর অনেক কাজই মাইক্রোপ্রসেসর করতে পারে। এ জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বর্তনী একটা চিপের মধ্যে তৈরি করা হয়।

৩৫তম বিসিএস

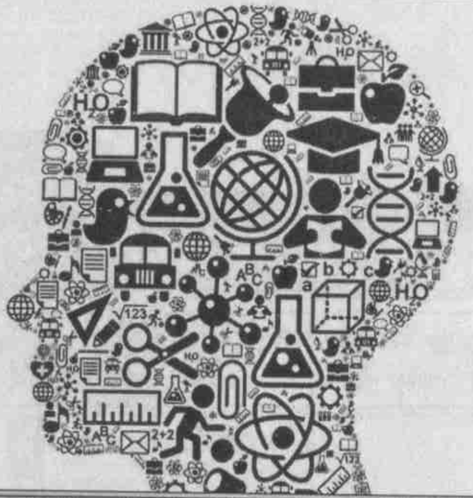

মডেল প্রশ্ন

মডেল প্রশ্ন ০১ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০২ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৩ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৪ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৫ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৬ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৭ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৮ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ০৯ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
মডেল প্রশ্ন ১০ || সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মডেল প্রশ্ন

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মডেল প্রশ্ন ০১ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ০১

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. আলো কি? আলো কিভাবে উৎপন্ন হয়? প্রিজম কি? ৪

খ. রক্তের গ্রুপ 'পজেটিভ' বা 'নেগেটিভ' হওয়ার কারণ কি? রক্তে pH-এর মান কত? রক্তে লোহিত কণিকার কাজ কি? ৪

গ. শ্রাব্যতার সীমা বলতে কি বোঝায়? ইনফ্রাসনিক ও সুপারসনিক শব্দ কাকে বলে? বাদুর কিভাবে পথ চলে? ৪

ঘ. তড়িৎকোষের পোলারায়ন বলতে কি বোঝায়? পেট্রোলবাহী ট্রাক থেকে একটি লোহার শিকল মাটিতে ঝুলতে দেখা যায় কেন? ৪

ঙ. একটি সাধারণ বিদ্যুৎ কোষের গঠন প্রণালী বর্ণনা করুন। ৪

২. ক. কম্বলে ঢেকে রাখলে মানুষের দেহ শীতের দিনে গরম থাকে, অথচ এক টুকরা বরফ কম্বলে ঢেকে রাখলে গরমের দিনে ঠাণ্ডা থাকে কেন? ২

খ. বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করা হয় কেন? ২

গ. সালোকসংশ্লেষণ কি? সালোক সংশ্লেষণের গুরুত্ব কি? ২

ঘ. বৈদ্যুতিক কোষ এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। ২

ঙ. এপেন্ডিক্স এবং এপেন্ডিসাইটিস বলতে কি বোঝায়? ২

৩. ক. নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন। ২½

খ. মানব দেহে লৌহের কাজ বর্ণনা করুন। ২½

গ. একটি বাতির গায়ে 220V–25W লেখা আছে- কথাটির অর্থ কি? ২½

ঘ. জোনাকি আলো জ্বালে কেন? ২½

৪. ক. সোডিয়ামকে কেন কেরোসিনের নিচে রাখা হয়? ২

খ. 'রাসায়নিক পদার্থসমূহের রাজা' বলতে কোন পদার্থকে নির্দেশ করে? ২

গ. সাধারণ লোহার সাথে ইস্পাতের পার্থক্য কি? ২

ঘ. একই বস্তুর ওজন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেন? ২

ঙ. ফরেনসিক মেডিসিন কি? ২

৫. ক. সুপার নোভা কি? তারা খসা কি? ২½

খ. ডায়া চৌম্বক, প্যারা চৌম্বক ও ফেরো চৌম্বক পদার্থ বলতে কি বোঝায়? ২½

গ. সাবান কি? সাবান কিভাবে ময়লা পরিষ্কার করে। ২½

ঘ. সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ও গামা রশ্মির প্রভাবে কি কি ক্ষতি হয়? ২½

৬. ক. হীরকের সংকট কোণ ২৪° বলতে কি বোঝায়? ২½

খ. সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস কি এবং কেন ঘটে? ২½

গ. গামা রশ্মি কি? এর প্রভাবে মানুষের কি কি ক্ষতি হতে পারে? ২½

ঘ. পেট্রোল ইঞ্জিন এবং ডিজেল ইঞ্জিন গঠনের মূল পার্থক্য কি? ২½

উত্তর : মডেল টেস্ট-০১

১. ক. **আলো :** আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জাগায়।

আলোর উৎপত্তি : যে কোনো পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের বিভিন্ন খোলসে অবস্থান করে। এ পরমাণুতে যখন তাপশক্তি বা অন্য কোনো শক্তি সরবরাহ করা হয়, তখন ইলেকট্রনগুলো এক খোলস থেকে অন্য খোলসে লাফিয়ে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে ইলেকট্রনগুলো আবার নিজ নিজ খোলসে ফিরে আসে, তখন ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আলোকশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। এভাবেই সকল প্রকার আলোকের সৃষ্টি হয়।

প্রিজম : দুটি হেলানো সমতলপৃষ্ঠ দ্বারা সীমাবদ্ধ প্রতিসারক মাধ্যমকে প্রিজম বলে। প্রিজমে সাধারণত তিনটি আয়তক্ষেত্রিক ও দুটি ত্রিভুজাকৃতি তল থাকে।

খ. **রক্তের গ্রুপ 'পজেটিভ' বা 'নেগেটিভ' হওয়ার কারণ :** রক্তের গ্রুপ 'পজেটিভ' কি 'নেগেটিভ' হবে তা নির্ভর করে রক্তের Rh ফ্যাক্টরের উপর। যদি কোনো ব্যক্তির রক্তের লোহিত কণিকায় 'Rh-এগ্লুটিনোজেন' নামক বিশেষ উপাদান থাকে, তবে ঐ ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ হবে পজেটিভ। আর লোহিত কণিকায় Rh-এগ্লুটিনোজেন না থাকলে রক্তের গ্রুপ হবে নেগেটিভ।

রক্তে PH-এর মান : রক্তে PH-এর মান ৭.২–৭.৪।

লোহিত কণিকার কাজ :

ক. এদের প্রধান কাজ O_2 বহন করা।

খ. এরা রক্তে অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষায় সহায়তা করে।

গ. এরা সামান্য পরিমাণ CO_2-ও বহন করে থাকে।

গ. **শ্রাব্যতার সীমা :** প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা ২০ থেকে ২০,০০০-এর মধ্যে থাকলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তা আমরা শুনতে পাই। কম্পনের এ সীমাকে শ্রাব্যতার সীমা বলা হয় এবং উক্ত শব্দকে শ্রুত শব্দ বলে। প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা ২০-এর কম হলে আমরা শব্দ শুনতে পাই না। এ শব্দকে ইনফ্রাসনিক বা অবশ্রুতি শব্দ বলে। আর প্রতি সেকেন্ডে কম্পন সংখ্যা ২০,০০০-এর বেশি হলে উৎপন্ন শব্দও আমরা শুনতে পাই না তখন একে শ্রবণোত্তর বা সুপারসনিক শব্দ বলে।

বাদুরের পথ চলা : শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টির মাধ্যমে বাদুর পথ চলে। বাদুর চলার সময় ক্রমাগত বিভিন্ন কম্পাঙ্কের শব্দোত্তর তরঙ্গ উৎপন্ন করে চারদিকে প্রেরণ করে। পরবর্তীতে এ প্রেরিত শব্দ বিভিন্ন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে বাদুরের কানে ফিরে আসে। শব্দোত্তর তরঙ্গ ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান এবং প্রতিফলিত শব্দের প্রকৃতি থেকে বাদুর সহজেই প্রতিবন্ধকের অবস্থান ও আকৃতি সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে। ফলে পথ চলার সময় বাদুর সেই প্রতিবন্ধক পরিহার করে।

ঘ. **তড়িৎকোষের পোলারায়ন :** সাধারণত সরল তড়িৎকোষে পোলারায়ন দেখা যায়, তড়িৎ কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া আরম্ভ হওয়ার পর দুটি করে হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাত থেকে ইলেকট্রন নিয়ে তামার পাতের বিভব বাড়িয়ে দেয় ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। তামার পাতে বেশি হাইড্রোজেন গ্যাস জমে গেলে হাইড্রোজেন আয়ন তামার পাতের সংস্পর্শে এসে ইলেকট্রন নিতে পারে না। ফলে তামার পাতের বিভব ক্রমশই কমতে থাকে। এতে তড়িৎ প্রবাহ হ্রাস পায়। একে পোলারায়ন বলে।

পেট্রোলবাহী ট্রাক থেকে একটি লোহার শিকল মাটিতে ঝুলিয়ে দেয়ার কারণ : পেট্রোলবাহী ট্রাক চলার সময় পেট্রোল নড়াচড়া করতে থাকে। ফলে পেট্রোল ও ট্যাঙ্কের লোহার দেয়ালের মধ্যে ঘর্ষণ হয়। এ ঘর্ষণের কারণে স্থির তড়িৎ উৎপন্ন হয়। এভাবে উৎপন্ন স্থির তড়িৎ ক্রমশ জমা হতে হতে এক সময় তড়িৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলে পেট্রোল ও বায়ুর মিশ্রণে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ এবং আগুন ধরে যেতে পারে। উৎপন্ন তড়িৎ যেন জমা না হয়, সেজন্য পেট্রোলের ট্যাংকের গায়ের সাথে যুক্ত করা একটি লোহার শিকলকে মাটিতে গড়িয়ে দেয়া হয়। এর ফলে ট্যাংকে স্থির তড়িৎ উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে পরিবাহী লোহার শিকলের মধ্য দিয়ে মাটিতে চলে যায়।

ঙ. একটি সাধারণ বা সরলতম বিদ্যুৎ কোষের উদাহরণ হলো- ভোল্টার কোষ। নিচে এ কোষের গঠন প্রণালী বর্ণনা করা হলো :

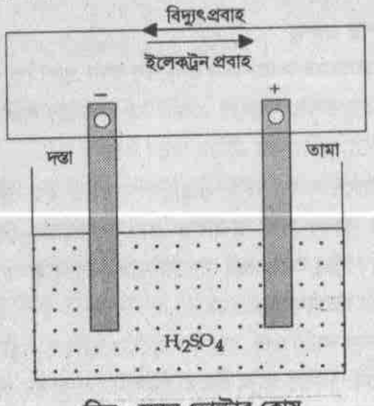

চিত্র : সরল ভোল্টার কোষ

একটি কাচের পাত্রে খানিকটা পাতলা H_2SO_4 নিয়ে তার মধ্যে একটি দস্তা ও একটি তামার পাত পরস্পরকে স্পর্শ না করিয়ে ডুবালে একটি সরল ভোল্টার বিদ্যুৎ কোষ তৈরি হয়।

পাত দুটির সাথে দুটি সংযোজক স্ক্রু লাগান থাকে। একটি তামার তার দিয়ে সংযোজক স্ক্রু দুটিকে সংযুক্ত করলে তারের মধ্য দিয়ে তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎ প্রবাহ শুরু হয় এবং তামার পাত বেয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ উঠতে থাকে।

দস্তা ও এসিডের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে তামা ও দস্তার পাতের মধ্যে বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। তামার পাতের বিভব দস্তার পাতের চেয়ে উচ্চতর হওয়ায় তামার পাত থেকে দস্তার পাতে তড়িৎ প্রবাহিত হয়।

২. ক. কম্বল তাপের কুপরিবাহক। কারণ কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য ছিদ্র পথে বায়ু আবদ্ধ থাকে। বায়ু তাপের কুপরিবাহক বলে এ বায়ুস্তর তাপ পরিবহনে বাধা প্রদান করে। শীতের দিনে মানুষের দেহ কম্বলে ঢেকে রাখলে কম্বলের মধ্য দিয়ে মানুষের দেহের তাপ বাইরে যেতে পারে না। ফলে শরীর গরম থাকে। অপরপক্ষে গরমের দিনে বায়ুমণ্ডল থেকে তাপ গ্রহণ করে বরফ গলতে থাকে। কিন্তু কম্বলে ঢাকা থাকলে তাপের কুপরিবাহক বলে বাইরের তাপ কম্বল ভেদ করে বরফে আসতে পারে না। ফলে বরফ কোনো তাপ গ্রহণ করে না। তাই এটি ঠাণ্ডাই থাকে।

খ. বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করার কারণ : বৈদ্যুতিক বাল্ব বায়ু শূন্য হলে এর মধ্যে যে ফিলামেন্ট থাকে তা দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় এবং কাচের ভেতরের দেয়ালে পাতলা আবরণ পড়ে। ফলে বাল্ব দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, নিষ্ক্রিয় গ্যাস (আর্গন, নিয়ন, রেডন, জেনন, ক্রিপটন, হিলিয়াম) বাল্বে ব্যবহার করলে এর ফিলামেন্ট ধীরে ধীরে নষ্ট হয় ও অধিকতর উজ্জ্বল আলো পাওয়া যায়। পাশাপাশি এর স্থায়িত্বও বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই বৈদ্যুতিক বাল্বে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

গ. সালোকসংশ্লেষণ : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সবুজ উদ্ভিদ সূর্যালোক থেকে প্রাপ্ত শক্তি ব্যবহার করে ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) ও পানির রাসায়নিক মিলন ঘটিয়ে শর্করা (কার্বহাইড্রেট) জাতীয় খাদ্য তৈরি করে এবং উপজাত দ্রব্য হিসেবে অক্সিজেন (O_2) নির্গত করে সেই প্রক্রিয়াকে সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) বলে।

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{ক্লোরোফিল}]{\text{সূর্যালোক}} C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2$$

সালোকসংশ্লেষণের গুরুত্ব

ক. এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সমগ্র জীব জগতের জন্য প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদিত হয়।

খ. এ প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত খাদ্যের একটি অংশ উদ্ভিদ সঞ্চয় করে রাখে এবং সেই সঞ্চিত খাদ্য গ্রহণ করে প্রাণিজগত জীবন ধারণ করে।

গ. সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এর ফলে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেন-এর ভারসাম্য বজায় থাকে এবং শ্বসনের জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন পাওয়া যায়। সালোকসংশ্লেষণ সংঘটিত না হলে প্রাণীরা অক্সিজেন–এর অভাবে মারা যেত।

ঘ. সালোকসংশ্লেষণে কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহৃত হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে পৃথিবীর মানুষ গ্রিন হাউজজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাচ্ছে।

ঘ. নিচে বৈদ্যুতিক কোষ এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈদ্যুতিক কোষ	ব্যাটারি
১. যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাকে বৈদ্যুতিক কোষ বলে। এটি একটি সরলতম একক কোষ। যেমন– ভোল্টার কোষ।	১. প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি বলতে একাধিক কোষের সমবায়কে বোঝায়। যেমন– লেড এসিড কোষ
২. চিত্র : বৈদ্যুতিক কোষ	২. 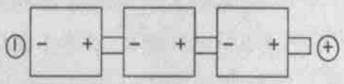 চিত্র : ব্যাটারি
৩. প্রতীক : 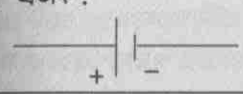	৩. প্রতীক :
৪. আকারে ছোট ও হালকা।	৪. আকারে বড় ও ভারী।
৫. প্রাপ্ত ভোল্টেজ কম।	৫. প্রাপ্ত ভোল্টেজ বেশি।

ঙ. এপেন্ডিক্স : এপেন্ডিক্স মানবদেহের একটি নিষ্ক্রিয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশ। পরিপাকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদান্ত্রের মধ্যে অবস্থিত একটি বড় সিকামই এপেন্ডিক্স নামে পরিচিত। কোনো কারণে একটি পঁচে গেলে তীব্র ব্যথাসহ দৈহিক বৈকল্য দেখা দেয়।

এপেন্ডিসাইটিস : এপেন্ডিসাইটিস হলো রোগবিশেষ। এপেন্ডিক্সের তীব্র ব্যথাসম্বলিত রোগই এপেন্ডিসাইটিস। মল, কৃমি প্রভৃতি দ্বারা এপেন্ডিক্সের নালী বন্ধ হলে এতে পচন ধরে তীব্র ব্যথা হয়। আবার ভাইরাস বা আন্ত্রিক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে সৃষ্ট প্রদাহের কারণে এপেন্ডিক্স গাত্র ফুলে ওঠে এবং রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে এপেন্ডিক্সে পচন ধরে তীব্র ব্যথা হয়। প্রদাহজনিত এ ব্যথা প্রথম নাভির গোড়ায় অনুভূত হয় এবং পরে তলপেটের ডানদিকে সরে যায়। এপেন্ডিসাইটিস হলে জরুরি শল্য চিকিৎসা করাই সর্বোত্তম।

৩. **ক. নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় :** নিরক্ষরেখার উভয় পার্শ্বে ০° থেকে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত এ বলয় অবস্থিত। এ অঞ্চলে সারাবছর সূর্য প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ অঞ্চলের বায়ু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু, তাই বায়ুর চাপ কম। ফলে এ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। তাই একে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলে।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য :

ক. এ অঞ্চলের বায়ু অন্যান্য অঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু হয়।

খ. এ অঞ্চলের বায়ুর অনুভূমিক প্রবাহ হয় না। তাই এর অপর নাম নিরক্ষীয় শান্ত বলয়।

গ. এ অঞ্চলে প্রায়ই বজ্রপাতসহ প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

ঘ. সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে প্রচুর জলীয়বাষ্পের উদ্ভব হয়।

খ. মানবদেহে লৌহের কাজ : রক্তের ৯৮% লৌহ হিমোগ্লোবিনে থাকে। হিম নামক লৌহঘটিত যৌগ গ্লোবিন নামক প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হিমোগ্লোবিন অণু তৈরি করে। এজন্য হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে

লৌহ অপরিহার্য। হিমোগ্লোবিনের প্রধান কাজ ফুসফুস থেকে অক্সিজেন বহন করে আনা ও কোষের মধ্যে যুক্ত করে দেয়া এবং কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিয়ে ফুসফুসে ছেড়ে দেয়া। এছাড়া

ক. লৌহ জীবিত প্রাণী কোষের শ্বসনের জন্য অপরিহার্য।

খ. অন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে ফিরিটিন নামক প্রোটিনের আকারে সঞ্চিত থাকে। দেহের প্রয়োজন মতো আন্ত্রিক ঝিল্লী লোহা মুক্ত করে এবং দেহে বিশোষিত হয়।

দেহের প্রধান সঞ্চয়, যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় লৌহ ফিরিটিনরূপে জমা থাকে। বিপাক কার্যে সাহায্যকারী কোনো কোনো এনজাইমেও লৌহ থাকে।

গ. বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাল্ব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V ও W লেখা থাকে। V দ্বারা ভোল্ট এবং W দ্বারা ওয়াট বোঝানো হয়। এখানে ভোল্ট হলো বৈদ্যুতিক চাপের একক এবং ওয়াট হলো তড়িৎ ক্ষমতার একক। কাজেই বাতির গায়ে 220V-25W লেখা থাকার অর্থ হচ্ছে 220 ভোল্ট বিভব পার্থক্যে সংযুক্ত করলে বাতিটি সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে এবং বাতিটি প্রতি সেকেন্ডে 25 ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করবে। অর্থাৎ 25 ওয়াট করে বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এছাড়া বাতিটিকে 220 ভোল্টের উপরের কোনো বিভব চাপে জ্বালানো যাবে না। কারণ এতে করে বাতিটির ভেতরের ফিলামেন্ট ফেটে যাবে অর্থাৎ বাতিটি ফিউজ হয়ে যাবে।

ঘ. **জোনাকির আলো জ্বালার কারণ :** আমরা যে জোনাকির আলো দেখি তা পুরুষ জোনাকির আলো। স্ত্রী জোনাকির কোনো ডানা নেই, সে উড়তেও পারে না। পুরুষ জোনাকির উদর অংশ কতগুলো ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা। এ ভাগগুলোর ষষ্ঠ এবং সপ্তম ভাগের মাঝখানে জোনাকির আলোক-যন্ত্রটি আছে। এটা থাকে তলার দিকে। যে অংশ থেকে আলো বের হয় তার ওপরেই আছে আরেকটি স্তর। এ স্তর আলোকে প্রতিফলন করতে সাহায্য করে। আলোক-যন্ত্রের কোষগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে আলো তৈরি করে তাতে কোনো উত্তাপ সৃষ্টি হয় না। স্নায়ুর মাধ্যমে সংকেত পেয়ে আলোক-যন্ত্রের কোষে অবস্থিত লুসিফেরিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিডাইজড্ লুসিফেরিন তৈরি হয়। এ অক্সিডাইজড্ লুসিফেরিন থেকেই আলো বেরিয়ে আসে। এ বিক্রিয়া লুসিফেরিনেজ নামের এক ধরনের উৎসেচকের সাহায্যে ঘটে থাকে। জোনাকির শরীরে সংকেত পাঠানোর জন্য কোনোরকম ব্যবস্থা না থাকায় রাতে আলো জ্বেলে পুরুষ জোনাকি সহচরী জোনাকির সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। অর্থাৎ জোনাকির আলোর সংকেত দেখে সহচরী জোনাকি সহজেই সহচরের খোঁজ পায়।

৪. ক. **সোডিয়ামকে কেরোসিনের নিচে রাখার কারণ :** শুষ্ক বাতাসে সোডিয়াম কক্ষ তাপমাত্রায় বিক্রিয়া করে না। কিন্তু আর্দ্র বাতাসে এটি সোডিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা বাতাসের জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে। তাই বাতাসের সংস্পর্শে যাতে না আসতে পারে সেজন্য সোডিয়াম ধাতুকে কেরোসিনের বা পেট্রোলের নিচে রাখা হয়।

খ. **রাসায়নিক পদার্থসমূহের রাজা :** প্রায় প্রত্যেক শিল্পের কোনো না কোনো স্তরে H_2SO_4 ব্যবহৃত হয়। সব রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে H_2SO_4 বেশি উৎপন্ন ও ব্যবহৃত হয় বলে একে রাসায়নিক পদার্থসমূহের রাজা বলা হয়।

H_2SO_4 সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য, প্রায় প্রত্যেক শিল্পে উৎপাদনের কোনো না কোনো স্তরে কম বা বেশি পরিমাণে H_2SO_4 প্রয়োজন। সমগ্র পৃথিবীতে 20 মিলিয়ন টনের বেশি H_2SO_4 রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

গ. **সাধারণ লোহার সাথে ইস্পাতের পার্থক্য :** সাধারণ লোহার কার্বনের পরিমাণ শতকরা ২.৫-৪.৫ ভাগ কিন্তু ইস্পাতে কার্বনের পরিমাণ শতকরা ০.২৫–১.৫ ভাগ। বিশুদ্ধ লৌহের গলনাঙ্ক ১৫৩৫° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ইস্পাতের গলনাঙ্ক ১৩০০°–১৪০০° সেন্ট্রিগ্রেড। ইস্পাতের চুম্বকীকরণ স্থায়ী হয় কিন্তু বিশুদ্ধ লোহার চুম্বকীকরণ স্থায়ী হয় না।

ঘ. **একই বস্তুর ওজন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হওয়ার কারণ :** কোনো বস্তুর ওজন শুধু তার ভরের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণের ওপরও নির্ভরশীল। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বিভিন্ন, তাই বস্তুর ওজনগত অবস্থা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে বেশি, তাই এ অঞ্চলে বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে বিষুবীয় অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে কম, তাই এ অঞ্চলে বস্তুর ওজনও সবচেয়ে কম।

ঙ. **ফরেনসিক মেডিসিন :** দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সমাধানের জন্য মেডিক্যাল সাক্ষ্য-প্রমাণ কিংবা চিকিৎসকের মতামতের প্রয়োজন হয়। এ সংক্রান্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ শাখাটি ফরেনসিক মেডিসিন নামে পরিচিত। আইনগত বিতর্ক এড়াতে সাধারণত ফরেনসিক রোগতত্ত্ব, ফরেনসিক মানসিক রোগতত্ত্ব, ফরেনসিক দন্তবিজ্ঞান, ফরেনসিক বিষবিজ্ঞান, অর্থোপেডিকস, সাধারণ শল্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের ওপর মতামত প্রদান করা হয়।

লাশের ময়না তদন্ত; পচে-গলে যাওয়া লাশ শনাক্ত করা; অস্থির বয়স, প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণ; বিকৃতভাবে পুড়ে যাওয়া দেহাবশেষ শনাক্তকরণ, আঘাতের প্রকৃতি নির্ণয়; যৌন নির্যাতনের প্রকৃতি নির্ণয়; পোশাক কিংবা দেহে লেগে থাকা রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা; দেহবিশেষ থেকে বের করা গুলির অংশবিশেষ পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ফরেনসিক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎকগণ মতামত দিয়ে থাকেন।

৫. ক. **সুপার নোভা :** তারকা কেন্দ্রের হাইড্রোজেন জ্বালানি পুড়িয়ে হিলিয়ামে পরিণত হতে থাকলে এক সময় এই হাইড্রোজেন জ্বালানি শেষ হয়ে যায় এবং প্রক্রিয়াটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে উত্তাপের অভাবে তার ভিতরের অংশ সংকুচিত হতে থাকে এবং এ সংকোচনের ফলে সৃষ্ট তাপ নতুন করে উত্তাপ তৈরি করে। এ উত্তাপের ফলে পুরাতন হাইড্রোজেন জ্বালানির ভস্ম হিলিয়ামে নতুন করে দহন শুরু হয় এবং হিলিয়াম পুড়ে হয় কার্বন ও অক্সিজেন। কার্বন ও অক্সিজেন থেকে সিলিকন এবং সিলিকন থেকে আয়রন পরমাণু তৈরি হওয়ায় জ্বালানির অভাবে তারকাটির জীবন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। তখন আয়রন দিয়ে তৈরি ভিতরের শাঁসটি ভীষণভাবে বিস্ফোরিত হয়। একে বলে সুপার নোভা বা অতিনভ অবস্থা।

এ সুপার নোভার বিস্ফোরণকালে একটি একক তারকার দীপ্তি সমস্ত ছায়াপথের অনুজ্জ্বল্যকে ছাড়িয়ে যায় এবং এ অবস্থা কয়েকদিন ধরে বহাল থাকে। এটাই তারকার মৃত্যুপূর্ব শেষ আর্তনাদ। বৃহৎ আকৃতির তারকার জীবনাবসানে এটি প্রথম ধাপ।

তারা খসা : মহাশূন্যে ভাসমান জড়বস্তুগুলো অনেক সময় মধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলের প্রভাবে প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। রাতের মেঘমুক্ত আকাশে এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন নক্ষত্র ছুটে যাচ্ছে বা মনে হয় কোনো নক্ষত্র যেন এই মাত্র খসে পড়ল। এ ঘটনাকে বলা হয় তারা খসা।

খ. **ডায়া চৌম্বক পদার্থ :** কোনো পরমাণুতে যদি সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বিপরীত অভিমুখে ঘূর্ণনরত থাকে তাহলে একটি ইলেকট্রন দ্বারা উৎপন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র বিপরীত অভিমুখে ঘূর্ণায়মান অপর ইলেকট্রনের চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা নাকচ হয়ে যায়। এ ধরনের পরমাণু দ্বারা গঠিত পদার্থ হচ্ছে অচৌম্বক পদার্থ। এসব পদার্থকে খুব শক্তিশালী কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে এ পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘূর্ণন সামান্য প্রভাবিত হয়ে এসব পদার্থে খুবই চৌম্বকত্ব দেখা যেতে পারে, যাকে ডায়া চৌম্বকত্ব বলে। এ ধরনের অচৌম্বক পদার্থকে ডায়া চৌম্বক পদার্থ বলে। যেমন– পানি, তামা, বিসমাথ, অ্যান্টিমনি ইত্যাদি ডায়া চৌম্বক পদার্থ।

প্যারা চৌম্বক পদার্থ : কোনো পরমাণুতে যদি বিপরীত অভিমুখে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান না হয় তাহলে প্রত্যেক ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট চৌম্বকক্ষেত্র পরস্পরের ক্রিয়া নাকচ করতে পারে না। ফলে পরমাণুটি একটি লব্দ চৌম্বকক্ষেত্র লাভ করে এবং পরমাণুটি একটি ক্ষুদ্র চুম্বক হিসেবে আচরণ করে। একে দ্বিপোল চৌম্বক বলে। এরকম পরমাণু চৌম্বক দ্বারা গঠিত পদার্থের উপর যদি কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগ করা না হয় তাহলে চৌম্বক দ্বিপোলগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে ফলে পদার্থটিতে কোনো লব্ধ চৌম্বক ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু যদি কোনো চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে এ চুম্বক দ্বিপোলগুলো আংশিকভাবে বিন্যস্ত হয়ে সামান্য পরিমাণে চুম্বকত্ব প্রদর্শন করে। এদেরকে প্যারা চৌম্বক পদার্থ বলে।

ফেরো চৌম্বক পদার্থ : কিছু কিছু পদার্থে চৌম্বক দ্বিপোলগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত না হয়ে দল বেঁধে একই অভিমুখে বিন্যস্ত হয়ে এক একটা চৌম্বক ডোমেইন গঠন করে। প্রত্যেকটি ডোমেইন স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি স্বতন্ত্র চুম্বকের মতো আচরণ করে। অসংখ্য চৌম্বক ডোমেইন নিয়ে গঠিত এসব পদার্থকে ফেরো চৌম্বক পদার্থ বলে। ডোমেইনগুলো বিভিন্ন দিকে মুখ করে থাকে বলে ফেরো চুম্বক পদার্থকে সাধারণভাবে অচুম্বকিত মনে হয়।

গ. **সাবান :** সাবান হচ্ছে উচ্চতর জৈব এসিড; যেমন— স্টিয়ারিক এসিড, পামিটিক এসিড প্রভৃতি এসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। এর রাসায়নিক সংকেত হলো $C_{17}H_{35}COONa$। চর্বি বা তেলের সাথে অ্যালকালি বা ক্ষার ফুটিয়ে ফ্যাটি এসিডের লবণ প্রস্তুত করা হয়। কস্টিক সোডার (NaOH) দ্রবণে তেলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাবান ও গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। এ থেকে সাবান ও গ্লিসারিনকে আলাদা করে ফেলা হয়।

সাবান যেভাবে ময়লা পরিষ্কার করে : সাবানের দুইটি অংশ থাকে। একটি হলো ফ্যাটি এসিডের আয়ন এবং অপরটি সোডিয়াম অথবা পটাসিয়াম আয়ন। কাপড়ে যখন সাবান দেয়া হয়, তখন সাবানের অণুগুলো ভেঙ্গে গিয়ে ফ্যাটি এসিডের আয়ন ও সোডিয়াম আয়ন তৈরি করে। সোডিয়াম আয়ন পানির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ফ্যাটি এসিডের আয়ন ময়লা তৈলাক্ত পদার্থ কণার দিকে আকৃষ্ট হয়। এ সময় তেলের অণুর চারদিকে ফ্যাটি এসিডের অণুগুলো

ভিড় করে পানির সাথে বিক্রিয়া না করেই পানির ওপর ভেসে উঠে। এতে কাপড় থেকে তৈলাক্ত ময়লা মুক্ত হয় এবং কাপড় পরিষ্কার হয়। এর সাথে নাড়াচড়া বা ঘষা দিলে তেল ও ময়লা আরও সহজে কাপড় থেকে আলগা হয়ে যায়।

ঘ. **সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিরক প্রভাব :** সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানুষের জন্য সৃষ্ট ক্ষতি :

১. চর্ম ক্যান্সার হতে পারে।
২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
৩. চোখে ছানি পড়ে এবং অন্ধত্ব বেড়ে যায়।
৪. খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং বীজের উৎকর্ষ নষ্ট হয়।
৫. প্রাণিজগতের অনেক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে।

গামা রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব : গামা রশ্মির প্রভাবে মানুষের নিম্নলিখিত ক্ষতি হতে পারে :

১. এ রশ্মি দেহের কোষ নষ্ট করতে পারে।
২. এ রশ্মির প্রভাবে মাথার চুল পড়ে যায়।
৩. এ রশ্মিতে আক্রান্ত মানুষের ক্যান্সার ও টিউমার হতে পারে।
৪. অতিমাত্রায় এ রশ্মি মানুষের দেহে পড়লে মানুষের মৃত্যু হতে পারে।

৬. ক. হীরকের সংকট বা ক্রান্তি কোণ ২৪° বলতে বোঝায় শূন্য মাধ্যমে (বা বায়ু) ও হীরকের বিভেদ তলে হীরক থেকে ২৪° কোণে আপতিত রশ্মি বিভেদ তল ঘেঁষে প্রতিসরিত হয়। আপতন কোণের মান ২৪°-এর চেয়ে বেশি হলে আলোক রশ্মির প্রতিসরণ না হয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হবে।

খ. **সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস :** ঘূর্ণিঝড়ের সময় সমুদ্রের পানি স্ফীত হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে উপকূলের কাছাকাছি যে উঁচু ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তাকে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বলে।
সাগরে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়।

সাগরে জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টির কারণ : ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হলে সাগরের পানি যে সব কারণে স্ফীত হয়ে জলোচ্ছ্বাস ঘটায় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. তীব্র বায়ুতাড়িত অভিসারি সমুদ্রস্রোত।
খ. ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের চাপের অস্বাভাবিক হ্রাস।
গ. ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত হানার সম্ভাব্য উপকূলের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের কৌণিক অবস্থান।
ঘ. সাগরের অগভীর অংশে বা মহীসোপানে ঘূর্ণিঝড়ের আগমন।
ঙ. উপকূলের আকৃতি।
চ. ভরা জোয়ার (ভরা কটাল)।

গ. **গামা রশ্মি (γ):** তাড়িত চৌম্বক বর্ণালীর 10^{-11} মিটারের চেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সকল বিকিরণই গামা রশ্মি। অতিক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হওয়ায় এ রশ্মির শক্তি অত্যন্ত বেশি যা দৃশ্যমান আলোর চেয়ে ৫০,০০০ গুণ বেশি।

এ রশ্মির কয়েকটি ধর্ম :

i. ভর ও চার্জ নেই।
ii. আলোর বেগে ($3 \times 10^8 ms^{-1}$) চলে।

iii. বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয় না।
iv. ভেদন ক্ষমতা সর্বাধিক কিন্তু আয়নায়ন ক্ষমতা কম।

ক্ষতিকর দিক :

i. এ রশ্মির প্রভাবে মানুষের দেহ পুড়ে যেতে পারে।
ii. অকালে চুল পড়ে যেতে পারে।
iii. ক্যানসার, টিউমার হতে পারে।
iv. এমন কি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ঘ. পেট্রোল ইঞ্জিনের ও ডিজেল ইঞ্জিনের পার্থক্য :

পেট্রোল ইঞ্জিন	ডিজেল ইঞ্জিন
১. জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।	১. জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহৃত হয়।
২. এতে বিদ্যুৎ স্পার্ক প্লাগ থাকে।	২. এতে কোনো স্পার্ক প্লাগ থাকে না।
৩. এতে বায়ু ও পেট্রোলের মিশ্রণ সিলিন্ডারে শোষিত হয়।	৩. এতে কেবল বায়ু সিলিন্ডারে শোষিত হয়।
৪. এতে উচ্চচাপে সংনমিত বায়ু ও জ্বালানির মিশ্রণে স্পার্কিং প্রক্রিয়ায় আগুন ধরানো হয়।	৪. এতে উচ্চচাপে সংনমিত বায়ুর ওপর জ্বালানি ইনজেক্ট করে আগুন ধরানো হয়।
৫. এ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা প্রায় ৩০%।	৫. এ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা প্রায় ৭০%।

মডেল টেস্ট ০১

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : *প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে*]

নম্বর

১. ক. অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
খ. মাইক্রোপ্রসেসর কি? ২
গ. ওএমআর এবং ওসিআর-এর মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
ঘ. ইনপুট ডিভাইস কি? ২

২. ক. কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেম উদাহরণসহ বুঝিয়ে লিখুন। ৪
খ. প্রোগ্রামিং ভাষা কি? প্রোগ্রামিং ভাষার বিভিন্ন স্তরের নাম লিখুন। ৪
গ. ইউনিভার্সেল সিরিয়াল বাস কি? ২

৩. ক. তথ্য প্রযুক্তি কি? সংক্ষেপে তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ উল্লেখ করুন। ৫
খ. ডেটা কোডিং কি? ডেটা কোডিং-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা লিখুন। ৫

৪. ক. গাণিতিকভাবে ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করুন। ৫
খ. বৈদ্যুতিক ক্ষমতা কি? বৈদ্যুতিক ক্ষমতা গাণিতিকভাবে প্রকাশ করুন। ৫

৫. ক. মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স বলতে কি বুঝায়? ৪
খ. সংক্ষেপে অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। ৪
গ. সংক্ষেপে ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট-এর কার্যনীতি লিখুন। ২

উত্তর : মডেল টেস্ট-০১

১. **ক.** অ্যানালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অ্যানালগ কম্পিউটার	ডিজিটাল কম্পিউটার
১. অ্যানালগ কম্পিউটারে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সংকেত বা অ্যানালগ সংকেত ব্যবহার করা হয়। অ্যানালগ সংকেতের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পর্যায়ক্রমিকভাবে ওঠা নামা করা।	১. ডিজিটাল কম্পিউটারে ডিজিটাল সংকেত বা বিদ্যুৎ প্রবাহ চালু বা বন্ধ করে হিসাবকার্য করা হয়ে থাকে অর্থাৎ এটি '০' ও '১' দিয়ে সব ধরনের কাজের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে।
২. চাপ, তাপ, তরলের প্রবাহ ইত্যাদি পরিবর্তনশীল ডেটার জন্য সৃষ্ট বৈদ্যুতিক তরঙ্গকে অ্যানালগ কম্পিউটারের ইনপুট হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।	২. ডিজিটাল কম্পিউটারে ডেটা প্রক্রিয়াকরণ ও হিসাবের জন্য ইনপুট হিসেবে বর্ণ ও অঙ্ক ব্যবহার করা হয়।
৩. অ্যানালগ কম্পিউটারে প্রক্রিয়াজাত ফলাফলকে সাধারণত কাঁটার সাহায্যে অথবা প্লোটারের সাহায্যে অঙ্কিত গ্রাফের আকারে বা ছবি এঁকে প্রকাশ করা হয়।	৩. ডিজিটাল কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল সরাসরি মনিটরে বা অন্য কোনো আউটপুট ডিভাইসে প্রদর্শিত হয়।
৪. অ্যানালগ কম্পিউটারে সূক্ষ্মতা কম, অর্থাৎ মোটামুটি ০.১%।	৪. ডিজিটাল কম্পিউটারের সূক্ষ্মতা অনেক বেশি, কারণ যোগ-বিয়োগ করার সময় দশমিকের পর অনেক বেশি ঘর (নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত) ব্যবহার করা যায়।
৫. মোটর গাড়ির স্পিডোমিটার, স্লাইড রুল, অপারেশনাল অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদি অ্যানালগ কম্পিউটার।	৫. সাধারণত আধুনিক কম্পিউটার বলতে ডিজিটাল কম্পিউটারকেই বুঝায়। এর সাহায্যে সব ধরনের কাজ করা যায়।

খ. মাইক্রোপ্রসেসর : মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI– Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ (Chip)। কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউকে ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়। মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রো কম্পিউটার বা মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক পদ্ধতির 'মস্তিষ্ক' বা 'ব্রেইন' স্বরূপ। মাইক্রোপ্রসেসরের প্রকৃতি ও ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটারের ক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্য। মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে মাইক্রো কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ কাজ সমাধান করা হয়।

গ. OMR এবং OCR দুটোই ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। OCR এবং OMR এর পার্থক্য নিম্নরূপ :

অপটিক্যাল মার্ক রিডার (OMR)	অপটিক্যাল ক্যারেক্টর রিডার (OCR)
১. OMR এর পূর্ণরূপ Optical Mark Reader.	১. OCR এর পূর্ণরূপ Optical Character Reader.
২. OMR এর সাহায্যে কালির দাগের আলোর প্রতিফলন বিচার করা হয় এবং পেন্সিলের সীসের উপাদান গ্রাফাইটের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা বিচার করা হয়।	২. এটি কোনো বর্ণ পড়ার সময় সেই বর্ণের গঠন অনুযায়ী কতগুলো বৈদ্যুতিক সংকেত সৃষ্টি করে।
৩. এটি পেন্সিলের বা কালির দাগ বুঝতে পারে।	৩. এর সাহায্যে কাগজে পেন্সিল বা কালির দাগ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের চিহ্ন বা বর্ণ পঠন সম্ভব।
৪. পরীক্ষার নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র পরীক্ষণে OMR ব্যবহৃত হচ্ছে।	৪. চিঠির পিন কোড, ইলেকট্রিক বিল, বাজার সমীক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে OCR ব্যবহৃত হয়।

ঘ. **ইনপুট ডিভাইস :** ইনপুট দিয়ে কম্পিউটার সমস্যা সমাধানের কাজের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং নির্দেশ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা দেয়া হয়। এ ইউনিটে বিশেষ মাধ্যম থেকে ডেটা ও প্রোগ্রাম গ্রহণ করে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরের পর কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষণ করে। কয়েকটি ইনপুট ডিভাইসের উদাহরণ নিচে দেয়া হলো :

১. পাঞ্চ কার্ড রিডার; ২. ভয়েস ডেটা এন্ট্রি পদ্ধতি; ৩. কী-বোর্ড; ৪. ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট; ৫. পেপার টেপ রিডার; ৬. অপটিক্যাল মার্ক বা আলোকীয় চিহ্ন রিডার; ৭. অপটিক্যাল বা আলোকীয় বর্ণ রিডার; ৮. চুম্বক কালি বর্ণ রিডার; ৯. চুম্বক টেপ ড্রাইভ; ১০. হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ; ১১. ফ্লপি ডিস্ক ড্রাইভ; ১২. মাউস; ১৩. স্ক্যানার; ১৪. ডিজিটাল ক্যামেরা ইত্যাদি।

২. ক. **অপারেটিং সিস্টেম :** অপারেটিং সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি সফটওয়্যার যা কম্পিউটার প্রোগ্রামের এক্সিকিউশনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যা সিডিউলিং, ডিবাগিং, ইনপুট/আউটপুট কন্ট্রোল, একাউন্টিং, কম্পাইলেশন, স্টোরেজ অ্যাসাইনমেন্ট, ডেটা ম্যানেজমেন্ট এবং আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে। বর্তমানে মাইক্রো কম্পিউটার বা পিসিতে বহুল ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেমগুলো হলো :

1. MS-DOS, PC-DOS, 2. MS WINDOWS 95/98/2000/XP/Vista, 3. UNIX, 4. XINIS, 5. LINUX, 6. Mac OS, 7. OS/2 Warp, 8. Solaries.

খ. **প্রোগ্রামিং ভাষা :** কম্পিউটার দিয়ে সহজে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য কম্পিউটারকে তার নিজস্ব বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ প্রদান করতে হয়। কম্পিউটারের নিজস্ব ও বোধগম্য ভাষায় নির্দেশ প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী শব্দ, বর্ণ, সংকেত ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট বিন্যাস হচ্ছে প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামে ব্যবহৃত বর্ণ, শব্দ, সংকেত ইত্যাদি নির্দিষ্ট গঠনে তৈরি হয় প্রোগ্রামের ভাষা।

বিভিন্ন স্তরের প্রোগ্রামের ভাষা : প্রোগ্রামের ভাষাকে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পাঁচটি স্তরে (Level) বা প্রজন্মে (Generation) ভাগ করা যায়। যথা–

ক. প্রথম প্রজন্ম ভাষা (১৯৪৫) : মেশিন ভাষা (Machine Language);
খ. দ্বিতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৫০) : অ্যাসেম্বলি ভাষা (Assembly Language);
গ. তৃতীয় প্রজন্ম ভাষা (১৯৬০) : উচ্চতর বা হাই লেভেল (High Level) ভাষা;
ঘ. চতুর্থ প্রজন্ম ভাষা (১৯৭০) : অতি উচ্চতর বা ভেরি হাই লেভেল (Very High Level) ভাষা;
ঙ. পঞ্চম প্রজন্ম ভাষা (১৯৮০) : স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল (Natural) ভাষা।

উল্লেখ্য, মেশিন ভাষা ও অ্যাসেম্বলি ভাষাকে লো লেভেল ভাষা বলে।

গ. **ইউনিভার্সেল সিরিয়াল বাস :** এ প্রযুক্তির সাহায্যে সংযোগ দেয়া I/O যন্ত্রগুলো প্রতি সেকেন্ডে ১২ মেগাবাইট গতিতে ডেটা পারাপার করতে পারে। পিসি এবং মেকিন্টোস উভয় প্লাটফরমেই এ ইন্টারফেসটি জনপ্রিয়। এ ইন্টারফেসের বড় সুবিধা হলো যে এতে ডেটা ট্রান্সফারের গতি যখন তখন উঠানামা করে না।

৩. ক. **তথ্য প্রযুক্তি :** তথ্যপ্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। একে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইটি (Information Technology – IT) নামে অভিহিত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি মূলত একটি সমন্বিত প্রযুক্তি যা যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও, কমপিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তির সম্মিলনে দীর্ঘদিন ধরে চর্চার ফলে সমৃদ্ধি লাভ করে তথ্যপ্রযুক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে কম্পিউটার এবং

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

সমাজে আজ তথ্যপ্রযুক্তির জয়জয়কার। ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং শিল্প সংস্কৃতিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। কলকারখানায় অধিকতর দক্ষতা এনে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

১. **ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে :** তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া আজকাল ব্যাংক, বীমা, ক্রেডিট কোম্পানি, বিমান পরিবহন এবং উন্নত বিশ্বের সাধারণ কেনাকাটাসহ অনেক কর্মকাণ্ড অচল। ব্যবসায় বাণিজ্যে কম্পিউটারসহ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় অচল, বিশেষত উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার বুলেটিন বোর্ড, ইলেক্ট্রনিক মেইল ওয়েভ সাইট এবং ইন্টারনেট বাণিজ্যিক যোগাযোগসহ সব রকম যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত আধুনিক ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানীতে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২. **যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি :** আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথে এবং আকাশপথের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে সহজতর, দ্রুত এবং লাভজনক। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে সংরক্ষিত। টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক মেইল ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যমে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে :** শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শিক্ষাকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এখন ইচ্ছা করলে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কোনো লাইব্রেরি থেকে বই পড়তে পারছে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি কিংবা গবেষণা কর্ম সাথে সাথে ইন্টারনেটে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। তাছাড়া টেলিভিশন, টেলিফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট সর্বোপরি কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার যাবতীয় তথ্য সম্প্রচারিত হচ্ছে।

৪. **বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে :** বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে টেলিফোন, টেলিভিশন, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং গবেষণা কর্ম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। ফলে বিজ্ঞান সামনের দিকে এগিয়ে চলছে রকেটের গতিতে। আজ থেকে একশ বছর আগে যে গবেষণা শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আজ কেউ গবেষণা করছে না, যা অতীতে করত। বর্তমানে সর্বশেষ গবেষণা কর্মটি যেখানে শেষ, সেখান থেকে অন্য গবেষক গবেষণা শুরু করছেন। ফলে বিজ্ঞান নিত্যনতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দ্বারে হাজির হচ্ছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ ঘরে বসে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন নতুন ওষুধের উদ্ভাবন এবং রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ পদ্ধতি আজ সবাই জেনে যাচ্ছেন।

৫. **শিল্প-সাহিত্য এবং বিনোদনে তথ্যপ্রযুক্তি :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ফলাফল আজ মুহূর্তে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষের কল্যাণে সেসব কর্ম অবদান রেখে যাচ্ছে।
বিনোদনের কথাতো বলাই বাহুল্য। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। সারা বিশ্বের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান আজ ঘরে বসে উপভোগ করা যাচ্ছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের বিনোদনের সব চাহিদাকে পূরণ করে যাচ্ছে।

খ. **ডেটা কোডিং :** কোডিং (Coding) হলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কোনো জিনিসকে সংক্ষেপে সংখ্যা বা অক্ষর বা চিহ্ন দ্বারা ইউনিক (Unique) সংকেত বা কোডের সাহায্যে বোঝানো। ইউনিক মানে কোনো কোডই একাধিক জিনিস বোঝাবে না। ডেটা কোডিংয়ের সাহায্যে দুরূহ ও জটিল ডেটাকে সহজে ও সংক্ষিপ্তাকারে কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়। কোডিং কাজের দক্ষতা ও নির্ভুলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ডেটা প্রসেসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সর্টিং বা সাজানোর কাজে সাহায্য করে।

ডেটা কোডিং-এর উদ্দেশ্য ও নীতিমালা : ডেটা কোডিংয়ের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

১. ডেটার গতিবিধি লক্ষ্য করা;
২. ইনফরমেশনের শ্রেণীবিভাগ করা;
৩. ইনফরমেশনকে গোপন রাখা;
৪. গোপন ইনফরমেশনকে প্রকাশ করা এবং
৫. প্রয়োজনীয় কাজের উদ্যোগ গ্রহণে সাহায্য করা।

ডেটা কোডিংয়ের নীতিমালা

১. কোড যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত;
২. কোড স্থায়ী (Stable) হওয়া উচিত;
৩. কোড ইউনিক (Unique) হওয়া উচিত;
৪. কোড এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে সাজানো যায়;
৫. কোড বিভ্রান্তিকর হওয়া উচিত নয়;
৬. কোড ইউনিফর্ম (Uniform) হওয়া দরকার;
৭. কোড পরিবর্তনযোগ্য হওয়া উচিত এবং
৮. কোড অর্থবোধক হওয়া উচিত।

৪. ক. **গাণিতিকভাবে ওহমের সূত্রের ব্যাখ্যা :** কোনো পরিবাহীর দু প্রান্তের মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে তার মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চলে। এ প্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্য, পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এবং পরিবাহীর তাপমাত্রার ওপর। একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর তাপমাত্রা স্থির থাকলে তার মধ্য দিয়ে যে প্রবাহ চলে তা শুধু এর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে। এ সম্পর্কে জর্জ সাইমন ওহ্‌ম (১৭৮৬-১৮৫৪) একটি সূত্র প্রণয়ন করেন, যা ওহমের সূত্র নামে পরিচিত।

সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা পরিবাহীর দু প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরা যাক, AB একটি পরিবাহক, এর দু প্রান্তের বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B (চিত্র)।
যদি $V_A > V_B$ হয়, তাহলে পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তর হবে,
$V = V_A - V_B$ এবং A থেকে B বিন্দুর দিকে তড়িৎ প্রবাহ চলবে।
এখন স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হলে,
ওহমের সূত্রানুসারে, $I \propto V$
বা, $I = GV$
এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, একে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা বলে। G-এর বিপরীত রাশি $R = \frac{1}{G}$। উপরিউক্ত সমীকরণে বসালে আমরা পাই, $I = \frac{1}{R}.V$.............(i)
এখানে R একটি ধ্রুব সংখ্যা। একে পরিবাহকের রোধ বলে। (i) নং সমীকরণ থেকে ওহমের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়। তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা ঐ পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তরের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

খ. **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা :** কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে কৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো পরিবাহক বা তড়িৎ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এক সেকেন্ড ধরে তড়িৎ প্রবাহের ফলে যে কাজ সম্পন্ন হয় বা যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি অন্য শক্তিতে (আলো, তাপ, যান্ত্রিকশক্তি ইত্যাদি) রূপান্তরিত হয়, তাকে তাড়িৎ ক্ষমতা বা বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বলে।

গাণিতিক প্রকাশ : আমরা জানি, তড়িৎ প্রবাহ হচ্ছে আধানের প্রবাহ। ধরা যাক, AB পরিবাহকের মধ্য দিয়ে t সময়ে Q পরিমাণ আধান প্রবাহিত হচ্ছে। A ও B বিন্দুদ্বয়ের বিভবান্তর $V_a - V_b = V$-এর আধান স্থানান্তরের জন্য কৃতকাজ W হবে—

$W = VQ$ এবং ক্ষমতা, $P = \frac{W}{t}$

বা, $P = \frac{VQ}{t}$

বা, $P = \frac{V.It}{t}$ [$\because$ তড়িৎ প্রবাহ, $I = \frac{Q}{t}$]

বা, $P = VI$ ....(i)

পরিবাহকের রোধ R হলে, ওহমের সূত্র থেকে পাই, $V = IR$.

সুতরাং (i) নং-এ V-এর মান বসিয়ে পাই, $P = I^2R$ ....(ii)

আবার, $V = IR$ হলে, $I = \frac{V}{R}$

সুতরাং (ii) নং সমীকরণে I-এর মান বসিয়ে পাই, $P = \frac{V^2}{R}$ .... (iii)

অতএব, (i), (ii) এবং (iii) নং সমীকরণ অনুযায়ী, তাড়িত ক্ষমতার গাণিতিক প্রকাশ হলো,

$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$.

৫. ক. **মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স :** ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি যতই উন্নত হচ্ছে ততই বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র মাপে ছোট হচ্ছে। যেমন প্রথম ইলেকট্রনিক্স কম্পিউটারের মাপ ছিল প্রায় ৩০ মিটার লম্বা, ৩

মিটার উঁচু এবং ১ মিটার পুরু। আর এখন কম্পিউটার শুধু টেবিলের ওপরেই বসানো থাকে না ল্যাপটপ কম্পিউটারকে নিজের কোলে বসানো যায়। এর কারণ, অর্ধ পরিবাহী দিয়ে তৈরি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস, যেমন— ট্রানজিস্টর, ডায়োড ইত্যাদি ক্রমেই মাপে ছোট হচ্ছে। মাপে ছোট করার এই প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান চর্চার এই শাখাকে মাইক্রো ইলেকট্রনিক্স বলে।

উদাহরণ হিসেবে একটি মাইক্রো ট্রানজিস্টরের কথা বলা যেতে পারে। আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি এই ট্রানজিস্টরের মাপ ০.৮ মি. মি. বাই ০.৮ মি. মি.। আর তার বেধ ৪ মিলিমিটারের প্রায় এক কোটি ভাগের এক ভাগ। এ রকম ৫০ ট্রানজিস্টরকে যদি একটির ওপরে আরেকটি রাখা যায় তাহলে হয়তো খবরের কাগজের একটা পাতার মতো পুরু হবে।

খ. **অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তন প্রক্রিয়া :** অ্যানালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিবর্তনে কোয়ান্টাইজিং প্রক্রিয়া জড়িত। কোয়ান্টাইকরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অ্যানালগ সংকেতের ব্যপ্তিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা এবং মূল সংকেত কোন স্তরে পড়ে তা খুঁজে বের করা। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ সংকেতকে কতভাগে ভাগ করা হবে তা ফোরিয়ার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বের করতে হবে। এর পরবর্তী প্রক্রিয়া হচ্ছে অ্যাবকেডিং যা কোয়ান্টাইজকৃত স্তরকে ডিজিটাল মান প্রদান করে। এই প্রক্রিয়ায় প্রত্যেকটি কোয়ান্টাইজকৃত স্তরের জন্য নির্দিষ্ট ডিজিটাল কোড দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে পরিচিত সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে বাইনারি পদ্ধতি। এছাড়াও অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতিতেও করা হয়, যেমন– হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি।

গ. **ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট-এর কার্যনীতি :** কোনো রাশিকে এনালগ থেকে ডিজিটালে রূপান্তরের জন্য পাঁচটি বেসিক ব্লক দ্বারা ডিজিটাল ইনস্ট্রুমেন্ট গঠিত হয়। ব্লকগুলো হলো :

১. ইন্টিগ্রেটর লেভেল

২. কমপারেটর

৩. বেসিক ব্লক

৪. ডেসিমেল কাউন্টার সেট

৫. লজিক সার্কিট ব্লক

যে রাশিটি পরিমাপ করতে হবে তা গ্রহণ প্রান্তে প্রয়োগ করা হয়। ইন্টিগ্রেটর, R ও C-এর মানের ওপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজ কম্পারেটরে সাপ্লাই দেয়া হয়। কম্পারেটরের প্রয়োগকৃত ভোল্টেজ এবং অসিলেটর থেকে উৎপন্ন Saw tooth ভোল্টেজ তুলনা করে কম্পারেটর আউটপুট গেটকে পরিচালনা করে। Saw tooth ভোল্টেজ বৃদ্ধির সাথে সাথেই গেট সার্কিট Open হয় এবং High frequency-এর ব্লক প্লাস কাউন্টারে যায়, যা যতক্ষণ পর্যন্ত গেট বন্ধ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কাউন্টার গণনা করে। গেটে ভোল্টেজ বেশি দিলে অনেকক্ষণ গেট খোলা থাকবে কাউন্টার বেশি গণনা করবে, আর ভোল্টেজ কম দিলে গেট অল্প সময়ের জন্য খোলা থাকবে কাউন্টার কম সময় পাবে গণনার জন্য। গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ডিজিটাল ডিসপ্লেতে ইনপুট ভোল্টেজের মান দেখা যায়।

মডেল প্রশ্ন ০২ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ০২

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

১. ক. তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কাকে বলে? সবচেয়ে ছোট ও সবচেয়ে বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কি? ফোটন কি? ৪

খ. অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ও ইমিউনিটি কি? টিকা কি? টিকা দেয়া হয় কেন? ৪

গ. সাধারণ মাপের ঘরে কথা বললে আমরা প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না কেন? আকাশে বিদ্যুৎ ঝলক দেখার কিছু পরে মেঘের গর্জনের শব্দ শোনা যায় কেন? ৪

ঘ. বৈদ্যুতিক চুল্লিতে তামার তার ব্যবহার করা হয় না কেন? ভেজা অবস্থায় বা ভেজা কাপড় দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারের সংস্পর্শে দুর্ঘটনা ঘটে কেন? ৪

ঙ. জ্বর আক্রান্ত রোগীর কপালে অ্যালকোহল মিশানো পানি বা স্পিরিট সিক্ত কাপড় লাগিয়ে দেয়া হয় কেন? ৪

২. ক. মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম বা রাতে তীব্র শীত অনুভূত হয় কেন? ২

খ. তারের মধ্য দিয়ে কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়? ২

গ. ক্লোরোপ্লাস্ট কি? এর তিনটি কাজ উল্লেখ করুন। ২

ঘ. চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কেন? ২

ঙ. কোষ কি? কোষ কত প্রকার ও কি কি? কোষের শক্তিঘর বা 'পাওয়ার হাউস' বলতে কি বোঝেন? ২

৩. ক আবহাওয়া ও জলবায়ু কাকে বলে? এর উপাদান কয়টি ও কি কি? $২\frac{১}{২}$

খ. সবুজ শাক সবজি কিছু তেল দিয়ে রান্না করতে হয় কেন? $২\frac{১}{২}$

গ. শীতকালে ঠোঁট ফাটে কেন? $২\frac{১}{২}$

ঘ. রাতে বিড়ালের চোখ জ্বল জ্বল করে কেন? $২\frac{১}{২}$

৪. ক. বেকিং পাউডার কি? এটি কি কাজে ব্যবহৃত হয়? ২

খ. গ্রাফাইট নরম, পিচ্ছিল ও বিদ্যুৎ পরিবাহী কেন? ২

গ. ধাতু, উপধাতু ও অধাতু কাকে বলে? ২

ঘ. সাধারণ পানি ও ভারী পানির পার্থক্য লিখুন। ২

ঙ. বিলিরুবিন (Bilirubin) কি? ২

৫. ক. নাইট্রোজেন চক্র কি? সংক্ষেপে লিখুন। $২\frac{১}{২}$

খ. পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক কেন? $২\frac{১}{২}$

গ. বনসাই (Bonsai) কি? $২\frac{১}{২}$

ঘ. রক্তের শ্রেণীবিন্যাস কি? মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন। $২\frac{১}{২}$

৬. ক. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মধ্যে পার্থক্য লিখুন। $2\frac{1}{2}$

খ. শব্দ দূষণ কি? এর ফলে কি ক্ষতি হয়? $2\frac{1}{2}$

গ. একটি বাতির গায়ে 220V–25W লেখা আছে- কথাটির অর্থ কি? $2\frac{1}{2}$

ঘ. মোটরগাড়ির ইঞ্জিনে ব্যবহৃত কোষে বিশুদ্ধ পানি দিতে হয় কেন? $2\frac{1}{2}$

উত্তর : মডেল টেস্ট-০২

১. ক. **তরঙ্গ দৈর্ঘ্য :** তরঙ্গ সঞ্চারণকারী কোনো কণার একটি পূর্ণ স্পন্দন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে, সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বলে। অথবা, পরপর দুটি তরঙ্গ শীর্ষ বা তরঙ্গ পাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। একে λ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তরঙ্গাস্থিত মাধ্যমের কোনো কণা স্পন্দনের সময়ে S দূরত্ব অতিক্রম করলে $\lambda = \frac{S}{N}$

সবচেয়ে ছোট ও বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্য : সবচেয়ে ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ গামা রশ্মি এবং সবচেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ হলো বেতার তরঙ্গ।

ফোটন : কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুসারে আলোকরশ্মি কোনো উৎস থেকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিগুচ্ছ বা প্যাকেট আকারে বের হয় এবং শূন্য মাধ্যম দিয়ে যাওয়ার সময় এ কণার আকার বজায় থাকে। প্রত্যেক রঙের আলোর জন্য এ শক্তি প্যাকেটের শক্তির একটা সর্বনিম্ন মান আছে। এ সর্বনিম্ন মানের শক্তিসম্পন্ন কণিকাকে ফোটন বলে।

খ. **অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ও ইমিউনিটি :** অ্যান্টিবডি রক্তে উৎপন্ন প্রতিরোধক পদার্থবিশেষ। দেহে যখন কোনো রোগজীবাণু, ভাইরাস প্রভৃতি প্রবেশ করে, তখন তাদের প্রতিহত করার জন্য লিম্ফোসাইট শ্বেত কণিকা থেকে এক প্রকার প্রোটিনজাতীয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। একে অ্যান্টিবডি বলে। অ্যান্টিবডি যেসব প্রোটিন কণাকে ধ্বংস করে বা যে প্রোটিনের প্রবেশের ফলে দেহে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাদের অ্যান্টিজেন বলে। অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে দেহে প্রবিষ্ট রোগজীবাণু বা অ্যান্টিজেনকে প্রতিহত করার ক্ষমতাকে ইমিউনিটি বা অনাক্রমতা বলে।

টিকা কি এবং টিকা দেয়া হয় কেন : টিকা প্রকৃতপক্ষে বিশেষ ধরনের রোগ প্রতিরোধকারী জীবাণু। এগুলো কোনো প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পরিমাণে ঢুকিয়ে দিলে তা দেহের মধ্যে বিশিষ্ট রোগের প্রতিরোধকারী প্রোটিন (এন্টিবডি) সৃষ্টি করে, যা ঐ রোগের আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করে। সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন রোগের টিকা তৈরি করা হয়। হাম, পোলিও, যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের জন্য টিকা দেয়া অত্যন্ত জরুরি।

গ. **সাধারণ মাপের ঘরে কথা বললে প্রতিধ্বনি শুনতে না পাওয়ার কারণ :** কোনো শব্দ শোনার প্রায় ১/১০ সেকেন্ড সময় পর্যন্ত শ্রোতার মস্তিষ্কে তার অনুভূতি থেকে যায়। তাই সৃষ্ট প্রতিধ্বনি শোনার জন্য প্রতিফলকের দূরত্ব এমন হতে হয় যেন ঐ শব্দের অনুভূতি কানে শেষ হওয়ার পর প্রতিফলিত শব্দ কানে পৌঁছায়। সাধারণ মাপের ঘরের যে কোনো দুটি দেয়ালের মাঝের দূরত্ব ৩৩.২ মিটারের কম থাকে। একমাত্রিক শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে হলে শব্দের প্রতিফলককে শব্দের উৎস হতে কমপক্ষে ৩৩.২ মিটার দূরে থাকতে হবে। সাধারণ মাপের ঘরে কথা বললে ঐ শব্দের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে থেকে যায়। এ সময়ের মধ্যে প্রতিফলিত শব্দ কানে এসে পৌঁছে মূল শব্দের সাথে মিশে যায়। এর ফলে প্রতিধ্বনিকে পৃথকভাবে শোনা যায় না। তাই সাধারণ মাপের ঘরের মধ্যে কথা বললে প্রতিধ্বনি শোনা যায় না।

আকাশে বিদ্যুৎ ঝলক দেখার পরে মেঘের গর্জনের শব্দ শোনা যাওয়ার কারণ : মেঘে মেঘে সংঘর্ষের ফলে আকাশে বিদ্যুতের ঝলক এবং শব্দ একই সাথে উৎপন্ন হয়। বিদ্যুৎ ঝলকের গতিবেগ আলোর গতির সমান এবং সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার। অপরদিকে, শব্দের বেগ অনেক কম এবং 0°C তাপমাত্রায় প্রতি সেকেন্ডে 332 মিটার। উভয়ের গতিবেগের এ বিশাল ব্যবধানের কারণে বিদ্যুৎ ঝলকের তুলনায় শব্দ আমাদের নিকট পৌঁছাতে বেশি সময় লাগে। এজন্য বিদ্যুৎ ঝলক দেখার কিছু পরে মেঘের গর্জনের শব্দ শোনা যায়।

ঘ. **বৈদ্যুতিক চুল্লিতে তামার তার ব্যবহার না হওয়ার কারণ :** তামার তারের গলনাঙ্ক 1000°C। ফলে বৈদ্যুতিক চুল্লির অতিরিক্ত উত্তাপে তার গলে যেতে পারে। এছাড়া তামার তার বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কালো পাউডার তৈরি করে। এজন্য বৈদ্যুতিক চুল্লিতে তামার তার ব্যবহৃত হয় না।

ভেজা অবস্থায় বা ভেজা কাপড় দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারের সংস্পর্শে দুর্ঘটনা ঘটার কারণ : শুষ্ক অবস্থায় মানুষের দেহের রোধ বেশি এবং ভেজা অবস্থায় মানুষের দেহের রোধ কম। মানুষের শুকনো হাত বা দেহ একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তু ভেজা অবস্থায় দেহের রোধ কমে যায় বলে এ নির্দিষ্ট সীমা অনেক কমে আসে। ফলে ভেজা হাতে জীবন্ত তার বা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলছে এমনকিছু ধরলে দুর্ঘটনা ঘটে।

আবার, শুকনো কাপড় বিদ্যুৎ অপরিবাহী হলেও ভেজা কাপড় বিদ্যুৎ পরিবাহী। কাজেই এর সাথে সংযুক্ত বিদ্যুৎবাহী তারেও বিদ্যুৎ পরিবাহিত হয়ে থাকে। সুতরাং ভেজা কাপড় দ্বারা বিদ্যুৎ প্রবাহিত তারের সংস্পর্শ ঘটলে বিদ্যুৎ মানবদেহে প্রবাহিত রক্তরসকে জমাট বাঁধিয়ে ফেলে। এতে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয় এবং স্পর্শকারীর মৃত্যু ঘটে।

ঙ. **জ্বর আক্রান্ত রোগীর কপালে অ্যালকোহল মিশানো পানি বা স্পিরিট সিক্ত কাপড় লাগিয়ে দেয়ার কারণ :** শরীরের উষ্ণতা দ্রুত কমানোর জন্য শুধু পানির পরিবর্তে অ্যালকোহল মেশানো পানি বা স্পিরিট সিক্ত কাপড় লাগিয়ে দেয়া হয়। পানি বাষ্পীভূত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুপ্ততাপ রোগীর দেহ থেকে গ্রহণ করে বলে রোগীর শরীরের তাপ কমে যায়। অ্যালকোহল বা স্পিরিট পানির চেয়ে দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং রোগীর শরীরের তাপ দ্রুত কমাতে পারে। তরলের বাষ্পীভবনের হার বাড়ানোর জন্য পানির সাথে অ্যালকোহল মেশানো হয়।

২. ক. **মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম বা রাতে তীব্র শীত অনুভূত হওয়ার কারণ :** দিনের বেলা সূর্য তাপ বিকিরণ করে। আর পৃথিবী সে তাপ শোষণ করায় ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। ভূপৃষ্ঠ যতবেশি উত্তপ্ত হবে ততবেশি গরম অনুভূত হবে। আর ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে যতবেশি শীতল হবে ততবেশি শীত অনুভূত হবে। মরু অঞ্চলের বায়ু শুষ্ক থাকে। এই শুষ্ক বায়ু বিকিরণের জন্য স্বচ্ছ পদার্থ হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ শুষ্ক বায়ুর মধ্য দিয়ে তাপ সহজে বিকিরিত হতে পারে। মরু অঞ্চলে দিনের বেলা তাই শুষ্ক বায়ুর মধ্য দিয়ে সূর্য থেকে বিকীর্ণ তাপ সহজেই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। তাই মরু অঞ্চলে দিনে তীব্র গরম অনুভূত হয়। আবার রাতের বেলায় ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণ করে। মরু অঞ্চলের শুষ্ক বায়ুর ভেতর দিয়ে এ বিকীর্ণ তাপ সহজেই বায়ুমণ্ডল ভেদ করে চলে যায় এবং ভূপৃষ্ঠ খুব শীতল হয়। এজন্য রাতের বেলা তীব্র শীত অনুভূত হয়।

খ. তারের মধ্য দিয়ে যেভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় : যেসব বস্তুর মধ্য দিয়ে সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাকে কন্ডাক্টর (Conductor) বা পরিবাহী বলে। যেমন— তামা, লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা ইত্যাদি বিদ্যুৎ পরিবাহী। এ সব ধাতুতে প্রচুর পরিমাণে মুক্ত ইলেকট্রন থাকে। যেসব ধাতুতে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যতো বেশি হয়, সেসব ধাতুতে বিদ্যুৎ পরিবহন ততো দ্রুত হয়। যখন কোনো বিদ্যুৎ বর্তনী চালু করা হয় তখন ঋণাত্মক আবেশিত মুক্ত ইলেকট্রন ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধণাত্মক প্রান্তের দিকে ধাবিত হয়। এ ইলেকট্রনের প্রবাহকেই বিদ্যুৎপ্রবাহ বলা হয়। ধাতব তারের মধ্যে অধিক ইলেকট্রনের উপস্থিতি বিদ্যুৎ সহজে এবং দ্রত পরিবহনে সাহায্য করে। তামার তারে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি বলে তামার তারে বিদ্যুৎ সহজেই প্রবাহিত হয়। তাই বৈদ্যুতিক তার হিসেবে তামার তার খুব বেশি ব্যবহার করা হয়।

গ. ক্লোরোপ্লাস্ট : সবুজ রঞ্জকযুক্ত প্লাস্টিডকে ক্লোরোপ্লাস্ট বলে। উদ্ভিদের সবুজ অংশে অর্থাৎ পাতা ও কচি কাণ্ডে এদের দেখা যায়। একই উদ্ভিদের কোষে এর সংখ্যা প্রায় নির্দিষ্ট।

কাজ :

i. সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য তৈরি করে।
ii. এটি সালোকসংশ্লেষণের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক শক্তি সরবরাহ করে।
iii. এটি ফ্যাটি এসিড ও প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়।

ঘ. চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণ : চলন্ত বাস হঠাৎ ব্রেক করলে গতিজড়তার কারণে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। চলন্ত অবস্থায় বাসের সাথে যাত্রীও একই গতিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাস হঠাৎ থেমে গেলে বাসের সাথে সাথে যাত্রীর শরীরের নিচের অংশ স্থির হয় কিন্তু শরীরের ওপরের অংশ গতিজড়তার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ঠিক একই কারণে চলন্ত বাস থেকে হঠাৎ নামার সময় যাত্রী সামনের দিকে পড়ে যেতে চান।

ঙ. কোষ : অর্ধভেদ্য পর্দাবেষ্টিত প্রোটোপ্লাজমের যে ক্ষুদ্র অংশ উপযুক্ত পরিবেশে নিজস্ব উপাদানগুলো নিজেই তৈরি করে নিতে পারে তাকে 'কোষ' বলে। কোষই জীবের গঠন ও কাজের একক। পূর্বসৃষ্ট কোষ হতে নতুন কোষের সৃষ্টি হয়। রবার্ট হুক 'সেল' বা 'কোষ' কথাটির আবিষ্কারক।

কোষের প্রকারভেদ :

i. শারীরবৃত্তীয় কাজের ভিত্তিতে :
১. দেহকোষ বা প্রাককেন্দ্রিক কোষ *(Somatic Cell)* ও
২. জননকোষ বা সুকেন্দ্রিক কোষ *(Reproductive Cell)*।

ii. নিউক্লিয়াসের গঠন অনুসারে :
১. আদি কোষ *(Prokaryotic Cell)* ও
২. প্রকৃত কোষ*(Eukaryotic Cell)*।

iii. জীব জগতের শ্রেণীবিভাগের ওপর ভিত্তি করে :
১. উদ্ভিদকোষ *(Plant Cell)* ও
২. প্রাণিকোষ *(Animal Cell)*।

কোষের শক্তিঘর বা 'পাওয়ার হাউস' : মাইটোকন্ড্রিয়াতে ক্রেবস চক্র, ফ্যাটি অ্যাসিড চক্র, ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট প্রক্রিয়া প্রভৃতি ঘটে থাকে। শক্তি উৎপাদনের সব প্রক্রিয়া এর অভ্যন্তরে ঘটে থাকে বলে মাইটোকন্ড্রিয়াকে কোষের শক্তিঘর বা 'পাওয়ার হাউস' বলা হয়।

৩. **ক. আবহাওয়া ও জলবায়ু :** প্রতিদিনের গড় তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাতের তথ্যের ভিত্তিতে কোনো এলাকায় যে অবস্থা প্রকাশ করে তাকেই আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ হতে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান : আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ৫টি। যথা : (১) বায়ুর তাপ, (২) বায়ুর চাপ, (৩) বায়ুপ্রবাহ, (৪) বায়ুর আর্দ্রতা ও (৫) বারিপাত।

খ. সবুজ শাক সবজি তেল দিয়ে রান্না করার কারণ : কতগুলো ভিটামিন পানিতে দ্রবণীয় যেমন-ভিটামিন বি, সি, আর কতগুলো চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে। এদের মধ্যে ভিটামিন 'এ' খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়ে থাকে। আবার সবুজ শাক সবজি হচ্ছে ভিটামিন 'এ'-এর প্রধান উৎস। শাক সবজি যদি কিছু পরিমাণ তেল দিয়ে রান্না করা হয় তাহলে ভিটামিন 'এ'সহ অন্যান্য চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো সহজেই তেলে দ্রবীভূত হয়ে যায়। ফলে এদের অপচয় হয় না। কিন্তু তেল ছাড়া রান্না করলে ভিটামিন 'এ'-সহ তেলে দ্রবণীয় অন্যান্য ভিটামিন তাপের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাই সবুজ শাক সবজি তেল দিয়ে রান্না করলে দেহ সহজেই ভিটামিন 'এ' সহ অন্যান্য চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো পেতে পারে—এতে দেহে রাতকানাসহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়।

গ. শীতকালে ঠোঁট ফাটার কারণ : আমাদের শরীরের চামড়ায় সেবেসিয়াস নামে এক প্রকার গ্রন্থি আছে। এই গ্রন্থি থেকে সর্বক্ষণ তেল জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে। এই তৈলাক্ত পদার্থটি শরীরের ঘামের সাথে মিশে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ফলে গায়ের চামড়া নরম থাকে।

শীতকালে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকে। শরীরে ঘামও হয় না। তাই সেবেসিয়াস গ্রন্থি থেকে যে তৈলাক্ত পদার্থটি বের হয়ে আসে তা শরীরের সর্বত্র ছড়াতে পারে না। এই জন্য শীতকালে শরীরটা বেশ খসখসে মনে হয়। এই খসখসে অবস্থা দূর করার জন্য অনেকে শীতকালে শরীরে তেল বা অলিভ অয়েল ব্যবহার করে। অর্থাৎ শরীরে কৃত্রিমভাবে তৈলাক্ত পদার্থ সরবরাহ করা হয়।

শীতকালে অনেকের শরীরের চামড়া ফেটে যায়। তবে শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় ঠোঁট বেশি ফাটে। এর কারণ হলো শরীরের অন্যান্য চামড়ার তুলনায় ঠোঁটের চামড়া অপেক্ষাকৃত বেশি পাতলা। আর যেহেতু ঠোঁট রয়েছে নাকের খুব কাছাকাছি, তাই ঠোঁটের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব বেশি পড়ে। প্রতিবার নিঃশ্বাস ছাড়ার সময়েই একটা গরম বাতাসের ঝাপটা বয়ে যায় ঠোঁটের উপর দিয়ে। তাই ঐ পাতলা চামড়ার জায়গাটি আরো বেশি শুকনো হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই শরীরের অন্যান্য অংশের তুলনায় শীতকালে ঠোঁট বেশি ফাটে।

ঘ. রাতে বিড়ালের চোখ জ্বল জ্বল করার কারণ : দিনের বেলায় একটা বিড়ালকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সে তার চোখকে কুঁচকে ছোট করে নিয়েছে। একই সাথে সে চোখের তারারন্ধ্র ছোট করে ফেলে যাতে চোখের ভেতরে বেশি আলো ঢুকতে না পারে। বেড়ালের অক্ষিপটে দুই রকমের কোষ থাকে। 'কোন্' কোষ আর 'রড' কোষ। এর মধ্যে 'কোন্' কোষের চেয়ে 'রড' কোষের সংখ্যাই বেশি থাকে। 'কোন্' কোষ বেশি আলোতে, আর 'রড' কোষ কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে।

অক্ষিপট 'রড' ও 'কোন' কোষ দিয়ে তৈরি চোখের ভেতরকার একটা পর্দা। বাইরে থেকে তারারন্ধ্র দিয়ে আলো ঢুকে অক্ষিপটে বাইরের বস্তুর ছবি তুলে ধরে। বিড়ালের চোখে অক্ষিপটের পিছনেই একটা স্তর থাকে। এ স্তরটিকে ট্যাপেটাম লুসিডাম বলে। এক ধরনের কেলাস দিয়ে এ স্তর তৈরি। কেলাসে আলো পড়লে তা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তেমনিভাবেই বাইরের আলো এ কেলাস স্তরে পড়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায় এবং আলো নানা দিকে প্রতিফলিত হয়।

বিড়ালের চোখের অক্ষিপটে 'রড' কোষের সংখ্যা বেশি থাকার জন্য বিড়াল অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পায়। রাতের অন্ধকারে বিড়াল চোখের তারারন্ধ্রকে পুরোটা খুলে রাখে যাতে বাইরের সব আলোই চোখের ভেতর ঢুকতে পারে। এ আলো ট্যাপেটাম লুসিডাম স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। আলোক রশ্মি ট্যাপেটাম লুসিডাম থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ভেতরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোক রশ্মি চোখের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য চোখের ভেতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে আর অক্ষিপটেও বাইরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি গঠিত হয়।

প্রতিফলিত আলোয় চোখের ভেতরটা উজ্জ্বল হওয়ার জন্যই অন্ধকারে বাইরে থেকে দেখলে বিড়ালের চোখের ভেতরটা জ্বলছে বলে মনে হয়।

৪. ক. **বেকিং পাউডার :** সোডিয়াম বাইকার্বনেট, পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারট্রেট ও শস্য স্টার্চের মিশ্রণকে বেকিং পাউডার বলে।

ব্যবহার : পাউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রস্তুতিতে বেকিং পাউডার ব্যবহৃত হয়। পাউরুটি, কেক ইত্যাদি প্রস্তুতির সময় এদের সাথে বেকিং পাউডার মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয় এবং সাথে সাথে পাউরুটি, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি ফুলে উঠে।

খ. **গ্রাফাইট নরম, পিচ্ছিল ও বিদ্যুৎ পরিবাহী :** গ্রাফাইটে কার্বন পরমাণুসমূহ সমতলীয় স্তরাকারে অবস্থিত। প্রতিটি কার্বন পরমাণু অপর তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টি করে। আবার ছয়টি কার্বন পরমাণু একটি সুষম ষড়ভুজের সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রতি স্তরে একটি ষড়ভুজি জালের সৃষ্টি হয়। কার্বন পরমাণুসমূহ এ জালের প্রতিটি কোণে অবস্থিত। এ ধরনের অসংখ্য শিট বা স্তর পরস্পরের সমান্তরালভাবে অবস্থিত স্তরসমূহের মধ্যে কোনো রাসায়নিক বন্ধন না থাকায় এরা একে অন্যের ওপর দিয়ে চলাচল করতে পারে। এ কারণে গ্রাফাইট নরম ও পিচ্ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে প্রতিটি পরমাণুর চারটি যোজ্যতা ইলেকট্রনের মধ্যে তিনটি ইলেকট্রন তিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে বন্ধন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। অপর ইলেকট্রনটি মোটামুটিভাবে মুক্ত থাকে। এ মুক্ত ইলেকট্রনগুলো গ্রাফাইটের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করে।

গ. **ধাতু :** যেসব মৌলিক পদার্থ চকচকে, বিদ্যুৎ ও তাপ সুপরিবাহী সেসব মৌলিক পদার্থকে ধাতু বলে। যৌগিক পদার্থে এরা সাধারণত তড়িৎ ধনাত্মক আয়ন হিসেবে উপস্থিত থাকে। যেমন— কপার, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার, গোল্ড প্রভৃতি।

উপধাতু : যেসব মৌল কখনো ধাতু আবার কখনো অধাতুর মতো আচরণ করে সেগুলোকে উপধাতু বলে। এদের সংখ্যা খুব কম। যেমন– বোরন, সিলিকন, জার্মেনিয়াম, আর্সেনিক ইত্যাদি।

অধাতু : যেসব মৌল প্রধানত তাপ ও বিদ্যুৎ অপরিবাহী তাদের অধাতু বলে। যৌগে এরা তড়িৎ ঋণাত্মক আয়ন হিসেবে থাকে। যেমন– নাইট্রোজেন, কার্বন, ক্লোরিন প্রভৃতি।

ঘ. **সাধারণ পানি ও ভারী পানির পার্থক্য :** দু পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো সাধারণ পানি। আর দুই পরমাণু ভারী হাইড্রোজেন বা ডিউটেরিয়াম (D_2) এবং এক পরমাণু অক্সিজেনের সমন্বয়ে গঠিত পানি হলো ভারী পানি (D_2O)। সাধারণ পানির ঘনত্বের (1.008) চেয়ে ভারী পানির ঘনত্ব (1.106) বেশি। ভারী পানি পারমাণবিক চুল্লিতে মডারেটর হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ঙ. **বিলিরুবিন (Bilirubin) :** বিলিরুবিন হচ্ছে পিত্তরসের কমলা রঙের প্রধান রঞ্জক পদার্থ। হিমোগ্লোবিনের প্রধান দুটি উপাদান প্রোটিন অংশ গ্লোবিন ও লৌহযুক্ত অংশ হিম (heme)। হিম ভেঙে শেষ পর্যন্ত বিলিরুবিনে পরিণত হয়। এছাড়া অন্যান্য ক্রোমোপ্রোটিন থেকে বিলিরুবিন তৈরি হয়। লোহিত রক্ত কোষের জীবনকাল গড়পড়তা ১২০ দিন। এরপর যকৃৎ, প্লীহা ও অস্থিমজ্জার রেটিকুলো-এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেমে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে হিমোগ্লোবিন বেরিয়ে আসে। হিমোগ্লোবিন থেকে গ্লোবিন অংশ বেরিয়ে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর হিম জারিত হয়ে টেট্রাপাইরল চক্র উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর থেকে লোহার অণু সরে গেলে সবুজ রঙের বিলিভারডিন উৎপন্ন হয়। বিলিভারডিন বিজারিত হয়ে বিলিরুবিন উৎপন্ন হয়।

৫. ক. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বিদ্যমান। বজ্রবৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড, পরবর্তীতে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড এবং শেষে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড গঠিত হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পড়ে এবং মাটির ক্ষারকীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে মাটিতে মিশে যায়। উদ্ভিদ মূল দ্বারা মাটি থেকে নাইট্রেট লবণ ও নাইট্রোজেন সার শোষণ করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে পরিণত করে। প্রাণিকুল উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করে। এরূপে উদ্ভিদ থেকে প্রাণিদেহে প্রোটিনরূপে নাইট্রোজেন স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ ডিনাইট্রিফাইং জীবাণুর প্রভাবে বিয়োজিত হয়ে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এবং অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেন চক্র না থাকলে মাটিতে নাইট্রেট লবণের অভাব হতো। নাইট্রেট লবণের অভাব হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে কৃষির উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন হতো। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্রের উপকারিতা অনস্বীকার্য।

খ. **পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক :** ভারকেন্দ্র থেকে মুক্তভাবে ঝুলন্ত একটি চুম্বকদণ্ড সর্বদা ভূ-গোলক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর অবস্থান করে। চুম্বকটিকে এ অবস্থা থেকে সরিয়ে দিলেও তা কয়েকবার দোল খেয়ে পুনরায় উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির হয়। যেহেতু ঝুলন্ত চুম্বকের কাছে অন্য কোনো চুম্বক নেই সুতরাং পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক।

গ. **বনসাই (Bonsai) :** একটি ছোট মাটির পাত্রে বা টবে কোনো এক বৃক্ষ প্রজাতিকে খাটো বামনাকৃতি করে বহু বর্ষ ধরে জন্মানোর পদ্ধতি বনসাই নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিকভাবে

যদিও বনসাই উদ্যানতত্ত্বের একটি দুর্বোধ্য শাখা, কিন্তু এটি প্রাচ্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে শতাব্দী ধরে জড়িত। পশ্চিমা বিশ্বের সংস্কৃতিতে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে। বনসাই শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পাত্রের মধ্যে কোনো গাছ' এবং এর উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় চীনের চৌ-এর (Chou) রাজত্বকালে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে যখন চীনা সম্রাটগণ তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সব প্রদেশ থেকে নিয়ে আসা মাটি, পাথর ও ছোট ছোট করে ছেঁটে আনা গাছপালা দিয়ে ক্ষুদে মডেল বাগানগুলো সাজাতেন।

বনসাই-এর প্রযুক্তি উদ্যানতত্ত্বের শারীরবৃত্তিক ও ইকোলজি বিষয়ের নানা অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শুধু আকৃতি সুরক্ষাই নয়, শাখা-প্রশাখার প্যাটার্নের ব্যাপারেও উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন। এ কাজ করা হয় বাছাইকৃত (Selective) ছাঁটাই (Pruning) দ্বারা এবং শীর্ষস্থ কুঁড়িগুলোকে চিমটি কেটে তুলে ফেলা, যাতে পার্শ্বসহ কুঁড়িগুলো মুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, অর্থাৎ শীর্ষকুঁড়ির আধিপত্য নষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। শিকড়কেও কোনো কোনো প্রজাতিতে দুই বা তিন মাস অন্তর ছাঁটাই করা জরুরি। যার ফলে পার্শ্বীয় নতুন নতুন শিকড় বৃদ্ধি পেতে পারে যাদের মাটি থেকে পানি ও খনিজ পদার্থ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রচুর।

ঘ. **রক্তের শ্রেণীবিন্যাস :** রক্ত কণিকায় কতগুলো অ্যান্টিজেন-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মানুষের রক্তের যে শ্রেণীবিভাগ করেন তা ABO রক্ত গ্রুপ বা সংক্ষেপে রক্ত গ্রুপ নামে পরিচিত। অনেক সময় একে ল্যান্ডস্টেইনারের রক্ত গ্রুপও বলে।

রক্তের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে দুরকম অ্যান্টিজেন এবং রক্তরসে দু রকম অ্যান্টিবডি থাকে। এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানব জাতির রক্তকে চারটি শ্রেণী বা গ্রুপে ভাগ করা যায়। যথা : A, B, AB, O.

মানুষের ABO রক্ত গ্রুপের বৈশিষ্ট্য

রক্ত গ্রুপ	লাল রক্তকণিকার উপস্থিত এন্টিজেন	সেরেমে উপস্থিত এন্টিবডি	যে গ্রুপকে রক্তদান করতে পারে	যে গ্রুপ থেকে রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A	এন্টিজেন A	এন্টিবডি a	A, AB	A এবং O
B	এন্টিজেন B	এন্টিবডি b	B, AB	B এবং O
AB	এন্টিজেন A এন্টিজেন B	কোনো এন্টিবডি নেই	AB	সব গ্রুপ
O	কোনো এন্টিজেন নেই	এন্টিবডি a এন্টিবডি b	সব গ্রুপ	O গ্রুপ

৬. ক. চন্দ্রগ্রহণের সময় চাঁদ ও সূর্যের মধ্যে পৃথিবী চলে আসে। অর্থাৎ পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। চন্দ্রগ্রহণ হয় শুধুমাত্র পূর্ণিমার সময়। সূর্যগ্রহণের সময় সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চাঁদ চলে আসে। অর্থাৎ চাঁদের ছায়া সূর্যের উপর পড়ে। সূর্যগ্রহণ অমাবস্যার সময় হয়।

খ. **শব্দ দূষণ :** শব্দ এক প্রকার শক্তি। শব্দের সাহায্যেই আমরা পরস্পরের সাথে তথ্যের আদান-প্রদান করি। পাখির কলতান বা পাতার মর্মরধ্বনি কিংবা সঙ্গীতের মধুর আওয়াজ যেমন আমাদের মনের ক্লান্তি দূর করে তেমনি গোলমাল বা হট্টগোল কিংবা তীব্র শব্দ বা শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ মনকে শ্রান্ত করে এবং অনেক সময় আমাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই পরিবেশের শব্দ দূষণ বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ধারণ ক্ষমতা ৪৫-৫৫ ডেসিবেল। কিন্তু আমরা আমাদের কানের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতার চেয়ে প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ থেকে ৫০ গুণ বেশি শব্দ শুনি।

শব্দ দূষণের ফলে ক্ষতি : চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, যদি টানা ৮ ঘণ্টা আমরা ৯০ থেকে ১০০ ডেসিবেল শব্দ প্রতিদিন শুনি, তাহলে ২৫ বছরের মধ্যে শতকরা ৫০ জনের বধির হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন। যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কম আসে, মেজাজ খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এছাড়া ক্রমাগত শব্দ দূষণের ফলে মানুষ হৃদরোগ, ডায়বেটিস, গ্যাস্ট্রিক এমনকি লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

গ. বৈদ্যুতিক আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাল্ব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V ও W লেখা থাকে। V দ্বারা ভোল্ট এবং W দ্বারা ওয়াট বোঝানো হয়। এখানে ভোল্ট হলো বৈদ্যুতিক চাপের একক এবং ওয়াট হলো তড়িৎ ক্ষমতার একক। কাজেই বাতির গায়ে 220V-25W লেখা থাকার অর্থ হচ্ছে 220 ভোল্ট বিভব পার্থক্যে সংযুক্ত করলে বাতিটি সবচেয়ে বেশি আলো বিকিরণ করবে এবং বাতিটি প্রতি সেকেন্ডে 25 ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করবে। অর্থাৎ 25 ওয়াট করে বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হবে। এছাড়া বাতিটিকে 220 ভোল্টের উপরের কোনো বিভব চাপে জ্বালানো যাবে না। কারণ এতে করে বাতিটির ভেতরের ফিলামেন্ট ফেটে যাবে অর্থাৎ বাতিটি ফিউজ হয়ে যাবে।

ঘ. সাধারণত মোটরগাড়ির ইঞ্জিনে লেড স্টোরেজ কোষ ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি কোষ 2Volt করে। ফলে গাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারীতে ৬টি কোষ সংযোজন করে 12 ভোল্টেজের ব্যাটারি তৈরি করা হয়।

যখন গাড়ি চলতে থাকে তখন জেনারেটরের সাহায্যে কোষ চার্জিত হয়। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সময় কোষের বিদ্যুৎক্ষরণ বা ডিসচার্জ হয়। গাড়ি না চালিয়ে ঘন ঘন ইঞ্জিন বন্ধ এবং স্টার্ট করা হলে ব্যাটারীর ক্ষমতা নিঃশেষিত হয়। তখন পুনরায় বাহির থেকে বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করে ব্যাটারীকে চার্জ করতে হয়। বার বার চার্জ করা হলে H_2SO_4 মিশ্রিত পানি বিশ্লেষিত হয়।

$$H_2O\,(l) \longrightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}\,O_2(g)$$

এতে $H_2(g)$ এবং $O_2(g)$ নির্গমনের ফলে ব্যাটারির পানি কমতে থাকে। তাই মাঝে মধ্যেই ব্যাটারিতে পাতিত বা বিশুদ্ধ পানি যোগ করে H_2SO_4 দ্রবণের ঘনত্ব 1.2 -এ ঠিক রাখতে হয়।

মডেল টেস্ট ০২

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : *প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে*]

নম্বর

১. ক. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
   খ. ভারচুয়াল মেমোরি কি? ২
   গ. কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
   ঘ. ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কি? ২

২. ক. অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণীবিভাগ লিখুন। ৫
   খ. সংক্ষেপে থার্ড জেনারেশন ল্যাংগুয়েজ ও ফোর্থ জেনারেশন ল্যাংগুয়েজ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫

৩. ক. ডেটা কমিউনিকেশন কি? ডেটা কমিউনিকেশন-এর উপাদানগুলো লিখুন। ৫
   খ. মাল্টিমিডিয়া বলতে কি বুঝায়? এর বিভিন্ন ব্যবহার উল্লেখ করুন। ৫

৪. ক. ডিসি ও এসি বলতে কি বুঝায়? ৪
   খ. ডিসি ও এসি-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪
   গ. লাইন তারের দূরত্বজনিত শক্তির অপচয় রোধের উপায় কি? ২

৫. ক. P-n জংশন কি? একে P-n জংশন ডায়োড বলার কারণ কি? ৩
   খ. রেকটিফায়ার বলতে কি বুঝায়? কিভাবে রেকটিফায়ার হিসেবে P-n জংশন ব্যবহার করা যায়? ৪
   গ. গাইগার-মুলার কাউন্টার কি? ৩

উত্তর : মডেল টেস্ট-০২

১. ক. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের পার্থক্য নিম্নরূপ :

হার্ডওয়্যার	সফটওয়্যার
১. কম্পিউটারের বাহ্যিক অবকাঠামো বা বাহ্যিক আকৃতি সম্পন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ, ডিভাইস সমূহকে হার্ডওয়্যার বলে।	১. প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই সফটওয়্যার বলে।
২. ইন্ট্রিগেটেড সার্কিট, মাইক্রোপ্রসেসর, মাদার বোর্ড, ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভ, কীবোর্ড, মাউস, মনিটর, প্রিন্টার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি কম্পিউটার হার্ডওয়্যার।	২. বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম যেমন-MS Office, Adobe Photoshop, Visual Basic ইত্যাদি, বিভিন্ন ধরনের অপারেটিং সিস্টেম যেমন- MS Windows 9X/2K, UNIX, MacOS ইত্যাদি সফটওয়্যার।
৩. হার্ডওয়্যার হচ্ছে কম্পিউটারের বাহ্যিক কাঠামো যা আমরা স্পর্শ করতে পারি। হার্ডওয়্যার ছাড়া সফটওয়্যার অর্থহীন।	৩. সফটওয়্যারের কোনো বাহ্যিক কাঠামো নেই তাই একে আমরা স্পর্শ করতে পারি না। সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অচল। অর্থাৎ এরা একে অন্যের পরিপূরক।

খ. **ভারচুয়াল মেমোরি :** আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমোরির (যেমন-হার্ডডিস্কে) ফাঁকা স্থানকে প্রধান মেমোরির অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ অবস্থাকে ভারচুয়াল মেমোরি বলে। যদি ভারচুয়াল মেমোরি অন করা হয় তাহলে কোনো হার্ডডিস্কের যে পরিমাণ স্থান প্রধান মেমোরির অংশ তথা ভারচুয়াল মেমোরি হিসেবে ব্যবহার করা হবে হার্ডডিস্কে ডেটা সংরক্ষণের জন্য সে পরিমাণ স্থান কম পাওয়া যাবে। আবার ভারচুয়াল মেমোরি অফ করে দিলেই হার্ডডিস্কের যে খালি স্থান ভারচুয়াল মেমোরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ডেটা সংরক্ষণের জন্য খালি পাওয়া যাবে।

গ. কম্পাইলার ও ইন্টারপ্রেটারের মধ্যকার পার্থক্য নিম্নরূপ :

কম্পাইলার	ইন্টারপ্রেটার
কম্পাইলার সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি এক সাথে অনুবাদ করে।	ইন্টারপ্রেটার এক লাইন করে পড়ে এবং অনুবাদ করে।
কম্পাইলার প্রোগ্রামের সবগুলো ভুল এক সাথে প্রদর্শন করে।	ইন্টারপ্রেটার প্রতিটি লাইনের ভুল প্রদর্শন করে অনুবাদ কার্য বন্ধ করে দেয়।
ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে ধীর গতিসম্পন্ন।	ডিবাগিং ও টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে দ্রুত গতিসম্পন্ন।
এই প্রোগ্রামটি সাধারণত বড় হয়ে থাকে এবং প্রধান	এই প্রোগ্রামটি সাধারণত ছোট হয়ে থাকে এবং প্রধান
মেমোরিতে বেশি জায়গা প্রয়োজন হয়।	মেমোরিতে কম জায়গা প্রয়োজন হয়।
প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য কম সময় প্রয়োজন।	প্রোগ্রাম নির্বাহের জন্য বেশি সময় প্রয়োজন।

ঘ. **ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম :** অনেকগুলো কম্পিউটার প্রোগ্রামের সমন্বয়ে ডেটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (DBMS) অথবা উপাত্ত ঘাঁটি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গঠিত হয়। ডেটাবেজ নিয়ন্ত্রণ, সৃজন, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজের জন্য এই প্রোগ্রাম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এটা সংশ্লিষ্ট প্রোগ্রামের একটি অংশ। এটা ডেটাবেজ ও ডেটাবেজ ব্যবহার করার মধ্যে সমন্বয়কারী সফটওয়্যার হিসেবে কাজ করে।

২. ক. অপারেটিং সিস্টেমের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :

ক. ব্যাচ প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম
১. এক্ষেত্রে একটির পর একটি ব্যবহারিক প্রোগ্রাম নির্বাহ করা হয়।
২. ব্যবহারকারীর কোনো বিরতি প্রয়োজন হয় না।

খ. রিয়েল টাইম অপারেটিং সিস্টেম
১. প্রোগ্রামের গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়।
২. ব্যবহারকারী প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কাজ করতে পারে।

গ. মাল্টি প্রসেসিং অপারেটিং সিস্টেম
১. একাধিক প্রসেসর দ্বারা প্রসেসিং করানো হয়।
২. সিপিইউ কখনো অলস থাকে না।

ঘ. মাল্টি প্রোগ্রামিং অপারেটিং সিস্টেম

১. এ অপারেটিং সিস্টেম এক সাথে একাধিক প্রোগ্রাম চালাতে পারে।

২. এক্ষেত্রে ধাপ তিনটি– i. Ready, ii. Running iii. Blocked.

ঙ. টাইম শেয়ারিং অপারেটিং সিস্টেম

১. প্রসেসিং সময়কে বিভিন্ন প্রোগ্রাম এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়।

২. একাধিক ব্যবহারকারী এক সাথে কাজ করতে পারে।

চ. ভারচুয়াল স্টোরেজ অপারেটিং সিস্টেম

১. সহায়ক মেমোরির কিছু অংশকে প্রধান মেমোরি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

২. প্রধান মেমোরির স্বল্পতা দূরীকরণ ও সহায়তার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছ. ডিস্ট্রিবিউটেড অপারেটিং সিস্টেম

একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাহায্যে একাধিক কম্পিউটারের সিস্টেম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কম্পিউটারের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এ সিস্টেম ব্যবহৃত হয়।

খ. থার্ড জেনারেশন ল্যাংগুয়েজ ও ফোর্থ জেনারেশন ল্যাংগুয়েজের সম্পর্ক : থার্ড জেনারেশন ভাষায় আমাদের পরিচিত বাক্য, বর্ণ ও সংখ্যা ব্যবহার করে প্রোগ্রাম রচনা করা হয়। এ ভাষায় খুব দ্রুত এবং সহজে প্রোগ্রাম লিখা যায়। এ ভাষায় প্রোগ্রাম লিখতে খুব দক্ষতার প্রয়োজন নেই। এ ভাষার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, এ ভাষায় লিখিত প্রোগ্রাম যে কোনো কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়। ২৫টিরও বেশি হাইলেভেল বা উচ্চতর ভাষা আছে। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো :

বেসিক (BASIC)	এলগল (ALGOL)
প্যাসকেল (PASCAL)	লগো (LOGO)
ফের্ট্রান (FORTRAN)	লিস্প (LISP)
কোবল (COBOL)	অ্যাডা (ADA)
টার্বো সি (TURBO C)	প্রোলগ (PROLOG)

বৈশিষ্ট্য : স্বাভাবিক ভাষার মতো হাই লেভেল ভাষার গঠনগত (Syntax) নিয়ম-কানুন আছে। নিচে হাই লেভেল ভাষায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো :

১. হাই লেভেল ভাষায় স্বাভাবিক ভাষার (যেমন ইংরেজি) অনেক শব্দ ব্যবহার করা যায়।

২. প্রোগ্রামের কার্যবর্ণনা বা স্টেটমেন্ট অনেকগুলো মেশিন (বা অ্যাসেম্বলি) স্টেটমেন্টের সমকক্ষ অর্থাৎ প্রোগ্রাম সংক্ষিপ্ত হয়।

৩. অসংখ্যা তৈরি লাইব্রেরি প্রোগ্রামের সুবিধা বিদ্যমান।

৪. প্রোগ্রাম রচনার সময় কম্পিউটার মেশিনের কথা ভাবতে হয় না।

কম্পিউটারে ব্যবহৃত বিশেষ কয়েকটি ভাষাকে 4GL বলে। 4GL ব্যবহার করে সহজে এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তৈরি করা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খ বা বিস্তারিতভাবে প্রক্রিয়াকরণের বর্ণনা দিতে হয় না বলে চতুর্থ প্রজন্মের ভাষাকে ননপ্রসিডিউলার ল্যাংগুয়েজও বলা হয়। অধিকাংশ চতুর্থ প্রজন্মের ভাষায় কথোপকথন রীতিতে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে ব্যবহারকারীর যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকে।

বৈশিষ্ট্য :

১. এ ভাষায় লিখিত কোনো প্রোগ্রাম বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি কম্পিউটারে একই সাথে কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহার করা যায়।

২. এটি ইন্টারেক্টিভ মোডে কার্যক্ষম।

৩. এ ভাষায় প্রোগ্রাম লেখার পর পুরোটা কম্পাইল করার প্রয়োজন হয় না। একটি কমান্ড লেখার সাথে সাথেই কম্পাইল হয়ে যায়।

৪. স্বাভাবিক ইংরেজি ভাষার মতো নির্দেশ দিয়ে ডেটাবেজের সাথে সংযোগ স্থাপন করা যায়। উদাহরণ : SQL/DS, INTELECT.

৩. **ক. ডেটা কমিউনিকেশন :** তথ্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নির্ভরযোগ্যভাবে আদান-প্রদান করার নাম ডেটা কমিউনিকেশন। এ প্রক্রিয়ায় ৪টি উপাদান ক্রিয়াশীল হয়। যথা : ১. তথ্যের উৎস বা প্রেরক, ২. তথ্যের বাহক মাধ্যম, ৩. গ্রাহক বা তথ্য গ্রহণকারী ও ৪. ফিডব্যাক বা প্রাপ্তি স্বীকার,

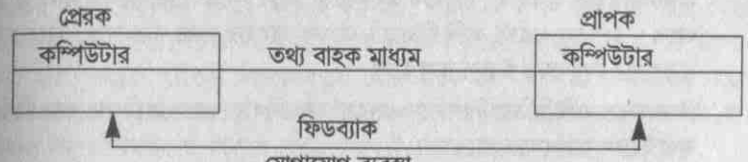

যোগাযোগ ব্যবস্থা

চিত্রের এ যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রেরক একটি কম্পিউটার এবং গ্রাহকও একটি কম্পিউটার। তথ্য টেলিফোন লাইন বা কেবল বহন করে গ্রাহকের নিকট নিয়ে আসে।

ডেটা কমিউনিকেশন সিস্টেম

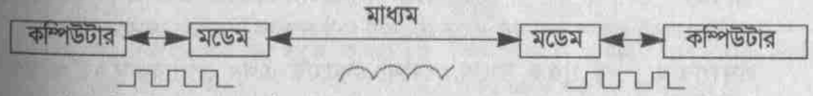

ডেটা কম্পিউটার থেকে বর্গ তরঙ্গ আকারে রওনা দেয়। মডেমে সাইন তরঙ্গ গিয়ে এ তরঙ্গের প্রকৃতি পরিবর্তন হয়। Modulation ও Demodulation কথাদ্বয়ের প্রথম বর্ণ সমষ্টি দিয়ে MODEM শব্দটি রচিত। এ মডেম সাইন তরঙ্গ আকারে কম্পিউটার প্রদত্ত বর্গ তরঙ্গটিকে ক্যাবল টেলিফোনকে হস্তান্তর করে। ক্যাবল/টেলিফোন সেটা আবার দ্বিতীয় মডেমে পৌঁছে দেয়। দ্বিতীয় মডেমটি আবার রূপান্তর করে মূল বর্গ তরঙ্গ করে দ্বিতীয় কম্পিউটারকে হস্তান্তর করে বলে একই লাইন দিয়ে বর্ণ বা শব্দ দিয়ে গঠিত যে কোনো সঙ্কেত গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

ডেটা কমিউনিকেশনের উপাদান : কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নির্ভরযোগ্যভাবে ডেটা বা তথ্য আদান-প্রদান সম্ভব। এ যোগাযোগ প্রক্রিয়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদান হলো–

১. উৎস (Source);

২. প্রেরক (Transmitter);

৩. মাধ্যম (Medium);

৪. গ্রাহক বা প্রাপক (Receiver) ও

৫. গন্তব্য (Destination)।

খ. **মাল্টিমিডিয়া :** মাল্টিমিডিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বহুমাধ্যম। কাজেই মাল্টিমিডিয়া হলো এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা, যাতে একাধিক মিডিয়া (যেমন– লেখা বা টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ইমেজ ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে সচল, সজীব ও আকর্ষণীয় ভুবন তৈরি করা যায়।

মাল্টিমিডিয়ার বিভিন্ন মিডিয়া : মূলত তিনটি মিডিয়াকেই মাল্টিমিডিয়ার মিডিয়া বলে গণ্য করা হয়। এগুলো হলো : ১. বর্ণ, ২. চিত্র, ৩. শব্দ (সাউন্ড)।

১. **বর্ণ :** মানুষের লিখিত ভাষা হলো বর্ণ। কম্পিউটারে এ বর্ণ কোনো না কোনো ধরনের আকৃতি নিয়ে প্রকাশিত হয়।

২. **চিত্র :** মানুষের আঁকা ছবি, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফ সবই গ্রাফিক্স। গ্রাফিক্স স্থির এবং চলমান উভয়ই হতে পারে। চলমান গ্রাফিক্সকে এনিমেশন বা ভিডিও বলা হয়।

৩. **শব্দ (সাউন্ড) :** শব্দ হচ্ছে মানুষের প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের চারপাশে যত প্রকারের শব্দ আছে তার সবই মাল্টিমিডিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার : প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্তমানে সর্বত্রই মাল্টিমিডিয়ার ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। নিচে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের কিছু ক্ষেত্র উল্লেখ করা হলো–

বিনোদন : মাল্টিমিডিয়া বিনোদনে এনেছে নতুন দিগন্ত। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ভিডিও গেমের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

শিক্ষাক্ষেত্রে : শিক্ষাক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার শিক্ষাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলে। কম্পিউটার এইডেড লারনিং মাল্টিমিডিয়ারই প্রয়োগ।

ইন্টারনেট : ইন্টারনেটে মাল্টিমিডিয়ার বিকল্প নেই— এ কথা ইন্টারনেট ব্রাউজ করলে যে কেউই বুঝতে পারে।

বাণিজ্য : কোনো পণ্য সম্পর্কে বিজ্ঞাপন কিংবা বিস্তারিত তথ্য এখন মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যারেই প্রকাশ করা হয়, যাতে যে কেউ পণ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে।

প্রকাশনায় : বই পুস্তক কিংবা কোনো ডকুমেন্ট এখন পেপারব্যাকের পাশাপাশি মাল্টিমিডিয়াতেও প্রকাশ করা হয়। ফলে বিশাল আকারের বইপত্র ব্যবহার না করে মাল্টিমিডিয়া সিডিতে একই জিনিস অনেক বেশি সুবিধাসহ ব্যবহার করা যায়।

মেডিকেল : মেডিকেল শিক্ষা ও চিকিৎসাক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার বর্ণনাতীত। রোগ ও রোগের প্রতিবছর কিংবা ডায়োগনসিস করার জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের প্রচুর মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার পাওয়া যায়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি : মাল্টিমিডিয়ার কল্যাণে এখন ভার্চুয়াল রিয়েলিটি জগতে ভ্রমণ করা সম্ভব হচ্ছে। আসলে মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার এতই ব্যাপক পর্যায়ে হচ্ছে যে সংক্ষেপে এর বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে ব্যবসায়িক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবনের সব ক্ষেত্রেই মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার হচ্ছে।

৪. ক. **ডিসি বা সম প্রবাহ :** যখন কোনো বর্তনীর মধ্য দিয়ে একদিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তাকে সম প্রবাহ বা একমুখী (DC) প্রবাহ বলে। এক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের (বিদ্যুৎ উৎসের) ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর প্রকৃতি পাল্টায় না। কিন্তু পরিবর্তী প্রবাহের (AC) ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎসের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক মেরুর প্রকৃতি অবিরত পাল্টাতে থাকে। একমুখী প্রবাহের সময় কোনো তারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত চার্জের প্রকৃতি ও দিক বদলায় না। শিল্প-কারখানায় মোটর চালাতে ও পরিবহন শিল্পে একমুখী প্রবাহ ব্যবহৃত হয়। তড়িৎ রাসায়নিক শিল্পে ও ধাতুকে ইলেকট্রোপ্লেটিং করতে একমুখী প্রবাহ ব্যবহৃত হয়।

এসি বা পরিবর্তী প্রবাহ : যে তড়িৎ প্রবাহের মান সবসময়ে পরিবর্তনশীল এবং তড়িৎ প্রবাহের দিকও কিছুক্ষণ পর পর বদলায় তাকে পরিবর্তী প্রবাহ বলে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একমুখী প্রবাহের চেয়ে পরিবর্তী প্রবাহের প্রচলন অনেক বেশি। পরিবর্তী প্রবাহী তড়িৎ উৎপন্ন হয় অল্টারনেটরে কিন্তু একমুখী প্রবাহী তড়িৎ উৎপন্ন হয় ডায়নামোতে। ডায়নামোর মধ্যস্থিত আর্মেচার কয়েলে যে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয় কম্যুটেটরের সাহায্যে তাকে একমুখী প্রবাহে পরিণত করা হয়। একমুখী তড়িতের অভিমুখ একই দিকে হওয়ার ফলে ডায়নামোর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্তে কোনো পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তী প্রবাহের মান একটি আবর্তনে তরঙ্গাকৃতিতে এক অভিমুখে শূন্য থেকে সর্বোচ্চ এবং সর্বোচ্চ থেকে শূন্য হয়। সেজন্য আল্টারনেটরের কোনো বিশেষ প্রান্তকে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক বলা যায় না।

একমুখী তড়িৎ প্রবাহের চেয়ে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহের ব্যবহার উপযোগিতা অনেক। পরিবর্তী প্রবাহের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ছাড়াও ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স-এর দ্বারা প্রবাহমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির অপচয় কম হয়। পরিবর্তী তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রে ফেজের সংখ্যা বাড়িয়ে সমআয়তনের সমপ্রবাহী তড়িৎ উৎপাদক যন্ত্রের তুলনায় অধিক শক্তি উৎপাদন করা যায়। এছাড়া পরিবর্তী তড়িৎব্যবস্থায় ভোল্টেজকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজনমতো বাড়ানো এবং স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমারের সাহায্যে প্রয়োজনমতো কমানো যায়। এজন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বন্টনের ক্ষেত্রে পরিবর্তী প্রবাহের প্রচলন সর্বত্র।

খ. ডিসি বা সমপ্রবাহ এবং এসি বা পরিবর্তী প্রবাহের মধ্যে মূলগত পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

সম প্রবাহ বা একমুখী প্রবাহ	পরিবর্তী প্রবাহ
১. সম প্রবাহের অভিমুখ সর্বদা স্থির থাকে।	১. পরিবর্তী প্রবাহের মুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর পরিবর্তিত হয়।
২. সম প্রবাহের মান স্থির থাকে, আবার নাও থাকতে পারে।	২. কিন্তু পরিবর্তী প্রবাহের মান একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন হয়।
৩. সম প্রবাহ ওহমের সূত্র ও কারসফের সূত্র মেনে চলে।	৩. কিন্তু পরিবর্তী প্রবাহ ও পরিবর্তী বিদ্যুচ্চালক শক্তির সম্পর্ক বর্তনীর প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। এটি ওহম এবং কারসফের সূত্র মেনে চলে না।

গ. **লাইন তারের দূরত্বজনিত শক্তির অপচয় রোধের উপায় :** আমরা জানি, $I \propto V$. অর্থাৎ ভোল্টেজ অনেকগুণ বৃদ্ধি করে এবং প্রবাহ একই অনুপাতে কমিয়ে অথবা বিপরীত ব্যবস্থা করে প্রেরিত তড়িৎ ক্ষমতা সমান রাখা যায়। প্রত্যেক লাইন-তারের কিছু রোধ (R) আছে এবং ঐ তারের ভেতর দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ গেলে জুল-প্রভাবজনিত তাপের উদ্ভব হবে এবং শক্তির অপচয় হবে। লাইন-তার যত দীর্ঘ হবে, ক্ষতির পরিমাণ তত বৃদ্ধি পাবে। দু রকম উপায়ে ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা যায়—

১. লাইন তার নির্মাণে মোটা তামার তার ব্যবহার করা, কারণ মোটা তারের রোধ খুব কম তবে মোটা তারে খরচ অনেক বেশি পড়ে।

২. প্রবাহমাত্রা (I) খুব কম প্রয়োগ করা। এজন্য ভোল্টেজ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি করতে হবে, কারণ তড়িৎ ক্ষমতা অপরিবর্তিত রাখতে হবে। কিন্তু জেনারেটরে খুব উচ্চ ভোল্টেজ উৎপন্ন করা এবং ব্যবহারকারীর পক্ষে উচ্চ ভোল্টেজ ব্যবহার করা খুবই বিপজ্জনক। এ সমস্যার সমাধান করা যায় এসি সরবরাহ ব্যবস্থায় ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে। ডিসি সরবরাহ

ব্যবস্থায় এই সুবিধা নেই, কারণ সেখানে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা যায় না। তাই আজকাল তড়িৎশক্তি প্রেরণে সর্বত্র এসি সরবরাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

৫. ক. **p-n জংশন :** একটি p টাইপ ও একটি n টাইপ অর্ধপরিবাহী কেলাসকে পাশাপাশি জোড়া লাগালে তাদের মধ্যবর্তী অন্তঃস্তরকে p-n জংশন বলে।

p-টাইপ সিলিকন + n-টাইপ সিলিকন = p-n জংশন

p-n জংশন ডায়োড বলার কারণ : ডায়োড এক ধরনের ইলেকট্রনিক ক্ষুদ্র বস্তু যা তড়িৎ প্রবাহকে একমুখী করে। p-n জংশনে ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে তা ইলেকট্রনকে এক অভিমুখে প্রবাহের অনুমতি দেয়। তাই p-n জংশনকে ডায়োড বলা হয়।

খ. **রেকটিফায়ার :** দ্বিতড়িদ্বার বা সংক্ষেপে ডায়োডকে রেকটিফায়ার বলা হয়। একটি p- টাইপ সিলিকন এবং n টাইপ সিলিকন পাশাপাশি সংযোগে p-n জংশন করা হয়। এ p-n জংশনই ডায়োড যাকে রেকটিফায়ার বলে। এর কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহকে একমুখীকরণ। বিভিন্ন ধরনের রেকটিফায়ারের মধ্যে অর্ধ তরঙ্গ রেকটিফায়ার (Half wavel rectifier) এবং পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার (Full wavel rectifier) উল্লেখযোগ্য।

রেকটিফায়ার হিসেবে p^{-n} জংশন

ক. **সম্মুখী প্রবাহ ও সম্মুখী ঝোঁক :** p-n জংশনে যদি কোনো বহিঃস্থ ভোল্টেজ বা বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ ঘটে। ভোল্টেজ যদি এমনভাবে প্রয়োগ করা হয় যে ব্যাটারি বা সেলের ধনাত্মক প্রান্ত p-টাইপ বস্তুর সাথে এবং ঋণাত্মক প্রান্ত n-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয় তাহলে ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত ইলেকট্রনগুলোকে বামে অর্থাৎ p-টাইপ বস্তুর দিকে এবং ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত হোলগুলোকে ডানে অর্থাৎ n-টাইপ বস্তুর দিকে টানবে। ফলে p-n জংশন ও বহিঃস্থ বর্তনীতে তড়িৎ প্রবাহ চলবে। এ প্রবাহকে বলা হয় সম্মুখী প্রবাহ। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় সম্মুখী ঝোঁক।

খ. **বিমুখী ঝোঁক :** ভোল্টেজ যদি বিপরীত অভিমুখে প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্ত যদি n-টাইপ এবং ঋণাত্মক প্রান্ত যদি p-টাইপ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করা হয় তাহলে n-টাইপ বস্তুর মুক্ত ইলেকট্রন ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের আকর্ষণের ফলে n-টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে; p^{-n} জংশন পার হয়ে p-টাইপ বস্তুতে যেতে পারবে না। p-টাইপ বস্তুর হোলও p-টাইপ বস্তুতেই থেকে যাবে। এতে জংশন দিয়ে কোন তড়িৎ প্রবাহ চলবে না। এ ধরনের সংযোগকে বলা হয় বিমুখী ঝোঁক।

গ. **গাইগার-মুলার কাউন্টার :** গাইগার-মুলার কাউন্টার বা জিএম (GM) কাউন্টার সর্বপেক্ষা জনপ্রিয় বিকিরণ ডিটেকটর (radiation detector)। এই কাউন্টার উচ্চলাভ বিবর্ধক (high gain amplifier) ছাড়াই আলফা, বিটা, গামা ও এক্স-রে বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে। গাইগার-মুলার কাউন্টারে একটি ধাতব নল থাকে এবং এই নলের অক্ষ বরাবর ঢুকানো হয় একটি সূক্ষ্ম তার। সূক্ষ্ম তারের দু'প্রান্ত নল থেকে অন্তরীত থাকে। এই নলের ভিতর অতি সহজে আয়নিত হতে পারে এমন কোনো গ্যাস বা গ্যাসের মিশ্রণ এবং এর সাথে মিশ্রিত খুব অল্প অনুপাতে নিবৃত্তি বাষ্প (quencing vapour) থাকে। ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত চোঙ্গাকৃতি নলটি সাধারণত এক সেন্টিমিটার থেকে দুই সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় সূক্ষ্ম তারটি অ্যানোড হিসেবে কাজ করে এবং উচ্চ বিভব পার্থক্য সম্পন্ন ব্যাটারির সাহায্যে তারকে ধনাত্মক বিভব এবং নলটিকে ঋণাত্মক বিভব দেয়া হয়।

মডেল প্রশ্ন ০৩ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ৩

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

১. ক. তাড়িত চৌম্বক বর্ণালী কাকে বলে? তড়িৎ চৌম্বকীয় বর্ণালীর বিভিন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য উল্লেখ করুন। ৪
খ. ব্লাড ক্যান্সার কত প্রকার? এর চিকিৎসা সম্পর্কে লিখুন। কেমোথেরাপি (Chemotheraphy) কি? ৪
গ. শব্দ শ্রবণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করুন। প্রতিধ্বনির সাহায্যে কিভাবে খনিজ পদার্থের সন্ধান করা হয়? ৪
ঘ. বর্তমানে বৈদ্যুতিক বালব বায়ুশূন্য না করে নিষ্ক্রিয় গ্যাসভর্তি করা থাকে কেন? ফ্যান আস্তে বা জোরে ঘোরালে বিদ্যুৎশক্তি সমান খরচ হয়— কারণ কি? ৪
ঙ. ব্যালিস্টিকস কি? ব্যালিস্টিকস মিসাইল (Ballistic Missile) কি? ৪

২. ক. বর্ষাকালে ভেজা কাপড় শুকাতে চায় না, অথচ শীতকালে ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় কেন? ২
খ. পৃথিবীর বিভবকে শূন্য ধরা হয় কেন? ২
গ. উদ্ভিদের বয়স কিভাবে বোঝা যায়? ২
ঘ. 'মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক, সকল গতিই আপেক্ষিক। কোষ স্থিতি বা গতি পরম নয়।'—উদাহরণের সাহায্যে এ বিবৃতি ব্যাখ্যা করুন। ২
ঙ. প্লাস্টিক সার্জারি কি? ২

৩. ক. মানবদেহের ওপর বায়ুচাপ কত? মানুষ তা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে? ২$\frac{১}{২}$
খ. অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড কাকে বলে? ২$\frac{১}{২}$
গ. মানুষ লম্বা বা বেঁটে হয় কেন? ২$\frac{১}{২}$
ঘ. কীটপতঙ্গ কেন আলোর প্রতি আকর্ষিত হয়? ২$\frac{১}{২}$

৪. ক. তামা সবুজ হয়ে যায় কেন? সোহাগা কি? ২
খ. ধাতুর মতো ঔজ্জ্বল্য এবং তড়িৎ পরিবাহিতা সত্ত্বেও গ্রাফাইট কেন অধাতু? ২
গ. বর্ষাকালে খাদ্য লবণ গলে যায় কেন? ২
ঘ. লিফটে নামার সময় ওজন কমে যায় কেন? ২
ঙ. শব্দ দূষণ কি? শব্দ দূষণ আমাদের কি ক্ষতি করে? ২

৫. ক. মহাবিস্ফোরণ বা প্রচণ্ড নিনাদ (Big Bang) তত্ত্ব কি? বিগ ব্যাং-এর আগে কি ঘটেছিল? ২$\frac{১}{২}$
খ. কুরি বিন্দু কি? কোনো চৌম্বক পদার্থের অণুগুলো এক একটি চুম্বক হওয়া সত্ত্বেও চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্ব থাকে না কেন? ২$\frac{১}{২}$
গ. সাবান ও ডিটারজেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি? ২$\frac{১}{২}$
ঘ. কোলেস্টেরল আমাদের হৃৎপিণ্ডে কিভাবে ক্ষতি করে? ২$\frac{১}{২}$

৬. ক. বৈদ্যুতিক কোষ এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। ২$\frac{1}{2}$

খ. পুকুরের চেয়ে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ কেন? ২$\frac{1}{2}$

গ. 'ডিজিটাল' এবং 'এনালগ' এ দুটি শব্দ দিয়ে ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়? ২$\frac{1}{2}$

ঘ. নাইট্রোজেন চক্র কি? সংক্ষেপে লিখুন। ২$\frac{1}{2}$

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৩

১. ক. **তাড়িত চৌম্বক বর্ণালী :** শক্তির বিকিরণ তরঙ্গ আকারে ঘটে। বিভিন্ন শক্তির বেলায় তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং সে সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য হয়। বিভিন্ন রশ্মি ও দৃশ্যমান আলোক বা বিদীর্ণ তাপের ভেতর প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্য নেই। এ কারণে সব তরঙ্গকে সাধারণভাবে তাড়িত চুম্বকীয় তরঙ্গ বলা হয়ে থাকে। তাড়িত চৌম্বক বিকিরণ বা তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গের সমগ্র পরিসরকে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বা কম্পাঙ্কের ভিত্তিতে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে; একে বলা হয় তাড়িত চৌম্বক বর্ণালী।

বিভিন্ন তরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য

তরঙ্গের প্রচলিত নাম	তরঙ্গদৈর্ঘ্য
দীর্ঘ বেতার তরঙ্গ	~ 10^5 m
মধ্যম বেতার তরঙ্গ	~ 10^3 m
ক্ষুদ্র বেতার তরঙ্গ	~ 10^2 m
মাইক্রোওয়েভ	~ 1 m
অবলোহিত আলোক	~ 10^{-5} m
দৃশ্যমান আলোক	~ 7×10^{-7} m থেকে 4×10^{-7} m
অতিবেগুনি আলোক	~ 4×10^{-7} m থেকে 1×10^{-8} m
রঞ্জন রশ্মি (বা এক্সরে)	~ 1×10^{-8} m থেকে 1×10^{-11} m
গামা রশ্মি (γ-রশ্মি)	~ 1×10^{-11} m থেকে 10^{-15} m

খ. **ব্লাড ক্যান্সারের প্রকারভেদে :** ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া সাধারণত দু ধরনের—একিউট (Acute) ও ক্রনিক (Chronic)। প্রথমটি দ্রুত প্রসারমান এবং সাধারণত ছোটদের বেশি হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি ধীরগতিতে প্রসারমান ও বড়দের বেশি হয়।

ব্লাড ক্যান্সারের চিকিৎসা ও করণীয় : রক্তের PBHF এবং Bone marrow পরীক্ষার মাধ্যমে অতি সহজেই ব্লাড ক্যান্সার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে ব্লাড ক্যান্সারের প্রায় সব চিকিৎসা সম্ভব (কেবল বোন ম্যারো প্রতিস্থাপন ছাড়া) এবং অত্যন্ত সফলভাবে চালু আছে। চিকিৎসা সাধারণত দু ধরনের ১. ক্যান্সার কোষ নির্মূল করার চিকিৎসা; যেমন– কেমোথেরাপি, অস্থিমজ্জা ও রক্তকোষ প্রতিস্থাপন, ২. উপসর্গসমূহের চিকিৎসা; যেমন– রক্ত পরিসঞ্চালন, বিভিন্ন প্রকার ইনফেকশন দূর করা এবং পুষ্টি নিশ্চিত করা।

কেমোথেরাপি (Chemotheraphy) : ক্যান্সার বিনাশী ওষুধ (অ্যান্টি ক্যান্সার ড্রাগ) দিয়ে ক্যান্সারের চিকিৎসা করাকে বলে কেমোথেরাপি। ক্যান্সার যখন সমগ্র দেহে ছড়িয়ে পড়ে, অস্ত্রোপচারে এর চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না তখনই কেমোথেরাপি করা হয়। কেমোথেরাপি হচ্ছে সমস্ত শরীর জুড়ে চিকিৎসা। কেমোথেরাপি সংখ্যা বৃদ্ধিরত সকল ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে আক্রমণ করে ক্যান্সার নিরাময়ের চেষ্টা করে। এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলো বমি বমি ভাব, ক্লান্তি, কোষ্ঠকাঠিন্য ও মুখের আলসার ইত্যাদি।

গ. **শব্দ শ্রবণ প্রক্রিয়া :** কানের পাতা শব্দতরঙ্গকে সংগ্রহ করে কানের নালীর মধ্য দিয়ে কর্ণপটহে পাঠায়। ফলে কর্ণপটহ আন্দোলিত হয়। কর্ণপটহের এ আন্দোলন হাতুড়ি, নেহাই এবং রেকাবি দ্বারা সঞ্চালিত হয়ে ককলির তরল পদার্থকে আন্দোলিত করে। এখন যে তন্তুর স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক তরলের কম্পাঙ্কের সমান সে তন্তু অনুযায়ী কম্পাঙ্কে আন্দোলিত হতে থাকে। ফলে বৈদ্যুতিক সাড়া (electrical response) উৎপন্ন হয়ে স্নায়ুতন্তুর দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং আমরা শব্দ শুনতে পাই। কি প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুতিক সাড়া উৎপন্ন হয় তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানী হেলমহোল্জ শ্রবণ প্রক্রিয়ার এ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

প্রতিধ্বনির সাহায্যে খনিজ পদার্থের সন্ধান : খনিজ পদার্থের অবস্থান নির্ণয়ের জন্য মাটির নিচে গর্ত করে ডিনামাইট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ বিস্ফোরণের শব্দ মাটির নিচের বিভিন্ন শিলাস্তর থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। ফিরে আসা প্রতিধ্বনি হাইড্রোফোন নামক গ্রাহক যন্ত্রে ধারণ করা হয়। এ যন্ত্রে স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় প্রতিধ্বনির লেখ অঙ্কিত হয়। এ লেখ পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন শিলার গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এভাবে শিলার গঠন প্রকৃতি থেকে ভূ-অভ্যন্তরস্থ খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব নির্ণয় করা যায়।

ঘ. **বৈদ্যুতিক বালব নিষ্ক্রিয় গ্যাসভর্তি থাকার কারণ :** বৈদ্যুতিক বালব বায়ুশূন্য হলে এর মধ্যস্থ ফিলামেন্টটির দ্রুত বাষ্পীভবন হয়। ভেতরে কাচের দেয়ালে পাতলা আবরণের সৃষ্টি হয়। এতে বালবের আলোর ঔজ্জ্বল্য কমে যায় এবং বালবটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। নিষ্ক্রিয় গ্যাস বা নাইট্রোজেন ভর্তি থাকলে ফিলামেন্টের বাষ্পীভবন কম হয়। সুতরাং বালবের আলোর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি এবং স্থায়িত্বের জন্য বালব বায়ুশূন্য না করে নিষ্ক্রিয় গ্যাস ভর্তি করা হয়।

ফ্যান আস্তে বা জোরে ঘোরালে বিদ্যুৎশক্তি সমান খরচ হওয়ার কারণ : ফ্যানে তড়িৎপ্রবাহ কম হলে আস্তে ঘোরে এবং বেশি বা পূর্ণ প্রবাহ হলে জোরে ঘোরে। এই আস্তে বা জোরে ঘোরা নির্ভর করে রেগুলেটরের ওপর। রেগুলেটরে পরিবর্তনশীল রোধ থাকে। এ রোধ পরিবর্তন করে স্বাভাবিক তড়িৎপ্রবাহের সরবরাহ পরিবর্তন করা হয়। ফ্যান যখন আস্তে ঘোরে তখন বিদ্যুৎশক্তি ফ্যানে সরবরাহ কম হয় এবং রেগুলেটরের রোধ বেশি থাকে। রোধের ক্রিয়ার ফলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় তা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ মোট বিদ্যুৎ খরচ একই হয়।

ঙ. **ব্যালিস্টিকস :** ব্যালিস্টিকস (Ballistics) ফলিত পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা, যেখানে প্রতিপক্ষের গতি ও গতির নির্ধারক বিষয়সমূহ আলোচিত হয়। ব্যবহারিক কারণে এটি শুটিংয়ের বিজ্ঞান নামে পরিচিত। অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক এ দুভাগে এটিকে ভাগ করা যায়। বন্দুকের নল থেকে বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বুলেটের গতিপ্রকৃতি হলো অভ্যন্তরীণ ব্যালিস্টিকসের অংশ। আবার, বন্দুকের নল থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর মুহূর্ত থেকে বুলেট বাহ্যিক ব্যালিস্টিকসের আওতায় থাকে।

ব্যালিস্টিকস মিসাইল : ব্যালিস্টিকস মিসাইল একটি বিশেষ ধরনের ক্ষেপণাস্ত্র। ব্যালিস্টিকস ক্ষেপণাস্ত্র কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে তাক করে ছোড়া হয়। ক্ষেপণাস্ত্রটি নিজেই একটি ব্যালিস্টিক পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। এ চলনপথটি (trajectory) কিছুটা উপবৃত্তাকৃতি, যা তিনটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্ব-প্রপালশনের দ্বারা প্রাপ্ত ভরবেগ, পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ ও অ্যারোডিনামিক বাধার ফলে সৃষ্ট মন্দন।

ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র থেকে পৃথক এজন্য যে, গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অধীনে হয় অ্যারোডিনামিক অথবা প্রোপালসিভ বল ব্যবহৃত হয় এর যাত্রাপথের অধিকাংশ বা সবটাই নিয়ন্ত্রণের জন্য। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অ্যারোডিনামিক বলের হিসাব-নিকাশ বেশ জটিল। সে তুলনায় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ত্রুটি অনেক কম। এজন্য গাইডেড মিসাইল ব্যবহার করা হয়, যখন উড্ডয়নকালে মিসাইলটিকে অধিকাংশ সময় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে থাকতে হয়। আবার বায়ুমণ্ডলের বাইরে অ্যারোডিনামিক বলের হিসাব বেশ সহজ। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে ক্ষেপণাস্ত্র অধিকাংশ সময়ে বায়ুমণ্ডলের বাইরে রাখা যায়, সেসব ক্ষেত্রে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রই উত্তম। দূরপাল্লা তথা পৃথিবীপৃষ্ঠে ১৬০ থেকে ১৬০০ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে চাইলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করা যায়। উদ্ভাবিত এ ধরনের দুটো ক্ষেপণাস্ত্র হলো- আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল (ICBM) সাবমেরিন লঞ্চ ও ব্যালিস্টিক মিসাইল (SLBM)।

২. ক. **শীতকালে ভেজা কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যায় :** বর্ষাকালে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। এতে ভেজা কাপড় থেকে পানির বাষ্পায়ন খুব ধীরে ধীরে হয়। সেজন্য বর্ষাকালে ভেজা কাপড় শুকাতে চায় না। অপরদিকে শীতকালে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় ভেজা কাপড় থেকে পানির বাষ্পায়ন দ্রুত হয়। ফলে ভেজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

খ. **পৃথিবীর বিভব শূন্য :** আমরা জানি, কোনো একটি ছোট আকারের পরিবাহক ধনাত্মক আধান লাভ করলে এর বিভব বৃদ্ধি পায় এবং এর পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু পরিবাহকটি যদি অতি বিশাল আকারের গোলক হয় তাহলে এতে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধির কারণে বিভবান্তর পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের পৃথিবী এমনই একটি বিশাল আকারের পরিবাহক। পৃথিবী একটি ঋণাত্মক আধানের বিশাল ভাণ্ডার। তাই এ থেকে কিছু ইলেকট্রন বের করে নিলে অথবা এতে কিছু ইলেকট্রন দিলে এর বিভবের কোনো পরিবর্তন হয় না। তাই পৃথিবীর বিভবকে শূন্য ধরা হয়।

গ. **উদ্ভিদের বয়স নির্ণয়ের উপায় :** উদ্ভিদের দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সেকেন্ডারি বা গৌণ কোষকলার বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ পরিধিতে বা প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি স্পষ্ট বোঝা যায়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এ বৃদ্ধির হার বেশি থাকে এবং শীতকালে থাকে কম। ফলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কাষ্ঠিক উপাদান বেশি পরিমাণে তৈরি হয় এবং শীতকালে কম তৈরি হয়। এতে পাশাপাশি দুটি পুরু ও পাতলা বলয় সৃষ্টি হয় প্রতি এক বছর সময়ে। বিভিন্ন বছরে সৃষ্ট এ সকল বলয় এককেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে পরস্পর সজ্জিত হয়, যা বার্ষিক বলয় নামে পরিচিত। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের প্রস্থচ্ছেদে এ সকল বর্ষবলয় গুণে সাধারণত উদ্ভিদের বয়স বের করা হয়।

ঘ. **বিবৃতির ব্যাখ্যা :** কোনো বস্তু স্থিতিশীল না গতিশীল তা বোঝার জন্য বস্তুর আশপাশ থেকে আর একটা বস্তুকে নিতে হবে, যাকে আমরা প্রসঙ্গ বস্তু বলতে পারি।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় দু বন্ধু যদি মুখোমুখি বসে থাকে, তবে একজনের সাপেক্ষে অন্যের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং বলা যেতে পারে একজনের সাপেক্ষে অন্যজন স্থির। কিন্তু যদি ট্রেনলাইনের পাশে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি তাদেরকে দেখেন তবে ঐ ব্যক্তির সাপেক্ষে তাদের (দু বন্ধুর) অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রেনলাইনের পাশে দাড়ানো ব্যক্তির সাপেক্ষে তারা উভয়ই গতিশীল। আবার, দু বন্ধুর সাপেক্ষে (চলন্ত ট্রেনের যে কোনো যাত্রীর সাপেক্ষে) ট্রেনলাইনের পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিটিকে গতিশীল মনে হবে।

ঙ. **প্লাস্টিক সার্জারি :** অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহের ক্ষতিগ্রস্ত, বিকৃত অংশ বা টিস্যু নিরাময়, পুনঃসংস্থাপন বা স্বাভাবিকীকরণের ব্যবস্থাকে প্লাস্টিক সার্জারি বলে। এটি এক ধরনের শল্যচিকিৎসা, যার সাহায্যে জন্মগত বা কোনো দুর্ঘটনায় বিকৃত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাইরের চেহারা ঠিক করা হয়। বর্তমানে দগ্ধ মুখমণ্ডল পুড়ে যাওয়া টিস্যু, বিকৃত অঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও প্লাস্টিক সার্জারির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন।

৩ ক. **মানবদেহের ওপর বায়ুর চাপ ও তা নিয়ন্ত্রণ :** ১৬ বর্গফুট ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট স্বাভাবিক আকারের একজন মানুষের ওপর বায়ুর চাপ ১৫.১ টন বা ৪১৩ টন (প্রায়)। এটি মানুষের জন্য সহনাতীত। মানবদেহের ওপর বায়ুমণ্ডলের চতুর্দিকের চাপ সমান, চতুর্দিকের বায়ুর চাপ সমান হওয়ায় একদিকের চাপ অপরদিকের চাপকে নিষ্ক্রিয় করে। মানুষের শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে এবং শরীরের চামড়ার লোমকূপের মধ্য দিয়ে সর্বদা বায়ু প্রবেশ করে। ফলে ভিতরের বায়ু ওপরের বায়ুর চাপকে নিষ্ক্রিয় করে। এভাবে বায়ুর প্রচণ্ড চাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে মানুষের সহনীয় পর্যায়ে থাকে।

খ. **অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড :** দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও দেহে নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষার জন্য কয়েকটি এমাইনো এসিড প্রয়োজন। অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড দেহে বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে সংশ্লেষ হতে পারে না। খাদ্য থেকে এই এমাইনো এসিডগুলো সংগ্রহ করতে হয়। অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড ছাড়া দেহের বৃদ্ধি হয় না বলে খাদ্য থেকে এমাইনো এসিডগুলো পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। এজন্য এদেরকে অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বলা হয়। মানব দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড ৮টি—

ক. ট্রিপটোফ্যান (Tryptophan)	ঙ. লিউসিন (Leucine)
খ. ফিনাইল অ্যালানিন (Phenylalanine)	চ. আইসোলিউসিন (Isoleucine)
গ. লাইসিন (Lysine)	ছ. থ্রিওনিন (Threonine)
ঘ. ভ্যালিন (Valine)	জ. মেথিওনিন (Methionine)

গ. **মানুষের লম্বা ও বেঁটে হওয়ার কারণ :** লম্বা বা বেঁটে হওয়া নির্ভর করে বংশগত বৈশিষ্টের ওপরে, যা আসে বাবা ও মায়ের ক্রোমোজোম থেকে। বংশগত কারণ ছাড়াও গ্রোথ

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৩

1. (a) কম্পিউটার একটি অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র। ইলেকট্রনিক সংকেতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে কম্পিউটারের ভাষা। গণিতের বাইনারি পদ্ধতিতে যে কোনো সংখ্যাকে 1 এবং 0 দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এরূপ বাইনারি যে কোনো সংখ্যাকে ইলেক্ট্রনিক অন/অফ করে প্রকাশিত ভাষাই হলো ইলেকট্রনিক ল্যাঙ্গুয়েজ বা কম্পিউটারের ভাষা। বাইনারি হলো এমন সংখ্যা পদ্ধতি, যাতে যে কোনো সংখ্যাকে ০ এবং ১ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন : ২৯ কে ১১১০১ দ্বারা, ২০৩ কে ১১০০১০১১ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এভাবে যে কোনো সংখ্যাকে ১ এবং ০ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কম্পিউটার কেবল ইলেকট্রনিক সংকেত অর্থাৎ সার্কিটে বিদ্যুৎ আছে কি নেই তা বোঝে। অর্থাৎ কম্পিউটার শুধু দুটি অবস্থা বোঝে। বাইনারি 1 দ্বারা বিদ্যুৎ আছে (On) এবং 0 দ্বারা বিদ্যুৎ নেই (Off) এর উপর ভিত্তি করেই কম্পিউটারের ভাষা তৈরি করা হয়েছে। এভাবে যে কোনো শব্দ বা চিহ্ন কম্পিউটারকে বোঝার উপযোগী করে অর্থাৎ 0 এবং 1 এ রূপান্তরিত করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজে।

(b) টাইম শেয়ারিং (Time Sharing) এক ধরনের স্থানীয় বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পদ্ধতির জন্য ব্যবহৃত অপারেটিং সিস্টেম। টাইম শেয়ারিং নেটওয়ার্ক তৈরি হয় সার্ভারকে কেন্দ্র করে। টাইম শেয়ারিং পদ্ধতিতে দুই বা ততোধিক ব্যবহারকারী নিজ নিজ টার্মিনালে বসে তাদের স্ব-স্ব প্রোগ্রাম একটি কম্পিউটারের সিপিইউতে প্রক্রিয়াকরণ করতে পারেন। প্রত্যেক ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রসেস করে। শেষ ব্যবহারকারী প্রোগ্রামটি প্রসেস করার পর আবার প্রথম ব্যবহারকারীর প্রোগ্রাম প্রসেস করার জন্য ফিরে আসে। এভাবে চলতে থাকে যতক্ষণ না সব প্রোগ্রাম কার্যকরী করা শেষ হয়।

(c) ক. আইবিএম-এ DOS এবং চিত্রভিত্তিক উইন্ডোজ দুই পরিবেশেই কাজ করা যায়। কিন্তু এপল ম্যাকিনটোশের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়েছে শুধু চিত্রভিত্তিক GUI (Graphical User Interface) যা বর্ণভিত্তিক থেকে খুবই সহজ।

খ. আইবিএম কম্পিউটারে ইন্টেল বা অন্যান্য কোম্পানির তৈরি ইন্টেলের অনুরূপ প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। এপল ম্যাকিনটোশে মটোরোলার তৈরি প্রসেসর ব্যবহৃত হয়।

গ. এপল ম্যাকিনটোশ শুধুমাত্র Apple নামক একটি কোম্পানি তৈরি করে বলে এর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু IBM অনেক দেশেই তৈরি হয়। তাই প্রতিযোগিতার জন্য এদের দাম দিন দিন কমে যাচ্ছে।

(d) ডিভিডির পূর্ণ রূপ হচ্ছে Digital Versatile Disk বা Digital Video Disk। সিডি-রম প্রযুক্তিকে স্থলাভিষিক্ত করার জন্য ডিভিডি নামক নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ডিভিডি সিডি রম-এর চাইতে বহুগুণ বেশি ডেটা ধারণ করতে পারে। সিডিতে এক পার্শ্বে ডেটা সংরক্ষণ করা হয় কিন্তু ডিভিডিতে এক পার্শ্বে কিংবা উভয় পার্শ্বেই ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। আবার ডিভিডিতে সিঙ্গেল লেয়ার কিংবা ডবল লেয়ার ডেটা সংরক্ষণ করা যায়। এসব কারণে সিডি রমের উন্নততর ডেটা সংরক্ষণ ব্যবস্থা হচ্ছে ডিভিডি। একটি ডিভিডিতে ৪.৭ গিগাবাইট থেকে ১৭ গিগাবাইট পর্যন্ত ডেটা সংরক্ষণ করা যায়।

ডিভিডি সিডি রমের মতোই অডিও-ভিডিও ধারণ করতে সক্ষম। একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য মুভি সংরক্ষণ করার জন্য একটি সিঙ্গেল সাইডের ডিভিডিই যথেষ্ট। ডিভিডি ড্রাইভ প্রচলিত সিডি

ঘ. **লিফটে নামার সময় ওজন কমে যাওয়ার কারণ :** লিফটে নিচের দিকে নামার সময় লোকের ওজন নিচের দিকে ক্রিয়া করে। অপরদিকে লিফটের প্রতিক্রিয়া বল ওপরের দিকে ক্রিয়া করে। কিন্তু নিচে নামার সময় লিফটের প্রতিক্রিয়া বল কমে যায়। প্রতিক্রিয়া বল কমে যাওয়ার কারণে লিফটে নামার সময় ওজন কমে যায় বলে মনে হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বল, $R = m(g-f)$। যদি $g = f$ হয় অর্থাৎ লিফটটি যদি মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g-এর সমান ত্বরণে নিচে নামতে থাকে তাহলে লোকটির কোনো ওজন নেই বলে মনে হবে।

ঙ. **শব্দ দূষণ :** শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের ওপরে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই শব্দ দূষণ বলে। শব্দ পরিমাপের একক ডেসিবল। পূর্ণ বয়স্ক একজন লোক ৬০-৭০ ডেসিবল মাত্রার শব্দ সহ্য করতে পারে। ৭০-৭৫ ডেসিবল অতিক্রম করলেই তাকে দূষণের পর্যায় বলে গণ্য করা যায়। যানবাহনের জোরালো হর্ন, নির্বিচারে লাউড স্পিকারের ব্যবহার, উড়োজাহাজের শব্দ, আবাসিক এলাকায় কল কারখানার অবস্থান, প্রচণ্ড কোলাহল ইত্যাদি শব্দ দূষণের মূল কারণ।

শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিক : শব্দ দূষণ মানবদেহে নিঃশব্দ ঘাতকের মতো কাজ করে। শব্দ দূষণে মানুষের মানসিক ও শারীরিক বিপত্তি ঘটতে পারে; রক্তচাপ ও হৃদকম্পন ব্যাহত হয়; শ্রবণশক্তি কমে আসে ও বধির হওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। এছাড়া কণ্ঠনালীর প্রদাহ, আলসার, মস্তিষ্কের রোগও হতে পারে। শব্দের তীব্রতা অনুযায়ী ভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম বিরক্তি ভাব, ক্রোধ প্রবণতা, মানসিক উত্তেজনা, পড়াশোনা ও কর্মনিবিষ্টতায়ও বিঘ্ন ঘটে। অনবরত শব্দ দূষণের শিকার হলে শিশুদের ভাষাগত সমস্যা ছাড়া বুদ্ধিমত্তা ও হ্রাস পেতে পারে।

৫. ক. **বিগ ব্যাং তত্ত্ব :** বিগ ব্যাং বা প্রচণ্ড নিনাদ বা মহাবিস্ফোরণ নকশা হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের মহাবিস্ফোরণ বা আর্তনাদ যা থেকে সময়, স্থান ও পদার্থের সৃষ্টি। প্রথমে এ মহাবিশ্ব ছিল অবিশ্বাস্যভাবে ঘন ও উত্তপ্ত। পরে এটি যখন বাইরের দিক থেকে প্রসারিত হতে থাকে তখন ছায়াপথ ও নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব প্রসারমান। মহাবিস্ফোরণের সময়কাল আমাদের পার্থিব সময় হিসেবে ১৫০০ কোটি বছর থেকে ২০০০ কোটি বছর অতীত হিসেবে ধরা হয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী অবশ্য এটিকে আজ থেকে ১৭.৭ শত কোটি বছর আগের বলে হিসাব করেছেন। বেলজীয় নভোবিজ্ঞানী জর্জ লেমিট্রি ১৯২৭ সালে জানান মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে।

বিগ ব্যাং-এর আগের মুহূর্তটিতে মহাবিশ্ব সময়বিহীন এক শূন্যতায় ঝুলে থাকা ক্ষুদ্র মটরদানার মতো জিনিস ছিল। এ ক্ষুদ্র দানাটি এর পরের কয়েক মুহূর্ত দ্রুত প্রসারিত হতে থাকে। এই অবস্থাটিকে বলা হয় ইনফ্লেশন বা স্ফীতি।

খ. **কুরি বিন্দু :** কোনো একটি চুম্বককে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার অধিক উত্তপ্ত করলে এটির চুম্বকত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এ তাপমাত্রাকে কুরি বিন্দু বলে।

চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্ব না থাকার কারণ : চৌম্বক পদার্থের অণুগুলো এক একটি চুম্বক হওয়া সত্ত্বেও চৌম্বক পদার্থে চুম্বকত্ব থাকে না। তার কারণ হলো এ অণু চুম্বকগুলো চৌম্বক পদার্থের মধ্যে এলোমেলোভাবে সাজানো থাকে অর্থাৎ ক্ষুদ্র অণু চুম্বকগুলো একই দিকে মুখ করে থাকে না বলে পদার্থে চুম্বকত্ব থাকে না।

গ. সাবান ও ডিটারজেন্টের উৎপাদক উপাদান গত পার্থক্য :

i. সাবানের মৌলিক উপাদান হিসেবে চর্বি ও ক্ষার ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে ডিটারজেন্টে মৌলিক উপাদান হিসেবে চর্বি ও ক্ষারের সাথে বিভিন্ন সিনথেটিক পরিষ্কারক উপাদান ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগ ব্যবহার করা হয়।

ii. সাবানে মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) ব্যবহার করা হয় না। ডিটারজেন্টে মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) ও সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ব্যবহার করা হয়। ফলে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হয়।

ব্যবহারিক সুবিধার ক্ষেত্রে পার্থক্য

i. সাবান হলো ফ্যাটি এসিড মিশ্রিত গ্লিসারাইড। অন্যদিকে ডিটারজেন্ট হলো সিনথেটিক পরিষ্কারক।

ii. সাবান ঠাণ্ডা পানিতে কম দ্রবণীয়। ডিটারজেন্ট ঠাণ্ডা পানিতে বেশি দ্রবণীয়।

iii. সাবান খর পানিতে কম ফেনা দেয় ও কম কার্যকর কিন্তু ডিটারজেন্ট খর পানিতে বেশি ফেনা দেয় ও অধিক কার্যকর।

iv. সাবানের কঠিন তলের ভেতরে ঢোকার ক্ষমতা কম, কিন্তু ডিটারজেন্টের তা বেশি।

ঘ. কোলেস্টেরলের ক্ষতিকর দিক : আমাদের শরীরে রক্ত বয়ে চলে ধমনীর মধ্য দিয়ে। এই রক্তে যখন কোলেস্টেরল বেশি হয়ে যায় তখন ধমনীর গায়ে আঠার মতো করে এর প্রলেপ পড়তে থাকে। ধমনীর গায়ে যত পুরু করে প্রলেপ পড়ে রক্ত চলাচলের পথ ততই সরু হয়ে পড়ে। রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয়। এ সময় থেকে বুকে ব্যথা শুরু হতে পারে। কারণ রক্তই অক্সিজেনকে বহন করে আনে। আর হৃৎপিণ্ডে রক্তবাহী ধমনীতে বাধার সৃষ্টি হলে হৃৎপিণ্ডে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পৌছে না। এভাবে নানা হৃদরোগের সূচনা হয়। এসব রোগকে এককথায় 'কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজ' (Cardio vascular disease) বলে।

রক্তবাহী নালীর গায়ে যখন স্নেহপদার্থের প্রলেপ পড়তে থাকে তখন নালীর ভিতরের দেয়ালের স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায়। নালীর দেয়াল খসখসে হয়ে ওঠে। অনেক সময় পুরু হয়ে জমে থাকা প্রলেপে ফাটল ধরে। এ ধরনের অবস্থা রক্তবাহী নালীর যে কোনো স্থানে হতে পারে। তবে বেশিরভাগ সরু নালিকায় এবং নালী যেখানে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয় সেখানে প্রলেপ জমে বেশি। খসখসে প্রলেপ বা ফাটলে সহজেই রক্তকণিকা এসে আটকে যেতে পারে। যার ফলে জমাট রক্ত তৈরি হয়। জমাট রক্ত আকারে বেশি বড় হলে রক্তনালীর মুখ আটকে ফেলে। ছোট হলে রক্তস্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে থাকে। পরে কোনো সরু নালীমুখে এসে আটকে যায়। হৃদপিণ্ডে রক্তবাহী কোনো নালীতে যদি এ ঘটনা ঘটে তাহলে রক্ত আর হৃৎপিণ্ডে গিয়ে অক্সিজেন পৌছে দিতে পারে না। এভাবে অক্সিজেনের অভাবে অনেক সময় হৃৎপিণ্ডের অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে যায়। এ রোগকে বলে 'মাইলোকার্ডিয়া ইনফার্কশন' (Milocardia infarction)। একইভাবে মস্তিষ্কে এ ঘটনা ঘটলে তাকে স্ট্রোক বলে।

৬. ক. নিচে বৈদ্যুতিক কোষ এবং ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য দেয়া হলো :

বৈদ্যুতিক কোষ	ব্যাটারি
১. যে যন্ত্রের সাহায্যে রাসায়নিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তাকে বৈদ্যুতিক কোষ বলে। এটি একটি সরলতম একক কোষ। যেমন– ভোল্টার কোষ।	১. প্রকৃত পক্ষে ব্যাটারি বলতে একাধিক কোষের সমবায়কে বোঝায়। যেমন– লেড এসিড কোষ
২. 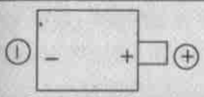 চিত্র : বৈদ্যুতিক কোষ	২. 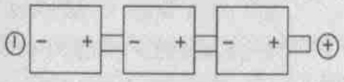 চিত্র : ব্যাটারি
৩. প্রতীক : 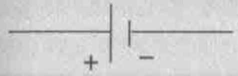	৩. প্রতীক :
৪. আকারে ছোট ও হালকা।	৪. আকারে বড় ও ভারী।
৫. প্রাপ্ত ভোল্টেজ কম।	৫. প্রাপ্ত ভোল্টেজ বেশি।

খ. সমুদ্রের পানিতে নানা ধরনের লবণ দ্রবীভূত থাকে। তাই সমুদ্রের পানির ঘনত্ব নদীর পানি বা পুকুরের পানির চেয়ে বেশি। ঘনত্ব বেশি হওয়ার কারণে সমুদ্রের পানির প্লবতা নদী বা পুকুরের পানির প্লবতার চেয়ে বেশি। ফলে সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটার সময় সাতারুর শরীরের উপর প্লবতা বেশি হওয়ায় শরীর হালকা বলে মনে হয়। এ কারণে নদী বা পুকুরের পানির তুলনায় সমুদ্রের পানিতে সাঁতার কাটা সহজ।

গ. এনালগ : 'এনালগ' শব্দটি দ্বারা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে এনালগ সিগনাল কে বুঝায়। এটি এমন এক ধরনের সাংকেতিক প্রক্রিয়া, একটানা চলমান পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ যা কোনো মাধ্যমে বিচরণে সক্ষম। এটি sinusoidal বা nonsinusoidal হতে পারে এবং এর মান একটি সর্বনিম্ন মান হতে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চমান পর্যন্ত হতে পারে।

যেসব ইলেকট্রনিক ডিভাইস এনালগ সিগনাল ব্যবহার করে কাজ করে সেগুলোকে এনালগ ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলে। যেমন : TV, স্পিডোমিটার ইত্যাদি।

ডিজিটাল : 'ডিজিটাল' শব্দটি দ্বারা ইলেকট্রনিক সরঞ্জামের ক্ষেত্রে ডিজিটাল সিগনালকে বুঝায়। এটি এমন এক ধরনের থেমে থেমে যাওয়া সংকেত যা বৈদ্যুতিক সংকেত 'ON' এবং 'OFF'-এর মতো কাজ করে। ডিজিটাল সিগনাল কেবল 0 এবং 1 নিয়ে কাজ করে। '0' দ্বারা OFF state এবং 1 দ্বারা ON state কে বুঝায়।

যেসব ইলেকট্রনিক ডিভাইস ডিজিটাল সিগনাল ব্যবহার করে কাজ করে সেগুলোকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ডিভাইস বলে। যেমন : ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়ি ইত্যাদি।

ঘ. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস বিদ্যমান। বজ্রবৃষ্টির সময়ে বিদ্যুৎ ক্ষরণের ফলে বায়ুস্থ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত হয়ে প্রথমে নাইট্রিক অক্সাইড, পরবর্তীতে নাইট্রোজেন ডাই-

অক্সাইড এবং শেষে বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়ায় নাইট্রিক এসিড গঠিত হয়। উৎপন্ন নাইট্রিক এসিড বৃষ্টির পানির সাথে মাটিতে পড়ে এবং মাটির ক্ষারকীয় পদার্থের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন করে মাটিতে মিশে যায়। উদ্ভিদ মূল দ্বারা মাটি থেকে নাইট্রেট লবণ ও নাইট্রোজেন সার শোষণ করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনে পরিণত করে। প্রাণিকুল উদ্ভিদ থেকে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করে। এরূপে উদ্ভিদ থেকে প্রাণিদেহে প্রোটিনরূপে নাইট্রোজেন স্থানান্তরিত হয়। উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত্যুর পর তাদের মৃতদেহ ডিনাইট্রিফাইং জীবাণুর প্রভাবে বিয়োজিত হয়ে মুক্ত নাইট্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। এভাবে নাইট্রোজেন গ্যাস বায়ুমণ্ডল থেকে মাটিতে, মাটি থেকে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহে এবং অবশেষে উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহ থেকে বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসার প্রক্রিয়াকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নাইট্রোজেন চক্র না থাকলে মাটিতে নাইট্রেট লবণের অভাব হতো। নাইট্রেট লবণের অভাব হলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়ে কৃষির উৎপাদন হুমকির সম্মুখীন হতো। কাজেই কৃষিক্ষেত্রে নাইট্রোজেন চক্রের উপকারিতা অনস্বীকার্য।

মডেল টেস্ট ৫৪

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে] নম্বর

১. a. কম্পিউটার ভাষা বলতে আপনি কি বুঝেন? ২
   b. টাইম শেয়ারিং (Time sharing) কি? ২
   c. IBM এবং Apple computer এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৩
   d. DVD কি? ৩

২. a. Computer keyborad কি? এটা কিভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা করুন। ৪
   b. MICR কি? এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন। ৪
   c. VDU কি? ২

৩ a. সংক্ষেপে, তথ্যপ্রযুক্তির ইতিহাস আলোচনা করুন। ৫
   b. ডেটা (data) কি? বিভিন্ন প্রকার ডেটা সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৫

৪. a. আই.সি (I.C)-এর সুবিধাগুলো লিখুন। ৩
   b. আই.সি (I.C)-এর গঠন বর্ণনা করুন। ৭

৫. a. ট্রানজিস্টর এবং বিবর্ধক বলতে কি বুঝেন? ৩
   b. ট্রানজিস্টর কিভাবে বিবর্ধক হিসাবে ব্যবহার করা যায়? ৩
   c. Bipolar transistor কি? Bipolar transistor এবং FET-এর মধ্যে পার্থক্য লিখুন। ৪

হরমোনের প্রভাব লম্বা বা বেঁটে হওয়ার ওপর যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে। গ্রোথ হরমোন মস্তিষ্কে অবস্থিত পিট্যুইটারী গ্রন্থি থেকে বের হয়। অস্থি তৈরি করতে ও লম্বা অস্থির (Long bone) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই হরমোন। অস্থি তৈরির কাজ শেষ হওয়ার আগে এই হরমোনের ক্ষরণ বেশি হলে তৈরি হয় অতিকায় লম্বা মানুষ। অস্থি তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে এই হরমোন বেশি বেরুলে চওড়া হাড়যুক্ত মানুষের সৃষ্টি হয়। এই বৈশিষ্ট্যকে বলে অ্যাক্রোমেগালি (Acromegaly)। গ্রোথ হরমোনের ক্ষরণ খুব কম হলে তৈরি হয় বামনাকৃতি মানুষ। আবার, থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid) থেকে বেরুনো থাইরক্সিন ও ট্রাই-আয়োডোথাইরোনিন হরমোন দুটির ওপরেও মানুষের লম্বা বা বেঁটে হওয়া নির্ভর করে।

ঘ. **কীটপতঙ্গের আলোর প্রতি আকর্ষণ :** আলোক প্রবাহ থেকে নিঃসৃত অবলোহিত আলোক বিচ্ছুরণের ফলেই কীটপতঙ্গ সেদিকে আকর্ষিত হয়, বিশেষ করে পুরুষ পতঙ্গ। স্ত্রী পতঙ্গের পেটে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রন্থি থেকে ফোরাসন গন্ধযুক্ত অণুকণা নিঃসৃত হয়। এ অণুকণা থেকে কিছু অবলোহিত আলোক কণা বিচ্ছুরিত হয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। পুরুষ পতঙ্গগুলো এ বিকিরণের গন্ধে আকুল হয়ে স্ত্রী পতঙ্গের দিকে ধাবিত হয়। কোনো কোনো পুরুষ পতঙ্গ আলোর উৎসে স্ত্রী পতঙ্গের উপস্থিতি অনুমান করে আলোর শিখার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। এভাবে স্ত্রী পতঙ্গের সন্ধান করতে গিয়ে পুরুষ পতঙ্গগুলো আলোর প্রতি আকর্ষিত হয়। যদি কোনো আলোক উৎস অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ না করে তাহলে পতঙ্গরা সেদিকে ধাবিত হবে না।

৪. ক. **তামা সবুজ হওয়ার কারণ :** আর্দ্র বায়ুতে কপার বা তামা প্রথমে অক্সাইড ও পরে বাতাসের সালফারের সংস্পর্শে কপার সালফেটে পরিণত হয়। কপার সালফেট বা তুঁতের রং সবুজ। এজন্য তামার উপরিভাগ সবুজ হয়ে যায়।

সোহাগা কি : স্বর্ণকারদের বহুল ব্যবহৃত সোহাগা একটি সোডিয়াম যৌগ। একে বোরাক্স বা সোডিয়াম পাইরো বোরেট বলা হয়। এটি সোনা, রূপার অলঙ্কার তৈরির সময় ও ধাতু ঝালাইয়ের ক্ষেত্রে বিগালক হিসেবে বিভিন্ন পদার্থ পরীক্ষা করার কাজে, ভেষজ ঔষধে, জীবাণুনাশক, লন্ড্রিতে, অগ্নি নির্বাপক হিসেবে, কাচ ও সিরামিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

খ. **যে কারণে গ্রাফাইট অধাতু :** গ্রাফাইট একটি অধাতু। কারণ গ্রাফাইট—

১. অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে, যা একটি অম্লীয় অক্সাইড।
২. লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না বা বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে না।
৩. সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন হলেও আলো প্রতিফলন করে না।
৪. পিটিয়ে পাতে পরিণত করা যায় না, আঘাত করলে শব্দ উৎপন্ন হয় না।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে গ্রাফাইট ধাতুর মতো উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও অধাতু।

গ. **বর্ষাকালে লবণ গলে যাওয়ার কারণ :** বিশুদ্ধ খাদ্যলবণ গলে না। কিন্তু খাদ্য লবণের মধ্যে ভেজাল দ্রব্য থাকার ফলে বর্ষাকালে পরিবেশ থেকে পানি বাষ্প শোষণ করে তা গলে যায়। খাদ্য লবণের মধ্যে ভেজাল হিসেবে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম সালফেট ইত্যাদি থাকে। এরা শোষণ করে ফলে এদের সাথে খাদ্য লবণের মূল উপাদান সোডিয়াম ক্লোরাইডও গলে।

রমও পাঠ করতে পারে। এসব কারণেই ডিভিডির জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা ভিডিও ক্যাসেট কিংবা সিডির জায়গা দখল করে নিবে ডিভিডি। ডিভিডির মূল্যও সাধারণের নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে।

2. (a) **কী-বোর্ড :** এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় ইনপুট ডিভাইস। দেখতে অনেকটা টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের মতো। টাইপ রাইটারের কী-বোর্ডের বোতামগুলো শুধু অক্ষর টাইপ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। পক্ষান্তরে, কম্পিউটারের কী-বোর্ডের বোতামের সাহায্যে টাইপ ছাড়াও কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

কম্পিউটার কী-বোর্ডের সাথে অনুক্রমিক বা সিরিয়াল ইন্টারফেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করে। কী-বোর্ডের সাথে কম্পিউটারকে সংযুক্ত করার জন্য সাধারণত পাঁচ বা ছয় পিনের DIN সংযোজন ব্যবহার করা হয়। এ সংযোজনের মাধ্যমে আট বিট প্রস্থের ডেটা অনুক্রমিকভাবে বিনিময় করা হয়। কী-বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য যেমন কী-বোর্ডের অভ্যন্তরে মাইক্রোপ্রসেসর থাকে, তেমনি কম্পিউটার অভ্যন্তরে কী-বোর্ড সংক্রান্ত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানের জন্য কী-বোর্ড কন্ট্রোলার চিপ থাকে।

কী-বোর্ডে কোনো একটি কী চাপ দেয়ার মুহূর্তের মাঝেই সংশ্লিষ্ট অক্ষরটি মনিটরের পর্দায় প্রতীয়মান হয়। কোনো একটি অক্ষরের সাথে সংশ্লিষ্ট কী চাপ দেয়ার সময় থেকে মনিটরের পর্দায় অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত কি ঘটে তার প্রতি ধাপের পর্যানুক্রমিক বর্ণনা নিচে দেয়া হয়েছে।

১. কী-বোর্ডের অভ্যন্তরস্থ চিপ প্রথমে কোন কীটি চাপ দেয়া হয়েছে তা নির্ধারণ করে।
২. কী-বোর্ড কন্ট্রোলার চিপ এরপর কীর সাথে জড়িত কী-কোডট কী-বোর্ড বাফারে (Keyboard buffer) সংরক্ষণ করে এবং একই সাথে কী-বোর্ড ক্যাবল দিয়ে কী-কোডটি কম্পিউটারকে পাঠায়।
৩. কী-বোর্ড কন্ট্রোলার কীবোর্ডের জন্য নির্ধারিত ইনপুট মুখ দিয়ে কী কোডটি পড়ে এবং কী বোর্ডের নকশার ওপর ভিত্তি করে কী-কোডকে স্ক্যান কোডে রূপান্তরিত করে।
৪. কী-বোর্ড কন্ট্রোলার এরপর ৯ নং বায়োস ইন্টেরাপ্টের মাধ্যমে কম্পিউটারকে একটি স্ক্যান কোডের উপস্থিতির কথা অবগত করায়। বায়েসে এ পর্যায় থেকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।
৫. কী-বোর্ডের ইন্টেরাপ্ট হ্যান্ডলার স্ক্যান কোডটি পড়ে এবং কোন কীটি চাপ দেয়া বা ছেড়ে দেয়া হয়েছে তা নির্ধারণ করে এবং স্ক্যান কোডটি কোন কন্ট্রোল অক্ষরের ইন্টেরাপ্ট হ্যান্ডলার ঐ কন্ট্রোল অক্ষরের নির্ধারিত কাজটি সমাপন করে। অর্থাৎ অক্ষরটি মনিটরে দেখা যায়।

(b) এক্ষেত্রে ম্যাগনেট ইংক বা ফেরোসোফেরিক অক্সাইডযুক্ত কালির সাহায্যে লেখা হয়। এ কালিতে লেখা কাগজ শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রাখলে কালির ফেরোসোফেরিক অক্সাইড (Fe_2O_3) চুম্বকে পরিণত হয়। এরপর এ বর্ণচুম্বকগুলো তড়িৎ চৌম্বকীয় আবেশের দ্বারা তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন করে। এ আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান থেকে MICR কোন বর্ণ পড়া হচ্ছে বুঝতে পারে ও কম্পিউটারে তা সঞ্চিত রাখে। এ পদ্ধতিতে ব্যাংকের চেকের চেক নম্বর লেখা ও পড়া হয়। MICR প্রতি মিনিটে আড়াই হাজারের বেশি চেক পাঠ করে কম্পিউটারের প্রসেসরে প্রেরণ করতে পারে।

MICR-এর সুবিধা :

১. ব্যাংক চেক যদি দলিত-মথিত, ভাঁজযুক্ত বা স্টাম্পড (Stamped) করাও হয়ে থাকে তবু MICR সূক্ষ্মভাবে চেক নাম্বার পড়তে পারে।
২. দ্রুত কাজ সম্পন্ন করে।

MICR-এর অসুবিধা :

১. MICR গাণিতিক দশটি সংখ্যা এবং বিশেষ সংখ্যা ছাড়া কিছুই পড়তে পারে না।

(c) VDU-এর পূর্ণরূপ ভিজ্যুয়াল ডিসপ্লে ইউনিট। এটিকে ইনপুট ও আউটপুট উভয় ব্যবস্থা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। VDU-তে একটি মনিটর ও একটি কী বোর্ড থাকে। কী বোর্ডের সাহায্যে ইনপুটকৃত ডেটা মনিটরে আউটপুট হিসেবে দেখা যায়। বর্তমানে বিভিন্ন শ্রেণীর কম্পিউটারে VDU বেশ প্রচলিত ইনপুট ও আউটপুট ব্যবস্থা।

3. (a) তথ্যপ্রযুক্তি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে যোগাযোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। চোখে দেখে, কথা বলে ও শুনে, আকার ইঙ্গিতে তথ্য আদান-প্রদানের পর মানুষ এসব তথ্য সংরক্ষণের উপায় বের করার চেষ্টা করে। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে, ছবি এঁকে, গাছের বাঁকলে চিহ্ন দিয়ে তথ্য সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়। পরে এসব তথ্যকে আরো স্থায়ী রূপ দিতে তৈরি হয় কাগজ ও কালি। এতেই সংরক্ষিত হতো তথ্যাদি। ধীরে ধীরে ছাপাখানার উদ্ভবের ফলে তথ্যব্যবস্থায় আসে অভাবনীয় সাফল্য। এতে তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ, সংরক্ষণ, আদান-প্রদান ও চর্চার সুবিধা সৃষ্টি হলো। ছাপাখানার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকল তথ্যের প্রচার এবং প্রসার ততই হলো বিস্তৃত। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানের সাথে সাথে তথ্যের আদান-প্রদানও বাড়তে থাকে। একই সাথে উদ্ভব ঘটতে শুরু করে নানা ধরনের গণনা যন্ত্রের (অ্যাবাকাস, পাঞ্চকার্ড, যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর)। এসব যন্ত্রাদি যুগের পর যুগ আরো উন্নত হতে থাকে। উদ্ভব ঘটে ইন্টিগ্রেটর সার্কিট (IC), মাইক্রোপ্রসেসরের মতো উন্নত প্রযুক্তির, যা ব্যবহার করে নানা ধরনের যোগাযোগ যন্ত্রপাতি তৈরি করা সহজ হয়। টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আরো পরিবর্তন আসতে শুরু করে। দূরবর্তী স্থানে কথা বলা ও যোগাযোগ সম্ভবপর হয় এতে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর যে কোনো স্থানে এখন টেলিফোনে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব হয়েছে। রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের ফলে ছবিসহ তথ্য সম্প্রচার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। ধীরে ধীরে এগুলো শক্তিশালী তথ্য মাধ্যম রূপে আবির্ভূত হয়। প্রযুক্তির উৎকর্ষের ধারাবাহিকতায় উদ্ভব ঘটে কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের। এতে তথ্য সম্প্রচার ও আদান-প্রদান পদ্ধতি হয় আরো লাগসই। তথ্যের আদান-প্রদানের হারও যায় বেড়ে। স্যাটেলাইট ব্যবহার করে মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়। এর ফলে একইসাথে কয়েক লক্ষ ফোন কল, টেলিভিশনের একাধিক চ্যানেল সম্প্রচার, চিত্রসহ বিবিধ তথ্যাদি আদান-প্রদান করা যায়। বর্তমানে ফ্যাক্স, সেলুলার ফোন, পেজার, স্যাটেলাইট টেলিফোনের মতো উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি পণ্য উদ্ভাবিত হয়েছে। ফলে তথ্যের আদান-প্রদানের গতিও যাচ্ছে বেড়ে।

ফাইবার অপটিক ক্যাবলের উদ্ভব বিপুল পরিমাণ তথ্যের আদান-প্রদানকে প্রচণ্ড গতিশীল করে তুলেছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থায় এসেছে অভাবনীয় সাফল্য। এ প্রযুক্তিতে আলোকরশ্মি পরিবাহী সূক্ষ্ম ফিলামেন্টের তৈরি স্বচ্ছ তারের ভেতর দিয়ে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিসরণের মাধ্যমে একই সাথে বয়ে নেয়া যায় অসংখ্য টেলিফোন কল, টেলিভিশন সংকেত আর বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত। আজকাল বিপুল পরিমাণ উপাত্ত পরিবহনে সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে আন্তঃমহাদেশীয় ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপিত হয়েছে। কম্পিউটার নির্ভর

ইন্টারনেট প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে সমগ্র বিশ্বটিই আজ এক বিশাল তথ্য আঁকারে পরিণত হয়েছে। বিশ্বজুড়ে আজ সৃষ্টি হয়েছে বিস্তৃত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক। বিশ্বের কম্পিউটারগুলো আজ একে অন্যের সাথে এ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত রয়েছে। মুহূর্তেই তথ্য আদান-প্রদান, টেলিকনফারেন্সিং, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স, কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশ্বের যে কোনো স্থানে ফোনে কথা বলার সুযোগও এতে স্থাপিত হয়েছে। তবে সার্বিকভাবে কম্পিউটারের ওপর নির্ভর করেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার বিস্তৃতি ঘটলেও একে একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তির উপাদান বলা হয় না বরং বিভিন্ন প্রযুক্তির সম্মিলিত রূপই হচ্ছে তথ্যপ্রযুক্তি। দীর্ঘদিন ধরে এটি বিকাশ লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে পৌছেছে।

(b) সুনির্দিষ্ট আউটপুট বা ফলাফল পাওয়ার জন্য প্রসেসিংয়ে ব্যবহৃত কাঁচামালসমূহকে ডেটা বা উপাত্ত বলে। ডেটা একটি একক ধারণা অর্থাৎ ইনফরমেশন বা তথ্যের ক্ষুদ্রতম এককই ডেটা। ডেটাকে প্রসেস করেই ইনফরমেশন পাওয়া যায়।

Datum শব্দের বহুবচন হলো ডেটা (Data) যার অর্থ ফ্যাক্ট (Fact)। কোনো ধারণা (Idea), বস্তু (Object), শর্ত (Condition), অবস্থা (Situation) ইত্যাদির ফ্যাক্ট, চিত্র (Figure) বা বর্ণনা (Description) ডেটার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি কার্যকলাপ ডেটার জন্ম দেয়। কোনো ঘটনায় (Event) বহু ডেটা জড়িত থাকে। ডেটা এক বা একাধিক বর্ণ, চিহ্ন বা সংখ্যা বিশিষ্ট হতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের ডেটা : বিষয় (Content) এবং প্রকাশ পদ্ধতি (representation) অনুযায়ী ডেটা অনেক রকমের হতে পারে। যেমন :

নিউমেরিক (Numeric) ডেটা : সংখ্যা দিয়ে ডেটা প্রকাশ করা হয়, যেমন— বয়স, ওজন, আয়, লোকসংখ্যা ইত্যাদি।

অ্যালফাবেটিক (Alphabetic) ডেটা : অক্ষর দিয়ে যে ডেটা প্রকাশ করা হয়, যেমন— নাম, পদ ইত্যাদি।

অ্যালফানিউমেরিক (Alphanumeric) ডেটা : যে ডেটাতে অক্ষর এবং সংখ্যা দুটোই ব্যবহার করা হয়, যেমন— গাড়ির নম্বর। এ ধরনের ডেটা অনেক দিন ধরে প্রচলিত। কম্পিউটার আসার পর নতুন কয়েক ধরনের ডেটা তৈরি হয়েছে। যেমন :

গ্রাফিক (Graphic) ডেটা : ছবি বা রেখা সংক্রান্ত ডেটা, যেমন— ফটোগ্রাফ, চার্ট, ড্রইং ইত্যাদি।

অডিও (Audio) ডেটা : শব্দ সম্বন্ধীয় ডেটা, যেমন— গান, কথা ইত্যাদি।

ভিডিও (Video) ডেটা : চলমান ছবি সম্বন্ধীয় ডেটা, যেমন— সিনেমা, অ্যানিমেশন, কোনো অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং ইত্যাদি।

এছাড়া মাধ্যম হিসেবেও ডেটার প্রকারভেদ হতে পারে। যেমন :

ডিজিটাল (Digital) ডেটা : কম্পিউটার ডেটা প্রসেস করার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যমের ডেটা লাগে। এ মাধ্যমের নাম হলো ডিজিটাল মাধ্যম। তাই, কম্পিউটারে ব্যবহারযোগ্য সব ডেটাই ডিজিটাল ডেটা।

নন-ডিজিটাল (Non digital) ডেটা : আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ডেটা যে মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায়, সেগুলোর প্রায় কোনোটিই ডিজিটাল ডেটা নয়। যেমন— কাগজে লেখা অক্ষর এবং সংখ্যা, ফটোগ্রাফ, ফিল্মের ছবি, আঁকা ছবি, যন্ত্রের শব্দ, গান, কথা ইত্যাদি। এগুলো সবই নন-ডিজিটাল ডেটা এবং সরাসরি কম্পিউটারে ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। এসব বিভিন্ন মাধ্যমের নন-ডিজিটাল ডেটাকে ডিজিটাল ডেটাতে পরিবর্তিত করে তবেই কম্পিউটারে ব্যবহার করা যায়।

4. (a) **আইসির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো রয়েছে :**

১. স্বল্পসংখ্যক সংযোগ থাকায় এর বিশ্বাসযোগ্যতা (reliability) অনেক বেশি হয়।
২. একটি ক্ষুদ্র আইসির মধ্যে বহুসংখ্যক বিভিন্ন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস বা পার্টস খুবই অল্প জায়গার মধ্যে তৈরি করা হয় বলে এর আকার অত্যন্ত ছোট হয়।
৩. ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য ওজনও খুব সামান্য হয়।
৪. তাপমাত্রার কম-বেশি হলেও এর কার্যকারিতা সহজে নষ্ট হয় না।
৫. আইসি চালনার জন্য খুব সামান্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন হয়। ফলে অর্থের সাশ্রয় হয়।
৬. বিভিন্ন পার্টস ক্রয় করে ডিভাইস বা বর্তনী তৈরি করলে যে খরচ পড়বে তার চেয়ে কম খরচে আইসি পাওয়া যায়।
৭. বহু সংখ্যক আইসি একসাথে তৈরি করা হয় বলে এদের মধ্যে গুণাবলীর পার্থক্য থাকে না বললেই চলে।
৮. মেরামতের ঝামেলামুক্ত এবং কম খরচে পরিবর্তন করা যায়।

(b) আইসি তৈরির জন্য মূলত চারটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা– ক. মনোলিথিক; খ. পাতলা ফিল্ম; গ. স্থূল ফিল্ম এবং ঘ. হাইব্রিড বা বর্ণ সঙ্কর পদ্ধতি। বাস্তবে প্রথম পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত বলে এ পদ্ধতিটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হলো :

মনোলিথিক আইসি তৈরির পদ্ধতি : মনোলিথিক আইসিতে বর্তনীর সব উপাদান এবং এদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ একটি একক পাতলা ওয়েফার (thin wafer)-এর উপর তৈরি করা হয়। এ ওয়েফারকে 'সাবস্ট্রেট' (substrate) বলে। মনোলিথিক আইসি তৈরিতে নিম্নোক্ত পর্যায়ক্রমিক ধাপ অনুসরণ করা হয় :

১. **p-সাবস্ট্রেট তৈরি :** আইসি তৈরির এটি প্রথম ধাপ। প্রথমে একটি অনেক বড় আকারের p-টাইপ সিলিকন কেলাস তৈরি করা হয়। এরপর ডায়মণ্ড করাত দিয়ে এ কেলাস থেকে প্রচুর সংখ্যক খুবই পাতলা ওয়েফার কেটে নেয়া হয়। ওয়েফারের বেধ সাধারণত 200 μm করা হয়। এ ওয়েফারের একপৃষ্ঠ মসৃণভাবে ঘষা হয়, যাতে বাহ্যিক কোনো অপদ্রব্য মিশ্রিত না থাকে। এ ওয়েফারকে বলা হয় 'সাবস্ট্রেট'।

২. **অ্যাপিট্যাক্সিয়াল n-স্তর (Epitaxial n-layer) তৈরি :** এ ধাপে সাবস্ট্রেটটি ডিফিউশন (Diffusion) বা ব্যাপন চুল্লিতে স্থাপন করা হয়। এরপর সিলিকন পরমাণু এবং পঞ্চযোজী পরমাণুর মিশ্রণ গ্যাস ওয়েফারের উপর দিয়ে উচ্চতাপে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে সাবস্ট্রেটের উত্তপ্ত পৃষ্ঠে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি স্তর জমা হয়। এ পাতলা স্তরকে 'অ্যাপিট্যাক্সিয়াল স্তর' (epitaxial layer) বলে। এ স্তর সাধারণত 10 μm বেধের হয়। এ পাতলা স্তরের মধ্যে আইসির বিভিন্ন অংশ (Components) তৈরি করা হয়।

৩. **অক্সাইড কোটিং বা মাস্কিং (Oxide coating or Masking) :** বাইরের কোনো পদার্থ দ্বারা যাতে অ্যাপিট্যাক্সিয়াল স্তর দূষিত বা সংক্রমিত না হতে পারে এবং বিভিন্ন পার্টস যাতে একটির সাথে অন্যটি লেগে না যায়, তাই এর ওপর সিলিকন ডাই-অক্সাইডের একটি খুবই পাতলা স্তর (প্রায়1 μm বেধ) তৈরি করা হয়। উচ্চতাপে অক্সিজেন গ্যাস অ্যাপিট্যাক্সিয়াল স্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত করে এ অক্সাইড স্তর তৈরি করা হয়। ওয়েফারের বিভিন্ন অংশ থেকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাহায্যে অক্সাইড স্তর সরিয়ে দেয়া হয় এবং কেবলমাত্র সে বিশেষ বিশেষ স্থানে ডিফিউশন প্রক্রিয়ায় আইসির বিভিন্ন

কম্পোনেন্ট (component) বা পার্টস স্থাপন করা হয়। বিশেষ বিশেষ জায়গায় অক্সাইড স্তর সরানোর প্রক্রিয়াকে 'এচিং' (etching) করা বলা হয়। নির্দিষ্ট অবস্থানে এচিং পদ্ধতি অনুসরণ করে অক্সাইড স্তর সরিয়ে বিভিন্ন প্রান্ত সংযোজন তৈরি করা হয়।

এর প্রত্যেকটি এক একটি চিপ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একটি ওয়েফার থেকে অনেকগুলো একই ধরনের চিপ তৈরি করা সম্ভব। এ চিপই হলো আইসি, যার মধ্যে বর্তনীর বহু কম্পোনেন্ট সংযোজিত থাকে।

5. (a) দুই ধরনের অর্ধপরিবাহী দিয়ে গঠিত ইলেকট্রনিক যন্ত্র হচ্ছে ট্রানজিস্টর। ট্রানজিস্টরে একই অর্ধপরিবাহীর দুটি স্তরের মাঝখানে অপর একটি অর্ধপরিবাহী বস্তুর স্তর স্থাপন করা হয়। যদি দুটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে একটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহী বসানো হয় তবে তাকে n-p-n ট্রানজিস্টর বলে। একইভাবে দুটি p-টাইপ অর্ধপরিবাহীর মাঝে একটি n-টাইপ অর্ধপরিবাহী বসালে p-n-p ট্রানজিস্টর তৈরি হয়। বৈদ্যুতিক সংকেতকে নিয়ন্ত্রিত ও বিস্তারিত করার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট ইত্যাদিতে ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত হয়।

অ্যামপ্লিফায়ার : অ্যামপ্লিফাই (Amplify) শব্দটির অর্থ বিবর্ধন। যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (Input-এর) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে (Output-এ) বিবর্ধিত (Amplify) করে সে যন্ত্রকে অ্যামপ্লিফায়ার বলে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(b) যে যন্ত্র এর অন্তর্গামীতে (Input) প্রদত্ত সংকেতকে বহির্গামীতে বিবর্ধিত (amplify) করে তাকে বলা হয় অ্যামপ্লিফায়ার। ইলেকট্রনিক অ্যামপ্লিফায়ার ক্ষুদ্র অন্তর্গামী সংকেতকে বৃহৎ বহির্গামী সংকেতে পরিণত করে। ট্রানজিস্টর অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কারণ তড়িৎ প্রবাহের পরিবর্তন বৃদ্ধি করতে বা বিবর্ধিত করতে ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। অন্তর্গামী হতে পারে তড়িৎপ্রবাহ বা ভোল্টেজ। ট্রানজিস্টরের পীঠ প্রবাহের (base current) সামান্য পরিবর্তন সংগ্রাহক প্রবাহের (collector current) বিরাট পরিবর্তন ঘটায়। ট্রানজিস্টর পীঠ-প্রবাহকে ৫০ থেকে ১০০ গুণ বাড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাহক প্রবাহ হিসেবে প্রদান করতে পারে। এ জন্য বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীতে ট্রানজিস্টরকে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(c) সাধারণ ট্রানজিস্টরে হোল ও ইলেকট্রনিক উভয়েই বিদ্যুৎ পরিবহনে অংশ নেয়। এজন্য এদেরকে বাইপোলার ট্রানজিস্টর বলে।

ফিল্ড ইফেক্ট ট্রানজিস্টর (FET) এবং বাইপোলার ট্রানজিস্টরের পার্থক্য নিচে আলোচনা করা হলো :

১. ফেটে (FET) শুধু এক ধরনের বাহক কাজ করে, এজন্য একে বলা হয় ইউনিপোলার (unipolar) ট্রানজিস্টর; পক্ষান্তরে সাধারণ ট্রানজিস্টরের ক্ষেত্রে উভয় ধরনের বাহক কাজ করে, এজন্য একে বাইপোলার (bipolar) ট্রানজিস্টর বলে।

২. ফেটের গেটে বিপরীত বায়াস প্রয়োগ করা হয় ফলে ইনপুট রোধ উচ্চমানের হয়; কিন্তু বাইপোলার ট্রানজিস্টরে ইনপুট সার্কিট সম্মুখ বায়াস হওয়ায় ইনপুট রোধ কম মানের হয়।

৩. ফেট হচ্ছে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস আর সাধারণ ট্রানজিস্টর হচ্ছে কারেন্ট নিয়ন্ত্রিত ডিভাইস।

মডেল প্রশ্ন ০৪ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ০৪

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. দৃশ্যমান আলো কাকে বলে? মৌলিক রং কি কি? ৪

খ. করোনারি বাইপাস, এনজিওপ্লাস্টি ও ইসিজি কি? ৪

গ. প্রতিধ্বনি বলতে কী বোঝেন? প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব ও সময়ের পার্থক্য সম্পর্কে লিখুন। সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় কিভাবে? ৪

ঘ. কুলম্বের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা করুন। ওহমের সূত্র লিখুন। ৪

ঙ. অটোচক্র কাকে বলে? ডিজেল ইঞ্জিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য করুন। ৪

২. ক. পানির ব্যতিক্রমধর্মী প্রসারণ কি? কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এটি ঘটে থাকে? ২

খ. ধাতব খুঁটির সাথে সরাসরি বিদ্যুৎ লাইনের তার সংযুক্ত থাকে না কেন? ২

গ. কাসাভা কি? ২

ঘ. কাচের জানালায় রাইফেলের বুলেট ছোঁড়া হলে জানালায় কেবল একটি ছিদ্রের সৃষ্টি হয়, কিন্তু ঢিল ছোঁড়া হলে কাচ চৌচির হয়ে যায় কেন? ২

ঙ. অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন কি? অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলতে কি বোঝেন? ২

৩. ক. যতই ওপরে ওঠা যায় ততই বায়ুর তাপ হ্রাস পায় কেন? ২½

খ. দেহে পানির ঘাটতি থেকে কি অসুবিধা দেখা দিতে পারে? ২½

গ. ক্রোমোজোম কি? এর কাজ কি? মানব দেহে কতগুলো ক্রোমোজোম আছে? ২½

ঘ. মাছ যে অক্সিজেন নেয় সেটি কোথায় কিভাবে থাকে? মাছ কোন অঙ্গের সাহায্যে এটি শরীরে গ্রহণ করে? ২½

৪. ক. ড্রাই আইস বা শুষ্ক বরফ কি? ২

খ. সিলিকা একটি উচ্চ গলনাঙ্কবিশিষ্ট কঠিন পদার্থ কেন? ২

গ. লৌহের নিষ্ক্রিয়তা কি? এটি কিভাবে দূর করা যায়? ২

ঘ. কোনটি বেশি ভারী— এক পাউন্ড তুলা না এক পাউন্ড লোহা? ২

ঙ. তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ জনিত কারণে মানবদেহের ওপর কি প্রভাব পড়ে? ২

৫. ক. আলোকবর্ষ এবং কসমিক বছর বলতে কি বোঝায়? ২½

খ. পূর্বে আবেশ পরে আকর্ষণ– ব্যাখ্যা করুন। বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ কি? ২½

গ. পেট্রোলিয়াম (Petroleum) কি? পেট্রোলিয়াম উৎপত্তি হয় কিভাবে? ২½

ঘ. পেসমেকার কি? ২½

৬. ক. ওজোন স্তর কি এবং এটি কি কাজে লাগে?
খ. আয়নস্তর কি এবং এটি কি কাজে লাগে?
গ. সৌরশক্তি কিভাবে উৎপন্ন হয়?
ঘ. এসিড বৃষ্টি কি এবং কেন ঘটে?

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৪

১. ক. **দৃশ্যমান আলো :** 4×10^{-7} থেকে 7×10^{-7} মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ হচ্ছে দৃশ্যমান আলো। আমরা যে আলোতে দেখি সেটি দৃশ্যমান আলো। তবে দৃশ্যমান আলোর সকল তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। এর মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি এবং বেগুনি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। তরঙ্গদৈর্ঘ্য হিসেবে ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সাজালে পাওয়া যায়— বেগুনি < নীল < আসমানী < সবুজ < হলুদ < কমলা < লাল।

মৌলিক রং : কোনো একটি পদার্থ থেকে প্রতিফলন, প্রতিসরণ বা শোষণের পরে যে বর্ণের আলোক চোখে পতিত হয় তাই পদার্থের রং বা বর্ণ। মৌলিক বর্ণ– লাল, সবুজ ও নীল। এ তিন রঙের সংমিশ্রণে অন্য সব রং তৈরি করা যায়। যেমন—
সবুজ + লাল = হলুদ; লাল + নীল = ম্যাজেন্টা; লাল + নীল + সবুজ = সাদা; নীল + হলুদ = সাদা

খ. **করোনারি বাইপাস :** হৃৎপিণ্ডে শিরা থেকে আসা রক্ত বিরামহীনভাবে পাম্প শেষে ধমনীর মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। যে রক্তবাহিকাগুলো হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ করে তাদের করোনারি আর্টারি বলে। করোনারি আর্টারিগুলোর গাত্রে অতিরিক্ত চর্বি জমে এবং অভ্যন্তরভাগ উঁচু-নিচু-অমসৃণ ও সরু হলে রক্তপ্রবাহ আংশিক বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে রক্ত চলাচলের বাধা দূর করার জন্য সাধারণত যে চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার হয় তাই করোনারি বাইপাস। এ পদ্ধতিতে শরীরের অন্য কোনো সস্থান থেকে শিরা কেটে এনে রক্তবাহী নালিকাগুলোর বাধাপ্রাপ্ত স্থানের উপর-নিচে জোড়া লাগিয়ে দেয়া হয়। এতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এনজিওপ্লাস্টি : হৃৎপিণ্ড হতে পাম্পকৃত রক্ত তিনটি বৃহৎ ধমনীর মধ্য দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়। ধমনী দ্বারা রক্ত চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হলে এর চিকিৎসায় এনজিওপ্লাস্টি চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রের দ্বারা সমস্যাযুক্ত ধমনীর সংকুচিত স্থান বিশেষ ধরনের বেলুন দ্বারা প্রসারিত হয়। ফলে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ইসিজি : ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফিকে সংক্ষেপে ইসিজি বলা হয়। এটি হলো হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের ফলে সৃষ্ট বিদ্যুৎ কম্পনের রেখাচিত্র অঙ্কনের একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এর সাহায্যে হৃদযন্ত্রের অবস্থা এবং কার্যাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও নিখুঁত তথ্য পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে হৃদযন্ত্রের চিকিৎসায় ইসিজির ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ. **প্রতিধ্বনি :** কোনো উৎস থেকে সৃষ্ট শব্দ যদি দূরবর্তী কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে উৎসের দিকে ফিরে আসে তখন মূলধ্বনির যে পুনরাবৃত্তি ঘটে তাকে প্রতিধ্বনি বলে। প্রতিধ্বনি হলো শব্দের প্রতিফলনের উদাহরণ।
প্রতিধ্বনি শোনার জন্য ন্যূনতম দূরত্ব ও সময়ের পার্থক্য : প্রতিধ্বনি শোনার জন্য মূলধ্বনি ও প্রতিধ্বনি শোনার মধ্যবর্তী সময়ের পার্থক্য ০.১ সেকেন্ড হওয়া প্রয়োজন। এর কম হলে মূলধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনিকে আলাদা করা যাবে না। সুতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী দূরত্ব এমন হতে হবে যেন প্রতিফলিত শব্দ ০.১ সেকেন্ডের আগে ফিরে আসতে না পারে। আবার যেহেতু বায়ুতে শব্দের বেগ ৩৩২ মিটার/সেকেন্ড। সুতরাং প্রতিধ্বনি শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব ১৬.৬ মিটার অর্থাৎ শ্রোতা ও প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যকার দূরত্ব ১৬.৬ মিটার হওয়া প্রয়োজন।

সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ : ফ্যাদোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয়। এটি আলট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করে, যা সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং জাহাজে রক্ষিত হাইড্রোফোন যন্ত্রে ধরা পড়ে। সমুদ্রের তলদেশে শব্দতরঙ্গের যেতে-আসতে গৃহীত সময় হতে সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করা হয়। আধুনিক ফ্যাদোমিটারে তরঙ্গ সৃষ্টি, প্রতিধ্বনি গ্রহণ, সময় গণনা প্রভৃতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসপ্লেতে দেখা যায়।

ঘ. **কুলম্বের সূত্র :** নির্দিষ্ট মাধ্যমে দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান আধানদ্বয়ের গুণফলের সমানুপাতিক। এদের মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এ বল আধানের সংযোজক সরলরেখা বরাবর ক্রিয়া করে।

গাণিতিক প্রকাশ : ধরি, দুটি বিন্দু আধানের পরিমাণ যথাক্রমে q_1 ও q_2 এবং এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব d। এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বলের মান F হলে কুলম্বের সূত্রানুসারে,

$$F \propto \frac{q_1q_2}{d^2} \Rightarrow F = k\frac{q_1q_2}{d^2} \text{ ....(i)}$$

এখানে, k একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, যার মান রাশিগুলোর একক এবং আধানদ্বয়ের মধ্যবর্তী মাধ্যমের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। আধানের সুবিধাজনক একক পছন্দ করে এ ধ্রুবকের মান ১ যোগ করা যায়।
(i) নং সমীকরণে $k = 1$ বসিয়ে।

$$F = 1.\frac{q_1q_2}{d^2}$$

$$F = \frac{q_1q_2}{d^2}$$

দুটি নির্দিষ্ট আধানের মধ্যকার আকর্ষণ ও বিকর্ষণ বলের মান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলে এ সূত্রকে ব্যস্তানুপাতিক বা বিপরীত বর্গীয় সূত্রও বলা হয়।

ওহমের সূত্র : তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্যদিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ চলে তা পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তরের সমানুপাতিক।

যদি কোনো পরিবাহকের দুই প্রান্তের বিভবান্তর V হয় এবং স্থির উষ্ণতায় ঐ পরিবাহকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হয়, তাহলে ওহমের সূত্রানুসারে,

$I \propto V$ বা, $V \propto I$

বা, $V = IR$ [এখানে, R একটি ধ্রুবক। R-কে পরিবাহকের রোধ বলা হয়]

$\therefore I = \frac{V}{R}$ ।

ঙ. **অটোচক্র :** পেট্রোল ইঞ্জিনের পিস্টনে দু বার সামনে এবং দু বার পেছনে এ চারবার গতির সময়ে মাত্র একবার জ্বালানি সরবরাহ করা হয় বলে এই ইঞ্জিনটিকে চতুর্ঘাত ইঞ্জিন বলে। ১৮৮৬ সালে ড. অটো সর্বপ্রথম সফলতার সাথে এই ইঞ্জিন চালু করেন বলে চক্রের পর পর চারটি ঘাতের ক্রিয়াকে 'অটোচক্র' বলে।

ডিজেল ইঞ্জিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনের পার্থক্য :

ডিজেল ইঞ্জিন

১. জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহৃত হয়।
২. এতে কোনো স্পার্ক প্লাগ থাকে না।
৩. এতে কেবল বায়ু সিলিন্ডারে শোষিত হয়।
৪. এতে উচ্চচাপে সংনমিত বায়ুর ওপর জ্বালানি ইনজেক্ট করে আগুন ধরানো হয়।
৫. এ ইঞ্জিনের কার্যদক্ষতা প্রায় ৭০%।

পেট্রোল ইঞ্জিন

১. জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।
২. এতে বিদ্যুৎ স্পার্ক প্লাগ থাকে।
৩. এতে বায়ু ও পেট্রোলের মিশ্রণ সিলিন্ডারে শোষিত হয়।
৪. এতে উচ্চ চাপে সংনমিত বায়ু ও জ্বালানির মিশ্রণে স্পার্কিং প্রক্রিয়ায় আগুন ধরানো হয়।
৫. এ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা প্রায় ৪০%।

২. ক. **পানির ব্যতিক্রমধর্মী প্রসারণ :** আমরা জানি, বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ঘটলে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। তবে পানির ক্ষেত্রে 4°C তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে অর্থাৎ পানি এসময় সবচেয়ে ভারী হয়। তাপমাত্রা 4°C-এর কম বা বেশি হলে পানি হালকা হয়। এটিই পানির ব্যতিক্রমধর্মী প্রসারণ অর্থাৎ তরল পদার্থের প্রসারণের সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। সুতরাং 0°C থেকে পানির তাপমাত্রা বাড়াতে থাকলে 4°C পর্যন্ত পানির ঘনত্ব বাড়বে এবং তাপমাত্রা আরো বাড়তে থাকলে ঘনত্ব কমতে থাকবে। 0°C থেকে 4°C পর্যন্ত পানির ব্যতিক্রম প্রসারণ দেখা যায়।

খ. **ধাতব খুঁটির সাথে বিদ্যুৎ লাইনের তার সরাসরি যুক্ত না করার কারণ :** ধাতু অর্থাৎ ধাতব খুঁটি বিদ্যুৎ সুপরিবাহী। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধাতব খুঁটির সাথে বৈদ্যুতিক তার সরাসরি যুক্ত থাকলে খুঁটিটি বিদ্যুতায়িত হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে কেউ এ খুঁটি স্পর্শ করলে তড়িতাহত হয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হবে। এই দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যই ধাতব খুঁটির সাথে বিদ্যুৎ লাইনের তার সরাসরি যুক্ত করা হয় না।

গ. **কাসাভা :** কাসাভা একটি আংশিক কাষ্ঠল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বহুবর্ষজীবী গুল্ম। এর স্টার্চ সম্বলিত শিকড় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে জনপ্রিয় খাদ্য। কাসাভা প্রধানত সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। এটি ময়দা এবং সাগুদানা হিসেবে সুপরিচিত স্টার্চ দানার উৎস। জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কাসাভার শিকড় একটি নিম্নমানের খাবার। এতে প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। প্রধান খাদ্য হিসেবে কাসাভা গ্রহণকারীদের দেহে প্রোটিনের অভাবজনিত কারণে কোয়াশিওরকর হতে পারে।

ঘ. **ঢিল ছুঁড়লে কাচ চৌচির হওয়ার কারণ :** বুলেটের গতি অত্যন্ত বেশি। বুলেট যখন কাচের জানালায় ছোঁড়া হয়, তখন অতি অল্প সময় বুলেটের গতি কাচের ওপর ক্রিয়া করে। এতে কেবল কাচের আঘাতপ্রাপ্ত অংশে স্থিতি জড়তার সামান্য পরিবর্তন হয়, অন্য অংশের স্থিতি জড়তা অপরিবর্তিত থাকে। এর ফলে আঘাতপ্রাপ্ত অংশে ছোট ছিদ্র তৈরি হয়।

অন্যদিকে, ঢিল ছুঁড়লে এর গতি অনেক কম থাকে। ফলে এটি কাচের জানালায় অনেক সময় ধরে ক্রিয়া করে। এতে কাচের জানালার বেশকিছু অংশের স্থিতি জড়তা নষ্ট হয়। যেসব অংশের স্থিতি জড়তা নষ্ট হয়, সেগুলো ভেঙে যায় বলে কাচ চৌচির হয়ে যায়।

ঙ. **অস্বাভাবিক কোষ বিভাজন :** মাইটোসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি এভাবে কোষের সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রিত থাকে। কোনো কারণে এ নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হয়ে গেলে অস্বাভাবিকভাবে কোষ বিভাজন চলতে থাকে। এর ফলে টিউমার সৃষ্টি হয়। এছাড়া ক্যান্সার কোষও এ নিয়ন্ত্রণহীন অস্বাভাবিক কোষ বিভাজনের ফসল। গবেষণায় দেখা গেছে বিভিন্ন প্রকার প্যাপিলোমা ভাইরাস ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : দেহের কতগুলো বিশেষ স্থানে অবস্থিত নালীহীন গ্রন্থি 'হরমোন' নামক যে জটিল জৈব-রাসায়নিক তরল উৎপন্ন করে এবং সে তরল উৎপত্তিস্থল থেকে নালীপথের পরিবর্তে সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে দেহের সর্বত্র পরিবেশিত হয়, তাদের সমষ্টিকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র বলে।

৩. ক. **উপরে উঠলে বায়ুর তাপ হ্রাস পাওয়ার কারণ :** বায়ুর তাপের মূল উৎস সূর্য হলেও বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে অধিকতর তাপ সংগ্রহ করে উত্তপ্ত হয়। পরে এ তাপ ধীরে ধীরে ঊর্ধ্ব স্তরে বায়ুকে উত্তপ্ত করে। এ কারণে নিচের বায়ুস্তরে তাপমাত্রা সর্বাধিক এবং ওপরের দিকে ক্রমশ তাপ কম। বায়ুর নিম্নস্তরে ধূলিকণা, জলীয়বাষ্প ও অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান অধিক থাকায় সেখানকার বায়ু ঘন কিন্তু ক্রমে ওপরের দিকে এসব উপাদান কম থাকায় সেখানকার বায়ু ক্রমেই পাতলা থাকে। বায়ু যত বেশি ঘন তার তাপধারণ ক্ষমতাও তত অধিক। এ কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় তাপ ততই হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ৯০.৪৪ মি. উচ্চতায় বায়ুর তাপ ১° সেলসিয়াস হ্রাস পায়।

খ. **দেহের পানির ঘাটতিতে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় :** পানি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। প্রাণীদেহের ৬০–৭৫ ভাগই পানি। পানি প্রাণীদেহে দ্রাবকের কার্যসম্পাদন করে। দেহে পানির ঘাটতিতে যেসব অসুবিধা দেখা দেয় তা নিম্নরূপ :

পানির অভাবে দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাহত হয়। পাচক রস ও খাদ্যরসের তরলায়ন ব্যাহত হয়, যা পরিপাক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। বৃক্কের রেচন পদার্থ নিষ্কাশন বিঘ্নিত হয়। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন দেহে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির আয়রনের ভারসাম্য নষ্ট করে। ফলে পেশী দুর্বলতা ও অবসাদ দেখা যায়। পানির অভাবে ক্ষুধামান্দ্যও সৃষ্টি হয়।

গ. **ক্রোমোজোম :** নিউক্লিয়াসে অবস্থিত সূত্রাকার অঙ্গাণু যা মিউটেশন বা প্রকরণের ক্ষমতা সম্পন্ন, বংশগতির বাহক তাকে ক্রোমোজোম বলে। স্বাভাবিক কোষে এরা ক্রোমাটিন জালিকা হিসেবে নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে। কোষ বিভাজনের শুরুতে এই ক্রোমাটিন জালিকার প্যাচানো সুতার মতো বস্তু ফিতার আকৃতি ধারণ করে, তখন এদেরকে ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করা হয়।

ক্রোমোজোমের কাজ :

ক. বংশগত বৈশিষ্ট্য এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে বহন করে; খ. প্রোটিন সংশ্লেষণে সহায়তা করে।

মানবদেহে ক্রোমোজোমের সংখ্যা : মানব দেহে ২৩ জোড়া বা ৪৬ টি ক্রোমোজোম থাকে। এর মধ্যে ২২ জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।

ঘ. **মাছের অক্সিজেন গ্রহণ :** মাছ যে অক্সিজেন নেয় সেটি পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ফুসফুসওয়ালা মাছ ছাড়া বাকি সকল মাছই ফুলকার সাহায্যে শরীরে অক্সিজেন গ্রহণ করে। শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য মাছ প্রথমে মুখে জল নেয়। ঐ জল ফুলকার কোষ কর্তৃক শোষিত হয়। ফুলকার তলীয় ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ায় শোষিত অক্সিজেনের পরিমাণও বেশি। এ অক্সিজেন রক্তের সাথে মিলিত হয়ে সমস্ত শরীরে পরিচালিত হয়। অন্যদিকে শরীরের অভ্যন্তরের কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত কর্তৃক ফুলকায় ফিরে আসে এবং জলে দ্রবীভূত হয়ে শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে। এমনিভাবে মাছের শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে।

৪. ক. **ড্রাই আইস :** ১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে এবং উচ্চচাপে ঠাণ্ডা করে কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে বাষ্পীভূত করলে তা অল্প পরিমাণ বাষ্পায়িত হয় এবং অবশিষ্ট কিছু অংশ কঠিন কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। এটি দেখতে বরফের মতো বলে একে শুষ্ক বরফ বলে। স্বাভাবিক বায়ুচাপে শুষ্ক বরফ ৭৮.৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঊর্ধ্বপাতিত হয়। পচনশীল পদার্থ ঠাণ্ডা রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়। শুষ্ক বরফের মোটা পাত বা ফলক সহজেই কেটে ট্রাক বা জাহাজে প্রেরিত কাঁচামালের হিমায়িতকরণে ব্যবহার করা হয়।

খ. **সিলিকার গলনাঙ্ক :** প্রতিটি সিলিকন পরমাণু চতুস্তলকীয়ভাবে চারটি অক্সিজেন পরমাণুর সাথে একক সমযোজী বন্ধন দ্বারা যুক্ত। প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু দুটি সিলিকন পরমাণুর সাথে যুক্ত। এভাবে অতি বৃহৎ একটি অণুর সৃষ্টি হয়। বৃহদাকার অণু হওয়ার কারণে সিলিকার গলনাঙ্ক এত বেশি।

গ. **লৌহের নিষ্ক্রিয়তা ও তা দূর করার উপায় :** শীতল ও গাঢ় কিংবা ধূমায়িত নাইট্রিক এসিডের সংস্পর্শে লৌহ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ লৌহ লঘু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে না কিংবা কপার সালফেট দ্রবণ থেকে কপারকে অধঃক্ষিপ্ত করে না। লৌহের এরূপ অবস্থাকে লৌহের নিষ্ক্রিয়তা বলে। নিষ্ক্রিয় লৌহের উপরিপৃষ্ঠকে ঘর্ষণ করে বা হাইড্রোজেন গ্যাসে উত্তপ্ত করে লৌহের এ নিষ্ক্রিয়তা দূর করা যায়।

ঘ. **এক পাউন্ড তুলা না এক পাউন্ড লোহা বেশি ভারী :** কোনো বস্তু কতটুকু ভারী তা নির্ভর করে এদের কোথায় ওজন করা হচ্ছে তার ওপর। বায়ুতে তুলা ও লোহা উভয়ের ভর সমান। আসলে বায়ুপূর্ণ স্থানে যদি এক পাউন্ড তুলা ও এক পাউন্ড লোহার ভর সমান হয় তাহলে বায়ুশূন্য স্থানে তুলার ভর বেশি হবে। কারণ তুলার ঘনত্ব কম বলে এক পাউন্ড তুলার আয়তন এক পাউন্ড লোহার চেয়ে অনেক বেশি হবে। ফলে তুলার উপর বাতাসের প্রবলতার মান লোহার চেয়ে অনেক বেশি হবে। ফলে তুলার প্রকৃত ওজন কম হবে। বায়ুশূন্য স্থানে লোহা ও তুলার প্রকৃত ওজন যদি এক পাউন্ড করে হয় তাহলে বায়ুপূর্ণ স্থানে ঐ তুলা লোহা অপেক্ষা হালকা হবে।

ঙ. **মানবদেহে তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণের প্রভাব :** তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্রিয়ার ফলে মানবদেহের ক্রোমোজোমের ডিএনএ (DNA)-র গঠন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং এর প্রভাব বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। বংশগতিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ফলে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের বস্তিদেশ এক্স-রে করালেও গর্ভের শিশুটি জন্মগত বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে পশ্চাৎপদ হতে পারে। তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দৈহিক প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রথমত বমি বমি ভাব, বমি, অজীর্ণতা, ক্ষুধাহীনতা, দুর্বলতা, ঠোঁট ফেটে যাওয়া, চামড়ার নিচে বা মুখ থেকে আপনা আপনি রক্ত ক্ষরণ, চুল পড়ে যাওয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দিতে পারে।

৫. ক. **আলোকবর্ষ :** একবছর সময়ে আলো যতটা পথ বা দূরত্ব অতিক্রম করে বা করতে পারে তাকে এক আলোকবর্ষ (Light Year) বলে। আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে ৩,০০,০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ প্রতি মিনিটে ১,৮০,০০,০০০ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে। এক মিনিটের অতিক্রান্ত দূরত্বকে বলে 'আলোক মিনিট' (Light Minute)। যখন আমরা বলি যে, নভোমণ্ডলস্থ কোনো বস্তুপিণ্ড এক আলোক মিনিট দূরে অবস্থিত তখন তার অর্থ এই বোঝায় যে, বস্তুপিণ্ডটি পৃথিবী থেকে ১,৮০,০০,০০০ কিলোমিটার দূরে আছে। একবছর সময়ে আলো যে দূরত্ব অতিক্রম করে তার পরিমাণ হলো ৯৪,৬০,০০,০০,০০,০০০ কিলোমিটার। সংক্ষেপে এ দূরত্বকে বলা হয় ৯.৪৬ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার, ৯.৪৬ × ১০[১২] কিলোমিটার বা ৫.৮৮ ট্রিলিয়ন মাইল।

কসমিক বছর : মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা একসাথে গাঁথা এক বিরাট নক্ষত্রমণ্ডলীকে গ্যালাক্সি বলে। আলোকবর্ষ (Light Year) হিসেবে প্রতিটি গ্যালাক্সির আয়তন পরিমাপ করা হয়। মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা একটি মোচাকার গ্যালাক্সি। আমাদের সৌরজগৎ এ গ্যালাক্সির অন্তর্ভুক্ত। মিল্কিওয়ের প্রায় লক্ষাধিক নক্ষত্রের মধ্যে আমাদের সূর্য একটি নক্ষত্র। আধুনিক হিসাব মতে গ্যালাক্সির কেন্দ্রস্থল থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৩২,০০০ আলোকবর্ষ।

সৌরজগতের গ্রহগুলো যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় তেমনি প্রতিটি নক্ষত্র কেন্দ্রীয় ঘনিভূত অংশের চারদিকে অর্ধবৃত্তাকার বা বৃত্তাকার পথে আবর্তিত হয়। কেন্দ্রের কাছের নক্ষত্রগুলো দূরের নক্ষত্রের চেয়ে দ্রুতগতিতে আবর্তিত হয়। সূর্য তার গ্যালাক্সির চতুর্দিকে প্রতি সেকেন্ডে ২৫০ কিলোমিটার বেগে আবর্তিত হয়। গ্যালাক্সির কেন্দ্রিভূত অংশের চতুর্দিকে আবর্তন সম্পন্ন করতে সূর্যের প্রায় ২২৫ মিলিয়ন বছর লাগে। এ আবর্তন কালই কসমিক বছর বা গ্যালাক্টিক ইয়ার।

খ. **পূর্বে আবেশ ও পরে আকর্ষণের ব্যাখ্যা :** কোনো চুম্বককে চৌম্বক পদার্থের নিকটে রাখার ফলে আবেশের দ্বারা পদার্থের নিকটতম প্রান্তে ঐ চুম্বক মেরুর বিপরীত মেরু এবং দূরবর্তী প্রান্তে সমজাতীয় মেরু উৎপন্ন হয়। চুম্বক মেরুর ক্রিয়ার নিয়মানুসারে আবেশী মেরু ও নিকটবর্তী আবিষ্ট বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ এবং আবেশী মেরু ও দূরবর্তী আবিষ্ট সমমেরুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অধিক হলে বিকর্ষণ বল কম হবে এবং চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হবে। অতএব প্রমাণিত হয় পূর্বে আবেশ পরে আকর্ষণ সংঘটিত হবে।

বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ : একটি গতিশীল চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অথবা একটি স্থির তড়িৎবাহী বর্তনীর তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধি করে অন্য একটি সংবদ্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল ও তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশ বলে।

গ. **পেট্রোলিয়াম (Petroleum) :** পেট্রোলিয়াম মূলত হাইড্রোজেন ও কার্বন দিয়ে গঠিত হাইড্রোকার্বন যৌগের সমষ্টি। পেট্রোলিয়াম শব্দটি ল্যাটিন শব্দ পেট্রো অর্থাৎ পাথর এবং ওলিয়াম অর্থাৎ তেল থেকে এসেছে। পেট্রোলিয়াম বলতে অনেক সময় সাধারণত তরল তেলকে (Crude oil) বোঝানো হয়ে থাকলেও বস্তুত এ শব্দটি দ্বারা শিলাস্তরে অবস্থিত গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন, যা প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) নামে পরিচিত এবং কঠিন

হাইড্রোকার্বন, যা অ্যাসফাল্ট নামে পরিচিত, তাও বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক গ্যাস, তেল এবং অ্যাসফাল্ট হাইড্রোকার্বন যৌগসমূহের যথাক্রমে বায়বীয়, তরল এবং কঠিন রূপ এবং সে হিসেবে এদের উৎপত্তিগত এবং অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য রয়েছে।

পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি : পেট্রোলিয়াম ভূগর্ভে উচ্চতাপ এবং চাপের প্রভাবে শিলাস্তরের ভেতর অবস্থিত জৈবিক পদার্থের ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়ে থাকে। কোনো কোনো শিলাস্তর যেমন কাদাশিলা (Shale) ও চুনাপাথর (Limestone) উৎপত্তিকালে কখনো বা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ জৈবিক পদার্থ জমা হতে পারে এবং তা যখন ভূ-অভ্যন্তরে স্থানান্তরিত হয়ে পর্যাপ্ত তাপের প্রভাবে পড়ে তখন এ জৈবিক পদার্থ থেকে পেট্রোলিয়াম সৃষ্টি হয়ে থাকে। এ ধরনের কাদাশিলা বা চুনাপাথরকে পেট্রোলিয়ামের উৎস শিলা (Source Rock) বলে। উৎস শিলার জৈবিক পদার্থ স্থলজাত উদ্ভিদ শ্রেণীর অথবা সমুদ্রজাত উদ্ভিদ বা প্রাণী উভয় শ্রেণীরই হতে পারে। সমুদ্রজাত উদ্ভিদ এবং প্রাণী জাতীয় জৈবিক পদার্থের খনিজ তেল সৃষ্টি করার ক্ষমতা অনেক বেশি। তবে সমুদ্র ও স্থলজাত জৈবিক পদার্থ উভয়ই সমানভাবে গ্যাস উৎপাদন করতে পারে। তাই কোনো এলাকায় তেলের আধিক্য বা গ্যাসের আধিক্য থাকা ঐ এলাকায় পেট্রোলিয়াম উৎসশিলায় জৈবিক পদার্থের ধরনের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

ঘ. পেসমেকার : পেসমেকার একটা ছোট ইলেকট্রনিক যন্ত্র। প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ও দেড় ইঞ্চি চওড়া। আর মাত্র এক থেকে দুই মিলিমিটার পুরু। এতে একটা সূক্ষ্ম তার আছে, সেটা একটা ছোট রক্তনালীর মধ্য দিয়ে হার্টে চালিয়ে দেয়া হয়। একটা ছোট অপারেশন করে যন্ত্রটা বুকের চামড়ার নিচে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। এই অপারেশনের মাত্র ৪/৫ দিন পর রোগী বাড়ি ফিরে যেতে পারে।

পেসমেকারের মধ্যে ইলেকট্রনিক্স মস্তিষ্ক আছে যা ওই সূক্ষ্ম তারের মধ্য দিয়ে খবর পায় হার্ট চলছে না থেমে গেছে। হার্ট স্পন্দন থামলেই পেসমেকার বুঝতে পারে হার্টে বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়ই বিঘ্ন ঘটেছে। তখনই পেসমেকারের ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক ঐ তারের মধ্য দিয়েই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে পাঠিয়ে দেয়। হার্টে আবার পাম্প করতে আরম্ভ করে। এ ঘটনাগুলো এতো নিমিষে ঘটে যায় যে, হার্ট বন্ধ হয়ে ব্লাক আউট ইত্যাদি সমস্যার সূত্রপাতের কোনো অবকাশ থাকে না।

৬. ক. ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬৫ মাইল ওপরে বায়ুমণ্ডলের চতুর্থ স্তরকে ওজোন স্তর বলে। এই স্তর সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে নেয় এবং পৃথিবীর শব্দকে প্রতিফলিত করে।

খ. বায়ুস্তরের ওজোন স্তরের ওপরে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে আয়নস্তর বলে। এই স্তরে বিভিন্ন ধরনের চার্জযুক্ত কণা থাকে। এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়। ফলে সংবাদ আদান-প্রদান এই স্তরের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

গ. শক্তির প্রধান উৎস সূর্য। সূর্য ফিউশন প্রক্রিয়ায় সব সময় সৌরশক্তি উৎপন্ন করছে।

ঘ. পৃথিবীর শিল্পকারখানা থেকে প্রতিনিয়ত দূষিত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এই দূষিত গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন পার অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এসিডে পরিণত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে। এই এসিড মিশ্রিত বৃষ্টিপাতকে এসিড বৃষ্টি বলে।

মডেল টেস্ট ০৪

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে। নম্বর

১. (a) কম্পিউটার সফটওয়্যারের শ্রেণীবিন্যাস করুন। ২
(b) CPU এবং মাইক্রোপ্রসেসের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। ২
(c) মাইক্রো কম্পিউটার কি? ২
(d) কম্পিউটার কিভাবে চালু করা যায়? ২
(e) MS-Dos কি? ২

২. (a) আধুনিক কম্পিউটারের কাজ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৪
(b) এসেম্বলি ভাষা কি? এই ভাষার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লিখুন। ৪
(c) কম্পিউটারে CAE বলতে আপনি কি বুঝেন? ২

৩. (a) তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৪
(b) মেনুয়েল ডেটা প্রসেসিং এবং অটোমেটিক ডেটা প্রসেসিং এর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। ৪
(c) CD-ROM কিভাবে ডেটা সংরক্ষণ করে? ২

৪. (a) RADAR কি? RADAR কিভাবে কাজ করে? ব্যাখ্যা করুন। ৫
(b) Transformer কি? এর গঠন বর্ণনা করুন। ৫

৫. (a) বিভিন্ন ধরনের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বর্ণনা করুন। ৪
(b) নেটওয়ার্ক টপোলজি কি? সংক্ষেপে এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন। ৪
(c) Modem কি? ২

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৪

1. (a) কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
১. সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)
২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার

নিচে সফটওয়্যারের প্রকারভেদ ছকে দেখানো হলো :

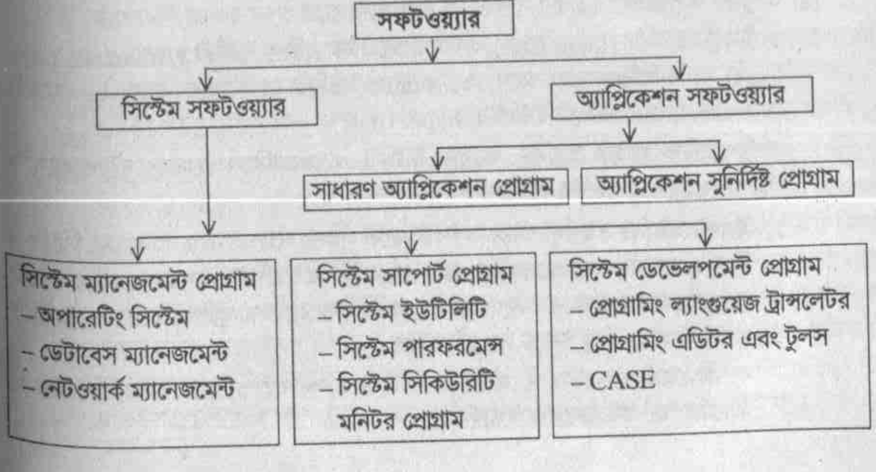

(b) কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সিপিইউ বলে। কম্পিউটারের কাজ করার গতি সিপিইউ-এর উপর নির্ভরশীল।

মাইক্রোপ্রসেসর হলো একক ভিএলএসআই (VLSI-Very Large Scale Integration) সিলিকন চিপ (Chip)। মাইক্রো কম্পিউটারের সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে একীভূত করে মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়। মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন ও কাজ এবং সিপিইউ-এর সংগঠন ও কাজ একই রকম। মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য (কাজ) চিপের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় লজিক সার্কিট থাকে। মাইক্রো প্রসেসরের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াকে প্রোগ্রামের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং প্রোগ্রামকে কম্পিউটারের মেমোরি অংশে সংরক্ষণ করা হয়।

(c) **মাইক্রোকম্পিউটার :** মাইক্রোকম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলেও অভিহিত করা হয়। ইন্টারফেস চিপ, একটি মাইক্রোপ্রসেসর CPU এবং RAM, ROM সহযোগে মাইক্রোকম্পিউটার গঠিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যায়। ম্যাকিনটোস আইবিএম পিসি এ ধরনের কম্পিউটারের উদাহরণ।

(d) কম্পিউটার কাজ করে বিদ্যুতের স্রোতবাহিত সংকেতের মাধ্যমে। কম্পিউটারে আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজের জন্য কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় তথ্য (Data) প্রদান করতে হয়। আর সেই তথ্য প্রদান করার কাজটিকে বলা হয় কম্পিউটারে ইনপুট দেয়া। তথ্য বা ইনপুট (Input) পাওয়ার পর কম্পিউটার তার ব্যবহারকারীর নির্দেশ মতো ঐ তথ্য নিয়ে কাজ করে বা তথ্য প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ হলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে ঐ কাজের ফলাফল জানিয়ে দেয়।

(e) এমএস-ডস (MS-DOS)-এর পুরো অর্থ হচ্ছে 'মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম'। এমএস ডস হচ্ছে একটি অপারেটিং সিস্টেম প্রোগ্রাম, যা কম্পিউটারকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলতে সহায়তা করে। কম্পিউটার সংগঠনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটারের মেমোরিতে তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামসমূহকে পরিচালনা করার পদ্ধতি, কম্পিউটারের সাথে ব্যবহারকারীর সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ইত্যাদি কার্যাবলী এমএস-ডস প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

2. (a) আধুনিক কম্পিউটারের প্রধান সাংগঠনিক অংশগুলো হলো :

১. ইনপুট ইউনিট (Input Unit), ২. অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট (Arithmetic Logic Unit) বা গাণিতিক যুক্ত অংশ; ৩. কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ; ৪. মেমোরি (Memory); ৫. আউটপুট ইউনিট (Output Unit)

অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট ও মেমোরিকে একত্রে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট বলা হয়।

১. **ইনপুট ইউনিট :** ইনপুট দিয়ে কম্পিউটারকে সমস্যা সমাধানের জন্য কাজের নির্দেশ ও নির্দেশ পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা দেয়া হয়। এ ইউনিটে বিশেষ মাধ্যম থেকে ডেটা ও প্রোগ্রাম গ্রহণ করে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরের পর কম্পিউটারের মেমোরিতে সংরক্ষণ করে। কিছু ইনপুট যন্ত্রপাতির নাম :

ক. কী-বোর্ড, খ. মাউস, গ. জয়স্টিক, ঘ. ডিস্ক, ঙ. স্ক্যানার, চ. কার্ড রিডার, ছ. ডিজিটাল ক্যামেরা, জ. মাইক্রোফোন ইত্যাদি।

২. **সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ :** কম্পিউটারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU) বা কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ অংশ যা কম্পিউটারের মস্তিষ্কস্বরূপ। সিপিইউ যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, হিসাব-নিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের কাজ করে। সিপিইউ'র মধ্যে তিনটি প্রধান ইউনিট থাকে। যেমন–

ক. অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল ইউনিট (ALU) বা গাণিতিক যুক্তি অংশ

খ. কন্ট্রোল ইউনিট বা নিয়ন্ত্রণ অংশ ও গ. মেমোরি বা স্মৃতি ভাণ্ডার।

৩. **আউটপুট ইউনিট :** আউটপুট ইউনিট প্রক্রিয়াকরণের ফলাফল মানুষের অনুধাবনযোগ্যরূপে উপস্থাপন করে। কিছু আউটপুট যন্ত্রপাতি হলো :

ক. মনিটর, খ. প্রিন্টার, গ. প্লোটার, ঘ. মাইক্রোফিল্ম, ঙ. ডিস্ক, চ. স্পিকার ইত্যাদি।

(b) অ্যাসেম্বলি ভাষাকে সাংকেতিক (Symbolic) ভাষাও বলে। এর প্রচলন শুরু হয় ১৬৫০ সাল থেকে, দ্বিতীয় প্রজন্মের কম্পিউটারে এই ভাষা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল।

অ্যাসেম্বলি ভাষার ক্ষেত্রে নির্দেশ ও ডেটার অ্যাড্রেস বাইনারি বা হেক্স সংখ্যার সাহায্য না দিয়ে সংকেতের সাহায্যে দেয়া হয়। এ সংকেতকে বলে সাংকেতিক কোড (Symbolic Code) বা নেমোনিক (Nemonic অর্থাৎ যে সংকেতের সাহায্যে কোনো বড় সংখ্যা বা কথাকে মনে রাখার সুবিধা হয়)। যেমন অ্যাকিউমুলেটরে রাখা, এর নেমোনিক LDA। ডেটা ও ডেটার অ্যাড্রেসও নেমোনিকের সাহায্যে দেয়া হয়। এর জন্য নিউমারিক ও আলফানিউমারিক বর্ণ ব্যবহৃত হয়। একসঙ্গে এক বা একাধিক বর্ণ ব্যবহার করা যায় তবে সর্ববামের বর্ণ সর্বদা অক্ষর হয় যেমন– A, B, A1, B2 ইত্যাদি।

অ্যাসেম্বলি ভাষার সুবিধা :

১. অ্যাসেম্বলি ভাষা দক্ষ ও সংক্ষিপ্ত প্রোগ্রাম রচনা করা সম্ভব।
২. এ ভাষায় রচিত প্রোগ্রামে ভুলের পরিমাণ কম হয় এবং সহজেই তা নির্ণয় ও সংশোধন করা সম্ভব।
৩. এই ভাষার প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল, তাই এ ভাষা ব্যবহারের জন্য কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ধারণা দরকার।
৪. মেমোরির জন্য অ্যাসেম্বলি শব্দের ব্যবহারের ফলে প্রোগ্রাম রচনার মেমোরি-অ্যাড্রেসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অপ্রয়োজনীয়।

অ্যাসেম্বলি ভাষার অসুবিধা :

১. প্রোগ্রাম মেশিনের সংগঠনের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং মেশিনের অভ্যন্তরীণ সংগঠনের ধারণা ছাড়া প্রোগ্রাম রচনা অসম্ভব। তাছাড়া এক মেশিনের প্রোগ্রাম অন্য মেশিনে নাও চলতে পারে।
২. এই ভাষায় প্রোগ্রাম রচনা মেশিনের ভাষার তুলনায় সহজতর হলেও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ।

(c) CAE হচ্ছে প্রকৌশল-সমস্যাদি সমাধানে সহায়তা করার জন্য কম্পিউটারভিত্তিক যন্ত্রাদির ব্যবহার। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রকৌশলকে চারটি পরস্পর সম্পর্কিত সমস্যা-সমাধানকারী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সেগুলো হলো—কম্পিউটার ডেটাবেজ উপাত্ত-সন্নিবেশ ও যোগাযোগ; কম্পিউটার চিত্রণ (graphics) ও মডেলিং; কম্পিউটার অনুকরণ (simulations) ও বিশ্লেষণ এবং উপাত্ত আত্তীকরণ (data acquisition), ভৌত প্রোটোটাইপ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত প্রকৌশলের প্রয়োগ চলতে পারে চূড়ান্ত উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত, যে সময়ে অনুরূপ কম্পিউটার ব্যবস্থার প্রয়োগকে সাধারণত কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন (CAM—Computer-Aided Manufacturing) বা কম্পিউটার সমন্বিত উৎপাদন (CIM—Computer Integrated Manufacturing) বলা হয়।

3. (a) **তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক মাধ্যম :** তথ্যপ্রযুক্তির সূচনালগ্ন থেকে বিভিন্ন মাধ্যম বা ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিচে এরূপ কয়েকটি মাধ্যম উল্লেখ করা হলো :

১. **টেলেক্স (Telex) :** টেলেক্স পদ্ধতি হচ্ছে মোর্স-কোডের উন্নততর সংস্করণ। এ পদ্ধতিতে সংকেত গ্রহণ ও প্রদর্শন উভয় ক্ষেত্রেই টাইপ রাইটার (বৈদ্যুতিক) ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে পার্সোনাল কম্পিউটার টেলেক্স প্রেরণ ও গ্রহণের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. **টেলিটেক্সট (Teletext) :** টেলিটেক্সট একটি একমুখী সম্প্রচার ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ডেটাবেস থেকে পৃষ্ঠার আকারে টেলিভিশন সম্প্রচারের মাধ্যমে তথ্য সম্প্রচার করা হয়। আবহাওয়ার খবর, স্টক মার্কেটের রিপোর্ট, সংবাদ, বাণিজ্যিক পণ্যের খবর, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি তথ্য প্রচারের জন্য টেলিটেক্সট ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৩. **ভিডিওটেক্সট (Videotext) :** এ ব্যবস্থায় ব্যবহারকারী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বৃহৎ ডেটাবেসের সাথে সংযোগ স্থাপন করে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে পারে। আহরিত তথ্য টেলিভিশন পর্দায় প্রদর্শন করা হয়। এ ব্যবস্থায় টেলিটেক্সট-এর মতো তথ্য সম্প্রচার না করে শুধু অনুসন্ধানকারীর নিকট প্রেরণ করা হয়। এ ব্যবস্থায় নিয়োজিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে সংবাদ, বাণিজ্যিক খবরাখবর, স্টক মার্কেট রিপোর্ট ইত্যাদি সংরক্ষিত অবস্থায় থাকে।

৪. **মেইল (Electronic Mail) :** ইলেক্ট্রনিক মেইলকে সংক্ষেপে 'ই-মেইল' বলা হয়। এটি এক ধরনের উন্নত ও দ্রুত ডাকব্যবস্থা। এছাড়াও এটি একটি আন্তর্জাতিক ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ ও বিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যম।

৫. **টেলিকনফারেন্সিং (Teleconferencing) :** টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে সভা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়াকে টেলিকনফারেন্সিং বলা হয় এবং এ সভাকে টেলিকনফারেন্স বলে। ১৯৭৫ সালে মরি টারফ এ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন।

৬. **ভিডিও কনফারেন্সিং (Videoconferencing) :** ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যবস্থায় টেলিভিশনের পর্দায় অংশগ্রহণকারীরা পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে একে অন্যেকে দেখে কথোপকথনে অংশগ্রহণ করেন। এটি একটি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থা।

৭. **ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (Electronic Fund Transfer) :** ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার হলো টেলিফোন ও ডেটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে অর্থ স্থানান্তর। এ প্রক্রিয়ায় ইলেক্ট্রনিক উপায়ে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার হিসাবের মধ্যে প্রকৃত অর্থের আদান-প্রদান না ঘটিয়ে শুধু হিসাবের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণের সমন্বয় সাধন ও আধুনিকীকরণ করা হয়। বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার অটোমেটিক টেলার মেশিনগুলোকে এ যোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ব্যাংকের কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা হয়।

(b) ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ মেনুয়াল পদ্ধতিতে অথবা কম্পিউটারের সাহায্যে অটোমেটিক পদ্ধতিতে করা যেতে পারে। কম্পিউটারসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার ব্যতীত হাতেকলমে ডেটা প্রসেসিং করা হলে তাকে মেনুয়াল ডেটা প্রসেসিং বলা হয়। মেনুয়াল ডেটা প্রসেসিংয়ে পরিশ্রম বেশি হয় কিন্তু সে তুলনায় আউটপুট কম হয়। তাছাড়া সময় বেশি প্রয়োজন এবং ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে। অন্যদিকে কম্পিউটারের সাহায্যে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি (যেমন- স্ক্যানার, ওসিআর-OCR, এমআইসিআর-MICR, ওএমআর-OMR ইত্যাদি ইনপুট যন্ত্রপাতি) সহযোগিতায় অতি দ্রুত গতিতে, কম সময়ে এবং নির্ভুলভাবে অটোমেটিক পদ্ধতিতে ডেটা প্রসেসিং করা যায়। পূর্বে ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ সাধারণত মেনুয়াল পদ্ধতিতে করা হতো কিন্তু বর্তমানে কম্পিউটারের কল্যাণে অতি দ্রুতগতিতে ও কম পরিশ্রমে কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির সাহায্যে অটোমেটিক পদ্ধতিতে ডেটা প্রসেসিংয়ের কাজ করা হয়।

উভয় ক্ষেত্রে প্রসেসিংয়ের ফলাফল একই হয়, তবে প্রসেসিংয়ের বৈশিষ্ট্য বা নমুনায় অবশ্যই কিছু পার্থক্য থাকে। নিচে উভয় প্রকার ডেটা প্রসেসিং তুলনা করা হলো :

তুলনার বিষয়	মেনুয়াল	অটোমেটিক
কাজের গতি	মন্থর	খুব দ্রুত
দীর্ঘ সময় করার ক্ষমতা	দুর্বল	খুব ভালো
মেমোরি ক্ষমতা	কম	বেশি
নির্ভুল কাজ করার ক্ষমতা	ভুল হতে পারে	ভুল করার সম্ভাবনা নেই
মনোযোগসহ নির্দেশ পালন	সঠিক হয় না	সঠিক হয়
বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে সংযোজন ও সংশোধন ক্ষমতা	আছে	নেই

আলোচ্য ছক থেকে দেখা যায় যে মেনুয়াল একটি অনুন্নত ডেটা প্রসেসর। মানুষের কাজের গতি, সহ্য-ক্ষমতা এবং তথ্য মনে রাখার ক্ষমতা খুব সীমিত। তবে পরিবেশের সাথে মিল রেখে নতুন কিছু সংযোজন এবং পরীক্ষণের ভুল নির্ণয় করে তা সংশোধনের পথ নির্দেশের ক্ষমতা শুধু মানুষেরই আছে, কম্পিউটারের নেই। সুতরাং যেখানে বুদ্ধি, বিবেচনা, কারণ নির্ণয় এবং নতুন আবিষ্কার প্রয়োজন সেখানে মেনুয়াল সর্বোত্তম। আবার ক্যালকুলেশন, বিশ্লেষণ, সাজানো এবং তুলনা করার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার করা উত্তম।

(c) সিডি-রমের পূর্ণনাম কমপ্যাক্ট ডিস্ক রিড-অনলি মেমোরি। সিডি-রম একটি অপটিক্যাল মাধ্যম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিডি রম অ্যালুমিনিয়াম এবং প্লাস্টিকের তৈরি হয়ে থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার স্বর্ণ এবং প্লাস্টিকের তৈরি হয়ে থাকে। সিডি-রম চাকতিটির ব্যাস ৪.৭২ ইঞ্চি এবং ১.২ মিলিমিটার। অপটিক্যাল মাধ্যমে তথ্য সংরক্ষণ এবং পঠন কাজ করার জন্য লেজার রশ্মি ব্যবহার করা হয়। তথ্য সংরক্ষণ বা লিখার জন্য লেজার রশ্মি ঐ মাধ্যমের সারফেস বা আস্তরণের নির্দিষ্ট প্যাটার্ন পুড়িয়ে দেয়। আবার ঐ সংরক্ষিত তথ্যকে পড়ার জন্য সিডি ড্রাইভ অন্য ধরনের লেজার রশ্মি ব্যবহার করে। এ রশ্মি সিডির আস্তরণকে স্ক্যান করে তথ্যকে চিহ্নিত করতে পারে। সিডি ড্রাইভে অন্যান্য সংরক্ষণ মাধ্যমের মতো মেকানিক্যাল হেড নেই, এ কারণে এতে হেড ক্রাশ করার সম্ভাবনা নেই। তাই এতে ঝুঁকি কম, টিকে বেশি দিন এবং অভাররাইট হয় না।

4. (a) রাডার হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যার সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির বাইরের কোনো বস্তুকে খুঁজে বের করা যায় এবং দূরত্বও নির্ণয় করা যায়। রাডার (RADAR)-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Radio Detection And Ranging।

প্রেরক, গ্রাহক ও সূচক সম্বলিত ও প্রতিধ্বনি সৃষ্টির নীতি অনুসারে রাডার কাজ করে। রাডার ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গের চেয়ে অধিক কম্পাংক বিশিষ্ট তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এই বেতার তরঙ্গ বা সূক্ষ্ম তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। প্রেরক যন্ত্র থেকে অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ সামনের দিকে পাঠানো হয়। এই তরঙ্গগুলো সরলরেখায় চলে এবং উদ্দিষ্ট অভিলক্ষ্য বস্তুটির গায়ে লেগে প্রতিফলিত হয়ে এর কিছু অংশ ফিরে আসে। প্রতিফলিত রশ্মির যে অংশ রাডার কেন্দ্রে ফিরে আসে, গ্রাহক যন্ত্র প্রথমে তা গ্রহণ করে, পরে সংকেতকে পরিবর্তিত করে নির্দেশক যন্ত্রে বা পর্দায় বিম্ব গঠন করে। ঐ বিম্বের প্রকৃতি থেকে রাডার দূরবর্তী অবস্থানের বিমান, জাহাজ বা নিম্নচাপের পরিষ্কার ধারণা দেয়। প্রেরক যন্ত্র থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সময়কে আলোর গতিবেগ দিয়ে গুণ করে রাডার থেকে ঐ বস্তুর দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব পাওয়া যায়। এর অর্ধেকই হচ্ছে রাডার থেকে ঐ বস্তুর দূরত্ব। এভাবেই রাডার বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করে। ১৯৩৫ সালে রাডার আবিষ্কৃত হয় তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

(b) তড়িৎ বিভব বা তড়িৎ প্রবাহকে বাড়াতে বা কমাতে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়। তারের প্রস্থচ্ছেদের ওপরই বিদ্যুতের প্রবাহ নির্ভর করে। তাই দূরে বিদ্যুৎ পাঠাতে হলে অধিক প্রস্থচ্ছেদের তার প্রয়োজন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আবার উচ্চ অ্যাম্পিয়ারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে লাইন লস অনেক বেড়ে যায়। এ জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিদ্যুৎ পাঠাতে বৈদ্যুতিক বিভব বা ভোল্টেজ বাড়ানো হয়। এতে অ্যাম্পিয়ার আনুপাতিক হারে কমে যায়। আবার বেশি ভোল্টেজ ব্যবহার করলে তারের ইনস্যুলেটরের খরচ অনেক বেড়ে যায়। এসব কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সাধারণত ১১০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সঞ্চালন ক্ষতি কমানোর জন্য একে ২,৩০,০০০ ভোল্টে উন্নীত করা হয় আবার গ্রাহকদের জন্য একে কমিয়ে ১১০০০, ৪৪০ অথবা ২২০ ভোল্ট হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এভাবে ভোল্টেজকে কমানো বা বাড়ানো যন্ত্রের নাম ট্রান্সফরমার।

ট্রান্সফরমারে থাকে নরম লোহার পাতের তৈরি অভ্যন্তরীণ দণ্ড। এ দণ্ডের উপর প্যাঁচানো পরস্পর থেকে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন তামার তারের দুটো কুণ্ডলী। এ কুণ্ডলী দুটি এক বাহুর ওপর বা ভিন্ন ভিন্ন বাহুর ওপর হতে পারে। দুই তারের আবর্তন বা পাক সংখ্যা আলাদা আলাদা থাকে। কুণ্ডলীর তারের এক প্রান্তে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসের সংযোগ এবং অপর প্রান্তে গ্রাহক প্রান্তের সরবরাহ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়। উৎসের কুণ্ডলীকে প্রাইমারি এবং অন্য কুণ্ডলীকে সেকেন্ডারি কুণ্ডলী বলে। সেকেন্ডারির পাকসংখ্যা-কম হলে প্রাইমারি অপেক্ষা বেশি ভোল্টেজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দু কুণ্ডলীর পাকসংখ্যার অনুপাতে দু পার্শ্বে দু রকম ভোল্টেজ পাওয়া যাবে সেই সাথে বিপরীত অনুপাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ, অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যাবে।

5. (a) **নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ :** নেটওয়ার্ক সিস্টেমে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলোর অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্কসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN)
২. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropoliton Area Network-MAN)
৩. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN)

১. **লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network-LAN) :** একই বিল্ডিং বা স্বল্প পরিসর জায়গার মধ্যে অবস্থিত কতকগুলো কম্পিউটার নিয়ে গঠিত নেটওয়ার্ককে বলা হয় লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। এ ধরনের নেটওয়ার্ক স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রিন্টার, স্ক্যানার, মডেম ইত্যাদি ডিভাইসগুলোকে শেয়ার দেয়া যাতে যে কোনো ইউজার তার নিজস্ব ওয়ার্কস্টেশন থেকে ডিভাইসগুলো ব্যবহার করতে পারে।

২. **মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropolitan Area Network-MAN) :** একই শহরের মধ্যে একাধিক কম্পিউটারের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ককে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা MAN বলে।

৩. **ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network-WAN) :** বিস্তৃত ভৌগোলিক এলাকাব্যাপী গড়ে ওঠা নেটওয়ার্ককে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা WAN বলে। ইন্টারনেট WAN এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইন্টারনেট সাধারণ ডায়ালআপ নেটওয়ার্কিং এবং ব্রডব্যান্ড প্রকৃতির হয়।

ব্রডব্যান্ডে রেডিও মডেম, ওয়্যারল্যাস, DSL, ADSL মডেম ব্যবহৃত হয়।

(b) একটি নেটওয়ার্কে বিভিন্ন কম্পিউটার এবং পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো ক্যাবল এর মাধ্যমে যে জ্যামিতিক সন্নিবেশে সংযুক্ত থাকে তাকে টপোলজি বলে। নেটওয়ার্কের প্রধান টপোলজিগুলো হচ্ছে–

ক. বাস টপোলজি (Bus Topology) খ. রিং টপোলজি (Ring Topology)
গ. স্টার টপোলজি (Star Topology) ঘ. ট্রি টপোলজি (Tree Topology)
ঙ. মেশ টপোলজি (Mesh Topology)

ক. **বাস টপোলজি (Bus Topology) :** বাস টপোলজিতে একটি মূল ক্যাবল থাকে এবং সেই ক্যাবলের সাথে বিভিন্ন কম্পিউটার সংযুক্ত থাকে। এ টপোলজির মূল সমস্যা হচ্ছে কোনো কারণে মূল ক্যাবলে সমস্যা দেখা দিলে পুরো সিস্টেমই অচল হয়ে যায়।

খ. **রিং টপোলজি (Ring Topology) :** এ পদ্ধতিতে একটি নেটওয়ার্কের সকল কম্পিউটার একে অন্যের সাথে কেবলের মাধ্যমে এমনভাবে সংযুক্ত থাকে যে, বৃত্তের ন্যায় একটি লুপের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের টপোলজিতে ক্যাবলের পরিমাণ কম লাগে। তবে এ পদ্ধতির সমস্যা হলো যদি কোনো কারণে কোনো একটি কম্পিউটারে বা ক্যাবলে সমস্যা দেখা দেয় তবে পুরো নেটওয়ার্কই ভেঙ্গে যায়।

গ. **স্টার টপোলজি (Star Topology) :** স্টার টপোলজির ক্ষেত্রে কেন্দ্রে একটি হাব বা সুইচ থাকে এবং এ হাব বা সুইচের সাথে সকল কম্পিউটারে সংযুক্ত থাকে। কম্পিউটারগুলো একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ পদ্ধতিতে ক্যাবল বেশি লাগে এবং কোনো কারণে হাব বা সুইচে সমস্যা দেখা দিলে পুরো নেটওয়ার্কই অচল হয়ে যায়।

ঘ. **ট্রি টপোলজি (Tree Topology) :** ট্রি টপোলজিতে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত কম্পিউটারগুলো সরাসরি কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত না থেকে একটি বিশেষ অন্তবর্তী মাথায় যুক্ত থাকে এবং পরে এ অন্তবর্তী মাথাকে উচ্চ গতিসম্পন্ন সংযোগ পথ দ্বারা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করা হয়।

ঙ. **মেশ টপোলজি (Mesh Topology) :** মেশ টপোলজি অনেকটা রিং টপোলজির মতো। ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কে এ টপোলজি ব্যবহার করা হয়। কারণ, এতে প্রতিটি নেটওয়ার্ক নোড WAN ভুক্ত সকল নোডের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। সংযোগ লাইনের দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় এর খরচ বেশি হয়।

(c) **মডেম :** মডেম হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যা কম্পিউটার ও টেলিফোন লাইনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তথ্যের আদান-প্রদানে সহায়তা করে। মডুলেশন (Modulation) এবং ডিমডুলেশন (Demodulation) এ দুইটি শব্দ থেকে মডেম (Modem) শব্দটির উৎপত্তি। মডুলেশন প্রক্রিয়ায় ডিজিটাল সিগন্যালকে এনালগ সিগন্যালে এবং ডিমডুলেশন প্রক্রিয়ায় এনালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তরিত করা যায়। কম্পিউটার কাজ করে ডিজিটাল মোডে এবং টেলিফোন কাজ করে অ্যানালগ মোডে। মডেমের প্রধান কাজ হলো কম্পিউটারের ডিজিটাল তথ্যকে অ্যানালগ মোডে এবং পরবর্তীতে অ্যানালগ মোড থেকে ডিজিটাল মোডে রূপান্তরিত করা, যাতে সেই তথ্য টেলিফোন লাইনের মাধ্যমে অপর প্রান্তের মডেমে পৌঁছে। আর অপর প্রান্তের মডেম সেই টেলিফোন বাহিত তথ্যগুলোর অ্যানালগ মোডকে আবার ডিজিটাল মোডে রূপান্তরিত করে অপর প্রান্তের কম্পিউটারের পর্দায় ফুটিয়ে তোলে।

মডেমের প্রকারভেদ : বর্তমানে বাজারে দুই ধরনের মডেম পাওয়া যায় :
১. ইন্টারনাল মডেম (Internal Modem)
২. এক্সটারনাল মডেম (External Modem)

১. **ইন্টারনাল মডেম (Internal Modem) :** ইন্টারনাল মডেম তুলনামূলকভাবে দামে সস্তা। এটি সাধারণত মাদার বোর্ডের নির্দিষ্ট স্লটে লাগাতে হয়। এ মডেমে বিদ্যুৎ খরচ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

২. **এক্সটারনাল মডেম (External Modem) :** এক্সটারনাল মডেমের দাম ইন্টারনাল মডেমের চেয়ে একটু বেশি। এটি তুলনামূলকভাবে ইন্টারনাল মডেমের চেয়ে ভাল। এটি সহজেই খুলে অন্য কম্পিউটারে লাগানো যায়।

মডেল প্রশ্ন ০৫ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ০৫

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য : *ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*

১. ক. নীল কাচের মধ্য দিয়ে সাদা ফুল নীল ও হলুদ ফুল কালো দেখায় কেন? চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা আগুনের একটি বৃত্ত দেখি কেন? ৪

খ. ডেঙ্গু জ্বর কি? কিসের অভাবে বেরিবেরি (Beriberi) রোগ হয়? এর উপসর্গগুলো লিখুন। ৪

গ. সনিক বুম (Sonic Boom) কাকে বলে? মিগ যুদ্ধজাহাজ উড়তে গেলে অনেক সময় বোমার শব্দ শোনা যায় কেন? ৪

ঘ. বিদ্যুৎচমক, বজ্রনাদ ও বজ্রপাত কাকে বলে? ৪

ঙ. অপটিক্যাল ফাইবার বলতে কি বোঝায়? ইস্পাত রবারের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক কেন? ৪

২. ক. শীতপ্রধান দেশে বরফের নিচে প্রাণী কিভাবে বেঁচে থাকে? ২

খ. বজ্র নিবারক কাকে বলে? এটা কিভাবে বজ্রপাতের ক্ষতি থেকে ঘরবাড়ি ইত্যাদি রক্ষা করে? ২

গ. ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয় কেন? ২

ঘ. বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে পারে না কেন? ২

ঙ. মানুষ নাক ডাকে কেন? ২

৩. ক. সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় কি? ২½

খ. রাফেজযুক্ত খাবারের উপকারিতা কি? ২½

গ. DNA (Deoxyribonuclic Acid)-এর বৈশিষ্ট্য ও কাজ কি কি? ২½

ঘ. ব্যাঙ শীতকালে অদৃশ্য হয় কেন? ২½

৪. ক. সোনায় মরিচা ধরে না কেন? ক্যারেট (Carat) কি? ২

খ. ওজোন কি? প্রকৃতিতে কিভাবে ওজোন উৎপন্ন হয়? ২

গ. গ্রিন ভিট্রিওল কি? ব্লু ভিট্রিওল কি? ২

ঘ. ভূমি থেকে কিছু উপরে একই উচ্চতা থেকে একই জাতীয় একটি ভারী ও হালকা বস্তু বিনা বাধায় নিচে পড়তে থাকলে কোন বস্তুটি আগে মাটিতে পড়বে? কেন? ২

ঙ. আর্সেনিক কি? পানিতে কিভাবে আর্সেনিক দূষণ ঘটে? ২

৫. ক. কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল কি? শ্বেত বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ বলতে কি বোঝায়? ২½

খ. কিলোওয়াট-ঘণ্টা কি? ট্রান্সফর্মার কি? এটি কত প্রকার ও কি কি? ২½

গ. 'প্রতিপ্রভা', 'অনুপ্রভা' ও 'তাপাপন' কাকে বলে? ২½

ঘ. আকুপাংচার কি? ২½

৬. ক. বন উজারের ফলে কি কি ক্ষতি হয়? ২½

খ. লেসার (LASER) কি? ২½

গ. একটি কার্বুরেটরের কাজ কি? ২½

ঘ. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধা কি কি? ২½

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৫

১. ক. **নীল কাচের মধ্য দিয়ে সাদা ফুল নীল ও হলুদ ফুল কালো দেখানোর কারণ :** কোনোর বস্তুর উপর আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসলে সে বস্তুটি আমরা দেখতে পাই। প্রতিফলিত আলোর যে বর্ণ থাকে বস্তুটিকেও আমরা সেই বর্ণের দেখি। একটি সাদা ফুল সূর্যের সাতটি আলোই প্রতিফলিত করে বলে তা সাদা দেখায়। সাদা ফুল থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি যখন নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসে তখন ঐ কাচ নীল ব্যতীত অন্যসব বর্ণের আলো শোষণ করে নেয়, তাই আমাদের চোখে শুধু নীল আলো পৌঁছে। ফলে ফুলটি নীল দেখায়। পক্ষান্তরে, হলুদ ফুল শুধু হলুদ বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে বলে তা হলুদ দেখায়। কিন্তু হলুদ বর্ণের আলোক নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসার সময় শোষিত হয় তাই হলুদ ফুলকে নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে কালো দেখায়।

চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা আগুনের একটি বৃত্ত দেখার কারণ : চোখের দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বকাল ০.১ সেকেন্ড। চোখের সামনে কোনো বস্তু রাখলে রেটিনায় তার বিম্ব গঠিত হয়। যদি বস্তুটিকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে ০.১ সেকেন্ড পর্যন্ত এর অনুভূতি মস্তিষ্কে থেকে যায়। কোনো বস্তুকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে এক সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগের মধ্যে যদি বস্তুকে আবার চোখের সম্মুখে আনা হয় তাহলে দর্শনানুভূতির স্থায়িত্বের জন্য বস্তুটির মাঝখানের অনুপস্থিতি টের পাওয়া যায় না। তাই চোখের সামনে একটি জ্বলন্ত মশাল জোরে ঘুরালে আমরা আগুনের একটি বৃত্ত দেখি।

খ. **ডেঙ্গু জ্বর :** ডেঙ্গু ফিভার বা জ্বর এক ধরনের ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। শারীরিক দুর্বলতা, ফুসকুড়ি ও লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া এ রোগের উপসর্গ। এডিস ইজিপটি নামক এক জাতীয় মশা এ ভাইরাসের বাহক। এ মশার একটি বৈশিষ্ট্য হলো, এরা সাধারণত দিনের বেলায় মানুষকে কামড়ায়, গরম কালে শহর এলাকায় জলাবদ্ধ স্থানে এরা বংশবিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে গরমকালেই এদের বংশবিস্তার বেশি হয়ে থাকে। এ ভাইরাসকে ডেঙ্গু ভাইরাসও বলা হয়। ডেঙ্গু ভাইরাস বহনকারী মশা যাদেরকে কামড়ায় তারাই ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। তাছাড়াও এ মশা কোনো আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ানোর পরে কোনো সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ালে সেই ব্যক্তিটিও ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হবে। তাই বলা যায়, ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তিটিও এ রোগ ছড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

বেরিবেরি রোগের কারণ : ভিটামিন বি$_১$-এর (থিয়ামিন) অভাবজনিত রোগ। আলফা-কিটো এসিড-এর ডি-কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ায় থায়ামিন একটি কো-এনজাইম (সহ-অনুঘটক) রূপে কাজ করে। শর্করার স্বাভাবিক বিপাকক্রিয়ার জন্য এটা প্রয়োজনীয়। স্নায়ুতন্ত্রের স্বাভাবিক উদ্দীপনা পরিবহন ক্ষমতা বজায় রাখার জন্যও থিয়ামিন দরকারি।

বেরিবেরির উপসর্গ

i. **শোথযুক্ত বেরিবেরি (wet beriberi) :** বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্তজালিকার প্রসারণের (dilatation) ফলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালনের মাত্রা বেড়ে যায়। এছাড়া শরীরে পানি জমে যায় বা শোথ হয়। ক্ষেত্রবিশেষে হৃৎপিণ্ড বিকল (heart failure) হতে পারে এবং রোগির মৃত্যু হতে পারে।

ii. ভারনিক এনসেফালোপ্যাথি (veraick's encephalopathy) : এরা সাধারণত মানসিক ভারসাম্যহীনতা, চোখের সমস্যা, স্মৃতিভ্রষ্টতা ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আসে।

iii. শুকনো বেরিবেরি : এখানে মূলত স্নায়ুতন্ত্রে সমস্যা দেখা দেয়। সেনসরি (sensory) এবং মোটর (motor) স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ঝিনঝিন করা, পেশীর দুর্বলতা ইত্যাদি নানা রকম লক্ষণ দেখা দেয়।

ঢেঁকি ছাঁটা চাল, গমের আটা, শিম, বরবটি, ঈষ্ট, মাছের ডিম, মাংস ইত্যাদি খাবারে প্রচুর ভিটামিন বি$_1$ থাকে। উপযুক্ত খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সহজেই বেরিবেরি প্রতিরোধ করা সম্ভব।

গ. **সনিক বুম :** শব্দশক্তি জড় মাধ্যমের ভেতর দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১১৫৬ ফুট হিসেবে সঞ্চালিত হয়। জাহাজ উড়ার সময় ভয়ানক শব্দ হয় এবং এ শব্দতরঙ্গও সেকেন্ডে ১১৫৬ ফুট হিসেবে জাহাজের চারদিকে সঞ্চালিত হতে থাকে। জাহাজটি শব্দ উৎপাদন করে এক জায়গায় স্থির না থেকে তার সামনের দিকের ধাবমান শব্দতরঙ্গের পিছু পিছু ছুটতে থাকে। জাহাজের গতিবেগ যত বাড়তে থাকে শব্দ তরঙ্গও জাহাজের মধ্যে দৌড়ের প্রতিযোগিতার মতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। জাহাজের গতি এক সময় শব্দের বেগকে ছাড়িয়ে যায়। তখনই জাহাজ শব্দতরঙ্গ কর্তৃক সৃষ্ট তরঙ্গ দেয়াল ভাঙ্গে এবং ভীষণ শব্দ হয়। আজকাল শব্দের দ্বিগুণ, তিনগুণ ইত্যাদি দ্রুতগতি সম্পন্ন যুদ্ধ জাহাজ বানান হয়েছে। শব্দের দ্বিগুণ বেগে কোনো জাহাজ চলতে গেলে শব্দের সর্বোচ্চ বেগকে অতিক্রম করা কালীন পর পর দুইবার এবং তিনগুণ বিশিষ্ট জাহাজের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গতি অর্জনের সময় যাবত পর পর তিনবার শব্দ শোনা যাবে। এ শব্দ ঠিক যেন বোমা পড়ার শব্দ। আসলে এটি সনিক বুম।

ঘ. **বিদ্যুৎ চমক :** মেঘ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি কণার সমষ্টি। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার আয়ন (ধন ও ঋণ) থাকে। এসব আয়নের ওপর জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি কণার সৃষ্টি করলে মেঘ ধনাত্মক বা ঋণাত্মক আধান লাভ করে। এরূপ বিপরীত ধর্মী দুটি মেঘ কাছাকাছি আসলে আকর্ষণের ফলে চার্জ এক মেঘ থেকে অন্য মেঘে দ্রুত ছুটে যায়। ফলে ইলেকট্রনের (চার্জ) গতিপথে যে তীব্র আলোক উৎপন্ন হয় তাকে বিদ্যুৎচমক বলে। এ সময় আলোর সাথে প্রচুর তাপও উৎপন্ন হয়।

বজ্রনাদ : বিদ্যুৎ চমকানোর সময় স্ফুলিঙ্গ যে পথে যায় ঐ পথের আশপাশের বায়ু হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয় এবং পরমুহূর্তে শীতল ও সঙ্কুচিত হয়। বায়ুর দ্রুত সংকোচন ও প্রসারণের দরুন তীব্র শব্দের সৃষ্টি হয়। একে বজ্রনাদ (Thunder) বলে।

বজ্রপাত : অতিরিক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চিত কোনো মেঘ ভূপৃষ্ঠের নিকটে নেমে আসলে ভূপৃষ্ঠে বিপরীত ধর্মী আবেশের সৃষ্টি হয় এবং এর আকর্ষণে মেঘের বিদ্যুৎ হঠাৎ পৃথিবীতে শব্দ সহকারে ছুটে আসলে তাকে বজ্রপাত বলে।

ঙ. **অপটিক্যাল ফাইবার :** অপটিক্যাল ফাইবার একই সঙ্গে বিভিন্ন ঘনত্বের স্বচ্ছ কাচ নির্মিত তারবিশেষ। বেশ কয়েক স্তরে সজ্জিত কাচের ঘনত্ব বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে ক্রমশ ঘন হয়ে থাকে। ফলে প্রতিসরাঙ্ক ভেতরের দিকে বাড়তে থাকে। শব্দ শক্তির পরিবর্তিত বিদ্যুৎ সিগনালকে দ্রুত ও বিকৃতি ছাড়া প্রেরণের জন্য আলোক সিগনালে রূপান্তর করা হয়। এ রূপান্তরিত আলোক সিগনালকে পাঠানোর জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়। পরবর্তীতে এ আলোক সিগনাল ক্রমান্বয়ে বিদ্যুৎ ও শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। বর্তমানে টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, টেলিভিশন ইত্যাদিতে সিগনালকে অপটিক্যাল ফাইবার-এর মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে।

ইস্পাত রবারের চেয়ে বেশি স্থিতিস্থাপক : নির্দিষ্ট বিকৃতি সৃষ্টি করতে যে বস্তুতে যতো বেশি বল প্রয়োগ করতে হয় তাকে ততো বেশি স্থিতিস্থাপক বলা হয়। দেখা যায়, একই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থচ্ছেদ বিশিষ্ট রবার ও ইস্পাতের তারে সমান দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতে রবারের তুলনায় ইস্পাতের তারে বলপ্রয়োগ করতে হয় অনেক বেশি। এজন্য রবারের তুলনায় ইস্পাতের স্থিতিস্থাপকতা অনেক বেশি।

২. ক. **শীতপ্রধান দেশে বরফের নিচে প্রাণী যেভাবে বেঁচে থাকে :** পানি একটি ব্যতিক্রমধর্মী তরল পদার্থ। 4° C তাপমাত্রায় এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং সর্বাপেক্ষা ভারী। শীতপ্রধান দেশে নদী বা সমুদ্রের পানি ঠাণ্ডা বায়ুর সংস্পর্শে শীতল ও ভারী হয়ে নিচে চলে যায় এবং নিচের উষ্ণ ও হালকা পানি ওপরে ওঠে আসে। এভাবে ক্রমশ নিচের পানি ঠাণ্ডা হতে থাকে এবং এক সময় এর তাপমাত্রা 4° সে-এ পৌছায়। তখন এ পানি সবচেয়ে ভারী হয় এবং নিচেই থেকে যায়। কারণ উপরের পানির তাপমাত্রা আরো নিচে নামলেও তা নিচের পানি অপেক্ষা হালকা হয় বলে উপরেই থেকে যায়। তাছাড়া পানি তাপের কুপরিবাহী বলে উপরের পানি বরফে পরিণত হলেও নিচের পানি ৪ সে. তাপমাত্রায় থেকে যায়। ফলে জলাশয়ের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী সহজেই বেঁচে থাকে।

খ. **বজ্র নিবারক :** ঘরবাড়ি, অট্টালিকা প্রভৃতিকে বজ্রপাতের ক্ষতিকর হাত থেকে রক্ষার জন্য যে তীক্ষ্ণাগ্র পরিবাহী ব্যবহার করা হয়, তাকে বজ্র নিবারক বলে। বজ্র নিবারক দণ্ডের এক প্রান্তে একটি ধাতব পাত এবং অপর প্রান্তে কয়েকটি তীক্ষ্ণ সূচিমুখ বিশিষ্ট পরিবাহী থাকে। বাড়ির ছাদের উচ্চতম প্রান্তে সূচিমুখ রেখে দণ্ডের ধাতব পাতটি মাটির নিচে পুঁতে রাখা হয়। যখন কোনো চার্জ মেঘ পরিবাহীর নিকটে আসে তখন ঐ চার্জ অতি সুপরিবাহী দণ্ডের মধ্য দিয়ে মাটিতে চলে যায়। ফলে ঘরবাড়ি বজ্রপাতের হাত থেকে রক্ষা পায়।

গ. **ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলার কারণ :** উদ্ভিদের মতো নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণে ব্যাকটেরিয়াকে উদ্ভিদ বলা হয়।

ক. ব্যাকটেরিয়ার কোষপ্রাচীর দৃঢ় প্রকৃতির। কিছু কিছু প্রজাতিতে সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ উপস্থিত থাকে।
খ. কিছু ব্যাকটেরিয়া স্বভোজী এবং অজৈব যৌগ হতে জৈব খাদ্য সংশ্লেষণ ক্ষমতাসম্পন্ন।
গ. ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি উদ্ভিদের মতো। কোষপ্রাচীরের মাধ্যমে তরলাবস্থায় খাদ্যগ্রহণে সক্ষম।
ঘ. ব্যাকটেরিয়ার কোষের গঠন অনেকটা থ্যালোফাইটার মতো।
ঙ. ব্যাকটেরিয়া ছত্রাকের সাথে সম্পর্কযুক্ত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

ঘ. **বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে না পারার কারণ :** পাখি তার ডানার সাহায্যে আকাশে ওড়ে। পাখি দু ডানা দিয়ে ডানার নিচে বাতাসে আঘাত করে অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে, এটি হলো ক্রিয়া। এর ফলে বাতাসও নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী পাখির উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে, এটি হলো প্রতিক্রিয়া। বলের কারণে পাখি উড়তে পারে। বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে পারে না। কারণ ডানা নিচের দিকে আঘাত করলেও বাতাস না থাকায় ডানার ওপর প্রয়োগ করার মতো বিপরীতমুখী বল অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয় না। তাই পাখি বায়ুশূন্যস্থানে উড়তে পারে না।

ঙ. **মানুষ নাক ডাকার কারণ :** কারো যদি নাক ডাকে, তখন দুটো জিনিস লক্ষ্য করতে হবে। প্রথম ব্যাপারটি হলো যার নাক ডাকছে দেখা যাবে তিনি চিত হয়ে শুয়ে আছেন। দ্বিতীয়ত, তখন তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মানুষ যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন তার শ্বাস-প্রশ্বাসও গভীর হয়। যখন কেউ চিত হয়ে শুয়ে থাকে তখন তার জিব গলবিলের ভেতরে চলে যায়- ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার পথ কিছুটা

সংকীর্ণ হয়ে আসে। যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে তখন নিঃশ্বাস নেয়ার সময় ওই সংকীর্ণ পথে বাতাস যেতে আসতে বাধা প্রাপ্ত হয়। এর ফলে বাতাসের বেগ আরও বেড়ে যায়।

তালুর পেছনে যে নরম তালু আছে বাতাসের তীব্রতার জন্য তখন সেখানে কম্পনের সৃষ্টি হয় এবং এক ধরনের আওয়াজ হয়। তাকেই আমরা বলি নাক ডাকা বা নাসিকা গর্জন। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকার সময় কারো যদি নাক ডাকে, তখন উচিত হবে তাকে কাত করে শুইয়ে দেয়া। তখন আপনা থেকেই নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ পাশ ফিরিয়ে শোয়ানোর ফলে জিভ আবার স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে আসবে। নাকের ছিদ্রপথ খোলা হয়ে যাবে। বাতাস যেতে আসতে আর বাধাগ্রস্ত হবে না। তখন আপনা থেকে নাক ডাকাও বন্ধ হয়ে যাবে।

৩. ক. **সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় :** বায়ুমণ্ডলে বাতাসের ঘূর্ণনের দিক যদি পৃথিবীর ঘূর্ণনের দিকের সদৃশ হয় তবে তাকে সাইক্লোন (Cyclone) বলে। ঘড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, সাইক্লোন দক্ষিণ গোলার্ধে সেদিকে ঘোরে। উত্তর গোলার্ধে সাইক্লোন ঘোরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে। আবহাওয়া বিজ্ঞানে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় শুধু তখনই বলা হয় যখন ভূপৃষ্ঠে বাতাসের বেগ প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। এমনকি তা শত শত কিলোমিটার হতে পারে (গ্রীষ্মমণ্ডলীয় সাইক্লোন)। সাইক্লোনের কেন্দ্রে বাতাসের চাপ থাকে খুব কম। এজন্য অনেক সময় সাইক্লোনকে নিম্নচাপ বলা হয়।

খ. **রাফেজযুক্ত খাবারের উপকারিতা :** শস্যদানা, ফল এবং সবজির অপাচ্য তন্তুময় অংশ রাফেজ নামে পরিচিত। ফল ও সবজির রাফেজ মূলত সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর। রাফেজযুক্ত খাবার একটি দৃঢ় স্ফীত পিণ্ড গঠন করে। ফলে খাদ্যনালীর পেশীর ক্রমসংকোচন সঞ্চালনে সহজেই স্থানান্তরিত হয়। রাফেজযুক্ত খাদ্য বিষাক্ত বর্জ্যনীয় বস্তুকে খাদ্যনালী থেকে পরিশোষণ করে। উচ্চ তন্তুযুক্ত খাদ্য খাদ্যনালীর ক্যান্সারের আশঙ্কা হ্রাস করে। তন্তুযুক্ত খাবার স্থূলতা হ্রাস করে ক্ষুধার প্রবণতা হ্রাস করে। এটি যেসব খাবারে থাকে সেগুলো কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, খাদ্যনালীর ক্যান্সার ইত্যাদি হ্রাস করে।

গ. **DNA-র বৈশিষ্ট্য**

ক. DNA বংশগতির বাহক

খ. ক্রোমোজোমের ভিতর DNA একটি আবশ্যক সুনির্দিষ্ট অঙ্গ।

গ. কোষের বৃদ্ধি ও বিভাজনের সময় এরা নির্ভুল প্রতিলিপি গ্রহণ করতে পারে।

ঘ. DNA অণু স্থায়ী, তথাপি প্রাকৃতিক কিংবা কৃত্রিম উপায়ে DNA-এর বেস পরিবর্তিত করে স্থায়ীভাবে নতুন ধরনের DNA সৃষ্টি করতে পারে। এই পরিবর্তনকে মিউটেশন বলে।

ঙ. কোনো কারণে এর বেস নষ্ট হলে নিউক্লিওপ্লাজম থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে DNA-র স্থায়িত্ব নষ্ট হয় না।

DNA-র কাজ

ক. বংশগতি বৈশিষ্ট্যের বাহক হিসেবে কাজ করে;

খ. RNA (Ribonuclic Acid) সংশ্লেষণ করে;

গ. কোষের প্রোটিন সংশ্লেষণ করে;

ঘ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোষের যাবতীয় জৈবিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

ঘ. **ব্যাঙ শীতকালে অদৃশ্য হওয়ার কারণ :** আমাদের মতো ব্যাঙের রক্ত উষ্ণ নয়, শীতল। শীতের শুরুতে যখন আশেপাশের তাপমাত্রা কমতে থাকে তখন ব্যাঙের দেহের তাপমাত্রাও কমতে থাকে। এ কারণে এদের শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের গতি কমে যায়। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তখন ব্যাঙ পুকুর, জলাশয় বা ডোবার তলদেশে নরম মাটির নিচে আত্মগোপন করে। মাটির নিচে তারা প্রায় ৬০ সেন্টিমিটার গভীর পর্যন্ত চলে যায়। সেখানে তারা অসাড়, অবশ অবস্থায় পুরো শীতকালই বিশ্রামে কাটায়। একেই ব্যাঙের শীতনিদ্রা (Hibernation) বলে। এ সময় এদের শরীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ খুব ধীর গতিতে চলতে থাকে।

এ সময় ব্যাঙ চোখ, মুখ ও কান বন্ধ রাখে। এমনকি এদের শ্বাসপ্রশ্বাস ও ভিজা গায়ের চামড়ার মধ্য দিয়ে চলে। একে ব্যাঙের ত্বকীয় শ্বসন বলে। এ সময় বেঁচে থাকার জন্য এদের শরীরে সঞ্চিত চর্বি ও গ্লাইকোজেন এরা কাজে লাগায়।

৪. ক. **সোনায় মরিচা না ধরার কারণ :** সোনা একটি নিষ্ক্রিয় ধাতু। নিষ্ক্রিয় ধাতুগুলো ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ স্তরে অষ্টক পূর্ণ থাকায় এরা অন্য কোনো পদার্থের ইলেকট্রন গ্রহণ কিংবা নিজের ইলেকট্রন বর্জন করে না। বাতাসে যেসব উপাদান আছে তাদের সাথে এ ধাতু কোনো যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে না বা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে না। এ জন্যই সোনায় মরিচা ধরে না।

ক্যারেট (Carat) : ক্যারেট হচ্ছে মুক্তা ব্যতীত অন্যান্য রত্নপাথরের ওজনের একক। একে মেট্রিক ক্যারেটও (m.c.) বলা হয়। আন্তর্জাতিকভাবে ক্যারেট এর ওজন নির্দেশিত হয়েছে ২০০ মিলিগ্রাম। মুক্তার ওজনের এককের নাম গ্রেন (grain)। এক গ্রেন = ৫০ মিলিগ্রাম বা ১/৪ ক্যারেট।

খ. **ওজোন :** ওজোন অক্সিজেনের একটি রূপভেদ। এর সংকেত O_3. অক্সিজেনের প্রতি অণুতে দুই পরমাণু অক্সিজেন এবং ওজোনের প্রতি অণুতে তিন পরমাণু অক্সিজেন রয়েছে। এ গঠন-পার্থক্যের কারণে এদের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রকৃতিতে ওজনের উৎপত্তি : বায়ুতে সামান্য পরিমাণে ওজোন বিদ্যমান। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি বা বজ্রবিদ্যুতের সংস্পর্শে বায়ুর স্বল্প অক্সিজেন ওজোন পরিণত হয়। এজন্য বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে ওজোন স্তর গঠিত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন অনবরত ওজোনে পরিণত হয়, আবার ওজোন ভেঙ্গে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়।

গ. **গ্রিন ভিট্রিওল :** গ্রিন ভিট্রিওলের বাংলা নাম হিরাকস। এর সংকেত $FeSO_4, 7H_2O$। এটি সবুজ রঙের দানাদার পদার্থ।

ব্লু ভিট্রিওল : কপার সালফেট ($CuSO_4$) বা তুঁতের বিশেষ নাম ব্লু ভিট্রিয়ল। এটি নীলবর্ণের দানাদার বিষাক্ত পদার্থ। পদার্থটি পোকামাকড় ধ্বংস করার কাজে লাগে।

ঘ. **একই উচ্চতা থেকে একই জাতীয় একটি ভারী ও হালকা বস্তু বিনা বাধায় নিচে পড়তে থাকলে যে বস্তুটি আগে মাটিতে পড়বে :** একই উচ্চতা থেকে একই জাতীয় একটি ভারী ও হালকা বস্তু বিনা বাধায় নিচে পড়তে থাকলে বস্তু দুটি একই সাথে মাটিতে পড়বে।

সমদূরত্বে একটি ভারী ও হালকা বস্তুর মধ্যে অভিকর্ষজ ত্বরণ একই হবে। কারণ, অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' বস্তুর ভরের ওপর নির্ভরশীল নয়, এটি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুর মধ্যকার দূরত্বের ওপর নির্ভরশীল। তাই একই দূরত্বে থেকে ভিন্ন ভরের দুটি বস্তু বিনা বাধায় একই সময়ে মাটিতে পড়বে।

ঙ. **আর্সেনিক :** আর্সেনিক একটি স্ফটিকাকার ধাতব মৌল। এটি পানিতে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। পানিতে এর স্বাভাবিক মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার। মানুষের আর্সেনিক সহনীয় মাত্রা পানিতে ০.০৫ মিলিগ্রাম/লিটার। ভূগর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে পানিতে আর্সেনিকের আধিক্য ঘটে এবং পানির আর্সেনিক দূষণ ঘটে।

পানিতে আর্সেনিক দূষণ : মাটিতে যৌগ হিসেবে আর্সেনিক থাকে। নলকূপের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের কারণে পানির স্তর পানিশূন্য হয়। নলকূপের মাধ্যমে বাতাসের অক্সিজেন এ পানিশূন্য স্তরে পৌঁছে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে আর্সেনিক মুক্ত করে। এই মুক্ত আর্সেনিক নলকূপের পানির সাথে মিশে ওপরে উঠে আসে।

৫. ক. **কৃষ্ণগহ্বর বা ব্ল্যাকহোল :** জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাকাশের ছায়াবৃত্ত অঞ্চলসমূহ কিছু কিছু বৃহৎ নক্ষত্রের ধ্বংসাবশেষ। সূর্য থেকে ৩ গুণ বেশি ভরের নিউট্রন তারকা যখন সংকুচিত হতে থাকে তখন তার ভর এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, একটি কেন্দ্রীয় বিন্দুতে তা জমা হয়। তখন এর ঘনত্ব দাঁড়ায় অসীম। এ তারা থেকে তখন কোনো পদার্থ এমনকি আলোও বেরিয়ে আসতে পারে না। তারাটি একটি অভেদ্য দিগন্তের পর্দার আড়ালে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। তারকার এ অবস্থাকে বলা হয় ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণ গহ্বর। ব্ল্যাকহোল নামকরণটি করেছিলেন মার্কিন পদার্থবিদ জন হুইলার (১৯৫৭)।

শ্বেত বামন বা হোয়াইট ডোয়ার্ফ : মধ্যমাকৃতির তারকা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রাকৃতির কোনো তারকার জ্বালানি যখন ফুরিয়ে যায় তখন সেটি সংকুচিত হয়ে পরিণত হয় অনুজ্জ্বল তারকায়। এটি দেখতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং সাদা রঙের। এগুলোকে শ্বেত বামন বলা হয়। উল্লেখ্য, লাল দানব আরও সংকুচিত হয়ে শ্বেত বামনে পরিণত হয়। মহাকর্ষ বলকে উপেক্ষা করে তারার এ বামন অবস্থাকে ধরে রাখে এর পরমাণুর অভ্যন্তরের ইলেক্ট্রনের বহির্ভাগ।

খ. **কিলোওয়াট-ঘন্টা :** আন্তর্জাতিকভাবে সারা বিশ্বে তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বাড়িতে, কলকালখানায় যে তড়িৎ সরবরাহ করে তার পরিমাপ শক্তির একক অনুযায়ী করে। তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান কিলোওয়াট-ঘন্টা এককে শক্তি পরিমাপ করে। এ একককে বোর্ড অব ট্রেড ইউনিট বা সংক্ষেপে শুধু ইউনিট বলে। এক কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো তড়িৎযন্ত্র এক ঘন্টা ধরে চালু রাখলে যে পরিমাণ তড়িৎশক্তি ব্যয় করে তাকে এক কিলোওয়াট ঘন্টা বলে।

ট্রান্সফর্মার : যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে অথবা উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে বলা হয় ট্রান্সফর্মার। ট্রান্সফর্মার দু প্রকার। ক. উচ্চধাপী, খ. নিম্নধাপী।

উচ্চধাপী : এ যন্ত্র অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে।

নিম্নধাপী : এ যন্ত্র অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে।

গ. **প্রতিপ্রভা :** এমন কতগুলো বস্তু আছে যেগুলোর উপর এক বর্ণের আলো পড়লে বস্তুটি ভাস্বর হয় এবং অন্য বর্ণের আলো দিতে থাকে। একে প্রতিপ্রভা বলে এবং বস্তুগুলোকে প্রতিপ্রভ বস্তু বলে। সাধারণত যে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো পড়ে প্রতিপ্রভ বস্তু তার চেয়ে বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করে। যেমন– অতিবেগুনি আলো পড়লে দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। কুইনাইন, সালফেট, ইউরেনিয়াম ইত্যাদি প্রতিপ্রভ বস্তুর উদাহরণ। কোনো প্রতিপ্রভ বস্তুর উপর যতক্ষণ আলো ফেলা হয় প্রতিপ্রভাও ততক্ষণ দেখা যায়।

অনুপ্রভা : এমন কতগুলো বস্তু আছে যাদের সাদা আলোয় কিছুক্ষণ উন্মুক্ত রেখে আলো সরিয়ে নিলেও অন্ধকারে কিছুক্ষণ আলো দেয়। একে অনুপ্রভা বলে এবং বস্তুগুলোকে অনুপ্রভ বস্তু বলে। ক্যালসিয়াম সালফাইড, বেরিয়াম সালফাইড প্রভৃতি অনুপ্রভ বস্তু।

তাপাপন : এটি প্রতিপ্রভার ঠিক বিপরীত ঘটনা। কোনো বস্তু দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো শোষণ করে ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো বিকিরণ করলে তাকে তাপাপন বা ক্যালোরেসেন্স বলে। এক্ষেত্রে সাধারণত অবলোহিত আলো শোষিত হয় এবং দৃশ্যমান আলো নির্গত হয়। কার্বন ডাই-সালফাইডে আয়োডিন দ্রবণ তাপাপন প্রদর্শন করে।

ঘ. **আকুপাংচার :** আকুপাংচার এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি। Acus ও Puncture শব্দ দুটি থেকে আকুপাংচার (Acupuncture) কথাটি এসেছে। Acu শব্দের অর্থ সুই এবং Puncture শব্দের অর্থ ফোটানো। সুতরাং আকুপাংচার শব্দের আক্ষরিক অর্থ সুই ফোটানো। রোগ নিরাময়ে স্টেইনলেস স্টিলের সুই-এর প্রয়োগ প্রণালীই হলো আকুপাংচার। আকুপাংচার বা সুই ফুটিয়ে রোগের চিকিৎসা চীনের মানুষের হাজার হাজার বছরের গবেষণার ফল। এ চিকিৎসা পদ্ধতিতে শরীরের বিভিন্ন বিন্দুতে ছোট ছোট সুই ফুটানো হয়। উক্ত সব বিন্দুর সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের একটি মানচিত্র চীনের আকুপাংচার বিশেষজ্ঞরা তৈরি করেছেন। তারা মানব শরীরে সর্বমোট ৭৮৭টি ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু নির্ধারণ করেন। এই চিকিৎসা পদ্ধতিতে সুচগুলো গভীরে ফোটানো হয় না এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রাণাবিহীন। এ ধরনের কোনো চিকিৎসা মাত্র দশ মিনিট কাল স্থায়ী হয়। অবশ্য এই পদ্ধতিতে প্রথমে পাথরের সুই এবং পরে বাঁশের সুই ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে স্টেইনলে স্টিলের সুই ব্যবহৃত হয়।

৬. ক. বন উজারের ফলে নিম্নোক্ত ক্ষতিসমূহ হয়ে থাকে :

(ক) পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। (খ) অকাল বৃষ্টিপাত বা অধিক বৃষ্টিপাত তথা অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। (গ) মৃত্তিকাক্ষয় বৃদ্ধি পায়। (ঘ) ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। (ঙ) বন্য জীবজন্তুর সংখ্যা হ্রাস পায়।

খ. Light Amplification by Stimulated Emission Radiation-কে সংক্ষেপে LASER বলে। পদার্থের পরমাণু উত্তেজিত করে কোয়ান্টাম অবস্থায় আনতে পারলেই LASER রশ্মির উদ্ভব ঘটে। লেসার রশ্মি ডাক্তারের সিজারের মতো কাজ করে থাকে। ফলে এর সাহায্যে মানুষের চোখ, দাঁত ইত্যাদি অঙ্গে সফল অস্ত্রোপচার করা হয়। এছাড়া পারমাণবিক বিকিরণেও এ রশ্মি সহায়তা করে থাকে।

গ কার্বুরেটরের কাজ হচ্ছে জ্বালানি প্রজ্জ্বলিত হবার পূর্বে জ্বালানিকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করে বায়ুর সাথে মিশ্রিত করা, যাতে তা সহজেই কমবাশন (Combustion) চেম্বারে পুড়ে শক্তি প্রদান করতে পারে।

ঘ. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহারের সুবিধা :

ক. পরিবেশ দূষণের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হয়।

খ. গ্যাসে জ্বালানি খরচ কম হয়।

গ. গৃহিণীর কাছে অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার অপেক্ষা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

মডেল টেস্ট ০৫

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : *প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে*]

নম্বর

১. (a) Intercom বলতে আপনি কি বুঝেন? ২
(b) ফ্রিওয়্যার এবং শেয়ারওয়্যার এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। ২
(c) Web-Server কি? ২
(d) Unicode কি? ২
(e) এন্টি-ভাইরাস কি? ২

২. (a) কম্পিউটার বলতে আপনি কি বুঝেন? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৪
(b) পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার বলতে আপনি কি বুঝেন? ২
(c) System Software কিভাবে চালু করা হয়? ৪

৩. (a) System development life cycle কি? এর যে কোনো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৫
(b) এনিমেশন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ৫

৪. (a) Boolean Algebra কি? ২
(b) ডিজিটাল সিস্টেম কি? ২
(c) PROM, EPROM এবং EEPROM কি? ২+২+২=৬

৫. (a) সেমি-কন্ডাকটর বলতে আপনি কি বুঝেন? ২
(b) Zener Diode-এর প্রয়োগ আলোচনা করুন। ৪
(c) LED কি? এর প্রয়োগ আলোচনা করুন। ৪

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৫

১. **(a)** ইন্টারকম হলো স্বল্প দূরত্বে কার্যক্ষম ব্যক্তিগত টেলিফোন নেটওয়ার্ক। এ নেটওয়ার্কে অল্প কিছু টেলিফোনের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকে। যেসব টেলিফোনের মধ্যে সংযোগ থাকে, সেগুলোতে শুধু বোতাম টিপেই কথা বলা যায়।

(b) ফ্রিওয়্যার ও শেয়ারওয়্যার দুই ধরনের ব্যবহারিক সফটওয়্যার। ফ্রিওয়্যারের জন্য কোনো খরচ দিতে হয় না। অনেক প্রোগ্রামার বা প্রতিষ্ঠান তাদের উদ্ভাবিত সফটওয়্যার সর্বসাধারণের ব্যবহারের সুযোগ দেয়। এ সফটওয়্যারকে বলা হয় ফ্রিওয়্যার। সামান্য রেজিস্ট্রেশন ফি এর বিনিময়ে শেয়ারওয়্যার ব্যবহার করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক রকম ফ্রিওয়্যার ও শেয়ারওয়্যার সংগ্রহ করা যায়।

(c) ইন্টারনেটের সাথে পরস্পর স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থেকে যে কম্পিউটারটি অন্যান্য কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ ঘটিয়ে দেয় তাকেই বলে ওয়েব-সার্ভার।

(d) পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশের ভাষা বিভিন্ন রকম। আবার প্রত্যেক ভাষাতে রয়েছে অসংখ্য বর্ণ। যেমন, শুধু চীনা ভাষাতেই রয়েছে পঁচিশ হাজার বর্ণ। কিন্তু আগে কম্পিউটারে মাত্র ২৫৬টি বর্ণ ব্যবহার করা যেত। ফলে কম্পিউটারের ব্যবহারও ছিল সীমিত। এক সাথে অনেক ভাষা

ব্যবহার করা যেত না; এই অসুবিধা দূর করতে APPLE কম্পিউটার, মাইক্রোসফট কর্পোরেশন ইত্যাদি বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিলে কম্পিউটার কোডের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য একটি কনসোর্টিয়াম গঠন করে। এই কনসোর্টিয়ামকে ইউনিকোড কনসোর্টিয়াম বলে।

(g) এটি একটি প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার ভাইরাসকে চিহ্নিত করে, দূরীভূত করে এবং কম্পিউটার সিস্টেমকে ভাইরাস প্রতিরোধী করে তোলে।

২. **(a)** কম্পিউটার (Computer) শব্দটি গ্রিক কম্পিউট (Compute) শব্দ থেকে এসেছে। Compute শব্দের অর্থ গণনা করা। Computer শব্দের অর্থ গণনাকারী যন্ত্র। পূর্বে কম্পিউটার দিয়ে শুধু হিসাব-নিকাসের কাজই করা হতো বলে এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। কম্পিউটার হচ্ছে এমন এক ধরনের যন্ত্র যা মানুষের দেয়া যুক্তিসঙ্গত তথ্যের ভিত্তিতে অতি দ্রুত সঠিকভাবে কোনো নির্ণয় কার্য সম্পাদন করতে পারে এবং এটার ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে। বর্তমান যুগে কম্পিউটারের বহুমুখী ব্যবহারের ফলে এর সংজ্ঞা অনেক ব্যাপকতা লাভ করেছে। কাজের অনেক নির্দেশ কম্পিউটারের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করা সম্ভব এবং প্রয়োজনে এটি একটির পর একটি করে সেসব নির্দেশ নির্ভুলভাবে ত্বরিত গতিতে নির্বাহ করতে পারে। হিসাব সিদ্ধান্ত ও যুক্তিমূলক সমস্যার দ্রুত ও নির্ভুল সমাধান দিয়ে মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে কম্পিউটার। এর গতি, বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতা মানুষের অনুরূপ ক্ষমতার তুলনায় অনেক উন্নত।

প্রয়োগের তারতম্যের ভিত্তিতে কম্পিউটারকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
১. সাধারণ ব্যবহারিক কম্পিউটার এবং ২. বিশেষ ব্যবহারিক কম্পিউটার।

আবার, কম্পিউটারের গঠন ও প্রচলন নীতির ভিত্তিতে একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
১. অ্যানালগ কম্পিউটার, ২. ডিজিটাল কম্পিউটার এবং ৩. হাইব্রিড কম্পিউটার

আকার, সামর্থ্য, দাম ও ব্যবহারের গুরুত্বের ভিত্তিতে ডিজিটাল কম্পিউটারকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :
(i) মেইনফ্রেম কম্পিউটার; (ii) মিনি কম্পিউটার; (iii) মাইক্রো কম্পিউটার এবং (iv) সুপার কম্পিউটার

নিচে ছকের সাহায্যে কম্পিউটারের পূর্ণাঙ্গ শ্রেণীবিভাগ দেখানো হলো :

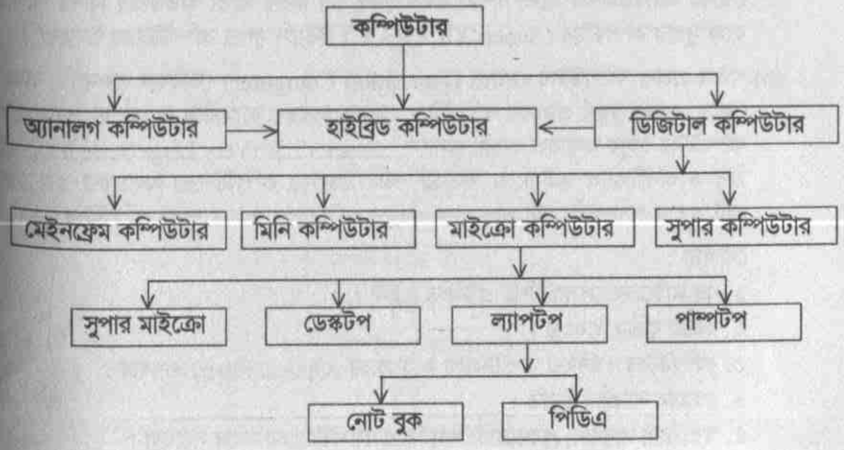

অ্যানালগ কম্পিউটার : যে কম্পিউটার একটি রাশিকে অপর একটি রাশির সাপেক্ষে পরিমাপ করতে পারে, তাই অ্যানালগ কম্পিউটার। এটি উষ্ণতা বা অন্যান্য পরিমাপ যা নিয়মিত পরিবর্তিত হয় তা রেকর্ড করতে পারে। মোটর গাড়ির বেগ নির্ণায়ক যন্ত্র অ্যানালগ কম্পিউটারের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ডিজিটাল কম্পিউটার : যে কম্পিউটার সংখ্যা ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করে তাই ডিজিটাল কম্পিউটার। এটি যে কোনো গণিতের যোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে এবং বিয়োগ, গুণ ও ভাগের মতো অন্যান্য অপারেশন যোগের সাহায্যে সম্পাদন করে।

হাইব্রিড কম্পিউটার : হাইব্রিড কম্পিউটার হলো এমন একটি কম্পিউটার যা এনালগ ও ডিজিটাল কম্পিউটারের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয়ে গঠিত। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বলা যায়, প্রযুক্তি ও ভিত্তিগত দিক থেকে এনালগ ও ডিজিটালের আংশিক সমন্বয়ই হচ্ছে হাইব্রিড কম্পিউটার।

মেইনফ্রেম কম্পিউটার : মেইনফ্রেম কম্পিউটার হচ্ছে এমন একটি বড় কম্পিউটার যার সঙ্গে অনেকগুলো ছোট কম্পিউটার যুক্ত করে এক সঙ্গে অনেকে কাজ করতে পারে। জটিল বৈজ্ঞানিক গবেষণা, উচ্চস্তরের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ, বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শৈল্পিক ব্যবহারে এটা কাজে লাগে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগে, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে এ ধরনের কম্পিউটার ব্যবহৃত হয়ে থাকে। CYBER-170, IBM-4300 এ ধরনের কম্পিউটার।

মিনি কম্পিউটার : যে কম্পিউটারে টার্মিনাল লাগিয়ে প্রায় এক সাথে অর্ধ শতাধিক ব্যবহারকারী ব্যবহার করতে পারে তাই মিনি কম্পিউটার। এটা শিল্প-বাণিজ্য ও গবেষণাগারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। NCRS/9290, PDP-II, IBM S/36 ইত্যাদি এ শ্রেণীর কম্পিউটার।

মাইক্রো কম্পিউটার : মাইক্রো কম্পিউটারকে পার্সোনাল কম্পিউটার বা পিসি বলেও অভিহিত করা হয়। ইন্টারফেস চিপ, একটি মাইক্রোপ্রসেসর CPU এবং RAM, ROM সহযোগে মাইক্রো কম্পিউটার গঠিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের সর্বক্ষেত্রে এ কম্পিউটারের ব্যবহার দেখা যায়। ম্যাকিনটোস আইবিএম পিসি এ ধরনের কম্পিউটারের উদাহরণ।

সুপার কম্পিউটার : অত্যন্ত শক্তিশালী ও দ্রুতগতিসম্পন্ন কম্পিউটারকে সুপার কম্পিউটার বলে। এ কম্পিউটারের গতি প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ১ বিলিয়ন ক্যারেক্টার। পৃথিবীর আবহাওয়া বা কোনো দেশের আদমশুমারির মতো বিশাল তথ্য ব্যবস্থাপনা করার মতো স্মৃতিভাণ্ডার বিশিষ্ট কম্পিউটার হচ্ছে সুপার কম্পিউটার। Supers XII, CRAY 1 ইত্যাদি সুপার কম্পিউটারের উদাহরণ।

(b) **পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার (Fifth Generation Computer) (ভবিষ্যৎ প্রজন্ম) :** ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এখনো চতুর্থ প্রজন্মের কম্পিউটার প্রচলিত আছে। আমেরিকা ও জাপান পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার চালুর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। Super VLSI (Very Large Scale Integration) চিপ ও অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটারের অবতারণা করা হয়েছে। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রচুর ডেটা ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার।

বৈশিষ্ট্য :

১. বহু মাইক্রোপ্রসেসরবিশিষ্ট একীভূত বর্তনী।
২. কৃত্রিম বুদ্ধির ব্যবহার।
৩. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবারের (Optical Fiber) ব্যবহার।
৪. প্রোগ্রাম সামগ্রীর উন্নতি।
৫. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ।

৬. চৌম্বক বাবল মেমোরি।
৭. ডেটা ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি।
৮. অধিক সমৃদ্ধশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার।
৯. বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার-কম্পিউটারের উন্নয়ন ইত্যাদি।

(c) কম্পিউটার পদ্ধতিতে হার্ডওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামগুলোকে কার্যরত রাখার জন্য সাহায্যকারী প্রোগ্রামসমূহকে সিস্টেম সফটওয়্যার বলে। সিস্টেম সফটওয়্যারের আরেক নাম অপারেটিং সিস্টেম। সিস্টেম সফটওয়্যার এমন এক প্রকার প্রোগ্রামের সমষ্টি, যার সাহায্যে কম্পিউটারের সকল হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারকে নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং সফটওয়্যারগুলোর পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকরী করতে সমর্থন এবং সাহায্য করে।

সিস্টেম সফটওয়্যার কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যারের যোগাযোগ স্থাপন করে। সিস্টেম সফটওয়্যার ছাড়া কম্পিউটার পরিচালনা করা যায় না।

৩. (a) ইনফরমেশন সিস্টেম গড়ে তোলার নিমিত্তে এর বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজগুলো ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে সিস্টেম উন্নয়ন চক্র। সিস্টেম উন্নয়ন চক্রের মাধ্যমে ইনফরমেশন সিস্টেম উন্নয়নসহ অন্য যে কোনো সফটওয়্যার উন্নয়ন করা যায়। কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য সিস্টেম উন্নয়ন চক্রে যে ধাপগুলো প্রয়োজন সেগুলো হলো :

১. তথ্যানুসন্ধান বা ইনভেস্টিগেশন;
২. বিশ্লেষণ বা অ্যানালাইসিস;
৩. পরিকল্পনা বা ডিজাইন;
৪. সফটওয়্যার উন্নয়ন;
৫. সিস্টেম বাস্তবায়ন এবং
৬. সিস্টেম রক্ষণাবেক্ষণ।

এ ধাপগুলো পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। চিত্রে সিস্টেম উন্নয়ন ধাপসমূহ দেখানো হলো :

১. তথ্যানুসন্ধান (Investigation) : প্রসেসিংয়ের এ ধাপে সমস্যার প্রকৃতি, সমস্যার কারণ ও সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনার কতকগুলো বিষয় বিবেচনা করা হয়। তথ্যানুসন্ধানের এ ধাপে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়ে থাকে সেগুলো হলো :

ক. বিদ্যমান পদ্ধতি সম্পর্কে জানা ও প্রয়োজনে পরিদর্শন করা।

খ. জরিপমূলক কাজের মাধ্যমে সিস্টেম নির্বাচন।

গ. সিস্টেম সমাধানের সম্ভাবনা এবং

ঘ. সিস্টেমের প্রস্তুতকরণ।

অতঃপর রিপোর্ট, ডকুমেন্ট ইত্যাদি হতে ডেটা সংগ্রহ করে প্রস্তাবিত পদ্ধতির উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বিভিন্ন সিস্টেম তুলনা ও বিশ্লেষণ করে সিস্টেমের সম্ভাব্যতা বিচার করা হয়। তথ্যানুসন্ধানের পর সিস্টেমের সম্ভাব্যতার রিপোর্ট তৈরি করা হয়। রিপোর্টে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকে :

i. বৈশিষ্ট্যসহ প্রস্তাবিত সিস্টেমের প্রাথমিক বর্ণনা,

ii. প্রস্তাবিত পদ্ধতির অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিচালনাগত সম্ভাব্যতা এবং

iii. প্রস্তাবিত পদ্ধতি উন্নয়নের রূপরেখা।

২. সিস্টেম বিশ্লেষণ (System Analysis) : সিস্টেম বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে সিস্টেমে ব্যবহৃত উপাদান ও বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সময় নিরূপণ, সমস্যার কারণ চিহ্নিতকরণ, ডেটা সংগ্রহ এবং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন সিস্টেম তৈরির সর্বোচ্চ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট অনুমোদনের পর সিস্টেম বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ ধাপে ডেটা প্রসেসিংয়ের সমস্যাটি চিহ্নিত করে তা সমাধানের বিভিন্ন পথ বিশ্লেষণ করা হয়। সিস্টেম বিশ্লেষণ ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ডেটা প্রসেসিংয়ের মূল উদ্দেশ্য সঠিকভাবে এখানে চিহ্নিত হয় এবং এর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তী কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়। ডেটাকে মূল্যবান তথ্যে রূপান্তরের জন্য সংগঠনে ব্যবহৃত যান্ত্রিক সরঞ্জাম, প্রোগ্রাম সামগ্রী, লোকবল প্রভৃতি বিষয়ে বিবেচনা করা হয়। সংগঠনের এসব সম্পদ কিভাবে ডেটা গ্রহণ, প্রসেসিং, তথ্য সংরক্ষণ ও ফলাফল প্রদানে সহায়তা করে তা বিশ্লেষণ করা দরকার হয়। প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নির্দিষ্ট করার পর এসব বিষয়াদির রিপোর্ট তৈরি করা হয়।

৩. সিস্টেম ডিজাইন বা পরিকল্পনা : সমস্যা সমাধান করার জন্য বর্তমান সিস্টেমের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে নতুন সিস্টেমের মূল রূপরেখা নির্ণয় করাকে সিস্টেম ডিজাইন বা পরিকল্পনা বলে। সিস্টেম বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর জন্য তৈরি ডেটা প্রসেসিং পদ্ধতির রিপোর্ট চূড়ান্ত করার পর শুরু হয় সিস্টেম ডিজাইন এর কাজ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো জটিল সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারলে তার সহজ সমাধান বেরিয়ে আসে।

(b) কম্পিউটারের মাধ্যমে টেক্সট, ড্রয়িং, ইমেজ, পেইন্টিং ইত্যাদি স্থির বস্তুকে বিভিন্ন ডাইমেনশনে গতিশীল বা সচল করার কৌশলকে অ্যানিমেশন বলা হয়। অ্যানিমেশনের সাহায্যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির জগতে বিচরণ করা সম্ভব হয়েছে। অ্যানিমেশন দুই প্রকার। যথা–

ক. দ্বিমাত্রিক অ্যানিমেশন (2D) ও খ. ত্রিমাত্রিক অ্যানিমেশন (3D)।

4. (a) বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra) : শুধু ০ এবং ১ এ দুটি বাইনারি সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে অন্য সকল প্রকার সংখ্যার প্রদর্শন ও হিসাবনিকাশের বীজগণিতীয় পদ্ধতিকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলে। বুলিয়ার অ্যালজেবরায় প্রতিটি চলকের মান কেবল ০ কিংবা ১ হতে পারে। কোনো চলকের মান সত্য হলে ১ এবং মিথ্যা হলে ০ ধরা হয়। ধনাত্মক লজিকের ক্ষেত্রে লজিক গেইট বা যুক্তি বর্তনীর উচ্চ ভোল্টেজ ১ এবং নিম্ন ভোল্টেজ ০ ধরা হয়।

(b) ডিজিটাল পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা যায় এটি তার (wire) ও বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশের (Mechanical part) সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি নেটওয়ার্ক যা ভোল্টেজের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংকেতিক তথ্য (coded information) বহন করে। অন্য ভাবে বলা যায়, এটি কতগুলো যৌক্তিক উপাদানের (logical element) সমষ্টি এবং প্রতিটি উপাদানের কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা (rules) বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। উঁচু পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, কোনো ডিজিটাল পদ্ধতি হলো বিভিন্ন ক্রিয়ামূলক অংশের (functional units) সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন তথ্য পড়তে (input), লিখতে (write), সংরক্ষণ করতে (store)-ও ব্যবহার করতে পারে।

(c) পিরোম (PROM – Programable Read Only Memory) : সাধারণত পি-রোমের অসুবিধা হলো ব্যবহারকারী এতে নিজের ইচ্ছামতো প্রোগ্রাম পরিবর্তন করতে বা নতুন করে প্রোগ্রাম লিখতে পারে না। অথচ বাজারে যেসব প্রোগ্রাম করা রোম পাওয়া যায় তাতে সব কাজ হয় না। এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় পি-রোম। বর্তমান বাজারে নতুন অবস্থায় যে পি-রোম পাওয়া যায় তাতে সব কোষে একটি করে ফিউজ লাগানো থাকে। ফলে বর্তমান বাজারের সব পি-রোমের কোষই বাইনারি 1। বিশেষ পি-রোম প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যবহারকারী পি-রোম বিশেষ করে মেমোরি কোষের (Memory Cell) ফিউজগুলোতে উচ্চ তড়িৎশক্তি চালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে 0 করে দিতে পারেন। এভাবে ব্যবহারকারী তার লিখিত মাইক্রোপ্রোগ্রামকে পি-রোমে সংরক্ষণ করতে পারেন। পি-রোমকে একবার প্রোগ্রাম করা হলে এতে সংরক্ষিত তথ্য আর পরিবর্তন করা যায়। অর্থাৎ পি-রোম তখন রোমে পরিণত হয় এবং এতে সংরক্ষিত তথ্য শুধু পাঠ করা যায়। রমের ন্যায় পি-রোম অউদ্বায়ী অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করলে এতে সংরক্ষিত সব তথ্য মুছে যায় না।

ইপিরোম (EPROM – Erasable Programable Read Only Memory) : রোম বা পিরোমে একবার তথ্য সংরক্ষণ করা হলে আর পরিবর্তন করা যায় না। আর এ অসুবিধা দূর করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের রোম তৈরি করা হয়েছে, যার নাম ইপিরোম। ইপিরোমে সংরক্ষিত তথ্যকে মুছে আবার নতুন করে বিশেষ প্রোগ্রামের সাহায্যে প্রোগ্রাম করা যায়। ইপিরোম একটি ছোট কোয়ার্টজের জানালা থাকে, সেই জানালা দিয়ে সিলিকন ও ওফার দেখা যায়। সংরক্ষিত তথ্য মুছে ফেলার সময়ে একটি আলট্রা ভায়োলেট ল্যাম্পের তলায় ইপিরোমকে রাখলে ল্যাম্পের অতি বেগুনি রশ্মি জানালা দিয়ে ওফার-এর ওপর পড়ে। ফলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ইপি রমের সব তথ্য মুছে যায়। পরবর্তীতে পি-রোম প্রোগ্রামের সাহায্যে নতুন করে আবার ইপিরমে তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। ইপিরোম উদ্বায়ী নয় অর্থাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করলে প্রোগ্রামকৃত তথ্য কোনো অবস্থাতেই মুছে যায় না।

ইইপিরোম (EEPROM– Electrically Erasable Programable Read Only Memory) : ইইপিরোম-এর প্রধান অসুবিধা হলো এতে সংরক্ষিত তথ্য মুছতে প্রায় আধা ঘণ্টা সময় লাগে এবং আংশিকভাবে কোনো তথ্য মুছা যায় না। এ অসুবিধা দূর করার জন্যই ইইপিরোম তৈরি করা হয়েছে। অতি সহজে এতে সংরক্ষিত সব তথ্য যা প্রয়োজনমতো এক বা একাধিক বিট বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা মুছে পুনঃপুন প্রোগ্রাম করা যায়। এজন্য এর নাম ইলেকট্রিক্যাল ইরেজিবল সংক্ষেপে ইইপিরোম। প্রোগ্রাম করার সময় একে কম্পিউটার থেকে খুলতে হয়। এতে সংরক্ষিত সব তথ্য মুছতে ইপি রমের তুলনায় অনেক সময় কম লাগে।

৫. a. যে বস্তুর পরিবাহিতা (Conductivity) পরিবাহী (Conductor) এবং অপরিবাহী (insulator) বস্তুর মাঝামাঝি তাকে অর্ধপরিবাহী বস্তু বা সেমিকন্ডাক্টর বলে। সাধারণ অবস্থায় এদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না। কিন্তু বিশেষ অবস্থায় এরা পরিবাহী।

b. এটি একটি বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এক নাগাড়ে একই পরিমাণ ডিসি ভোল্টেজ পাওয়ার জন্য 'পাওয়ার স্লাপাইতে' এটা ব্যবহার করা হয়। এর গঠন প্রণালী অনেকটা সাধারণ অর্ধপরিবাহী ডায়োডের মতো হলেও এর কার্যপ্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক।
সাধারণ ডায়োডে বিপরীত ভোল্টেজ জেনার ভোল্টেজে বা ব্রেকডাউন ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হলে এটি পুড়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জেনার ডায়োডের গঠন এমন যে এটি নষ্ট হয় না। রিজার্ভ ভোল্টেজ বা বিপরীত ভোল্টেজ ব্রেক ডাউন ভোল্টেজে পৌঁছালেই জেনার ডায়োডের মধ্য দিয়ে প্রবাহ শুরু হয়। জেনার ডায়োডের ইনপুট ভোল্টেজ কম-বেশি হলেও আউটপুট ভোল্টেজ নির্দিষ্ট মাত্রায় স্থির থাকে। তাই এটি ভোল্টেজ স্থির রাখার কাজে ব্যবহৃত হয়।

c. লাইট এমিটিং ডায়োড (Light Emitting Diode) সাধারণত এলইডি নামেই অধিক পরিচিত। আভিধানিক অর্থের সঙ্গে এর কার্যকারিতারও একটি সম্পর্ক রয়েছে। এটি এমন একটি ডায়োড যা থেকে আলো নির্গত হয়। এ ডায়োডের ভেতর দিয়ে যখন তড়িৎ প্রবাহিত হয় তখন এটা আলোকিত হয়ে ওঠে। তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে আলোর তীব্রতা বা ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।
বিভিন্ন অডিও সিস্টেমে যথা– রেডিও, টেপরেকর্ডার, অ্যামপ্লিফায়ার ইত্যাদিতে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে। এ ছাড়া বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিটার এবং ক্যালকুলেটরে সংখ্যা ফুটিয়ে তোলার কাজে LED ব্যবহার করা হয়।

মডেল প্রশ্ন ০৬ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ৬ সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. উচ্চ রক্তচাপ কি? উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ ও কারণগুলো বর্ণনা করুন। ৪
খ. GIS কি? ৪
গ. রেশম পোকার জীবনচক্র বর্ণনা করুন। ৪
ঘ. স্ট্রোক কি? এর লক্ষণগুলো কি কি? কারো স্ট্রোক হলে তাৎক্ষণিকভাবে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে? ৪
ঙ. 'মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক, সকল গতিই আপেক্ষিক। কোষ স্থিতি বা গতি পরম নয়।'–উদাহরণের সাহায্যে এ বিবৃতি ব্যাখ্যা করুন। ৪

২. ক. বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে পারে না কেন? ২½
খ. মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ বলতে কি বোঝায়? ২½
গ. কাঁদানে গ্যাস কি? ২½
ঘ. প্যাগাসাস কি? ২½

৩. ক. ইনসুলিন কি এবং এর কাজ কি? ২½
খ. গ্রিনপিস বলতে কি বোঝেন? ২½
গ. তারা খসা কি? ২½
ঘ. পেইন্ট ও ভার্নিশ বলতে কি বোঝায়? ২½

৪. ক. এগারিকাস কি? এরা কোথায় জন্মে? ২½
খ. ঘাতক রোগ কাকে বলে? ২½
গ. রক্ত লাল দেখায় কেন? ২½
ঘ. ট্রান্সফর্মার কি? এটি কত প্রকার ও কি কি? ২½

৫. ক. প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের প্রধান পার্থক্য নির্দেশ করুন। ২½
খ. সিনেমা হলের পর্দা সাদা ও অমসৃণ রাখা হয় কেন? ২½
গ. বেলাডোনা (Belladona) কি? ২½
ঘ. সাপ খোলস ছাড়ে কেন? ২½

৬. ক. বরফের গঠন আলোচনা করুন। ৫
অথবা, বরফের আয়তন পানির আয়তনের তুলনায় বেশি কেন?
অথবা, বরফ পানিতে ভাসে কেন?
খ. পানির আয়নিক গুণফল ব্যাখ্যা করুন। ৫

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৬

১. ক. প্রবাহমান রক্ত নালীগাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে বলা হয় ব্লাড প্রেসার বা রক্তচাপ। হৃদযন্ত্রের বাম নিলয়টি সংকুচিত হওয়ার ফলেই অধিকতর রক্তচাপের সৃষ্টি হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে বলা হয় সিস্টোলিক প্রেসার। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন শুরু হওয়ার ঠিক আগের চাপকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলে। একজন সুস্থ ব্যক্তির রক্তের চাপ স্বাভাবিকভাবে ১২০/৮০।

রক্তের চাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে অর্থাৎ ১২০/৮০-এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে তখন ঐ ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন আছে বলে ধরা হয়।

হাইপারটেনশনের লক্ষণ

১. সকালে ঘুম থেকে উঠলে মাথার পেছন দিকে ও ঘাড়ে ব্যথা হওয়া।
২. মাথা ঘোরা, কানে ভো ভো করা, বুক ধড়ফড় করা, দুর্বলতা, নিদ্রাহীনতা, অল্পতেই বিরক্ত হওয়া।
৩. বুকে ব্যথা, অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট, রাতে হাঁপানি।
৪. পক্ষাঘাত।
৫. ঘনঘন প্রস্রাব, কখনও প্রস্রাবের সময় রক্ত যেতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের কারণ

১. বাবা মা'র উচ্চ রক্তচাপ থাকলে।
২. শরীরের ওজন বেড়ে গেলে।
৩. গতি, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বেড়ে গেলে।
৪. অ্যালকোহল জাতীয় খাবার খেলে।
৫. অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে।
৬. অধিক সময় জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খেলে।

খ. ভৌগোলিক উপাত্ত সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য উপাত্ত বিশ্লেষণে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারে ভূগোলবিদ, কম্পিউটার বিজ্ঞানী এবং বিভিন্ন প্রায়োগিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের (যেমন— আবহাওয়াবিদ, পরিকল্পনাবিদ, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপক ইত্যাদি) সম্মিলিত চেষ্টায় কম্পিউটার ভিত্তিক ভৌগোলিক ডাটাবেজের নতুন এক প্রযুক্তির জন্ম এবং ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ প্রযুক্তিকে ইংরেজিতে Geographic Information System বা সংক্ষেপে GIS বলে।

GIS হচ্ছে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার, ভৌগোলিক উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্ট জনবলের একটি সুসংবদ্ধ ব্যবস্থা, যার দ্বারা সব ধরনের ভৌগোলিক এবং ভৌগোলিক সম্পর্কযুক্ত উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, নবায়ন, বিশ্লেষণ এবং প্রদর্শন করা যায়। GIS কম্পিউটার প্রযুক্তিভিত্তিক একটি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এর দ্বারা ডাটাবেজ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ ছাড়াও এমন ধরনের অত্যন্ত জটিল ভৌগোলিক বিশ্লেষণ করা যায়, যা অন্য কোনো ব্যবস্থার দ্বারা করা অত্যন্ত কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ ধরনের বিশ্লেষণ তথ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে করা সম্ভবই হয় না। ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয় ভৌগোলিক এবং এর সাথে সম্পর্কযুক্ত উপাত্ত। অন্য কথায়, এ ব্যবস্থা হচ্ছে একটি কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থা যার দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে (Earth Surface) অবস্থিত স্থানের বর্ণনা সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়। সুতরাং এ ব্যবস্থায় কম্পিউটারে যে তথ্য সংরক্ষণ করা হয়, তার সাথে পৃথিবীর উপরিভাগের স্থান বা স্থানসমূহের অবশ্যই সম্পর্ক থাকতে হবে।

গ. কয়েকটি ধারাবাহিক ধাপের মাধ্যমে রেশম পোকা তার জীবনচক্র সম্পন্ন করে থাকে। রেশম পোকার জীবনচক্রে নিম্নলিখিত চারটি ধাপ পরিলক্ষিত হয়।

১. ডিম
২. শূককীট বা লার্ভা
৩. মূককীট বা পিউপা
৩. পূর্ণাঙ্গ মথ

নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো :

১. **ডিম :** স্ত্রী রেশম মথ তুঁত পাতার ওপর একসাথে ৩০০-৫০০ ডিম পাড়ে। ডিমগুলো দেখতে সরিষা দানার মতো। এক ধরনের আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলো পাতার সাথে লেগে থাকে। গ্রীষ্মকালে ৮-১০ দিনের মধ্যে ডিম থেকে লার্ভা বের হয়।

২. **শূককীট বা লার্ভা :** সদ্যজাত লার্ভাগুলো দেখতে সরু, ছোট ও বাদামি বর্ণের। এ সময় এরা প্রচুর তুঁত পাতা খায়। এরা দ্রুত বড় হতে থাকে ও পরিণত লার্ভায় পৌঁছাতে চারবার খোলস বদলায়। লার্ভা দশার শেষদিকে এরা খাওয়া বন্ধ করে এবং সংকুচিত হয়। এ সময় লার্ভা তার লালাগ্রন্থি থেকে লালা নিঃসৃত করে রেশম সুতা তৈরির মাধ্যমে গুটি (কোকুন) তৈরি করে।

৩. **মূককীট বা পিউপা :** কোকুনের ভিতর লার্ভা দু-এক দিনের মধ্যে পিউপায় পরিণত হয়। পিউপা এ সময় কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। পিউপার দেহে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং পূর্ণাঙ্গ মথে রূপান্তরিত হতে থাকে।

৪. **পূর্ণাঙ্গ মথ :** পিউপা দশার ৮-১০ দিন পর কোকুন কেটে পূর্ণাঙ্গ মথ বেরিয়ে আসে। এদের মাথায় এক জোড়া শুঙ্গ, বুকে তিন জোড়া পা এবং পিঠে দু জোড়া পাখা থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে এরা যৌন মিলনে আবদ্ধ হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্ত্রী মথ ডিম দেয়।

ঘ. স্ট্রোক দ্রুত সংঘটিত মস্তিষ্কের রক্ত সঞ্চালন বিকৃতি। এটি তিন প্রকার। যেমন– ১. রক্তক্ষরণ, ২. থ্রম্বোসিস ও ৩. এম্বোলিজম। উচ্চ রক্তচাপ ও ধমনীস্থূলতা এথেরোস্ক্লেরোসিসযুক্ত বয়স্ক ও বৃদ্ধলোকদের এ রোগ বেশি হয়। স্ট্রোক হঠাৎ দেখা দেয়া এক মারাত্মক রোগ। কোনো রকম পূর্ব লক্ষণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চলাফেরা করলে বা ঘুমের মধ্যেও বা আকস্মিকভাবে দেখা দিতে পারে। স্ট্রোকের ফলে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ দ্রুত সংঘটিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে রোগী জ্ঞান হারায়। বমি হয়, অসাড়ে প্রস্রাব ও পায়খানা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল লাল হয়ে ফুলে ওঠে, নাকে ও কানে পরিলক্ষিত হয় নীলচে ভাব। এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হয়, নাড়ির গতি মন্থর হয়ে নেমে যায় মিনিটে ৪০ থেকে ৫০ বার। শরীরের তাপ স্বাভাবিক বা উচ্চ হয়, চোখের পিউপিল আলোতে সংকুচিত হয় না। যে দিকে আক্রান্ত হয় তার উল্টো দিকের হাত-পা নরম ও অবশ হয়, নাক ও ঠোঁটের ভাঁজ চলে যায়, প্রশ্বাসের সঙ্গে গাল ফুলে ওঠে। মুখ ও চোখ অন্য দিকে প্রায়ই ফিরানো থাকে। এ অবস্থায় রোগীকে যথাশীঘ্র হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। রোগীর মাথা পায়ের থেকে সামান্য উঁচুতে রেখে তাকে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। ঘড় ঘড় শব্দসহ শ্বাস-প্রশ্বাস চললে রোগীর মাথা এক পাশে কাৎ করে মুখ থেকে লালা পরিষ্কার করে দিতে হবে। অজ্ঞান রোগীর মাথা পেছন দিকে কাৎ করে হেলাতে হবে যাতে তার লালা বা বমি ফুসফুসে না গিয়ে মুখ দিয়ে গড়িয়ে বেরিয়ে যায়। এ অবস্থায় তার মুখে কোনো খাবার, পানীয় বা ওষুধ কিছুই দেয়া যাবে না।

মাথায় বরফের ব্যাগ এবং পায়ে হটওয়াটার ব্যাগ দিয়ে সেঁক দেয়া যায়। স্ট্রোকের রোগীর জন্য নার্সিং কেয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময়ে রোগীকে কিছুক্ষণ পর পর ডান পাশ, বাঁ পাশ করে শুইয়ে দিতে হবে। বিছানা, রোগীর শরীর পরিষ্কার রাখতে হবে। নিয়মিত চোখ, মুখ, নাক পরিষ্কার রাখতে হবে। রোগীর হাত-পায়ের ব্যায়াম করাতে হবে।

ঙ. কোনো বস্তু স্থিতিশীল না গতিশীল তা বোঝার জন্য বস্তুর আশপাশ থেকে আর একটা বস্তুকে নিতে হবে, যাকে আমরা প্রসঙ্গ বস্তু বলতে পারি।

চলন্ত ট্রেনের কামরায় দু বন্ধু যদি মুখোমুখি বসে থাকে, তবে একজনের সাপেক্ষে অন্যের অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং বলা যেতে পারে একজনের সাপেক্ষে অন্যজন স্থির। কিন্তু যদি ট্রেনলাইনের পাশে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তি তাদেরকে দেখেন তবে ঐ ব্যক্তির সাপেক্ষে তাদের (দু বন্ধুর) অবস্থানের পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ ট্রেনলাইনের পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তির সাপেক্ষে তারা উভয়ই গতিশীল। আবার, দু বন্ধুর সাপেক্ষে (চলন্ত ট্রেনের যে কোনো যাত্রীর সাপেক্ষে) ট্রেনলাইনের পাশে দাঁড়ানো ব্যক্তিটিকে গতিশীল মনে হবে।

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কোনো বস্তু প্রকৃতপক্ষে স্থির কিনা তা নির্ভর করে প্রসঙ্গ বস্তুর ওপর। প্রসঙ্গ বস্তু যদি প্রকৃতপক্ষে স্থির হয় তাহলে তার সাপেক্ষে যে বস্তু স্থিতিশীল রয়েছে সেও প্রকৃতপক্ষে স্থির। এ ধরনের স্থিতিকে আমরা পরম স্থিতি বলতে পারি। সেরূপ পরম স্থিতিশীল প্রসঙ্গ বস্তুর সাপেক্ষে কোনো বস্তুর গতিকে আমরা পরম গতি বলতে পারি। কিন্তু এ মহাবিশ্বে এমন কোনো প্রসঙ্গ বস্তু পাওয়া সম্ভব নয় যা প্রকৃতপক্ষে স্থির রয়েছে। কারণ পৃথিবী প্রতিনিয়ত সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, সূর্যও তার গ্রহ, উপগ্রহ নিয়ে নভোমণ্ডলের চারদিকে ঘুরছে। কাজেই আমরা যখন কোনো বস্তুকে স্থিতিশীল বা গতিশীল বলি, তা আমরা কোনো আপাত স্থিতিশীল বস্তুর সাপেক্ষে বলে থাকি। পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত গাছ, দালানকোঠা ইত্যাদিকে আমরা স্থির বস্তু হিসেবে দেখলেও অন্যকোনো গ্রহ থেকে দেখলে দেখা যাবে পৃথিবীর ঘূর্ণনের সাথে সাথে পৃথিবী পৃষ্ঠের সবকিছুই গতিশীল।

কাজেই আমরা বলতে পারি, এ মহাবিশ্বের সকল স্থিতিই আপেক্ষিক, সকল গতিই আপেক্ষিক। কোনো স্থিতি বা গতি পরম নয়।

২. ক. পাখি তার ডানার সাহায্যে আকাশে ওড়ে। পাখি দু ডানা দিয়ে ডানার নিচে বাতাসে আঘাত করে অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে, এটি হলো ক্রিয়া। এর ফলে বাতাসও নিউটনের তৃতীয় সূত্রানুযায়ী সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে, এটি হলো প্রতিক্রিয়া। বলের কারণে পাখি উড়তে পারে। বায়ুশূন্য স্থানে পাখি উড়তে পারে না। কারণ ডানা নিচের দিকে আঘাত করলেও বাতাস না থাকায় ডানার ওপর প্রয়োগ করার মতো বিপরীতমুখী বল অর্থাৎ প্রতিক্রিয়া বলের সৃষ্টি হয় না। তাই পাখি বায়ুশূন্যস্থানে উড়তে পারে না।

খ. **মহাকর্ষ :** এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুকণাই একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বে যে কোনো দুটি বস্তুকণার মধ্যকার এই আকর্ষণ বলকে মহাকর্ষ বলে।
যেমন—সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে আকর্ষণ বল হলো মহাকর্ষ।
অভিকর্ষ : কোনো বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে অভিকর্ষ বলে।
যেমন– পৃথিবী ও চন্দ্রের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল হলো অভিকর্ষ।

গ. তৈল জাতীয় তরল পদার্থ ক্লোরোপিক্রিনকে কাঁদানে গ্যাস বলা হয়। এটি অশ্রু উৎপাদক বলে এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। গাঢ় নাইট্রিক এসিডের সাথে ক্লোরোফরমকে উত্তপ্ত করলে কাঁদানে গ্যাস পাওয়া যায়।

ঘ. বিজ্ঞানীরা এই সর্বপ্রথম আমাদের সূর্যের মতো একটি নক্ষত্রের চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। এর নাম ৫১ প্যাগাসাস। এই গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৪০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এবং উত্তর গোলার্ধে এটি দৃশ্যমান।

৩. ক. ইনসুলিন হচ্ছে একটি পলিপেপটাইড। এর আণবিক ওজন প্রায় ৬০০০ গ্রাম। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত ইনসুলিন সাধারণত গরুর অগ্ন্যাশয় থেকে প্রস্তুত করা হয়। এ গো-ইনসুলিনে কার্বনের ২৫৪টি, হাইড্রোজেনের ৩৭৭টি, নাইট্রোজেনের ৬৫টি, অক্সিজেনের ৭৫টি এবং সালফারের ৬টি পরমাণু থাকে। ইনসুলিন অণুতে ৪৮টি এমাইনো এসিড থাকে।

ইনসুলিন এক ধরনের হরমোন, যা অগ্ন্যাশয় থেকে নির্গত হয় এবং চিনির বিপাক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। স্বাভাবিক জীবদেহের রক্তে চিনির মাত্রা ধ্রুবক থাকে। রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়লে অগ্ন্যাশয় ইনসুলিন নির্গমন বৃদ্ধি করে দেয়। ডায়াবেটিক রোগীদের ক্ষেত্রে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাদারহ্যানস টিস্যু চিনির বিপাক করার মতো ইনসুলিন উৎপাদনে অক্ষম হয়ে পড়ে। এভাবে জীবদেহ থেকে অব্যবহৃত চিনি বের হয়ে আসে। ফলে রক্তে চিনি বৃদ্ধি পায়।

খ. গ্রিনপিস ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা। পরিবেশ বিষয়ে প্রথাবিরোধী এবং উচ্চকিত প্রতিবাদের জন্য এটি আলোচিত। সংস্থাটি অহিংস পদ্ধতিতে সরাসরি প্রতিরোধে বিশ্বাসী। পারমাণবিক পরীক্ষার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রে সংস্থাটির পদচারণা শুরু হয়। ঐ বছর কিছু সংখ্যক আমেরিকান ও কানাডীয় নাগরিক একটি জাহাজ ভাড়া করে আলাস্কার এমচিটকা দ্বীপে পৌছে। সেখানে পর পর অনেকগুলো পারমাণবিক পরীক্ষা ঘটানোর কথা ছিল। গ্রিনপিসের প্রতিবাদের কারণে একটি মাত্র পরীক্ষা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। গ্রিনপিস এখনো এই একই কায়দায় তাদের প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে।

গ. মহাশূন্যে ভাসমান জড়বস্তুগুলো অনেক সময় মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলের প্রভাবে প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। রাতের মেঘমুক্ত আকাশে এদেরকে দেখলে মনে হয় যেন নক্ষত্র ছুটে যাচ্ছে বা মনে হয় কোনো নক্ষত্র যেন এই মাত্র খসে পড়ল। এ ঘটনাকে বলা হয় তারা খসা।

ঘ. পেইন্ট : যেসব রঞ্জক পদার্থ পানি বা অন্য কোনো তরলে দ্রবীভূত হয় না, অথচ অস্বচ্ছ তরল অবস্থায় বস্তুর ওপরি তলে বা বস্তুপৃষ্ঠে প্রলেপ হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং বস্তুপৃষ্ঠ রঙিন হয় সেসব রঞ্জক পদার্থকে অদ্রবণীয় রঙ বা পেইন্ট বলে।
ভার্নিশ : কাঠ, ধাতু এবং অন্যান্য পদার্থকে চাকচিক্যময়, উজ্জ্বল এবং বাতাস ও আর্দ্রতা থেকে রক্ষা করার জন্য বস্তুর ওপর এক ধরনের স্বচ্ছ তরল প্রলেপ ব্যবহার করা হয়। একে ভার্নিশ বলে।

৪ ক. Agaricus-এর মূল, দেহ অত্যন্ত সরু, সূত্রাকার এবং শাখান্বিত। দেহকোষে নিউক্লিয়াস, দানাদার প্রোটোপ্লাজম এবং কোষ গহ্বর থাকে। সরু সূত্রাকার দেহটি মাটির নিচে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, এ সূত্রাকার দেহকে মাইসিলিয়াম বলে। অনুকূল পরিবেশে মাইসিলিয়ামের মাঝে মাঝে ছোট ছোট বলের মতো গঠন জন্মে। এগুলো মাটির ওপরে বৃদ্ধি পেয়ে ছাতার আকারে একটি বিশেষ অঙ্গ গঠন করে। এই বিশেষ অঙ্গকে ফ্রুটবডি বলা হয়। পূর্ণাঙ্গ ফ্রুটবডিই মাশরুম বা ব্যাঙের ছাতা নামে

পরিচিত। উপরের দিকে ছাতার প্রসারিত অংশকে পাইলিয়াস এবং বাটের মতো অংশকে স্টাইপ বলে। পাইলিয়াসের নিচে গিল থাকে, যেখানে স্পোর উৎপন্ন হয়। স্টাইপের উপরের দিকে পাতার সার অংশকে অ্যানুলাস বলে। এগারিকাস মরা, পচা জৈব পদার্থ ও খাদ্যদ্রব্যের ওপর জন্মে।

খ. এইডস রোগকে ঘাতক রোগ বলা হয়। এইডস ভাইরাস দেহের রোগ প্রতিরোধক কোষকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলে। ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এ কারণে এইডস ভাইরাসকে Human Immuno-Deficiency Virus বা সংক্ষেপে HIV বলা হয়। HIV হলো এইডস রোগের প্রাথমিক পর্যায়। এইডস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু অনিবার্য। তাই এইডস রোগকে ঘাতক রোগ বলা হয়।

গ. লোহিত রক্ত কণিকা (Red Blood Cell), শ্বেত রক্ত কণিকা (White Blood Cell), অনুচক্রিকা (Platelate) এবং রক্তরস বা প্লাজমার সমসত্ত্ব মিশ্রণে রক্ত গঠিত। লোহিত রক্ত কণিকায় থাকে হিমোগ্লোবিন। হিমোগ্লোবিন হিমাটিন ও প্রোটিনের সমন্বয়ে গঠিত। এই হিমোগ্লোবিনে ৯৪% প্রোটিন (গ্লোবিন) এবং ৬% হিম (লৌহ ও সালফারের একটি পরফাইরিন) থাকে। মানবদেহে প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে প্রায় ১১-১৭ ভাগ হিমোগ্লোবিন থাকে, আর এই হিমোগ্লোবিন থাকার জন্যই রক্ত লাল দেখায়।

ঘ. যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ প্রবাহের নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে অথবা উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভবে রূপান্তরিত করা হয়, তাকে বলা হয় ট্রান্সফর্মার। ট্রান্সফর্মার দু প্রকার। ক. উচ্চধাপী, খ. নিম্নধাপী।
উচ্চধাপী : এ যন্ত্র অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহকে অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে।
নিম্নধাপী : এ যন্ত্র অধিক বিভবের অল্প তড়িৎ প্রবাহকে অল্প বিভবের অধিক তড়িৎ প্রবাহে পরিণত করে।

৫. ক. প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের পার্থক্য নিম্নরূপ :

পার্থক্যের বিষয়	প্রাণিকোষ	উদ্ভিদকোষ
১. কোষপ্রাচীর	প্রাণিকোষে কোষপ্রাচীর নেই, শুধু প্লাজমা ঝিল্লি দিয়ে বেষ্টিত।	অধিকাংশ উদ্ভিদকোষ সেলুলোজ নির্মিত কোষ প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত।
২. প্লাস্টিড	প্লাস্টিড নেই।	বিভিন্ন প্রকার প্লাস্টিড আছে।
৩. কোষ গহ্বর	কতগুলো নিম্নশ্রেণীর প্রাণী ব্যতীত অধিকাংশ প্রাণিকোষে কোষ গহ্বর থাকে না।	সাধারণ এক বা একাধিক কোষ গহ্বর থাকে।
৪. সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রিওল	প্রাণিকোষে সর্বদা সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রিওল থাকে।	উদ্ভিদকোষে সাধারণত সেন্ট্রোজোম ও সেন্ট্রিওল থাকে না।
৫. গলজি বস্তু	অণুবীক্ষণ যন্ত্রে প্রায় গলজি বস্তু দেখা যায়।	অণুবীক্ষণ যন্ত্রে গলজি বস্তুর উপস্থিতি কম দেখা যায়।
৬. খাদ্য	প্রাণিকোষের সঞ্চিত খাদ্য মূলত গ্লাইকোজেন।	উদ্ভিদকোষে সঞ্চিত খাদ্য মূলত শ্বেতসার।
৭. নিউক্লিয়াস	নিউক্লিয়াস সাধারণত আকৃতিতে বড় এবং সব সময় কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে।	নিউক্লিয়াস সাধারণত আকৃতিতে ছোট এবং কোষের পরিধির দিকে অবস্থান করে।
৮. লাইসোজোম	প্রাণিকোষে লাইসোজোম থাকে।	উদ্ভিদকোষে লাইসোজোম থাকে না। শুধু ভাজক কোষে থাকে।
৯. কোষান্তর	ডেসমোজোম এর মাধ্যমে।	প্লাজমোডেসমাটার মাধ্যমে।
১০. স্নেহপদার্থ	স্নেহপদার্থ সবসময় থাকে এবং অর্ধতরল অবস্থায় থাকে।	স্নেহপদার্থ যদি থাকে, তবে তরল অবস্থায় থাকে।
১১. মাইক্রোভিলাই	প্লাজমা পর্দায় মাইক্রোভিলাই থাকে।	প্লাজমা পর্দায় মাইক্রোভিলাই থাকে না।
১২. আকার	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিকোষের আকার পরিবর্তিত হতে পারে।	পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদকোষের আকার সাধারণত পরিবর্তিত হয় না।

খ. সাদা পর্দা অন্য কোনো আলোকরশ্মি শোষণ না করে প্রতিফলিত করে। যার ফলে সিনেমার ঔজ্জ্বল্য কমে না এবং যে রঙের আলোকরশ্মি আপতিত হয় তার কোনো পরিবর্তন হয় না। পাশাপাশি দর্শক স্পষ্ট ছবি দেখতে পায়। এ কারণেই সিনেমা হলে সাদা পর্দা ব্যবহার করা হয়। আর সিনেমা হলের পর্দা অমসৃণ হওয়ার কারণ হলো, এতে পর্দার ওপর আপতিত আলোকরশ্মির বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়া এ রশ্মি সব দর্শকের চোখে পড়ে।

গ. বেলাডোনা হচ্ছে সোলানেসি (Solanacese) পরিবারভুক্ত এট্রোপা বেলাডোনা (Atropa Belladona) নামের এক রকম বিষাক্ত উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত ওষুধ। বহুবর্ষজীবী এ উদ্ভিদ ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী ইউরোপ ও এশিয়া মাইনরে মূলত জন্মাতো। কিন্তু এখন এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ এবং ভারতসহ পৃথিবীর অনেক স্থানে ব্যাপকভাবে জন্মায়। ফুল ফোটার সময়ে এর পাতা, ফুলের ডগা এবং মূল সংগ্রহ করে শুকিয়ে রাখা হয়। এই উদ্ভিদ থেকে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ উপক্ষার পাওয়া যায় যা ওষুধরূপে ব্যবহৃত হয়। এগুলোর মধ্যে প্রধান উপক্ষার হচ্ছে অ্যাট্রোপিন, যা চোখের তারা (Pupil) প্রসারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আগে নারী নিজেদের আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য চোখে এটা ব্যবহার করতো বলে জানা যায়।

ঘ. সাপের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এর দেহ সারাজীবন বৃদ্ধি পায়, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। দেহের বৃদ্ধির কারণে এর খোলসের আকার দেহের তুলনায় ছোট হয়ে পড়ে। যেহেতু দেহের সব অংশে বৃদ্ধি ঘটে থাকে তাই সাপের দেহে নতুন খোলস তৈরি হয়। এ কারণে সাপ পুরানো খোলস পরিত্যাগ করে। প্রজাতি বিশেষে সাপ এক থেকে তিনমাস পরপর খোলস পরিবর্তন করে।

৬. ক. **বরফের গঠন (Structure of Ice) :** এক একটি বরফের কেলাস বা স্ফটিককে এক একটি অতি বৃহৎ অণু হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বরফে প্রতিটি অক্সিজেন পরমাণু চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তন্মধ্যে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণুর সাথে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত, অপর দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন পরমাণুর সাথে হইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। অক্সিজেন পরমাণুর চারদিকে এই চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু বিকৃত চতুস্তলকীয়ভাবে অবস্থান করে। সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয় অক্সিজেন পরমাণু থেকে 0.96Ä দূরত্বে অবস্থিত। অপরদিকে হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বয় অক্সিজেন পরমাণু থেকে 1.80A দূরত্বে অবস্থিত। হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য একটি পানির অণুর অংশ। অপরদিকে সমযোজী বন্ধনে যুক্ত হাইড্রোজেন পরমাণু অন্য H_2O অণুর অক্সিজেন পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। অর্থাৎ প্রতিটি H_2O অংশ অপর চারটি H_2O অণুর অংশের সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে যুক্ত। এভাবে একটি অতি বৃহৎ অণু গড়ে উঠে। সে কারণে বরফের সঠিক সংকেত হচ্ছে $(H_2O)n$। এই গঠনে বরফের স্ফটিকে বহু ফাঁকা জায়গা থেকে যায়।

সুতরাং বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির তুলনায় কম এবং বরফ পানিতে ভাসে। 0°C. তাপমাত্রায় বরফ যখন গলতে আরম্ভ করে তখন কিছু সংখ্যক হাইড্রোজেন বন্ধন ভেঙে যায় এবং এই ফাঁকা জায়গায় কিছু পানির অণু অবস্থান নেয়। ফলে বরফ পানিতে রূপান্তরিত হলে তার আয়তন কমে অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাইড্রোজেন বন্ধনের ভাঙার পরিমাণ বাড়ে। সুতরাং পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব বাড়তে থাকে। 4°C তাপমাত্রায় পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব সর্বোচ্চ মানের হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির অণুসমূহের মধ্যে কম্পন ও গতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে অণুসমূহ পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে চেষ্টা করে। বিপরীতমুখী দুটি প্রক্রিয়া সব সময় কার্যকর, তবে 4°C তাপমাত্রার উপরে

কম্পনজনিত আয়তন বৃদ্ধি হাইড্রোজেন বন্ধন ভাঙার ফলে আয়তন হ্রাস অপেক্ষা বেশি হয়। ফলে 4°C তাপমাত্রার উপরে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির আয়তন বাড়ে অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায়।

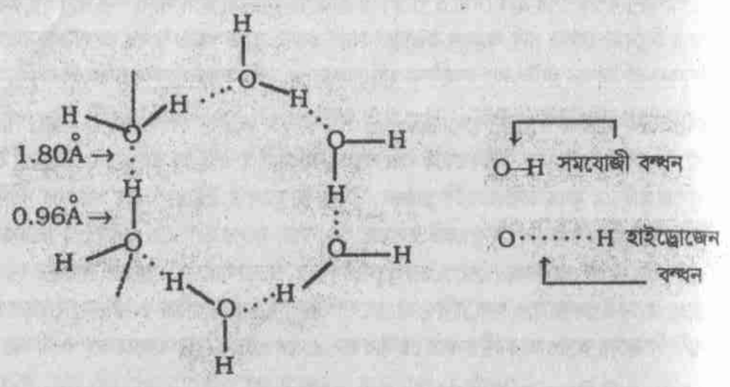

চিত্র : বরফের আণবিক গঠন। বৃত্ত দিয়ে অক্সিজেন পরমাণু নির্দেশ করা হয়েছে, সাধারণ সরলরেখা (—) দিয়ে সমযোজী বন্ধন এবং ডট লাইন (....) দিয়ে হাইড্রোজেন বন্ধন বুঝানো হয়েছে।

খ. বিজ্ঞানী কোলরাস্ ও হেডউইলার (Kohlrausch ও Heydweiller 1894) বিশুদ্ধ পানির পরিবাহিতা নির্ণয় করে দেখান যে, অতি বিশুদ্ধ পানি অতি সামান্য মাত্রায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে। অতএব বিশুদ্ধ পানি অল্পমাত্রায় নিম্নরূপে বিয়োজিত হয় :

$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$ [সঠিকভাবে $2H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$]

ভরক্রিয়া সূত্র মতে, $K = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$: এখানে [ ] = ঘনমাত্রা বোঝায়

প্রকৃতপক্ষে সামান্য পরিমাণে বিয়োজনের ফলে পানির ঘনমাত্রায় বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। তাই $[H_2O]$ এর মান ধ্রুবক ধরা হয়।

সুতরাং $[H^+][OH^-] = K[H_2O] = K_w$ = ধ্রুবক

K_w কে পানির আয়নিক গুণফল বলা হয়। বিভিন্ন তাপমাত্রায় পানির আয়নিক গুণফল (K_w) এর মান সামান্য পরিমাণে বিভিন্ন হয়। 25°C তাপমাত্রায় পানির গুণফল (K_w) এর মান 1×10^{-14} ধরা হয়।

পানি বিয়োজিত হলে সমান সংখ্যক H^+ ও OH^- উৎপন্ন হয়। তাই বিশুদ্ধ পানিতে H^+ ও OH^- এর ঘনমাত্রা সমান থাকে।

আবার $[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$

$\therefore [H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

যেহেতু বিশুদ্ধ পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রক্সিল আয়ন সমান থাকে; তাই এ অবস্থায় পানিকে নিরপেক্ষ যৌগ বলা হয়। পানির আয়নিক গুণফলের সম্পর্ক থেকে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা প্রকাশের জন্য pH স্কেল নামক একটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

মডেল টেস্ট ০৬

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো দুটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. ক. কম্পিউটার বিবর্তনের ইতিহাস উল্লেখ করুন। ৪
খ. সিপিইউ কি? এর প্রধান কাজগুলো কি? ৪
গ. সমাজে তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বর্ণনা করুন। ৪
ঘ. ওহমের সূত্রটির গাণিতিক প্রকাশসহ ব্যাখ্যা করুন। ৪
ঙ. অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ার এর মধ্যে পার্থক্য কি? ৪

২. ক. ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন কি? ২½
খ. স্যাটেলাইট (Satellite) কি? ২½
গ. ডিজিটাল পদ্ধতি কাকে বলে? ২½
ঘ. Energy Band বা শক্তি ব্যান্ড কি? ২½

৩. ক. মানবদেহের রোধ কিরূপ? ২½
খ. ওয়েব অ্যাড্রেস কি? ২½
গ. মাউস (Mouse) কি? ২½
ঘ. ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড কি? এর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন। ২½

৪. ক. ডেটা কোডিং কি? এর শ্রেণীবিভাগ উল্লেখ করুন। ৩
খ. Anti-Virus কি? ২
গ. ওয়েব-সার্ভার বলতে কি বোঝায়? ২
ঘ. স্ক্যানার কি? ৩

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৬

১. ক. ইতিহাস ঘেটে যতটুকু জানা যায়, প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে চীনাদের তৈরি অ্যাবাকাস নামক গণনাকারী যন্ত্রটিই প্রথম গণনাকারী যন্ত্র। যাকে কম্পিউটারের পূর্বপুরুষ বলা হয়। তখন থেকে আজ অবধি অনেক পর্যায় অতিক্রম করে বর্তমান আধুনিক কম্পিউটার আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। আধুনিক কম্পিউটারের মৌলিক রূপরেখা তৈরি করেন ব্রিটিশ গণিত বিশারদ চার্লস ব্যাবেজ (Charles Babbage)। ১৮৩৩ সালে তিনি পূর্ব প্রজন্মের সব যন্ত্রগণকের জন্য স্মৃতিভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 'অ্যানালিটিকেল' নামক একটি যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেন। বিভিন্ন কারণে তাঁর এ প্রচেষ্টা বাস্তব রূপদানে সমর্থ না হলেও তাঁর এ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই আজকের আধুনিক কম্পিউটার আবিষ্কৃত হয়েছে। এ কারণে চার্লস ব্যাবেজকে কম্পিউটারের আদি পিতা বা কম্পিউটারের জনক বলা হয়ে থাকে।

১৮৮৭ সালে ড. হারম্যান হলেরিথ যুক্তরাষ্ট্রের আদমশুমারি কাজে ব্যবহারের জন্য ইলেকট্রো

মেকানিক্যাল ব্যবস্থায় পাঞ্চকার্ডের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি তথ্য প্রক্রিয়াকরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এ যন্ত্রের সাহায্যে দ্রুত আদমশুমারির রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে হলেরিথ এ যন্ত্র তৈরির জন্য 'হলেরিথ টেবুলেটিং মেশিন কোম্পানি' নাম দিয়ে একটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ জাতীয় আরো কয়েকটি কোম্পানি মিলে বিখ্যাত কম্পিউটার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান 'ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন' সংক্ষেপে IBM-এর জন্ম হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক হাওয়ার্ড এইচ. আইকেন আইবিএম-এর চারজন প্রকৌশলীর সহযোগিতায় ১৯৪৪ সালে Mark-1 নামে প্রথম স্বয়ংক্রিয় সাধারণ ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ডিজিটাল কম্পিউটার তৈরি করেন।

১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. জন মউসলি এবং তাঁর এক ছাত্র প্রেসপার একার্ট ENIAC নামে তৈরি করেন প্রথম প্রজন্মের ডিজিটাল কম্পিউটার।

১৯৪৬ সালে হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ জন ভন নিউম্যান 'সংরক্ষিত প্রোগ্রাম' (Internal Stored Program) ধারণাটি উদ্ভাবন করেন। তিনিই প্রথম কম্পিউটারের 'তথ্য ও নির্দেশ' সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করেন।

এরপর জন মউসলি ও প্রেসপার একার্ট নিজেদের কোম্পানিতে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ইউনিভ্যাক-১ (UNIVAC = Universal Automatic Calculator) তৈরি করেন। এটিই সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভিত্তিতে তৈরি ইলেকট্রনিক কম্পিউটার।

১৯৪৮ সালে ট্রানজিস্টর (Transistor) আবিষ্কৃত হওয়ার পর কম্পিউটারে ভালবের বদলে ট্রানজিস্টরের ব্যবহার শুরু হয়। ট্রানজিস্টর ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলো আকারে ছোট হয়ে যেতে শুরু করে। এ কম্পিউটারগুলো আগের কম্পিউটার অপেক্ষা উন্নত ছিল।

ট্রানজিস্টরের পর আসে আইসি (IC)-এর ব্যবহার। সিলিকন বা সেমিকন্ডাক্টর-এর একটি ক্ষুদ্র অংশে একাধিক ট্রানজিস্টর সন্নিবেশিত করা হলে তাকে বলা হয় আইসি বা সমন্বিত সার্কিট (Integrated Circute-IC)। আইসি ব্যবহার করে তৈরি হলো নতুন প্রজন্মের কম্পিউটর।

কম্পিউটারের সবচেয়ে বড় বিপ্লব ঘটে মাইক্রোপ্রসেসর আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে। ১৯৭১ সালে আমেরিকার ইন্টেল (Intel) নামক কোম্পানি সর্বপ্রথম মাইক্রোপ্রসেসর (Microprocessor) তৈরি করে। ফলে দাম কমে যায়, ব্যবহারের সুবিধা বেড়ে যায় এবং কাজের ক্ষমতা হাজার হাজার গুণ বেড়ে যায়। মাইক্রোপ্রসেসর দিয়ে তৈরি কম্পিউটারকেই আধুনিক মাইক্রোকম্পিউটার বা পার্সোনাল কম্পিউটার বলা হয়।

খ. কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ বলে। সিপিইউ কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক' বা 'ব্রেইন' স্বরূপ। কম্পিউটারের কাজ করার গতি এবং ক্ষমতা সিপিইউ-এর ওপর নির্ভরশীল।

সিপিইউ-এর কিছু কাজ নিচে দেয়া হলো :

১. কম্পিউটারের সব অংশের নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ সংকেত (Timing & Control signals) প্রদান করা।
২. মেমরি ও ইনপুট/ আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে ডেটার আদান-প্রদান করা (Transferring data)
৩. মেমরি থেকে ডেটা ও ইন্সট্রাকশন নেয়া (Fetching instructions & data)
৪. ইনস্ট্রাকশন ডিকোড করা (decode)

৫. গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বা সিদ্ধান্তমূলক কাজ করা (Arithmetic & Logical operatons)
৬. কম্পিউটারের মেমরিতে সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা ও
৭. ইনপুট ও আউটপুট অংশগুলোর সাথে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

গ. সমাজে আজ তথ্যপ্রযুক্তির জয়জয়কার। ব্যবসা, ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ, শিক্ষা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং শিল্প সংস্কৃতিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হচ্ছে। কলকারখানায় অধিকতর দক্ষতা এনে এবং উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি। নিচে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার উল্লেখ করা হলো :

১. **ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে :** তথ্যপ্রযুক্তি ছাড়া আজকাল ব্যাংক, বীমা, ক্রেডিট কোম্পানি, বিমান পরিবহন এবং উন্নত বিশ্বের সাধারণ কেনাকাটাসহ অনেক কর্মকাণ্ড অচল। ব্যবসায় বাণিজ্যে কম্পিউটারসহ তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি ছাড়া অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় অচল, বিশেষত উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অসম্ভব। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান ও যোগাযোগ, টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার বুলেটিন বোর্ড, ইলেক্ট্রনিক মেইল, ওয়েব সাইট এবং ইন্টারনেট বাণিজ্যিক যোগাযোগসহ সব রকম যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম। তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ব্যতীত আধুনিক ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানীতে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

২. **যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি :** আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি ব্যাপকহারে পরিলক্ষিত হচ্ছে। সড়কপথ, রেলপথ, জলপথে এবং আকাশপথের যোগাযোগের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে করেছে সহজতর, দ্রুত এবং লাভজনক। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা হচ্ছে সংরক্ষিত। টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলিভিশন, টেলিপ্রিন্টার, কম্পিউটার, ইলেক্ট্রনিক মেইল ইত্যাদি যোগাযোগ মাধ্যমে বিপ্লব এনে দিয়েছে।

৩. **শিক্ষাক্ষেত্রে :** শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার শিক্ষাকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এখন ইচ্ছা করলে কেউ বাংলাদেশে বসে আমেরিকার কোনো লাইব্রেরি থেকে বই পড়তে পারছে। আজকাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি কিংবা গবেষণা কর্ম সাথে সাথে ইন্টারনেটে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। তাছাড়া টেলিভিশন, টেলিফোন, ই-মেইল, ইন্টারনেট সর্বোপরি কম্পিউটারের মাধ্যমে শিক্ষার যাবতীয় তথ্য সম্প্রচারিত হচ্ছে।

৪. **বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে :** বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধারায় তথ্যপ্রযুক্তির বিপুল এবং বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণাকর্ম নতুনভাবে প্রকাশিত হওয়ার ফলে টেলিফোন, টেলিভিশন, ই-মেইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং গবেষণা কর্ম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি লাভ করছে। ফলে বিজ্ঞান সামনের দিকে এগিয়ে চলছে রকেটের গতিতে। আজ থেকে একশ বছর আগে যে গবেষণা শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আজ কেউ গবেষণা করছে না, যা অতীতে করত। বর্তমানে সর্বশেষ গবেষণা কর্মটি যেখানে শেষ, সেখান থেকে অন্য গবেষক গবেষণা শুরু করছেন। ফলে বিজ্ঞান নিত্যনতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের দ্বারে হাজির হচ্ছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাচ্ছে। আজ ঘরে বসে তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে চিকিৎসা সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। নতুন নতুন ওষুধের উদ্ভাবন এবং রোগ নিরাময়ের সর্বশেষ পদ্ধতি আজ সবাই জেনে যাচ্ছেন।

৫. **শিল্প-সাহিত্য এবং বিনোদনে তথ্যপ্রযুক্তি :** তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ শিল্প সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার হচ্ছে এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যুক্ত হচ্ছে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি। সাহিত্য ও শিল্পকর্মের ফলাফল আজ মুহূর্তে বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে এবং মানুষের কল্যাণে সেসব কর্ম অবদান রেখে যাচ্ছে।

বিনোদনের কথাতো বলাই বাহুল্য। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। সারা বিশ্বের টিভি চ্যানেলের অনুষ্ঠান আজ ঘরে বসে উপভোগ করা যাচ্ছে। ফলে তথ্যপ্রযুক্তি আমাদের বিনোদনের সব চাহিদাকে পূরণ করে যাচ্ছে।

ঘ. **ওহমের সূত্র :** তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো নির্দিষ্ট পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তরের সমানুপাতিক।

ব্যাখ্যা : ধরা যাক, AB একটি পরিবাহক, এর দু প্রান্তের বিভব যথাক্রমে V_A ও V_B (চিত্র)।

যদি $V_A > V_B$ হয়, তাহলে পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তর হবে,

$V = V_A - V_B$ এবং A থেকে B বিন্দুর দিকে তড়িৎ প্রবাহ চলবে।

এখন স্থির তাপমাত্রায় পরিবাহকের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহ I হলে,

ওহমের সূত্রানুসারে, $I \propto V$

বা, $I = GV$

এখানে G একটি সমানুপাতিক ধ্রুবক, একে পরিবাহকের তড়িৎ পরিবাহিতা বলে। G-এর বিপরীত রাশি $R = \frac{1}{G}$। উপরিউক্ত সমীকরণে বসালে আমরা পাই, $I = \frac{1}{R}.V$............(i)

এখানে R একটি ধ্রুব সংখ্যা। একে পরিবাহকের রোধ বলে। (i) নং সমীকরণ থেকে ওহমের সূত্রকে নিম্নোক্তভাবে লেখা যায়। তাপমাত্রা স্থির থাকলে কোনো পরিবাহকের মধ্য দিয়ে যে তড়িৎ প্রবাহ চলে তা ঐ পরিবাহকের দু প্রান্তের বিভবান্তরের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক।

ঙ. অসিলেটর এবং অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অসিলেটর	অ্যামপ্লিফায়ার
১. অসিলেটরে কোনো ইনপুট সিগনাল এর প্রয়োজন হয় না।	১. অ্যামপ্লিফায়ারে ইনপুট সিগনালের প্রয়োজন হয়।
২. অসিলেটর নিজে নিজেই আউটপুট সিগনাল উৎপন্ন করে।	২. অ্যামপ্লিফায়ারে আউটপুট সিগনাল ইনপুট সিগনালের ওপর নির্ভরশীল।
৩. অসিলেটরের ইনপুটে ডিসি দিলে আউটপুট-এ এসি পাওয়া যায়।	৩. অ্যামপ্লিফায়ারে ইনপুট সিগনাল আউটপুটে বর্ধিত আকারে পাওয়া যায়।
৪. অসিলেটরে পজিটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার হয়।	৪. অ্যামপ্লিফায়ারে নেগেটিভ ফিডব্যাক ব্যবহার হয়।
৫. অসিলেটরে টিউনড সার্কিট থাকে।	৫. অ্যামপ্লিফায়ারে টিউনড সার্কিট থাকে না।
৬. অসিলেটরের ফিডব্যাক গেইন A_f ইনফিনিটি হয়।	৬. অ্যামপ্লিফায়ারের ফিডব্যাক গেইন A_f ইনফিনিটি হয় না।

২. ক. **ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন (Web Search Engine) :** সার্চ ইঞ্জিন এক ধরনের টুল। যে টুল ইন্টারনেটের সকল ওয়েব সাইটের ভাণ্ডার তার বুকে ধরে রাখে। সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে ক্যাটাগরি অনুসারে ওয়েব সাইট খুঁজে বের করা যায়। এরকম জনপ্রিয় কিছু সার্চ ইঞ্জিন হলো, ইয়াহু, গুগল, বিং, ইত্যাদি।

খ. **স্যাটেলাইট (Satellite) :** অনেক সময় ক্যাবল অথবা মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক স্থাপন করা সম্ভবপর হয় না। সেক্ষেত্রে দেখা যায় দুটি নেটওয়ার্কের মধ্যবর্তী স্থানে উঁচু পর্বত, দালান বা সমুদ্র থাকলে এমনটি হয়। তখন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়। এজন্য অবশ্য কম্পিউটারের সাথে মডেম লাগবে। বর্তমানে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক সিস্টেমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত কম্পিউটারসমূহের মধ্যে নেটওয়ার্ক স্থাপনে স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হয়।

গ. ডিজিটাল পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। অত্যন্ত সাধারণভাবে বলা যায় এটি তার (Wire) ও বিভিন্ন যান্ত্রিক অংশের (Mechanical Part) সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি নেটওয়ার্ক যা ভোল্টেজের পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংকেতিক তথ্য (Coded Information) বহন করে। অন্যভাবে বলা যায়, এটি কতগুলো যৌক্তিক উপাদানের (Logical Element) সমষ্টি এবং প্রতিটি উপাদানের কিছু নির্দিষ্ট নীতিমালা (Rules) বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত থাকে। উঁচু পর্যায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, কোনো ডিজিটাল পদ্ধতি হলো বিভিন্ন ক্রিয়ামূলক অংশের (Functional Units) সমন্বয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থা যা বিভিন্ন তথ্য পড়তে (Input), লিখতে (Write), সংরক্ষণ করতে (Store) ও ব্যবহার করতে পারে।

ঘ. একটি বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পরমাণুর ইলেকট্রনগুলোর বিভিন্ন কক্ষপথের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট শক্তিস্তর কেলাসের কোটি কোটি ঘন সংঘবদ্ধ শক্তিস্তরের রূপ নেয়। অর্থাৎ বোর (Bohr) পরমাণুর একেকটি শক্তিস্তর একেকটি ব্যান্ড বা পাল্লার রূপ নেয়, একেই শক্তি ব্যান্ড বলে।

৩. ক. গায়ের চামড়া শুকনো থাকলে মানবদেহের রোধের পরিমাণ প্রায় 50,000 ওহম হয়। কিন্তু চামড়া ভেজা থাকলে এর রোধ অনেক কমে যায়; প্রায় 10,000 ওহম হয়। সুতরাং ভেজা অবস্থায় শরীরের রোধ কম হওয়ায় এর মধ্য দিয়ে বেশি প্রবাহ চলতে পারে। কোনো ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সুইচ, বাল্ব, পাখা, হিটার, ইস্ত্রি, টেলিভিশন প্রভৃতি থেকে দেহের মধ্য দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ মাটিতে চলে যায়। একে আমরা বৈদ্যুতিক শক (Shock) বলি। যদি তড়িৎপ্রবাহ মাটিতে চলে না যেত তাহলে শক অনুভব করতাম না। সুতরাং ভেজা অবস্থায় কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্পর্শ করা বিপজ্জনক এবং এ কারণে ভেজা মাটিতে খালি পায়ে দাঁড়িয়ে সুইচ নাড়াচাড়া করা উচিত নয়। কাঠ অন্তরক পদার্থ বলে সাধারণত কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা হয়। কাঠ ভেজা হলে তড়িতাহিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু শুকনো কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে যদি তড়িৎপ্রবাহের দুটি তারের প্রান্ত স্পর্শ করা হয় তাহলে শক লাগবে। এজন্য হাতে রবারের দস্তানা পরা উচিত।

খ. প্রতিটি ওয়েব অ্যাড্রেসের পেছনে একটি আইপি অ্যাড্রেস কাজ করে। ইন্টারনেটে যখন কোনো ওয়েব অ্যাড্রেস লিখে এন্টার প্রেস করা হয় তখন DNS-এর মাধ্যমে তা আইপি অ্যাড্রেসে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট কম্পিউটারকে খুঁজে পায়। মূলত ওয়েব অ্যাড্রেস ডোমেনের অন্তর্ভুক্ত একটি কম্পিউটারের পরিচয় বহন করে যা ওয়েব সার্ভিস প্রদান করে।

গ. মাউস হচ্ছে ক্যাবল (Cable) বা তারের সাহায্যে কম্পিউটারের সঙ্গে সংযুক্ত ছোট একটি যন্ত্রাংশ। তারের প্রান্ত ধরে যন্ত্রটি ঝুলিয়ে ধরলে যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা ইদুরের মত দেখায়। মাউসটি নাড়াচড়া করলে কম্পিউটারের পর্দায় একটি তীর (Arrow) নড়াচড়া করে। তীরটির গতিবিধি বা চলাচল টেবিলের উপর রাখা মাউস নাড়াচড়া করে নিয়ন্ত্রণ করতে হয় এবং পর্দার তীরটিকে বিভিন্ন নির্দেশের (Command) উপর ক্লিক করে কম্পিউটারকে নির্দেশ প্রদান করতে হয়। তাছাড়া মাউসের সাহায্যে পর্দায় লিখিত বিষয়, গ্রাফ, ছবি ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণসহ আরও নানা কাজ করা যায়।

ঘ. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কিংবা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তরের হারকে ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিড বলে। এ ট্রান্সমিশন স্পিডকে অনেক সময় Bandwith বলা হয়। এ ব্যান্ডউইথ সাধারণত Bit Per Second (bps) এ হিসাব করা হয়। ডেটা ট্রান্সফার গতির ওপর ভিত্তি করে কমিউনিকেশন গতিকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. ন্যারো ব্যান্ড (Narrow Band) [৪৫-৩০০bps পর্যন্ত]
২. ভয়েস ব্যান্ড (Voice Band) [৯৬০০bps পর্যন্ত]
৩. ব্রড ব্যান্ড (Broad Band) [কমপক্ষে ১ mbps]

৪. ক. কোডিং (Coding) হলো কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে কোনো জিনিসকে সংক্ষেপে সংখ্যা বা অক্ষর বা চিহ্ন দ্বারা ইউনিক (Unique) সংকেত বা কোডের সাহায্যে বোঝানো। ইউনিক মানে কোনো কোডই একাধিক জিনিস বোঝাবে না। ডেটা কোডিংয়ের সাহায্যে দুরূহ ও জটিল ডেটাকে সহজে ও সংক্ষিপ্তাকারে কম্পিউটারে এন্ট্রি করা হয়। কোডিং কাজের দক্ষতা ও নির্ভুলতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ডেটা প্রসেসের ক্ষেত্রে উপযুক্ত সর্টিং বা সাজানোর কাজে সাহায্য করে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কোড : কোড প্রধানত ৬ ধরনের। যথা :

১. অ্যালফাবেটিক;
২. নিউমেরিক;
৩. অলফানিউমেরিক;
৪. নেমোনিক;
৫. অ্যাক্রোনিম ও
৬. সেলফ চেকিং।

খ. এটি একটি প্রোগ্রাম যা কম্পিউটার ভাইরাসকে চিহ্নিত করে, দূরীভূত করে এবং কম্পিউটার সিস্টেমকে ভাইরাস প্রতিরোধী করে তোলে।

গ. ইন্টারনেটের সাথে পরস্পর স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থেকে যে কম্পিউটারটি অন্যান্য কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেটের সংযোগ ঘটিয়ে দেয় তাকেই বলে ওয়েব-সার্ভার।

ঘ. স্ক্যানার দেখতে অনেকটা ফটোকপি মেশিনের মতো। উচ্চতা প্রায় চার/পাঁচ ইঞ্চি। স্ক্যানারের সাহায্যে ক্যামেরায় তোলা ছবি বা যে কোনো মুদ্রিত ছবি, লেখা ইত্যাদি হুবহু কম্পিউটারে নিয়ে যাওয়া যায়। স্ক্যানারের সাহায্যে কম্পিউটারে নেয়া ছবি, লেখা ইত্যাদি যে কোনো প্রোগ্রামের বিষয়বস্তুর মধ্যে বসিয়ে প্রিন্ট করা যায়। এর সাহায্যে কম্পিউটারে নেয়া ছবি ইচ্ছামত সম্পাদনা করা যায়। অর্থাৎ ছোট বড় করা যায়, অংশ বিশেষ বা যে কোনো দিক কেটে বাদ দেয়া যায়, সংযোজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা যায় ও রঙের কাজ করা যায়।

মডেল প্রশ্ন ০৭ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ০৭

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

১. ক. একজন মহাশূন্যচারী মহাশূন্যে কখন নিজেকে ওজনহীন অনুভব করেন? ৪
খ. অভিস্রবণ কাকে বলে? অভিস্রবণের গুরুত্ব কি? ৪
গ. মানুষের চোখ ও ক্যামেরার তুলনা করুন। ৪
ঘ. 'আগুনের আংটি' বলতে কি বোঝায়? ৪
ঙ. আকাশ আলোকচিত্র (Aerial Photograph) কি? ৪

২. ক. Astronomy বা জ্যোতির্বিদ্যা কি? ৩
খ. নিয়ত বায়ুপ্রবাহ কাকে বলে? এর প্রকারভেদ উল্লেখ করুন। ২
গ. ফার্স্ট এইড বক্স কি? ২
ঘ. পূর্বে আবেশ পরে আকর্ষণ– ব্যাখ্যা করুন। ৩

৩. ক. রক্তের গ্রুপ জানার প্রয়োজনীয়তা কি? ৩
খ. মেয়ে সন্তান জন্মের জন্য মা একা দায়ী নয় কেন ব্যাখ্যা করুন। ৪
গ. টিকটিকির লেজ খসে পড়ে কেন? ৩

৪. ক. রাতে গাছের তলায় শয়ন করা ঠিক নয় কেন? ৩
খ. কচু জাতীয় খাদ্য খাওয়ার পর গলা চুলকায় কেন? ২
গ. রত্নপাথর বা GEM কি? ২
ঘ. ডিজেল ইঞ্জিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য করুন। ৩

৫. ক. স্লাইড ক্যালিপার্স কি? এর ব্যবহার উল্লেখ করুন। $২\frac{১}{২}$
খ. কোনটি বেশি ভারী— এক পাউন্ড তুলা না এক পাউন্ড লোহা? $২\frac{১}{২}$
গ. মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Rays) কাকে বলে? $২\frac{১}{২}$
ঘ. লিফটে নামার সময় ওজন কমে যায় কেন? $২\frac{১}{২}$

৬. ক. মাটির অম্লত্ব বলতে কি বুঝেন? উদ্ভিদ, পানি ও অণুজীবসমূহের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া আলোচনা করুন। ৫
খ. মাটির ক্ষারত্বের কারণ কি কি? ৫

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৭

১. ক. একজন মহাকাশচারী মহাশূন্যে নিজেকে সব সময়ই ওজনহীন অনুভব করেন। মহাশূন্যচারীরা মহাশূন্য যানে চড়ে পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করে থাকেন। এ বৃত্তাকার গতির জন্য কেন্দ্রমুখী অভিকর্ষজনিত ত্বরণ (g)-এর বিপরীতে একটি সমমানের কেন্দ্রবিমুখী ত্বরণ (g) মহাশূন্যযানে সবসময় বজায় থাকে। এ অবস্থায় মহাশূন্যযানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর ত্বরণ $(g - g) = 0$ হয় এবং মহাশূন্যচারী মহাশূন্যযানের দেয়াল বা মেঝেতে কোনো বল প্রয়োগ করেন না। ফলে তিনি ওজনের বিপরীত কোনো প্রতিক্রিয়া বলও অনুভব করেন না। তাই তিনি ওজনহীনতা অনুভব করেন। এ অবস্থায় মহাশূন্যযান থেকে কোনো বস্তুকে ছেড়ে দিলে পড়ে না, গ্লাসের পানি উপুড় করলেও পড়বে না অর্থাৎ সবকিছুই ওজনহীন মনে হবে।

খ. একই বায়ুমণ্ডলীয় চাপ, তাপমাত্রা এবং একই দ্রাবক বিশিষ্ট দুটি ভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণ একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লি দ্বারা পাশাপাশি পৃথক থাকলে দ্রাবক পদার্থ যে প্রক্রিয়ায় তার বেশি ঘনত্বের এলাকা হতে কম ঘনত্বের এলাকার দিকে ব্যাপিত হয়, সে প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে।

অভিস্রবণের গুরুত্ব

ক. অভিস্রবণের মাধ্যমে উদ্ভিদ পানি পরিশোষণ করে।

খ. অন্তঃঅভিস্রবণ ও বহিঃঅভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্ষীকোষের স্ফীত ও শ্লথ হওয়ার মাধ্যমে পত্র-রন্ধ্রের সাহায্যে প্রস্বেদনকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. অভিস্রবণ প্রক্রিয়া পরোক্ষভাবে কোষের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ. বীজ ও স্পোরের বিসরণে সাহায্য করে।

ঙ. নরম কোষকে দৃঢ় করে।

গ. নিচে মানুষের চোখ ও ক্যামেরার তুলনা করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মানুষের চোখ	ক্যামেরা
১. আলোক নিরুদ্ধ বাক্স	চোখের অক্ষিগোলক আলোক নিরুদ্ধ বাক্সের কাজ করে।	ক্যামেরায় আলোক নিরুদ্ধ বাক্স আছে।
২. বিম্বের ধরন	চোখের লেন্স চোখের সামনের বস্তুর সদ, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠন করে।	ক্যামেরায় এক বা একাধিক উত্তল লেন্স আছে, যা সদ, উল্টো ও খর্বিত বিম্ব গঠন করে।
৩. ডায়াফ্রাম	চোখের আইরিশ ডায়াফ্রামের কাজ করে।	ক্যামেরার ডায়াফ্রাম লেন্সের উন্মেষ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. কাজ	চোখের পাতাও একই কাজ করে। করে যে কোনো দূরত্বের বস্তুর ছবি তোলা যায়।	ক্যামেরার সাটার আলোক সম্পাতের সময় নিয়ন্ত্রণ
৫. বিম্ব গঠন	চোখের রেটিনায় বিম্ব গঠিত হয়।	ক্যামেরার আলোক-সংবেদী ফিল্মে বিম্ব পড়ে।
৬. বস্তু দেখা	চোখের উপযোজন ক্ষমতার জন্য যে কোনো অবস্থানের বস্তু দেখা যায়।	ক্যামেরার লেন্স ও ফিল্মের মধ্যবর্তী দূরত্ব নিয়ন্ত্রণ করে যে কোনো দূরত্বের বস্তুর ছবি তোলা যায়।
৭. প্রতিফলন রোধ	অক্ষিপটের কৃষ্ণমণ্ডল চোখের ভেতরে অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করে।	অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন রোধ করার জন্য ক্যামেরার ভেতরে কালো রং করা থাকে।

ঘ. ভূপৃষ্ঠের যে দুর্বল অংশসমূহের ওপর আগ্নেয়গিরিসমূহ সঞ্চিত রয়েছে তাকে আগ্নেয়গিরি মণ্ডল বলে। আগ্নেয়গিরি মণ্ডলকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম মণ্ডলটি দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত হর্ন অন্তরীপ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিমভাগে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল দিয়ে উত্তরদিকে আলাস্কা পৌঁছেছে। আলাস্কা থেকে এলিউক্সিয়ান দ্বীপপুঞ্জ হয়ে এশিয়ার কামচাটকা, জাপান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। এখান থেকে একটি শাখা বোর্নিও, সলবিস ও জাভা হয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করেছে এবং অপর শাখা নিউ গিনি, নিউজিল্যান্ড হয়ে দক্ষিণ অ্যান্টার্কটিকার ইরিপস পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এসব আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরকে আংটির মতো ঘিরে রেখেছে বলে একে 'আগুনের আংটি' (Fire ring of the Pacific) বলা হয়।

ঙ. আকাশ আলোকচিত্র হচ্ছে বিমান বা উপগ্রহ থেকে তোলা ভূপৃষ্ঠের অংশবিশেষের আলোকচিত্র। প্রায়ই এসব চিত্র পরপর উঠানো হয় এবং একটি অপরটিকে প্রাবৃত করে। এর উদ্দেশ্য একটি অঞ্চলের বিশেষ দিকের পুরো চিত্র দেখে ভূপৃষ্ঠের ত্রিমাত্রিক ধারণা লাভ করা যায়।

আকাশ আলোকচিত্রের দুটি প্রধান ব্যবহার হলো ভূপৃষ্ঠের বিশদ বিবরণ সম্বলিত মানচিত্র অঙ্কন এবং বিশেষ ক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ। ভূপৃষ্ঠের বিশদ বিবরণ সম্বলিত সব আধুনিক মানচিত্রই ত্রিমাত্রিক পর্যবেক্ষণের সুবিধাযুক্ত আকাশ আলোকচিত্র থেকে তৈরি হয়েছে। এসব আলোকচিত্র থেকে সঠিক পরিমাপ পদ্ধতিকে বলে Photogrammetry। ভূমির বন্ধুরতার জন্য পরিমাপে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু ফটোগ্র্যামেট্রি পদ্ধতি পরিমাপ নিশ্চিত করে নিখুঁত মানচিত্র প্রস্তুত করে।

আকাশ আলোকচিত্রের অপর প্রধান ব্যবহার হচ্ছে, চিত্রের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ও ঘটনার ব্যাখ্যা দান ও উপাত্ত সংগ্রহ। এছাড়া সময় ও স্থানভেদে ভূপৃষ্ঠের যেসব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন লক্ষ করা যায়, আকাশ আলোকচিত্র তাকে যথাযথভাবে ধারণ করে।

২. ক. মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে পৃথিবীর কাছে যে বিকিরণ আসে তার পর্যবেক্ষণ এবং ব্যাখ্যার বিজ্ঞানকেই জ্যোতির্বিদ্যা বলে। মানুষের ইতিহাসে বেশিরভাগ অংশই এ বিকিরণ বিদ্যুৎ চুম্বক বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশে নিবদ্ধ ছিল এবং চক্ষু ছিল একমাত্র গ্রাহক। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক গুণে বেড়ে যায় যার ফলে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহগুলোর অনেক বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ পায় এবং মানুষের চোখে যা আগে দেখা যায়নি এমন অসংখ্য তারার অস্তিত্ব ধরা পড়ে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বর্ধিত আলোক সংগ্রহের ক্ষমতা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে এবং একই সাথে মহাবিশ্ব এবং সৌরজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক আলোচনা বেড়েই চলেছে।

দূরবীক্ষণ যন্ত্রের ফলে আমরা জানি যে তারকাগুলো হলো দূরবর্তী সূর্য। তারকার ভৌত প্রকৃতি আলোচনা সম্ভব হয়েছে যখন টেলিস্কোপ অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন— ফটোমিটার এবং স্পেকট্রোগ্রাফ যা দিয়ে তারকা থেকে আসা বিকিরণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। ফটোগ্রাফিক প্লেট প্রবর্তনের ফলে ভৌত জ্যোতির্বিদ্যার প্রভূত উন্নতি হয়েছে যার ফলে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহার করে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান সৃষ্টি হয়েছে।

খ. পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ প্রধানত চাপ বলয়ের ওপর নির্ভরশীল। যে বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বছরের সকল সময় নির্দিষ্ট দিকে নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয় তাকে নিয়ত বায়ুপ্রবাহ বলে। নিয়ত বায়ুপ্রবাহ তিন প্রকার। যথা : ১. অয়ন বায়ু, ২. পশ্চিমা বায়ু বা প্রত্যয়ন বায়ু ও ৩. মেরু বায়ু।

গ. প্রাথমিক চিকিৎসার উপযোগী সরঞ্জাম সম্বলিত বক্স হলো ফার্স্ট এইড বক্স। এ বক্সে কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক, এন্টিসেপটিক, তুলা, ব্যান্ডেজ, কাঁচি, ছোট ছুরি প্রভৃতি থাকে।

ঘ. কোনো চুম্বককে চৌম্বক পদার্থের নিকটে রাখার ফলে আবেশের দ্বারা পদার্থের নিকটতম প্রান্তে ঐ চুম্বক মেরুর বিপরীত মেরু এবং দূরবর্তী প্রান্তে সমজাতীয় মেরু উৎপন্ন হয়। চুম্বক মেরুর ক্রিয়ার নিয়মানুসারে আবেশী মেরু ও নিকটবর্তী আবিষ্ট বিপরীত মেরুর মধ্যে আকর্ষণ এবং আবেশী মেরু ও দূরবর্তী আবিষ্ট সমমেরুর মধ্যবর্তী দূরত্ব অধিক হলে বিকর্ষণ বল কম হবে এবং চৌম্বক পদার্থটি চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হবে। অতএব প্রমাণিত হয় পূর্বে আবেশ পরে আকর্ষণ সংঘটিত হবে।

৩. ক. এন্টিজেন ও এন্টিবডির ওপর ভিত্তি করে মানুষের রক্তকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এ ধরনের শ্রেণী বিন্যাসকে ABO রক্তগ্রুপ বলে। বিভিন্ন কারণে আমাদের দেহে রক্তের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। দুর্ঘটনা, রক্তশূন্যতা অথবা কোনো কঠিন রোগ এবং অস্ত্রোপচার করার সময় অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়। এ সময় অন্য লোকের দেহ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে প্রয়োজন মেটানো হয়। এখানে রক্তদাতা ও গ্রহীতার রক্তে রাসায়নিক গুণাগুণ একরূপ হওয়া দরকার। তা না হলে অঘটন ঘটে রোগী মারা যেতে পারে। তাই রক্ত রোগীর দেহে প্রয়োগের পূর্বে দাতা ও গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ ভালোভাবে জেনে নেয়া উচিত।

খ. মেয়ে সন্তান জন্মদানের জন্য মা একা দায়ী না হওয়ার কারণ নিচে আলোচনা করা হলো :
যে পদ্ধতিতে কোনো জীব ফিনোটাইপগত বৈশিষ্ট্য স্ত্রী বা পুরুষে বিভেদিত হয়, তাকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে। সেক্স ক্রোমোজোমের একটি হলো X ক্রোমোজোম এবং অন্যটি হলো Y ক্রোমোজোম। সেক্স ক্রোমোজোম যদি XY হয়, তাহলে সন্তানটি পুরুষ (ছেলে) হবে, আর যদি XX হয়, তাহলে সন্তানটি স্ত্রী (মেয়ে) হবে।

স্ত্রী এবং পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই ৪৪টি অটোসোম এবং একজোড়া সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। স্ত্রীর সেক্স ক্রোমোজোম হলো XX এবং পুরুষের সেক্স ক্রোমোজোম হলো XY। পুরুষের গ্যামেট (শুক্রাণু) হবে X এবং Y কিন্তু স্ত্রীর গ্যামেট (ডিম্বাণু) হবে X এবং X। স্ত্রীর X ডিম্বাণুর সাথে যদি পুরুষের Y শুক্রাণুর মিলন হয়, তবে সন্তান হবে XY অর্থাৎ ছেলে। আবার স্ত্রীর X ডিম্বাণুর সাথে যদি পুরুষের X ডিম্বাণুর মিলন হয়, তবে সন্তান হবে XX অর্থাৎ মেয়ে। দেখা যাচ্ছে Y ক্রোমোজোম না থাকলে কখনো ছেলে হবে না। স্ত্রীতে কোনো Y ক্রোমোজোম থাকে না, Y ক্রোমোজোম থাকে কেবলই পুরুষে। কাজেই কোনো দম্পতির যদি কোনো ছেলে সন্তান না হয় তার জন্য পিতাই সম্পূর্ণ দায়ী, মা কোনো ক্রমেই দায়ী নয়।

গ. টিকটিকির লেজের হাড় কতগুলো ছোট ছোট কশেরুকা দিয়ে তৈরি। কশেরুকাগুলো মিলেই তৈরি হয় মেরুদণ্ডের লেজের অংশ। টিকটিকির লেজের মাঝ বরাবর এমন কয়েকটি কশেরুকা আছে যাদের মাঝখানে একটা ফাটলের দাগ থাকে। এ ফাটলের দাগ অংশে কশেরুকা এত বেশি হালকা হয় যে, সামান্য ছোঁয়া বা সামান্য চাপেই কশেরুকাটি দুভাগে ভেঙ্গে যেতে পারে। কশেরুকার ঐ ফাটল অংশকে ঘিরে যেসব রক্তনালী এবং স্নায়ুতন্ত্রী আছে তারাও ঐ পর্যন্ত এসেই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ ঐ অংশের পিছনে রক্ত যেতে পারে না এবং কোনো সংবেদনও পৌঁছায় না। বাইরের দিক থেকে ঐ অংশে খাঁজ তৈরি হয়। আর এ খাঁজ অংশ থেকেই লেজটি খসে পড়ে।
টিকটিকির লেজ হলো এক ধরনের প্রতিরক্ষা অঙ্গ। অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই টিকটিকি লেজ খসিয়ে শত্রুর দৃষ্টি খসা লেজের দিকে নিয়ে যায়। আর সে ফাঁকে টিকটিকি পালিয়ে বাঁচে। খসা লেজ যখন পেশীর চালনায় নড়তে থাকে তখন শত্রু ঐ খসা লেজটিকেই টিকটিকি বলে মনে করে। ভয় পেলে টিকটিকির লেজের পেশীতে চাপ পড়ে, ফলে ফাটল অংশে কশেরুকা দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং লেজও খসে পড়ে। রক্তনালীগুলো ঐ অংশে আগে থেকেই বন্ধ হয়ে যায় বলে লেজ খসে পড়লেও এক ফোঁটা রক্তপাত হয় না।

৪. ক. মানুষ সবসময় নিশ্বাসের সাথে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। গাছ দিনের বেলায় সালোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে। কিন্তু রাতে গাছের সালোকসংশ্লেষণ বন্ধ থাকে এবং শ্বাসক্রিয়া চলতে থাকে। শ্বাসক্রিয়ায় গাছ প্রাণীদের মতো অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। রাতে গাছতলায় শয়ন করলে গাছের পরিত্যক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড নিশ্বাসের সাথে মানুষের দেহে প্রবেশ করে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই রাতে গাছ তলায় শয়ন করা উচিত নয়।

খ. প্রতিটি উদ্ভিদ কোষেই বিভিন্ন রকমের জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগ থাকে। এগুলোর উপরই উদ্ভিদের গুণাগুণ নির্ভর করে। কচু গাছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট নামক তেমনি একপ্রকার যৌগ বিদ্যমান, যা কচু কোষে স্ফটিক বা দানা আকারে থাকে। খাওয়ার সময় এ দানার সূক্ষ্ম প্রান্ত গলায় আটকে যায়। ফলে গলায় চুলকানোর মতো অনুভূতির সৃষ্টি হয়।

গ. অলঙ্কারাদিতে ব্যবহারের উপযোগী সৌন্দর্য ও অধিক স্থায়িত্বসম্পন্ন খনিজ ও অন্যান্য পদার্থ রত্নপাথর হিসেবে পরিচিত। মুক্তা, অ্যাম্বার, কোরাল, জেট প্রভৃতি জৈব উৎসজাত এবং কাচের মতো অজৈব উৎসের রত্নপাথর ছাড়া আর সব রত্নপাথরই খনিজ পদার্থ।

ঘ. ডিজেল ইঞ্জিন ও পেট্রোল ইঞ্জিনের পার্থক্য :

ডিজেল ইঞ্জিন

১. জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহৃত হয়।
২. এতে কোনো স্পার্ক প্লাগ থাকে না।
৩. এতে কেবল বায়ু সিলিন্ডারে শোষিত হয়।
৪. এতে উচ্চচাপে সংনমিত বায়ুর ওপর জ্বালানি ইনজেক্ট করে আগুন ধরানো হয়।
৫. এ ইঞ্জিনের কার্যদক্ষতা প্রায় ৭০%।

পেট্রোল ইঞ্জিন

১. জ্বালানি হিসেবে পেট্রোল ব্যবহৃত হয়।
২. এতে বিদ্যুৎ স্পার্ক প্লাগ থাকে।
৩. এতে বায়ু ও পেট্রোলের মিশ্রণ সিলিন্ডারে শোষিত হয়।
৪. এতে উচ্চ চাপে সংনমিত বায়ু ও জ্বালানির মিশ্রণে স্পার্কিং প্রক্রিয়ায় আগুন ধরানো হয়।
৫. এ ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা প্রায় ৪০%।

৫. ক. স্লাইড ক্যালিপার্স একটি উন্নত ধরনের ভার্নিয়ার স্কেল। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয় –
১. দণ্ডের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ে
২. গোলকের ব্যাস নির্ণয়ে
৩. সিলিন্ডারের দৈর্ঘ্য ও ব্যাস নির্ণয়ে
৪. ফাঁপা টিউবের ভেতরের ও বাইরের ব্যাস নির্ণয়ে।

খ. কোনো বস্তু কতটুকু ভারী তা নির্ভর করে এদের কোথায় ওজন করা হচ্ছে তার ওপর। বায়ুতে তুলা ও লোহা উভয়ের ভর সমান। আসলে বায়ুপূর্ণ স্থানে যদি এক পাউন্ড তুলা ও এক পাউন্ড লোহার ভর সমান হয় তাহলে বায়ুশূন্য স্থানে তুলার ভর বেশি হবে। কারণ তুলার ঘনত্ব কম বলে এক পাউন্ড তুলার আয়তন এক পাউন্ড লোহার চেয়ে অনেক বেশি হবে। ফলে তুলার উপর বাতাসের প্লবতার মান লোহার চেয়ে অনেক বেশি হবে। ফলে তুলার প্রকৃত ওজন কম হবে। বায়ুশূন্য স্থানে লোহা ও তুলার প্রকৃত ওজন যদি এক পাউন্ড করে হয় তাহলে বায়ুপূর্ণ স্থানে ঐ তুলা লোহা অপেক্ষা হালকা হবে।

গ. পৃথিবীর সবদিকে মহাশূন্য থেকে ইলেকট্রন, প্রোটন ও কয়েকটি পরমাণুর নিউক্লিয়াস আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে পৃথিবীতে আঘাত হানে। এদেরকে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays) বলে। যেসব মহাজাগতিক রশ্মি মহাশূন্য থেকে এসে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে আঘাত হানে তাদেরকে প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মি বলে।

প্রাথমিক মহাজাগতিক রশ্মির বেশির ভাগ কণা বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে বাতাসের কণাকে আঘাত করে। ফলে বহুসংখ্যক কম বেগবান নিউট্রন, ইলেট্রন, প্রোটন, আলফা কণা, মিউমেসন, ফোটন ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। একে কেউ কেউ নিউক্লিয় প্রপাত (Nuclear Cascade) বলে অভিহিত করেন। একে বলা হয় উদ্ভূত বা দ্বিতীয় পর্যায়ের মহাজাগতিক রশ্মি (Secondary Cosmic Rays)। খুব কমসংখ্যক প্রাথমিক রশ্মি ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত এসে পৌছাতে পারে। উদ্ভূত রশ্মিগুলো ভূপৃষ্ঠের সবদিকে বর্ষিত হয়। মহাজাগতিক রশ্মির ওপর পৃথিবীর চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাব রয়েছে। মেরু অঞ্চলে এর প্রাখর্য নিরক্ষীয় অঞ্চলের চেয়ে বেশি। মহাজাগতিক রশ্মি বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত। সুতরাং এ রশ্মি চুম্বক ক্ষেত্রদ্বারা বিচ্যুত হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, ছায়াপথের সর্বত্র চুম্বকক্ষেত্র বিদ্যমান। প্রাথমিক গতিসম্পন্ন প্রোটন ও বিভিন্ন আয়ন এ চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় এর প্রভাবে ত্বরান্বিত হয়ে প্রচুর শক্তির অধিকারী হতে পারে।

ধারণা করা হয়ে থাকে, নক্ষত্রমণ্ডলী প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন প্রোটনের মধ্যে অধিক শক্তিসম্পন্নগুলো ছায়াপথের চুম্বকক্ষেত্র দ্বারা ত্বরিতচালিত হয়ে সর্বোচ্চ 10^{12} থেকে 10^{4} এমইভি (MEV) শক্তি নিয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে এসে পৌছায়।

ঘ. লিফটে নিচের দিকে নামার সময় লোকের ওজন নিচের দিকে ক্রিয়া করে। অপরদিকে লিফটের প্রতিক্রিয়া বল ওপরের দিকে ক্রিয়া করে। কিন্তু নিচে নামার সময় লিফটের প্রতিক্রিয়া বল কমে যায়। প্রতিক্রিয়া বল কমে যাওয়ার কারণে লিফটে নামার সময় ওজন কমে যায় বলে মনে হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া বল, $R = m(g-f)$। যদি $g = f$ হয় অর্থাৎ লিফটটি যদি মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ g-এর সমান ত্বরণে নিচে নামতে থাকে তাহলে লোকটির কোনো ওজন নেই বলে মনে হবে।

৬. ক. মৃত্তিকা দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব বেশি হলে মাটিতে অম্লত্বের সৃষ্টি হয়। মাটির অম্লমানের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির অম্লতার তীব্রতাও পরিবর্তিত হয়। যে মাটির অম্লমান যত কম সে মাটির অম্লত্ব তত বেশি। মাটিতে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা মাটির অম্লতার তীব্রতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। মাটির অম্লত্ব প্রধানত দু'প্রকার। যথা– সক্রিয় অম্লত্ব ও প্রচ্ছন্ন অম্লত্ব। মাটির দ্রবণে যে পরিমাণ H^+ মুক্ত অবস্থায় থাকে তাকে সক্রিয় অম্লত্ব বলে। পিএইচ মিটার দ্বারা সক্রিয় অম্লত্ব জানা যায়। অন্যদিকে কর্দম কণা বা কলোয়েড যে পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন শোষিত বা আবদ্ধ অবস্থায় রাখে তাকে প্রচ্ছন্ন অম্লত্ব বলে। মাটির প্রচ্ছন্ন অম্লত্ব সক্রিয় অম্লত্বের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি এবং এটেল মাটিতে এর পরিমাণ আরও অধিক। অম্লত্বের হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য মাটিতে অবস্থানরত উদ্ভিদ, পানি ও অণুজীবসমূহের মধ্যেও নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। যেমন–

১. মাটিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সহজলভ্যতা হ্রাস পায়।
২. মাটিতে আয়রন ও অ্যালুমিনিয়ামের আধিক্যজনিত বিষাক্ততা সৃষ্টি হয়।
৩. মাটিস্থ অণুজীবসমূহ বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়ার সক্রিয়তা হ্রাস পায়।
৪. মাটির অম্লত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার প্রভৃতি মুখ্য পুষ্টি উপাদানের দ্রবণীয়তা কমে যায়।
৫. মাটিতে আয়রন, জিংক, বোরন, কপার, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা বৃদ্ধি পায়।
৬. অম্ল মাটিতে কিছু কিছু ফসল যেমন– চা, আনারস, কমলালেবু প্রভৃতি ভালো জন্মে।

খ. বিভিন্ন কারণে মাটিতে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হতে পারে। যেমন–

১. **শিলাগত কারণ :** ক্ষারীয় শিলা হতে সৃষ্ট মাটি ক্ষারীয় বিক্রিয়তা প্রদর্শন করে, যেমন– চুনাপাথর, ডলোমাইট হতে সৃষ্ট মাটিতে চুনের পরিমাণ বেশি থাকে। বাংলাদেশে গঙ্গা প্লাবনভূমিতে অধিক হারে শামুক-ঝিনুক থাকে বলে এ মাটিতে ক্ষারত্ব সৃষ্টি হয়েছে।
২. **জলবায়ুগত কারণ :** জলবায়ুর কারণে শুষ্ক ও অবশুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় বলে সেখানে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের চুয়ানি কম হয়। ফলে মাটির ওপর স্তরে ক্ষারীয় দ্রব্য বেশি থাকে, যা মাটিতে ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করে।
৩. **লোনাজনিত কারণ :** সামুদ্রিক লোনা পানির প্লাবনে কোনো জমি নিয়মিত প্লাবিত হলে সে মাটির লবণাক্ততা বেড়ে যায়। লোনা পানিতে লবণ বেশি থাকে। অন্যদিকে সোডিয়াম আয়নের আধিক্য থাকে। ফলে মাটি ক্ষারীয় হয়ে থাকে।
৪. **খারাপ মানের সেচের পানি ব্যবহার :** জমিতে ক্রমাগত অধিক সোডিয়ামযুক্ত সেচের পানি ব্যবহার করলে ক্ষারতা দেখা দেয়। পানির সোডিয়াম জমির জৈব পদার্থসমূহকে দ্রবীভূত করে এবং এদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ফলে মাটির ক্ষারতা বৃদ্ধি পায় এবং মাটির সংযুতি নষ্ট হয়।

মডেল টেস্ট ০৭

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো দুটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

নম্বর

১. ক. রাডার (RADAR) কি? রাডার কিভাবে কাজ করে? ৪
   খ. অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন। ৪
   গ. ট্রান্সফরমার (Transformer) কি? এর গঠন উল্লেখ করুন। ৪
   ঘ. ই-কমার্স কি? এর প্রকারভেদ ও সুবিধাবলী আলোচনা করুন। ৪
   ঙ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি কি? ৪

২. ক. বিদ্যুৎ প্রবাহ কি? বিদ্যুৎ প্রবাহ কয় প্রকার ও কি কি? ৩
   খ. তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ কি? তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশের ক্ষেত্রে ফ্যারাডের পরীক্ষাসমূহ বর্ণনা করুন। ৪
   গ. ডিজিটাল থেকে অ্যানালগ রূপান্তর কিভাবে হয়? ৩

৩. ক. ভিডিও কনফারেন্সিং কি? ২
   খ. ট্যাব কী (Tab key) বলতে কি বোঝায়? ২
   গ. ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer) কি? ২
   ঘ. স্ক্যানিং কি? টেলিভিশনে ছবি প্রেরণে স্ক্যানিং কিভাবে ব্যবহার করা হয়? ৪

৪. ক. IPS কি? এ সম্পর্কে আলোচনা করুন। ২½
   খ. এসি সরবরাহের সুবিধাগুলো কি কি? ২½
   গ. বিভব ও বিভব পার্থক্য কি? ২½
   ঘ. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কত প্রকার ও কি কি? ২½

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৭

১. ক. রাডার হচ্ছে এক ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, যার সাহায্যে আমাদের দৃষ্টির বাইরের কোনো বস্তুকে খুঁজে বের করা যায় এবং দূরত্বও নির্ণয় করা যায়। রাডার (RADAR)-এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে Radio Detection And Ranging।

প্রেরক, গ্রাহক ও সূচক সম্বলিত ও প্রতিধ্বনি সৃষ্টির নীতি অনুসারে রাডার কাজ করে। রাডার ব্যবস্থায় বেতার তরঙ্গের চেয়ে অধিক কম্পাংক বিশিষ্ট তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। এই বেতার তরঙ্গ বা সূক্ষ্ম তরঙ্গের গতিবেগ আলোর গতিবেগের সমান। প্রেরক যন্ত্র থেকে অতি উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরঙ্গ সামনের দিকে পাঠানো হয়। এই তরঙ্গগুলো সরলরেখায় চলে এবং উদ্দিষ্ট অভিলক্ষ্য বস্তুটির গায়ে লেগে প্রতিফলিত হয়ে এর কিছু অংশ ফিরে আসে। প্রতিফলিত রশ্মির যে অংশ রাডার কেন্দ্রে ফিরে আসে, গ্রাহক যন্ত্র প্রথমে তা গ্রহণ করে, পরে সংকেতকে পরিবর্তিত করে নির্দেশক যন্ত্রে বা পর্দায় বিম্ব গঠন করে। ঐ বিম্বের প্রকৃতি থেকে রাডার দূরবর্তী অবস্থানের বিমান, জাহাজ বা নিম্নচাপের পরিষ্কার ধারণা দেয়। প্রেরক যন্ত্র থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ বস্তু কর্তৃক প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক যন্ত্রে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই সময়কে আলোর গতিবেগ দিয়ে গুণ করে রাডার থেকে ঐ বস্তুর দূরত্বের দ্বিগুণ দূরত্ব পাওয়া যায়। এর অর্ধেকই হচ্ছে রাডার থেকে ঐ বস্তুর দূরত্ব। এভাবেই রাডার বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করে। ১৯৩৫ সালে রাডার আবিষ্কৃত হয় তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

খ. অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

অ্যামিটার	ভোল্টমিটার
১. কোনো বর্তনীর বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা সরাসরি (অ্যাম্পিয়ারে) পরিমাপ করার যন্ত্রকে অ্যামিটার বলে।	১. কোনো বর্তনীর দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব বৈষম্য সরাসরি (ভোল্টে) পরিমাপ করার যন্ত্রকে ভোল্টমিটার বলে।
২. অ্যামিটার একটি কম রোধবিশিষ্ট চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার। একটি চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের সাথে নিম্নমানের রোধ সমান্তরালে যুক্ত করে এটি তৈরি।	২. ভোল্টামিটার একটি উচ্চ রোধবিশিষ্ট চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটার। একটি চলকুণ্ডলী গ্যালভানোমিটারের সাথে উচ্চমানের রোধ শ্রেণীতে যুক্ত করে এটি তৈরি।
৩. যে বর্তনীর বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রা নির্ণয় করতে হবে তার সাথে তাকে সিরিজ সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।	৩. বর্তনীর যে দুই বিন্দুর মধ্যে বিভব বৈষম্য নির্ণয় করতে হবে ঐ দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের সাপেক্ষে একে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করতে হয়।
৪. অ্যামিটার কার্যকর রোধ নিম্নমানের বলে কোনো বর্তনীর সাথে তাকে শ্রেণী সমবায়ে যুক্ত করলে বর্তনীর মূল বিদ্যুৎপ্রবাহ মাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটে না ধরা যায়।	৪. ভোল্টামিটারের কার্যকর রোধ খুব বেশি বলে একটি বর্তনীর কোনো অংশের সাপেক্ষে তাকে সমান্তরাল সমবায়ে যুক্ত করলে ঐ অংশের বিভব বৈষম্যের কোনো পরিবর্তন হয় না ধরা যায়।

গ. তড়িৎ বিভব বা তড়িৎ প্রবাহকে বাড়াতে বা কমাতে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়। তারের প্রস্থচ্ছেদের ওপরই বিদ্যুতের প্রবাহ নির্ভর করে। তাই দূরে বিদ্যুৎ পাঠাতে হলে অধিক প্রস্থচ্ছেদের তার প্রয়োজন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আবার উচ্চ অ্যাম্পিয়ারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে লাইন লস অনেক বেড়ে যায়। এ জন্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিদ্যুৎ পাঠাতে বৈদ্যুতিক বিভব বা ভোল্টেজ বাড়ানো হয়। এতে অ্যাম্পিয়ার আনুপাতিক হারে কমে যায়। আবার বেশি ভোল্টেজ ব্যবহার করলে তারের ইনস্যুলেটরের খরচ অনেক বেড়ে যায়। এসব কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে সাধারণত ১১০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। সঞ্চালন ক্ষতি কমানোর জন্য একে ২,৩০,০০০ ভোল্টে উন্নীত করা হয় আবার গ্রাহকদের জন্য একে কমিয়ে ১১০০০, ৪৪০ অথবা ২২০ ভোল্ট হিসেবে সরবরাহ করা হয়। এভাবে ভোল্টেজকে কমানো বা বাড়ানো যন্ত্রের নাম ট্রান্সফরমার।

ট্রান্সফরমারে থাকে নরম লোহার পাতের তৈরি অভ্যন্তরীণ দণ্ড। এ দণ্ডের উপর প্যাঁচানো পরস্পর থেকে বৈদ্যুতিকভাবে বিচ্ছিন্ন তামার তারের দুটো কুণ্ডলী। এ কুণ্ডলী দুটি এক বাহুর ওপর বা ভিন্ন ভিন্ন বাহুর ওপর হতে পারে। দুই তারের আবর্তন বা পাক সংখ্যা আলাদা

আলাদা থাকে। কুণ্ডলীর তারের এক প্রান্তে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎসের সংযোগ এবং অপর প্রান্তে গ্রাহক প্রান্তের সরবরাহ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়। উৎসের কুণ্ডলীকে প্রাইমারি এবং অন্য কুণ্ডলীকে সেকেন্ডারি কুণ্ডলী বলে। সেকেন্ডারির পাকসংখ্যা কম হলে প্রাইমারি অপেক্ষা বেশি ভোল্টেজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ দু কুণ্ডলীর পাকসংখ্যার অনুপাতে দু পার্শ্বে দু রকম ভোল্টেজ পাওয়া যাবে সেই সাথে বিপরীত অনুপাতে বিদ্যুৎ প্রবাহ, অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যাবে। পাওয়ার হাউস বা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয়। উৎপাদন কেন্দ্রে 11 KV/132 KV (KV= Kilovolt), 11 KV/230 KV সঞ্চালনে 230 KV/132 KV, 132 KV/33 KV এবং বিতরণ ব্যবস্থায় 33 KV/11 KV, 11 KV/44 KV ট্রান্সফরমার ব্যবহৃত হয়।

ঘ. ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাণিজ্য করতে পারেন। অনলাইনের এ বাণিজ্যকে E-Commerce বলে। Electronic Commerce-এর সংক্ষিপ্ত রূপই ই-কমার্স। উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা পণ্যের বিবরণ বিজ্ঞাপন আকারে তাদের ওয়েব পেজে প্রদর্শন করেন। ক্রেতা কোনো পণ্য সম্পর্কে আগ্রহী হলে ওয়েব পেজের অর্ডার ফরম পূরণ করে বিক্রেতার নিকট অর্ডার প্রদান করেন এবং একই পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে মূল্য পরিশোধ করেন। বিক্রেতা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ক্রেতার নিকট পণ্য পৌঁছে দেন। ইন্টারনেটভিত্তিক এরূপ ক্রয় পদ্ধতিকে অনলাইন শপিং বলা হয় এবং সামগ্রিক এ ব্যবসায় ব্যবস্থাপনাই ই-কমার্স।

ব্যবহার : শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য, গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা ও রাষ্ট্র পরিচালনা প্রভৃতিতে ই-কমার্স ব্যবহৃত হয়।

প্রকারভেদ : ই-কমার্স সাধারণত তিন প্রকার। যথা :

১. বিজনেস টু কনজিউমার (B2C) ই-কমার্স

২. বিজনেস টু বিজনেস (B2B) ই-কমার্স

৩. কনজিউমার টু কনজিউমার (C2C) ই-কমার্স

ই-কমার্সের জন্য যে কোনো দেশে বসে অন্য এক দেশের পণ্য বা সেবা কেনা-বেচা করা সম্ভব। EDI—Electronic Data Interchange হওয়ায় টাকা হারানোর ভয় থাকে না। সপ্তাহে সাত দিন এবং প্রতিদিনের ২৪ ঘণ্টাই কেনা-বেচা করা সম্ভব। ই-কমার্সের ফলে কেনা-বেচার সময় কম লাগে এবং পণ্য বা সেবা দ্রুত কাস্টমার/ভোক্তা/ক্রেতার দোড়গোড়ায় পৌঁছে যায়। ই-কমার্সের ফলে ভার্চুয়াল অরগানাইজেশন/ডিজিটাল ফার্ম গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ ফিজিক্যাল লোকেশন ছাড়াও অর্গানাইজেশন তাদের ব্যবসা করতে পারছে। ই-কমার্স বিশ্ব বাণিজ্যে যেমন বিপ্লব এনেছে তেমনি এনে দিয়েছে নিরাপত্তা ও দ্রুততা। ই-টেকনোলজির বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো পেমেন্ট সিস্টেম। এই পেমেন্ট সিস্টেম ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড, ইলেকট্রনিক চেক, ফোন বা আইভিপি (IVP) গ্রহণ করে যা সাধারণ পে-সিস্টেমের চেয়ে অনেক বৈচিত্র্যময়, সুবিধাজনক এবং নিরাপদ।

ঙ. তথ্যপ্রযুক্তি বলতে সাধারণত তথ্য রাখা এবং একে ব্যবহার করার প্রযুক্তিকেই বোঝানো হয়। একে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা আইটি (Information Technology – IT) নামে অভিহিত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি মূলত একটি সমন্বিত প্রযুক্তি যা যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগ, অডিও ভিডিও, কমপিউটিং, সম্প্রচারসহ আরো বহুবিধ প্রযুক্তির সম্মিলনে দীর্ঘদিন ধরে চর্চার ফলে সমৃদ্ধি লাভ করে তথ্যপ্রযুক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। সার্বিকভাবে বলতে গেলে কম্পিউটার এবং টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ, একত্রকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিনিময় বা পরিবেশনের মাইক্রো-ইলেকট্রনিক্স ব্যবস্থাকে তথ্যপ্রযুক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

২ ক. পরিবাহীর কোনো প্রস্থচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অভিলম্বভাবে বাহ্যিক বলের প্রভাবে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক চার্জ একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়, তাকে বিদ্যুৎ প্রবাহ বা বিদ্যুৎ প্রবাহমাত্রা বলে। এক কথায় বলা যায়, বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহের হারকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ বলে।

বিদ্যুৎ প্রবাহ দু প্রকার। যথা : ১. সম বা একমুখী প্রবাহ (Direct Current বা DC) এবং ২. পরিবর্তী প্রবাহ বা দ্বিমুখী প্রবাহ (Alternating Current বা AC)।

বিদ্যুৎ যদি সর্বদা একই দিকে প্রবাহিত হয় তবে তাকে একমুখী বিদ্যুৎ প্রবাহ বলে। আর যদি প্রবাহের অভিমুখ নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সমমুখী হয় এবং সাধারণভাবে পরিবর্তনের ধরনটি একটি সাইন লেখ (sine curve) হয় তবে তাকে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ বা দ্বিমুখী প্রবাহ বলে।

খ. কোনো তার বা তার কুণ্ডলীর কাছে আমরা যদি কোনো চুম্বককে নাড়াচাড়া করি, বা আনা নেয়া করি বা কোনো চুম্বকের নিকট কোনো তার কুণ্ডলীকে আনা-নেয়া করি তাহলে কুণ্ডলীতে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তড়িতচৌম্বক আবেশ বলে। কোনো তড়িৎবাহী তার বা বর্তনীর নিকট কোনো তার কুণ্ডলী আনা-নেয়া করলেও তার কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হয়। একে তড়িত চৌম্বক আবেশ বলে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, একটি গতিশীল চুম্বক বা তড়িৎবাহী বর্তনীর সাহায্যে অন্য একটি সংবদ্ধ বর্তনীতে ক্ষণস্থায়ী তড়িচ্চালক বল ও তড়িৎ প্রবাহ উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে তড়িতচৌম্বক আবেশ বলে।

পরীক্ষা-১ : কার্ড বোর্ডের একটি চোঙের গায়ে অন্তরীত তার পেঁচিয়ে তারের দু প্রান্তে একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার যুক্ত করা হয়। এখন একটি দণ্ড চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে দ্রুত চোঙের ভেতর আনা-নেয়া করলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ ঘটবে। চুম্বক প্রবেশ করানোর সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটার বিক্ষেপ যে দিকে ঘটবে চুম্বককে বের করানোর সময় বিক্ষেপ ঘটবে তার বিপরীত দিকে।

চুম্বকটিকে স্থির রেখে এবার যদি গ্যালভানোমিটারসহ কুণ্ডলীটিকে চুম্বকের দিকে দ্রুত নেয়া হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। কুণ্ডলীটিকে চুম্বক থেকে দূরে সরিয়ে নিলে বিক্ষেপ বিপরীত দিকে দেখা যাবে।

পরীক্ষা-২ : অন্তরীত তামার তারের দুটি বদ্ধ কুণ্ডলী নেয়া হয়। প্রথম কুণ্ডলীতে শুধু একটি সুবেদী গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত। দ্বিতীয় কুণ্ডলীতে একটি তড়িচ্চালক শক্তির উৎস, একটি পরিবর্তনশীল রোধ ও একটি টেপা চাবি সংযুক্ত। যে কুণ্ডলীতে তড়িচ্চালক শক্তির উৎস সংযুক্ত তাকে মুখ্য কুণ্ডলী বলে। আর যে কুণ্ডলীতে গ্যালভানোমিটার সংযুক্ত সেটি গৌণ কুণ্ডলী। মুখ্য কুণ্ডলীতে তড়িৎ প্রবাহ চালালে গৌণ কুণ্ডলীর গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যায়। আবার তড়িৎ প্রবাহ বন্ধ করার সময়ও গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যায়। তবে এবার বিক্ষেপ বিপরীত দিকে হয়।

মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তন করতে থাকলে গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ দেখা যাবে। এক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহ বৃদ্ধির সময় বিক্ষেপ যেদিকে হবে তড়িৎপ্রবাহ হ্রাসের সময় বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে।

মুখ্য কুণ্ডলীর তড়িৎপ্রবাহ স্থির রেখে যদি কুণ্ডলীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিবর্তন করা হয় তাহলেও গ্যালভানোমিটারে ক্ষণিক বিক্ষেপ দেখা যাবে। দূরত্ব বৃদ্ধি করলে বিক্ষেপ যেদিকে হবে, দূরত্ব হ্রাস করলে বিক্ষেপ তার বিপরীত দিকে হবে।

উপরের পরীক্ষা থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায়। গ্যালভানোমিটারে বিক্ষেপ বর্তনীতে তড়িচ্চালক শক্তি তথা তড়িৎ প্রবাহের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এ তড়িচ্চালক শক্তিকে আবিষ্ট তড়িচ্চালক শক্তি এবং প্রবাহকে আবিষ্ট তড়িৎপ্রবাহ বলে।

চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি বন্ধ হয়ে গেলে গ্যালভানোমিটারে শূন্য বিক্ষেপ দেখা যায়। আপেক্ষিক গতি যত বেশি হয় বিক্ষেপের পরিমাণও তত বৃদ্ধি পায়। সুতরাং বলা যায়, চুম্বক ও কুণ্ডলীর মধ্যবর্তী আপেক্ষিক গতি যতক্ষণ থাকে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহও ততক্ষণ স্থায়ী হয় এবং এর মান আপেক্ষিক গতির মানের ওপর নির্ভর করে।

চুম্বকের মেরু পরিবর্তন করলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হয়। চুম্বকের মেরু শক্তি বৃদ্ধি করলে আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

গ. ডিজিটাল পদ্ধতিতে মান নির্দেশ করার জন্য ডিজিটাল কোড ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি ডিজিটাল গ্রহণ অবস্থার জন্য একটি করে অ্যানালগ মান থাকে। গ্রহণ সংকেতে প্রতিটি বিটের অবস্থানের উপর নির্ভর করে বিটটির স্থানিক মান বা ওজন নির্ধারণ করা হয়। ফলাফল প্রদান/প্রদর্শনের জন্য অধিকাংশ পরিবর্তকসমূহের মৌলিক বর্তনী একটি ভোল্টেজ প্রতিরোধযোগ্য ক্রমোন্নতি নেটওয়ার্ক (Ladder Network) যা ভারযুক্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ নির্গত করে।

৩. ক. **ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing) :** ভিডিও কনফারেন্সিং হলো দুই বা ততোধিক স্থানের মধ্যে ইমেজ (ভিডিও) এবং স্পিচ (অডিও) ট্রান্সমিট করা। এটা করার জন্য প্রথমে দরকার ওয়েব ক্যামেরা, যার সাহায্যে ইমেজ ধারণ এবং প্রেরণ করা যায় এবং মাইক্রোফোন যার সাহায্যে শব্দ ধারণ এবং প্রেরণ করা যায়।

খ. **ট্যাব কী (Tab key) :** কম্পিউটারের কার্সরকে দ্রুত স্থানান্তরের জন্য উক্ত কী-টি ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো প্যাকেজে রয়েছে যেখানে কমান্ড মেনুর এক কমান্ড থেকে অন্য কমান্ডে কার্সর স্থানান্তর করার জন্য ট্যাব কী টির প্রয়োজন হয়।

গ. **ল্যাপটপ কম্পিউটার (Laptop Computer) :** ক্ষুদ্রাকৃতির কম্পিউটার, যেটি আকারে খুবই ছোট। অর্থাৎ এ ধরনের কম্পিউটার সাধারণত কোলের ওপর রেখে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করা যায়।

ঘ. **স্ক্যানিং :** ছবিকে যে পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বা বিন্দুতে ভাগ করা হয় তাকে স্ক্যানিং বলে।

ছবি প্রেরণে এর ব্যবহার : টেলিভিশন ক্যামেরা কোনো দৃশ্যকে তড়িৎ চার্জে রূপান্তরিত করে। ক্যামেরা লেন্সের পিছনে থাকে একটি পর্দা বা মোজাইক, তার ওপর সিজিয়াম নামক পদার্থের বিন্দুর আকার আস্তরণ থাকে। প্রতিটি সিজিয়াম বিন্দু এক একটি ক্ষুদ্র আলোক তড়িৎ সেল হিসেবে কাজ করে। যখনই আলো এসব কিছুর উপর পতিত হয়, তখন তারা ইলেকট্রন নিঃসরণ বা ত্যাগ করে। ফলে তড়িৎ চার্জের সৃষ্টি হয়। লেন্স দৃশ্যমান ছবিকে মোজাইক পর্দায় ফোকাস করে যার ফলে সিজিয়াম বিন্দুগুলো ইলেকট্রন নির্গমন করে। ছবির উজ্জ্বল অংশ অধিক ইলেকট্রন এবং অনুজ্জ্বল অংশ কম ইলেকট্রন নিঃসরণ করে। অর্থাৎ ছবির বিভিন্ন অংশের পার্থক্যের জন্য সিজিয়াম বিন্দু থেকে নির্গত ইলেকট্রনের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। সুতরাং টেলিভিশন ক্যামেরায় পূর্ণাঙ্গ ছবিটি হয় তড়িৎ চার্জ বা ইলেকট্রন দ্বারা সৃষ্ট একটি পূর্ণাঙ্গ অভিন্ন ছবি। সিজিয়ামে বিন্দুর তড়িৎ চার্জ নির্গমনের জন্য অন্য কারও সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পরবর্তী ধাপ হলো এ ক্ষুদ্র চার্জ বা আধান দ্বারা প্রবাহ বা কারেন্টের সৃষ্টি হয়, যা বিবর্ধনের পর তাড়িত চৌম্বক বেতার তরঙ্গ হিসেবে টেলিভিশন অ্যান্টেনায় প্রেরণ করা হয়। সম্পূর্ণ কাজটি করে ইলেকট্রনগানের সাহায্যে। ইলেকট্রনগান এমন একটি যন্ত্র যা দ্রুতগতিতে ইলেকট্রনের স্রোতকে সুইয়ের মতো চিকন রশ্মি হিসেবে ছুঁড়ে দেয়। ইলেকট্রনগানের মুখের নিকট চৌম্বক পাতে বা চৌম্বক বিসরক কয়েলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ কারেন্টকে সমন্বিত করে ইলেকট্রনগানকে এমনভাবে তাক করা হয় যে, নির্গত রশ্মি মোজাইক পর্দার উপর অগ্র-পশ্চাৎ ও উপরে-নিচে আসা-যাওয়া করে। বীমের এ অগ্র-পশ্চাৎ এবং উপরে-নিচে গমনকে বলা হয় স্ক্যানিং। ইলেকট্রন স্রোতকেও ফোকাস করে এমনভাবে চালনা করা হয় যেন ইলেকট্রন সম্পূর্ণ ছবিটি বাম থেকে ডানে স্ক্যান করে।

৪. ক. IPS-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো Instant Power System। যা মূলত Power Storage হিসেবে কাজ করে থাকে। IPS এমন একটি Device যা বৈদ্যুতিক Power রিজার্ভ করে এবং পরবর্তীতে Main লাইন বা বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্ধে Back up দেয়। UPS-এর মতো IPS বৈদ্যুতিক সরবরাহ বন্ধের সাথে সাথে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিতে পারে না। 1/10 Sec পরে সরবরাহ automatically প্রদান করে থাকে। UPS অল্প সময়ের জন্য Back up দিয়ে থাকে কিন্তু UPS এর তুলনায় IPS বহুগুণ Back up দিয়ে থাকে। তাই IPS বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি চালনায় বেশি জনপ্রিয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্র : IPS মূলত যেসব ক্ষেত্রে বেশি সময় বৈদ্যুতিক সরবরাহের প্রয়োজন হয় সেখানেই বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিভিন্ন জায়গায় লোডশেডিংয়ের ফলে বাসা বাড়ির টিভি, ভিসিপি, ফ্যান, ফ্রিজ প্রভৃতি বেশি সময় চালনার কাজে IPS বেশ জনপ্রিয়। Computer পরিচালনায় IPS ব্যবহার করা যাবে তবে সে ক্ষেত্রে UPSও ব্যবহার করতে হবে, যাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ Continue থাকে। এর ফলে কোনো বড় কাজ (প্রায় ২ ঘণ্টা) Computer এ করা সম্ভব হবে অথবা কোনো কাজে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে Save করতে IPS ও UPS ব্যবহার করা খুবই কার্যকর।

খ. এসি সরবরাহের নিম্নলিখিত সুবিধা আছে :

ক. ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে এসি ভোল্টেজ উচ্চমান থেকে নিম্ন অথবা নিম্নমান থেকে উচ্চে রূপান্তরিত করা সহজ।

খ. দূর-দুরান্তে তড়িৎশক্তি প্রেরণের ব্যাপারে এসি সরবরাহ ব্যবস্থা ডিসি অপেক্ষা কম ব্যয়বহুল। কারণ এক্ষেত্রে লাইন-তার হিসেবে খুব সরু তার ব্যবহার করা যায়।

গ. এসিকে সহজে একমুখীকারকের (Rectifier) সাহায্য রূপান্তরিত করা সম্ভব।

ঘ. এসি মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি নির্মাণ করা অনেক সহজ, তাছাড়া যন্ত্রপাতিগুলো অনেক বেশি টেকসই হয় এবং এদের প্রতি খুব বেশি নজর দেয়ার প্রয়োজন হয় না।

ঙ. পরিবর্তী প্রবাহমাত্রা হ্রাস করার জন্য নিরোধক-কুণ্ডলী (Choke Coil) অথবা ধারক ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে শক্তির অবক্ষয় হয় অতি সামান্য কিন্তু সমপ্রবাহমাত্রা হ্রাস করতে হলে রোধক ব্যবহার করতে হয় এবং সেক্ষেত্রে তাপজনিত শক্তিক্ষয় প্রচুর পরিমাণে হয়।

গ. বিভব : অসীম দূরত্ব থেকে একটি একক ধন চার্জকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের কোনো বিন্দুতে আনতে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হয় তাকে উক্ত ক্ষেত্রের দরুন ঐ বিন্দুর বৈদ্যুতিক বিভব বলে। একে সাধারণত V দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

বিভব পার্থক্য : বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুতে একটি একক ধন চার্জকে স্থানান্তর করতে যে পরিমাণ কাজ সাধিত হয় তাকে ঐ দুটি বিন্দুর মধ্যকার বিভব পার্থক্য বলে।

একটি বিন্দু থেকে অপর একটি বিন্দুতে একক ধন চার্জকে আনতে যে পরিমাণ কাজ করা হয় তাই ঐ দু বিন্দুর বিভব পার্থক্যের পরিমাপ। কাজেই দুটি বিন্দুর বিভব যথাক্রমে V_1 এবং V_2 হলে বিভব পার্থক্য, $V = V_1 - V_2$।

চার্জ এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে প্রবাহিত হলে বুঝতে হবে যে, বস্তু দুটির বিভব অসম বিভব – এবং না হলে বস্তু দুটির বিভব সম-বিভব।

ঘ. কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তিন প্রকার। যথা–

১. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান (Local Area Network-LAN)
২. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ম্যান (Metropoliton Area Network-MAN)
৩. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ওয়ান (Wide Area Network -WAN)

মডেল প্রশ্ন ০৮ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

মডেল টেস্ট ০৮ সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৬০

[দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. ক. স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশির পার্থক্য লিখুন। ৩
খ. জলবিদ্যুৎ কি? ২
গ. হীরক ও গ্রাফাইটের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩
ঘ. দিয়াশলাই শিল্পে এবং জমির উর্বরতার ক্ষেত্রে ফসফরাসের ভূমিকা আলোচনা করুন। ৪
ঙ. গরমের সময় বেশি রোদে কেউ কেউ রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে কেন? ৪
চ. সুষম খাদ্য পরিবেশনে কি কি শর্ত পালন প্রয়োজন? ৪

২. ক. দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয় কেন? ২$\frac{১}{২}$
খ. যতই ওপরে ওঠা যায় ততই বায়ুর তাপ হ্রাস পায় কেন? ২$\frac{১}{২}$
গ. বালিয়াড়ি (Sand Dune) কালে বলে? ২$\frac{১}{২}$
ঘ. মৃত্তিকার PH কি? ২$\frac{১}{২}$

৩. ক. চাষাবাদের 'সল্ট পদ্ধতি' কি? ৩
খ. এল-নিনো ও লা-নিনা কি? ৩
গ. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড কি? ২
ঘ. পরিবেশ বান্ধব উপাদান কি? ২

৪. ক. খনিজ লবণের অভাবজনিত রোগ কি? ২
খ. অ্যান্টিবডি (Antibody) কি? ৩
গ. ব্লাড ক্যান্সার কি? এর কারণসমূহ উল্লেখ করুন। ৩
ঘ. Rabies বা জলাতঙ্ক রোগ কি? ২

৫. ক. Acromegaly কি? ২
খ. মোম কি? রাজকীয় জেলি কি? ৩
গ. আলো কি? আলো কিভাবে উৎপন্ন হয়? ৩
ঘ. শব্দ কি? শব্দ কিভাবে উৎপত্তি হয়? ২

৬. ক. মাটির উপাদান কত প্রকার কি কি? বর্ণনা করুন। ৫
খ. Bio-gas কি এবং এর মধ্যে কি কি গ্যাস বিদ্যমান থাকে এবং প্রয়োগ লিখুন। ৫

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৮

১. ক. স্কেলার রাশি ও ভেক্টর রাশির পার্থক্য :

বৈশিষ্ট্য	স্কেলার রাশি	ভেক্টর রাশি
১. সংজ্ঞা	শুধু মান দ্বারা অর্থপূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়।	অর্থপূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য মান ও দিক নির্দেশনা উভয়েরই প্রয়োজন হয়।
২. পরিবর্তন	শুধু মানের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।	মান বা দিক বা উভয়ের পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়।
৩. যোগ, বিয়োগ ও গুণন পদ্ধতি	সাধারণ গাণিতিক নিয়মে করা হয়।	সাধারণ গাণিতিক নিয়মে না হয়ে জ্যামিতিক বা ভেক্টর বীজগণিতের নিয়মানুসারে হয়।
৪. যোগফল	দুটি স্কেলার রাশির যোগফল শূন্য হবে যখন উভয়েরই মান শূন্য হবে।	উভয়ের মান শূন্য না হলেও যোগফল শূন্য হতে পারে।

খ. আমরা জানি, পানি শক্তির অন্যতম উৎস। পানির স্রোত ও জোয়ার-ভাঁটাকে ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদন করা যায়। পানির প্রবাহ বা স্রোতকে কাজে লাগিয়ে যে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তা-ই জলবিদ্যুৎ। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে পানির বিভবশক্তি ব্যবহার করা হয়।

গ. হীরক ও গ্রাফাইটের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

হীরক	গ্রাফাইট
১. বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উজ্জ্বল স্ফটিকাকার পদার্থ।	১. ধূসর কালো, অস্বচ্ছ স্ফটিকাকার পদার্থ।
২. আপেক্ষিক গুরুত্ব গ্রাফাইট অপেক্ষা বেশি (৩.৫ সর্বোচ্চ)।	২. আপেক্ষিক গুরুত্ব হীরক অপেক্ষা কম (২.২৫)।
৩. সবচেয়ে কঠিন পদার্থ।	৩. নরম ও কঠিন।
৪. তাপ অপরিবাহী।	৪. তাপ সুপরিবাহী।
৫. 900° সে. তাপমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।	৫. 700° সে. তাপমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে।

ঘ. **দিয়াশলাই শিল্প :** প্রথমদিকে দিয়াশলাইয়ের শ্বেত ফসফরাস ও একটি জারক পদার্থের মিশ্রণ ব্যবহার করা হতো। একে শিরিশ কাগজে ঘষলে ঘর্ষণের ফলে জ্বলে উঠতো। কিন্তু ফসফরাস অত্যন্ত বিষাক্ত, তা বিশেষ করে কারখানার কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের খুব ক্ষতি করায় আইন করে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে দিয়াশলাইয়ে ফসফরাস সালফাইড ও জারক এজেন্ট হিসেবে $KClO_3$ ব্যবহার করা হয়। আধুনিক 'নিরাপদ' দিয়াশলাইয়ে কাঠির অগ্রভাগে প্রধানত পটাসিয়াম ক্লোরেট থাকে। ক্ষারের পার্শ্বদেশে লাল ফসফরাস (49.5%), অ্যান্টিমনি সালফাইড (27.6%), Fe_2O_3 (1.2%) এবং বিশেষ আঠা (21.7%)-এর মিশ্রণ থাকে। এতে কাঠিটি ঘষা দিলে তবেই তা জ্বলবে, নতুবা নয়।

জমির উর্বরতার ক্ষেত্রে : জমির উর্বরতার জন্য ফসফরাস একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মৌল। উদ্ভিদ মাটি থেকে একে শোষণ করে, মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণী ফলমূল খেলে ফসফরাস তাদের শরীরে, বিশেষ করে হাড় তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। প্রাণী মারা গেলে তাদের হাত থেকে অতি

ধীরে ফসফরাস মাটিতে প্রবেশ করে। তবে কার্বন ও নাইট্রোজেন চক্রের সাথে ফসফরাস চক্রের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। ফসফরাসের কোনো উদ্বায়ী যৌগ সৃষ্টি না হওয়ায় ফসফরাস সমভাবে বণ্টিত হয় না এবং অতি ধীরে জীবজন্তুর শরীর থেকে মাটিতে ফিরে আসে। এ কারণে জমি থেকে ফসফরাসের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পায়, যার ফলে জমিতে ফসফরাস সার প্রদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ঙ. তাপ সহ্য করার ক্ষমতা শেষ সীমায় পৌঁছলেই একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে। একে বলে হিটস্ট্রোক (Heatstroke)। ঘাম প্রচণ্ড গরম থেকে শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু একটানা বেশিক্ষণ গরম থাকলে ঘামার হার কমতে থাকে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি হলে সে হার আরও কমে। আবার কোনো মানুষের শরীরের তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেই ঘামার হার খুব কমে আসে বা একেবারেই বন্ধ হয়ে পড়ে। তাপ বেরোনোর উপায় বন্ধ হয়ে গেলে খুব ক্লান্ত লাগে। কিন্তু ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি তাপমাত্রায় একেবারেই ঘাম হয় না। এ অবস্থায় হিটস্ট্রোক হতে পারে। মোটা মানুষ বা বয়স্কদের এতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আরো একটি কারণে রোদে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। একে বলে হিট সিনকোপ (Heat-syncope)। রোদে বেশিক্ষণ দাঁড়ালে রক্ত পায়ে নেমে আসে। ফলে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল কমে যায়। আর তখন মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ ঘাটতি হলে এমনটা হতে পারে।

চ. সুষম খাদ্য দেহে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ক্যালরি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ সরবরাহ করে। সুতরাং মাছ-ডাল, ভাত-রুটি, শাকসবজি-ফল এসব বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্য নিয়েই খাবার সুষম হয়। যেসব শর্ত পালনে খাবার সুষম হয় সেগুলো হলো :

i. প্রতি বেলায় খাবারে উক্ত তিন শ্রেণীর খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করে খাদ্যের ছয়টি উপাদানের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।
ii. প্রত্যেক শ্রেণীর খাদ্য নির্ধারিত পরিমাণে পরিবেশন করে পর্যাপ্ত উপাদান সরবরাহে নিশ্চয়তাদান।
iii. খাদ্য প্রস্তুতে সতর্কতা অবলম্বন করে খাদ্য উপাদানের অপচয় রোধ।
iv. দৈনিক মোট ক্যালরির ৬০% থেকে ৭০% শর্করাজাতীয় খাদ্য, ৩০% থেকে ৪০% স্নেহজাতীয় খাদ্য এবং ১০% প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে গ্রহণ।
v. দৈনিক মাথাপিছু কমপক্ষে ৩০ গ্রাম তেল (রান্নায়) এবং ২০ গ্রাম গুড়/চিনি পরিবেশন।
vi. খাদ্য প্রস্তুত ও পরিবেশনে যথার্থভাবে পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন।

২. ক. খাদ্যের ছয়টি উপাদানই দুধে পরিমিত মাত্রায় থাকে বলে দুধকে আদর্শ খাদ্য বলা হয়। যেমন—

i. শর্করা হিসেবে দুধে আছে ল্যাক্টোজ,
ii. আমিষ হিসেবে আছে কেজিন ও অ্যালবুমিন,
iii. স্নেহ হিসেবে আছে ছোট ছোট দানাদার পদার্থ,
iv. খাদ্যপ্রাণের মধ্যে ভিটামিন-সি ব্যতিরেকে সব ভিটামিন দুধে বিদ্যমান,
v. খনিজ হিসেবে আছে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস
vi. পানি হলো দুধের অন্যতম উপাদান।

খ. বায়ুর তাপের মূল উৎস সূর্য হলেও বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠ থেকে অধিকতর তাপ সংগ্রহ করে উত্তপ্ত হয়। পরে এ তাপ ধীরে ধীরে উর্ধ্ব স্তরে বায়ুকে উত্তপ্ত করে। এ কারণে নিচের বায়ুস্তরে তাপমাত্রা সর্বাধিক এবং ওপরের দিকে ক্রমশ তাপ কম। বায়ুর নিম্নস্তরে ধূলিকণা, জলীয়বাষ্প ও অন্যান্য কৃত্রিম উপাদান অধিক থাকায় সেখানকার বায়ু ঘন কিন্তু ক্রমে ওপরের দিকে এসব উপাদান কম থাকায় সেখানকার বায়ু ক্রমেই পাতলা থাকে। বায়ু যত বেশি ঘন তার তাপধারণ ক্ষমতাও তত অধিক। এ কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত ওপরে ওঠা যায় তাপ ততই হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ৯০.৪৪ মি. উচ্চতায় বায়ুর তাপ ১° সেলসিয়াস হ্রাস পায়।

গ. বায়ুপ্রবাহের সাথে বিবিধ বালিকণাও প্রবাহিত হয়। কিন্তু কোনো কারণে কোথাও বায়ুপ্রবাহ বাধা পেলে বায়ু দ্বারা বাহিত বালিকণাসমূহ উক্ত স্থানে জমা হতে থাকে। এভাবে জমা হতে হতে একসময় বালুকার ঢিবির সৃষ্টি হয় যা বালিয়াড়ি নামে অভিহিত। অনেক সময় দেখা যায় সমুদ্রের বুকেও বালিকণা জমা হয়ে বালির ঢিবি এবং চড়া তৈরি হয়।

ঘ. মৃত্তিকার অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্দেশ করার জন্য একটি স্কেলের সাহায্যে PH-এর মান 0 —14 পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ স্কেল অনুযায়ী প্রশমন বিন্দু বা নিরপেক্ষ বিন্দুর PH হলো 7.0। PH-এর মান 7.0-এর কম হলে অম্লত্ব এবং 7.0-এর অধিক হলে ক্ষারত্ব নির্দেশ করে। H^+ আয়নের গাঢ়ত্বের কারণে অম্লীয় মৃত্তিকা এবং OH^- আয়নের গাঢ়ত্বের কারণে ক্ষারীয় মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। কোনো মৃত্তিকার দ্রবণের PH জানা থাকলে এর সঞ্চিত OH^- আয়নের পরিমাণ জানা যায়।

৩. ক. 'SALT' হচ্ছে Slopping Agricultural Lands Technology. এটি পার্বত্য অঞ্চলে চাষাবাদের আধুনিক পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে পাহাড়ে সমোন্নতি রেখা বরাবর প্রত্যেক ৪-৬ মিটার স্থানে ২টি সারিতে নাইট্রোজেন ধারক গাছ-গাছড়ার বেড়া সৃষ্টি করা হয় এবং মধ্যবর্তী স্থানে খাদ্যশস্য ও বনজ বৃক্ষ লাগানো হয়। আন্তর্জাতিক পর্বত উন্নয়ন সংস্থা (ICMI) বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে এ চাষাবাদ পদ্ধতি সম্প্রসারণে সহায়তা দিচ্ছে।

খ. স্প্যানিশ ভাষায় এল-নিনো শব্দের অর্থ ছোট খোকা এবং লা-নিনা শব্দের অর্থ ছোট খুকি। ইকুয়েডর আর পেরুর জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে যখন অনেক দিন কোনো মাছ শিকার করতে পারছিল না তখন তারা পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার জন্য এ নাম দুটির প্রচলন করে।

ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে দক্ষিণ আমেরিকার প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে ইকুয়েডর ও পেরুর উপকূলের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করে উষ্ণ পানির স্রোত। এ সময়কে ইঙ্গিত করেই জেলেরা পরিস্থিতির নাম দেন এল-নিনো। এর অর্থ তারা বোঝাতে চায় শিশু যীশু। এল-নিনো সাধারণত দুই থেকে সাত বছর পর আসে। এল-নিনো হচ্ছে বিষুব রেখার ওপাশ থেকে নেমে আসা পানির স্রোতের ফলে সৃষ্ট জলবায়ুর প্রতিক্রিয়া। এল-নিনোর প্রভাবে সাগরের পানির উষ্ণতা বাড়ে এবং ঝড়, খরা ও অনাবৃষ্টি হয়। এল-নিনোর পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে শুরু হয় লা-নিনা। এল-নিনোর প্রভাব শেষ হওয়ার পরপরই লা-নিনার প্রভাবে সাগরের পানির উষ্ণতা কমে। এর প্রভাবে অতিবৃষ্টি ও বন্যা হয়।

১৯৯৮ সালে বিশ্বে এল-নিনোর প্রভাবে কানাডায় তুষার ঝড়, ইন্দোনেশিয়ায় দাবানল, ফিলিপাইনে খরা এবং লা-নিনার প্রভাবে বাংলাদেশ, চীন ও ভারতে ভয়াবহ বন্যার সৃষ্টি হয়।

গ. সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড হচ্ছে বঙ্গোপসাগরের একটি অতলস্পর্শী মহিখাদ। সুন্দরবনের অদূরে মহীসোপান এলাকাকে দ্বিখণ্ডিত করে সাগরতলায় সৃষ্টি হয়েছে এ গভীর মহিখাদ। দুবলা দ্বীপ থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং Bengal Deep Sea Fan-এর উত্তরে অবস্থিত এটি। সমুদ্রের গভীরের দিকে প্রায় ২০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

ঘ. মানুষের ব্যবহৃত যেসব উপাদান পরিবেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থায় থাকে, তাকে পরিবেশ বান্ধব উপাদান বা Environmental Friendly Items বলে।

৪. ক. ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থির পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং দাঁত ক্ষয় হয়ে যায় এবং ফসফরাস অস্থি ও দাঁতের পুষ্টিসাধন করতে পারে না। খাদ্যে লৌহঘটিত লবণের অভাব হলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ফলে অক্সিজেনের অভাবে শরীর দুর্বল হয় এবং পরিশেষে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।

খ. অ্যান্টিবডি রক্তে উৎপন্ন প্রতিরোধক পদার্থ বিশেষ; প্রধানত রক্তরসে প্রাপ্ত একটি প্রোটিন। এ প্রোটিনকে সঙ্গতিপূর্ণ অ্যান্টিজেনের (দেহে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু কর্তৃক নিঃসৃত বিশেষ বিষাক্ত প্রোটিন) সাথে সুনির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলতা (Specific reactivity) দ্বারা বৈশিষ্টমণ্ডিত করা যায়। অ্যান্টিবডিগুলো রোগের বিপক্ষে প্রতিরোধক্ষমতা সৃষ্টিতে অ্যালার্জির বিপক্ষে খাদ্যগ্রহণ, কীট দংশন প্রভৃতির ফলে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়াশীলতা বা অস্থিরতা ও রক্ত পরিবহনে (Blood transfusion) গুরুত্বপূর্ণ। এদেরকে অ্যান্টিজেন শনাক্তকরণে বা অনাক্রম্য (Immune) অবস্থা নিরূপণে ল্যাবরেটরিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। জন্মের সময়ে সাধারণত অ্যান্টিজেন অনুপস্থিত থাকে। তবে শিশুরা মায়ের কাছ থেকে গর্ভের ফুল (Placenta) বা স্তনরসের (Colostrum) মাধ্যমে পরোক্ষভাবে অ্যান্টিজেন পেতে পারে।

গ. ব্লাড ক্যান্সার বা লিউকোমিয়া রক্তের একটি অতি মারাত্মক রোগ, যেখানে রক্তকোষের অনিয়ন্ত্রিত এবং অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে, যা অসিস্থমজ্জা ও দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রতঙ্গে বিস্তার লাভ করে। আমরা জানি, রক্তে তিন ধরনের কণিকা আছে– লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা ও অণুচক্রিকা। ব্লাড ক্যান্সরে যে কোনো ধরনের কণিকাই আক্রান্ত হতে পারে।

কারণসমূহ : ব্লাড ক্যান্সারের সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। তবে রক্তকোষ বিভাজনের সময় জিনগত ত্রুটি বা Mutation-এর ফলেই ক্যান্সারের উৎপত্তি। এ ত্রুটি বা Mutation-এর জন্য রেডিয়েশন (Radiation), বিভিন্ন কেমিক্যালস (যেমন– বেনজিন), ভাইরাস (যেমন– $HTLV_1$) ড্রাগস ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়ে থাকে।

ঘ. Rabies Virus এ রোগের জন্য দায়ী। Rabied প্রাণী যারা Rabies Virus ধারণ করে তাদের কামড়ে এ রোগ হয়। যেমন– কুকুর, বিড়াল।

বৈশিষ্ট্য : জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, অনুভূতিহীনতা, দ্বিধাদ্বন্দ্বতা, মুখে লালা আসা, ব্যথাময় পেশীর সংকোচন, পানির প্রতি ভয় ইত্যাদি।

প্রতিকারসমূহ : ৫টি টিকা দেয়া হয় ০, ৩, ৭, ১৪, ২৮ দিনে। কিন্তু বাংলাদেশে ১৪ দিনে ১৪টি টিকা দেয়া হয়।

৫. ক. কোনো পূর্ণ বয়স্ক মানুষের গ্রোথ হরমোন বেশি কাজ করলে চওড়া (লম্বা) হাড়যুক্ত মানুষের সৃষ্টি হয়। এ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় Acromegaly।

খ. মোম : যে সাদা, কঠিন পদার্থ দিয়ে মৌমাছির বাসা বা মৌচাক গঠিত হয় তাকে মোম বলে। মোম কর্মী মৌমাছির উপরে অবস্থিত মোমগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থ থেকে তৈরি হয়।

রাজকীয় জেলি : রাজকীয় জেলি একপ্রকার পুষ্টিকর খাদ্য। কর্মী মৌমাছির মুখের গ্রন্থি নিঃসৃত ক্ষরণের সাথে পরিপাককৃত মধু ও পরাগ মিশে এ খাদ্য প্রস্তুত হয়। কর্মী মৌমাছিরা রাজা ও রাণীর জন্য সংরক্ষিত কুঠুরির লার্ভাকে রাজকীয় জেলি খাওয়ায়।

গ. আলো : আলো এক প্রকার শক্তি বা বাহ্যিক কারণ যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়।

আলোর উৎপত্তি : যে কোনো পদার্থের পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াস থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বের বিভিন্ন খোলসে অবস্থান করে। এ পরমাণুতে যখন তাপশক্তি বা অন্য কোনো শক্তি সরবরাহ করা হয়, তখন ইলেকট্রনগুলো এক খোলস থেকে অন্য খোলসে লাফিয়ে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে ইলেকট্রনগুলো আবার নিজ নিজ খোলসে ফিরে আসে, তখন ইলেকট্রনের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি আলোকশক্তি হিসেবে নির্গত হয়। এভাবেই সকল প্রকার আলোকের সৃষ্টি হয়।

ঘ. শব্দ এক প্রকার শক্তি, যা কোনো কম্পনশীল বস্তু থেকে উৎপন্ন হয়ে জড় মাধ্যমের সাহায্যে আমাদের কানে পৌঁছে শ্রুতির অনুভূতি জন্মায় বা জন্মাতে চেষ্টা করে।

উৎপত্তি : কম্পনের ফলে শব্দের সৃষ্টি হয়। কম্পনশীল বস্তু থেকে সৃষ্ট স্পন্দন জড় মাধ্যমকে আন্দোলিত করে তরঙ্গ সৃষ্টি করে যা আমাদের কানে শব্দের অনুভূতি বয়ে আনে বস্তুর কম্পন থামার সাথে সাথে শব্দ নিঃসরণও থেমে যায়।

৬. ক. মাটি প্রধানত ৪টি উপাদান নিয়ে গঠিত। যথা–

১. খনিজ পদার্থ (Mineral matter)
২. জৈব পদার্থ (Organic matter)
৩. বায়ু (Air) ও
৪. পানি (Water)।

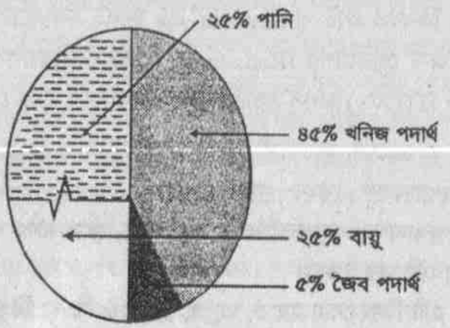

চিত্র : মাটির উপাদান (আয়তনভিত্তিক)

১. খনিজ পদার্থ : খনিজ পদার্থ মাটির অন্যতম প্রধান উপাদান। আয়তন অনুসারে মাটির অধিকাংশ স্থানই খনিজ পদার্থ দখল করে আছে। ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে আদি শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে খনিজ পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। বালিকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা হচ্ছে মাটির খনিজ পদার্থ। মাটির এই খনিজ কণাসমূহ বিভিন্ন অনুপাতে মিশে মৃত্তিকা বুনট এবং পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মৃত্তিকা সংযুতি গঠন করে। মৃত্তিকা সংযুতি গঠিত হওয়ার ফলে মাটি সচ্ছিদ্র হয় এবং তাতে সহজে বায়ু ও পানি স্থান করে নিতে পারে। মাটিতে আয়তন অনুসারে শতকরা ৪৫ ভাগ খনিজ পদার্থ থাকে।

খনিজ পদার্থ :

ক. বালিকণা, পলিকণা ও কর্দমকণা দ্বারা গঠিত এবং আদি শিলা থেকে উৎপন্ন।

খ. পুষ্টি উপাদান (যেমন : লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি) সমৃদ্ধ।

২. জৈব পদার্থ : জৈব পদার্থ মাটির অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। গাছপালা ও জীবজন্তুর মৃতদেহ মাটিতে পচে যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে জৈব পদার্থ বলে। জৈব পদার্থ মাটির ভৌত রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাবলির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জৈব পদার্থ মাটির প্রাণ। আয়তন অনুসারে মাটিতে শতকরা ৫ ভাগ জৈব পদার্থ থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশের অধিকাংশ মাটিতে ১.৫% এর কম জৈব পদার্থ আছে। অথচ মাটিতে কমপক্ষে ২.৫% জৈব পদার্থ থাকা দরকার।

৩. বায়ু : বায়ু মাটির একটি অন্যতম উপাদান। আয়তন অনুসারে মাটিতে শতকরা ২৫ ভাগ বায়ু থাকে। তবে এই বায়ুর পরিমাণ মাটিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে কমতে থাকে। শুকনো জমিতে পানির তুলনায় বায়ুর পরিমাণ বেশি থাকে। মাটিতে অবস্থিত বায়ু গাছপালার শিকড়, মৃত্তিকা অণুজীবের শ্বসনের জন্য অক্সিজেন সরবরাহ করে। মাটিস্থ বায়ুতে অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস থাকে। মাটিস্থ বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড পানিতে মিশে কার্বনিক এসিড তৈরি করে, যা মাটিতে বিদ্যমান জটিল পুষ্টি উপাদানসমূহকে দ্রবীভূত করে উদ্ভিদের জন্য সহজলভ্য করে তোলে। মৃত্তিকাস্থ রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া বায়বীয় নাইট্রোজেন শিমজাতীয় গাছের শিকড়ে জমা করে। ভৌত বিবেচনায় মাটির স্বাভাবিক আয়তনের প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে বায়ু পরিসর থাকে। ভূমিকর্ষণ ও আলোড়নসহ নানা প্রক্রিয়ার প্রভাবে মৃত্তিকা বায়ু পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলের সাথে বায়ু বিনিময়ের মাধ্যমে মৃত্তিকা বায়ু পরিবর্তিত হয়। মাটির রন্ধ্র পরিসরের বায়ু ও বায়ুমণ্ডলীয় বায়ু পারস্পরিক বিনিময়কে মৃত্তিকা বাতান্বয়ন (Soil aeration) বলে। মৃত্তিকা বায়ুতে প্রায় ৭৯.২০% নাইট্রোজেন, ২০.৬০% অক্সিজেন এবং ০.২৫% কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে।

৪. পানি : পানি মাটির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বৃষ্টির পানি বা সেচের পানিই মৃত্তিকা পানির প্রধান উৎস। মাটি কণার ফাঁকে ফাঁকে পানি জমা থাকে। মাটিতে বায়ু ও পানির পরিমাণ একটি অন্যটির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মাটিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুর পরিমাণ কমতে থাকে। মাটিতে আয়তন অনুসারে শতকরা ২৫ ভাগ পানি থাকে।

মৃত্তিকা পানি :

- মাটিকে রসালো রাখে।
- মাটিতে গাছের পুষ্টি উপাদানগুলোকে দ্রবীভূত করে।
- উদ্ভিদের পুষ্টি উপাদানের দ্রাবক ও বাহক হিসেবে কাজ করে।
- বীজের অংকুরোদগমের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।
- মাটির তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. **Biogas (বায়োগ্যাস) :** গোবর, মলমূত্র, পাতা, খড়কুটা প্রভৃতি পদার্থ পানির সাথে মিশিয়ে বাতাসের অনুপস্থিতিতে রাখলে ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে ফারমেন্টেশন প্রক্রিয়ায় এসব পদার্থ থেকে যে বর্ণহীন দাহ্য গ্যাস উৎপন্ন হয়, তাই বায়োগ্যাস নামে পরিচিত।

Biogas-এর উপাদান : বায়োগ্যাস-এর প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস। এছাড়াও ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর ভিত্তি করে নাইট্রোজেন (N_2), অ্যামোনিয়া (NH_3), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), হাইড্রোজেন (H_2) প্রভৃতি গ্যাস অতি সামান্য পরিমাণে বিদ্যমান থাকতে পারে।

Biogas-এর প্রয়োগ : বর্তমানকালে নানাবিধ ক্ষেত্রে বায়োগ্যাসের প্রয়োগ বা ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বায়োগ্যাসের প্রধান কয়েকটি প্রয়োগক্ষেত্র নিচে তুলে ধরা হলো :

i. এ গ্যাস রান্নাবান্নার কাজে ব্যবহৃত হয়।
ii. ম্যান্টেল জ্বেলে হ্যাজাক লাইটের মতো ঘর আলোকিত করা যায়।
iii. বায়োগ্যাসের সাহায্যে জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে রেডিও, টিভি, ফ্রিজ, ভিসিডি ইত্যাদি চালানো যায়।
iv. পাম্প চালিয়ে কৃষি জমিতে সেচ প্রদান করা যায়।
v. এ গ্যাসের সাহায্যে গাড়ি চালানো যায়।

মডেল টেস্ট ০৯

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : *প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো দুটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*] নম্বর

১. ক. Computer Software কি? Software এর প্রয়োগ আলোচনা করুন। ৮
খ. তড়িৎ মোটর কি? ট্রান্সফর্মারের সাথে এর পার্থক্য কি? ৪
গ. পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার বলতে কি বুঝায়? এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি হবে? ৪
ঘ. Band width কি? Amplifier এর শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন। ২
ঙ. মডুলেশন এবং ডিমডুলেশন কি? এ প্রক্রিয়া কোথায় ব্যবহৃত হয় এবং কেন? ২

২. ক. Hydroelectric Power বলতে কি বোঝায়? ৩
খ. Multi-media কি? কত প্রকার ও কি কি? Multi-media'র সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো কি কি? ৪
গ. Laser Printing প্রযুক্তি বলতে কি বুঝেন? ৩
৩. ক. Nuclear power generator হতে কিভাবে Nuclear শক্তি উৎপন্ন করা হয়? ১০
৪. ক. সিপিইউ (CPU) এবং সফটওয়্যার (Software) বলতে কি বোঝায়? ২
খ. ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট কি? বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন। ৫
গ. কম্পিউটার ও মানুষের কাজ করার মধ্যে সাদৃশ্য কোথায়? ৩

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৮

১. ক. **Computer Software (কম্পিউটার সফটওয়্যার) :** প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকেই কম্পিউটার সফটওয়্যার বলে। কম্পিউটার সফটওয়্যার ছাড়া হার্ডওয়্যার অর্থহীন। সফটওয়্যার ব্যবহারকারী এবং হার্ডওয়্যারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে।

Software (সফটওয়্যার)-এর প্রয়োগ : বর্তমান কালে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর বহু বিচিত্রমুখী ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর প্রধান কয়েকটি প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো।

শিল্প ক্ষেত্র : শিল্প ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যাপক প্রয়োগ যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করেছে। রাসায়নিক কারখানা, ইস্পাত প্ল্যান্ট ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের শিল্প ক্ষেত্রে কম্পিউটার সফটওয়্যারের সাহায্যে প্রসেস কন্ট্রোল ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়াও রোবট নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয় কম্পিউটার সফটওয়্যার। রোবট বা এ ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো কোনো বিরতি ছাড়াই কাজ করতে পারে। ফলে কল-কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

শিক্ষা ক্ষেত্র : আজকাল বাজারে প্রচুর শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার পাওয়া যায়। এ ধরনের সফটওয়্যারের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। কারণ এসব শিক্ষামূলক সফটওয়্যারের সাহায্যে ঘরে বসেই বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যায়। শিক্ষামূলক মাল্টিমিডিয়া সফটওয়্যার টেক্সট, ছবি, অডিও, ভিডিও ইত্যাদির সংমিশ্রণে তৈরি হয় বিধায় এগুলোর মাধ্যমে শিক্ষালাভ খুব আকর্ষণীয় এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। এ ধরনের কিছু সফটওয়্যার-এর উদাহরণ হলো : এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, ওয়ার্ল্ড বুক, আমেরিকান টকিং ডিকশনারি ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা : বর্তমানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা কাজে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, পরিসংখ্যান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান সব গবেষণাতেই কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়। কারণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও হিসাব-নিকাশ কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর সাহায্যে নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা যায়।

প্রকাশনা শিল্প : পত্র-পত্রিকা থেকে শুরু করে সব ধরনের প্রকাশনার জন্য কম্পিউটার সফটওয়্যার ব্যবহৃত হয়। কাঙ্ক্ষিত অবয়বে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পৃষ্ঠা সাজানো, ভুল সংশোধন,

সংরক্ষণ, প্যারা স্থানান্তর ইত্যাদি কাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ড প্রসেসিং ও ডিটিপি প্যাকেজ সফট্ওয়্যার ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যবহার প্রকাশনা শিল্পে উৎকর্ষতা ও বৈচিত্রতার এক অনন্য আবহ সৃষ্টি করেছে।

ডিজাইন তৈরি : শিল্প কারখানা থেকে শুরু করে ইমারত, সেতু, পাতাল সড়ক, ফ্লাইওভার, রাস্তা, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদির ডিজাইন তৈরিতে কম্পিউটার সফট্ওয়্যার ব্যবহার করা হয় যা কম্পিউটার গ্রাফিক্স নামে পরিচিত। এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ের মধ্যে একই জিনিসের অনেকগুলো ডিজাইন তৈরি করে তাদের সুবিধা, অসুবিধা ও উপযোগিতা তুলনা করে দেখা যায়। প্রয়োজনবোধে ডিজাইন সংশোধনও করা যায়।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা : কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর বদৌলতে এখন ব্যাংকগুলোতে আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছে। কম্পিউটার সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় টাকা তোলার বিশেষ যন্ত্রে (ATM–Automated Teller Machine) ক্রেডিট কার্ড ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ যন্ত্রের সংখ্যা গণনার বোতামগুলোতে চাপ দিয়ে টাকার পরিমাণ জানিয়ে দিলে সাথে সাথে যন্ত্রের ভিতর থেকে টাকা বেরিয়ে আসে। এভাবে রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টার যে কোনো সময়েই ব্যাংক থেকে টাকা তোলা সম্ভব।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র : ইতোমধ্যে বাজারে বেরিয়েছে বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার যা সঙ্গীতের সুর সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের সফটওয়্যারকে মিডি (MIDI—Musical Instruments Digital Interface) সফটওয়্যার বলে। বর্তমানে এমন সুর সৃষ্টির সফটওয়্যার তৈরি হয়েছে যা বিশ্বের বড় বড় নামীদামী সুর স্রষ্টা হিসেবে খ্যাত বেটোভেন, বাখ, মোজার্ট প্রমুখ খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞের নতুন নতুন সুর সৃষ্টিতে সক্ষম। এ ধরনের একটি সফটওয়্যার-এর নাম হচ্ছে Mozart 42nd।

বিনোদন : বিনোদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ প্রবেশ করেছে কম্পিউটার সফটওয়্যার। অবাস্তব সব দৃশ্যকে আশ্চর্য বাস্তব রূপ দেয় সফটওয়্যার। ইটি, জুরাসিক পার্ক, টারমিনেটর, ম্যাট্রিক্স, সিন্দাবাদ, স্পাইডারম্যান ইত্যাদিসহ আরো অনেক ছবিতে যে আশ্চর্য দৃশ্য দেখানো হয়েছে তার সবই সম্ভব হয়েছে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর বদৌলতে। সফটওয়্যার-এর কারসাজিতে দর্শক মুহূর্তেই চলে যান সেই কোটি কোটি বছর আগের জুরাসিক যুগের ডাইনোসরদের কাছে। আবার খেলাধুলার জন্য রয়েছে সর্বাধুনিক সব ভিডিও গেমস সফটওয়্যার। এর পাশাপাশি প্রচলিত তাস বা দাবা খেলাও বাদ পড়েনি।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে কম্পিউটার সফটওয়্যার-এর ব্যাপক হারে প্রয়োগ মানব সভ্যতার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করেছে।

খ. তড়িৎ মোটর (Electric Motor) : তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর। একে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে; যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে। তড়িৎ মোটর দুই প্রকারের; যথা– (ক) ডিসি মোটর, (খ) এসি মোটর।

একটি তড়িৎ মোটর নিম্নলিখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

১. **ক্ষেত্র চৌম্বক :** U আকৃতির একটি স্থায়ী বা তাড়িত চুম্বক এই যন্ত্রের ক্ষেত্রে চুম্বকের কাজ করে।

২. **আর্মেচার :** কাঁচা লোহার মজ্জার উপর অন্তরিত তামার তার জড়িয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। আর্মেচার মূলত একটি আয়তকার কুণ্ডলী বা কয়েল।

৩. **কমুটেটর :** শক্ত তামার কতগুলো খণ্ড অভ্রের পাতের দ্বারা পরস্পর থেকে অন্তরিত করে কমুটেটর তৈরি করা হয়।

৪. **ব্রাস :** কার্বন অথবা তামা দ্বারা ব্রাস তৈরি করা হয়।

ট্রান্সফর্মারের সাথে তড়িৎ মোটরের পার্থক্য :

পার্থক্যের বিষয়	ট্রান্সফর্মার	তড়িৎ মোটর
১. সংজ্ঞা :	যে যন্ত্রের সাহায্যে পর্যাবৃত্ত উচ্চ বিভবকে নিম্ন বিভব এবং নিম্ন বিভবকে উচ্চ বিভবে রূপান্তরিত করা যায় তাকে রূপান্তরক বা ট্রান্সফর্মার বলে।	যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মোটর বা তড়িৎ মোটর বলে।
২. কার্যকরী নীতি :	একটি কয়েলে তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্তন করে অন্য কয়েলে আবিষ্ট তড়িৎ চালক শক্তি বা তড়িৎ আবিষ্ট তড়িৎ চালক শক্তি বা তড়িৎ উৎপাদনের পরিচিতি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস রয়েছে ট্রান্সফর্মারে।	তড়িৎবাহী তারের উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছে বৈদ্যুতিক মোটর।
৩. প্রকারভেদ :	ট্রান্সফর্মার সাধারণত দুই প্রকার– ১. উচ্চধাপী বা আরোহী বা স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার ২. নিম্নধাপী বা অবরোহী বা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার।	তড়িৎ মোটর দুই প্রকার– ১. ডিসি মোটর ২. এসি মোটর
৪. মূল কাজ :	দূরদূরান্তে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করা হয়।	ছোট ছোট বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।
৫. ব্যবহার :	বাসা, বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়।	বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিল ইত্যাদিতে তড়িৎ মোটর ব্যবহৃত হয়।

নিচে ট্রান্সফর্মার ও তড়িৎ মোটরের মধ্যে পার্থক্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

গ. পঞ্চম প্রজন্ম কম্পিউটার (Fifth Generation Computer) : Super VLSI (Very Large Scale Integration) চিপ ও অপটিক্যাল ফাইবারের সমন্বয়ে পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার তৈরি হবে। এটি হবে অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও প্রচুর ডেটা ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার। মানুষের কণ্ঠস্বর সনাক্ত করার ক্ষমতা ও কণ্ঠে দেয়া নির্দেশ বুঝাতে পেরে কাজ করতে পারবে এ কম্পিউটার। আমেরিকা ও জাপান পঞ্চম প্রজন্মের কম্পিউটার চালুর অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

বৈশিষ্ট্য :

১. বহু মাইক্রোপ্রসেসরবিশিষ্ট একীভূত বর্তনী,
২. কৃত্রিম বুদ্ধির ব্যবহার,
৩. কম্পিউটার বর্তনীতে অপটিক্যাল ফাইবারের (Optical Fiber) ব্যবহার,
৪. প্রোগ্রাম সামগ্রীর উন্নতি,
৫. স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ, শ্রবণযোগ্য শব্দ দিয়ে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ।
৬. চৌম্বক বাবল মেমরি।
৭. ডেটা ধারণ ক্ষমতার ব্যাপক উন্নতি
৮. অধিক সমৃদ্ধশালী মাইক্রোপ্রসেসর ও মাইক্রোকম্পিউটার।
৯. বিপুল শক্তিসম্পন্ন সুপার-কম্পিউটারের উন্নয়ন ইত্যাদি।

ঘ. **Band width :** Band width হচ্ছে ডেটা সম্প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি চ্যানেল। যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি বিভিন্ন মাত্রায় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন চ্যানেল ব্যবহারের সময় উক্ত চ্যানেলের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সির ব্যবধান।

Amplifier কে বিভিন্নভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যুগল বর্তনীর উপর ভিত্তি করে দুইভাবে শ্রেণীবিন্যাস করা যায়। যথা–

(১) রোধ-ধারক যুগল বিবর্ধক (R-C Coupled Amplifier) ও

(২) ট্রান্সফর্মার যুগল বিবর্ধক (Transformer Coupled Amplifier)। আবার কাজের ধরন অনুসারে Amplifier কে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা– (১) Class A (২) Class B (৩) Class C ও (৪) Class D।

ঙ. ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে মডুলেশন বলে। আবার এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে ডিমডুলেশন বলে।

ডেটা যোগাযোগ ব্যবস্থায় যেসব মাধ্যম ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে টেলিফোন লাইন অন্যতম। টেলিফোন লাইনের মধ্য দিয়ে এনালগ সংকেত আদান-প্রদান হয়। কিন্তু কম্পিউটারে প্রদত্ত ডেটা ও তথ্য প্রকৃতপক্ষে ডিজিটাল সংকেত। কাজেই ডেটা কমিউনিকেশনের জন্য ডিজিটাল সংকেতকে এনালগ সংকেত এবং এনালগ সংকেতকে ডিজিটাল সংকেতে পরিণত করা প্রয়োজন। এজন্য ডেটা যোগাযোগ ব্যবস্থায় মডুলেশন ও ডিমডুলেশন ব্যবহৃত হয়।

২. ক. **Hydroelectric Power :** পানির বিভব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় তাকে Hydroelectric Power বলে। পানিকে বাঁধ দিয়ে আটকালে এর উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। পানির তলের উচ্চতা বা গভীরতা বৃদ্ধির ফলে এর মধ্যে অধিক বিভব শক্তি জমা হয়। কোনো পাহাড়ের উপত্যকায় নিচের প্রান্তে বাঁধ দিয়ে এ কাজটি সাধারণত করা হয়ে থাকে। নদী থেকে আসা পানির প্রবাহ বাঁধে বাধা পেয়ে জমা হতে থাকে। ফলে বাঁধের পেছনে কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি হয়। হ্রদ পানিতে পূর্ণ হয়ে গেলে হ্রদ থেকে পানি একটি মোটা নলের ভিতর দিয়ে নিচে অবস্থিত একটি তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্রে প্রবাহিত করা হয়। পানি

পতনের সময় এর বিভব শক্তি গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ গতি শক্তি একটি টার্বাইনকে ঘোরায়। টার্বাইনটি একটি তড়িৎ জেনারেটরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। এ জেনারেটরে তড়িৎ উৎপন্ন হয় যা Hydroelectric Power নামে পরিচিত।

খ. **Multi-media (মাল্টিমিডিয়া) :** মাল্টিমিডিয়া শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো বহুমাধ্যম। মাল্টিমিডিয়া বলতে বোঝায় এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যেখানে একাধিক মিডিয়া (যেমন– লেখা বা টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ইমেজ ইত্যাদি) ব্যবহারের মাধ্যমে সচল, সজীব ও আকর্ষণীয় ভুবন তৈরি করা যায়। লিপি, দৃশ্য ও ধ্বনির সমন্বয়ে সৃষ্ট বহুমাত্রিক উপস্থাপনাই হলো মাল্টিমিডিয়া।

মাল্টিমিডিয়ার প্রকারভেদ : মাল্টিমিডিয়া প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১. লিনিয়ার মাল্টিমিডিয়া (Linear Multi-media)
২. হাইপারমিডিয়া (Hypermedia)
৩. ইন্টারঅ্যাক্টিভ মাল্টিমিডিয়া (Interactive Multi-media)

Multi-media'র সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রযুক্তি : মাল্টিমিডিয়ার সাথে পার্সোনাল কম্পিউটার ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো হলো :

ক. সাউন্ড কার্ড
খ. সিডিরম ড্রাইভ বা ডিভিডি ড্রাইভ
গ. স্পীকার
ঘ. মাইক্রোফোন ও
ঙ. ডিজিটাল ক্যামেরা

মালিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আরো কিছু নতুন প্রযুক্তি হলো : মডেম, স্ক্যানার, টিভি কার্ড, প্রজেক্টর ইত্যাদি।

গ. **Laser Printing (লেজার প্রিন্টিং) প্রযুক্তি :** লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তি বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের প্রিন্টিং প্রযুক্তি যেখানে লেজার রশ্মির সাহায্যে কাগজে লেখা ফুটিয়ে তোলা হয়। লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে ছাপানোর কাজে লেজার প্রিন্টার ব্যবহৃত হয়। লেজার প্রিন্টারে একটি লেজার বীম (beam) ব্যবহৃত হয় যা একটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর CRT-এর মতো রাস্টার স্ক্যান ইমেজ উৎপন্ন করে। ড্রামটি একটি আলোক সংবেদী প্লাস্টিক (Photosensitive Plastic) দ্বারা প্রলেপযুক্ত থাকে যার পৃষ্ঠদেশে (Surface) ঋণাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ প্রদান করা হয়। লেজার বীমটি ঘূর্ণায়মান ড্রামের উপর স্পট তৈরি করে। লেজার দ্বারা লিখিত স্পটসমূহ ধনাত্মক বৈদ্যুতিক চার্জ ধারণ করে। উক্ত ধনাত্মক চার্জসমূহ ঋণাত্মক চার্জযুক্ত টোনার ম্যাটেরিয়ালকে আকর্ষণ করে। ঘূর্ণায়মান ড্রামে কাগজ দেয়া হয়। টোনারটি কাগজে স্থানান্তরিত হয়। এভাবেই লেজার প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়।

৩. ক. নিউক্লীয় (Nuclear) শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয় Nuclear Power Generator বা পারমাণবিক চুল্লি। এ চুল্লিতে নিউক্লীয় বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে তাপ উৎপন্ন করা হয় এবং উৎপন্ন তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

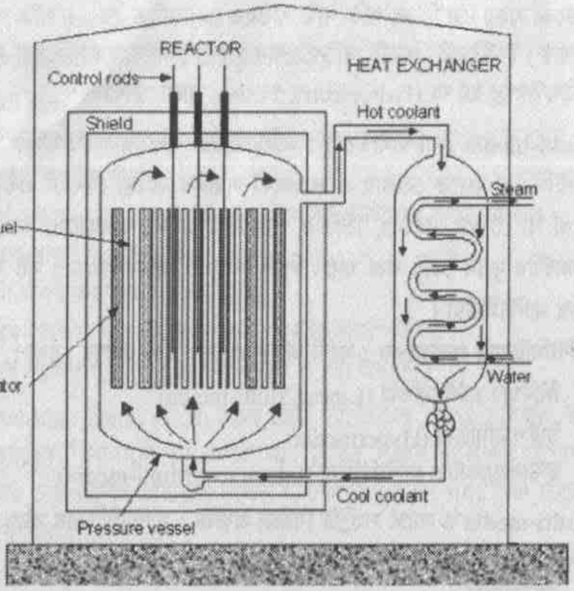

চিত্র : Nuclear Power Generator

পারমাণবিক চুল্লিতে থাকে একটি খুব দৃঢ় ও টেকসই ইস্পাতের পাত্র যা প্রবল চাপেও ফাটবে না। এ পাত্রের ভিতরে থাকে গ্রাফাইটের তৈরি চতুষ্কোণাকৃতি কতকগুলো ব্লক। এদেরকে মজ্জা (Core) বলা হয়। গ্রাফাইট মজ্জার ভিতর কতকগুলো উলম্ব সরু নালীপথ থাকে। এসব নালীপথ ইউরেনিয়ামের দণ্ড দ্বারা পূর্ণ থাকে। বোরন বা ক্যাডমিয়ামের কিছু দণ্ডকে ইউরেনিয়ামের পাশাপাশি রাখা হয়। এ দণ্ডগুলোকে নিয়ন্ত্রক দণ্ড বলা হয়।

পারমাণবিক চুল্লিতে যে ইউরেনিয়াম ব্যবহার করা হয়, তা দু'ধরনের পরমাণুর মিশ্রণ। এদের মধ্যে ইউরেনিয়াম-২৩৫ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনোভাবে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু বিভাজিত হলে এটি অপেক্ষাকৃত অল্প ভরের বেরিয়াম ও ক্রিপ্টন পরমাণুতে রূপান্তরিত হয় এবং প্রতি ফিসন বা বিভাজনে ৩টি করে নিউট্রন সৃষ্টি হয় ও প্রতি বিভাজনে প্রায় ২০০ MeV শক্তি নির্গত হয়। এ নবজাত নিউট্রনগুলো পুনরায় আশেপাশের অন্যান্য ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমাণু তথা নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়া শুরু হয় এবং অতি অল্প সময়ে বহুসংখ্যক বিভাজনের ফলে অত্যধিক পরিমাণে উৎপাদিত পারমাণবিক শক্তি তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। ক্যাডমিয়াম দণ্ডগুলোকে উঠা-নামা করিয়ে শৃঙ্খল বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

পারমাণবিক চুল্লির কার্যকালীন সময়ে যে প্রচণ্ড তাপশক্তি উৎপন্ন হয় তা সাধারণত উচ্চ চাপের কার্বন ডাই-অক্সাইড বা হিলিয়াম গ্যাস দ্বারা বের করে আনা হয় এবং একটি বয়লারে রাখা পানির চারদিকে বেষ্টন করে ঘোরানো হয়। ফলে পানি ফুটে বাষ্পে পরিণত হয় এবং এ বাষ্প দ্বারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে টার্বো জেনারেটর (Turbo-generator) ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

৪. ক. **সিপিইউ (CPU) :** কম্পিউটারের যে অংশ ডেটা প্রক্রিয়াকরণের কাজ করে তাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা সিপিইউ বলে। সিপিইউ কম্পিউটারের মস্তিষ্ক বা ব্রেইনস্বরূপ।

সফ্টওয়্যার : সমস্যা সমাধান বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কম্পিউটারের ভাষায় ধারাবাহিকভাবে সাজানো নির্দেশমালাকে প্রোগ্রাম বলে। প্রোগ্রাম বা প্রোগ্রাম সমষ্টি যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও ব্যবহারকারীর মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে হার্ডওয়্যারকে কার্যক্ষম করে তাকে সফ্টওয়্যার বলে।

খ. **ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট :** বৈদ্যুতিক বর্তনীতে যে সকল উপাদান ব্যবহৃত হয় তাদেরকে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্ট বলে। যেমন– পরিবাহী তার, রোধক, বৈদ্যুতিক বাল্ব, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি।

বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি : বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রধান কয়েকটি পদ্ধতি সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হলো :

তাপবিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে কয়লা, জ্বালানি তেল ইত্যাদি পুড়িয়ে তাপ উৎপন্ন করা হয়। তাপের সাহায্যে পানি বাষ্পীভূত হয় এবং পানির বাষ্পের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

জলবিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে পানির বিভব শক্তিকে কাজে লাগিয়ে টার্বাইন ঘোরানো হয়। টার্বাইনটি একটি তড়িৎ জেনারেটরের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। ফলে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

সৌরবিদ্যুৎ : সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে আলোক-তড়িৎ কোষ ব্যবহৃত হয়। আলোক-তড়িৎ কোষের ওপর ন্যূনতম কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট সূর্যের আলো পতিত হলে আলোকশক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

বায়ুবিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে বায়ুশক্তি ব্যবহার করে পাখা ঘুরানো হয়। পাখাটি জেনারেটরের সাথে যুক্ত থাকে। ফলে জেনারেটরে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ : এ পদ্ধতিতে সাধারণত নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়ার সাহায্যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করা হয়। উৎপন্ন তাপ ব্যবহার করে পানি বাষ্প তৈরি করা হয়। পানির বাষ্পের সাহায্যে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

গ. **কম্পিউটার ও মানুষের কাজের সাদৃশ্য :** কম্পিউটারে আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজের জন্য কম্পিউটারকে প্রয়োজনীয় তথ্য (Data) প্রদান করতে হয়। আর এই তথ্য প্রদানের কাজটিকে বলা হয় কম্পিউটারে ইনপুট (Input) দেয়া। ইনপুট পাওয়ার পর কম্পিউটার তার ব্যবহারকারীর নির্দেশ অনুযায়ী ঐ তথ্য নিয়ে কাজ করে বা তথ্যকে প্রক্রিয়াকরণ (Processing) করে। প্রক্রিয়াকরণের কাজ শেষ হলে কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে ঐ কাজের ফলাফল জানিয়ে দেয়। এবার মানুষের কাজের একটি উদাহরণ দেয়া যাক। ধরা যাক, কারো শরীরে একটি মশা কামড় দিলো। সঙ্গে সঙ্গে খবরটি মস্তিষ্কে চলে যাবে। এটা হলো ইনপুট (Input)। এরপর মস্তিষ্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাজ শুরু করে দিল। এ পর্যায়ের কাজটিই হচ্ছে প্রক্রিয়াকরণের (Processing) কাজ। প্রক্রিয়াকরণের পর মস্তিষ্ক হাতকে নির্দেশ দিল মশাকে মারার জন্য। নির্দেশ অনুযায়ী হাত মশাকে থাপ্পড় দিল। এই থাপ্পড় দেয়াটা হচ্ছে আউটপুট (Output)। তাই বলা যায়, কম্পিউটার ও মানুষের কাজের পদ্ধতিগত বেশ মিল রয়েছে।

মডেল প্রশ্ন ০৯ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

সাধারণ বিজ্ঞান

মডেল টেস্ট ০৯

পূর্ণমান : ৬০

[দ্রষ্টব্য : *ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।*]

১. ক. সূর্যের তাপে গাছের পাতা উত্তপ্ত হয় না কেন? ৪
খ. বিগ ব্যাংগ তত্ত্ব কি? ৪
গ. লোডশেডিং (Load Shedding) কি? বাংলাদেশে কি কি পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়? ৪
ঘ. গ্রিন হাউস কাকে বলে? গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি? এই ইফেক্ট বা প্রক্রিয়ার নাম এরূপ হলো কেন? ৪
ঙ. ভোরের সূর্য লাল দেখা যায় কেন? ৪

২. ক. গাছের বয়স কিভাবে বোঝা যায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ২
খ. অধিবর্ষ কেন প্রয়োজন হয়? ব্যাখ্যা করুন। ২
গ. শীতকালে কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায় কেন? ২
ঘ. সাবমেরিন ক্যাবল কি? ২
ঙ. পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক কেন? ২

৩. ক এসিড বৃষ্টি কি এবং কেন ঘটে? ২
খ. কোনো বস্তু কিভাবে দেখা যায়? বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন কেন? ৩
গ. সমুদ্রের পানি পান করা যায় না কেন? ২
ঘ. মোটরযান কিভাবে বায়ু দূষিত করে? ৩

৪. ক. জারণ-বিজারণের আধুনিক সংজ্ঞা দিন। প্রমাণ করুন যে, জারণ-বিজারণ যুগপৎ সংগঠিত হয়। ৪
খ. শব্দ দূষণ কি? এর ফলে কি ক্ষতি সাধিত হয়? Ultra-violet Ray'র প্রভাবে মানব দেহের কি উপকার ও কি অপকার সাধিত হয়? ৪
গ সেরিকালচার বলতে কি বোঝায়? ২

৫. ক. পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর কেন? ২½
খ. বনসাই (Bonsai) কি? ২½
গ. প্রোটিন কি? প্রোটিনের কাজ কি কি? ২½
ঘ. বারিমণ্ডল কিভাবে বায়ুমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করে? ২½

৬. ক সনোমিটারের সাহায্যে একটি সুর শলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৫
খ. স্বরকম্প বা বীট উৎপত্তি ব্যাখ্যা করুন। ৫

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৯

১. ক. সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য তৈরি করার জন্য গাছের পাতাকে সবসময় সূর্যের আলোয় থাকতে হয়। কিন্তু সূর্যের প্রচণ্ড তাপে গাছের পাতা উত্তপ্ত বা শুকিয়ে যাওয়ার কথা। ক্লোরোফিল সমৃদ্ধ একটি ত্বক যেমন পাতার উপরিতলকে আবৃত রাখে তেমনি পত্ররন্ধ্র বা Stomata নামক অসংখ্য রন্ধ্রপথযুক্ত ত্বক পাতার নিচে থাকে। এ রন্ধ্রপথগুলো Valve-এর মতো কাজ করে পাতার ভেতরের ও বাইরের বায়ুমণ্ডলের মধ্যকার পদার্থের আদান প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে। দিনের বেলায় পাতায় এ পথে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) প্রবেশ করে ও অক্সিজেন নির্গত হয় এবং জলীয় বাষ্প এ পথে নির্গত করে। জলীয় বাষ্পের নির্গত হওয়ার এ প্রক্রিয়াকেই প্রস্বেদন বলে। প্রস্বেদন প্রক্রিয়ায় সারাদিন পানি বাষ্পে পরিণত হচ্ছে এবং পাতার তাপ কমে যাচ্ছে। প্রতিনিয়ত এ বাষ্পীভবনের জন্য তাপ কমে যাওয়ায় গাছের পাতা উত্তপ্ত বা শুকিয়ে যায় না।

খ. বিগ ব্যাংগ বা প্রচণ্ড নিনাদ বা মহাবিস্ফোরণ নকশা হলো মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময়ের মহাবিস্ফোরণ বা আর্তনাদ, যা থেকে সময়, স্থান ও পদার্থের সৃষ্টি। প্রথমে এ মহাবিশ্ব ছিল অবিশ্বাস্যভাবে ঘন ও উত্তপ্ত। পরে এটি যখন বাইরের দিক থেকে প্রসারিত হতে থাকে তখন ছায়াপথ ও নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়। মহাবিস্ফোরণের পর থেকে সমগ্র মহাবিশ্ব প্রসারমান। মহাবিস্ফোরণের সময়কাল আমাদের পার্থিব সময় হিসেবে ১৫০০ কোটি বছর থেকে ২০০০ কোটি বছর অতীত হিসেবে ধরা হয়। বেশিরভাগ বিজ্ঞানী অবশ্য এটাকে আজ থেকে ১৭.৭ শত কোটি বছর আগের বলে হিসাব করেছেন। বেলজিয়ামের নভোবিজ্ঞানী জর্জ লেমেটার ১৯২৭ সালে জানান মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে বিগ ব্যাংয়ের মাধ্যমে। পরবর্তীতে এ রহস্য জানতে ২০০৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (CERN)-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় বিগ ব্যাং পরীক্ষা। কিন্তু প্রথম দু'দিনের পরীক্ষার পর যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পরীক্ষাটি বাধাগ্রস্ত হয়।

গ. **লোডশেডিং (Load Shedding) :** কোনো কারণে স্বাভাবিক বিদ্যুৎ সরবরাহ বিঘ্নিত হলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাকে লোডশেডিং (Load Shedding) বলে। সাধারণত চাহিদার তুলনায় পাওয়ার স্টেশনগুলোর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কম হলে লোডশেডিং (Load Shedding) হয়।

বাংলাদেশে গ্যাস, কয়লা, পানির বিভবশক্তি, বায়ুশক্তি, তেল ও সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এছাড়াও পাবনার রূপপুরে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

ঘ. গ্রিন হাউস : শীতপ্রধান দেশে যে কাচের ঘরের মধ্যে গাছপালা লাগানো হয়, তাকে গ্রিন হাউস বলে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট : বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন ধরনের গ্রিন হাউস গ্যাস যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন পরিবেশের ওপর যে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হয়, তাকে গ্রিন হাউস ইফেক্ট বলে।

গ্রিন হাউস ইফেক্ট নামকরণের কারণ : শীতপ্রধান দেশগুলোতে গাছপালাকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কাচ দিয়ে ঘেরা জায়গা বা ঘরের মধ্যে লাগানো হয়। দিনের বেলায় সূর্য হতে বিকীর্ণ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তাপ কাচের দেওয়াল ভেদ করে ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারে। এর ফলে গাছপালা ও মাটি গরম হয়। গরম মাটি ও গাছপালা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তাপ বিকিরণ করে। এই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিকীর্ণ তাপ কাচ

ভেদ করে বাইরে যেতে পারে না। ফলে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণ পরিবেশে গাছপালা ভালোভাবে জন্মাতে পারে।

গ্রিন হাউসের ক্ষেত্রে কাচ যেমন সূর্য হতে আগত তাপকে আটকে রাখে, তদ্রূপ বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাস পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিকীর্ণ তাপকে পৃথিবীর বাইরে যেতে দেয় না। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা গ্রিন হাউস ইফেক্ট নামে পরিচিত। গ্রিন হাউসের সাথে প্রক্রিয়াটির সাদৃশ্যের কারণেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে।

ঙ. সূর্যের আলো পৃথিবীর যে অংশে পড়ে সে অংশকে আমরা বলি দিন। সূর্যের সাদা আলো আসলে সাতটি রঙের মিশ্রণ। এগুলো হলো বেগুনি, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এদের মধ্যে লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি এবং বেগুনী আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। উঠার সময় অর্থাৎ ভোরে সূর্য দিগন্তের কাছাকাছি থাকে। দুপুরে সূর্য যখন আমাদের মাথার ওপরে থাকে তখন সূর্যালোককে ধূলিকণা, পানিকণাপূর্ণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করতে হয় দিগন্ত রেখা থেকে এই সূর্যরশ্মিকে বায়ুমণ্ডলের পুরুস্তর ভেদ করতে হয় তার অনেক গুণ বেশি। তাই বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা পানিকণায় ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট নীল এবং এর কাছাকাছি বর্ণগুলোর বিক্ষেপণ বেশি হয় এবং এরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু লাল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বড় হওয়ায় তা সোজাসুজি পৃথিবীতে চলে আসে। তাই সূর্যোদয়ের সময় অর্থাৎ ভোরের সূর্যকে লাল দেখা যায়।

২. ক. উদ্ভিদের দেহকোষ বিভাজনের মাধ্যমে এর বৃদ্ধি ঘটে থাকে। সেকেন্ডারি বা গৌণ কোষকলার বিভাজনের ফলে উদ্ভিদ পরিধিতে বা প্রস্থে বৃদ্ধি পায়। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এই বৃদ্ধি স্পষ্ট বোঝা যায়। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে এই বৃদ্ধির হার বেশি থাকে এবং শীতকালে থাকে কম। ফলে বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে কাষ্ঠিক উপাদান বেশি পরিমাণে তৈরি হয় এবং শীতকালে কম তৈরি হয়। এতে পাশাপাশি দুটি পুরু ও পাতলা বলয় সৃষ্টি হয় প্রতি এক বছর সময়ে। বিভিন্ন বছরে সৃষ্ট এসব বলয় এককেন্দ্রিক বৃত্তের আকারে পরস্পর সজ্জিত হয়, যা বার্ষিক বলয় নামে পরিচিত। বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদের প্রস্থচ্ছেদে এসব বর্ষবলয় গণনা করে সাধারণত উদ্ভিদের বয়স বের করা হয়।

খ. সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময় লাগে। প্রতি ৪ বছর পর ২৪ ঘণ্টা বা একদিন বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে গণনা করা হয়। একেই অধিবর্ষ বলা হয়। সঠিক সময় গণনার জন্য অধিবর্ষ প্রয়োজন হয়।

গ. শীতকালে বাতাসের জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা কমে যায়। শীতকালে বাতাস শুষ্ক থাকে। এ কারণে ভেজা কাপড়ের পানি দ্রুত বাষ্পে পরিণত হয় এবং কাপড় তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

ঘ. সাবমেরিন ক্যাবল মূলত সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবারের বিশেষ ধরনের ক্যাবল ব্যবস্থাপনা। সমুদ্রের তলে স্থাপিত হওয়ায় এর নাম হয়েছে সাবমেরিন ক্যাবল। এর মাধ্যমে আন্তঃমহাদেশীয় টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ও অবিকৃতভাবে তথ্য সম্প্রচার করা সম্ভব। আমাদের দেশও ২১ মে ২০০৬ সালে সাবমেরিন ক্যাবল লাইনে যুক্ত হয়েছে।

ঙ. ভারকেন্দ্র থেকে মুক্তভাবে ঝুলন্ত একটি চুম্বকদণ্ড সর্বদা ভূ-গোলক উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর অবস্থান করে। চুম্বকটিকে এ অবস্থা থেকে সরিয়ে দিলেও তা কয়েকবার দোল খেয়ে পুনরায় উত্তর-দক্ষিণ দিক বরাবর স্থির হয়। যেহেতু ঝুলন্ত চুম্বকের কাছে অন্য কোনো চুম্বক নেই সুতরাং পৃথিবী নিজেই একটা বিরাট চুম্বক।

৩. ক. পৃথিবীর শিল্প কারখানা থেকে প্রতিনিয়ত দূষিত গ্যাস বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। এই দূষিত গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন পার অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এসিডে পরিণত হয়ে ভূপৃষ্ঠে পতিত হচ্ছে। এই এসিড মিশ্রিত বৃষ্টিপাতকে এসিড বৃষ্টি বলে।

খ. আমাদের পঞ্চইন্দ্রিয়ের অন্যতম ইন্দ্রিয় চোখ দ্বারা আমরা দেখার কাজ করি। চোখ একটি জটিল প্রক্রিয়া মুহূর্তের মধ্যে সম্পন্ন করে আমাদের বিভিন্ন বস্তু দেখার কাজটি সম্পন্ন করে থাকে। কোনো বস্তুকে আমরা তখনই দেখতে পাই, যখন ঐ বস্তু থেকে আলো এসে আমাদের চোখে পড়ে। বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে চোখের কর্নিয়ার উপর পড়ে তা লেন্সের মধ্য দিয়ে চোখের সব চেয়ে পেছনের অংশ রেটিনাতে পড়ে বস্তুর উল্টে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে এবং সাথে সাথেই বিদ্যুৎ সংকেতের মতো এই প্রতিবিম্ব অপটিক নার্ভের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে। মস্তিষ্ক আবার এই প্রতিবিম্ব উলটে দিয়ে বস্তুর সোজা প্রতিবিম্ব তৈরি করে এবং তখনই বস্তুটিকে দেখতে পাই। পুরো ব্যাপারটাই ঘটে মুহূর্তের মধ্যে।

কোনো বস্তুকে আমরা তখনই দেখি যখন ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এসে আমাদের চোখে পড়ে। আবার প্রতিফলিত আলোকরশ্মির বর্ণের উপর বস্তুর বর্ণ নির্ভরশীল। কোনো একটি বস্তু যে বর্ণের রশ্মি প্রতিফলন করে আমরা সেই বস্তুকে সেই প্রতিফলিত বর্ণেই দেখব। সূর্যের আলোকে সাদা দেখালেও তা সাতটি বর্ণেরই মিশ্রণ। এই আলো থেকে কোনো বস্তু যে বর্ণ প্রতিফলন করে থাকে আমরা ঐ বস্তুকে সেই রংয়ে দেখি অর্থাৎ বিভিন্ন বস্তুর রং ভিন্ন হয়ে থাকে।

গ. সমুদ্রের পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় লবণ থাকে বলে এই পানি পান করা যায় না। এক গ্যালন (প্রায় সাড়ে চার লিটার) সমুদ্রের পানিতে লবণ থাকে প্রায় ১০০ গ্রাম। আবার যে সমুদ্র একটু ঘেরা জায়গায় অর্থাৎ মহাসাগর নয় তাতে লবণের পরিমাণ আরও বেশি। নদীর পানি সাগরে মিশবার আগে বয়ে নিয়ে আসে বিভিন্ন রকম খনিজ পদার্থ ও লবণ। সারাদিন সমুদ্রের পানি বাষ্পীভূত হয়ে ওপরে উঠে যায় কিন্তু লবণ থেকে যায়, আবার নদী লবণ নিয়ে আসে। এভাবেই দিন দিন সমুদ্রের পানিতে লবণের পরিমাণ বাড়তে থাকে। সমুদ্রের পানিতে এত লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বলে তা পানের অযোগ্য।

ঘ. মোটরযানের ইঞ্জিন পেট্রোল, ডিজেল বা অকটেন ও বায়ুর মিশ্রণকে প্রজ্বলিত করে বিপুল পরিমাণ তাপ শক্তি ও চাপের সৃষ্টি করে যা ব্যবহার করে মোটরযান চালিত হয়। কিন্তু এই প্রজ্বলন কার্য চলার সময় যে কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে তা মূলত বায়ুমণ্ডলের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড ও সালফার ডাই অক্সাইড ও লেড অক্সাইড প্রভৃতি যৌগের মিশ্রণ। ফলে বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে। আর আমাদের মতো অনুন্নত দেশে বেশিরভাগ মোটরযানই ত্রুটিযুক্ত। ফলে এদের থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া বায়ুমণ্ডল তথা সামগ্রিক পরিবেশের জন্য এক মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। এছাড়া মোটরযানের উচ্চ শব্দও পরিবেশকে দূষিত করে।

৪. ক. জারণ-বিজারণের আধুনিক সংজ্ঞা : যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা (অণু, পরমাণু, মূলক বা আয়ন) ইলেক্ট্রন প্রদান করে তাকে জারণ এবং যে বিক্রিয়ায় কোনো রাসায়নিক সত্তা ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে তাকে বিজারণ বলে। যেমন– কপার সালফেটের সাথে জিংক বিক্রিয়া করে জিংক সালফেট ও কপার উৎপন্ন করে।

$CuSO_4 + Zn \rightarrow Cu + ZnSo_4$

এখানে Zn পরমাণু দুটি ইলেক্ট্রন প্রদান করে Zn^{2+} আয়নে পরিণত হয়েছে।

$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e$-

অর্থাৎ জিংক এর জারণ ঘটেছে।

আবার, Cu^{2+} আয়ন দুটি ইলেক্ট্রন গ্রহণ করে Cu এ পরিণত হয়েছে।

$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

অর্থাৎ কপার এর বিজারণ ঘটেছে।

সুতরাং জারণ-বিজারণ যুগপৎ সংগঠিত হয়।

খ. শব্দ দূষণ : শব্দের আধিক্য আমাদের দেহ ও মনের উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তাকেই শব্দ দূষণ বলা হয়।

শব্দ দূষণের ক্ষতিকর দিক : তীব্র শব্দযুক্ত পরিবেশের মধ্যে থাকলে শ্রবণ শক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, উচ্চ শব্দযুক্ত শিল্প কারখানায় যে সকল শ্রমিক কাজ করে তাদের শ্রবণ শক্তি দশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন, যেখানে মানুষকে সার্বক্ষণিক উচ্চ শব্দের পরিবেশে থাকতে হয় সেখানকার মানুষের স্বাভাবিক স্নায়ু-সংযোগ ব্যাহত হয়, কাজে মনোযোগ কমে আসে, মেজাজ খিটখিটে হয়, পরিপাক যন্ত্রের কাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, ফলে আলসার ও অন্যান্য আন্ত্রিক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

মানব দেহের জন্য Ultra-violet Ray'র উপকারি দিক :

i. Ultra-violet Ray বা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানব দেহের ত্বকের নিচে ভিটামিন ডি তৈরি হওয়ার প্রাথমিক বিক্রিয়া সূচিত হয়।

ii. অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে আগে রিকেট, যক্ষ্মা (বিশেষত ত্বকের যক্ষ্মা) এবং আরো অনেক রোগের চিকিৎসা করা হতো। বর্তমানকালেও যে সকল রিকেটের রোগী ওষুধ হিসেবে ভিটামিন ডি সহ্য করতে পারে না, তাদের চিকিৎসার জন্য অতিবেগুনি রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

iii. এছাড়াও সোরিয়াসিস, ব্রন, পিটরিয়াসিস রেজিয়া প্রভৃতি ত্বকের ব্যাধির চিকিৎসাতেও অতিবেগুনি রশ্মির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

মানবদেহের উপর Ultra-violet Ray'র ক্ষতিকর প্রভাব :

i. Ultra-violet Ray বা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে মানব দেহের ত্বক লাল হয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ যাবত অতিমাত্রায় অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকের উপর পতিত হলে ত্বকে সৌর ক্ষত (Sun Burn) সৃষ্টি হয়। এ সময়ে উপত্বকের কিছু কোষ মরে যায় এবং সেখানে রক্তরস ও শ্বেতকণিকা জমা হওয়ার ফলে ফোস্কা সৃষ্টি হয়।

ii. অতিবেগুনি রশ্মির কারণে ত্বকে ক্যান্সার হতে পারে।

iii. অতিবেগুনি রশ্মি চোখে প্রবেশ করলে দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এবং এর প্রভাবে চোখে ছানিও পড়তে পারে।

গ. আমরা যে সিল্ক বা রেশমি কাপড় ব্যবহার করি তা রেশম মথ নামে এক ধরনের মথের লার্ভার লালাগ্রন্থি বা রেশম সুতা থেকে তৈরি হয়। রেশমি সুতা উৎপাদন এবং রেশমি বস্ত্র তৈরির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে রেশম মথ পালন করার এবং তার গুটি বা কোকুন থেকে রেশমি সুতা সংগ্রহ করার সার্বিক প্রক্রিয়াকে সেরিকালচার বলা হয়। বাণিজ্যিকভাবে রেশম চাষ অত্যন্ত লাভজনক। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় উন্নতমানের রেশম চাষ করা হয়।

৫. ক. উচ্চচাপে ও তাপে রাসায়নিক সংযোজন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ইথিলিনের একাধিক অণু একত্রিত হয়ে যে বড় অণু তৈরি করে তাকে পলি-ইথিলিন বা পলিথিন বলে। এটি অস্বচ্ছ কঠিন প্লাস্টিক। ব্যবহারের পর পলিথিন ব্যাগের পরিত্যক্ত অংশ মাটি, পানি ইত্যাদি দূষিত করে। ফেলে দেয়ার পর দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থাকে বলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হয়। পলিথিন মাটির উর্বরতা হ্রাস, গুণ পরিবর্তন করাসহ নানা সমস্যা সৃষ্টি করে। শহরাঞ্চলে পলিথিন ব্যাগ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

খ. একটি ছোট মাটির পাত্রে বা টবে কোনো এক বৃক্ষ প্রজাতিকে খাটো বামনাকৃতি করে বহু বর্ষ ধরে জন্মানোর পদ্ধতি বনসাই নামে পরিচিত। আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও বনসাই উদ্যানতত্ত্বের একটি দুর্বোধ্য শাখা, কিন্তু এটি প্রাচ্যের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারার সাথে শতাব্দী ধরে জড়িত। পশ্চিমা বিশ্বের সংস্কৃতিতে এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে মাত্র বিংশ শতাব্দীতে। বনসাই শব্দের অর্থ হচ্ছে 'পাত্রের মধ্যে কোনো গাছ' এবং এর উৎপত্তির সন্ধান পাওয়া যায় চীনের চৌ-এর (Chou) রাজত্বকালে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে যখন চীনা সম্রাটগণ তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সব প্রদেশ থেকে নিয়ে আসা মাটি, পাথর ও ছোট ছোট করে ছেঁটে আনা গাছপালা দিয়ে ক্ষুদে মডেল বাগানগুলো সাজাতেন।

বনসাই-এর প্রযুক্তি উদ্যানতত্ত্বের শারীরবৃত্তিক ও ইকোলজি বিষয়ের নানা অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শুধু আকৃতি সুরক্ষাই নয়, শাখা-প্রশাখার প্যাটার্নের ব্যাপারেও উপযুক্ত পরিকল্পনার প্রয়োজন। এ কাজ করা হয় বাছাইকৃত (Selective) ছাঁটাই (Pruning) দ্বারা এবং শীর্ষস্থ কুঁড়িগুলোকে চিমটি কেটে তুলে ফেলা, যাতে পার্শ্বসহ কুঁড়িগুলো মুক্ত হয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, অর্থাৎ শীর্ষকুঁড়ির আধিপত্য নষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন। শিকড়কেও কোনো কোনো প্রজাতিতে দুই বা তিন মাস অন্তর ছাঁটাই করা জরুরি। যার ফলে পার্শ্বীয় নতুন নতুন শিকড় বৃদ্ধি পেতে পারে যাদের মাটি থেকে পানি ও খনিজ পদার্থ গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রচুর।

গ. প্রোটিন : কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত জটিল জৈব পদার্থ, যার প্রতিটি অণু বহুসংখ্যক অ্যামাইনো এসিড অণু দিয়ে গঠিত এবং অ্যামাইনো এসিডগুলো পেপটাইড বন্ধ দ্বারা পরস্পরযুক্ত।

কাজ : ১. প্রোটিন দেহের কোষ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ একক। ২. দেহের বাফার পদ্ধতি (Buffer System) গঠন করে। ৩. প্লাজমা প্রোটিনের লেভেল নিয়ন্ত্রণ করে দেহরস ও রক্তের কলয়ডাল ওসমেটিক চাপ রক্ষা করে। ৪. শক্তি সরবরাহ করে। ৫. এনজাইম ও হরমোন তৈরিতে অংশগ্রহণ করে।

ঘ. বিশাল জলরাশিতে পরিপূর্ণ ভূত্বকের অবনমিত অংশই বারিমণ্ডল। ভূপৃষ্ঠের প্রায় ৭১ শতাংশ এলাকা জুড়ে বারিমণ্ডল বিস্তৃত। আয়তনের বিশালতার কারণে এটি বায়ুমণ্ডলের চাপ, তাপ,

আর্দ্রতা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। বারিমণ্ডলের নিকটবর্তী অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন এবং বারিমণ্ডলের দূরবর্তী স্থানের বায়ু চরমভাবাপন্ন হয়। বারিমণ্ডলের শীতল ও উষ্ণ পানির স্রোত উপকূলবর্তী অঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সমুদ্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে বৃষ্টিপাত ঘটায়। ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এছাড়া ভূপৃষ্ঠের বায়ুমণ্ডলের তাপের সমতা বণ্টনে বারিমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. ক. তত্ত্ব : সনোমিটারের সাহায্যে কোনো একটি সুরশলাকার কম্পাঙ্ক নির্ণয়ের জন্যে আমরা যে সমীকরণ ব্যবহার করি তা হলো–

$$n = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{m}}$$

এখানে, n = কম্পাঙ্ক,

ℓ = তারের কম্পমান দৈর্ঘ্য

$T = Mg$ = তারে প্রযুক্ত টান

এবং m = তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর।

পরীক্ষা পদ্ধতি : একটি সুরশলাকা নিই যার কম্পাঙ্ক নির্ণয় করতে হবে। প্রথমে পরীক্ষাধীন তারের মোট দৈর্ঘ্য ও ভর জেনে একক দৈর্ঘ্যের ভর বের করি। এখন, সুরশলাকাকে একটি রাবার প্যাডে আঘাত করি এবং সনোমিটারের বাক্সের উপর স্থাপন করি। সেতুকে এদিক-সেদিক সরিয়ে তারের দৈর্ঘ্যকে এমনভাবে সংযোজিত করি যাতে তারের উপরে স্থাপিত কাগজের টুকরা ছিটকে পড়ে। অর্থাৎ, তার ও সুরশলাকা অনুনাদ সৃষ্টি করে। এ অবস্থায় দুই সেতুর মধ্যবর্তী তারের দৈর্ঘ্য বের করি। এরপর টান বের করি।

হিসাব : ধরি, তারের টান $T = Mg$ ডাইন, তারের কম্পমান দৈর্ঘ্য $= \ell$, তারের একক দৈর্ঘ্যের ভর $= m$ গ্রাম।

$$\therefore \text{কম্পাঙ্ক,}\quad n = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{T}{m}} = \frac{1}{2\ell}\sqrt{\frac{Mg}{m}}$$

এখন, M, g, ℓ, এবং m এর মান জেনে n নির্ণয় করা যায়।

খ. সাধারণত সামান্য পার্থক্যের কম্পাঙ্ক সম্পন্ন দুটি তরঙ্গমালা যখন একই সরলরেখা বরাবর পরস্পর বিপরীত দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন ব্যতিচারের সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ, ফাঁপা কাঠের বাক্সের উপর বসানো দুটি একই কম্পাঙ্কের সুরশলাকা নিয়ে একটির পর একটি আঘাত করলে একটানা একই রকম শব্দ শোনা যায়। সুরশলাকা দুটিকে একসঙ্গে আঘাত করলেও একটানা শব্দ উৎপন্ন হয়, তবে শব্দ এক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা জোরালো হয়। এখন, একটি সুরশলাকার বাহুতে কিছুটা মোম আটকিয়ে সামান্য ভারী করলে এর কম্পাঙ্ক কিছুটা কমে যাবে। এবার উভয়কে একসঙ্গে আঘাত করলে দেখা যাবে যে, শব্দ একটানা হচ্ছে না; শব্দের প্রাবল্য একবার বাড়ছে ও একবার কমছে। শব্দের প্রাবল্যের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধির ফলেই স্বর কম্পের সৃষ্টি হয়। এর উৎপত্তি নিম্নের ব্যাখ্যা হতে বুঝা যায়–

প্রতি সেকেন্ডে প্রতিটি সুরশলাকা এদের নিজ নিজ কম্পাঙ্কের সমান সংখ্যক শব্দ তরঙ্গ বায়ুর মধ্যে সৃষ্টি করে।

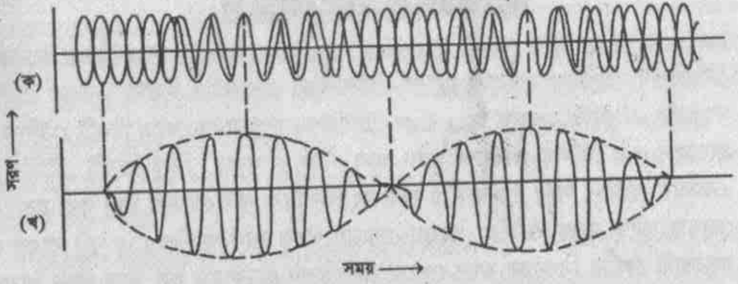

(ক) নং চিত্রে ঐ দুটি তরঙ্গ গুচ্ছের প্রতিকৃতি অর্থাৎ, বিভিন্ন বিন্দুতে সৃষ্ট সরণগুলো কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয় তা দেখানো হয়েছে। এ তরঙ্গ গুচ্ছ দুটি পরস্পরের উপর আপতিত হয়ে যে লব্ধি তরঙ্গের সৃষ্টি করবে তা (খ) নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। এ চিত্র হতে দেখা যায় যে বিবেচনাধীন বিন্দুতে লব্ধি তরঙ্গ গুচ্ছের বিস্তার সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। লব্ধি তরঙ্গের বিস্তার সময়ের সাথে এরূপ হ্রাস বৃদ্ধির ফলে তরঙ্গের প্রাবল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে বা বীট সৃষ্টি হয়।

বীট প্রকাশের রাশিমালা

যদি দুটি উৎসের কম্পাঙ্ক n_1 এবং n_2 হয় এবং প্রতি সেকেন্ডে সৃষ্ট বীটের সংখ্যা N হয়–

তাহলে, $N = n_1 \sim n_2$

যদি $n_1 > n_2$ হয়, $N = n_1 - n_2$

যদি $n_1 > n_2$ হয়, $N = n_2 - n_1$

মডেল টেস্ট ০৯

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

[দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।] নম্বর

১. ক. রঙিন টেলিভিশনের PAL system সম্পর্কে আলোচনা করুন। ৫
   খ. Facebook কি? Facebook-এর ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধাগুলো আলোচনা করুন। ৫
২. ক. Fiber optic কত প্রকার কি কি? Optical fiber-এর মাধ্যমে কিভাবে ডেটা আদান প্রদান করা যায়? ৫
   খ. একটি IC এর গঠনপ্রণালী বর্ণনা করুন। ৫
৩. ক. Wimax প্রযুক্তি কি? Face-book account খোলার পদ্ধতি বর্ণনা করুন। ৫
   খ. ইউপিএস কি? এটি কিভাবে কাজ করে? ৩
   গ. বিসিডি কোড (BCD Code) কি? ২
৪. ক. টেলিভিশনে কিভাবে শব্দ ও ছবি প্রেরণ করা হয়? ৪
   খ. রেকটিফায়ার কাকে বলে? ৩
   গ. অ্যামিটার কি? এর গঠন ও কার্যপ্রণালী উল্লেখ করুন। ৪
৫. ক. কম্পিউটার সিস্টেম কি? এর বৈশিষ্ট্য ও উপাদানগুলো উল্লেখ করুন। ৩
   খ. 'র‍্যাম (RAM)' এবং 'রম (ROM)' কি? ২
   গ. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক LAN সম্বন্ধে লিখুন। ৩
   ঘ. চ্যাট (Chat) কি? ২

উত্তর : মডেল টেস্ট-০৯

১. ক. PAL-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Phase Alternate Line. PAL system হচ্ছে বিশ্বের অনেক দেশে টেলিভিশন সম্প্রচারে ব্যবহৃত এনালগ টেলিভিশন এনকোডিং সিস্টেম। রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচারে এ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। রঙিন টেলিভিশন সম্প্রচারের ক্ষেত্রে তিনটি মৌলিক রঙের প্রয়োজন। এ মৌলিক রংগুলো হলো লাল, নীল ও সবুজ। কিন্তু তিনটি মৌলিক রংকে একসাথে পাঠানো সম্ভব হয় না। এ জন্য রং তিনটিকে দুটি জোড়ায় ভাগ করা হয়। একটি জোড়ায় থাকে সবুজ ও নীল। অপর জোড়ায় থাকে লাল ও নীল। এ দুটি রঙের জোড়া বহনকারী কোনো সিগন্যাল যখন কোনো টেলিভিশন গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে তখন প্রয়োজনীয় তিনটি মৌলিক রংই পাওয়া যায়। ফলে টেলিভিশনের পর্দায় যে কোনো রঙিন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়। PAL সিস্টেম বলতে মূলত এভাবে দুটি ভিন্ন জোড়া রঙের সংমিশ্রণের (multiplexing) মাধ্যমে রঙিন ছবি সম্প্রচার করাকে বোঝানো হয়ে থাকে।

খ. ফেসবুক হলো সামাজিক যোগাযোগের (সোশ্যাল নেটওয়াকিং) একটি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট। এটি ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে যাত্রা শুরু করে। মার্ক জুকারবার্গ ফেসবুকের প্রতিষ্ঠাতা। এই জনপ্রিয় ওয়েবসাইটটি ব্যবহারের বেশ কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে।

সুবিধা :

১. ফেসবুক বিশ্বের যে কোনো প্রান্তের লোকজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
২. বিদেশে অবস্থানকারী আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ফেসবুক বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৩. ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য ফেসবুক একটি ভালো মাধ্যম।
৪. ফেসবুকের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর মতামত প্রদান, কিংবা ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা আদান-প্রদান করা যায়।
৫. বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা খবর ফেসবুকের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে সবার সাথে শেয়ার করা যায়।

অসুবিধা :

১. ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় নষ্ট করা শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফলে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।
২. অফিস চলাকালীন সময়ে ফেসবুকের ব্যবহার কাজকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।
৩. ফেসবুকের মাধ্যমে ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে।
৪. ফেসবুকে অনেকে ভুয়া অ্যাকাউন্ট খুলে প্রতারণা করে।
৫. ফেসবুকের মাধ্যমে অনেক সময় ব্যবহারকারীর ছবি বিকৃত করে অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হয়।

২. ক. **ফাইবার অপটিকের প্রকারভেদ :** ফাইবারের গাঠনিক উপাদানের প্রতিসরাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ফাইবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১. স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index Fiber)
২. গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index Fiber) ও
৩. মনোমোড ফাইবার (Monomode Fiber)

স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং এর ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে। কোরের প্রতিসরাঙ্কের ভিন্নতার জন্য এ দু ধরনের ফাইবারের আলোক রশ্মির গতিপথও ভিন্ন হয়। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের ব্যাসার্ধ বেশি।

প্রেরক যন্ত্র, প্রেরণ মাধ্যম এবং গ্রাহক যন্ত্র—এ তিনটি মূল অংশ নিয়ে ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থা সংগঠিত। প্রেরক যন্ত্র উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করে ফাইবারের মাধ্যমে তা গ্রাহক যন্ত্রে পৌঁছায়।

অপটিক্যাল ফাইবার সরাসরি অ্যানালগ বা ডিজিটাল ডেটা পরিবহনে সক্ষম নয়। একে প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োজনীয় মডুলেটর ও লাইট ইমিটিং ডায়োডের মাধ্যমে আলোক তরঙ্গে পরিণত করে ফাইবারের মধ্যে প্রেরণ করা হয়।

অপটিক্যাল ফাইবার আলোক রশ্মির পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে থাকে। আলোক রশ্মি যখন কোনো ক্ল্যাডিং বিভেদ তলে আপতিত হয় তখন তা স্নেলের সূত্রানুসারে প্রতিসৃত হয়। এভাবে বার বার পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে গ্রাহক যন্ত্রে গিয়ে ধরা পড়ে।

গ্রাহক যন্ত্রে মূলত দুটি অংশ থাকে— ফটো ডিটেকটর এবং প্রসেসিং ইউনিট। ফটো ডিটেকটরের কাজ হলো ফাইবার থেকে ডেটা উদ্ধার করা (Detection)। প্রসেসিং ইউনিটে থাকে অ্যামপ্লিফায়ার, ফিল্টার, ডিমডুলেটর ইত্যাদি। এরা ডেটাকে যথার্থভাবে ডিমডুলেশন, অ্যামপ্লিফিকেশন এবং ফিল্টারেশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায়।

খ. **ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা IC :** ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট বা IC হলো এক প্রকার ইলেকট্রনিক সার্কিট যাতে সার্কিটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বা যন্ত্রাংশগুলো একটি ক্ষুদ্র অর্ধ পরিবাহক চিপে বিশেষ প্রক্রিয়ায় গঠন করা হয়, যারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঐ চিপের অংশ। একটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটে অনেকগুলো যন্ত্রাংশ যেমন রোধক, ধারক, ডায়োড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি এবং এদের অন্তসংযোগ একটি ক্ষুদ্র প্যাকেজ হিসেবে থাকে, যাতে এরা একটি পূর্ণ ইলেকট্রনিক কার্যাবলী সম্পন্ন করতে পারে। একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহক পদার্থের মধ্যে এসব যন্ত্রাংশ গঠন ও সংযুক্ত করা হয়।

IC-এর গঠন প্রণালী : IC গঠন করার জন্য চারটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা :

ক. মনোলিথিক (Monolithic) পদ্ধতি;
খ. পাতলা ফিল্ম (Thin film) পদ্ধতি;
গ. স্থূল ফিল্ম (Thick film) পদ্ধতি; এবং
ঘ. হাইব্রিড (Hybrid) বা সংকর পদ্ধতি।

এদের মধ্যে মনোলিথিক পদ্ধতিটি বহুল প্রচলিত। সুতরাং নিচে এ পদ্ধতিতে IC গঠন প্রণালী আলোচনা করা হবে। মনোলিথিক (Monolithic) পদ্ধতি হলো যেখানে সার্কিটের প্রায় সকল উপাদান এবং এদের মধ্যে বৈদ্যুতিক সংযোগ একটি পাতলা ফালি বা ওয়েফারের (Wafer) মধ্যে তৈরি করা হয়। এ পাতলা ওয়েফারকে সাবস্ট্রেট বলে। IC তৈরির পর্যায়ক্রমিক ধাপগুলো নিম্নরূপ :

i. **P- সাবস্ট্র্যাট তৈরি :** IC তৈরির এটি প্রথম ধাপ। চিত্র- ক, খ ও গ এ ধাপের সরল চিত্র দেখানো হলো। একটি লম্বা ও মোটা (যেমন 25 cm লম্বা ও 2.5 cm ব্যাস) P টাইপ সিলিকন হতে খুব পাতলা রোধের (200μm) ওয়েফার (wafer) কেটে নেয়া হয়। এ ওয়েফারকে বলে সাবস্ট্র্যাট (Substrate), যার ওপর IC এর বিভিন্ন উপাদান তৈরি করা হয়।

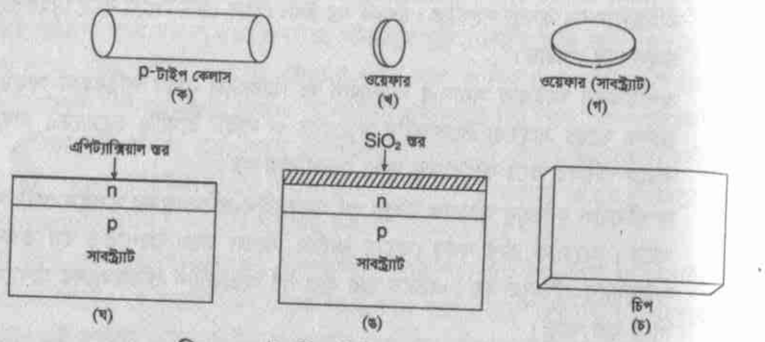

চিত্র : IC তৈরির বিভিন্ন ধাপ

ii. **এপিট্যাক্সিয়াল (Epitaxial) স্তর তৈরি :** দ্বিতীয় ধাপে সিলিকন পরমাণু ও পঞ্চ যোজনী বিশিষ্ট পরমাণু গ্যাসের মিশ্রণ' উত্তপ্ত ওয়েফারের উপর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। এর ফলে n-টাইপ অর্ধপরিবাহীর একটি পাতলা স্তর ওয়েফারের উপর জমা হয়। এ পাতলা (10μm) আবরণকে এপিট্যাক্সিয়াল (epitaxial) স্তর বলে। চিত্র (ঘ) এ প্রদত্ত স্তর।

iii. **অন্তরিত (Insulated) স্তর তৈরি :** এপিট্যাক্সিয়াল স্তরকে বাইরের দূষণ থেকে মুক্ত রাখার জন্য সিলিকন ডাই-অক্সাইডের (SiO_2) একটি পাতলা স্তর (1μm) এপিট্যাক্সিয়াল স্তরের উপরে জমা করা হয়। চিত্র (ঙ) দ্রষ্টব্য।

iv. **খাঁজ কাটা (Etching) :** সাবস্ট্রেট উপাদান তৈরির জন্য কোনো খাঁদ মেশানোর পূর্বে রাসায়নিক পদ্ধতিতে অন্তরিত স্তরে খাঁজ কাটা হয়। একে etching করা বলে। এচিং এর স্থলে এপিট্যাক্সিয়াল স্তর উন্মুক্ত হয়। ঐ সমস্ত স্থানে বর্তনীর বিভিন্ন উপাদান তৈরি করা হয়।

v. **চিপ তৈরি :** এরপর ওয়েফারকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয়। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র অংশকে চিলতে বা চিপ (chip) বলে। চিত্র (চ) দ্রষ্টব্য। প্রতিটি চিপে IC থাকে। একই ধরনের বহু সংখ্যক চিপ ওয়েফারে এক সাথে তৈরি করা হয়। গ্লাস কাটার মত করে চিপগুলোকে কেটে আলাদা করা হয়।

৩. ক. Wimax শব্দটির পুরো অর্থ হলো Worldwide Interoperability for Microwave Access অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ব্যবহারের সাধারণ বিনিময়যোগ্য পদ্ধতি। Wimax হলো এক প্রকার টেলিযোগাযোগ প্রটোকল যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়মে সম্পূর্ণ মোবাইল ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা যায়।

বর্তমানে Wimax-এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ 40 Mbit/s রেটে ইন্টারনেট অ্যাকসেস করা সম্ভব এবং যা IEEE 802.16m প্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত। এর ইন্টারনেট অ্যাকসেস স্পিড খুব শীঘ্রই 1 Gbit/s এ উন্নীত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এজন্য Wimax প্রযুক্তিকে বলা হয় 4G বা Fourth Generation ওয়ারলেস টেলিকমিউনিকেশন টেকনোলজি। 30 metre (বা 100-foot) এলাকায় Wi-Fi Local Area Network ব্যবহার করে Wimax সুবিধা প্রদান করা হয়। Wimax Forum নামে প্রযুক্তিবিদদের একটি সংগঠন Wimax প্রযুক্তির বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করে থাকে।

Facebook Account খোলার পদ্ধতি :

Facebook এ Account খুলতে হলে নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয় :

১. প্রথমে ইন্টারনেট ব্রাউজারের Address bar-এ www.facebook.com লিখে Enter দিতে হবে।
২. ফেসবুকের Home page ওপেন হলে ডান পাশে Sign Up অপশন পাওয়া যায়। Sign Up বাটনে ক্লিক করলে একটি অনলাইন ফর্ম আসবে। এ Online Form-এ নাম, ঠিকানা ও অন্যান্য তথ্য দিয়ে Formটি পূরণ করতে হবে।
৩. পরবর্তীতে Security Check Box এ ভেসে ওঠা লেখাগুলো সঠিকভাবে লিখে Sign Up এ ক্লিক করতে হবে।
৪. পরবর্তী Page এ নিজের মেইল একাউন্ট প্রবেশ করে Friend খুঁজে নেয়া যেতে পারে অথবা Skip This Step ক্লিক করতে হবে।
৫. Profile Info Page টিকে High School, College, University এবং Employer এর নাম লিখে save বাটনে ক্লিক করতে হবে।
৬. পরের Page এ Profile Picture Upload বাটনে ক্লিক করে নিজের ছবি আপলোড করতে হবে।
৭. সবশেষে যে ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে Sign up করা হয়েছিল সেটির Inbox এ গিয়ে Facebook থেকে পাঠানো Mail এর Confirmation Link এ ক্লিক করলেই Account খোলা সম্পন্ন হবে।

খ. ইউপিএস হলো এক বিশেষ ধরনের পাওয়ার সাপ্লাই, যা কিছু সময়ের জন্য বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এর পূর্ন নাম Uninterruptible Power Supply. আমাদের দেশে বিদ্যুৎ কখন যায়, কখন আসে এক কোনো নিয়মনীতি নেই। হয়তো দিনভর অনেক কাজ কম্পিউটারে জমা হয়েছে। ভুলবশত সেগুলো সেভ করা হয়নি। কিন্তু হঠাৎ করে বিদ্যুৎ চলে গেলে তখন সব কাজ নষ্ট হয়ে যাবে বা মুছে যাবে। এতে করে সারা দিনের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায় এ কাজগুলো পুনরায় করতে হবে। এ অসুবিধা দূর করা এবং আকস্মিক বিদ্যুৎ বন্ধের অসুবিধা থেকে বাঁচার জন্য ইউপিএস বা আনইন্টারাপটেবল পাওয়ার সাপ্লাই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ইউপিএস-এর ব্যাটারি বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় করে রাখে। ফলে হঠাৎ করে যখন বিদ্যুৎ চলে যায়, তখন ইউপিএস সাধারণত এক থেকে দুই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে ব্যাটারিতে সঞ্চিত বিদ্যুৎ থেকে কম্পিউটারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। প্রকারভেদে ইউপিএস দশ মিনিট থেকে দুই ঘণ্টা পর্যন্ত ক্রমাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে। ইউপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে র‍্যামের ডাটার ক্ষতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

গ. **বিসিডি কোড (BCD Code) :** বিসিডি (BCD) কোডের পূর্ণ অর্থ হচ্ছে বাইনারি কোডেড ডেসিমাল (Binary Coded Decimal)। কোনো দশমিক সংখ্যাকে বাইনারি সংখ্যায় কিংবা বাইনারি সংখ্যাকে দশমিক সংখ্যায় রূপান্তর করার পদ্ধতি সহজতর করার জন্য বিসিডি কোড ব্যবহার করা হয়। বিসিডি কোড সাধারণত ৪, ৬, ৮ বিটের হতে পারে। তবে ৮ বিটের বিসিডি কোডকে আদর্শ হিসেবে ধরা হয়।

৪. ক. যে যন্ত্রের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানের কোনো ঘটনার ছবি ও শব্দ একই সঙ্গে দেখা ও শোনা যায়, তাকে টেলিভিশন বলে। দূরবর্তী জায়গায় একটি সক্রিয় ছবিকে প্রেরণ করে পুনরুৎপাদন করার কৌশলকে টেলিভিশন প্রক্রিয়া বলে।

টেলিভিশনে থাকে দুটি প্রেরক যন্ত্র। সম্প্রচারের একটি প্রেরক যন্ত্র শব্দ প্রেরণ করে এবং অন্য প্রেরক যন্ত্রটি চিত্র প্রেরণ করে। টেলিভিশনে শব্দ পাঠানো হয় সাধারণ বেতার যন্ত্রপাতির সাহায্যে। ছবি পাঠাতে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় যে দৃশ্য প্রেরণ করতে হবে তার একটি বিম্ব বা ছবি টেলিভিশনের পর্দায় ফেলা হয়। ক্যামেরার ভিতর একটি ফটোটিউব থাকে। এই টিউব একটি উজ্জ্বল আলোকবিন্দুকে জোরালো বিদ্যুৎস্পন্দনে বা ঝলকে এবং অনুজ্জ্বল আলোক বিন্দুকে কম জোরালো বিদ্যুৎ ঝলকে রূপান্তরিত করে। টেলিভিশনের ছবিকে স্ক্যানিং করে প্রেরণ করা হয়। স্ক্যানিং করার সময় ছবির ঔজ্জ্বল্য ও অনুজ্জ্বলের উপর ভিত্তি করে অনেকগুলো রেখায় বিভক্ত করা হয়। সমস্ত ছবিকে এতো দ্রুত স্ক্যানিং করা হয় যে, প্রতি সেকেন্ডে ৩০টি চিত্র সম্প্রচারিত হয়।

খ. দ্বিতড়িৎদ্বার বা সংক্ষেপে ডায়োডকে রেকটিফায়ার বলা হয়। একটি p- টাইপ সিলিকন এবং n টাইপ সিলিকন পাশাপাশি সংযোগে p-n জংশন করা হয়। এ p-n জংশনই ডায়োড যাকে রেকটিফায়ার বলে। এর কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ প্রবাহকে একমুখীকরণ। বিভিন্ন ধরনের রেকটিফায়ারের মধ্যে অর্ধ তরঙ্গ রেকটিফায়ার (Half Wavel Rectier) এবং পূর্ণ তরঙ্গ রেকটিফায়ার (Full Wavel Rectifier) উল্লেখযোগ্য।

গ. যে যন্ত্রের সাহায্যে বর্তনীর তড়িৎপ্রবাহ সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা যায় তাকে অ্যামিটার বলে। অ্যামিটারকে বর্তনীর সাথে অনুক্রমিক সংযোগে যুক্ত করা হয়।

এ যন্ত্রে একটি কুণ্ডলী জাতীয় গ্যালভানোমিটার থাকে। গ্যালভানোমিটার হচ্ছে সেই যন্ত্র, যার সাহায্যে বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহের অস্তিত্ব ও পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। এ গ্যালভানোমিটারের কুণ্ডলীর বিক্ষেপ নির্ণয়ের জন্য কুণ্ডলীর তলের সমকোণে একটি সূচক বা কাঁটা লাগানো থাকে। সূচকটি অ্যাম্পিয়ার, মিলিঅ্যাম্পিয়ার বা মাইক্রোঅ্যাম্পিয়ার এককে দাগকাটা একটি স্কেলের ওপর ঘুরতে থাকে। যেহেতু অ্যামিটারকে বর্তনীতে অনুক্রমিক সংযোগে যুক্ত করতে হয় তাই এর রোধ বর্তনীতে কার্যকর হয়, ফলে বর্তনীতে প্রবাহের মানের পরিবর্তন হতে পারে। এজন্য কুণ্ডলীর সাথে সমান্তরালে একটি অল্প মানের রোধ সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে অ্যামিটারের তুল্য রোধ খুব কমে যায় এবং এটি বর্তনীতে সংযুক্ত করলে বর্তনীর প্রবাহের তেমন কোনো পরিবর্তন হয় না।

অ্যামিটার একটি সমান্তরালে অল্পমানের রোধ সংযুক্ত অ্যাম্পিয়ারে দাগাঙ্কিত গ্যালভানোমিটার।

৫. ক. সিস্টেম হলো কতগুলো ইন্ট্রিগেটেড উপাদানের সম্মিলিত প্রয়াস যা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে। সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. একটি সিস্টেমে একাধিক উপাদান (Elements) থাকবে।

২. সিস্টেমের উপাদানগুলোর একটি অপরটির সাথে লজিক্যাল সম্পর্ক থাকবে।

৩. সিস্টেমের সকল উপাদানগুলো এমনভাবে কন্ট্রোল করা হবে যাতে সিস্টেমের উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

কম্পিউটার সিস্টেম কতগুলো ইন্টিগ্রেড উপাদান (ইনপুট/ আউটপুট যন্ত্রপাতি, মেমরি, সিপিইউ ইত্যাদি) নিয়ে গঠিত যা প্রোগ্রামের লিখিত নির্দেশাবলী পালন করে। ইনপুট বা আউটপুট যন্ত্রপাতিগুলো সিপিইউ থেকে নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কাজ করতে পারে না। অনুরূপভাবে মেমরিও এককভাবে কোনো কাজ করতে পারে না। কাজেই সকল উপাদান একত্রে মিলে কাজ করে একটি উদ্দেশ্য সাধন করে। কম্পিউটার সিস্টেমের উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

১. হার্ডওয়্যার, ২. সফটওয়্যার, ৩. হিউম্যানওয়্যার বা ব্যবহারকারী ও ৪. ডেটা/ ইনফরমেশন।

খ. **র‍্যাম (RAM) :** র‍্যাম (RAM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে র‍্যানডম এক্সেস মেমোরি (Random Access Memory)। এটি কম্পিউটারের অস্থায়ী তথ্য রাখার ভাণ্ডার যেখানে কম্পিউটারের প্রতি মুহূর্তে চলমান সব ডেটা এবং তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। র‍্যামে সব তথ্য জমা থাকে অস্থায়ী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে, যার ফলে কম্পিউটার বন্ধ করার সাথে সাথে এর সব তথ্য মুছে যায়, যা আর পুনরুদ্ধার করা কখনই সম্ভব হয় না।

রম (ROM) : রম (ROM)-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে রিড অনলি মেমোরি (Read Only Memory)। এটি কম্পিউটারের স্থায়ী স্মৃতি। কম্পিউটার বন্ধ করলে বা বিদ্যুৎ চলে গেলে রমের স্মৃতিতে রক্ষিত সব তথ্যাবলী অক্ষত বা অপরিবর্তিত থাকে। রমের রক্ষিত তথ্যের কোনো সংশোধন, পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যায় না।

গ. সাধারণত ১০ কিমি বা তার কম এরিয়ার মধ্যে বেশ কিছু কম্পিউটার টার্মিনাল বা অন্য কোনো পেরিফেরাল ডিভাইস সংযুক্ত করে যে নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয় তাকে LAN বলে। এটি সাধারণত স্কুল, কলেজ ক্যাম্পাসে, কোনো বড় অফিস বিল্ডিংয়ে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া ডেটা এন্ট্রি, ডেটা প্রসেসিং, বৈদ্যুতিক মেইলিং সিস্টেমের জন্য LAN ব্যবহার করা হয়। LAN-এর টোপোলজি সাধারণত স্টার, রিং কিংবা ব্রডকাস্ট চ্যানেল মেথড হয়ে থাকে। এর ট্রান্সমিশন মিডিয়া হিসেবে সাধারণত কো-অক্সিয়াল ক্যাবল বা অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয়।

Ethernet Co-axial 10base2 Cable নামে যে কো-অক্সিয়াল ক্যাবলটি বাজারে প্রচলিত আছে তার দ্বারা LAN তৈরি করলে LAN-এর সর্বোচ্চ 185 Meter এবং একটি LAN-এ সর্বোচ্চ চারটি রিপিটার স্টেশন ব্যবহার করা যাবে।

ঘ. **চ্যাট (Chat) :** চ্যাট (Chat) অর্থ খোশগল্প। এ ব্যবস্থায় একজন ব্যবহারকারী তার কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সাথে গল্প করতে পারেন। চ্যাটে অংশগ্রহণকারীগণ হয়তো পরস্পরের অপরিচিত অথবা একজন অন্যজনকে কোনোদিন দেখেওনি। অথচ তারা কম্পিউটারের মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ে খোশগল্প করতে পারেন। এভাবে গল্পের পরিচিত বন্ধুত্ব অনেক সময় খুব আন্তরিকও হয়ে ওঠে।

মডেল প্রশ্ন ১০ সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

নির্ধারিত সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ১০০

সাধারণ বিজ্ঞান

মডেল টেস্ট ১০

পূর্ণমান : ৬০

দ্রষ্টব্য : ইংরেজি অথবা বাংলা যে কোনো একটি ভাষায় প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লেখা চলবে। প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো চারটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।]

১. ক. অতিথি পাখি কাকে বলে? এসব পাখিদের প্রতি আমাদের কিরূপ আচরণ করা উচিত? কেন? ৪

খ. আর্সেনিক দূষণ রোধকল্পে কি কি ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে? ৪

গ. চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ কি এবং কিভাবে হয়? ৪

ঘ. নীল কাচের মধ্য দিয়ে সাদা ফুল নীল ও হলুদ ফুল কালো দেখায় কেন? ৪

ঙ. ভার্নালাইজেশনের গুরুত্ব লিখুন। ৪

২. ক. প্রেসার কুকার কি? এতে রান্না তাড়াতাড়ি হয় কেন? ৩

খ. আইভরি ব্ল্যাক কি? ২

গ. বাইনোকুলার (Binocular) কি? ৩

ঘ. এনজাইম কি? ২

৩. ক. রেশম সুতার উৎস কি? ২$\frac{1}{2}$

খ. আদর্শ গ্যাস কি? ২$\frac{1}{2}$

গ. ঢালাই লোহা (Cast iron) কি? ২$\frac{1}{2}$

ঘ. ছত্রাক কি? ছত্রাকের অর্থনৈতিক গুরুত্ব লিখুন। ২$\frac{1}{2}$

৪. ক. সব ফুল থেকেই ফল হয় না কেন? ২$\frac{1}{2}$

খ. 'ম্যাড ক্র্যাব' কি? ২$\frac{1}{2}$

গ. রাতে যেসব নক্ষত্র আমরা দেখি, তাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বহু বছর আগে লোপ পেয়েছে– বুঝিয়ে লিখুন। ২$\frac{1}{2}$

ঘ. প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম চুম্বক বলতে কি বোঝায়? ২$\frac{1}{2}$

৫. ক. খেলোয়াড়রা মাঠে নামার আগে ওয়ার্মিং আপ করে কেন? ২

খ. নিম্নচাপ বলতে কি বোঝায়? ২

গ. Sea Level কি? ২

ঘ. রাতে বিড়ালের চোখ জ্বল জ্বল করে কেন? ৪

৬. ক. লাউড স্পিকার কি? এটা কিভাবে কাজ করে? ৩

খ. RUBY LASER-এর গঠন বর্ণনা করুন। ৩

গ. চৌম্বক বলরেখা বলতে কি বুঝেন? এর ধর্মাবলি লিখুন। ৪

উত্তর : মডেল টেস্ট-১০

১. ক. বাংলাদেশে প্রায় ৬০০ প্রজাতির পাখি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ৪০০ প্রজাতির পাখি এ দেশের স্থায়ী বাসিন্দা, আর প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি শীতকালে পৃথিবীর উত্তরাঞ্চল থেকে অতিথি হিসেবে আসে। কারণ রাশিয়ার সাইবেরিয়া, পূর্ব ইউরোপ এবং এমনকি হিমালয় পর্বতের ঢালেও শীতকালে তীব্র শীত পড়ে। পাখিরা এ শীত সহ্য করতে পারে না বলে এবং সম্ভবত খাদ্যের সন্ধানে এ দেশে পাড়ি জমায়। আমাদের দেশে অতিথি হিসেবে আগত সব পাখিই শীতকালে আসে বলে এদের 'শীতের পাখি'-ও বলা হয়। শীতের পাখিদের মধ্যে লেনজা, পাতারি, নীলশীর, ভুঁতি হাঁস, খোপা হাঁস ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস, আবালি, খঞ্জন, কাদাখোঁচা, চটক ইত্যাদি প্রধান।

পাখিরা ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ, ইঁদুর ইত্যাদি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে বলে আমাদের ফসল রক্ষা পায় এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই অতিথি পাখিসহ সকল প্রকার পাখি সংরক্ষণ জরুরি। বেশি বেশি দেশী গাছ লাগিয়ে আমরা পাখির জন্য অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে পারি।

খ. পানিতে আর্সেনিকের দূষণ রোধ করার জন্য বিশেষজ্ঞরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। দেখা গেছে দুশ ফুট থেকে চারশ ফুট নিচের স্তরে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। অবশ্য একহাজার ফুট নিচের স্তরেও আর্সেনিক পাওয়া গেছে। তাই-

i. যে কোনো স্তরে বসানো নলকূপের পানিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তা বন্ধ করে দিয়ে বিকল্প পানীয় জলের উৎস স্থাপন করতে হবে।

ii. আর্সেনিক দূষণমুক্ত পানির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত বিলের, পুকুরের বা নদীর পানি ফুটিয়ে পান করতে হবে।

iii. ফিল্টারের সাহায্যে বা অন্য কোনো উপায়ে পানিকে আর্সেনিক মুক্ত করতে হবে।

iv. ব্যাপকভাবে মাটির নিচের পানির ব্যবহার কমিয়ে প্রাকৃতিক উৎসের পানির ব্যবহার বাড়াতে হবে।

v. নলকূপগুলো বন্ধ করে দেয়ার পর সেচ ও পানীয় জলের জন্য প্রত্যেক গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় একটা বড় পুকুর বা দীঘি খনন বা একটা জলাধার নির্মাণ করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ।

vi. পুকুরগুলো সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে আবর্জনা, মলমূত্র এবং কৃষিজমি থেকে আসা রাসায়নিক সার ও কীটনাশক এ পানিতে না পড়ে।

গ. চন্দ্রগ্রহণ : পৃথিবী তার নিজ অক্ষের চারদিকে ঘোরার পাশাপাশি সূর্যের চারদিকেও ঘুরছে। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে এসে পৌছায়। এমতাবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের ওপর পড়ে এবং চন্দ্রকে দেখা যায় না। একে বলা হয় চন্দ্রগ্রহণ।

সূর্যগ্রহণ : চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে কোনো এক অমাবস্যার তিথিতে সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে এসে পৌছায়। এ সময় সূর্যের আলো চন্দ্র দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর কিছু অংশে পড়ে। ফলে পৃথিবীর কোন স্থান থেকে সূর্যের কিছু অংশ দেখা যায় না। একে বলা হয় সূর্যগ্রহণ।

ঘ. কোনো বস্তুর উপর আপতিত আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে আসলে সে বস্তুটি আমরা দেখতে পাই। প্রতিফলিত আলোর যে বর্ণ থাকে বস্তুটিকেও আমরা সেই বর্ণের দেখি। একটি সাদা ফুল সূর্যের সাতটি আলোই প্রতিফলিত করে বলে তা সাদা দেখায়। সাদা ফুল থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি যখন নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসে তখন ঐ কাচ নীল ব্যতীত অন্যসব বর্ণের আলো শোষণ করে নেয়, তাই আমাদের চোখে শুধু নীল আলো পৌঁছে। ফলে ফুলটি নীল দেখায়। পক্ষান্তরে, হলুদ ফুল শুধু হলুদ বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে বলে তা হলুদ দেখায়। কিন্তু হলুদ বর্ণের আলোক নীল কাচের মধ্য দিয়ে আসার সময় শোষিত হয় তাই হলুদ ফুলকে নীল কাচের মধ্য দিয়ে দেখলে কালো দেখায়।

ঙ. অর্থনৈতিক দিক থেকে ভার্নালাইজেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপ ও আমেরিকার মতো অনেক শীতপ্রধান দেশে বছরের অধিকাংশ সময় হিমশীতল অবস্থা বিরাজমান থাকে, ফলে সেসব অঞ্চলে সারাবছর স্বাভাবিক কৃষিকার্য সম্ভব হয় না। কৃষিক্ষেত্রে এসব অন্তরায় কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সেসব দেশে যে কয়েক মাস আবহাওয়া অনুকূলে থাকে সেসব সময় ভার্নালাইজেশন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অল্প সময়ে ফসল ফলানোর পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ভার্নালাইজেশন পদ্ধতিতে এক দেশের উদ্ভিদকে আরেক দেশের অনুপযোগী আবহাওয়ায় সহজেই অভ্যস্ত করা যায়। ইদানীং আমাদের দেশে কৃষিকার্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা আছে। এ পদ্ধতিতে ধান, পাট প্রভৃতি ফসল উৎপন্ন করে খরা, জলাবদ্ধতা, বন্যা রোগবালাই প্রভৃতি থেকে রক্ষা করা যেতে পারে। আবার একই জমিতে একাধিক ফসলও ফলানো যেতে পারে।

২. ক. প্রেসার কুকার এমন একটি রান্নার পাত্র যেখানে পানির উপরস্থ চাপ বাড়িয়ে এর স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধির মাধ্যমে অল্প সময়ে রান্না করা সম্ভব। ফরাসি বিজ্ঞানী ডেনিস পেপিন ১৬৮১ সালে এটি আবিষ্কার করেন। এটি একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি মোটা দেয়ালের পাত্র। এর ঢাকনাটিকে রাবার প্যাডের বেষ্টনীর মাধ্যমে বায়ুনিরুদ্ধভাবে আটকানো যায়। ঢাকনাটিতে একটি ছিদ্র থাকে এবং কোনো ওজনের সাহায্যে একটি পিন ভাল্ব ছিদ্র মুখে আটকে রাখা হয়। ভিন্ন ভিন্ন ওজন ব্যবহারে পিন ভাল্বটি বিভিন্ন চাপে ছিদ্র বন্ধ করে এবং এর ফলে কুকারের ভেতরস্থ বাষ্পের চাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এভাবে পানিকে 120° সে. বা আরো বেশি উষ্ণতায় ফুটানো যায়। এতে অল্প সময়ে এবং কম জ্বালানিতে রান্না করা সম্ভব হয়। বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি পেলে ভাল্বটি খুলে যায় এবং অতিরিক্ত চাপ কমে যায়। যার ফলে এতে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায়।

খ. প্রাণিদেহের চর্বিযুক্ত হাড়ের বিধ্বংসী পাতনের ফলে উৎপন্ন অস্থিজ কয়লাকে হাইড্রোক্লোরিক এসিডে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় আইভরি ব্ল্যাক। আইভরি ব্ল্যাক কালো রং হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ. দূরের বস্তু বড় আকারে দেখার জন্য দুই চোখ দ্বারা ব্যবহার্য আলোকী যন্ত্র। মনোকিউলার যন্ত্রাদির তুলনায় বাইনোকুলারের বৈশিষ্ট্য হলো এতে দৃষ্টি গভীরতা অধিক।

কোনো বস্তু যখন উভয় চোখ দ্বারা দেখা হয়, তখন ভিন্ন ভিন্ন কোণ থেকে বস্তুটি দৃষ্ট হয় এবং দু চোখের মধ্যে আসন্ন ৬.৫ সেন্টিমিটার দূরত্ব থাকা আবশ্যক। দু চোখের দৃষ্টি সমন্বিত হলেই দূরের বস্তু সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক সাধারণত খালি চোখে ৪৫০ মিটার (৫০০ গজ) দূরের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায়।

বাইনোকুলারের সাহায্যে এ দৃষ্টিসীমা অনেক বাড়ানো যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ সাত-শক্তির বাইনোকুলারের সাহায্যে এ দৃষ্টিসীমা প্রায় ৬৫০ মিটার (৭১০ গজ) পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়।

ঘ. একপ্রকার প্রাণহীন, অদানাদার নাইট্রোজেনপূর্ণ অজানা রহস্যময় জটিল জৈব পদার্থকে এনজাইম বলে। এনজাইমগুলো ইস্ট নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র জীবকোষ থেকে নিঃসৃত হয়। জাইমেজ, ম্যাল্টেজ, ইনভারটেজ, পেপসিন প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এনজাইম। এনজাইমগুলো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট যৌগের ওপর ক্রিয়া করে।

যেমন– ইস্ট থেকে নিঃসৃত জাইমেজ এনজাইম ২০°-২৫° সে. তাপমাত্রায় লঘু জলীয় দ্রবণের গ্লুকোজকে বিয়োজিত করে ইথাইল এলকোহল উৎপন্ন করে।

৩. ক. রেশম বা পলু পোকা থেকে তৈরি এক ধরনের গুটি বা কোকন রেশম বা সিল্ক সুতার উৎস। জীবনচক্রের এক পর্যায়ে রেশম মথ শুককীট বা লার্ভা অবস্থায় থাকে। পরিণত লার্ভার রেশমগ্রন্থি থেকে সরু ছিদ্রপথে রেশম নিষ্কাশিত হয়। এ রেশম বাইরে আসার সাথে সাথেই বাতাসে শুকিয়ে রেশম সুতায় পরিণত হয়। লার্ভার চারিদিকে রেশম সুতা পেঁচিয়ে ও সুতার উপরিভাগে অবস্থিত আঠালো পদার্থের সাহায্যে লার্ভা গুটি বা কোকনে পরিণত হয়। কোকনের ভেতর লার্ভা ২/১ দিনের মধ্যেই পিউপায় রূপান্তরিত হয়।

খ. যেসব গ্যাস সব তাপমাত্রায় ও চাপে বয়েলের সূত্র, চার্লসের সূত্র ও অ্যাভোগেড্রোর সূত্র মেনে চলে তাদেরকে আদর্শ গ্যাস বলে। অন্যকথায় যেসব গ্যাস সব তাপমাত্রা ও চাপে আদর্শ গ্যাসের অবস্থার সমীকরণ মেনে চলে তাদেরকে আদর্শ গ্যাস বলে।

প্রকৃতপক্ষে কোনো গ্যাসই সব তাপমাত্রা ও চাপে আদর্শ গ্যাসরূপে আচরণ করে না। সুতরাং আদর্শ গ্যাস একটি কাল্পনিক ধারণা। তবে অতি নিম্নচাপে, যেমন– প্রায় শূন্য বায়ুচাপে ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায় সব গ্যাসই আদর্শ গ্যাসরূপে আচরণ করে।

গ. ঢালাই লোহা হচ্ছে লোহার সংকর, যেখানে কার্বনের পরিমাণ ১.৮ থেকে ৪.৫ শতাংশ। ঢালাই লোহা সাধারণত বিশেষ আকৃতিতে (কাস্টিং) তৈরি করা হয় যাতে সরাসরি ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণ কাজে এর ব্যবহার রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ঢালাই লোহা থেকে রড কিংবা তার তৈরি করা হয়ে থাকে। সাধারণত ৩ শতাংশ সিলিকনের উপস্থিতি দেখা যায়, তবে ৬ থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত সিলিকন থাকতে পারে। এ ধরনের ঢালাই লোহাকে ব্লক আকারে রাখা হয়। পেটা লোহাকে অবশ্য ঢালাই লোহার পুনর্গলনের মধ্যবর্তী রূপ হিসেবে ধরা যায়। ঢালাই লোহা বিভিন্ন বাণিজ্যিক গ্রেড হিসেবে বিক্রি হয়ে থাকে। এগুলো হলো—গ্রে আয়রন, চিল আয়রন, হোয়াইট আয়রন ইত্যাদি।

ঘ. **ছত্রাক :** অপুষ্পক সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদের ক্লোরোফিল বিহীন পরভোজী গোষ্ঠীকে ছত্রাক (Fungi) বলে। এদের দেহে ক্লোরোফিল থাকে না তাই এরা সালোকসংশ্লেষণ করতে পারে না। এদেরকে খাদ্যের জন্য পচনশীল জৈব পদার্থ বা জীবদেহের তৈরি খাদ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। যেমন— মিউকর।

অর্থনৈতিক গুরুত্ব : ছত্রাক আমাদের উপকার এবং অপকার দুই-ই করে। পাউরুটি, পনির, দই প্রভৃতি শিল্পে ছত্রাক ব্যবহৃত হয়। অনেক ছত্রাক থেকে মূল্যবান এন্টিবায়োটিক ঔষধ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে পেনিসিলিন উল্লেখ করার মতো। আবার ছত্রাক খাদ্যদ্রব্যসহ অনেক নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী নষ্ট করে। এরা উদ্ভিদ ও মানুষের নানা প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। আলুর মড়ক, ধানের বাদামি দাগ রোগ ছত্রাক আক্রমণের ফলেই হয়। ছত্রাক মানুষসহ বিভিন্ন প্রাণীর ত্বক, যকৃত, ফুসফুস, নাক, কান ও গলা প্রভৃতি অঙ্গের নানা রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

৪. ক. আমরা জানি, প্রকৃতির নিয়মেই ফুল থেকে ফল হয়। সব নিয়মেই যেমন ব্যতিক্রম থাকে তেমনি প্রকৃতির নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। অনেক গাছেই ফুল ধরলেও তা থেকে ফল হয় না।

ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু বেরিয়ে গর্ভমুণ্ডে এসে পড়ে। গর্ভমুণ্ডে পরাগরেণু অঙ্কুরিত হলে পরাগরেণু থেকে একটা লম্বা পরাগনালী বেরিয়ে গর্ভদণ্ডের ভেতর দিয়ে নামতে নামতে একেবারে গর্ভাশয়ের ভেতরে এসে পৌঁছায়। পরাগনালীতে পুরুষ কোষ বা শুক্রাণু থাকে আর গর্ভাশয়ের ভেতরে ডিম্বকে আছে স্ত্রীকোষ বা ডিম্বাণু। পরাগনালীর শুক্রাণু এবং ডিম্বকের ডিম্বাণু মিলিত হলেই ডিম্বক থেকে বীজ এবং ডিম্বাশয় থেকে ফল তৈরি হয়।

এ পুরো ব্যাপারটা যে কোনো একটা জায়গায় বাধা পড়লে শুক্রাণু ডিম্বাণুর সঙ্গে আর মিলতে পারে না। সে জন্য ফলও তৈরি হয় না। অনেক সময়ে গর্ভমুণ্ডের শুষ্কতার জন্য পরাগরেণু অঙ্কুরিতই হয় না। আবার পরাগনালী কখনো এত ছোট হয় যে তা ডিম্বাণু পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারে না। তাছাড়া এমনও হতে পারে পরাগরেণু ডিম্বাণুর আগেই পরিণত হলো বা ডিম্বাণু পরিণত হলো পরাগরেণুর আগে। এ রকম নানা ধরনের কারণের জন্য ফুল হলেও গাছে ফল হতে পারে না।

খ. 'ম্যাড ক্র্যাব' এক ধরনের কাঁকড়া। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লোনা পানিতে এরা উৎপন্ন হয়ে থাকে। যদিও এরা ম্যানগ্রোভ অঞ্চল পছন্দ করে কিন্তু তবুও বঙ্গোপসাগরের তট ও অধিতট এবং আন্তঃজোয়ার-ভাটাঞ্চল থেকে ৪০-৫০ কিলোমিটার অভ্যন্তরের মোহনাঞ্চলের নদীনালা, খালবিলের লবণাক্ত পানিতে এ কাঁকড়া প্রবেশ করে মানুষের চাষের আওতায় পৌঁছেছে। বিদেশে বাংলাদেশ থেকে 'ম্যাড ক্র্যাব' রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে ১৯৮২-৮৩ সাল থেকেই অবশ্য এ কাঁকড়া রপ্তানি হচ্ছে।

গ. রাতের আকাশে এমন বহু নক্ষত্র আছে যাদের দূরত্ব পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ। সুতরাং ঐ বিশাল দূরত্বে থাকা কোনো নক্ষত্র হতে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছাতে বহু কোটি বছর সময় লাগবে। বিশাল দূরত্বের কোনো নক্ষত্র যদি কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দী আগে ধ্বংস হয়ে থাকে তবে ঐ নক্ষত্র হতে সর্বশেষ নির্গত আলোকরশ্মি বহু কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে আসতে থাকবে। এজন্য আমরা ঐ নক্ষত্রকে আকাশে দেখতে পাব যদিও নক্ষত্রটির অনেক পূর্বেই ধ্বংস হবে।

ঘ. **প্রাকৃতিক চুম্বক :** খনিতে যেসব চুম্বক পাওয়া যায় তাদেরকে প্রাকৃতিক চুম্বক বলে। প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার থাকে না, এদের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু শক্তিশালী হয় না। প্রাকৃতিক চুম্বককে সন্ধানী পাথরও বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য : ১. প্রাকৃতিক চুম্বকের কোনো সুনির্দিষ্ট আকার থাকে না, ২. প্রাকৃতিক চুম্বকের চুম্বকত্ব স্থায়ী কিন্তু শক্তিশালী হয় না।

কৃত্রিম চুম্বক : লোহা, ইস্পাত, নিকেল ইত্যাদি চৌম্বক পদার্থকে পরীক্ষাগারে বিশেষ উপায়ে চুম্বকে পরিণত করা হলে তাকে কৃত্রিম চুম্বক বলে। কৃত্রিম চুম্বক নিয়মিত আকারের হয়ে থাকে। শিল্প ও বৈজ্ঞানিক কাজে এগুলো ব্যবহার করা হয়।

বৈশিষ্ট্য : ১. কৃত্রিম চুম্বক নিয়মিত আকারের হয়ে থাকে, ২. কৃত্রিম চুম্বকের চুম্বকত্ব শক্তিশালী কিন্তু অস্থায়ী।

৫. ক. মাঠে নামার আগে খেলোয়াড়রা যে ছুটোছুটি করে নেয়, খেলাধুলার ভাষায় একে ওয়ার্মিং আপ বলা হয়। ওয়ার্মিং আপ করলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। এতে শরীরে বিপাকের হার বাড়ে। কোষে অক্সিজেনও বেশি পৌঁছায়। ফলে শরীরে বেশি শক্তি পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এভাবে শরীরে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়লে বিপাকের হার ১৩% বেড়ে যায়।

খ. আমরা জানি কোনো স্থানের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে সেখানকার বায়ু প্রসারিত হয়ে হালকা হয়ে যায় এবং চাপ কমে যায়। বায়ুচাপের এই হ্রাস পাওয়াকেই নিম্নচাপ বলে। নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে চারিদিকের শীতল ভারী বায়ু নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবল বেগে ছুটে আসে। এ বায়ু সমুদ্রের বিশাল জলরাশির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্র থেকে প্রচুর জলীয়বাষ্প বয়ে আনে এবং বৃষ্টিপাত, ঝড় ইত্যাদি ঘটায়। বিভিন্ন কারণে এ নিম্নচাপ অঞ্চলটি স্থান পরিবর্তন করলে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতসহ ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি করে।

গ. Sea Level অর্থ সমুদ্রতল। সমুদ্রতল বা গড় সমুদ্রতল বলতে বোঝায় সমুদ্রের মুক্ত তলের গড় উচ্চতা, অবশ্যই নিস্তরঙ্গ অবস্থায়। পাহাড় বা পর্বতের উচ্চতা অথবা উচ্চস্থানে অবস্থিত কোনো শহরের উচ্চতা হিসাব করা হয় Sea Level থেকে। এ হিসাব অনুযায়ী সমুদ্রতলকে শূন্য উচ্চতা ধরা হয়। যেমন— হিমালয় পর্বতের উচ্চতা ৮৮৮৪ মিটার অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের শীর্ষ বিন্দু সমুদ্রতল থেকে ৮৮৮৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত।

ঘ. দিনের বেলায় একটা বিড়ালকে লক্ষ করলে দেখা যাবে সে তার চোখকে কুঁচকে ছোট করে নিয়েছে। একই সাথে সে চোখের তারারন্ধ্র ছোট করে ফেলে যাতে চোখের ভেতরে বেশি আলো ঢুকতে না পারে। বেড়ালের অক্ষিপটে দুই রকমের কোষ থাকে। 'কোন্' কোষ আর 'রড' কোষ। এর মধ্যে 'কোন্' কোষের চেয়ে 'রড' কোষের সংখ্যাই বেশি থাকে। 'কোন্' কোষ বেশি আলোতে, আর 'রড' কোষ কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে।

অক্ষিপট 'রড' ও 'কোন' কোষ দিয়ে তৈরি চোখের ভেতরকার একটা পর্দা। বাইরে থেকে তারারন্ধ্র দিয়ে আলো ঢুকে অক্ষিপটে বাইরের বস্তুর ছবি তুলে ধরে। বিড়ালের চোখে অক্ষিপটের পিছনেই একটা স্তর থাকে। এ স্তরটিকে ট্যাপেটাম লুসিডাম বলে। এক ধরনের

কেলাস দিয়ে এ স্তর তৈরি। কেলাসে আলো পড়লে তা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তেমনিভাবেই বাইরের আলো এ কেলাস স্তরে পড়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায় এবং আলো নানা দিকে প্রতিফলিত হয়।

বিড়ালের চোখের অক্ষিপটে 'রড' কোষের সংখ্যা বেশি থাকার জন্য বিড়াল অন্ধকারে ভালো করে দেখতে পায়। রাতের অন্ধকারে বিড়াল চোখের তারারন্ধ্রকে পুরোটা খুলে রাখে যাতে বাইরের সব আলোই চোখের ভেতর ঢুকতে পারে। এ আলো ট্যাপেটাম লুসিডাম স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। আলোক রশ্মি ট্যাপেটাম লুসিডাম থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখের ভেতরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোক রশ্মি চোখের ভেতরে ছড়িয়ে পড়ার জন্য চোখের ভেতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে আর অক্ষিপটেও বাইরের বস্তুর স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি গঠিত হয়।

প্রতিফলিত আলোয় চোখের ভেতরটা উজ্জ্বল হওয়ার জন্যই অন্ধকারে বাইরে থেকে দেখলে বিড়ালের চোখের ভেতরটা জ্বলছে বলে মনে হয়।

৬. ক. লাউড স্পিকার হচ্ছে এমন একটি ইলেকট্রো অ্যাকাউস্টিক ট্রান্সডিউসার যা বিদ্যুৎতরঙ্গকে শব্দতরঙ্গে রূপান্তরিত করে। বর্তমানে প্রায় সবক্ষেত্রেই ডায়নামিক লাউড স্পিকার ব্যবহৃত হয়। ডায়নামিক লাউড স্পিকারে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক, পোলপিস, পেপার কোণ, ভয়েস কয়েল, স্পাইডার ও ধাতব ফ্রেম থাকে। ভয়েস কয়েলের মধ্যে চুম্বক অবস্থান করে, তাই কয়েলটা সবসময় চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করে।

যখন অ্যামপ্লিফায়ার থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (অডিও সিগন্যাল) এসে ভয়েস কয়েলে প্রবেশ করে, তখন ভয়েস কয়েল কাঁপতে থাকে। ভয়েস কয়েলের সাথে পেপার কোণ যুক্ত থাকায় পেপার কোণ কাঁপতে থাকে এবং এর সামনের বাতাসও কাঁপতে থাকে। বাতাসের এ কম্পন হচ্ছে মাইক্রোফোনের সামনে সৃষ্ট শব্দের কম্পনের একেবারে অবিকল প্রতিরূপ। অর্থাৎ মাইক্রোফোনের সামনে যে আওয়াজ করা হয়, লাউড স্পিকার থেকে সে একই আওয়াজ শোনা যায়।

খ. **রুবি লেজার (Ruby Laser) :** এটি রুবি দণ্ড দ্বারা তৈরি একটি লেজার উৎপাদন যন্ত্র। এটি সিলিন্ডার আকৃতির রুবির দণ্ড। দণ্ডের একপ্রান্ত A সম্পূর্ণভাবে রৌপ্যায়িত (fully silvered) এবং অন্য প্রান্ত B অর্ধ রৌপ্যায়িত (half silvered)। দণ্ডটি কাচের নলের মধ্যে থাকে। নলটি একটি প্যাঁচানো জেনন বাতি বা ঝলক বাতির (flash tube) মধ্যে রাখা হয়। বাতির আলো দ্বারা 'পাম্পিং' সম্পন্ন করা হয়।

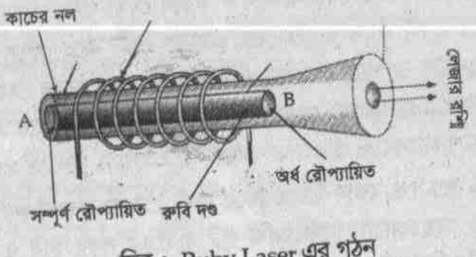

চিত্র : Ruby Laser এর গঠন

রুবি দণ্ডটি অ্যালুমিনিয়াম-অক্সাইড নামক যৌগের কেলাস। এর মধ্যে ক্রোমিয়াম পরমাণুর অপদ্রব্য যোগ করা হয়। সাধারণত অধিক উত্তাপে বাষ্পীভূত অবস্থায় প্রতি 100 ভাগ Al_2O_3 এর সাথে 0.05 ভাগ Cr_2O গ্যাস মিশিয়ে, মিশ্রিত গ্যাসকে শীতল করে লেজার উৎপাদনের উপযোগী রুবি দণ্ড তৈরি করা হয়।

ঝলক বাতির আলো দ্বারা উদ্ভাসিত করলে কেলাসস্থ অধিকাংশ পরমাণু উত্তেজিত হয় এবং পাম্পিং সম্পন্ন হয়। কিছু কিছু উত্তেজিত পরমাণুর স্বতঃস্ফূর্ত নিঃসরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফোটন উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটায়। ফোটনসমূহ বা আলোক রশ্মি দণ্ডের দুই প্রান্তে বার বার প্রতিফলিত হয়। প্রতি যাত্রায় উদ্দীপিত নিঃসরণ ঘটে এবং আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। অতি তীব্র লাল আলো বা লেজার রশ্মি রৌপ্যায়িত প্রান্ত ভেদ করে বেরিয়ে আসে।

গ. **চৌম্বক বলরেখা :** যে কাল্পনিক রেখা বরাবর চুম্বকের উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে তাই চৌম্বক বলরেখা। অন্যভাবে, চৌম্বক ক্ষেত্রে চৌম্বক বল যে সমস্ত নির্দিষ্ট রেখা বরাবর ক্রিয়া করে সেই সমস্ত রেখাকে বলা হয় চৌম্বক বলরেখা।

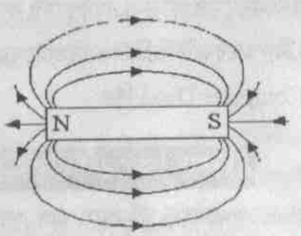

চিত্র : চৌম্বক বলরেখা

চৌম্বক বলরেখার ধর্মাবলী :

i. চৌম্বক বলরেখা বদ্ধ বক্ররেখা।
ii. বলরেখাগুলো উত্তর মেরু হতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ মেরুতে শেষ হয়।
iii. বলরেখাগুলো কখনো পরস্পরকে ছেদ করে না।
iv. বলরেখাগুলো পরস্পরের উপর চাপ দেয় ফলে দুটি বলরেখার মধ্যে বিকর্ষণ কাজ করে।

মডেল টেস্ট ৫

প্রযুক্তি

পূর্ণমান : ৪০

দ্রষ্টব্য : প্রার্থীদিগকে ১নং প্রশ্নের এবং অবশিষ্ট প্রশ্নের যে কোনো তিনটির উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে।

নম্বর

১. ক. সফটওয়্যার (Software)-এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন। ৫
খ. নেপিয়ারের হাড় কি? ৫

২. ক. ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser) কি? ২
খ. আইকন (Icon) কি? ২

গ. পোলারয়েড ক্যামেরায় কিভাবে তাৎক্ষণিক আলোকচিত্র প্রস্তুত হয়? ২

ঘ. সলিনয়েড কি? তড়িৎবাহী সলিনয়েড দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে– ব্যাখ্যা করুন। ৪

৩. ক. আপেক্ষিক রোধ কি? রোধ ও আপেক্ষিক রোধের পার্থক্য দেখান। ৩

খ. অপটিক্যাল ফাইবারের প্রকারভেদ, গঠন ও সুবিধাবলী বর্ণনা করুন। ৫

গ. ডেটা সংগ্রহের জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়? ২

৪. ক. আইবিএম (IBM) এবং এপল (Apple) কম্পিউটারের মধ্যে পার্থক্য কি? ৩

খ. ভারচ্যুয়াল মেমরি কি? ২

গ. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম কি? এ প্রোগ্রাম কি কাজ করে? ৩

ঘ. মাল্টিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিগুলো কি কি? ২

৫. ক. ফ্যাক্স কি? ফ্যাক্সের ব্যবহার ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন। ৩

খ. এসি জেনারেটর বা ডায়নামোর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা করুন। ৩

গ. ডিজিটাল ডিভাইস কি? কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইসের নাম লিখুন। ২

ঘ. কম্পিউটার ডিস্ক (Computer Disk) কি? ২

উত্তর : মডেল টেস্ট-১০

১. ক. কম্পিউটার সফটওয়্যারকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software)

২. অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software) বা ব্যবহারিক সফটওয়্যার

নিচে সফটওয়্যারের প্রকারভেদ ছকে দেখানো হলো :

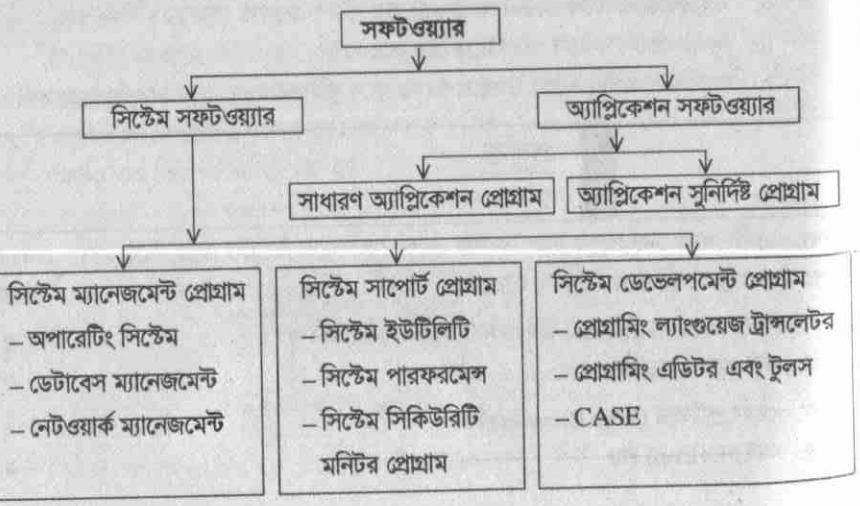

খ. ভাগ ও গুণের কাজের সহায়তার জন্য যন্ত্রের প্রচলন করেন জন নেপিয়ার নামক একজন স্কটিশ গণিতবিদ। তিনি ১৬১৭ সালে হিসাবে সহায়তার জন্য দাগ কাটা ও সংখ্যা বসানো কাঠি ব্যবহার করে এক ধরনের যন্ত্রের প্রচলন করেন। কাঠি দিয়ে তৈরি হওয়ায় এ যন্ত্রটির নাম হয়েছে নেপিয়ার হাড় (Napier's Bone)। নেপিয়ারের যন্ত্রে দশটি দণ্ড আছে। প্রত্যেক দণ্ডে দশটি সংখ্যা আছে।

২. ক. **ওয়েব ব্রাউজার (Web Browser) :** ওয়েব ব্রাউজার হলো এক বিশেষ ধরনের প্রোগ্রাম যা ওয়েব পেজ প্রদর্শনে ব্যবহৃত হয়। HTML ভিত্তিক ডকুমেন্ট পেজ প্রদর্শনের জন্য ইউনিক্স ভিত্তিক প্রথম গ্রাফিক্স ব্রাউজার প্রণীত হয়েছিল ১৯৯২ সালে। মাইক্রোসফট ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ও মজিলা ফায়ারফক্স বর্তমানে বহুল প্রচলিত দুটি ওয়েব ব্রাউজার।

খ. **আইকন (Icon) :** বর্ণভিত্তিক (ডস) কম্পিউটার সিস্টেমকে চিত্রভিত্তিক (উইন্ডোজ) কম্পিউটার সিস্টেমে রূপান্তর করায় এর ব্যবহার ও পরিচালনা অত্যন্ত সহজ ও দৃষ্টিনন্দন হয়েছে। চিত্রভিত্তিক কম্পিউটার সিস্টেমে কমান্ডসমূহকে বিভিন্ন চিত্র দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে কমান্ড মুখস্থ করার কোনো ঝামেলা নেই। প্রতিটি চিত্রকে একেকটি কমান্ড দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছে। উইন্ডোজ সিস্টেমে প্রদর্শিত উক্ত চিত্রসমূহকে আইকন হিসেবে অভিহিত করা হয়।

গ. পোলারয়েড ক্যামেরায় পরস্পর সমান্তরালভাবে যুক্ত দুটি ফিল্ম রোল ভরা হয়। এর একটি রোল নেগেটিভ ও অন্যটি পজিটিভ। আলোকচিত্রের রাসায়নিক পূর্ণ ক্ষুদ্র আধার (pad) পজিটিভ রোলটির সাথে যুক্ত থাকে। ক্যামেরায় লেন্সের মাধ্যমে ফিল্মের ওপর আলো এসে পড়ার পর নেগেটিভ ও পজিটিভ ফিল্মদ্বয় দুটি রোলারের মধ্য দিয়ে চালিত হয়। এর ফলে রাসায়নিকপূর্ণ আধারগুলো ভেঙ্গে যায়। রাসায়নিক পদার্থগুলো এরপর নেগেটিভ ফিল্মটির ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। এর ফলেই আলোক পৃষ্ঠের রোলারটির উপর নেগেটিভ চিত্র সৃষ্টি হয়ে যায়। এরপর আধা নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে পজিটিভ ফিল্মের ওপর লাগানো রাসায়নিক পদার্থ মিশে নতুন বিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পজিটিভ আলোক চিত্র ফুটে ওঠে।

ঘ. সলিনয়েড হলো কাছাকাছি বা ঘন সন্নিবিষ্ট অনেকগুলো প্যাঁচযুক্ত লম্বা বেলনাকার কয়েল বা তার কুণ্ডলী। একটি লম্বা অন্তরীত পরিবাহক তারকে স্প্রিংয়ের মতো বহুপাকে ঘন সন্নিবিষ্ট করে সাজালে বা কয়েল তৈরি করলে সলিনয়েড তৈরি হয়। অন্তরীত বেলনাকার চোঙের ওপর তার পেঁচিয়ে সলিনয়েড তৈরি করা যেতে পারে। তারের প্রতিটি পাক বেলনের অক্ষের সাথে লম্বভাবে থাকে।

তড়িৎবাহী সলিনয়েড দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে : সলিনয়েড দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ চালালে সলিনয়েডের প্রতিটি প্যাঁচ একটি কয়েল হিসেবে কাজ করে এবং চুম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে। এছাড়াও প্যাঁচগুলো একত্রে যে চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, তা কোনো দণ্ড চুম্বকের চারদিকের চৌম্বকক্ষেত্রের সদৃশ। কয়েলটি এমনভাবে আচরণ করে যেন এর এক প্রান্তে উত্তর মেরু ও অপর প্রান্তে দক্ষিণ মেরুর সৃষ্টি হয়েছে। কোনো সলিনয়েডে বলরেখার প্রকৃতি ঠিক

একটি দণ্ড চুম্বকের বলরেখার মতো। দণ্ড চুম্বকের মতোই সলিনয়েডের দুই প্রান্তে বিপরীত চৌম্বক মেরুর মতো আচরণ করে। সলিনয়েডের যে প্রান্তে সে প্রান্তে দক্ষিণ মেরু সৃষ্টি হয়। আর সে প্রান্তে উত্তর মেরু সৃষ্টি হয়।

যখন কোনো চুম্বক শলাকাকে সলিনয়েডের এক প্রান্তে যে প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে আনা হয়, শলাকার দক্ষিণ মেরু এর দিকে আকৃষ্ট হয়। শলাকাকে অপর প্রান্তে (যে প্রান্তে তড়িৎপ্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে) আনা হলে এর উত্তর মেরু ঐ প্রান্তের দিকে আকৃষ্ট হয়। সলিনয়েডে তড়িৎপ্রবাহের অভিমুখ বিপরীত করলে এর মেরুদ্বয়ও পাল্টে যায় এবং বলরেখাগুলোর অভিমুখ বিপরীতমুখী হয় অর্থাৎ এটি একটি দণ্ড চুম্বকের মতো আচরণ করে।

৩. ক. একক দৈর্ঘ্য এবং একক প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কোনো একটি পরিবাহী তার প্রস্থচ্ছেদের অভিলম্বভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহে যে পরিমাণ বাধা প্রদান করে, তাকে তার আপেক্ষিক রোধ বলে।

রোধ ও আপেক্ষিক রোধের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ :

রোধ	আপেক্ষিক রোধ
১. পরিবাহী যে ধর্মের ফলে তার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহকালে কম-বেশি বাধার সৃষ্টি করে তাকে এর রোধ বলে। নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক মাত্রা বিদ্যুৎ প্রবাহের জন্য কোনো পরিবাহীর দু প্রান্তে যে বিভব পার্থক্যের প্রয়োজন হয় সেটাই উক্ত তাপমাত্রায় ঐ পরিবাহীর রোধের পরিমাণ নির্দেশ করে।	১. কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একক আয়তনের কোনো একটি ঘনক আকৃতির বা একক দৈর্ঘ্য ও একক প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট একটি পরিবাহীর দু বিপরীত তলের মধ্যবর্তী রোধকে ঐ তাপমাত্রায় উক্ত পরিবাহীর উপাদানের আপেক্ষিক রোধ বলে।
২. রোধের একক ওহম Ω।	২. আপেক্ষিক রোধের একক ওহম মিটার (Ωm)।
৩. কোনো পরিবাহীর রোধের মান নির্ভর করে তাপমাত্রা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদ, পরিবাহীর উপাদান ইত্যাদির ওপর।	৩. কোনো পরিবাহীর আপেক্ষিক রোধ নির্ভর করে এর তাপমাত্রা ও উপাদানের ওপর।
৪. রোধ হয় কোনো পরিবাহীর।	৪. আপেক্ষিক রোধ হয় পরিবাহীর উপাদানের।

খ. অপটিক্যাল ফাইবার হলো ডাই-ইলেকট্রিক পদার্থ দিয়ে তৈরি এক ধরনের আঁশ, যা আলো নিবদ্ধকরণ ও পরিবহনে সক্ষম। ভিন্ন প্রতিসরাঙ্কের এ ধরনের ডাই-ইলেকট্রিক দিয়ে অপটিক্যাল ফাইবার গঠিত। অপটিক্যাল ফাইবারের তিনটি অংশ থাকে। যথা :

১. **কোর :** ভিতরের ডাই-ইলেকট্রিক কোর যার ব্যাস ৮ থেকে ১০০ মাইক্রোন হয়ে থাকে।

২. **ক্ল্যাডিং :** কোরকে আবদ্ধ করে থাকা বাইরের ডাই-ইলেকট্রিকটি ক্ল্যাডিং নামে পরিচিত। কোরের প্রতিসরাঙ্ক ক্ল্যাডিং-এর প্রতিসরাঙ্কের চেয়ে বেশি থাকে।

৩. **জ্যাকেট :** আবরণ হিসেবে কাজ করে।

অপটিক্যাল ফাইবারের প্রকারভেদ : ফাইবারের গাঠনিক উপাদনের প্রতিসরাঙ্কের ওপর ভিত্তি করে ফাইবারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা :

১. স্টেপ ইনডেক্স ফাইবার (Step-index Fiber)
২. গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবার (Graded-index Fiber) ও
৩. মনোমোড ফাইবার (Monomode Fiber)

স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক সর্বত্র সমান থাকে। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের কোরের প্রতিসরাঙ্ক কেন্দ্রে সবচেয়ে বেশি এবং এর ব্যাসার্ধ বরাবর কমতে থাকে। কোরের প্রতিসরাঙ্কের ভিন্নতার জন্য এ দু ধরনের ফাইবারের আলোকরশ্মির গতিপথও ভিন্ন হয়। গ্রেডেড ইনডেক্স ফাইবারের তুলনায় স্টেপ ইনডেক্স ফাইবারের কোরের ব্যাসার্ধ বেশি।

ফাইবারের গঠন উপাদান : ফাইবার তৈরির অন্তরক পদার্থ হিসেবে সিলিকা এবং মাল্টি কমপোনেন্ট কাচ বহুলভাবে ব্যবহার করা যায়। এসব অন্তরক পদার্থের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অতি স্বচ্ছতা,
২. রাসায়নিক সুস্থিরতা বা নিষ্ক্রিয়তা।
৩. সহজ প্রক্রিয়াকরণ যোগ্যতা।

ফাইবার তৈরির জন্য সোডা বোরো সিলিকেট, সোডা লাইম সিলিকেট, সোডা অ্যালুমিনা সিলিকেট ইত্যাদি মাল্টি কম্পোনেন্ট কাচগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। কখনো কখনো ফাইবারের ক্ল্যাডিং হিসেবে প্লাস্টিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্তমানে পূর্ণ প্লাস্টিক ফাইবারের ব্যবহারও পরিলক্ষিত হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্ষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে প্রধান বাধা। সাধারণ কাচ ফাইবার তৈরির জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়। কারণ এর মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মি কিছু দূর যেতে না যেতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। তাছাড়া সাধারণ কাচ দূর থেকে স্বচ্ছ মনে হলেও অপটিক্যাল কমিউনিকেশনের জন্য যতটা স্বচ্ছতা দরকার ঠিক ততটা নয়।

ফাইবারের সুবিধা : বিভিন্ন ধরনের সুবিধার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এসব সুবিধার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. উচ্চ ব্যান্ডউইথ,
২. আকারে ছোট এবং ওজন অত্যন্ত কম,
৩. শক্তি ক্ষয় করে কম,
৪. বিদ্যুৎ চৌম্বক প্রভাব হতে মুক্ত,
৫. ডেটা সংরক্ষণের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা।

গ. উৎস থেকে ডেটা সংগ্রহ করার জন্য অনেকগুলো পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা–

– লিখিত ডকুমেন্ট (Written documents) তৈরি করে;
– সাক্ষাৎকার (Interviews) গ্রহণ করে;

– প্রশ্নাবলী (Questionnaires) তৈরি ও পূরণ করে;
– পর্যবেক্ষণ (Observations) করে ও
– নমুনায়ন (Sampling) করে ইত্যাদি।

তাছাড়া OMR, OCR, Barcode Reader, Light Pen, MICR ইত্যাদি ইনপুট যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারে সরাসরি ডেটা গ্রহণ করতে পারে।

৪. ক. আইবিএম (IBM) এবং এপল (Apple) কম্পিউটারের পার্থক্য :

i. আইবিএম-এ DOS এবং চিত্রভিত্তিক উইন্ডোজ দুই পরিবেশেই কাজ করা যায়। কিন্তু এপল ম্যাকিনটোশের অপারেটিং সিস্টেম তৈরি হয়েছে শুধু চিত্রভিত্তিক GUI (Graphical User Interface) যা বর্ণভিত্তিক থেকে খুবই সহজ।

ii. আইবিএম কম্পিউটারে ইন্টেল বা অন্যান্য কোম্পানির তৈরি ইন্টেলের অনুরূপ প্রসেসর ব্যবহৃত হয়। এপল ম্যাকিনটোশে মটোরোলার তৈরি প্রসেসর ব্যবহৃত হয়।

iii. এপল ম্যাকিনটোশ শুধুমাত্র Apple নামক একটি কোম্পানি তৈরি করে বলে এর দাম তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু IBM অনেক দেশেই তৈরি হয়। তাই প্রতিযোগিতার জন্য এদের দাম দিন দিন কমে যাচ্ছে।

iv. এপল কম্পিউটার সাধারণত প্রকাশনা জগতে বেশি ব্যবহৃত হয়। IBM কম্পিউটার প্রকাশনা ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

v. এপল কম্পিউটারের সিপিইউ (সিস্টেম ইউনিট) তুলনামূলকভাবে IBM কম্পিউটারের চেয়ে ছোট আকৃতির।

খ. আধুনিক অপারেটিং সিস্টেমগুলোতে সহায়ক মেমরির (যেমন– হার্ডডিস্কে) ফাঁকা স্থানকে প্রধান মেমরির অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এ অবস্থাকে ভারচ্যুয়াল মেমরি বলে। যদি ভারচ্যুয়াল মেমরি অন করা হয় তাহলে কোনো হার্ডডিস্কের যে পরিমাণ স্থান প্রধান মেমরির অংশ তথা ভারচ্যুয়াল মেমরি হিসেবে ব্যবহার করা হবে হার্ডডিস্কে ডেটা সংরক্ষণের জন্য সে পরিমাণ স্থান কম পাওয়া যাবে। আবার ভারচ্যুয়াল মেমরি অফ করে দিলেই হার্ডডিস্কের যে খালি স্থান ভারচ্যুয়াল মেমরির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল তা ডেটা সংরক্ষণের জন্য খালি পাওয়া যাবে।

গ. কম্পিউটার অন করার পর নিয়ন্ত্রণ প্রোগ্রামের সুপারভাইজারের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি প্রাইমারি মেমরি বা র‍্যাম (RAM)-এ লোড হয় বলে এটিকে 'রেসিডেন্ট রুটিন' বলা হয়। সুপারভাইজারের বাকি অংশ সেকেন্ডারী মেমরিতে থাকে তাই তাকে 'ক্ষণস্থায়ী বা ট্রানজিয়েন্ট রুটিন' বলা হয়। সুপারভাইজার প্রোগ্রামের কাজ নিম্নরূপ–

১. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসগুলোর সাথে CPU-এর সংযোগ স্থাপন করে ডেটা আদান-প্রদান নিয়ন্ত্রণ করে।

২. কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে যে কোনো Error Message সুপারভাইজার প্রোগ্রাম জানিয়ে দেয়।

৩. সুপারভাইজার প্রোগ্রাম প্রয়োজনমত ক্ষণস্থায়ী বা ট্রানজিয়েন্ট রুটিন প্রোগ্রামকে সহায়ক মেমরি থেকে প্রধান মেমরিতে নিয়ে এসে কাজে লাগায়।

ঘ. মাল্টিমিডিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি হলো :

১. ইন্টারঅ্যাকটিভ টিভি সিস্টেম (Interactive TV System),
২. ভার্চুয়াল রিয়েলিটি (Virtual Reality),
৩. ভিডিও টেলিফোন (Video Telephone),
৪. হোম শপিং (Home Shoping),
৫. হোম এডুকেশন (Home Education),
৬. ভিডিও কনফারেন্সিং (Video Conferencing) ও
৭. রিমোট অপারেশন (Remote Operation) ইত্যাদি।

৫. ক. ফ্যাক্স (Fax) একটি সংক্ষিপ্ত ইংরেজি শব্দ যার পূর্ণ অর্থ হলো ফ্যাক্সিমিলি (Faxcimile)। ফ্যাক্স হচ্ছে একটি যন্ত্র, যার দ্বারা লিখিত বক্তব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছানো হয়। ফ্যাক্সের পাঠক যন্ত্রে লিখিত বক্তব্য স্থাপন করলে তা ইলেকট্রনিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এবং প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো হয়। গ্রাহক যন্ত্র এ বক্তব্য গ্রহণ করে পূর্ববৎ করে প্রিন্টারের সাহায্যে অবিকলভাবে প্রকাশ করে, মাইক্রোওয়েভ এবং স্যাটেলাইটের মাধ্যমে এ সংবাদ আদান-প্রদান করা হয়।

ব্যবহার : লিখিত বক্তব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রুত প্রেরণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। ছবি, ম্যাপ, ইত্যাদিও ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এর সাহায্যে টেলিফোন ও ফটোকপিও করা যায়। রেকর্ডার হিসেবেও এ যন্ত্র অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

যেভাবে কাজ করে : লিখিত বক্তব্য পাঠক যন্ত্রে স্থাপন করলে তা ইলেকট্রিক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হয় এবং প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে পাঠানো হয়। গ্রাহকযন্ত্র এ বক্তব্য পূর্ববৎ করে প্রিন্টারের সাহায্যে অবিকলভাবে প্রকাশ করে।

খ. **গঠন :** এতে একটি চুম্বক থাকে। একে ক্ষেত্র চুম্বক (field magnet) বলে। চুম্বকের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কাঁচা লোহার পাতের ওপর একটি তারে আয়তাকার কুণ্ডলী থাকে। কাঁচা লোহার পাতটিকে আর্মেচার বলে। আর্মেচারটিকে চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যবর্তী স্থানে যান্ত্রিক উপায়ে সমগতিতে ঘুরানো হয়। আয়তাকার কুণ্ডলীর দুই প্রান্ত দুটি স্লিপ রিং-এর সাথে সংযুক্ত থাকে। স্লিপ রিং দুটি আর্মেচারের সাথে একই অক্ষ বরাবর ঘুরতে পারে। দুটি কার্বন নির্মিত ব্রাস এমনভাবে স্থাপন করা হয় যেন তারা যখন আর্মেচার ঘুরতে থাকে তখন স্লিপ রিং দুটিকে স্পর্শ করে থাকে। ব্রাস দুটির সাথে বহির্বর্তনীর রোধ সংযুক্ত থাকে।

কার্যপ্রণালী : বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আবেশের উপর ভিত্তি করে এ যন্ত্রের মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত। কোনো চৌম্বক ক্ষেত্রের দুই মেরুর মাঝে একটি পরিবাহী কুণ্ডলীকে যান্ত্রিক উপায়ে ঘুরিয়ে তড়িৎ প্রবাহ আবিষ্ট করা যায়। চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যে পরস্পর সমান্তরালে বলরেখাগুলো নির্গত হয়। জেনারেটরের আর্মেচার কুণ্ডলী তারের ঘূর্ণনের ফলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংখ্যক বলরেখা এর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। আর্মেচারের দু প্রান্তের সাথে সংযুক্ত বহিঃবর্তনীকে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহ বলে। আবিষ্ট তড়িৎ প্রবাহের মান কুণ্ডলীর পাক সংখ্যা, চুম্বকের শক্তি এবং ঘূর্ণনের বেগের উপর নির্ভর করে।

গ. কতগুলো ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেমন— ট্রানজিস্টার, ডায়োড, অপারেশনাল অ্যামপ্লিয়ার ইত্যাদি দিয়ে তৈরি আরেকটি ডিভাইস যেটি বিভিন্ন ডিজিটাল কাজ সম্পাদন করে, একে ডিজিটাল ডিভাইস বলে। কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইস হলো রেজিস্টার, কাউন্টার, ফ্লিপ-ফ্লপ, ডিকোডার, এনকোডার, মাল্টিপ্লেক্সার, ডি-মাল্টিপ্লেক্সার ইত্যাদি।

ঘ. **কম্পিউটার ডিস্ক (Computer Disk) :** কম্পিউটারে প্রোগ্রাম এবং ডাটা বা উপাত্ত রাখার আঁধারকে ডিস্ক বলা হয়। ডিস্কে ইচ্ছামতো ডাটা বা উপাত্ত, প্রোগ্রাম, সংবাদ ইত্যাদি লেখা ও পড়া যায়। ফ্লপি ডিস্ক (OCR), হার্ড ডিস্ক (Hard Disk), ৩সিডি (CD—Compact Disk) ইত্যাদি কম্পিউটার ডিস্কের উদাহরণ।

প্রফেসর'স

বিসিএস সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

১০ম-৩৪তম বিসিএস-এর প্রশ্ন সমাধান

নতুন সিলেবাসে মডেল প্রশ্ন ও উত্তর সংযোজিত

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com
01836672102